অদ্রীশ বর্ধন
অসহ্য
সাসপেন্স
সমগ্র
হৃদযন্ত্র দুর্বল পাঠকদের
জন্য এই বই নয়!

অদ্রীশ বর্ধন
অসহ্য সাসপেন্স সমগ্র
হৃদযন্ত্র দুর্বল পাঠকদের
জন্য এই বই নয়!

অসহ্য সাসপেন্স সমগ্র

অদ্রীশ বর্ধন

অসহ্য সাসপেন্স সমগ্র

পত্রভারতী

www.bookspatrabharati.com

প্রথম একত্রে প্রকাশ নভেম্বর ২০১৮
দ্বিতীয় মুদ্রণ ফেব্র&য়ারি ২০১৯

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্রভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০০০৯
থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ একতা

ASAJHYO SUSPENSE SOMOGRO
by Adrish Bardhan
Published by PATRABHARATI 3/1 College Row, Kolkata 700 009
Phones 2241 1175, 94330 75550, 98308 06799
E-mail patrabharati@gmail.com
visit at www.facebook.com/PatraBharati

ISBN 978-81-8374-517-8

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
শ্রদ্ধাস্পদেষু

পত্রভারতী প্রকাশিত

লেখকের অন্যান্য বই

সেরা গোয়েন্দা উপন্যাস
বিশ রহস্য
সুপারম্যান বিক্রমজিৎ
সেরা কল্পবিজ্ঞান অমনিবাস
পাঁচটি রহস্য উপন্যাস
মাকড়সা আতঙ্ক

আজ থেকে ১৮ বছর আগে প্রকাশিত **অসহ্য সাসপেন্স প্রথম খণ্ডের** ভূমিকা লেখার সময় সাহিত্যিক **অদ্রীশ বর্ধন** লেখেন—

'এই গ্রন্থে সংকলিত কাহিনিগুলি লিখতে বসে মাথায় ভিড় করে এসেছিল নানা ঘটনা, নানা তথ্য। তাদের কোনোটা পেয়েছি বিদেশি বিজ্ঞান পত্রিকায়, কোনোটা দৈনিক খবরের কাগজে। কল্পনার সংমিশ্রণ ঘটেছে বিদেশি কাহিনিতেও। কখনও শুনেছি পুলিশ অফিসারের অভিজ্ঞতা, কখনও পড়েছি ডিটেকটিভ এজেন্সির নিউজ বুলেটিন, কখনও দিল্লি থেকে প্রকাশিত পুলিশ ম্যাগাজিন। পিনকারটন আর এফ. বি. কেসও আমায় সাহায্য করেছে। এভাবেই উপকরণ এসেছে অজস্র উৎস থেকে—এমনকী মানসিক চিকিৎসালয় থেকেও।

বহু বছর ধরে সংগৃহীত এইসব উপাদানকে মনোরঞ্জনী মণিমালায় গেঁথেছি গল্প আকারে—আবির্ভাব ঘটিয়েছি অনেক বিচিত্র চরিত্রের।

এই প্রথম তারা সকলে একত্রে সন্নিবেশিত হচ্ছে। প্রথমে ঠিক ছিল, অসহ্য সাসপেন্স 'অখণ্ড' প্রকাশিত হবে। কিন্তু বইয়ের আকার এত সুবিপুল হয়ে উঠল, পাঠকপাঠিকাদের কথা ভেবে দু-খণ্ডে প্রকাশ করা হচ্ছে। অনতিবিলম্বে প্রকাশিত হবে দ্বিতীয় খণ্ড। আশা রাখি, রহস্যপিপাসু পাঠকরা খুশি হবেন।...'

কিন্তু অতঃপর অসহ্য সাসপেন্স সিরিজে আরো লেখা সংযোজিত হওয়ায় শেষপর্যন্ত প্রকাশিত হয় ৩টি খণ্ড। পাঠক সমাজে তুমুল আলোড়ন তোলে এই সিরিজ। অবশেষে অদ্রীশ বর্ধনের জীবদ্দশাতেই পূর্ণ হল তাঁর মনস্কামনা। এসে গেল পরিমার্জিত নবরূপে **অসহ্য সাসপেন্স সমগ্র**।

কলকাতা
২১শে সেপ্টেম্বর, ২০১৮

প্রকাশক

সাসপেন্স! সাসপেন্স!

পায়রাকুঠীর রহস্য

ছিদ্রান্বেষী ইন্দ্রনাথ

আদুরে খোকা

ম্যারিঅন-এর ঘটনা

এক বোতল কাশাকা

বাদালোনা-র সেই লাশটি

মধ্যরাতের মস্কো

দামাস্কাসের উগ্র সূর্য

নেশা লাগে খুনের স্বাদে

ব্লেড, ক্রিম আর ঘুমের বড়ি

মেয়ে খুনে কাউন্ট সারভিয়াত্তি

মানুষ দস্তানার কাহিনি

রাতের আতঙ্ক

পাঁচ তারার প্যাঁচ

নিরুদ্দেশ নীলকান্তমণি

মই

ব্ল্যাকমেল

রাজা কঙ্ক

শনিবারের মড়া

শিয়রে শমন

জিরো জিরো গজানন

জিরো জিরো গজানন রেগেছে

আবার জিরো জিরো গজানন

ব্রোঞ্জের গণেশ

প্রেতিনী কন্যার কাহিনি

নীহাররঞ্জন গুপ্ত-র গল্প নিয়ে গোয়েন্দা ধাঁধা রহস্যভেদী। কিরীটি রায়

সুন্দরী তুমি শুকতারা

পাগল খুনি

সোনার খড়ম

স্তব্ধ অট্টহাসি

দাঁত থাকতে

জুয়েল বক্স

হীরক বন্দরের হিরের কলম

ব্রেন ডিটেকটিভ

কদাকার কেস

রূপোর রেকাবি

প্রবঞ্চক সম্রাট

সোনার আতা

ফকিরচাঁদের ফৌতি ব্যবসা

দুঃস্বপ্ন

রায়চৌধুরী-দম্পতির বসবার ঘরটি সত্যিই অপরূপ। রীতিমতো বিলাসবহুল উপকরণে সুসজ্জিত। নরম মখমল আঁটা সোফা, আয়নার মতো চকচকে পালিশ করা নীচু হালফ্যাশানের চেয়ার, ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত শ্বেত প্রস্তরে খোদিত গ্রিক ভাস্কর্যের রম্য নিদর্শন ঘরের আবহাওয়াকেও যেন বিলাস-সৌরভে সুরভিত করে তুলেছে। দেওয়ালে ঝুলছে, বহুমূল্য ভেলভেটের পর্দা, পর্দার ওপর সোনালি সুতোর ফুল-লতা-পাতা। ঘরের মেঝেতে পা ডুবে যাওয়া পুরু গালিচা—বাস্তবিকই এ ভবনের সুন্দরী কর্ত্রী-ঠাকরুনের মনোরঞ্জনে সক্ষম অপরূপ এই কক্ষটি। রূপসী স্ত্রীর সকল খেয়াল এবং চাহিদা মেটাতে কুন্তল রায়চৌধুরী কোনওদিন বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেননি—তাঁর বিপুল সম্পদের শেষ কানাকড়িও বোধ করি এ জন্যে ব্যয় করতে তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না। আর বাস্তবিকই, মনিকা তাঁর জন্যে যে স্বার্থত্যাগ করেছে তার প্রতিদানে কুন্তল রায়চৌধুরী যে তাঁর জন্যে এতটা করবেন এ তো স্বাভাবিক। ভারতবর্ষের মধ্যে নৃত্যশিল্পে, বিশেষত ভারতনাট্যম-নৃত্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন মনিকা দেবী, কয়েকটি জনসম্বর্ধিত চিত্রেও পরিচয় দিয়েছেন তাঁর নিপুণ অভিনয়-দক্ষতায়—সুনাম সুযশের শিখরে তিনি উঠে বসেছিলেন, অর্থ তাঁর চরণে যেত গড়িয়ে—এ সবের মোহ ত্যাগ করে কুন্তল রায়চৌধুরীর প্রেমে মুগ্ধ হয়ে এলেন তাঁর ঘরে ঘরণী হয়ে। যশোজ্জ্বল জীবনের সবকিছু মনিকা দেবী ছেড়ে এসেছেন—সে সব পূরণ করবার প্রাণপণ চেষ্টা করেন কুন্তল রায়চৌধুরী। এ জন্যে তিনি তাঁর অর্থকে মনে করেন ধূলিসম। কেউ হয়তো মনে করতে পারেন যে তিনি প্রেমের চেয়ে বড় করে দেখেছিলেন মনিকা দেবীর অনিন্দ্য রূপ আর অগাধ খ্যাতিকে। প্রেমের ফাটল তিনি অর্থের প্রলেপ দিয়ে জুড়ে দেওয়ার প্রয়াস পেতেন। কিন্তু তা যারা ভাবেন, তাঁরা ভ্রান্ত। কেননা, একঘর দর্শকের সামনেও তাঁর অকুণ্ঠ ভালবাসার প্রমাণ দিতে তিনি কোনও দিন কুণ্ঠিত হননি।

কিন্তু কক্ষটি বাস্তবিকই অপূর্ব। প্রথম দৃষ্টিতেই কক্ষটিকে দেখে মনে হবে যেন শিল্পী চোখে স্বপ্নাঞ্জন লেপন করে ঘরটি সজ্জামণ্ডিত করেছেন। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ আবহাওয়ার সাথে পরিচিত হয়ে ওঠার পর কতকগুলো অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য প্রত্যেকেই উপলব্ধি করবে। ঘরটি নিস্তব্ধ—অত্যন্ত নিস্তব্ধ। পুরু গালিচার ওপরে কোনও পদশব্দ শ্রুত হয় না। ঘরের মৃদু নীলাভ আলোর আবহাওয়া কেমন যেন থমথমে হয়ে উঠেছে। মনিকা রায়চৌধুরী এই কক্ষটিতে প্রতিদিন আসতেন, ঘণ্টা দু-চার থাকতেন—কিন্তু যতক্ষণ থাকতেন তিনি, ততটুকু সময় একাকী মগ্ন হয়ে থাকতেন এই অদ্ভুত নৈঃশব্দ্যে এবং এই রহস্যময় ঘরের চারটি দেওয়ালের মধ্যে মনিকা রায়চৌধুরী হয়ে উঠতেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং রীতিমতো বিপজ্জনক মহিলা।

বিপজ্জনক—হ্যাঁ একমাত্র এই শব্দটিই প্রয়োগের উপযুক্ত। কোমল মখমলের ওপর অর্ধশায়িতা তাঁর নিখুঁত অবয়ব দেখে সে সন্দেহ কার মধ্যে উপস্থিত হবে? সুগঠিত কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞ চিবুকটি দক্ষিণ হস্তের ওপর ন্যস্ত করে তিনি আড় হয়ে শুয়েছিলেন। তাঁর দীঘল কিন্তু ম্লান দুটি চক্ষু, প্রশংসনীয় কিন্তু অনমনীয় দুটি আঁখির দৃষ্টি, সম্মুখে বিস্তৃত—অটল সঙ্কল্পে স্থির সে দৃষ্টি। অবোধ্য শঙ্কার ছায়াবিজড়িত, ভয়াবহ সে দৃষ্টি। অনিন্দ্যসুন্দর তাঁর আননটি— শিশুর মতো কমনীয়, কিন্তু তবুও তাঁর ওই পেলব নমনীয়তার নীচে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে এক অনির্বচনীয় অথচ সুনিশ্চিত ভাব প্রকাশ, যে প্রকাশভঙ্গি বলে দিচ্ছে তার অন্তরে ক্রীড়া করছে এখন কুটিল চক্রান্তের দানবীয় উল্লাস। লক্ষ্য করা গেছে, এই বিশেষ ক্ষণটিতে কুকুরেও তাঁর কাছ থেকে এসেছে সরে, কোল থেকে অবুঝ শিশুও নেমে পালিয়েছে নিরাপদ দূরত্বে। যুক্তির অতীত এমন অনেক সহজাত ভাবাবেশ মনুষ্যকুলে আছে যা একেবারেই বুদ্ধির অগম্য।

বিশেষ করে এই অপরাহ্নে তিনি বেশ একটু বিচলিত হয়ে পড়েছেন। তাঁর হাতে একটি লিপিকা, সেটি তিনি বারংবার পড়েছেন এবং পড়তে পড়তে তাঁর টানা-টানা নিখুঁত ভুরু দুটি হয়ে উঠেছে ঈষৎ কুঞ্চিত, সরস ওষ্ঠাধর দুটি হয়ে উঠেছে ঈষৎ কঠিন। অকস্মাৎ তিনি চমকিত চক্ষু তুললেন এবং দেহের চিতা সম ভয়াবহতা শঙ্কার ছায়াপাতে কোমল হয়ে উঠল। হাতের ওপর ভর দিয়ে তিনি উঠে বসলেন, দরজার ওপর স্থির হয়ে রইল তাঁর চক্ষু দুটি। নিবিষ্ট মনে তিনি শুনছিলেন—শুনছিলেন এমন কিছু যা তাঁর মনে জাগ্রত করত আতঙ্ক। মুহূর্তের জন্য তাঁর ভাবব্যঞ্জক মুখের ওপর খেলে গেল একটুকরো সুমিষ্ট হাসি। তারপরেই ভীত চক্ষে তিনি লিপিকাটি দ্রুতহস্তে ব্লাউজের ভেতরে ঢুকিয়ে দিলেন। ব্লাউজ থেকে হাত সরিয়ে নেওয়ার পূর্বেই উন্মুক্ত হয়ে গেল দরজা এবং ক্ষিপ্র চরণে কক্ষে প্রবেশ করলেন একটি সুদর্শন যুবক।

কুন্তল রায়চৌধুরী, তাঁর স্বামী! ইনিই সেই পুরুষ যিনি আজ তাঁর নবীন এবং অভিনব এক অভিজ্ঞতার একমাত্র প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

কুন্তল রায়চৌধুরীর বয়স প্রায় বছর তিরিশ, দাড়ি-গোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো, বাহুল্যবর্জিত আঁটসাঁট পোশাক সুগঠিত দেহটিকে জড়িয়ে আছে। হাতদুটি বুকের ওপর ভাঁজ করে দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি, অপলক চোখে তাকিয়ে রইলেন তাঁর স্ত্রীর সুন্দর মুখপানে। কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে তখনও মনিকা রায়চৌধুরী তাঁর স্বামীর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন। নির্বাক এই দৃষ্টি বিনিময়ের মধ্যে যেন প্রকাশ পেল ভয়ঙ্কর কিছু সম্ভাবনার। প্রত্যেকেই প্রত্যেককে দৃষ্টির ভাষা দিয়ে প্রশ্ন করলেন এবং প্রত্যেকেই যেন দৃষ্টির মধ্যে দিয়েই খুঁজে পেলেন তার উত্তর। কুন্তল রায়চৌধুরী যেন জিগ্যেস করলেন, এ কী করলে তুমি? প্রত্যুত্তরে মনিকা দেবী যেন উত্তর দিলেন, তুমি জেনেছ কতটুকু? অবশেষে সম্মুখে অগ্রসর হলেন কুন্তল রায়চৌধুরী, স্ত্রীর পাশেই মখমলের কুশনের ওপর বসলেন এবং আলগোছে একটি সুগঠিত কান ধরে স্ত্রীর মুখটি নিজের পানে ফেরালেন।

মনি, আমায় তুমি বিষ দিচ্ছো?

আতঙ্কভরা মুখে এবং প্রতিবাদভরা দৃষ্টি নিয়ে মনিকা রায়চৌধুরী স্বামীর স্পর্শ থেকে ছিটকে দাঁড়িয়ে উঠলেন। এত দারুণ বিচলিত হয়েছিলেন তিনি যে, কথা বলতে পারছিলেন না—চঞ্চল হাত আর অস্থির অবয়বাদির মধ্যে প্রকাশ পেল তাঁর অন্তরের বিস্ময় আর ক্রোধ। কুন্তল রায়চৌধুরী আবার আর একটি প্রশ্ন করলেন এবং এইবার তাঁর কণ্ঠে প্রকাশ পেল নিবিড় আন্তরিকতা।

কিন্তু কেন?

তুমি পাগল হয়েছো! উন্মাদ! রুদ্ধশ্বাসে বললেন মনিকা।

স্বামীর উত্তর তাঁর রক্ত জমিয়ে দিল, অসহায় নৈঃশব্দ্য নিয়ে তিনি স্বামীর মুখপানে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলেন—তাঁর বিবর্ণ ওষ্ঠাধর দুটি ঈষদোন্মুক্ত এবং গণ্ডদ্বয় রক্তহীন—পকেট থেকে একটি ছোট্ট বোতল বার করে কুন্তল রায়চৌধুরী স্ত্রীর চোখের সামনে ধরলেন।

তোমার জুয়েল-কেস থেকে পেলাম।

দুবার মনিকা দেবী কথা বলতে গেলেন, দুবারই হলেন ব্যর্থ। অবশেষে তাঁর আকুঞ্চিত ওষ্ঠাধরের ফাঁক দিয়ে একটির পর একটি শব্দ এল বেরিয়েঃ

তোমাকে বিষ দিইনি।

আবার কুন্তল রায়চৌধুরীর হাত প্রবিষ্ট হল পকেটে। একটা কাগজ বার করলেন, ভাঁজ খুললেন এবং স্ত্রীর সামনে ধরলেন।

ডাঃ মিত্রের সার্টিফিকেট। বোতলের তরল পদার্থে বার গ্রেন অ্যান্টিমনি আছে। যে কেমিষ্ট এটা বিক্রি করেছে, সে আমার সাক্ষী হবে।

মনিকা রায়চৌধুরীর মুখটি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। বলবার মতো আর কিছুই নেই। মারাত্মক ফাঁদে পড়লে অসহায় হিংস্র প্রাণী যেভাবে তাকায়, তিনিও শুধু সেইভাবে রইলেন তাকিয়ে।

ঠিক আছে? জিগ্যেস করলেন কুন্তল রায়চৌধুরী।

কোনও উত্তর এল না, কিন্তু মনিকা দেবীর মুখভাব দেখে মনে হল তিনি মরিয়া হয়ে উঠেছেন।

কেন? জিগ্যেস করলেন কুন্তল—আমি জানতে চাই, কেন? কথা বলতে বলতে তিনি লক্ষ্য করলেন মনিকার ব্লাউজের ফাঁকে লিপিকার একটা কোণ। চক্ষের নিমেষে তিনি সেটা ছিনিয়ে নিলেন। হতাশভাবে চিৎকার করে মনিকা চেষ্টা করলেন লিপিকাটি ফিরে পেতে, কিন্তু একহাতে কুন্তল সেটি ওপরে তুলে ধরলেন এবং অপর হাতে স্ত্রীকে শক্ত করে ধরে লিপির ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলেন।

সোম! বললেন রুদ্ধশ্বাসেঃ এ যে সোম!

লুপ্ত সাহস আবার ফিরে পেলেন মনিকা দেবী। গোপন করার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। তাঁর মুখটি কঠিন এবং দৃঢ় হয়ে উঠল। শাণিত ছুরিকার মতো ধারালো হয়ে উঠল চক্ষুদুটি।

হ্যাঁ, সোম।

মাই গড! শেষকালে সোম।

উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে দ্রুত পায়চারী করতে লাগলেন কুন্তল। অপরেশ সোম! যে পুরুষটির সারাজীবন স্বার্থত্যাগ, সৎসাহস এবং শ্রেষ্ঠ পুরুষের উপযুক্ত গুণগরিমায় সমুজ্জ্বল, যে পুরুষটিকে তিনি তার অন্তরের স্বর্ণমণ্ডিত আসনে বসিয়েছেন, সেই অপরেশ সোমও শেষে এই নারীর কবলে পড়েছেন এবং এমন স্থানে উপনীত হয়েছেন যে বন্ধুর সাথে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করতেও তিনি সর্বতোভাবে প্রস্তুত। অবিশ্বাস্য, কিন্তু তবুও ওই লিপিকার আবেগময় মিনতিপূর্ব ভাষায় তাঁর স্ত্রীকে একটি কপর্দকশূন্য পুরুষের সাথে পলায়ন করার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। অপরেশ সোম—একদিন যার হাতে কুন্তল রায়চৌধুরী হাত মিলিয়েছেন সখ্যের বন্ধনে, নিবিড়তর করেছেন পরিচয়—সেই সোম আজ লিখেছেন এই লিপিকা! কিন্তু পত্রের প্রতিটি শব্দ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে কুন্তলের মৃত্যু অন্তত সোম মোটেই কল্পনা করছেন না। সমস্যার এ পৈশাচিক সমাধান উদ্ভূত হয়েছে একজনের কুটিল মস্তিষ্ক থেকে, যেখানে শয়তানই একমাত্র তার বাসের উপযুক্ত স্থান বলে মনে করে।

লক্ষ জনের মধ্যেও স্বতন্ত্র ছিলেন কুন্তল রায়চৌধুরী। দার্শনিক, চিন্তাশীল পুরুষ, প্রত্যেকের জন্য তাঁর উদার হৃদয়ে সঞ্চিত থাকত অপার সহানুভূতি। কিন্তু মুহূর্তের জন্য বিষিয়ে উঠল তার অন্তর। সেই মুহূর্তটিতে তিনি অপরেশ সোম এবং স্ত্রীকে হত্যা করতে পারতেন এবং কর্তব্যনিষ্ঠ দৃঢ়-সঙ্কল্প পুরুষের মতো মৃত্যুর সম্মুখীন হতে দ্বিধাবোধ করতেন না। কিন্তু পায়চারী করতে করতে ইতিমধ্যেই যুক্তিস্নিগ্ধ চিন্তাধারায় স্তিমিত হয়ে এল তাঁর মানসিক উগ্রতা। সোমের অপরাধ কি? তাকে দোষ দেবেন কী করে? এই নারীর মোহলীলা তাঁর অজানা নেই। মোহ-বিস্তার শুধু তার অপরূপ দৈহিক সৌন্দর্যের দ্বারা নয় পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার কৌতূহল জাগ্রত করার এক অসাধারণ ক্ষমতা এর আছে পুরুষটির অন্তরতম বিবেককে ইনি খুঁচিয়ে জাগিয়ে তোলেন এবং তিনি যে তাকে উচ্চাশা আর মহান কর্তব্যের দিকে অনুপ্রাণিত করে নিয়ে যাচ্ছেন, এই জাতীয় ধারণা পুরুষটির মনে প্রবেশ করিয়ে দিতে পারেন। মনিকা দেবীর মোহপাশের মারাত্মক চাতুর্যই হল ওইখানে। কুন্তলের মনে পড়ল নিজের ক্ষেত্রে কীভাবে এ মোহ তাঁকে বেষ্টন করেছিল। মনিকা দেবী, যতদূর কুন্তলের বিশ্বাস, সে সময় বন্ধনহীনই ছিলেন। তারপর তাঁদের বিবাহ হল সাঙ্গ। কিন্তু ধরা যাক, তিনি বন্ধনহীন ছিলেন না, ধরা যাক তিনি বিবাহবন্ধনে পূর্ব হতেই ছিলেন আবদ্ধ এবং ধরা যাক ঠিক এইভাবেই তিনি তার চিত্তকে বন্দি করেছিলেন। এরপর কি তিনি তখন ক্ষান্ত হতে পারতেন? পারতেন কি অপূর্ব বাসনা নিয়ে দূরে সরে যেতে? কখনই না। অন্তরের সর্বশক্তি নিয়োগ করেও তিনি তা করতে পারবেন না। তাহলে যে বন্ধুটি আজ এই একই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, তার ওপর মনকে তিনি কেন তুলবেন বিষিয়ে? অপরেশ সোমের কথা চিন্তা করে অনুকম্পা আর সহানুভূতিতে তার অন্তর পূর্ণ হয়ে গেল।

আর ওই নারীটি? পাশেই অর্ধশায়িতা এই সেই মোহিনী, হতভাগ্য সুন্দরী নারী—স্বপ্ন তার চূর্ণ, ষড়যন্ত্র তার উদঘাটিত, ভবিষ্যৎ তার অন্ধকার এবং বিপদসঙ্কুল। আর তবুও যে মহিলাটি তাঁকে বিষ প্রয়োগ করতে

প্রস্তুত হয়েছে, তার জন্যেও তাঁর চিত্ত হল আর্দ্র। তিনি ওর জীবনেতিহাসের কিছুটা জানেন। তিনি জানেন, ওর চাতুর্য, ওর সৌন্দর্য বাধা কাকে বলে তা জানে না। আর আজ একজন তার পথের প্রতিবন্ধক হয়েছেন, তাই ও উন্মাদের মতো নির্মম ষড়যন্ত্রে সে প্রতিবন্ধক দূর করতে হয়েছে বদ্ধপরিকর। অত্যন্ত প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত রাজবংশে কুন্তল রায়চৌধুরীর জন্ম। সারাটা জীবন তিনি শিক্ষা, কৃষ্টি আর শান্ত পরিবেশের মধ্যে মানুষ হয়েছেন। পক্ষান্তরে মনিকা দেবীর সারা জীবনে উদ্দামতা, আলোক-উচ্ছাসের উল্লাসে ভরপুর, প্রকৃতির অমোঘ ধর্মানুযায়ী তারা ক্ষণেকের জন্য পরস্পরের প্রতি আকর্ষিত হয়েছেন, কিন্তু স্থায়ী বাঁধন অসম্ভব। এ বিষয়ে তাঁর চিন্তা করে দেখা উচিত ছিল, উপলব্ধি করা উচিত ছিল এই পরিণামের। তাঁর শিক্ষিত এবং সংযত মস্তিষ্কের ওপর এখন নির্ভর করছে সকল দায়িত্ব। সমস্যাপীড়িত অসহায় নাবালকদের ওপর যেভাবে মনটি অনুকম্পায় ভরে ওঠে, মনিকা দেবীর পরিণামের কথা ভেবে কুন্তলেরও চিত্ত দ্রবীভূত হয়ে উঠল। এতক্ষণ তিনি নীরবে ঘরের মধ্যে পায়চারী করছিলেন, ওষ্ঠ দৃঢ়বদ্ধ, হস্ত দুটি মুষ্টিবদ্ধ—শেষকালে হাতের তালুতে নখের দাগ গেল বসে। এখন তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে মনিকার পাশে বসলেন এবং মনিকার ঠান্ডা নিরাসক্ত হাতটি নিজের ওপর তুলে নিলেন। তাঁর মস্তিষ্কে একটি চিন্তা হল জাগ্রত। সাহস না দুর্বলতা? প্রশ্নটি তার কানে বেজে উঠল, চোখের সামনে মূর্তি পরিগ্রহ করল এবং যেন কল্পনার চোখে দেখতে পেলেন যে জগতের সম্মুখে বড় বড় অক্ষরে সেটি প্রকাশিত হয়েছে।

কঠিন দ্বন্দ্ব, কিন্তু জয়ী হলেন তিনি।

মনিকা, আমাদের দুজনের মধ্যে একজনকে পছন্দ করে নিতে হবে তোমাকে। সোম যদি তোমাকে সুখী করতে পারে, তাহলে আমি সরে যাব।

বিবাহ-বিচ্ছেদ? রুদ্ধশ্বাসে মনিকা বললেন।

বিষের বোতলটি বেষ্টন করে ধরল কুন্তলের হাতটিঃ একেও তুমি ভাবতে পার। বললেন তিনি।

কুন্তলের ওপরে চোখ তুললেন মনিকা দেবী। নতুন এক অদ্ভুত প্রভায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চক্ষুদুটি। এ মানুষটি এতদিন তার কাছে ছিল অপরিচিত। সেখানে সংযত, বাস্তবধর্মী, দৃঢ়চিত্ত কুন্তল রায়চৌধুরী অদৃশ্য হয়ে গেছেন। তার স্থলে তিনি যেন দেখতে পেলেন মহাবীর এক শহীদকে, যিনি স্বার্থলেশশূন্য চিত্তধর্মের অমানবিক উচ্চতায় উন্নীত। তীব্র কালকূটের বোতলটি তিনি দুহাতে চেপে ধরলেন।

আমাকে ক্ষমা করো তুমি!

মৃদু হাসলেন কুন্তলঃ এখনও সেই ছোট্ট খুকিটিই আছ দেখছি।

দু-হাত কুন্তলের দিকে বিস্তার করলেন মনিকা। ঠিক সেই সময়ে দরজায় টোকার শব্দ শোনা গেল এবং ঘরে প্রবেশ করলো একটি পরিচারিকা। এই রহস্যময় কক্ষে যেভাবে প্রত্যেকে করে চলাফেরা, ঠিক সেই রকম অদ্ভুত নিঃশব্দে সে প্রবেশ করল। ট্রের ওপর একটি কার্ড। মনিকা সে দিকে এক লহমা তাকালেন।

অপরেশ সোম! আমি দেখা করবো না।

লাফিয়ে উঠলেন কুন্তলঃ

অভ্যর্থনা করে নিয়ে এসো। এই মুহূর্তে।

কয়েক মিনিট পরে দীর্ঘ, উন্নতনাসা, প্রশস্ত ললাট একজন যুবাপুরুষ ঘরে প্রবেশ করলেন। স্মিত বদনে প্রফুল্ল ভঙ্গিতে তিনি ঘরে ঢুকলেন। কিন্তু যখন দরজা তার পেছনে হল রুদ্ধ এবং সম্মুখের মুখ কটির ওপর পরিস্ফুট হল স্বাভাবিক ভাবপ্রকাশ, তখন ধীরে-ধীরে তাঁর মুখ থেকে মিলিয়ে গেল হাসির শেষ রেশটুকুও। দুজনের মুখ পর্যায়ক্রমে দেখে নিলেন। বললেন, মতলব কী?

কুন্তল এবং তাঁর কাঁধের ওপর একটি হাত রাখলেন।

বদ মতলব অন্তত নয়—কুন্তলের জবাব।

বদ মতলব?

আমি সব জানি। কিন্তু আমাদের অবস্থা পাল্টাপাল্টিভাবে হয়ে গেলে আমিও তাই করতাম।

এক পা পিছিয়ে গেলেন সোম এবং প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে মনিকার দিকে তাকালেন। মনিকা মাথা হেলিয়ে সায় দিলেন, তারপর মনোরম গ্রীবাটি পুনরায় সোজা করলেন।

মৃদু হাসলেন কুন্তলঃ

স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য ফাঁদ পেতেছি বলে শঙ্কার কোনও কারণ তোমার নেই। এ বিষয়ে আমাদের খোলাখুলি কথা হয়ে গেছে। শোন অপরেশ, চিরকাল তুমি স্পোর্টসম্যান। এখানে এই বোতলটা দেখ। কীভাবে এটা এল এখানে, তা নিয়ে চিন্তা করো না। যদি আমাদের মধ্যে একজন এটা পান করে তাহলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। মনি, এবার বেছে নাও।

রহস্যময় ঘরটিতে সক্রিয় হয়েছিল আরও একটি রহস্যঘন শক্তি। কক্ষের মধ্যে উপস্থিত ছিল চতুর্থ একটি পুরুষ। যদিও জীবন-নাটকের সঙ্কটম মুহূর্তে তিনটি প্রাণী তার সম্বন্ধে মোটেই চিন্তা করেনি, করবার অবসরও ছিল না। কতক্ষণ ধরে সে সেখানে আছে, কতটুকু সে শুনেছে, কেউ বলতে পারে না। তিনটি প্রাণীর ক্ষুদ্র দল হতে বেশ খানিকটা দূরে দেওয়াল-গাত্রে সে গুঁড়ি মেরে বসেছিল। ভয়াবহ সর্পাকৃতি তার গঠন, নীরব এবং দক্ষিণ হস্তের ঈষৎ স্পন্দন ব্যতীত সর্বদেহ-স্থির। একটি চতুষ্কোণাকৃতি বস্তুর অন্তরাল থেকে সে রয়েছে দৃষ্টির অগোচরে এবং একটি কৃষ্ণবস্ত্র এমনভাবে বস্তুটিকে আচ্ছাদিত করেছে যে তারও অবয়বাদি লক্ষ্য করা যায় না। নিবিষ্ট মনে নাটকের প্রতিটি আবেগময় মুহূর্ত সে গভীর আগ্রহে লক্ষ্য করছে, তার মধ্যস্থতা করার সময় প্রায় আসন্ন। কিন্তু অপর প্রাণীত্রয় তার বিষয়ে চিন্তা করল খুবই অল্প। নিজেদের অভিনীত উদ্বেগ আর শিহরণময় নাটকে তারা এমন গভীরভাবে মগ্ন যে, চক্ষু এড়িয়ে গেল তাদের চেয়েও অধিকতর সক্রিয় একটি শক্তির, যে শক্তি যে-কোনও মুহূর্তে দৃশ্যের পরিচালনা-ভার তুলে নিতে পারে স্বহস্তে।

প্রস্তাবে প্রস্তুত, অপরেশ? কুন্তল প্রশ্ন করলেন।

দীর্ঘ পুরুষটি মাথা হেলিয়ে সায় দিলেন।

না! না! চিৎকার করে উঠলেন মনিকা।

ছিপি খুলে ফেললেন কুন্তল। পাশের টেবিল থেকে এক প্যাকেট তাস তুলে নিলেন। কার্ড এবং বোতল রইল পাশাপাশি।

মনিকার ওপর আমরা দায়িত্বটুকু ছেড়ে দিতে পারি না। বললেন তিনিঃ এস অপরেশ, তিনের মধ্যে একটি বেছে নাও।

অপরেশ টেবিল অভিমুখে অগ্রসর হলেন। অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখিয়ে দিলেন মৃত্যুনির্দেশী তাসগুলি। স্ত্রীলোকটি হাতের ওপর ভর দিয়ে সম্মুখে ঝুঁকে পড়লেন এবং উদভ্রান্ত দৃষ্টি মেলে রইলেন তাকিয়ে।

আর ঠিক এই সময়ে যেন বজ্রপাত হল। আগন্তুক উঠে দাঁড়িয়েছে। বিবর্ণ এবং গম্ভীর সে।

আচম্বিতে তিনজনেই তার উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেন। প্রত্যেকে তার দিকে ফেরালেন মুখ। চোখে তাঁদের ব্যগ্র অনুসন্ধিৎসা। আগন্তুক শান্ত, বিষণ্ণভাবে তাঁদের দিকে তাকাল। কর্তৃত্বব্যঞ্জক তার আকৃতি।

একি হলো? একসাথে প্রত্যেক শুধোলেন।

রাবিশ! উত্তর দিলে সে রাবিশ! সমস্ত রীলটা আবার আমাদের আগামীকাল তুলতে হবে!

** 'রহস্য-পত্রিকা'য় প্রকাশিত। বৈশাখ ১৩৬৩।*

কাঞ্চনপুর-রহস্য

হত্যা সম্বন্ধে সাধারণের আগ্রহ প্রায়ই দেখা যায় ভ্রমাত্মক অথবা আমার মতে, ভ্রান্তির সম্ভাবনা বিশিষ্ট। উদাহরণ স্বরূপ সেই সামন্তঘটিত কাহিনিটাই ধরা যাক। সতের বছর আগে ঘটনাটা ঘটেছিল এবং এখনও সে ঘটনা প্রত্যেকের কাছে যেন গতদিনের স্মৃতি—এখনও জনসাধারণ সে কাহিনি নিয়ে গভীর আগ্রহে আলোচনা করে। তবুও যে-কোন দিক দিয়ে বিচার করাই যাক না কেন, কোনও মতেই এটাকে প্রথম শ্রেণির হত্যাপর্যায়ে ফেলা যায় না। ব্যাপারটা ঘটেছিল এই রকমঃ

ইন্ডিয়ান কেমিক্যালস কোম্পানির স্বত্ত্বাধিকারী মিঃ কে. ডি. সামন্ত জীবন-সঙ্গিনীরূপে পেয়েছিলেন একজন অতি খিটখিটে এবং বদমেজাজী মহিলাকে। কাজেই তাঁর অন্তরের যে গভীর অনুরাগ স্ত্রীর প্রাপ্য ছিল—সেই অনুরাগের সবটুকুই দিলেন তাঁর সুন্দরী টাইপিস্ট মিস সান্যালকে। আর তারপর তিনি মিসেস সামন্তকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করলেন এবং দেহটিকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে কয়লার গাদার নীচে সমাধিস্ত করলেন। প্রাথমিক হলেও এই অবধি ব্যাপারটা করলেন তিনি সুন্দরভাবে আর এরপর যদি মূর্খ মিস্টার সামন্ত আর কুটোটি না নেড়ে চুপচাপ থাকতেন, তাহলে সুখেই সারা জীবনটা কাটিয়ে ইহলোক ত্যাগ করতেন। কিন্তু কিসের তাগিদে জানি না নির্বোধের মতো তিনি বাড়ি থেকে উধাও হলেন—প্রেমিকার সঙ্গে ছদ্মবেশে সাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপ যাত্রা করলেন। এই কাজটি যদি তিনি না করতেন, তাহলে আমি বিনা দ্বিধায় এই হত্যাটিকে অতুলনীয় আখ্যা দিতে বিলম্ব করতাম না। পরিণামে কি হল? বেতারের সুযোগ নিয়ে ভারতীয় পুলিশ তাঁকে জাহাজেই গ্রেপ্তার করলে। এই হত্যা-ঘটিত বিষয়ে এইটুকুই হল সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক—কিন্তু জনসাধারণ এখনও পর্যন্ত এই অপ্রাসঙ্গিকটুকু নিয়েই করছে মাতামাতি। একজন বিখ্যাত চিত্রসমালোচক যখন কোনও চিত্র সম্বন্ধে একটি প্রথম শ্রেণির সমালোচনা করেন, তখন অল্পজনেই তা পড়ে। কিন্তু যেই কোনও সবজান্তা সংবাদদাতা খবর দেয় যে চিত্রশিল্পী ক্যানভাস সাজানোর সময়ে শেক্সপীয়ারের সনেট আবৃত্তি করতে থাকেন অথবা একাহারী হয়ে এই সব বিখ্যাত চিত্র সৃষ্টি করেন—তখনই সমস্ত জগৎ একবাক্যে স্বীকার করে যে, তিনি বড় দরের শিল্পীই বটে।

যা অপ্রয়োজনীয়, তা আর কিছু করতে না পারলেও অকৃত্রিম সত্যটুকুকে চিরকালই অস্পষ্ট করে তোলে। জনতা যদি মিথ্যার পেছনে ধাওয়া করে, তাহলে সত্য তো অবহেলিত হবেই। সুতরাং বুদ্ধিভ্রষ্ট মিঃ সামন্তর জটিল কার্যকলাপ যখন সংবাদপত্র প্রায় ভরিয়ে রেখে দিয়েছে, সেই সময়ে অত্যাশ্চর্য আলিপুর-হত্যা-রহস্যকে স্থান দেওয়া হল কাগজে চক্ষুর অগোচরে ক্ষুদ্র এক কোণে। বাস্তবিকই, খুঁটিনাটি তথ্যগুলি থেকে এমন ভাবে আমাদের বঞ্চিত করা হয়েছিল যে, এই স্মৃতিতে তা গেঁথে নেই ঘটনাটা প্রায় এই ঃ আলিপুরের ছোটখাটো একটি ফ্ল্যাটের দোতলায় একজন যুবক একটি অভিনেত্রীর সঙ্গে কথা বলছে, অভিনেত্রীর বয়সের সীমারেখা, যতদূর আমার মনে পড়ছে, তিরিশ কি চল্লিশের মধ্যে হবে— এবং বিগতযৌবনা হওয়ার পরিণামস্বরূপ চিত্রজগতেও খ্যাতি বিলীন হয়েছে অনেকদিন। কথাবার্তার মাঝখানে আচম্বিতে শোনা গেল একটা ফায়ারিংয়ের শব্দ—খুব কাছ থেকেই। যুবকটি ফ্ল্যাট থেকে ছিটকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল এবং বাড়ির সদর দরজায় দেখতে পেল একটি মৃত পুরুষকে—তার আপন পিতা—গুলি তাঁর বক্ষে বিদ্ধ হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, পিতাও এক সময়ে অভিনেতা ছিলেন এবং ওপরতলার অভিনেত্রীটি তাঁর পুরোনো বান্ধবী। কিন্তু তারপরেই আসছে হত্যার অভিনব এবং আশ্চর্য অংশটুকু। মৃতের পাশে অথবা মৃতের হাতে কিংবা মৃতের কোটের পকেটে—আমার ঠিক মনে পড়ছে না কোনওখানে—ভারি তারের তৈরি একটা অস্ত্র

পাওয়া গেল—জঘন্য এবং অত্যন্ত সাংঘাতিক এক মারণাস্ত্র,—নিখুঁত নৈপুণ্যে অতি অদ্ভুতভাবে গঠন করা হয়েছে সেই বিচিত্র অস্ত্রটি। তখন রাত্রি, কিন্তু প্রতিপদের শুভ্র চন্দ্রকিরণে চতুর্দিক আলোকিত। যুবকটি বললে, একজনকে সে দৌড়ে গিয়ে পাঁচিল টপকে পালাতে দেখেছে।

কিন্তু লক্ষ্য করুন পয়েন্টটিঃ মৃত অভিনেতা তাঁরই পুরোনো বান্ধবীর ফ্ল্যাটের নীচে লুকিয়ে ছিলেন, অন্তরালে থেকে অপেক্ষা করছিলেন, হাতে ছিল তাঁর সেই নির্মম অস্ত্রটি। তিনি কোনও শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার প্রত্যাশায় ছিলেন। যাকে খুন করবার অভিপ্রায় না থাকলেও যার মারাত্মক অনিষ্টের অভিপ্রায় নিয়ে প্রস্তুত হয়েছিলেন।

কে সেই শত্রু? মৃত ব্যক্তির বর্বর ও সুচিন্তিত অভিপ্রায়ের চেয়েও দ্রুতগামী ওই বুলেটটি কার দ্বারা নিক্ষিপ্ত?

খুব সম্ভব আমরা কোনওদিন তা জানতে পারব না, যে হত্যা প্রথম শ্রেণির পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার উপযুক্ত ছিল, যে হত্যা বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতার দিক দিয়ে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করতে পারত, সেই হত্যাই বিস্মৃতির গর্ভে তলিয়ে যেতে বাধ্য হল—মূর্খ জনতা ততধিক মূর্খ সামন্ত আর তার প্রেমিকাকে নিয়ে সৃষ্টি করলে বছরব্যাপী আলোচনার।

স্বভাবতই এই ধরনের অবহেলার জন্য যুদ্ধ অনেকাংশে দায়ী। সেই আতঙ্কভরা দিনগুলিতে মানুষের মাথায় শুধু একটি চিন্তাই জাগ্রত ছিল—বাদবাকি সব হয়েছিল উপেক্ষিত। সুতরাং ঢাকুরিয়া লেকে যত্ন করে বস্তায় জড়ানো মৃত মহিলাটির বিকৃত দেহটির ওপর খুব অল্পই মনোযোগ দেওয়া হল এবং বেশি বাগাড়ম্বর না করে একটি লোককে ফাঁসিতে দেওয়া হল ঝুলিয়ে। এ কেসে দু-একটি চিত্তাকর্ষক পয়েন্ট প্রত্যেকেরই দৃষ্টি গেল এড়িয়ে।

আর, তারপর শোনা গেল ভবানীপুরে এক আশ্চর্য হত্যা-কাহিনি। একটি সম্ভ্রান্ত পরিবার একটা বড় বাড়িতে নতুন ভাড়া এলেন। তখনও তাঁদের সমস্ত মালপত্র খোলা হয়নি—একরাত্রে গৃহকর্তাকে কে খুন করে কয়েকটি জিনিস নিয়ে সরে পড়ল। লুণ্ঠন সামগ্রীর মধ্যে ছিল কী? একজোড়া বুট জুতো, খুব জোর, পনের টাকার বেশি দাম হওয়া উচিত না। আর একটি ঘড়ি—সেটার দামও পঁচিশ টাকার ওদিকে নয়। এক্ষেত্রেও হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করে বিনাবাক্যব্যয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হল। আর বলতে বাধ্য হচ্ছি, তার গতিবিধির যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা ছিল। কিন্তু যুদ্ধপূর্ব অথবা যুদ্ধকালীন যাবতীয় কেসের মধ্যে সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ যে কেসটি লোকচক্ষুর অন্তরালে হারিয়ে গেছিল, সেটি হল কাঞ্চনপুর-রহস্য। অশ্রুতপূর্ব এই কাহিনি শোনাবার আগে প্রথমেই আমি কাহিনির ঘটনাস্থান ও পাত্রপাত্রীর নাম পরিবর্তনের অবাধ অনুমতি পাঠকের কাছ থেকে চেয়ে রাখছি। কারণ, এই কাহিনি সম্পর্কিত ব্যক্তিরা কোথায় বর্তমান আছেন, তা জানি না, জীবিত কি মৃত, তাও জানি না। সুতরাং পূর্ব থেকেই সাবধানতা অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত মনে করে এইটুকু অধিকার আমি চেয়ে নিলাম। সংবাদপত্রে যখন এই কাহিনির ছোট্ট একটি শিরোনামা প্রকাশিত হল, তখন অতি ব্যস্ত জগতের নজরই পড়ল না সেদিকে। সংবাদপত্র মারফৎ উজবেক শিল্পীদের নৃত্যকলা প্রদর্শন বা নিখিল ভারত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্মিলন বা ওই জাতীয় কিছু বৈচিত্র্যময় সংবাদ পরিবেশিত হত কিনা মনে নেই, হলেও জনগণ তখন সে সংবাদ রাখার চেয়ে ট্যাঙ্কার, ভি-টু অথবা প্যারাসুট বাহিনীর খবরটাই জেনে রাখা উচিত বলে মনে করত।

কাঞ্চনপুরের রহস্যের সূত্রপাত হয় এইভাবে। প্রথমেই ধরে নেওয়া যাক যে কলকাতা শহরের উপকণ্ঠে অতি মনোহর ক্ষুদ্র একটি কলোনি আছে—মনে করা যাক, সেই সুসজ্জিত কলোনিটার নাম কাঞ্চনপুর। ক্ষুদ্র হলেও প্রয়োজনীয় কিছুরই অভাব সেখানে রাখা হয়নি। থানা, বাজার, পোস্টাফিস ইত্যাদি যাবতীয় সুবিধাই সেখানে সহজ লভ্য। শহরের উপকণ্ঠে থাকায় যাতায়াতেও কোনও অসুবিধা নেই—ট্রাম, বাস এবং ট্রেন, এই ত্রিবিধ যানই যাতায়াতের পথকে সুগম করে তুলেছে। এ হেন কাঞ্চনপুরে চৌরাস্তা থেকে স্টেশনের বিপরীত দিকের পথটায় মিনিট তিনেক হেঁটে গেলে লাল পয়েন্টিং করা যে দোতলা বাড়িটা দেখতে পাওয়া

যায়, সেখানে বাস করতেন জগদীশ সরকার এবং তাঁর স্ত্রী। প্রাচীন দুর্গ-ফটকের মতো লোহার বড় বড় কীলক মারা সদর দরজার ওপরেই একটা চকচকে তামার প্লেটে লেখা আছে, 'Taxidermist : Skeletons Articulated' মৃত জন্তুজানোয়ারের চামড়া অবিকৃত রেখে ভেতরে শুষ্ক জিনিস ঠেসে কৃত্রিম জীবন্ত-দর্শন জানোয়ার তৈরির আর্টকেই Taxidermy বলে। এর বাংলা প্রতিশব্দ আমার জানা নেই। জগদীশ সরকার শুধু যে এই শিল্পতেই দক্ষ ছিলেন তা নয়, তিনি বিভিন্ন অস্থির জোড়া লাগিয়ে কঙ্কাল নির্মাণেও সমান পারদর্শী ছিলেন। তাঁর বাড়ির পেছনে ছিল ছোট্ট একফালি বাগান—এই বাগানের একপ্রান্তে জগদীশ সরকার নির্মাণ করেছিলেন ছোট্ট কারখানাটি—তাঁর যন্ত্রপাতি থাকত এইখানেই। নিভৃতে প্রতিবেশীদের সাদা-অনুসন্ধিৎসু চক্ষুর অন্তরালে তিনি তাঁর শিল্প নিয়েই দিনের পর দিন যেতেন কাটিয়ে।

যতদূর জানা গেছে, এই অস্থি সংযোজনকারী ট্যাক্সিডারমিস্ট ভদ্রলোকটি নিতান্ত নিরীহ এবং নম্র স্বভাবের মানুষ ছিলেন। প্রতিবেশীরা এই ছোটখাটো মানুষটিকে পছন্দ করতেন। পাশের বাড়ির সরকারি চাকুরে অময়বাবু, মোড়ের স্টেশনারি দোকানের স্বত্বাধিকারী হরিহরবাবু এবং আরও দুজন ভদ্রলোক সুখেন্দু দাস আর রবিপ্রসাদ মুখার্জি—এঁরা সবাই জগদীশ সরকারের বৈঠকখানায় বহু বিকেল দাবা খেলে, চা পান করে এবং গল্প করে কাটিয়ে গেছেন। যুদ্ধপূর্ব শান্তির দিনে বহুবার এই ক'জন নিরীহ ভদ্রলোক ইডেন গার্ডেনে বেরিয়েছেন এবং গঙ্গার ঘাটে সূর্যাস্ত দেখেছেন।

তাঁদের কেউই খুব বেশি কথা বলতে ভালোবাসেন না এবং একমাত্র বিকাল ছাড়া কখনই একত্রে বাজে সময় নষ্ট করা পছন্দ করতেন না। বৈঠকখানায় তাঁরা নীরবে বসে দাবা খেলতেন, দু-একটি কথা বলতেন আর না হয় শান্ত দৃষ্টি মেলে দেওয়ালে প্রলম্বিত সোনালিফ্রেমে বাঁধান রবীন্দ্রনাথের ছবিটা দেখতেন। অথবা বড় টেবিলটার ওপর রক্ষিত দুটি লালাভ প্রায়-জীবন্ত কুকুরের মধ্যস্থিত অদ্ভুত দর্শন ঘড়ির দোদুল্যমান পেণ্ডুলামটি নির্নিমেষ চোখে লক্ষ্য করতেন। জগদীশবাবু এই শান্ত পরিবেশের কেন্দ্রস্থল ছিলেন—তাঁর স্মিত বদন এবং সৌম্যমূর্তি দিয়ে এই ক'জনের মনকে তিনি একেবারেই জয় করে নিয়েছিলেন। জগদীশবাবুর স্ত্রী ছিলেন যেমন কটুভাষিণী, তেমনই তীব্র-স্বভাবা। এই শান্তি-চক্রের পাঁচজন সভ্যই তাঁকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতেন। প্রতিবেশিনীরাও জগদীশ-গিন্নি সম্বন্ধে ছিলেন শঙ্কিত। নির্বিরোধী জগদীশবাবুর জীবন তিনি বিষিয়ে তুলেছিলেন। লৌহকীলক মারা মজবুত দরজা ভেদ করেও তীক্ষ্ণ বামা-কণ্ঠ প্রতিবেশীদের সচকিত করে তুলত—একবার শুরু হলে যে পর্যন্ত না দম ফুরিয়ে আসত, জগদীশবাবুর প্রতি কণ্ঠনিঃসৃত সেই বিষোদগার আর থামতে চাইত না আর বেচারি জগদীশবাবু ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাইরে বেরিয়ে আসতেন—কেননা রসনার চেয়েও কার্যকরী আরও কিছুর আশঙ্কা তিনি করতেন।

কুখ্যাত এই মহিলাটি ছিলেন শ্যামবর্ণা, মধ্যমাকৃতি, কুঞ্চিতকেশী। নিমফুল খেলে মুখের ভাব যেরকম হয়, তাঁর মুখে সর্বদাই সেই ভাব থাকত ফুটে। তিনি হাঁটতেন দ্রুতগতিতে, কিন্তু বেশ একটু খুঁড়িয়ে। তাঁর অন্তরের তেজ ছিল প্রচুর—প্রতিবেশীদের কাছে তিনি ছিলেন একটি মূর্তিমান উৎপাত আর হতভাগ্য জগদীশবাবুর কাছে তিনি ছিলেন উৎপাতের চেয়েও ভয়ঙ্কর।

রণ-দামামা বেজে ওঠার পর ইডেন গার্ডেনে ও গঙ্গার ধারে এই ক'জন শান্ত-পরিবেশ-প্রিয় ভদ্রলোকের বৈকালিক ভ্রমণটা প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম হল এবং তাঁদের নিবিড় স্বাচ্ছন্দ্যানুভূতিরও ব্যাঘাত ঘটল প্রচুর। তা সত্ত্বেও এই শান্তি-চক্রের বৈকালিক অধিবেশন পুরোপুরি ভাবে স্থগিত রইল না এবং এক সন্ধ্যায় জগদীশবাবু ঘোষণা করলেন যে তাঁর স্ত্রী এলাহাবাদে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন এবং খুব সম্ভবত বেশ কিছু সময়ের জন্য আর ফিরবেন না।

'ওখানেও হাওয়া পরিবর্তনের জন্য খুব বেশি লোক না গেলেও,' অময়বাবু বললেন, 'আমার একবার যথেষ্ট উপকার হয়েছিল।'

অপর কয়েকজন কিছু বললেন না। কিন্তু অন্তরের সঙ্গে জগদীশবাবু জানালেন অভিনন্দন। তাঁদের মধ্যে একজন পরে মন্তব্য করেছিলেন যে জগদীশবাবুর স্ত্রীর পক্ষে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান

হচ্ছে বৈতরণীর ওপারে এবং সকলেই তাতে একমত হয়েছিলেন। তখন তাঁরা কেউই জানতেন না যে প্রস্তাবিত চিকিৎসার সকল সুবিধাই সে সময় জগদীশগিন্নি উপভোগ করছিলেন।

যতদূর মনে পড়ছে, জগদীশ-গিন্নির এক ভগ্নি, অন্নপূর্ণা মিত্রের আবির্ভাবের পর থেকেই জগদীশবাবু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এই মহিলাটি ছিলেন তাঁর ভগ্নির মতো প্রায় একই রকম বদমেজাজী এবং সন্দিগ্ধমনা। একটি অভিজাত পরিবারের নার্স হয়ে কয়েক বছর তিনি ব্রহ্মদেশে বাস করছিলেন। তারপর পরিবারটি কলকাতায় ফিরে এলে, তিনিও সেই সঙ্গে কলকাতায় চলে এলেন। প্রথমে এই মহিলাটি তাঁর ভগ্নিকে খান দু-তিন চিঠি লিখেছিলেন, কোনও উত্তর পাননি। এইখানেই তাঁর কীরকম খটকা লাগল, কেননা জগদীশ-গিন্নি পত্র-লেখিকা হিসাবে বড় নিয়মিত ছিলেন এবং প্রতি পত্রই তাঁর স্বামী সম্বন্ধে 'নোংরা কথা'য় পরিপূর্ণ থাকত। সুতরাং কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পরের সন্ধ্যাতেই অন্নপূর্ণা মিত্র সশরীরে এসে হাজির হলেন বোনের মুখে প্রকৃত সত্যটুকু জানতে। জগদীশবাবু চিঠিগুলো যে সরিয়ে ফেলেছেন, এ বিষয়ে তাঁর আর কোনও সন্দেহই ছিল না। প্রায়ই বিড় বিড় করে তাঁকে বলতে শোনা যেত, 'হতভাগা জানোয়ার মজা আমি দেখাব তোমায়!' আর তাই কাঞ্চনপুরে এসে হাজির হলেন অন্নপূর্ণা মিত্র—এসেই কারখানা থেকে টেনে বের করলেন জগদীশবাবুকে। মহিলাটিকে দেখবামাত্র বেজায় দমে গেলেন জগদীশবাবু। চিঠিগুলো তিনি পড়েছিলেন। কিন্তু কলকাতায় ফিরে আসাটা এমন আকস্মিক যে আগে থেকে খবর না পাওয়ায় তিনি প্রস্তুত হয়ে উঠতে পারেননি। যাই হোক, মিস মিত্র এ সম্বন্ধে একটি কথাও বললেন না। জগদীশবাবু ভেবেছিলেন, তাঁর স্ত্রীর এই বোনটি অন্তত আরও দশ-কুড়ি বছর সুদূর ব্রহ্মদেশে বাস করতে থাকবেন— ইতিমধ্যে নাম পরিবর্তন করে বছর খানেকের মধ্যে তিনিও সরে পড়বেন। আর তাই আচম্বিত মিস মিত্রকে সামনে দেখে তিনি গেলেন দারুণ দমে।

অন্নপূর্ণা মিত্র সোজা কাজের কথা পাড়লেন।

'কমলা কোথায়?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'ওপর তলায়? ঘণ্টা বাজানোর পর, দরজায় কড়া নাড়ার পর —তার তো নেমে আসা উচিত ছিল।'

'না।' জগদীশবাবু বললেন। তাঁর গোপন-রহস্য নিয়ে তিনি যে গোলকধাঁধার সৃষ্টি করছেন, তার কথা চিন্তা করে তিনি স্বস্তি বোধ করলেন এই গোলকধাঁধাঁর ঠিক কেন্দ্রস্থলে তিনি সম্পূর্ণ নিরাপদ! 'না, সে ওপরতলায় নেই সে বাড়ি নেই।'

'ও' তাই নাকি? বাড়িতে নেই? তাহলে নিশ্চয় কোনও বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে গেছে? কখন ফিরবে বলে মনে হয় আপনার?'

'সত্য কথা বলতে কি অন্নপূর্ণা, সে আর ফিরবে বলে আমি আশা করি না। আমাকে সে ছেড়ে গেছে— তিন মাস আগে সে চলে গেছে।'

'এই কথা আমায় বলতে চান আপনি! আপনাকে ছেড়ে গেছে! তার সঙ্গে কী ব্যবহারটা তাহলে করেছিলেন? কোথায় গেছে সে?'

'বিশ্বাস কর অন্নপূর্ণা, আমি জানি না। একদিন সন্ধ্যায় আমাদের মধ্যে একটু ঝগড়া-ঝগড়ি হল, কিন্তু তা নিয়ে আমি বেশি কিছু ভাবিনি। কিন্তু সে বললে যে যথেষ্ট হয়েছে, বলে কয়েকটি জিনিস গোছ-গাছ করে ব্যাগে পুরে বেরিয়ে গেল। আমি পিছু পিছু অনেকটা ছুটে গেলাম, বার বার মিনতি করে বললাম ফিরে আসতে—কিন্তু সে একবারও ঘাড় ফিরিয়ে তাকালে না—সোজা স্টেশনের দিকে চলে গেল। আর সেই দিন থেকে তাকে আর দেখিও নি, তার কথাও শুনিনি। আর যত চিঠি এসেছে, সব আমি পোস্ট-অফিসে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি।'

ভগ্নিপতির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন অন্নপূর্ণা মিত্র। দোষটা কার, কমলার না জগদীশবাবুর— এই নিয়ে কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, সবশেষে ক্রোধে কাঁপতে-কাঁপতে বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে। আর জগদীশবাবু ফিরে গেলেন কারখানায়। কয়েকটি ময়ূর ঠাসা বাকি ছিল, সেইগুলো সেরে

ফেলতে! আবার তিনি সুস্থ বোধ করতে লাগলেন। কিছুক্ষণের জন্য তার বুকের স্পন্দন কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছিল—আশঙ্কা করেছিলেন তাঁর গোলকধাঁধার রহস্য বুঝি গেল ফাঁস হয়ে। কিন্তু তারপরে আবার ফিরে এল তাঁর চিত্তের শান্তি।

এর পর সব কিছু মোটামুটি মানিয়ে যেত, যদি না চৌমাথার কাছে অন্নপূর্ণা মিত্রের সঙ্গে রেবা রায়ের মুখোমুখি সাক্ষাৎ হত। রেবা রায় সরকারি চাকুরে অময়বাবুর স্ত্রী। ইতিপূর্বে জগদীশবাবুর বাড়িতে দুজনের আলাপ হয়েছিল—কাজেই দেখামাত্র দুজনেই দুজনকে চিনতে পারলেন। কয়েকটি বাজে কথার পর মিস মিত্রকে রেবা রায় জিগ্যেস করলেন যে কলকাতায় ফেরবার পর ইতিমধ্যে তাঁর বোনের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেছেন কিনা।

'সে যে কোথায় তাই যখন জানি না, তখন কী করে আমার সঙ্গে তার দেখা হতে পারে?' বেশ কিছুটা উষ্মা প্রকাশ করে মিস মিত্র উত্তর দিলেন।

'কী মুসকিল, আপনি তাহলে জগদীশবাবুর সঙ্গে দেখা করেননি?'

'এই মুহূর্তে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসছি।'

'কিন্তু তিনি তাহলে নিশ্চয় এলাহাবাদের ঠিকানাটা ভুলে যেতে পারেন না?'

আর এইভাবে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে গড়িয়ে গেল কথাবার্তার গতি এবং মিস মিত্র পরিষ্কার জানতে পারলেন যে জগদীশবাবু তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের কাছে বলেছেন যে তাঁর স্ত্রী অনেক দিনের জন্য এলাহাবাদে আত্মীয়-স্বজনের কাছে বেড়াতে গেছেন। প্রথমত মিত্র-ভগ্নিদ্বয়ের কোনও আত্মীয়ই এলাহাবাদে থাকত না—তাঁদের আদিবাস ছিল ময়মনসিংহে, আর দ্বিতীয়ত, জগদীশবাবু তাঁকে বলেছেন, কমলা ক্রুদ্ধ হয়ে বাড়ি ছেড়ে কোথায় বেরিয়ে গেছেন তা তিনি জানেন না। প্রথমে মিস মিত্র ভাবলেন এখুনি ফিরে গিয়ে ভগ্নিপতিকে এক হাত নেবেন—তারপর তিনি মত পরিবর্তন করলেন। দেরি হয়ে যাচ্ছিল, কাজেই তৎক্ষণাৎ আর দেখা না করে তিনি কলকাতাতেই ফিরে গেলেন,—সারাপথে কি ভাবে জগদীশবাবুকে শায়েস্তা করবেন, সেই কথাই লাগলেন ভাবতে।

পরের হপ্তায় আবার তিনি আবির্ভূতা হলেন কাঞ্চনপুরে। কাঁচা মিথ্যা কথনের অপরাধে তিনি জগদীশবাবুকে অভিযুক্ত করলেন—তাঁর সামনে ধরে দিলেন দুটি বিভিন্ন কাহিনি। আর, আবার আগের মতো জগদীশবাবুর বুকটা টিপ টিপ করতে লাগল। ভয়ানক আতঙ্কে হাত-পা প্রায় অবশ হয়ে আসার উপক্রম হল। কিন্তু তাঁর সংযম নিতান্ত অল্প ছিল না।

'সত্যিই', তিনি বললেন, 'আমি তোমায় কোনও মিথ্যেই বলিনি অন্নপূর্ণা। ঠিক যা ঘটেছে তোমায় বলেছি। কিন্তু এখানকার লোকদের জন্যে এলাহাবাদের ওই কাল্পনিক গল্পটা আমায় বানাতে হয়েছিল। এ বিষয় নিয়ে প্রত্যেকে আলোচনা করুক, এ ইচ্ছা আমার ছিল না—বিশেষ করে কমলার ফিরে আসার সম্ভাবনা যখন রয়েছে—আমার তো মনে হয় আর কিছুদিনের মধ্যেই সে ফিরে আসবে।'

সন্দেহপূর্ণ চোখে মুহূর্তের জন্য মিস মিত্র জগদীশবাবুকে এক দৃষ্টে লক্ষ্য করলেন আর তারপরেই দ্রুতপদে উঠে গেলেন দোতলায়। কিন্তু অচিরেই তিনি নেমে এলেন।

'কমলার ড্রয়ার আমি দেখে এলাম।' এমন ভাবে তিনি কথা শুরু করলেন যেন জগদীশবাবুকে যুদ্ধে আহ্বান করছেন। 'অনেকগুলো জিনিস পাওয়া যাচ্ছে না। চুণীর লকেট বসান নেকলেশটা নেই, কৃষ্ণার দেওয়া হীরার আংটিটাও দেখতে পেলাম না, কানপাশা, চুড়ি আর তাগাও দেখতে পেলাম না।'

'কমলা চলে যাবার পর আমি ওর সব কটা ড্রয়ারই বাইরের দিকে খুলে ঝুলতে দেখেছি।' নিশ্বাস ফেললেন জগদীশবাবু। 'আমার বিশ্বাস, সে যাবার সময়ে সব গয়নাই নিয়ে গেছে।'

এটা স্বীকার করতেই হবে যে জগদীশবাবু প্রতিটি ছোটখাটো বিষয়ের ওপর তীক্ষ্ন নজর রেখেছিলেন—এ গুণটি বোধহয় তাঁর শিল্প-দক্ষতা থেকেই জন্মেছিল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে যাবার সময়ে স্ত্রী

যাবতীয় অলঙ্কার ফেলে চলে গেছে—এ গল্প কেউই বিশ্বাস করবে না। আর কাজেকাজেই যাবতীয় অলঙ্কার-সম্পত্তি গেল অদৃশ্য হয়ে।

প্রকৃত পক্ষে, এ ক্ষেত্রে কি যে আর করা উচিত, তা মিস মিত্র আর ভেবে উঠতে পারলেন না। দুটি বিভিন্ন রকমের কাহিনি বলার তাৎপর্য জগদীশবাবু এমন সুন্দরভাবে যুক্তির সাহায্যে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, সে যুক্তি তিনিও না মেনে পারেননি। সুতরাং জগদীশবাবু যে যে-কোনও কৃমি-কীট মনুষ্যের চেয়েও জঘন্য—এই পরম সত্যটুকুই তাঁকে জানিয়ে দিয়ে তিনি দড়াম করে দরজা বন্ধ করে প্রস্থান করলেন। পুনরায় দ্রুত-স্পন্দিত বক্ষ নিয়ে জগদীশবাবু ফিরে গেলেন তাঁর কারখানায়। গোলকধাঁধা তখনও নিরাপদ, রহস্য তার অনাবিষ্কৃত। দ্বিতীয়বার আবার যখন মিস মিত্রের অগ্নি-মূর্তির সম্মুখীন তিনি হলেন, প্রথমটা তাঁর হৃৎপিণ্ডটা বড় বেশি রকম লাফালাফি করছিল—কিন্তু এখন বুঝলেন এ আতঙ্ক সম্পূর্ণ আকার বিহীন। তাঁর কোনও বিপদ আর নেই। আমাদের মতো তিনিও তখন ভাবলেন সামন্ত ঘটিত মামলার বিবরণটি। সামন্ত দৌড়োদৌড়ি করছিলেন বলেই ধ্বংস হয়ে গেলেন। যদি সামন্ত চঞ্চল না হয়ে এক স্থানে জেঁকে বসে থাকতেন, তাহলে তাঁর কেশাগ্র স্পর্শ করবার সাহস কারও হত না এবং কয়লার গাদার নীচে সমাধিও কোনওদিন হত না আবিষ্কৃত। জগদীশবাবু অবশ্য মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন যে সন্দিগ্ধমনা যে কোনও ব্যক্তি আসুক তাঁর গৃহে, খুঁজে দেখুক প্রতিটি কোণ, চোর-কুঠরি এবং কয়লার গাদা। বাগানের প্রতিটি ফুলগাছের মাটি খনন করুক, প্রতিটি দেওয়াল ভেঙে তন্নতন্ন করে দেখুক। এই কথাই ভাবতে-ভাবতে তিনি তুলে নিলেন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ একটি দাঁড়কাক। সকালের দিকে এ অর্ডারটি এসেছিল—সমস্ত মন নিবিষ্ট করে তিনি কৃষ্ণ-প্রাণীটিকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইলেন।

ভগ্নীর অসাধারণ অন্তর্ধান রহস্যের সংবাদ বহন করে মিস মিত্র ফিরে এলেন কলকাতায় আর ক্রমাগত চিন্তা করতে লাগলেন। আগাগোড়া বিষয়টা বারংবার তোলপাড় করেও তিনি চিন্তার কোনও কূল-কিনারা পেলেন না। তিনি জানতেন না যে এরকম ভাবে নানা কারণে বহু নারী এবং পুরুষ উধাও হয়ে যায় প্রতি বছরে—কেউই তাদের সন্ধান পায় না, যে পর্যন্ত না দৈব এসে কল-কাঠি নেড়ে দিচ্ছে। কিন্তু কী জানি কেন, মিস অন্নপূর্ণা মিত্রের কাছে এই ব্যাপারটি মনে হল একটি রীতিমতো অলুক্ষুণে, বিস্ময়-জনক, অতুলনীয় এবং ভয়াবহ ঘটনা। অনবরত এই বিষয় নিয়ে ভেবে ভেবে তিনি মাথা গুলিয়ে ফেললেন, তবুও স্বল্প-বাক জগদীশ সরকার যে গোলকধাঁধার সৃষ্টি করেছেন, তার প্রবেশ পথেরই হদিশ পেলেন না খুঁজে। অবশ্য ভগ্নিপতি সম্বন্ধে মিস মিত্রের কোনও সন্দেহ ছিল না। কেননা তাঁর ব্যবহার এবং কথাবার্তা খুবই সরল, স্পষ্ট এবং অতীব বোধগম্য। তিনি একজন কৃমি-কীট—এই সংবাদ তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন—কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি অবশ্যই সত্য কথাই বলেছেন। কিন্তু মিস মিত্র তাঁর একমাত্র বোনটিকে ভালোবাসতেন। এবং কমলা সরকার কোথায় গেছেন এবং তাঁর কী হয়েছে—এই সংবাদ জানার জন্যে তিনি আকুল হয়ে উঠলেন। আর তাই সর্বশেষে তিনি পুলিশের সমীপে এই ঘটনাটি হাজির করলেন।

অন্তর্হিত মহিলার যতটুকু বর্ণনা সম্ভব, মিস মিত্র স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে তা দিতে কসুর করলেন না কিন্তু এই কেসের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীটি মিস মিত্রের দৃষ্টি একটি বিষয়ে আকর্ষণ করলেন—যেহেতু তিনি তাঁর ভগ্নীকে বহু বছর যাবৎ দেখেননি, অতএব এ ক্ষেত্রে জগদীশ সরকারের পরামর্শ অপরিহার্য। সুতরাং পুনরায় শিল্প-কর্ম থেকে টেনে আনা হল ট্যাক্সিডারমিসট ভদ্রলোককে। মিস মিত্রের আনা সংবাদটুকু এবং তাঁর দেওয়া কমলা সরকারের দৈহিক বর্ণনার ওপর ভদ্রলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল। তিনি আর একবার তাঁর ছোট্ট জটিলতাবিহীন গল্পটি বললেন, বিশ্রী কানাঘুষো এড়াবার জন্যে প্রতিবেশিদের কাছে কেন মিথ্যা বলেছেন—সে কথারও উল্লেখ করলেন এবং সর্বশেষে মিস মিত্র বর্ণিত কমলা সরকারের ফটোগ্রাফে নিজেরও দু-একটি খুঁটিনাটি পরিবর্তন সংযোজন করে দিলেন। তারপর তিনি কনস্টেবলটিকে দুটি ফটোগ্রাফ দিলেন। ফটো দুটির মধ্যে যে যে স্থানে সাদৃশ্য চোখ এড়ায় না, সেগুলিও তর্জনী নির্দেশ করে দেখিয়ে দিলেন এবং তারপর প্রসন্ন-বদনে স্মিত-হাস্যে তাকে দিলেন বিদায়।

পুলিশের জোর তদন্ত চলল—Missing Squad ফটোগ্রাফ দুটি নিয়ে সম্ভব অসম্ভব সব জাতীয় স্ত্রীলোকের সঙ্গেই দেখতে লাগল মিলিয়ে। কিন্তু তা হতোস্মি! মিস মিত্র যে তিমিরে ছিলেন, সেই তিমিরেই রইলেন। তখন তিনি নিজেও নিজের প্রচেষ্টা আর অর্থ নিয়োগ করে অনুসন্ধানকে ব্যাপকতর করে তুললেন প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্রেই ফটো সহ নিরুদ্দেশ বিজ্ঞাপন ছাপা হল—কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল আর ততই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন মিস অন্নপূর্ণা মিত্র। সবশেষে পুলিশের সঙ্গে এবং আরও কয়েক জনের সঙ্গে পরামর্শ করে দেওয়াল-বিজ্ঞাপন ছাপালেন এবং কাঞ্চনপুর ও শহরের সর্বত্র দিলেন ছড়িয়ে। শহরের বাইরেও কিছু গেল। বাড়ির দেওয়ালে, গাছের গুঁড়িতে, পার্কের বেঞ্চে—সর্বত্র দেওয়াল প্রলম্বিত শ্রীমতী কমলা সরকারের ফটোগ্রাফ বহু পথচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগল—এ সেই ফটোগ্রাফ যেটি জগদীশবাবু নিজে নগর-রক্ষীবাহিনীর হাতে দিয়েছেন তুলে, সেই সাথে তাঁর দেওয়া বিশদ দৈহিক বর্ণনাও হয়েছে মুদ্রিত—বর্ণনার মধ্যস্থানে লেখা আছে 'বেশ একটু খুঁড়িয়ে চলেন'—এই কয়টি শব্দ মোটা মোটা হরফে ছাপা। প্লাকার্ডের ফল কিছু দেখা গেল না—কিছুই চাঞ্চল্যকর সংবাদও এল না। 'শেষবারের মতো তাঁকে কাঞ্চনপুর স্টেশনের দিকে যেতে দেখা গেছে'—এই বিবৃতিও সরকারি গোয়েন্দার কাছে খুব আশাজনক সূত্র বলে মনে হল না। এ ব্যাপারে কোনও ইঙ্গিতও সংবাদপত্রে হল না প্রকাশিত আর তারপর ধীরে ধীরে আমরা আবার নিজস্ব সংবাদদাতা পরিবেশিত সম্মুখ-রণাঙ্গনের চাঞ্চল্যকর বিবরণে হয়ে গেলাম মগ্ন। একটি মুখরা স্ত্রীলোকের গতিবিধি নিয়ে আলোচনা করবার মতো অবকাশ আমাদের আর কারুরই রইল না—কাঞ্চনপুর কলোনিও তাঁর কথা বিস্মৃত হয়ে এল ধীরে ধীরে।

আর তারপর হল এই রহস্যের উপসংহার এবং সেটা নিছক দৈবঘটিত ছাড়া আর কিছুই নয়। কাঞ্চনপুর কলোনির একপ্রান্তে অবস্থিত একটি দ্বিতল ভবনের দোতলায় ততোধিক নির্জন এক কক্ষে অলস মধ্যাহ্নে পদচারণা করছিলেন শ্রীকান্ত মিত্র—একজন মেডিক্যাল স্টুডেন্ট। হাতে বিশেষ কোনও কাজ ছিল না এবং পড়াতেও বিশেষ মন বসছিল না। কাজেই উদাসীন এবং অলস ভঙ্গিমায় তিনি জানলা দিয়ে রাস্তার ওপারে দোকানের সাইনবোর্ডটি লক্ষ্য করলেন, রাস্তার মোড়ে দুটি ছোট মেয়েকে দেখলেন বেণী দুলিয়ে স্কুলে যেতে। তারপর দেখলেন এক স্থূলাঙ্গী মহিলা বহুকষ্টে রিক্সা থেকে নেমে প্রবেশ করলেন পার্শ্ববর্তী দোকানে। তখন তিনি শো-কেসের মূল্যবান হস্তীদন্ত নির্মিত নটরাজের মূর্তির শিল্পকৌশল দেখলেন, এবং ভাবলেন যে এরকম একটি মূর্তি কিনে তাঁর পড়ার টেবিলে সদ্যক্রীত মড়ার মাথার খুলি ওপর রেখে দিলে কীরকম দেখাবে আর তারপর তাঁর ভ্রাম্যমান দৃষ্টি ঘুরতে ঘুরতে এসে স্থির হল পথপার্শ্বের একটি গাছের মোটা গুঁড়ির ওপর গুঁড়িটির ওপরে দুটিমাত্র শাখা ঠিক ইংরাজি 'Y'-এর মতো ঊর্ধ্বে উঠে গেছে। এই দুটি শাখার সংযোগস্থলে দেখতে পেলেন একটি নিরুদ্দেশ বিজ্ঞাপন এবং কমলা সরকারের দৈহিক বর্ণনা।

'বেশ একটু খুঁড়িয়ে চলেন।'

শ্রীকান্ত মিত্রের শ্বাস-প্রশ্বাস মুহূর্তের জন্য রুদ্ধ হয়ে গেল। জানলার একটি গরাদ চেপে ধরে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি আর একবার ওই বিস্ময়কর শব্দগুলি পড়লেন। আর তারপর তিনি সোজা হাজির হলেন কাঞ্চনপুর পুলিশ-ফাঁড়িতে।

ব্যাপারটা এই ঃ কমলা সরকারকে শেষবার দেখা যাওয়ার তিন হপ্তা পরে শ্রীকান্ত মিত্র জগদীশ সরকারের কাছ থেকে কিনেছিলেন একটি স্ত্রী-নরকঙ্কাল। উরুর একটি হাড়ের গঠন বিকৃত থাকার ফলে তিনি কঙ্কালটি খুব সুবিধা দরেই পেয়েছিলেন। আর এখন তাঁর আচম্বিতে মনে হল যে কঙ্কালের ভূতপূর্ব অধিকারিণী একসময়ে নিশ্চয় বেশ একটু খুঁড়িয়ে চলতেন।

মামলা চলার সময়ে সোমদেব চৌধুরি তাঁর সুনাম বজায় রাখলেন। জমকালো বাগ্মীতার সাহায্যে তিনি জগদীশ সরকারের পক্ষ সমর্থন করলেন। আমি আদালতে ছিলাম—সে সময়ে প্রায় আদালতে যাওয়া আমার অন্যান্য কাজের অন্যতম ছিল এবং কয়েদির পক্ষাবলম্বন করে তিনি প্রথমেই বাকপটুতায় যে নিদর্শন দেখিয়েছিলেন, তা আমি কোনওদিন ভুলব না। ধীরে-ধীরে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং সমস্ত আদালত-গৃহের

চতুর্দিকে বুলিয়ে নিলেন তাঁর মসৃণ চক্ষু। সর্বশেষে তাঁর গাম্ভীর্যময় প্রশান্ত দৃষ্টি স্থির হল জুরির ওপর। অনেকক্ষণ বাদে কথা শুরু করলেন তিনি। মৃদু, স্পষ্ট ও সতর্ক তাঁর স্বর, প্রত্যেকটি শব্দ উচ্চারণ করবার পূর্বে যেন মনে মনে গুঞ্জন করে নিয়ে তবে বলছেন।

'ভদ্রমহোদয়গণ,' তিনি শুরু করলেন, 'একজন অত্যন্ত মহান পুরুষ এবং অত্যন্ত জ্ঞানবান পুরুষ এবং অত্যন্ত সৎ পুরুষ একবার বলেছিলেন যে, সম্ভাবনাই হল জীবনের পথপ্রদর্শক। এটা যে একটি রীতিমতো অর্থব্যঞ্জক বাক্য, এ সম্বন্ধে, আমার বিশ্বাস, আপনারা নিশ্চয় আমার সঙ্গে একমত হবেন। বিশুদ্ধ গাণিতিক পরিধি একবার আমরা অতিক্রম করে এলে যা পাই—তার মধ্যে অতি অল্পই থাকে নিশ্চিত। ধরা যাক, লগ্নী করার মতো যথেষ্ট অর্থ আমাদের আছে ঃ প্রথমে পরিকল্পনাটিকে আমরা সর্বপ্রকার দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করি এবং তারপর একটি সম্ভাবনাময় বিষয় সম্বন্ধে মনস্থির করে ফেলি। নতুবা ভাগ্যের হাতে ক্রীড়নক হওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না। দায়িত্বপূর্ণ পদে কোনও ব্যক্তিকে অধিষ্ঠিত করার আগে আমরা তাঁর সততা এবং বুদ্ধির তীক্ষ্নতার কার্যকরী সম্ভাবনা সম্বন্ধে চিন্তা করে নিই। আবার সম্ভাবনাই আমাদের পথ দেখিয়ে মীমাংসার দিকে, চিত্ত সঙ্কল্পের দিকে নিয়ে যেতে পারে। একজনের সম্বন্ধে আর একজন কখনই নিশ্চিত ও অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে আসতে পারে না ঃ সম্ভাবনার ওপর বারংবার আমাদের নির্ভর করে এগিয়ে যেতে হয়।

'কিন্তু প্রত্যেক নিয়মের আছে ব্যতিক্রম। যে নিয়ম আমরা এইমাত্র বর্ণনা করলাম, এরও ব্যতিক্রম আছে। এই মুহূর্তে আপনারা সেই ব্যতিক্রমের সম্মুখীন হচ্ছেন ভয়াবহরূপে। আপনারা হয়তো মনে করতে পারেন —আমি বলছি না যে আপনারা মনে করেন—হয়তো মনে করতে পারেন, কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান ওই জগদীশ সরকার দ্বারা তাঁর স্ত্রী কমলা সরকারকে খুন করার সকল সম্ভাবনা থাকা বিচিত্র নয়।'

এই স্থানে হল ক্ষণের বিরতি। তারপরঃ

'আপনারা যদি তাই মনে করেন, তবে কাঠগড়াস্থিত আসামিকে মুক্তি দেওয়া আপনাদের এখন অলঙ্ঘনীয় কর্তব্য। একটি মাত্র রায় আপনারা প্রকাশ করতে পারেন এবং সে রায় হল—'নির্দোষ।'

এই মুহূর্ত পর্যন্ত সোমদেব চৌধুরী যেভাবে তাঁর বক্তৃতা শুরু করেছিলেন, ঠিক একই প্রকার শীতল, কিন্তু স্পষ্ট উচ্চারণ করলেন রক্ষা করে—থেমে থেমে, এবং প্রতিটি শব্দ ঠোঁটের আগায় আসার আগে শব্দটির গুরুত্ব মনে মনে বিবেচনা করে নিচ্ছিলেন। আচম্বিতে তাঁর কণ্ঠস্বর উদারা-মুদারা ছাড়িয়ে তারায় উঠে গেল, প্রতিটি শব্দ প্রত্যেকের অন্তরে যেন গেঁথে যেতে লাগল—সমস্ত আদালত-কক্ষটি গমগম করে উঠল তাঁর তীক্ষ্ন এবং গম্ভীর কণ্ঠস্বরে। দ্রুতবেগে একটির পর একটি শব্দ বেরিয়ে আসতে লাগল তাঁর মুখ থেকেঃ

'মনে রাখবেন, এটা সম্ভাবনার আদালত নয়। এখানে সম্ভাবনার কোনও স্থান নেই, সে তর্কের কোনও অবকাশ এখানে নেই। এই স্থান নিশ্চিত সত্য নিয়ে আদান প্রদান করে—এই স্থানের নাম আদালত। যতক্ষণ না আপনারা নিশ্চিত হচ্ছেন যে আমার মক্কেল দোষী এবং দুয়ে দুয়ে যোগ করলে চার হয়—এই নিশ্চিত সত্যটুকুর মতো নিশ্চিত যে পর্যন্ত আপনারা না হতে পারছেন, ততক্ষণ আপনারা ওঁকে মুক্ত করে রাখবেন।

'আবার, এবং তবুও আবার আমি বলছি—এটা আদালত, নিশ্চিত সত্যের স্থান। আমাদের সাধারণ জীবনযাত্রায়, আমরা প্রায় দেখি, সম্ভাবনাই আমাদের পথপ্রদর্শক। কখনও কখনও আমরা ভুল করি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে ভ্রম সংশোধন করতে পারি। ক্ষতিযুক্ত লগ্নীকরণকে সামলে নেওয়া যায় লাভযুক্ত লগ্নীকরণ দিয়ে অসৎ ভৃত্য সরিয়ে সেস্থানে সৎ ভৃত্য আনা চলে। কিন্তু এক্ষেত্রে —যেখানে হাতের দাঁড়িপাল্লায় একদিকে রেখেছেন জীবন, অপর দিকে মৃত্যু—সেখানে ভ্রান্তির কোনও অবকাশ নেই, কেননা, এ ভ্রান্তি হবে অসংশোধনীয়। মৃত পুরুষকে জীবন দান করে আপনারা জীবিত করতে পারবেন না। 'এই লোকটি সম্ভবত হত্যাকারী, অতএব এ দোষী,' এই কথা কখনই আপনাদের বলা চলে না। এ ধরনের রায় প্রকাশ করার আগে, 'এই লোকটি হত্যাকারী' এই কথা বলার মতো নিশ্চয়তা আপনাদের থাকা উচিত। আর ওকথা আপনারা বলতেই পারবেন না—কেন পারবেন না, তা আমি বলছি।'

তারপর সোমদেব চৌধুরী একটির পর একটি প্রমাণ নিয়ে বিশদ ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। বিশেষজ্ঞের রিপোর্টে প্রকাশ, উরুর হাড়ে যে বিকৃত-গঠন দেখা গেছে, তার ফলে নরকঙ্কালটির পক্ষে বিজ্ঞাপন—বর্ণিত ভাবে অবিকল ওই রকম খুঁড়িয়ে চলা উচিত—আর এই বিশেষ ভাবে খোঁড়ানোটাই হল কমলা সরকারের একমাত্র বৈশিষ্ট্য। কিন্তু বাদীপক্ষ বিবিধ যুক্তিতর্কের সাহায্যে ডাক্তারদের স্বীকার করতে বাধ্য করেছে যে এ ধরনের বিকৃত গঠন অস্বাভাবিক হলেও অদ্বিতীয় নয়। শুধু বলা চলে এটা অসাধারণ। কিন্তু আবার খুব অসাধারণ নয়। শেষকালে, একজন ডাক্তার স্বীকার করলেন যে তাঁর তিরিশ বছর হসপিটাল এবং প্রাইভেট প্র্যাকটিশকালে, উরুর বিকৃত-গঠন অস্থি-র কেস তিনি মাত্র পাঁচবার শুনেছেন। সোমদেব চৌধুরী ছোট্ট একটি স্বস্তির শ্বাস ফেললেন তিনি যেন অন্তর দিয়ে অনুভব করলেন যে এরপর বিচারকের রায় কি হবে।

জুরির কাছে এই সব খুঁটিনাটি তথ্য তিনি পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলেন। যতক্ষণ না অপরাধ সম্পর্কিত অন্যান্য বস্তু, দেহ অথবা দেহের সনাক্তকরণযোগ্য কোনও অংশ প্রমাণরূপে উপস্থাপিত না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কাউকে যে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া অনুচিত—এই যুক্তিটির ওপর বারংবার জোর দিতে লাগলেন। বিষ্টুপুরের সেই কাহিনীটা তিনি বললেন, হত্যাপরাধে তিনটি লোকের ফাঁসি হয়ে যাবার দু-বছর পর কীভাবে নিহত ব্যক্তি শিশ দিতে দিতে গ্রামে ঢুকেছিল। 'ভদ্রমহোদয়গণ', তিনি বললেন, 'সবশেষে আমি যা জানি, এবং আপনারাও যা জানেন, তা হল এই যে, যে কোনও মুহূর্তে কমলা সরকার ভ্রূকুটি করে এই আদালত-কক্ষ প্রবেশ করতে পারেন। (কয়েকটা শ্রোতা ঘাড় ফিরিয়ে দরজার দিকে বারকয়েক লক্ষ্য করল) আমি নির্ভীকভাবে শুধু এই কথাই বলব যে তিনি মৃত, এই ধরনের কোনও অনুমান করা আমাদের কোনওমতেই উচিত নয়।'

জগদীশবাবুর আত্মপক্ষ সমর্থন অবশ্য খুবই সংক্ষিপ্ত। যে কঙ্কালটি তিনি শ্রীকান্ত মিত্রের কাছে বিক্রয় করেছেন, সেটি গত তিন বছর যাবৎ বিভিন্ন অস্থি সংযোজন করে ধীরে-ধীরে তৈরি করেছিলেন। দুটি হাতে যে হুবহু মিল নেই, এদিকেও তিনি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। আর, বাস্তবিকই এই ছোট্ট বৈষম্যটুকুও তাঁর চোখ এড়িয়ে যায়নি।

সিদ্ধান্ত প্রকাশ করার আগে জুরিবর্গ আধঘণ্টা ধরে নিজেরা আলোচনা করলেন। তারপর ঘোষিত হল, জগদীশ সরকার নির্দোষ।

কিছুদিন বাদে শুনেছিলাম জগদীশবাবু দিল্লিতে চলে গেছেন, সেখানেই তাঁর শিল্পনৈপুণ্য এবং নব বিবাহিতা নম্র স্বভাবা একটি বধূ নিয়ে সুখে আছেন। একজন পুরোনো বন্ধুর সাথে তাঁর দেখা হয়েছিল। কথায় কথায় সৌম্যমূর্তি জগদীশবাবু স্নিগ্ধ স্বরে বলেছিলেন, 'আমার বিচক্ষণ আইনজ্ঞটি আমায় একথাও বলেছিলেন যে, বেচারী কমলার মৃত্যু হয়েছে, একথা অনুমান করে নিলেও আমায় আর কোনও ক্ষতির সম্ভাবনা নেই।' প্রসন্নভাবে তিনি হেসে এরপর অন্য বিষয়ের অবতারণা করেছিলেন।

সর্বশেষে একথা আমি বলে রাখতে চাই যে, আমার এ বর্ণনা হয়তো আংশিক কাহিনি হয়ে দাঁড়াতে পারে। সোমদেব চৌধুরীর অপূর্ব বাগ্মীতা স্মরণ করে যতটুকু আমি বলতে পারি, তা হল এই যে জগদীশবাবু নির্দোষ। খুব সম্ভব তাঁর কাহিনি সম্পূর্ণ সত্য। কমলা সরকারও বহাল তবিয়তেই জীবিত আছেন, বিষ্টুপুরের মতো তিনিও হয়তো একদিন সাদা নিমফুল ভক্ষিত মুখ নিয়ে ফিরে আসতে পারেন। আমার এ কাহিনিতে যদি কিছু সংশয়ছায়া কারও ওপর আমি ফেলে থাকি, তখন তা হয়তো শূন্যে বিলীন হয়ে যেতে পারে।

যুক্তির পথে দেখলে কাঞ্চনপুর-রহস্য তাহলে মীমাংসিত রহস্য। নিশ্চয় তাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে?

** 'রোমাঞ্চ' পত্রিকায় প্রকাশিত। ফাল্গুন, ১৩৬৩।*

মোমের আগুন

আমার বউ নন্দিনী ফ্যামিলি প্ল্যানিং প্রচারক। প্রচারক শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ আমার জানা নেই। নন্দিনীর কাজ হল গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে টোঁ টোঁ করা। আর 'দুটি বা তিনটি সন্তান, সুখী ইনসান'—এই সরকারি বাণী প্রচার করা। কিছুদিন আগে রাজস্থান সরকারের কাছ থেকে নন্দিনী আমন্ত্রণ পেল—জয়পুরে ফ্যামিলি প্ল্যানিং সেমিনার হচ্ছে। সব প্রদেশ থেকেই অভ্যাগতরা আসছেন। নন্দিনীর আসা চাই। নন্দিনী রাজি হয়ে গেল।

আমি গেলাম না ছুটি পেলাম না বলে। নন্দিনী সহকর্মীদের সঙ্গে গেল রাজপুতদের দেশে। পরে চিঠি পেলাম। সেমিনার নামক প্রহসন শেষ হয়েছে। ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের বাজেট খসিয়ে ওরা এখন রাজপুতানা দেখতে বেরিয়েছে। তার পরেই একটি চিঠি এল বিকানীর থেকে। নন্দিনী লিখছেঃ

প্রিয়তম স্বামী আমার,

তুমি তো জান, ভূত দেখতে আমি ভালোবাসি। ভালোবাসি বলেই ভূতরা আমায় দেখা দেয় না। নিরুপায় হয়ে এনতার ভূতের গল্প পড়ি। সম্প্রতি এমন একটা ঘটনা আমার জীবনে ঘটল যা আমার ভূতদর্শনের সাধ জন্মের মতো মিলিয়ে দিয়েছে। আমার ধাত ছেড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে।

সেমিনার করতে এসে সবারই দেখি ফূর্তির প্রাণ গড়ের মাঠ। সরকারি পয়সা ফুট কড়াই হচ্ছে হোক, পো-পোয়াতীর ভাবনা সোয়ামীরা ভাবুক—আমরা ঘুরি দেশ। এই মন্ত্র সম্বল করে আমরা তো জয়পুর থেকে আজমীর হয়ে চিতোরগড়ে এলাম। তারপর উদয়পুর, মাউন্ট আবু ঘুরে গেলাম যোধপুর। সবশেষে বিকানীরে। মরুভূমির দেশ বিকানীর। এখানে এসেই আমার স্নায়ু জখম হবার উপক্রম হয়েছে। বেলা তিনটে নাগাদ একাই মরুভূমির দিকে গিয়েছিলাম। আমার সৃষ্টিছাড়া খেয়ালের সঙ্গে কারো মেজাজ খাপ খায় না। আমি ভালবাসি মরুভূমি, কাঁটাঝোপ, জঙ্গল আর ভাঙা কেল্লা। ওরা ভালোবাসে প্রাসাদ আর সরোবর। বাগিচা আর ফোয়ারা। আমি চাই রুক্ষ, ধূসর, পরিত্যক্ত অঞ্চল। যেখানে মানুষ যেতে ভয় পায়। যেখানকার ধূ-ধূ শূন্যতা বুক কাঁপায়। যেখানকার ভয়াল বন্যতা রক্ত হিম করে দেয়। আমার এই বাউণ্ডুলে বিদঘুটে মেজাজের সঙ্গে তুমি পরিচিত।

বিকানীর থেকে একটা উটের পিঠে চেপে মরুভূমির কিনারায় তাই একাই এলাম। উট ছেড়ে দিলাম। ঠিক করলাম, একা-একা মরুভূমির সূর্যাস্ত দেখব। কাঁকড়ার গর্ত দেখব, বালির কান্না শুনব। তারপর ফিরে এসে যোধপুর বিকানীর সড়ক ধরে যে-কোনও গাড়িতে চেপে শহরে আসব।

উট থপথপ করে বিদেয় হতেই আমি বালিয়াড়ি পেরিয়ে এগিয়ে চললাম। ছোট ছোট বালির পাহাড় ডিঙোনোর মধ্যে সে যে কি আনন্দ, হে পতি দেবতা, তা তোমায় বোঝাতে পারব না। সে এক আশ্চর্য শিহরন। পায়ের নীচে বালি সরে যাচ্ছে। চড়াইতে উঠতে গিয়ে মাঝে মাঝে হুমড়ি খাচ্ছি—কিন্তু তার মধ্যেই যে রোমাঞ্চ, যে পুলক, যে মুক্তির উল্লাস—তা শুধু উপলব্ধির বিষয়। কী ভাবছ? স্নায়ু সত্যিই জখম হয়েছে? পাগল হয়েছি? আজ্ঞে না মশাই—।

বালির পাহাড় ডিঙোতে ডিঙোতে হঠাৎ একটা পরিত্যক্ত গাঁয়ে পৌঁছোলাম। মরুভূমির গ্রাম। বুঝতেই পারছ অবস্থাটা। খান কয়েক কাঠামো আর ভাঙাচোরা ইটের গাঁথনি ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। একটা কেল্লার ধ্বংসস্তূপ দেখলাম। সূর্যের পড়ন্ত আলোয় ভাঙা পাথরের বুকে যেন আর এক চিতোর দেখলাম। শৌর্য, বীর্যের ইতিহাস যেন মূর্ত হয়ে উঠল।

হেঁটে হেঁটে পা ব্যথা হয়ে গিয়েছিল। ভাঙা পাঁচিলের আড়ালে ছায়ায় বসলাম। ঝোলা থেকে রুটি মাখন আর ডিম বার করলাম। খেয়ে দেয়ে সামান্য ঝিমুনি এসেছিল। মুক্ত পরিবেশে মনটাও নির্মেঘ হয়ে গিয়েছিল। আচমকা চোখ খুলে দেখলাম গোধুলির আলোয় আকাশ রাঙা হয়ে গিয়েছে।

এবার ফেরা দরকার। যে দিক দিয়ে এসেছিলাম, সেই দিকেই পা বাড়ালাম। দিব্বি কিছু দূর গেলাম। ইতিমধ্যে আলো আরও নিভে এল। বালির ওপর পায়ের ছাপ দেখে দেখে হাঁটছিলাম। অন্ধকার গাঢ় হতে সে ছাপও আর দেখতে পেলাম না। তারপর বুঝলাম, আমি পথ হারিয়েছি।

উঁচু উঁচু বালিয়াড়ির মধ্যে আমি একা দাঁড়িয়ে রইলাম। চারপাশে জমাট অন্ধকারের মতো বালির পাহাড় আমার ওপর ঝুঁকে রইল। ভয় ডর আমার বড় একটা নেই। কিন্তু সেদিন আমি অস্বস্তি অনুভব করলাম। তাছাড়া চারদিক এমন নিথর নিস্তব্ধ যে মাথার মধ্যে যেন মহাশূন্যের শূন্যতা অনুভব করলাম। সে এক বিচিত্র অনুভূতি।

ঠিক এই সময়ে দেখা হল সুরুচির সঙ্গে। সুরুচিকে তোমার মনে পড়ে?

দশ বছর আগে ধূমকেতুর মতো ছায়াছবি মহলে যে মধ্য গগনে উঠে গিয়েছিল। সুরুচির মতো প্রতিশ্রুতিময়ী চিত্রতারকা সিনেমা লাইনে বড় একটা দেখা যায়নি। প্রতিটি ছবি হিট করার পর অকস্মাৎ সুরুচি রূপোলি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিল। কারণ সেই চিরন্তন। কোনও এক হিজ হাইনেস মহারাজা নাকি সুরুচির পাণিপীড়ন করে এবং সুরুচি তখন মহারাজার কণ্ঠলগ্না হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

সেই সুরুচির সঙ্গে দেখা হল বিকানীরের প্রান্তে মরুভূমির মধ্যে। সুরুচি দূর থেকে মাথা হেঁট করে আমার দিকেই আসছিল। আমি বিজন প্রান্তরে মানবী দেখে দৌড়ে গিয়েছিলাম। গিয়েই চেনা-চেনা ঠেকেছে। তারার আলোয় সুরুচিও আমার চোখে চোখ রেখেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি চিনেছি। ওই চোখ ভোলবার নয়, সুরুচির সম্বল ছিল শুধু ওই চোখ। শুধু চোখের মধ্যে দিয়ে মনের সব ভাষাও ফোটাতে পারত। কথার প্রয়োজন যত না ওর অতলান্ত চাহনিই যা বলবার তা বলত।

সুরুচি সেই চাহনিই মেলে ধরল আমার ওপর। দেখলাম, দুই চোখে গভীর বিষাদ।

আমি সচমকে বললাম—'আপনি? সুরুচি দেবী?'

'হ্যাঁ', নিষ্প্রাণ গলায় বলল সুরুচি। 'পথ হারিয়েছেন?'

সুরুচি চিরকালই কম কথা বলে। সেদিনও বলল। বাকিটুকু আমি হৃদয় দিয়ে অনুভব করলাম। সুরুচি আমাকে সঙ্গ দিতে চাইছে। আমাকে পথ দেখাতে চাইছে। কোনও কথা বললাম না! উত্তর যেন নিষ্প্রয়োজন। সুরুচি যেন মনের কথা মন দিয়ে পড়ে। পাশাপাশি দুজনে হাঁটলাম। মানুষের সঙ্গ যে এত মধুর হতে পারে, সেইদিন সেই প্রথম জানলাম। হে পতি দেবতা, দোষ নিও না! সত্যি কথাই বললাম। তখনকার অনুভূতির কথাই বললাম।

জিগ্যেস করলাম—'আর কদ্দূর?'

মৃদুস্বরে সুরুচি বলল—'আমার বাড়ি কাছেই। আপনার পথেরও শেষ সেইখানে।'

'আমি কিন্তু আপনাকে বেশি বিরক্ত করতে চাই না।'

'বিরক্ত হব না। বাড়িতে পঞ্চাশটা শোবার ঘর আছে। ব্যবহার করা হয় মাত্র দুটি। আমি আর স্বামী ছাড়া কেউ থাকে না।'

'আপনার স্বামী মানে হিজ হাইনেস—'

'রাজা ভৈরব নামেই ওঁকে সবাই চেনে।'

'আমি গেলে মনে মনে অসন্তুষ্ট হবেন না তো?'

'না। আমরা মানুষ ভালোবাসি।' বলে হাসল সুরুচি। তারার আলোয় ঝিকিমিকি দাঁতের সারি দেখলাম। দেখলাম, চিত্রতারকার জৌলুস এখনও বজায় রেখেছে সুরুচি।

একটা বালিয়াড়ি পেরোতেই একটা প্রাসাদ দেখলাম। বেশ বড়। অন্ধকারে বেশ খানিকটা জমাট অন্ধকার ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। সামনের ফটকে কেরোসিন তেলের বড় বাতি জ্বলছে দেখলাম।

সবিস্ময়ে বললাম—'ইলেকট্রিক লাইন এখানে আসেনি?'

'না,' সংক্ষিপ্ত জবাব দিল সুরুচি। একটু থেমে বলল—'উনি পছন্দ করেন না।'

বাড়ির মধ্যে ঢুকে রাজা ভৈরবের পছন্দের আরও নমুনা দেখলাম। বড় বড় শামাদানে জ্বলছে বিস্তর মোমবাতি। কোথাও কেরোসিনের প্রদীপ। বিশাল বড় লণ্ঠনগুলো ঝুলছে—কিন্তু বাতি জ্বলছে না।

ঘরের পর ঘরে গালিচা আর অয়েল পেইন্টিং, পাথরের মূর্তি আর ইস্পাতের হাতিয়ারের সমাবেশ।

একতলায় খাবার ঘরে আমি বসলাম। একসঙ্গে বারো মোমবাতির আলোয় শিশমহলের মতো ঝলমল করতে লাগল ঘরটা। ভালো ভালো খাবার সাজিয়ে দিল সুরুচি। এত অল্প সময়ে এত সুখাদ্যের আয়োজন দেখে অবাক হলাম।

ঘরের এককোণে বড় ডিভান পাতা ছিল। আমি সেখানে বসলাম। সুরুচি বলল—'আমি যাচ্ছি।' বলে পাশের ঘরে গেল। ফিরে এল একটা ট্রে নিয়ে। রূপোর ট্রে। দু-গেলাস গরম দুধ আর দু-পাত্র সোনালি মদিরা নিয়ে ওপরে চলে গেল।

আমি ডিভানে গা এলিয়ে দিলাম। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম, শূন্য পুরীর শূন্যতা কেন? রাজা আর রানী ছাড়া প্রাসাদে আর কেউ নেই কেন? দাসদাসী ছাড়া প্রাসাদ কি মানায়? এ কেমনতর রাজ পরিবার? ভাবতে-ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

হঠাৎ উঠে বসলাম আমি। জানলা দিয়ে দেখলাম চাঁদের আলো মেঝেতে পড়েছে। আর দেখলাম ধোঁয়া ঢুকছে। পটপট শব্দ হচ্ছে।

ধড়মড়িয়ে জানলায় গিয়ে দাঁড়ালাম। আগুনের লাল আভা দেখে চমকে উঠলাম। দোতলায় আগুন লেগেছে। সিঁড়ির দিকে দৌড়ে গেলাম। উঠতে পারলাম না। সিঁড়িতে আগুন ও ধোঁয়া দুর্ভেদ্য বেড়াজালের সৃষ্টি করেছে।

বৃথাই চেষ্টা করলাম। সুরুচি দেবীর নাম ধরে ডাকলাম। কারও সাড়া না পেয়ে দৌড়ে বাইরে চলে এলাম। ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োতে লাগলাম। আশ্চর্য এবার কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই যোধপুর-বিকানীর সড়ক দেখতে পেলাম। চাঁদের আলোয় দৌড়োতে দৌড়োতে কতক্ষণ পরে যে বিকানীর পৌঁছলাম—তা বলতে পারব না। স্টেশনের সামনে চৌকিদারের কাছে হাঁপাতে হাঁপাতে আগুন লাগার খবর দিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

জ্ঞান ফিরে আসতে দেখলাম হাসপাতালে শুয়ে আছি। মাথার কাছে ডাক্তার দাঁড়িয়ে। ঘরে আর কেউ নেই।

চোখ মেলতেই ডাক্তার বলল—'কী হয়েছিল?'

আমি বললাম কী হয়েছিল। জিগ্যেস করলাম আগুন নেভাতে দমকল গেছে কিনা। ডাক্তার হাসল। বলল—'মরুভূমিতে আগুন লাগলে আর নেভে না। তা ছাড়া এখানে দমকল কোথায়?'

'তাহলে? সব পুড়ে যাবে যে?'

'পুড়ে গেছে। পাঁচ বছর আগেই পুড়ে গেছে।'

'সে আবার কি কথা?'

'আপনি যে বাড়িতে গিয়েছিলেন, সে বাড়িতে এখন আর কেউ থাকে না। পাঁচ বছর আগে সেখানে থাকত রাজা ভৈরব আর রানী সুরুচি। রাজা ছিল বিকৃত মস্তিষ্ক এবং খেয়ালী। রানীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। তাই একদিন রাজাকে মেরে রাজ সম্পত্তি হাতানোর প্ল্যান করে।'

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতে লাগলাম।

ডাক্তার বলল—'একদিন রাত্রে দু-গেলাস গরম দুধ আর মদ নিয়ে রাজার কাছে গেল রানী। খুব যত্ন করে রাজাকে খাওয়াতে গেল। রাজার সন্দেহ হল! কেন না, যত্ন করে কিছু করা রানীর কুষ্ঠিতে লেখেনি। দাস-

দাসী না থাকায় সুরুচি দেবী খুবই অশান্তিতে ছিলেন। তাই সুরার সঙ্গে দুধ দেখে রাজার সন্দেহ হয়। রানী দুধ নিয়ে গিয়েছিল বিষের গন্ধ ঢাকবে বলে। পেস্তাবাদাম মেশানো দুধ নিয়ে হঠাৎ খাতিরের বহর দেখে অপ্রকৃতিস্থ রাজার খটকা লাগল।'

'বিষ?'

'হ্যাঁ। দুধে বিষ মেশানো ছিল। পাশে শামাদানে জ্বলন্ত মোমবাতি ছিল। দরজার বাইরে পেট্রোলের টিন ছিল। রানীর প্ল্যান ছিল, বিষ খাইয়ে আগে রাজাকে খুন করা। তারপর পেট্রোল ঢেলে শামাদান উল্টে আগুন লাগিয়ে দেওয়া। সবাই জানবে, হঠাৎ আগুন লেগে রাজা ভৈরব পুড়ে মরেছে। রানীকে কেউ সন্দেহ করবে না।'

'কিন্তু রাজার মনে খটকা লাগল। তাই রানী যেই অন্য দিকে ফিরেছে, রাজা অমনি দুধ অর সুরার গেলাস পালটা পালটি করে দিল। রানী সেই দুধ খেয়ে রাজার সামনেই মারা গেল। দারুণ উত্তেজিত রাজা শামাদান নিয়ে যেই ঘর থেকে বেরোতে যাবে, অমনি পেট্রোলের টিনে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। পেট্রোল গড়িয়ে গেল মেঝেতে—শামাদানের জ্বলন্ত মোমবাতি ছিটকে গিয়ে পড়ল পেট্রোলে। সঙ্গে সঙ্গে দাউ দাউ করে আগুন লেগে গেল দোতলায়। ফলে রাজা জ্যান্ত পুড়ে মরল। আর পুড়ল রানীর মৃতদেহ।'

ডাক্তার থামতেই আমি শুধোলাম—'এ গল্প কবেকার?'

'পাঁচ বছর আগেকার।'

'আপনি কী করে জানলেন?'

'কেন না, দুধে আমিই বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলাম। রানী সুরুচির সঙ্গে আমার গোপন প্রেম ছিল। কিন্তু খবরদার, এ কথা যেন পাঁচ কান না হয়।' বলেই ডাক্তার আমার সামনেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

** 'উল্টোরথ' পত্রিকায় প্রকাশিত। ভাদ্র, ১৩৭৭।*

ভানুমতীর খেল

'ভানুমতীর খেল ছাড়া আর কি,' বিরক্তকণ্ঠে বললে ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর জয়ন্ত চৌধুরী।'অশরীরী ছাড়া কারো পক্ষে আরুণিকে খুন করা সম্ভব নয়। সুতরাং এটা খুন নয়, আত্মহত্যা।'...বলে, কফির কাপে প্রচণ্ড শব্দে চুমুক দিল সে।

কথা হচ্ছিল আমার বৈঠকখানায়। আড্ডার আসর জমিয়েছিল বন্ধুবর ইন্দ্রনাথ রুদ্র। প্রাইভেট ডিটেকটিভ হিসাবে ওকে আমার কলমে ঠাঁই দিয়েছিলাম। এখন দেখা যাচ্ছে, আমার চাইতে ওর নামই বেশি। যাক সে কথা।

নির্ভেজাল সেই আড্ডার আসরে ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হল আমার আর একটি গোয়েন্দা বন্ধু—জয়ন্ত চৌধুরী। সরকারের নুন খেয়ে গোয়েন্দাগিরি করে বলে ইন্দ্রনাথ তাকে যখন তখন ঠাট্টা বিদ্রূপ করে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে উপহাস করে। বলে—'রামভক্ত হনুমান, সরকারভক্ত জাম্বুবান।'

সেদিনও এই জয়ন্ত এসে আমাদের খোশগল্পের আসরটি পণ্ড করে দিল। এমন একটা অবিশ্বাস্য অপঘাত কাহিনি বর্ণনা করল যা আত্মহত্যা ছাড়া কিছুই নয়। অথচ লোকান্তরিত লোকটার পরিচিতবর্গের জবানবন্দী থেকে মনে হয় হত্যা। বেশ ঠান্ডা মাথায় ভেবেচিন্তে আটঘাট বেঁধে হত্যা।

তাই জয়ন্ত চৌধুরীর মেজাজ সপ্তমে চড়েছে। গরুখোঁজা খুঁজে বার করেছে ইন্দ্রনাথকে। এক নিঃশ্বাসে বিবৃত করেছে আদ্যপান্ত ঘটনাটা। সবশেষে মন্তব্য করেছে—'একে যদি হত্যাকাণ্ড বলতে হয় তো বলব ভানুমতীর খেল। অথচ ছোটকর্তা টিটকিরি দিয়ে বললেন কিনা জয়ন্ত, তুমি এবার রিটায়ার করো। এটা সাজানো আত্মহত্যা। আসলে খুবই ইনটেলিজেন্ট মার্ডার। আমার ইনটেলিজেন্স নিয়ে এ হেন কটাক্ষ, বলুন দিকি বৌদি, সহ্য করা যায় কি?'

গৃহিণী কবিতা মুখ টিপে হেসে বলেছে—'সত্যিই তো।'

'ইন্দ্রনাথ, তোর কী মনে হয়,' গলার শির তুলে চেঁচিয়ে বলেছে জয়ন্ত। 'তোর কী মনে হয়, সেটা বল। ইজ ইট এ মার্ডার? তাই যদি হয়। প্ল্যানচেট করে পি সি সরকারের প্রেতকে নামালেই হয়—আমাকে কেন? কুহক বিদ্যেটা আমি শিখিনি। ইন্দ্রজাল আর রহস্যের জাল কি এক জিনিস হল?'

ইন্দ্রনাথ তখন গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। ঠোঁটের কোণে ঝুলছিল আধপোড়া 'কাঁচি'। ধোঁয়ার সুতো কাঁপতে কাঁপতে স্পর্শ করছিল কড়িকাঠ। ওর কবি কবি মুখটিও উত্থিত সেইদিকে—স্বপ্ন-ছাওয়া চাহনি নিবদ্ধ কড়িকাঠের টিকটিকিটার ওপর। বলল উদাস গলায়—'জয়ন্ত, টিকটিকিটা দেখেছিস?'

'টিকটিকি!' জয়ন্ত খাবি খেল যেন।

'স্কাইলাইট থেকে বেরিয়ে কড়িকাঠ বরাবর হাঁটছে টিকটিকিটা। আমি যদি ওকে মনে করি হত্যাকারীর হাত, তাহলেই তো হত্যার সমাধান হয়ে যায়।'

'টিকটিকি! হত্যাকারীর হাত। ইন্দ্রনাথ আমার মাথার অবস্থা ভালো নয়। বেশি ইয়ার্কি মারলে তোকেই খুন করে বসতে পারি।'

চোখ নামিয়ে প্রশান্ত হাসল ইন্দ্রনাথ। টানাটানা চোখে কৌতুক উপচে পড়ল। বলল বুদ্ধিদীপ্ত ধীর কণ্ঠে—'জাম্বুবান কি সাধে বলেছি!'

'ফের।'

'ছোটকর্তা ঠিকই বলেছেন, এটা হত্যা, আত্মহত্যা নয়।'

'কীভাবে? কীভাবে? কীভাবে?' তড়াক করে লাফিয়ে চিলের মতো চেঁচিয়ে উঠল জয়ন্ত। এমন জোরে চেঁচালো যে টিকটিকিটা সুড়ুৎ করে উধাও হল স্কাইলাইটের ফোকরে! সেইদিকে আঙুল তুলে বলল ইন্দ্রনাথ—'ওই ভাবে!'

হেঁয়ালির আগের ঘটনাটা এবার বলা যাক।

ফিরোজা থিয়েটার এই রহস্যকাহিনির অকুস্থল। থিয়েটারটি ব্রিটিশ আমলের। অনেক ইতিহাস, অনেক স্মৃতিবিজড়িত এই প্রমোদ নিকেতন দীর্ঘ একশো বছর ধরে আমোদ বিতরণ করে এসেছে রসিকদের মধ্যে। ফিরোজা থিয়েটারের চাইতে বড় থিয়েটার হালে তৈরি হয়েছে শহরে। কিন্তু এমন জমকালো কোনওটাই নয়। এ থিয়েটারে প্রবেশ করলেই মনের মধ্যে যেন সাতটা কোকিল গান গেয়ে ওঠে। মান্ধাতা আমলের লিফটে চড়ে তিনতলায় ওঠবার পর বিশাল নাট্যশালার বিশালতা মাথা ঘুরিয়ে দেয়। সাহেবদের কাণ্ডই আলাদা। এ-হেন ফিরোজা থিয়েটারে নতুন নাটক মঞ্চস্থ হতে চলেছে। মহড়া শেষ হতে হতেই রাত আটটা বেজে যায়। রোজই বাড়ি ফিরতে রাত হয় তপন আর সুলতার।

তপন ফিরোজা থিয়েটারের বাঁধা বাজিয়ে আর গাইয়ে। ওর দরাজ গলায় গান আর সুরেলা পিয়ানো সঙ্গীত না থাকলে কোনও নাটকই জমে না। চেহারাটিও ভালো। তাই স্টেজেও নামতে হয়। নাটক লেখা হয় সেইভাবেই। সুলতা ওর নতুন বিয়ে করা বউ। রূপসী। ফিরোজা থিয়েটারের যা কিছু নাটক রচনার দায়িত্ব ওর কাঁধে। সুলতার সংলাপ এত মিষ্টি, এত তেজালো, এত নাটকীয়, যে দর্শকরা ওর নামে পাগল।

ফিরোজা থিয়েটারেই দুজনের পরিচয়। প্রণয় এবং পরিণয়।

সেদিনও রাত করে ফ্ল্যাটে ফিরল তপন আর সুলতা। সুলতা শাড়ি পালটে টান টান হল শয্যায়, উদরাগ্নি হোটেলেই নিভিয়ে আসা হয়েছিল। সুতরাং—জামা খুলতে গিয়ে তপন চমকে উঠল। মানিব্যাগটা ফেলে এসেছে স্টাফরুমে।

সুলতার তখন ঘুম এসে গেছে। মানিব্যাগ স্টাফরুমে পড়ে আছে শুনে জড়িত কণ্ঠে বলল—'কালকে গেলেই পাবে'খন। এসো শুয়ে পড়ো।'

তপন বললে—'তা হয় না। মানিব্যাগ ভর্তি টাকা রয়েছে। ড্রেসিং রুমেও চাবি দেওয়া থাকে না। সকালে ঝাড়ুদার আসে। তার চাইতে আমি এখুনি গিয়ে নিয়ে আসি। এই তো তিন মিনিটের রাস্তা। যাব আর আসব।'

'এসো,' বলে পাশ ফিরে পাশবালিশে পা তুলে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল সুলতা। রাত তখন দশটা। ফিরোজা থিয়েটার খাঁ-খাঁ করছে। সামনের ফটক দিয়ে প্রবেশ করল তপন। সিঁড়ি বেয়ে উঠল দোতলায়। দেখল, সামনেই লিফট। লিফটম্যান নেই। অসময়ে কোনওদিনই থাকে না। বলতে গেলে সারা ফিরোজা থিয়েটারে একটি মাত্র প্রাণী ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি থাকে না। নাম তার ইস্পাহানি।

ইস্পাহানি সম্বন্ধে দু-চার কথা এই সুযোগে বলে নেওয়া যাক। কেন না, দুর্ভেদ্য এই অপঘাত-রহস্যে বড় রকমের স্থান জুড়ে রয়েছে এই মানুষটা।

ইস্পাহানির বয়স সত্তরের ওপরে। লোকে বলে তার চোখে ছানি পড়েছে। কিন্তু সে তা মানতে রাজি নয়। ইস্পাহানির চুল সাদা, দাড়ি লাল, ভুরু কালো। সব চাইতে আশ্চর্য তার দৈর্ঘ্য। এ রকম বেঁটে গুড়গুড়ে বামন মূর্তি পিগমিদের দেশে পাওয়া যায়। কলকাতার পথে ঘাটে পাওয়া যায় না। মাত্র আড়াই ফুট লম্বা বাঁটকুল মূর্তি—তার ওপর চুল-দাড়ি-ভুরুর রং তিন রঙের।

ইস্পাহানিকে সংগ্রহ করেছিলেন ফিরোজা থিয়েটারের মুসলমান মালিক পারস্যের পথ থেকে। থিয়েটারের অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে তার চাকরি হয় পঞ্চান্ন বছর আগে। ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পায় তার অসাধারণ প্রভুভক্তি যা নাকি সারমেয়দের সমতুল্য। এরকম বিশ্বাসভাজন ভক্তি এ যুগে বিরল। তাই রাত্রি নিশীথে গোটা ফিরোজা থিয়েটারের রক্ষণাবেক্ষণের ভার তার একার—আর কারো নয়।

তিনতলায় ইস্পাহানির ঘর। রাত গভীর হলেই দরজা খুলে চারপাইয়ের ওপর ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে থাকে সে। আর আলবোলা সাজিয়ে ভুরুক ভুরুক করে তামাক খায়। এইটাই একমাত্র নেশা ইস্পাহানির। বিয়ে-থা

সে করেনি।
একটা কথা আবার পুনরাবৃত্তি করা যাক। দরজা খুলে তাম্রকুট সেবন করে ইস্পাহানি। কারণ নাকি ধোঁয়ায় তার দম আটকে আসে। এটা তার বহু বছরের অভ্যেস।
খোলা দরজার বিপরীত দিকে আর একটা ঘর। এ-ঘর জাঁদরেল নায়ক আরুণির। ফিরোজা থিয়েটারে এমনি ঘর আরো আছে। করিডরের দু-পাশে সারি সারি স্টাফ রুম। থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতিজনের বরাদ্দ একটি বিশ্রাম ঘর। কমন গ্রীনরুমে অনেকেই যেতে চায় না—নিজের নিজের ঘরই তাদের পছন্দ। ড্রেসিংরুম বলতে এই স্টাফরুমকেই বোঝায়। তিনতলার ওপরে ছাদ।
রাত দশটায় স্টাফরুম থেকে নিজের মানিব্যাগ উদ্ধার করে লিফটে উঠল তপন। কিন্তু নির্জন নিশ্চুপ থিয়েটার ভবনে একা-একা লিফট চালানোর ছেলেমানুষি হঠাৎ পেয়ে বসল ওকে। দোতলা থেকে নীচে না নেমে সটান উঠে গেল তিনতলায়। কোলাপসিবল গেট-এ ফাঁক দিয়ে দেখল ইস্পাহানির দরজা খোলা। আলো জ্বলছে। তামাকের গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে। যথারীতি তাম্রকুটের নেশায় আবিল হয়েছে বৃদ্ধ।
আরো দেখল, আরুণির ঘরের দরজাও দুহাট করে খোলা। সে ঘরেও জ্বলছে আলো।
লিফট চালিয়ে একতলায় নামল তপন।
রাস্তায় বেরিয়ে কিছুদূর যেতে না যেতেই একটা গাড়ি উল্কাবেগে এসে ব্রেক কষল ফটকের সামনে। দরজা খুলে হন্তদন্ত হয়ে নামলেন ডক্টর লুথরা। ফিরোজা থিয়েটারের স্টাফ ডক্টর।
একটু বিস্মিত হল তপন। এত রাতে জনহীন থিয়েটারে কার চিকিৎসার দরকার পড়ল? পরক্ষণেই চিন্তা মুছে গেল মন থেকে ঘুমের দৌরাত্ম্যে।
ঘুম একেবারেই ছুটে যেত চোখ থেকে যদি আরুণির ঘরে উঁকি দিত তপন। দেখত, কড়িকাঠ থেকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে একটা সদ্য-ঝুলন্ত দেহ।
আরুণির দেহ!
পরের দিন সকালে হইচই পড়ে গেল ফিরোজা থিয়েটারে। ডক্টর লুথরা বললেন টেলিফোনে তলব করেছে আরুণি স্বয়ং। টেলিফোন অবশ্য তিনি নিজে ধরেননি। ধরেছিল ওঁর দাসী মন্থরা। মন্থরাকে জেরা করল জয়ন্ত চৌধুরী। আমতা-আমতা করে মন্থরা বললে—এজ্ঞে, তিনিই আরুণিবাবু কিনা জানব কেমনে? বললেন তো আরুণিবাবু বলছি, ডাক্তারবাবুকে এক্ষুনি থিয়েটারে পাঠিয়ে দাও। ভীষণ বিপদ।
জয়ন্ত মুখ ভেংচে চমকে উঠেছিল—'কেমনে আবার জানবে? আরুণিবাবু? কখনো ফোন করেননি ডাক্তারবাবুকে? করেছিলেন তবুও গলা চিনতে পারলে না?'
ভয়ে কাঁটা হয়ে বললে মন্থরা—'এজ্ঞে, তাঁর গলা তো ভারি। মনে তো হয় উনি নন।'
অর্থাৎ কেসটা ঘোরালো হল। অন্য কেউ যদি ফোন করে থাকে, তাহলে সে কে? সেই কি নাটের গুরু হত্যাকারী না, আত্মহত্যার চাক্ষুষ সাক্ষী?
উভয়ক্ষেত্রেই তপন ফেঁসে যাচ্ছে। পুলিশের ছোটকর্তার তীব্র ধারণা মেনি মুখো ওই গাইয়ে বাজিয়ে লোকটা হয় হত্যাকারী, নয় হত্যাকারীর শাগরেদ। আরে বাবা, তুমি যদি অতই সাচ্চা পার্টি হবে তো খামোকা লিফট চালিয়ে তিনতলায় উঠতে গিয়েছিলে কেন? তোমার ঘর তো দোতলায়? তাছাড়া, কোনওদিন তোমার মানিব্যাগ নিতে ভুল হয় না, ভুল হল সেইদিনই যেদিন চিত্রগুপ্ত তাঁর জাবদাখাতায় ঢেঁড়া মারলেন আরুণির নামের পাশে?
কিন্তু এর পাল্টা যুক্তিও আছে। তপনকে কেউ দেখেনি ফিরোজা থিয়েটারে রাত দশটায়। তা সত্ত্বেও সে কবুল করেছে। না করলেও পারত। সে যদি নাটের গুরুই হবে তো যে—খবর কেউ জানে না, সে-খবর পুলিশকে বলে খাল কেটে কুমির ডাকবে কেন?
তাছাড়া, ডক্টর লুথরা বলছেন, আরুণির হৃদপিণ্ড পরীক্ষা করে তিনি তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলেন। ধুকধুক করে তখনও হার্ট কাজ করে চলেছিল—নিঃশ্বাস যদিও পড়ছিল না। এরকম অবস্থা নাকি গলায় দড়ি দিয়ে

ঝুলে পড়ার মিনিট দু-তিন পর পর্যন্ত থাকে। উনি কোরামিন ফুঁড়েও অবশ্য হার্ট আর চালু করতে পারেননি। তাছাড়া, ঘাড়ের কাছে মেরুদণ্ডর হাড় ভেঙে গিয়ে যার মৃত্যু ঘটেছে, তার হার্টে কোরামিন দিয়েও কোনও লাভ ছিল না। তবে একটা জিনিস স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

ডাক্তার যখন ফোন পান, তখনো জীবিত ছিল আরুণি। সে কড়িকাঠে ঝুলেছিল, ডাক্তার তার কাছে পৌঁছোনোর মিনিট দু-তিন আগে।

কিন্তু সে সময়ে তপন ছাড়া আর কেউ তো আসেনি থিয়েটারে?

সুতরাং হয় তপন হত্যাকারী, না হয় আরুণি নিজেই আত্মঘাতী হয়েছে। ঠিক তার আগেই গলা পালটে ফোন করেছে ডাক্তারকে অভিনেতার পক্ষে যা অসম্ভব নয় মোটেই।

আরও তথ্য প্রকাশ পেল।

মদ্যপান করেছিল আরুণি। জিনের বোতল আর গেলাস ছিল ঘরের মধ্যেই। জিনের মধ্যে মেশানো ছিল পেমবুটাল। ঘুমের ওষুধ। এত বেশি মাত্রায় ছিল যে মরবার আগে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল আরুণি।

বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল। হুঁশ ছিল না। তবে ফোন করেছিল কে? নিশ্চয় সে নয়। তাহলে?

হত্যাকারী।

কিন্তু হত্যাকারী ঘরে ঢুকল কী করে? ডাক্তার পৌঁছোনোর দু-তিন মিনিট আগে দড়ি থেকে ঝোলানো হয়েছে বেহুঁশ দেহটাকে। সে সময় দরজার দিকেই তাকিয়েছিল ইস্পাহানি। আরুণি বাবুর ঘরে কাউকে সে ঢুকতে দেখেনি। বেরোতেও দেখেনি। মোটে দু-তিন মিনিটের তো মামলা।

অথচ ডাক্তার এসে দেখল তখনো হার্ট চলছে আরুণির।

ইস্পাহানি আরও বলল। ন'টা নাগাদ ক্যাসানোভা এসেছিল আরুণির ঘরে। আরুণি তখন সবে পাবলিক বার থেকে সুরার নেশা নিয়ে ফিরেছে। রোজ রাতের মতোই আর এক প্রস্থ মাল টানা শুরু করেছে স্টাফরুমে। এমনি সময়ে এল ক্যাসানোভা।

ক্যাসানোভা! ঐতিহাসিক নাম! চরিত্রহীনতায়, লাম্পট্যে, নারী বিলাসে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক ক্যাসানোভা। এ নাম তার পিতৃদত্ত নাম নয়। ধর্মেও সে খ্রিস্টান নয়। কিন্তু তবুও তার নাম ক্যাসানোভা হয়ে গিয়েছে 'ক্যাসানোভা' নাটকে নায়কের সফল অভিনয়ের পর। একাদিক্রমে পাঁচশো রজনী অভিনয়ের পর স্তাবকদের দৌলতে আসল নামটি বিস্মৃত হল মুগ্ধ দর্শকরা...লোকে মুখে চালু হয়ে গেল ক্যাসনোভা নামটা।

সেই ক্যাসানোভা এসেছিল আরুণির ঘরে। বিদায় নিয়েছিল আধঘণ্টা পর। তারপর ইস্পাহানি আর কাউকে দেখেনি সে ঘরে ঢুকতে।

অথচ রাত দশটায় প্রাণবায়ু বিলীন হল আরুণির। ক্যাসানোভা বিদায় নিয়েছে সাড়ে ন'টায়। সুতরাং সে নিরপরাধি। তপন লিফটে থেকে নামেনি। ইস্পাহানির সামনে আসেনি—সুতরাং সে-ও নিরপরাধ।

আরুণির অপঘাত মৃত্যুর হেতু তাহলে একটাই—সুইসাইড।

জয়ন্ত এই পর্যন্ত এসে তদন্তে যবনিকা টানতে চেয়েছিল।

কিন্তু প্রশ্ন উঠল কশেরুকার ভাঙা হাড়টা নিয়ে। ডাক্তার বললেন—নিশ্চয় কেউ নীচ থেকে দু-পা ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়েছিল। ফলে কশেরুকার হাড় ভেঙেছে। অথচ মৃত্যুকালীন কষ্ট লাঘবের জন্যে গলা ঘিরে তুলোর প্যাড রেখেছিল আরুণি—তারপর ছিল দড়ি। মৃত্যুপথযাত্রীর পক্ষে এটুকু আরামের আয়োজন হাস্যকর সন্দেহ নেই, কিন্তু বিরল ঘটনাও নয়।

কেসটা তাহলে আত্মহত্যার।

কিন্তু পা ধরে টেনে কশেরুকার হাড় ভাঙল কে?

জানা গেল আরো একটা তথ্য। আরুণির ট্রাউজার্সের তলার দিকে গোড়ালির ঠিক ওপরে ভাঁজ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে সেখানে দেখা গেল পাটের ফেঁসো। অর্থাৎ দুটো পা শক্ত করে বেঁধে ছিল

কেউ। হয়তো হ্যাঁচকা টান দিয়ে কশেরুকার হাড় ভেঙে চম্পট দেওয়ার সময় খুলে নিয়ে গিয়েছে পায়ের দড়ি।

অদ্ভুত! অদ্ভুত! ঘাটে এসেও তরী ডুববে নাকি? আত্মহত্যার ফতোয়া দিয়ে ইনভেসটিগেশন শিকেয় তুলতে চেয়েছিল জয়ন্ত, কিন্তু...!

জেরার মুখে অবশ্য প্রকাশ পেয়েছিল কতগুলো চাঞ্চল্যকর সংবাদ।

আরুণি মদ ভালোবাসত। আর ভালোবাসত সুন্দরী মেয়ে। চরিত্রে সে ক্যাসানোভা। মদের চাট হিসেবে রূপসী নাহলে তার দিবস রজনী অন্ধকার। এহেন আরুণি প্রথমে ঝুঁকেছিল সুলতার দিকে। কিন্তু সুলতা ঝুঁকেছিল তপনের দিকে। তপনও চেয়েছিল সুলতাকে সুতরাং যথাসময়ে বিয়ে হয়ে গেল ওদের। বিয়ের পরেই একদিন স্টেজের মহড়ায় নাটকের পাট সংলাপের পরিবর্তে নিজস্ব সংলাপ ব্যবহার করল আরুণি। কদর্য ভাষার সংলাপ নিক্ষিপ্ত হল তপনের উদ্দেশ্যে।

কেলেঙ্কারি বেশিদূর এগোবার আগেই সুলতা স্বামীকে নিয়ে বেরিয়ে এল স্টেজ থেকে। পরের দিন সুলতার ফ্ল্যাটে গিয়ে তপনের কাছে ক্ষমা চেয়ে এল আরুণি। অকপটে বললে, ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে ব্যর্থতার জ্বালায় আর মদের নেশায় মাথা ঠিক রাখতে পারেনি সে।

তপন ভুলে গেল বিষয়টা। ভুলল না কেবল সুলতা। বললে—'ওগো, আমরা মেয়েরা পুরুষদের হাড় পর্যন্ত দেখে ফেলি। আরুণি মোটেই অনুতপ্ত হয়নি। তুমি কিন্তু সাবধানে থেকো বাপু!'

তপন ঘাবড়ে গিয়ে বলেছে—'কী করে থাকব বলো?'

'রিভলভারটা কোথায়?'

'স্টিল আলমারিতে। কেন?'

'কোমরে গুঁজে রেখো।'

'ধ্যাৎ! বিচ্ছিরি রকমের উঁচু হয়ে থাকে। নাটক লিখে লিখে তোমার কল্পনাশক্তি বিপজ্জনকভাবে বেড়ে গেছে দেখছি।'

মাসখানেক পরেই কিন্তু ঘটল ছোট্ট একটা ব্যাপার।

যে সময়ে নিজের ঘরে ঢোকার কথা নয়, সেই সময়ে হঠাৎ ঘরে এসে পড়েছিল তপন। ঢুকেই দেখল, কী আশ্চর্য। ওর ক্রিমের জার থেকে চুরি করছে আরুণি। আঙুলে তুলে তুলে রাখছে নিজের জারে।

অভাবনীয় দৃশ্য। প্রথমে থতমত খেয়েছিল আরুণি।

পরক্ষণেই বলেছে সপ্রতিভভাবে—'কিছুতেই মেক আপ উঠছে না আমার ক্রিমে। তাই তোমার ক্রিম নিয়ে একটু 'ট্রাই' করছিলাম, বলে, তপনের মন্তব্য শোনার আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল আরুণি।

ফ্ল্যাটে ফিরে সুলতাকে ক্রিম বৃত্তান্ত জানাল তপন। বলল—'আরুণির মাথায় ছিট আছে।

'তাই কি?' ভুরু কুঁচকে ভারি মিষ্টি করে বললে সুলতা। 'অতই যদি ওর ক্রিমের ওপর লোভ তো জারটা ওকে দিয়ে দিও। আমি তোমার জন্যে ক্রিমের শিশি কিনে এনেছি। এই দ্যাখো।'

নতুন ক্রিমটা বাস্তবিকই উঁচুদরের। সুতরাং বিনা দ্বিধায় সেইদিন থেকেই বাতিল হয়ে গেল পুরোনো ক্রিমের শিশি। দিন কয়েক পরে হঠাৎ ক্যাসনোভা বললে—'ধুত্তোর, আমার ক্রিমটা গেল ফুরিয়ে, তপনদা, একটু ক্রিম ধার দেবেন?'

তপন উদার গলায় বললে—'ধার কেন, একেবারেই দান করছি। এই নাও! তোমার সুলতাদি আমাকে একটু নতুন শিশি এনে দিয়েছে' বলে, পুরোনো ক্রিমের জারটা চালান করে দিল ক্যাসানোভাকে।

ক্রিম পেয়ে ক্যাসানোভা তো মহা খুশি। দামি দামি ক্রিম ছাড়া আজেবাজে ক্রিম ব্যবহারের বিরোধী সে। কারণ, তার একজিমা। থুতনির ঠিক তলায় বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে বিশেষ এই চর্মরোগটিতে অনামী ক্রিম লাগাতে চায় না বলেই এত খুঁতখুঁতে সে!

ক্রিমের ব্যাপার মিটল এখানেই। ইতিমধ্যে আবার একটা কেলেঙ্কারি ঘটল স্টেজের পেছনে—পর্দার অন্তরালে।

মেয়েঘটিত কেলেঙ্কারি। মূলে সেই একজনই—লম্পট আরুণি!

ক্যাসানোভা রোমান্টিক অভিনয়ে বিখ্যাত। চেহারাটিও তার লেডি কিলার টাইপের। রীতিমতো রোমিও রোমিও একহারা ছিপছিপে চেহারা। মাথাভরা ঢেউ খেলানো চুল। নাক-মুখ চোখা চোখা, বুদ্ধিদীপ্ত। রং সাহেবদের মতো টকটকে লাল। ক্যাসানোভা চরিত্রকে সে জীবন্ত করেছিল শুধু চেহারার রোমান্স দিয়ে।

চেহারা যার রোমান্টিক তার অন্তরেও রোমান্স থাকা স্বাভাবিক। রোমান্স-সরোবরে হিল্লোল জাগিয়েছিল থিয়েটারেরই একটি মেয়ে। ক্যামেলিয়া। ক্যামেলিয়া যিশুর উপাসক। কিন্তু আচারে আচরণে তা বোঝা মুশকিল। ক্যামেলিয়া ফর্সা নয়—কালো। কিন্তু কালোবরণ মেয়ে যে চোখ জুড়োতে পারে, ক্যামেলিয়া তার প্রমাণ। তার পদ্মদীঘির মতো টলটল চোখ, ঢলঢলে মুখশ্রী আর কলকলে কণ্ঠস্বর শুনে প্রেক্ষাগৃহ মুহুর্মুহু করতালিতে ফেটে পড়ে, পুরুষরা মোহিত হয়, নারীরা ঈর্ষান্বিত।

সেই ক্যামেলিয়াকে সহসা স্টেজের পেছনে দড়ির গাদায় ফেলে আরুণি...ক্যামেলিয়ার কোমল তনু ননী দিয়ে গড়া নয়। আরুণির কবল থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসতে দেরি লাগেনি। ক্ষতির মধ্যে ব্লাউজটা একটু ছিঁড়ে গিয়েছিল। আর এগোতে পারেনি আরুণি।

সমস্ত ব্যাপারটা ঘটল অতি নিঃশব্দে। ঠিক সেই সময়ে সুলতা এসে পড়ে সেখানে। আঁচল দিয়ে বুক ঢেকে হাঁপাতে হাঁপাতে ক্যামেলিয়া তখন বেরিয়ে আসছে অন্ধকারের মধ্যে থেকে। পেছনে টলমলায়মান আরুণি—দুই হাত তখনো সামনে প্রসারিত—মুখে মদের গন্ধ। সুলতাকে দেখেই যেন জোঁকের মুখে নুন পড়েছিল। সুট করে উধাও হয়েছিল আরুণি।

উনিশ বছরের সদ্যফোটা ক্যামেলিয়া তখন কেঁদে ফেলেছিল সুলতার কাঁধে মাথা রেখে। সুলতা চেয়েছিল ব্যাপারটা থিয়েটার কর্তৃপক্ষের কানে তোলা হোক। পাঁচ কান হোক এবং আরুণিকে বিদেয় করা হোক। সে থাকতে এ-থিয়েটারে নারীর ইজ্জৎ অক্ষুণ্ণ রাখা অসম্ভব।

ক্যামেলিয়া কিন্তু রাজি হয়নি। বলেছে—'না সুলতাদি, কেলেঙ্কারি বাড়িয়ে লাভ নেই। কেলেঙ্কারিতে মেয়েরা পুড়ে মরে, পুরুষদের গায়ে আঁচ লাগে না।' কথাটা সত্যি।

জয়ন্ত প্রশ্ন তুলেছিল—'বেশ তো, ধরা যাক, আরুণি সুইসাইড করেনি, মার্ডাড হয়েছে। কিন্তু কেন? বিনা লাভে কেউ মানুষ খুন করে না। আরুণিকে খুন করে কার কী স্বার্থসিদ্ধি হচ্ছে, তা দেখা যাক।'

কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরোলো তখনি।

আরুণির ব্যাঙ্ক ব্যালান্স নেহাত কম ছিল না। অকৃতদার নায়কের তহবিল কখনো শূন্য থাকে না। মা কমলা যেন ঝাঁপি ভরে টাকা দিয়েছিলেন তাকে। আরুণির মৃত্যুতে এ-টাকা পাচ্ছে তার একমাত্র ভাই অরণ্যকুমার।

অরণ্যকুমার থাকে দার্জিলিংয়ে। বহুবার বিদেশ সফর করেছে সে। সারা পৃথিবী নাম জানে তার। সেতারের জাদুকর অরণ্যকুমার যে-ছবিতে মিউজিকের ভার নেয়, তা সুপারহিট করে।

আরুণির মতো সে মদ বা মেয়েমানুষের ভক্ত নয়। কিন্তু তবুও তার ভাঁড়ার শূন্য। অর্থ সঞ্চয় করা তার কোষ্ঠিতে লেখেনি। কারণ আর কিছুই নয়—মানুষটা অসম্ভব খামখেয়ালী। নিত্য নতুন উদ্ভট খেয়ালের পেছনে টাকা উড়িয়ে সে ফতুর। তার ওপর অতিরিক্ত মাত্রায় দুর্মুখ। ফলে মিউজিক ডিরেকশনের অফার নিয়ে কেউ চৌকাঠ মাড়াচ্ছে না ইদানীং। দায়িত্বজ্ঞানহীনও বটে। দু-দুটো ছবির মিউজিক অর্ধেক শেষ করে সে-নাকি গা ঢাকা দিয়েছিল হিমালয়ের অন্য অঞ্চলে। আরুণি ইহলোক ত্যাগ করেছে, এ-খবর তাকে জানানো হয়েছিল টেলিগ্রাম মারফৎ। জবাব এল ফিরতি টেলিগ্রাম। অদ্ভুত সেই টেলিগ্রামের বাংলা মানে এই,

উল্লসিত হলাম। অনেক মাসের প্রতীক্ষা সফল হল। সত্যিই কি আত্মহত্যা? খবরদার আমাকে যেন বিরক্ত করা না হয়।

অরণ্যকুমার

জয়ন্ত যথাসময়ে জেরা করেছিল তাকে। জিগ্যেস করেছিল সৃষ্টিছাড়া এই টেলিগ্রামের প্রকৃত অর্থ কী? কেন সে ভায়ের মৃত্যুতে এত উল্লসিত? অরণ্যকুমার জানিয়েছিল, শুধু সেতার দিয়ে একটা অভিনয় প্রোগ্রাম মঞ্চস্থ করতে চেয়েছিল সে। টাকা চেয়েছিল আরুণির কাছে, পায়নি। জয়ন্ত তখন বলেছিল, এর পরিণাম কিন্তু খুব খারাপ। পুলিশ তাকেই সন্দেহ করছে ভাই-ঘাতক হিসেবে। শুনে বিষম কৌতুক অনুভব করেছিল অরণ্যকুমার। শুধু জিগ্যেস করেছিল—আরুণির টাকাগুলো কবে নাগাদ পাওয়া যাবে?

রাগে ফুলতে ফুলতে ফিরোজা থিয়েটারে ফিরে এসেছিল জয়ন্ত। তখনি জানতে পেরেছিল, ক্যামেলিয়ার ওপর বলাৎকারের গোপন সংবাদ।

খটকা লেগেছিল জয়ন্তর মনে। তবে কি প্রিয়তমার ওপর বলাৎকারের প্রতিশোধ নিয়েছে ক্যাসানোভা? কিন্তু কী করে?

এর দুদিন পরেই সুলতার পীড়াপিড়িতে আর্যমতে ক্যাসানোভার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল ক্যামেলিয়ার।

বিয়ের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে খুন হতে হতে বেঁচে গেল সুলতা।

ক্যামেলিয়া বলেছিল—সুলতাদি, বিয়ের ইচ্ছে তো দুজনেরই। কিন্তু দুজনেই পিছিয়ে যাচ্ছি দুটো কারণে।'

'যথা?' জিগ্যেস করেছিল সুলতা।

ক্যামেলিয়া যদি ফর্সা হত, তাহলে কথাটা বলতে গিয়ে আরক্ত হত। কালো বলে হল বেগুনি। আঁচলের খুঁট আঙুলে জড়াতে জড়াতে বলল—'কি-ই বা বয়স আমার। এই সময়ে বাচ্চাকাচ্ছা হওয়া মানেই কেরিয়ার নষ্ট হওয়া।' হেসে ফেলল সুলতা—'এই ব্যাপার! একেবারেই ছেলেমানুষ তুমি। ওটা কোনও ওজোর নয়। বাচ্ছা না চাইলে হবে কেন?'

'কিন্তু—'

'আবার কিন্তু কি?'

'ক্যাসানোভার শরীর মোটেই ভালো যাচ্ছে না।'

'একজিমা বেড়েছে বলে?'

'না না। দিনকে দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে, চোখে অন্ধকার দেখছে একটু পরিশ্রম করলেই, পেটের অসুখ তো লেগেই রয়েছে।'

'ও সব হল ব্যাচেলারের রোগ। বিয়ের জল পড়লেই সেরে যায়,' বলে সস্নেহে ক্যামেলিয়ার চিবুক ধরে নেড়ে দিয়েছিল সুলতা।

বিয়ের পর পার্কস্ট্রিটের অভিজাত রেস্তোরাঁয় ম্যারেজ-ডিনার দিল ক্যাসানোভা। খানাপিনার টেবিলে বসে এই কথারই জের টেনে নিয়ে বললে সুলতা—'ক্যামেলিয়া বিয়ে করে এক ঢিলে দু-পাখি মারল।'

'পাখি দুটোর নাম?' শুধোলো তপন।

'ক্যাসানোভার কাহিল শরীর এবার ক্যামেলিয়া-টনিকে চাঙ্গা হয়ে উঠবে।'

'আর?'

'বর্বর দু'পেয়ে নারী শিকারিদের লোলুপ নজর ক্যামেলিয়ার ওপর আর পড়বে না।'

চামচ নামিয়ে রেখে মৃদুকণ্ঠে বললে ক্যাসানোভা—'আপনি আরুণির কথা বলছেন তো? সে তো আগেই মরেছে।'

টেবিল নিস্তব্ধ। তারপর বলল সুলতা—'তুমি কিছু বলেছো বুঝি ক্যাসানোভাকে?'

'স-ব,' দুষ্টু হেসে বলল ক্যামেলিয়া। 'না বললে পেট ফুলে মরেই যেতাম।' এমন ঢঙে কথাটা বলল ক্যামেলিয়া যে টেবিলের প্রত্যেকেই দুম করে ফেটে পড়ল দমকা হাসিতে। হাসতে হাসতে বললে সুলতা

—'আরুণির মৃত্যুটা যেন মাধ্যাকর্ষণের ত্রিশঙ্কুর-পাওয়া।'

'কথাটার মানে?'—খুক খুক করে হাসতে হাসতে শুধোলো ইন্সপেক্টর জয়ন্ত চৌধুরী। ভোজসভায় হাজির থাকতে বাধ্য হয়েছিল সে কর্তব্যের তাগিদে। সদ্য মরেছে একটা মানুষ, এর মধ্যেই বিয়ের এত ঘটা কেন বাপু?

সুলতা ঠোঁট উল্টে বললে—'মানে আবার কি? মাধ্যাকর্ষণের টানে আছাড় খেলে জানি ঘাড়ের হাড় ভাঙে। কিন্তু আরুণি মাধ্যাকর্ষণকে কলা দেখিয়ে শূন্যে ঝুলল ত্রিশঙ্কুর মতো, অথচ ঘাড়ের হাড়টি ভাঙল মট করে।'

'তবে হাড়টা ভাঙল কী করে? কড়িকাঠের ধাক্কায়? উল্টো মাধ্যাকর্ষণ নাকি?'

গম্ভীর ভাবে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল জয়ন্ত। এ প্রশ্নের জবাব তার জানা নেই। জানার সুযোগও পেল না। দুদিন পরেই হত্যাকারী হানা দিল সুলতার ফ্ল্যাটে।

তপন ফিরোজা থিয়েটারে গিয়েছে। সুলতা মার্কেট থেকে ফিরেছিল ফ্ল্যাটে। দরজা বন্ধ করে এক কাপ কফি বানাচ্ছে আর গুণ গুণ করে গান গাইছে। ফিরোজা থিয়েটারে তাকেও যেতে হবে এখুনি। এমন সময়ে দরজায় টক-টক-টক শব্দ হল।

অন্যমনস্কভাবে এক পাল্লার ফ্লাসডোর ঈষৎ ফাঁক করেছিল সুলতা। কিন্তু ফাঁকের মধ্যে দিয়ে কিছু দেখবার আগেই একটা হাত দেখা গেল। হাতে খানিকটা কালো কাপড়। চক্ষের নিমেষে সুলতার চোখে চেপে ধরল হাতটা। আর একটা হাত বেষ্টন করল কণ্ঠনালী। হাতের অধিকারী প্রবেশ করল ভেতরে এবং একইভাবে চোখ আর গলার ওপর যুগপৎ চাপ বৃদ্ধি করে চলল সর্বশক্তি দিয়ে। কোনওরকম শব্দ করতে পারল না সুলতা। বুঝল সে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। ফুসফুসটা বাতাসের অভাবে যেন ফেটে যাচ্ছে। পুরোপুরি অজ্ঞান হওয়ার আগে দরজার বাইরে শুনল মেয়েলি কণ্ঠের ডাক—'সুলতা আছো?' তারপর আর কিছু মনে নেই সুলতার।

জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর দেখল, সে শুয়ে আছে লাগোয়া বাথরুমে। গলায় বেশ ব্যথা। অতিকষ্টে দরজা পেরোলো সুলতা। শোবার ঘরে কেউ নেই। খাবার ঘর শূন্য। বসবার ঘরও তাই। তেপায়ার টুলটার ওপর জেডপাথরের কনফিউসিয়াসের মূর্তি চাপা ছোট্ট একটা চিরকুট ছাড়া ঘরের মধ্যে বেমানান কিছুই চোখে পড়ল না। চিরকুটটা তুলে নিল সুলতা। গোটা গোটা হরফে মেয়েলি ছাঁদে একটি মাত্র পংক্তিঃ

'সুলতা, নতুন নাটকের একটা কপি এনো। প্রকাশক চেয়েছে।

আখতার ফিরোজা থিয়েটারের পুরোনো নায়িকা। এখন ছোটখাটো পার্ট করে। স্বামীর বইয়ের কারবার। সুলতার সব নাটক বেরোয় ওইখান থেকেই।

জ্ঞান হারানোর ক্ষণ-পূর্ব ডাকটা মনে পড়ল। আখতারের গলাই বটে। হত্যাকারী ওই ডাক শুনেই ওকে টেনে নিয়ে গেছে বাথরুমে। আখতার দরজা খোলা দেখে ভেতরে এসেছে। শোবার ঘরে, খাবার ঘরে, বসবার ঘরে কাউকে না পেয়ে চিরকূট রেখে গেছে।

আচ্ছন্নের মতো খাবার টেবিলে বসে পড়ল সুলতা। কফি কাপটা টেনে নিল ঠোঁটের কাছে।

ফিরোজা থিয়েটারে ফোন এল তপনের নামে। ডাকছে সুলতা।

'কী ব্যাপার ডার্লিং?' উচ্ছল কণ্ঠে বলল তপন।' 'এত দেরি কেন?'

ক্লান্ত কণ্ঠে বলল সুলতা—'ওগো, আমাকে কফির মধ্যে বিষ খাইয়ে মারবার চেষ্টা চলছে। তুমি তাড়াতাড়ি এসো।'

তীব্র অ্যাকোনাইট মিশানো ছিল কফির কাপে। রাসায়নিক পরীক্ষায় ধরা পড়ার অনেক আগেই স্বাদের তারতম্য থেকে সন্দেহ হয়েছিল সুলতার। কফির কাপ ঠোঁটের কাছে টেনে নিয়ে ভাবছিল—হাতে পেয়েও তার ধড়ে প্রাণটা রেখে গেল কেন হত্যাকারী? দয়া? উঁহু! নিশ্চয় অন্য পন্থায় নিকেশ করার আয়োজন করে গেছে। কফির কাপে বিষ মিশিয়ে দিয়ে যায়নি তো? গরম কফির কাপ টেবিলেই ছিল কিনা...

চুমুক দেয়নি সুলতা। আঙুলে করে এক ফোঁটা নিয়ে জিভের ডগায় রেখেছিল। চিন চিন করে উঠেছিল স্বাদ-সচেতন রসনা-কেন্দ্রগুলো। এ-স্বাদ তার প্রিয় কফির স্বাদ নয়। একটু তফাৎ আছে।

তাই বেঁচে গেল সুলতা।

কিন্তু ধনেপ্রাণে মারা পড়ার উপক্রম হল জয়ন্ত বেচারী। একি ফ্যাসাদ! একটা খুনের (!) নিষ্পত্তি হতে না হতেই আবার একটা খুনের প্রচেষ্টা! তবে কি আরুণি সত্যিই নিহত হয়েছে? সুলতা হয়ত জানে হত্যাকারীর পরিচয়—তাই তার মুখ বন্ধ করার জন্যেই বিষ নিয়ে হত্যাকারী ফের নেমেছে হত্যার আসরে? কে সেই হত্যাকারী? আখতার? কিন্তু হত্যার চেষ্টা করে কেউ চিরকুট রেখে নিজের নাম লিখে ঘোষণা করে যায়? ধুত্তোর! ঠিক এই সময়ে আরও একটা কথা মনে পড়তেই মাথা ঘুরে গেল জয়ন্তর। আখতারের ড্রেসিংরুমে নেমবুটাল ভর্তি শিশি থাকত। কারণ নিদ্রাহীনতা ছিল তার ক্রনিক ব্যাধি। আরুণির অপঘাত-মৃত্যুর কিছুদিন আগে নেমবুটাল ভর্তি শিশিটা চুরি গিয়েছিল তার ঘর থেকে। আরুণির মৃত্যু হওয়ার পর জানা গেল, তার জিনের বোতলে মেশানো ছিল নেমবুট।

আসলে হয়তো আদৌ চুরি যায়নি শিশিটা—সন্দেহের আওতা থেকে রেহাই পাবার জন্যেই সাফাই গেয়েছে আখতার!

কিন্তু আখতার খুন করবে কেন? প্রৌঢ়ার ওপরেও কি নজর দিয়েছিল লম্পট আরুণি?

আরও দুদিন পর সাংঘাতিক একটা কাণ্ড ঘটল ফিরোজা থিয়েটারে। জোর কদমে রিহার্সাল চলছে। তপন দোতলায় নিজের ঘরে স্বরলিপি ওলটাচ্ছে। এমন সময়ে পাংশুমুখে উঁকি দিল ক্যামেলিয়া—'ওকে দেখেছেন?'

'কাকে? ক্যাসানোভাকে?'

'হ্যাঁ। শরীরটা খারাপ করছে বলে হঠাৎ কোথায় যে গেল!'

'শরীর খারাপ ছিল? তাহলে বাড়ি গিয়েছে।'

'না, না। বাড়ি যাওয়ার হলে আমাকে বলত। দুজনের একসঙ্গেই যে বাড়ি ফেরার কথা।' বলতে বলতে ক্যামেলিয়া কেঁদে ফেলে আর কি। 'তপনদা ও কোথায় গেল?'

ক্যামেলিয়ার ভীতির কারণ অনুমান করা যায়। আরুণির রহস্যজনক মৃত্যুর এখনো কিনারা হয়নি। অথচ সুলতার প্রাণ নিয়ে টানাটানি আরম্ভ হয়ে গেছে। আবার মরণের ডংকা বাজায়নি তো হত্যাকারী? এবার হয়তো ক্যাসানোভার প্রাণ—

উঠে পড়ল তপন। উদ্বিগ্ন ক্যামেলিয়াকে নিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজল সারা ফিরোজা থিয়েটার। না, ক্যাসানোভা ফটক পেরোয়নি। অথচ থিয়েটারেও নেই। তবে গেল কোথায়? হনুমানের মতো ছাদ থেকে লম্ফ দিয়ে চম্পট দেয়নি তো?

শেষের সম্ভাবনাটা এসেছিল জয়ন্ত গোয়েন্দার উর্বর মগজে। থিয়েটারেই হাজির ছিল সে নতুন কোনও সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টায়। ছাদ থেকে লম্ফ প্রদানের সম্ভাবনাটা মাথায় আসতেই খেয়াল হল, সব দেখা হয়েছে—শুধু ছাদটা দেখা হয়নি।

ছুট! ছুট! ছুট! জিরাফ-দৌড় দৌড়ে লম্বা লম্বা লাফ মেরে লোহার মই পেরিয়ে ছাদে পৌঁছোলো জয়ন্ত তপন আর ক্যামেলিয়া।

আরুণির ঘরের কড়িকাঠ ফুঁড়ে উঁচু স্কাইলাইট আর লিফট-এর কলকব্জা ঢাকা ছোট্ট শেডটার মাঝামাঝি জায়গায় মুখ থুবড়ে শুয়েছিল সুদর্শন ক্যাসানোভা। হাত কয়েক দূরে খানিকটা বমি। সারা দেহে কোনও চোট নেই। দেহে প্রাণ নেই। শুধু একটু ফিকে বিস্ময় লেগে আছে রোমান্টিক মুখে।

ক্যামেলিয়া ফিট হয়ে গিয়েছিল। প্রাণহীন আর জ্ঞানহীন দুটি দেহকে লোহার মই বেয়ে নীচে নামানো হল অতি কষ্টে। জয়ন্ত বিদ্যুৎবাতির নীচে দেখল, ক্যাসানোভার জিভ অস্বাভাবিক ফোলা, চোখের পাতাও লাল

এবং ফুলো, হাতের চেটো কর্কশ এবং খড়িওঠা আঙুলের নখ ঘিরে সাদা পাটি। একজিমা থুৎনির নীচ থেকে ছড়িয়ে পড়েছে দুই গালে।

আর্সেনিক পয়জনিং। একদিনের বিষক্রিয়া নয়—দীর্ঘদিনের। সবক'টা লক্ষণই তাই। বিশেষ করে চর্মরোগ। অথচ আগে একজিমা থাকায় অতটা গা দেয়নি ক্যাসানোভা। যদি দিত, চর্মরোগের অকস্মাৎ বিস্তার নিয়ে যদি ডাক্তার কনসাল্ট করত, তাহলে প্রাণটা বেঘোরে যেত না। বেচারা!

সন্দেহ এসে পড়ল ক্যামেলিয়ার ওপর। এ-ধরনের মেয়েরা সব পারে। স্ত্রী ছাড়া খাবারে বিষ মেশাবে কে? ঘেয়ো স্বামীকে বোধহয় মনে ধরেনি। তাই—

সুতরাং ভানুমতীর খেল নিয়ে অর্ধোন্মাদ জয়ন্ত গোয়েন্দা একজন ছোটখাটো গোয়েন্দা মোতায়েন করল ক্যামেলিয়ার পেছনে। তারপর চলে এল আমার ডেরায় ইন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হয়ে। জরুরি অবস্থায় যোগাযোগের জন্যে আমার টেলিফোন নাম্বার দিয়ে এল ক্ষুদে গোয়েন্দাকে।

শুধু সেই জন্যেই বেঁচে গেল একটা প্রাণ!

এই পর্যন্ত ধৈর্য সহকারে শ্রবণ করেছিল ইন্দ্রনাথ রুদ্র। এমন শান্ত সুন্দর স্বপ্নিল চোখে তাকিয়ে সিগারেট টানছিল যে মনে হচ্ছিল যেন কালিদাস, শেক্সপীয়ার, রবীন্দ্রনাথ একযোগে ভর করেছেন তার কল্পনাকেন্দ্রে। সবশেষে উদাস গলায় অবতারণা করেছে টিকটিকি প্রসঙ্গ। টিকটিকিটা ছাদের স্কাইলাইট দিয়ে এসে, কড়িকাঠ বরাবর হাঁটছিল।

ইন্দ্রনাথ তখন বলেছিল, টিকটিকিটাকেই যদি হত্যাকারীর হাত কল্পনা করা যায়, তাহলেই তো সমাধান হয়ে যায় হত্যা রহস্যর।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বিকট বিশ্রী গলায় চেঁচিয়ে জানতে চেয়েছিল জয়ন্ত গোয়েন্দা— 'কীভাবে? কীভাবে? কীভাবে?'...

চেঁচামেচিতে বোধহয় ভড়কে গিয়েই অথবা ঘরের বাতাস অপছন্দ হওয়ায় ঠিক সেই মুহূর্তেই সুড়ুৎ করে স্কাইলাইট দিয়ে উধাও হয়েছিল টিকটিকিটা। ইন্দ্রনাথ সেইদিকে আঙুল তুলে বলেছিল— 'ওইভাবে।'

শুনে চেঁচাতেও ভুলে গেল জয়ন্ত গোয়েন্দা। পুলিশী হুংকার বিস্মৃত হয়ে অসহায়ের মতো চাইল কবিতার দিকে, আমার দিকে। নীরবে যেন বলতে চাইল—দ্যাখো, তোমাদের ইন্দ্রনাথের ফচকেমিটা দ্যাখো। মরছি নিজের জ্বালায়, এখন কি ইয়ার্কি করবার সময়।

কবিতার শিরদাঁড়া কিন্তু সিধে হয়ে গিয়েছিল টিকটিকির দিকে ইন্দ্রনাথ আঙুল তুলতেই। অক্ষম লেখক স্বামীর এই সক্ষম গোয়েন্দা বন্ধুটিকে সে চেনে। ও জানে, প্রগলভ ইন্দ্রনাথ যখন সহসা দুর্বোধ্য হয়ে যায়, নিজেই একটা ধাঁধা হয়ে যায়, তখনি বুঝতে হবে ওর ভেতরের ধাঁধা আর ধাঁধা নেই—সরল হয়ে গিয়েছে।

কন্দর্পকান্তি ইন্দ্রনাথ রুদ্রর ওপর তাই অবিচল আস্থা আর অপরিসীম ভক্তি আমার গৃহিণীর। বাইরে কিন্তু বিরাম নেই খুনসুটির। সম্পর্কটি ভারি মধুর, আমার বেশ লাগে ওদের কপট কলহ দেখতে।

ইন্দ্রনাথের টিকটিকি-ধাঁধা শুনেই তাই মুখিয়ে উঠল আমার সুন্দরী বধূ। ডাগর চোখ ঘুরিয়ে গোল মুখ আরও গোল করে যেন তুবড়ি ফোটালো শাণিত রসনায়—'ঠাকুরপো, তুমি মার্চ মাসে জন্মেছো নিশ্চয়? ওই সময়ে রবি মীন চিহ্নে ছিল নিশ্চয়?'

হকচকিয়ে গেল ইন্দ্রনাথ—'কেন? কেন? কেন?'

জিভের মোচড় দিয়ে অদ্ভুতভাবে ভেংচে বললে কবিতা—'কেন? কেন? কেন? কেন? ওই সময়ে যারা জন্মায়, তারা মদ আর মাদক দ্রব্যে অত্যন্ত আসক্ত হতে পারে। তা কি মহাশয়ের জানা নেই?'

'কিন্তু—'

'কিন্তু আবার কি?' তেড়ে উঠল কবিতা—'কোকেন গাঁজার নেশা না থাকলে এই রকম একটা সিরিয়াস মোমেন্টে টিকটিকি নিয়ে অর্বাচীনের মতো কেউ কথা বলে?'

'আরে বউদি,' অসহায় কণ্ঠস্বর ইন্দ্রনাথের—'সমস্যার সমাধান তো গল্প শুনতে শুনতেই করে ফেলেছি। তাই—'

'তাই বিভ্রান্ত জয়ন্ত ঠাকুরপোকে আরও বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছ? দর বাড়াচ্ছো, না?'

'কি মুশকিল! কি মুশকিল!'

'মুশকিল আসান তো তোমার হাতেই বন্ধু,' গৃহিণীর হাতে বন্ধুবরের নাকানি-চোবানির দৃশ্য দেখে ব্যঙ্গ কণ্ঠে বললাম আমি—'আরুণি যদি নিহতই হয়ে থাকে তো হত্যাকারীর নামটা বলে দিলেই তো ল্যাটা চুকে যায়।'

'ধাঁ করে যদি বলেই দিলাম, তাহলে সাসপেন্স রইল কোথায়?'

'আইভরি থাকলে কিন্তু তখন তর সইত না,' টিটকিরি দিল কবিতা।

আইভরি মানে মিস আইভরি লাহা। ইন্দ্রনাথ রুদ্রর সুযোগ্যা সহকারিণী।

'শার্লক হোমস ক্লাব' মামলায় তার আবির্ভাব ঘটেছিল বিপুল বিস্ময়, কৌতুক আর রহস্যের মধ্যে দিয়ে। এক খোঁচাতেই কাজ হল।

দু-হাত মাথার ওপর তুলে বলল ইন্দ্রনাথ—'আর না, বউদি, সারেন্ডার করছি। হত্যাকারীর নাম—

ঠিক সেই সময়ে ঝন ঝন করে বাগড়া দিল টেলিফোনটা। খপাং করে রিসিভার তুলল কবিতা, ধরন দেখে মনে হল রিসিভার ছুঁড়ে মারতে পারলেই বাঁচে তারের অপর প্রান্তের মানুষটিকে।'

'কাকে চাই? জয়ন্ত চৌধুরীকে? আছেন।'

লাফিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলল জয়ন্ত। মিনিটখানেক পরে নামিয়ে রাখল। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে অদ্ভুত স্বরে —'আমার টিকটিকির ফোন। ক্যামেলিয়ার পেছনে গিয়েছিল ন্যাশানাল লাইব্রেরির রিডিং রুমে। ক্যামেলিয়া সেখানে বিষবিজ্ঞানের বই নিয়ে আর্সেনিক পয়জনিংয়ের চ্যাপ্টার খুলে পড়ছে। আশ্চর্য! ক্যামেলিয়ার মতো মেয়ে মানুষ খুন করে?'

'মেয়েরা সব পারে', সুযোগটাকে লুফে নিয়ে কবিতার দিকে অপাঙ্গে তাকিয়ে যেন শোধ তুলল ইন্দ্রনাথ। 'ওরা দেবী হতে পারে, দানবীও হতে পারে।'

শ্লেষটা দাগ কাটল না কবিতাকে। বিমূঢ়কণ্ঠে ও বললে—'ক্যামেলিয়া? দুদিন যেতে না যেতেই নিজের হাতে বরণ করল বৈধব্য?'

পা নাচাতে নাচাতে বললে ইন্দ্রনাথ—'বলিহারি যাই মেয়েদের বুদ্ধিকে। বউদি, সাসপেন্স কিন্তু শেষ হল না—সবে শুরু হল।'

'আবার সাসপেন্স!'

'কী করি বলো। আমি নিরুপায়। জয়ন্ত জিপ এনেছিস?'

'কেন?'

'আর একটা খুন ঠেকাতে হবে।' বলতে বলতে গম্ভীর হয়ে গেল ইন্দ্রনাথ। তপন-সুলতার টেলিফোন নাম্বার জানা আছে?'

'আছে।'

'ডায়াল কর...কে ধরেছে?' বলতে বলতে সর্বাঙ্গ টানটান হয়ে উঠল ইন্দ্রনাথের।

রিসিভার নামিয়ে বলল জয়ন্ত—'একটু আগে একটা চিরকুট এসেছিল তপনের নামে। চিরকুটে বলা হয়েছে অমুক ঠিকানায় যেন এক্ষুনি চলে আসে তপন।'

'কে বলেছে?'

'জয়ন্ত চৌধুরী।'

'জয়ন্ত চৌধুরী! মানে জাল চিঠি। তুই তো এখানে,' বলতে বলতে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল ইন্দ্রনাথ। চুল খামচে ধরে বললে—'কি গাধা আমি! খামোকা সময় নষ্ট করলাম এতটা! এখুনি না বেরোলে সর্বনাশ হয়ে

যাবে। ঠিকানাটা মনে আছে?'

'আছে।'

'চল।'

দুড়দাড় করে দুই বন্ধু নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

ঠিকানায় যথাসময়ে পৌঁছোল দুজনে।

বাড়িটা ন্যাশনাল লাইব্রেরীর ধারে কাছেই। নির্জন পাড়া। বাড়িটা দোতলা। একতলায় থাকে একটা পাঞ্জাবি পরিবার।

হুড়মুড় করে দোতলায় উঠল দুই গোয়েন্দা। ফ্ল্যাটের দরজায় তালা ঝুলছে বাতাস শুঁকে বলল জয়ন্ত —'হ্যারে, এ যে গ্যাসের গন্ধ!'

'তুই বাতাস শুঁকবি না, দরজা ভাঙবি?' খেঁকিয়ে উঠল ইন্দ্রনাথ। উৎকণ্ঠায় মেজাজ তিরিক্ষে হলে যা হয় আর কি।

জয়ন্ত দরজার পাল্লার দিকে চেয়ে বললে—'মজবুত দরজা রে। তার চাইতে তালাশুদ্ধ কড়া উপড়ে আনা যাক।'

বলে, জিপ থেকে হাতখানেক লম্বা একটা লোহার রড নিয়ে এল সে। কড়ায় ঢুকিয়ে সামান্য চাড় দিতেই খসে পড়ল কড়া।

নিস্তব্ধ ঘরগুলো যেন নিঃশব্দে হেসে উঠল ওদের উদভ্রান্ত মুখচ্ছবি দেখে। কোনও ঘরে কেউ নেই।

অথচ তীব্র হয়েছে গ্যাসের গন্ধ। বাকি ছিল একটা ঘর। রান্নাঘর। শেকল খুলে ভেতরে ঢুকতেই পাওয়া গেল তপনকে জ্ঞানহীন, কিন্তু তখনো প্রাণহীন নয়।

গ্যাসের চাবি বন্ধ করে দরজা জানলা খুলে দিল ইন্দ্রনাথ। পাখা চালিয়ে দিয়ে জল ছিটে দিতেই চোখ মেলল তপন। বলল তার আহাম্মকের মতো আচরণ বৃত্তান্ত। জয়ন্ত চৌধুরীর হস্তলিপির সঙ্গে তার পরিচয় ছিল না। তবুও শমন পেয়ে ছুটে এসেছিল এই ঠিকানায়। কারণ আর কিছুই নয়। ঠিকানাটি তার পরিচিত। সঙ্গে এনেছিল রিভলভার।

ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। ঢুকতেই পেছন থেকে ডাণ্ডা পড়ল মাথায়। তারপর আর কিছু মনে নেই।

রিভলভারটা? নেই। কোমরে নেই, ঘরের কোথাও নেই। যাওয়ার সময়ে হত্যাকারী নিয়ে গেছে হত্যার আর একটা হাতিয়ার।

ঘড়ির দিকে তাকিয়েই চমকে উঠল তপন—'সর্বনাশ! আজকে যে আমাদের শো শুরু হচ্ছে। ইন্টারভ্যালের পর থেকেই যে পিয়ানোয় বসতে হবে আমাকে।'

'এই অবস্থায়?' চটে গিয়ে বললে জয়ন্ত। 'প্রাণটা ফিরে পেয়েছেন স্রেফ ইন্দ্রনাথের বুদ্ধির জোরে। এখনো টলছেন আপনি। এখন বাজনা আসবে?'

'আসবে।' গোঁয়ারের মতো দরজার দিকে টলতে টলতে এগিয়েছে তপন। 'আজকের প্রথম 'শো'য়ে হাজির আমাকে থাকতেই হবে।'

'শো' আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। চাপা উত্তেজনায় থমথম করছে ফিরোজা থিয়েটার গ্রীনরুম। তপন এখনও আসেনি।

ইন্টারভ্যাল হয়ে গেল। তবুও তপন এল না। নিঃসীম শংকায় ছেলেমানুষের মতো কেঁদে ফেলল সুলতা। থিয়েটার কর্তৃপক্ষ শংকিত হলেন অন্য আশংকায়। দর্শকরা চেয়ারগুলো আস্ত রাখবে কি তপনের মিউজিক না শোনার পর? এতদিন ধরে ফলাও করে বহু বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে তপনের নাম দিয়ে। এখন? কিন্তু তপন এল। পর্দা ওঠবার আগেই ঝড়োকাকের মতো সে এল। দুপাশে জয়ন্ত আর ইন্দ্রনাথ। ড্রেসিংরুমে গেল না। মেকআপও নিল না, এসেই বসল পিয়ানোয়। বিশাল হলঘর গমগম করে উঠল তার হাতের জাদুতে।

হারানো রিভলভারটা আবির্ভূত হল তার মিনিট কয়েক পরেই।

সহসা তপনের খেয়াল হল কোথায় যেন কী একটা গণ্ডগোল হয়েছে। ডাণ্ডার মার আর গ্যাসের বিষে মুমূর্ষু হয়েও সঙ্গীত-সুধায় সে চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল মিনিট কয়েকের মধ্যেই। আত্মবিস্মৃত হয়ে পিয়ানোর রীডের ওপর আঙুল চালনা করছিল ক্ষিপ্রবেগে।

আচম্বিতে ওর মনে হল সামনের সারির শ্রোতারা ঈষৎ উন্মনা হয়েছে। তাদের কান এখন পিয়ানোর দিকে নেই—সারি সারি চোখগুলো গেঁড়ির চোখের মতো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

সম্বিৎ ফিরতেই তপন দেখল বিস্ফারিত চোখগুলো তার দিকে নিবদ্ধ নয়—নিবদ্ধ তার পেছন দিকে।

সুতরাং কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে তাকিয়েছিল তপন নিছক কৌতূহল বশে। এক পলকে যা দেখল কাজ হল তাইতেই। পিয়ানো ছেড়ে ছিটকে গেল তপন। একলাফে মঞ্চ থেকে প্রেক্ষাগৃহ, সেখান থেকে দরজা। পিস্তল নির্ঘোষটা শোনা গেল দরজায় পৌঁছোনোর আগেই! আশ্চর্য! এ-রকম নাটকীয় কাণ্ডর পর হট্টগোলে ফেটে পড়া উচিত ছিল প্রেক্ষাগৃহ। কিন্তু যুগটা নিওরিয়ালিজম-এর। নাটকটিও নতুন। সুতরাং দর্শক সাধারণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভাবল পিয়ানো ছেড়ে চম্পট দেওয়াটা বোধ হয় নাটকেরই অঙ্গ। ভাবল, নতুন চমক। অনেকে তো শতমুখে তারিফ করার জন্যে যুৎসই বুলি সাজাতে আরম্ভ করে দিল মনের মধ্যে।

কিন্তু সামনের সারির দর্শকরা ভ্যাবাচাকা খেয়ে ভাবল—তাইতো! এ আবার কি ধরনের নিওরিয়ালিজম! সিরিয়াস মুহূর্তে একী ছন্দপতন! তারা যে স্বচক্ষে দেখেছে রিভলভারটাকে পেছনের উইংসের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসতে। দেখেছে নলচের মুখে আগুন—শুনেছে ফায়ারিংয়ের পিলে চমকানো আওয়াজ।

বেশি কিছু বোঝবার আগেই পর্দা নেমে এসেছিল হুড়মুড় করে। বিদ্যুৎবেগে মঞ্চে আবির্ভূত হয়েছিল দুই গোয়েন্দা—ইন্দ্রনাথ আর জয়ন্ত। রিভলভার সমেত গ্রেপ্তার করেছিল—

ক্যামেলিয়াকে!

তপন? না, মরেনি। আহতও হয়নি। আনাড়ির বুলেট তাকে স্পর্শও করেনি।

নাটক আবার শুরু হয়েছিল। তপন ফের বসেছিল পিয়ানোর সামনে।

মৌজ করে সিগারেট সেবন করতে করতে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলেছিল ইন্দ্রনাথ—'ওহে সরকারি টিকটিকি, ক্যামেলিয়াকে যেন আরুণি-নিধন আর স্বামীবধের অপরাধে নির্যাতন কোরো না। দুদিনের মধ্যে বিধবা হয়েছে বেচারা, পাগল হতে বেশি দেরি নেই।'

আমতা আমতা করে বলেছিল জয়ন্ত—'মাই ডিয়ার ইন্দ্রনাথ, ক্যামেলিয়া কিন্তু তপনকে খুন করবার চেষ্টা করেছিল ডাণ্ডা মেরে, গ্যাস দিয়ে আর গুলি করে।'

'তাতো করবেই।' বলে আর দাঁড়ায়নি ইন্দ্রনাথ। ঊর্ধ্বশ্বাসে উধাও হতে হতে শুধু বলেছে—'ভানুমতীর খেল-এর ঐন্দ্রজালিকের নামটি যদি জানতে চাও কাল সকালে এসো মৃগাঙ্কর বৈঠকখানায়। কফি আর মাছের কচুরির নেমন্তন্ন রইল। আর হ্যাঁ, সঙ্গে আনবে তপন আর সুলতাকে।'

মাছের কচুরীর পাহাড় বানিয়ে ফেলেছিল গৃহিণী। একদা বোম্বাই বাসিনী কোটিপতির দুহিতা যে পাচকশালায় প্রবেশ করলে ইন্দ্রের শচী হয়ে যায়—তা যে-না মাছের কচুরি চেখেছে, সে বুঝবে না।

উদগার তুলে হট কফিতে চুমুক দিল তপন। শুধোলো—'এবার বলুন ইন্দ্রনাথবাবু, আরুণিকে খুন করেছে কে?'

'আপনি', বলে কাঁচির নতুন প্যাকেট ছিঁড়ল ইন্দ্রনাথ।

ঠং করে একটা শব্দ হল। কাপ নামিয়ে রেখেছে তপন। চোয়ালটা শিথিল হয়ে ঝুলছে অদ্ভুতভাবে। আর, সুলতা অস্ফুট চিৎকার রোধ করার জন্যে হাত চাপা দিয়েছে মুখে।

ধীরেসুস্থে প্যাকেট ছিঁড়ল ইন্দ্রনাথ। দেশলাইয়ের খোলে ঠকঠক করে ঠুকল সিগারেটের প্রান্তদেশ। ঠোঁটে ঝুলিয়ে অগ্নিসংযোগ করল অপর প্রান্তে। বলল এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে—'আপনাদের অনেকেরই বিশ্বাস মিঠে চেহারার ওই ক্যামেলিয়াই এতগুলি খুনের নায়িকা। বিশেষ করে তাকে যখন হাতে-নাতে ধরা গেছে তপনবাবুকে খুন করার প্রচেষ্টায়। ঠিক কিনা?'

'দুবার,' শুকনো গলায় বলল তপন, 'দুবার সে চেষ্টা করেছিল আমাকে প্রাণে মারবার।'

'খুব একটা অন্যায় করেনি। ও আপনাকে ঘৃণা করত। ঘৃণার কারণ আর কিছুই নয়। আমরা জানবার অনেক আগেই ও জেনে ফেলেছিল, তার স্বামীকে বিষ দিয়ে মেরেছেন আপনি।'

কাগজের মতো সাদা হয়ে গেল তপন। বিন্দু বিন্দু ঘাম দাঁড়িয়ে গেল কপালে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল আচ্ছন্নের মতো। সুলতাও উঠে দাঁড়াল একই মুখচ্ছবি নিয়ে।

বিহ্বল কণ্ঠে বললে তপন—'আপনার তাহলে বিশ্বাস, আরুণিকেও মেরেছি আমি?'

'তা আর বলতে,' প্রসন্ন কণ্ঠে বলল ইন্দ্রনাথ। পরিহাসের বাষ্পও নেই কথার সুরে—'আরুণিকেও খুন করেছেন আপনি।'

সুলতা হিসহিসিয়ে উঠল সর্পিনীর মতো—'আপনি...আপনি মানুষ না জানোয়ার?'

প্রত্যুত্তরে অ্যাশট্রেতে ছাই ঝাড়ল ইন্দ্রনাথ। বলল একই রকম হৃষ্টকণ্ঠে—'ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে ক্যামেলিয়া গিয়েছিল আর্সেনিক দিয়ে কীভাবে মানুষ খুন করা যায়, তা জানতে। তখনি সে জেনেছিল, চামড়ার মধ্যে দিয়েও আর্সেনিকের বিষক্রিয়া হয়। মনে পড়েছিল থুৎনির আর গালের একজিমা ঢাকবার জন্যে রোজ ঘণ্টাখানেক ধরে মেক আপ করত ক্যাসানোভা। আরও মনে পড়ল, যে ক্রিম দিয়ে মেক আপ করা হত, সেটি দান করেছিলেন আমাদের তপনবাবু। ক্রিমটিতে যে সাদা আর্সেনিক বোঝাই, তা আমি কাল রাতে REINSGH টেস্ট করে দেখেছি। থিয়েটার থেকে ক্রিমের নমুনা এনে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, জল, তামার তার আর বুনসেন বার্নার নিয়ে বসেছিলাম আমার এক কেমিস্ট বন্ধুর ল্যাবোরেটরিতে। ক্যামেলিয়া কিন্তু এক্সপেরিমেন্টের ধার ধারেনি। মিথ্যে চিরকুট লিখে তপনবাবুকে নিয়ে গেছে নিজের ডেরায়। তারপর গ্যাস দিয়ে মারতে চেয়েছিল ভদ্রলোককে। জয়ন্তর স্যাঙাৎ যদি টেলিফোনে তার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে বিষবিজ্ঞান অধ্যয়নের সংবাদটি না জানাতো, তাহলে এতক্ষণে তপনবাবুর মড়া নিয়ে কাটা ছেঁড়া আরম্ভ হয়ে যেত পুলিশ মর্গে। শুনেই বুঝেছিলাম শোকে পাগল হয়ে গিয়েছে ক্যামেলিয়া। বাঘিণীসত্ত্বা জেগেছে। তাই ভয় পেয়ে দৌড়েছিলাম। ক্যামেলিয়া যাবার সময়ে তপনবাবুর রিভলভার নিয়ে পালিয়েছিল বোধ হয় নিজে মরবার জন্যে। কিন্তু তাঁকে জ্যান্ত অবস্থায় পিয়ানো বাজাতে দেখে গুলি ছুঁড়েছিল থিয়েটারের মধ্যেই।'

এতগুলো কথা বেশ খুশি খুশি স্বরে বলে থামল ইন্দ্রনাথ। তারপর বললে হাসি মুখে—'তপনবাবু, সুলতা দেবী, আপনাদের অহেতুক উদ্বেগের মধ্যে রাখতে চাই না। বসুন আপনারা। শুনে রাখুন, দু-দুটো মরণফাঁদ পাতা হয়েছিল ফিরোজা থিয়েটারে। দুটোকেই অপারেট করেছেন একা তপনবাবু। দুটোর মধ্যে একটা পাতা হয়েছিল অবশ্য শুধু তপনবাবুর জন্যেই।'

ঢোঁক গিলল তপন। সুলতার সাদা মুখে আবার রক্ত ফিরে আসতে দেখা গেল।

নিজের মনেই বলল তপন—'দুটো মরণ ফাঁদ...'

'হ্যাঁ। কারণ এ মামলায় হত্যাকারীর সংখ্যা দুই—এক নয়।'

'কী বলছ ঠাকুরপো? এতক্ষণে মুখ খুলল কবিতা। 'দুজন হত্যাকারী?'

'দুই হত্যাকারীই এখন মৃত,' শান্ত স্বর ইন্দ্রনাথের।

'আরুণি আর ক্যাসানোভা!' ছিপিখোলা সোডার বোতলের মতো বিস্ময় ধ্বনি করল তপন।

'হ্যাঁ। ক্যাসানোভা খুন করেছে আরুণিকে। আরুণি আপনার প্রাণ নিতে গিয়ে নিয়েছে ক্যাসানোভার। ভাগ্যের কি পরিহাস দেখুন। মরবার পরেও ঘাতককে মেরে গেল আরুণি।'

কপালের ঘাম মুছতে মুছতে সুলতা বললে—'কিন্তু আমার ওপর চড়াও হওয়ার সখ হল কার?'

'ক্যাসানোভার। কারণ একটা বেফাঁস কথা বলে ফেলেছিলেন ম্যারেজ ডিনারে। মনে পড়ছে?'

'বেফাঁস কথা! কী?'

'জয়ন্তকে জিগ্যেস করেছিলেন, 'তবে হাড়টা ভাঙল কী করে? কড়িকাঠের ধাক্কায়? উল্টো মাধ্যাকর্ষণ নাকি?'

'আমি তো বুঝতেই পারছি না সে কথার সঙ্গে—

'বুঝিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে ক্যাসানোভা বধের দুর্বোধ্য জায়গাগুলো বোঝবার চেষ্টা করা যাক। প্রথম থেকেই জানতাম ক্যামেলিয়া নির্দোষ। স্বামীকে সে ভালোবাসত। খুন করা তার কল্পনাতীত। অথচ স্বামীর খাবারে বিষ মেশানোর সব চাইতে বেশি সুযোগ তারই। কিন্তু বিষ দেওয়ার জন্যে কেউ বিয়ে করে না। তাহলে? কাজটা অন্য কারো। আর্সেনিককে ক্যাসানোভার দেহে ঢোকানো হয়েছে অন্য কোনও পথে। কী পথে? ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল চামড়ার মধ্যে দিয়ে আর্সেনিক পয়জনিংয়ের নজির নতুন নয়। বহুবিধ কসমেটিকস এর মধ্যে দিয়ে, বিশেষ করে ফেস ক্রিমের মাধ্যমে এ দুর্ঘটনা বহুবার ঘটেছে অতীতে। আরও মনে পড়ল, একজিমার দাগ ঢাকবার জন্যে মেক আপ নিয়ে মেহনৎ করাটা খুবই স্বাভাবিক ক্যাসানোভার পক্ষে। মনে পড়ল দানবীর তপনবাবুর ক্রিমদানের বৃত্তান্ত। নিজের অজান্তে বিষাক্ত ক্রিম দিয়ে মেরে ফেলেছেন ক্যাসানোভাকে। তাই বলছিলাম ক্যাসানোভার হত্যাকারী ওঁকেও বলা চলে।

'তপনবাবু, এই সব কারণেই প্রথমে আপনাকেই সন্দেহ করেছিলাম। কী হল? মন খারাপ হল নাতো? জানেন তো, আমরা গোয়েন্দারা ভূশণ্ডির কাক। সর্বজ্ঞ মহাপুরুষ যেন—অন্তত আমার লেখক বন্ধু মৃগাঙ্কর গল্পগুলো পড়ে এইরকম মিথ্যে ইমেজ খাড়া হয়ে যায়। আসলে তা নয়, আমরা সন্দেহ করি সবাইকেই। তারপর বাদ দিতে থাকি একে একে। আপনিও বাদ পড়লেন দুটি কারণে। প্রথমতঃ আপনার অকুণ্ঠ সরলতা এবং প্রাণ খোলা কথাবার্তা। বিষাক্ত ক্রিমের জার জেনে শুনে কেউ অর্পণ করলে এতটা সহজ হতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ ক্যাসানোভাকে মেরে আপনার লাভ কী? কিছু না। ক্যামেলিয়াকে নিয়ে ক্যাসানোভার সঙ্গে আপনার কোনও প্রেমের ত্রিভুজ গড়ে ওঠেনি। ফলে, ওর ওপর কোনও বিদ্বেষ নেই আপনার। অবশ্য 'জ্যাক দি রিপারের' মতো উন্মাদ খুনে যদি হন আপনি, তাহলে স্বতন্ত্র কথা। আপনার ড্রেসিংরুমে আরুণি গিয়েছিল নিজের জার থেকে বিষযুক্ত ক্রিম আপনার জারে চালান করতে। কিন্তু আপনি বুঝলেন উল্টো। আপনাকে বোঝানোও হল—ক্রিম ফুরিয়ে গিয়েছে আরুণির। তাই কাঁচুমাচু মুখে সটকে পড়ল ঈর্ষাকাতর নায়ক। এ-কাহিনীতে অবশ্য সে খল নায়ক। প্রতিযোগিতায় আপনার কাছে হেরে'—

'প্রতিযোগিতা কেন বলছেন? ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদ জানায় সুলতা। 'প্রেমের? আমি কি তাকে প্রেম করতাম?'

'সরি। আমি তা মনে করিনি। যাই হোক, ঈর্ষার বিষে জ্বলেপুড়ে কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে গিয়েছিল আরুণি। বিষযুক্ত ক্রিম কিছুদিন ব্যবহার করলেই তপনবাবু অসুস্থ হতেন, ডাক্তার দেখাতেন, আর্সেনিক পয়জনিং ধরা পড়ত—কিন্তু এমনই পাথর চাপা কপাল লোকটার, হাতে নাতে ধরা পড়ল আপনার কাছে। তারপরেও বেচারির বুদ্ধিশুদ্ধি তালগোল পাকিয়ে গেল আপনি দিব্বি সুস্থ থাকায়। ও হয়তো চেয়েছিল বিষযুক্ত ক্রিম ফিরিয়ে নিতে—কিন্তু কেন নেয়নি সে রহস্য আমি উদ্ধার করতে পারিনি।'

'ওই ঘটনার পর থেকে আমার জিনিসপত্র আলমারিতে তালা দিয়ে রাখতাম,' বলল তপন।

'ঠিক। ওই জন্যেই সে ক্রিম পুনরুদ্ধার করতে পারেনি, অথচ ক্রিমের বিষাক্ত ফলাফলও দেখতে পায়নি।'

'সে জন্যে আমি কৃতজ্ঞ আমার স্ত্রীর কাছে,' বলল তপন। 'সেইদিনই ও নতুন ক্রিমের জার না আনলে ওকে আজ বিধবা হতে হত। তবে হ্যাঁ, ক্যামেলিয়া সধবা থেকে যেত।'

'সাময়িকভাবে থাকত,' বলল ইন্দ্রনাথ। আর্সেনিক পয়জনিংয়ে না মরলেও ফাঁসির দড়িতে মরত ক্যাসানোভা...আরুণির অনেক আগে থেকেই ক্যাসানোভার শরীরে বিষ ঢুকতে শুরু করেছিল বলেই সন্দেহের আঁচ থেকে রেহাই পেয়েছেন তপনবাবু। নইলে ধরে নেওয়া যেত, আপনি ক্যাসানোভাকে খুন করেছেন এই কারণে যে ক্যাসানোভা জানত আপনি আরুণিকেও খুন করেছেন। কিন্তু আসলে তা তো হয়নি। আরুণির প্রাণপাখি উড়িয়ে দিয়েছিল একজনই—ক্যাসানোভা।'

কাষ্ঠহেসে বললে তপন—'কিন্তু আপনি যে বললেন আমিই—'

দমাস করে বেতাল শব্দ হল। ঝনঝন করে নেচে উঠল টেবিল ভর্তি কাপডিস প্লেট চামচ। দেখা গেল, বিপুল মুষ্টাঘাত করেছে ইন্সপেক্টর জয়ন্ত চৌধুরী। আর চেঁচাচ্ছে গাঁকগাঁক করে—'কিন্তু কীভাবে? কীভাবে?

কীভাবে?'

'এইভাবে,' বলে শুরু করল ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

আরুণির ওপর ক্যাসানোভার বিতৃষ্ণার কারণটা আর একবার ঝালিয়ে নিই। সুলতা দেবী সেই দৃশ্যের উপসংহারটুকু দেখেছিলেন। ক্যামেলিয়াকে আরুণি ধর্ষণ করতে চেয়েছিল, তাই না?'

মুখ লাল হল সুলতা দেবীর। কবিতা বললে—'মরণদশা আর কি! কথার ছিরি ছাঁদ নেই।'

ইন্দ্রনাথ বললে—'তাই আরুণির প্রাণপাখিকে উড়িয়ে দেওয়ার সংকল্প নিল ক্যাসানোভা। কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের প্রাণ পাখিটিও যাতে সকালে ফাঁসির দড়িতে না উড়ে যায়, তাই আটঘাট বাঁধল সে। উদ্ভট নাটক করে করে ব্রেনের মধ্যে তার গজগজ করছিল উদ্ভট বুদ্ধি, তাই—'

নাটকটা আমার লেখা, গম্ভীর মুখে বলল সুলতা। এবং সেটা উদ্ভট নয়।'

'ওই হল গিয়ে। তাই একটা বিটকেল প্ল্যান ডালপালা মেলে ধরল ক্যাসানোভার উর্বর মস্তিষ্কে। ওর প্রথম কাজ হল, কড়িকাঠে একটা হুক পেঁচিয়ে লাগানো, সেই হুক থেকেই পরে খলনায়ক আরুণিকে ঝুলতে দেখা গেছে। সুযোগের অভাব ছিল না। দীর্ঘদিন ধরে নিষ্ঠাসহকারে সূচনা পর্ব সমাপ্ত করেছে ক্যাসানোভা। হুকটা আরুণির চোখে পড়লেও বিপদ নেই। হুক নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। আরুণিও নিশ্চয় ঘামায়নি।

এর পরের ধাপে বেশ খানিকটা নেমবুটাল জোগাড় করতে হল ক্যাসানোভাকে। আখতারের ঘর থেকে শিশি ভর্তি নেমবুটাল সরাতে বেগ পেতে হল না মোটেই। বেশ খানিকটা ড্রাগ জিনের বোতলে মিশিয়ে রেখে দিল আরুণির ঘরে। ভুল করল সেইখানেই। কেননা নেমবুটাল মেশাতে হলে বোতলের মদে মেশাতে হবে। অথচ বোতলটি পরে পাওয়া যাবে এবং সন্দেহের উদ্রেক ঘটাবে। তাই ক্যাসানোভার প্ল্যান ছিল নিশ্চয় কামফতে হওয়ার পর নেমবুটাল মিশোনো মদের বোতল সরিয়ে সেখানে নিরীহ জিনের একটা বোতল রাখা, কিন্তু বোতল পালটা-পালটি করার মুহূর্তটি যেই এল বেমালুম বিষয়টি বিস্মৃত হল ক্যাসানোভা। অতি বড় হুঁশিয়ার অপরাধীও কিছু না কিছু ভুল করে। ক্যাসানোভাও সাজানো আত্মহত্যার দৃশ্যে রেখে গেল মার্ডারের স্পষ্ট সূত্র।'

'যথা সময়ে বাইরে রেস্তোরাঁয় খেয়ে দেয়ে মাল টেনে ড্রেসিংরুমে এল আরুণি ফের জিনের বোতল ফাঁক করার সাধু অভিলাষ নিয়ে। ঘুমের ওষুধের কাজ শুরু না হওয়া পর্যন্ত সবুর করল, তারপরে উঠে এল ছাদে বেশ খানিকটা দড়ি নিয়ে। ওঠবার সময়ে দেখে গেল, লিফটটা প্ল্যানমাফিক দোতলাতেই আছে—একতলায় নেই। ও জানত, বুড়ো ইস্পাহানি লিফট-র কলকব্জায় হাত দিতে চায় না কখনও বিগড়ে গিয়ে মাঝখানে আটকে যায় এই ভয়ে। অত রাতে ফিরোজা থিয়েটারে যে কেউ আসবে না—তাও জানত ইস্পাহানি। সুতরাং যেখানকার লিফট, সেইখানেই রেখে সে তামাক খাবে নিজের ঘরে বসে, সেই ফাঁকে ঘরের স্কাইলাইটের কাছেই লিফট-এর কলকব্জায় কেরামতি করতে পারবে ক্যাসানোভা।'

'বটে!' আচম্বিতে সটান হয়ে বসল জয়ন্ত।

'ঠাকুরপো! বুঝেছি,'—সবিস্ময়ে বলল কবিতা।

কিন্তু যেই আমি বিজ্ঞতা জাহির করতে গেলাম, ইন্দ্রনাথ আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললে—'হ্যাঁ, ধরেছো ঠিক তোমরা। কিন্তু তপনবাবু যদি লিফট নাও চালাতেন, ক্যাসানোভা চালাত। তার কাজটা আপনি সেরে দিলেন দেখে সে অবশ্য অবাক হয়েছিল যথেষ্ট।

'দড়ির একটা প্রান্ত সে বাঁধল হয় লিফট-এর কলকব্জার সঙ্গে, না হয় লিফট-এর মাথায়। দড়িটা কতখানি লম্বা রাখলে লিফট-এর টানে আরুণির মুণ্ডু ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে না, সেটা অবশ্য হিসেব করে মেপে রেখেছিল ক্যাসানোভা। তাই অপর প্রান্তটা গলিয়ে আনল স্কাইলাইটের ফোকর দিয়ে, ঝুলিয়ে দিল মেঝের ওপর। স্কাইলাইট দিয়েই আরও দুটি জিনিস ঘরে ফেলল সে। খানিকটা তুলো আর দু-গাছা দড়ি। আগে থেকেই একটা উপযুক্ত উচ্চতার টুলও রাখা হয়েছিল ঘরের মধ্যে।

মঞ্চসজ্জা সম্পূর্ণ হল। নাটকের সংলাপ বা ওই জাতীয় কিছু নিয়ে সফল নায়ক আরুণির সঙ্গে আলোচনার জন্যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা ছিল আগে থেকে। কারো মনে সন্দেহ না আনার জন্যেই এই ব্যবস্থা। আরুণির ঘরে এল কাঁটায় কাঁটায় ন'টায়। চেয়ারে দাঁড়িয়ে একগাছি দড়ি বাঁধল কড়িকাঠের হুকে। অপর প্রান্তে রইল একটা ফাঁস। এমনভাবে ফাঁস তৈরি হল যাতে গিঁটটা চোয়ালের খাঁজে পড়ে।'

'এরপর আর একগাছি দড়ি বাঁধা হল আরুণির কোমরে। অন্য প্রান্তটা গলিয়ে আনল কড়িকাঠের হুকের মধ্যে দিয়ে এবং টান মারল হেঁইও বলে। নেমবুটালে অচেতন আরুণি দুলতে দুলতে উঠল শূন্যে। ত্রিশঙ্কুর মতো তাকে শূন্য মার্গেই রেখে দড়ির প্রান্তটা বাঁধল দরজার কড়ায়। টুলটা এমন ভাবে রাখল হুকের নীচে যাতে আরুণির পায়ের ভর রইল টুলের ওপরে। আবার উঠল চেয়ারে। গলা ঘিরে তুলোর পটি দিয়ে মুণ্ডুটা গলিয়ে দিল ফাঁসের মধ্যে। তুলোর পটির ওপর আলতো করে এঁটে দিল দড়ির ফাঁস।

'সুইসাইড যারা করে, তাদের কেউ কেউ মৃত্যুকালেও একটু আরাম পেতে চায়। ক্যাসানোভার তাতে সুবিধে হল। কেননা, আরুণির মৃত্যুর যে সময় নির্ধারণ করেছিল ক্যাসানোভা, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে বাঁচিয়ে রাখার দরকার ছিল বই কি।

'চেয়ার থেকে নামল ক্যাসানোভা। আরুণির কোমর থেকে খুলল দড়ির বাঁধন। সঙ্গে সঙ্গে দেহটা হেলে পড়ল। পা রইল টুলে—ফাঁস রইল গলায়। কিন্তু দম বন্ধ হল না তুলোর দৌলতে। এ ভাবে অনেকক্ষণ বাঁচিয়ে রাখা যাবে আরুণিকে। দেহের খানিকটা ওজন টুলের ওপর পড়ায় গলায় ছাপ পড়ছিল অনেক কম।

'তারপর লিফট-এর সঙ্গে বাঁধা দড়ির প্রান্তটা তুলে আনল ক্যাসানোভা। বাঁধল আরুণির পায়ে। ট্রাউজার্সের ক্রিজ নষ্ট হয়েছিল ওই জন্যেই। পাটের ফেঁসো নিয়েও কতই না গবেষণা করেছে জয়ন্ত। একবারও খেয়াল হয়নি স্রেফ ধোঁকা দেওয়ার জন্যেই পায়ের চামড়ার ওপর না বেঁধে ট্রাউজার্স সমেত দড়ি বেঁধেছিল ক্যাসানোভা।

'এরপর টুলের পায়া ঘিরে একটা দড়ি জড়ালো ক্যাসানোভা। দড়ির দুটোপ্রান্তই বেঁধে রাখল স্কাইলাইটের শিকে। সবশেষে মুছল চেয়ারটা।

'কাজ শেষ। ঘর থেকে বেরিয়ে এল ক্যাসানোভা। রাত তখন সাড়ে নটা। ইস্পাহানি ওকে এগিয়ে দিল নীচতলায়। একটু অপেক্ষা করে ক্যাসানোভা গেল পাবলিক টেলিফোন বুথে। ফোন করল ডক্টর লুথরাকে আরুণির নাম নিয়ে। জরুরি দরকার, এখুনি আসতে হবে। একজন ডাক্তারকে অকুস্থলে হাজির না করলে এত আয়োজন ফেঁসে যেতে পারে। ডাক্তারের সার্টিফিকেট থাকা চাই এই মর্মে যে, হ্যাঁ ক্যাসানোভা বেরিয়ে যাওয়ার অনেকক্ষণ পরে মারা গিয়েছে আরুণি। তিনি আসার মিনিট কয়েক আগেই তাঁর প্রাণপাখি উড়েছে।

'থিয়েটারে ফিরে এল ক্যাসানোভা। বাড়ি থেকে থিয়েটারে আসতে ডক্টর লুথরার ক'মিনিট সময় লাগে, সে হিসেব তার জানা। তাই ঠিক সময়ে থিয়েটারে এল সে লিফটটা নীচে নামিয়ে আরুণির দম বন্ধ করার জন্যে। কিন্তু গিয়ে কি দেখল? না আমাদের তপনবাবু তার হয়ে অপকর্মটি নিজেই করছেন অর্থাৎ লিফট নামাচ্ছেন। ফলে আরুণিকে আর স্বহস্তে বধ করতে হল না ক্যাসানোভাকে।

'মাগো'! অস্ফুট কণ্ঠে বলল সুলতা। তপন কেবল ঢোঁক গিলল শুকনো গলায়।

'ঘাবড়াবেন না, তপনবাবু না জেনে যা করেছেন তার জন্যে আপনাকে দায়ী করা চলে না কোনও মতেই। যাই হোক, লিফট নীচে নামতেই তিনতলায় আরুণির গোড়ালিতে বাঁধা দড়িতে টান পড়ল। টানের চোটে গোড়ালি গিয়ে পৌঁছোল স্কাইলাইটের ইঞ্চি কয়েক দূরে। ঘাড়ের পেছনটা কড়িকাঠের কোণে লাগতেই মট করে ভাঙল সারভাইকালভারটিব্রা অর্থাৎ কশেরুকার একটা হাড়।

'চটপট ছাদে উঠল ক্যাসানোভা। স্কাইলাইটের ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে খুলে দিল গোড়ালির বাঁধন। পেণ্ডুলামের মতো দোদুল্যমান হল আরুণির লাস। দড়িটা টেনে নিল ক্যাসানোভা। শিকে বাঁধা দড়ির দুপ্রান্ত ধরে টান দিতেই উলটে পড়ল টুলটা। দড়ির একপ্রান্ত ধরে টেনে বার করে নিল ক্যাসানোভা। ঘরের মধ্যে ঝুলতে লাগল কেবল আরুণির দেহ।

'সুলতা দেবী, কি বেফাঁস কথা বলেছিলেন এখন বুঝছেন তো? জয়ন্তকে জিগ্যেস করেছিলেন, 'হাড়টা ভাঙল কী করে? কড়িকাঠের ধাক্কায়? উল্টো মাধ্যাকর্ষণ নাকি? শুনেই টনক নড়েছিল ক্যাসানোভার। চোরের মন বোঁচকার দিকেই থাকে। ওর দৃ,ঢ় বিশ্বাস হয়েছিল, আপনি ওর গুপ্তরহস্য জেনেছেন। তাই পরলোকে যাওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ল আপনার।'

'কি বেইমান! বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আমিই বিয়ে দিলাম ওদের—'সুলতা ফুঁসে উঠল।

ইন্দ্রনাথ ঝকঝকে চোখে তাকিয়ে বললে—কি সুন্দর প্ল্যানখানা দেখেছেন। জটিল সন্দেহ নেই। কিন্তু পরিষ্কার তকতকে। খোঁচ নেই কোথাও। সমস্ত ঘটনাটা ঘটতে লেগেছে দশ মিনিট। ইস্পাহানির দরজা খোলা ছিল আগাগোড়া, তার চোখও ছিল এই দিকে। শুধু একটা খটকা লেগেছিল আমার। টুলটা উলটে পড়ার শব্দ শুনে ইস্পাহানি কেন উঠে আসেনি। এলে ক্যাসানোভার জবর সাক্ষী জুটতো। থিয়েটারে গিয়ে কারণটা আবিষ্কার করলাম। ইস্পাহানি বার্ধক্য হেতু কানে একটু কম শোনে। ক্যাসানোভার হিসেবে এ সম্ভাবনাটা ছিল বলেই ডাক্তারকে হাজির করেছিল টেলিফোন করে। কিন্তু ঘুণাক্ষরেই আঁচ করতে পারেনি, যাকে খতম করার জন্যে এত জোগাড়যন্ত্র তারই দেওয়া আর্সেনিক বিষে সে নিজেই খতম হয়ে চলেছে তিল তিল করে। একেই বলে ভগবানের মার, দুনিয়ার বার।'

ইন্দ্রনাথ থামল। উৎপাত-যন্ত্র টেলিফোনটাও যেন এতক্ষণ ধরে রুদ্ধশ্বাসে শুনছিল ওর বচন-মালা। রহস্যোদঘাটন পর্ব সমাপ্ত হতে না হতেই এমন আওয়াজ করে উঠল যে কান ঝালাপালা হয়ে গেল ঘরশুদ্ধ সকলের।

ধরল কবিতা। বলল—'জয়ন্ত ঠাকুরপো, লালাবাজারের ফোন। তোমার বস।' বিপুল উৎসাহে লম্ফ দিয়ে রিসিভার ধরল জয়ন্ত। কান পেতে শুনল কিছুক্ষণ, তারপর মেঘ গর্জনের মতো বলল গুরুগম্ভীর গলায় —'কেস সেটলড হয়ে গেছে, স্যার। আমি আসছি।'

ইন্দ্রনাথ কাষ্ঠ হেসে বললে—'বাহাদুরিটা তুই-ই নিস রে। প্রোমোশন হবে। আর আমাকে দিস শুকনো ধন্যবাদ।'

'মাভৈঃ,' অভয় দিলাম। 'আমি তোকে দেব তুই যা চাস।'

'গল্পের নাম কী দেবে? বচন ফকিরের কল্কে? টিটকিরি দিল কবিতা।

'ভানুমতীর খেল,' দরজার কাছ থেকে বলল জয়ন্ত এবং বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেল ভোজরাজ কন্যা ভানুমতীর মতোই।

** 'বিচিন্তা' পত্রিকায় প্রকাশিত। শারদীয় সংখ্যা, ১৯৭৩।*

আফিং ও ইন্দ্রনাথ রুদ্র

ইন্দ্রনাথ রুদ্রকে অনেক অপকর্মের নাড়ীনক্ষত্র জানতে হয়েছে, কারণ সে প্রাইভেট ডিটেকটিভ। তা সত্ত্বেও একটি কেস নিয়ে নাজেহাল হয়েছিল ইন্দ্রনাথ। হওয়াটা আশ্চর্য নয়। কেন না, এত জেনেও যা নিয়ে কোনওদিন মাথা ঘামাতে হয়নি তাকে, চাঞ্চল্যকর এই মামলার মূল রহস্য ছিল সেইটাই। আমি আফিংয়ের চোরাই কারবারের কথা বলছি।

বড়দিনের সময়ে সাধারণত আমরা কলকাতায় থাকি না। শীতের আমেজ গায়ে লাগলেই মনটা উড়ুউড়ু হতে থাকে। বড়দিনের ক'টা দিন কোথাও না কোথাও কাটিয়ে আসি। একা কখনো যাই না। গৃহিণী কবিতা সঙ্গে তো থাকেই। সেই সঙ্গে বন্ধুবর ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

বছর কয়েক আগে এমনি একটা বড়দিন কাটাতে আমরা এসেছিলাম রাজস্থানে। মরুভূমির শীতের একটা আলাদা আমেজ আছে। ধু-ধু বালির দিকে তাকিয়ে মনটাও কেন যেন হু-হু করে ওঠে। আমার গিন্নি বলে, 'তুমি নির্ঘাত আরব বেদুইন ছিলে গত জন্মে।' আমি ওর থুতনি নেড়ে বলতাম—'আর তুমি ছিলে বেদুইন বউ?'

ইন্দ্রনাথ অমনি গলাখাঁকারি দিত পেছন থেকে। বলত—'ওহে কপোত-কপোতী, তোমাদের দস্যুবৃত্তির মধ্যে আমি কিন্তু ছিলাম না।'

মুখ টিপে হেসে কবিতা বলত—'তুমি দস্যু নও, তুমি তস্কর। রমণীকুলের চিত্ত লোপাট করতে অদ্বিতীয়।'

ছেলেমানুষ হয়ে যেতাম তিনজনেই। মরুভূমি আমাদের সব ভুলিয়ে দিত। আমরা ভুলে যেতাম আমাদের শিষ্টাচারের আড়ষ্টতা, ভুলে যেতাম কথা বলার ঠাটবাট। সহজ হয়ে যেতাম অন্তর পর্যন্ত। ফলে যে ধরনের ইয়ার্কি-ঠাট্টায় মত্ত হতাম, তা নিষ্পাপ মনেই করতাম।

দিনরাত পাপী-তাপীদের নিয়ে ঘেঁটে ঘেঁটে ইন্দ্রনাথ নিজেও চাইত সব কিছু ভুলে যেতে। কিন্তু এমনই কপাল, কোনওবারেই তা সম্ভব হত না। একটা না একটা ভজকট ব্যাপার এসে জুটতই। যেমন হল সেবার —রাজস্থানে।

বিকানীরে গিয়ে আমরা মরুভূমির রুখু চেহারা দেখে কবিতার পর কবিতা আওড়াচ্ছিলাম, ইন্দ্রনাথ ওর কবি-কবি চেহারা নিয়ে বসে থাকত বালিয়াড়ির ওপর। হাওয়ায় চুল উড়ত। টানা-টানা স্বপ্নালু দুটি চোখে ও কিসের স্বপ্ন দেখত, তা ভগবানই জানেন। দেখে আমার মনটা কীরকম হয়ে যেত। ব্যাচেলর হলেই কি অমনি হয়? আমিও এককালে ব্যাচেলার ছিলাম। বম্বের কোটিপতি কন্যার পাণিপীড়ন করার আগে আমিও নিঃসঙ্গ ছিলাম। কিন্তু ইন্দ্রনাথের একাকীত্বের জাত আলাদা। ওর মনের নাগাল পাওয়ার ক্ষমতা বোধকরি কোনও নারীরই নেই। তাই ও চিরকুমারই রয়ে গেল।

সেদিন হঠাৎ কবিতা বায়না ধরল, 'ঠাকুরপো চল উটে চড়ি।'

'চড়ে?' ভুরু কোঁচকালো ইন্দ্রনাথ।

'মরুভূমির ভেতর পর্যন্ত চলে যাব। যেখানে মোটর-সাইকেল যায় না, জিপ যায় না—সেইখানে চলবে আমাদের উট খপখপ করে। আমরা উটের পিঠে বসে দুলব আর দুলব। গলা ছেড়ে গান গাইব। বালিয়াড়ির ঢেউ দেখব। ফণিমনসা আর কাঁটাঝোপ গুণব। সূর্যাস্তের রঙ মনে গেঁথে নেব। তারপর আবার ফিরবে আমাদের উট খপখপ করে বালির টিলা পেরিয়ে। ভালো লাগবে না?'

কবিতার কথার সুরে কী যেন ছিল। জাদু বোধহয় একেই বলে। ঘরকুণো বাঙালি আমরা। কিন্তু অ্যাডভেঞ্চারের নেশা কেন আমাদের রক্তে, এ প্রশ্নের জবাব পাই না। থর মরুভূমির দিকে তাকিয়ে ভাসা ভাসা দুটি চোখে দূর-দিগন্তের ছবি দুলিয়ে কবিতা যা বলল, তা যেন আমাদেরই মনের কথা। আমরা যেন একই সুরে একই গান গেয়ে উঠলাম। সমস্বরে বললাম—'তাই ভালো। চল যাই।'

এলাম স্টেশনের কাছে। উটের আড্ডা সেখানে। সেইসঙ্গে জিপ আর মোটর-সাইকেল। অপরূপা কবিতার দুইপাশে দুই বঙ্গ-তনয় দেখে ছেঁকে ধরল ড্রাইভাররা। ওদের অনর্গল কথা থেকে এইটুকু বুঝলাম যে বাবুরা শুটিংয়ের জন্যে মরুভূমি দেখতে যাবেন তো? ফার্স্টক্লাস জিপ দেব, চলে আসুন। শুনলাম, শুটিং এখানে হামেশাই হচ্ছে। বিশেষ করে সত্যজিৎ রায় তাঁর 'গোপী গায়েন বাঘা বায়েন'-এর কিছু দৃশ্যগ্রহণ করতে এ অঞ্চলে এসেছিলেন। তারপর থেকেই বেঙ্গলিবাবু দেখলেই আর রক্ষে নেই।

অত কথায় আমরা আর গেলাম না। শুধোলাম—'উট আছে?'

হাঁ করে তাকিয়ে রইল ওরা।

কবিতা এবার ওর দুর্গাপ্রতিমার মতো বড় বড় দুই চোখ পাকিয়ে ঝঙ্কার দিল—'হাঁ করে দেখবার কি আছে? বলি, উট আছে?'

উট? এমনভাবে ওরা সাড়া দিল যেন উট জিনিসটা প্রাগৈতিহাসিক জন্তু—এ যুগে দুর্লভ। ডাইনোসর বা টেরোড্যাকটিস-এর মতো উট প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলাও নিরাপদ নয়। একজন তো বলেই বসল—'উট কি হবে? উটের পিঠ একতলা উঁচু। পড়ে মরবেন নাকি? হাড়গোড় গুঁড়িয়ে যাবে যে।'

কবিতা গেল ক্ষেপে—'তাতে তোমার কী? আমরা উট চাই। উটের পিঠে চাপব, মরি মরব। তিনটে উট চাই। সারাদিনের জন্যে।'

ওরা অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে রইল। দু-একজন নিজেদের মধ্যে ফিসফাসও করে নিল। তারপর শুনলাম, উট নামক জীবটা নাকি ইদানীং বিকানীরে বড়ই দুর্লভ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চাইলেই তা পাওয়া যায় না। সবুর করতে হবে।

রাগে গজগজ করতে করতে আমরা ফিরে এলাম হোটেলে। কবিতা যদি নাগিনী হত, তাহলে নিশ্চয় আসবার সময় ছোবল বসিয়ে আসত উটের আড্ডায় কাউকে না কাউকে। কিন্তু কিছুই যখন করা গেল না, তখন আমরা গেলাম বিকানীর প্যালেসে। সেখানে পাথরের চত্বরে দাঁড়িয়ে নীচের শহরের দিকে তাকিয়ে আছি, দেখছি সাদা সাদা ঘিঞ্জি বাড়ির চেহারা আর ভাবছি সব দেশীয় রাজ্যেই কি একই দৃশ্য? চকমিলানো মার্বেল প্রাসাদ একজনের, ঝুঁকো বাড়ি সকলের?

এমন সময়ে কবিতা বলল—'ঠাকুরপো, বললে তো বলবে মেয়েদের মনে সন্দেহ লেগেই আছে। কিন্তু সেই সকাল থেকে একটা লোক আমাদের পিছু নিয়েছে। লোকটা এখানেও এসেছে।'

কবিতা কথাটা বলল যেন হাওয়াকে লক্ষ্য করে নীচের ঘিঞ্জি বাড়ির দিকে তাকিয়ে। ইন্দ্রনাথও কথাটা শুনল যেন হাওয়ার মুখে। দুজনের কেউই পিছন ফিরল না, এদিক ওদিক তাকাল না। অগত্যা আমিও যেভাবে দাঁড়িয়েছিলাম, রইলাম সেইভাবেই দাঁড়িয়ে।

ইন্দ্রনাথ বলল—'যদি কেউ পেছনে লেগে থাকে তো তোমার জন্যে।'

'অপরাধ?'

'তোমার উর্বশীরূপ। বিদেশ-বিভুঁয়ে বেরিয়ে রূপটাকে ঢেকে রাখলেই পার।'

'তুমি গোয়েন্দা না কচু।'

'কেন?'

'চোখ থাকতেও চোখ নেই। মেয়েদের এইজন্যই গোয়েন্দা হওয়া উচিত।'

'খুলে বল।'

'আমরা সোজা চলি। সোজা দেখি। কিন্তু পাশ থেকে কে আমাদের দেখে কী করছে, না তাকিয়েও বুঝতে পারি। যেমন এখন পেরেছি।'

'সে তো ভালো কথা। কিন্তু সে জন্যে আমি গোয়েন্দা না হয়ে কচু হতে যাব কেন?'

'যাবে এই কারণে যে লোকটা কার দিকে তাকিয়ে আছে তা তুমি দ্যাখনি—কিন্তু আমি দেখেছি।'

'কার দিকে তাকিয়ে?'

'তোমার দিকে।'

ইন্দ্রনাথ কোনও জবাব দিল না। পকেট থেকে চন্দনকাঠের কাজ-করা সিগারেট কেস বার করল। একটা সিগারেট ঠোঁটের ফাঁকে আলগোছে ঝুলিয়ে নিয়ে কি যেন ভাবতে লাগল। তারপর দেশলাই বার করে জ্বালতে গিয়ে কাঠি নিভে গেল। হাওয়া বোধহয় সামনে থেকে আসছে। তাই পেছন ফিরে হাত আড়াল করে কাঠি জ্বালতেই জ্বলে উঠল। সিগারেটও জ্বলল।

আমি দেখলাম, আঙুলের ফাঁক দিয়ে সেইসঙ্গে অদূরে মার্বেল ক্যানোপির কাছে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটাকেও দেখা হয়ে গেল ইন্দ্রনাথের।

কাঠিটা ফেলে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ।

বলল—'বউদিকে ধন্যবাদ জানাই। আমার নাম কচু হওয়াই উচিত। লোকটা আমাকেই নজরে রেখেছে।'

'কিন্তু কেন?' শুধোলাম আমি।

'বুঝতে পারছি না। আমরা তিনজনেই এ অঞ্চলে বিদেশি। অথচ নজর আমার দিকে। তার মানে একটাই। লোকটা আমাকে চেনে। আমি কিন্তু ওকে চিনতে পারছি না।'

এই পর্যন্ত কথা হল বিকানীর প্যালেসে। এবার ফেরার পালা। মনটা আর ততটা হালকা নয়। রোমাঞ্চ-রোমাঞ্চ ভাবের সঙ্গে একটু দুর্ভাবনা তো আছেই। রাজপুতদের দেশে এসে না জানি কি ঝামেলায় পড়তে হয়।

হলও তাই। এঁকাবেঁকা পথে ফিরছে আমাদের অটোরিক্সা। মানে, তিনচাকার মোটর সাইকেল। আচমকা রাস্তার ওপর ডিনামাইট ফাটল।

পরে শুনেছিলাম, রাস্তা চওড়া করার জন্যে অমন ডিনামাইট নাকি হামেশাই ফাটছে শহরে। কখনো ফাটাচ্ছে মিলিটারি, কখনো অন্য কর্তৃপক্ষ। কিন্তু সেদিনের ডিনামাইটটি কার দয়ায় সমস্ত রাস্তা জুড়ে ফাটল, সে হদিশ আর পাওয়া গেল না।

ফল হল সাঙ্ঘাতিক। বেগে ছুটছিল মোটর-সাইকেল রিকশা, আচম্বিতে সামনে দেখলাম রাস্তা উড়ে গেল। তিনতলা বাড়ির সমান ধুলো আর ধোঁয়ার ফোয়ারা লাফিয়ে উঠল।

আর আমাদের অটোরিকশা সোজা গিয়ে আছাড় খেল সেই গর্তে।

তারপর আর কিছু মনে নেই।

জ্ঞান ফিরলে দেখলাম রাস্তাতেই শুয়ে আছি। মাথা ভিজে গেছে রক্তে। রক্তটা আমার চাইতে আমার ড্রাইভারের বেশি। তার খুলি দু-ফাঁক হয়ে গিয়েছে। মারা গিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে।

কবিতার হাত ভেঙে গিয়েছে। ইন্দ্রনাথ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। মাথা দিয়ে গড়াচ্ছে রক্ত।

আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে অনেকে। তার মধ্যে মিলিটারি দেখলাম, পুলিশ দেখলাম সাধারণ পথচারীও দেখলাম।

মাথার মধ্যে অত যন্ত্রণা নিয়েও চোখ সরাতে পারছিলাম না ইন্দ্রনাথের ওপর থেকে। ইন্দ্রনাথ...যে ইন্দ্রনাথ সহস্র বিপদ—ঝঞ্ঝায় চিরকাল অকুতোভয়, যে ইন্দ্রনাথ বহুবার বহুভাবে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা কষে হাসতে হাসতে কদলী দেখিয়েছে যমালয়কে—সেই ইন্দ্রনাথ সামান্য একটা অ্যাকসিডেন্টের ফলে এমন হয়ে গেল?

হাসছিল ইন্দ্রনাথ। আপনমনে হাসছিল। শব্দহীন হাসি।

শব্দ ওর কণ্ঠেও আর জাগেনি।

ব্রেন শক। ডাক্তারেরা তাই বললে। মাথায় এমন চোট লেগেছে যে সহসা কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে ইন্দ্রনাথ রুদ্র। সেই সঙ্গে চিন্তার স্বচ্ছতাও। সংক্ষেপে পাগল হয়ে গিয়েছে দুরন্ত ইন্দ্র...সেই সঙ্গে হয়েছে বোবা।

সে কি কান্না কবিতার। খবর ছড়িয়ে পড়ল দেখতে দেখতে। সারা বিকানীর শহরে যেন জাদুমন্ত্রবলে রটে গেল, কলকাতার বিখ্যাত গোয়েন্দা ইন্দ্রনাথ রুদ্রকে ডিনামাইট ফাটিয়ে কারা যেন বোবা করে দিয়েছে, উন্মাদ বানিয়ে ছেড়েছে। 'মোমের হাত' রহস্য ভেদ করে ভারত সরকারের মুখোজ্জ্বল করেছিল যে ইন্দ্রনাথ রুদ্র, 'হীরামনের হাহাকার' প্রহেলিকায় অভূতপূর্ব মুন্সিয়ানা দেখিয়েছিল যে প্রাইভেট ডিটেকটিভ, মরুভূমির দেশে এসে সে ঘায়েল হয়েছে।

কিন্তু কাদের হাতে?

রহস্য রহস্যই রয়ে গেল। আমি ওকে কলকাতায় সরাতে চাইলাম । কিন্তু নতুন বিপদ দেখা দিল। একমুখ দাড়ি নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় টো-টো করত ইন্দ্রনাথ। এমনও গেছে রাতে ফেরেনি—সারাদিন ফেরেনি। তারপর আবার দেখা দিয়েছে লাল চোখ নিয়ে...মুখে সেই শব্দহীন হাসি। সরল চাহনি। মাঝে মাঝে কী এক আতঙ্কে বিস্ফারিত...তখন যেন চমকে চমকে উঠত অকারণে...খুট শব্দ শুনলেই এমন করে উঠত যেন কানের কাছে আবার ডিনামাইট ফাটল।

জয়ন্তকে চিঠি লিখলাম। জয়ন্ত চৌধুরী। আমাদের কলেজবন্ধু। এখন পুলিশের দাসত্ব করে। চোর-ছ্যাঁচোড় নিয়ে কারবার। বিপদে-আপদে তিন বন্ধুই তিনজনকে স্মরণ করতাম। এবারও করতে হল। কেননা, ইন্দ্রনাথকে আমি বিকানীর থেকে সরাতে পারছিলাম না কিছুতেই। যার দেখা পাওয়াই ভার, তাকে স্টেশনে নিয়ে যাই কী করে?

জয়ন্ত এল যথাসময়ে। সব শুনল। ইন্দ্রনাথের সঙ্গেও দেখা হল। কিন্তু জয়ন্তকে যেন চিনি চিনি করেও চিনতে পারল না ইন্দ্রনাথ।

কীভাবে যে দিন কেটেছে, ভগবানই জানেন। কবিতা প্রায় নাওয়া-খাওয়া ত্যাগ করেছিল ইন্দ্রনাথের ওই শোচনীয় অবস্থা দেখে। কাকে সামলাই আমি? বন্ধুকে না, বউকে? আমার নিজের অবস্থাও যে শোচনীয়। নার্ভের সহ্যের একটা সীমা আছে তো।

জয়ন্ত স্থানীয় পুলিশ-মহলে গেল। উদ্দেশ্য ছিল ডিনামাইট বিস্ফোরণের কারণ অনুসন্ধান। ইন্দ্রনাথকে যে লোকটা পিছু নিয়েছিল, তার হদিশ পাওয়া গেছে কিনা, এ খোঁজও নিয়েছিল। খবর কিছুই পায়নি। পুলিশ মহল অন্য ঝামেলা নিয়ে নাকানি-চোবানি খাচ্ছে। ডিনামাইট বিস্ফোরণ আর উধাও আততায়ী নিয়ে মস্তিষ্ক ঘমাক্ত করবার সময় তাদের নেই।

তবে চাঞ্চল্যকর একটা খবর নিয়ে এল জয়ন্ত। বালির দেশের সাজানো গোছানো সুন্দর এই শহরটিতে যে এমন অসুন্দরের কারবার চলছে, তা আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি। আমি আফিং, মরফিন, হেরোইনের কথা বলছি।

বছরখানেক আগেই নাকি বোম্বাই, কলকাতা, দিল্লির পুলিশ মহল আর আবগারী বিভাগের টনক নড়েছিল। রাতারাতি মাদকদ্রব্যের চোরাই চালান কেন যে এত বেড়ে গেল, তা ভাবতে ভাবতে চুল পাকবার উপক্রম হয়েছিল কেষ্ট-বিষ্টুদের। হোমরা-চোমরারা অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে, অনেক তদন্ত-টদন্ত করে জানতে চাইল মালটা আসছে কোত্থেকে? সমস্ত উত্তর ভারত তোলপাড় করে জানা গেল সেই তথ্য।

বিস্ময়কর তথ্য সন্দেহ নেই। প্রথমে সন্দেহ করা গিয়েছিল বোম্বাই আর কলকাতাকে। যত লটঘট ব্যাপার তো অপরাধের এই দুটি ডিপো থেকেই ঘটছে। কাজেই প্রচণ্ড চাপ এসে পড়েছিল দুই শহরের পুলিশ চাঁইদের ওপর। নাকে কি সরষের তেল দিয়ে ঘুমনো হচ্ছে? মরফিন-আফিং- হেরোইনে দেশ যে ছেয়ে গেল।

চাপে পড়ে খোঁজ-খোঁজ শুরু হল। তখনই জানা গেল চাঞ্চল্যকর খবরটা। ঘুণাক্ষরেও যা কেউ কল্পনা করতে পারেনি, ঘটছে তাই। বড় শহর নয়, আফিং আর আফিংজাতীয় সব কিছুই বিপুল পরিমাণে চালান

হচ্ছে বিকানীর শহর থেকে।

বিকানীর! যার নাম শুনলেই নেচে ওঠে টুরিস্টরা, চোরাই চালান আসছে সেই শহরেই। সেখান থেকে বিভিন্ন পথে মালটা ছড়িয়ে পড়ছে সারা দেশে।

তবে কি টুরিস্টদের হাতেই আসছে চোরাই চালান? অসম্ভব। টুরিস্টরা আসছে কোত্থেকে? অধিকাংশই দিল্লি এবং বোম্বাই থেকে। অথচ পাকা খবর রয়েছে, মাল যাচ্ছে বিকানীর থেকে দিল্লি এবং বোম্বাইতে। ওদিকে থেকে এদিকে আসছে না।

তবে? তখন গবেষকরা বসলেন আফিংয়ের জাত নির্ণয় করতে। জানা গেল এ আফিংয়ের চাষ হয়েছে তুরস্কর মাটিতে। অর্থাৎ তুরস্কর আফিং মরফিন আর হেরোইনের আকারে ভারতে ঢুকছে বিকানীর দিয়ে।

কিন্তু কীভাবে? এই নিয়ে পাগল হবার উপক্রম হয়েছে স্থানীয় পুলিশ। সুরাহা আর হচ্ছে না। তুরস্ক আর ভারতের মাঝে রয়েছে পারস্য, আফগানিস্থান, পাকিস্তান। তিন-তিনটে দেশ পেরিয়ে কাঁড়ি কাঁড়ি হেরোইন ভারতে প্রবেশ করছে। অথচ পথটা কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না।

জয়ন্ত বলল—'মৃগাঙ্ক, আফিং থেকে যে ক'টা মাদক দ্রব্য তৈরি হয়, তার মধ্যে সবচাইতে মারাত্মক হল হেরোইন। আউন্স পিছু এর দাম নিউইয়র্কে তিনশো থেকে ছশো ডলার। প্যারিসেও তাই। ইন্ডিয়ায় প্রতি আউন্স তিন হাজার থেকে ছ'হাজারে খুচরো বিক্রি হচ্ছে নীচের মহলে।'

শুনে হাঁ হয়ে গেলাম আমি। বললাম—'বল কি! তার মানে এক-এক চালানেই তো রাজা বনে যাওয়া যায়।'

'যায়ই তো। বিকানীর এয়ারপোর্ট থেকে একটা উড়োজাহাজে লেজের মধ্যে লুকিয়ে এক খেপে কত টাকার মাল নিয়ে গিয়েছিল জান?'

'কত টাকার?'

শুনে কথা আটকে গেল আমার। জয়ন্ত দেখলাম খুবই উত্তেজিত। বলল—'হিরোইনের যারা চোরাই চালান দেয়, তাদের একটা আন্তর্জাতিক দল আছে। নারকোটিক ব্যুরোর কাছে তাদের নামের লিস্টও আছে। নিউইয়র্ক থেকে চাপ এসেছে আমাদের ওপর। ইন্ডিয়া ঘাঁটি হয়ে দাঁড়িয়েছে হেরোইন পাচারের। ওরা বলছে, তুরস্কর আফিং ইরানের একটা ফ্যাক্টরিতে এসে হেরোইন হচ্ছে। সেখান থেকে ভারত হয়ে চলে যাচ্ছে বোর্নিও। বোর্নিও থেকে আরও ওদিকে। কি ফ্যাচাং বল তো।'

আমি বললাম—'ফ্যাচাং বলে ফ্যাচাং! কিন্তু তা নিয়ে আমাদের মাথাব্যথার দরকার কি ভাই? ইন্দ্রনাথকে নিয়ে পিট্টান দিতে পারলেই বাঁচি।'

জয়ন্ত বললে—'তাহলে তো হেরে ভূত হয়ে দেশে ফিরতে হয়।'

'হেরে ভূত হতে যাব কেন?'

'ইডিয়ট। ইন্দ্রনাথকে ঘায়েল করেছে যারা, তারা আঁচ করেছিল ইন্দ্রনাথ বিকানীর এসেছে ওদের ঘাঁটি খুঁজতে। বিকানীর পুলিশকে যারা থোড়াই কেয়ার করে, ইন্দ্রনাথকে তারা ভয় পেয়েছে। তাই চেয়েছিল পথের কাঁটা সরাতে। কিন্তু কী হতে কী হয়ে গেল।'

খট করে একটা শব্দ হল। দেখি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ইন্দ্রনাথ। কখন জানি ফিরেছে রাস্তা থেকে। কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল তাও জানি না। নিঃশব্দে হাসছে জয়ন্তর দিকে চেয়ে।

মুখের হাসিটা পাগলের হাসি, কিন্তু চোখের হাসিটা যেন কীরকম।

দিন কয়েক পরের কথা।

কবিতার প্লাস্টার করা হাত নিয়ে ট্রেনের ধকল সইবে না বলেই বোধহয় জয়ন্ত কলকাতা যাত্রা স্থগিত রেখেছিল। বেরিয়ে যেত সেই সকালে, ফিরত রাতে। শুনতাম কলকাতা বোম্বাই দিল্লির নারকোটিক স্কোয়াড ডিটেকটিভরা এসে রোজ গুলতানি করছে বিকানীরে। এমনকী লন্ডন আর নিউইয়র্ক থেকেও দুজন এক্সপার্ট এসেছে চোরাই চালানের হদিশ বার করতে। কিন্তু ঘোল খেয়ে যাচ্ছে সবাই।

যে দিনের কথা বলছি, সেদিন সকাল থেকেই টিকি দেখা যায়নি ইন্দ্রনাথের। দুপুরের দিকে হন্তদন্ত হয়ে ফিরল জয়ন্ত। এসেই নাকে মুখে গুঁজে সেই যে বেরিয়ে গেল, সারা রাত আর পাত্তা নেই। যাবার সময়ে অবশ্য একটু অদ্ভুত হেসেছিল। বলেছিল, 'কাল সকালে একটা সারপ্রাইজ নিউজ দেব। তৈরি থাকিস।'

সুতরাং সারারাত জয়ন্ত না ফেরায় খুব দুশ্চিন্তা হয়নি। ধরে নিয়েছিলাম, হেরোইন নিয়ে নিশ্চয় সাতঘাটের জল খেয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু সেইসঙ্গে উন্মাদ ইন্দ্রনাথও নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় চোখ থেকে ঘুম উড়ে গেল। কর্তা-গিন্নি দুজনেই ঠায় বসে। রাগ হতে লাগল জয়ন্তর ওপর। আফিংয়ের পাহাড়ে ভারত চাপা পড়ে পড়ুক, তাতে আমাদের কী? ইন্দ্রনাথ আগে না আফিং আগে? চটপট কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ভালো ডাক্তার দেখালে এখনও হয়তো একটা অমূল্য ব্রেন রক্ষা পেতে পারে।

ছটফট করে কাটালাম সমস্ত রাত। ভোরের দিকে যখন নিজেই পুলিশ ফাঁড়ির দিকে যাব ভাবছি, এমন সময়ে একটা জিপ এসে থামল ফটকের সামনে।

পুলিশ জিপ। প্রথমে নামল জয়ন্ত। পেছনে ইন্দ্রনাথ রুদ্র। হাতে একটা জ্বলন্ত সিগারেট।

সিগারেট! ইন্দ্রনাথ ফের সিগারেট ধরেছে? অথচ ডিনামাইট বিস্ফোরণের পর থেকে সিগারেটের সঙ্গে ওর কোনও সম্পর্কই ছিল না!

জয়ন্ত বলেছিল, একটা সারপ্রাইজ নিউজ দেবে। সে নিউজটা যে এমনি পিলে-চমকানো হবে, তা ভাবিনি।

ঘরে ঢুকল ওরা দুজনে। ঢুকেই নাটকীয় ভঙ্গিমায় জয়ন্ত বলল—'বন্ধুবর মৃগাঙ্ক এবং বন্ধুপত্নী কবিতা। তোমাদের প্রথমেই একটা সু-খবর জানাই। খবরটা হচ্ছে এইঃ থ্রি চিয়ার্স ফর ইন্দ্রনাথ রুদ্র! হিপ হিপ হুররে! হিপ হিপ হুররে! হিপ হিপ হুররে!!!'

কোটরাগত দুই চোখ নাচিয়ে ইন্দ্রনাথ শুধু হাসল। শব্দহীন হাসি। সিগারেটে জমপেশ টান দিয়ে বসল সোফায়।

চিরকালই দেখেছি, অধিক উত্তেজনায় আমি তোতলা হয়ে যাই। বিয়ের আগে কবিতার কাছে কতবার হয়েছি। এখনও গিন্নির মুখ-নাড়ায় মাঝে মাঝে হই। কিন্তু সেদিন তোতলা হলাম ইন্দ্রনাথের ওই পাগল মূর্তির মধ্যেও একটা অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করে।

জয়ন্ত মুখ টিপে হাসল। বলল—'মৃগ, আফিং-রহস্য ভেদ হল। কাল রাতে পুরো গ্যাংটা ধরা পড়েছে।'

'কোথায়?' যন্ত্রচালিতের মতো প্রশ্ন করলাম।

'উটের আড্ডায়।'

'উটের আড্ডায়!' বলে ক্ষণেক হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। তারপর বিজ্ঞের হাসি হেসে বললাম—'তাই বল। উট আফিং বয়ে আনছিল। অথচ কেউ অ্যাদ্দিন দেখেনি।'

'উট আফিং বয়ে আনছিল—ঠিকই ধরেছিস।' বলে অদ্ভুত হাসল জয়ন্ত। 'তবে কেউ দেখেনি। দেখবে কী করে? ফ্লোরোস্কোপ করার বিদ্যে যে কারো জানা ছিল না।'

'কি কোপ বললি?'

'ফ্লোরাস্কোপ। মানে যা দিয়ে চামড়া ভেদ করে মেট্যাল ক্যাপসুলগুলো দেখা যায়।'

'মেটাল ক্যাপসুল! ফ্লোরোস্কোপ! ভাই জয়ন্ত, আমার মাথা ঘুরছে। একে সারা রাত জেগেছি। আর তার ওপর আর হেঁয়ালি ভালো লাগে না। কী হয়েছে খুলে বল। আফিং, উট, ফ্লোরোস্কোপ, মেট্যাল ক্যাপসুল—মানে কী এ-সবের?'

'হে লেখক, গাঁজাখুরী গপপো না বানিয়ে এ কেস নিয়ে দুকলম লিখো। সুনাম হবে। তুরস্ক থেকে পাকিস্তান পর্যন্ত এসে হেরোইন আর মরফিন কীভাবে থর মরুভূমি পেরিয়ে বিকানীরে ঢুকেছিল তা জান?'

'জানবার জন্যেই তো আমি বসে।'

'উটের চলাচল মরুভূমির সীমান্তে খুব সন্দেহজনক কিছু নয়। তাই থর মরুভূমির ও-প্রান্তে ধাতুর ক্যাপসুল খাইয়ে দেওয়া হত উটদের। সাধারণ ক্যাপসুল নয়। ক্যাপসুলের ভেতরে থাকত হেরোইন আর মরফিন।

উটের পাচকযন্ত্র যে কি বিদঘুটে, তা তোমার অজানা নয়। দীর্ঘদিন না খেয়েও শরীরের মধ্যে জমানো খাবার ভাঙিয়ে ওদের চলে যায়। মেটাল ক্যাপসুলগুলো অন্যান্য খাবারের সঙ্গে শরীরের মধ্যেই খাবার জমানোর খুপরিতে গিয়ে জমা থাকত। মরুভূমি পেরিয়ে বিকানীরে আসার পর উট মেরে খুপরির মধ্যে থেকে বার করে নেওয়া হত মেটাল ক্যাপসুল।'

'উট মেরে?'

'অবাক হওয়ার কী আছে? এক-একটা উট কত টাকার হেরোইন নিয়ে আসত জান?'

আমি নীরব।

জয়ন্ত বলল—'লাখখানেক টাকার কম তো নয়। কাজেই একটা উট মরলেও লাভের ভাগ এমন কিছু কমছে না। অথচ কারো চোখে পড়ছে না। তন্নতন্ন করে সার্চ করেও কিছু ধরা পড়ছে না। ফ্লোরোস্কোপ কই?'

'ফের ফ্লোরোস্কোপ। বলছি না হেঁয়ালি করিসনি।' খেঁকিয়ে উঠলাম আমি। 'সারা রাত জেগে মাথার কি ঠিক থাকে?'

থতমত খেয়ে জয়ন্ত বলল—'বারে, হেঁয়ালি আর রইল কোথায়? সবই তো বললাম।'

'আজ্ঞে না, সব এখনও বলা হয়নি।'

'কী বাকি রইল বন্ধু?'

'উটকে সন্দেহ হল কেন?'

'বিকানীরে উট কমে গিয়েছিল বলে, উটের দাম হঠাৎ চড় চড় করে বেড়ে গিয়েছিল বলে, মরুভূমিতে বেড়াতে যাওয়ার জন্যে ইন্দ্রনাথ রুদ্র উট পায়নি বলে।'

'মরুভূমিতে-বেড়াতে-যাওয়ার-জন্যে-ইন্দ্রনাথ-রুদ্র-উট-পায়নি-বলে!' যেন আবৃত্তি করলাম...থেমে থেমে প্রতিটি শব্দ ওজন করে করে বললাম। তারপর বুঝি বিদ্যুৎ খেলে গেল মাথায়। বললাম সন্দিগ্ধ কণ্ঠে —'ইন্দ্রনাথ কেন বলবে? ইন্দ্রনাথ তো বোবা।'

আচমকা অট্টহাসি মানুষকে যে কি সাঙ্ঘাতিক চমকে দেয়, এতদিনে হাড়ে হাড়ে বুঝলাম।

কিঞ্চিৎ ধাতস্থ হয়ে দেখলাম ইন্দ্রনাথ রুদ্র হাসছে। হাসির ধমকে ফুলে ফুলে উঠছে সর্বদেহ। সশব্দ অট্টহাসি—নিঃশব্দ নয়।

ইন্দ্রনাথ রুদ্র হাসছে! শব্দ যার কণ্ঠ থেকে বিদায় নিয়েছিল ডিনামাইট বিস্ফোরণের পর মাথায় চোট পেয়ে, সে হাসছে।

হাসি থামিয়ে বলল ইন্দ্রনাথ রুদ্র—'তুই একটা প্রকাণ্ড গর্দভ। আমাকে যারা মারতে গিয়ে মারতে পারল না, তারা আবার আমাকে মরণ-মার মারত যদি না আমি বোবা আর পাগলের ভান করতাম। আমি বোবা নই, পাগল নই, কোনওকালেই হইনি। কেবল অভিনয় করেছিলাম ওদের ঢিট করবার জন্যে। উদ্দেশ্য আমার সফল হয়েছে। এবার হে বন্ধু, চল গৃহে ফিরি।'

হঠাৎ একটা শব্দ শুনে ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, কবিতার সংজ্ঞাহীন দেহ লুটোচ্ছে সোফার নীচে। জ্ঞান নেই। অথচ দুই চোখে বইছে অশ্রুর ধারা। আনন্দ-অশ্রু!

** সিনেমা জগৎ' পত্রিকায় প্রকাশিত।*

মায়াবী মোটিভ

রহস্য নেই বলেই একে রহস্য-গল্প বলব না। রহস্য সৃষ্টিও করব না। শুধু এক গোয়েন্দার কাহিনি বলব। সরকারি গোয়েন্দা। এই কলকাতারই।

বিশ্ববন্ধু ব্যানার্জি মুচিপাড়া থানার ও-সি ভদ্রলোক মাঝবয়সী। সুগঠিত দেহ। রোগা নন, মোটাও নন। দোহারা চেহারা বলতে যা বোঝায়। কানের পাশে এবং মাথার পেছনের চুলে সাদা রং ধরেছে। মুখটি ভারি। কিন্তু পায়ভারি নন। কথা মন দিয়ে শোনেন, নীরবে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেন, সাধ্যমতো উপকার করার চেষ্টা করেন। এ হেন সমাজহিতৈষী আদর্শ দারোগার প্রয়োজন প্রতিটি থানায়।

আমি গিয়েছিলাম একটা বড় রেফারেন্স নিয়ে আমার ভাইপোর একটি উপকারের আশায়। কিন্তু পরিচয় দেবার পর দেখলাম, রেফারেন্সের প্রয়োজন ছিল না। উনি আমাকে চেনেন।

বললেন, 'আপনি তো গল্প লেখেন?'

কোলের ওপর দু-হাত জড়ো করে মৃদু হেসে বললাম—'লিখি। আপনাদের নিয়ে।'

'কিন্তু কি জানেন মৃগাঙ্কবাবু, মাঝে-মাঝে দু-একটা বাংলা গল্প পড়ে দেখেছি আপনারা ছেলে ভুলোনো গল্প লেখেন। যেমন, অমুক ডিটেকটিভ অমুক জায়গা থেকে একটা জিনিস কুড়িয়ে পেয়ে ঝট করে পকেটে রেখে দিল—সেইটাই নাকি একটা বড় প্রমাণ। কিন্তু সেটা সেইখানেই পাওয়া গিয়েছে, তার কি প্রমাণ? আপনাদের সখের গোয়েন্দা তা নিয়ে মাথা ঘামায় না।'

'মানছি। বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের এত দুর্গতি এই কারণেই। আমরা কিছু না জেনেই লিখি। মেডিক্যাল জুরিসপ্রূডেন্স পড়ি না, ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের পাতা ওল্টাই না, ফরেন্সিক সায়ান্স ল্যাবরেটরির দরজা মাড়াই না। অথচ লিখি।'

বিশ্ববন্ধুবাবু বললেন—'বিলেত আমেরিকার সব গল্পই কি এদেশে খাপ খায়? টেকনিক আলাদা, সমাজ আলাদা, আমরা আলাদা।'

'সেইজন্যেই আমি বিশ্বাস করি আপনাদের সঙ্গে না মিশে গোয়েন্দা গল্প লেখা উচিত নয়। শুধু কাহিনির জন্য নয়, আপনাদের না জেনে, আপনাদের স্বভাব চরিত্র না বুঝে, আপনাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল না হয়ে যে গল্প লেখা হয়—তা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না কিছুতেই। তা ছাড়া সরকারি এই গোয়েন্দামাত্রই মূর্খ আর সখের গোয়েন্দারা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী—ট্র্যাডিশন ভাঙবার জন্যে আমি আপনাদের গৌরবময় দিকটা তুলে ধরবার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি এক-আধটা গল্প লিখেছি। ইন্ডিয়ান পুলিশ জার্নাল, ওয়ার্ল্ড ডিটেকটিভ এজেন্সির মান্থলি বুলেটিন আর স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের একজন সুদক্ষ পুলিশ অফিসার আমাকে এ ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।'

বিশ্ববন্ধুবাবু টেবিলের ওপর দু-হাত রেখে ঘাড় কাত করে একমনে শুনছিলেন। আমি থামতেই বললেন—'আমিও আপনাকে একটা স্টোরি বলে হেল্প করতে পারি। জাল চেকের কেস। আমি তদন্ত করেছিলাম, সঙ্গে স্বপন ছিল—স্বপন চৌধুরী—এখন এ-সি-ডি-ডি-ওয়ান।'

ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের যে দুজন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার, স্বপন চৌধুরি তাঁদের একজন। শুনে আগ্রহান্বিত হলাম। মুখে আর কিছু বললাম না। শুধু ঘাড় বেঁকিয়ে চোখ কুঁচকে তাকালাম।

বিশ্ববন্ধুবাবু বৈঠকি সুরে বললেন—'স্বপন তখন আমার মতোই সাব-ইন্সপেক্টর। দুজনেই আছি ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে। এমন সময়ে লন্ডন ব্যাঙ্কে চব্বিশ হাজার টাকার একটা চেক ভাঙানো হল। বেয়ারার চেক।

সইটা জাল। জালিয়াত টাকা নিয়ে চলে যাবার সাতদিন পর জানা গেল সইটা জাল।'

আমি বললাম—'লন্ডন ব্যাঙ্ক? বলেন কি! এত বড় ব্যাঙ্কেও জাল সই ধরা পড়ে না? কোন ব্র্যাঞ্চ? চৌরঙ্গী রোড?'

'না। নেতাজি সুভাষ রোড। সইটা যে জাল, ব্যাঙ্কের কেউ ধরতে পারেনি। যার নামে অ্যাকাউন্ট, তিনি টিম্বার মার্চেন্ট। পাণ্ডু থেকে ওয়াগনে কাঠ এনে কলকাতায় কাঠের দোকানে চালান দেন। দিন সাতেক পরে অ্যাকসিডেন্ট্যালি তিনি ব্যাঙ্কের স্টেটমেন্ট দেখতে গিয়ে দেখলেন, চব্বিশ হাজার টাকা নগদে তোলা হয়েছে। অথচ উনি জানতেন এরকম কোনও টাকা তোলা হয়নি। চেক নাম্বার মিলিয়ে চেক বইয়ের কাউন্টার পার্ট দেখতে গিয়ে দেখলেন—কাউন্টার পার্টই নেই। তার পরেরটাও নেই। মোট দুটো চেক ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে চেক বই থেকে।'

'একদম ভেতর থেকে?'

'হ্যাঁ।—ওভাবে চেক বার করে নিলে কারও পক্ষে ধরা সম্ভব নয়। টিম্বার মার্চেন্ট ভদ্রলোকও জীবনে ধরতে পারতেন না যদি না চব্বিশ হাজার টাকা খোয়া যেত।—যাক, যথাসময়ে আমরা হাজির হলাম। জানেন তো, তদন্তের শুরুতে সবাইকে সন্দেহ করতে হয়। কাউকে সাধু পুরুষ বলে মনে-মনে ছেড়ে দেওয়াটাও অন্যায়। প্রাথমিক তদন্তে আমরা জেরা কনসেনট্রেট করলাম সেই সব লোকদের ওপর যারা টিম্বার মার্চেন্টের চেক সরানোর সুযোগ পেয়েছে।

'এরকম লোক পেলাম একজনকেই। টিম্বার মার্চেন্টের তিনি পি-এ। বয়স খুব একটা নয়। বছর পঁয়ত্রিশ। সুশ্রী। শ্যামবর্ণ। চোখে চৌকো ফ্রেমের বাহারি চশমা। খুব চটপটে। মিষ্টভাষী। মিশুকে এবং অতিশয় কাজের লোক। ইকনমিক্সে এম-এ।

'টিম্বার মার্চেন্ট ভদ্রলোকের নাম কুঞ্জবিহারী গড়াই। লেখা-পড়া বলা বাহুল্য কম করেছেন, কিন্তু টাকা করেছেন প্রচুর। জঙ্গলের ইজারা নিয়ে বসে বসে টাকা রোজগার তো—টাকার ওপর মায়া মমতা তাই একটু কম। চেক বইটা যে সযত্নে লুকিয়ে রাখতে হয়, সে খেয়ালও ছিল না। রেখে দিতেন নিজের সেক্রেটারিয়েট টেবিলের বাঁদিকের ড্রয়ারে। কস্মিনকালেও ড্রয়ারে তালা দিতেন না। বিশ বছরের কাঠের কারবারে কখনও বিশটা পয়সাও খোয়া যায়নি ড্রয়ার থেকে—চেক হারাবার প্রশ্নই ওঠে না।

'পি-এ ছোকরার নাম প্রদ্যোৎ পাল। অল্প শিক্ষিত মালিকের প্রায় সব কাজ সে একাই করত। চেক লেখা, হিসেব রাখা—স-ব। চেক কে নিতে পারে, এই হাইপোথিসিস ধরে এগোতে গিয়ে পেলাম প্রদ্যোৎ পালকে। হাইপোথিসিস মানে, একটা কিছু অনুমান করে নিয়ে তদন্ত শুরু করতে হয়— নিশ্চয় তা জানেন।

'প্রদ্যোৎ ছোকরাকে যত জিগ্যেস করি, চেক দুটো সে নিল কখন, ততই সে নাকে কেঁদে বলতে লাগল—আমি সাতে নেই, পাঁচে নেই, কেন স্যার আমাকে কষ্ট দিচ্ছেন? সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না দেখে থার্ড ডিগ্রি প্রয়োগ করলাম।'

আমি সকৌতুকে বললাম—'থার্ড ডিগ্রি কিন্তু একটা সায়ান্স বললেও চলে। ঠিক মতো অ্যাপ্লাই করতে পারলে সুফল ফলাবেই।'

থার্ড ডিগ্রি মানে যে কচুয়া ধোলাই, সুধী পাঠককে নিশ্চয় আর তা ব্যাখ্যা করতে হবে না।

বিশ্ববন্ধুবাবু গম্ভীর মুখে বললেন—'থার্ড ডিগ্রি সায়ান্স নয়। তবে যে যাই বলুক না কেন, থার্ড ডিগ্রি পৃথিবীর সব দেশেই আছে। সোজা আঙুলে ঘি না উঠলেই থার্ড ডিগ্রি দাওয়াই ছাড়ে সব মিঞাই।'

'ইট ইঝ অ্যান আর্ট।' আমি কিন্তু থার্ড ডিগ্রির স্বপক্ষে লেগে রইলাম নাছোড়বান্দার মতো। আসলে আমি মনে মনে বিশ্বাস করি, মারের মতো ওষুধ আর নেই। শক্তের ভক্ত প্রত্যেকেই!

বিশ্ববন্ধুবাবু বললেন, 'থার্ড ডিগ্রি অনেক রকমের আছে। ধরুন চোখের ওপর স্পট লাইট ফেলে জেরা করা। ঘর অন্ধকার করে প্রদ্যোৎ পালকে গোল হয়ে ঘিরে বসে এইভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে গেলাম। কিন্তু পেট থেকে একটা কথাও বার করতে পারলাম না। মাথারা ওপর টপটপ করে জলের ফোঁটা ফেললাম এক

নাগাড়ে—তবুও মনোবল শিথিল হল না। শেষকালে টেবিলের ওপর হাত উপুড় করে রাখতে বললাম। আঙুলের নখের ডগায় জ্বলন্ত সিগারেটের ছেঁকা দিলাম। কোনও মানুষ তিন সেকেন্ডের বেশি সহ্য করতে পারে না। এক ছোকরা একটা মেয়েকে কিডন্যাপ করে লুকিয়ে রেখেছিল। বিস্তর আড়ং ধোলাই দেওয়ার পরেও যখন ঠিকানাটা কিছুতেই বার করা গেল না—তখন নখের ডগায় সিগারেট ধরলাম—দু-সেকেন্ডের মাথায় সে বললে—বলছি স্যার। কিন্তু প্রদ্যোৎ পালকে এই ট্রিটমেন্টেও নোয়াতে পারলাম না। তখন সন্দেহ হল, ছোকরা হয়তো সত্যিই নির্দোষ অথবা রাম দুঁদে।

'ছেড়ে দিলাম প্রদ্যোৎ পালকে। ব্যাঙ্ককে জানিয়ে দেওয়া হল, আর একটা চেক ভাঙাতে আসামী আসতে পারে। চেকের নাম্বার মুখস্থ করে রাখল কাউন্টার কর্মচারীরা।

'মাস কয়েক কেউ এল না। আমরাও হাল ছেড়ে দিলাম। এরকম কত কেসই শেষ পর্যন্ত আনসলভড থেকে যায়। এ কেসেরও সুরাহা কখনোই সম্ভব নয়। কোনও ক্লু নেই। ধরব কাকে?

'সুতরাং আমি স্বপন কেসের কথা ভুলে গেলাম। টিম্বার মার্চেন্ট কুঞ্জবিহারীবাবুও টাকার শোক ভুলে গেলেন। প্রদ্যোৎ পালও আমাদের আতংক কাটিয়ে উঠল।

'ঠিক এই সময়ে এন এস বসু রোডের লন্ডন ব্যাঙ্কে আবার এসে পৌঁছল ছত্রিশ হাজার টাকার একটা বেয়ারার চেক। এত মাস পরে কাউন্টার ক্লার্কদের মনে রাখার কথা নয় চেক নাম্বারটা। রোজ অমন কত চেক আসছে। কিন্তু দৈবক্রমে যার হাতে চেকটা ভাঙাবার জন্যে এগিয়ে দেওয়া হল—সেই ভদ্রলোকের হঠাৎ কীভাবে জানি মনে পড়ে গেল নাম্বারটা।

'কিন্তু চমকে উঠলেন না। ভাবান্তর দেখালেন না। স্বাভাবিকভাবে যেমন সবাইকে বলেন, সেই ভাবেই বললেন—আপনার সই?

'চেক যিনি এনেছিলেন, তিনি রীতিমতো সুদর্শন পুরুষ। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স। গায়ে টেরিলিনের দামি স্যুট, পায়ে বাটা কোম্পানির সবচেয়ে দামি জুতো, হাতে হিরের আংটি, মুখে পাইপ। পাক্কা সাহেব বললেই চলে।

'প্রশ্ন শুনে নীরবে ঘাড় হেলিয়ে জানালেন—হ্যাঁ।

'পেছনে আর একটা সই করুন।—খুব সহজভাবেই বললেন কাউন্টারের ভদ্রলোক। সবাইকেই বলেন। কিন্তু এঁকে বলার পর যেই দেখলেন কলম বার করে ঘাড় হেঁট করে সই করছেন দিশি সাহেবটি, অমনি চোখের ইঙ্গিতে দূরের দারোয়ানকে জানালেন গেট বন্ধ করতে।

'কিন্তু জ্ঞানপাপী যে, তার চোখে সব দিকেই থাকে। কাউন্টার থেকে চোখের নির্দেশ কোন দিকে গেল, চোখের কোণ দিয়ে তা দেখেই দিশি সাহেব সই না করেই দৌড় দিলেন দরজার দিকে।

'কিন্তু এইখানেই লন্ডন ব্যাঙ্কের চরম এফিসিয়েন্সির পরিচয় পাওয়া গেল। মাস কয়েক আগে জাল সই যারা ধরতে পারেনি তারাই চক্ষের পলকে দেখিয়ে দিলে জালিয়াতকে কীভাবে ধরতে হয়। মুহূর্তের মধ্যে বেজে উঠল অ্যালার্ম বেল—এক সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল সবক'টা দরজা। ধরা পড়ল দিশি সাহেব।

'কিন্তু চেকটা তখন তার হাতে নেই। গড়াগড়ি খাচ্ছে মেঝেতে। আমরা খবর পেয়ে দৌড়ে গেলাম। গিরে তার তম্বি দেখে অবাক হয়ে গেলাম। পরিচয় শুনে আরো অবাক হলাম। ভদ্রলোক নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ের কনট্রোলার অফ ওয়াগনস। হেডকোয়ার্টার পাণ্ডুতে। পরিচয়পত্র পকেটেই ছিল। নাম, হীরকবরণ মুখার্জি।'

'সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের পর্যন্ত সন্দেহ হল—এ কাকে ধরতে কাকে ধরে বসল ব্যাঙ্কের দারোয়ান? হীরকবরণও হম্বিতম্বি করে বললেন—হোয়াট ননসেন্স। কে না কে চেক জাল করেছে তার আমি জানি কী? আমাকে কেন আটকাচ্ছেন?'

'কুণ্ঠিত গলায় স্বপন বললে—খুবই অন্যায় হয়েছে। কিন্তু আপনি কেন আজ ব্যাঙ্কে এসেছিলেন?'

'চেক ভাঙাতে নিশ্চয় নয়।'

'তবে?'

'বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে।'

'ব্যাঙ্কে কাজ করেন?'

'হ্যাঁ। বিল ডিপার্টমেন্টে।'

'নাম?'

জিগ্যেস করবেন তো? করুন না।—দোয়েল দত্ত।

'তৎক্ষণাৎ খবর গেল বিল ডিপার্টমেন্টে। সত্যিই দোয়েল দত্ত নামে এক ভদ্রলোক কাজ করেন সেখানে। কেরাণীর কাজ। সেকশন ইনচার্জও নন। তলব পেয়ে এলেন আমাদের সামনে। মাথায় প্রায় সবটুকু টাক দখল করেছে—বয়স সেইজন্যেই বেশি মনে হয়। ফর্সা। পুরু ঠোঁট। নেয়াপাতি ভুঁড়ি আছে। নিশ্চিন্ত, তৃপ্ত মুখচ্ছবি। সেই মুহূর্তে ঈষৎ উদ্বিগ্ন পুলিশের সামনে আসায়। চেক জালিয়াৎ ধরা পড়েছে। ব্যাঙ্কের সবাই জেনে গিয়েছিল—ইনিও জেনেছেন।

'ঘরে ঢুকেই স্বভাবতই আগে কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্যে চাইলেন হীরকবরণ মুখার্জির দিকে। ক্ষণেক পিট পিট করে চেয়ে যেন কুয়াশার মুখ দিয়ে অনেক দিন আগেকার চেনা মুখ আবিষ্কার করলেন।'

'বললেন অবাক কণ্ঠে—হীরক না?'

'কনট্রোলার অফ ওয়াগনস তাচ্ছিল্যের সঙ্গে আমাদের দিকে চাইলেন। দোয়েল দত্তর প্রশ্নের জবাব দেওয়ার দরকার আছে বলেও মনে করলেন না।'

'আমি বললাম দোয়েল দত্তকে—বসুন।'

'হীরকবরণ আর আমাদের দিকে পর্যায়ক্রমে চেয়ে বসে পড়লেন দোয়েল দত্ত। ভদ্রলোক শান্তিপ্রিয়। তাই অস্বস্তি পেয়ে বসেছে লক্ষ্য করলাম।'

'এঁকে চেনেন দেখছি। কি সূত্রে চেনেন?—আমার প্রশ্ন।'

'ক্লাস ফ্রেন্ড। আরামবাগে একসঙ্গে পড়তাম। এক ক্লাশে।'

'স্কুল ফ্রেন্ড?'

'আজ্ঞে।'

'কত বছর আগে?'

'তা প্রায় বিশ বছর।'

'আপনি এখন কোথায় থাকেন?'

'বেলেঘাটায়।'

'আর উনি কোথায় থাকেন?'

'তা তো জানি না।'

'হীরকবরণ মুখার্জি কথা বলতে গেলেন। হাতের ইঙ্গিতে নিরস্ত করলাম।'

'কেন জানেন না? আপনার বন্ধুতো। বিশ বছরের বন্ধু।'

'দেখুন, বিশ বছর আগে এক ক্লাশে পড়েছি বলেই বিশ বছর পরে কে কোথায় থাকে জেনে রাখতে হবে তার কোনও মানে নেই।—দোয়েল দত্ত নিজেকে কোণঠাসা মনে করে নিয়ে কাটা-কাটা গলায় বললেন।'

'আমি সুর নরম করে বললাম—তা ঠিক। কিন্তু আমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য হল আপনাদের মধ্যে বন্ধুত্বটা কোন পর্যায়ে তা আবিষ্কার করা।'

'কথাটা শুনেই চাবুক খাওয়ার মতো চমকে উঠলেন দোয়েল দত্ত। চোখের তারা দুটো আকারে বড় হয়ে গেল প্রশ্নের অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝে।

'তা হলে আপনি কি বলতে চাইছেন জাল চেকের ব্যাপারে আমার হাত আছে।'

'আমি কিছু বললাম না।'

'দোয়েল দত্ত ঈষৎ তীব্র কণ্ঠে বললেন—জানেন বিশ বছরের মধ্যে হীরক আমার কাছে এসেছে বড় জোর দুবার?'

'খবরটা আগ্রহের সঞ্চার করল আমাদের মনে।'

'দুবার? মাত্র?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ,—দোয়েল দত্তর স্নায়ু যে মোটেই শক্ত নয়, রেগে ওঠা দেখে তা বুঝলাম—'যখন ওর চাকরি ছিল না আর আমার চাকরি হয়েছিল— এইখানে—তখন একবার। তারপর যখন রেলে কি একটা বড় চাকরি পেয়ে চলে গেল—তখন আর একবার।

'হীরকবরণ মুখার্জি এতক্ষণ কথা বলার সুযোগ না পেয়ে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। এবার হাত তুলে যেই কথা বলতে গেছেন, আমি বললাম—আপনি এখন কথা বলবেন না। শুনতে দিন—দোয়েলবাবু, শেষবার হীরকবাবু যখন এসেছিলেন, সেটা কত বছর আগে?

'মনে মনে হিসেব করে নিয়ে দোয়েল দত্ত বললেন—প্রায় সতেরো আঠারো বছর আগে।

'আশ্চর্য! এত বছর পরে দেখেও চিনতে পারলেন?'

'চিনতে একটু অসুবিধে হয়েছিল। কেননা, হীরক কখনও সুট-টাই পরত না।'

'এখন পরেন, বড় চাকরি করেন বলে—খুবই বড়।—শেষ শব্দ দুটোয় যে অহেতুক মোচড় দিইনি, হীরকবাবুর মুখে তার প্রতিক্রিয়া দেখেই বুঝলাম।'

'উষ্ণকণ্ঠে বললেন হীরকবরণ মুখার্জি—আজ্ঞে হ্যাঁ, খুবই বড়। আপনার চাকরির চাইতেও বড়। ট্রাঙ্ককলে জানলেই পারেন!'

'জানব—যথাসময়ে। আপাতত শুধু বলুন, যে বন্ধুর সঙ্গে আঠারো বছর যোগাযোগ রাখেননি, আজ কেন তার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। '

'এমনি।'

'কোনও কাজ না নিয়ে?'

'কাজ নিয়ে কেউ আড্ড—মারতে আসে না।'

'আপনার মতো বড় অফিসার অফিস টাইমে একজন কেরাণী বন্ধুর সঙ্গে আঠারো বছর পরে আড্ডা মারতে এসেছেন—আশ্চর্য নয় কি? দোয়েলবাবু আপনাকে কেরাণী বলছি বলে কিছু মনে করবেন না। কিন্তু আপনারও কি খটকা লাগছে না পদমর্যাদায় স্ফীত যে বন্ধু আঠারো বছর আপনার ছায়া মাড়ায়নি মর্যাদার হানি ঘটবে বলে, আজ সে হঠাৎ আড্ডা মারতে এল কেন?'

'দোয়েল দত্ত চতুর ব্যক্তি। বুঝলেন, জল কোন দিকে গড়িয়েছে। তিনি সন্দেহমুক্ত। কিন্তু হীরকবরণ জড়াতে চাইছেন তাঁকে!'

'তাই ঈষৎ কঠিন কণ্ঠে বললেন—হ্যাঁ লেগেছে।'

'গতবারও যদি ধরা পড়তেন, একই সাফাই গাইতেন হীরকবাবু, তাই না? অ্যালিবি রেডি করেই এসেছিলেন।'

'গতবার ধরা পড়তাম মানে? হোয়াট দি হেল ইউ মীন?'

'আই মীন ইউ আর এ পাক্কা ক্রিমিন্যাল, মিঃ হীরকবরণ মুখার্জি,—চিবিয়ে চিবিয়ে বললাম আমি। —'চব্বিশ হাজার টাকার চেকে সই জাল করে ভাঙিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো বুকের পাটা যার-তার থাকে না।'

'মুখ লাল হয়ে গেল কনট্রোলার অফ ওয়াগনসের।—'স্পিক প্রপারলি। আপনার মতো পেটি পুলিশ অফিসারের তক্তা নড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আমার আছে জানবেন।

'বিনীতকণ্ঠে বললাম—জানলাম। আপনিও জানুন, এই মুহূর্ত থেকে আপনি আনডার অ্যারেস্ট। রেডিওগ্রাম পাঠাচ্ছি পাণ্ডুতে। জবাব এলে তারপর দেখা যাবে।'

'রেডিওগ্রামের জবাব আসতে সাত আট দিন দেরি হবে ভাবিনি। বসেও থাকিনি। সমানে জেরা করে গিয়েছি কন্ট্রোলার অফ ওয়াগনসকে।

'প্রথম দিনের কথা বলা যাক।

'একরাত পুলিশ হাজতে থেকে মুখটা একটু শুকিয়ে গেলেও মেজাজটা একটু গরম হয়েছে দেখলাম হীরকবরণ মুখার্জির। তেল শুকায় সব মিঞারই লক-আপে রাত্রিবাস করলে। পাঁচরকম থার্ডক্লাস ক্রিমিন্যাল, প্রজাদের গন্ধ এবং উদ্বেগ—ভদ্রসন্তানরা সইতে পারে না।'

'কিন্তু হীরকবরণ মুখার্জির ধাত খুব কড়া। খুব বেশি টসকাননি।'

'টেবিলের সামনে থেকে ইচ্ছে করে সব চেয়ার সরিয়ে নিয়েছিলাম। দাঁড়িয়ে রইলেন হীরকবরণ। তীব্র চোখ পর্যায়ক্রমে চাইতে লাগলেন আমার আর স্বপনের দিকে। আমরাও টেবিলের ওপর আঙুল দিয়ে টকটক করতে নিরীক্ষণ করলাম তাঁর মুখচ্ছবি। দেখলাম, হীরকবরণের চোখে একটা চাপা তীক্ষ্নতা আছে। না রাগলে তা প্রকাশ পায় না। এ জাতীয় তীক্ষ্নতা বাজপাখির চোখের দিকে চাইলে দেখা যায়।

'বললাম—ভালো আছেন?'

'ডেকেছেন কেন?'

'রেগে আছেন মনে হচ্ছে?'

'সমুদ্র দেখেছেন?'

'কি কথার কি জবাব। সাবধানে বললাম—দেখেছি। আপনি'

'আমি নিজে সমুদ্র। এমনিতে শান্ত—ঝড় উঠলে ভয়ংকর। আমার রাগের নমুনা যথা সময়ে টের পাবেন। প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া আমার কলেজ ফ্রেন্ড খেয়াল রাখবেন।'

'রাখলাম। এখন যা জিগ্যেস করব তার জবাব দিন। আপনার অফিস পাণ্ডুতে। কলকাতায় এসেছিলেন কেন?

'বলব না।'

'বললে আপনার ভালো হত না?'

'সেটা আমি বুঝব। আমার প্রেস্টিজ আমার কাছে।'

'ও। প্রেস্টিজ যাবার ভয়ে বলবেন না কার কাছে এসেছিলেন?'

'হীরকবরণ জবাব দিলেন না।'

'স্বপন বললে—কোথায় উঠেছিলেন?'

'বলব না।'

'স্বপন খুব কম কথা বলে। এই জবাবের পর একটি কথাও বলল না। দাঁড়িয়ে উঠে আমাকে বললে—চলো বিশুদা। হোটেলগুলোয় ঘুরে আসি। হীরকবরণ সামান্য ভুরু কুঁচকোলেন। আমি বললাম—চলুন আপনার ফটো নেওয়া যাক।

'পুলিশ ফটোগ্রাফার তৎক্ষণাৎ হীরকবরণের ছবি তুলে খানকয়েক এনলার্জমেন্ট দিয়ে গেল টেবিলে। জিপ নিয়ে আমি আর স্বপন বেরিয়ে পড়লাম। কলকাতা আর হাওড়ার সবক'টা প্রথম আর দ্বিতীয় শ্রেণির হোটেলে গিয়ে ছবি দেখালাম। রদ্দিমার্কা হোটেলগুলো বাদ দিলাম—কেননা হীরকবরণ মুখার্জির মতো চালিয়াৎ লোক এসব হোটেলে যাবে না অনেক খোঁজবার পর হাওড়ার একটা হোটেলে ফটো দেখেই চিনে ফেললেন ম্যানেজার। হোটেল রেজিস্টার খুলে দেখালেন, হীরকবরণ সেখানে নিজের নাম লিখিয়েছে প্রবাসজীবন হালদার।'

'ম্যানেজার অবশ্য হলফ করে বললেন, ছবিটা প্রবাসজীবনেরই। আরও বললেন, মাস কয়েক আগে ভদ্রলোক হোটেলে উঠেছিলেন। দিন কয়েক ছিলেন।'

'হোটেল-বাস সাঙ্গ করে চলে যাওয়ার সময়ে সব হোটেল রেজিস্টারে লিখতে হয় কোথায় যাওয়া হচ্ছে। প্রবাসজীবন সেই ঘরে লিখেছিল—বেলঘরিয়া।'

'ফটোর পেছনে হোটেল ম্যানেজারকে দিয়ে লিখিয়ে নিলাম, এঁর নাম প্রবাসজীবন হালদার। অমুকদিন থেকে অমুকদিন পর্যন্ত এই হোটেলে ছিলেন। যাওয়ার সময়ে বেলঘরিয়ায় যাচ্ছি লিখে গিয়েছিলেন। হোটেলের সীল দিয়ে সই করে দিলেন ম্যানেজার।

'অফিসে এসে হীরকবরণকে দেখালাম লেখাটা। যেন অদৃশ্য হাতে একটা চড় খেলেন ভদ্রলোক। মুখ লাল হয়ে গেল। ভালো খেয়ে দেয়ে এমনিতেই লাল-লাল চেহারা। তার ওপর মিথ্যে ধরা পড়ে যাওয়ার লাঞ্ছনা। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে ছেড়ে দিয়ে বললেন—হ্যাঁ, আমার ছবি, আমারই ছদ্মনাম, তাতে হয়েছে কী?'

'ছদ্মনাম নিলেন কেন?'

'আমার খুশি। ভারতীয় সংবিধানে নতুন নাম নেওয়ার বিরুদ্ধে কোনও বিধান আছে কি?

'আমার জানা নেই। শুধু এইটুকু জানি চোর-বাটপাররা নাম ভাঁড়ায়, সাধু-সত্যবানরা নয়—বেলঘরিয়ায় গিয়েছিলেন কার কাছে?

'যাইনি। একটা কিছু লিখতে হয়, তাই লিখেছিলাম।

'আমি চোখ পাকিয়ে চেয়ে রইলাম, হীরকবরণ ঠোঁটের কোণে তাচ্ছিল্যের হাসি দুলিয়ে চেয়ে রইলেন। কম কথার মানুষ স্বপন ততক্ষণে ফের আঙুল দিয়ে টরেটক্কা বাজিয়ে চলেছে টেবিলের ওপর। যেন সংকেতে বলতে চাইছে, বিশুদা, এ-বড় শক্ত চাঁই। এ ভাঙবে তবু মচকাবে না। চেক ওর, জাল সইটাও ওর, আগের টাকাও এ নিয়েছে—কিন্তু প্রমাণ নেই, এভিডেন্স নেই, ক্লু নেই। রেডিওগ্রামের জবাব আসার পর যখন শুনবে হ্যাঁ, ইনিই দোর্দণ্ডপ্রতাপ কনট্রোলার অফ ওয়াগনস, তখন মানে মানে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া পথ পাবে না, বিশুদা, এ বড় শক্ত চাঁই।

'হালে পানি না পেলে শেষ পর্যন্ত থার্ড ডিগ্রির শরণাপন্ন হতে হয়। স্বীকার করছি কাজটার মধ্যে খুব বীরত্ব নেই। কিন্তু রেজাল্ট নিয়ে আমাদের দরকার। একটা লোক কুকর্ম করেছে বুঝতে পারছি, হাতেনাতে ধরেও ফেলেছি, অথচ সাজা দেওয়া যাবে না প্রমাণের অভাবে—হাসতে হাসতে হারিয়ে যাবে জনঅরণ্যের মধ্যে। আরও কতজনের সর্বনাশ করবে—ভাবা যায় না। এইজন্যেই জানবেন থার্ড ডিগ্রির হেল্প নিতে হয়। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার জন্যে, অপরাধীকে অপরাধ কবুল করানোর জন্যে অশাস্ত্রীয় যদি কিছু করি তো জানবেন সেটা মহৎ উদ্দেশ্যেই করা—নিজের স্বার্থে নয়।

'কিন্তু হীরকবরণ সবক'টা পরীক্ষায় পাস করে গেলেন। মানে কোনওরকমেই তাঁকে কবুল করানো গেল না। সাত দিন হয়ে গেছে। রেডিওগ্রামের জবাব তখনও আসেনি। আমরা বেদম হয়ে পড়েছি। রাত হয়েছে। আমার চেয়ারের বাঁ-ধারে মেঝের ওপর উপুড় হয়ে বসে আছেন হীরকবরণ। এককথায় তখন তাঁর জর্জরিত অবস্থা বললেই চলে। চুপসে গেছেন। মুখের সে চেকনাই আর নেই। চোখের চাপা তীক্ষ্নতাও নেই। আমার চেয়ারের ডানদিকে দাঁড়িয়েছিল স্বপন।'

'বলল—বিশুদা, তাহলে লকআপ পাশ লিখে একে সেন্ট্রাল লকআপে পাঠানো যাক?'

'তাই করো—বললাম আমি।'

'স্বপন কিন্তু লকআপ পাশ না লিখে টেলিফোন রিসিভার তুলে নিল। শুনলাম অপারেটরকে বলছে—মিসিং স্কোয়াড দিন। শুনলাম বটে, কিন্তু মিসিং স্কোয়াড কেন চাইছে, তা ভাবলাম না। জিগ্যেস করলাম না। হাতের কেসের সঙ্গে মিসিং স্কোয়াডের যে কোনও সম্বন্ধ থাকতে পারে, তা কল্পনাতেও আনতে পারিনি। আমি কেন, নাটের গুরু স্বয়ং হীরকবরণও তিলমাত্র সন্দেহ করেননি— আঁচ করতেও পারেননি কম কথার মানুষ স্বপন চৌধুরী, ভবিষ্যতের এ-সি-ডি-ডি (ওয়ান) স্বপন চৌধুরী কোন লাইনে যাচ্ছে, কি মোক্ষম প্যাঁচে ঘায়েল করতে যাচ্ছে বোবা হীরকবরণকে। নিঝুম হয়ে হীরকবরণ তখন মেঝের পানে চেয়ে ভাবছিলেন বোধহয় ওঁর দুর্দৈবের কথা। আর ভাবছিলাম মোগল আমল হলে এত প্রমাণ-টমাণের কেউ ধার ধারত না। হাতির তলায়

ফেলে হীরকবরণের বুকের ওপর হাতির একটা পা চালিয়ে দিলেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসত স্বীকারোক্তি। স্বপন তখন ফিনিশিং টাচ দিচ্ছে টেলিফোনে। ওস্তাদের মার শেষ রাত্রেই হয়। কথাটা যে কত বড় সত্যি, স্বপনের কেরদানি দেখে সেদিন বুঝলাম। হয়তো গোড়া থেকেই আঁচ করে রেখেছিল, কোন লাইনে ল্যাং মারবে হীরকবরণকে—কিন্তু ইচ্ছে করেই বলেনি এতক্ষণ। হীরকবরণের হিরে চকচকে চেহারায় কালি না পড়া পর্যন্ত, মনোবল ভেঙে না যাওয়া পর্যন্ত চুপ করে থেকেছে। তারপর সময় বুঝে ছেড়েছে তুরুপের তাস। রিয়্যাল ডিটেকটিভ একেই বলে। স্রেফ ঝোপ বুঝে কোপ মারা, বুদ্ধির খেলায় হারিয়ে দেওয়া, নাটক সৃষ্টি করে ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে আচম্বিতে অতর্কিতে অপরাধীর মন ভেঙে চুরমার করে দেওয়া।'

'দেহে মনে আমিও তখন অবসন্ন। তাই অন্যমনস্ক ভাবে শুনলাম স্বপন বলছে—হ্যালো মিসিং স্কোয়াড? তারপর শুনলাম একটা চেহারার ডেসক্রিপশন বলে গেল। কিছুক্ষণ কান পেতে শুনল। সবশেষে রিসিভার নামিয়ে রেখে চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বললে—দাও, লকআপ পাশটা লিখে ফেলি।'

'লিখতে লিখতে মাথা নীচু করে বললে—বাদলবাবু, বেঙ্গল কেবিনে ওয়াইফকেও বলে আসেননি?'

'ঘরের মধ্যে আমি আর হীরকবরণ ছাড়া বাদলবাবু বলে কেউ নেই। কিন্তু 'বাদলবাবু' নামটা শুনে হীরকবরণের গায়ের ওপর যেন এক গামলা গরম জল ঢেলে দেওয়া হল। তিড়বিড়িয়ে লাফিয়ে উঠেই ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে বিবর্ণ মুখে চেয়ে রইলেন স্বপনের পানে।

'স্বপন লেখা থামিয়ে খুব সহজভাবে মুখ তুলে বলল—আসবার সময়ে বলে এলেই পারতেন। ভাবনা চিন্তা হয়তো!'

'হীরকবরণের মুখের চেহারা তখন আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। ঠোঁটের পাশে চামড়া কাঁপছে থিরথির করে, চোখদুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে বাইরে—মুখের কোথাও আর সেই অনমনীয় দৃপ্ত মনোভাবের তিলমাত্র ছায়া নেই। নকআউট করেছে স্বপন। মিডল উইকেট ডাউন।'

'ঢোঁক গিলে স্বপনকে বললেন হীরকবরণ—স্যার, একটু পাশের ঘরে আসবেন? উঠে দাঁড়িয়ে স্বপন বললে—চলুন। আমাকে চোখের ইঙ্গিতে বসতে বলে হীরকবরণকে নিয়ে গেল পাশের ঘরে। পরে শুনলাম, কী হয়েছিল সেখানে। সটান স্বপনের দু-পা জড়িয়ে ধরেছিলেন হীরকবরণ। বলেছিলেন— 'আমি সব বলব স্যার কিন্তু দয়া করে হ্যান্ডকাফ লাগিয়ে বাড়ি নিয়ে যাবেন না। বন্ধুর মতো সঙ্গে চলুন। সব ফিরিয়ে দেব। কিন্তু বাড়ির লোকের সামনে, পাড়াপড়শির সামনে হাতকড়াটা লাগাবেন না।

'নিজে থেকেই সব কবুল করে বললেন হীরকবরণ। 'বাদলবাবু'—এই ছদ্মনামটি এবং হ্যারিসন রোডের 'বেঙ্গল কেবিনে'র নাম শুনেই হীরকবরণ ধরে নিয়েছিলেন—স্বপন চৌধুরী সারাদিন এত কম কথা বলেছে সব জানে বলে। সুতরাং মান বাঁচাতে প্রাণ খুলে কথা বলাই ভালো।

'জিপে হীরকবরণকে বসালাম আমার আর স্বপনের মাঝখানে। কিন্তু সাবধান থাকার আর দরকার ছিল না। হীরকবরণ তখন সব টাকা ফিরিয়ে দিয়ে ইজ্জত বাঁচাতে চান। নিজেই পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন হ্যারিসন রোডের 'বেঙ্গল কেবিন' হোটেলে। ফ্যামিলি হোটেল। আগে এগিয়ে দিলাম হীরকবরণকে। ম্যানেজার গোল কাউন্টারের সামনে বসে আলপিন দিয়ে দাঁত খুঁটছিলেন। যেন কাঠকয়লা দিয়ে তৈরি একটা ফ্রানকেন্সটাইন মূর্তি। যেমন বিরাট মুখ, তেমনি বিরাট চেহারা। হীরকবরণকে দেখেই আলপিন নামিয়ে হাঁ-হাঁ করে উঠলেন—আচ্ছা বেআক্কেলে লোক তো মশাই আপনি। কোথায় ডুব দিয়েছিলেন? ওয়াইফকেও তো বলে যাবেন? থানা-পুলিশ পর্যন্ত হয়ে গেল। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। পেছন ফিরে আমাদের দেখে নিয়ে ক্লিষ্ট কণ্ঠে বললেন হীরকবরণ—ওরা কোথায়?

'কোথায় আবার—বাড়িতে। এই তো আজ সকাল কাঁদতে কাঁদতে বেলঘরে গেল। বলিহারি যাই আপনার আক্কেলকে। আমাদের গুডউইল পর্যন্ত টাইট করে ছেড়েছেন মশায়। আজ পর্যন্ত ওঙ্কার মিত্তিরের হোটেলে পুলিশ ঢোকেনি কখনো—আপনার কৃপায়—

এই পর্যন্ত শুনেই অন্তরাল থেকে সামনে এসে দাঁড়ালাম আমি আর স্বপন। স্বপনের হাতে আইডেনটিটি কার্ড। তৎক্ষণাৎ বাকি কথাটা কোঁৎ করে যেন গিলে নিয়ে চক্ষের নিমেষে হেঁ-হেঁ করে হেসে বললেন ওঙ্কার মিত্তির—আসা হোক! আসা হোক! কী সৌভাগ্য! পেয়েছেন তাহলে বাদলবাবুকে।

'পেয়েছি।—অল্পকথার মানুষ স্বপন অল্প কথাতে বললে—'হোটেল রেজিস্টার বার করুন।

কাষ্ঠহাসি মিলিয়ে গেল ওঙ্কার মিত্তিরের চারকোল ফেস থেকে। বিনা বাক্যব্যয়ে কাউন্টারের কোণ থেকে রেজিস্টার টেনে নিয়ে এগিয়ে দিল স্বপনের দিকে।

'খাতায় লেখা হীরকবরণ মুখার্জির আর এক নাম—বাদল ভৌমিক। এসেছেন সপরিবারে। স্ত্রী, দুই মেয়ে এবং ছেলেকে নিয়ে। আজ সকালেই তারা চোখের জল মুছতে মুছতে গেছেন বেলঘরিয়ায়—হীরকবাবুর পৈত্রিক ভিটেতে।

'মনে পড়ল হাওড়ার হোটেলে রেজিস্টারেও হীরকবরণ লিখেছিলেন বেলঘরিয়ায় যাচ্ছি। এই একটা ব্যাপারে তিনি মিথ্যার আশ্রয় নেননি। বিপদের আশংকা নেই জেনেই নেননি। ভয় আসল ওই নামকে নিয়ে। ওই জন্যে দু-হোটেলে লিখেছেন দুটো নাম।

'স্বপন বের কর হীরকবরণের আর একটা ফটোগ্রাফ। পেছনে ওঙ্কার মিত্তিরকে দিয়ে হোটেলের রবার স্ট্যাম্প মারিয়ে সই করিয়ে নিল যে ফটো যার তিনি বাদল ভৌমিক নামে অমুক তারিখ থেকে অমুক তারিখ পর্যন্ত বেঙ্গল কেবিনে থেকে রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হয়েছিলেন। মিসিং স্কোয়াডে খবর দেওয়া হয়েছিল। রেডিওতে অ্যানাউন্সমেন্ট হয়েছিল, হাসপাতালে খোঁজ নেওয়া হয়েছিল।

'ঠিক এই অনুমানটি করেছিল স্বপন—দি পুলিশ ডিটেকটিভ। যে লোক কলকাতার বাইরে থেকে এসে একবার হোটেলে উঠেছে, সে নিশ্চয় এবারও হোটেলে উঠেছে। এই কদিন যদি একজন বোর্ডার উধাও হয়ে গিয়ে থাকে, মাথা বাঁচাবার জন্যে ম্যানেজার মিসিং স্কোয়াডের শরণাপন্ন হবেই। সুতরাং...

সেই রাতেই জিপ হাঁকিয়ে গেলাম বেলঘরিয়ায়। হীরকবরণের বাড়ি দেখে তাক লেগে গেল। ভালো কথা, রুটিন জেরার সময় হীরকবরণ বলেছিলেন, তাঁর বাবা নেই, বউ নেই, কেউ নেই। বউ যে আছে ওঙ্কার মিত্তিরের কাছে শুনে এসেছিলাম। বাড়িতে ঢুকে দেখলাম, বাবাও আছেন। সত্তর বছরের বৃদ্ধ। হীরকবরণ তাঁর একমাত্র সন্তান। পুত্রগর্বে গর্বিত। আজকালকার বাজারে এরকম একটা চাকরি করা ভাগ্যের ব্যাপার। হীরকবরণ বাড়িতে কম কথা বলেন। ব্যক্তিত্ব রাখেন। এমনকি পিতৃদেবও অকারণে কথা বলেন না ছেলের সঙ্গে। মেয়ে, ছেলে, বউও মুখ তুলে কথা বলেন না তাঁর সামনে। পাড়াপড়শি সম্মান করে। সবাই জানে তিনি কৃতি পুরুষ। জীবন সংগ্রামে বিজয়ী পুরুষ।

'আমরা কথা রেখেছিলাম, হ্যান্ডকাফ দিইনি। এমনকী বাপকেও সব কথা বলিনি—সেই মুহূর্তে। কিন্তু অত রাতে পুলিশ জিপে ছেলেকে আধমরা চেহারায় ফিরতে দেখে বুঝলেন অভাবনীয় কিছু ঘটেছে। তারপর যখন ছেলে শোবার ঘরে ঢুকে দেওয়ালের সিন্দুক খুলে বার করল থরে থরে সাজানো আনকোরা সোনার গয়না—তাঁর তখন আর কিছুই বুঝতে বাকি রইল না।

'লিস্ট করলাম গয়নার।

'গয়নার সঙ্গেই ছিল সব ক্যাশমেমো। দাম ফেলে যোগ করলাম। মোট চোদ্দ হাজার। আর পাওয়া গেল খানকয়েক ফুলস্ক্যাপ কাগজ। তাতে প্রায় দুশো বার কুঞ্জবিহারী গড়াইয়ের নামটা সই করা। মস্ক করেছেন হীরকবরণ।

'এই পর্যন্ত যখন এগিয়েছি, বাড়িতে তখন চাপা কান্না শুরু হয়ে গেছে। বাড়িশুদ্ধ লোক জানত, হীরকবরণ এত গয়না কিনেছেন বিবাহযোগ্য দুই মেয়ের জন্যে, সেই মেয়ে দুটিই রাঙা চোখে কাঁদতে কাঁদতে এসে গায়ের বারোমেসে গয়না পর্যন্ত খুলতে আরম্ভ করল—যাতে বাবা ছাড়া পায়। বছর কুড়ি-বাইশ বয়স হবে মেয়ে দুটির। মার্জিত মুখশ্রী। কিন্তু ভয়ে উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় মাথার ঠিক নেই। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে

একটার পর একটা চুড়ি খুলে নামিয়ে রাখতে লাগল আমার আর স্বপনের পায়ের কাছে। পুলিশের কাজ করলেও আমরা মানুষ। ঘরসংসার করি। ভেতরে বিচলিত হলেও অবিচল থাকতে হল বাইরে।

'কিন্তু বাধা দিলেন হীরকবরণ নিজেই।

'বললেন—ও গয়না আমার টাকায় কেনা। চোদ্দো হাজারের হিসেব এই গয়নায় দিলাম।'

'বাকি দশ হাজার?—অনেক কষ্টে নীরস গলায় জিগ্যেস করলাম আমি।'

'তাও আছে। আসুন।'

'নীচে নেমে এলাম। বৃদ্ধ সুনীলবরণ, হীরকবরণের বাবা হাত জড়িয়ে ধরলেন স্বপনের আর আমার। কেলেঙ্কারী যেন না হয়—ওই তাঁর একমাত্র ছেলে। সচ্চরিত্র, শিক্ষিত, দায়িত্বসম্পন্ন। এতবড় ফ্যামিলি রয়েছে ওর মাথার ওপর। হীরক আজ রাতে ফিরবে তো?

'কথা দিতে পারলাম না। জিপে ওঠালাম হীরকবরণকে। একটা ঠিকানা দিলেন উনি। জায়গাটা বেলঘরিয়াতেই অ্যাডভোকেটের বাড়ি।'

'বললেন—দশহাজার টাকার জমি কিনব ঠিক করেছিলাম। টাকাটা গচ্ছিত রেখেছিলাম অ্যাডভোকেটের কাছে। জমির দালালকে বলা ছিল সেরকম জমি পেলেই যেন দেখা করে ওঁর সঙ্গে।

'অ্যাডভোকেটের নাম মুক্তারামবাবু। প্রবীণ, বিচক্ষণ, হুঁশিয়ার। প্রথম কথাতেই প্রকাশ পেল তাঁর চরিত্রে সদাসতর্ক বৈশিষ্ট্য। বেরিয়ে এলেন খালি গায়ে। ব্রাহ্মণ। চওড়া বুকে সাদা পৈতে। মুখে বুদ্ধির ছাপ। তীক্ষ্ন চোখে দেখলেন আমাকে আর স্বপনকে।

'টাকা চাইলেন হীরকবরণবাবু। মুক্তারামবাবু আঙুলে পৈতে জড়াতে জড়াতে কঠোর গলায় বললেন—তার আগে বলুন এরা কে?'

'আমার বন্ধু। জমির খোঁজ পাওয়া গেছে। তাই—'

'শুনেছি বাজপাখির চোখ মানুষের চোখের তিনগুণ বেশি শক্তিশালী হয়। নিমেষের মধ্যে জ্বলে ওঠা মুক্তারামবাবুর চোখে সেই শ্যেনদৃষ্টিই প্রত্যক্ষ করলাম। হীরকবরণের কলজে পর্যন্ত যেন এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেল সেই চাহনিতে। ইস্পাতের ছুরির মতো ধারালো হাসি হেসে বললেন চিবিয়ে চিবিয়ে—তাই এত রাতে এলেন টাকা নিতে। হীরকবাবু, আমি ক্রিমিন্যাল চরিয়ে খাই। এত বোকা আমাকে ঠাওরাবেন না। এরা কোত্থেকে আসছেন আমি জানি। আপনি দশহাজার টাকা যে সোজা পথে পাননি—সেটাও আঁচ করেছিলাম বলে ঝুটঝামেলায় যেতে চাইনি। টাকা রেখেছিলাম—কিন্তু প্রত্যেকটা নোটের পেছনে আপনাকে দিয়ে ইনিসিয়াল করিয়ে নিয়েছিলাম। নিন আপনার টাকা।

'সিন্দুক খুলে তৎক্ষণাৎ দশহাজার টাকা বার করে দিলেন মুক্তারামবাবু। প্রত্যেকটা নোটের পেছনে ছোট সই করে তারিখ দিয়েছেন হীরকবরণ। আমরা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম। সই করা তারিখ দেওয়া নোটগুলোই এখন হীরকবরণের বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ। লিকুইড কেসকে এক নিমেষে সলিড গ্রাউন্ডে দাঁড় করিয়ে দিলেন হুঁশিয়ার, দূরদর্শী মুক্তারামবাবু। এখন হীরকবরণ বলতে পারবেন না—এ নোট আমি নিইনি। নম্বরী নোট ব্যাঙ্কের হিসেবের সঙ্গেও মিলে যাবে।'

'মিলেও গেল। সন্তোষজনকভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল হীরকবরণ মুখার্জির কুকীর্তি।'

'হীরকবরণকে নিয়ে যাওয়া হল টিম্বার মার্চেন্ট কুঞ্জবিহারী গড়াইয়ের সামনে। কনট্রোলার অফ ওয়াগনসের অধঃপতনের কাহিনি শুনে ভদ্রলোক মনে হল মূর্চ্ছা যাবেন। জীবনে তিনি এরকম একজন স্বনামধন্য অফিসারকে এত হীন কাজ করতে দেখেননি। হ্যাঁ ঘুষ-টুষ নেন অনেকেই—হীরকবরণ মুখার্জি জীবনে একটা আধলাও কারো কাছে নেন নি—ঘুষ তো দূরের কথা—ধার পর্যন্ত নিতেন না। অফিসে ব্যবসায়ী মহলে তাই হীরকবরণ বলতে হীরের টুকরোই বোঝাত।

'সেই হীরকবরণ তাঁর চেকবই থেকে একটি চেক ছিঁড়ে নিয়েছেন, একথা তিনি বিশ্বাস করবেন কী করে? মাস কয়েক আগে উনি এসেছিলেন গড়াই মশাইয়ের অফিসে। প্রায় আসতেন—কুঞ্জবিহারীবাবুও যেতেন।

কন্ট্রোলার অফ ওয়াগনসকে খাতির করতে হত, হাতে রাখতে হত—তাতে ওয়াগন সহজে পাওয়া যেত, কাঠ চালান নইলে অসম্ভব এই ওয়াগন-আকালের দিনে।—বিশেষ করে ওই অঞ্চলে। কিন্তু হীরকবরণ পয়সা নেন না—তাই নতুন বছরে একটা ডায়েরি দিয়েছিলেন। দামি ডায়েরি। কাকে ক'টা ডায়েরি দেওয়া হল, সে হিসাব নিজে হাতে লিখে রাখেতেন কুঞ্জবিহারীবাবু—যাতে সামনে বছর ডাইরি দিয়ে আপ্যায়নে ভুল-ত্রুটি না হয়। সেই খাতা বার করে দেখালেন নাম লেখা রয়েছে হীরকবরণ মুখার্জির।'

'কিন্তু চেক দুখানা কীভাবে সরালেন হীরকবরণ সেই পি-এ ছোকরাকে টাকা খাইয়ে কি? এ প্রশ্নের উত্তরে সত্যবাদী রূপে বিখ্যাত হীরকবরণ সত্যি কথাই বললেন।'

'ডাইরি হাতে নেওয়ার মুহূর্ত পর্যন্ত নাকি চেক চুরির কোনও প্ল্যান তাঁর মাথায় ছিল না। এসেছিলেন কাজের কথা বলতে। সে কথা হয়েছে, ডায়েরিও পেয়েছেন নববর্ষের শুভেচ্ছাসহ, উঠে পড়লেই পারতেন—কিন্তু উঠলেন না। এদিকে খেতে যাবার সময় হয়েছে কুঞ্জবিহারী গড়াইয়ের। হীরকবরণ মুখার্জিকে লাঞ্চের নেমন্তন্নও করলেন তিনি। দুজনে একদিন ভালোমন্দ খেলে ক্ষতি কি। কিন্তু হীরকবাবু গেলেন না। উৎকোচ-নির্লোভ বলেই বোধহয় গেলেন না। এই মনে করে কুঞ্জবিহারীবাবু বললেন—তাহলে আপনি একটু বসুন, আমি যাব আর আসব। সায় দিলেন হীরকবাবু। ঘর ফাঁকা হতেই উঠে গিয়ে দেখলেন ড্রয়ারে চাবি দেওয়া নেই। স্বপন জিগ্যেস করল—এই যে বললেন চেক চুরির কোনও প্ল্যান আপনার ছিল না—তাহলে ড্রয়ার দেখতে গেলেন কেন? হীরকবরণ বললেন—কি জানি কেন হঠাৎ মনে হল দেখিই না কি আছে ড্রয়ারে। প্রথম ড্রয়ারে পেলাম চেকবই। কি যে দুর্মতি হল, তৎক্ষণাৎ খান দুই চেক একেবারে গোড়া থেকে ছিঁড়ে বার করে নিলাম চেক বইয়ের ভেতর থেকে। কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এলেন কুঞ্জবিহারীবাবু। চা খেয়ে অফিসে চলে এলাম। নেক্সট উইকে কলকাতা গিয়ে তুললাম চব্বিশ হাজার টাকা।'

সব তো হল। কিন্তু মোটিভ কই? মোটিভ ছাড়া ক্রাইম সচরাচর হয় না। মোটিভ ছাড়া যারা ক্রাইম করে, তারা বিকৃত মস্তিষ্ক। জ্যাক দি রিপারের মতো উন্মাদ। ক্লেপটোম্যানিয়্যাকরা যেমন চুরি করে আনন্দ পায়—তেমনি আর কি! কিন্তু হীরকবরণ মুখার্জি সজ্জন। সুস্থমস্তিষ্ক এবং জীবনে প্রতিষ্ঠিত পুরুষ। তাঁর অভাব নেই, লোভ নেই। তা-সত্ত্বেও এতবড় অন্যায় কেন করলেন? মোটিভ কী?'

'এ কাহিনির সেইটাই সবচেয়ে মর্মান্তিক অংশ। হীরকবরণ মুখার্জি বিবেকবান সজ্জন পুরুষ—তাই বিবেকদংশন সহ্য করতে না পেরে এক অন্যায়কে ঢাকতে আর এক অন্যায় করে বসলেন। ক্ষণিকের ভুলে পদস্খলন তাঁর হয়েছিল। জীবনে কখনো পাপ করেননি বলেই একটিমাত্র পাপের অনুতাপে তিনি জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিলেন। তাই প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আর একটি পাপের সঙ্গে পা বাড়ালেন।

'মায়াবী মোটিভ একেই বলে।

'হীরকবরণ মুখার্জির ডিপার্টমেন্টে রামতনু বলে একটি ছেলে কাজ করত। ছেলেটির দুনিয়ায় কেউ নেই—একটিমাত্র বোন ছাড়া। বোনটির বয়স যখন সতেরো, ঠিক তখন রামতনুকে বদলি হতে হল নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়েরই এমন একটা দুর্গম জায়গায় যেখানে অনূঢ়া বোনকে নিয়ে যাওয়া সেই মুহূর্তে সম্ভব নয়। রামতনুর মাইনেও এমন কিছু বেশি নয়। মেসে থেকে বাসাবাড়ি খুঁজতে হবে। তদ্দিনের জন্যে বোনটিকে কোথায় রাখা যায়?

'হীরকবরণ মুখার্জিকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করত রামতনু। ধরল তাঁকেই। বলল—স্যার, বাসাবাড়ি না পাওয়া পর্যন্ত আপনার কাছে যদি সরোজিনীকে রাখেন, আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি।

'হীরকবরণ রাজি হলেন। রামতনুকে স্নেহ করতেন তিনি। তিনি নিজেও পরোপকারী। সরোজিনী রইল তাঁর কোয়ার্টারে। পাণ্ডুর কোয়ার্টারে তিনি ঠাকুর-চাকর নিয়ে একাই থাকতেন। বৃদ্ধ বাবার দেখাশুনার জন্যে এবং ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্যে স্ত্রীকে রেখেছিলেন বেলঘরিয়ায়।

'মাস কয়েক পরে সরোজিনীর স্কুলে খবরটা প্রকাশ পেল। মেয়েদের চোখকে ধুলো দেওয়া যায় না এসব ব্যাপারে। বান্ধবীরাই ধরে ফেলল, সরোজিনী সন্তানসম্ভবা। হীরকবরণ মুখার্জির দুর্দিন শুরু হল তখন

থেকেই। রামতনু এল। সে-ও স্তম্ভিত। হীরকবরণ লজ্জায় অধোবদন। এদিকে কানাঘুসো আরম্ভ হয়েছে রেলওয়ে কোয়ার্টারে। তাই রামতনু আর সরোজিনীকে নিয়ে এলেন পুরীতে। প্রস্তাব করলেন গর্ভপাত করা হোক।

'বেঁকে বসল সরোজিনী—রামতনুর ইচ্ছে সত্ত্বে। নিরুপায় হয়ে কলকাতায় এলেন হীরকবরণ। কালিঘাটে গিয়ে সরোজিনীর মাথায় সিঁদুর পরিয়ে দিয়ে বিয়ে করলেন। বাগবাজারে একটা ছোট্ট ফ্ল্যাটে তার থাকার ব্যবস্থা করলেন।

'কিন্তু ওই পর্যন্তই। মুহূর্তের মোহে যে ভুল তিনি করেছিলেন, বিয়ের লাইসেন্স নিয়ে তাকে প্রলম্বিত করলেন। সরোজিনীর আর বাচ্চার খোঁজখবর নিতেন। কিন্তু সরোজিনীর ফ্ল্যাটে রাত্রিবাস করতেন না।

'দিবারাত্র বিবেকের দংশন আর সইতে পারে না হীরকবরণ। সরোজিনী আর নিষ্পাপ শিশুটির ভবিষ্যতের একটা পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করার সংকল্প নিলে মনে মনে। তাঁর অবর্তমানে দ্বিতীয় স্ত্রী আর পুত্রের যাতে খাওয়া পরার অভাব না থাকে, জীবিতকালে সেই ব্যবস্থা করে যাবেন ঠিক করলেন।

'কিন্তু রোজগার তাঁর রবারের মতো নয় যে টানলে বড় হবে। উৎকোচ নিয়ে এতদিনের সুনাম আর শ্রদ্ধাকে বলি দিতে রাজী নন। তাই সব দিক বজায় রেখে কাকপক্ষীকে না জানতে দিয়ে প্রথম যে কাজে হাত দিলেন—তা নিয়েই এই গল্প।'

গল্প শেষ করে বিশ্ববন্ধুবাবু হেসে বললেন—'মৃগাঙ্কবাবু, এ গল্পের ডিটেকটিভ চমকে দেওয়ার মতো কোনও ক্লু পায়নি—শুধু দেখিয়েছে উপস্থিত বুদ্ধির খেলা। কিন্তু সে সুযোগও সে পেত না—হীরকবরণ কোনওদিনই ধরা পড়তেন না—যদি তিনি প্রফেশনার ক্রিমিন্যাল হতেন—তাহলে আর দ্বিতীয় বার ওই ব্যাঙ্কে তিনি আসতেন না। ওই একটি মাত্র ভুলের জন্যে তাঁকে শেষ পর্যন্ত জেলেই যেতে হল—পাঁচ বছরের জন্যে।'

** 'উল্টোরথ পত্রিকায় প্রকাশিত। জুলাই-আগস্ট, ১৯৭৬।*

কনে হল বিধবা

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শেষবারের মতো নিজেকে দেখল মণিকা। বিধবার বেশে কোনও ত্রুটি নেই। অথচ এই সেদিন বেনারসী পরে শিবমন্দিরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে। আশা ছিল এই আয়নার সামনে বেনারসী পরেই স্বামীর পাশে দেখবে নিজেকে। কিন্তু...

মণিকার চোখ শুকনো কেন? জবাব দিল মণিকার মন। বলল—মণিকা তো বেঁচে নেই।

আলমারি থেকে টাকার বাণ্ডিলটা বার করে আনল মণিকা। পাঁচ ভাগ করে রাখল সুটকেসের ওপর। প্রতিটি ভাগে রইল সমান পরিমাণ টাকা। একদৃষ্টে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল পাঁচ থাক টাকার দিকে। বুকের তুফানের ছায়াও পড়ল না চোখের তারায়। কী করে পড়বে? মণিকা তো বেঁচে নেই!

কেবল পাঁচ থাক টাকার প্রতিফলন পাঁচ-পাঁচটি ধিকি-ধিকি প্রতিজ্ঞাস্বরূপ জ্বলতে লাগল ওর বিশাল দুই চোখে।

'বউমা,' মণিকার শাশুড়ি ঘরে এলেন। 'বউমা, আমার কথা রাখো। যেও না।'

'না, মা, যেতে আমাকে হবেই।'

শাশুড়ি আর পীড়াপীড়ি করলেন না। একশো টাকার নোটের একটা তাড়া মণিকাকে দিয়ে বললেন—'তপনের সারাজীবনের সঞ্চয়। নাও। মনে রেখো আমার শেষ কথাটা—যেদিন মন চাইবে, সেদিনই ফিরে আসবে।'

সুটকেস খুলল মণিকা। পাঁচ থাক টাকা একসঙ্গে করল। শাশুড়ির দেওয়া টাকা রাখল তার ওপর। সুটকেস বন্ধ করে বলল—'মা, চললাম।'

শাশুড়ি এবার কেঁদে ফেললেন।

রাস্তায় নেমে এল মণিকা। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে সেই ফুটফুটে মেয়েটা। সবুজ ফ্রক উড়ছে জোর হাওয়ায়। বেণীর ডগাটা অস্থিরভাবে কামড়াচ্ছে ছোট ছোট দাঁত দিয়ে।

মণিকাকে দেখেই দৌড়ে এল কাছে—'মাসিমা, চলে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁরে।'

'আমি সঙ্গে যাব?'

'আয়।'

স্টেশন বেশি দূরে নয় বড় জংশন ইলেকট্রিক ট্রেন হরবখৎ যাচ্ছে আসছে। প্ল্যাটফর্মে কিছুক্ষণ দাঁড়াতেই এল কলকাতাগামী ট্রেন। ফুটফুটে মেয়েটার গাল টিপে দিয়ে একটা ফার্স্ট-ক্লাস কামরায় উঠে পড়ল মণিকা।

উল্টোদিকের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে তখন যদি কেউ মণিকার গতিবিধি নজরে রাখত, তাহলে একটা অদ্ভুত ব্যাপার চোখে পড়ত। দেখত, মণিকা কামরার একদিকের দরজা দিয়ে ভেতরে উঠল বটে—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একদিনের দরজা দিয়ে নেমে পড়ল রেল লাইনের খোয়ার ওপর। সেখান থেকে প্ল্যাটফর্মে উঠে ওভারব্রিজ পেরিয়ে মিশে গেল ভিড়ের মধ্যে।

চোদ্দোতলা ফ্ল্যাটবাড়ি একতলায় মেঝে মুছছিল প্রসাদী। প্রসাদী এ বাড়ির ঝাড়ুদারও বটে, দারোয়ানও বটে। কো-অপারেটিভ হাউসিং স্কিমে তৈরি ফ্ল্যাটবাড়ির সবাইকেই সমান যত্ন করার দায়িত্ব তার।

হলঘরের মোজেক মেঝে মুছছে প্রসাদী। ঘরে আর কেউ নেই। তাই গান ধরেছে গলা ছেড়ে। পুরু লেন্সের সুতো বাঁধা চশমাটা মাঝে মাঝে পিছলে নেমে আসছে নাকের ডগায়। সেই অবস্থাতেই 'মেরে

স্বপ্নেকী রাণী'কে ডাকছে তারস্বরে।

আচমকা স্তব্ধ হল রাসভ কণ্ঠ। কারণ, প্রসাদীর অদূরে ভোজবাজীর মতো এসে দাঁড়িয়েছে একটি নারীমূর্তি। আগুনের মতো রূপ তার। অঙ্গ ঘিরে বেনারসীর বাহারে সে-রূপ যেন দাবাগ্নির মতো লেলিহান।

মেয়েটি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে প্রসাদীর দিকে। মুখে কথাটি নেই। কিন্তু বিশাল দুটি চোখে যেন কিসের অনুনয়।

প্রসাদী তার কর্তব্য করল—'কাকে খুঁজছেন?'

'ব্যারিস্টান বারীন বাগচিকে।'

'উনি তো এখন থাকেন না।'

'কখন থাকেন?'

'সন্ধের পর। আর সকালের দিকে।'

'কামরা নম্বর?'

'পঁয়তাল্লিশ। দশতলার 'বি' ব্লক।'

'ফোন আছে?'

'হ্যাঁ।'

'কত নম্বর?'

নম্বর জানতে বারীন বাগচির চিঠির খুপরির সামনে গেল প্রসাদী। তারপর নম্বর বলতে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল, মেয়েটি নেই।

সেইদিনই সন্ধ্যের পর বারীন বাগচির টেলিফোনে ভেসে এল নারীকণ্ঠ।

'আপনি ব্যারিস্টার বাগচি?'

'দ্যাটস মি।'

মেয়েটি আর কোনও জবাব দিল না। রিসিভার রাখার শব্দ ভেসে এল।

ভুরু কুঁচকে সিগার কামড়ে ধরল বারীন বাগচি। ব্যাপারটা যেন কেমনতর। এই মেয়েটিই কি আজ দুপুরে তার খবরাখবর নিয়ে গেছে প্রসাদীর কাছে?

পরের দিন সকালবেলা আবার টেলিফোন ভেসে এল সেই নারীকণ্ঠ।

'বারীন বাগচি?'

'স্পিকিং।'

টুকরো হাসি—'আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাই।'

'কেন?'

'আলাপ হলেই বুঝবেন।'

'আজকে আসুন। ফ্ল্যাটে একটা টি-পার্টি দিচ্ছি। সন্ধ্যে ৭টা। আলাপ করার উপযুক্ত সময়।'

'থ্যাকংস।' লাইন কেটে গেল।

সারাদিন রহস্যময়ীর কথাগুলো পাক খেল বারীন বাগচির ব্যাচেলার মগজে। রোমান্স? মন্দ কি!

সন্ধে নাগাদ ফ্ল্যাটে যখন টি-এর ফাঁকে ফাঁকে দু-চারটে গেলাসের রঙিন পানীয় বিলি হচ্ছে ঠিক তখনি একটি আশ্চর্য সুন্দরী মেয়ের দিকে বারীনের দৃষ্টি আকর্ষণ করল তার বন্ধু সঞ্চয়।

বলল—'বারীন, মেয়েটাকে কখনো দেখেছি বলে তো মনে হচ্ছে না। তোর নতুন বান্ধবী নাকি? সমানে তোর দিকেই তাকিয়ে আছে।'

চকিতে তাকাল বারীন। দেখল, দরজার ঠিক পাশটিতে দাঁড়িয়ে যেন মূর্তিমতী প্রদীপশিখা। মানুষ এত রূপবতীও হয়?

মন্ত্রমুগ্ধের মতো পায়ে পায়ে মেয়েটির সামনে গিয়ে দাঁড়াল বারীন। হাতের মদের গ্লাস হাতেই রইল। চোখে চোখ লেগে রইল চুম্বকের মতো।

'আপনি?'

মেয়েটি হাসল। বারীন দেখল, মোনালিসা যেন মূর্ত হল হাসির মধ্যে।

বারীন বলল—'আপনি ফোন করেছিলেন?'

জবাব দিল না অপরূপা। বিশাল নয়নের চাহনি ফিরল চওড়া বারান্দার দিকে। বারান্দায় আলো-আঁধারি, জাপানি ফানুস আর ক্যাকটাস।

বুঝল বারীন। পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়াল ব্যালকনিতে। একপাশে সেই মেয়েটি। আর একপাশে সঞ্জয়।

জাপানি ফানুসের রামধনু-রশ্মির মধ্যে পরীর মতো চেয়ে আছে মেয়েটি।

বারীন বিস্মিত। বিস্মিত সঞ্জয়ও। বিস্ময়ের মাঝেই হাতের গ্লাস ঠোঁটের কাছে তুলেছিল বারীন। কিন্তু ঠোঁটের সঙ্গে পানীয়র মিলন হওয়ার আগেই হাত থেকে গ্লাসটা টেনে নিল মেয়েটি। নিয়ে গেলাস উপুড় করে ধরল পাশের ক্যাকটাসের টবে।

বলল সঞ্জয়কে—'চা আনবেন?'

সঞ্জয় বেরিয়ে গেল।

মেয়েটি বলল—'হ্যাঁ, আমিই ফোন করেছিলাম। আমিই দেখা করতে এসেছিলাম। আমার নাম মণিকা। আমি বড় একা।'

বারীন কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

মণিকা কাশ্মিরী শালটা গা থেকে খুলে মেলে ধরল বারান্দার বাইরে। হাওয়ায় বেশ টান। ঝড়ের টান। হাত থেকে শালটা খসে গিয়ে আটকে গেল হাততিনেক দূরে ঝুলন্ত রেডিও এরিয়ালের কঞ্চিতে।

মণিকা বললে—'এনে দেবেন?' চোখে অনুনয়।

বারীন ব্যালকনির রেলিং টপকে দাঁড়াল সরু কার্নিশের ওপর। অবাক চাহনি তখনো মণিকার বিশাল চোখের ওপর। তারপর এক হাতে রেলিং ধরে ঘুরে দাঁড়িয়ে যেই আর এক হাত বাড়িয়েছে শালের দিকে, অমনি দু-হাতে তাকে প্রচণ্ড ধাক্কা মারল মণিকা।

রেলিং থেকে হাত খসে গেল বারীনের। দশতলার ব্যালকনি কার্নিশ থেকে দেহটা পাকসাট খেয়ে আছড়ে পড়ল একতলার লনে।

চেঁচিয়েছিল বারীন, কিন্তু কেউ শুনতে পায়নি। ঘরে তখন জাজ মিউজিকের ধুম পড়েছে।

মণিকা এ-দরজা সে-দরজা দিয়ে উধাও হয়ে গেল। কাশ্মীরী শালটা হাওয়ার টানে এরিয়েল থেকে উড়ে গিয়ে ভেসে গেল নীচতলার একটা বাড়ির ছাদে।

চায়ের ট্রে নিয়ে সঞ্জয় এসে দেখল ব্যালকনি শূন্য।

দিনকয়েক পরে।

মঘা দত্ত ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে যেতেই রামদাস ঝাড়ন ফেলে আলমারি খুলে বার করল হুইস্কির বোতল। মঘা দত্তর হুইস্কির বোতল। বিপত্নীক মঘার এই এক বদভ্যেস। ফ্ল্যাটে বসে মদ গেলা চাই।

রামদাস তার ফাইফরমাশ খাটে। ঘরদোর সাফ করে। রান্না-বান্নাও করে দেয়। বাবুর দেখাদেখি তারও ইদানীং সখ হয়েছে হুইস্কি গেলার। তাও চুরি করে। মঘা দত্ত বেরিয়ে গেলেই রোজ খাওয়া চাই এক ঢোক। তারপর অবশ্য বেসিন থেকে জল ঢালতে হয় বোতলে। কেননা মঘা ভারি হুঁশিয়ার। হুইস্কির বোতলে রোজ কলম দিয়ে দাগ দিয়ে রাখে। লুকিয়ে-চুরিয়ে রামদাস তবুও হুইস্কি খায়। খেয়ে জল ঢেলে দাগে দাগ মিলিয়ে রাখে।

সেদিনও এক ঢোক গিলল রামদাস। জল মেশালো। বোতলটা আলমারিতে ফিরিয়ে দেওয়ার আগেই দারুণ চমকে উঠল।

খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে এক পরমাসুন্দরী। বিশাল চাহনি রামদাসের ওপর।
বোতলটা তাড়াতাড়ি পেছনে লুকালো রামদাস। বলল—'কাকে চাই?'
'মঘা দত্ত।'
'নেই।'
'কখন থাকবেন?'
'সন্ধের পর।'
তোমার নাম?'
'রামদাস।'
'বাবুর দেখাশোনা করো?'
'আজ্ঞে।'
'বাবুর সময় কাটে কী করে?'
'আজ্ঞে, সিনেমা দেখে, আড্ডা মেরে, বই পড়ে—'
'খুব সিনেমা দেখেন?'
'থিয়েটারও।'
'ও।'
'আজ্ঞে, বাবু এলে কি বলব?'
হাসল মেয়েটি—'পেনসিল আছে? কাগজ আছে। আনো, চিঠি লিখব।'
বোতল সামলাতে সামলাতে কাগজ-পেনসিল আনতে পাশের ঘরে গেল রামদাস, ফিরে এসে দেখল মেয়েটি নেই।
মঘা দত্ত ফ্ল্যাটে ফিরেই লেটারবক্সে একটা খাম পেল। ভেতরে সবুজ কাগজে দু-লাইন চিঠি আর একটা থিয়েটারের বক্স-টিকিট।
সবুজ কাগজে ল্যাভেন্ডারের সৌরভ। চিঠির দু-লাইনে রোমান্সে ইঙ্গিত।

প্রিয়,
আলাপ করতে চাই। আসছেন তো?

মাথা ঝিমঝিম করে উঠল মেঘা দত্তর। এমন সময়ে রামদাস এল। সেই পরমাসুন্দরীর আবির্ভাব-বৃত্তান্ত রসিয়ে রসিয়ে বলল।
মঘা দত্তর স্থাণুর মতো বসে রইল খাটের ওপর।
থিয়েটার-হল।
বক্সে ঢুকে মঘা দেখল, কেউ নেই। এদিকে থিয়েটার শুরু হল বলে। তবে কি ঠাট্টা করল কেউ?
থিয়েটার শুরু হল। আস্তে আস্তে কমে এল মঘার ছটফটানি। মন যখন থিয়েটারের মঞ্চে, ঠিক তখনি বক্সের ছায়ামায়ায় এসে দাঁড়াল সেই মেয়েটি। নাম তার মণিকা।
দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। অনিমেষে চেয়ে রইল মঘার পানে। ভাবলেশহীন চাহনি। তারপর এসে বসল পাশে।
মঘা যেন আইসক্রিমের মতোই গলে গেল। মেয়েটা চেয়ে আছে মঞ্চের দিকে। নিশ্চল তনু।
বলল—'আমার নাম মণিকা।'
'অঃ।'
'আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে।'

'অ্যাঁ।'

'এখানে বলব না।'

'হোটেলে?'

'না, আপনার বাড়িতে।'

'তাই নাকি?' এ যে আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া। 'কবে?'

'কাল। আর কেউ থাকুক আমি চাই না। একটু থেমে, 'শুধু আপনি আর আমি।'

মঘার যেটুকু বাকি ছিল, এবার তাও গেল।

মঘা দত্তর ফ্ল্যাটের ধুলো ঝেড়েছে মঘা। সাজিয়েছে। রজনীগন্ধার স্টিক আর বেল-জুঁইয়ের গন্ধে ঘরে কেমন ফুলশয্যার আমেজ এনেছে।

মঘা নিজেও সেজেছে। বুকে খুশির তুফান।

তুফান ছুটে যেত যদি সেইমুহূর্তে মঘা দত্তর তৃতীয় নয়ন খুলে যেত। এবং সেই তৃতীয় নয়নে ভেসে উঠত সেই শহরেরই একটি দামি হোটেলের কক্ষ।

দেখা যেত, খাটের ওপর একটা গোটা হুইস্কির বোতল নিয়ে বসে মণিকা। এক হাতে একটা ইঞ্জেকশন দেবার সিরিঞ্জ। সিরিঞ্জভর্তি সাদা আরক। ছুঁচটা ছিপি ফুঁড়ে বোতলের ভেতর ঢুকিয়ে দিল মণিকা। সাদা আরকটা মিশিয়ে দিল হুইস্কির সঙ্গে।

মঘার ফ্ল্যাটে মণিকা এল ব্যাগের মধ্যে আরকমিশানো বোতল নিয়ে। মঘার প্রথম উচ্ছ্বাস কমতেই ভিজে গলায় বলল—'আমি জানি আপনি কী ভালোবাসেন।'

'কী?'

'হুইস্কি।'

মঘা কাষ্ঠহাসি হাসল।

মণিকা বলল—'হুইস্কি আমি খাই না। ভারমুথ ছাড়া কিছু ছুঁই না। কিন্তু আপনি যা ভালোবাসেন তাই দিয়েই শুরু হোক আমাদের প্রথম পরিচয়।' ব্যাগ থেকে বেরুলো হুইস্কির বোতল। 'বিলিতি স্কচ। একশো টাকা এক বোতল। নিন, দু-গেলাস ঢালুন।'

মঘার চোখ শামুকের চোখের মতো উদ্ধত হল। মাথায় টাইফুনের ছোঁয়া লাগল। ত্বরিতপদে উঠে গেল বোতল হাতে। ফটাৎ করে খুলল ছিপি। পর দু-গ্লাস খাঁটি (!) স্কচ ঢেলে সোডা পাঞ্চ করে রাখল মণিকার সামনে।

মণিকা আকাঁপা আঙুলে একটা গ্লাস তুলে নিল। আকাঁপা চোখে মঘার পানে চাইল। গ্লাসে গ্লাস ঠেকিয়ে বলল—'চিয়ার্স।'

গ্লাস শূন্য করে দিল মঘা। মণিকা গ্লাস হাতে রাখল। বলল—'আর এক গ্লাস খান। তারপর কথা।'

মঘা উঠে গেল গ্লাস ভরতে। সঙ্গে-সঙ্গে রজনীগন্ধার ফুলদানীতে হাতের গ্লাস উপুড় করে ধরল মণিকা।

মঘা ফিরে এসে দেখল শূন্য গ্লাস কোলে নিয়ে বসে মণিকা। বিলোল আঁখিতে কালো ইশারা।

পুরো গ্লাসটা এক ঢোকেই শেষ করল মঘা। মাথার মধ্যে মৃত্যুর ঐক্যতান শুরু হল সেই মুহূর্ত থেকে।

প্রথমে মঘা বোঝেনি। মনে হয়েছিল স্কচের নেশা। তারপর মাথার খোঁচা যখন চোখেও এসে পৌঁছোল, তখন ভাবল জবর স্কচ তো! দু-পেগেই এফেক্ট! তারপর চোখ ঘোলাটে হয়ে এল। বিশ্বসংসার ঝাপসা হয়ে এল। মেঝের ওপর সটান আছড়ে পড়ল মঘা।

মণিকা উঠে দাঁড়াল। মঘার দিকে তাকালো না। গেলাসদুটো নিয়ে বেসিনে ধুয়ে তুলে রাখল। আরকমিশানো হুইস্কির বোতল বেসিনে উপুড় করে ঢেলে দিল। খালি বোতলটা রাখল ব্যাগের মধ্যে।

মঘা তখন ধুঁকছে। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে পাশে বসল মণিকা। চেয়ে চেয়ে দেখল, মঘা মরছে ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছে।

বলল—'শুনতে পাচ্ছেন?'

কাতরে উঠল মঘা।

মণিকা বলল—'স্কচে আমি বিষ মিশিয়ে আপনাকে খাইয়েছি। এখুনি মরবেন। আর দেরি নেই। মরবার আগে নিশ্চয় জানতে ইচ্ছে করছে, কেন আপনাকে মারলাম। তাই বলছি। শুনুন, কেন-র উত্তর একবছর আগে একটা শিবমন্দিরের সামনে রয়েছে। নতুন বউ নিয়ে শিবকে প্রণাম করতে গিয়েছিল একজন। মন্দির থেকে বেরোতে না বেরোতেই বিধবা হয়েছিল কনে বউ।'

এই পর্যন্ত বলে থামল মণিকা। শোনবার মতো কেউ আর ছিল না ঘরে।

অনেক রাতে রামদাস এসে দেখেছিল মেঝের ওপর মরে কাঠ হয়ে শুয়ে তার বাবু।

অন্য একটি শহরতলী।

স্কুল। সবে ছুটি হয়েছে। বাচ্চা মেয়েটার হাত ধরে তার মা রওনা হয়েছে বাড়ির দিকে। মেয়েটি বার বার ফিরে তাকাচ্ছে পেছনে।

কোয়ার্টার এসে গেছে। সামনে খানিকটা সবুজ লন। তারপর দোতলা বাড়ি। হালফ্যাসানি। বোগানভালিয়ার থোকা আর রংবেরঙের ফুল দিয়ে সাজানো চত্বর।

ফটক দিয়ে ঢোকবার সময়ে আবার পেছন ফিরে তাকালো মেয়েটি। স্কুলের উষাদির মতো দেখতে মেয়েটা এখনো আসছে। বেশ দেখতে।

ফটকের সামনে এসে দাঁড়ালো পিছু নেওয়া মেয়েটি নাম তার মণিকা।

বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হল না। খেলতে বেরিয়েছে বাচ্চা মেয়েটি। রঙিন প্লাস্টিকের বল নিয়ে ছুটোছুটি করছে সবুজ লনে। একবার ফটক দিয়ে রাস্তায় ঠিকরে গেল বলটা। ধরে ফেলল মণিকা। হাসিমুখে তাকিয়ে রইল বাচ্চা মেয়েটির দিকে। কাছে ডাকল হাত নেড়ে।

ভয় পেল না ছোট্ট মেয়েটি। স্কুলের উষাদির মতোই তো দেখতে। কী সুন্দর হাসি। স্কুল থেকেই তো পেছন পেছন এসেছে।

কাছে গেল মেয়েটা। মণিকা বলটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল—'কী নাম তোমার?'

'ঝুমি।'

'বাঃ, কী সুন্দর নাম। আমার নাম উষাদি তোমাদের স্কুলে পড়াই।'

'তোমার নামও উষাদি?'

'হ্যাঁ গো। তোমার মায়ের নাম কী?'

'শ্রীমতী বনমালা লাহিড়ী।'

'সাবাস। তোমার মামার বাড়ি কোথায়?'

'অনেকদূর।'

'কোথায়?'

'আগরতলায়।'

'তোমার মামা আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আগরতলায় থাকেন?'

'হ্যাঁ।'

'কী নাম জানো?'

'পল্টু মামা।

'দাদু আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আগরতলায় থাকেন?'

'হ্যাঁ।'

এইসময়ে দোতলার জানলা দিয়ে ডাক দিল ঝুমির মা—'ঝুমি, ভেতরে এসো।' বল নিয়ে এক দৌড়ে ভেতরে চলে গেল ঝুমি।

মণিকা প্লেনে আগরতলা গেল। সেখান থেকে একটা টেলিগ্রাম পাঠালো ঝুমির মা শ্রীমতী বনমালা লাহিড়ীকে।

টেলিগ্রাম হাতে পেয়ে শ্রীমতী বনমালা লাহিড়ী দেখল, ভাই লিখছে বাবার শেষ অবস্থা এখুনি না এলেই নয়।

কাজেই পরের প্লেনেই আগরতলা রওনা হল ঝুমির মা। ঝুমির বাবার কাছে রেখে গেল ঝুমিকে। ঘরসংসার দেখার জন্যে ঠিকে ঝি, রাঁধুনি তো আছেই। কোনও অসুবিধে হবে না। ঝুমির বাবা অফিস গেলে ঠিকে ঝি-ই সারাদিন বাড়ি আগলাবে-খন।

সেইদিন রাত্রে ঝড় উঠল। দরজার কড়া নড়ল। ঝুমির বাবা ঝুমিকে নিয়ে একতলায় বসেছিল। উঠে এসে দরজা খুলে দিল।

মণিকা ভেতরে ঢুকল। হাওয়ায় উড়ছে ওর কপালের চুল। বুকের আঁচল। ঝুমির বাবা শান্তনু লাহিড়ী বিস্মিত হলেন অপরূপ মহিলার সহজ আচরণে।

মণিকা বলল—'ঝুমি কই?'

'ওই তো।'

স্বচ্ছন্দ পায়ে ঝুমির পাশে গিয়ে বসে পড়ল মণিকা। বলল—'আমি ঝুমিদের উষাদি। ওদের স্কুলে পড়াই। তাই না ঝুমি?' ঝুমি ঘাড় নেড়ে সায় দিল। 'এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। ভাবলাম, যাই দেখে যাই।'

শান্তনু লাহিড়ী বললে—'ভালোই করেছেন। ওর মা গেল বাপের বাড়ি। একা আমি সামলাতে পারছিলাম না।

হেসে উঠল মণিকা—'খাওয়া হয়েছে?'

'না। কিন্তু—'

মণিকা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে—'কোনও কথা নয়। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। খাইয়ে-দাইয়ে ঝুমিকে ঘুম পাড়িয়ে বাড়ি যাব-খন।' একটু থেমে মোনালিসা হাসি হেসে—'এ কাজ আমি ভালোবাসি।'

শান্তনু লাহিড়ী অপ্রস্তুত হলেন। খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাসও ফেললেন।

রান্নাবান্না করাই ছিল। এটা-সেটা গল্প করতে করতে গ্যাসের উনুনে সব গরম করে নিল মণিকা। এর ফাঁকে পাঁউরুটি কাটা বড় ছরি নিয়ে দরজার পাশের টেলিফোনের তারটা কেটে রাখল। বাপবেটিকে খাওয়াল। নিজে কিছু দাঁতে কাটল না। ঝুমিকে ভুলিয়ে ভালিয়ে দোতলায় নিয়ে গিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিল। নীচে নেমে এসে দেখল হলঘরের টেবিলে তখনও বসে শান্তনু লাহিড়ী। মুখে পাইপ। চোখে বিস্ময়।

'চলে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ। আমার কাজ ফুরিয়েছে।'

নিস্তব্ধ রাত। বাইরে ঝিঁ-ঝিঁ ডাকছে। শান্তনু লাহিড়ীর রক্তে দোলা লাগল মণিকার বিশাল চোখজোড়ার আয়ত চাহনি দেখে।

পাইপ সরিয়ে শুধু বলল—'আপনার মতো মেয়ে আমি দেখিনি।'

'তাই নাকি?' বলে মণিকা হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে শান্তনু লাহিড়ীর পেছনে গেল। ব্যাগ থেকে ছোট্ট পিস্তল বার করল। নলচেটা মুঠোয় ধরে কুঁদো দিয়ে ব্রহ্মতালুতে খুব জোরে চোট মারল। অজ্ঞান হয়ে গেল শান্তনু লাহিড়ী।

ব্যাগ থেকে নাইলন দড়ি বার করল মণিকা। পিছমোড়া করে বাঁধল শান্তনুকে। মুখের মধ্যে বেশ খানিকটা তুলো ঠেসে দিল। তারপর চওড়া স্টিকিং প্লাস্টারের পটি দিয়ে মুখ আটকে দিল।

টানতে টানতে শান্তনুকে নিয়ে এল ছোট্ট রান্নাঘরে। স্টিকিং প্লাস্টারের পটি দিয়ে প্রতিটি বন্ধ জানলার ফাঁক বন্ধ করল। তারপর একটা টুল নিয়ে বসল শান্তনুর পাশে। ব্যাগ থেকে স্মেলিং সল্টের শিশি নিয়ে ধরল নাকের কাছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝাঁঝালো গন্ধে জ্ঞান ফিরে এল শান্তনু লাহিড়ীর। চেঁচাতে পারল না—মুখ বন্ধ। হাত-পা নাড়তে পারল না—দড়ি দিয়ে বাঁধা।

মণিকা বলল—'একটু পরেই মারা যাবেন আপনি। আমার নাম উষা নয়। আমি ঝুমির স্কুলে পড়াই না। মিথ্যে টেলিগ্রাম করে আমিই সরিয়েছি ঝুমির মাকে আপনাকে নিজের হাতে মারব বলে। কেন জানেন? একবছর আগে একটা শিবমন্দিরের সামনে একজন গুলি খেয়ে মরেছিল। মনে আছে? নতুন বর। আমি তার নতুন বউ। বিধবা।'

শান্তনু লাহিড়ীর চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই দৃশ্য। তিনতলা বাড়ির চিলেকোঠায় বসে ওরা তাসের জুয়ো খেলছিল। মেসবাড়ি। জুয়োর সঙ্গে মদের ব্যবস্থাও রয়েছে। আর রয়েছে শান্তনুর দোনলা বন্দুকটা। ফাঁড়িতে দেখতে চেয়েছিল বন্দুকের চেহারা। নইলে নাকি লাইসেন্স বাতিল হয়ে যাবে। তাই বন্দুক নিয়ে আসা। ফাঁড়ির কাজ শেষ। এখন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে একটু ফূর্তিতে মত্ত।

চিলেকোঠায় ওরা পাঁচজন ছিল। বারীন, মঘা, শান্তনু, ভৈরব আর কালিদাস। পাঁচজনের কর্মস্থল পাঁচদিকে। দৈবাৎ পাঁচ বন্ধু মিলেছে। তাই এই ফুর্তির আয়োজন।

কে জানত ফুর্তির শেষে এ-ট্র্যাজেডি থাকবে। কেননা, একদান খেলে উঠে জানলায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ভৈরব। হাতে ছিল শান্তনুর দোনলা বন্দুক। নিছক খেয়ালবশেই তাগ করছিল রাস্তার ও পাশে শিবমন্দিরের চুড়োর ত্রিশূলটা। খেলাচ্ছলেই মন্দির দিকে নজর রেখে নলচে নামিয়ে আনছিল চুড়ো বরাবর নীচের দিকে। ত্রিশূলের পর গম্বুজের পলস্তারা। তারপর মন্দিরের চত্বর। ঠিক এই সময়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে এসেছিল নবপরিণীতা একটি দম্পতি। ভৈরবের নলচের সামনেই এসে পড়ল নতুন বরটি। মাছির সঙ্গে একরেখায় যখন বরের হৃৎপিণ্ড, ঠিক তখুনি শান্তনুর চোখে পড়েছিল জানলায় বন্দুক বাগিয়ে কাকে যেন তাগ করছে ভৈরব। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠে দৌড়ে গিয়েছিল শান্তনু। কেননা সে ছাড়া আর কেউ জানত না বন্দুকে গুলিভরা আছে।

আচমকা শান্তনুর চেঁচানিতে এবং তারপরেই শান্তনুর হেঁচকা টানেতে চমকে গিয়েছিল ভৈরব। এমনই বরাত, সঙ্গে সঙ্গে গুলি বেরিয়ে গিয়েছিল বন্দুক থেকে। এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছিল নতুন বরের হৃৎপিণ্ড।

ওরা আর দাঁড়ায়নি। ফূর্তির ট্র্যাজেডি মাথায় নিয়ে চোঁ-চাঁ চম্পট দিয়েছিল পাঁচ বন্ধু। কে মারা গেল, তা নিয়ে আর মাথা ঘামায়নি।

মণিকার চোখে জল। বলছিল—'আমারও স্বপ্ন ছিল, সংসার করব। এ স্বপ্ন হঠাৎ দেখিনি। ছেলেবেলায় কল্প ছিল আমার খেলার সাথী। সেই কল্প বড় হল। কিশোর হল। তরুণ হল। আমি কিশোরী হলাম। তরুণী হলাম। মন দেওয়ার পালাও গড়ে উঠেছে ধাপে ধাপে। স্বপ্নও দেখেছি তিল তিল করে। সে স্বপ্ন মুহূর্তের মধ্যে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছেন আপনারা—আপনারা পাঁচ বন্ধুতে। কল্প মারা গেল। আমি বেঁচে মরে রইলাম শুধু প্রতিহিংসার জন্যে। এক বছরে অনেক টাকা খরচ করেছি, অনেক কাঠখড় পুড়িয়েছি। তবে বার করেছি আপনাদের পাঁচজনের নাম আর ধাম। বারীন আর মঘা কল্পর কাছে পৌঁছে গেছে। আপনি এখুনি যাবেন। ভৈরব আর কালিদাসও যাবে কয়েকদিনের মধ্যে।'

বলে, মণিকা উঠে দাঁড়াল। গ্যাসের চাবি পুরো খুলে দিল। বাইরে এসে বন্ধ করল পাল্লাদুটো। স্টিকিং প্লাস্টারের পটি দিয়ে টিপে টিপে বন্ধ করল পাল্লার ফাঁক।

যথাসময়ে পুলিশ এসেছিল। ঝুমি বার বার বলেছিল, 'উষাদি এসেছিল স্কুল থেকে। তারপর বাবা মরে গেছে।'

পুলিশ স্কুলে গিয়ে উষাদিকে গ্রেপ্তার করেছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ফোন এল ফাঁড়িতে। একটা নারীকণ্ঠ বললে—'উষা দেবী নির্দোষ। ওঁর নাম নিয়ে আমিই খুন করেছি শান্তনু লাহিড়ীকে।'

পেট্রল পাম্পের পাবলিক ফোন থেকে থানায় ফোন করেছিল মণিকা। রিসিভার রেখেই দৌড়ে এসে উঠেছিল গাঢ় রক্ত-রঙের ক্যাডিলাক গাড়িটায়। ড্রাইভ করেছিল নিজেই। ঘণ্টাতিনেক একটানা গাড়ি চালিয়ে পৌঁছেছিল একটা মোটর মেরামতি কারখানায়। জি. টি. রোডের ওপর গাড়ি দাঁড় করিয়ে হেঁটে হেঁটে পৌঁছেছিল গ্যারেজে।

বেশ বড় কারখানা। ভাঙা-আধভাঙা গাড়ি দাঁড় করানো এলোমেলোভাবে। এঁকেবেঁকে আপিসের দিকে এগুলো মণিকা। তেলকালিমাখা একজন মেক্যানিককে বললে ভৈরবকে ডেকে দিতে।

মণিকা দাঁড়িয়ে রইল। জায়গাটা বেশ নির্জন। মাথার ওপর কাক উড়ছে। আশেপাশে মানুষ নেই। ভাঙা গাড়ির ভিড়ে মণিকাকে দেখা যাচ্ছে না।

মণিকা হ্যান্ডব্যাগ খুলে ক্ষুদে পিস্তলটা বার করল। তুষার শুভ্র ওড়না দিয়ে ঢেকে রাখল ডান হাত আর হাতে ধরা পিস্তল।

নলচে ফেরানো রইল আপিসের দিকে। ওই পথেই আসবে ভৈরব। ওই তো আসছে। মাথাজোড়া টাক। গ্যাঁট্টাগোট্টা চেহারা। এ কারখানার মালিক। একাই আসছে।

মণিকা পিস্তল তাগ করল। ট্রিগার টিপতে যাবে—

এমন সময়ে ভৈরবের পেছনে একটা সোরগোল শোনা গেল। পাহাড়প্রমাণ লোহালক্করের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর, দুজন কনস্টেবল এবং একজন তেলচুকচুকে ভদ্রলোক। চেঁচাচ্ছেন ভদ্রলোক—'ওই যে...ওই দেখুন...জোচ্চের কোথাকার...অ্যারেস্ট করুন... মেরামতের নাম করে আমার গাড়ি নিয়ে ভাড়া খাটাচ্ছে একবছর ধরে...গাড়ি দিচ্ছে না...চোর... গুন্ডা...বদমাশ...'

মণিকা থমকে গেল। ভৈরব ঘুরে দাঁড়িয়েছে। কনস্টেবল দুজন এসে দাঁড়িয়েছে দুপাশে তারপর পুরো দলটা এগিয়ে চলল বড় রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশভ্যানের দিকে।

মণিকা আর দাঁড়াল না। ফিরে এল ক্যাডিলাকে। সিটে বসে হ্যান্ডব্যাগ থেকে বার করল একটা কাগজ। তাতে লেখা এই ক'টি নাম ঃ

বারীন

মঘা

শান্তনু

ভৈরব

কালিদাস

বারীন, মঘা আর শান্তনুর নাম তিনটে পেনসিল দিয়ে কাটা। মণিকা জিজ্ঞাসা চিহ্ন বসালো ভৈরব-এর নামের পাশে।

সত্যিই তো! ভৈরব যে এখন হাজতে!

কালিদাস রায় চিত্রশিল্পী। জীবনধর্মী চিত্রাঙ্কনে পারদর্শী। তাই তার নিভৃত স্টুডিওতে মডেলের আনাগোনা চলে সকাল সন্ধ্যায়।

কালিদাস রায় ব্যাচেলার। সুপুরুষ। ধনী। তাই তার মক্কেল হতে রাজি হয় এমন অনেক কন্যা যাদের রূপ আছে, হয়তো রূপাও আছে।

কাজেই সেদিন সন্ধ্যায় কলিংবেল টিপে যে মেয়েটি কালিদাসের স্টুডিওতে পা দিল, তার প্রস্তাব শুনে বিস্মিত হল না কালিদাস। মেয়েটি কাজ চায়। মডেল হতে চায়। ফি খুব কম। ঘণ্টায় পাঁচ টাকা।

কালিদাস আপাদমস্তক দেখল মেয়েটির। দেখে রাজি হল। কারণ, এ মেয়ে কেবল রূপসী নয়, রূপকে কীভাবে মেলে ধরতে হয়, তা জানে। উৎসাহের বশে কালিদাস সঙ্গে সঙ্গে তাকে সিটিং দিল। ইজেলে কাগজ আটকে পেনসিলের লম্বা লম্বা টানে ফুটিয়ে তুলল অপরূপার রূপরেখা।

মোহিনী হেসে বিদায় নিল মেয়েটি। নাম তার মণিকা। বলে গেল সে আবার আসবে। কাল সন্ধ্যায় সে হবে ব্যাধের বউ। কালিদাসের ইচ্ছে তাই।

নীচে নেমে এল মণিকা। চাতাল ঘুরে যেই লন পেরোতে যাচ্ছে, এমন সময়ে পাশ দিয়ে হন হন করে বেরিয়ে গেল একটি মূর্তি।

পুরুষ মূর্তি। এক পলকেই মণিকা তাকে চিনেছিল। তাই আর পেছনে না ফিরে সিধে ফটক পেরিয়ে পড়েছিল রাস্তায়।

পুরুষটিও থমকে দাঁড়িয়েছিল। পেছন ফিরে তাকিয়েছিল অপসৃয়মান তন্বীর দিকে। সন্দিগ্ধ চোখে। মেয়েটাকে এত চেনা চেনা ঠেকছে কেন?

সেই মুহূর্তে মনে পড়েনি। পড়লে অনেকগুলি বন্ধুকৃত্য একসাথেই সারতে পারত। কেননা, যুবা পুরুষের নাম সঞ্জয়। বারীন বাগচির বন্ধু। যে বারীন এই সেদিন নিহত হয়েছে, মণিকার হাতে।

এই সঞ্জয়কে দিয়েই চা আনতে পাঠিয়েছিল মণিকা বারীনের মদের গেলাস ক্যাকটাসের টবে উপুড় করে দিয়ে।

পরের দিন সন্ধ্যায় কালিদাসের ফ্ল্যাটে এল মণিকা। একটিমাত্র বাঘের চামড়া পাতলা কোমর জড়িয়ে বুকের ওপর দিয়ে ঝুলে রইল কাঁধের ওপর। আর এক কাঁধে তিরভরা তূণ। হাতে ধনুক। ছিলায় তির। ছিলা টান করে ধরা কান পর্যন্ত।

এই পোজে বিভিন্ন কোণ ধরে অনেকগুলি স্কেচ আঁকলো কালিদাস। প্রতিটি স্কেচের মধ্যেই অনুভব করল কামনার স্বাদ। মেয়েটার অনাবৃত কাঁধ, ঊরু এবং পিঠ ওকে টানতে লাগল চুম্বকের মতো। পাগলের মতো পরের পর স্কেচ এঁকে চলল ও। ক্লান্তি নেই ওর পেনসিল টানার। ক্লান্তি নেই মণিকার অঙ্গেও। সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারানো চলবে না।

এবার ফ্রন্ট পোজে দাঁড়াল মণিকা। তিরের মুখ সিধে ফেরানো কালিদাসের দিকে। কালিদাসের চোখ পর্যায়ক্রমে ঘুরছে ইজেল আর মণিকার ওপর।

এমন সময় সাঁই করে কালিদাসের পাঁজর ছুঁয়ে তির বেরিয়ে গেল—খটাং করে আটকে গেল ওদিকের দেওয়ালে টাঙানো ছবির ফ্রেমে।

ভীষণ চমকে উঠেছিল কালিদাস। আর মণিকা কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়েছিল পাশের টুলের ওপর—'আর পারছি না...বড্ড হাত-পা কাঁপছে।'

'তবে থাক,' সামলে নিয়ে বলল কালিদাস। 'কাল হবে-খন।'

'না।' ফ্যাকাসে মুখ মণিকার। 'আজকের মুড কালকে নাও থাকতে পারে। যত রাতই হোক, ছবি শেষ করুন। একটু ব্রান্ডি দেবেন?'

একটু কেন, বেশি করেই ব্র্যান্ডি ঢালল কালিদাস। নিজের রক্তেও আগুন ছোটালো ব্র্যান্ডির প্রসাদে। মণিকাকে দুটো আদরের কথা বলার চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু তার আগেই একটা কাণ্ড ঘটল।

জানলার সামনে দাঁড়িয়েছিল মণিকা। দেখল, একতলার লন পেরিয়ে সঞ্জয় আসছে। আসছে কালিদাসের ফ্ল্যাটেই।

মণিকা বলল—'আমি যে এখানে আছি, তা আপনার কোনো বন্ধু-বান্ধবকে জানাতে চাই না। আপনার হেল্প চাই।'

'একশোবার।'

'আমি বাথরুমে যাচ্ছি। আপনার বন্ধুটি চলে গেলে আমাকে ডাকবেন।'

যথাসময়ে সঞ্জয় এল। ইজেল আঁকা মণিকার ছবি দেখে ভুরু কুঁচকে ভাবল অনেকক্ষণ। গত সন্ধ্যায় ছবিটায় রং চড়িয়েছিল কালিদাস। মণিকা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছিল সে ছবিতে। এ ছবিটাও চিনি-চিনি মনে হল সঞ্জয়ের। কিন্তু কিছুতেই মনে পড়ল না প্রথম দেখার ঘটনাটা।

ইচ্ছে ছিল কালিদাসের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা মারার। কিন্তু কালিদাস যেন তাকে তাড়াতে পারলেই বাঁচে, এমনি ভাব দেখালো। বিস্মিত হল সঞ্জয়। হয়তো ইজেলের ছবিটা নিয়েই ব্যস্ত শিল্পীবন্ধু, এই ভেবেই আর দাঁড়ালো না সঞ্জয়। মডেলের মেয়েটি কে, এ প্রশ্ন বলি-বলি করেও বলতে পারল না কালিদাসের ঠোঁটে চাবি-দেওয়া ভাব দেখে।

ভাবিত মনে বাড়ি ফিরল সঞ্জয়। মেয়েটা কে? কার ছবি আঁকছে কালিদাস? কেন এত চেনা-চেনা লাগছে ছবিটা? একেই তো গতকাল সন্ধ্যায় কালিদাসের বাড়ি থেকে বেরোতে দেখা গিয়েছিল? চোখে চোখ পড়েছিল, মেয়েটি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে পাশ কাটিয়ে গিয়েছিল—আর ফিরেও তাকায়নি। কিন্তু সঞ্জয়ের কেন জানি মনে হয়েছিল, ফিরে তাকায়নি পাছে সঞ্জয় তাকে চিনে ফেলে তাই। ধরা দিতে চায় না মেয়েটা। কিন্তু কেন? কালিদাস এত রাতে তার ছবি আঁকছে তন্ময় হয়ে কেন? স্কেচ দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে মডেলের ছবি। তার মানে, মডেল ঘরের মধ্যেই ছিল। সঞ্জয়কে দেখেই লুকিয়েছে। অথবা কালিদাস লুকিয়ে রেখেছে। কেন এই লুকোচুরি? কে এই রহস্যময়ী? কার প্রভাবে কালিদাসের মতো প্রিয় বন্ধুও এত দূরে সরে যেতে পারে?

ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে গেল সঞ্জয়ের। গলাও শুকিয়ে কাঠ। তাই কুঁজো থেকে গেলাসে জল গড়িয়ে গলায় ঢালল। ঢেলে, গেলাসের তলানিটা অভ্যেসমতো উপুড় করে ধরল পাশে রাখা ক্যাকটাসের টবে।

উপুড় করেই থমকে গেল। স্মৃতির বিদ্যুৎ ঝলসে উঠেছে মাথার মধ্যে। আবার গেলাসটা উপুড় করল সঞ্জয়। আবার! আবার!

এবার মনে পড়েছে। ঠিক এমনি করেই ক্যাকটাসের টবে মদের গেলাস উপুড় করে ধরেছিল অজানা এক সুন্দরী, বারীন বাগচির ফ্ল্যাটে। দিয়ে সঞ্জয়কে বলেছিল চা আনতে। সঞ্জয় চা নিয়ে ফিরে এসে দেখেছিল বারান্দা শূন্য। বহু নীচে পড়ে রক্তাক্ত একটা মাংসপিণ্ড—বারীন বাগচি!

আকাশের বিজলী মানবীরূপে দেখা দিলে যে রূপ হয়, মেয়েটির অঙ্গে সেই রূপ দেখেছিল সঞ্জয়। তাই ভোলা যায়নি। কালিদাস এই মেয়েরই ছবি আঁকছে তন্ময় হয়ে। অন্য ছাঁদে চুল বাঁধার জন্যে চিনি-চিনি করে চিনতে পারেনি সঞ্জয়।

বারীন বাগচির রহস্যজনক আত্মহত্যার (?) পূর্ব মুহূর্তে যে মোহিনীকে দেখা গিয়েছিল—এই সেই কন্যা। বারীনের মৃত্যুর কারণ সে, হয়তো বা হত্যাকারিণীও। কিন্তু কালিদাসের সঙ্গে জুটল কেন মেয়েটা? এত গোপনীয়তাই বা কেন?

হঠাৎ একটা কুৎসিত চিন্তা হুল ফোটালো সঞ্জয়ের মগজে। ছিটকে গিয়ে রিসিভার তুলল ও। ডায়াল করল কালিদাসের নাম্বার। কিন্তু ফোন বেজেই গেল। কেউ ধরল না।

কালিদাস কি ঘুমোচ্ছে?

সঞ্জয়ের মাথায় সেই কুৎসিত চিন্তাটা তখনো সমানে হুল ফুটিয়ে চলেছে। কাজেই কিছুক্ষণের মধ্যেই অত রাতেও তাকে দেখা গেল কালিদাসের ফ্ল্যাটের সামনে।

দরজা ভেজানো ছিল। ভেতরে আলো জ্বলছিল। ইজেলের পায়ার কাছে মুখ থুবড়ে পড়েছিল কালিদাস।

একটা তির পিঠের মধ্যে ঢুকে আধখানা বেরিয়েছিল বুক দিয়ে।

পরের দিন।

জেলখানার সামনে এসে ব্রক কষল একটা রক্তরক্তের ক্যাডিলাক। নেমে দাঁড়াল পরমাসুন্দরী একটি তরুণী।

জেল সুপার অবাক হলেন তরুণীকে দেখে। মেয়েটি নাকি ভৈরব সাহার সহোদরা। দাদা হাজতবাস করছে শুনে দেখা করতে এসেছে।

সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। জেলখানার নিয়মকানুন ছার সে মুখের কাছে। কাজেই অচিরেই গরাদের এপাশে এসে দাঁড়াল মণিকা। ওপাশে ভৈরব।

চোখে চোখ রেখে মণিকা বলল—'চিনতে পারছেন?'

'না।'

'আপনাকে মুক্তি দিতে এসেছি।'

বলে, আঁচল ঢাকা পিস্তল থেকে পর পর তিনবার গুলি করল মণিকা। ভৈরব মুক্তি পেল ধরাধাম থেকে।

সেই সঙ্গে মণিকাও। চতুর্থ গুলিটা দিয়ে নিজের মগজ ফুটো করে দিয়ে সে রওনা হল পরপারে স্বামীর কাছে।

** 'রহস্য' পত্রিকা'য় প্রকাশিত। শারদীয় সংখ্যা, ১৩৭৮।*

পরশ পাথর

ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছিলাম অনেক মাস, অনেক বছর। সঙ্গে আছে আরো অনেকেই। দিশেহারা। উদ্দেশ্যহীন।

কিন্তু আমার মতো ম্যাজিক জানে না কেউ। জাদুমন্ত্র আমার সূক্ষ্ম সত্তায়। আমি চাইলে অনেক কিছু করতে পারি। কিন্তু ইচ্ছে নেই।

পৃথিবীর আকর্ষণ বড্ড বেশি। প্রবল। মাঝে-মাঝে দূরের ওই গ্রহনক্ষত্রের দিকে ছিটকে গেছিলাম বটে, কিন্তু প্রচণ্ড আকর্ষণ আমাকে টেনে নামিয়ে এনেছে। বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে গুহায়, মন্দির কাঠ গির্জায় মসজিদে ঘুরে ঘুরে বেড়াই। এই সব জায়গাই আমার বেশি ভালো লাগে।

পগাড়ে নালায়, পোড়োবাড়ি আর বাঁশঝাড় নিমগাছে যারা ঘোরে, মায়া হয় ওদের দেখে। একেবারেই শক্তিহীন। যতদিন বেঁচেছিল, শুধু নাওয়া খাওয়া, টাকা রোজকার আর ভোগবাসনা নিয়েই মেতে থেকেছে। ব্রহ্মাণ্ডের অসীম শক্তিদের শরীরের আধারে সঞ্চয় করার কোনও চেষ্টা করেনি।

আমি করেছিলাম। বছরের পর বছর ল্যাবরেটরিতে সাধনা করেছি। হিমঠান্ডায় পাহাড়ের গুহায় অজানাকে জানতে চেয়েছি। শক্তি পেয়েছি। অকল্পনীয় শক্তি।

কিন্তু অত শক্তিকে ধরে রাখার মতো শরীর আমার ছিল না। রক্তমাংসের শরীর জীর্ণ করে দিয়ে আমার মূল সত্তাকে আঁকড়ে ধরে ধারণাতীত শক্তিরা বেরিয়ে এল বাইরে। মূল সত্তার বিনাশ নেই, জরা নেই, ক্ষয় নেই। জাদুবলে বলীয়ান এই সত্তা আবার নবদেহে প্রবিষ্ট হতে পারে। কিন্তু আমার ইচ্ছে নেই।

না, ইচ্ছে নেই। লাভ কী?

কিন্তু মায়া হল ছেলেটিকে দেখে। কতই বা আর বয়স। বড়জোর চোদ্দো। ভারি সুন্দর চেহারা। চোখদুটো বড় বড়। টকটকে ফর্সা রং। মাথায় বেশ লম্বা। একমাথা হালকা চুল।

সবচেয়ে ভালো লেগেছিল ছেলেটার চোখের চাহনি। দিঘির মতো টলটলে, কালো। সমুদ্রের মতো অতলান্ত। আকাশের মতো অসীম, প্রশান্ত।

অথচ এই চোখই কখনো কখনো ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। হিংস্রতায় নিষ্করুণ হয়ে ওঠে। তখন তার দিকে চাওয়া যায় না।

ঠিক এই সময়েই কিন্তু গভীর চোখে তার দিকে চেয়েছিল তার মা। তন্ময় চাহনি। ব্যথা যেন ঝরে পড়ছে দুই চোখে।

মা বলে ঠিকই চিনেছিলাম আমি। ড্রেসিং টেবিলের ওপরেই রয়েছে যে তার ফটোগ্রাফ। ছেলেটি আত্মনিমগ্ন সেই ফটোর পানে চেয়ে। চোখ, চিবুক, মুখের গড়ন একই রকমের।

ছবির মা কিন্তু সামনেই দাঁড়িয়ে। ছলছল চোখে চেয়ে রয়েছে ছেলের দিকে।

আমি যে পাশে এসে দাঁড়িয়েছি, সে তখনও তা দেখেনি। ছেলেটির দেখবার কথা নয়। কিন্তু মা তো দেখবে। কিন্তু যার সমস্ত মনপ্রাণ জুড়ে রয়েছে ওই ছেলে, সে পাশের দিকে তাকাবে কখন?

মৃদু স্বরে জিগ্যেস করেছিলাম—'কী হয়েছে?'

ভীষণ চমকে উঠল ছেলের মা। আমাকে দেখেই বিস্ময়ভরা চোখদুটোয় ফুলে উঠল নিবিড়। বিস্ময়—'কে আপনি?'

'তোমারই মতো একজন। দেহত্যাগ করেও ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। পৃথিবীর মায়া আর কাটাতে পারছি না।'

'আপনারও ছেলে আছে নাকি?'

'না। কেউ নেই আমার।'

'তবে?'

'কীসের আকর্ষণে আটকে আছি পৃথিবীতে, এই তো? হয়তো মাটির আকর্ষণ...অথবা হয়তো আমাদের মতোই যারা দুঃখ শোকে অধীর, তাদের ছেড়ে যেতে পারছি না বলেই...।'

'আপনি কি সাধু ছিলেন?'

'লম্বা দাড়ি দেখে বলছ?' হাসলাম আমি—'চুলদাড়ি কাটবার সময় পেতাম না—তাই।'

'শুধু দাড়ি নয়,' ছেলের মা আমার চোখের দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকিয়ে—'আপনার মতো সৌম্য বিদেহী আজ পর্যন্ত দেখিনি। ঋষির মতোই চেহারা আপনার,' বলতে বলতে হঠাৎ দু-চোখে আশার আলো জ্বলে ওঠে মেয়েটির—'আপনিই কি সেই সব অদৃশ্য সহায়দের একজন যারা মরণের পরেও মানুষের উপকার করে যান নানাভাবে?'

হাসলাম। জবাব দিলাম না।

মেয়েটির চোখমুখ তখন জ্বলজ্বল করছে। কতই বা আর বয়স হবে। বড় জোড় চব্বিশ। মৃত্যুকালে যে বয়স ছিল, এখনও তা রয়ে গেছে। পরমা সুন্দরী। যেমন রং, তেমনি মুখের গড়ন। দীর্ঘাঙ্গী। চোখদুটো সবচেয়ে সুন্দর বড় বড়। গভীরভাবে আচ্ছন্ন।

বলল আকুল কণ্ঠে—'ঠাকুর, আমার ছেলেটাকে ভালো করে দেবেন?'

'ঠাকুর!' হেসে ফেললাম আমি—'ঠাকুর বললে কেন আমাকে?'

'ওইরকমই যে দেখতে আপনাকে। বলুন না, ভালো করে দেবেন ছেলেটাকে?'

'কী হয়েছে ওর?'

'ভেবে ভেবেই বোধহয় পাগল হয়ে যাচ্ছে। ওই দেখুন...ওই দেখুন।'

দেখলাম ছেলেটা উঠে দাঁড়িয়েছে। স্কিপিং-এর দড়িটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। চোখদুটো বিষণ্ণ। মায়ের ছবির দিকে তাকাচ্ছে আর দড়িটাকে টেনে টেনে দেখছে কত শক্ত।

মতলবটা বুঝলাম। বললাম—'ওর বাবা কোথায়?'

'কাজে বেরিয়েছে। রাত হবে ফিরতে। তার মধ্যেই দেখুন...ওই দেখুন ওই দেখুন...!'

ছেলেটা মায়ের ফটো তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে কাঁদছে। দু-গাল বেয়ে জল গড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে পাশেই বাবার ছবির দিকে। কিন্তু কী আশ্চর্য। সে চোখে বিদ্বেষ! বিজাতীয় ঘৃণা।

'বাপকে একদম সইতে পারে না দেখছি,' বলেছিলাম আমি।

'অথচ বাপকেই সবচাইতে ভালোবাসে। আমার চাইতেও। হঠাৎ ওর অখণ্ড বিশ্বাসে ঘা লেগেছে। খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে বাবার ওপর অগাধ বিশ্বাস। ও আজ তাই দিশেহারা।'

'বিশ্বাস ভাঙল কেন?' দেখলাম ছেলেটা দড়ি নিয়ে আবার টেনে টেনে দেখছে। খালি গা। প্রদীপ্ত চোখে বিকার ভাব। অস্থির। মাথার মধ্যে যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

'ওর মামা কানে বিষ ঢেলেছে। নিজেদের দোষ ওর বাবার ঘাড়ে চাপিয়েছে। বলেছে, তোর বাবা তোর মাকে মেরে ফেলেছে।—একী—একী করছিস রাজু।—ঠাকুর—ঠাকুর! ওকে বাঁচান!'

মায়ের চিৎকার ছেলে শুনতে পাবে কেন? একজন ইহলোকে, আর একজন পরলোকে। কিন্তু ছেলের কাণ্ড দেখে মায়ের সে খেয়াল নেই। আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠেছে—'বাঁচান! বাঁচান! ঠাকুর, ওকে বাঁচান।'

খাটে উঠে পড়েছে রাজু। স্কিপিং দড়ির একটা প্রান্ত বেঁধেছে সিলিংয়ে লাগানো হুকে। অন্য প্রান্তে একটা ফাঁস তৈরি করেছে।

গলায় দড়ি দেওয়ার মতলব। কাঁদছে ওর মা। হাওয়া-শরীর নিয়ে ছেলেকে আটকাতে পারছে না। ঘর ফাঁকা। দরজায় ল্যাচ দেওয়া। চাবি নিশ্চয় বাবার কাছে। তিনি না ফিরলে এ ছেলের আত্মহত্যা কেউ রোধ করতে পারবে না। কিন্তু আমি পারব।

চনমন করে উঠল আমার বিদেহী সত্তার শক্তিকেন্দ্রগুলো। দ্রুত হ্রস্ব স্বরে শুধোলাম ব্যাকুল-নয়না মেয়েটিকে—'নাম কী তোমার, মা?'

'দুর্গা। রাজু। রাজু। লক্ষ্মী ছেলে আমার—ধীর হ। মাথা ঠান্ডা কর।'

রাজু ততক্ষণে দড়ির ফাঁস গলায় দিয়েছে। আমি আর দেরি করলাম না। ঢুকে পড়লাম ওর শরীরের মধ্যে। চলে গেলাম একেবারে মস্তিষ্কে। যেখানে দশ হাজার কোটিরও বেশি নিউরণ পরিপাটিভাবে সাজানো রয়েছে। ন-হাজার কোটি এখনও নিষ্ক্রিয়। সারা জীবন জানতে চেয়েছি এই ন-হাজার কোটি নিউরনের কাজ কী। কেন তাদের সৃষ্টিকর্তা ভরে দিয়েছেন করোটির মধ্যে। নিশ্চয় উদ্দেশ্য আছে। নিষ্ক্রিয় নিউরণদের সক্রিয় করলে কী কী ঘটতে পারে, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আর ধ্যানের মাধ্যমে তা জানতে চেয়েছি—পেরেছিও।

প্রবেশ করলাম এই নিষ্ক্রিয় নিউরণের রাজ্যে। থাকে থাকে সাজানো কোটি কোটি পুঞ্জীভূত রহস্য। প্রতিটি নিউরণ এক একটি অন্তহীন প্রহেলিকা। শক্তি কেন্দ্র। অসীম শক্তির ভাণ্ডারকে করোটির মধ্যে নিয়ে মানুষ কত অসহায়...ভাবে বুঝি মাত্র পাঁচটা ইন্দ্রিয়ই তার একমাত্র সম্বল। এই পাঁচ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগৎ ছাড়া অন্য আর কিছুই মানতে চায় না। মূর্খ! মূর্খ!

নিউরণ-লোকে বিচরণ এই আমার প্রথম নয়। ধ্যানের শক্তি নিয়ে আমি কোটি কোটি প্রহেলিকাদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে তাদের চরিত্র জেনেছি, তাদের কাজ জেনেছি, অলৌকিক কাণ্ডকারখানার আধারদের প্রয়োজনমতো সক্রিয় করে তুলে অসম্ভবকেও সম্ভব করে তোলার মন্ত্রগুপ্তি আয়ত্ত করেছি।

রাজুর নির্মল মস্তিষ্কে প্রবেশ করেই টের পেলাম দোটানার প্রচণ্ড আলোড়ন চলছে। নিউরণদের মধ্যে দিয়ে যেন ঝড় বয়ে চলেছে। আবেগের এই প্রভঞ্জন ধেয়ে আসছে একদিক থেকেই—একগুচ্ছ নিউরণ-কেন্দ্র থেকে—ভুল ধারণা মৌরসীপাট্টা গেড়ে বসেছে যেখানে।

অনেক কিছুই করা যায় এখন। কিন্তু সে সময় তো নেই। প্রথমেই ওর অসুস্থ চিন্তাধারায় যে প্ল্যানটা ছকে রেখেছে, সেটাকে ভণ্ডুল করে দিতে হবে। ওর চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, মায়ের ছবিটা বুকে ধরে কাঁদতে কাঁদতে সিধে হয়ে দাঁড়াল। এরপর ওর ইচ্ছে চেয়ারটাকে টেনে তার ওপর দাঁড়িয়ে দড়িটাকে ছোট করে নেওয়া। যাতে চেয়ার থেকে লাফিয়ে পড়লে গলায় এঁটে যায়।

ঠিক এই জায়গাটাতেই কয়েকটা নিউরণকে অসাড় করে দিলাম। দড়ি ছোট করার কথা ভুলে গেল রাজু। খাটে উঠে দাঁড়িয়ে লাভ দিতেই দড়িটা আলগা হয়েই রইল। আরও কয়েকটা নিউরণকে নিষ্ক্রিয় করে দিলাম —যাতে উপস্থিত বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। রাজু মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে গলায় দড়িটা টেনে টেনে বসাতে লাগল। কাঁদছে। হিস্টিরিয়া এসে গেছে। অজ্ঞান হয়ে গেল। গ্যাঁজলা বেরোচ্ছে ঠোঁটের কষ বেয়ে।

বেরিয়ে এলাম। দুর্গা আতঙ্কঘন চোখে তাকিয়ে ছেলের দিকে।

বললাম—'বেঁচে গেল তোমার ছেলে। কিন্তু এভাবে কতদিন ওকে বাঁচাবে?'

'আপনি ব্যবস্থা করুন ঠাকুর।'

'ঠাকুর। বেঁচে থাকতে কেউ ঠাকুর বলে ডাকেনি। পাগল বলত সবাই।

বললাম—'ঠিক আছে, মা। দেখছি কী করা যায়।'

দুর্গার কষ্ট হচ্ছিল। সূক্ষ্মদেহী। অনেক ঊর্ধ্বস্তর থেকে নেমে এসেছে ছেলের টানে। এখন কষ্ট হচ্ছে। জলের মধ্যে মানুষ ডুবে থাকলে যেরকম কষ্ট হয়, তার চাইতেও বেশি।

বললাম—'মা, তুমি যাও। আমি আছি।'

'আপনার কষ্ট হচ্ছে না?'

'হলেও যেতে পারছি না, মা। যাও।'

দুর্গা চলে গেল। নিশ্চিন্ত মনে আমার পাহারায় ছেলেটাকে সঁপে দিয়ে সে ফিরে গেল ঊর্ধ্বলোকের বিদেহীদের মাঝে।

আমি চেয়ে রইলাম রাজুর মুখের দিকে। অসহায়। বড় অসহায়। বিকারগ্রস্থ হওয়ার ফলে এত বুদ্ধিদীপ্ত হয়েও নির্বোধের মতো আচরণ করে চলেছে। একে টেনে তুলতেই হবে। ঘোর কাটাতেই হবে। অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসতে হবে।

দরজার ল্যাচ-কী ঘুরে গেল। রাজুর বাবা ঢুকলেন ঘরে। শ্রান্ত, ক্লান্ত চেহারা। বয়সে প্রৌঢ়। চোখের তারায় কিন্তু অবসাদ ফুঁড়ে বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য ঠিকরে বেরোচ্ছে। যৌবনে ব্যায়ামচর্চার চিহ্ন এখনো রয়ে গেছে বাহু আর বুকের পেশিতে। লম্বা চুল উস্কখুস্ক। জুলপি পেকে সাদা। সরু গোঁফও বিলকুল রূপোলি।

ঘরে ঢুকেই ভদ্রলোক এদিক-ওদিক তাকালেন। ছেলেকে দেখতে পেলেন না। নিমেষে আতঙ্ক ঘনিয়ে এল দুই চোখে। ছুটে গেলেন রান্নাঘরে, তারপর কলতলায়। ছেলে কোথাও নেই। উদভ্রান্তের মতো ফের দৌড়ে ঘরে ঢুকলেন বড় ঘরে। ছেলে অনেক সময় খাটের তলায় লুকিয়ে ভয় দেখায় বাবাকে। তাই খাটের তলায় হেঁট হয়ে উঁকি দিলেন। ট্রাঙ্ক আর কার্ডবোর্ড বাক্স বোঝাই থাকায় খাটের ওদিক পর্যন্ত দেখতে পেলেন না। উঠে দাঁড়িয়ে খাট ঘুরে এদিকে আসতে যাবেন, এমন সময় চোখে পড়ল সিলিং থেকে লাকলাইন দড়ি ঝুলছে। দড়ি নেমে গেছে খাটের ওপাশে মেঝে পর্যন্ত।

মেঝেতে শুয়ে রাজু। অজ্ঞান। বুকের ওপর দুহাতে জড়িয়ে মায়ের বাঁধানো ফটোগ্রাফ—যে মাকে ওর মনেই নেই।

গলায় দড়ির ফাঁসের দিকে চেয়ে রইলেন ওর বাবা। সেকেন্ড খানেক। বিপদ অনেক মানুষের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব জাগিয়ে তোলে। এই ভদ্রলোকের ক্ষেত্রে তাই ঘটল। নিমেষে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে রাজুর শিথিল একটা হাত তুলে নিয়ে মণিবন্ধে আঙুল টিপে দেখলেন—নাড়ি আছে। ফটোটা বুক থেকে নিয়ে রাখলেন ড্রেসিং টেবিলে। গলা থেকে ফাঁস ফুলে বগলের তলায় হাত দিয়ে মেঝের ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে এলেন খাটের এদিকে। দুহাতে ছেলেকে তুলে শুইয়ে দিলেন খাটে। দৌড়োলেন রাস্তার ওপার থেকে ডাক্তারকে ডেকে আনতে।

ডাক্তার এলেন সঙ্গে সঙ্গে। সব শুনে বললেন—'এ কেস অফ সিজোফ্রেনিয়া। মেন্ট্যাল হোমে ট্রান্সফার করুন ইমিডিয়েটলি।'

সিজোফ্রেনিয়া? সন্দেহ হল আমার। রাজুর মগজের ভেতর এইমাত্র টহল দিয়ে এলাম আমি। এলোমেলো চিন্তার দুঃসহ টানাপোড়েন ছাড়া তো কিছুই চোখে পড়েনি। সিজোফ্রেনিয়া নামক উন্মত্ততার বিকৃতি তো কোনও কোষে দেখিনি—অবশ্য কোটি কোটি নিউরণের সবগুলো আর দেখা হয়নি। তবুও—

ডাক্তার বিদায় নিতেই টেলিফোন তুললেন পলাশবাবু। ব্যবস্থা হয়ে গেল বালিগঞ্জের একটি মেন্টাল হোমে। রাজু তখন কলতলায়—শুনতে পেল না—জানতেও পেল না অন্যায়ভাবে তাকে পাঠানো হচ্ছে পাগলা গারদে!

ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দুহাতে মাথা টিপে ধরেছেন পলাশবাবু। পাঁচদিন বয়স থেকে যাকে একটা দিনের জন্যেও কাছ ছাড়া করেননি—আজ তাকে পাঠাচ্ছেন পাগলা গারদে—

রাজু পাগল। এইজন্যেই কি তিনি বিয়ে করলেন না দ্বিতীয়বার? ছেলের জীবনে কোনও অন্তরায় আসুক, তা তিনি চাননি। কিন্তু পরিণাম?

ঠিক এই সময়ে, পলাশবাবুর এই বিহ্বলতার সুযোগে ঢুকে গেলাম তাঁর মগজের কন্দরে—

বললাম—'বিয়ে করিনি, ভালোই করেছি। ছেলেটা সৎ-মা'র হাতে পড়ত। নির্ঝঞ্ঝাট থাকতে গিয়ে আরও ঝঞ্ঝাট বাড়ত।'

বললাম—'ডাক্তার বলুক গে, পাগলা-গারদে ছেলেকে দেওয়া ঠিক হবে না। সেখানে পাঁচ রকম পাগলের মতো একেও পাগলের ট্রিটমেন্ট দেওয়া হবে। ইলেকট্রিক শক দেবেই ঝামেলা কমানোর জন্যে। ব্রেনসেল নষ্ট করে দেবে। খামোকা ছেলেটাকে মগজের শক্তি কমিয়ে দেওয়াটা ঠিক নয়।'

পুনরুক্তি করে গেলেন পলাশবাবু। ভাবনাগুলো যেন তাঁরই।

এইভাবেই চলল মগজ ধোলাই। পলাশবাবুর মগজটিও বেশ। আধ্যাত্মিক চিন্তায় ভরপুর। বিশুদ্ধ। পবিত্র পরিবেশ। সৎ চিন্তা, সৎ সঙ্গ আর সৎ কথা তাঁর মগজের এহেন উচ্চাবস্থা এনেছে। যেটুকু দ্বিধা, সংশয়, দিশেহারা অবস্থা এসেছিল, আমি তা কাটিয়ে দিলাম মগজে অধিষ্ঠান করে।

ফলটা কিন্তু নাটকীয় করতে চাইনি ইচ্ছে করেই। রাজুকে বাঁচাবো কথা দিয়েছি দুর্গাকে। তাই সইয়ে সইয়ে পলাশবাবুকে তৈরি করতে হয়েছে। কখনো রাজুর মগজেও প্রবেশ করেছি—তার দানবিক সত্তাকে রুখে দিতে। তার মাথায় যখন খুন চেপেছে, হিংস্র চোখে বাবার দিকে তাকিয়ে সাইকেলের পাম্পার হাতে নিয়েছে পেটাবে বলে, আমি তখন পলাশবাবুকে ছেড়ে তার মধ্যে ঢুকে মহাবিপর্যয় রুখে দিয়েছি।

কিন্তু হঠাৎ একদিন এমন একটা ঘটনা ঘটল যার পর আমাকে ভাবতে হল অন্য পন্থা।

বেশ ছিল বাপবেটায়। নতুন স্কুলেও ভর্তি হয়ে গেছে। স্কুল খুললেই নতুন বন্ধুদের সঙ্গে হই-চই করার স্বপ্নে বিভোর রাজু। নতুন জামা-প্যান্ট-জুতো-বই এসে গেছে। দুর্গার মুখে হাসি ফুটেছে। ও তো দেখছি রোজই রাত্রে আসে। ছেলের মাথার কাছে চুপটি করে বসে থাকে। রাজু ঘুমিয়ে পড়লেই ওর সূক্ষ্ম দেহের সঙ্গে কত কথাই না বলে।

তাই নিশ্চিন্তে হয়েছিলাম। সংসার সুখের হয়েছে। একজনের হাওয়ার শরীর, বাকি দুজনের রক্তমাংসের।

দিনকয়েকের জন্যে চুম্বক ক্ষেত্রে ভেসে গিয়েছিলাম। বিজ্ঞানীরা এখনও পুরো হদিশ পাননি এই চুম্বক ক্ষেত্র আর তার অকল্পনীয় শক্তির। এই পৃথিবীতেই বিরাজমান এই শক্তি-ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে সূক্ষ্ম শরীরেও আমাকে অবগাহন করে নিতে হয়। বিশেষ করে সৌরঝড়ের সময়ে। মহাজাগতিক রশ্মির প্রভঞ্জন বয়ে যায় পৃথিবীর ওপর দিয়ে। চুম্বক ক্ষেত্র অকল্পনীয় শক্তির আধার হয়ে ওঠে। এইচ, রাইডার হ্যাগার্ডের 'শী' উপন্যাসটা যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা অবাক হয়েছেন মৃত্যুকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে হাজার হাজার বছর ধরে বেঁচে থাকার রহস্যকেন্দ্র এক মৃত আগ্নেয়গিরির মধ্যে রয়েছে জেনে। আসলে, পৃথিবীর বেশ কয়েকটা জায়গায় পুঞ্জীভূত রয়েছে এই শক্তি। প্রাচীন মঠ-মন্দিরগুলো নির্মিত হয়েছে এই সব জায়গাতেই। দৈবী-শক্তি প্রকৃতপক্ষে এই মহাশক্তি। কুম্ভমেলায় বারো বছর অন্তর যাঁরা গেছেন, তাঁরা দেখেছেন, মধ্যরাত্রে স্নান করার ঠিক সময়টিতে আচম্বিতে কোথা থেকে প্রবল হাওয়া বইতে শুরু করে। প্রচণ্ড শীতে কাঁপতে কাঁপতে একটা ডুব দিলেই কিন্তু কাঁপুনি চলে যায়—আর শীত করে না। এ হাওয়া কোথা থেকে আসে, আসলে তা হাওয়া কি অন্য কিছু, বারো বছর অন্তর কুম্ভ মেলায় কেন সারা পৃথিবীর যোগীরা আসেন—তা অনেকেই জানেন না। পৃথিবীর অনেক অজানা রহস্যের অন্যতম এই রহস্য কিন্তু আমার কাছে মোটেই রহস্য নয়। যখন বেঁচে ছিলাম, সাধনা করেছি হিমালয়ের বিশেষ এক গিরিগুহায়—শক্তির কেন্দ্র আছে সেখানে। মৃত্যুর পরেও অমর সত্তাটাকে মাঝে মাঝে নিয়ে যাই শক্তি-স্নানে অক্ষয় অব্যয় থাকবার মানসে।

কিন্তু নিজের প্রসঙ্গ বড় বেশি বলে ফেলেছি। শক্তি কেন্দ্রে সেবার দেখলাম আরও অনেক বিদেহী গুরু এসেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছে মাদাম ব্লাভাটস্কি, কর্নেল অলকট এবং একজন স্বামীজি যিনি থিয়সফিস্টদের সম্বন্ধে কত কটূক্তিই করেছেন একসময়ে।—কিন্তু এই শক্তি ক্ষেত্রে দেখলাম তোফা আছেন তিনজনে।

কথায় বলে, সৎসঙ্গে স্বর্গবাস। তা আমার স্বর্গ তো এই পৃথিবী। তাই মিশে গেলাম সৎসঙ্গে বেশ কিছুদিনের জন্যে। এমন সময়ে একদিন গুরুজি দর্শন দিলেন অকস্মাৎ। এই গুরুজির নাম পৃথিবীর সবাই জানেন। কিন্তু আমি তা বলতে চাই না। কথা দিয়েছি।

গুরুজি সৌম্য হেসে বললেন—'তুই এখানে সৎ-সঙ্গ করছিস, ওদিকে তোর রাজুর অবস্থা যে কাহিল হয়ে এল। যা পালা।'

তৎক্ষণাৎ চলে এলাম রাজুর ঘরে। দেখলাম রাজু মেঝেতে বসে কটমট করে তাকাচ্ছে আর চোখ ঘোরাচ্ছে। একটু তফাতে বসে ওর বাবা। ম্লান উদ্বিগ্ন মুখে বিপদের কালো ছায়া।

রাজুর সামনে ময়লা ধুতি-পাঞ্জাবি পরা কালোমতো বেঁটেপানা চশমাধারী এক প্রৌঢ় একটা ঝাঁটার কাঠি নিয়ে মন্ত্র পড়ছে।

রাজুর সমস্ত সত্তায় জড়িয়ে রয়েছে বীভৎস কালো একটা ছায়া।

দেখেই আঁতকে উঠেছিলাম। এ যে সেই বিভীষিকা—অন্ধকারের পুঞ্জ হতে যার জন্ম— অন্ধকারেই যার নিবাস। কিন্তু সরল রাজুকে আশ্রয় করেছে কেন?

ফ্ল্যাটটা একতলায়। পাশেই জলা জায়গা। নোংরা বস্তি। বুঝলাম সবই। রাজু দাঁত মাজা ছেড়েছে। ঘরদোর বমি করে ভাসাচ্ছে। যেখানে সেখানে মলত্যাগ করছে। শুভ শক্তি ঘর থেকে বিদায় নিয়েছে। আবির্ভূত হয়েছে অশুভ শক্তি।

এই ছায়াদানবকে আমি চিনি। মানুষের মনের যত পাপ, যত অন্যায়, যত কালিমা—সব পুঞ্জীভূত হয় ইথারে—ইথিরীয় উপাদানে গঠন করে নেয় কায়া—অপার্থিব সেই কায়া হন্যে হয়ে খোঁজে একটি আশ্রয়—এমন একটি আশ্রয় যাকে বেষ্টন করে পরজীবি লতার মতো নিজের পুষ্টিসাধন করে চলবে, ভোগবাসনা মিটিয়ে চলবে।

এ ছায়াদানবের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পাপাচার, অতৃপ্ত কামনার ক্ষুধিত লিপ্সা এর বিবেক নেই, বোধ নেই, মায়া নেই, মমতা নেই। অতীতেও দেখেছি জগতের অনেক শুভশক্তি এর কুটিল শক্তির কাছে হার মেনেছে। পারব কি আমি?

গুণীন ভদ্রলোক আঁচ করেছে খানিকটা। অশরীরীর অস্তিত্ব অনুমান করে নিয়ে ঝাড়ফুঁক করে চলেছে সেইভাবে—কিন্তু কল্পনাও করতে পারেনি—অশরীরী বা দুষ্ট প্রেতাত্মার চাইতেও সহস্র গুণে ভয়াবহ এই ছায়াদানব। মানুষের চোখে সে অদৃশ্য। দৃশ্যমান হলে দাঁতকপাটি লাগতই।

'রাজু, মাপো তো কাঠিটা আঙুল দিয়ে,' বলে মন্ত্রপড়া ঝাঁটার কাঠিটা এগিয়ে দিল গুণীনবাবু। চশমাটা ঠিক করে নিয়ে চেয়ে রইল হাসি হাসি মুখে। ভাবখানা, যাবে কোথায় বাছাধন!

রাজুর চোখ জ্বলছে। অমানুষিক চাহনি। বনের শ্বাপদও এ চাহনি দেখলে শিউরে উঠত। কাছে ঘেঁসত না। কিন্তু গুণীনবাবু আঙুলের স্টিলের আংটিটা একবার নিজের কপালে ছুঁইয়ে শুধু বললেন—'মাপ রে, মাপ। এক ঘণ্টার মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

রাজুর শরীর এই ক'দিনেই যেন দুগুণ ফুলে উঠেছে। গোল কাঁধে চিতাবাঘের মতো ঝুঁকে লাফিয়ে পড়ার প্রবণতা। স্ফুলিঙ্গ চোখে সেই রক্তহিম করা জিঘাংসা।

ঠোঁট আর চোয়াল শক্ত হয়ে গেল রাজুর। কিন্তু সামলে নিলে নিজেকে শেষ মুহূর্তেও। কাঠিটাকে মেঝেতে ফেলে আঙুল ফেলে ফেলে মাপল—বাইশ।

অর্থাৎ বাইশ আঙুল লম্বা কাঠি।

কাঠি টেনে নিল গুণীনবাবু। আবার কিছুক্ষণ মন্ত্র পড়ল আর ফুঁ দিল—মন্ত্র পড়ল আর ফুঁ দিল—মন্ত্র পড়ল আর ফুঁ দিল—বার বার তিনবার। তারপর কাঠিটা বোলাতে লাগল রাজুর গায়ে।

চাপা গলায় গজরে উঠল রাজু। চোদ্দো বছরের এই ছেলের গলায় শুনেছি সুমিষ্ট স্বর—এত কর্কশ, গুরুগম্ভীর গজরানি এ কণ্ঠে কল্পনাই করতে পারা যায় না। শিউরে উঠলেন পলাশবাবু। ভয়ে কাঠ হয়ে চেয়ে আছেন ছেলের দিকে।

চমকে উঠেছিল গুণীনবাবুও। পরক্ষণেই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দ্রুত হাতে বারকয়েক সারা গায়ে কাঠি বুলিয়ে নিয়ে টেনে ধরল মেঝের ওপর।

বলল—'রাজু, নিজে মাপ।'

প্রতিবার গায়ে কাঠি বোলাবার সঙ্গে সঙ্গে কুঁচকে কুঁচকে যাচ্ছিল রাজু। চোখে সেই অগ্নিগর্ভ দৃষ্টি, শক্ত ঠোঁট একটু ফাঁক হয়ে যাওয়ায় না মাজা হলুদ দাঁত বাঘের মতো যেন রক্ত—তৃষ্ণায় লোলুপ। দৃশ্যটা অতিশয় রোমাঞ্চকর। কিন্তু গুণীনবাবু তো এসব দেখেশুনে অভ্যস্ত। তাই পরোয়া করেনি। হুকুমের স্বরে বলল—'রাজু, নিজে মাপ।'

ভেবেছিলাম এবার রাজুর ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে। কিন্তু আবার সামলে নিল সে নিজেকে। আমি যে শক্তি দিয়ে এসেছি ওর মগজে, এখনও তার রেশ রয়ে গেছে মনে হচ্ছে।

কাঠিটা মাপল রাজু। একই কাঠি একটু আগে মেপেছিল বাইশ আঙুল। কোনও হাতসাফাই যে হয়নি তা তো দেখাই যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও এবার তা মাপবার পর দাঁড়াল চৌত্রিশ আঙুল।

কাঠি বেড়ে গেছে। গুণীনবাবু বাহাদুর বলতে হবে। ছায়াদানবের কিছুটাকে মন্ত্রবলে টেনে এনেছে কাঠির মধ্যে।

তাকিয়ে দেখলাম, রাজুর অবয়ব ঘেরা ছায়াদানব কাঁপছে থির থির করে...একবার গুটিয়ে গিয়ে আবার বড় হয়ে যাচ্ছে...আর ভলকে ভলকে কালচে বেগুনি কুৎসিত আভা ঠিকরে যাচ্ছে চারিদিকে।

বলা বাহুল্য এ সবই দেখলাম আমি। আর কেউ না।

খুশি গলায় বললে গুণীনবাবু—''রাজু, আর ভয় নেই। ব্যাটাকে পাকড়েছি। কব্জায় এসে যাবে এখুনি। তারপর কাঠি ছোট হতে হতে দেখবি পনেরো আঙুলে এসে দাঁড়িয়েছে। আর কয়েকবার ঝাড়লেই—'

পরক্ষণেই বুঝি প্রলয় ঘটে গেল ঘরের মধ্যে। এত দ্রুত ঘটনাগুলো ঘটে গেল যে ভালো করে দেখাও গেল না কি হয়ে গেল।

শুনলাম একটা শতবজ্রগর্জনের মতো হুঙ্কার রাজুর কণ্ঠে। সঙ্গে সঙ্গে সে ছিটকে দাঁড়িয়ে উঠেই বোধহয় পর পর প্রচণ্ড লাথি মেরে গেছিল বসে থাকা গুণীনবাবুর চোয়ালে, বুকে আর পেটে। বোধহয় বললাম এই কারণে যে তিড়িংমিড়িং করে লাফিয়ে উঠে রাজুকে কেবল এ-পা আর ও-পা ছুঁড়তে দেখেছিলাম। এরই নাম বোধহয় ক্যারাটে বা কুংফু।

ফলটা হল এইরকমঃ বেঁটেখাটো গুণীনবাবু বসে থাকা অবস্থাতেই শূন্য পথে উড়ে গেল এবং দশ ফুট পেছনকার খোলা দরজা দিয়ে আছড়ে পড়ল বাইরের চাতালে।

প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব আছে বটে ভদ্রলোকের। নিমেষমধ্যে গড়িয়ে গিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়িয়েই কাঁচাকোঁচা সামলাতে সামলাতে ছুটল বাস স্ট্যান্ডের দিকে।

ফিরে তাকালাম রাজুর দিকে। তার চোখে খুনের সঙ্কল্প। আতঙ্কে পাংশুবর্ণ পলাশবাবু।

মনস্থির করে নিলাম তৎক্ষণাৎ। প্রবেশ করলাম পলাশবাবুর মগজে। সব যেন পাথর হয়ে গেছে সেখানে। শক্তি প্রভাবে খানিকটা ধাতস্থ করলাম তাঁকে। দুর্গার কথা আমি রাখব ঠিকই। বাঁচাবো রাজুকে। তার আগে বাঁচাতে চাই পলাশবাবুকে। খুন হয়ে যাবে যে ছেলের হাতে।

বললাম—'রাজু, যা হাত মুখ ধুয়ে আয়।'

রাজু তো চায় কলতলাতেই থাকতে। চায় তার শরীরের দখলদার এই বিভীষিকা। রক্তবর্ণ চোখে সে কলতলায় ঢুকতেই পলাশবাবুর হাতটা বাড়িয়ে দিলাম টেলিফোনের দিকে। যে নম্বরটা অনেকদিন ধরে মনে করতে পারছিলেন না—সেটা ডায়াল করালাম ওঁর আঙুল দিয়ে। ওপাশ থেকে ভেসে এল তীব্র ব্যক্তিত্বময় কণ্ঠস্বর।

কথা হয়ে গেল সংক্ষেপে। রাজু বেরিয়ে আসার আগেই (পাক্কা দু-ঘণ্টা পরে) রিসিভার রেখে প্রতীক্ষায় রইলেন পলাশবাবু। মনকে আমি শক্ত করে ধরে রয়েছি। তাই আজ এত নিষ্ঠুর হতে পারবেন। ছেলের মঙ্গলের জন্যেই হতে হবে।

রাজু অশুচি কলতলা-পাইখানা থেকে অশুচি দেহ আর অশুচি মন নিয়ে বেরিয়ে এসে তিন লিটার দুধ আর আমসত্ত খেয়ে নিল একসঙ্গে, সেইসঙ্গে কলা বেশ কয়েকটা। পেট জয়ঢাক। অবয়ব ঘিরে ছায়াদানবকে বেশ পরিতৃপ্ত দেখলাম। বিজয় গৌরবে উল্লসিত। তাই বিকট আভার বিকিরণ আর দেখা যাচ্ছে না। একটু একটু করে কালো ছায়াটা প্রবিষ্ট হচ্ছে সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা গৌরবর্ণ দেহটার মধ্যে। মৌরসীপাট্টা গেড়ে বসেছে আর কী।

হাসলাম। জানি এর ওযুধ কী। ওঝা, গুণীনরা তা জানে না। বিজ্ঞানসাধক ছিলাম বলেই—

ঘুমিয়ে পড়েছে রাজু। ওর নিঃশ্বাসেও এখন দুর্গন্ধ। মুখে তো বটেই। ফুলের মতো সেই ছেলেটা, যার নিষ্পাপ মুকুলে ছিল অরণ্যের আশ্বাস—আজ সে ক্ষুদে দানব!

চেয়ারে ঠায় বসে আছেন পলাশবাবু। দরজা জানলা সব বন্ধ। আলো জ্বলছে ঘরে—দিনের বেলাতেও।

মৃদু টোকা পড়ল দরজায়। উঠে গেলেন পলাশবাবু। সামনে দাঁড়িয়ে তিনজন জোয়ান চেহারার যুবক।

একজন বললে—'ডক্টর বক্সীর কাছ থেকে আসছি।'

দরজাটা দু-হাট করে খুলে দিলেন পলাশবাবু। বললেন—'গাড়ি কোথায়?'

'ওই তো—।'

'দরজার সামনে এনে রাখুন।'

গাড়ি এল দরজার সামনে—শুধু ফুটপাত পেরোতে হবে। ব্যাকডোর খোলাই রইল।

যুবক তিনজনকে নিয়ে শোবার ঘরে ঢুকলেন পলাশবাবু। ঘুমন্ত রাজুকে তিনদিক থেকে ঘিরে ধরল তিনজনে—খাটের তিন পাশে। মাথার কাছে দেওয়াল। পালাবার পথ ওখানে নেই।

পলাশবাবু টেলিফোনে সব কথাই বলেছিলেন ডাক্তার বক্সীকে। তিনি বড় মনোরোগ-বিশেষজ্ঞ হতে পারেন—কিন্তু রাজু তাঁর কাছে হবে একটা চ্যালেঞ্জ। এশিয়া-বিখ্যাত তিন মনোচিকিৎসককে সে ঘোল খাইয়েছে (সেটা যে আমার জন্যেই, পলাশবাবু তা জানবেন কী করে?) ক্যারাটে মার জানে, গায়ে এখন অসুরের মতো শক্তি। এর আগে একটা পাগলা-গারদে একাই এক মিনিটের মধ্যে মেল নার্স, ডাক্তার, দারোয়ানকে পিটিয়ে, চেম্বার তছনছ করে দিয়ে বেরিয়ে এসেছে পিথিডিন ইঞ্জেকশন দেওয়া সত্ত্বেও।

ডাক্তার বক্সী তাই সেইরকম লোক পাঠিয়েছেন। পলাশবাবু জানেন, এক্ষুনি কুরুক্ষেত্র কাণ্ড ঘটে যাবে। তবুও সাহস সঞ্চয় করে ঠেলা দিলেন রাজুকে—'ওঠ রে।'

চোখ মেলল রাজু। খাটের তিন পাশে তিনজন অচেনা পুরুষ দেখে চোখ বন্ধ করে ফেলল তৎক্ষণাৎ। নগ্ন গা, পাজামার দড়ি শিথিল—এসময়ে...

মৃদু স্বরে পলাশবাবু বললেন—'যেতে হবে—ওঠ!'

সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুলেই চিৎকার করে উঠল রাজু—'না!'

বুঝেছে সে কোথায় যেতে হবে। কিন্তু হাত-পা চালানোর সময় দিল না তিন মজবুত পুরুষ। দুজনে চেপে ধরল দু-কব্জি আর দু-পায়ের গোছা। আর একজন মাথা—যাতে ঘাড় বেঁকিয়ে কামড়ে দিতে না পারে।

প্রলয় ঘটতই। কিন্তু তা হল না। চ্যাংদোলা করে বিছানা থেকে টেনে নামিয়ে সটান গাড়িতে তুলে ফেলা হল রাজুকে। কালো ছায়াদানবকে ফুঁসতে দেখলাম ওর অবয়ব দিয়ে।

ট্যাক্সি বেরিয়ে যেতেই আমি ওদের পৌঁছনোর আগেই চলে গেলাম মেন্টাল হোমে—ঢুকে গেলাম ডাক্তার বক্সীর মগজে।

দীর্ঘদেহী, উন্নতনাসা, গৌরবর্ণ ডক্টর বক্সী যখন অনর্গল পাইপ টানছেন, রাজুকে চ্যাংদোলা করে এনে ফেলা হল তাঁর সামনে।

পাজামা অর্ধেক খুলে গেছে। বিশাল শরীর বিশালতর হয়েছে। রাজু যেন সত্যিই এখন দানব। নোংরা দাঁতে মুখে অকপট হত্যালালসা, রক্তবর্ণ ঘূর্ণিত চোখে ঘৃণার বিষ। কণ্ঠে হুংকার—'এখানে কেন?'

মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে তিনবার টেবিলে ঠুকলেন ডাক্তার বক্সী। যে কাজটা অনেক পরে করার কথা, সেটা যাতে এখুনি করা হয়—এই প্ল্যান আমি তখন তাঁর মাথায় বসে জুগিয়ে চলেছি। আমার কথাই তিনি বললেন মুখ দিয়ে—'সেলে ঢুকিয়ে দাও। গিভ হিম শক!'

ডাক্তার বক্সী শকথেরাপিতে বিশ্বাস করেন না। খামোকা ব্রেন সেল নষ্ট করে দেওয়ার পক্ষপাতী তিনি নন। টকথেরাপীতে মিরাকল দেখান, কিন্তু সেটা সময়সাপেক্ষ। মাসের পর মাস মেন্টাল হোমে থাকতে হয়। খরচসাপেক্ষও বটে। মাসে চার-পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে যেতে হয়। তাই তিনি কুসংস্কারমুক্ত হলেও খোলা মনে কিছুদিন স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটির শক-থেরাপি নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। সমসাময়িক মনোরোগ-

বিশেষজ্ঞদের বলেননি—ভূতে পাওয়া রোগীদের ভালো করার জন্যেই তাঁর এই গবেষণা। টিটকিরি দেওয়ার লোকের তো অভাব নেই। প্রেতদেহ যে স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটিতে সইতে পারে না—এ তত্ত্ব তিনি জেনেছিলেন সাইকিক রিসার্চ সোসাইটি থেকে। সুফলও পেয়েছিলেন কয়েকটা কেসে—কিন্তু টিটকিরির ভয়ে গবেষণা-পত্রে তা হাজির করেননি— পাঁচ কান করেননি। লোকে জেনেছে, তিনি শক দিয়ে রোগ সারিয়েছেন।

আমাকে পাঁচ জায়গায় যেতে হয় বলেই জানতাম তাঁর চিকিৎসার গুপ্তরহস্য। রাজুকে এতদিন এখানে আনিনি— কারণ ভূতে পাওয়ার কেস তার নয়। কিন্তু আজ ভূতেদের গুরু ঢুকেছে তার শরীরে।

সুতরাং...

তিন মাস পরে দেখা গেল সল্টলেকের স্টেডিয়ামের পাশ দিয়ে নতুন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে রাজুকে স্কুটার চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন পলাশবাবু। মুখে প্রশান্ত হাসি। রাজু ঝকঝক করছে। ব্যক্তিত্ব আর আচরণ পাল্টে দিয়েছেন ডাক্তার বক্সী।

ছায়া-দানব শক খেয়েই পালিয়েছিল। তারপর ওকে টক থের‍্যাপি দিয়ে খাপখোলা বাঁকা তলোয়ার বানিয়ে ছেড়েছেন ডাক্তার বক্সী। টিকালো নাক, বুদ্ধি উজ্জ্বল চোখে কোথায় সেই অতীতের বিভীষিকা?

পেছন পেছন দুর্গা যাচ্ছিল। সঙ্গে আমি।

ও বললে—'বড় কষ্ট হচ্ছে। এখন চলি?'

'যাও,' বললাম আমি—'রাজুর ভার আমার।'

দুর্গা আর আসেনি। ভেবেছিলাম পুনর্জন্ম নিয়েছে।

রাজুর বিয়ে হল কালকে। মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করতে দেখলাম দুর্গাকে। সূক্ষ্ম দেহে।

পাগলি!

** 'রহস্য পত্রিকা'য় প্রকাশিত।*

ভা রহস্য

কাঞ্জনজঙ্ঘাকে এভাবে সবসময়ে দার্জিলিং থেকে দেখা যায় না। ইন্দ্রনাথ এই প্রথম দার্জিলিং আসেনি। শীতকালটা বরাবর এড়িয়ে যায় অবশ্য—ঠান্ডার ভয়ে। দু-এক বছর অন্তর শৈলনগরীতে যায় পাহাড় আর ঝাউবন দেখতে। ক্লান্ত স্নায়ুকে চাঙ্গা করতে।

প্রতিবার আসে এপ্রিল মাস নাগাদ। প্রিয় হোটেল একটাই আছে। জলাপাহাড়ের দিকে যে রাস্তাটা, যে রাস্তা দিয়ে সকালে আর বিকেলে টুরিস্টরা হই-হই করতে করতে ঘোড়া টগবগিয়ে যাতায়াত করে, সেই রাস্তার পাশেই পড়ে হোটেলটা। ঘোড়ার যাতায়াতের সময়টুকু ছাড়া জায়গাটা খুব নিস্তব্ধ। যে ঘরটায় বরাবর ওঠে, তার তিন দিকে কাচের জানলা। খাটে বসেই একদিকে দেখা যায় টাইগার হিলের ওপরে মাইক্রোওয়েভ টাওয়ার, আর একদিকে এভারেস্ট আর অন্যান্য পাহাড়চুড়ো। সামনে পাহাড় আর পাহাড়।

ইন্দ্রনাথ এখানে এলেই অন্যরকম হয়ে যায়। যে ইন্দ্রনাথ রুদ্রকে গোয়েন্দা কাহিনির পাঠকপাঠিকারা চেনে, জানে এবং ভালোবাসে, এ যেন সে ইন্দ্রনাথ নয়। বজ্রকঠিন ইন্দ্রনাথ এখানে এলে যেন ঋষিপ্রতিম হয়ে যায়। যতক্ষণ ঘরে থাকে, ততক্ষণ পাহাড় আর আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যে ভাবে আপন মনে, সে ছাড়া কেউ জানে না। যখন বেড়াতে বেরোয়, পাহাড়ের গা বেয়ে নীচে নেমে যায়, কখনো দার্জিলিং ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে যায় ঝাউবনের পত্র মর্মর শুনতে শুনতে—তখন যেন আরও বেশি আত্মস্থ, আরও বেশি ধ্যানস্থ, আরও বেশি করে অন্য জগতের মানুষ হয়ে যায়। তার ভেতরকার যে সত্তাটার সন্ধান কেউ পায়নি, দার্জিলিংয়ের মন উদাস করা পরিবেশে এলেই তা ব্যাকুল হয়ে বেরিয়ে আসে বাইরে। রহস্যপ্রেমিক ইন্দ্রনাথ তখন প্রকৃতই উন্মনা হয়ে খোঁজে এমন এক রহস্য-সূত্র যা বিশ্বচরাচরে ব্যাপ্ত অথচ অনাদি অনন্ত সে রহস্যকে অনেকেই আজও বুঝে ওঠেনি।

ভার্গব বসুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল এই রকমই একটা মুহূর্তে।

জায়গাটা দার্জিলিং থেকে বেশ দূরে। একটা গোল পাথরের ওপর চুপ করে বসে রয়েছে একটা মনুষ্যমূর্তি। মাথার লম্বা চুল পিঠ পর্যন্ত লুটিয়ে পড়েছে। গায়ে তিব্বতী পোশাক। পায়ে পশমের জুতো। হঠাৎ দেখলে তিব্বতী লামা বলেই মনে হয়।

সুদূরের পানে মেলে ধরা ইন্দ্রনাথের চাহনি সহসা আটকে গেছল নিথর নিষ্কম্প মানুষটার ওপর। মাথার ওপর ঝাউগাছটা খুব বেশি হেলে পড়েছে ছাতার মতো—দুলে দুলে যেন সম্মান জানাচ্ছে মানুষটাকে।

সরু পায়ে-চলা পথটা পাথরটার হাত দশেক দূর দিয়ে গেছে। ইন্দ্রনাথই যাচ্ছিল সেখান দিয়ে। হঠাৎ চোখ আটকে গেল অদ্ভুত জায়গায় অদ্ভুতভাবে মানুষটাকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে। অন্যমনস্কভাবে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। পরক্ষণেই উজ্জ্বল হল দুই চোখ। ঝলসে উঠল হীরকদ্যুতি—এই সেই দ্যুতি যার ঝিলিক দেখলেই প্রমাদ গোনে অপরাধী, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে অপরাধসন্ধানী।

ধারালো ঠোঁটের কোণে ভেসে ওঠে মৃদু হাসি। একটু ব্যঙ্গের, একটু বিস্ময়ের।

কেশে গলা সাফ করে নিয়ে ডাকল ধীর-গম্ভীর গলায়, 'ভার্গববাবু!...ভার্গব বসু!'

নড়ে উঠল নিথর মূর্তি। পাথরের ওপর পাথরের স্ট্যাচুর মধ্যে বুঝি প্রাণের স্পন্দন দেখা গেল। আস্তে আস্তে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ইন্দ্রনাথের পানে।

ধবধবে সাদা মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে। জোড়া ভুরুর নীচে চোখ দুটো এতক্ষণ স্তিমিত ছিল। ইন্দ্রনাথের পানে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পরেই তা নক্ষত্রকুচির মতো চিকমিকে হয়ে উঠল। বললে শান্ত গলায়, 'ইন্দ্রনাথ

রুদ্র।...অনেক দিন পরে দেখা। কেমন আছেন?'

'ভালো। আপনি এখানে?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে না ভার্গব বসু। মৃদু হাওয়ায় মাথার লম্বা চুল উড়ে এসে পড়ল কপালে, চোখে-মুখে। হাত দিয়ে সরানোর চেষ্টাও করল না।

তারপর বললে 'আসুন। পাশে বসুন। বলছি।'

নড়ল না ইন্দ্রনাথ। বলল বাঁকা সুরে, 'সঙ্গে ছুরি নেই তো? অথবা রিভলভার? সেই রিভলভারটা—যার একটা গুলিতে নাম লিখে দিয়েছেন আমার হার্ট ফুটো করবেন বলে?'

আশ্চর্য হাসি হাসল ভার্গব বসু। ঝকঝকে সাদা দাঁতে রোদ্দুর ঝিলিক তুলে গেল নিমেষের জন্যে। ঝিলিক দেখা গেল তারকা উজ্জ্বল দুই চোখেও।

বলল ভরাট গলায়, 'ইন্দ্রনাথ রুদ্র, আমার বয়স ষাট পেরিয়েছে। রক্তের নেশাও বিদায় নিয়েছে।'

'টাকার নেশা? মদের নেশা? পরস্ত্রীর নেশা?'

প্রত্যেকটা প্রশ্ন যেন ব্লোপাইপ থেকে নির্ভুল লক্ষ্যে ছোট ছোট তীরের মতো ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারল ইন্দ্রনাথ। প্রত্যেকটা তীর গিয়ে বিঁধল যথাস্থানে। মানুষটার মনের মধ্যে। তাই বুঝি ঝকঝকে হাসিটা ম্লান হল সামান্য। ঈষৎ নিষ্প্রভ হল ঝিকিমিকি চাহনি। ধবধবে সাদা সুন্দর মুখটার ওপর দিয়ে যেন চাপা বেদনার ঢেউ ভেসে গেল চকিতের জন্যে।

বলল একই রকম ভরাট মাদল-বাজনের সুরে, 'ইন্দ্রনাথ রুদ্র, আর কেউ না জানলেও আপনি তো জানেন, সব মানুষের মনের মধ্যেই সু আর কু দুটো প্রবৃত্তি আছে। কু প্রবৃত্তি মাথা চাড়া দিলে সে সমাজের চোখে অপরাধী। আর সু প্রবৃত্তি যখন ঠেলে ওঠে, তখন সে—'

'আপনার ভেতরে তাহলে এখন—'

'সু ছাড়া কু আর নেই। পাশে এসে বসুন, ইন্দ্রনাথবাবু। অনেক কথা আছে।'

ইন্দ্রনাথ আর কথা বাড়াল না। সে জানে, তার প্রাণটাকে পিঞ্জরশূন্য করার জন্যে ধরাতলে বহু ব্যক্তি এখনও তৎপর, সে জানে অগণিত মানুষ যেমন তাকে ভালোবাসে, বহু পুরুষ এবং নারী তেমন তার চিতাভস্মের সন্ধান পেলে বড় খুশি হবে। সঙ্গে তাই সবসময়ে রাখে ছোট আগ্নেয়াস্ত্র। প্রতিটি পেশীর বজ্রশক্তিকেও প্রকট করে তুলতে থাকে সব সময়ে। পেশায় এবং নেশায় সে যে গোয়েন্দা—তার বিশ্রাম নেই, তার জীবনের নিশ্চয়তা নেই, মুহূর্তের নিরাপত্তাবোধও নেই।

বোধ হয় এইগুলোর সন্ধানেই এই পর্বতাঞ্চলে আসে বারবার। একা।

কিন্তু ভার্গব বসুকে নির্জন এই অঞ্চলে এভাবে বসে থাকতে দেখে অণুপরমাণুর ওয়ার্নিং বেল বেজে ওঠে নিঃশব্দে। ভার্গব বসু। একদা যে ছিল পুলিশের আতঙ্ক, সাধারণ মানুষের কাছে বিভীষিকা, সমাজের চোখে এক জীবন্ত প্রহেলিকা—আজ সে এই শান্তির অঞ্চলে মূর্তিমান অশান্তির করাল চেহারা নিয়ে উপস্থিত কেন?

দূর থেকেই তাই ছুঁড়ে দেয় বিদ্রূপ-তীক্ষ্ণ প্রশ্নবাণ, 'গাঁজা চরসের স্মাগলিং ধরেছেন নাকি? মিথাকুয়ানল ট্যাবলেটের সঙ্গে পাল্টাপাল্টি ব্যবসাটা অবশ্য ইদানীং ভালোই চলছে এ অঞ্চলে।'

'ইন্দ্রনাথ রুদ্র, আপনি কি সেই মতলবেই ঘুরঘুর করছেন এখানে?' খরখরে হয়ে ওঠে ভার্গব বসুর ঈগল চক্ষু। বিষাণ বেজে ওঠে যেন কণ্ঠে।

গ্রিক স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে রইল ইন্দ্রনাথ। হাওয়ায় উড়তে লাগল গায়ের শাল। চুনোট করা কোঁচার অগ্রভাগ। হিরো সে চিরকাল। সুদর্শন। ব্যক্তিত্বময়। স্থিতধী। অসমসাহসিক।

বলল নিশ্চল দেহে নিষ্কম্প স্বরে, 'না।'

'তবে কেন এসেছেন এখানে?'

'আপনি কেন এসেছেন?'

'আমি?' থমকে গেল ভার্গব বসু। চোখে চোখে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর গলার স্বর নামিয়ে এনে বললে ভল্যুম কমিয়ে দেওয়া স্টিরিও আওয়াজে, 'জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে। বিশ্বাস হল না? আসুন, বলছি।'

পাশাপাশি বসে দুজনে এখন। দশ বছর আগেও দুজনে দুজনের অন্বেষণে হন্যে হয়ে ঘুরেছে। আজ বসে দুজনে পাশাপাশি। একটা মাত্র গোল পাথরের ওপর। মাথার ওপর দুলন্ত ত্রিভঙ্গমুরারি ঝাউ। সামনে গভীর খাদ। দূরে তুষারমৌলী হিমালয়। সূর্য যতই দিগন্ত ছাড়িয়ে মাথার ওপর উঠছে, কুয়াশা ততই কেটে যাচ্ছে। পাখির কাকলি আর পাতার সরসরানি ছাড়া কোনও শব্দ নেই।

'ইন্দ্রনাথ রুদ্র,' দূরের বরফ-ছাওয়া পাহাড়-চুড়োগুলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বলল ভার্গব বসু, 'আপনি জানেন, অনেক কলঙ্কে ভরা আমার অতীত। আপনি জানেন, একমাত্র শ্যালকের স্ত্রীকে নিয়ে ঘর করতেও আমি দ্বিধা করিনি। লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছি, কাশ্মীর থেকে মেঘালয় পর্যন্ত পুরো হিমালয় বেল্টে চোরাকারবার করেছি, রাজামহারাজার সঙ্গে বসে মদ খেয়েছি, ধনীর টাকা লুঠ করেছি, গরিবের মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। কেন ইন্দ্রনাথবাবু, কেন?'

'জানি কেন,' মৃদু স্বরে বলল ইন্দ্রনাথ, 'যখন আপনি কপর্দকহীন, যখন আপনি সদ্যবিবাহিত, তখন আপনার সুন্দরী স্ত্রী ঘরছাড়া হয়েছিল এক আমেরিকান টুরিস্টের সঙ্গে। বিয়েও করেছিল তাকে। তারপর—'

'লম্পট আমেরিকান দেহের ক্ষুধা মিটিয়ে চম্পট দেয় আমেরিকায়। তারই একটি ছেলে আর একটি মেয়েকে মানুষ করতে হচ্ছে আমাকে আজও। কারণ, ওদের মা ছিল একটা কাওয়ার্ড। আমার সামনে আর আসতে পারেনি। ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে দিয়ে—'

'বিষ খেয়েছিল সেই রাতেই।'

'ভারতীকে কাছে এনে রাখতে হয়েছিল সেই কারণেই।'

ভারতীর কথা ভাবতেই ইন্দ্রনাথের মনে পড়ে যায় মিশরের আশ্চর্য সুন্দরী নেফারতিতিকে। রিমার্কেবল বিউটি ছিল যাঁর, যিনি বিস্ময়ের পর বিস্ময় সৃষ্টি করে সহসা একদা যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছিলেন, তাঁর জায়গায় আবির্ভূত হয়েছিল এক পুরুষমূর্তি—মিশর শাসন করেছিল কঠোর হস্তে।

কে এই নবাগত? কেউ জানে না। আজও তা রহস্যাবৃত।

অনুমান, শক্তিময়ী নেফারতিতি নিজেই পুরুষবেশে মিশর শাসন করে গেছিলেন।

কেন? না, ফারাও চতুর্থ আমেনহোটেপ মিশরীয় প্রাচীন দেবদেবীদের ফেলে রেখে সূর্যদেবতা অ্যাটন উপাসনায় মেতে উঠেছিলেন। নীল নদের পাড়ে থিবস নগরীর মন্দির পরিত্যাগ করে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে গেছিলেন তিনশো মাইল উত্তরে জনহীন ভূখণ্ড আমারনাতে। সতেরো বছর ছিলেন সেখানে—সূর্যই ছিল তাঁর একমাত্র উপাস্য দেবতা।

সবচেয়ে বিস্ময়কর স্বামী-স্ত্রীর চেহারা। ফারাও ছিলেন কদাকার। নেফারতিতি ছিলেন অসামান্য রূপসী।

এ যুগের নেফারতিতি বলা যায় ভারতীকে। অসাধারণ রূপবতী। কিন্তু স্বামী নির্বাচন করেছিল যাকে, তার মতো কুৎসিত মানুষ বোধ হয় ভূভারতে আর নেই। কুঁজো, কালো, সারা মুখে আর গায়ে বড় বড় আঁচিল। একটা চোখ পাথরের। ভাস্কর তার নাম। পেশাতেও তাই। নেশাও বটে। কৃষ্ণনগরের চুর্ণি অঞ্চলে ছোট্ট একটা স্টুডিওতে দিন নেই রাত নেই পাথর খুদে মূর্তির পর মূর্তি গড়ে যেত।

প্রতিটি মূর্তিই অনবদ্য। আশ্চর্য সুন্দর। তারিফ না করে পারা যায় না।

ভারতী ভালোবাসত শিল্পী ভাস্করকে—কদাকার ভাস্করের বাইরের সত্তাটাকে দেখেও দেখেনি সেই কারণেই। কিন্তু আস্তে আস্তে অসহ্য হয়ে উঠেছিল ভাস্করের সান্নিধ্য। শিল্পী ভাস্কর দরিদ্র ছিল না—কিন্তু ছিল অসংযমী! মদ, মেয়েমানুষ এবং জুয়ো—এই তিনটে সর্বনাশা নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল একটু একটু করে।

কি নিয়ে থাকবে ভারতী? সন্তান? ভাস্কর তা দিতে পারেনি। ভালোবাসা? ভাস্কর তাও তাকে দেয়নি।

রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছিল ভার্গব বসু ঠিক এই সময়ে।

বেথুয়াডহরির জঙ্গলে দাঁড়িয়ে কথা হয়েছিল দুজনের মধ্যে।

মাথায় ছ'ফুট লম্বা যেন সাদা মার্বেল কুঁদে গড়া ভার্গব। দুই চোখে কঠিন হিরে। কণ্ঠস্বরে অশনি সঙ্কেত।

বলেছিল নীরস স্বরে, 'ভারতী, শুনেছ সব?'

মুখ নীচু করে বলেছিল পরমাসুন্দরী ভারতী, 'হ্যাঁ।'

'বিষ খেয়ে মরেছে—বেশ করেছে। আগেই মরা উচিত ছিল। কিন্তু ছেলেমানুষ দুটো তো কোনও দোষ করেনি।'

'কিন্তু তুমি নিজেই তো পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে চর্কিপাক দিয়ে বেড়াচ্ছ সারা ভারতে—ছেলেমেয়ে মানুষ করবে কীভাবে?'

'আমি তো করব না।'

'তবে কে করবে?'

'তুমি।'

'আমি!'

'হ্যাঁ, ভারতী, তুমি। তুমি যা চাও, তা কি পেয়েছ ভাস্করের কাছে?'

মুখ নীচু করেছিল ভারতী।

পাষাণকণ্ঠে বলে গেছিল ভার্গব, 'অথচ তোমার ভালোবাসার ভেল্কি থেকেই সৃষ্টির প্রেরণা পেয়েছে ভাস্কর। কি ছিল সে বিয়ের আগে? কপর্দকহীন কারিগর। তুমিই তাকে আইডিয়া দিয়েছ, প্রেরণা দিয়েছ, শক্তি জুগিয়েছ, মূর্তি গড়ার উপাদান কেনা থেকে শুরু করে স্টুডিও জোগাড় করার টাকা পর্যন্ত সব জুটিয়ে দিয়েছে।'

'তুমিই দিয়েছ—নইলে পেতাম কোথায়?'

'ভারতী, তার বিনিময়ে আমি তোমাকে চাইছি না। ছেলেমেয়ে তোমার দরকার—নয় কী? বেশ, মুখে না বলো—তোমার মন তা চাইছে, আমি জানি। মাঝে মাঝে আমি আসব—দেখে যাব তাদের—কিন্তু এক-আধ রাতের বেশি থাকতে পারব না। রাজি?'

রাজি হয়েছিল ভারতী। সেই মুহূর্তে চলে এসেছিল ভার্গবের সঙ্গে—বাড়ি আর ফেরেনি। ভাস্কর তার ঠিকানাও আর খুঁজে পায়নি। মাসে মাসে আসত শুধু মোটা টাকার ডিমান্ড ড্রাফট।

সেই সঙ্গে ভার্গব বসুর নিজের হাতে লেখা একটা চিরকূট।

প্রিয় ভার্যাট,

তোমার নেশার টাকা পাঠালাম। বউকে নিয়ে ভেবো না। আগের জন্মে সে ছিল ভোজরাজার কন্যা, বিক্রমাদিত্যের পত্নী। মায়াবিদ্যায় নিপুণা। তারই ভেল্কিতে তুমি আজ প্রসিদ্ধ ভাস্কর। একই মায়াবিদ্যা দেখিয়ে আমেরিকানের ঔরসে জাত দুই ছেলেমেয়েকে সে নিজের ছেলেমেয়ে করে নিয়েছে। আমি তার নাম দিয়েছি ভানুমতী। আপত্তি নেই তো?

ভার্গব বসু

ডিমান্ড ড্রাফট পেয়ে বড় খুশি হত ভাস্কর প্রতিবার। একই বয়ানের চিঠি পেয়েও অখুশি হত না। কিন্তু তেলেবেগুনে জ্বলে উঠত ভার্যাট সম্বোধনটা পড়ে।

প্রথমটা মানে বুঝতে পারেনি। অভিধান দেখেছিল। মানেটা জানতে পেরে অবধি বিছুটির জ্বালা ধরে যায় হাতে চিঠিখানা পেলেই।

কারণ, ভার্যাট মানে সেই পুরুষ যে স্ত্রীকে বেশ্যাবৃত্তি করায় জীবিকার জন্য।

বাড়ি ঠিক করেই রেখেছিল ভার্গব। অজ্ঞাতবাসের জন্যে হিমালয়ের কোলে ছিমছাম সুন্দর কটেজ। দার্জিলিংয়ের উপকণ্ঠে।

ছেলেমেয়েদের ধমনীতে বইছে আমেরিকান রক্ত। মানুষ হোক তারা শীতের দেশে—সাহেবী কায়দায়।

ছেলের নাম ভারদ্বাজ। মেয়ের নাম ভায়োলেট।

দুজনেরই চোখে রং নীল। গায়ের লং লালচে। ভারতীয় বলেই মনে হয় না। চুলগুলো পর্যন্ত সোনালি।

ভার্গব ধূমকেতুর মতো মাঝে মাঝে আসত নিরালা এই ডেরায়। কালিংম্পঙের ডক্টর গ্রাহাম হোম থেকে আনিয়ে নিত ছেলেমেয়েদের। দিন দুই হইচই করে আবার উধাও হয়ে যেত মাস কয়েকের জন্যে।

ভানুমতীকে মা আর ভার্গবকে বাবা বলত ভারদ্বাজ আর ভায়োলেট।

ভানুমতী ভারদ্বাজকে বলত, ভাস্করাচার্য—ভাস্কর হওয়ার প্রতিভা আছে নাকি তার মধ্যে।

ভায়োলেটকে বলত ভাস্বতী—বড় দীপ্তিশালী, বড় তেজস্বিনী বলে।

ভারতীকে শুধু ভানুমতী নামেই ডাকত না ভার্গব। বলত, 'অভিনব বিদ্যাটা ভালোই শিখেছ। এক এক সময়ে ইচ্ছে যায় তোমাকে আমার পার্টনার করে নিই।'

'তাই তো নিয়েছ,' সুন্দর চোখে, সুন্দর হেসে বলত ভারতী। সে চোখে হিমালয়ের অপার শান্তি।

অট্টহেসে বলত ভার্গব, 'দূর! এত হাফ পার্টনারশিপ।'

'ফুল পার্টনারশিপ দিলেই হয়।'

'না। তাহলে যে ভার্যাট কথাটা সত্যি হয়ে যাবে। পেয়ে বসবে ভাস্কর।'

'ও তো আমার জীবনে আর নেই।'

'না থাকুক। এই পৃথিবীতে তো আছে। কিন্তু ভার্যাট শব্দটার যা মানে, তা হতে দেব না। আমি বলছি অন্য পার্টনারশিপের কথা।'

'যেমন?'

'আমার এই কারবারে তোমার অভিনয় বিদ্যেটাকে কাজে লাগাতে পারলে—'

'ছেলেমেয়েদের তাহলে দেখবে কে?

ভারতীয় সঙ্গে রহস্যময়ী নেফারতিতির তুলনাটা এই কারণেই বারবার মাথায় আসে ইন্দ্রনাথের। আশ্চর্য মেয়ে বটে। প্রহেলিকায় প্রাণবন্ত।

বাগানে বসে অনেক দূরের রোপওয়ের ঝুলন্ত কামরার যাতায়াত দেখছিল ভারতী। এমনিতেই দুধে আলতা গোলা তার গায়ের রং। দীর্ঘদিন পাহাড়ী জায়গায় থাকার ফলে গালদুটো এখন টুকটুকে আপেলের মতো রাঙা। দুই চোখ কিন্তু মিশমিশে কালোজামের মতো কালো। একটু ঠাহর করলে কালো চুলের মধ্যে দু-একটা রুপোলি রেখাও আবিষ্কার করা যাবে। কিন্তু যৌবন যেন এখনো তার দেহের তটে তটে ফুঁসে ফুঁসে উঠছে। লাস্যময়ী ললনা সে কোনওকালেই নয়। তার রূপে আগুনের দাহিকাশক্তি নেই, আছে অমৃতবারির স্নিগ্ধতা। হিমালয়ের হাওয়া তাকে আরও অপরূপা এবং বুঝি অনন্তযৌবনা করে তুলেছে।

আশেপাশে কেউ নেই। এই তল্লাটেই কেউ নেই। কটেজ শূন্য। ছেলেমেয়েরা কালিম্পঙের ডক্টর গ্রাহাম হোমে। ভারতী আজ একা। বড় একা। মনের মধ্যে মহাকাশের শূন্যতা। এরকম শূন্যতা তার মনে আগেও এসেছে বহুবার। কিন্তু প্রতিবারই যেন আশ্চর্যভাবে হিমালয় জীবন্ত হয়ে উঠে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে তাকে —একা একা বেরিয়ে পড়েছে ভারতী। হিমাচলের হিম হাওয়ার স্নিগ্ধ প্রলেপ বুকের মধ্যে নিয়ে ফিরে এসেছে।

কিন্তু আজ আর সে ইচ্ছে করছে না। হিমালয়ের হাতছানি তার প্রাণে আর সাড়া জাগাচ্ছে না। কেননা, খবর এসেছে দুদিন আগে—ভার্গব বসু আর নেই।

হিমালয় গ্রাস করেছে মহাভয়ঙ্কর ভার্গবকে। বর্ডার পুলিশের গুলি এড়িয়ে আর পালাতে পারেনি। মাদক দ্রব্যের বোঝা সমেত লাশ গড়িয়ে গেছে খাদের মধ্যে।

ভার্গব আর আসবে না। টাকাও আর আসবে না। সংসার চলবে কেমন করে?

ভারতী তাই আজ এত উন্মনা। স্বয়ং হিমালয়ও যেন হাহাকার করে উঠছে মাঝে মাঝে তার বুকের হাহাকারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বহমান বায়ু আকারে।

ভার্গব—যে ভার্গব ভারতীকে দিয়েছে নিরাপত্তা, মাতৃত্বের স্বাদ, নারীত্বের সম্মান, সে ভার্গব বিদায় নিয়েছে চিরকালের জন্যে।

ঝাপসা হয়ে আসে ভারতীর দু-চোখ।

গলা খাঁকারিটা শুনল ঠিক সেই সময়ে। পেছনে।

চমকে উঠেছিল ভারতী। পেছন ফিরে দেখেছিল অতি বৃদ্ধ এক তিব্বতী লামাকে? অষ্টাবক্র মূর্তি বললেই চলে। হাতের যষ্টিও তথৈবচ। লোলচর্মের আড়ালে তির্যক চক্ষু প্রায় অদৃশ্য। চোখ পিটপিট করে নির্নিমেষে দেখছে ভারতীকে।

নিঃশব্দে কখন এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে—ভারতী টেরও পায়নি।

বিস্মিত চোখ মেলে কিছুক্ষণ তাকিয়েছিল ভারতীয়। পরক্ষণেই উবে গেছিল বিস্ময়। কৌতুক-তরল হাসিতে সমুজ্জ্বল হয়েছিল মুখচ্ছবি।

বলেছিল বীণাঝঙ্কৃত স্বরে, 'রাসবিহারী বসুও এমন ছদ্মবেশে ধরতে পারতেন কিনা সন্দেহ। অগ্নিযুগে যদি জন্মাতে, ব্রিটিশরাজ নাজেহাল হয়ে যেত তোমাকে নিয়ে। খাদের মধ্যে থেকে উঠে এলে কী করে? ক-টা গুলি লেগেছিল গায়ে?'

'ভানুমতী—' ভণিতা না করে বললে ছদ্মবেশী ভার্গব বসু, 'এই জন্যেই তোমাকে বলি মায়াবিদ্যায় নিপুণা। কী করে বুঝলে আমি অশরীরী প্রেত নয়?'

'ঢং দেখে আর বাঁচি না!' উঠে পড়ে ভারতী। 'রোপওয়েতে এলে নিশ্চয়? চিনতে পারেননি?'

পাহাড়ের গায়ে গায়ে অট্টহাসি ছুঁড়ে দিয়ে বললে ভার্গব বসু, 'ক্ষিদে পেয়েছে।'

বাইরে থেকে কটেজটাকে মনে হয় ছোট। দোতলা। কিন্তু ভেতরে ঢুকলে বোঝা যায় ছোটখাটো একটা প্যালেস।

দোতলার বিরাট হলঘরটা আজ গমগম করছে আবির্ভাবে। ভারদ্বাজ ভায়োলেট অনেকদিন পর ড্যাডিকে দেখে খুশিতে কলকল করছে। ভারতী এঁটো বাসনকোসন সরাচ্ছে টেবিল থেকে। উজ্জ্বল চোখে বারবার তাকাচ্ছে যার পানে, এই কটেজে সে এসেছে এই প্রথম।

ভাস্কর। তার বিয়ে করা স্বামী।

ভাস্করের সামনেই বসে ভার্গব। স্মিতমুখে শুনছে ভাস্করের বক্তৃতা।

আগের চাইতে আরও কদাকার হয়েছে ভাস্কর। কুঁজো পিঠ যেন আরও নুয়ে পড়েছে বয়েসের ভারে। মুখ আর সারা দেহের আঁচিলগুলো লোমশ হয়ে ওঠায় এখন তাকে মূর্তিমান ইয়েতি বললেও চলে।

এক বিঘত লম্বা একটা পাথরের নারীমূর্তি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাতে দেখাতে বলছিল ভাস্কর, 'প্রস্তর যুগের ভেনাস। ফ্রান্স থেকে আনিয়েছি। আহা, মুণ্ডুর যা ছিরি! বুকে পিঠে নিতম্বে এত চর্বিও থাকত সেকালের মেয়েদের? হাউ আগলি!'

ভার্গব বললে, 'শুনেছি, হিমযুগের ঠান্ডা থেকে বাঁচবার জন্যে তখনকার মানুষদের গায়ে চর্বির আস্তরণ থাকত একটু বেশি। ভাস্কর, স্টোনএজের ভেনাস নিয়ে আলোচনা করার জন্যে তোমাকে ডাকিনি। ভারদ্বাজ, ভায়োলেট, ভারতী—তোমরাও শোনো।'

ঘর এখন নিস্তব্ধ!

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল ভার্গব বসু, 'তোমরা জানো পুলিশের চোখে আমি এখন মৃত। মৃতই থাকব বাকি জীবনটা। এখানেই থাকব—আর কোথাও যাব না।'

খুশিতে ফেটে পড়ে ভারদ্বাজ আর ভায়োলেট। প্রথমজনের বয়স চোদ্দো। দ্বিতীয়জনের বারো।

সঙ্কুচিত হয় কেবল ভাস্করের একটা চোখ—পাথরের চোখটা নির্ভাষ, নিষ্কম্প।

ভার্গব বলে চলে, 'আমার রোজগারের উৎস ছিল অনেক। কোটি কোটি টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছি, বিরাট দলের সর্দারি করেছি। কিন্তু আর নয়। এবার আমার ছুটি। শান্তিতে জীবনযাপনের পালা।'

'সুবুদ্ধি হল এতদিনে।' ভারতীর মন্তব্য।

সামান্য হাসল ভার্গব। বলল, 'কিন্তু মিতব্যয়ী হতে হবে এখন থেকে। কারণ...'

বলে একটু থামল ভার্গব। তারপর বলল, 'এই কটেজে জমানো টাকা ছাড়া আর কোথাও একটা পয়সাও আমার নেই।'

যেন শ্বাস ফেলতেও ভুলে গেছে ঘরের প্রত্যেকে।

বড় নিশ্বাস ফেলে বলল ভার্গব, 'আমার দেহ নিপাত্তা হয়েছে, এ খবরটা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার যে-যে ডেরায় যত নগদ টাকা ছিল, সব লুঠ করে নিয়ে গেছে আমারই স্যাঙাৎরা।'

'বেশ করেছে।' ঈষৎ কঠিন শোনাল ভারতীর গলা।

কিন্তু যেন হাহাকার করে ওঠে ভাস্কর, 'কিন্তু আমার তাহলে চলবে কী করে?'

ঘৃণার আগুন জ্বলে ওঠে ভারতীর কালো চোখে। এত বছর পরে স্বামীর সঙ্গে দেখা, একটা কথাও সে বলেনি। ভার্গব কেন তাকে এই লুকোনো আস্তানায় কৌশলে এনে ফেলেছে—তাও জানতে চায়নি। কিন্তু এই মুহূর্তে লোভী মানুষটার কদর্য মন যেন বিবমিষার বিষ ঢেলে দিল তার সারা অঙ্গে।

প্রশান্ত হাসি হাসল ভার্গব বসু, 'সে ব্যবস্থা করব বলেই এসেছি এখানে, ডেকে এনেছি তোমাকে। ভাস্কর, ভারদ্বাজ আর ভায়োলেট এখন বড় হয়েছে। সব জানে। তোমার স্ত্রী এখন তাদের মা। কিন্তু তোমার ঘর খালি করেছি আমি। তার গুণগার দিয়ে এসেছি মাসে মাসে—'

'সেই সঙ্গে একটা জঘন্য চিঠি—'

'ভায়রার সঙ্গে ঠাট্টা বলেই ওটাকে ধরে নিও। ভারতী নিষ্কলঙ্ক আজও। সন্ন্যাসিনী বলতে পারো। ছেলেমেয়ে ছাড়া কেউ ওর গা ছোঁয়নি এত বছরেও।'

জানলা দিয়ে হিমালয়ের পাহাড় চুড়োগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল দুই ভাইবোন। দুজনেই দুটো বিউটি।

চোখ নামিয়ে রয়েছে ভারতী। সেদিকে একবার তাকিয়েই রুক্ষ কণ্ঠে বললে ভাস্কর, 'সাফাই গাওয়ার দরকার নেই। আমার জন্যে কী ব্যবস্থা করেছ বলো।'

ভার্গব বসুর ভয়ঙ্কর চোখদুটো একটু শুধু ছোট হল। কণ্ঠস্বর রইল অবিকৃত। বললে, 'কৃষ্ণনগরে তোমার স্টুডিওর আশেপাশে অনেক গাছ আছে। একটা গাছের তলায় রূপোর বাক্সে সোনার বাট রাখা আছে—বর্তমান বাজার দাম প্রায় তিন লাখ টাকা।'

'তি-ন-লা-খ!' যেন দম আটকে আসে ভাস্করের।

'ওই সোনা তোমার।'

'কি-কিন্তু কোথায় আছে?'

'সেটা তোমাকে খুঁজে বার করে নিতে হবে।'

'কিন্তু গাছ তো অনেক—লোকজন তো দেখে ফেলবে সব গাছের তলা খুঁড়তে গেলে—'

'সমাধানটা তোমাকেই করতে হবে। যেমন এখানকার সমাধান করবে ভানুমতী।'

'আমি!' চমকে ওঠে ভারতী। 'সমস্যাটাই বা কী?'

'আমার পেছনে এই যে সিন্দুকটা দেখছ,' দেওয়াল ঘেঁষা ইস্পাত-সিন্দুক দেখিয়ে বলে ভার্গব বসু, 'এর মধ্যে আছে ত্রিশ লাখ টাকার সোনা। তোমার, ভারদ্বাজের আর ভায়োলেটের জীবন তাতে চলে যাবে।'

'ও।' সংক্ষিপ্ত মন্তব্য ভারতীর। 'কিন্তু সমস্যাটা কী?'

'সিন্দুকটা ডবল দাম দিয়ে করিয়ে এনেছিলাম বোম্বাই থেকে। কপাটের ওপর শিবমূর্তিটার চারপাশে গোল সার্কেলের মধ্যে স্বরবর্ণ আর ব্যঞ্জনবর্ণের সবক'টা হরফই লেখা রয়েছে দেখতে পাচ্ছ। আমি ছাড়া সিন্দুক

খোলার কায়দা কেউ জানে না। তোমাকে সেই কৌশল আবিষ্কার করতে হবে—যদি হঠাৎ আমি মারা যাই।'

'হঠাৎ মারা যাবে কেন?' উদ্বিগ্ন স্বর ভারতীর।

'কারণ আমরা হার্টের অবস্থা ভালো নয়। বর্ডার পুলিশের গুলিতে অক্ষত ছিলাম না, ভারতী। যাক সেকথা, সোনা ছাড়াও সিন্দুকে আছে একটি থলি বোঝাই হিরে। তার বাজার দাম এখন কত—বলতে পারব না। তোমার বড় আদরের ভাস্বতী আর ভাস্করাচার্যের জন্য রইল এই থলি। কিন্তু সিন্দুকের মধ্যে থেকে আবিষ্কার করতে হবে তোমাকেই।'

বিচ্ছিরি হাসি সোনা গেল এই সময়ে। চমকে উঠল প্রত্যেকেই।

হাসছে ভাস্কর।

বললে, সিন্দুকটা আগুনে পুড়িয়ে ভেঙে ফেললেই ল্যাটা চুকে যাবে—সিক্রেট জানবার দরকার কী?

'বিচিত্র হাসি ভেসে ওঠে ভার্গবের ঠোঁটের কোণে, 'সেই সঙ্গে উড়ে যাবে এই কটেজ। হাতুড়ির ঠোকা পড়লেও তা হবে। কারণ, ওর মধ্যে বসানো আছে পাওয়ারফুল এক্সপ্লোসিভ।'

'আতকে ওঠে ভাস্কর।

নির্দয় চাহনিটা এতক্ষণে ফুটে উঠতে দেখা যায় ভার্গব বসুর পাথর কঠিন চক্ষুতারকায়।

বলে নির্মম স্বরে, 'ভাস্কর, ভার্গব বসু কোনও কাজেই ফাঁক রাখে না। এতদিন তোমাকে এ-বাড়িতে আনিনি তোমার এই লোভী মনটার জন্যেই— কুবেরের সম্পত্তি এখানে আছে তুমি জানতে পারলে কী-কী করবে, তাও আমি জানি। কিন্তু পার পাবে না—পরলোক বলে যদি কিছু থাকে, প্রেতাত্মা বলে যদি কিছুর অস্তিত্ব থাকে—আমি সেই প্রেতাত্মা হয়ে অভিশপ্ত করে তুলব তোমার জীবনকে।'

সন্ধ্যা নামছে পাহাড়ের গায়ে। সূর্য আর দেখা যাচ্ছে না।

কথা শেষ করে হাঁফাচ্ছে ভার্গব বসু। হঠাৎ এক ঝলক রক্ত উঠে এল মুখ দিয়ে।

'ভার্গব!' চকিত কণ্ঠ ইন্দ্রনাথের।

হাত তুলে তাকে নিরস্ত করে ভার্গব, 'আমার আয়ু শেষ হয়ে এসেছে ইন্দ্রনাথ রুদ্র। ভেবেছিলাম ভানুমতীকে বলে যাব সিন্দুক খোলার গুপ্তরহস্য—কিন্তু আর সময় নেই। ডাক এসেছে, চললাম।'

মাথাটা বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ে ভার্গবের।

ধরে ফেলে ইন্দ্রনাথ। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলে জোর গলায়, 'কিন্তু আমাকে শোনালেন কেন এই কাহিনী?'

ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দেয় ভার্গব, 'সিন্দুক আপনি খুলে দেবেন বলে।'

প্রাণবায়ু মিলিয়ে গেল শূন্যে শেষ শব্দটা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

রহস্য সিন্দুকের সামনে বসে আছে ইন্দ্রনাথ রুদ্র। কমল হিরের মতো চোখদুটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে সিন্দুকের প্রতিটি অংশ।

ওর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে ভারতী আর ভাস্কর, ভারদ্বাজ আর ভায়োলেট।

ইন্দ্রনাথ দেখছে, সিন্দুকটা দামি ইস্পাত দিয়ে তৈরি। চওড়ায় ছ-ফুট, লম্বায় তিন ফুট। কপাটটার প্রায় সবটুকু জুড়ে গোলাকার হাতল। হাতলের ওপর একটা শিবের মূর্তি। মূর্তির মাথায় অর্ধচন্দ্র। বাঁকা চাঁদের খোঁচাদুটো ফেরানো রয়েছে হাতল ঘিরে খোদাই করা স্বরবর্ণ আর ব্যঞ্জনবর্ণের হরফগুলোর দিকে। গোল হাতলের ওপরের কিনারায় একটা তির চিহ্ন। লাল রঙের। অর্থাৎ এই তির চিহ্ন ঘুরিয়ে সঠিক হরফগুলোর দিকে ফেরালেই খুলে যাবে সিন্দুক।

'বুঝলাম।' যেন নিজের মনেই বলল ইন্দ্রনাথ।

'কি বুঝলেন?' পেছন থেকে জিগ্যেস করল ভারতী।

'গোল হাতলের ওই তিরটা ফেরাতে হবে এমন কয়েকটা হরফের দিকে যা জানা ছিল কেবল ভার্গব বসুর।'

বিরক্ত স্বরে বলল ভাস্কর, 'ওটা আমরাও বুঝেছি। কিন্তু হরফগুলো কি, তা কি বলে গেছে আপনাকে?

'না।' শান্ত স্বরেই বলল ইন্দ্রনাথ, 'সময় পেলেও বলত না। কেননা, ভার্গব আমাকে চিনত হাড়ে হাড়ে।'

'আমাদের যদি সেইভাবে চেনবার সুযোগ দিতেন—'

ভাস্করের মুখের কথা আটকে গেল ইন্দ্রনাথ ফিরে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে। হিমেল চোখ। গা পর্যন্ত হিম হয়ে গেল ভাস্করের। সুপুরুষ, অমায়িক মানুষটার চোখ যে পলকের মধ্যে বরফ কঠিন হয়ে উঠতে পারে, আগে তা ভাবেনি।

ওই একবারই চাইল তার পানে ইন্দ্রনাথ। আবার মুখ ফিরিয়ে নিল সিন্দুকের দিকে। বলল, 'ভার্গব বসু শুধু তস্কর সম্রাট ছিল না, রসিক সম্রাটও ছিল। রহস্য ওর জীবনের পাতায় পাতায়। কোনওটা ভয়ঙ্কর রহস্য, কোনওটা মজার রহস্য। এই সিন্দুক ওর মজার রহস্যপ্রবণতার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। সারা জীবন ধরে ওর অনেক রহস্যের সমাধান করেছি, মৃত্যুর আগে তাই চ্যালেঞ্জ জানিয়ে গেল শেষ রহস্যটা উপহার দিয়ে। জানি না, পরলোক আছে কিনা, প্রেতাত্মার অস্তিত্ব আছে কিনা—যদি থাকে, তাহলে এই রাতের অন্ধকারেই বাইরে থেকে ঘরের আলোয় চেয়ারে এসে বসুক! দেখুক, তার বুদ্ধি বড়, না আমার বুদ্ধি বড়!'

'মাই গড!' গা শিরশির করে ওঠে বোধ হয় ভাস্করের। ভারতীর দু-হাত ধরে গা ঘেঁষে দাঁড়ায় ভারদ্বাজ আর ভায়োলেট।

এসব ঘটল ইন্দ্রনাথের পেছনে। সে চেয়ে আছে সামনে সিন্দুকের দিকে। দুচোখ জ্বলছে নক্ষত্রের মতো। একটু একটু করে কণ্ঠে জাগ্রত হচ্ছে দুন্দুভি নিনাদ। যেন বিদেহীদের আবাহন করার সুরে কথাগুলো বলে একদৃষ্টে চেয়ে রইল সিন্দুকের দিকেই। তারপর সেই দিকে চেয়ে থেকেই বলল, 'ভারতী দেবী!'

'বলুন।'

'ভার্গব বসুর রসিক মনের পরিচিতি রয়েছে এই ফ্যামিলির প্রত্যেকের নামকরণের মধ্যে। 'ভা' দিয়ে নাম শুরু হয়েছে প্রত্যেকের। আপনার, ভাস্করবাবুর আর ভার্গববাবুদের নামের আদ্যক্ষরে মিল কাকতালীয়। ওই মিল দেখেই ছেলেমেয়ের নামের গোড়ায় 'ভা' লাগিয়েছিলেন উনি। তাই না?'

'হ্যাঁ। আমিও ওদের যে দুটো নাম দিয়েছি, তাও 'ভা' দিয়ে শুরু। ওঁর পছন্দ হবে জেনেই করেছিলাম। আমাকেও তো ভানুমতী নামে ডাকতেন।'

'তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমি বাদে এখানে যারা রয়েছে, তাদের প্রত্যেকের নামের আগে রয়েছে 'ভা'। এই সিন্দুকে যা কিছু আছে, তা ভাস্করবাবু বাদে বাকি তিনজনের জন্যে। তিনটে 'ভা'ওলা নামের জন্যে। তাহলে তিনবার হাতলের তির 'ভা'য়ের দিকে ঘোরানো যাক।

বলেই, উঠে গিয়ে দু-হাতে গোল হাতল চেপে ধরে লাল তিরটাকে প্রথমে 'ভ'য়ের দিকে ঘোরালো ইন্দ্রনাথ, তারপরে 'আ'য়ের দিকে।

'একবার 'ভা' হল। আরও দুবার হোক।' বলে পরপর একই ভাবে হাতল ঘুরিয়ে দুবার 'ভা' রচনা করল ইন্দ্রনাথ। 'মোট হল তিনবার। তিনজনের 'ভা'—সিন্দুক, এবার হও তো চিচিং ফাঁক।'

হাতল ধরে টান দিল বটে ইন্দ্রনাথ। কপাট রইল অনড়।

ব্যঙ্গের হাসি শোনা গেল পেছনে। হাসছে ভাস্কর।

মাই ডিয়ার ডিটেকটিভ, আমাকে বাদ দিতে গিয়ে ভুলটা করলেন। এই ফ্যামিলির আমিও একজন। চারজনের ফ্যামিলি। চারবার 'ভা' হবে। আবার করুন—গোড়া থেকে।'

কথার জবাব না দিয়ে যেন আপন মনেই বলে গেল ইন্দ্রনাথ, 'ভার্গব বসুর প্রেতাত্মা যদি হাজির থাকেন, তাহলে যেন এইরকম বিচ্ছিরি ভাবে হেসে উঠবেন না—ছেলেমেয়েরা ভয় পাবে। আপনার অতিরিক্ত হুঁশিয়ারি আগেই আঁচ করেছিলাম। তবুও পেরিয়ে এলাম ফার্স্ট স্টেপ। এবার সেকেন্ড স্টেপ। আপনাদের প্রত্যেকের নাম দুটো। ভারতী আর ভানুমতী, ভারদ্বাজ আর ভাস্করাচার্য, ভায়োলেট আর ভাস্বতী। মোট ছ'টা 'ভা'।

'আজ্ঞে না, মোট আটটা 'ভা'। ভাস্কর আর...আর...'

'ভার্যাট।' কঠিন স্বরে পেছন না ফিরেই বলল ইন্দ্রনাথ। 'মানেটা ছেলেমেয়েদের সামনে আর বললাম না। —যাক, মোট ছ'বার 'ভা'য়ের দিকে তির ঘোরানো যাক।'

ঘুরল হাতল। খুলল কপাট। ভেতরে ঠাসা সোনার বাটও দেখা গেল।

কিন্তু হিরের থলি কই?

বিদ্রূপের ছুরি ঝলসে ওঠে ভাস্করের কণ্ঠে, 'ব্লাফার!'

বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়ায় ইন্দ্রনাথ, 'কে? ভার্গব বসু? তার নখের যোগ্যও আপনি নন। কথাটা রিপিট করবেন না—প্রেতাত্মা হাজির থাকতে পারে।'

মুখ সাদা হয়ে গেল ভাস্করের। থরথর করে কাঁপতে লাগল মুখের আঁচিলগুলো।

নিরক্ত মুখে ভারতী শুধু বললে, 'কিন্তু হীরের থলি—'

'সিন্দুকেই আছে।' চকিতে কণ্ঠস্বর সহজ করে বলল ইন্দ্রনাথ। 'এবারে আসা যাক থার্ড স্টেপে।'

'থার্ড স্টেপ?' ভারতী বিস্মিত, 'সিন্দুকে তো থলি নেই।'

'সিন্দুকেই আছে, ভারতী দেবী!' স্নিগ্ধকণ্ঠ ইন্দ্রনাথের, 'ভার্গব বসু, অন্তত আপনার সামনে মিথ্যে বলেননি। কারণ আপনাকে তিনি মনে মনে পুজো করতেন, মনের সিংহাসনে আপনাকে দেবীর আসনে বসিয়েছিলেন। ভারতীর চেয়ে ভানুমতী নামটা তিনি অকারণে দেননি—ভানুমতীর ভেল্কি শুধু আপনিই দেখাতে পারবেন, এই বিশ্বাস এই আস্থা নিয়ে আপনার জিম্মাতেই রেখে গেছেন ছেলেমেয়ের হিরে।'

'আমি। আমার...কাছে...' হঠাৎ চিকচিক করে ওঠে ভারতীর চোখে। 'বুঝেছি।'

নীরবে ঘাড় হেলায় ইন্দ্রনাথ, 'হ্যাঁ, ভানুমতী নামটাতেই এবার হাতল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তির ছোঁয়াতে হবে।'

সিন্দুকের কপাট আস্তে আস্তে বন্ধ করে দিল ইন্দ্রনাথ। হাতলের তির ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছুঁয়ে গেল ভানুমতী শব্দটাকে।

কিন্তু কপাট আর খুলল না।

অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল ভাস্কর, 'দূর মশায়? শুধু অর্ধাঙ্গিনীর নামে কোনও শুভ কাজ হিন্দু শাস্ত্রের বিধানে আছে। যত্ত সব। আমার নামটাও যোগ করুন...'

নির্বিকার ভাবে বললে ইন্দ্রনাথ, 'এবার ফোর্থ স্টেপ। ভারতী দেবী, ভালে চন্দ্র যার, তার নাম কী?'

'শিব।' বললে ভারতী ঈষৎ বিমূঢ় কণ্ঠে।

'হাতলে রয়েছে শিব, মাথায় রয়েছে চন্দ্র—নিশ্চয় অকারণে নয়। কাছে আসুন। কী দেখছেন? চাঁদের একটা খোঁচার ওপর ছোট্ট বিন্দু। ওই বিন্দুটাই হোক এবার আমাদের চিচিং ফাঁক সঙ্কেত।'

বলেই দুহাতে অর্ধচন্দ্র চেপে ধরল ইন্দ্রনাথ। চাপ দিতেই আস্তে আস্তে ঘুরে গেল শুধু বাঁকা চাঁদটা। কালো বিন্দুটাকে দিয়ে ভানুমতী শব্দটা ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেল ইন্দ্রনাথ।

খুলে এল শিবমূর্তি সমেত পুরো হাতলটা। ভেতরে একটা খুপরি। খুপরির মধ্যে একটা মখমলের থলি।

আলতো হাতে থলে বার করে এনে টেবিলে উপুড় করে দিল ইন্দ্রনাথ।

হাজারটা সূর্য যেন ঠিকরে গেল অজস্র ছোট-বড় হিরে থেকে।

স্খলিত স্বরে বললে ভানুমতী, 'বুঝলেন কী করে বলবেন?'

'সিন্দুকের ডবল দাম শুনে। ডবল দাম দেওয়া মানেই ডবল কাজ করা হয়েছে সিন্দুকে। মানে, ডবল সিন্দুক। সিন্দুকের ভেতরে সিন্দুক। ভার্গব বসুর প্রেতাত্মা এবার ঊর্ধ্বলোকে যেতে পারেন—যাকে যা দেবার, তা দিয়ে গেলাম।'

'কই দিলেন? আর্তনাদ করে ওঠে ভাস্কর, 'আ-আমার তিন লাখ টাকার সোনা কোন গাছের তলায় আছে।'

নিষ্ঠুর গলায় বললে ইন্দ্রনাথ দরজার দিকে যেতে যেতে, 'ওটা আপনিই বার করুন আপনার কুটিল ব্রেন খাটিয়ে।'

'সে তো করবই। কিন্তু সময় তো লাগবে—'ভার্গবের, ইয়ে, মানে প্রেতাত্মাটি কষ্ট পাবে—'

হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসল ভারতী। ইন্দ্রনাথের দু-হাত জড়িয়ে ধরল।

বলল চোখে চোখ রেখে গাঢ় কণ্ঠে, 'দাদা!'

'দাদা?'

'হ্যাঁ, আমি আপনার বোন। আমার একটা কথা রাখুন।'

বিরাট নিশ্বাস ফেলে ইন্দ্রনাথ বললে, হায়রে বাংলার বধূ...গাছের সন্ধানটা বলে দিতে হবে, কেমন?'

'হ্যাঁ, দাদা।'

'এই হিমালয়ে বসে?'

'আপনি পারবেন। ফিফথ স্টেপ নিশ্চয় ভেবে রেখেছেন।'

হেসে ফেলল ইন্দ্রনাথ, 'দুষ্টু মেয়ে। তোমার মহাপণ্ডিত ভার্যাট স্বামীকে জিগ্যেস করো তো ভাণ্ডির মানে কী?'

ভাণ্ডির!'

'সবই তো ভা'য়ের খেলা। কৃষ্ণনগরের চুর্ণিতে এতদিন ছিলে, বটগাছ দেখোনি অজস্র?'

'বটগাছ? হ্যাঁ, হ্যাঁ ওর স্টুডিওর দক্ষিণ দিকেই তো একটা বুড়ো বট—'

'ভাণ্ডির মানে বট গাছ। ডবল নাম তো এখানেও।' ভাস্কর, ভার্যাট, ভাণ্ডির—বটগাছের তলা খুঁড়লেই—'

'তিন লাখ টাকার সোনা—!' সোল্লাসে কুঁজটাকে প্রায় সিধে করে ফেলল ভাস্কর।

ইন্দ্রনাথ ততক্ষণে চৌকাঠ পেরিয়ে গেছে। কিন্তু বাড়ির বাইরে যাওয়ার আগেই দৌড়ে নেমে এল ভারদ্বাজ আর ভায়োলেট।

দু-জোড়া নীল চোখ মেলে বললে, 'আঙ্কল, পুলিশে খবর দেবেন নাকি?'

দু-হাতে দুজনের থুতনী ধরে বললে ইন্দ্রনাথ, 'নির্ভয়ে থেকো। আমি পুলিশের লোক নই। সবচেয়ে বড় কথা, তোমাদের ড্যাডি তো এখন বড় পুলিশের কাছে। এখানকার পুলিশ সব খবর নাই বা জানল?'

বৃষ্টির আভাস দেখা দিয়েছিল চার টুকরো নীল আকাশে।

ইন্দ্রনাথ আর দাঁড়ায়নি।

** 'রোমাঞ্চ' পত্রিকায় প্রকাশিত।*

প্রতিবিম্ব স্মৃতি

গোলপার্কের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা যাদবপুরের দিকে গেছে, অবনীশ ফিরছিল সেই পথ দিয়ে। বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা মারা শেষ হয়েছে, এখন ধরবে শিয়ালদার যে-কোনও বাস। তাই হাঁটছে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার-এর পাশ দিয়ে ফুটপাত ধরে।

জায়গাটা বেশ অন্ধকার। প্রদীপের নীচেই অন্ধকার থাকে জানা ছিল অবনীশের। সাধন ভজন-সংস্কৃতি-কেন্দ্র এই ভবনের ঠিক পাশের রাস্তাটি কেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন, তা বুঝতে পারেনি। পারল একটু পরেই।

রাস্তার সবকটা ল্যাম্পপোস্টের আলো নিভনো। ওপাশের ফুটপাতের দোকান থেকে বিচ্ছুরিত আলোর আভাস পড়েছে এদিকের ফুটপাতে। লোহার রেলিং-এ পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে একটি তরুণী।

মেয়েটির দিকে অবনীশের চোখ আকৃষ্ট হওয়ার কারণ আছে। প্রথমত ওই রকম আঁধারঘেরা নিরালা জায়গায় মেয়েটি একেবারে একা। দ্বিতীয়ত, মেয়েটির অঙ্গে ঝলমলে পোশাক। ক্ষীণ আলোয় ঝলসে উঠছে নাকের নাকছাবি। ঝলসে উঠছে এই কারণে যে মেয়েটি একদৃষ্টে চেয়েছিল অবনীশের দিকে। চোখাচোখি হতেই এক ঝটকায় মুখখানা ঘুরিয়ে নিল অন্যদিকে যেন দেখেও দেখছে না। পরক্ষণেই অবশ্য ঘাড় কাত করে চেয়ে রইল অবনীশের দিকে। বুকটা আরও একটু চিতিয়ে শরীরটাকে লীলায়িত ভঙ্গিমায় এনে যেন লাস্যময়ী হয়ে উঠল নিমেষ মধ্যে।

দু-হাত সামনে দিয়ে এই দৃশ্য দেখতে দেখতে এগিয়ে গেছিল অবনীশ। মনের পটে ছাপ কিন্তু থেকে গেছে। ধবধবে ফর্সা রং। কাজলটানা কালো চোখ, নাসিকালঙ্কারের দ্যুতি, কর্ণাভরণের ঝিলিক এবং সব মিলিয়ে ছিপছিপে দেহবল্লরীর মধ্যে কামনা-উদ্ধত তেজীয়ান ভঙ্গিমা আর গ্রীবা বেঁকিয়ে একদৃষ্টে অবনীশের দিকে চেয়ে থাকার মানে একটাই হয়।

মেয়েটি কলগার্ল। বেশ বড় ঘরের মেয়ে বলেই মনে হয়। কিন্তু দক্ষিণ কলকাতায় এদের দাপটই তো এখন বেশি। লেকের মাঠে সন্ধ্যার পর একা বসা যায় না, বেড়ানো যায় না। পাশে এসে জুটবেই। বয়ঃসন্ধিকালের সমস্যা। রক্তে এদের বিদ্রোহ-প্রকাশ বিপথে কুপথে।

অবনীশ ধোয়া তুলসীপাতাটি নয়। ডাক্তারি পড়তে গিয়ে সহপাঠিনী এবং নার্সদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জমিয়েছে একাধিকবার। নিজেও দেখতে সুপুরুষ। দীর্ঘকায়। গৌরবর্ণ। টান টান চাবুকের মতো চেহারা। বন্ধুরা ওকে হিরো বলে ডাকে। বান্ধবীরা বলে লেডিকিলার।

সুতরাং সুন্দরী মহিলা সঙ্গকামনা জানালে ছুঁৎমার্গের ধার ধারে না অবনীশ কোনওকালেই। রেলিং-এ হেলান দিয়ে বিজয়িনী ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে থাকা এই মেয়েটি অবশ্য অভিজাত বহুবল্লভা ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু চেহারার চমক, নিরালা পরিবেশ আর যৌবন-উষ্ণ রুধির ক্ষণেকের জন্য বিহ্বল করে তোলে অবনীশকে।

ক্ষণেকের জন্যেই বটে। মনোবিশারদরা একেই বলে ঝোঁকের মাথায় অসম্ভব কাণ্ড করে ফেলা। ক্ষণিক ভাবাবেগে আত্মহারা হয়ে কেউ চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কেউ গলায় দড়ি দেয়, কেউ বিষ খায়।

আদিমতম পেশায় রত এ কামিনীকে দেখেও রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল অবনীশের। মহিলাসান্নিধ্য চিরকালই প্রীতিকর তার কাছে—স্কুল কলেজে কো-এডুকেশন ক্লাসে পড়ার সময় থেকেই।

এমনকী কলগার্লদের সঙ্গসুখ উপভোগ করেছে মন মেজাজ শরীফ থাকলেই। আসলে ওর মধ্যে কোনো ভণ্ডামি নেই। খোলে চোখে দুনিয়াটাকে দেখে, ভাবাবেগবর্জিত বলেই ওর ইনটেলেকচুয়াল ম্যাচুইরিটি এত

ঊর্ধ্বে। ইমোশনালি ইমম্যাচিওর্ড হলে যা কখনোই সম্ভব হত না। ওর কাছে নরনারীর নিবিড় সান্নিধ্য নেহাতই প্রাকৃতিক ব্যাপার-বায়োলজিক্যাল লাভ ছাড়া কিছুই নয়।

মেয়েটিকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গিয়েও তাই থমকে দাঁড়াল অবনীশ। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল ঘাড় বেঁকিয়ে এখনও সে চেয়ে আছে তার দিকে। আলো-আঁধারির মধ্যে দিয়ে অনুভব করা যাচ্ছে তার কালো চোখের আকর্ষণ— চুম্বকের আকর্ষণের মতোই যা অদৃশ্য, কিন্তু অমোঘ।

পায়ে পায়ে মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেল অবনীশ। চোখ এবার রূপসীর দিকে। ষোড়শী বলেই তো মনে হয়। মাদকতা আছে বটে শরীরে। বেশবাস মূল্যবান—কিন্তু স্বল্প। দেহতটরেখাকে সযত্ন প্রয়াসে পরিমিতির মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে জানে। সংস্কৃতিসম্পন্না মেয়ে নিঃসন্দেহে।

শিকার জালে পড়েছে বুঝেছে অপরূপা। অবনীশের দিকে আর ফিরেও তাকাচ্ছে না। সটান চেয়ে আছে সামনের দিকে। গ্রীবাভঙ্গিমা কিন্তু গর্বোদ্ধত। দুহাত দুপাশে ছড়িয়ে রেলিং ধরার মধ্যে বেপরোয়া মনোভাব।

অবনীশ এবার মন্ত্রমুগ্ধ। মেয়েরা বুঝি চিরকাল এইভাবেই খেলিয়ে তোলে মনের মানুষদের। যারা এই শিল্পটিকে রপ্ত করেছে, তারা পারে আরও সুচারুভাবে। সম্পূর্ণ অপরিচিতা এই মেয়েটির লালসা-মদির আচরণ তাই বিহ্বল করে তোলে অবনীশের মতো খ্যাতিমান লেডিকিলারকেও।

আবার ফিরে আসে অবনীশ। এবার দাঁড়ায় মেয়েটির সামনেই। সামনেই চেয়েছিল রাতের রূপসী। ভ্রূক্ষেপ নেই অবনীশের দিকে। সাহস সঞ্চয় করে সুস্পষ্ট স্বরে অবনীশ বললে, 'ফ্রী আছেন?'

'কী বললেন?' ঝট করে মুখ ফিরিয়ে অবনীশের চোখে চোখে তাকাল মেয়েটি। কালো চোখে যেন দামিনী খেলছে। নাকের পাটা স্ফীত। ঝিলিক দিয়ে উঠছে নাকছাবি। হীরের নাকি?

মুহূর্তের মধ্যে ইনটেলেকচুয়ালি ম্যাচিওর্ড অবনীশ বুঝে ফেলল, ভুল হয়ে গেছে। এ-মেয়ে সে-মেয়ে নয় কলগার্ল বলে যাদের কৃপা করা যায়। এর ধমনীতে অভিজাত শোণিত। তাই গোখরের মতো ফণা মেলে ফোঁস করে উঠেছে। ছোবল মারার আগেই চম্পট দেওয়া দরকার।

কিন্তু অবনীশের অভিজ্ঞতার ঝুলিতে তখন আরও কিছু সঞ্চয়ের বাকি ছিল।

ঝটিতি জবাব দিয়েছিল অবনীশ, 'সরি।'

বলেই আর দাঁড়ায়নি। লম্বা লম্বা পা ফেলে যেই দূরত্ব বাড়াতে গেছে মেয়েটির কাছ থেকে অমনি দুপাশের দুটি ল্যাম্পপোস্টের আড়াল থেকে তির বেগে ধেয়ে এল দুটি মূর্তি।

'কী হয়েছে? কী হয়েছে?'

চিৎকার শুনে ঘাড় বেঁকিয়ে অবনীশ দেখলে, রেলিং থেকে সরে এসেছে রাতের রহস্যময়ী। কিছুই বলছে না। শুধু চেয়ে আছে অবনীশের দিকে।

ছেলেদুটি ছুটে আসছে অবনীশের দিকে—'ও মশাই কী বলছিলেন—'

কেন ল্যাম্পপোস্টের আলো নিভনো এবং কেন ঠিক এই জায়গাটিতে মেয়েটি নিজেকে লোভনীয় করে দাঁড়িয়ে আছে, অবনীশ তা বুঝে নিলে চকিতের মধ্যে। ল্যাম্পপোস্টের আড়ালে গা মিলিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল মস্তান দুটি। উদ্দেশ্য একটাই। অবনীশকে টেনে-হিঁচড়ে আড়ালে নিয়ে যাওয়া, মারধর করে সর্ব্বস্ব কেড়ে নেওয়া। সর্ব্ববল্লভাটি তাদের টোপ, গ্যাং-এর অন্যতমা সদস্যা।

অভিনব ফাঁদ। উর্বর মস্তিষ্ক বটে এই তিনজনের।

চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই নিজের দশা কী হতে চলেছে কল্পনা করে নিল অবনীশ। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব কাজ দিল বিস্ময়করভাবে। মাঝ রাস্তা দিয়ে একটি বাস যাচ্ছে গোলপার্কের দিকে। ছুটে গিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল অবনীশ। কন্ডাক্টর ধরে ফেলল একহাত বাড়িয়ে।

পেছনে মস্তান দুটো ছুটে আসছে। 'ধর ধর' করে চেঁচাচ্ছে। এই বাসে তারা উঠবেই।

কন্ডাক্টর পাদানিতে দাঁড়িয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে দেখল ধাবমান দুজনকে। বাস ছুটছে, তারাও ছুটছে।

শুধলো অবনীশকে, 'কী হয়েছে?'

'বদমাস।'

বাসশুদ্ধ লোক চেয়ে আছে অবনীশের দিকে। ভাবলেশহীন মুখ। কেউ যদি কাউকে তাড়া করে এবং ধরে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলে, কারও কিছু এসে যায় না। বরং নির্লিপ্ত থাকাই ভালো।

বাস থামাল না কন্ডাক্টর। পরের স্টপ গোলপার্কের সামনে। পেছনে মস্তান দুটি এসেও চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে আসছে। এই স্টপে বাসে তারা উঠবেই। তারপর কী হবে ভাবতেই আবার উপস্থিত বুদ্ধি খেলে গেল অবনীশের মাথার মধ্যে।

বাসে উঠেছিল পেছনের দরজা দিয়ে। স্টপে বাস থামতে না থামতেই নেমে পড়ল সামনের দরজা দিয়ে। ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ফুটপাত ঘেঁষে। ড্রাইভার বসে সিটে ঘাড় বেঁকিয়ে দেখছে কীসের এত শোরগোল।

বাস থেকে লাফ দিয়ে নেমেই ট্যাক্সির রাস্তার দিকের দরজা এক হ্যাঁচকায় খুলে ভেতরে ঢুকে গেল অবনীশ। সংযত স্বরে বললে, 'শিয়ালদা।' ট্যাক্সি ড্রাইভার বোধহয় ওয়াকিবহাল এই ধরনের ফাঁদ সম্পর্কে। তিলমাত্র কৌতূহল প্রকাশ করল না। একটা কথাও বলল না। স্টার্ট দিল ইঞ্জিনে।

মস্তান দুটি তখন ট্যাক্সির ঠিক পেছনে—'বেঁধে! বেঁধে!' কিন্তু বাঁধল না ট্যাক্সি ড্রাইভার। সে কারবার করতে বসেছে, শিয়ালদার প্যাসেঞ্জার ছাড়তে যাবে কেন? অথবা হয়তো কোনও ঝামেলায় জড়াতে চায় না। নয়তো স্রেফ মানবিকতা। ফাঁদ কেটে সুদর্শন কিন্তু অনভিজ্ঞ একজন তরুণকে নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে যাওয়ার উদারতা।

মুহূর্তে বাঁ-দিকে টার্ন নিয়ে গোলপার্ক ঘুরে গড়িয়াহাটার মোড়ের দিকে ছুটল ট্যাক্সি।

ডক্টর বোস ঠক ঠক করে ছাইদানিতে পাইপ ঠুকে ছাই ঝাড়তে-ঝাড়তে টেবিলের দিকে চোখ নামিয়েই বললেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডক্টর কাঞ্চন ঘোষকে, 'তুলে এনেছ?'

'ইয়েস স্যার।'

'খুব ট্রাবল দিয়েছে নাকি?'

'খুবই। চারজনে হিমসিম খেয়ে গেছি। গোড়ালি আর কবজি চেপে না ধরলে খাট থেকে নামানো যেত না।'

'কী করেছিল?'

'ঘুমোচ্ছিল।'

'ঠিক ক'টা বাজে তখন?'

'ঠিক একটা।'

'এই দুপুরে ঘুম। কেস-হিসট্রি অবশ্য তাই,' চোখ তুললেন ডক্টর বোস।

'অবসেশনাল ডিসঅর্ডার। চোদ্দো ঘণ্টা খালি স্নান আর পায়খানা। নিজেকে নোংরা বোধ করে। সন্ধে পর্যন্ত গরম লেবুর জল আর নুন খায় চারবারে চার লিটার। তারপর কলতলা। দশটা থেকে শুরু হয় খাওয়া। তিন লিটার দুধ, আমসত্ত্ব আর জোলাপ। তোমার কী মত, কাঞ্চন?'

'যা শুনেছি আর যা দেখলাম, তাতে মনে হয় হয় ইসিটি শক দিতে হবে—তাতেও না হলে ব্রেনের নার্ভ পাথওয়ে কেটে দিতে হবে।'

হাসলেন ডক্টর বোস। পাইপ এখন দাঁতের ফাঁকে। ধোঁয়া বেরোচ্ছে নাকমুখ দিয়ে। 'কাঞ্চন, ইউ নো ভেরি ওয়েল, ওই দুটো পথ আমি মাড়াতে চাই না। ইসিটি শক রিমার্কেবল কাজ দেয় ঠিকই—কিন্তু কীভাবে, নোবডি নোজ। ব্রেনের নার্ভ পাথওয়ে কেটে দিতে হলে ভেলোর যেতে হবে—রেজাল্ট ইজ আননোন। নো কাঞ্চন, নো সব ব্যাপারের কজ অ্যান্ড এফেক্ট আছে। মেয়েটির এই উৎকট ছুঁচিবাই রোগেরও মূলে যে ঘটনা বা ঘটনাগুলো আছে—আমাদের তা জানতে হবে। যেদিন ও তা কবুল করবে, ওর ইমোশনাল টারময়েল চলে যাবে। এভরিথিং উইল বি নরম্যাল।'

'তা ঠিক। বিহেভিয়ার থেরাপির ম্যাজিক তো অনেকেই দেখে গেল। আমিও আপনার কাছে এসে দেখছি,' হাসল কাঞ্চন। পাতলা পাকানো চেহারা। পাতলা হয়ে এসেছে মাথার চুলও। শ্যামবর্ণ। চাহনি

কঠোর। মনের রুগিদের কাছে চাহনি আর কথার ম্যাজিক যে কি অদ্ভুত ফল সৃষ্টি করে, তা সে শিখেছে ডক্টর বোসের কাছে। 'টক থেরাপি' ইদানীং পাশ্চাত্যের বহু মনোরোগ-বিশেষজ্ঞকে চমৎকৃত করেছে। কোনও ওষুধ না দিয়ে, শক না দিয়ে, অথবা নামমাত্র ওষুধ দিয়ে দিনের পর দিন গ্রুপ ডিসকাশন আর নানারকম কাজকর্মের মধ্যে বছরের পর বছর ধরে পাগল হয়ে থাকা মানুষকেও উনি সুস্থ করে তুলেছেন।

চার্জ অবশ্য খুব বেশি। এই যে মেয়েটিকে এইমাত্র অভিজাত পল্লী থেকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে এল কাঞ্চন, এর জন্যেও প্রথম মাসে দিতে হবে চার হাজার। তারপর তিন হাজার। তারপর দু-হাজার। তারপর দেড় হাজার। জটিল কেস বলেই নার্সিং হোমে আনতে হয়েছে—এখানকার রেট তো বেশি হবেই। এত ডাক্তার, নার্স, আয়া—অথচ কম পেশেন্ট—যাতে ওয়ান টু অয়ান অবজার্ভ করা যায়। চব্বিশ ঘণ্টা নানাভাবে ওয়াচ করা যায়। কম জটিল কেসে কম খরচেই টক থেরাপি এবং অ্যাডভাইস চালিয়ে যান ডক্টর বোস অন্য চেম্বারে।

বিলেতের বড় হাসপাতালে ভালো চাকরিতে ছিলেন। কেন যে ইন্ডিয়ায় এলেন। এত বেশি দক্ষিণায় ধনী পেশেন্ট ছাড়া পেশেন্ট পাওয়া যায় না। অন্যান্য মেন্টাল হোমে এক চতুর্থাংশ টাকায় চিকিৎসা হয়। নামেই চিকিৎসা অবশ্য। সমাজ থেকে একটা পাগলকে তুলে এনে অনেক পাগলের সঙ্গে খাঁচায় পুরে রাখা।

জানলা দিয়ে তাকিয়ে কি যেন ভাবছিলেন ডক্টর বোস। তাই এতক্ষণ কথা বলেনি কাঞ্চন। এবার তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন। ঈষৎ লালাভ মুখখানায় অজস্র অভিজ্ঞতার ছাপ। কপালের বলিরেখা তারই পদরেখা। সামান্য ধূসর চোখের তারায় চাপা ধীশক্তির রোশনাই। মাথায় বেশ লম্বা। মেদ নেই সারা শরীরে,—সেই সঙ্গে বিস্তর চুলও অদৃশ্য হয়েছে মাথার সামনের দিক থেকে।

পাইপটা হাতে নিয়ে বুদ্ধিদীপ্ত কিন্তু আত্মনিমগ্ন চোখে কাঞ্চনের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন ডক্টর বোস। কতই বা আর বয়স। বড় জোর চল্লিশ। সে তুলনায় অনেক ভারিক্কি, আবার যখন হাসেন, প্রাণখোলা হাসিতে ঘর ফাটিয়ে দেন। জবাব নেই সেই হাসির—দমকে দমকে অট্টহাস্য যেন আর থামতেই চায় না।

ডক্টর বোসকে তাই ভয় করে, শ্রদ্ধাও করে কাঞ্চন। ওঁর কথার মধ্যে, চাহনির মধ্যে, আচরণের মধ্যে নাটকীয়তা আছে, আছে জাদুশক্তি—অ্যানিম্যাল ম্যাগনেটিজম। যেকোনো মানুষকে নিজের মতে নিয়ে আসতে পারেন অল্পসময়ের মধ্যে—কখনো ধমকে, কখনো ধারালো যুক্তি দিয়ে, কখনো হেসে, কখনো আশ্চর্য বচনমালা দিয়ে।

টক থেরাপিস্ট! ইন্ডিয়ায় ইনিই একমাত্র টক থেরাপিস্ট। সনাতনী মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের তাই বিদ্বেষ এঁর ওপর। আড়ালে বলেন, 'ও তো বড়লোকদের দোহন করে চলেছে ম্যাজিক দেখিয়ে—যেমন মেসমার করত মেসমেরিজম দিয়ে, কিন্তু টিকেছিল কী?'

ডক্টর বোসের ভেতরের যন্ত্রণা সেইখানেই। বিয়েও করলেন না। সুস্থ মস্তিষ্কদের সুস্থ করে তোলার সমাজসেবায় ব্রতী হয়েছেন ইন্ডিয়ায় ফিরেই। বাঁধাধরা চাকরির অফার পেয়েও যাননি— রুগিদের মধ্যে একটা টোটালিটি খুঁজে পাওয়ার সুযোগ বা সময় তো সেখানে নেই। নারী মনোরোগ বিশেষজ্ঞরাই তাঁকে অ্যাডভাইস দিয়েছেন, 'কি ছেলেমানুষি করছ? চেম্বারে কনসাল্টেশন ফি নিয়ে রোজ দশ-বারোটা রুগি দেখো। অর্ধেক ভালো হবে, অর্ধেক রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে। মাসে দশ-বারো হাজার টাকা তোমার এসে যাবে।'

কর্ণপাত করেননি ডক্টর বোস। এও যেন তাঁর এক পাগলামি। প্রতিভাধরদের ম্যাডনেস। কাঞ্চন তাই এত ভক্ত এই অদ্ভুত মানুষটির। অনেক মাসে পুরো মাইনে পায় না—নতুন জামা প্যান্ট কিনতে পারে না—তবুও শেখবার, জানবার উদগ্র বাসনা তাকে ধরে রেখে দিয়েছে ডক্টর বোসের কাছে। যে মাটিতে গাছ বাড়ে, সেই মাটিই তো গাছকে নিজের কাছে ধরে রাখে।

চেয়ে আছেন ডক্টর বোস। মনে মনে প্ল্যান করছেন নিশ্চয়। দু-চোখের কোণ কুঁচকে গেছে। এক-একটা পেশেন্টকে তো এক-একরকমভাবে হ্যান্ডল করতে হয়।

শুধোলেন হঠাৎ, 'মেয়েটা কোথায়?'

'সেলে।'

'কেন? ভায়োলেন্ট? এখনও?'

'ভীষণভাবে।'

'চলো তো দেখি।'

খাটের সঙ্গে চার হাত-পা বাঁধা মেয়েটির চুল ছড়িয়ে পড়েছে মুখে বুকে চারপাশে। বিস্রস্ত বেশ। ভারী গড়ন। খুব ফর্সা, কটমট করে তাকাচ্ছে এদিকে সেদিকে আর বাঁধন খোলার চেষ্টা করছে প্রাণপণে।

পাইপ টানতে টানতে লম্বা পদক্ষেপে ঠিক তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো ডক্টর বোস। কাঞ্চন রইল বাইরে। প্রথম অবজার্ভেশন ডাক্তারবাবু একাই করেন।

পলকহীন চোখে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আছেন ডক্টর বোস। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ধোঁয়া উঠছে সরু ফিতের মতো।

বছর পঁচিশ বয়স হবে মেয়েটির। সুন্দরী নিঃসন্দেহে। অতিরিক্ত মেদ জমায় ভোঁতা হয়ে গেছে বরতনুর ধারালো অংশগুলো।

কটমট করে ডাক্তারের দিকে চেয়ে প্রথমে হিসহিসিয়ে গর্জন করে উঠেছিল সুন্দরী পেশেন্ট। পরক্ষণেই স্থির চোখে চেয়ে রইল। চোখের পাতা আর পড়ে না। দুই তারারন্ধ্রের গহনে জ্বলছে দুটি নিষ্কম্প প্রদীপশিখা।

চোখ কুঁচকে চেয়ে রইলেন ডক্টর বোসও। কী দেখছেন তিনি? অসম্ভব স্মৃতিশক্তির অধিকারী ডক্টর বোস কেন দিশেহারা হয়ে যাচ্ছেন?

মেয়েটির কনীনিকা আরও ছোট হয়ে এসেছে। বেড়েছে দৃষ্টির সুচাগ্রতা। করোটির মধ্যে মগজের কোষে কোষে যেন প্রচণ্ড আলোড়ন চলছে, এনার্জির বিস্ফোরণ ঘটেছে। অনিমেষ তারারন্ধ্রে তারই কেন্দ্রীভূত প্রকাশন ঘটছে...

কিন্তু এ তো চেতনার স্ফুলিঙ্গ...স্বাভাবিকতার উন্মেষ!

পরক্ষণেই অতিশয় স্মার্ট ডক্টর বোসকে হতবুদ্ধি করে দিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে চাপা বজ্রনাদের মতো শুধু কটি কথা বলল মেয়েটি—'গোলপার্ক... রাত...পালিয়েছিলে...ট্যাক্সিতে...আমি নোংরা? তাই না? বড় নোংরা? হাঃ হাঃ হাঃ! হাঃ হাঃ হাঃ!

বসবার ঘরে দাঁড়িয়ে আছেন ডক্টর বোস। মাথার পাতলা চুলে আঙুল চালাচ্ছেন। আঙুল কাঁপছে।

কাঞ্চন দাঁড়িয়ে ছিল পেছনে। বিমূঢ় অবস্থা। ডাক্তারবাবুকে এরকম বিচলিত কখনো সে দেখেনি।

'কাঞ্চন,' খোলা জানলা দিয়ে শুধু মাঠ আর দূরের দিগন্তের দিকে চেয়ে বললেন ডক্টর বোস।

'স্যার।'

'মেয়েটিকে আমি একা ট্রিট করব। বুঝেছ?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'আর কী বুঝেছ?'

সবেগে ঘুরে দাঁড়ালোন ডক্টর বোস। থিরথির করে কাঁপছে মুখের পেশী। পেশেন্টের সামনে, তাদের গার্জেনদের সামনে ডক্টর বোসকে নাটক করতে আর আগেও দেখেছে কাঞ্চন। কিন্তু এখন তো ঠিক নাটক বলে মনে হচ্ছে না।

'কাঞ্চন,' বজ্রগর্ভ কণ্ঠস্বর ডক্টর বোসের—'এর আগে তোমাদের ফটোগ্রাফিক মেমারির কথা বলেছিলাম মনে আছে?'

'প্রতিবিম্ব স্মৃতি?'

'হ্যাঁ। সোনার গয়নাভর্তি সুটকেস সমেত চলে গেছিল ট্যাক্সি—পরে খেয়াল হতেই বাড়িময় কান্নাকাটি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ট্যাক্সির দিকে চেয়েছিল যে বাচ্চা মেয়েটি, সে এসে বলেছিল—মা, কাঁদছ কেন? ট্যাক্সির

নাম্বার তো আমার মনে আছে। ট্যাক্সি পাওয়া গিয়েছিল। প্রতিবিম্ব স্মৃতি... প্রতিবিম্ব স্মৃতি! চোখে যা দেখে, ব্রেনে তার পারমানেন্ট ইমপ্রিন্ট পড়ে।—কাঞ্চন, আজকের এই মেয়েটির আছে সেই বিশেষ ক্ষমতা।'

'কীভাবে বুঝলেন?'

'কী ভাবে বুঝলাম? হাঃ হাঃ হাঃ...হাঃ হাঃ হাঃ...হাঃ হাঃ হাঃ...সেটা না হয় তোমার কাছে সিক্রেটই থাক কাঞ্চন, ডক্টর অবনীশ বোসের অতীত আর নাই বা জানলে? হাঃ হাঃ হাঃ...হাঃ হাঃ হাঃ...হাঃ হাঃ হাঃ!'

তিন মাস পরে একমনে বিয়ে বাড়ির খানা খেয়ে চলেছে কাঞ্চন। সামনে এসে দাঁড়ালেন বর-বউ।

'আর কিছু চাই?'

মুখ তুলল কাঞ্চন, 'হ্যাঁ স্যার, চাই।'

'কি বলো? ফ্রাই না বিরিয়ানি।'

'একটা প্রশ্নের জবাব।'

'বটে!' চোখ ছোট হয়ে গেল ডক্টর অবনীশ বোসের।

'কী প্রশ্ন?'

'প্রতিবিম্ব স্মৃতি কী ভুলের প্রায়শ্চিত্ত ঘটায়?'

'শাট আপ!'

গভীর চোখে তাকিয়ে জবাব দিলে নতুন বউ, 'ঘটায়।'

** 'সুকন্যা' পত্রিকায় প্রকাশিত। শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৯৩।*

আমার মনের মরীচিকা

অনেক দূরে চলে এসেছি মৃগাঙ্ক, কিছুদিন আমার কোনও খবর পাবে না। বন্ধুভাগ্য আমার ভালোবলেই তোমার মতো বন্ধু পেয়েছি, কবিতাবৌদির মতো বন্ধু স্ত্রী পেয়েছি। আমার এই নিঃসঙ্গ জীবনটাকে তোমরা দুজনে স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে ভরিয়ে তুলেছ। ভালোবাসো বলেই আমার এত দিনের আনন্দ এই পেশাবদ্ধ অভিজ্ঞতা নিয়ে কত গল্পই না লিখেছ। সেদিন 'ভবিষ্যৎ বঙ্গ সাহিত্য' সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মন্তব্য পড়ছিলাম। যেদিন আনন্দের ভেতর দিয়ে লিখতে পারা যাবে, সেই দিন আবার সাহিত্য সৃষ্টির দিন ফিরে আসবে। ওঁর মনে হয়েছিল, বড় সাহিত্যিক আমাদের দেশে এখন আর জন্মাবে না। মৃগাঙ্গ, তুমি বড় সাহিত্যিক নও। নিজেকে সাহিত্যিক বলে কখনো দাবিও করোনি। কিন্তু তুমি যা লিখেছ, তা আনন্দের ভেতর দিয়েই লিখেছ। সে আনন্দ আমার ক্ষুদ্র কীর্তিকে পাঁচজনের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে থেকেই পেয়েছ। আনন্দ আমিও পেয়েছি। নইলে আর পাঁচটা বঙ্গসন্তানের মতো চাকরিবাকরি না করে অপরাধী-শিকারে মত্ত হলাম কেন। বহু বছর ধরে এই মৃগয়ায় আনন্দ পেয়েছি মৃগাঙ্ক, এখন আমি ক্লান্ত। বিষাদ কাটিয়ে ওঠার জন্যে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করার প্রেসক্রিপশন করেন ডাক্তাররা—আমি বোধ হয় নিজে থেকেই তাই এই সৃষ্টিছাড়া পেশায় তন্ময় হয়েছিলাম এতগুলি বছর। মৃগয়া-মত্ত হয়েছিলাম ইচ্ছে করেই। ভুলে থাকার জন্যে। মনের ভেতরে চাপা পড়ে থাকা বেদনাকে এড়িয়ে থাকার জন্যে। কিন্তু মনের সঙ্গে ছলনা দীর্ঘদিন করা যায় না। মরীচিকার স্বরূপ একদিন না একদিন ধরা পড়েই। আমার এই আত্মবঞ্চনা আজ আমাকে পীড়া দিচ্ছে। আনন্দের অন্বেষণে এই পেশায় এসে আমার মনে হচ্ছে, অনেকের নিরানন্দের কারণ আমি হয়েছি। এতদিন আত্মশ্লাঘা অনুভব করেছিলাম দেশ আর দশের মঙ্গল করছি। ভুল, ভুল, এই অহঙ্কারই আমাকে অন্ধ করে রেখেছিল এতদিন। দেশ আর দশের সেবা করতে হয় কী করে, তা আটপৌরে মানুষদের কাছেই জেনে নেওয়া উচিত ছিল। সরাসরি তাদের মুখের মধ্যিখানে তাকিয়ে তাদের মনের মানদণ্ডে বুঝে নেওয়া উচিত ছিল তারা কী চায়। তাদের জীবনধারার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে গিয়ে তাদের ছোট ছোট মঙ্গলের পথগুলিকেই আবিষ্কার করতে পারলেই 'শ্রীবাস্তব কল্পস্বর্গ' এই মর্ত্যেই হয়তো রচনা করা যায়। কিন্তু আমরা কেউ তা করি না। তাই চুরাশিতে অরওয়েলের বিভীষিকাবর্ষের মতো আমিও আমার বিভীষিকাবর্ষ যাপন করেছি। মরীচিকার পেছনে ছুটে ছুটে ক্লান্ত হয়ে পালিয়ে এসেছি অনেক দূরে...নিরালায় নির্জনে আত্মসমীক্ষা করে চলেছি। কি পেয়েছি বলতে পারো, এতগুলো বছর ধরে এত অপরাধী শিকার করে? ক'টা মানুষের প্রাণে আনন্দ দিতে পেরেছি? ক'জনকে সুখী করতে পেরেছি? ক'টা জীবনে আশার প্রদীপ জ্বালতে পেরেছি? ক'টা সংসারে শান্তিসমীরণ বওয়াতে পেরেছি? বরং ঠিক তার উল্টোটাই ঘটিয়েছি। আমার মনের এই মরীচিকা আর অস্পষ্ট নয় আমার কাছে।

ভাষার স্থপতি তুমি নও। গল্প-উপন্যাসের যে বিষয়বস্তু তুমি নির্বাচন করেছ, সেখানে এই স্থাপত্য দেখানোর সুযোগও নেই। ভাষার স্পন্দমায়া তাই তোমার লেখায় কখনো ফুটে ওঠেনি। ভাষাশিল্পের সুরম্য শিবিরে আবদ্ধ হয়ে থাকাটাও তোমার লক্ষ্যমাত্রা নয়। সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়াটাই আমার নেশা, অঘটনের মধ্যে মিশে যাওয়াটাই আমার আনন্দ। তুমি তোমার সরল ভাষার দীপাধার নিয়ে আমার এই নেশা আর আনন্দকেই উদ্ভাসিত করেছ দশজনের সামনে। তোমার গল্পে আমি কখনো হয়েছি রঙমহলের রাজা, কখনো দেখিয়েছ আমার হিরণ হাসির কিরণ। কিন্তু কখনো ভাবোনি, আমার কুটিল হাসিও ঘটিয়ে তোলে জটিল সর্বনাশ। তুমি রুদ্রের ডম্বরধ্বনি শুনিয়েছ তোমার পাঠকপাঠিকাদের, কিন্তু তার জীবনের স্থূল মিথ্যার খেলাকে কখনো

ধরতেও পারো নি। তুমি লিখেছ তার শান দেওয়া খর খড়গসম ললাটে বুদ্ধি দিচ্ছে পাহারা, কিন্তু শান দেওয়া প্রতারণার ছুরিটা তোমার নজর এড়িয়ে গেছে। তুমি দেখেছ তার তীক্ষ্ণ সজাগ আঁখি, দেখেছ কটাক্ষে তার ধরা পড়ে কোথায় কার ফাঁকি—কিন্তু দেখোনি তার নেশাভ্রান্ত চরিত্রের ঝড়ের কলোল্লাস, বিদ্যুতের অট্টহাস। তুমি দেখছে তার উড়োপাখির ডানার মতো যুগল কালো ভুরু, কিন্তু কখনো কি খেয়াল করেছ, কি তীব্র তার হাস্য?

মৃগাঙ্ক, আমিই সেই ইন্দ্রনাথ রুদ্র। তোমার কপট প্রতারক প্রবঞ্চক বন্ধু ইন্দ্রনাথ রুদ্র। আমাকে তুমিও ধরতে পারোনি। ঘরে ঘরে সর্বনাশের বহ্নিশিখা জ্বালিয়ে আজ আমি ক্লান্ত, অনুতপ্ত, বিমর্ষ। আমার চোখ খুলে দিয়েছে একটি মেয়ে। ছোট্ট একটি মেয়ে।

অহল্যা যেমন মুনির শাপে পাষাণ হয়ে গিয়েছিল, মাঝে মাঝে মনে হত, আমিও বুঝি কারো শাপে পাষাণ হয়ে পড়ে আছি জীবনের সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর বক্ষের ওপর দিয়ে। আমার শাপান্ত ঘটিয়েছে বোধহয় এই মেয়েটিই। আমার মনের কঠিন শুষ্ক শয্যার ওপর একটি মাত্র কচি স্নিগ্ধ শ্যামল ঘাস বলা যায় এই মেয়েটিকে। নামটিও তার মিষ্টি—শ্রাবণী। নীলবর্ণের বনফুল সেন।

শ্রাবণীকে কিছুদিন হল অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছিলাম আমার ঘরদোর মোছা আর বাসন মাজার কাজে। স্বপাকে আহার এখনো করি—বরাবরের অভ্যেস। ওই কাজটি কারও হাতে তুলে দিতে মন চায় না। প্রেশারকুকারে বেশিক্ষণ সময়ও লাগে না। কিন্তু ঘরদোর বাসনপত্র পরিষ্কার রাখতে ইদানীং বড়ই আলস্যবোধ করছিলাম।

মাসান্তে মাত্র পনেরো টাকা বেতনের বিনিময়ে শ্রাবণী আমাকে এই ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি দিয়েছে। খুবই গরিব। মাথার চুলে কোনওদিন তেলের ছোঁয়া লাগে বলে মনে হয় না। রুখু লালচে চুল চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে রাখে। একটাই লাল ফ্রক রোজ পরে। রোজ ভোর পাঁচটায় আসে। আমি ঘুম থেকে উঠি কাক ডাকবারও আগে—বেড়িয়ে ফিরি কাক ডাকবার সময়ে। শ্রাবণী আসে তারপর। রোজ শিউলিতলা থেকে ফুল কুড়িয়ে আনে। প্লেটে করে সাজিয়ে রাখে টেবিলে। ডালশুদ্ধ ফুল এনে রাখে ফুলদানিতে। জল পাল্টে দেয় নিজেই। আমাকে কিছু বলতে হয় না।

একদিন সে যাবার সময়ে বলে গেল, 'কাকু, আজ বিকেলে আসতে একটু দেরি হবে।'

রোজ বিকেলে শ্রাবণী আসত চারটে বাজলেই—সেদিন এল ছ'টায়। ঘর মুছতে মুছতে হাসি হাসি মুখে নিজেই বললে, 'দাদার কাছে গেছিলুম, কাকু। দাদা বললে, আজকে থেকে যা। তোমার কষ্ট হবে বলে চলে এলুম।'

আমি বললাম, 'বেশ করেছিস। দাদার কাছে গেছিলিস কেন? বেড়াতে?'

'না। টাকা আনতে।'

'টাকা আনতে কেন?'

'পাঁচ-ছ'দিন খাওয়া হয়নি যে।'

'সে কী! পাঁচ-ছ'দিন খাসনি?'

'না।'

'টাকা পেয়েছিস?'

'না।'

'আজ তাহলে খাবি কী?'

হাসল শ্রাবণী। ঘর মুছতে লাগল মাথা নীচু করে।

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'আমাকে বলিসনি কেন? না খেয়ে থাকতে কষ্ট হয় না?'

শ্রাবণী কথা বলল না।

আমি মানিব্যাগ খুলে দশটা টাকা দিয়ে বললাম, 'আবার দরকার হলে বলবি।'

শ্রাবণী আর বলে নি। দাদার কাছ থেকেই নাকি টাকা এনেছিল। চার-পাঁচটা ছোট ভাইবোন আর মাকে নিয়ে কখনো একবেলা কখনো দু-বেলাই না খেয়ে থেকেছে। দাদা সেই কারণেই একা থাকে। বাবা নেই। শ্রাবণীর বয়স বড়জোর বারো।

এর দিন কয়েক পরেই ট্যাক্সি ড্রাইভার বলবন্ত সিং খুন হল আমাদের পাড়াতেই। ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাসের ধারে—নোংরা জলের নালার একটু দূরে।

বেলেঘাটা সি-আই-টি বিল্ডিংস তুমি দেখছ। বাইপাসটা গেছে তার গা ঘেঁষে। কিছুদিন আগেও এই বিল্ডিং ছিল কলকাতার পুব অঞ্চলের শেষপ্রান্ত—তারপরেই চব্বিশ পরগনা। ধূ-ধূ মাঠ আর ভেড়ি। এখন সেখানে সল্ট লেক স্টেডিয়াম তৈরি হচ্ছে, ফ্ল্যাটবাড়ির পর ফ্ল্যাটবাড়ি উঠছে। চিরনিদ্রিত সুদীর্ঘ অজগর সাপের মতো ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাস এই দুইয়ের মাঝ দিয়ে যেন জড়শয়নে শুয়ে রয়েছে। স্থির, অবিচল, ধুলোয় লুণ্ঠিত। রাত্রিদিন তার ওপর দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে ছুটে যাচ্ছে চাকা, হেঁটে যাচ্ছে চরণ। অহর্নিশ দুঃস্বপ্নের মতো বিচিত্র শব্দ আবর্তিত হয়েই চলেছে। চরণের আর চাকার স্পর্শে হৃদয় পাঠ করার বিদ্যে যদি এই মহাপথের জানা থাকত, তাহলে বলতে পারত কে বাড়ি যাচ্ছে, কে এয়ারপোর্টে যাচ্ছে, কে দক্ষিণের বালিগঞ্জ-পার্কসার্কাসে যাচ্ছে, কে জিরোতে যাচ্ছে, কে শ্মশানে যাচ্ছে। জানে না বলেই ধরতে পারেনি গভীর রাতে বলবন্ত সিং ট্যাক্সি চালিয়ে এসেছিল তার বুকের ওপর দিয়ে নিয়তির নির্দেশে দেহপিঞ্জর ত্যাগের লিখনকে সত্য করে তুলতে।

মৃগাঙ্ক, গল্প লিখতে বসে তুমি অনুপুঙ্খ বর্ণনা দাও সারস্বত উদ্দেশ্যে। আমি দেব কেবল প্রতিবেদন। সি-আই-টি বিল্ডিংয়ের শেষপ্রান্তে যেখানে খাল বুজিয়ে ওপর দিয়ে সড়ক নির্মিত হয়েছে, সেই জায়গাটা ছাড়িয়ে ধাপা লক পাম্পিং স্টেশনের পাশ দিয়ে দক্ষিণে একটু গেছিলে মনে আছে? দুর্গন্ধে প্রাণ আইঢাই করে উঠেছিল, নাকে রুমাল চাপা দিয়েছিলে? এখান থেকেই সড়কটা সোজা গিয়ে একটু বাঁয়ে বেঁকে চলে গেছে ধাপা-বানতলার আবর্জনা স্তূপের দিকে। সি-এম-ডি-এর স্বপ্ন একদিন এই রাস্তা আড়াইশো ফুট চওড়া হবে, মাঝখানে সবুজ মধ্যপটি থাকবে, ছ'টি ছ'রকমের পথ থাকবে এই আড়াইশো ফুটের ওপর, সুভাষ সরোবরের ধারে কাদাপাড়া টিলার মতো টিলা উদ্যানও গড়ে উঠবে, পুরো সড়কটাই আলো ঝলমলে থাকবে।

আপাতত, এ রাস্তায় হাঁটলে অথবা গাড়ি চালালে পদে পদে গরু মোষের সঙ্গে ধাক্কা লাগে, পায়ের তলায় সাপ কিলবিল করে উঠে নেমে যায় দু-পাশের ভেড়ির জলে, রাত্রে গাড়ি চালাতে গিয়ে বুক ঢিপ ঢিপ করে অন্ধকারে। হেঁটে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। উহু-হুহু দীর্ঘশ্বাস। সুখ-দুঃখ, জরা-যৌবন, হাসি-কান্না, জন্ম-মৃত্যু, ধনী-দরিদ্র সমস্তই ওই নিশ্বাস ধুলোর স্রোতের মতো উড়ে যায় সুদীর্ঘ নিস্তব্ধ এই সড়কের ওপর দিয়ে।

কলকাতা পুলিশের সজাগ দৃষ্টি থাকে এই দিকে। এই সেদিন পর্যন্ত পুলিশ-চৌকি ছিল বিল্ডিংয়ের মোড়ে। তখন পার্টিতে পার্টিতে বোমাবাজি হত, দিবালোকে মানুষ খুন হত—পুলিশ প্রহরীর তর্জনি শাসনে তা কমে আসে। পুলিশ চৌকিও উঠে যায়। কিন্তু রাতের আঁধারে কালো জিপ টহল দিয়ে যায় জোরালো হেডলাইট জ্বালিয়ে। কেননা, পুরোনো বিল্ডিংয়ের এককোণে গড়ে ওঠা নতুন বিল্ডিংয়ে গভীর রাতে নাকি ট্যাক্সি ঢোকে কলকাতার দিক থেকে—কিছুক্ষণ পরে সড়ক বেয়ে চলে যায় সল্ট লেক বা গড়িয়ার দিকে। পুরো সড়কটাই এখন বেআইনি কারবারের সড়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নোংরা জলের খালের পাশে কালো জিপটার হেডলাইটে হঠাৎ দেখা গেছিল দুমড়ে মুচড়ে পড়ে থাকা একটা দেহ। কালো পিচের রাস্তা থেকে একটু দূরে—ঘাস জমির ওপর। ঘাড়টা অস্বাভাবিকভাবে বেঁকে রয়েছে পেছনে।

দাঁড়িয়েছিল কালো জিপ। রাতের প্রহরীরা নেমে গিয়ে পেয়েছিল বলবন্ত সিংকে। পকেট থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স উদ্ধার করতেই পাওয়া গিয়েছিল তার পরিচয়। ট্যাক্সিটা কিন্তু দেখা যায়নি। ঘাস-জমির ওপর চাকার দাগ ছিল।

হেডলাইট আর অনেকগুলো টর্চবাতির আলোয় দেখা গেছিল চোখ ঠেলে বেরিয়ে এসেছে বলবন্ত সিংয়ের। লড়েছে প্রাণপণে—টেরিন শার্ট ছিঁড়ে ঝুলছে দুপাশে। রঙিন সুতির মাফলারটা মুখ আর নাকের ওপর দিয়ে প্রচণ্ড শক্তিতে টেনে তিনটে গিঁট দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছে পেছনে। গলার ওপর আঙুলের ছাপ। নিষ্ঠুরভাবে শ্বাসরোধ করা হয়েছে সব দিক দিয়েই।

বেলেঘাটা থানার বড়বাবুর সঙ্গে আমার হৃদয়ের সম্পর্ক আছে। কি জানি কেন ভদ্রলোক আমাকে ভালোবাসেন। কারণে অকারণে বাড়ি আসেন, পকেটভর্তি চুরুট বের করে আমাকে খেতে দেন, নস্যির ডিবেও বাড়িয়ে দেন। শীর্ণকায় এবং দীর্ঘকায় এই ভদ্রলোকই বলতে গেলে আমাকে চুরুট আর নস্যিতে রপ্ত করে ছেড়েছেন। অট্টহেসে বলেন, দিনে অন্তত একবার...'চার্চিল... চার্চিল...ক্যালকাটার চার্চিল মশায়...চুরুট আর নস্যি দুটোতেই মজা পেতেন—দুটো দিয়েই ব্রেন সাফ রাখতেন।'

এঁর নাম ধরণী ঘোষাল। কৃষ্ণকায় হাস্যমুখ সদাশয় আড্ডাবাজ পুরুষ। উনিই আমাকে দেখালেন বলবন্ত সিংয়ের লাশটা। শুনলাম, পকেটে গোটা পঞ্চাশ টাকা ছিল—দিনের শেষে ওই রকম রোজগারই হত রোজ। টাকা নেই। ট্যাক্সিও নেই। ওয়েস্টার্ন কান্ট্রির মতো ট্যাক্সি ছিনতাই আরম্ভ হয়েছে দিল্লির পর কলকাতাতেও। কিন্তু ট্যাক্সি ড্রাইভারকে খুন করতে গেল কেন? ফেলে পালালেই তো হত।

অটোপ্সি রিপোর্ট দেখলাম। ডেথ বাই স্ট্র্যাংগুলেশন। শ্বাসতন্ত্র এক্কেবারেই জখম। নাক আর মুখের পেছনে সাড়ে চার ইঞ্চি লম্বা ফাঁদলসদৃশ ফ্যারিংক্স বা ভয়েস বক্সের ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়েছে। কঠিন কার্টিলেজ দিয়ে গড়া ফ্যারিংক্স গাত্র সব সময়ে খোলা থাকে—কিন্তু প্রচণ্ড চাপ দিয়ে তা থেঁতলে দেওয়া হয়েছে।

বলবন্ত সিংয়ের অনামিকায় আংটি পরার কোনও দাগ দেখলাম না। কিন্তু ঘড়ি পরার দাগ আছে বাম মণিবন্ধে। ঘড়ি পাওয়া যায়নি।

ধরণীবাবু জানালেন, ট্যাক্সি ড্রাইভারদের অ্যাসোসিয়েশন ওয়ান ডে স্ট্রাইক করতে চলেছে। হত্যাকারীকে ধরতে না পারলে আরো জল গড়াবে। অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ক্ষমতাবান ব্যক্তি—মেম্বার অফ পার্লামেন্ট। চাকরি নিয়ে না টানাটানি করে। কলকাতা নামক মনুষ্য অরণ্যে গাড়ি চাপা পড়ে আর অনাহারেই রোজ কতজন অক্কা পাচ্ছে—কেউ মাথাও ঘামায় না। একটা ট্যাক্সি ড্রাইভার না হয় জীবনসংগ্রাম থেকে ছাড়ান পেল—তা নিয়ে এত হই-চই করার কি আছে?

শুনতে-শুনতে শ্রাবণীর মুখটা মনে পড়ে গেছিল। সত্যিই তো, চার-পাঁচদিন না খেয়ে হাসিমুখে আমার খিদমৎ খেটে গেছে বাচ্চা মেয়েটা—কেউ তো খবর রাখেনি।

'নিন, নিন, খান,' হাতে একটা চুরুট গুঁজে দিয়ে বলেছিলেন ধরণী ঘোষাল, 'ব্রেনটাকে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে দেখুন না হোমিওসাইড স্কোয়াডকে হেলপ করতে পারেন কিনা। লাখ লাখ লোকের মধ্যে থেকে কিলার খুঁজে বার করতে গিয়ে শালা নিজেই না কিলড হয়ে যাই।'

বলতে বলতেই এসেছিল টেলিফোন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিই ধরণী ঘোষাল... তরণী এবার ডুবল বলে...পাওয়া গেছে ট্যাক্সিটা?...অ্যাবানডনড?...আমহার্স্ট স্ট্রিট থানার সামনে?...ফুয়েল মিটারের ইন্ডিকেটর 'E-য়ের দাগে?...নো ক্লু?...গুড।'

ঠকাস করে রিসিভার নামিয়ে রেখে ধরণী ঘোষাল জানালেন, বড় জবর পরিহাস করে গেছে হত্যাকারী। খালি ট্যাক্সি রেখে গেছে থানার সামনেই—বুকের পাটা তো কম নয়। পুলিশকে চ্যালেঞ্জ!

আমি বলেছিলাম, তা নয়। চ্যালেঞ্জের ব্যাপারই নয়। থানার সামনে ট্যাক্সি ফেলে যাওয়ার দরকার হলে কাছাকাছি থানাগুলো ছেড়ে গিয়ে আমহার্স্ট স্ট্রিট থানা পর্যন্ত যাওয়া কেন? আসলে তেল ফুরিয়ে গেছিল। জিগ্যেস করেছিলাম, গাড়ির মুখটা কোন দিকে ছিল বলেছে? ধরণীবাবু বললেন, 'উত্তর দিকে। রাজা রামমোহন রায়ের বাড়ির দিকে। কিন্তু ইন্দ্রনাথবাবু, সন অভ সোয়াইনটাকে এখন কোথায় পাই বলুন তো?'

'সন নয়, বলুন সন্স। একজন হত্যাকারী নয়—একাধিক। দুজন তো বটেই, তিনজন হওয়াও বিচিত্র নয়। বলবন্ত সিং শক্তিশালী যুবক। লড়েওছে প্রাণপণে। কিন্তু পারেনি অতজনের সঙ্গে।'

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ধরণীবাবু বলেন, 'অবভিয়াসলি।'

আমি বললাম, 'বলবন্ত সিংয়ের ডেরায় হানা দিয়েছেন?'

'এই যাব বলেই তো আপনাকে পাকড়াও করে নিয়ে এলাম। চলুন।'

ভবানীপুরে বলবন্ত সিংয়ের আস্তানায় উল্লেখযোগ্য কিছুই পাওয়া যায়নি। ব্যাচেলার। একা থাকত একটা ছোট্ট ঘরে। মদের খালি এবং ভর্তি বোতল আর ফিল্মস্টারদের ছবিতে বোঝাই ঘর। দেওয়ালে সাঁটা বিশেষ একটা নায়িকার বুকের ওপর কলম দিয়ে আঁকা হরতন—তিরবিদ্ধ।

'স্যাডিস্ট,' একদৃষ্টে সেদিকে চেয়ে আছি দেখে, নাক কুঁচকে বলেছিলেন ধরণী ঘোষাল, 'আপনি নন—বলবন্ত সিং।'

আমি ওঁকে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পাশেই টায়ারের দোকানে ঢুকেছিলাম। টেলিফোন যন্ত্রটা দেখিয়ে জানতে বলেছিলাম, বলবন্ত সিংয়ের নামে টেলিফোন আসত কিনা। শিখ দোকানদার খালিস্তানি মেজাজ দেখিয়ে বলেছিল, আসত বইকি—এখনো আসে। দিল চৌচির করার মতো সব টেলিফোন।

দিল চৌচির করার মতো টেলিফোনই আশা করছিলাম। খুঁটিয়ে জিগ্যেস করতেই খবরটা পেয়ে গেলাম। একটি নারীকণ্ঠ প্রায় ডেকে দিতে বলত বলবন্ত সিংকে। বলবন্তও তাকে ফোন করত। তার ঠিকানা? আবার উগ্র হয়ে উঠেছিল খালিস্তানি টেম্পার। আমি ধীরে-সুস্থেই ঠিকানা উদ্ধারের পথ বাতলে দিয়েছিলাম। উল্টোপাল্টা টেলিফোনের বিল আসার জন্যে অনেকেই আজকাল খাতায় লিখে রাখে রোজ কোন নম্বরে টেলিফোন করা হল। সেরকম খাতা নেই কি দোকানে? সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিল খাতাখানা। উগ্র শিখ আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিল, তিনদিন আগে বলবন্ত সিংয়ের ফোন করা নাম্বারটা। একই নাম্বার দেখলাম আগেও লেখা রয়েছে খাতায়।

ওইখান দাঁড়িয়েই ফোন করলাম ওয়ান নাইন সেভেনে। ডাইরেক্টরী এনকোয়ারি। পেয়ে গেলাম আলিপুরের একটা ঠিকানা।

গিয়েছিলাম সেখানে। বাড়িটা এক বিলেত ফেরত ব্যারিস্টারের। এখন অবশ্য ব্যারিস্টার সম্মান আর কাউকে দেওয়া হয় না—সবাই অ্যাডভোকেট। তাহির আমেদ কিন্তু মার্বেল প্রস্তর ফলকে এখনো সেই ঘোষণাই করে চলেছেন।

ভদ্রলোক মাঝবয়সি। পুলিশ দেখেই পাইপ নামিয়ে বললেন, 'খবরটা পেলেন কী করে?'

আকাশ থেকে পড়লেন ধরণী ঘোষাল, 'কীসের খবর?'

'সাকিনা দুদিন হল পালিয়েছে—পুলিশকে জানাইনি কেলেঙ্কারির ভয়ে, বাট হাউ...'

সাকিনা তাঁর একমাত্র মেয়ে। পঞ্চদশী। স্কুলগার্ল। ঘর তার দোতলায়। পেছনের বারান্দা থেকে নেমে যাওয়া যায় একতলার বাগানে—সেখানে থেকে দরজা খুলে দুদিন আগে রাত্রে পালিয়েছে সাকিনা। মায়ের হিরে-জহরতও নিয়ে গেছে। প্রায় লাখ টাকার জুয়েল। বলা বাহুল্য, বেশির ভাগই কালো টাকায় কেনা। তাই চেপে গেছিলেন তাহির আমেদ।

সাকিনার পড়ার টেবিলে নিজের একটা ছবি ছিল কাচের তলায়। এককোণে ছোট করে একটা টেলিফোন নাম্বার লেখা—খালিস্তানী শিখের টায়ারের দোকানের টেলিফোন নাম্বার।

সাকিনা দেখতেও বিশেষ সেই নায়িকার মতো—যার ছবির বুকের হরতন আঁকা দেখে এসেছি বলবন্ত সিংয়ের ঘরে।

প্রেমের সম্পর্ক ছিল দুজনের মধ্যে। সাকিনা জহরত নিয়ে পালিয়ে গেছে তাহলে বলবন্ত সিংয়ের কাছেই।

তক্ষুনি গেলাম টায়ারের দোকানে। বলবন্ত সিং কি সাদি-টাদি করব বলেছিল ইদানীং? বলছিল বইকি। টাকার পাহাড়ে নাকি বসবে শিগগিরই—ট্যাক্সি চালাতে আর হবে না—টায়ারের দোকান দেবে। ক্যাপিটাল? কুছপরোয়া নেহি—ওভি হো জায়গা।

কিন্তু বলবন্ত সিংয়ের একখানা মাত্র ঘরে তালা ঝোলে না কেন? আমরা তো ভেজানো দরজা খুলেই ভেতরে ঢুকেছিলাম। তালা কোথায়?

আশপাশের ঘরের বাসিন্দাদের জিগ্যেস করে জানা গেল, ব্যাচেলার বলবন্ত ওই রকমই কাছাখোলা। এই তো দিন কয়েক আগেই ভোররাতে বন্ধুবান্ধব নিয়ে এসেছিল। কেউ উঠে অবশ্য দেখেনি, বলবন্ত তাদের মধ্যে ছিল কিনা। ভোরবেলা দেখা গেল দরজা দু-হাট করে খোলা—বলবন্ত নেই, বন্ধু-টন্ধুও নেই। নিশ্চয় চাবি দিতে ভুলে গেছে।

তালাটা পাওয়া গেল ঘরের মধ্যে। যা খুঁজছিলাম, সেটা কিন্তু পাওয়া গেল না—জহরতের বাক্সটা। যে রাতে বন্ধুদের নিয়ে বলবন্ত এসেছিল বলে প্রতিবেশীদের বিশ্বাস, সে রাতেই খুন হয়েছিল বলবন্ত। পকেট থেকে চাবি নিয়ে বন্ধুরা এখানেই এসেছিল জহরতের বাক্স সরাতে।

হত্যাকারীরা তাহলে বলবন্তের বন্ধু। বাড়ির ঠিকানা জানত। কিন্তু ট্যাক্সি নিয়ে উত্তর কলকাতার দিকে যাচ্ছিল কেন? সটান ভবানীপুরে এল না কেন?

খুনটার মোটিভ তাহলে ট্যাক্সি ছিনতাই নয়—জহরত লুঠ।

শুনে নিশ্চিন্ত হলেন ধরণী ঘোষাল—ট্যাক্সি ড্রাইভারদের হামলা এবার রোখা যাবে।

আমার মনটা কিন্তু খচখচ করতে লাগল। বলবন্তর বন্ধুরা অত রাতে বেলেঘাটাতেই বা এল কেন, খুন-টুন করে ভবানীপুরের দিকে না গিয়ে আমহার্স্ট স্ট্রিট থানার সামনেই বা গেল কেন?

ধরণী ঘোষালকে নিয়ে এলাম আমহার্স্ট স্ট্রিট থানায়। দেখলাম ট্যাক্সিখানা। পেছনের ট্রাঙ্ক খুলে দেখলাম, থরে থরে সাজানো টায়ার। অনেকগুলো মোটর সাইকেলের টিউবও রয়েছে ভেতরে। টায়ার আর টিউব, দুটো থেকেই বেরোচ্ছে দিশি মদের গন্ধ। চোলাই মদ। টিউবে ভরে টায়ারের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে যাওয়া হত। সবক'টা টিউবই খালি। অর্থাৎ ট্যাক্সি করে মাল পাচার করে ফিরছিল বলবন্ত সিং। কোথায় ফিরছিল?

ধরণী ঘোষালকে নিয়ে চলে এলাম বেলেঘাটায়। চোলাই মদের ডিপো এখানে একটা নয়—একাধিক। ডোবায় পোঁতা থাকে বোতল, জালা। ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাসের ধারে ধারে ধাপা-বানতলা পর্যন্ত চলছে এই ব্যবসা। দিনদুপুরেও দূর থেকে দেখা যায় ঝোপের মধ্যে জলা-জায়গায় ধোঁয়া উঠছে। ধরণী ঘোষাল দেখলাম আমার চাইতেও বেশি খবর রাখেন। মার্কামারা কয়েকটি আড়তে হানা দিলেন সবার আগে। অভয় দিতে এক জায়গায় বললে, বলবন্ত সিং খুন হয় যে রাতে, সেইদিন একগাড়ি মাল নিয়ে গেছিল। সঙ্গে ছিল তিনজন পাঞ্জাবি দোস্ত। শিখ।

ধরণী ঘোষাল উল্লসিত হলেও আমি হইনি। এত বড় শহরে তিনজন শিখ খুনেকে খুঁজে বার করা সম্ভব নয় কোনওমতেই। কিন্তু তাই বলে তো হাল ছেড়ে দেওয়াও যায় না। একগাড়ি মাল ডেলিভারী দিয়ে বলবন্ত বন্ধুদের নিয়ে আবার আসছিল নিশ্চয় আর একগাড়ি মাল নিতে—অন্তত বন্ধুরা তাই বুঝিয়েছিল বলবন্তকে। তারপর বচসা হয়েছে—খুন হয়েছে বলবন্ত। কিন্তু কলহটা কি নিয়ে? সাকিনাকে নিয়ে নয়তো? উপপত্নীর ভাগ তো দোস্তরাই চায়। সাকিনা তাহলে কোথায়? ট্যাক্সি পাওয়া গেছে উত্তরমুখো অবস্থায়। বলবন্তকে সরিয়ে দোস্তরা প্রথমেই সাকিনা সন্ধানেই যাচ্ছিল নিশ্চয়—ভেবেছিল রূপ আর রূপো এক জায়গাতেই পাওয়া যাবে। তেল ফুরিয়ে যাওয়ায় ফিরে এসেছে বলবন্তের ঘরে। জহরত পেয়েছে কিনা জানা যাচ্ছে না—কিন্তু সাকিনাকে পেয়েছে কি?

বলবন্তর যা চরিত্র, তা থেকে বোঝা যায় উত্তর কলকাতার একটা নিষিদ্ধ পল্লীতে তার যাতায়াত থাকা স্বাভাবিক। সোনাগাছিতে। চোরাই মদের কারবারটাও সেখানে চলে ভালো। ট্যাক্সি নিশ্চয় যাচ্ছিল সেই দিকেই। বলবন্ত নিজের ঘরে তোলেনি সাকিনাকে—হয়তো রেখে এসেছে নিষিদ্ধ পল্লীরই কোনও নিশ্চিন্ত ডেরায়।

গেলাম সোনাগাছিতে। হেদিয়ে পড়েছিলেন ধরণী ঘোষাল। কিন্তু ঘনঘন নস্যি নিচ্ছিলেন আর দিচ্ছিলেন আমাকে।। 'চার্চিল...চার্চিল' স্বগতোক্তি শুনে যাচ্ছিলাম সমানে। মৃগাঙ্ক, তুমি সোনাগাছি কখনো যাওনি আমি

জানি। কিন্তু আমার লাইনটাই খারাপ। সব খবরই রাখতে হয়। বারবনিতাদেরও ক্যাটেগরি আছে। রূপ আর পশার অনুযায়ী এক-এক বাড়িতে এক-এক দলের নিবাস। 'নতুন'দের তোলা হয় আবার বিশেষ বিশেষ জায়গায়। বাঙালি, হিন্দুস্থানী, মুসলিম, চাইনিজদের এলাকা আলাদা আলাদা। নিয়মিত খদ্দেররা মোটামুটি খবর রাখে দালালদের দৌলতে—দালালরাও সব খবর ভাঙে না। পুলিশের ভয়ে। কিন্তু রামকেষ্ট আমার হাতের লোক। কোনওকালে তার একটা উপকার করে ফেলেছিলাম—আজও সেই উপকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে সে এক পায়ে খাড়া। ধরণী ঘোষালকে জিপে বসিয়ে এই রামকেষ্টকেই খুঁজে বার করলাম। কথা ফুরোনোর আগেই সে শুধু সাকিনার ডেসক্রিপশন শুনে বলে দিলে, 'মালটা' ক'দিন আগেই এসেছে বটে—কিন্তু বাজারে নামেনি এখনো। প্রাইভেট মাল। প্রাইভেটদের এলাকায় আছে বহাল তবিয়তে। সোনাগাছির অলিখিত নিয়ম অনুযায়ী সেখানে কাউকে নিয়ে যাওয়া যাবে না।

কিন্তু রামকেষ্ট তো আমাকে চেনে। সোনাগাছির সততা সম্বন্ধে আমাকে সমঝে দেওয়ার পর নিয়ে গেল সাকিনার ঘরে। পঞ্চদশী মেয়েটা যেন আগুন দিয়ে গড়া। হেলেনের জন্য ট্রয়, পদ্মিনীর জন্যে চিতোর ধ্বংসের পর সাকিনার জন্যেও কলকাতা ধ্বংস হয়ে গেলে আশ্চর্য হব না। বলবন্ত তো গেলই—এবার যাবে তার হত্যাকারীরা।

আমাকে দেখেই ভুরু কুঁচকেছিল সাকিনা। রামকেষ্ট অভয় দেওয়ার পর ভুরু সরল হয়েছিল। বলবন্ত যে আর নেই, প্রথমে তা ভাঙি না। শুধু দুটো প্রশ্ন করেছিলাম—জহরতের বাক্সটা কোথায়?

বলবন্তর কাছে, বলেছিল সাকিনা। অত দামি বাক্স এ অঞ্চলে রাখতে চায়নি। কিন্তু আজ এলেই বলবে বাক্স ফিরিয়ে আনতে।

দ্বিতীয় প্রশ্নটা করতেই বললে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, চিনব না কেন? আমারই দেওয়া তো।'

দ্বিতীয় প্রশ্নটা কি যদি আঁচ করতে পারো, মৃগাঙ্ক, তাহলে বুঝব তুমি বড় গোয়েন্দা-লেখক। আর যদি না পারো, ধৈর্য ধরো।

তখন সন্ধে হয়েছে। সোনাগাছির মদের আড্ডায় ভিড় শুরু হয়েছে। রামকেষ্টকে দিয়ে দোকানদারকে ম্যানেজ করিয়ে কাউন্টারের পেছনে সাকিনাকে বসিয়ে রাখলাম বোরখা পরিয়ে। সাকিনা এসেছিল—বলবন্ত আর ফিরবে না শুনে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে এসেছিল। মদ খেতে আসবে শুনে এক কথাতেই রাজি হয়ে গেছিল।

ভেবেছিলাম একরাত্রে হবে না—অনেক রাত অপেক্ষা করতে হবে। সোনাগাছিতে মদের কারবারে এবং মেয়েদের কারবারে যাদের যাতায়াত নিয়মিত, কিছুক্ষণের জন্যেও এখানে তাদের আসতেই হয় গলা ভিজিয়ে নেওয়ার জন্যে। জহরতের বাক্স পেয়েও যারা জহরতের মালকিনকে পায়নি, সাকিনার সন্ধানে তারা আসবেই আসবে। সাকিনার সন্ধানে না হলেও টাকা ওড়াতে, ফূর্তি করতে আসবেই। এখানে বসে মদ যারা খায় না, বোতল বগলে করে নিয়ে যায় তারা। মোট কথা, আসতেই হবে। অপরাধীদের চরিত্রের এদিকটা আমার ভালোভাবেই জানা।

মৃগাঙ্ক, ভাগ্য সহায় হয় উদ্যোগীদের। বরাবর তাই দেখেছি। সেই সন্ধ্যাতেও তাই দেখলাম। তিনজন শিখ পাঞ্জাবি ঢুকল ঘরে। চনমনে চোখ। বেপরোয়া ভাবভঙ্গি।

চোখের ইশারা করল সাকিনা। বোরখার আড়ালে দেখলাম চোখ জ্বলছে তার।

ধরণী ঘোষাল তৈরি ছিলেন। তিনজনকেই তুললেন আগে থেকে এনে রাখা ভ্যানে।

তিনজনেই কবুল করেছিল বলবন্ত হত্যার অপরাধ। ওরা ছিল চারবন্ধু। মদ সাপ্লাই ওদের মেন বিজনেস। ট্যাক্সি রেখেছিল বলবন্ত সেই কারণেই। কিন্তু একদিন সাকিনাকে প্যাসেঞ্জার তুলে তাকে গেঁথে ফেলেছিল ছিপে। বাড়ি থেকে বার করে জহরতের বাক্সও তুলেছিল বাড়িতে। মতলব ছিল বোম্বেতে পিঠটান দেওয়ার—সাকিনাকে নিয়েই। ফিল্ম হিরোইন বানাতো। কিন্তু তিন দোস্ত বাগড়া দিয়েছিল মদের কারবার লাটে উঠবে

দেখে। দেখতে চেয়েছিল সাকিনাকে। দেখায়নি বলবন্ত। বেলেঘাটায় ওই জন্যেই ওকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। হয় সাকিনা আর জহরতের ভাগ দাও—নইলে জানে মরো। লড়ে গেছিল বলবন্ত—কিন্তু...

তিনজনের একজনের দিকে আমি একদৃষ্টে চেয়েছিলাম। অনেকক্ষণ থেকেই। মাথায় সে ছোটখাটো, শিখদের মতো লম্বা চওড়া নয়। কথাও বলছে না। চুপচাপ।

ধরণী ঘোষালকে আড়ালে ডেকে বলতেই তাকে ছাড়া বাকি দুজনকে সরিয়ে নিয়ে গেছিলেন তিনি ঘর থেকে।

ঘরে তখন সে আর আমি।

আমি চোখে চোখে চেয়ে বলেছিলাম, 'তুমি বাঙালি?'

চমকে উঠেছিল সে।

'এ পথে এলে কেন?'

কর্কশ গলায় বলেছিল সে, 'পেটের জ্বালায়।'

'কিন্তু এখন তো ইন্ডিয়ান পিনাল কোডের ৩০২ ধারা অনুযায়ী, ফাঁসি হবে তোমাদের। ৩৯০ ও ৪০২ ধারা অনুযায়ী রবারি আর ডেকয়টি চার্জেও ফেঁসে যাবে।'

নীরবে চেয়ে রইল সে। ভয় পেয়েছে।

'দাড়ি গোঁফ রেখেছ কেউ যাতে চিনতে না পারে—কেন? আরও খারাপ কাজ করেছ?'

কথা নেই।

'বিয়ে করেছ?'

'হ্যাঁ।'

'বউ আছে?'

'হ্যাঁ।'

'ছেলেমেয়ে?'

'আছে।'

'এদের ভাসিয়ে দিয়ে যেতে তো হবে এবার।'

'ভাসিয়ে দিয়েছি অনেকদিন।'

'বাড়ি ছাড়া?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'খেতে দিতে পারি না।'

'এখন তারা খেতে পাচ্ছে?'

'মাঝে মাঝে টাকা পাঠাই—মুখ আর দেখাই না।'

'কোথায় থাকে তারা?'

জবাব নেই।

'তাদের জন্য মন কাঁদে না? দেখতে ইচ্ছে যায় না?'

পকেট থেকে একটা ফটো বার করল সে। কোণ দুমড়ানো মলিন। বললে, 'এইটাই দেখি রোজ।'

'দেখি।'

ইতস্তত করে বাড়িয়ে দিল সে।

আমি দেখলাম এবং চমকে উঠলাম। ছ'জনের পরিবারের একজনকে আমি চিনি। শ্রাবণী।

মৃগাঙ্ক, তাই আমি পালিয়ে এসেছি। খেতে না পাওয়া মেয়েটাকে এবার আমি বাপহারাও করলাম জন্মের মতো। তাকে টাকা দিয়েছি, খাবারের বন্দোবস্ত করে এসেছি—কিন্তু শুধু আমিই জানি—ইহজীবনে সে আর

বাবাকে ফিরে পাবে না।

সাকিনাকে ফিরিয়ে দিয়েছি তার বাবার কাছে। সে ঘড়িটা চিনিয়ে না দিলে, বলবন্ত সিংয়ের হত্যাকারীকে ধরতে পারতাম না। ধরণী ঘোষালরা একদম মাথা খাটান না—এইটাই ওঁদের বড় দোষ। বলবন্ত সিংয়ের কব্জিতে ঘড়ি পরার দাগ ছিল। কিন্তু ঘড়িটা নিয়ে একদম মাথা ঘামাননি। টাকা- পয়সাসমেত হত্যাকারীরা সেই ঘড়িটাও তো খুলে নিয়ে গেছিল। একজন না একজন হাতেও নিশ্চয় পরেছিল—নিশ্চয় দামি বলেই নিয়ে যাওয়ার লোভ হয়েছিল। সাকিনাই চিনিয়ে দেয় ঘড়িটা। ক্যাসিয়ো কোয়ার্জ ঘড়ি—মাস, তারিখ, বার, অ্যালার্ম—সব আছে সেই ঘড়িতে। এই একটিমাত্র সূত্র সন্ধানেই সাকিনার সঙ্গে দেখা করেছিলাম এবং দ্বিতীয় প্রশ্নটা করেছিলাম।

যাক সেকথা, শ্রাবণীকে পিতৃহীন করার অপরাধ বুকে নিয়ে পালিয়ে এসেছি এই পাহাড়-বনের নির্জনতায়। বিবেককে জিগ্যেস করছি বারবার, সমাজের ভালো করতে গিয়ে নির্দোষদের সর্বনাশ করার কোনও অধিকার কি আছে আমার? শ্রাবণী তো নিষ্পাপ—কেন তার এত বড় ক্ষতি আমি করলাম? খ্যাতি? যশ? কৃতিত্বের অহঙ্কার? মরীচিকার পেছনে আর কতদিন ছুটে চলব, মৃগাঙ্ক, বলতে পারো?

** 'রোমাঞ্চ' পত্রিকায় প্রকাশিত।*

গন্ধর্বলোক

ঈশানীর চিঠি ঈশান কোণের মেঘের মতোই আমার ছুটির দফারফা করে ছাড়ল। নামডাক এমনিতে হয়নি। বোম্বাইয়ের রূপোলি পর্দার তারকা-রানি আমি। কাজেই আবেগ বস্তুটার মাত্রা আমার মধ্যে একটু বেশিই। স্নায়ুর ওপরেই আমাকে বাঁচতে হয়। জানি, সব চিত্রতারকাদের মতোই চল্লিশ ছুঁয়ে আমাকেও গ্যাসট্রিক আলসারে ভুগতে হবে—স্নায়ুর ওপর অত্যাধিক চাপ দেওয়ার শাস্তি পেতে হবে। শিলাদকুমারও এই নিয়ে ঠাট্টা করে আমাকে।

বছরে পাঁচ-ছ'টা বড় বড় ছবিতে আমাকে নায়িকা হতেই হয়। দ্বিতীয় ছবির শুটিং শেষ হবার পর শিলাদকুমার ফিরল কাম্বোডিয়া থেকে। দুজনেই বেশ কাহিল। কেননা, সাতমাস একটানা কাম্বোডিয়ার ছবির কাজ করেছে শিলাদ। তাই প্রস্তাব করেছিল, আর একবার হানিমুনে বেরোনো যাক।

শিলাদের কথা শুনে হাসি পেয়েছিল বইকি। আর একবার হানিমুন, কথাটার কোনও মানে নেই আমার কাছে। কোনও হানিমুনই হয়নি আমাদের। বিয়ে হলে তো হবে। বিয়ে করার সময় পেলাম কখন? ফিল্মদুনিয়ার গন্ধর্বলোকে বিয়ে করার সময় ক'টা ভাগ্যবানের হয়?

সে যাই হোক, মধুচন্দ্রিমা যাপনের প্রস্তাব লুফে নিয়েছিলাম।

বাইরে বেরোনো নিরাপদ নয়। ভক্তদের জ্বালায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে। তাই যেমন-তেমন ঘরে শুয়ে রইলাম। বাইরে বাজতে লাগল টেলিফোন। নীচে খটাখট শব্দে ব্যস্ত রইল অফিস টাইপরাইটার। ফ্যান-ক্লাব কর্মীরা ফুরসত পেল না চিঠির বস্তা থেকে মুখ তোলবার। ডিটেকটিভরাও রোজকারমতো টহল দিয়ে ফিরতে লাগল বাড়ি আর বাগানের প্রতিটি বর্গ ইঞ্চিতে।

আমি আর শিলাদ এয়ার-কন্ডিশনড ঘরে শুয়ে বিভোর হয়ে রইলাম পরস্পরকে নিয়ে। এক-এক রাতে এক-এক ফুলশয্যার রোমান্সে মশগুল হয়ে রইলাম দুজনে দুজনকে নিয়ে। ব্রেকফাস্ট আসত সূর্য যখন মধ্যগগনে। আমি ক্রিম খেতে ভালোবাসি বলে শিলাদকুমার কত ঠাট্টাই না করত। বলত, দুদিনেই অ্যায়সা মোটা হবে যে ছবির কাজ আর জুটবে না। আমি শুনতাম না। ক্রিম আমার ভীষণ ভালো লাগে। এতদিনেও যখন মুটিয়ে যাইনি—তখন আর যাবোও না।

সেদিনও ব্রেকফাস্ট এলে ক্রিম খাচ্ছি। খেতে খেতে আমার চিঠির তাড়া থেকে একটা খাম বেছে নিলাম। খুলতেই দেখলাম ঈশানীর চিঠি।

শ্রীযুক্তা মদালসা দেবী

মান্যবরেষু,

আমি আর পারছি না। আপনার হয়ে জাল অটোগ্রাফ দিতে দিতে হাঁপিয়ে উঠেছি। রেহাই পাবার জন্য চুল ছেঁটে ফেলাম। তবুও মুক্তি নেই। আপনার ভক্তের দল এখনও রাস্তায় দেখলেই আমার পেছনে ছোটে। মনে করে আমিই মদালসা। বলে, কেন চুল ছাঁটলাম। অমন লম্বা চুল ছেঁটে কেন ববছাঁট করলাম। মদালসা দেবী, আমি সত্যিই আর পারছি না। সারাটা জীবন নকল মদালসা দেবী হয়ে কাটাবার বিড়ম্বনা আর সইতে পারছি না।

বিনীতা

ঈশানী দত্ত

চিঠি পড়েই মাথা গরম হয়ে গেল। চিঠির বক্তব্যর জন্য নয়। এ চিঠি আমার কাছে এল কী করে? সেক্রেটারিদের পইপই করে বলে দিয়েছি, ভক্তবিটেলদের কোনওরকম স্তুতিপত্র যেন আমার সামনে না পৌঁছোয়। ফ্যান-ক্লাব খুলেছি কি এমনি-এমনি? খোশামুদে চিঠি প্রথম প্রথম ভালোই লাগত। ভাবতেও অবাক লাগে, এসব চিঠির জবাবও দিতাম। কিন্তু হাউইয়ের মতো খ্যাতির আকাশে উঠে পড়ার পর স্তুতিপত্র দেখলেই মেজাজ খিঁচড়ে যায়।

একেই বলে খ্যাতির বিড়ম্বনা। খ্যাতি যখন থাকে না, তখন খ্যাতির পেছনে দৌড়োই। খ্যাতি যখন আসে, তখন খ্যাতিকে এড়িয়ে চলি। শিলাদকুমার অবশ্য এর ব্যতিক্রম। গোড়া থেকেই এ কারো ধার ধারেনি। গন্ধর্বলোকে হিরো রূপেই ওর প্রবেশ প্রস্থানও ঘটবে হিরোর মতো।

তাই সেক্রেটারিদের ওপর ঢালাও হুকুম আছে, সব চিঠিই খুলে দেখবে। ব্যক্তিগত চিঠি আসবে, আমার সামনে—বাদবাকি সব যাবে ফ্যান-ক্লাবে। বাঁধা ছকের টাইপকরা চিঠিতে জবাব যাবে। এমনকী আমার সইকরা যে ফটোগ্রাফ পাঠানো হবে, তার সইটিও নিজে করব না—ওরাই আমার হয়ে করে দেবে।

মোট কথা, কোনও ধরনের ফ্যান-লেটার যেন আমার ত্রিসীমায় না আসে। এই হল আমার অর্ডার। তা সত্ত্বেও ঈশানীর চিঠি আমার কাছে পৌঁছোয় কী করে?

বিরক্তি নিশ্চয় কণ্ঠেও প্রকাশ পেয়েছিল। কেননা, কাগজ পড়তে পড়তে মুখ তুলল শিলাদ—'হল কী?'

'ফ্যান লেটার। হাজারবার বলেছি এসব চিঠি যেন আমার কাছে না পৌঁছোয়।'

বলে, চিঠিটা ছুঁড়ে দিলাম ওর বিছানায়। এক হাতে তুলে নিল শিলাদ। ভারী সুন্দর হাতটা সিল্কের চাদরের পটভূমিকায় নতুন করে দেখলাম। হাত দেখে মানুষের চরিত্র ধরা যায়। অন্তত আমার তাই বিশ্বাস। তা না হলে যার চেহারা অমন অসুরের মতো, তার মন অমন মিষ্টি, অমন নরম, অমন শিল্পীসুলভ হবে কেন? ওর হাতে সে চিহ্ন আছে।

চিঠিটা পড়ল শিলাদ। পড়ে হেসে ফেলল—'ঈশানী দত্ত! বেশ নাম। চিঠিটাও। ভক্তের চিঠি তো এরকম হয় না। ইন্টারেস্টিং!' বলে, অপাঙ্গে তাকাল। 'চিঠিটার মধ্যে রহস্য আছে।'

'রহস্য! রহস্য আবার কি? এ চিঠি এখানে পৌঁছোল কী করে, এ ছাড়া আর কোনও রহস্য তো দেখছি না।'

'হাতের লেখাটা যে তোমার হাতের লেখার মতো। রহস্য সেইটাই।'

কথাটা সত্যি। ঈশানী দত্তর হাতের লেখা অবিকল আমার হাতের লেখার মতোই।

সেকেন্ড কয়েকের মধ্যেই মতলবটা মাথায় এল আমার। খাট থেকে নামতে নামতে বললাম—'চললাম।'

'কোথায়?'

'ঈশানীকে দেখতে।'

'কিন্তু এ যে হানিমুনের সময়! এই দ্যাখো কাগজেও তাই লিখেছে। এখন কি বাইরে বেরোয়?'

'নকল মদালসারও তো হানিমুনের ইচ্ছা যায়।' বলে মুচকি হাসলাম আমি। বিধাতারও তখন হেসেছিলেন —অলক্ষ্যে।

'বেশ তো, খাবার নেমতন্ন করো, বর্তে যাবে,' শিলাদ বলেছিল।

'উঁহু। থার্ডক্লাস যে-কোনও একটা হোটেলে শুধু দুজনে দেখা করব, কথা বলব। এই হল আমার আজকের অ্যাডভেঞ্চার।'

সেই ব্যবস্থাই হল। প্যারাডাইজ হোটেল। বিকেল চারটে। ঘর 'বুক' করার পর ঈশানী দত্তর প্যারেলের ঠিকানায় খবর পাঠালাম—আমি আসছি।

স্নান সেরে নখরঞ্জন করে চুল আঁচড়ে যখন আমার হেয়ার-ড্রেসারের চেম্বার থেকে বেরোলাম, তখন আমাকে নায়িকা-শ্রেষ্ঠা মদালসা বলে চেনা মুশকিল। প্রসাধন এবং কেশবিন্যাস আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মতোই।

প্যারাডাইজ হোটেলের সিঁড়ির ধাপে পা দিয়ে হঠাৎ মনটা অন্যরকম হয়ে গেল। নকল মদালসাকে দেখে লাভ কী? খামোকা এনার্জি নষ্ট...ধাপ থেকে পা নামিয়ে ফিরতে যাচ্ছি, মনে পড়ল শিলাদকুমারের মুখ...ঠাট্টা...টিটকিরি...ভক্তের ভয়ে পলায়ন? নাঃ, ফেরা হল না। সোজা গেলাম অফিসরুমে। নাকের ডগায় চশমা এঁটে বুড়ো ম্যানেজার এমন ভাবে তাকাল আমার পানে যেন আমি মেয়েটা তেমন সুবিধের নয়। দুই চোখে বেশ সন্দেহ...বারান্দা দিয়ে এগোতে এগোতে বিড়বিড় করে কিঞ্চিৎ জ্ঞানদানও করা হল। এ হোটেল নামী হোটেল, কুঅভিসন্ধি নিয়ে এখানে কেউ আসে না। হোটেলের দুর্নাম মালিক একদম সইতে পারে না। বলতে-বলতে 'বুক' করা কামরার সামনে পৌঁছোলাম। দরজা ভেজানো ছিল। ঠেলে ঢুকলাম। প্রায়ান্ধকার। একটা টেবিল। দূরপ্রান্তে গোটাতিনেক চেয়ার। কে যেন সেখানে বসে রয়েছে।

পেছন ফিরে দেখলাম বুড়ো নেই। বললাম—'অন্ধকারে কি মুখ দেখা যায়?' বলেই খট করে সুইচ টিপলাম। আলোয় ভরে উঠল ছোট্ট ঘরটা।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম নকল মদালসার দিকে। চেয়ারে বসা মেয়েটি যেন আর একটা আমি।

তফাত শুধু পোশাক। আমি যা পরেছি, তা দামি না হলেও পরিচ্ছন্ন। কিন্তু নকল 'আমি' যা পরেছে, তা রীতিমতো নোংরা। যেমন ব্লাউজের ছিরি, তেমনি শাড়ির অবস্থা। ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা চুল। তা সত্ত্বেও আমার সঙ্গে তার মুখের আদলের হেরফের ঘটেনি। থুতনি সুডৌল। টানা টানা চোখ। কামনার দুটি ডিপো। আমার ভক্তরা যে যে দেহশ্রীর জন্য আমাকে নিয়ে পাগল, সবই দেখলাম রয়েছে নকল 'আমি'র মধ্যে।

ঈশানী নির্ভয়ে তাকিয়েছিল। নিঃশঙ্ক চোখ। বলল—'বসুন।' কণ্ঠস্বর আমার মতোই। ঈষৎ ঘষা, ঈষৎ ধরা, ঈষৎ তীকষ্ন। শুনেছি, পুরুষের রক্তস্রোত নাকি উদ্দাম হয় আমার এই কণ্ঠস্বরে। নকল 'আমি' বহু চেষ্টায় এ স্বরও নকল করেছে।

আমি অভিনেত্রী। বিস্ময় চোখমুখ থেকে সরিয়ে রাখলাম। ঈশানী কিন্তু দেখলাম, মোটেই ঘাবড়ায়নি। মদালসার সামনে এসে বহু বাঘা রিপোর্টারও কেঁপে ওঠে। কিন্তু ঈশানী দত্ত বিন্দুমাত্র নার্ভাস হয়নি।

নৈঃশব্দ্য আমি ভাঙলাম। গৌরচন্দ্রিকার ধার দিয়েও গেলাম না। বললাম।—'কি মনে করে?'

'কিছুই মনে করে নয়।' বলল ঈশানী আমারই গলায়। 'আগে বসুন। অতদূরে নয়—আমার পাশে।' ঈশানী যেন হুকুম করছে। যেহেতু তাকে আর আমাকে দেখতে যমজ বোনের মতো, অতএব আমার ওপর তার যেন একটা অধিকার জন্মে গিয়েছে। 'কত লম্বা আপনি?'

প্রশ্নটা আকস্মিক। সুরটাও যেন কেমন-কেমন। কিন্তু গায়ে মাখলাম না। বললাম—'সাড়ে পাঁচ।'

'আমারও তাই। ম্যাগাজিনেও তাই দেখেছিলাম। বাজিয়ে নিলাম।'

'কেন? বাজিয়ে নেবার দরকার কি?' কিছু একটা বলা দরকার, তাই বললাম।

কোলের ওপর রাখা কালো হ্যান্ডব্যাগটা খুলল ঈশানী। একটা কালো রঙের সাইলেন্সার ফিট করা রিভলভার বার করে বলল—'একটু পরেই আপনাকে খুন করব, তাই জেনে নিলাম। মরবার আগে কিছু বলবার থাকলে বলতে পারেন।'

নিস্তব্ধ ঘরে ঈশানীর কথা ফুরোলো। আবেগ নেই, উত্তাপ নেই, ঘৃণা নেই, দ্বেষ নেই। শুধু একটা ঘোষণা —আমাকে মরতে হবে। শুটিংয়ের সময়ে এরকম সংলাপ শুনলে মনে হত নাটকীয় মুহূর্ত তৈরি হচ্ছে। কিন্তু ঈশানীর কণ্ঠে নাটক নেই।

বিক্ষিপ্ত মনটাকে জড়ো করবার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। শুধু মনে হল, অফিস ঘরের বুড়ো ম্যানেজার একটু আগেই হোটেলের সুনাম নিয়ে লম্বা-চওড়া বচন ঝেড়েছে মনে পড়ল রাস্তার মোড়ে গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ড্রাইভার, এয়ারকন্ডিশনড ঘরে আমার প্রতীক্ষায় বসে আছে শিলাদকুমার। ইচ্ছে হল খামচে নিই রিভলভারটা। ফিল্ম হলে তাই করতাম। কিন্তু এটা বাস্তব। সব শেষ হতে চলেছে।

ধরা গলায় বললাম—'কী করেছি আমি? কেন খুন করবে?'

জবাব দিল না ঈশানী। রিভলভারটা দোলাতে দোলাতে শুধু চেয়ে রইল।

রাগ হয়ে গেল—'ফাঁদটা ভালোই।'

'ফাঁদ আপনার। আপনিই আমাকে ডেকেছেন।'

কথাটা সত্যি। অ্যাডভেঞ্চারের লোভে নিজের ফাঁদ নিজেই পেতেছি। চোখ ফেটে জল এল। কিন্তু কাঁদতে পারলাম না। শুধু বললাম ছেলেমানুষের মতো—'কিন্তু কী অপরাধ করেছি আমি?'

এ প্রশ্নের জন্য তৈরি ছিল ঈশানী। বল্লমের মতোই জবাবটা ছুঁড়ে দিল আমাকে লক্ষ্য করে—'অপরাধ! শেষ নেই অপরাধের। প্রথম অপরাধ, হুবহু আমার চেহারা নিয়ে কেন এসেছিলেন পৃথিবীতে? দ্বিতীয় অপরাধ, এসেই ছিলেন যদি ফিল্মস্টার হতে গেলেন কেন? কেন আমার জীবন বিষিয়ে তুলেছেন? নিশ্চিন্ত মনে আমি কোথাও বেরোতে পারি না। বেরোলেই মদালসা মনে করে আমায় তাড়া করে, ছিঁড়ে খায়। কেন? কী অপরাধে? বছরের পর বছর কেন এই নির্যাতন? আপনার হয়ে মিথ্যে অটোগ্রাফ দিতে দিতে হাত ব্যথা হয়ে যায়, জানোয়ার লোকগুলোর জ্বালায় অলিগলি দিয়ে মুখ ঢেকে পালিয়ে বেড়াই। কেন? কী অপরাধে? আজ সুযোগ এসেছে শোধ তুলবার, এই অত্যাচার বন্ধ করবার। শুধু তাই নয়, এবার আমার পালা। বহু বছর মদালসার ছায়া হয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছি, এবার হবো আসল মদালসা। হাঃ, হাঃ, হাঃ।'

পাগল? না। স্থির সংকল্পে বজ্রকঠিন মুখ। দীর্ঘ ক্লেশের শেষ হতে চলেছে। তাই আনন্দ জ্বলজ্বলে আনন। দুই চোখে কেবল ঘৃণা, অপরিসীম ঘৃণা।

ফিসফিস করে শুধু বললাম—'আসল মদালসা হবে? আমাকে মেরে? পারবে না।'

'পারব না? কেন?'

'দেখতে আমার মতো হলেও সত্যি সত্যিই তো তুমি নও। আমার চালচলনই আলাদা। সে জিনিস রপ্ত করা মুখের কথা নয়। যেমন ধরো, এ হোটেল থেকে কতদূরে ঠিক কোনখানে গাড়ি পার্ক করেছি, তা তোমার জানা নেই।'

'বারান্দা থেকে তাও দেখেছি। মোড়ের কাছে বাস-স্টপেজের সামনেই গাড়ি পার্ক করেছেন।'

'ড্রাইভারের নাম? কী বলে ডাকবে?'

'কমলবাহাদুর। ডাকব শুধু কমল বলে।'

'যাবে কোথায়? কমলবাহাদুরকে বলবে কী?'

'ব্লু-টেম্পল,' অবিকল আমার গলায় বলল ঈশানী।

'কমল ধরে ফেলবে। এখান থেকে বেরিয়েই যে গাড়ি বাড়ি ফিরছি না, কমল তা জানে। আজ বিকেলে অনেক প্রোগ্রাম নিয়ে তবে রাস্তায় বেরিয়েছি।'

'বলব, কমল, আর পারি না। প্রোগ্রাম বাতিল। চলো ব্লু-টেম্পল। ছুটির সময়ে যতটা পারি জিরিয়ে নিই।'

শুনতে-শুনতে বেশ বুঝলাম কমলবাহাদুরের ক্ষমতা নেই একথা শোনার পর নকল মনিবানিকে চেনে। গলার খোঁচগুলো পর্যন্ত নকল করেছে ঈশানী। বলবার কায়দায় কোনও ফারাক নেই। শুধু পোশাক পাল্টে নিলেই হল। আমার পোশাক ও পরবে—নিজের পোশাক আমাকে পরাবে। কমলবাহাদুর কেন, স্বয়ং শিলাদকুমারও চিনতে পারে কিনা সন্দেহ।

উপায় নেই। কোনও উপায় নেই। আমার জীবনে গোপনতা নেই। আমি যে গন্ধর্বলোকের অপ্সরী। আমার চালচলন, খাওয়া-দাওয়া, কথাবার্তা, হাবভাব—সবকিছুই পাবলিক প্রপার্টি। ভক্ত জনগণ মুখস্থ করে রেখেছে আমার অষ্টপ্রহরের পাঁচালী। ঈশানী আমাকে নিয়ে লেখা প্রবন্ধ পড়েছে, আমার অভিনয় করা ফিল্ম দেখেছে, আমার সঙ্গে ফিল্ম সমালোচকের সাক্ষাৎকার মুখস্থ করেছে ফলে আমার সব কিছুই তার নখদর্পণে। যে-কোনও মুহূর্তে আমার জায়গায় সে দাঁড়ানোর সব পর্বই তার কণ্ঠস্থ। কী ভয়ানক!

অভিশপ্ত গন্ধর্বলোকের পরী আমি। এই তো আমার জীবন। আমার কথা বলার রেকর্ডে আমার ভক্তবৃন্দ বারংবার শুনেছে। ঈশানীও শুনেছে। ভক্তিতে গদগদ হয়ে নয়—আমার সর্বনাশ কামনায়। রেকর্ডের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে রপ্ত করেছে মদালসার সেই বিখ্যাত কথা বলার ভঙ্গি।

ঠান্ডা গলায় বললাম—'বিয়ে করেছ নিশ্চয়। স্বামী তো তোমায় ছাড়বে না।'
'স্বামী আমায় নেয় না।'
আশ্চর্য মিল! আমার স্বামীও আমাকে নেয়নি।
'ছেলেপুলে?'
অবাক চাহনি মেলে তাকায় ঈশানী—'সে কী! ভুলে গেলেন? আমাদের তো ছেলেপুলে নেই?'
চমকে উঠেছিলাম কথা বলার ধরনে। প্রথমে ভেবেছিলাম, 'আমাদের বলতে ঈশানী আর স্বামীর কথা বলা হচ্ছে। পরক্ষণেই বুঝলাম, তা নয় ঈশানী আর আমি 'আমাদের' বলতে এই দুজনে। বছরের পর বছর এইভাবেই ভেবে এসেছে ঈশানী। মজ্জায় তার এই চিন্তাই পাকা আসন পেতে বসেছে। মদালসা মানেই ঈশানী—ঈশানী মানেই মদালসা। লোকে তার পিছু নিয়েছে মদালসা ভেবে—চিন্তাটা আরও কায়েমী হয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে মদালসার অভিনয় করতে করতে ঈশানী নিজেও কখন মদালসা হয়ে গিয়েছে। সত্যিই তো আমি সন্তানহীনা। এখন প্রয়োজন কেবল পট পরিবর্তনের। আসল মদালসা নিহত হবে নকল মদালসার বেশে। আর, নকল মদালসা গিয়ে বসবে আসল মদালসার সিংহাসনে।
সফল হবে এক উন্মাদ ছন্নছাড়ার অপ্রকৃতিস্থ স্বপ্ন। তিল তিল করে খ্যাতির যে সৌধ আমি গড়ে তুলেছি, বহু বছরের সাধনায় যে বৈভব, যশ, প্রতিপত্তি অর্জন করেছি, কালো রিভলভারের একটিমাত্র গুলিতে তা চলে যাবে নোংরা পোশাকের ওই মেয়েমানুষটার দখলে। আর, খ্যাতিহীন হোটেলের প্রায়ন্ধকার ঘরে যথাসময় আবিষ্কৃত হবে নামগোত্রহীন একটি লাশ!
ঈশানী চেয়েছিল আমার পানে। চোখ তুলতেই বলল—'একটা কথা জানার ছিল। শিলাদকুমার লোকটা কীরকম?'
কনকনে বরফ-খণ্ডের মতো কথাটা কানের পর্দায় গিয়ে আঘাত হানল। সঙ্গে সঙ্গে ভাবনার স্রোত বইল অন্যদিকে। জানি শিলাদ কি বলবে। আমাকে নিকেশ করে ঈশানী আমার বেশে ব্লু-টেম্পলে ফিরলেই শিলাদ শুধোবে—'কিগো পরী, ঈশানীকে দেখলে?'
ঈশানী নতুন ঢং শুরু করবে। বলবে, চুলটা হঠাৎ ছাঁটতে হল। শুনে শিলাদ সাদাসাদা ঝকঝকে দাঁত বার করে অট্টহাসি হাসবে। কাছে টেনে নেবে ঈশানীকে।
লুঠ হয়ে যাবে শিলাদকুমার! আমার জীবনের সবচাইতে দামি, সবচাইতে আদরের, সবচাইতে গোপনীয় মণিকোঠায় ধুলো পায়ে তাণ্ডব নৃত্য শুরু করবে শয়তানী ঈশানী। হীরে জহরতকেও ছড়িয়ে রাখি, কিন্তু সন্তর্পণে সরিয়ে রাখি যে মানুষটিকে—সেই শিলাদকুমারকে কেড়ে নিয়ে যাবে ঈশানী—কিন্তু কেউ কোনওদিন জানতেও পারবে না! শিলাদের নিঃশ্বাসে উত্তপ্ত হবে ঈশানী, শিলাদের আদরে বিহ্বল হবে শয়তানি!
ভাবতে ভাবতেই লক্ষ লক্ষ অগ্নিশিখা যেন উদ্দাম নৃত্যে আগুন ধরিয়ে দিল শিরায় শিরায়, মগজের প্রতি স্নায়ুকোষে। যা হবার নয়, তাই হতে চলেছে—অসম্ভব সম্ভব হতে চলেছে। সেই মুহূর্তে দুর্বিসহ এই সম্ভাবনা নিঃশেষে মুছে নিয়ে গেল আমার সমস্ত ভয়, আতঙ্ক, আশঙ্কা। ইচ্ছে হল...প্রচণ্ড ইচ্ছে হল চুলোয় যাক রিভলভারের তপ্ত বুলেট...ইচ্ছে হল লাফিয়ে গিয়ে ঝাঁপিড়ে পড়ি কুচক্রী ঈশানীর ওপর...আঁচড়ে কামড়ে চড়িয়ে পিটিয়ে কেড়ে নিই নিকষ হাতিয়ার...খামচে খুবলে ছিঁড়ে মেরে বিচূর্ণ করি ওর আকাশ-কুসুম আশার...কিন্তু না...মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে...শয়তানী বুদ্ধি দিয়েই কব্জায় আনতে হবে।
অকস্মাৎ পরিকল্পনাটার আবির্ভাব ঘটেছিল মগজে। মস্তিষ্কের সেই মুহূর্তের উর্বরতায় পরে বিস্মিত হয়েছিলাম। মিথ্যে...একটা ডাহা মিথ্যেকে বলতে হবে সত্যির মতো করে...পারব না? নিশ্চয় পারব...আমি যে অভিনেত্রী...মিথ্যের বেসাতিতে বড় কারবারী!
'ঈশানী,' আবেগের পুঞ্জ মেঘ গলার মধ্যে সঞ্চয় করে বললাম—'ঈশানী, শিলাদকুমারের সব কথাই তোমাকে বলতে পারি। যা জানি—স-ব। তারপর তুমি আমাকে খুনও করতে পারো। কিন্তু আমার ভাগ্যে যা

লেখা, তা রোধ করার ক্ষমতা আমার নেই। ঈশানী, তোমারও নেই।'

বলে থামলাম। সেকেন্ড কয়েক শব্দহীন সাসপেন্স সৃষ্টি করলাম। তারপর একই সুরে কথার খেই টেনে বললাম—'ঈশানী, আমার পরিণতি রোধ করবার ক্ষমতা তোমারও নেই। নিয়তির লিখন, ঈশানী, নিয়তির লিখন। একথা কেউ জানে না, কাউকে বলিনি। কাগজে কোথাও বেরোয়নি। জানো আমার শেষ কোথায়? কী অবস্থায়?'

উৎকণ্ঠা। নৈঃশব্দ্য। ঈশানীর নির্নিমেষ চাহনি।

'আর মাত্র ছ'মাস। ছ'মাস পরেই আমাকে যেতে হবে অ্যাসাইলামে...রাঁচির পাগলাগারদে... দুরারোগ্য ব্যাধিতে দিনে দিনে পাকিয়ে যাচ্ছি আমি...এত খাই কিন্তু গায়ে মাংস লাগে না (ব্রেকফাস্টে ক্রিম খাওয়া নিয়ে শিলাদকুমারের রঙ্গ পরিহাস আমার মিথ্যেকে অনেকটা সত্যির বনেদ জোগাল)... আর মাত্র ছ'মাস, ছ'মাস বাইরে থাকার অনুমতি দিয়েছে ডাক্তার...এই ছ'মাস শেষ বিশ্রাম নিচ্ছি ব্লু-টেম্পলে...কাগজে কে না সে খবর পড়েছে...কিন্তু এ বিশ্রাম যে শেষ বিশ্রাম তা কেউ জানে না...জানে না শিলাদকুমার আমাকে শেষ সঙ্গসুখ দিচ্ছে বহু অর্থের বিনিময়ে...'

এইখান থেকেই আমার অভিনয় প্রাণবন্ত হল। শিলাদকুমার যে দেহ মনে একটা অসুর ছাড়া কিছু নয়—এ সত্য বলতে বলতে আমি কেঁদে ফেললাম। শিলাদকুমার যে বহু অভিনেত্রীর শয্যায় অংশ নিয়েছে, এ ঈর্ষা আমার অন্তর সেই মুহূর্তে বিষিয়ে তুলল। শিলাদকুমারের সাত মাস কাম্বোডিয়া- প্রবাস যে অনেক গোপন রঙ্গের মুখরোচক ইতিহাস, এ কল্পনা চোখের জল আরও বৃদ্ধি করল। ফলে, অশ্রু যেন বন্যার মতো উপচে পড়ল দু-গাল বেয়ে। রমণীমোহন শিলাদকুমার তুমি আমার যৌবন-সুধার শেষ বিন্দুটিও লুঠে নিতে এসেছ...তারপর যাবে নতুন ফুলে, নতুন মধুর লোভে। এ ফুল যাবে ঝরে...ছ'মাস পরে রাঁচির পাগলাগারদে শুরু হবে অনিশ্চিত জীবন। ডাক্তাররা? চেষ্টার ত্রুটি করেনি। কিন্তু শেষ ঘনিয়ে এসেছে...কেউ জানে না...জানি শুধু আমি আর শিলাদকুমার...

শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার আমার ভাগ্যে একাধিকবার জুটেছে। কিন্তু সেদিনের অভিনয় বুঝি সব রেকর্ডকেও ম্লান করে দিয়েছিল। তিল তিল করে আমার দীপ নিভে যাওয়ার কাহিনির শেষে আমি অঝোর ধারে কাঁদতে লাগলাম।

ঘর নিস্তব্দ। আমার উচ্ছ্বাস এবার নীরব অশ্রুধারায় পর্যবসিত। দুহাতে মুখ ঢেকে বেশ কিছুক্ষণ ডুকরে কাঁদলাম। মনের চোখ দিয়ে দেখলাম, কালো রিভলভারের মিশমিশে নলটা আমার ব্রহ্মরন্ধ্রে তাগ করেছে...অন্তিম নির্ঘোষের প্রত্যাশায় কাঠ হয়ে রইলাম কিছুক্ষণ।

কিন্তু কোনও শব্দ নেই। নিস্তব্ধ ঘরে কেবল আমার ফোঁপানি যেন শ্মশানপুরীর হাহাকার সৃষ্টি করে চলেছে। দু-হাত নামিয়ে মাথা তুললাম। অবাক হয়ে গেলাম ঈশানীকে দেখে।

ঈশানী কাঁদছে। চেয়ারের পেছনে মাথা হেলিয়ে দিয়ে কাঁদছে। রিভলভারের নলচে নির্মমভাবে চেপে ধরেছে চিবুকের নীচে।

'আপনিও...আপনিও...' ফুঁপিয়ে উঠল ও।

'ঈশানী!' আমার আর্ত চিৎকারে আমি নিজেই চমকে উঠেছিলাম। 'ঈশানী!' না...না...!' বলতে-বলতে ছিটকে গিয়েছিলাম চেয়ার ছেড়ে। এক, ঝটকায় ওর শিথিল মুঠি থেকে কেড়ে নিয়েছিলাম রিভলভার। ঈশানী হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল আমার ওপর। দু-হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে সেকি কান্না!

সেকেন্ডকয়েক গেল ওকে সামলাতে। অবশ্য রিভলভার হাতছাড়া করলাম না। সিধে হয়ে বসল ঈশানী। কান্নার ফাঁকে ফাঁকে যা বলল, তা সত্যিই মর্মন্তুদ।

দৈব সহায় না হলে এরকম কাকতালীয় বড় একটা ঘটে না। কী করে যে এ কাণ্ড, ঘটল, তা এখনও ভাবলে আমার অবাক লাগে। আমার অজান্তেই ওর এমন একটা টনটনে জায়গা ছুঁয়ে ফেলেছিলাম যে

নিমেষে ভেঙে পড়েছিল ঈশানী। হয়তো ঈশানীর করাল ব্যক্তিত্বের প্রভাব সাময়িকভাবেও আমাকে আচ্ছন্ন করেছিল। অলৌকিক ঘটনাও ঘটে। নইলে ওর মনের গোপন ক্ষতে এভাবে আমার হাত গিয়ে পড়বে কেন?

অদ্ভুত কাকতালীয়। ঈশানী নিজেই এই একই ব্যাধিতে ভুগছে। যেদিন ও আমাকে চিঠি লিখে, তার আগের দিন ডাক্তার ওকে যে প্রেসক্রিপশন লিখেছে, তারও অর্থ ছ'মাস পরে পাগলাগারদে গিয়ে মগজ পরীক্ষা করা। এই ছমাস খোলা বাতাসে ঘুরেও যদি ঈশানীর দুরারোগ্য ব্যাধির উপশম না ঘটে, তাহলে পথ ওই একটাই!

ঈশানী তাই বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। বছরের পর বছর নকল মদালসা থেকে একলাফে আসল মদালসা হবার প্ল্যানটা তখনি মগজে এসেছিল। এছাড়া বাঁচবার আর পথ নেই। প্রেসক্রিপশনের লিখনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানোর জন্যেই ও আমাকে মেরে আমার জীবনে প্রবেশ করতে চেয়েছিল। কিন্তু ভাগ্যের কি পরিহাস! আমিও সেই ব্যাধিতে আক্রান্ত? আমারও সেই শোচনীয় পরিণতি?

কাঁদতে কাঁদতে চোখ ফুলে উঠেছিল ঈশানীর। আমি আমার রুমাল দিয়ে ওর চোখ মুছিয়ে দিলাম। ও উঠে দাঁড়িয়ে ধরা গলায় বলল—'জানি না আর দেখা হবে কিনা। পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলাম। অভাবের যন্ত্রণা আর সইতে পারছিলাম না। কিন্তু নিয়তির চাইতে বড় আর কিছু নেই।'

সেই মুহূর্তে আমার মনটা কীরকম হয়ে গেল। যে মেয়েমানুষটা কিছুক্ষণ আগেই কসাইয়ের মতো আমার হৃদযন্ত্র স্তব্ধ করার পণ করেছিল, সহসা তার অসহায় চাহনি নিঃসীম অনুকম্পায় ভরিয়ে তুলল আমার অন্তর। আমি আর একটি কথাও বললাম না। হ্যান্ড-ব্যাগ থেকে ফাউন্টেন পেন আর চেকবই বার করে দশ হাজার টাকার একটা বেয়ারার চেক লিখে দিলাম ঈশানীকে।

ও চেক নিয়ে আমার আগেই বিদায় নিল। সজল চোখে শেষবার আমার পানে তাকিয়ে ধীরে ধীরে নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে। নোংরা শাড়ি ব্লাউজের আড়ালে ছ'মাসের পরমায়ু নিয়ে প্রেতচ্ছায়ার মতো অদৃশ্য হল নকল মদালসা—আমার তারকা জীবনের দুষ্টগ্রহ!

শিলাদকুমার সব শুনে অট্টহাসিতে ঘর কাঁপিয়ে তুলল।

—'এরকম সুপারফাইন ব্ল্যাকমেলিং এর আগে কখনো ঘটেছে বলে শুনিনি। ওগো কন্যে, তোমার কপাল ভালো, ঈশানী এখনো ফিল্মে নামেনি। নামলে কী কাণ্ড ঘটত বলো তো? তুমি আর এ তুমি হতে না।'

কথাটা একদম উড়িয়ে দিতে পারি না। কেননা ঈশানীর রিভলভারটা ব্লু-টেম্পলে এনেছিলাম। খুলেওছিলাম। কার্তুজের খুপরিতে একটা কার্তুজও পাইনি।

** 'রহস্য পত্রিকা'য় প্রকাশিত।*

নিয়োগ প্রথা

প্রথাটা নতুন কিছু নয়। অনেক প্রাচীন। নিয়োগ-প্রথার বহু নজির আছে ভারতের পৌরাণিক ইতিবৃত্তে। বিবাহিতা নারী পরপুরুষের সাহচর্যে সন্তানসম্ভবা হতে পারে এই প্রথায়।

পুরাণে যা আছে, তা কি সামাজিক কদর্যতা হতে পারে? বিদুর এবং পাণ্ডুর মতো ব্যক্তিরা যদি নিয়োগ প্রথা অনুযায়ী পরভৃত সন্তান হয়েও সমাজ শিহরামান হতে পারেন, তবে একালেও তা সম্ভব হবে না কেন?

ভয়ঙ্কর সেই অ্যাকসিডেন্টের পর থেকেই এ চিন্তা যেন উর্ণনাভের মতো জাল বুনে চলেছে আমার মগজে। চিন্তার জট যতই জটিল হয়েছে, নিয়োগ প্রথা ততই উঁকিঝুঁকি মেরেছে মস্তিষ্কের কোষে কোষে।

অভিশপ্ত সেই দুর্ঘটনায় মানুষ বাঁচে না। কিন্তু ভোগান্তি আমার কপালে আছে। নইলে বেঁচে গিয়ে মরে থাকব কেন?

ভাবছেন বুঝি হেঁয়ালি করছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, ও জিনিসটা আমার চরিত্রে নেই। তাই কাগজ কলম নিয়ে বসেছি বিচিত্র এই আত্মকাহিনি লিখতে।

পড়তে-পড়তে আপনার মনে হতে পারে উদ্ভট, অলীক, অবিশ্বাস্য। মনে হতে পারে, ভয়াবহ সেই দুর্ঘটনায় মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গিয়েছে আমার। তাই অসম্ভব কাহিনির অবতারণা করে ইন্ধন জোগাচ্ছি পঙ্গু কল্পনাকে।

পঙ্গু! সত্যিই আমি আজ পঙ্গু। কিন্তু কল্পনায় নয়। হাত-পা-চোখের মতো কোনও প্রত্যঙ্গও পঙ্গু নয়। পঙ্গু কেবল আমার পৌরুষ।

হ্যাঁ, আমার পৌরুষ। যে পৌরুষ প্রতিটি নারীর কাম্য। আজ তা অনুপস্থিত আমার মধ্যে। সংক্ষেপে বংশরক্ষায় আমি অক্ষম। বীজশূন্য আমার পুরুষ দেহ। তাই তো বলছিলাম, ভয়ঙ্কর সেই দুর্ঘটনা আমাকে নবজীবন দেয়নি—দিয়েছে জীয়ন্ত-মৃত্যু।

তা সত্ত্বেও বিয়ে করেছিলাম অলকানন্দাকে। কারণ অলকানন্দা এমনই মেয়ে যাকে দেখলেই বিয়ে করতে সাধ যায়। আমি প্রচণ্ড নাস্তিক। ঈশ্বর মানি না। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালের অস্তিত্ব স্বীকার করি না। কিন্তু শুধু আপনাকেই বলি, স্বর্গ বলে যদি সত্যিই কোনও দেবলোক থাকে এবং সেখানকার দেবসভায় উর্বশী কি তিলোত্তমাকে বিউটি-কনটেস্টে টেক্কা দেওয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে স্বচ্ছন্দ্যে আমার বউ অলকানন্দাকে আপনারা নিয়ে যেতে পারেন। ইন্দ্র প্রমুখ বহু সৌন্দর্য-রসিকের মুন্ডু ঘুরিয়ে দেবার মতো রূপ নিয়ে মর্ত্যেই জন্মগ্রহণ করেছিল মানবী অলকানন্দা।

তবে হ্যাঁ, এই মুহূর্তে তাকে খুঁজে পাওয়াই মুশকিল। কেন, তা বলার জন্যেই এই উদ্ভট আত্মকাহিনির অবতারণা।

অলকানন্দার জন্ম গরীবের ঘরে। কিন্তু আমার আবির্ভাব অতি ধনী পরিবারে। সেইসঙ্গে ছিল আমার প্রয়াস এবং নাস্তিকতাবাদ। আমার বিশ্বাস, প্রকৃত নাস্তিক না হলে খাঁটি অসৎ হওয়া যায় না। আমার বিবেকেও ও সবের বালাই নেই।

ফলে যাবতীয় অপকর্মে আমি হাত পাকিয়েছি। বিবেককে টাকার আফিং খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি। তা না হলে পৌরুষহীন হয়েও অলকানন্দাকে বিয়ে করলাম কী করে?

টাকার জোরে তো বটেই। মেয়েদের চরিত্র যতই দুর্জ্ঞেয় হোক না কেন, একটা ব্যাপারে তারা অতিশয় অকপট। সেটি হল অর্থ। রৌপ্যমুদ্রার পর্বত এদেরকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে।

তাই অতি সহজেই অলকানন্দা আমার ঘরনী হল। জেনে শুনেই হল। তার নারী জীবনের চরম সাধ মেটাতে আমি অপারগ জেনেও হাসিমুখে সে বরমাল্য দিল আমার গলায়। চোখে চোখ রেখে হেসেও ফেলল।

আরও আছে। অলকানন্দা আমার চাইতে কত বছরের ছোট জানেন। তিরিশ বছরের। আমি পঞ্চাশ ছাড়িয়েছি। কোথায় বানপ্রস্থ অবলম্বন করব, তা না পাণিপীড়ন করে বসলাম অলকানন্দার। হঠাৎ ওকে চোখে পড়ায় মাথার মধ্যে যেন দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। সারা জীবনে অনেক মেয়ে মানুষ ঘেঁটেছি। কিন্তু এমন আহা মরি রূপ তো দেখিনি।

প্রেম? উঁহু। এ শর্মার অন্তর পাথর দিয়ে বাঁধানো। এ সব মেয়েলী ছেনালীপনা আমার আসে না। প্রেম-টেম নয় মশায়। বড়লোকের সংগ্রহবাতিক বলতে পারেন। হীরে মুক্তোর মতো দামি দুষ্প্রাপ্য জিনিস দেখলেই ছোঁ মেরে এনে কোষাগারে রাখার বদখেয়াল। এ খেয়াল আমারও আছে। কারণ আমি বড়লোক। অর্থের জাদু বলে সমাজের শীর্ষস্থানীয়। কাজেই ঠাটবাট বজায় রাখার জন্যে একজন অনিন্দ্য সুন্দরী প্রয়োজন বই কি।

অলকানন্দাকে সংগ্রহ করলাম সেই কারণেই। দামি দামি ফার্নিচারের মতোই তাকে সাজিয়ে রাখলাম আমার সাজানো ঘরে। কেউ মুগ্ধ হল, কারো চোখ টাটাল, কেউ ঘনঘন যাতায়াত আরম্ভ করল আমার প্রাসাদে।

আমি কিন্তু নির্বিকার রইলাম। বিকার দেখিয়েই বা লাভ কি আমার? ভোগস্পৃহা থাকলেও ভোগক্ষমতা তো আমার নেই।

কিন্তু অলকানন্দার ছিল। অলকানন্দা বিশ বছরের পূর্ণ যুবতী। আজন্ম দারিদ্র্য ভোগ করার পর সহসা ঐশ্বর্যের আলোয় তার চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছে। ভোগ-কামনার সকল উপাদানই তিলতিল করে প্রলুব্ধ করেছে তাকে।

না, না, আপনারা যা ভাবছেন, এ গল্প সে গল্প নয়। ভাবছেন এরপর সব সংসারে যা হয় এ সংসারেও বুঝি তাই হল। অলকানন্দা যুবক প্রেমিক সংগ্রহ করে হয় চম্পট দিল, অথবা, ভোগের পথে গা ভাসালো।

কিন্তু অলকানন্দা সে সবের ধার দিয়েও গেল না। সে দরিদ্র ছিল বটে, কিন্তু বুদ্ধিহীনা ছিল না। সে জানত ওসব পিচ্ছিল পথে একবার পা দিলে সামলানো বড় মুশকিল। আমাকে ছাড়া যায়, কিন্তু আমার বিপুল বৈভবকে হাত ছাড়া করা যায়?

ওই যে বললাম, নারীজাতি যতই দুর্জ্ঞেয় হোক, একটি বিষয়ে তারা নেহাতই অকপট। সেটি অর্থ। তারা সব ত্যাগ করতে পারে, পারে না কেবল অর্থ। কারণ, এই অর্থর বনেদেই তো সংসার। অর্থ থাকলেই প্রেম থাকে, কর্তব্য থাকে, সংসারেও টান থাকে।

পাঠিকারা নিশ্চয় ভ্রূকুঞ্চন করছেন। মুণ্ডপাতও করছেন। কিন্তু আত্মকাহিনিতে মিথ্যে বলতে নেই। আমার কথা আমি বলে যাই। সত্যি মিথ্যে বিচারের ভার আপনাদের।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। অলকানন্দা কোনওদিন তার যৌবনের ক্ষুধা নিয়ে অশান্ত হয়নি। অস্থির হয়নি। বাইরে মন দেয়নি।

তাই ধীরে ধীরে আমার মনের মধ্যে যে চিন্তাটার অঙ্কুর দেখা দিল, তা আমি আত্মকাহিনির গোড়াতেই বলেছি।

নিয়োগ-প্রথা। পুরাকালে যা ঘটেছে। একালে তা ঘটবে না কেন? পরপুরুষের বীজ গ্রহণ করে নারী সন্তানবতী হয়েছে সেকালে—একালে হলে দোষ কি? হলেই বা পরভৃত সন্তান। আমার বিপুল বৈভবের একজন উত্তরাধিকারী তো প্রয়োজন।

তাছাড়া পুরাণ তো আমাদের শেখায়। সমস্যায় সুরাহার পথ দেখায়। নিয়োগ-প্রথাও কি আমার পারিবারিক জীবনে সমাধানের পথ নয়? স্ত্রী-কে সন্তানবতী করা অপারগ স্বামীর পক্ষেও সম্ভব এবং সে বিধান তো প্রাচীন পুরাণেই রয়েছে।

পাঠক-পাঠিকার মধ্যে যাঁরা মনোবিজ্ঞান নিয়ে চর্চা করেন, তাঁরা বোধকরি অন্য সন্দেহ করে বসেছেন। ভাবছেন, আমি Sadist। বিকৃত রুচির দাস। নইলে ঘরের বউকে নিয়োগ-প্রথার রাস্তা দেখাবো কেন?

আবার বলি, আত্মকাহিনীতে মিথ্যে বলতে নেই। তাই বলি, এজাতীয় একটা কেতাব অনেকদিন আগে আমার হাতে এসেছিল। নানারকম বিকৃতি আর অপরাধের ঘটনা পড়তে মন্দ লাগেনি। শুনেছি, তরুণী ভার্যাদের অনেক বৃদ্ধ উৎসাহিত করে তরুণমহলে গা ভাসাতে। গোপনে সেই দৃশ্য দেখে নাকি আবেশে বিহ্বল হয়ে পড়ে অক্ষম স্বামী পুঙ্গবরা।

মিথ্যে বলব না। নিয়োগ-প্রথার কল্পনা ঠিক এই জাতীয় না হোক, বিচিত্র একটা অনুভূতি বারংবার জাগ্রত করেছে আমার সর্বদেহে। আমি পঙ্গু। আমি নির্বীজ। কিন্তু যখনি অন্তরের কন্দরে লালন করেছি নিয়োগ প্রথার সুখাবহ চিন্তাকে, মনের সিনেমায় ছবি দেখেছি অলকানন্দার স্বেদসিক্ত আবেশ বিহ্বল তন্বীরূপকে, তখনি প্রতিটি লোমকূপে অদ্ভুত একটা শিহরন অনুভব করেছি। অনাস্বাদিতপূর্ব এ শিহরণের ব্যাখ্যা আমি জানি না। কিন্তু এ রোমাঞ্চর সঙ্গে যেন তুলনা হয় না কোনও কিছুর।

বিকৃতি? হতে পারে। কথায় বলে, কানা, খোঁড়া, কুঁজো—তিন চলে না উজো। মানে, এই তিন পঙ্গু কখনো সোজা পথে চলে না। আর আমার মতো পঙ্গু বেঁকা পথে চলব, এ আর আশ্চর্য কি। দেহ-বিকৃতি থেকেই যে মন-বিকৃতি।

সে কথা থাক। অলকানন্দার কোল জোড়া হবে, অলকানন্দা সুখী হবে, আমার উত্তরাধিকারী আসবে, এই কল্পনাই হয়তো বিচিত্র সুখানুভূতিতে আমার মগজ ভরিয়ে তুলত—এমন একটা ব্যাখ্যাও তো হতে পারে?

তাই নিয়োগ-প্রথার কল্পনা প্রতিবারই আনন্দ দিয়েছে আমাকে। উন্নাসিক ব্যক্তিরা হয়তো শিউরে উঠবেন। ছিঃ ছিঃ, এ যে সামাজিক কদর্যতা।

কিন্তু আমি মানুষটাই যে কদর্য। বাইরে নয়। বাইরে আমি সুপুরুষ, মহান এবং উদারচেতা। কিন্তু আমার ভেতরে যে কদর্যতা মৌচাকের মতো বাসা বেঁধে আছে। সংসারে হেন কদর্য কাজ নেই, যাতে আমি হাত পাকাই নি। সুতরাং, নিয়োগ-প্রথার কল্পনা আমাকে উল্লসিত করবে, এইটাই হয়তো স্বাভাবিক।

সব চাইতে আশ্চর্য কী জানেন? আমি কদর্য হতে পারি, কিন্তু অলকানন্দা নিশ্চয় নয়। সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। অতএব তার মতো ডানাকাটা রূপসীর ভেতরটাও দেবীজনোচিত হবে—এইটাই কি আপনারা ধরে নিয়েছেন।

আশ্চর্য সেইখানেই। অলকানন্দাকে নিয়োগ-প্রথার প্রস্তাব বেশিক্ষণ বুঝাতে হয়নি। যুক্তিতর্কের জাল বিছিয়ে বসেছিলাম ওর মস্তিষ্কধোলাই করব বলে। নিয়োগ-প্রথার দাওয়াই গুলে না খাওয়ালে সাড়া দেবে কেন মেয়েটা?

হায়! হায়! কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, অলকানন্দা আমার চাইতেও স্মার্ট। প্রথমে হাঁ করে শুনছিল। তারপর চোখ কপালে তুলে মুখখানা সিঁদুরের মতো লাল টকটকে করে ফেলল। তারপর ফিক করে হেসে ফেলে বললে—'যাঃ!'

আমি আবার সেই শিহরণটা অনুভব করলাম মেরুদণ্ডের উপর থেকে নীচ পর্যন্ত। ওকে বুকের কাছে টেনে নিলাম। তুলতুলে গালদুটো টিপে দিলাম। কালো জামের মতো কালো-কালো চোখ দুটোর পানে তাকিয়ে নিবিড়কণ্ঠে বললাম—'ঠাট্টা নয় অলকানন্দা। মহাভারতে যা আছে, তা কি খারাপ?'

বলে, আবার বোঝাতে শুরু করলাম কীভাবে বিদুর পাণ্ডু এবং আরও অনেকে পরভৃত সন্তান। এই ভারতবর্ষের পুণ্য মাটিতে যুগ-যুগ ধরে চলে এসেছে নিয়োগ-প্রথা। বহু পুণ্যবতী সন্তানবতী হয়েছে এই প্রথায়। মোটেই ক্ষুণ্ণ হয়নি সতীত্বের আদর্শ। কেন হবে? পতির নির্দেশেই তো পরপুরুষের সঙ্গসুখ গ্রহণ করেছে। পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা...

ছলনা জিনিসটা নাকি মেয়েদের একচেটিয়া। সুতরাং অলকানন্দাও যৎসামান্য ছলনা করল বইকি। সতীত্বপনা না দেখালে স্বামীর মন রাখা যায় না যে। তা ছাড়া, এ প্রস্তাব অলকানন্দার কাছে মেঘ না চাইতেই

জল পাওয়ার সামিল। ঐশ্বর্য, স্বামী কোনওটাই হাত ছাড়া হচ্ছে না। কিন্তু হাতের মুঠোয় আপনা হতে এসে যাচ্ছে একটা বাড়তি সুখ।

দেহসুখ।

কাজেই রাজি হল অলকানন্দা। ঠিক হল দয়িত নির্বাচনের ভার অলকানন্দার। বল্লভবরণ করবে সে কেবল সন্তানবতী হওয়ার জন্যে—তারপর আর কোনও সম্পর্ক থাকবে না।

সাধারণ গৃহস্থের কাছে এ জাতীয় দাম্পত্যচুক্তি সত্যিই কল্পনাতীত। রক্ষণশীল পাঠক-পাঠিকা নিশ্চয় এই মুহূর্তে আমার মুখে নিষ্ঠাবান ত্যাগ করতে পারলে পরম উল্লসিত হতেন। কিন্তু আমি নিরুপায়।

তা ছাড়া অলকানন্দার কথাটা ভাবুন। আমার অতি কদর্য প্রস্তাব সে ফেলতে পারেনি। সাদরে গ্রহণ করেছে। যৌবন-নিপীড়িত দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণু দিয়ে ভোগ করেছে।...তারপর!

তার পরের কথা পরে বলব।

আপাতত শুনুন অলকানন্দার কাহিনি। আমি তাকে গ্রীন সিগন্যাল দেবার পর অলকানন্দা প্রজাপতির মতোই উড়তে শিখল। তার ওড়ার বিবরণ মাঝে মাঝে কানেও এল। কিন্তু আমি কর্ণপাত করলাম না, বরং সেই গোপন শিহরণে রোমাঞ্চিত হলাম। রঙিন সে সব কাহিনি দিয়ে এ কাহিনি ভরাতে চাই না। অলকানন্দা রূপসী, অলকানন্দার স্বামী ধনবান, অলকানন্দা সমাজের শীর্ষস্থানীয়া— সুতরাং অভাব ঘটল না মধুমক্ষিকা বাহিনীর। অলকানন্দা পরমানন্দে বিভোর হল।

এই গেল আমার আত্মকাহিনি প্রথম পর্ব। এবার শুনুন দ্বিতীয়পর্ব।

অলকানন্দা যথারীতি পার্টিতে গিয়েছে। আমি সারাদিনের কাজকারবার সেরে বাড়ি ফিরেছি। রোজকার অভ্যেস মতো সুরার পাত্র নিয়ে বসেছি। সারা পৃথিবী চষে আনা সেরা সেরা মদিরা পাবেন আমার আলমারিতে। নেমন্তন্ন রইল। যে দিন খুশি আসতে পারেন।

খুব মন দিয়ে একটা নতুন ককটেল পাঞ্চ করছিলাম। পাঁচরকম সুরা মিশিয়ে, তাতে বরফখণ্ড ভাসিয়ে, বিটার আর লেমনজুসের ছিটে দিয়ে অপূর্ব এক গেলাস ককটেল বানালাম। এক চুমুক টেনে এত ভালো লাগল যে 'আঃ' ধ্বনিটা পরম আমেজেই বেরিয়ে এল সরল কণ্ঠ দিয়ে।

ঠিক তখনি পেছন থেকে কে যেন বললে—'হয়েছে? এবার ফিরুন। আর কতক্ষণ দাঁড়াবো?'

মিথ্যে বলব না। আচমকা কণ্ঠস্বর আমাকে রীতিমতো চমকে দিয়েছিল। কিন্তু কি জানেন, গুরুর দয়ায় আমার মন চমকালেও বাইরেটা কখনো চমকায় না। তাই ধীরস্বরে পেছন ফিরলাম।

ফিরে দেখলাম, একটা কিম্ভূতকিমাকার মানুষ দাঁড়িয়ে আমার পাঁচ হাত পেছনে। হাতে একটা রিভলভার।

লোকটাকে কিম্ভূতকিমাকার বললাম অন্য কারণে। আজকাল কি এক ফ্যাশান হয়েছে মোটা মোটা জুলপি রাখার। মানাক আর না মানাক, মুখ সরু হোক কি চেহারা লিকপিকে হোক—জুলপি রাখতেই হবে। জুলপিধারী ভাবে না জানি কি খোলতাই হয়েছে মুখশ্রী। আর আমি ভাবি, চিড়িয়াখানার বনমানুষ, না, সার্কাসের সঙ?

তা, সেদিন যা দেখলাম, তাকে জুলপি না বলে গালপাট্টা বলা উচিত। দু-গাল জুড়ে ইয়া মোটা দাড়ি। চিবুকে একটাও চুল নেই। গোঁফও নেই। চুলের বহর কেবল দু-গালে। ফুলো ফুলো গাল। মাথার মাঝখানটা গড়ের মাঠের মতো পরিষ্কার। কানের ওপর কয়েকগাছি চুলের সংখ্যা গুনে বলা যায়। সার্সির কাচে নাক চেপে ধরলে ডগাটা যেরকম বিচ্ছিরি থ্যাবড়া দেখায়, এর নাসিকাগ্রও তাই। চোখ দুটোতে ডাহা বোকামি মাখানো।

এহেন মানুষকে কিম্ভূতকিমাকার বলব না তো কাকে বলব?

বোকা হোক, গাধা হোক, সঙ হোক, বিদঘুটে হোক—একটা বিষয়ে আনাড়ি নয় আগন্তুক। রিভলভার ধরার কায়দা দেখলেই মালুম হয়, জিনিসটা ও হাতে ভালোই চলে। আগুন নিয়ে খেলাটা যেন জলভাত তাঁর কাছে।

তাই একটু ভাবিত হলাম বইকি। যার চোখে ডাহা বোকামি মাখানো, চেহারাখানা গালফুলো গোবিন্দমার্কা, তার হাতে মানুষ মারার যন্ত্র বিপজ্জনক নয় কি?

কিন্তু ওই যে বললাম গুরুর দয়া। তাই ভাবনাটাকে চোখের ধারে কাছেও ঘেঁষতে দিলাম না। বরং একটু মোলায়েম হাসলাম। গেলাস দুলিয়ে ককটেল মেশাতে লাগলাম। ফলে, কাচের গেলাসে বরফ লাগায় টুং টাং বাজনা বাজতে লাগল। মিষ্টিচোখে এমন ভাবে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলাম নাড়ুগোপাল আগন্তুকের যেন কন্দর্পকান্তি উত্তরমকুমারের আবির্ভাব ঘটেছে আমার সামনে।

আর একটা চুমুক দিলাম গেলাসে। না, মশাই না। হাত কাঁপেনি। কাঁপবে কেন? কুকাজে আমিও কি কমপোক্ত?

ধীরে সুস্থে বললাম—'কী ব্যাপার? খুন করা হবে নাকি আমাকে?'

গালপাট্টাধারী ফ্যাসফেসে গলায় বললে—'তবে না তো কি জামাই আদর করব?'

'বেশ, বেশ,' বলে, ফের চুমুক দিলাম তারিয়ে তারিয়ে। তারপর মিষ্টি মিষ্টি করে বললাম— 'কেন মরবো, সেটা না জেনে মরাটা কি ঠিক হবে? কে পাঠিয়েছে?'

গালপাট্টার মুখের আর কোনও কথা নেই। রিভলভারের নলচেটা অবশ্য আমার বুকের দিকেই ফেরানো। নলচের অন্ধকার গর্তের সঙ্গে কেন জানি না পাতালের সুড়ঙ্গর সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছে হল। জগতে পাপপুণ্য বলে কোনও বস্তু যদি থাকে, পরকালের অস্তিত্ব যদি মেনে নিতে হয়। তাহলে পাতালের পথই তো আমার পথ। নরকের কুণ্ডই তো আমার শেষ পরিণতি। কীর্তির কাহিনি আজ শোনাতে বসেছি।

আবার বললাম—'তোমার নাম জানি না। ভাই মস্তান, বলেই ডাকা যাক। রাগ করলে নাকি? করলেই বা কি। করলেও গুলি করবে। না করলেও গুলি করবে। শোনো মস্তান, আমার শত্রুদের নাম আমি জানি। আমি পটল তুললে লাভ কার-কার, তাও জানা। তাই অনুমান করতে পারি, কার ভাড়া খাটছো তুমি। বলব?'

গালপাট্টা নীরব।

'আমার বউয়ের,' বললাম আমি। হাসিমুখেই বললাম। অবাক কাণ্ড তাই না? আরে মশাই, গালপাট্টা নিজেও তাজ্জব বনে গেল আমার হাসি দেখে, আমার ঠান্ডা মাথায় কথা বলা দেখে। বেচারী জানবে কী করে যে বাঁদুরে বুদ্ধিতে জুড়ি নেই আমার?

তাই সেকেন্ড কয়েক হাঁ করে তাকিয়ে রইল গালপাট্টা। তারপর ফুলো গালে টোল ফেলে ফ্যা-ফ্যা করে হেসে ফেলল। 'ধরেছেন ঠিক। কেন জানেন?'

'কেন আবার। আমার টাকা।'

গালপাট্টার বোকা বোকা চোখেও এবার যেন একটা বিরাট কৌতুক দেখা গেল—'শুধু তাই?'

'আবার কি?'

'মশায়ের বয়সটা খেয়াল আছে?'

'তা আছে বইকি। এ বছরের বসন্তকালে বাহান্ন হবে।'

'বসন্ত!' বলে, এমন একটা নোংড়াচুমকুড়ি ছাড়ল গালপাট্টা যে এই প্রথমে একটু রাগ হল আমার। ছেড়ে বলল—'বউটার বয়স কত?'

'বাইশ।'

'আই-আই!' আবার সেই হলদে হাসি ইডিয়ট! 'বাহান্নর সঙ্গে বাইশ। আর কি চান স্যার? শুধু—এই দোষেই তো নেড়িকুত্তা দিয়ে খাওয়ানো উচিত আপনাকে। বুড়ো বয়েসে মেয়ের বয়সি মেয়েকে নিয়ে শুতে লজ্জা করে না?'

মহাবাচাল খুনে তো। রিভলভারটা হাতে না থাকলে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াতাম শূয়ারকে। তাও তো আসল ব্যাপারটা জানে না হতভাগা। আমি ঢেঁড়া পুরুষ—একথা জানা থাকলে না জানি কি খিস্তিটাই শুনতে হত।

ককটেলটা মন্দ মেশেনি। আর এক চুমুক খেলাম। জিভ দিয়ে ঠোঁট মুছে নিয়ে বললাম—'মস্তান, কথাটা খাঁটি বলেছো। বছর খানেক পরে ডাইভোর্স করার প্ল্যান নিয়ে বিয়েটা করেছিলাম। রফা একটা করতাম। মোটা টাকার রফা।'

গালপাট্টা বলল—'চেখে চেখে বেড়ানোর সখ আছে মনে হচ্ছে?'

'টাকা থাকলেই থাকে। আমার টাকা আছে, মেয়ে মানুষের সখ আছে। মদ খাওয়ার সখ আছে। কিন্তু মরবার সখ নেই।'

'সখ আপনার ডবকা বউটারও আছে। ফূর্তির সখ। দেখেননি কেন অ্যাদ্দিন?'

আমি মিশমিশে রিভলভারের অন্ধকার ফুটোর দিকে চেয়ে বললাম—'মস্তান, জীবনে ক'টা খুন করেছ?'

'ডজন ডজন।'

'ফাইন। খুন করাটা কারো পেশা, কারো নেশা। তোমার কোনটা?'

'নেশা। ভীষণ আলো লাগে খুন করতে।'

সুরার নেশায় চোখে রং ধরলেও মন আমার হুঁশিয়ার। ওই একটা কথার মধ্যেই গালপাট্টার চরিত্র জানা হয়ে গেল আমার। সেকেন্ড। কয়েক নির্নিমেষে চেয়ে রইলাম ওর নির্বোধ কিন্তু অটল চাহনির পানে।

তারপর হেসে বললাম—'দু-মিনিট তো হয়ে গেল হে। গুলি করো।'

'করব, করব। তাড়াহুড়ো করলে ভাল্লাগে না।'

'তাই বলো। তিলে তিলে মারতে চাও। সেইটাই তোমার আসল আনন্দ, ঠিক কিনা?'

'ওরে আমার গণৎকার রে।'

'গণৎকার নয় হে। রতনে রতন চেনে। যাক, তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে কী? না, আমি যতক্ষণ না ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তোমার পায়ে ধরছি, ততক্ষণ আমাকে জীইয়ে রাখবে।'

'তাতো বটেই, তবে তারও একটা সীমা আছে তো।'

'তা আর বলতে। লোহার নার্ভকে টলানো যায় না। বরং গুলি করা ভালো। যাক, এক গেলাস চলবে নাকি?'

'চলবে। তবে আমার সামনে ঢালুন গেলাস।'

'সাবাস মস্তান। হুঁশিয়ার খুনে তুমি ভাবছ বিষ মিশিয়ে দেব?'

'দিতেও তো পারেন।'

কথা বাড়ালাম না। আর এক গেলাস ককটেল পাঞ্চ করলাম ওর সামনেই। গালপাট্টা কড়া নজর রাখল আমার নড়াচড়ার ওপর। বেচাল দেখলেই ট্রিগার টিপতে দ্বিধা করবে না।

বরফ ভাসিয়ে এগিয়ে দিলাম গেলাস। হাত বাড়িয়ে গেলাস ধরল না মস্তান। বলল—'টেবিলে রাখুন। ঠিক আছে। চেয়ারে বসুন।'

আমি বসলাম। মস্তান এগিয়ে এল। গেলাস নিয়ে বসল ইজি চেয়ারে। এক চুমুকে না খাওয়া পর্যন্ত কোনও কথা বললাম না।

এক চুমুকেই মেজাজ শরিফ হবে জানতাম। এ জিনিস মস্তানের চোদ্দো পুরুষও খেয়েছে কিনা সন্দেহ।

তারপর বললাম—'অলকানন্দা এখন কোথায়?'

'কে?'

'অলকানন্দা। আমার বউ।'

'পার্টিতে। ডজন খানেক ছেলেবন্ধু নিয়ে হয়তো ঢলাঢলি করছে এই মুহূর্তে। দেখলেও ভালো লাগে। তা না আপনি...বুড়োহাবরা...।'

'তার মানে, আমি যখন গুলি খাব, অলকানন্দা তখন পার্টি নিয়ে মশগুল।'

'কষ্ট হচ্ছে?'

'মোটেই না। ভাবছি প্ল্যানটা ফাইন। ডজনখানেক ইয়ার সাফাই দেবে ওর হয়ে। পুলিশ অলকানন্দার ডগাও ছুঁতে পারবে না।'

'ঠিক ধরেছেন। বুদ্ধিটা আমার।'

গোবর গণেশের বুদ্ধি! মনে মনেই বললাম আমি। মুখে বললাম—'ব্রিলিয়ান্ট প্ল্যান।' পুলিশ আসবে। আমার ঝাঁঝরা লাশ দেখবে। দেখে কী বলবে? খুনে-ডাকাতের কাণ্ড? তাই তো?'

'তা তো বটেই,' গেলাসটা সামনের ককটেল টেবিলে রাখল মস্তান।

'আপনার হার্টটা ফুটো করবার পর গেলাসটা ধুয়ে রেখে দেব মদের আলমারিতে। আমার আঙুলের ছাপ যেখানে লেগেছে, যাবার আগে সব মুছে দিয়ে যাব রুমাল দিয়ে। লেগেছে তো শুধু দরজার হাতলগুলোয় আর এই গেলাসে।'

'দামি দামি দু-চারটে জিনিস সঙ্গে নেবে নিশ্চয়? নইলে পুলিশ বলবে কেন ডাকাত পড়েছিল?'

'ও সব ছ্যাঁচড়ামোর মধ্যে আমি নেই। কিছুই নেবো না আমি। পুলিশ ভাববে, ভয়ের চোটে পালিয়েছে ডাকাত। গুলি করেই এমন প্যানিক হয়ে ছিল যে জিনিস নেবার সময় পায়নি।'

দেওয়ালের ছবিটা দেখে নিল মস্তান।

'ন্যাংটা ছবি,' ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিয়েই বলল।

'ফ্রান্সের নামকরা পেন্টারের আঁকা ছবি। দাম কত জানো?'

গালপাট্টা নীরব।

'চল্লিশ হাজার টাকা,' বললাম আমি।

শুনেই, গালপাট্টার নির্বোধ চাহনি চকিতের জন্যে ফের নিবদ্ধ হল অয়েল পেন্টিংয়ের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে পিচ্ছিল চাহনি পিছলে ফিরে এল আমার ওপর।

বলল—'লোভ দেখাচ্ছেন? চল্লিশ হাজার টাকা চাট্টিখানি কথা নয়। তবে কি জানেন, আগে আমার জান, পরে টাকা। ছবি নিয়ে ফ্যাসাদে পড়ি আর কি। ও ছবি যেখানে নিয়ে যাবো, আপনার চিহ্নও সঙ্গে সঙ্গে যাবে, তারপর? ফাঁসি কাঠ? না, স্যার না।' একটু থামল গালপাট্টা। হাসল। টোল পড়ল ফুলো গালে—'বুঝেছি।'

'কী বুঝেছি।'

'ছবি দিয়ে প্রাণটা ফেরত চাইছেন?'

'ক্ষতি কি?'

গালপাট্টা সবেগে ঘাড় নাড়ল বাচ্চা ষণ্ডের মতো—'দেখুন স্যার, খুন করাটা আমার ব্যবসা। ব্যবসায় বেইমানি করলে আর কেউ কাজ দেবে?'

শূন্য গেলাসটা নামিয়ে রাখলাম ককটেল টেবিলে। ঠান্ডা গলায় বললাম, 'মস্তান, কি চাও তাহলে? ভয়ে কাঁপছি দেখলে খুশি হবে?'

'কাঁপতে আপনাকে হবেই। ঢের ঢের হেঁক্কর দেখেছি। শেষকালে তো কেঁদে কুল পায় না।'

'কাঁদলেই গুলি করবে বুঝি?' ঈষৎ শক্ত হল গালপাট্টার বোকা চাহনি—'কেন মিছে কেরদানি দেখাচ্ছেন? বুক তো ঢিপ ঢিপ করছে। এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন কলির ভীম আর কি।'

'বাঃ, বেশ গুছিয়ে বলো তো মস্তান। দেখে তো বোঝা যায় না এত কথা পেটে আছে। যাক, তুমি কি ভাবো তোমার হুমকি শুনেই ভ্যাঁ করে কাঁদবো?'

'ভ্যাঁ না করলেও চ্যা তো করবেন। মরার আগেই আধখানা প্রাণ বেরিয়ে আসবে। কত তালেবরকে কাত করলাম এইভাবে।'

'সর্বস্ব দিয়েও কেউ যদি প্রাণ ভিক্ষা চায়?'

'বৃথা।'

'মানুষ হিসেবেও তো মানুষকে দয়া করা যায়?'

'আমি অমানুষ। আমার ছেলেবেলায় আমাকে কেউ দয়া করেছিল? মানুষের মতো কেউ বাঁচতে দিয়েছিল?'

'মস্তান, ছবিটা আর একবার দেখো। ছবির পেছনে কি আছে জানো?'

'বলুন না।' ঘাড় না ফিরিয়েই বলল মস্তান।

'দেওয়াল সিন্দুক।'

গালপাট্টা ঘাড় ফিরালো না।

'নগদ দেড়লাখ টাকার নোট পাবে সিন্দুকে।'

'দেড়লাখ!'

'হ্যাঁ, দেড়লাখ। সারা জীবনেও যা রোজগার করতে পারবে না।'

বলে, গেলাস হাতে নিয়ে আমি উঠে দাঁড়ালাম। গেলাম অয়েল পেন্টিংয়ের সামনে। গোপন বোতাম স্পর্শ করতেই কব্জার ওপর ঘুরে গেল অতবড় ছবিটা যেন দরজার পাল্লা।

দেওয়াল সিন্দুকের ঠিক মাঝখানে নম্বরী হাতল। পাক দিলাম গুনে গুনে। সিন্দুক খোলার কোড নম্বর আমি ছাড়া কেউ জানে না। অলকানন্দাও নয়।

খট করে আওয়াজ হল। সবুজ আলোটা জ্বলে উঠেছে। অর্থাৎ চিচিং ফাঁক। আলিবাবা আর চল্লিশ দস্যুর সেই রত্নগুহার দ্বার যেন উন্মোচিত।

হাতল ধরে টান দিলাম। নীচের খুপরি থেকে বার করলাম বড় খামটা। হাতের গেলাসটা রাখছিলাম সিন্দুকের ভিতরে। পাল্লা বন্ধ করে নম্বরী হাতল ঘুরিয়ে দিতেই পুট করে নিভে গেল সবুজ আলোটা। যার অর্থ, সিন্দুক বন্ধ হয়ে গেছে। কামান দাগলে যদি খোলে।

ফিরে দাঁড়ালাম। দেখি, পলকহীন চোখে আমার প্রতিটি মুভমেন্ট লক্ষ্য করছে গালপাট্টা। তর্জনী চেপে বসেছে মিশমিশে হাতিয়ারের ট্রিগারে।

বিচলিত হলাম না। এগিয়ে এসে খামটা ফেলে দিলাম ওর সামনে।

কিছুক্ষণ যেন বোবা হয়ে রইল গালপাট্টা। তারপর ফ্যাসফেসে গলায় বললে—'কিনতে চান আমাকে?'

সিগারেট কেস তুলে নিয়ে একটা সিগারেট বাছলাম অনেকক্ষণ সময় নিয়ে। তারপর গম্ভীর গলায় বললাম—'না।'

'তবে টাকা আনলেন কেন?'

'একেবারেই উচ্ছন্নে যে যায়, তাকে টাকা দিয়েও কেনা যায় না।'

'টাকার খাম আনলেন কেন তাহলে? কঠিন স্বর গালপাট্টার।

জবাব দিলাম না। লাইটার টিপে সিগারেট জ্বালালাম। একমুখ ধোঁয়া সিলিং লক্ষ্য করে ছাড়লাম। তারপর খামটা তুলে উপুড় করে ধরলাম ককটেল টেবিলের ওপর।

ভেতরে থেকে যা বেরুল, তা নোটের তাড়া নয়—কাগজের তাড়া।

'বোগাস পেপার,' ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট নাচিয়ে নাচিয়ে বললাম একই রকম গম্ভীর গলায়। সেই সঙ্গে লক্ষ্য করলাম যেন একটা ধাক্কা খেল গালপাট্টা। নির্বোধ চাহনিতে এই প্রথম দেখলাম ইস্পাতের ছুরি।

'খানিকটা সময় নিলেন বুঝলাম,' আরক্ত মুখ মস্তানের। 'কেন?'

'তোমার গেলাসটা রেখে এলাম সিন্দুকের ভেতর। টাকা আনার অছিলা না করলে পারতাম না।'

'ওটা আপনার গেলাস—আমার নয়।'

আবার হাসলাম আমি—'নাহে, ওটা তোমারই গেলা। পুলিশ এসে যখন দেখবে, ফাঁকা সিন্দুকে শুধু একটা খালি গেলাস, টনক নড়বেই। আঙুলের ছাপও নেবে। কারণ, খুনের তদন্তে মদের গেলাস থাকাটার মানে অনেক।'

চোখ ছোট করে তাকিয়ে রইল গালপাট্টা—'অসম্ভব। সমানে নজর রেখেছি আপনার ওপর। গেলাস সরাতেই পারবেন না।'

আবার হাসলাম আমি—'বার দুয়েক ছবিটার দিকে ঘাড় ফিরিয়েছিলে মনে আছে?'

'সে তো দু-এক সেকেন্ডের জন্যে।'

'দু-এক সেকেন্ডেই যথেষ্ট। গেলাস পাল্টাপাল্টি করতে কতক্ষণ লাগে?'

'অসম্ভব' দেখলাম, কপালে ঘামের আভাস দেখা দিয়েছে গালপাট্টার।

বললাম—'পুলিশ আসবে। গেলাসও পাবে। আঙুলের ছাপের ছবি উঠবে। তোমার ঠিকানাও মিলবে। তারপর? যথা সময়ে দুলবে ফাঁসির দড়িতে। পরকালে ফের দেখা হবে আমাদের। তখন না হয় শোনা যাবে ফাঁসিকাঠে দাঁড়ানোর যন্ত্রণা কাহিনি। এর চাইতে গুলি খেয়ে মরা ভালো, তাই না? ভালো কথা, ফাঁসিতে ঝোলার গল্প-টল্প এর আগে শুনেছ?'

মস্তানের তর্জনীর দিকে নজর গেল। আঙুল কাঁপছে। আঙুল চেপে বসেছে ট্রিগারের ওপর।

সিগারেটে আবার একটা জম্পেশ টান দিলাম। বললাম—'তোমার শেষ অবস্থা দেখে শেয়াল কুকুরেও কাঁদবে হে। তোমার ধারণা নিশ্চয় অন্যরকম। ভেবেছ অনেক টাকা পাবে। পায়ের ওপর পা তুলে কাটাবে শেষ জীবন। সবাই তাই ভাবে। মরীচিকার পেছনে সবাই দৌড়োয়। তোমার কপালে যে কি দুর্গতি—'

গলায় এতটুকু ঝাঁঝ দেখালো না গালপাট্টা। সহজভাবে বলল—সিন্দুক খুলুন। নইলে মরবেন।'

আমি আওয়াজ করেই হেসে উঠলাম—'মরবার সময়ে আর ঠাট্টা করো না, মস্তান। সিন্দুক খুললেও মরতে হবে, না খুললেও মরতে হবে। তাই না?'

আধ মিনিটটাক চেয়ে রইল গালপাট্টা। তারপর বলল—'কী করতে চান গেলাস নিয়ে?'

'আমি জানি, এখন তুমি আমাকে মারতে পারবে না। ছেড়ে দেবে। আমি সঙ্গে সঙ্গে গেলাস সমেত হাজির হব প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সিতে। গেলাস থেকে ফটো তুলে নেব তোমার আঙুলের ছাপের। সেই ফটোর সঙ্গে একটা কাগজে লিখে রাখব আজকের ঘটনার বিবরণ। চেহারার বর্ণনা। আরও অনেক কিছু। আঙুলের ছাপ আর তোমার কীর্তি কাহিনি লেখা কাগজটা একটা খামে ভরে গালা দিয়ে মুখ এঁটে দেব। আমার অ্যাটর্নিকে বলে রাখব, যদি কখনও আমার শোচনীয় মৃত্যু ঘটে এবং মৃত্যুর কারণ অ্যাকসিডেন্ট বলেও মনে হয়, যেন খামটা পুলিশ দপ্তরে পৌঁছে দেওয়া হয়।'

একই ভাবে চেয়ে রইল গালপাট্টা। তারপর বুকভর্তি শ্বাস নিয়ে বললে—'দরকার কি অত হাঙ্গামার? আমি চলে যাচ্ছি। জীবনে আমার ছায়াও আর দেখবেন না।'

মাথা নেড়ে বললাম—'তা হয় না। আমার ভবিষ্যৎ আমাকেই দেখতে হবে তো। গায়ে যাতে আঁচড়টি না লাগে, তার জন্যেই এই প্ল্যান।'

কি যেন ভাবল গালপাট্টা। বলল—'সোজা পুলিশের কাছে যাচ্ছেন না কেন?'

'কারণ আছে বইকি।'

দুশ্চিন্তায় কালো হয়ে এল গালপাট্টার মুখ। চোখ নামাল হাতের রিভলভারের ওপর। আপন মনেই ঘাড় নাড়ল একবার। তারপর রিভলভার রেখে দিল প্যান্টের পকেটে। বলল—'আমি না হয় যাচ্ছি। কিন্তু আপনার বেবুশ্যে বউটা তো ছাড়বে না। আবার কাউকে টাকা খাইয়ে পাঠাবে আপনাকে খতম করার জন্যে।'

'তা তো পাঠাবেই।'

'মারবে অন্য লোক, আর ফাঁসিতে ঝুলবো আমি?'

'তাই তো হবে।'

গালপাট্টার মুখে আর কথা নেই।

'অবশ্য নাও হতে পারে, 'বললাম আমি। 'ধরো যদি অলকানন্দা আর নতুন খুনে জোটাতে না পারে।'

'ভাড়াটে খুনের কি অভাব আছে কলকাতায়? ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না। আর আপনার গোলগাপ্পা বউটা তো মুড়িমুড়কির মতো টাকা ছড়ায়।'

'যদি আর ছড়াতে না পারে?'

'টাকা তো আপনার...ওঃ!' বলেই একদম চুপ মেরে গেল গালপাট্টা।

মিষ্টি মিষ্টি হাসলাম আমি—'মাথায় ঢুকেছে?'

গালপাট্টা জবাব দিল না। তবে ডুবন্ত মানুষ খড়কুটো দেখলেও যেন আকুল হয়—এর চোখেও দেখলাম সেই আলো—আশার আলো।

বললাম—'অলকানন্দা এখন কোথায়, তুমি জানো?'

'জানি। 'রেডনাইট' ক্লাবে। রাত এগারোটা পর্যন্ত ওখানেই থাকবে।'

'রাত এগারোটা? ফাইন। ভালো সময়। তার ওপর অমাবস্যার রাত। অন্ধকারে কাছের মানুষও দেখা যাবে না। 'রেডনাইট' ক্লাবের ঠিকানা জানো?'

'না।' গালপাট্টার চোখ ঠেলে বেরিয়ে এল।

'সদর স্ট্রিটে,' বাড়ির নম্বরটা বললাম। 'চার তলার ফ্ল্যাটে কুখ্যাত নাইট ক্লাব। তোমার চেনা উচিত ছিল।'

আধ মিনিট দুজনে তাকিয়ে রইলাম দুজনের পানে।

বললাম খুব মিষ্টি করে—'তোমার জান বাঁচানোর জন্যে আর একটা জান নিতে হবে। অলকানন্দা বেঁচে থাকলে তুমি মরবে।'

'এগারোটার সময়ে আপনাকে কোথায় পাবো, স্যার?' উঠে দাঁড়িয়ে বলল গালপাট্টা।

'আমার ক্লাবে। চার পাঁচ জন বন্ধুকে নিয়ে তাস পিটব। খবর যখন পৌঁছোবে, সবাই মিলেই শুনব।' একটু থেমে ফের বললাম—'কী খবর মস্তান?'

'আপনার বউ গুলি খেয়ে মরেছে।' নেকড়ের মতো হেসে ফেলল গালপাট্টা। 'একটা কথা জিগ্যেস করব, স্যার?'

'করো।'

'বউকে ভালোবাসেন?'

ককটেল টেবিলে জেড পাথরের ভারী সুন্দর একটা নারী মূর্তি সাজানো ছিল। মূর্তিটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে-দেখতে বললাম—'অনেক দাম দিয়ে অনেক শখ করে কিনেছিলাম এটা। এখন শখ মিটে গেছে। আর ভালো লাগে না। ভাবছি ফেলে দেব। নতুন মূর্তি কিনব।'

বিদায় হল গালপাট্টা। হাতে অনেক সময়। ক্লাবে যাওয়ার আগে মদের গেলাসটা ডিটেকটিভ এজেন্সিতে জমা দিয়ে এলাম।

সিন্দুকে যে গেলাস রেখেছিলাম—সেটা নয়। সে গেলাসে আমার আঙুলের ছাপ ছাড়া আর কোনও ছাপ ছিল না।

যে গেলাসটা গালপাট্টা ককটেল টেবিলে রেখে বিদায় নিল—নিলাম সেই গেলাস।

গেলাসের কাচে শুধু চোখেই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল মস্তানের আঙুলের ছাপ।

** 'রহস্য' পত্রিকায় প্রকাশিত।*

নেবুচাডনেজারের শীলমোহর

ইন্দ্রনাথ, শার্লক হোমস তো চুরুটের ছাই নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছে, তুমি বরং লেখো পায়ের ছাপ নিয়ে। আখেরে কাজ দেবে।' বললাম আমি।

ইন্দ্রনাথ গম্ভীর হয়ে বললে—'লিখব না এমন কোনও কথা নেই। লিখলেই বুঝবে সময় আর এনার্জি ব্যয় করে গোয়েন্দা গল্প লেখার নামে ছাইভস্ম না লিখে এদিকে মন দিলে কাজের কাজ করতে।'

উত্তপ্ত স্বরে বললাম—'লিখলেই পারো। গোয়েন্দা গল্প যদি এতই অপাঠ্য হত, তাহলে—'

'গোয়েন্দা গল্প যে অপাঠ্য, তা আমি বলিনি। আমি শুধু বলছি, দুর্বল কলমে ভালো ভালো কেসগুলো সস্তার রোমাঞ্চ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। 'ডিটেকশন' একাধারে আর্ট এবং সায়ান্স। সে জন্যে দরকার শাণিত পর্যবেক্ষণ শক্তি। তা না হলে নামকরা আর্টিস্ট আর সায়ান্টিস্টরা নামকরা ডিটেকটিভ হতে পারত। কিন্তু তোমাদের লেখায় অতি উন্নত 'ডিটেকশনে'র বাষ্পটুকুও থাকে না, থাকে খানিকটা সস্তার চমক আর সাসপেন্স। পায়ের ছাপ নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে বলে আমাকে ঠাট্টা করছ, কারণ হাঁটতে হাঁটতে পায়ের ছাপের দিকে নজর রেখেছি। কিন্তু বন্ধু, ছাপগুলো তো তোমার সামনেও আছে। চোখ তোমারও আছে। পায়ের মালিকদের সম্বন্ধে কিছু বলো দেখি শুনি।'

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে শর্টকাট করতে গিয়ে ভিজে মাটির ওপর অগণিত পদচিহ্ন ঘাড় হেঁট করে দেখতে দেখতে যাচ্ছিল ইন্দ্রনাথ। তাই টিপ্পনী কাটতে গিয়ে সত্যি সত্যিই চটিয়ে দিলাম বন্ধুবরকে। জঙ্গলের পথে না এলেও চলত। কিন্তু স্টেশনের এক কুলিই পথটা বাতলে দিলে। আর শুরু হল ওর পদচিহ্ন পর্যবেক্ষণ। মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল ছোটখাট গর্তের সামনে। পথসঙ্গী যদি এভাবে পথ চলে, তাহলে বিরক্ত হওয়া স্বাভাবিক। ইন্দ্রনাথের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ ছিল না তাতে। তন্ময় হয়ে পদচিহ্ন দেখতে দেখতে যেন মনে মনে আঁকছিল পায়ের মালিকদের চেহারা আর চরিত্রের ছবি।

বিব্রত হয়ে বললাম—'খালি পা হলে বলা যেত। কিন্তু জুতো পরলে অসুবিধে আছে। যেমন এই ছাপটা। ঢেউতোলা রাবারের সোল। এর বেশি আর কিছু বলা সম্ভব নয়।'

'ভুল। জুতো পরলে বরং আরও তথ্য জানা যায়। এ জন্যে শুধু ভাবলে চলে না, চোখ দিয়ে খুঁটিয়ে দেখার ক্ষমতাকে ট্রেনিং দিয়ে ধারালো করতে হয়। এখানকার মাটি সামান্য ভিজে, ছাপগুলো মোমের ছাঁচের মতোই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। ঢেউতোলা রাবার শোলের জুতো দামি জুতো। আঙুলের ডগা থেকে গোড়ালি পর্যন্ত সমস্ত ছাপটা সমানভাবে পড়েছে অর্থাৎ জুতোটার তলায় স্পঞ্জ লাগানো অ্যামবাসাডর সু। এ জুতো সাধারণ লোকে পরে না। সঙ্গীর সম্বন্ধে কিছু বলতে পারো?'

'সঙ্গী! পাশাপাশি দুজোড়া ছাপ রয়েছে বলেই কি একজন অপরজনের সঙ্গী?'

'পায়ের ছাপ তাই বলছে! প্রথম থেকেই যদি ছাপগুলো লক্ষ্য করতে, তাহলে বুঝতে কেন এ কথা বললাম। প্রথমেই ধরা যাক পদক্ষেপ। দুজনেই খুব লম্বা—সেটা অবশ্য বোঝা যাচ্ছে জুতোর মাপ থেকে, কিন্তু লম্বা হওয়া সত্ত্বেও দুজনেই ছোট ছোট পা ফেলে হেঁটেছে। কেন?'

'কেন?' প্রতিধ্বনি করলাম আমি।

'যার পায়ে চামড়ার জুতো, তার ছোট ছোট পা ফেলার একটা কারণ আছে। কারণটা বোঝা যাচ্ছে ছড়ি ফেলার ধরন দেখে। ছড়িটা ধরা হয়েছে আড়ষ্টভাবে—প্রতিবারই ছড়ির ওপর একটু ভরও দেওয়া হয়েছে—যেন পথ চলতে ছড়িটা বিলক্ষণভাবে সাহায্য করেছে। ছড়ির দাগ রয়েছে প্রতি দু-পা অন্তর। যখনই বাঁ-পা

মাটিতে পড়েছে, তখনই ছড়িও পড়েছে বাঁ-পায়ের উল্টোদিকে। যার সোজা মানে এই যে, পায়ের মালিক বয়েসে প্রবীণ, কাহিল অথবা অক্ষম। কিন্তু রাবার-সোল জুতো যার পায়ে, সে সাধারণ ভাবেই হেঁটেছে—প্রতি চার পা অন্তর একবার মাটি ছুঁয়েছে ছড়ি। অস্বাভাবিক ছোট পদক্ষেপে হাঁটার কারণটা শারীরিক নয়, সঙ্গীর পায়ে পা মিলিয়ে চলতে হচ্ছে বলেই।

'তারপর দেখো, দুজোড়া পা সাধারণ পাশাপাশিই চলেছে, কেউ কারও পায়ের ছাপ মাড়িয়ে যায়নি। কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটেছে পথ যেখানে সরু। তখন দুজনকে আগেপিছে চলতে হয়েছে। এই রকম দুটো ক্ষেত্রে একবার দেখলাম রাবার সোলের ছাপ মাড়িয়ে গেছে চামড়ার সোল। আরেকবার দেখলাম, চামড়ার সোলের ওপর পড়ছে রাবার সোল। এই থেকেই পাকাপাকি সিদ্ধান্তে আসা যাচ্ছে যে দুজনেই একসঙ্গে পথ চলেছে, মধ্যে মধ্যে আগেপিছে হলেও সঙ্গ ছাড়েনি।'

'খুবই সোজা,' বললাম আমি। 'তুমি যা বললে, তা হল থিওরির ব্যাপার। পায়ের ছাপ আর তার মানে নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কতকগুলো থিওরি আওড়ালে। কিন্তু এর মধ্যে পর্যবেক্ষণ বা চোখকে ট্রেনিং নেওয়ার প্রশ্ন আসছে কোত্থেকে?'

তিক্তকণ্ঠে ইন্দ্রনাথ জবাব দিলে—'বুঝিয়ে দিলে সবই সোজা। আর চোখের ট্রেনিং না থাকলে এটুকুও যে জানা যায় না, তার প্রমাণ তো তুমি নিজেই। বেশ তো, দু-দুটো ছড়ির ছাপ তোমার সামনেই রয়েছে। ভালো করে দ্যাখো, দেখে বলো দেখি আশ্চর্য কিছু দেখতে পাচ্ছো কিনা।'

বললাম, সবগুলোই তো একই রকম মনে হচ্ছে। রাবার সোল লোকটার ছড়ি অবশ্য একটু বেশি লম্বা। আর চামড়ার-সোল লোকটার ছড়ির গর্ত একটু বেশি গভীর। কারণটা খুব সম্ভব ছড়িটা ছোট হওয়ার ফলেই চাপ বেশি পড়ছিল ছড়ির ওপর—তাই গর্তও হয়েছে গভীর।'

বিদ্রূপের হাসি হেসে ইন্দ্রনাথ বললে—'আসল পয়েন্টটাই 'মিস' করে গেলে। চাক্ষুষ প্রমাণগুলো দেখবার ক্ষমতা তোমার নেই বলেই এই ব্যর্থতা। পরিষ্কার পয়েন্ট, বিশেষ কয়েকটা ক্ষেত্রে তা রীতিমতো দরকারিও বটে।'

'বটে? শুনতে পারি পয়েন্টটা কি?'

'অবশ্যই পারো। তোমাকে ট্রেনিং দেওয়ার জন্যেই আমার এত লেকচার দেওয়া। কিন্তু সিদ্ধান্তে তোমাকে নিজেকেই পৌঁছোতে হবে, আমি বলব না।'

'পয়েন্টাটা বলবে তো?'

'বলছি। প্রথমেই দ্যাখো, ছোট ছড়ির ছাপগুলো ছড়িধারীর ডানদিকে পড়েছে। দ্বিতীয়, প্রতিটি ছাপই সামনের দিকে আর ডাইনের দিকে সব চাইতে কম গভীর।'

উবু হয়ে বসে আবার দেখলাম ছাপের সারি। ইন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছে।

বললাম—'কিন্তু তাতে কি প্রমাণিত হয়?'

আমার সেইরকম গা-জ্বালানো হাসি হেসে ইন্দ্রনাথ বললে—'চাক্ষুস প্রমাণ সামনেই আছে। সবজান্তা বন্ধু, চোখ দিয়ে তার চুলচেরা বিচার কর, তাহলেই পাবে উত্তর।'

'কিন্তু তোমার হেঁয়ালিটাই তো ধরতে পারলাম না,' খেঁকিয়ে উঠে বলি আমি। ছাপগুলো একদিকে কম গভীর, তার কারণ ছড়ির ফেরুলটা সেইদিকেই বেশি ক্ষয়েছে। কিন্তু আবার বলছি, তাতে কি কিছু প্রমাণিত হয়? কেন ছড়ির মালিক ছড়ির ফেরুল একদিকে বেশি খইয়েছে, এটাই কি তোমার সিদ্ধান্ত?'

'শান্ত হও বন্ধু, শান্ত হও। এত অল্পে ধৈর্যচ্যুতি ঘটলে গোয়েন্দা হওয়া যায় না। দার্শনিকের মতো নির্বিকার থেকে দাগটার কম গভীরতা নিয়ে মাথা ঘামাও। পয়েন্টটা রীতিমতো ইন্টারেস্টিং।'

'গোল্লায় যাক তোমার ছড়ির ছাপ। ছড়ি আমার নয়, ছড়ির মালিককেও আমি চিনি না। সুতরাং তা নিয়ে অত রিসার্চেরও দরকার নেই। আরে, ত্রিপুরারিবাবু যে!'

জঙ্গল যেখানে শেষ হয়েছে, সেইখানেই ফ্রেমে আঁটা ছবির মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন সলিসিটর ত্রিপুরারি আঢ্যি। আমাদের দেখেই হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এলেন।

'নমস্কার ইন্দ্রনাথবাবু! নমস্কার মৃগাঙ্কবাবু! আমি জানতাম সময় বাঁচাতে এ পথই ধরবেন আপনারা। তাই এগিয়ে নিতে এলাম।'

ইন্দ্রনাথ নমস্কার ফিরিয়ে দিয়ে বললে—'আপনার টেলিগ্রামে দেখলাম মৃত্যুটা সন্দেহজনক আত্মহত্যা বলে মনে হচ্ছে। তদন্তের সুযোগ আছে তো?'

'আছে কিনা বলতে পারব না। সে আপনারা এক্সপার্টরা বুঝবেন। নিহত ব্যক্তির পঞ্চাশ হাজার টাকার লাইফ ইন্সিওর্‌্যান্স ছিল। মৃত্যুটা যদি আত্মহত্যা বলেই প্রমাণিত হয়ে যায়, তাহলে এসটেটের পঞ্চাশ হাজার টাকা লোকসান হয়ে যাচ্ছে। সেইজন্যেই ভাবছিলাম উপযুক্ত ফি দিয়ে এক্সপার্টকে দিয়ে যদি কিছু প্রমাণ করা যায় মৃত্যুটা নেহাতটা দুর্ঘটনা, তাহলে পঞ্চাশ হাজার টাকা এসটেটে চলে আসে।' বলে ধূর্ত চোখ নাচিয়ে অর্থব্যঞ্জক হাসি হাসলেন ত্রিপুরারি আঢ্যি।

প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটা এড়িয়ে গেল ইন্দ্রনাথ। উৎকোচ-প্রস্তাবে কঠিন হয়ে উঠল চোয়ালের রেখা।

বললে নীরস স্বরে—'কেসটার আদ্যোপান্ত বলুন।'

'যেতে যেতেই বলছি। মৃত ব্যক্তির নাম প্রহ্লাদ চক্রবর্তী। আমার বন্ধু সলিসিটর কৃষ্ণদাস চক্রবর্তীর ভাই। আজ সকালে অফিসে গিয়ে খবর পেয়েই আমার কাছে দৌড়ে আসে কৃষ্ণদাস। ওর সঙ্গেই এসেছি এখানে। কৃষ্ণদাস বাড়ির মধ্যে অপেক্ষা করছে আপনাদের জন্যে।

'গত রাতে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে এক চক্কর বেড়াতে বেরিয়েছিল প্রহ্লাদ। গরমকালে খাওয়ার পর বেড়ানো ওর চিরকালের স্বভাব। চাকরবাকররা দেখেছে তাকে বেরিয়ে যেতে। তারপর আর কেউ তাকে জীবিত অবস্থায় দেখেনি। কখন যে সে ফিরে এসেছে, তা কেউ জানে না। সেটা অবশ্য স্বাভাবিক। কেননা, প্রহ্লাদের বৈঠকখানা, ছোট্ট কারখানা, পড়ার ঘর আর মিউজিয়াম বাড়ি থেকে আলাদা। লাগোয়া হওয়ার ফলে একটা দরজা খুললেই এ-বাড়ি ও-বাড়ি এক হয়ে যায়। বৈঠকখানায় ঢোকার আলাদা দরজা আছে। সাধারণত রাত্রে বেড়িয়ে ফিরে এই দরজা দিয়েই বাড়ির মধ্যে ঢুকে সিধে শুতে চলে যেত প্রহ্লাদ—চাকরবাকররা জানতেও পারত না।

'গত রাতেও তাই করেছে প্রহ্লাদ। কিন্তু আজ সকালে শোবার ঘরে গিয়ে ওর বিধবা পিসি দেখলে বিছানা নিভাঁজ, কেউ শোয়নি। প্রহ্লাদেরও পাত্তা নেই। এ-বাড়ি থেকে বৈঠকখানায় যাওয়ার দরজা ঠেলে দেখা গেল ওদিক থেকে বন্ধ। অগত্যা চাকর নারাণকে ডাক দেয় পিসি। বাইরে গিয়ে দেখে সেদিককার দরজাও বন্ধ। হাঁকাহাঁকি করেও যখন সাড়া পাওয়া গেল না, তখন নারাণ দেখতে লাগল জানলা খোলা আছে কিনা। কিন্তু জানলাগুলোও বন্ধ। শেষকালে কারখানা ঘরে একটা বড় স্কাইলাইটের রড খুলে ফাঁক দিয়ে কোনওমতে ভেতরে ঢোকে নারাণ। তারপর বৈঠকখানায় ঢুকে দেখে টেবিলের পাশে চেয়ারে বসে প্রহ্লাদ। মারা গেছে আগেই। টেবিলের ওপর একটা হুইস্কির বোতল, সোডার বোতল, একবাক্স চুরুট, ছাইদানিতে একটা আধপোড়া চুরুট আর একবাক্স পটাসিয়াম সায়ানাইট বড়ি।

'তৎক্ষণাৎ ডাক্তারকে খবর পাঠানো হয়। খবর যায় কৃষ্ণদাসের অফিসেও। নটা নাগাদ ডাক্তার এসে বললেন, সায়ানাইড পয়জনিং। তবে পোস্টমর্টেম না করলে খুঁটিনাটি বলা সম্ভব নয়। চাকরা- বাকররা ধরাধরি করে চেয়ার থেকে প্রহ্লাদকে নিয়ে শুইয়ে দিয়েছে সোফার ওপর। না দিলেই ভালো করত। কেন না, প্রহ্লাদ মরে কাঠের মতো শক্ত হয়ে গেছে।'

'পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে?' জিগ্যেস করে ইন্দ্রনাথ।

'না। প্রহ্লাদ আত্মহত্যাই করেছে—সন্দেহজনক মৃত্যু নয়। তা সত্ত্বেও সবাই ভাবলাম আপনার মতো একজন এক্সপার্টকে ডাকা ভালো—বিশেষ করে মৃত্যুটা যদি আকস্মিক হয়—'

'শুনে তাই মনে হচ্ছে। পরিষ্কার আত্মহত্যা। কৃষ্ণদাসবাবুর কাছে নিশ্চয় প্রহ্লাদ চক্রবর্তীর মনের অবস্থার খবর পাওয়া যাবে?'

'তা পাবেন। যা শুনলাম, সম্প্রতি বড় উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল প্রহ্লাদ। এসে গেছি।'

সামনেই পুরোনো আমলের সাদাসিদে একটা একতলা বাড়ি। বাগানের ফটক পেরিয়ে ভেতরে পা দিলাম আমরা। সদর দরজা খুলে গম্ভীরমুখে বেরিয়ে এলেন এক ভদ্রলোক। মাথায় কাঁচাপাকা চুল। সাদা গোঁফ। সোনার চশমা। আলাপ হল। প্রহ্লাদ চক্রবর্তীর দাদা সলিসিটর কৃষ্ণদাস চক্রবর্তী।

বাড়ির মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে কৃষ্ণদাসবাবু বললেন—'প্রহ্লাদ যে আত্মহত্যা করবে ভাবাই যায় না। সেরকম ছেলে তো ও নয়। আমাদের বংশেও আত্মহত্যা কেউ কখনো করেনি। কিন্তু কেন যে ও—'

কথা বলতে-বলতে হলঘরে প্রবেশ করলাম এবং এক প্রান্তের দরজা পেরিয়ে প্রহ্লাদ চক্রবর্তীর বৈঠকখানায় এসে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল এক ভয়ানক দৃশ্য। সোফার ওপর কিম্ভূতকিমাকার ভঙ্গিমায় শায়িত এক মৃতদেহ। কিম্ভূতকিমাকার এই কারণে যে মৃতদেহ শুয়ে রয়েছে চেয়ারে বসার ভঙ্গিতে— দু-পা হাঁটু মুড়ে সে এক আশ্চর্য 'পোজে'। পরিধানের বুশশার্ট, ট্রাউজার্স, আর জুতো। দূর থেকেই জুতোর শুকতলা লক্ষ্য করে চমকে উঠলাম আমি।

সোলটা রাবার সোলের, ঢেউ তোলা! ঠিক যেমনটি একটু আগেই ভিজে মাটিতে দেখে এসেছি।

টেবিলের ওপর পোড়া চুরুট সমেত ছাইদানি, হুইস্কির বোতল, সোডার বোতল, চুরুটের বাক্স আর পটাশিয়াম সায়ানাইডের প্যাকেট।

স্থির চোখে মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে ছিল ইন্দ্রনাথ। জুতোর শুকতলা দেখে আমিও উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। কাছে গিয়ে দেখলাম। দামি জুতো, তলায় 'ফোম রাবারের' স্তর লাগানো অ্যামবাসাডর মোকাসিন।

ত্রিপুরারিবাবু বললেন—'আপনারা দেখুন। আমরা পাশের ঘরে আছি। দরকার পড়লে ডাক দেবেন।'

বলে, দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ভেতর বাড়িতে উধাও হলেন দুই প্রৌঢ় বন্ধু।

সঙ্গে-সঙ্গে আমি চাপা গলায় বললাম—'ইন্দ্র, দেখেছ?'

'দেখেছি।' সোফার সামনে দাঁড়িয়ে জবাব দিল ইন্দ্রনাথ।

'অবিকল সেই জুতো। কে জানে হয়তো ইনিই কাল রাতে হেঁটেছিলেন জঙ্গলের রাস্তায়।'

'হ্যাঁ ইনিই। তাতে কোনও সন্দেহ নেই,' বলে, বাঁ-পায়ের শুকতলার খাঁজে গাঁথা একটা কাঁটা পেরেক দেখিয়ে বলল, 'তখনি লক্ষ্য করেছিলাম পেরেকের ছাপ। কিন্তু বলিনি পাছে আবার তর্ক আরম্ভ করে দাও বলে।'

'কিন্তু পায়ের ছাপটা যদি এই ভদ্রলোকেরই হয়, তাহলে তো সঙ্গে সেই আশ্চর্য ছড়িওলা লোকটিকেও আমাদের দরকার। ভাবছি, কে হতে পারে লোকটা। পাড়ার কেউ নয় তো?'

'তা হতে পারে। ছাপগুলোও খুব টাটকা, খুব সম্ভব কাল রাতের। আর তা যদি হয় তাহলে ভদ্রলোককে আমাদের প্রয়োজন। কেননা, প্রহ্লাদ চক্রবর্তীকে সবশেষে জীবিত অবস্থায় তিনিই দেখেছেন। অবশ্য তা নির্ভর করছে, কোন সময়ে মাটির ওপর পায়ের ছাপ পড়েছে, তার ওপর।'

বলে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লাশটা পরীক্ষা করতে আরম্ভ করল ইন্দ্রনাথ। মৃতদেহ পরীক্ষার বিশেষ কয়েকটা পদ্ধতি আছে আমার এক ডাক্তার বন্ধুর কাছে শুনেছিলাম। ইন্দ্রনাথ দেখলাম বিদ্যেটায় বেশ ওস্তাদ। তীক্ষ্ণ চোখে দেখল মুখের ভেতর আর তালুর ওপর। তারপর ঘরটা মোটামুটি পরীক্ষা করে নিয়ে গেল পাশের ছোট্ট ওয়ার্কশপে। ল্যাবরেটরি বেসিনের কোণ-টোণগুলোয় অনেকক্ষণ ধরে উঁকিঝুঁকি দিল। তাক থেকে নামিয়ে আনল একটা খালি গেলাস। আলোর সামনে ধরে উল্টেপাল্টে দেখে আবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করল তাকের ওপর। ভিজে গেলাস উলটো করে শুকোতে দেওয়া হয়েছিল, তাই একটা আবছা জলের রেখা গোল হয়ে ফুটে রয়েছে তাকের ওপর। ফিরে এল বৈঠকখানায়। বাইরের দরজার ছিটকিনিটা দেখল নেড়ে।

তারপর বলল নিরাশ মুখে—'নাঃ, কিচ্ছু নেই। পটাসিয়াম সায়ানাইডের বড়িগুলো দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, মৃত্যুটা হঠাৎ নয়, দুর্ঘটনা নয়—প্ল্যানমাফিক। চুরুটের বাক্সটা দেখছি আনকোরা, দুটো চুরুট নেই। একটা আধপোড়া অবস্থায় অ্যাসট্রেতে পড়ে—কিন্তু ছাই যা জমেছে তা একটা চুরুটের পক্ষে অনেক বেশি। চল, কৃষ্ণদাসবাবুকে দু-চারটে প্রশ্ন করা যাক।'

হলঘরে প্রবেশ করতেই সাগ্রহে চোখ তুললেন দুই প্রৌঢ়।

ত্রিপুরারিবাবু জিজ্ঞেস করলেন—'কিছু পাওয়া গেল?'

'আপাতত না।' জবাব দিল ইন্দ্রনাথ। 'আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। আচ্ছা কৃষ্ণদাসবাবু, বাইরের দরজাটায় দেখলাম মাঝে খিল আর তলায় ছিটকিনি। প্রহ্লাদবাবু কোনটা বন্ধ করেছিলেন?'

'ছিটকিনিটা। খিল খোলা ছিল।'

'ও। ত্রিপুরারিবাবুর মুখে শুনলাম, সম্প্রতি একটু উদ্বিগ্ন ছিলেন আপনার ভাই। কারণটা জানেন?'

'তেমন কিছুই নয়। ওর চাইতেও অনেক বড় উদ্বেগের মধ্যে ওর দিন গেছে। প্রহ্লাদ শক্ত নার্ভের ছেলে, আত্মহত্যার মতো দুর্বলতা ওর ছিল না। যাই হোক, আমি যা শুনেছি, বলছি।

'কিছুদিন আগে ভূপর্যটক নীলমাধব রাউত মেসোপটেমিয়া থেকে ফিরে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের কিউরিও দোকানি জন মার্টিনকে একটা ছোট্ট সোনার সিলিন্ডার শীলমোহর বিক্রি করেন। শীলমোহরটা নাকি নীলমাধববাবু বাগদাদের মাইলখানেকের মধ্যেই কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। কীভাবে পেয়েছিলেন তা জানি না। কিন্তু সিলিন্ডার সমেত উনি কলকাতায় ফিরে এসেই ছোটেন মার্টিনের কাছে কিছু টাকার আশায়। জন মার্টিন আটশো টাকা দিয়ে কিনে নেয় শীলমোহরটা।

'নীলমাধববাবু জানতেন সিলিন্ডারটা সোনার, তার বেশি কিছু জানতেন না। জন মার্টিনও বিশেষ কিছু জানত না। যদিও পুরোনো জিনিস কেনাবেচাই তার ব্যবসা, কিন্তু এক্সপার্ট নয়। তবে জন মার্টিনের একটা মহৎ গুণ আছে—নকল করার গুণ। পুরোনো জিনিসকে ঘষে-মেজে এমন নিখুঁত করে তোলে যে মাথা ঘুরে যায় কিউরিওলোভীদের। কাজটা অবশ্য বেআইনি নয়। জন মার্টিন আগে জুয়েলারের দোকানে কাজ করত। ঘড়ির কাজও মোটামুটি জানে। হাতের কাজে জুড়ি নেই তার। তাই ধরেছে এই লাভজনক ব্যবসা। ভাঙাচোরা পুরোনো দুষ্প্রাপ্য বস্তু জোগাড় করে জোড়াতালি দিয়ে ঠিক আগের মতোই করে দেয়—তারপর হাঁকে কড়া দাম। এর মধ্যে জোচ্চুরি নেই। সুতরাং জন মার্টিনকে জালিয়াত বলাটা ঠিক হবে না। কিন্তু কিউরিও সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ নয় জন মার্টিন। তাই নীলমাধব রাউতের কাছে পাওয়া সোনার সিলিন্ডারের মাথামুন্ডু কিছু বোঝেনি। শুধু বুঝেছে জিনিসটা অত্যন্ত প্রাচীন আর নকল নয়। অতএব সোনার যা দাম, তার ডবল দাম দিয়ে কিনে নিয়েছে।

'দিন পনেরো আগে প্রহ্লাদ গেছিল জন মার্টিনের দোকানে কি একটা মেরামতের কাজ নিয়ে। মার্টিন জানত আমার ভায়াটির ব্যাবিলনের দুষ্প্রাপ্য জিনিসপত্র সংগ্রহের বাতিক আছে। এ ব্যাপারে প্রহ্লাদ সত্যিই জিনিয়াস, ভাই বলে বলছি না। তাই শীলমোহরটা ওকে দেখায় মার্টিন। দেখেই প্রহ্লাদ বোঝে, জিনিসটা আদত—নকল নয়। শুধু তাই নয়, রীতিমতো প্রাচীন এবং ইন্টারেস্টিং কিউরিও। তাই আর না ভেবেই, এমনকী চোঙাটা আসলে কি, তা খুঁটিয়ে না দেখেই বারোশো টাকার চেক দিয়ে বাড়িতে নিয়ে যায়। প্রহ্লাদ জানত, কিউরিও হিসেবে সোনার সিলিন্ডারটা সত্যিই মূল্যবান এবং বারোশো টাকা অনায়াসেই দেওয়া যায়। বাড়ি এসে মোমের ওপর সিলিন্ডারটা গড়িয়ে ছাপ নিয়ে পরীক্ষা করতেই চক্ষুস্থির হয়ে গেল ভায়ার। চাঞ্চল্যকর আবিষ্কার। মোমের ছাঁচে ফুটে উঠেছে খোঁচা খোঁচা উঁচু উঁচু কতকগুলো হরফ...তুরাণী হরফ—যেমনটি প্রাচীন ব্যাবিলনে আর পারস্যে দেখা যেত। নিদারুণ উত্তেজিত হয়ে তৎক্ষণাৎ লিপিটার পাঠোদ্ধার করে ফেলে প্রহ্লাদ। আর তখনই বোঝা গেল এ শীলমোহর যে-সে লোকের নয়—স্বয়ং নেবুচাডনেজারের।

চোখের সামনে সেই সুপ্রাচীন শীলমোহর দেখেও নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারেনি প্রহ্লাদ। এ যে বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে পড়া! সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ালো ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে। ব্যাবিলোনিয়ান এক্সপার্ট

চমকে উঠল শীলমোহর দেখে। কিনতে চাইল মিউজিয়ামের জন্যে। কিন্তু এমন দুষ্প্রাপ্য মহামূল্যবান বস্তু হাতছাড়া করার পাত্র নয় প্রহ্লাদ। তবে এক্সপার্টের অনুরোধে শীলমোহরটার ওজন, মাপ আর কাদামাটির ওপর একটা গড়ানে ছাপ রেখে দিলে মিউজিয়ামে দর্শনার্থীদের জন্যে।

'এখন হয়েছে কি, শীলমোহরটা হাতছাড়া করার আগে নীলমাধব রাউত নিজেও কাদামাটির ওপর কয়েকটা গড়ানে ছাপ তুলে রেখেছিলেন। সেইগুলোই জন মার্টিনের কাছে আবার নিয়ে আসতেই মার্টিন সাহেব কয়েক টাকা দিয়ে সবগুলো কিনে কিউরিও হিসাবে সাজিয়ে রাখল শো-কেসে।

'একজন আমেরিকান অ্যাসিরিওলজিস্ট শো-কেসের ছাঁচগুলো দেখেই ঢুকে পড়ে দোকানে। বিনাবাক্যব্যয়ে কিনে নেয় কয়েকটা ছাঁচ। তারপর জন মার্টিনকে জেরা করতে থাকে কোত্থেকে এসেছে কিউরিওগুলো। মার্টিন অতশত না ভেবে নাম ঠিকানা দেয় নীলমাধব রাউতের। শীলটা সম্বন্ধে অবশ্য তখনো কিছু বলেনি। কেননা শীলমোহরের সঙ্গে মাটির ছাঁচের যে সম্পর্ক আছে, তা-ই তো জানত না মার্টিন। নীলমাধববাবু ধাপ্পা দিয়েছিলেন, কাদামাটির ছাঁচগুলোও নাকি খাস মেসোপটেমিয়া থেকে আমদানি। আমেরিকান এক্সপার্টের পাক্কা চোখে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়েছিল, মাটির ছাঁচটা সদ্য তৈরি। আর আসল শীলমোহরটাও নিশ্চয় এখনও নাগালের বাইরে যায়নি।

'তাই নীলমাধব রাউতের সঙ্গে দেখা করে আবার পেট থেকে কথা বার করবার চেষ্টা করতে থাকে অ্যাসিরিয়ান এক্সপার্ট। তখনই সন্দেহ হয় নীলমাধবের। শীলমোহরটা যে তার কাছেই ছিল, তা স্বীকার করেন নীলমাধব। কিন্তু এখন তা কোথায় আছে, তা কিছুতেই বলতে রাজি হলেন না এক্সপার্ট। অদ্ভুত চেহারার সোনার চোঙাটা নেবুচাডনেজারের শীলমোহর আর তার দাম দেড় লাখ থেকে দু-লাখের মধ্যে শুনে মাথা ঘুরে গেল রাউতমশায়ের। সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকান এক্সপার্টকে নিয়ে দৌড়লেন জন মার্টিনের দোকানে।

'এবার কিন্তু মার্টিন সাহেবের মনেও সন্দেহ দেখা দিল। কিছুতেই বলতে চাইল না কার কাছে শীলটা। উপরন্তু, কাদামাটির ছাঁচটা যে আসলে সোনার শীলমোহর থেকেই, এ সন্দেহ হওয়ায় একটা ছাঁচ নিয়ে দৌড়োল ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে। যেতেই ফাঁস হয়ে গেল সব কিছু। ব্যাপার আরও ঘোরালো হয়ে দাঁড়ালো আমেরিকান অ্যাসিরিওলজিস্ট প্রফেসর কিটম্যানের পেট আলগা হওয়ায়। হোটেলে ফিরে বন্ধুবান্ধবের কাছে নেবুচাডনেজারের সোনার শীলমোহরের গল্প করায় সাড়া পড়ে গেল কিউরিও-পাগলদের মধ্যে। দলে দলে আমেরিকান গোছা গোছা নোট নিয়ে রোজ হানা দিতে লাগল জন মার্টিনের দোকানে—দাম নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই—শীলমোহর চাই-ই চাই। কিন্তু জন মার্টিনের পেট থেকে যখন কিছুই বার করা গেল না, তখন ছুটল ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে। সেখানে যেতেই তারা বললে, হ্যাঁ শীলমোহরটা আছে আমার ভাই প্রহ্লাদ চক্রবর্তীর কাছে। ঠিকানাও দিলে। কিন্তু প্রহ্লাদের কলকাতার ঠিকানা বলতে টেম্পল চেম্বার্সে আমারই অফিসের ঠিকানা। ফলে, শুরু হল পত্রাঘাতের পর পত্রাঘাত। সমানে চিঠি মারফত অনুনয় বিনয় পৌঁছতে লাগল জন মার্টিন আর নীলমাধব রাউতের কাছেও।

'পাগল হতে বসলেন নীলমাধব রাউত। তিনি হামলা করতে লাগলেন জন মার্টিনের ওপর। মার্টিন সাহেব নাকি তাঁকে ঠকিয়েছে। হয় সে শীলমোহরটা ফেরত দিক, আর নইলে উপযুক্ত দাম দিক। জন মার্টিনের অবস্থাও তাই। সে-ও সমানে তর্জন গর্জন শুরু করে দিলে আমার ভায়ার ওপর। আর কোটিপতি কিউরিও-পাগলরা লাখ লাখ টাকা নগদে দেওয়ার লোভ দেখাতে লাগল দিনের পর দিন। বেচারা প্রহ্লাদের মনের অবস্থা তখন কহতব্য নয়। একদিক দিয়ে ওর সহানুভূতি ছিল নীলমাধব রাউতের ওপর। আপনারা তো জানেন, ভদ্রলোক কি পরিশ্রম করে সারা পৃথিবী ঘুরেছেন। যেখানে গেছেন, বাংলার আর ভারতের নামগান করে পাথেয় সংগ্রহ করেছেন। জন মার্টিনের সম্বন্ধে ওর কোনও মাথা ব্যথাই ছিল না। মার্টিন যদি তার ব্যবসা না বোঝে তো কার কি। কোনও জিনিসের কত দাম, তা মার্টিনের জানা উচিত ছিল। সব চাইতে জ্বালাতন আরম্ভ করল আমেরিকানরা। অবর্ণনীয় সেই উৎপাত। উৎপাতটা বসতবাড়ি পর্যন্ত পৌঁছোতো যদি না গোড়া থেকেই ঠিকানাটা গোপন করে যেত প্রহ্লাদ।

'শেষ পর্যন্ত নেবুচাডনেজারের শীলমোহর নিয়ে যে কি করত প্রহ্লাদ, তা আমি জানতাম না। তবে একদিনের জন্যে আমার প্রাইভেট অফিসটা ধার নেয় ও। সারাদিন ধরে ইন্টারভিউ নেয় নীলমাধববাবু, জন মার্টিন, প্রফেসর কিটম্যান আর অন্যান্য কিউরিও প্রেমিকদের। ইন্টারভিউ হয়েছে তিন দিন আগে। সারাটা দিন মশাই জালিয়ে মেরেছে লোকগুলো। যত্তোসব বদ্ধ উন্মাদের দল। একজন তো যাবার সময় নিজের ছড়ির বদলে আমার ছড়ি নিয়েও উধাও হল।'

'তাই নাকি? বেড়াবার ছড়ি?'

'হ্যাঁ। বড় শখের ছড়ি। বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া।'

'তার বদলে কি ছড়ি রেখে গেছে বলুন তো?'

'দেখলে কোনও তফাত বুঝবেন না। হুবহু একই রকম। ভুলটা হয়েছে যদিও সেই জন্যেই। হাতে নিয়েই আমার কীরকম সন্দেহ হল। তারপর হাঁটতে গিয়েই বুঝলাম এ ছড়ি সে ছড়ি নয়।'

'অস্বাভাবিক ছড়ি বলুন?'

'এক রকম তাই।'

'লম্বাই খাটো বুঝি?'

'না না, তা নয়। তফাতটা ঠিক বলে বোঝাতে পারব না। আমি আবার ল্যাংড়া মানুষ তো। বাঁহাতে ছড়ি নিয়ে না হাঁটলে ঠিক মৌজ আসে না, হয়তো সেইজন্যেই...সে যাক মশাই, আমার পুরোনো ছড়ি ফিরে পেলেই খুশি হই আমি। আপনি একটু বসুন, ছড়িটা দেখাচ্ছি।'

ভেতরবাড়ি গেলেন কৃষ্ণদাসবাবু। ফিরে এলেন অনতিকাল পরেই। হাতে একটা সেকেলে ফ্যাশনের মালাক্কা বেতের ছড়ি। হাতলটা হাতির দাঁতে সুন্দরভাবে বাঁধাই। বহু ব্যবহারে বিরঙ হলেও তাক লেগে যায় কারুকাজের সূক্ষ্মতা দেখে। হাতির দাঁত আর মালাক্কা বেতের জোড়মুখ চওড়া রূপোর পটি দিয়ে বেড় দেওয়া।

দুই চোখে অপরিসীম আগ্রহ নিয়ে কৃষ্ণদাসবাবুর হাত থেকে ছড়িটা তুলে নিল ইন্দ্রনাথ এবং দু-হাতে ধরে চোখের একদম কাছাকাছি এনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এমনভাবে দেখতে লাগল যে অবাক হয়ে গেলাম আমি। একটা ছড়ি বই তো নয়, তা সে যত সুন্দরই হোক না কেন, কিন্তু খুনের সঙ্গে যার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই তা নিয়ে অযথা মাথাব্যথা কেন ভেবে আশ্চর্য হলাম। ইন্দ্রনাথ কিন্তু একাগ্রমনে তীক্ষ্ণ চোখে একে একে দেখতে লাগল হাতির দাঁতের হাতল, রূপোর পটি আর পেতলের ফেরুলটা। বিশেষ করে ফেরুলটা নিয়েই ও এত বেশি তন্ময় হয়ে রইল যেন জিনিসটা অতি দুষ্প্রাপ্য অতি দুর্লভ কোনও চমকপ্রদ বস্তু।

বিচিত্র হেসে ত্রিপুরারিবাবু বললেন—'ওহে কৃষ্ণদাস, ইন্দ্রনাথবাবুকে ভার দাও, তোমার ছড়ি নির্ঘাত ফেরত পাবে।'

ছড়িটা ফিরিয়ে দিয়ে ইন্দ্রনাথ বললে—'তা পাবেন। সেদিন ইন্টারভিউতে কারা এসেছিলেন, তার একটা লিস্ট দিলেই হবে।'

'লিস্ট আমার অফিসেই আছে, দেওয়া যাবে-খন। কিন্তু যা বলছিলাম। সেদিন শীলটা নিয়ে ওদের মধ্যে কী কথাবার্তা হয়েছে, তা জানি না। আদৌ প্রহ্লাদ বিক্রি করবে কিনা, তাও আমাকে বলেনি। তবে কতকগুলো নাম ঠিকানা ইত্যাদি নাকি লিখে রেখেছিল। কাগজগুলো খুঁজে বার করা দরকার। কেননা, অভিশপ্ত শীলমোহরটা বিদেয় না করা পর্যন্ত শান্তি নেই আমার।'

'শীলটা কোথায়?' জানতে চাইল ইন্দ্রনাথ।

'কেন, যেখানে থাকার কথা সেখানেই, মানে আয়রন সেফে। কিন্তু আর ওখানে রাখা চলবে না। ব্যাঙ্কে সরাতে হবে।'

'সেফে আছে তো?'

'না থাকার কোনও কারণ নেই' বলেই সহসা উঠে দাঁড়ালেন কৃষ্ণদাসবাবু। 'এখনো পর্যন্ত অবশ্য আমি খুলে দেখিনি। দেখাই যাক না আছে কিনা।'

বৈঠকখানা ঘরের দিকে পা বাড়ালেন কৃষ্ণদাসবাবু। আমরাও পিছু পিছু এলাম। চৌকাঠেই থমকে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। আড়ষ্ট লাশটার দিকে তাকিয়ে আমতা আমতা করে বললেন—'চাবিটা রয়েছে কিন্তু ওর পকেটে।' তারপর বেশ অনিচ্ছাসত্ত্বেও পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ালেন সোফার সামনে। পকেট-টকেট হাতড়ে অনেকক্ষণ পরে বার করলেন একগোছা চাবি।

'পেয়েছি। কিন্তু সিন্দুকের চাবি...খুব সম্ভব এইটা,' বলে একটা চাবি আলাদা করে গিয়ে দাঁড়ালেন লোহার সিন্দুকের সামনে। চাবি ঢুকিয়ে ঘোরাতেই কড়াত করে খুলে গেল ভারী ডালাটা।

'বাঁচা গেল! আছে শীলটা। আপনার কথায় বুকটা ছাঁত করে উঠেছিল ইন্দ্রনাথবাবু। প্যাকেটটা খোলার দরকার আছে কি?' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন কৃষ্ণদাসবাবু। ইন্দ্রনাথের হাতে তুলে দিলেন ছোট্ট একটা পুলিন্দা। ওপরে ইংরাজিতে লেখা 'নেবুচাডনেজারের শীলমোহর।

মৃদু হেসে ইন্দ্রনাথ বললে—'একেবারেই নিশ্চিন্ত হওয়াই ভালো।'

'তা মন্দ বলেন নি।' বলে সুতো কেটে গালামোহর ভেঙে পুলিন্দা খুলে ফেললেন কৃষ্ণদাসবাবু।

ভেতর থেকে বেরুল একটা ছোট্ট কার্ডবোর্ডের বাক্স। ডালা খুলে হাতের তেলোয় বাড়িয়ে দিলেন এতটুকু একটা সিলিন্ডার—ফিনফিনে সেলোফেন পেপারে মোড়া।

মোড়ক খুলে বস্তুটা তুলে ধরলেন কৃষ্ণদাসবাবু। সওয়া ইঞ্চি লম্বা একটা সোনার সিলিন্ডার। ব্যাস আধ ইঞ্চির মতো। এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একটা লম্বালম্বি ছিদ্র।

সিলিন্ডারের আগাগোড়া ছোট্ট অথচ অতি সূক্ষ্ম কারুকাজ। আপাতদৃষ্টিতে তা অর্থহীন। কিন্তু বিশেষজ্ঞের চোখে এরই মধ্যে ধরা পড়েছে সারি সারি হরফে সাজানো এক সাংকেতিক লিপি— যুগযুগান্ত পূর্বে যে লিপিকারের মৃত্যু হয়েছে, ধরণীর বুক থেকে মুছে গেছে যার রাজ্যপাট।

কার্ডবোর্ডের বাক্স থেকে বেরুল ভাঁজ করা আর একটা ছোট্ট কাগজ। ভাঁজ খুলে কৃষ্ণদাসবাবু বললেন —'মাপজোক ওজনগুলো এতেই লিখে রেখেছে প্রহ্লাদ। থাক, কাজে লাগবে।'

চঞ্চল তীক্ষ্ন চোখে শীলমোহরটার দিকে তাকিয়ে ছিল ইন্দ্রনাথ। এখন সন্তর্পণে দুই আঙুল দিয়ে ধরে সিলিন্ডারটা আনল চোখের ইঞ্চি কয়েক দূরে। ধীরে ধীরে দুই চোখে ফুটে উঠল বিচিত্র বিস্ময়। আমিও যেন আবিষ্ট হয়ে পড়ছিলাম সোনার চোঙার সূক্ষ্ম লিপি দেখে। কত ছোট অথচ কত অর্থবহ। একবার দেখলেই মনের মধ্যে গভীর দাগ কেটে যায়। হাজার হাজার বছর আগে সুদূর সেই পৌরাণিক যুগে মহাপরাক্রমশালী এক নৃপতির হাতে শোভা পেয়েছে এই শীল, হয়তো তিনি সর্বক্ষণ অঙ্গে ধারণও করেছেন। কত সহস্র হতভাগ্যের জীবনদীপ নিভে গেছে এই শীলাঙ্কিত আদেশের বলে, কত সহস্রের ভাগ্যের চাকা সুদিনের মুখ দেখেছে এরই নির্দেশে।

আমি যখন আবেগবিহ্বল, ইন্দ্রনাথ তখন বৈজ্ঞানিক তন্ময়তায় বিভোর। চুলচোরা বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে শীলটির প্রতিটি বৈশিষ্ট্য। তাতেও সন্তুষ্ট হল না। নিত্যসঙ্গী 'রিসার্চ কেস' থেকে বেরুলো ম্যাগনিফাইং গ্লাস। প্রান্তদুটো অনেকক্ষণ দেখার পর কেন্দ্রের ছিদ্রের মধ্যে দিয়েও চোখ চালাল।

অবশেষে কৃষ্ণদাসবাবুর হাতে ধরা কাগজের টুকরোটায় চোখ বুলিয়ে বললে—'দেখছি একটা ডায়ামিটারেরই মাপ রয়েছে, খুব সম্ভব এক্সপার্ট ভদ্রলোক ভেবেছিলেন শীলটা অরিজিনাল, তাই দুটো মাপ নেননি। কিন্তু আমি তো তা দেখছি না। এর ডায়ামিটার এক এক জায়গায় এক এক রকম। চোঙা যেরকম পরিষ্কার গোলাকার হওয়া উচিত, এটা সেরকম নয়। দু-পাশও সমান্তরাল নয়।'

বলতে বলতে রিসার্চ কেসের আরেক পকেট থেকে ইন্দ্রনাথ বার করল 'ক্যালিপার' মাপকাঠি। সিলিন্ডারের এক প্রান্তে দুপাশে ক্যালিপারের চোয়াল দুটো ঠেকিয়ে মনে মনে হিসেব করে নিলে ভার নিয়ার স্কেলের

রিডিংটা। তারপর সিলিন্ডারের ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে সরিয়ে অপর প্রান্তে ক্যালিপার নিয়ে যেতেই শুধু চোখেই দেখা গেল, চোয়াল দুটো আর সিলিন্ডারের গা স্পর্শ করছে না, খানিকটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে।

মাপকাঠির মুখ দুটো সিলিন্ডারের পাশে ঠেকিয়ে আবার রিডিং নিল ইন্দ্রনাথ। তারপর বললে—'দু-মুখে তফাত প্রায় দু-মিলিমিটারের মতো।'

ত্রিপুরারিবাবু বললেন—'মিউজিয়ামের এক্সপার্ট ভদ্রলোকের আপনার মতো অত হিসেবী চোখ নেই। অঙ্ক-টঙ্কও নিশ্চয় কম জানেন। তাছাড়া এত নিখুঁত মাপজোকে কিছু আসে যায় না।'

'আমি বলব, আসে যায়,' ঝটিতি জবাব দিল ইন্দ্রনাথ। 'ভুল মাপজোকেই বরং কোনও প্রয়োজন নেই।'

সবার দেখা হয়ে যাবার পর শীলটা আবার কাগজে মুড়ে প্যাক করে ফেললেন কৃষ্ণদাসবাবু। তারপর আয়রন সেফের যথাস্থানে রেখে সদলবলে ফিরে এলাম হলঘরে।

ত্রিপুরারিবাবু জিগ্যেস করলেন—'ইন্দ্রনাথবাবু, সব তো দেখলেন। এখন বলুন তো ইন্সিওয়েন্সের প্রশ্নটার কিছু সুরাহা হল কিনা।'

'না।'

'তবে?'

যতক্ষণ পুলিশী তদন্ত শেষ না হচ্ছে, ততক্ষণ এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া সমীচীন হবে না। এখন আমরা চলি। সারাদিন অনেক ঝামেলা পোহাতে হবে আপনাদের।'

'তা ঠিক,' নিরাশমুখে বললেন ত্রিপুরারিবাবু। 'আমি আর এগোলাম না।'

'ঠিক আছে, আমরা নিজেরাই যাচ্ছি।' অত্যন্ত বিনীতভাবে এগিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত করে ফটকের বাইরে পা দিল ইন্দ্রনাথ।

দু-পা এগিয়ে আমি বললাম—'বড় গোলমেলে কেস। কোনও সুরাহাই হল না। অবশ্য সব সময়েই যে লক্ষ্যভেদ করা যাবে, এমন কোনও কথা নেই।'

'ঠিক বলেছ। আমাদের প্রাথমিক কাজ হল চোখ কানের সদ্ব্যবহার করে 'ফ্যাক্ট'গুলো মনে মনে সাজিয়ে নেওয়া। অঙ্ককষা সিদ্ধান্ত আসবে পরে। সেই জন্যেই আবার জঙ্গলের শর্টকাট ধরতে হবে আমাদের।'

'কেন বলো তো! ট্রেনের এখনো অনেক দেরি।'

'সেইজন্যেই তো। পায়ের ছাপগুলোর ছাঁচ নিয়ে যেতে চাই। কাজে লাগতে পারে।'

'বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?'

'নিশ্চয় না।'

বাধা দিলাম না। জানি তো, ইন্দ্রনাথ রুদ্রের গাণিতিক মন উদ্দেশ্য ছাড়া কখনো এনার্জি ব্যয় করে না। সুতরাং অচিরেই পৌঁছোলাম জঙ্গলের সেই কাদামাটি অঞ্চলে এবং সবচাইতে স্পষ্ট দুজোড়া পদচিহ্ন বেছে নিয়ে রিসার্চ কেস থেকে ইন্দ্রনাথ একে একে বার করল প্লাস্টার টিন, জলের বোতল, চামচে আর ছোট্ট একটা অ্যালকাথিন বাটি।

উদ্যোগপর্ব দেখে কৌতুক অনুভব করলাম। শেষ পর্যন্ত বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া না হয়। অ্যামবাসাডর জুতোর চিহ্ন নিঃসন্দেহে মৃত ব্যক্তির। কিন্তু তাতে কি? আরেক জনের পায়ের ছাপের ছাঁচ তুলেও কোনও লাভ আছে কি? লোকটা এখনো অজ্ঞাত। এখানে তার হাজির থাকাটাও এমন কিছু সন্দেহজনক নয়—অন্তত এখানো পর্যন্ত।

দু-জোড়া পদচিহ্নের ওপর তরল প্লাস্টার ঢেলে দিল ইন্দ্রনাথ এবং তারপর যা করল তা রীতিমতো দুর্বোধ্য।

বাটির মধ্যে আরো খানিকটা প্লাস্টার গুলে অজ্ঞাত ব্যক্তির পায়ের ছাপের পাশেই ছড়ির দুটো গর্তে ঢেলে দিল। তারপর রিসার্চ কেস থেকে একরীল সুতো বার করে গজ দুয়েক ছিঁড়ে নিয়ে দু-হাতে টান করে

এমনভাবে ধরল যাতে সুতোটা গর্তদুটোর ঠিক মাঝখান দিয়ে যায়। আস্তে আস্তে প্লাস্টার জমে যেতে সুতোও আটকে রইল তার মধ্যে।

কিন্তু এখনো গর্ত থেকে তোলার মতো শক্ত হয়নি প্লাস্টার ছাঁচ। তাই এবার পায়ের ছাপের ছাঁচগুলো তুলে নিয়ে রাখলে কেসের মধ্যে। তারপর আস্তে আস্তে তুলল ছড়ির গর্তের ছাঁচদুটো। একই ছড়ির দু-দুটো তুষারশুভ্র ফেরুল ছাঁচের দিকে অনিমেষ নয়নে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে পেনসিল দিয়ে একটা ছাঁচের ওপর কি চিহ্ন দিতে লাগল ইন্দ্রনাথ।

আমি বললাম—'দুটো ছাপের মধ্যে ফাঁকটুকু সুতোর মাপ থেকেই জানা যাবে, তাই না?'

'এত কাণ্ড অবশ্য সেজন্যে করিনি,' বলল ইন্দ্রনাথ। 'এ থেকে বোঝা যাবে ঠিক কোনও দিকে হেঁটেছে লোকটা, ছড়ির সামনে পেছনটাও জানা যাবে।'

খুবই উচ্চস্বরের মৌলিক পদ্ধতি, কোনও সন্দেহই নেই তাতে। কিন্তু লাভটা কি? এত কাণ্ড করে কিছু প্রমাণ করা গেলেও না হয় বুঝতাম।

কৌতূহল চাপতে না পেরে দু-চারটে প্রশ্ন করেছিলাম। কিন্তু চিরাচরিত পন্থা অবলম্বন করল ইন্দ্রনাথ, অর্থাৎ হঠাৎ মৌন হয়ে গেল। একবার শুধু বললে, ক্ল্যাইম্যাক্সে না পৌঁছোনো পর্যন্ত টুকটাক সাক্ষ্য জোগাড় করতেই হবে। কিন্তু ক্লাইম্যাক্সটা কোথায়, তার জবাব পেলাম না।

হাওড়ায় পৌঁছে ইন্দ্রনাথ একটা ট্যাক্সি নিয়ে গেল লালবাজারে। বলে গেল—'সন্ধেবেলা মেসে এসো। অনেক কথা আছে।'

সন্ধেবেলা যেতেই দেখি চিৎপাত হয়ে শুয়ে ইন্দ্রনাথ কাঁচি টানছে আর কড়িকাঠ নিরীক্ষণ করছে। আমাকে দেখেই বলে উঠল—'এসো মৃগ, এসো। কিন্তু কোনও প্রশ্ন নয়। কেসটা এখনো ধোঁয়াটে। একদিকে ঢিল ছুঁড়েছি, দেখি লাগে কিনা। কাল সকালে হাতে কাজ আছে?'

'না। কিন্তু কখন?'

'কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে আটটায় এখানে চলে এসো। শীলমোহর রহস্য নাটিকার শেষ অঙ্কটা দেখবার সৌভাগ্য হলেও হতে পারে। নাও হতে পারে। সবটাই তোমার কপাল আর আমার হাতযশ!'

পরের দিন সকাল। ফ্রি স্কুল স্ট্রিট।

কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে আটটায় সময়ে ইন্দ্রনাথের মেসের সামনে হাজির হয়ে দেখেছিলাম একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। সিঁড়িতে পা দিতে না দিতেই বন্ধুবর নিজেই তরতর করে নেমে এসেছিল নীচে।

ট্যাক্সি সঙ্গে সঙ্গে ছেড়েছে এবং যথা সময়ে এসে দাঁড়িয়েছি ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে।

ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে একটা মস্ত কালো ঢাকা গাড়ির পাশে আসতেই ওদিক থেকে উঁকি দিল সহাস্য মুখ। আমাদের প্রিয় বন্ধু ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর জয়ন্ত চৌধুরী। পরনে আদ্দির পাঞ্জাবি। মুখে বর্মা চুরুট।

ইন্দ্রনাথ বললে—'রিপোর্ট কী?'

'কাল সন্ধে থেকেই তোমার কথামতো সাদা পোশাকে দুজন গোয়েন্দা পাহারা দিচ্ছে। এখনও কিছু ঘটেনি।'

'ঘটবেই যে এমন কোনও কথা নেই। যুক্তির সিধে সড়কে চলেছি, যা সম্ভাব্য তা যদি সত্য হয়, তাহলে কেল্লা ফতে। নইলে ফস্কাগেরো।'

'এরকম কথা এর আগেও তোমার কাছে হাজার খানেক বার শুনেছি। কিন্তু...ওই যে...ওই যে...এসে গেছে তোমার লোক।'

একটা দোকানের পাল্লা খুলে ফুটপাত নামল এক প্রৌঢ়। নেমে দরজায় তালা দিয়ে এগোলো ফুটপাত ধরে। লোকটা মাথায় দিব্বি লম্বা। শীর্ণ। ট্রাউজার্স ঢাকা লম্বা লম্বা বকের মতো পা। চলার ধরনটা কেমন জানি অদ্ভুত। বোধহয় শিরদাঁড়ায় কোনও ব্যারাম আছে। তাই ডান হাতের ছড়িতে ভর দিয়ে হাঁটছে আড়ষ্টভাবে মন্থর চরণে। অপর হাতে ঝুলছে একটা কাঠের চৌকোণা বাক্স।

মেরুদণ্ডের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ শিহরণ বয়ে গেল ছড়িটা দেখে। হাতির দাঁতের হাতল। চওড়া রূপোর পটি। শক্ত মালাক্কা বেত। ঠিক যেমনটি দেখে এসেছি কৃষ্ণদাস চক্রবর্তীর হাতে। হুবহু একই রকম।

আমরা কথা বলতে বলতে যে রকম হাঁটছিলাম হাঁটতে লাগলাম। ধীর চরণে আমাদের পেরিয়ে গেল জন মার্টিন (নিঃসন্দেহে লোকটা জন মার্টিন, তা না হলে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের দোকান থেকে বেরোবে কেন?) আমরা পেছনে এসেই ঘুরে গিয়ে অনুসরণ করলাম। ঠিক তখনি লক্ষ্য করলাম দুজন পালোয়ান গোছের শক্তসমর্থ পুরুষ দূর থেকে পিছু নিয়েছে জন মার্টিনের। দমকল স্টেশনের সামনে এসেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল মার্টিন। সঙ্গে সঙ্গে চাপাকণ্ঠে বলল ইন্দ্রনাথ— 'জয়ন্ত, আর দেরি নয়। গাড়ি কই?'

মুখের কথা খসতে না খসতেই সেই ঢাকা মস্ত কালো গাড়িটা নিঃশব্দে ব্রেক কষলো পাশে। টপাটপ ভেতরে লাফিয়ে উঠলাম আমরা তিনজনে। মুশকো চেহারার লোকদুটোও যেন তৈরি ছিল, দ্রুতপায়ে এগিয়ে এসে টুক করে উঠে বসল ভেতরে। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় নিঃশব্দে পিছনে সামনে এগিয়ে গেল গাড়ি।

সামনের ট্যাক্সিটা তখন লিন্ডসে স্ট্রিট দিয়ে চলেছে সিধে চৌরঙ্গী রোডের দিকে। রেড সিগন্যাল থাকায় সামান্যক্ষণ দাঁড়াতে হল। তারপরেই ডান দিকে মোড় নিয়ে চলল এসপ্ল্যানেডের দিকে। সুরেন ব্যানার্জি রোডের কাছাকাছি গিয়ে বাঁ-দিকে মোড় দিয়ে ঢুকে পড়ল রানী রাসমণি রোডের মধ্যে। তারপর সুভাষ বোসের স্ট্যাচু প্রদক্ষিণ করে তিরবেগে এসে দাঁড়াল গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের সামনে।

জন মার্টিন ভাড়া মিটিয়ে নামবার আগেই আমরা হোটেলের হলে ঢুকে বসে পড়লাম দেওয়াল ঘেঁষা সোফাসেটে। মিনিটখানেকের মধ্যেই লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে ঢুকল জন মার্টিন। ঢুকে থমকে দাঁড়াল। ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগল যেন কারো আশায়।

হলের এককোণে একজন শ্বেতকায় ব্যক্তি বসে ম্যাগাজিন দেখছিল। লাল মুখ। কদমছাঁট সোনালি চুল। পরনে সিনথেটিক ফাইবারের ট্রাউজার্স আর বুশশার্ট। দশাসই চেহারা।

জন মার্টিনের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ম্যাগাজিন রেখে এগিয়ে এল শ্বেতকায় পুরুষ।

আর ঠিক তখনি, সোফা ছেড়ে উঠে জন মার্টিনের কাঁধে হাত রাখল জয়ন্ত।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো ঘুরে দাঁড়াল জন মার্টিন। তার চোখের তারায় নিবিড় শঙ্কা।

কর্তব্যকঠিন স্বরে জয়ন্ত বললে—'মিঃ মার্টিন। আমি একজন ডিটেকটিভ অফিসার।'

বলতেই, ছাইয়ের মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেল জন মার্টিন। চোখে চোখ রেখে শক্ত গলায় বললে জয়ন্ত —'আপনার হাতে যে ছড়িটা দেখছি, তা তো আপনার নয়।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল জন মার্টিন। বলল—'ঠিক বলেছেন। কার ছড়ি, তা জানি না। আপনার জানা থাকলে ফিরিয়ে দিতে পারেন। আসলে ভুল করে ছড়ি বদলাবদলি করে ফেলেছি। দয়া করে আমারটা যদি আমাকে ফিরিয়ে দেন তো উপকৃত হব।'

বলে, ছড়িটা এগিয়ে দিল জন মার্টিন। জয়ন্ত সেই ছড়িটা নিয়ে এগিয়ে দিলে ইন্দ্রনাথের হাতে। আমরা দুজনেই ততক্ষণে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম জয়ন্তর দুপাশে।

'এইটাই তো?' বললে জয়ন্ত।

নিরুত্তরে ছড়িটার আগাপাশতলা দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেল ইন্দ্রনাথ। তীক্ষ্ণ সন্ধানী এক্সরে চোখ দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিলে প্রতিটি বৈশিষ্ট্য। বিশেষ করে পরীক্ষা করল ফেরুলটা। পকেট থেকে 'ক্যালিপার গজ' বার করে দু-জায়গার ব্যাসের মাপও নিলে এবং নোটবই খুলে আগে থেকেই লেখা কিছুর সঙ্গে মিলিয়ে নিলে ফলাফলটা।

অধীর হয়ে পড়েছিল জন মার্টিন। আঙুল মটকাতে মটকাতে এখন বললে—'আরে মিস্টার, খামোকা দাঁড় করিয়ে রেখেছেন কেন আমাকে? এত মাপজোকের দরকার আছে কি? বললাম না আমার ছড়ি নয়।'

'সত্যি কথাই বলেছেন, 'বললে জয়ন্ত। 'সেই কারণেই আপনার সঙ্গে কিছু প্রাইভেট কথা আছে। কথা ছিল এই ছড়িটা সম্বন্ধেই।'

এই সময়ে উদ্বিগ্নমুখে ছুটতে ছুটতে এল হোটেল ম্যানেজার। পেছন পেছন সাদা পোশাক পরা একজন গোয়েন্দা। জয়ন্ত ঘুরে দাঁড়াতেই ম্যানেজার জানালে, কথাবার্তাগুলো প্রাইভেট অফিস রুমে হলেই ভালো হয়। প্রকাশ্যে হওয়াটা হোটেলের মর্যাদার পক্ষে হানিকর।

জয়ন্ত বললে—'তাই ভালো। চলুন।'

আমরা পা বাড়িয়েছি, এমন সময়ে শ্বেতাকায় ভদ্রলোক নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল জন মার্টিনের সামনে। বাক্সটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে—'দিন আমাকে।'

মাঝখানে এসে দাঁড়াল জয়ন্ত—'এখন নয়। মিঃ মার্টিন আপনার সঙ্গে পরে কথা বলবেন।'

'বাক্সটা আমার। আপনি কে?'

'পুলিশ অফিসার। বাক্সটা যদি আপনারই হয়, তাহলে বরং আমাদের সঙ্গে এসেই নজর রাখুন।'

শুনেই আমসির মতো শুকিয়ে গেল শ্বেতকায় পুরুষের মুখ। চোখে মুখে ফুটে উঠল রীতিমতো অস্বস্তি। জন মার্টিনের মুখের রক্তও আবার যেন ব্লটিং পেপার দিয়ে নিমেষে কে শুষে নিল।

ম্যানেজারের পেছন পেছন আমরা এলাম নিভৃত একটা সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে। দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বিদায় নিল ম্যানেজার।

জয়ন্ত বলল—'মিঃ জন মার্টিন, বাক্সটার মধ্যে কি আছে আমি জানতে চাই।'

জবাব এল শ্বেতকায় আগন্তুকের দিক থেকে—'উত্তরটা আমি দিচ্ছি। ওর মধ্যে আছে ভারতীয় মূর্তিশিল্পের একটা নিদর্শন। জিনিসটা আমার।'

'খুলে দেখান।'

টেবিলের ওপর বাক্সটা রেখে দড়ির বাঁধনটা আস্তে আস্তে খুলতে লাগল জন মার্টিন আর কপাল থেকে বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরে পড়তে লাগল বাক্সের ওপর। আলতারাপ খুলে ডালা খুলতেই দেখা গেল একটা প্লাস্টারের ছাঁচ। দেখেই চিনতে পারলাম আমি। শ্রবণবেলাগোলার গোমতেশ্বরের নগ্নমূর্তি। ষাট ফুট লম্বা গোমতেশ্বরের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ছ'ইঞ্চি প্রতিমূর্তির মধ্যে।

খড় আর কাগজের দলা দিয়ে প্যাক করা ছিল মূর্তিটা। দলাগুলো একে একে বার করে আনতে লাগল জন মার্টিন। স্পষ্ট দেখা গেল, আঙুলের ডগাগুলো কাঁপছে থর থর করে। সবশেষে মূর্তিটা সন্তর্পণে বাইরে এনে তুলে দিল জয়ন্তর হাতে।

শূন্য বাক্সটার মধ্যে সন্ধানী চোখ বুলিয়ে মূর্তিটা হাতে নিল জয়ন্ত। বলল—'ভিজে ভিজে মনে হচ্ছে।'

ইন্দ্রনাথ পাশে দাঁড়িয়েছিল। তন্নিষ্ঠ হয়ে তাকিয়েছিল সাদা গোমতেশ্বরের দিকে। এখন আস্তে আস্তে মূর্তিটা তুলে নিলে নিজের হাতে, তারপর হাতের তালুতে আলতো করে বসিয়ে অনুভব করতে লাগল মনে মনে। এই সময়ে আমার চোখ পড়ল জন মার্টিনের ওপর। অবাক হয়ে গেলাম তার মুখচ্ছবি দেখে। নিঃসীম আতঙ্কে বিস্ফারিত তার দুই চক্ষু। স্নায়বিক উত্তেজনায় কাঁপছে ঠোঁটের পাশের মাংসপেশী। শ্বেতকায় ভদ্রলোক কিন্তু একেবারেই নির্বিকার।

নির্বিকার ভাবটা ঘুচে গেল আচমকা। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে চেঁচিয়ে উঠল বিকট গলায়—'করছেন কি, করছেন কি! পড়ে যাবে যে!'

বলতে বলতেই ইন্দ্রনাথের তালু থেকে খসে পড়ল গোমতেশ্বর এবং ধেয়ে গেল পাথরে বাঁধানো মেদিনী লক্ষ্য করে। দুর্ঘটনা যে ইচ্ছাকৃত, তা ওর হাতের চেটো উপুড় করা ভঙ্গিমা দেখেই বুঝলাম।

মেঝের ওপর দমাস করে পড়েই টুকরো টুকরো হয়ে গেল গোমতেশ্বর প্রতিমূর্তি। তুষারশুভ্র অংশগুলো ছিটকে গেল দৃষ্টির আড়ালে।

আর, ধ্বংসাবশেষের মধ্যে থেকে ছোট্ট একটা হলদে রঙের ধাতুর সিলিন্ডার ধীরে ধীরে গড়িয়ে গেল মেঝের ওপর।

তৎক্ষণাৎ বাঘের মতোই সেদিকে ঝাঁপ দিল আগন্তুক এবং ততোধিক ক্ষিপ্রতায় তারও আগে হেঁট হয়ে চট করে মেঝে থেকে সিলিন্ডারটা কুড়িয়ে নিল জয়ন্ত।

বলল—'ওহে ইন্দ্রনাথ, জিনিসটা কি বলো তো?'

'নেবুচাডনেজারের শীলমোহর।'

'কার সম্পত্তি?'

'প্রহ্লাদ চক্রবর্তীর।'

'কিন্তু তিনি তো—!'

'পরশু রাতে খুন হয়েছেন!'

কথাটা শেষ হতে না হতেই অস্ফুট চিৎকার করে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ল জন মার্টিন—বুঝলাম জ্ঞান হারিয়েছে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজা লক্ষ্য করে অবিশ্বাস্য বেগে ধেয়ে গেল শ্বেতকায় পুরুষ। কিন্তু চৌকাঠেই মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়ে গেল গাঁট্টাগোট্টা গোয়েন্দা দুজনের সঙ্গে এবং পরমুহূর্তেই ক্লিক শব্দে মণিবন্ধে এঁটে দিল লৌহবলয়।

বাড়ি ফিরলাম হাঁটাপথে। হাঁটতে হাঁটতে ইন্দ্রনাথকে বললাম,—'পায়ের ছাপ আর ছড়ির ডগার ছাঁচগুলো তাহলে কোনও কাজেই এল না। মিছে পণ্ডশ্রম করলে।'

'উঁহু। এর পরেই তো প্রয়োজন ওদের। জন মার্টিনকে ফাঁসি দেওয়ার পক্ষে শীলমোহরটা যদি যথেষ্ট প্রমাণ না হয়, তখন এই ছাঁচগুলোই হবে অকাট্য প্রমাণ।'

সত্যি তাই হয়েছিল। মামলা চলার সময়ে কেটে বেরিয়ে গেল জন মার্টিন—শীলমোহরটা নাকি একজন এসে দোকানে বিক্রি করে গেছিল। লোকটাকে সে চেনে না। ঠিক সেই মুহূর্তে জন মার্টিনের পা আর ছড়ির ছাঁচ হাজির করা হল আদালতে এবং অবিসম্বাদিতভাবে প্রমাণ হয়ে গেল যে হত্যার রাত্রে প্রহ্লাদ চক্রবর্তীর বাড়ির কাছেই হাজির হয়েছিল জন মার্টিন। এরপর স্বীকারোক্তি আদায় করতে বেশি বেগ পেতে হয়নি।

যাই হোক, আমি জিগ্যেস করলাম—'কিন্তু মার্টিনকে তুমি সন্দেহ করলে কী করে বলো তো? জঙ্গলের মধ্যে ছড়ির গর্ত দেখে কি? আমি তো সন্দেহ করার মতো অদ্ভুত কিছুই দেখতে পেলাম না।'

'অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য একটাই ছিল। গর্তগুলো যে ছড়ির সে ছড়ির প্রকৃত মালিক ছড়িধারী নয়।'

'ইন্দ্রনাথ, তুমি নিশ্চয় জ্যোতিষী নও? সামান্য কতকগুলো ছড়ির ছাপ দেখে ছড়ির আসল মালিক কে, তা কি বলা সম্ভব?'

'সম্ভব। আর সেইটাই হল অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য। সমস্ত ব্যাপারটাই নির্ভর করছে কীভাবে ছড়ির ফেরুল ক্ষয়েছে তার ওপর। যে ছড়ির হাতলটা সাদাসিধে গোল মত, তার ফেরুল সমান ভাবে চারদিকে ক্ষয়ে যায়। কিন্তু যে ছড়ির হাতলটা বেঁকা, তার ফেরুল ক্ষয়ে যায় হাতলটা যে দিকে বেঁকা ঠিক তার উল্টো দিকে, অর্থাৎ ছড়ির সামনের দিকে। তার কারণ, হাতল বেঁকা ছড়িকে একটা বিশেষ কায়দায় একই দিকে বাগিয়ে ধরতে হয়—ফলে একই অবস্থায় ক্রমাগত ছড়ি ধরার ফলে ফেরুলের বিশেষ একটা দিকই সমানে ক্ষইতে থাকে। কিন্তু সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টটা কি জানো? ক্ষওয়াটা কিন্তু ঠিক হাতলের উল্টো দিকে হয় না, সামান্য একদিকে ঘেঁষে। কারণ? ছড়ি নিয়ে হাঁটার সময়ে হাতলটা আমরা পেছনে দুলিয়ে হাঁটি। যখন এগিয়ে যাই, ছড়িটাকে দুলিয়ে পেছন থেকে সামনে নিয়ে আসি—আপনা হতেই ছড়িটা তখন পায়ের কাছ থেকে বাইরের দিকে সরে গিয়ে সামনে এগিয়ে যায়। আসবার সময়ে আবার পা ঘেঁষেই আসে। ফলে ছড়ির ফেরুল সব সময়েই ভেতর দিকে একটু বেশি ক্ষয়। সেই কারণেই, ডান হতে ছড়ি নিয়ে যে হাঁটে, তার ফেরুল ক্ষয় সামান্য বাঁদিকে। আর বাঁহাতে ছড়ি নিয়ে যে হাঁটে, তার ফেরুল ক্ষয় সামান্য ডান দিকে। কিন্তু ডান হাতে ছড়ি নিয়ে হাঁটা যার অভ্যাস, সে ল্যাটা মানুষের ছড়ি নিয়ে হাঁটলে জমির ওপর যে ছাপ পড়বে, তাতে দেখা যাবে ফেরুলটা খয়েছে ডান দিকেই বেশি—ডান দিক দিয়ে দুলিয়ে ছড়ি পেছন থেকে সামনে আনার ফলে ক্ষয়টা আরো বেশি মনে হবে। তখনই বুঝতে হবে, ছড়ির মালিকেরা ছড়ি বদলাবদলি করেছে। আমি যে

ছাপ দুটো কাল তুললাম, তাতেও দেখা গেল এই বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ ফেরুলটা ক্ষয়েছে ডান দিকেই। অতএব ছড়িটা যার সে ল্যাটা মানুষ। তা সত্ত্বেও ছড়ি নিয়ে ডান হাতে হাঁটা হয়েছে। অতএব, ছড়ির মালিক অন্য কেউ।

লোকটাকে যখন চিনিই না, তখন ছাপটার বৈশিষ্ট্যটুকু নিয়ে শুধু মাথা ঘামালাম, তার বেশি না। কিন্তু প্রহ্লাদ চক্রবর্তীর পা দেখার সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম, জঙ্গলের মধ্যে যে জুতোর ছাপ দেখেছি, সে জুতো আর ও জুতো একই। অর্থাৎ প্রহ্লাদবাবু জঙ্গলের রাস্তায় হেঁটেছিলেন। সুতরাং সঙ্গের ছড়িধারী লোকটিকে নিয়ে তৎক্ষণাৎ মাথা ঘামানোর দরকার হয়ে পড়ল। তারপরেই কৃষ্ণদাসবাবু তাঁর ছড়ি হারানোর কাহিনি বললেন। ছড়িটাও দেখালেন। কি দেখলাম জানো? দেখলাম, ছড়িটা যার সে ডান হাতেই ছড়ি ব্যবহারে অভ্যস্ত—প্রমাণ—ফেরুলের বাঁদিক ক্ষওয়া। কৃষ্ণদাসবাবু যে ছড়ি পেয়েছেন, তার মালিক ডানহাতে ছড়ি ধরায় অভ্যস্ত। আর জঙ্গলের রাস্তায় যে হেঁটেছে, তার ছড়ির মালিক বাঁ-হাতে ছড়ি ধরায় অভ্যস্ত, একেই বলে কাকতালীয়। এ থেকে কি সিদ্ধান্তে এলাম? প্রহ্লাদবাবুর অজ্ঞাত সঙ্গীটি কৃষ্ণদাসবাবুর টেম্পল চেম্বার্সের অফিসে ইন্টারভিউ দিতে এসেছিলেন অর্থাৎ শীলমোহর দখল করতে যারা উন্মাদ, লোকটি তাদের অন্যতম। কথাটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা প্রশ্ন মাথার মধ্যে দেখা দিল—লোকটা কি শীলমোহর নিয়ে যেতে পেরেছে? আয়রনসেফ খুলে দেখলাম পেরেছে।'

'আয়রনসেফের শীলমোহরটা তাহলে—'

'নকল।'

'সর্বনাশ!'

'খুব যত্ন করে করলেও খুবই খারাপ নকল। ইলেকট্রোটাইপ। চোঙাটার সবদিকে সমতাও রাখতে পারেনি জালিয়াত হত্যাকারী। ব্যাবিলোনিয়ান এক্সপার্ট যে মাপজোক লিখে রেখেছিলেন, তার সঙ্গেও মিললো না, আর মাঝের ফুটোর দু-প্রান্তে মাটি মাখিয়ে ময়লা করলেও মাঝখানটা সদ্য ড্রিলিংয়ের জন্য চক চক করছিল।'

'কিন্তু জন মার্টিনই যে জালিয়াত, তা জানলে কী করে?'

'তখনও আমি সঠিক জানতাম না। তবে অনুমান করেছিলাম। কেননা, জন মার্টিনের কাছে আছে শীলটার গড়ানো ছাপ যা থেকে ইলেকট্রো তৈরি করা সম্ভব। আর চ্যাপ্টা ইলেকট্রো গোল করে চোঙা বানিয়ে নেওয়ার মতো কারিগরি জ্ঞান তার আছে। কিউরিও নকল করায় জুড়ি নেই তার। সব চাইতে বড় কথা, চোরাই শীলমোহর পাচার করার ক্ষমতা তার আছে—কেননা কিউরিও কেনাবেচাই তার ব্যবসা। অবশ্য সবটাই অনুমিতি আর যুক্তিসিদ্ধ সম্ভাবনা। তাই অপেক্ষা করতে লাগলাম সিদ্ধান্তটা বাজিয়ে নেওয়ার জন্যে। জন মার্টিনকে দোকান ঘর থেকে ডান হাতে ছড়ি ধরে বেরিয়ে আসতে দেখেই বুঝলাম। কিস্তিমাত।'

'শীলমোহরটা যে গোমতেশ্বরের মূর্তির মধ্যে লুকানো ছিল, সেটাও কি অনুমান?'

'ইন্ডিয়া থেকে আমেরিকায় শীলমোহরের মতো ছোট্ট একটা জিনিস স্মাগল করে নিয়ে যাওয়ায় সব চাইতে নিরাপদ পন্থা হল জিনিসটাকে প্লাস্টার ছাঁচের মধ্যে গেঁথে নেওয়া। আমি এই রকমই একটা কিছু আন্দাজ করছিলাম। মূর্তি দেখে আর সন্দেহ রইল না। হাতে নিয়ে বুঝলাম তখনও ভিজে ভিজে। অর্থাৎ মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে তৈরি ছাঁচ—প্লাস্টার এখনও শুকিয়ে খটখটে হয়নি। তাই ভেঙে ফেললাম। আমার ভুল হলেও ক্ষতি ছিল না। পাঁচ দশ টাকা দিলে ওরকম ছাঁচ অনেক পাওয়া যায়।'

'প্রহ্লাদবাবুকে জন মার্টিন কী করে বিষ খাওয়ালো বলো তো?'

'সেটা এখনো সঠিক জানি না, অনুমান করতে পারি। খুব সম্ভব, সঙ্গে করেই খানিকটা সায়ানাইড সলিউশন নিয়ে গেছিল মার্টিন। সুযোগ বুঝে মিশিয়ে দেবে হুইস্কির গেলাসে। এক চুমুক খেয়েই মিনিটখানেকের মধ্যে শেষ হয়ে গেছেন প্রহ্লাদবাবু। তবে গেলাসটা ধুয়ে তাকে রেখে যাওয়াটা ভুল হয়েছে জন মার্টিনের।'

'একটা হেঁয়ালির কিন্তু এখনো সমাধান হয়নি। দরজায় ছিটকিনি ভেতর থেকে দেওয়া ছিল। লোকটা বেরোল কী করে?'

'খুব সহজে। খিলটা খোলা ছিল। লাগানো ছিল শুধু ছিটকিনি। লক্ষ্য করেছ নিশ্চয় ছিটকিনির ফুটোটা মেঝের ওপর। অর্থাৎ ছিটকিনিটা ঘাঁটি থেকে নামিয়ে মেঝের ওপর রেখেছে জন মার্টিন। তারপর বাইরে গিয়ে দরজা টেনে বন্ধ করে দিতেই ছিটকিনি পড়ে গেছে মেঝের ফুটোয়।'

নেবুচাডনেজারের সোনার শীলমোহরের চাঞ্চল্যকর মামলা অনেক দিন ধরে চলেছিল। শেষ পর্যন্ত ছাড়া পেয়ে যায় আমেরিকান ভদ্রলোক। কিন্তু ফাঁসি হয়ে যায় জন মার্টিনের।

** 'প্রসাদ' (অগাস্ট, ১৯৬৮) পত্রিকায় প্রকাশিত।*

আটটা ঝিনুকের বোতাম

বন্ধুবর ইন্দ্রনাথের গুণ অনেক। সে ভারত বিখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ। মিষ্ট ভাষণে তার জুড়ি নেই। অনুভূতির সূক্ষ্মতায় তাকে শিল্পী বলা চলে। বুদ্ধির তীক্ষ্নতায় সে ইন্ডিয়ান শার্লক হোমস।

কিন্তু চাঁদেরও কলঙ্ক থাকে। ইন্দ্রনাথেরও একটা বদ দোষ আছে। তা হল তার অহংভাব। পাঁচজনের সামনেই এমন টিটকিরি মেরে বসে যা শুনে কান-টান ঝাঁ-ঝাঁ করে ওঠে।

সেদিন এই নিয়ে লঙ্কাকাণ্ড হয়ে গেল আমাদের মধ্যে।

রবিবারের বিকেলে ইন্দ্রনাথের মেসে গেছিলাম আমি আর গৃহিণী কবিতা। গিয়ে দেখি লক্কা পায়রার মতো এক ফুলবাবু জোড়হস্তে দাঁড়িয়ে।

ইন্দ্রনাথের ললাটে ভ্রূকুটি। এবং যেন কিছু বিব্রত।

আমাদের দেখেই বললে—'এসো ভায়া এসো। বসো বউদি। তোমাদের কথাই হচ্ছিল।'

কালো চোখ নাচিয়ে লাল ঠোঁট বেঁকিয়ে কবিতা বললে—'কী সৌভাগ্য আমাদের।'

'কিন্তু উপলক্ষ্যটা কী?' জিগ্যেস করলাম আমি।

'এই ভদ্রলোকের নাম লম্বোদর লস্কর। আর ইনিই সেই কুখ্যাত সাহিত্যিক মৃগাঙ্ক রায়। জীবনসঙ্গিনী কবিতা রায়। যাঁদের কথা আপনাকে বলছিলাম লম্বোদরবাবু।'

নমস্কার-প্রতিনমস্কারের পালা শেষ হলে বিনয়-গলিত হেসে লক্কাপায়রা যুবকটি বললেন— 'এজ্ঞে, আমি এসেছিলাম ইন্দ্রনাথবাবুর কাছে অ্যাপ্রেন্টিস হতে।'

'কীসের অ্যাপ্রেন্টিস?'

'গোয়েন্দাগিরির।'

হাসি চেপে বললাম—'তা, ইন্দ্রনাথ বলে কী?'

এজ্ঞে, উনি বলেন আপনাদের দ্বারাও যখন অ্যাদ্দিনে কিছু হয়নি, তখন আমার দ্বারাও হবে না।'

'কী!'

ফস করে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে ইন্দ্রনাথ বললে—'কথাটা কি মিথ্যে বলেছি, মৃগ? এতদিন ধরে আমার সাগরেদি করে শুধু ছাইভস্ম লেখা ছাড়া আর কিছু করতে পেরেছ আজ পর্যন্ত? বৌদির কথা বাদই দিলাম, মেয়েদের দ্বারা জগতে কোনও মহৎকর্ম সাধিত হয় না।'

মুখ লাল করে কবিতা বললে—'ঠাকুরপো তোমার বড় দেমাক হয়েছে।'

রেগে গিয়ে আমি বললাম—'সুযোগ এলে তোমার দর্প আমি চূর্ণ করব।'

অট্টহেসে ইন্দ্রনাথ বললে—'সুযোগ এসেছে।'

'কীরকম?'

জয়ন্ত ফোন করেছিল। 'রাঁদেভু হোটেলে' একজন খুন হয়েছে। বেরুতে যাচ্ছি এমন সময়ে এলেন লম্বোদরবাবু। তারপরেই তোমরা।'

'তাই নাকি? তাই নাকি?' জ্বলজ্বলে চোখে বললে লম্বোদর।

'চ্যালেঞ্জটা অ্যাকসেপ্ট করবে কিনা ভেবে দেখ, 'বলল ইন্দ্রনাথ। 'মুরোদ থাকে চলো আমার সঙ্গে। বউদি তুমিও এসো। লম্বোদরবাবু, যাবেন নাকি? গোয়েন্দা হওয়ার যোগ্যতা কার আছে আর কার নেই—তা জয়ন্তর সামনেই একটা টেস্ট কেসেই প্রমাণিত হয়ে যাক।'

গল্প-টল্প লিখে ইদানীং আমারও একটু দম্ভ হয়েছিল বোধহয়, তা না হলে লম্বোদয় লস্করের সামনে ইন্দ্রনাথের টিপ্পনীতে অত অপমানিত বোধ করব কেন।

তক্ষুনি লাফিয়ে উঠে বললাম—'চলো দেখা যাক কেরামতিটা কার বেশি।'

পাঞ্জাবির দিকে হাত বাড়িয়ে ইন্দ্রনাথ শুধু বললে—'চলো।'

পরে অবশ্য অনুতপ্ত হয়েছিলাম এই হঠকারিতার জন্যে।

পার্ক স্ট্রিট। রাঁদেভু হোটেল।

লবিতে গিজ-গিজ করছে পুলিশ, রিপোর্টার আর হোটেল-গেস্ট। কনক্রিট দেওয়ালের মতো পথ আটকে দাঁড়িয়ে সার্জেন্ট অচল দত্তর বিপুল দেহ। পাশেই দাঁড়িয়ে খর্বকায় এক পুরুষ। উদ্বেগের কালো ছাপ চোখে-মুখে। পরনে নেভী ব্লু সার্জ সুট, সাদা শার্ট আর কালো বো-টাই।

সপারিষদ ইন্দ্রনাথকে দেখে একগাল হেসে পার্শ্ববর্তী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে অচল দত্ত—'মিঃ পিটার ড্যানিয়েল। হোটেল ম্যানেজার।'

কাষ্ঠ হেসে করমর্দন করল পিটার ড্যানিয়েল। বলল—'ব্যাড। ভেরী ব্যাড। আপনি পুলিশের লোক?'

এমনভাবে মাথা নাড়ল ইন্দ্রনাথ যাতে হ্যাঁ-না দুই বোঝায়। লম্বোদরের মুখটা দেখলাম একটু শুকিয়ে গেছে পুলিশ দেখে। ফ্ল্যাশগান বাগিয়ে সাংবাদিকরা তাগ করছে, সুযোগ বুঝলেই শাটার টিপবে। একই রকম ধূসর রঙের শার্ট, প্যান্ট, টাই পরা হোটেল ক্লার্ক আর অন্যান্য কর্মচারীরা একযোগে প্যাট-প্যাট করে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। সব মিলিয়ে এমন একটা থমথমে পরিবেশ যে অস্বস্তি বোধ না করে উপায় নেই।

অচল দত্ত বললে—'লাশ চোখে পড়ার পর থেকে কেউ বাইরেও যায়নি, ভেতরেও আসেনি। ইন্সপেক্টর চৌধুরীর অর্ডার। এঁরা আপনার সঙ্গে যাবে তো?'

'হ্যাঁ। জয়ন্ত কোথায়?'

'তিন তলায়। রুম নং ১০৯।'

পা বাড়াল ইন্দ্রনাথ। কয়েক ধাপ উঠে এসে মুচকি হেসে বললে—'চলো হে গোয়েন্দারা। এখনি নার্ভাস হলে চলবে কেন?'

কবিতা কিছু বলল না। তবে মুখ দেখে বুঝলাম সহজ হবার চেষ্টা করছে বেচারি।

১০৯ নাম্বার কামরার সামনেই পেছনে হাত দিয়ে পায়চারি করছিল ডিটেকটিভ জয়ন্ত চৌধুরী—আমাদের বাল্যবন্ধু।

জয়ন্তর ললাট চিন্তাকুটিল। কবিতাকে দেখে ভ্রূকুটি করে বললে—'কী ব্যাপার, একেবারে সদলবলে যে।' লম্বোদরকে লক্ষ্য করে—'ইনি কে?'

'আমার অ্যাপ্রেন্টিস।' বলল ইন্দ্রনাথ।

'অ্যাপ্রেন্টিস? তার মানে?'

'তার মানে শিক্ষার্থী। মৃগ আর বউদিকেও তাই বলতে পারো। এইটাই হল টেস্ট-কেস। বোর্ড অফ এগজামিনারের মধ্যে থাকছ তুমি আর আমি।'

ললাট রেখা সরল হয়ে গেল জয়ন্তর। এত চিন্তার মধ্যেও ফিক করে হেসে বললে—'বেশ তো, ভেতরে চলো।'

চোখ পাকিয়ে তাকাল কবিতা। আমারও প্রবল বাসনা হল দুকথা শুনিয়ে দেওয়ার। কিন্তু স্থান-কাল-পাত্র ভেবে মুখ বুজে রইলাম।

না থেকেও উপায় ছিল না। কেননা ঘরের মধ্যে যে দৃশ্য দেখলাম, তা দেখামাত্র শিরশির করে উঠল আপাদমস্তক।

পুরু কার্পেটের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে এক ব্যক্তি। দু-হাত ছড়ানো দুপাশে—সাঁতারুর মতো। কে যেন এক বালতি লাল রং ঢেলে দিয়ে গেছে মাথার ওপর...লাল রং জমাট বেঁধেছে কালো চুলে...গড়িয়ে এসেছে

ঘাড় বেয়ে।

নিষ্প্রাণ নিস্পন্দ দেহটির দিকে দেখলাম বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে লম্বোদয় লস্কর।

আর কবিতা? মৃত ব্যক্তির পাশে রক্ষিত শয্যার সাদা চাদরের চাইতেও বুঝি সাদা হয়ে গেছে তার মুখ। রক্তহীন। রংহীন।

এ হেন বীভৎস দৃশ্যের প্রতিক্রিয়া নিশ্চয় আমার মুখেও দেখা গিয়েছিল। তাই আমাদের তিনজনের মুখের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বিলক্ষণ হৃষ্টচিত্তে বলল ইন্দ্রনাথ রুদ্র—'বন্ধু জয়ন্ত, নাম-ধামগুলো এবার বলে ফেলো দিকি।'

'নাম, টংগু লিনচান। বয়স বিয়াল্লিশ। বার্মিজ খ্রিস্টান । বিয়ে হয়েছিল কলকাতায়। স্ত্রীর সঙ্গে ডাইভোর্স হয়েছে বছর দুই আগে। রিপ্রেজেন্টেটিভ। মালিকের চাল আর কাঠের কারবার আছে মান্দালয়ে। বছরখানেক সাউথ আফ্রিকায় ছিলেন। নেটিভদের মারধোর করায় বিতাড়িত হয়েছেন ব্রিটিশ আফ্রিকা থেকে। রাঁদেভু হোটেলে নাম লিখিয়েছেন হপ্তা খানেক আগে। দিন তিনেকের জন্যে ঢাকায় গিয়েছিলেন আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে। আজ সকালেই ফিরেছেন। সাড়ে ন'টার সময়ে হোটেলে ঢুকেছেন। বারোটা পাঁচে মরে পড়ে থাকতে দেখেছে পারুল।'

'পারুল কে? প্রশ্ন করে ইন্দ্রনাথ।

'ঝি। মানে, ঘরদোর ঝাঁটপাট দেয়।'

'টংগু লিনচানের আগের ইতিহাস?'

'খুব অল্পই পাওয়া গেছে। মিশুকে। সামাজিক। যদ্দূর জানা গেছে, শত্রু নেই। আফ্রিকা থেকে যে জাহাজে ফিরেছেন, সে জাহাজেও শত্রু সৃষ্টির মতো কিছু করেননি। তবে হ্যাঁ, টংগু লিনচান নাম্বার ওয়ান লেডি কিলার। বউকে ডাইভোর্স করার আগে থেকেই লটঘট ছিল একটা মেয়ের সঙ্গে। কারবারের নাম করে নাকি তাকে নিয়েই পালিয়েছিলেন আফ্রিকায়। ফেরবার সময়ে ভদ্রমহিলাকে ফেলে এসেছেন। কলকাতাতেও তাঁর এক প্রেয়সী আছে।'

'কাকে সন্দেহ হয়?'

চিন্তাচ্ছন্ন চোখে বর্মী পর্যটকদের মৃতদেহর দিকে তাকিয়ে বলল জয়ন্ত—'আজ সকালেই টংগু লিনচানের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল তার কলকাতার প্রেয়সী। নাম, ভায়োলেট অ্যালক্যাটরা। ভায়োলট চাকরি বাকরি করে না—অথচ ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে রানির হালে থাকে। টংগু যখন ঢাকায়, তখন একবার এসে খোঁজ করে গেছিল ভায়োলেট। এনকোয়ারী কাউন্টারে খোঁজ নিয়ে জেনেছিল আজ সকালেই মিঃ লিনচানের ফেরার কথা। তাই ভায়োলেট এসেছিল এগোরোটা পাঁচে। রুম নাম্বার নীচ থেকে নিয়ে লিফটে করে উঠেছিল তিন তলায়। কখন বেরিয়ে গেছে কেউ জানে না। দরজায় টোকা মেরে কারো সাড়া না পেয়ে চলে যায় ভায়োলেট। বাইরেও অপেক্ষা করেনি। টংগু লিনচানের সঙ্গে নাকি তার দেখাও হয়নি।'

ঠিক এই সময়ে মৃতদেহের চুলের ডগা থেকে নখের ডগা পর্যন্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে খাটের কিনারায় বসে পড়ল কবিতা।

সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম চাপা উল্লাসের রোশনাই ওর তমালকালো দুই চোখে। তবে কি...তবে কি সূত্রের সন্ধান পেয়েছে কবিতা?

নিরীহ কণ্ঠে বলল ইন্দ্রনাথ—'পা টনটন করছে বুঝি?'

কর্ণপাত না করে জয়ন্তকে জিগ্যেস করল কবিতা—'বউ কী বলে?'

'বউ? টংগু যে আফ্রিকা থেকে ফিরে এসেছেন, তাই নাকি সে জানে না—দেখা হওয়া তো দূরের কথা। সকালে চৌরঙ্গিতে গেছিল সিনেমার টিকিট কিনতে।'

গিন্নির তৎপরতায় আমার জড়তাও অন্তর্ধান করেছিল। জয়ন্তর কথা শুনতে শুনতে সন্ধানী চোখ বুলোচ্ছিলাম ঘরের এ-কোণ থেকে সে-কোণে—হঠাৎ পাওয়া কোনও সূত্রের আশায়।

ঘরটা আর পাঁচটা প্রথম শ্রেণির হোটেল ঘরের মতোই। বৈশিষ্ট্যহীন। সিঙ্গলবেড। ওয়ার্ডরোব। কাচের দেরাজ। নাইট টেবিল। চিঠি লেখার ডেসক। আর চেয়ার। স্রেফ ঘর সাজানোর জন্যে ডামি ফায়ারপ্লেস।—ওপরের তাকে টাইমপিস আর একসারি বিভিন্ন স্বাদের ইংরেজি নভেল।

মৃতদেহের পাশে নতজানু হয়ে বসে পড়ল ইন্দ্রনাথ। ঘাড়খানা সারস পাখির মতো বাড়িয়ে ঝুঁকে পড়ল লম্বোদয়। তাই দেখে চেয়ারে বসতে বসতে ফিক করে হেসে ফেলল জয়ন্ত চৌধুরী।

মৃতদেহটাকে চিৎ করে শুইয়ে দিল ইন্দ্রনাথ। রাইগর মার্টিসে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তখন আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে। হিমকঠিন দেহ আর পোশাকের ওপর দ্রুত হাত চালিয়ে নিয়ে বলল—'বউদি, মৃগ, লম্বোদরবাবু। শুরু করা যাক এবার। বউদি, তুমিই আগে বলো। বলো কী দেখেছ?'

টপ করে খাট থেকে লাফ দিয়ে নেমে এল কবিতা। বোঁ করে এক চক্কর ঘুরে এল লাশটাকে।

ইন্দ্রনাথ সকৌতুকে বললে—'ব্যাপার কী? এখনও কিছু চোখে পড়ল না? এতদিন কি বৃথাই গপপো শোনালাম তোমাকে?'

লাল ঠোঁটে টুক করে জিভ বুলিয়ে নিয়ে রুদ্ধশ্বাসে বললে কবিতা—'দেখছি পুরোদস্তুর বিলিতি পোশাক পরার অভ্যেস টংগু লিনচানের। পায়ে কার্পেট স্লিপার। আর হ্যাঁ—সিল্কের আন্ডারওয়্যার।'

'ঠিক, ঠিক। এ ছাড়াও আছে কালো সিল্কের মোজা আর গার্টার। কোট-প্যান্টে ওস্তাগরের নামও রয়েছে—'ম্যাকিনসনস, জোহানেসবার্গ।' আর কী?'

'বাঁ-হাতে একটা রিস্টওয়াচ। আর...আর ঘড়ির কাঁচটা চিড় খেয়ে গেছে। কাঁটা আর ঘুরছে না। দাঁড়িয়ে গেছে ১১-৫০ মিনিটের ঘরে।'

'চমৎকার! চমৎকার! জয়ন্ত, ডাক্তার কী বলে?'

'টংগু লিনচান মারা গেছেন এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে। আমার মনে হয়—'

জ্বলজ্বলে চোখে বলে উঠল কবিতা—তার মানে কি এই নয় যে—'

'ধীরে, ধীরে, বউদি। যদি কিছু মাথায় এসে থাকে, তবে তা মাথার মধ্যেই রাখো। ঝট করে সিদ্ধান্তে পৌঁছনো ভালো গোয়েন্দার লক্ষণ নয়। ব্যস, এবার তোমার ছুটি। লম্বোদরবাবু, আপনি কী দেখলেন?'

কপাল কুঁচকে হাতঘড়ির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল লম্বোদরবাবু। চওড়া চামড়ার ব্যান্ডওলা পুরনো মডেলের হাতঘড়ি। তারপর বললে চিন্তাচ্ছন্ন কণ্ঠে—'পুরুষের ঘড়ি। পড়ে গিয়ে ধাক্কা লাগার ফলেই কাঁটা আর নড়ছে না। চামড়ার ব্যান্ডের দ্বিতীয় গর্তে একটা খাঁজ দেখা যাচ্ছে—বাকল আঁটা রয়েছে এই গর্তেই। কিন্তু এছাড়াও দেখছি আরও একটা খাঁজ—আরও গভীর দাগ—তৃতীয় গর্তে'

'সাবাস! সাবাস লম্বোদরবাবু! তারপর?'

বাঁ-হাতে ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়েছিল—সে রক্ত এখন শুকিয়ে গেছে। 'বাঁ-হাতের তালুতেও রক্ত লেগেছিল—কিন্তু দাগটা অনেক আবছা, যেন রক্তমাখা তালু দিয়ে কিছু আঁকড়ে ধরেছিলেন টংগু লিনচান, তাই বেশির ভাগই মুছে গেছে তালু থেকে। একটু খুঁজলেই এই ঘরেই পাওয়া যাবে জিনিসটা—টংগু লিনচানের হাতের ছাপও রয়েছে তাতে।'

'লম্বোদরবাবু, আপনার মতো অ্যাপ্রেন্টিস পাওয়ায় আমি গর্বিত। ওহে, জয়ন্ত, রক্তমাখা হাতের ছাপ লাগা কিছু পেয়েছ ধারে কাছে?'

জয়ন্তর মুখের হাসি মিলিয়ে গেছিল। তীক্ষ্নচোখে বলল—'এক্সেলেন্ট। কিন্তু রক্তের দাগ লাগা সে-রকম কিছু তো পাইনি। কার্পেটেও তেমন ছাপ নেই। খুব সম্ভব হত্যাকারী তা সঙ্গে করেই নিয়ে গেছে।

কপাল কুঁচকে ইন্দ্রনাথ বলল—'তুমি পরীক্ষক, পরীক্ষার্থী নয়। কাজেই আর ইঙ্গিত দিও না। মৃগ, তোমার কিছু বলার আছে?'

তাড়াতাড়ি বললাম—'মাথার ক্ষত দেখে মনে হচ্ছে ভারী কিছু দিয়ে বেশ কয়েকবার চোট মারা হয়েছে। বিছানার চাদরের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে ধস্তাধস্তিও হয়েছিল। আর মুখটা—'

'বটে! বটে! বটে! মুখটাও লক্ষ্য করে ফেলেছ? বলো দেখি কি দেখছ?'

'সদ্য দাড়ি গোঁফ কামানো। গালে আর চিবুকে এখনও লেগে রয়েছে ট্যালকম পাউডার। বাথরুমটায় চোখ বুলোলে হত না?'

কাঁচুমাচু মুখে কবিতা বললে—'মুখটা আমিও লক্ষ্য করেছিলাম ঠাকুরপো। কিন্তু কথাই বলতে দিল না...পাউডারটা লাগানো হয়েছে মসৃণভাবে। কোথাও বেশি, কোথাও কম নয়।'

লাফিয়ে উঠে বলল ইন্দ্রনাথ—'বউদি, তোমার শার্লক হোমস হওয়া রোখে কে। জয়ন্ত, অস্ত্র পাওয়া গেছে?'

'পাথরের ভারী হাতুড়ি। এক্সপার্টের মতে, আফ্রিকান কিউরিও। বেজায় ভারী, কিন্তু এবড়ো- খেবড়ো পাথর। খুব সম্ভব টংগু লিনচানের ব্যাগের মধ্যেই ছিল হাতুড়িটা—ট্রাঙ্ক তো এখনো এয়ারপোর্ট থেকে এসে পৌঁছয়নি।'

ইন্দ্রনাথ আর কিছু বলল না। আনমনা চোখে তাকিয়ে রইল শয্যার দিকে। রেক্সিনের ট্র্যাভেলিং ব্যাগটা খাটের ওপরেই বসানো ছিল। পাশেই চারকোল গ্রে কালারের ইভনিং স্যুট—পরিপাটি ভাবে ভাঁজ করা কোট আর ট্রাউজার্স। সাদা শার্ট। হাতের বোতাম। সাদা সিল্কের রুমাল। খাটের তলায় দুজোড়া কালো বুট। এত জিনিস দেখেও যেন সন্তুষ্ট হতে পারল না ইন্দ্রনাথ। বার বার চোখ বুলোতে লাগল ঘরের অন্যান্য জিনিসগুলোর ওপর। অশান্ত চোখ। যেন কিছু একটা খচ খচ করছে বুকের মধ্যে। খাটের পাশেই চেয়ারে পড়ে একটা ময়লা শার্ট, একজোড়া ময়লা মোজা, ময়লা গেঞ্জি আর আন্ডারওয়্যার—কিন্তু রক্তের ছিটেফোঁটাও নেই ময়লা জামা কাপড়ে। চিন্তান্বিত ললাটে কার্পেটের দিকে তাকিয়ে রইল ইন্দ্রনাথ।

জয়ন্ত বললে—'হাতুড়িটা আমরা নিয়ে গেছি। রক্তে আর চুলে মাখামাখি হয়েছিল বলেই এক্সপার্টরা...আঙুলের ছাপ কিন্তু কোথাও পাওয়া যায়নি। যেখানে খুশি হাত দিতে পারো। সব কিছুরই ছবি তোলা হয়ে গেছে, আঙুলের ছাপও খোঁজা হয়েছে।'

নিরুত্তরে একটা কাঁচি ধরাল ইন্দ্রনাথ। আমি আর লম্বোদরবাবু হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম মৃতব্যক্তির পাশে। দুজনেরই উদ্দেশ্য রিস্টওয়াচটা আরো ভালোভাবে দেখা। কবিতা দেখলাম আঠার মতো লেগে রয়েছে ইন্দ্রনাথের পেছনে।

লম্বোদরের উৎসাহ একটু বেশি। তাই ঝটিতি কব্জি থেকে ঘড়িটা খুলে নিয়ে খুটখাট শুরু করে দিলে পেছনের ডালাটা নিয়ে এবং কি কৌশলে জানি না অচিরেই খুট করে খুলে ফেললে ডালাটা। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল সোল্লাসে—'পেয়েছি! পেয়েছি!'

ডালার পেছনে খানিকটা সাদা কাগজের ছিন্ন অংশ আঠা দিয়ে সাঁটা। যেন কিছু একটা টান মেরে ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে সেখান থেকে।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বললে লম্বোদরবাবু—'একটা আইডিয়া মাথায় এসেছে।' বলেই একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল টংগু লিনচানের নিষ্প্রাণ মুখের দিকে। সন্ধানী চোখে কি যেন খুঁজতে লাগল।

'মৃগ তুমি?' বলল ইন্দ্রনাথ।

ইন্দ্রনাথের মেস থেকে বেরুবার সময় তাক থেকে ওরই আতসকাচটা নিয়ে এসেছিলাম। এখন তা বার করে ঘড়িটা উল্টেপাল্টে দেখতে দেখতে বললাম—'এখন কিছুই বলব না। তবে ঘড়িটা আমার বন্ধুর ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করার অনুমতি দিলে ভালো হয়।'

ইন্দ্রনাথ জয়ন্তর দিকে তাকাতেই জয়ন্ত ঘাড় নেড়ে সায় দিলে। ইন্দ্রনাথ বললে—'নিতে পারো। জয়ন্ত, ঘর, ফায়ারপ্লেস, বাথরুম—সমস্ত তন্ন তন্ন করে সার্চ করা হয়েছে কি?'

আঙুল মটকাতে মটকাতে জয়ন্ত বললে—'দেখছিলাম কখন তুমি প্রশ্নটা করো। ফায়ারপ্লেসে দারুণ ইন্টারেস্টিং কয়েকটা জিনিস পাওয়া গেছে।'

ফায়ারপ্লেসের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ। ডামি ফায়ারপ্লেস। আগুন কস্মিনকালেও জ্বলে না—শুধু ইউরোপীয় পরিবেশ সৃষ্টির জন্যই তা নির্মিত। কিন্তু এ হেন চুল্লিতেই জমে খানিকটা ছাই। এবং সে ছাই অতি বিচিত্র ছাই—কেন না তা কাঠের নয়, কয়লার নয়, এমনকী কাগজেরও নয়।

যকের ধন প্রাপ্তির আশা নিয়ে ছাইয়ের গাদা খোঁচাতে শুরু করল ইন্দ্রনাথ রুদ্র এবং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বিচিত্র ভস্মস্তূপের মধ্যে আবিষ্কৃত হল বিচিত্রতর দশটি বস্তু।

অদ্ভুত দশটি বস্তু। ছাইয়ের গাদায় থেকে তারা ভস্মাচ্ছাদিত। তবুও চিনতে অসুবিধে হল না। আটটা চ্যাপ্টা ঝিনুকের বোতাম আর দুটো অদ্ভুত-দর্শন ধাতব বস্তু। একটা তিনকোণা, অনেকটা চোখের আকারে। আরেকটা আঁকশির মতো। দুটোরই আকার খুব ছোট এবং দুটোই খাদ মিশানো কোনও সস্তা ধাতুতে তৈরি। আটটা ঝিনুকের বোতামের মধ্যে দুটো অপেক্ষাকৃত বড়। প্রতিটি বোতামের কিনারায় পল তোলা এবং কেন্দ্রে সুতো গলানোর চারটি ছিদ্র।

দশটি বস্তুই কিন্তু আগুনে ঝলসানো।

বিড়বিড় করে বলল জয়ন্ত—'ইন্দ্রনাথ, এই দশটা জিনিস নিয়ে ভাবতে ভাবতেই আমার মাথা ধরে গেল, কিন্তু সুরাহা হল না।'

নীরবে পোড়া বোতাম, তেকোণা ধাতু আর আঁকশি নাড়াচাড়া করতে করতে ইন্দ্রনাথ জিগ্যেস করলে—'ফায়ারপ্লেস শেষবার কে সাফ করেছে খোঁজ নিয়েছ?'

'নিয়েছি। পারুলই সাফ করেছে।'

'কখন?'

'আজ সকালে সাতটার একটু পরেই। সাতটার সময়ে একজন বোর্ডার ঘর ছেড়ে দেয়। তাই টংগু লিনচান আসার আগেই ঘর সাফ করে দেয় পারুল।'

নাইট টেবিলের ওপর বোতাম, আঁকশি আর তেকোণা ধাতুটা রেখে ট্র্যাভেলিং ব্যাগের ভেতরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করল ইন্দ্রনাথ। ভেতরটা অত্যন্ত অগোছালো, যাচ্ছেতাইভাবে হাঁটকানো। চারটে লম্বা নেকটাই, দুটো ধোয়া সাদা শার্ট, মোজা, আন্ডারওয়্যার আর রুমাল ঠাসা ব্যাগের মধ্যে। প্রতিটি শার্ট আর আন্ডারওয়্যারের ওপর লেবেল আঁটা একই ওস্তাগরের—'ম্যাকিনসনস, জোহানেসবার্গ।'

দেখে শুনে বন্ধুবরের খিঁচড়ে যাওয়া মেজাজটা কিঞ্চিৎ শরিফ হল বলেই মনে হল। খুশি খুশি মুখে গিয়ে দাঁড়াল ওয়ার্ডরোবের সামনে। টুইডের ট্র্যাভেলিং স্যুট, আর বাদামি রঙের একটা কোট ছাড়া ভেতরে আর কিছুই নেই।

সশব্দে পাল্লাটা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ। সঞ্চরমান দৃষ্টি স্থির হল দেরাজের ওপরে। প্রথম তাকটা শূন্য। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ড্রয়ার খুলেও কিছু পাওয়া গেল না।

জয়ন্ত বললে—'বৃথা খুঁজছ। জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখবারও সময় দেওয়া হয়নি মিঃ লিনচানকে। উঁহু, টেবিলেও কিছু নেই। যা আছে তা বাথরুমেই।'

যেন এই কথাটুকুর জন্যেই অপেক্ষা করছিল কবিতা। জয়ন্তর কথা ফুরোতে না ফুরোতেই জ্যামুক্ত শায়কের মতো সাঁ করে ছুটে গেল বাথরুম লক্ষ্য করে। পেছন পেছন সমান বেগে ছিটকে গেল লম্বোদর লস্কর। অগত্যা আমিও পেছনে পড়ে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ মনে করলাম না।

চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ঠোঁটের কোণে আলগোছে একটা 'কাঁচি' ঝুলিয়ে আমাদের কীর্তিকলাপ লক্ষ্য করতে লাগল ভারতের প্রথম কনসাল্টিং ডিটেকটিভ ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

বেসিনের ওপর খোলা রেক্সিনের টয়লেট-কিট। সাবান আর চুল লাগা আধোয়া সেফটি রেজরের পাশেই দাঁড় করানো ভিজে শেভিং বুরুশ। এক টিউব শেভিংক্রিম। ছোট্ট একটিন ট্যালকাম পাউডার আর এক টিউব টুথপেস্ট। কলের পাশেই গড়াগড়ি যাচ্ছে প্লাস্টিকের শেভিং বুরুশ রাখবার আধার—ঢাকনাটা পড়ে টয়লেট কিটের ওপর।

লম্বোদরবাবুর মুখটা লম্বা হয়ে গেল। নিরাশ কণ্ঠে বললে—'কিসসু নেই এখানে।'

আমি বললাম—'সত্যিই তাই। শুধু বোঝা যাচ্ছে, দাড়ি কামানো শেষ হতে না হতেই খুন হয়ে গেছেন টংগুমশাই। সেটটা ধুয়ে রাখবারও সময় পাননি।'

কবিতা কিন্তু কালো হিরের মতো ঝিকিমিকি চোখে বলল—'তুমি কিগো, অন্ধ নাকি!' বলেই গটগট করে বেরিয়ে গেল বাইরে। পেছনে লম্বোদর লস্কর।

বিমূঢ়ভাবে জিনিসগুলো আর একবার উল্টেপাল্টে দেখলাম। শেভিং বুরুশের ঢাকনা উল্টে দেখলাম ভেতর দিকে খাপে খাপে লাগানো এতটুকু একটা প্যাড। উল্লেখযোগ্য আর কিছুই না পেয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখলাম অপলক চোখে ঢাকনিটার দিকে তাকিয়ে ঘন ঘন সিগারেট ফুঁকছে ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

বেডরুমে ফিরে এসে দেখি হোটেল ম্যানেজার পিটার ড্যানিয়েল হাত-মুখ নেড়ে তর্ক করছে জয়ন্তর সঙ্গে। মুখ টিপে জয়ন্ত শুনে যাচ্ছে।

পেছন পেছন ইন্দ্রনাথ এসে বললে—'ব্যাপার কী? গোলমাল কীসের?' চারদিকে ঢি ঢি পড়ে গেল যে। এদিকে সকাল থেকে স্টাফকে ধরে রেখেছেন আপনারা। নাইট শিফট আরম্ভ হতে চলল, বাড়ি যাওয়ার জন্য সব ছটফট করছে—আমারও সেই অবস্থা। অথচ আপনারা—'

মাঝপথেই ড্যানিয়েলকে থামিয়ে দিয়ে ইন্দ্রনাথ বলল—'জয়ন্ত, তোমরা যা দেখবার দেখেছ। আমরাও দেখলাম। এখন আর খামোকা এঁদের হয়রান করে কোনও লাভ নেই।'

'অলরাইট মিঃ ড্যানিয়েল, আপনারা যেতে পারেন।' বললে জয়ন্ত।

পিটার ড্যালিয়েল উধাও হতেই ইন্দ্রনাথ ফিরে দাঁড়াল আমাদের দিকে। হিরো-হিরো কায়দায় একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে—'লম্বোদরবাবু কিছু বলবেন?'

'আমার একটা ঠিকানা চাই।'

ফস করে কবিতা বলে উঠল—'আরে, আমিও তো তা চাই।'

আমি বললাম—'আমি চাই এমন একটা জিনিস যা এই হোটেলেই আছে।'

'বেশ তো,' স্মিত মুখে বলল ইন্দ্রনাথ। 'তোমাদের যা যা দরকার, একতলায় সার্জেন্ট অচল দত্তের কাছে চেয়ে নাও। তারপর দু-ঘণ্টা সময় দিলাম। দু-ঘণ্টা পরে সন্ধে সাড়ে ছ'টার সময়ে আমার মেসে এসে দেখা করো। দেখা যাক কার দৌড় কদ্দূর পর্যন্ত।'

সবার আগে ঘর থেকে বেরুল কবিতা এবং সবার শেষে আমি। বেরুতে বেরুতে শুনলাম ইন্দ্রনাথ বলছে—'ওহে জয়ন্ত, তোমার সঙ্গে আমার কিছু সিরিয়াস আলোচনা আছে।'

দু-ঘণ্টা পর। ইন্দ্রনাথের মেস। সেই ভাঙা তক্তপোষ, নড়বড়ে চেয়ার আর টেবিল।

কলের পুতুলের মতোই এতক্ষণ চা-বিস্কুট খাচ্ছিল লম্বোদরবাবু আর কবিতা। আমি মৌনীবাবা হয়ে গেছিলাম সাময়িকভাবে।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ইন্দ্রনাথ বললে—'আর দেরি কেন? লম্বোদরবাবু, বলুন আপনার সিদ্ধান্ত।'

'শুধু সিদ্ধান্তই নয় ইন্দ্রনাথবাবু, তার চেয়েও এক কাঠি এগিয়েছি আমি।'

'যথা?'

'সমাধানে পৌঁছেছি।'

'তাই নাকি! তাই নাকি! কীভাবে পৌঁছলেন বলুন তো?'

'আমার একমাত্র সূত্র হল রিস্টওয়াচটা। চামড়ার ব্যান্ডে দুটো দাগ। যে দাগটা সবচাইতে কম গভীর—সেই দাগেই ঘড়ি পরে আছেন টংগু লিনচান। এই থেকেই সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে ঘড়িটা আসলে তাঁর নয়।'

'তবে কার?'

'হত্যাকারীর।'

'কিন্তু অকুস্থলে হত্যাকারী নিজের ঘড়ি ফেলে যাবে কেন?'

'পুলিশকে বিপথে চালনা করার জন্যে। ডাক্তার বলছেন, মিঃ লিনচান মারা গেছেন এগারোটা থেকে এগারোটা তিরিশ মিনিটের মধ্যে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঘড়ির কাঁটা দাঁড়িয়ে গেছে এগারোটা পঞ্চাশ মিনিটে। কেন?'

'কেন?'

'কারণ, হত্যাকারী খুন করার সময়টা ইচ্ছে করেই এগিয়ে দিতে চেয়েছে। অথচ নিহতর হাতে ঘড়ি নেই। তাই নিজের হাতের ঘড়ি খুলে আছড়ে মেরে কাচ ফাটিয়েছে, কলকব্জা বিগড়েচে— তারপর কাঁটা ঘুরিয়ে এগারোটা পঞ্চাশ মিনিটের ঘরে এনে পরিয়ে দিয়েছে মিঃ লিনচানের কব্জিতে। কিন্তু তাঁর কব্জি মোটা অথচ হত্যাকারীর কব্জি সরু—তাই ব্যান্ডটা লাগল অন্য ঘাঁটিতে।'

'ব্রিলিয়ান্ট। কিন্তু এটা তো সমাধান হল না। হত্যাকারী কে?'

'হত্যাকারী একজন স্ত্রীলোক। তাই তার কব্জি সরু।'

'বটে! বটে! কিন্তু কে সে?'

'টংগু লিনচানের তালাক দেওয়া বউ। খুনের মোটিভ, গায়ের জ্বালা মিটানো।'

শুনে নাকের ডগাটা সামান্য কুঁচকালো কবিতা। আমিও বিশেষ উৎসাহ বোধ করলাম না। দেখে শুনে মিইয়ে গেল লম্বোদর লস্কর। মিনমিনে স্বরে বললে—'আরও প্রমাণ আছে।'

'আছে নাকি?'

'ঘড়ির পেছনের ডালায় ভেতর দিকে খানিকটা ছেঁড়া কাগজ লেগে ছিল। যেন টান মেরে কিছু ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। ঘড়ির ভেতরে একটি জিনিসই রাখার রেওয়াজ ছিল এককালে—ফটোগ্রাফ। টংগু লিনচানের ঘড়িতেও ছিল একটা ফটো এবং সে ফোটোতেই সম্ভবত ছিল হত্যাকারীর চেহারা। তাই যাবার সময়ে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে ছবিটা। আমি রিপোর্টারের ছদ্মবেশে দেখা করলাম মিঃ লিনচানের আগের বউয়ের সঙ্গে। তার টেবিলেই একটা ফ্যামিলি অ্যালবাম দেখলাম। একটু নাড়াচাড়া করতেই পেলাম একটা ফটোগ্রাফ—একজন পুরুষ আর স্ত্রী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। কিন্তু তাদের মুন্ডুদুটোই নেই—গোল করে কেটে ফটো থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে—রয়েছে শুধু ধড়। আর প্রমাণের দরকার আছে?'

ঈষৎ দমে গিয়ে বললে ইন্দ্রনাথ—'না, আর দরকার নেই। মৃগাঙ্ক, তোমার সিদ্ধান্ত?'

'লম্বোদরবাবুর মতো আমারও সূত্র ওই ঘড়ি,' বললাম আমি। 'তবে ব্যান্ড নিয়ে অযথা মাথা ঘামাইনি। ঘামিয়েছি ঘড়ির শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ে।'

'ঘড়ির আবার শ্বাসপ্রশ্বাস! বলো কি হে?'

'ঘাবড়াও মৎ। জগদীশ বোসের থিওরি আওড়াচ্ছি না। তবে ঘড়িও নিশ্বেস নেয়, নিশ্বেস ছাড়ে।'

'ভারি ইন্টারেস্টিং ব্যাপার তো। রীতিমতো গবেষণা।'

'ঠাট্টা করো না। হাতের চামড়ায় ঘড়ি লেগে থাকার সময়ে গায়ের উত্তাপে ঘড়ির ভেতরকার বাতাসও গরম হয়ে প্রসারিত হয়ে যায়। আয়তনে বেড়ে যায়। আয়তনে বেড়ে যাওয়ার ফলে বাতাস পেরিয়ে যায় কাচের ফাঁক দিয়ে, ছোটখাটো চিড় দিয়ে। সেকেলে ঘড়ির ক্ষেত্রে এ জিনিসটা আরও বেশি দেখা যায়। টংগু লিনচানের ঘড়িও আধুনিক নয়।'

'বেশ।'

'ঘড়ি যখন হাত থেকে খুলে নামিয়ে রাখা হয়, তখন ভেতরের বাতাসও আবার ঠান্ডা হয়ে সঙ্কুচিত হয়। ফলে বাইরের বাতাস ফুটো কাচের ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ে ভেতরে। সেই সঙ্গে বাতাসের ধুলোও পথ করে নেয় ভেতরে।'

'তারপর?'

'সেই কারণেই, রুটিওলার ঘড়িতে পাওয়া যায় ময়দার ধুলো, ইটের পাঁজার মালিকের ঘড়িতে জমে ইটের ধুলো। টংগু লিনচানের ঘড়িতে কি পেয়েছি জানো?'

'কী?'

'মেয়েদের ফেস-পাউডার।'

'বটে!'

'জানো তো, খুঁতখুঁতে মেয়েরা গায়ের রং মিলিয়ে ফেস পাউডার কেনে। ঘড়ির মধ্যে যে ফেস পাউডার পেলাম তা সাধারণত কালো মেয়েরাই ব্যবহার করে।'

'এবং সে কালো মেয়েটি কে?' ইন্দ্রনাথের স্বর এবার তীক্ষ্ন।

বুক ভরে বিশ্বাস নিয়ে সগর্বে বললাম—'পারুল।'

ভীষণ চমকে উঠল ইন্দ্রনাথ—'পারুল কি হে?'

'কেন নয়? দুশ্চরিত্র টংগু লিনচান নিশ্চয় পারুলের গায়ে হাত দিতে গেছিল, তাই—'

খুক খুক শব্দ শুনে দেখি মুখে শাড়ির খুঁট চাপা দিয়ে ওদিকে তাকিয়ে আছে কবিতা।

গরম হয়ে বললাম—'এত হাসি কীসের?'

জবাব দিলে ইন্দ্রনাথ। বলল—'বউদি হাসছে পর্বতের মূষিক প্রসব দেখে। সাধে কি বলি গল্প লিখলে ঘিলু কমে যায়। আরে ব্রাদার, পারুলকে দেখো মনে হয় কি ফেস পাউডারের বিলাসিতা করার মতো সখ অথবা সাধ্য তার আছে? ঘড়ি পরা তো দূরের কথা। দূর, দূর। বউদি, তুমিই শুধু বাকি রইলে। শোনাও তোমার থিওরি।'

সঙ্গে-সঙ্গে কবিতা বললে—'ঘড়ির সূত্রটা কোনও সূত্রই নয়। এ নিয়ে এতটা সময় নষ্ট করা স্রেফ আহাম্মকি।'

তেড়ে উঠে বললাম—'বাজে কথা না বলে প্রমাণ করো এটা কোনও সূত্রই নয়।'

'করবই তো,' সমান তেজে জবাব দিল কবিতা। 'পাকিস্তান সময় আর ভারতীয় সময়ের তফাতটা জানা আছে?'

বিদ্রূপতরল কণ্ঠে বললাম—'তার সঙ্গে খুনের সম্পর্ক কি?'

কণ্ঠে ততোধিক শ্লেষ ঢেলে কবিতা বলল—'সেইটাই তো একমাত্র সম্পর্ক। ঘড়িটা টংগু লিনচানেরই। ঢাকায় গিয়ে তিনি পাকিস্তানের ঘড়ির সঙ্গে সময় মিলিয়েছেন। কলকাতায় এসে এখানকার সময়ের সঙ্গে ঘড়ি মিলনোর ফুরসৎ পাননি। কে না জানে, ঢাকার সঙ্গে ইন্ডিয়ার সময়ের তফাত পুরো আধ ঘণ্টা। মানে, ঢাকায় যখন বারোটা, এখানে তখন সাড়ে এগারোটা।'

মেশিনগানের মতো মোক্ষম যুক্তি বর্ষণে মুখ শুকিয়ে গেল আমার। লম্বোদরবাবুর মুখটা আবার লম্বা হয়ে গেল। আর ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ইন্দ্রনাথের চোখ।

বলল—'ক্যাপিটাল বউদি, ক্যাপিটাল। শার্লক হোমস হওয়ার যোগ্যতা একমাত্র তোমারই আছে। এ পর্যন্ত ঠিকই বললে, তারপর?'

'খুনি কে, তা আমি জানি। না, না টংগুর তালাক দেওয়া বউ নয়, পারুলও নয়। আগে শোনোই না। সবাই দেখেছ, মিঃ লিনচানের মুখের পাউডারের প্রলেপ। খুব মসৃণ প্রলেপ। গাল আর সেভিং সেটের অবস্থা দেখে জানা গেল খুন হওয়ার ঠিক আগেই দাড়ি কামিয়েছেন তিনি। ঠাকুরপো, দাড়ি কামানোর পর তুমিও পাউডার লাগাও।'

'লাগাই বই কি।'

'কীভাবে লাগাও?'

'এটা আবার কি প্রশ্ন?'

'বলোই না, কীভাবে লাগাও?'

'কেন আঙুল দিয়ে লাগাই।'

'ঠিক। আমার কর্তাটিরও সেই অভ্যেস। আশা করি, লম্বোদরবাবুরও। আসলে পুরুষমাত্রই গালে পাফ লাগানোর ধার ধারে না। তাই তারা আঙুলে করে পাউডার নিয়ে গালে ঘষে দেয়। ফলে জ্যাবড়া হয়ে কোথাও বেশি কোথাও কম ভাবে লেগে থাকে পাউডার। কিন্তু মেয়েরা পাফ ছাড়া পাউডার লাগায় না। তাই তাদের মুখে পাউডার অমন মোলায়েম ভাবে মাখানো থাকে। যেমন আমার। পাউডার মেখেছি বলে মনে হয়?'

'তা হচ্ছে বই কি—'

'হলেও তোমাদের মতো অত বিশ্রিভাবে মনে হয় না,' ঝটিতি জবাব দিল কবিতা। 'টংগু লিনচানের মুখে কিন্তু যেভাবে পাউডার লাগানো হয়েছে, তা পাফ ছাড়া লাগানো সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁর ঘরে তন্নতন্ন করে খুঁজেও পাফ পাওয়া যায়নি।'

এতক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে শুনছিল ইন্দ্রনাথ। এবার যেন স্বস্তির নিঃশ্বেস ফেলে বললে—'তাহলে বউদি, তুমি বলতে চাও যে, টুংগু লিনচানের দাড়ি কামানো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল একজন মেয়েছেলে, কামানো শেষ হলে আদর করে নিজের ভ্যানিটিব্যাগ খুলে পাউডারও মাখিয়ে দিলে ভদ্রলোককে এবং তার পরেই দমাস করে পাথরের হাতুড়ি মেরে গুঁড়িয়ে দিল মাথা। তাও কি সম্ভব?'

'ডাইভোর্স করা বউয়ের পক্ষে সম্ভব না হতে পারে, কিন্তু রক্ষিতার পক্ষে সম্ভব। একমাত্র তারাই আগের মুহূর্তে দেবী, পরের মুহূর্তে দানবী হতে পারে। টংগু লিনচানের কলকাত্তাই প্রেয়সী ভায়োলেট অ্যালক্যাটরার সঙ্গে ঘণ্টাখানেক আগেই দেখা করে এসেছি আমি। জ্ঞানপাপী তো, তাই কিছুতেই স্বীকার করতে চাইল না যে টংগু লিনচানকে পাউডার মাখিয়ে এসেছে আজ সকালে।'

পোড়া সিগারেটটা টোকা মেরে জানলাপথে উধাও করে দিয়ে ইন্দ্রনাথ বললে—'তোমরা তিনজনেই মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছ। প্রত্যেকেই নিজের নিজের যুক্তি অনুযায়ী নিজস্ব থিওরি গড়ে নিয়েছ। সেজন্যে তারিফ করছি তিনজনকেই। তবে কি জানো—'

'কী?' সমস্বরে জিগ্যেস করি আমরা।

'তোমরা তিনজনেই ভুল করেছ।'

'কিছুক্ষণ সব চুপ।

তারপর, শাড়ির খুঁট আঙুলে পাকাতে পাকাতে বাঁকা সুরে কবিতা বলে উঠল—'তোমার মতো দেমাকি মানুষের কাছ থেকে ঠিক এই কথাটাই শোনার আশায় ছিলাম এতক্ষণ।'

'আরে! আরে! আবার সেই মেয়েলি অভিমান। ঠোঁট না ফুলিয়ে আমার দুটো কথা যদি দয়া করে শ্রবণ করো, তাহলেই বুঝবে কেন বললাম তিনজনেই ভুল করেছ।'

'ভণিতা না করে বললেই হয়।'

'তোমরা তিনজনেই সেই একই ভুল করেছ। অর্থাৎ, চোখ-কান খোলা রেখে নতুন নতুন সূত্রকে কাজে না লাগিয়ে আগে থেকেই গড়ে নেওয়া থিওরিকেই খাড়া করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছ। একই সূত্র ধরে একই যুক্তির পথ বেয়ে প্রত্যেকেই চোখ-কান বুজে দৌড়েছ নিজের নিজের সিদ্ধান্তের দিকে। আশপাশে তাকাওনি। তাই ফেল করলে শোচনীয় ভাবে।

'লম্বোদরবাবু, আপনার থিওরি ঝুলছে একটি মাত্র সুতোর ওপর—গোল করে কেটে নেওয়া ফটো। কিন্তু সেটা তো নেহাতই কাকতালীয় হতে পারে। এর বশে তো কোনও ভদ্রমহিলাকে খুনি সাব্যস্ত করা যায় না। যায় কি? অসম্ভব।

'মৃগাঙ্ক, তুমি যে এমন আনাড়ির মতো থিওরি খাড়া করবে, আশা করিনি। রং মিলিয়ে ফেস পাউডার ব্যবহার করা অথবা হাতে রিস্টওয়াচ পরা পারুল কেন, বাংলাদেশের ঝি-শ্রেণির কোনও মেয়ের পক্ষেই সম্ভব নয়।

'আশা ছিল বউদির ওপর। ঢাকার সময়ের সঙ্গে ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইমের প্রভেদটুকু পর্যন্ত তুমি দিব্বি বললে। ভয় হয়েছিল, হয়তো টেক্কা মারবে আমার ওপর। কিন্তু যে বনেদের ওপর তোমার থিওরি খাড়া করলে, গোড়ায় গদল রয়ে গেল সেইখানেই। তুমি বলছ, পাফ দিয়ে পাউডার মেখেছেন টংগু লিনচান, অথচ ঘরে পাফ নেই। কিন্তু আমি বলব আছে।'

'কোথায়?'

'শেভিং ব্রাশ রাখার প্লাস্টিক কৌটোটা দেখেছ?'

'দেখেছি।'

'তার ক্যাপটা?'

'দেখেছি।'

'দেখোনি। দেখলে পাফটা দেখতে পেতে। ভেতর দিকে ছোট্টা একটা মখমলের পাফ লাগানো ছিল আগে থেকেই—টয়লেট-কিট যারা তৈরি করেছে, তারাই লাগিয়ে দিয়েছে। সুতরাং বউদি, অতীব দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, খুনির কাছাকাছি এসেও পাশ কাটিয়ে গেলে সব চাইতে মজার ব্যাপার, তিনজনেই খুনি সাব্যস্ত করলে একজন স্ত্রীলোককে। অথচ আমার হিসেব অনুযায়ী হত্যাকারী একজন পুরুষ।'

'প্রমাণ?' বন্দুকের বুলেটের মতো প্রশ্ন নিক্ষেপ করলাম আমি।

'সামনেই ছিল। কিন্তু চোখের ব্যবহার করোনি—প্রত্যেকেই আগে থেকেই ভেবে নেওয়া সিদ্ধান্তকে কায়েমি করার মতলবে অমন চোখে আঙুল দেওয়া প্রমাণ দেখেও দেখোনি। আমি আটটা ঝিনুকের বোতাম আর ধাতুর টুকরো দুটোর কথা বলছি।

'যে ফায়ারপ্লেসে কখনো আগুন জ্বলে না, সেখানে খানিকটা ছাই পড়ে। টংগু লিনচান নিশ্চয় হাত-পা ছড়িয়ে বসার আগে কিছু পোড়ানোর জন্যে ব্যস্ত হননি। তবে কাজটা কার? নিশ্চয়ই হত্যাকারীর। আগুন জ্বালিয়ে প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করার অপচেষ্টা। ছাইটা কাগজের নয়, কাঠের নয়, কয়লার নয়। ছাইয়ের গাদায় পড়ে আটটা পোড়া বোতাম। ছ'টা ছোট, দুটো বড়। পৃথিবীতে একটিমাত্র জিনিসই আছে যার মধ্যে থাকে এই আটটা বস্তু। শার্ট। ওপেন ব্রেস্ট ফুলশার্টের সামনে থাকে ছ'টা ছোট বোতাম আর দু-হাতায় দুটো বড় বোতাম। ছাইটা কাপড়ের। অর্থাৎ ফায়ারপ্লেসে কেউ একটা ফুলশার্ট পুড়িয়েছে—পোড়াবার সময়ে খেয়ালই ছিল না যে ঝিনুকের বোতাম আগুনকেও কদলী প্রদর্শন করতে পারে।

'এবার ধাতুর জিনিস দুটো। একটা তেকোণা আর একটা আঁকশি। ওপেনব্রেস্ট ফুলশার্ট যে পরে, সে টাউজার্স পরে। আর টাউজার্স যে পরে, সাধারণত সে টাই পরে। ধাতুর জিনিস দুটোও এসেছে বো-টাই থেকে। রেডিমেড বো-টাই বাজারে কিনতে পাওয়া যায়—কিনলে 'বো' বাঁধার ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয় না।

'লম্বোদরবাবু, আপনি বললেন বটে, টংগু লিনচান রক্তমাখা হাতে কিছু একটা আঁকড়ে ধরেছিলেন। কিন্তু সেটা যে হত্যাকারীর শার্ট হতে পারে, তা বললেন না। বিছানার চাদর দেখেই তো বোঝা যায় ধস্তাধস্তি হয়েছে। মাথায় প্রথম বাড়ি খেয়ে লড়েছেন মিঃ লিনচান, খামচে ধরেছিলেন হত্যাকারীর শার্ট আর বো-টাই। কিন্তু তবুও প্রাণে বাঁচেননি।

'লুটিয়ে পড়লেন মিঃ লিনচান। এদিকে হত্যাকারী পড়ল বিপদে। রক্তমাখা শার্ট আর বো-টাই নিয়ে বেরোনো যায় কী করে? হত্যাকারী যদি হোটেলের বাইরের লোক হত অথবা হোটেলের বোর্ডার হত, তাহলে কোটের কলার তুলে বো-টাই ঢেকে বেরিয়ে গেলেই কারো সন্দেহ হত না। বো-টাই যে পরে, সে কোটও পরে। কিন্তু তা না করে হত্যাকারী রক্তমাখা শার্ট আর বো-টাই আগুনে পুড়িয়ে মিঃ লিনচানের ব্যাগ হাঁটকে সাদা শার্ট আর বো-টাই পরে বেরিয়ে গেছে। এইজন্যেই ব্যাগের মধ্যে লম্বা নেকটাই পাওয়া গেছে। কিন্তু বো-টাই পাওয়া যায়নি। ইভনিং সুটের পাশেও তা ছিল না।

'হত্যাকারী তাহলে বাইরের লোক নয়, বোর্ডারও নয়। তাহলে কি হোটেলেরই কর্মচারী? নিশ্চয়ই তাই। কেননা, কর্তব্যরত অবস্থায় রাঁদেভু হোটেলের প্রত্যেকেই ফিটফাট থাকতে হয়। ডিউটি ছেড়ে কোথাও

যাওয়াও সম্ভব নয়। তাই নিজের শার্ট আর বো-টাই পুড়িয়ে পরের শার্ট আর বো-টাই পরে ফিরে যেতে হয়েছে তাকে ডিউটিতে।

'আমরা যখন তদন্ত করছি, হত্যাকারী তখন হোটেলেই অন ডিউটিতে রয়েছে। পরনে আছে সাদা শার্ট আর কালো অথবা সাদা বো-টাই। খুব সম্ভব কালো। কিন্তু আমরা দেখেছি রাঁদেভু হোটেলের প্রত্যেক কর্মচারীর শার্টের রং ধূসর, টাইয়ের রং ধূসর। শুধু একজনের বাদে...হোটেলে ঢুকেই তফাতটা নিশ্চয় লক্ষ করেছিলে?

'করোনি? অন্ধ অন্ধ, তোমরা তিনজনেই চোখ থেকেও অন্ধ। যাকগে, তোমরা বিদেয় হতেই জয়ন্তকে নিয়ে সেই একজনকে জেরা করতেই সব ফাঁস হয়ে গেল। তারপর শার্ট পরীক্ষা করতেই পাওয়া গেল সেই একই ওস্তাগরের লেবেল—'ম্যাকিনসনস, জোহানেসবার্গ' অর্থাৎ সাউথ আফ্রিকায় তৈরি জামা যেখানে বছরখানেক থেকে এসেছেন টংগু লিনচান কিন্তু আমাদের সন্দেহভাজন ব্যক্তিটি যে দেশে জীবনে যায়নি।

'তিন মিনিটের মধ্যেই সবকিছু স্বীকার করে বসল হত্যাকারী। অনেক দিন আগেই তার বউকেই ভাগিয়ে নিয়ে গেছিলেন টংগু লিনচান, তারপর প্রয়োজন ফুরোতেই ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো ফেলে এসেছেন। হপ্তাখানেক আগে 'রাঁদেভু হোটেলে' নাম লিখতেই হত্যাকারী তাঁকে চিনেছে এবং প্রতিশোধ নেওয়ার প্ল্যান এঁটেছে। আজ সকালে ঢাকা থেকে ফিরতে না ফিরতেই হাতুড়ি পেটা করে যমালয়ে পাঠিয়ে শোধ নিয়েছে স্ত্রী-হরণের।'

আলোকিত চোখে বললাম—'হত্যাকারী তাহলে—'

'হোটেল ম্যানেজার মিঃ পিটার ড্যানিয়েল,' বলে 'কাঁচি'র প্যাকেট হাতড়াতে লাগল ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

** 'সিনেমা জগৎ' (জুন, ১৯৬৯) পত্রিকায় প্রকাশিত।*

ঘড়ি বিবি

বিয়ের আগে ওর নাম ছিল রাবেয়া। বিয়ের পর নাম দিলাম রেবা।

আমি যা ছিলাম, তাই রয়ে গেলাম। মিন্টু পাইন। সুবর্ণ বণিক।

সিকিখানা কলকাতার মালিক বলতে পারেন আমাকে। বাপ-ঠাকুরদার আমলে আরও প্রপার্টি ছিল। এখনো মোহর আছে, হিরে-জহরত আছে। থাকে ব্যাঙ্কের লকারে। টাকা ফিক্সড ডিপোজিটে। সুদ যা পাই, তা শুনলে চোখ কপালে উঠে যাবে আপনার। সেই সঙ্গে বাড়ি ভাড়ার অঙ্ক যদি শোনেন, হিংসে হবেই।

তাই থাকি সাদাসিধেভাবে। সোনার বেনেদের ওপর হিংসে অনেকেরই। সপ্তগ্রামী বেনে তো। কবে কোনওকালে ব্যবসা-বাণিজ্য করে আমার পূর্বপুরুষরা দেদার টাকা জমিয়েছিলেন, সুদে-আসলে তা বাড়তে-বাড়তে এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে, সারা জীবন লাটসাহেবি করে কাটালেও আমার পরের সাতপুরুষ বসে খেয়ে যেতে পারবে।

আমি কিন্তু কোনওরকম নষ্টামির মধ্যে যাইনি। বাবা এবং মা অকালেই স্বর্গধামে রওনা হওয়ার সময়েও আমি ব্যাচেলর। কিন্তু সাতগেঁইয়া স্টাইলে রক্ষিতা-ফক্ষিতাও রাখিনি। আমার একমাত্র নেশা সন্ধে নাগাদ একটা ধনে পরিমাণ আফিং দুধ দিয়ে খাওয়া। আর কেবল দেশ দেখে বেড়ানো। পৃথিবীটাকে বারকয়েক পাক দিয়ে এসেছি।

ফ্র্যাঙ্কলি সব কথা বললাম। এরপর আমার এই আশ্চর্য কাহিনি বিশ্বাস করা না করা আপনার অভিরুচি।

মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারী দেখে বেরিয়ে আসার সময় গাছতলায় একটি পরমাসুন্দরীকে একদিন বসে বসে কাঁদতে দেখে চমকে উঠেছিলাম। আমি সাতগেঁইয়া। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেই ডাকসাইটে সুন্দরীদের দেখেছি ছোটবেলা থেকেই। রূপটুপ তাই কোনওকালেই আমাকে টলাতে পারে না। কিন্তু হাজারদুয়ারির বাইরে সেই অনিন্দ্যসুন্দরীকে দেখে আপনা থেকেই পা থেমে গেল আমার।

বয়স তার বড়জোর বিশ। কসমেটিকসের ভড়কি একদম নেই চোখে-মুখে। সবটাই ভগবানের দেওয়া। অমন কালো চোখ আমরা সাতগেঁইয়া মহলেও কখনো দেখিনি। অমন ঘন কালো কোঁকড়া চুল, দুধে আলতায় গোলা গায়ের রং আর নিখুঁত গড়ন-পেটন সারা পৃথিবী ঘুরে এসেও দেখিনি।

গাছতলায় একলা বসে এমন ভুবনমোহিনীকে কাঁদতে দেখে আমার মন চঞ্চল হয়েছিল। পাশে তার একটিমাত্র বোঁচকা। পরনে সাদা জমিনের লালপাড়ের সাদামাটা শাড়ি। শাড়ির খুঁট দিয়ে চোখের জল মুছছে আর কেঁদেই চলেছে সে।

কাছে গেলাম। বৃত্তান্ত শুনলাম। আমিও পরম রূপবান। বিশ্বাস না হয়, এসে দেখে গেলেই পারেন। দুধ আফিংয়ের দৌলতে আর টাকা টনিকের কল্যাণে সাতগেঁইয়া চেহারা দেখলে মনে হবে নিশ্চয় ধুতি-পাঞ্জাবি পরা কোনও নবাবপুত্তুর বুঝি। যদিও সাদাসিধেভাবে থাকি—কিন্তু চেহারায় জুলুষ ঢাকা যায় না।

মেয়েটা চোখ মুছে আমাকে দেখেই প্রেমে পড়েছিল। তাই সব কথা খুলে বলেছিল। বাড়ি তার পুব-বাংলায়। বাপ-মাকে খেয়েছে অকালে। এক চাচা তাকে বর্ডার পার করে নিয়ে আসে। তারপর সোনার গয়না ভর্তি পুঁটলিটা সঙ্গে নিয়ে তাকে গাছতলায় বসিয়ে সরে পড়েছে। রেখে গেছে কেবল এই বোঁচকাটা।

আমি মেয়েটাকে নিয়ে এলাম কলকাতায়। জ্ঞাতিগুষ্ঠিদের তোয়াক্কা করলাম না। একবার মসজিদে আর একবার পুরুত ডাকিয়ে—মুসলমানি মতে আর হিন্দুমতে তাকে বিয়ে করলাম। সেই থেকে রাবেয়া হল রেবা।

এইবার আসি আসল গল্পে। রেবার বোঁচকা দিয়েই এই বিচিত্র কাহিনির শুরু। বোঁচকার মধ্যে যেন সাত রাজার ধন আছে, এমনিভাবেই সবসময়ে তা আগলে রাখত রেবা। একদিন দেখলাম সেই সাত রাজার ধন।

বললে পেত্যয় হবে না আপনার। তবুও বলি। জিনিসটা একটা ঘড়ি। সেকেলে পেন্ডুলাম ঘড়ি। কিন্তু বাইরের গড়নটা মামুলি ঘড়ির মতো নয়। একটা মেয়েছেলের মূর্তি। ঘোমটা ফাঁক করে যেন সে উঁকি দিচ্ছে বাইরে। কিন্তু মুখের বদলে একটা ঘড়ি।

আমি এমন আজব ঘড়ি মশাই জীবনে দেখিনি। সাতগেঁইয়াদের সাতমহলা বাড়িতে হাজার রকমের দিশিবিলিতি ঘড়ি দেখেছি এতটুকু বয়স থেকে। কিন্তু মেয়েমানুষের চেহারাওয়ালা এমন অদ্ভুত ঘড়ি লাইফে দেখিনি। মেয়েটার মুখ নেই—অথচ তাকে বেশ সুন্দরীই মনে হয়। মনে হয় ঘোমটা সরিয়ে মুখটা দেখি। তার হাঁটু বেঁকিয়ে দাঁড়ানোর ভঙ্গিমার মধ্যেও এমন একটা আকর্ষণ যে একবার তাকালে আবার তাকাতে ইচ্ছে যায়—একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে ইচ্ছে যায়।

আমিও চেয়েছিলাম। ঘাড়ের ওপর ফোঁস করে নিঃশ্বেস পড়তেই বুঝলাম রেবা এসে দাঁড়িয়েছে। ঘাড় না ফিরিয়েই বললাম—'চমৎকার ঘড়ি তো!'

রেবা জবাব দিল না। আমারও চোখ ফেরাতে ইচ্ছে হচ্ছিল না ঘড়ি-সুন্দরীর ওপর থেকে।

ঘাড় না ফিরিয়েই বললাম—'এমন ঘড়িকে বোঁচকায় রেখেছ কেন? ঝুলিয়ে দাও দেওয়ালে। দু-চোখ ভরে রোজ দেখি।'

রেবা তখনও জবাব দিল না।

আমিও একদৃষ্টে ঘড়ি-সুন্দরীকে দেখতে দেখতে বললাম—'সত্যিই সুন্দরী। তোমার মতোই।'

'তাই বুঝি?' খুব আস্তে কানের কাছে কথাটা বলল রেবা। গলার স্বর আর বলার ভঙ্গিটা এমন যে শুনেই খটনা লাগল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম। রেবা অনিমেষে তাকিয়ে আছে সেই ঘড়ির দিকে।

'কার ঘড়ি, রেবা?'

'রেবা জবাব দিল না। কোনওদিনই দেয়নি। জিগ্যেস করে করে মুখ ব্যথা হয়ে যাওয়ায় আমিও আর জিগ্যেস করিনি। শুধু বুঝেছি, ঘড়িটা তার প্রাণ। এবং ঘড়ি নিয়ে কাউকে কোনও কথা বলতেই সে রাজি নয়।

ঘড়িটা কিন্তু জোর করেই আমি আমার শোওয়ার ঘরে টাঙিয়ে দিয়েছিলাম। দিন-কতক ঠিকমতো চলেছিল, সময়ও দিয়েছিল। তারপর একদিন রাত্রে দেখলাম ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেছে।

মাঝ রাতে উঠেছিলাম পেট ব্যথা করছিল বলে। আফিং খেলে পেটে বড় বায়ু হয়। পেট ফাঁফে। আমারও ঘুম ভেঙে গেছে। এমনিতে বায়ুর রোগ। তার ওপর আফিং। রেবা ঘুমোচ্ছে দেখে আমি নেমে এলাম খাট থেকে। চোখ পড়ল ঘড়ির ওপর।

দেখলাম, পেন্ডুলাম দুলছে না। তার মানে ঘড়ি থেমে আছে। দম দেওয়া হয়নি বোধহয়।

ও ঘড়িতে দম দেওয়ার ভার অবশ্য আমার নয়—রেবার। দম দেওয়া, তেল দেওয়া—সব ওর কাজ। তাই ঘড়ি বন্ধ দেখে আমি আর ঘড়িতে হাত না দিয়ে খাটের পাশ দিয়ে বাথরুমের দিকে এগোচ্ছি, এমন সময়ে টিক-টক টিক-টক আওয়াজ কানে ভেসে এল।

ঘড়ি তো বন্ধ। অথচ স্পষ্ট পেন্ডুলাম দোলার আওয়াজ হচ্ছে। ফিরে দেখলাম পেন্ডুলাম দুলছে না। ঘড়ি বন্ধ। টিক-টক টিক-টক আওয়াজটা বেশ শোনা যাচ্ছে। ঘর নিস্তব্ধ বলেই স্পষ্ট কানে বাজছে।

ধুত্তোর। আফিংয়ের মৌতাত তো। বাথরুম থেকে ঘুরে শুয়ে পড়লাম। টিক-টক আওয়াজ শুনতে-শুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে উঠে চা খেতে খেতে রেবাকে ঘটনাটা বলতেই ওর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ও মাথায় ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়েছিল আমার পাশে। এক হাঁটু বেঁকিয়ে দাঁড়ানোর ভঙ্গিমাটা অনেকটা ওই ঘড়ি-সুন্দরীর মতোই।

ঘাড় বেঁকিয়ে মুখের দিকে তাই চেয়েছিলাম। ঘড়ির বদলে অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানা দেখলাম। যেন সমস্ত রক্ত নেমে গেছে সেই মুখ থেকে।

'কী হল?'

ত্রস্তে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল রেবা। এ সম্পর্কে আর কোনও কথাও হল না পরে।

এরপরেও একদিন রাত্রে দেখলাম, আর শুনলাম সেই একই কাণ্ড। ঘড়ি তো বন্ধ কিন্তু টিক-টক আওয়াজ শোনা যাচ্ছে রেবা।

সকালবেলা কথাটা বললাম রেবাকে। আবার সেইভাবে মুখখানা ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে করে ঘর থেকে ছুটে পালাল রেবা।

তারপর থেকেই দেখতাম, রাত্রে আর রেবা ঘুমোয় না। একদৃষ্টে চেয়ে থাকে দেওয়ালের ঘড়ির দিকে। ভোর হলেই ঘুমিয়ে পড়ে অকাতরে। যতক্ষণ জেগে থাকে, ঘড়িও চলে বেশ টিক-টক করে।

জোর করে ওকে নিয়ে এলাম পুরীতে। ঘড়িটা আনতে চেয়েছিল সঙ্গে। আমি রাজি হইনি। আমার মন বলছে, ওই ঘড়িই যত নষ্টের গোড়া। ওকে দূরে রাখা দরকার।

পুরীতে রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল ঢেউয়ের গর্জনে। শুধু ঢেউয়ের গর্জনে নয়—আরও একটা আওয়াজে। টিক-টক শব্দটা যেন কানের কাছেই বাজছে।

উঠে বসলাম। ঘরে কোথাও ঘড়ি নেই। আমার হাতে ইলেকট্রনিক রিস্টওয়াচ। শব্দের বালাই নেই।

টর্চ জ্বেলে দেখছিলাম আশপাশ। হঠাৎ টর্চের আলো রেবার চুলের ওপর পড়তেই চমকে উঠলাম। ওর মাথা ভর্তি ঘন কালো চুলের মধ্যে সেই প্রথম সাদার ঝিলিক চোখে পড়ল। এর আগে ওর মাথায় পাকা চুল কখনো দেখিনি। এই বয়েসে চুল পাকার কথা ভাবাও যায় না। উদ্বেগে অবশ্য পাকে। ঠিক করলাম, কলকাতায় ফিরেই ডাক্তার দেখাতে হবে।

সকাল হল। আমার আগে অনেক ভোরে উঠে পড়েছিল রেবা। মুখ-চোখ বড্ড ক্লান্ত দেখলাম। যেন রাতারাতি বুড়িয়ে গেছে। মাথার পাকা চুলের সংখ্যা আরও বেড়েছে।

ক্লান্ত চোখে ক্লান্ত কণ্ঠে ও বললে—বাড়ি চলো এখুনি।

সে স্বর, সে চাউনি উপেক্ষা করতে পারলাম না। ফিরে এলাম কলকাতায়। বাড়িতে ঢোকার মুখেই দেখলাম দরজা খোলা। ভেতরে ঢুকে দেখলাম, চোর পড়েছিল, যা পেয়েছে, নিয়ে গেছে। শোবার ঘরে মেঝের ওপর আছড়ে ফেলে গেছে ঘড়ি সুন্দরীকে।

ধপ করে একটা শব্দ হল পেছনে। রেবা দু-হাতে বুক খামচে ধরে বসে পড়েছে মেঝেতে। মুখ নিরক্ত।

টেলিফোন তুললাম ডাক্তারকে ফোন করব বলে। লাইন খারাপ। বেরোতে যাচ্ছি—বাধা দিল রেবা। কোনও কথা না শুনে ছুটে গিয়ে ডেকে আনলাম ডাক্তার।

শোবার ঘুরে ঢুকে কিন্তু রেবাকে দেখলাম না—ঘড়ি সুন্দরীকেও দেখলাম না। এক বস্ত্রে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে রেবা—সঙ্গে নিয়ে গেছে ওর প্রাণ সেই ঘড়িটাকে।

রেবাকে আজ পর্যন্ত আর দেখিনি। আপনার চোখে পড়লে কাইন্ডলি খবর দেবেন। আমার মন বলছে ওকে কাছে পেলে সেই অদ্ভুত রহস্যের ব্যাখ্যা ঠিক পেয়ে যাব। নিস্তব্ধ রাতে ঘড়ি বন্ধ থাকলেও ঘড়ি চলার আওয়াজ কোত্থেকে হয়। ঠিক জানতে পারব—কানটা শুধু পাততে হবে— ওর বুকে!

** 'ক্রাইম' পত্রিকায় প্রকাশিত, ১৯৬৩*

শূন্য কলসী

এতটুকু একটা প্লেট। ফিকে গোলাপি প্লাস্টিক পেন্টের ওপর টুকটুকে লাল রঙে লেখাঃ

ক্যালকাটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি

রং নির্বাচন আর হরফের কায়দা থেকেই বোঝা যায়, এজেন্সির কর্ণধার যতই অভাবী হোক, তাঁর রুচির অভাব নেই।

কবিতাও বলল, 'ঠাকুরপো নেমপ্লেটটি করেছে বেশ। কিন্তু এই ভাঙা মেসবাড়ি থেকে অফিস না ওঠালে, রেসপেকটেবল ক্লায়েন্টরা আসবে কেন?'

কথাটা ঠিক। কবিতার যুগপৎ ভ্রূকুটি আর সনির্বন্ধ অনুরোধেই শেষ পর্যন্ত কলকাতার সর্বপ্রথম প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি স্থাপিত হল ইন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায়। কিন্তু এই কি অফিস করার উপযুক্ত জায়গা? রংচটা দরজা আর নোনাধরা দেওয়াল দেখেই উদ্যমের অর্ধেক অন্তর্হিত হয়। তারপর দাঁত বার করা সিঁড়ি পেরিয়ে ইন্দ্রনাথের ঘরে ঢুকে ভাঙা তক্তপোষ আর নড়বড়ে পায়া চেয়ার দেখেই তো বাকিটুকু আস্থাও কর্পুরের মতো উবে যায়।

তবে হ্যাঁ, এজেন্সির কর্ণধারকে দেখলে তার অতীত কীর্তিকলাপের কিছু কিছু শুনলে মনে ভরসা আসে বটে। সেদিনও দুজনে ঘরে ঢুকে দেখলাম, তক্তপোষের ওপর আড় হয়ে শুয়ে 'কাঁচি' ধ্বংস করছে ইন্দ্রনাথ। দুই চোখে তার শিল্পীর তন্ময়তা, দৃষ্টির অন্দরে অতলান্ত বিষাদ, আর ধারালো চিবুক ঠোঁট নাকে তীকষ্ন বুদ্ধির বিচ্ছুরণ।

কবিতার চুড়ির রিনিঝিনি আওয়াজেই চমকে উঠছিল ইন্দ্রনাথ। আমাদের দেখেই দু-হাত সামনে প্রসারিত করে মঞ্চ নটের কায়দায় দরাজ গলায় বলে উঠল, 'রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বীরের বীর্য, কর্মীর কর্মোদ্যম, রূপকারের কলাকৃতিত্ব প্রভৃতি সভ্যতার সমস্ত বড় বড় চেষ্টার পিছনে নারীপ্রকৃতির গূঢ় প্রবর্তন আছে।'

ভুরু কুঁচকে কবিতা বললে, 'তোমার অনেক রকম ঢং দেখেছি। কিন্তু এ-ঘরটার ভেতরে এমনকী intellectual beauty-র সন্ধান পেয়েছ যে—'

দমভোর সুখটান দিয়ে গলগল করে নাক-মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ইন্দ্রনাথ বললে, 'বসো, বসো, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'

'আরে গেল যা! কি কুক্ষণেই রবীন্দ্র-রচনাবলী তোমাকে দিয়েছিলাম। ওঠো, উঠে পড়ো।'

'কোথায়?'

'বাইরের অক্সিজেনে।'

'কিন্তু জয়ন্ত যে এখনি আসছে!'

'জয়ন্ত! এখন!'

'হ্যাঁ, খবর পাঠিয়েছে সে। একটা নতুন ঝামেলায় ডাক পড়েছে তার, তাই আমাকেও জ্বালাতে চায়। ওই তো এসে গেছে ও।'

সিঁড়িতে ভারী জুতোর আওয়াজ শুনলাম। পরক্ষণেই মসমস শব্দে পুরো পুলিশী ইউনিফর্ম পরে ঘরে ঢুকল জয়ন্ত। ঢুকেই এক চিৎকার, 'আরে, কপোত-কপোতী যে—কী ব্যাপার? এখানে তো নন্দন নিকুঞ্জবন নেই শ্বেতশিলাসনও নেই—তবে কেন বৃথা কালক্ষেপ এই দারিদ্রের কুটিরে?'

কবিতা বলল, 'আমার খুশি। কী জন্যে তুমি এসেছ, তাই আগে শুনি।'

'তারিণী সরখেল আত্মহত্যা করেছেন।'

চট করে উঠে বসল ইন্দ্রনাথ।

'ডক্টর তারিণী সরখেল?'

'হ্যাঁ।'

আলনা থেকে পাঞ্জাবিটায় টান দিয়ে ইন্দ্রনাথ বললে, 'চল, বেরিয়ে পড়া যাক। বউদি ভাই, মৃগাঙ্ক, আজকের মতো বিদেয় হও তোমরা।'

কপাল কুঁচকে কবিতা বললে, 'কেন, আমরাও তো তোমার সঙ্গে আসতে পারি?'

চোখ কপালে তুলে জয়ন্ত বললে, 'কী সর্বনাশ, পুলিশী তদন্তে নারীর উপস্থিতি—'

ইন্দ্রনাথ বোতাম আঁটতে আঁটতে বললে, 'রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, স্ত্রীলোকের বুদ্ধি পুরুষের চেয়ে অপেক্ষাকৃত অল্প।'

ঝঙ্কার দিয়ে উঠল কবিতা, 'থাক, থাক, আর রবীন্দ্রনাথ কপচাতে হবে না, আমরা যেতে চাই না তোমাদের সঙ্গে।'

আকাশ-পথে নিউইয়র্ক শহরে অ্যাডভেঞ্চারে যাওয়ার সময়ে গগনচুম্বী হর্ম্যনগরী দেখে টার্জেন মন্তব্য করেছিল—পাথরের জঙ্গল। আধুনিক কলকাতা শহর দেখলেও বোধ করি প্রকৃতিলালিত টার্জেন সেই একই ভুল করত। কিন্তু এই ইট কাঠ পাথরের জঙ্গলও এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছে, শুরু হয়েছে ঝিকমিকে ঝিল আর সবুজসুন্দর পত্রপুষ্পের চোখজুড়ানো শোভা। এই কলকাতারই শহরতলীতে যে এমন রমণীয় উপবন থাকতে পারে, তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

জায়গাটার একটু ইতিহাস আছে। আসবার পথে জয়ন্তর মুখে তা শুনেছিলাম। ইন্দ্রনাথের টিটকিরির পর অভিমানিনী কবিতা আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করেছিল, অগত্যা আমি একাই এসেছিলাম। তখনই শুনেছিলাম 'মায়াগড়ে'র ইতিবৃত্ত।

বড়িষা গ্রামের সাবর্ণ চৌধুরীর বংশের মনোহর, রামচাঁদ, রামভদ্র প্রভৃতির কাছ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলকাতা কিনে নেওয়ারও আগে পত্তন হয় এই মায়াগড়ের। প্রাচীন গৌড়ের এক শক্তিশালী নরপতি বর্গীদের অত্যাচার থেকে রাজপ্রাসাদ সুরক্ষিত রাখার জন্যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বৃত্তাকারের পরিখা খনন করেছিলেন। পরিখার সঙ্গে ভাগীরথীর সংযোগ ছিল। মারাঠা দস্যুদের প্রবেশ রোধ করার জন্যে ইচ্ছেমতো পরিখার ওপর পাতা পাটাতন টেনে তুলে ফেলা হত। এখন অবশ্য মোটা মোটা মরচে ধরা লোহার শেকল ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব নেই। পরিখার পরেই মাটি আর ইটের তৈরি তোরণ। বট-অশ্বত্থের প্রতাপে তা পড়ো-পড়ো হয়েও সমুন্নত। এককালে যা বাগান ছিল, এখন তা অরণ্য। দূরে গাছপালার ফাঁকে ঝিলের ঝিকিমিকি। অন্তঃপুরবাসিনীরা অবগাহন করতেন এইখানেই। উঁচু-নীচু পথ বেয়ে বেশ কিছুটা পথ এগিয়ে যাওয়ার পর জিপ এসে থামল মূল প্রাসাদের সামনে।

এক নজরেই বোঝা যায় এ সৌধের সৃষ্টি ইংরেজ আগমনের অনেক পরে। সামনের দিকটা ইংরেজি কাসল-এর অনুকরণে তৈরি। সংস্কারের অভাবে কিছুটা জীর্ণ—স্থানে স্থানে আগাছার দৌরাত্ম্যও চোখে পড়ে। এর ঠিক পেছনেই পরবর্তী যুগের তৈরি একটি বিশাল ইমারত। গাড়ি- বারান্দার নীচেই পুলিশের ট্রাক আর একটি জিপ দাঁড়িয়েছিল। দুজন কনস্টেবলকেও দেখলাম সঙীন বাগিয়ে চোখ পাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে।

জয়ন্ত অন ডিউটি আর এক মানুষ। স্বল্প কথায় স্থানীয় ইন্সপেক্টরের কাছ থেকে মোটামুটি বিবরণ শুনে নিয়ে, সরাসরি সে এগিয়ে গেল মৃতদেহ যে ঘরে আছে—সেই ঘরে। নীরবে অনুসরণ করলাম আমরা।

একটা মাঝারি প্রকোষ্ঠ। একদিকে লেখবার টেবিল। অপর দিকে কারুকাজকরা সেকেলে কাঠের আলমারিতে সাজানো বিস্তর কেতাব। আর একদিকে দেওয়ালের গা ঘেঁষে সাজানো আরাম কেদারা আর কিউরিও।

টেবিলের ওপরেই মাথা রেখে স্থির হয়ে বসেছিল একটি নিষ্প্রাণ দেহ। কানের ওপর ন্যস্ত মাথার দু-দিকে ছড়িয়ে রয়েছে দুটি হাত। ডান হাতের শিথিল আঙুলগুলো টেবিলের বাহুরে ঝুলছে। আর বাঁ-হাতের মুঠিতে ধরা একটি রিভলভার।

মৃতদেহ ছাড়া যে জিনিসটি সবার আগে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হল কালির স্রোত। দোয়াতের কালি। আধারটি উল্টেছে টেবিলের ঠিক মাঝখানে। বিভিন্ন শাখাপ্রশাখার স্রোতের আকারে তা বয়ে গেছে চারদিকে। একটি ধারা এসে পৌঁছেছে মৃতদেহের মাথার ঠিক নীচেই।

জয়ন্ত নীচু হয়ে মাথাটা কাত করলে। তারপর সিধে হয়ে তাকালে ইন্দ্রনাথের পানে।

ইন্দ্রনাথও দেখেছিল। ঠোঁটের ডগায় একটা কাঁচি লাগাতে-লাগাতে বললে, 'এই জন্যেই আত্মহত্যার কেসে তলব পড়েছে তোর?'

'ঠিক তাই। এটা আত্মহত্যাই নয়, খুন।'

'কী করে?' ফস করে বলে ফেলি আমি।

'ওহো, তুই বুঝি দেখিসনি?'

'কী দেখব?'

'কেন মাথার নীচে?'

'দেখেছি, কিছু নেই ওখানে।'

'কিছু না থাকাটাই তো সমস্যা। তুই কি বলতে চাস, আত্মহত্যা করার পর মৃত ব্যক্তি হাত বাড়িয়ে দোয়াতটি উল্টে দিয়েছিলেন?'

'অপ্রস্তুত হয়ে যাই আমি।

'তাই কি সম্ভব নাকি?'

'তা না হলে কালির ধারা মাথার নীচেও থাকত, মাথা ঘিরে চলে যেতো না। আচ্ছা ইন্সপেক্টর শিকদার, চিঠিটা কোথায়?'

'যেখানে ছিল, সেইখানেই রেখেছি, স্যার। ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে।' জবাব দিলেন লোক্যাল ইন্সপেক্টর শিকদার।

ঘরের মধ্যে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট ছিল শুধু একটিই, আর তা মৃত ব্যক্তির শূন্যে বেরিয়ে থাকা ডান হাতের শিথিল আঙুলের ঠিক নীচেই।

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে ঝুঁকে পড়ল ইন্দ্রনাথ। দোমড়ানো-মোচড়ানো কাগজের স্তূপের ঠিক ওপর থেকেই তুলে আনল একটা কাগজ। গোটা গোটা অক্ষরে কাগজটির ওপরে লেখা শুধু কয়েকটি পংক্তিঃ

'এই শেষ। আর আমি তোমাকে জ্বালাবো না। তারিণী সরখেল।'

অর্থাৎ আত্মহত্যার স্বীকারোক্তি। এরপরেও তারিণী সরখেল আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছেন বলতে গেলে একটু দ্বিধা হয় বইকি। জয়ন্তকে মৃদু স্বরে এই কথাই বললাম আমি।

জয়ন্ত ঠাট্টা করল না। গম্ভীর মুখে বললে, 'বেশ, আরো প্রমাণ তোমায় দেখাচ্ছি। ইন্সপেক্টর শিকদার, ডাক্তারের রিপোর্ট কি?'

গড়গড় করে মুখস্থ বলে গেলেন ইন্সপেক্টর—

'এক, গুলিটা হৃদপিণ্ড ফুঁড়ে বেরিয়ে গিয়েছে। দুই, খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়েছে। তিন, গুলিটা একটু ওপরের অ্যাঙ্গেল থেকে করা হয়েছে। চার, গতকাল রাত্রে মারা গেছেন ডক্টর সরখেল।'

জয়ন্ত বললে, 'এছাড়াও উনি তদন্ত করে জেনেছেন, ডক্টর সরখেল ল্যাটা ছিলেন না। অর্থাৎ ডান হাত মুক্ত থাকা সত্ত্বেও বাঁ-হাতে রিভলভার ধরার কোনও দরকারই ছিল না তাঁর। কাজে কাজেই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, ডক্টর সরখেল আত্মহত্যা করেননি এবং আততায়ী টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে ফায়ার করেছিল।'

ইন্দ্রনাথ বলে উঠল, 'আরও আছে। আততায়ী ডক্টর সরখেলের পরিচিতও বটে। কেননা, ঘরের মধ্যে ধস্তাধস্তির কোনও চিহ্নই নেই। টেবিলের কাগজপত্রও সুবিন্যস্ত। আক্রান্ত হওয়ার পূর্ব মুহূর্তেও ডক্টর কিছু বুঝতে পারেননি—পারলে নিশ্চয় চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠতেন। তাছাড়া, ওঁর মুখ-চোখেও সেরকম কোনও ভাব দেখা যাচ্ছে না। তাছাড়া আরাম কেদারার ওপর একটা বিলিতি ম্যাগাজিনও পড়ে রয়েছে। অর্থাৎ আততায়ী নিশ্চয় আরাম কেদারায় বসেছিল, সামনের স্তূপীকৃত ম্যাগাজিনের একটি টেনে নিয়ে নাড়াচাড়া করেছিল, হয়তো ডক্টর সরখেলের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্পগুজবও হয়েছিল! কেননা, আরাম কেদারার সামনে রক্ষিত ছাইদানে সিগারেটের ছাইয়ের সঙ্গে চুরুটের ছাইও আছে। কিন্তু টেবিলের ওপর রাখা ছাইদানে যেখানে হামেশাই ডক্টর সরখেল বসতেন, সেখানে সিগারেটের ছাই ছাড়া আর কিছু নেই।'

অবাক চোখে ইন্দ্রনাথের বক্তিমে শুনছিলেন লোক্যাল ইন্সপেক্টর শিকদার। মুখের ভাবখানা 'তুমি কোন তালেবড় হে!' ইন্দ্রনাথ স্তব্ধ হতেই জয়ন্ত তাই হাসি গোপন করে ভারিক্কি চালে বলে উঠল, 'ইন্সপেক্টর, এঁর নাম নিশ্চয় আপনি শুনেছেন। আমার বিশেষ বন্ধু ইনি—সত্যসন্ধানী ইন্দ্রনাথ রুদ্র। আর ইনি মৃগাঙ্ক চৌধুরী —লেখক, কবি, এবং ইন্দ্রনাথের কাহিনীকার।'

যথারীতি লাফিয়ে উঠলেন ইন্সপেক্টর। উচ্ছ্বাসে একটু স্তিমিত হয়ে আসার পর ইন্দ্রনাথ শুধোলে—'আপনি ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটটা ভালো করে দেখেছেন?'

'আজ্ঞে না। আপনারা আসবেন বলে—'

'আচ্ছা, আমিই দেখছি,' বলে উবু হয়ে বসে পড়ে ইন্দ্রনাথ। উপুড় করে দেয় বাস্কেটটা। ভেতর থেকে খুব বেশি কাগজপত্র অবশ্য পাওয়া গেল না। কতকগুলো পরিত্যক্ত ভেষজ সম্পর্কিত লিটারেচার, একটা পুরোনো প্রেসক্রিপশন রেফারেন্স-বুক, আর এটা খবরের কাগজের কাটিং।

ইংরাজি দৈনিকের পাতা থেকে সযত্নে কাঁচি দিয়ে কেটে নেওয়া অংশটা হাতে নিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ। উল্টেপাল্টে দেখে নিয়ে ছিন্ন পত্রটা তুলে দিলে আমার হাতে।

ভাবলাম, শার্লক হোমসের মতো না জানি আবর্জনা স্তূপ থেকে অতি মূল্যবান সূত্রই আবিষ্কার করে ফেলেছে বন্ধুবর ইন্দ্রনাথ। কাগজটার একদিকে দেখলাম জুতোর পালিশের বিজ্ঞাপন। আর একদিকে শুধু দুটি লাইন ঃ

T. S. FRIDAY NIGHT TEN

MOULIN ROUGE. K. L.

এক নজরেই বুঝলাম, অংশটি পার্সোনাল কলমে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল।

নীরবে কাটিংটা তুলে দিলাম জয়ন্তর হাতে। একে একে সবার পর্যবেক্ষণ শেষ হলে পর জয়ন্ত তা নোটবইয়ের ফাঁকে রাখতে রাখতে বললে, 'ইন্দ্রনাথ, ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটটা লক্ষ্য করেছ?'

'করেছি। বেতের বাস্কেট। নিউ মার্কেটে এ জিনিস এন্তার কিনতে পাওয়া যায়।'

'আর কিছু?'

'সম্প্রতি বাস্কেটটা উল্টো করে তার ওপর কেউ দাঁড়িয়েছিল। কয়েক জায়গায় সামান্য মচকে গিয়েছে। যেই দাঁড়াক, ওজন তার খুব বেশি নয়। কেননা, গুরুভার ব্যক্তি হলে অমজবুত বাস্কেটকে আর বাস্কেট বলে চেনা যেত না।'

'ব্যস?'

'স্যার,' আচমকা লাফিয়ে উঠলেন ইন্সপেক্টর শিকদার, 'স্যার, আমি একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি এখান থেকেই।'

এক সঙ্গে তিন জোড়া দৃষ্টি এসে পড়ে শিকদারের উত্তেজিত মুখের ওপর।

'কী?'

'একটা লাল সুতো।'

'কোথায়?'

'বাস্কেটের কোণে খাঁজে আটকে রয়েছে। অর্থাৎ ইন্দ্রনাথবাবু যা বললেন, তা সত্যি। বাস্কেটের ওপর যে দাঁড়িয়েছিল, তার পরিধেয়র একটা অংশ বাস্কেটের বেতের খোঁচায় আটকে গিয়েছিল। টান মেরে তা ছাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু সুতোটা থেকে গিয়েছে।'

'বটে,' ভুরু কুঁচকোয় জয়ন্ত, 'তাহলে এর মধ্যেই আততায়ীর চেহারার একটা মোটামুটি বর্ণনা আমরা পাচ্ছি। সে কৃশকায়, অঙ্গে লাল পোশাক, এবং সে ডাক্তার সরখেলের বিশেষ পরিচিত। ফিঙ্গার প্রিন্ট ব্যুরোতে আমি খবর দিয়ে এসেছি, তারা এল বলে। ম্যাগাজিন, অ্যাস্ট্রে, আর এই আত্মহত্যার স্বীকৃতিপত্রে কার কার আঙুলের ছাপ আছে, তা আমাকে জানতেই হবে। তবে আপাতত এ-ঘরে আর কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না। গতকাল রাত্রে এ-বাড়িতে কে কে ছিল?'

'ডক্টর সরখেল, মিসেস এবং মিস সরখেল, আর পুরোনো চাকর রামহরি।'

'ব্যস? এত বড় বাড়িতে মাত্র একজন চাকর?'

'ডাকব স্যার? এখনই জেরা করুন না?'

শুধু রামহরিকে ডাকুন।'

কনস্টেবলকে নির্দেশ দিলেন ইন্সপেক্টর সরখেল। তারপর নিহত ব্যক্তির সান্নিধ্য ত্যাগ করে সবাই বেরিয়ে এলাম বাইরে। আসতেই মুখোমুখি হয়ে গেলাম পঞ্চাশোত্তীর্ণ এক প্রৌঢ়ের সঙ্গে।

ইন্সপেক্টর বলে উঠলেন, 'এই যে রামহরি, তোমাকেই খুঁজতে পাঠাচ্ছিলাম, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

'এজ্ঞে, উই পাশটিতে দাঁড়িয়ে ছেলেম।'

বিচিত্র চেহারা প্রৌঢ়ের। বৃদ্ধের মতোই পলিতকেশ মাথা। এতটুকু কালো আঁচড়ও দেখা যায় না রুপোর মতো ঝকঝকে একরাশ চুলে। চোখেমুখে নিবিড় প্রশান্তির অভিব্যক্তি। ঋষির মতোই স্নিগ্ধ সে মুখ কোনও অভাব নেই, দুঃখ নেই, বাসনা নেই। অথচ তাপসিক কঠোরতার লেশমাত্র খুঁজে পাওয়া যায় না তার ললাটের ভাঁজে, চোখের বহির্বিন্দুর দু-ধারের প্রজ্ঞারেখায়।

নরম সুরে ইন্দ্রনাথ কথা শুরু করলে, 'তোমারই নাম রামহরি? তোমার সঙ্গে আমাদের বিশেষ দরকার।'

'এজ্ঞে।'

'আচ্ছা রামহরি, এ-বাড়িতে তুমি কতদিন আছ?'

'তা অনেক দিন হল এটুকু বয়স থেকেই এ-বাড়িতে এসেছিলেম।'

'তুমি ছাড়া আর কোনও...' কথাটা অসমাপ্ত রাখে ইন্দ্রনাথ।

কিন্তু রামহরি বুঝে নেয়। বলে, 'এজ্ঞে, আর কেউ নেই। দরকার কি বলুন? বাবু, মা'মণি আর দিদিমণি বই তো আর কেউ নেই সংসারে? বাড়িটা বড় হলে কি হবে, সংসারটি তো ছোট!'

'তুমিই তাহলে সব কাজ করো?'

'এজ্ঞে, সব। বাজার-হাট, রান্নাবান্না, ঘরদোর সাফ—সব।'

'বাবুর গাড়ি আছে তো?'

'এজ্ঞে আছে দুটো গাড়ি।'

'ড্রাইভার নেই?'

'এজ্ঞে, না। দরকার হয় না। দিদিমণি, মা'মণি, বাবু—প্রত্যেকেই যে গাড়ি চালাতে জানেন।'

'এত বড় বাড়িতে শুধু ক'টি প্রাণী থাকে, তোমাদের ভয় করে না?'

'এজ্ঞে, ভয় কীসের? এটুকু বয়স থেকেই তো রয়েছি এখানে।'

'আচ্ছা রামহরি, তোমার বাবু আত্মহত্যা করলেন কেন? মানে, তুমি তো পুরোনো লোক, কাজেই কোনও কারণ-টারণ থাকলে নিশ্চয় তা তোমার অজানা নয়।'

মাথা নীচু করে রইল রামহরি। তারপর মৃদুস্বরে বললে, 'এজ্ঞে, এ-বড় কঠিন প্রশ্ন।'

'কেন?'

'আত্মহত্যা তো অনেকেই অনেক কারণে করে!'

'যেমন আর্থিক অভাব?'

'এজ্ঞে, বাবুর টাকার অভাব নেই।'

সাংসারিক অশান্তি?'

'এজ্ঞে, সেরকম খিটিমিটি সব সংসারেই আছে।'

'আর কিছু?' অর্থব্যঞ্জক চোখে তাকালো ইন্দ্রনাথ।

বুদ্ধিমান রামহরি ইঙ্গিতটুকু বুঝে নিয়ে বললে, 'এজ্ঞে, সেরকম কিছু তো আমি জানি না। দিনের বেশির ভাগ সময় শহরেই কাটাতেন বাবু, বাড়ি ফিরতেন অনেক রাত্রে।'

'সেকি? এরকম নির্জন বাড়িতে!'

'এজ্ঞে, সেইটেই তো তাজ্জব কাণ্ড! আমরা কেউই কোনও শব্দ শুনিনি। বাবুর শোবার ঘর নীচেই। রাত্রে তাঁকে বিরক্ত করা বারণ। তাই সকালবেলা চা নিয়ে গিয়ে দেখি এই দৃশ্য।'

পরস্পর দৃষ্টি-বিনিময় করল ইন্দ্রনাথ ও জয়ন্ত।

জয়ন্ত শুধোলে, 'আচ্ছা, বাবুর কোনও শত্রু আছে বলে জানো কি?'

'এজ্ঞে, তা তো বলা মুশকিল।'

'বন্ধু?'

'এজ্ঞে, তা আছে নিশ্চয়। তবে এ-বাড়ি শহর থেকে এত দূরে যে, কাউকে বড় একটা আসতে দেখি না। পার্ক স্ট্রিটে বাবুর চেম্বারেই তেনারা যান।'

চুপ করল জয়ন্ত।

তারপর শুধোলে, 'তোমার মা-মণি কোথায়?'

'ওপরে। বড় কাঁদাকাটা করছেন। ডাকব?'

'না, না, ডাকতে হবে না। তুমি নীচে থাকো, আমরাই যাচ্ছি।'

মিসেস সরখেল তাঁর ঘরেই ছিলেন। কাশ্মীরি জাজিম বিছানা শয্যায় মখমলের উপাধানে মুখ লুকিয়ে শুয়েছিলেন তিনি। দোরগোড়ায় আমাদের পদশব্দ শুনেই ত্রস্তে উঠে বসলেন।

মৃদু গম্ভীর স্বরে জয়ন্ত বললে, 'মাপ করবেন, এ সময়ে আপনাকে বিরক্ত করা যে কতখানি হৃদয়হীনতা, তা আমি বুঝি। কিন্তু কর্তব্য বড় নিষ্ঠুর, কি করি বলুন।'

ভিজে গলায় বললেন মিসেস সরখেল, 'ভেতরে আসুন।'

দেওয়ালের ধার ঘেঁষে পাতা আরাম-কেদারায় বসলাম আমরা। বিষণ্ণ চোখ মেলে তাকালেন মিসেস সরখেল। আমি কবিতা লিখি, তাই বুঝি তাঁর এমন দুঃসময়েও ভারি ভালো লাগল তাঁর চাহনি। বয়স তাঁর চল্লিশের কাছাকাছি। যৌবনকে এখনও তিনি সযত্নে বন্দি করে রেখেছেন ঢলঢলে মুখের মিষ্টি লাবণ্যের পিঞ্জরে। সজল দুই চোখে দেখলাম শ্যামল ঘাসের কান্না। সারা মুখের বিষাদাভা যেন এইমাত্র শুক্লপক্ষের চাঁদকে অস্তাচলে পাঠিয়েছে। আজন্ম আভিজাত্যের মধ্যে লালিতা হলে যে গরিমা মাখানো সৌন্দর্য নিয়ে বঙ্গললনা প্রাণতরাঙ্গিনীর কুলে কুলে নৃত্য করে, তাই সম্বল করেই আজ বিধবা হয়েছেন মিসেস সরখেল।

আচমকা অত্যন্ত বেরসিকের মতো একটা প্রশ্ন করে বসল ইন্দ্রনাথ, 'মিসেস সরখেল, আপনার স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর ঘরে কী জন্যে গিয়েছিলেন তা বলবেন কি?'

দারুণ চমকে উঠলেন মিসেস সরখেল। আমার চোখে মনে হয় যেন বীণার তার ছিঁড়ে গেল, সঙ্গীতের তাল কেটে গেল, কবিতার ছন্দ-পতন ঘটলো। ভীষণ রাগ হয়ে গেল ইন্দ্রনাথের ওপর।

'আমি?' ক্ষীণস্বরে বললেন মিসেস সরখেল।

'হ্যাঁ, আপনি। রামহরির মুখে শুনলাম, আপনারা কেউই ফায়ারিং-এর শব্দ শোনেননি, অথচ তার মৃত্যুর ঠিক পরেই তাঁর টেবিল হাতড়ে ছিলেন কেন, তা জানতে পারি কি?

অসাধারণ সংযম বলে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করেছিলেন মিসেস সরখেল। গোলাপের ভীরু পাপড়ির মতো থরথর করে কেঁপে উঠছিল তাঁর অধরোষ্ঠ—গোপন শঙ্কার কৃষ্ণছায়া এসে পড়েছিল দুই মণিকায়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই প্রশ্ন-বাণের আকস্মিকতা কাটিয়ে উঠলেন উনি। আরক্ত থমথমে মুখে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি বলতে চান?'

অকস্মাৎ কররেখা নিরীক্ষণে তন্ময় হয়ে গেল ইন্দ্রনাথ। মুখ না তুলেই ধীর শান্ত সুরে থেমে থেমে বললে, 'দেখুন, আমি যা জিগ্যেস করেছি, তার মধ্যে অস্বচ্ছতা কিছুই নেই। তবুও যদি প্রশ্নটাকে পুনরাবৃত্তি করতে বলেন—'

'না আমি যাইনি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললে ইন্দ্রনাথ। এবার নখের ডগাগুলো পর্যবেক্ষণ করতে করতে বললে, 'মিসেস সরখেল, অনুমতি করেন তো একটা কথা বলি।' বলে, অনুমতির অপেক্ষা না করেই টিমেতালা স্বরে বলে চলে, 'আমরা এসেছি সত্যের সন্ধানে, অন্যায়ের উদঘাটনে। সেক্ষেত্রে আমাদের কাছে কিছু গোপন করার প্রচেষ্টা করা মানেই আপনার স্বামীর প্রকৃত হত্যাকারীকে আত্মগোপন করতে সাহায্য করা।'

যেন চমকে উঠলেন মিসেস সরখেল, অন্তত আমার তো তাই মনে হল।

'হত্যাকারী! কী বলছেন কি?'

'আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি আত্মহত্যা করেননি—নিহত হয়েছেন। আমরা এ-কথাও জানি, তাঁর মৃত্যুর পর আপনি তাঁর ঘরে গিয়েছিলেন।'

'না!'

'সে সময়ে আপনার পরনে ছিল লাল শাড়ি।'

'না!'

'আপনি ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট উল্টে তার ওপর দাঁড়িয়েছিলেন।'

'না!' রীতিমতো সঙ্কিত হয়ে উঠি ভদ্রমহিলার কাগজের মতো সাদা মুখ দেখে।

তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে ইন্দ্রনাথ।। বিদ্যুৎবেগে সামনে এগিয়ে গিয়ে মিসেস সরখেলের ডান হাত টেনে নিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটা তুলে ধরে ইস্পাতের মতো কঠিন গলায় চিবিয়ে চিবিয়ে বলে ওঠে, 'তবে তাঁর টেবিলের এই কালির দাগ আপনার আঙুলে এল কী করে?'

'না, না, না!' আর্ত চিৎকার করে ভেঙে পড়েন মিসেস সরখেল। ছিন্নমূল লতার মতোই শয্যার ওপর আছড়ে পড়ে কেঁদে ওঠেন অসহায়ভাবে—ফুলে ফুলে উঠতে থাকে তাঁর দেহ।

পরিস্থিতির নাটকীয়তা আর ক্লাইম্যাক্সের ধাক্কায় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম আমরা। ইন্দ্রনাথ কিন্তু অবিচল। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে কণ্ঠে বজ্রের বিষাণ বাজিয়ে পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণভাবে পালটে ফেলেও এখনও যে তা তার আয়ত্তের বাইরে যায়নি, তা ওর নির্বিকার মুখ দেখেই বুঝলাম। মিসেস সরখেলের হাত ছেড়ে দিয়ে মন্থর চরণে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও।

আর, আমরা নিশ্চুপ হয়ে দেখতে লাগলাম পতিবিয়োগ বিধূরা এক প্রৌঢ়ার উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন।

অনেকক্ষণ পরে শান্ত হল মিসেস সরখেল। কিন্তু মুখ তোলেন না উপাধান থেকে। নির্বিষ্ট মনে বাগানের দিকে তাকিয়ে এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল ইন্দ্রনাথ—আমাদের অস্তিত্বই যেন ভুলে গিয়েছিল। জীবনে উপর্যুপরি আঘাত আর ব্যর্থতার গ্লানিতে বিষিয়ে উঠেছে যার অন্তর, এ যেন সেই অলস চির-ক্লান্ত ইন্দ্রনাথ রুদ্র নয়। ওর কর্তব্য-নিষ্ঠুর গ্র্যানাইট পাথরের মতো কঠিন মুখচ্ছবির মধ্যে সন্ধান পেলাম আর এক ইন্দ্রনাথ রুদ্রের।

ফিরে দাঁড়ায় ইন্দ্রনাথ। পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ায় পালঙ্কের পাশে। তারপর সহানুভূতি আর সমবেদনায় কোমল-স্নিগ্ধ সুরে বলে, 'মিসেস সরখেল!'

কোনও উত্তর নেই।

'মিসেস সরখেল, আপনি আমাদের ওপর আস্থা রাখুন। বিশ্বাস করুন, আমরা এসেছি আপনার মঙ্গলের জন্যেই। আমাদের উপকারী বন্ধু হিসেবেই গ্রহণ করুন। আপনার গতিবিধির অনেক খবরই আমরা সংগ্রহ করেছি, এক্ষেত্রে কোনও কিছু গোপন করতে গেলেই আইনের রক্ত-চক্ষু থেকে তো আপনি রেহাই পাবেন না।'

এতক্ষণ পরে মাথা তুললেন মিসেস সরখেল। শিশিরে ভেজা পদ্ম-পলাশের মতো দুই চোখ মুছে বললেন, 'কিন্তু বিশ্বাস করুন, সে ঘটনার সঙ্গে এই দুর্ঘটনার কোনও সংযোগ নেই।'

'তবুও আমাদের তা জানা দরকার।'

'কিন্তু সে-কথা যে পাঁচজনকে বলার মতো নয়।'

ক্ষণেক নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইল ইন্দ্রনাথ। তারপর বলল, 'বিশ্বাস করলাম। আচ্ছা, আমার পরিচয়টা আপনাকে এখনও দেওয়া হয়নি, আমি সরকারি গোয়েন্দা নই—বেসরকারি অর্থাৎ প্রাইভেট ডিটেকভ। কাজেই যে কাহিনিকে সরকারি নথিপত্রে স্থায়ীভাবে রেখে যেতে আপনার দ্বিধা, এত ভয়—তা অসঙ্কোচে আমার কাছে বলতে পারেন। আমি কথা দিচ্ছি, সে-কাহিনির সঙ্গে যদি আপনার স্বামীর হত্যারহস্যের কোনও সংযোগ না থাকে, তবে তা কোনওদিনই লোকসমাজে প্রচারিত হবে না।

আমি বহুবার ভেবেছি, frustrated না হয়ে গিয়ে ইন্দ্রনাথ যদি অভিনয়জগতে আবির্ভূত হত, তাহলে কুশলী শিল্পী হিসেবে যশস্বী হতে ওর বেশিদিন লাগত না। কণ্ঠের উত্থান-পতন, প্রবল ব্যক্তিত্ব আর চোখ-মুখের ভাবপ্রকাশ খুশিমতো নিয়ন্ত্রণ করার ঈশ্বর প্রদত্ত গুণটি থাকার ফলে যে কোনও পরিস্থিতিকে ঢেলে সাজিয়ে, নিজের আয়ত্তে আনা ওর কাছে ছেলেখেলা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তখন অনাত্মীয়ও পরম আত্মীয় হয়ে উঠে মনের মণিকোঠার অর্গল খুলে দিত ইন্দ্রনাথের সামনে। স্বয়ং নগর-কোটাল এবং ধর্মাবতার এলেও যা সম্ভব হত কিনা সন্দেহ, তা মুহূর্তের মধ্যে সহজ হয়ে উঠল ওর কণ্ঠের এই জাদুর জন্যে। কণ্ঠে নির্ভরতা ঢেলে মিসেস সরখেল আমাদের পানে তাকিয়ে শুধু বললেন 'কিন্তু—'

আর বলতে হল না সর্বাগ্রে উঠে দাঁড়াল জয়ন্ত, তার পরেই আমি আর ইন্সপেক্টর শিকদার অনুসরণ করলাম তার দৃষ্টান্ত—একটি কথাও না বলে তিনজনে নেমে এলাম নীচে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, মিনিট পনেরোর মধ্যেই ইন্দ্রনাথ নেমে এল আমাদের পাশে।

ভাবলেশহীন মুখে বললে 'এবার আর একজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা বাকি।'

'মিস শকুন্তলা সরখেল। উনিও ওপরে আছেন।' বললেন ইন্সপেক্টর।

ইন্দ্রনাথ জয়ন্তর পানে তাকালে। জয়ন্ত বললে, 'চলো, সেরে আসা যাক।'

দোতলাতেই করিডরের আর এক প্রান্তে দক্ষিণ খোলা একটি ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম আমরা। দরজা খোলা। পুরু হ্যান্ডলুমের পর্দা ঝুলছিল সামনে। তারই ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম, জানলার সামনে আমাদের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন তন্বী তরুণী। জাফরানী রঙের চোলী আর আশমানী রঙের শাড়ির ওপর ফণিনীর মতো এলিয়ে রয়েছে একটি দীর্ঘ বেণী। দুই হাতে জানলার গরাদ ধরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটি।

এ অবস্থায় সাড়া না দিয়ে ঘরে প্রবেশ করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। কাজেই জয়ন্ত হাত তুলেছে দরজায় টোকা দেওয়ার জন্যে, এমন সময়ে একটা কাণ্ড ঘটল।

তীকষ্ন শিস দেওয়ার একটা স্পষ্ট শব্দ শুনলাম। শব্দটা এলো বাগানের দিক থেকেই।

শব্দটা মিলোনোর আগেই চনমনে হয়ে উঠল তন্বী মূর্তি। উদগ্র উত্তেজনায় দুই গাল চেপে ধরল গরাদের ওপর। তার পরেই একটা হাত বারবার আন্দোলিত হল শূন্যে। একটি মাত্র অর্থই সুস্পষ্ট হল এই হাত নাড়ার মধ্যে এবং তা না-বাচক।

অল্পক্ষণ পরেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে জানলার সামনে থেকে সরে এল রহস্যময়ী নারী মূর্তি এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গলা খাঁকারি দিয়ে ভারী গলায় জয়ন্ত বলে উঠল, 'ভেতরে আসতে পারি?'

দারুণ চমকে উঠল তরুণী মেয়েটি। সামনে ভূত দেখলেও বুঝি মানুষ এতটা চমকে ওঠে না। পরক্ষণেই সামলে নিয়ে কাষ্ঠহেসে হেসে কোনও মতে বলে উঠল, 'ও, আপনারা—মানে—পুলিশ—'

ধন্য নারী, ধন্য তোমার চির-অতলান্ত রহস্য আর ছলনার অপরিসীম ক্ষমতা! চমকিত না হয়ে উপায় ছিল না।

এবারেও নাটক শুরু করল ইন্দ্রনাথ স্বয়ং। জয়ন্তকে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়েই ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলে উঠল, 'চলে গেছে তো?'

থমকে গেল সামনের পক্ক বিম্বাধরের ঋজু দেহবল্লরী। চকিতে স্ফুরিত হয়ে উঠল পাতলা নাসারন্ধ্র। কৃষ্ণশিলায় খোদিত আননের প্রসাধনকলায়, নয়নের রুচিসুন্দর কজ্জ্বললেখায়, পরনের উজ্জ্বল, আশমানী রঙা অঞ্চলের বঙ্কিম রেখায় আর চারু-ললাটের কুমকুমবিন্দুর রাঙা আভায় নিমেষে স্পষ্ট হয়ে উঠল দৃপ্ত ঔদ্ধত্য। সিংহীর মতো ঘাড় বেঁকিয়ে বেঁকা সুরে পাল্টা প্রশ্ন করে বসল কৃষ্ণ সুন্দরী, 'তার মানে?'

হাসি মুখে হালকা সুরে জবাব দিলে ইন্দ্রনাথ, 'অত্যন্ত মামুলী প্রশ্ন। আপনার মতো বিদূষী প্রগতিশীলা বুদ্ধিমতী মহিলার কাছেও কি এর বিশদ ব্যাখ্যা করতে হবে? তাছাড়া, অনেকক্ষণ ধরে ও-জানলা থেকে তাকে দেখলাম তো!'

তোষামোদের জন্যেই হোক বা ইন্দ্রনাথের 'আমি-সব-জানি' ভাবের জন্যেই হোক, ধীরে ধীরে স্তিমিত প্রদীপশিখার মতোই নরম হয়ে আসে তন্বীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

এরপর যা ঘটল, তা সংক্ষেপে পূর্ব ঘটনারই পুনরাবৃত্তি। অর্থাৎ ইন্দ্রনাথ একাই ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে নাটক জমিয়ে তুলে ক্লাইম্যাক্স এনে ফেললে এবং আগের মতোই আমাদের বিদায় করে অশ্রুনয়না শকুন্তলা সরখেলের কাছে শুনতে বসল তার গোপন কাহিনি।

এর পরের একঘেয়ে পুলিশী তৎপরতার বিবরণ দিয়ে কাহিনিকে ভারাক্রান্ত করতে চাই না। মোটের ওপর, রাত ন'টার আগে শহরতলীর এই রহস্যময় উপবন 'মায়াগড়' থেকে বেরোতে পারলাম না আমরা তিন বন্ধু।

পথে পড়েই রহস্যতরল কণ্ঠে বললাম, 'কি হে ইন্দ্রনাথ, শ্যামা শিখরদশনা পীন পয়োধরার সঙ্গে কী কী গোপন কথা বলে এলে জানতে পারি কি, না কবিতাকে এজন্যে নিয়োগ করতে হবে?'

কাঁচির আগুনের আভায় দেখলাম, গোঁফের একপ্রান্ত বেঁকিয়ে ফিক করে হাসল ইন্দ্রনাথ। বলল, 'সেটুকু না হয় সাসপেন্সই থাকুক।'

'দেখো বন্ধু, শার্লক হোমসকে নকল করো না। মা আর মেয়ের মুখে কী কী গোপন কথা শুনেছ, তা না শোনা পর্যন্ত আমি ঘুমোতেই পারব না।'

'উঁহু, এখন এত কথা বললেই কাহিনির রসটুকুই নষ্ট হয়ে যাবে। তাছাড়া, তোমাকে দারুণ সাসপেন্সের মধ্যে রাখতে পারলে পাঠকসমাজেরই লাভ। নিজে সাসপেন্সে ছটফট না করলে লেখার মধ্যে সে সাসপেন্স আসবে কেন?'

অগত্যা মৌন হলাম।

পাঠিকাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। গৃহিণীর সঙ্গে মতবিরোধ এবং ঘোরতর কলহের সম্ভাবনা আছে জেনেও, একটি কথা এই কাহিনিপ্রসঙ্গে নিবেদন করার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। 'রুপোর টাকা' উপন্যাস পড়ার দুর্ভাগ্য যাঁদের হয়েছে, তাঁরা জানেন পূর্বরাগের পরেই এই হতভাগাকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়েছিল। এত কাণ্ডের পরেও কিন্তু নারীজাতির মনের অন্দরমহলের বিস্তর অলি-গলি সম্বন্ধে এখনও আমি পুরোপুরি ওয়াকিবহাল হতে পারিনি এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস বিধাতার সৃষ্ট এই ফুরফুরে জীবগুলি প্রয়োজনমতো দেবী ও দানবী উভয় রূপই ধারণ করতে পারে।

প্রখ্যাত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার তারিণী সরখেলের হত্যা-রহস্যের গ্রন্থি মোচন করতে গিয়েও আমি সন্দেহ করে বসলাম পূর্ববর্ণিত দুই স্ত্রী-চরিত্রকে। বিশেষত প্রথম সাক্ষাতেই তাঁদের সন্দেহনজনক কার্যকলাপের যেসব নির্দেশন শুনলাম এবং দেখলাম এরপর আর কোনও প্রমাণ ব্যতিরেকেই তাঁদেরকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো চলে।

পরের দিন দুপুরে এ সম্পর্কে অনেক ভেবে-চিন্তে আরও তদন্তসাপেক্ষ দুটি সিদ্ধান্ত আমি মনে মনে খাড়া করে ফেললাম। সরকারি আর বেসরকারি গোয়েন্দা বন্ধু দুজনের ক্ষুরধার বুদ্ধি যাতে আমার এই সিদ্ধান্ত পক্ষীর পক্ষ যুক্তিশরে ছিন্নভিন্ন করতে না পারে, সেই জন্যে বসে বসে যথোপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করছি, এমন সময়ে টেলিফোন এল ইন্দ্রনাথের কাছ থেকে।

'আজকের স্টেটসম্যান দেখেছিস?'

'দেখেছি।'

'পার্সোনাল কলম?'

'না। কেন?'

'কাল রাত্রেই জয়ন্ত গিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়ে এসেছিল ওদের অফিসে। কাগজটা দয়া করে খোলোই না কলমবাগীশ।'

খুললাম। রিসিভার রেখে দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেলাম মজাদার বিজ্ঞাপনগুলোর ওপর দিয়ে। এক জায়গায় এসে থমকে থেমে গেলাম।

K. L. TODAY NIGHT TEN

MOULIN ROUGE T. S.

রিসিভার তুলে নিয়ে বললাম, 'দেখেছি।'

'কী বুঝলি?'

'পণ্ডশ্রম।'

'বটে! কেন শুনি?'

'খুন যে অথবা যাঁরা করেছেন, তাঁরা ওই মায়াগড়েই রয়েছেন বহাল তবিয়তে।'

হাসির শব্দ ভেসে এল তারের মধ্যে দিয়ে।

'এ সম্বন্ধে দীর্ঘ বিতর্কের প্রয়োজন। আপাতত টেলিফোনের মধ্যে সেটা সম্ভব নয়। সংক্ষেপে বলি, এটা একটা চান্স। পোপার কাটিংয়ের K. L. নামধারী ব্যক্তিই যে হত্যাকারী, তা আমি বলছি না। তবে সে যদি হত্যাকারী হয়, তবে সে আজ রাত্রে মূলাঁ রুজে আসবে না। এলে বুঝব, সে নির্দোষ। অবশ্য তাকে চিনতে পারব কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে, তাই মিস শকুন্তলা সরখেলও আমাদের সঙ্গে থাকছেন যদি সনাক্ত করতে পারেন, এই আশায়।'

'বুঝেছি।'

'কী বুঝেছ?'

'তুমি মরেছ।'

তাড়াতাড়ি বলে ওঠে ইন্দ্রনাথ, 'আরে না, না, তা নয়। তোমরা, এই বিয়ে-করা লোকগুলো, সব সময়ে ব্যাচেলরদের এমন সব সন্দেহ করে বসো, যে—'

আমার কাছে ওসব সাফাইয়ের দরকার নেই ভাই, আমি কবিতাকে দিচ্ছি।'

কবিতা পাশেই ছিল। রিসিভারটা আমার হাত থেকে নিয়েই তো প্রথমে বেশ করে দু-কথা শুনিয়ে দিলে। তারপর লাইন কেটে দিয়ে আমার পানে ফিরে বললে, 'ঠাকুরপো কি বলছে জানো?'

'কী?'

'বলছে, তুমি তো বোম্বাই নগরীর ধনীর দুলালী, তবুও তোমাকে ৩৬০০০ টাকা খরচ করে তৈরি একটা মেয়েদের বাথরুম দেখাব, যদি আজ ঠিক রাত দশটার সময়ে মূলাঁ রুজে আসো। তাছাড়া, বর্তমান কেসের কৌতূহলোদ্দীপক উপসংহার দেখারও আশা করতে পারি। তোমাকে বলেছে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, 'কই আর বলল। বউদিঅন্ত প্রাণ তার।'

ঝঙ্কার দিয়ে উঠল গিন্নি, 'মরণ! ও আবার কি কথা!'

পার্ক স্ট্রিটের মূলাঁ রুজ রেস্তোরাঁ।

ঘূর্ণায়মান আলোক উইন্ডমিলের সামনে এসে যখন দাঁড়ালাম, তখন দশটা বাজতে দশ মিনিট।

ঢুকেই বাঁদিকে কোণের কেদারাগুলো রিজার্ভ করে রেখেছিল আমার আই.ডি.ডি. বন্ধু জয়ন্তকুমার। আসর জমিয়ে বসেছিল সে, ইন্দ্রনাথ আর শকুন্তলা সরখেল।

কবিতার সঙ্গে শকুন্তলার পরিচয়পর্ব সাঙ্গ হলে পর শুধোলাম, 'শুধু কি আমরাই আছি, না জয়ন্ত অন্যান্য সাঙ্গ-পাঙ্গও এনেছ?'

'প্রয়োজন আছে কি?' বলল জয়ন্ত।

লক্ষ্য করলাম, দু-বন্ধুরই সজাগ চাহনি প্রবেশ পথের ওপর নিবদ্ধ। যতবার দরজা খুলে যাচ্ছে, ততবারই চকিত হয়ে উঠেছে দুজনে, এবং শকুন্তলা সরখেলও দৃষ্টি বুলিয়ে নিচ্ছে প্রতিজনের ওপর।

কব্জি ঘড়িতে দেখলাম, ছোট কাঁটাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছে বড় কাঁটা রাত দশটা।

অনেকেই টেবিল ছেড়ে উঠে গেল। এল নতুন যুগলমূর্তি। নতুন তান ধরল ক্যাবারে মিউজিক পার্টি। গমগমে জ্যাজ সঙ্গীত।

রাত দশটা পনেরো মিনিট।

হতাশ হয়ে তাকালাম বন্ধুদের পানে। একমাত্র শকুন্তলা সরখেলই দেখলাম অবদমিত উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠেছে, হাতে ধরা কফির পেয়ালাও নিষ্কম্প নয়।

চুক চুক করে চুমুক দিতে দিতে ইন্দ্রনাথ বললে কবিতাকে 'বউদি, ছত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে তৈরি জুলিয়েটদের বাথরুমটা দেখে এসো এইবেলা—মাথা ঘুরে যাবে-খন।'

কিন্তু তার আগেই আবার খুলে গেল স্প্রিংডোর—টকটকে লাল রঙের পুরু গালিচার ওপর পা দিলেন খদ্দর পরিহিত এক প্রৌঢ়মূর্তি। চোখে পুরুলেন্সের মোটা চশমা। মুখভাব অত্যন্ত গম্ভীর।

মুখটা যেন কোথায় দেখেছি দেখেছি বলে মনে হল—বড় পরিচিত মুখ। কানের কাছে ফিসফিস করে উঠল জয়ন্ত, 'কার্তিক লাহিড়ী।'

কার্তিক লাহিড়ী! পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম জাঁদরেল মন্ত্রী কার্তিক লাহিড়ী। কেন্দ্রীয় দপ্তরে যাঁর অসীম প্রভাব, বাংলার জনগন-মানসে যিনি বর্তমানে ধ্রুবতারার মতো প্রোজ্জ্বল—সেই কার্তিক লাহিড়ী এত রাতে মূলাঁ রুজে?

পরক্ষণেই দারুণ চমকে উঠলাম আমি। হয়তো চেঁচিয়েই উঠতাম যদি না ইন্দ্রনাথ পাশ থেকে মোক্ষম চিমটি কেটে স্তব্ধ করে দিত আমায়।

কার্তিক লাহিড়ী! K. L.! ইনিই কি তাহলে স্টেটসম্যানে বিজ্ঞাপিত সেই K. L.?

অদূরেই একা শূন্য টেবিল অধিকার করেছিলেন স্বনামধন্য মন্ত্রী কার্তিক লাহিড়ী। চারপাশের বিলাতি পরিচ্ছদ আর ফরাসি পরিবেশের মাঝে তাঁর খাঁটি গান্ধী পোশাক বেশি করে প্রত্যেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। কিন্তু সেদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ আছে বলে মনে হল না। স্টুয়ার্ড এসে অর্ডার নিয়ে যাওয়ার পর ইয়া মোটা একটা সিগার বার করে অগ্নিসংযোগ করলেন তিনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই কফির সরঞ্জাম এসে পৌঁছল। অন্যমনস্কভাবে ধুমোদগীরণ করতে করতে কফি তৈরি করলেন। তারপর পকেট থেকে একটা শিশি বার করে খানিকটা তরল পদার্থ ঢাললেন পেয়ালার কফিতে—সম্ভবত কৃত্রিম শর্করা—চিনি খাওয়া নিষেধ স্বাস্থ্যের জন্যে।

আরও মিনিট কয়েক পরে জয়ন্ত চোখের ইঙ্গিত করল ইন্দ্রনাথকে। উঠে দাঁড়াল দুজনে।

—আমিও কলের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে উঠলাম সঙ্গে সঙ্গে—তিনজনেই লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেলাম মন্ত্রীমহাশয়ের টেবিল অভিমুখে।

টেবিলের সামনে পৌঁছলাম। আসন গ্রহণ করলাম। কিন্তু ভাবগতিক দেখে মনে হল, পৃথিবীতে ওই টর্পেডোর মতো চুরুট ছাড়া আর কোনও বস্তু আছে বলে মন্ত্রীমহোদয়ের জানা নেই। কিন্তু আমার সন্দেহ হল আমাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে উনি অনেক আগে থেকেই সচেতন—বোধ করি আমাদের জোড়া জোড়া শিকারি কুকুরের মতো একাগ্র দৃষ্টির জন্যেই।

গলা-খাঁকারি দিয়ে জয়ন্ত বললে, 'নমস্কার স্যার, এ সময়ে বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে দুঃখিত। আমি ডি-ডি'তে হোমিসাইড সেকশনের ইনচার্জ।'

'আমিও তাই অনুমান করেছিলাম,' সিগার না নামিয়েই এই প্রথম গুরুগম্ভীর স্বরে কথা বললেন কার্তিক লাহিড়ী।

কোনওরকম গৌরচন্দ্রিকা না করে কথোপকথনকে একেবারে সংক্ষিপ্ত করে আনলে জয়ন্ত। কর্তব্যকঠিন নীরস স্বরে বলে উঠল, 'নিশ্চয় শুনেছেন গাইনিকোলোজিস্ট তারিণী সরখেল আত্মহত্যা করেছেন?'

'আত্মহত্যা করেনি খুন হয়েছে।'

'আপনি জানলেন কী করে?'

'খুনটা আমিই করেছি।'

স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলাম আমি। আমার সুহৃদযুগলের অবস্থাও যে তথৈবচ, তা পাশে না তাকিয়ে বুঝলাম আমি।

ক্ষণেকের জন্যে কনসার্ট স্তব্ধ হতেই থমথমে নৈঃশব্দ্য নেমে এল চার দেওয়ালের মধ্যে।

ইন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম ফিসফিস করে বলে উঠল, 'আপনি বিষ খেলেন?'

'হ্যাঁ, খেলাম, ঘরে ঢুকেই শকুন্তলাকে দেখেছিলাম আমি। তাছাড়া, বিজ্ঞাপন পড়েই বুঝেছিলাম আমার লীলাখেলা ফুরিয়েছে। আশা করি, আমার আঙুলের ছাপও পেয়েছ তোমরা। তাছাড়া, কাজটা করার পর আমার অনুতাপের অন্ত নেই। কিন্তু সব ব্ল্যাকমেলিংয়েরই তো এই একই পরিণতি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মন্ত্রীকার্তিক লাহিড়ী। নির্মীলিত চোখে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'সময় খুব সংক্ষিপ্ত —কাজেই তোমাদের রিপোর্টের খোরাক এখুনি দিয়ে যাচ্ছি। তারিণী সরখেল আমার বাল্যবন্ধু। তার মতো শয়তান, সমাজশত্রু আর নিষ্ঠুর মানুষ আর দুটি দেখিনি। ছাত্রজীবনেও তার কীর্তিকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম আমরা। কিন্তু সে মেধাবী। তাই স্ত্রীরোগ বিদ্যায় বিলেত থেকে বিশেষজ্ঞ হয়ে এল সে। আর এই বিদ্যেই হল তার পাপাচারের প্রধান হাতিয়ার। সব কথা বলার সময় নেই, শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, তার মৃত্যুতে সমাজের ক্ষতি হয়নি এতটুকু, বরং উপকার হয়েছে প্রচুর। সম্ভ্রান্ত ঘরের কত নিরীহ মহিলা আর পুরুষ নিস্তার পেয়ে গেল তার বিরাট ব্যাপক শোষক যন্ত্রের নিষ্পেষণ থেকে।

'জীবনে আমি একবারই ভালোবেসেছিলাম—এবং তা যৌবনে, যখন ভোমরার গুঞ্জনকে মনে হত মোজার্টের সঙ্গীত। জীবনে তখনও আমি প্রতিষ্ঠা পাইনি—কিন্তু মেয়েটি ছিল বাংলার এক বিখ্যাত ধনীর একমাত্র কন্যা। কাজেই যা হবার, তাই হল। এই মুহূর্তে সে এখন এই কলকাতারই নাইট- খেতাব-ধন্য এক সুবিখ্যাত ধনকুবেরের ঘরনী। পূর্বরাগকালীন উচ্ছ্বাস মুহূর্তে আমাকে কয়েকটা চিঠি লিখেছিল সে। তার কয়েকটিতে দুর্বার প্রণয়াবেগের এমন নিদর্শন ছিল, এবং এমন কয়েকটি নিষিদ্ধ কথা ছিল, যার প্রতিলিপি কাগজে কাগজে ছাপা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টি-টি পড়ে যাবে বাংলাদেশে, এবং মেয়েটির তৎক্ষণাৎ আত্মহত্যা করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।'

জীবনীশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসার জন্যেই বুঝি একনাগাড়ে এতগুলি কথা বলে বেদম হয়ে পড়েছিলেন কার্তিক লাহিড়ী। দম নেওয়ার জন্যে থামতেই ইন্দ্রনাথ শুধোলে, 'সেই চিঠিগুলো ডক্টর সরখেলের হস্তগত

হয়েছে?'

'হ্যাঁ। এবং এই চিঠি কাগজে ছাপিয়ে দেওয়ার হুমকি দেখিয়ে সে এত বছর ধরে সমানে আমাকে আর সেই মেয়েটিকে শোষণ করে এসেছে। শেষ পর্যন্ত আমি মরিয়া হয়ে গেলাম ভেবে দেখলাম, এভাবে সারাজীবন নিদারুণ উদ্বেগের মধ্যে থাকার চাইতে এরকম একটা ক্লেদাক্ত জোঁককে পৃথিবী থেকে চিরতরে মুছে দেওয়াই ভালো।

'তাই সেদিন রাতে মায়াগড়ে গিয়েছিলাম সাইলেন্সার ফিট করা রিভলভার নিয়ে। গাড়ি রেখেছিলাম, প্রধান তোরঙ্গ থেকে অনেকদূর। তারিণী টেবিলেই বসেছিল। অত রাতে আমাকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল ও। আমি অনেক করে ওকে বোঝালাম, কাকুতি মিনতি করলাম চিঠিগুলো নষ্ট করে ফেলে আমাদের চিরতরে রেহাই দেওয়ার জন্যে। শেষে একটা রফা হল। চিঠি আমি ফেরত পাব না কেননা, নিরস্ত্র হয়ে রাজ্যের মন্ত্রীর হাতে নাজেহাল হওয়ার মতো উজবুক নাকি সে নয়, তাই চিঠিগুলো সে নিজের কাছেই রেখে দেবে। তবে এই শেষ একটা মোটা টাকা পেলেই আর সে আমাদের বিরক্ত করবে না।

'আমিও তাই চাইছিলাম। বললাম, কথাটা লিখে দিতে। সঙ্গে সঙ্গে রাজি হল সে। কেননা, এ-লেখার কোনও মূল্যই তো নেই। কাগজ টেনে নিয়ে লিখতে গিয়ে দেখে কলমে কালি নেই। দোয়াত খুলে কালি ভরে নিলে সে। তারপর লিখলেঃ

'এই শেষ। আর আমি তোমাকে জ্বালাবো না।

তারিণী সরখেল।'

'সইটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কুচক্রী তারিণী নিশ্চয় আমার মতলবটা আঁচ করতে পেরেছিল। কিন্তু আমি আর সময় দিলাম না, ও লাফিয়ে ওঠার আগেই টেবিলের সামনে থেকে এক গুলিতে ফুটো করে দিলাম ওর হৃদযন্ত্র। টেবিলের ওপরেই মাথা রেখে চিরকালের মতো ঘুমিয়ে পড়ল সমাজের জঘন্যতম অপরাধী তারিণী সরখেল। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে দু-একবার হাত ছুঁড়েছিল— তাইতেই দোয়াতটা গেল উল্টো। স্বীকারোক্তি লেখা কাগজটা পড়ল মেজেতে। লোহার আলমারির কোন তাকে চিঠিগুলো আছে, তা জানতাম। ওরই পকেট থেকে চাবি নিয়ে আলমারি খুলে চিঠির তাড়াটা পকেটস্থ করলাম। তারপর ওর স্বীকারোক্তি লেখা কাগজটা মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিয়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে নিয়ে বাঁ-হাতের মুঠিতে গুঁজে দিলাম রিভলভারটা। সাইলেন্সারটা শুধু খুলে নিয়ে রাখলাম পকেটে।

'কিন্তু অনভ্যস্ত খুনি হিসেবে আমি চারটি ভুল করেছিলাম, মাথা ঠান্ডা হলে পর ভুলগুলো আপনা হতেই ধরা পড়েছিল আমার কাছে।

'প্রথম ভুল, বাঁ-হাতে রিভলভার দেওয়া। আমি নিজে ল্যাটা। উত্তেজনার মুহূর্তে আমি তাই তারিণীর বাঁ-হাতটাই তুলে নিয়েছিলাম।

'দ্বিতীয় ভুল, খবরের কাগজের কাটিংটা ফেলে আসা।

'তৃতীয় ভুল, বিস্তর আঙুলের ছাপ ফেলে আসা।

'চতুর্থ ভুল, তারিণী স্থির হয়ে যাবার পর দোয়াতের কালি ওর মাথা পর্যন্ত গড়িয়েছিল। আমার উচিত ছিল ওর মাথার নীচেও খানিকটা কালি গড়িয়ে দেওয়া।'

বুক ভরে কয়েকবার শ্বাস নিলেন কার্তিক লাহিড়ী। তারপর স্খলিত স্বরে বললেন, 'কিন্তু এত ভুল সত্ত্বেও আমি সন্দেহের বাইরে থাকতাম। কিন্তু মরেও তারিণী আমায় মেরে গেল। বাড়ি গিয়ে চিঠির বান্ডিল খুলতেই তারিণীরই লেখা একটা চিরকুট পেলাম। তাতে লেখা, 'আমার অনিচ্ছায় এই তাড়া যদি তোমার হাতে যায়, তাহলে জেনো তুমি ফেঁসে গেলে। কেননা, এর মধ্যে সবচেয়ে খারাপ চিঠিটা যাতে যথাসময়ে প্রেসে যায়, সে ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি।'

আবার থামলেন কার্তিকবাবু। শেষবারের মতো ফুসফুসে খানিকটা শক্তি সঞ্চয় করে নিয়ে বললেন, 'কিন্তু সবচেয়ে বড় ভুলটা কি জানো? তোমরা একালের ছেলে, শুনে হাসবে। কিন্তু আমি এসব খুব মানি। সেই

রাত্রে তারিণীকে খুন করার জন্যে বাড়ি থেকে বেরনোর আগে দরজার পাশেই, একটা শূন্য কলসি গড়াগড়ি খেতে দেখেছিলাম। জানি না, জানো কিনা, খনার বচনেই আছেঃ

শূন্য কলসি শুকনা না।
শুকনা ডালে ডাকে কা।।
যদি দেখ মাকুন্দ ধোপা।
এক পা যেও না বাপা।।
খনা বলে এ-ও ঠেলি।
যদি সামনে না দেখি তেলি।।'

বলে, পাণ্ডুর মুখে হাসবার চেষ্টা করলেন কার্তিক লাহিড়ী। কিন্তু সে হাসির পরিবর্তে কান্নাই মূর্ত হয়ে উঠল তাঁর পুরু লেন্সের ওপারে ঘোলাটে চোখে।

আর দেরি করা সঙ্গত নয়। উঠে দাঁড়ালাম আমরা তিন বন্ধু। ধরাধরি করে প্রৌঢ় কার্তিক লাহিড়ীকে নিয়ে এলাম বাইরে।

গাড়ির মধ্যেই চির-শান্তির দেশে রওনা হলেন তিনি।

ভাঙা তক্তপোষের ওপর পদ্মাসনে বসে মৌজ করে গঞ্জিকা সেবনের মতো কাঁচিতে দমভোর এক টান দিয়ে ইন্দ্রনাথ বললে, 'তারিণী সরখেলের যে একদিন এই রকম শোচনীয় মৃত্যু হবে, তা আমি জানতাম। সেই জন্যেই জয়ন্তর মুখে ভদ্রলোকের আত্মহত্যার খবর শুনে লাফিয়ে উঠেছিলাম আমি। এরকম একটা জঘন্য শোষক কখনো আত্মহত্যা করে না—করতে পারে না।'

কবিতা বললে, 'খামোকা তুমি আবার মরা লোকটাকে গালাগাল দিচ্ছ কেন?'

'খামোকা নয় বউদি, তারিণী সরখেলের কীর্তিকাহিনি অনেক আগেই আমার কানে এসেছে। মক্কেলের হয়ে তাঁর সঙ্গে আমাকেও মোলাকাত করতে হয়েছে। লোকটার নৃশংসতা দেখে আমার গা রী রী করে উঠলেও কিছু করতে পারিনি। স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ হয়ে তিনি যে কত অভিজাত মহিলার সর্বনাশ করেছেন, তারপর ব্ল্যাকমেল করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই।'

অসহিষ্ণু স্বরে বললাম, 'পাস্ট ইস পাস্ট। আমি এখুনি শুনতে চাই মা আর মেয়ে যে খুন করেননি, এটা তুমি জানলে কখন?'

'তাঁদের মুখেই শুনলাম। হত্যার রাতে ঘুম না আসায় জানলায় দাঁড়িয়েছিলেন মিসেস সরখেল। হঠাৎ অন্ধকারে একটা ছায়ামূর্তিকে বেরিয়ে যেতে দেখেই সন্দেহ হয় ওঁর। নীচে নেমে এসেই নিহত স্বামীকে দেখে উনি মূর্চ্ছা যান। জ্ঞান ফিরে পান অনেক রাত্রে। কিন্তু উপস্থিত বুদ্ধি না হারিয়ে চটপট টেবিলের ড্রয়ার থেকে কতকগুলো কাগজপত্র সরিয়ে ফেলেন। আঙুলে কালি লেগে যায় তখনই। ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট উল্টে তার ওপর দাঁড়িয়ে আলমারির তাকেও এই কাগজ খুঁজতে হয়েছে তাঁকে। সেই সময় দোমড়ানো বাস্কেটে একটা লাল সুতো লেগে গিয়েছিল।'

কবিতা শুধোলে 'কাগজগুলো কি সম্পর্কিত?'

ইন্দ্রনাথ বললে, 'সেটা গোপনীয়। আমি কথা দিয়েছি।'

চোখ পাকিয়ে কবিতা বললে, 'বটে, আমার কাছে আবার গোপনীয়তা!'

'আঃ জ্বালিয়ে মারলে। তবে শোনো, কিন্তু দয়া করে মেয়েমহলে আলোচনা কোরো না। তারিণী সরখেল তাঁর স্ত্রীকে বিয়ে করতে বাধ্য করেছিলেন।'

'কী করে?'

'বিয়ের আগেই শকুন্তলা ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। চিকিৎসার অছিলায় এই কাণ্ড করেন তারিণী সরখেল। তারপর বিবাহ এবং মায়াগড়ের মতো বিশাল সম্পত্তি লাভ। মায়াগড়ের পুরোনো পরিচারক রামহরির মুখেও এ-কাহিনি শুনতে পারো তুমি।'

'কিন্তু কাগজগুলো কীসের?'

'এই কেলেঙ্কারির প্রমাণ ছিল এই সব কাগজপত্রে। মেয়ে বড় হয়েছে, তাই যাতে স্বামীর মৃত্যুর পর একথা আর কেউ না জানতে পারে, বিশেষ করে নিজের মেয়ের কানেও যাতে না ওঠে, তাই অমন দুঃসাহসী হয়েছিলেন মিসেস সরখেল।'

শুধোলাম, 'এতদূর পর্যন্ত বোঝা গেল। কিন্তু বোঝা গেল না শকুন্তলা সরখেলের জানলার সামনে হাত নাড়া আর সেই শিসের অর্থ।'

মুচকি হেসে বললে ইন্দ্রনাথ, 'উঠতি বয়েসে সব জুলিয়েটদেরই ওরকম দু-একটা রোমিও জোটে।'

'ও। কিন্তু শিসটা?'

'ন্যাকামো করো না। বিয়ের আগে প্রেম করার সময়ে শিস টিস দিয়ে বউদিকে কোনওদিন ডাকোনি বলতে চাও?'

'মুখে আগুন তোমার!' বলল কবিতা।

** 'রোমাঞ্চ' পত্রিকায় প্রকাশিত (মে-জুন, ১৯৬৪)*

রক্তের শয়তান

ইন্দ্রনাথ রুদ্র প্রাইভেট ডিটেকটিভ। অতএব সে সবজান্তা। এইরকম একটা ধারণা স্বয়ং ইন্দ্রনাথের মধ্যেই উঁকিঝুঁকি মারছিল নিশ্চয়। নইলে ইদানীং কথায় কথায় নিজের জয়ঢাক নিজে পিটবে কেন?

সত্যি কথা বলতে কি, হামবাগ ভাবটা আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি না। সুনাম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রনাথের চরিত্রেও হামবড়া জিনিসটা আসছে দেখে মেজাজ খিঁচড়েছে কতবার।

সেদিন তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলাম যখন ইন্দ্রনাথ টিপ্পনী কাটল আমার লেখা নিয়ে। এই একটি ব্যাপারে কে খোঁচা মারলে আমি আর শিব হয়ে বসে থাকতে পারি না। গিন্নিকেও রেয়াত করি না।

ফট করে ইন্দ্রনাথ বলে বসল, 'মৃগাঙ্ক হল লেখক, আর আরশুলা হল পাখি।'

বলুন দিকি, অর্ধাঙ্গিনীর সামনে এ জাতীয় কথায় মেজাজ ঠিক রাখা যায়? আমিও ঠিক রাখতে পারলাম না।

রেগে তিনটে হয়ে বললাম, 'রবার্ট ব্লেক যদি গোয়েন্দা হয়, তুমিও তাহলে ডিটেকটিভ।'

পাল্টা আক্রমণের জন্য তৈরি ছিল না ইন্দ্রনাথ। কিন্তু মানুষটা তো মহা ঘুঘু। ভাঙবে তবু মচকাবে না। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে এমন হাসিমুখে তাকাল যেন মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের লীগ খেলা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। বলল স্মিত মুখে, 'রবার্ট ব্লেকের সঙ্গে আমার মিল কোথায়?'

'ম্যাজিক দেখানোয়। সূত্র নেই, যুক্তি নেই—কেবল ভেলকি। ছোঃ!' বলে যেন কিস্তিমাত করেছি এমনি একটা ভাব দেখানোর জন্যে জম্পেশ টান দিলাম সিগারেটে এবং ফুকফুক করে ছোট ছোট কয়েকটা ধোঁয়ার রিং ছাড়লাম কড়িকাঠের দিকে।

আড়চোখে দেখলাম, সকৌতুকে আমাকে দেখছে ইন্দ্রনাথ। একটু হুঁশিয়ারও হলাম, কেননা, ওর টানা টানা চোখে যে জিনিসটার জিমনস্টিক দেখলাম, নাম তার দুষ্টুবুদ্ধি।

কবিতা টুং-টাং করে চামচ নাড়ছিল কফির পেয়ালায়। কান খাড়া করে শুনছিল দুই বন্ধুর বাকযুদ্ধ। যেন মল্লবীরের পাঁয়তাড়া।

হঠাৎ কবিতাকেই ডাক দিল ইন্দ্রনাথ। বলল, 'ও বউদি, করছ কী?'

'কফি। তোমার এবং আমার আরশুলা পতিদেবতার।'

বেশ বুঝলাম, কবিতা রাগাতে চায় আমাকে। বুঝেও, রেগে গেলাম। কোন অ্যাংগেলে ওকে ঘায়েল করব ভাবছি রান্নার দিক দিয়ে, না রূপের দিক দিয়ে, এমন সময়ে ইন্দ্রনাথ ফের বলল কবিতাকে, 'বউদি, তোমার আরশুলা পতিদেবতার চরিত্রের একটা বিবরণ শুনবে?'

আমার চরিত্রের বিবরণ? কী বলতে চায় ইন্দ্রনাথ? বিষম ভাবনা হয়ে গেল আমার। ইন্দ্রনাথের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই আমার দিকে। বলছে, 'রবার্ট ব্লেকের ঠাকুরদা এলেও যা বলতে পারবে না, ম্যাজিশিয়ান ইন্দ্রনাথ রুদ্র এবার তাই বলবে। কি দেখে বলবে জানো?'

'মুখ দেখে?' তেরছা চোখে তাকিয়ে বলল কবিতা।

'আরে না, ও-মুখে আছে কি যে দেখব?'

আমার শ্রীহীনতা নিয়ে এত বড় একটা খোঁচাও গায়ে মাখলাম না।

উদ্বেগ আমার চারিত্রিক খোঁচা নিয়ে। ইন্দ্রনাথ রুদ্র আমার কলেজ ফ্রেন্ড। স্কটিশ চার্চে পড়বার সময়ে সহপাঠিনীদের সঙ্গে একটু-আধটু রঙ্গ- ইতিহাস আছে বইকি। হতভাগা সেসব ফাঁস করলেই গিয়েছি।

ইন্দ্রনাথ কিন্তু সেসবের ধার দিয়েও গেল না। বল, 'সিগারেট টানার স্টাইলটা দেখেছ?'

কবিতা আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে নিল, 'আবার রিং ছাড়া হচ্ছে!'

ইন্দ্রনাথ বললে, 'হ্যাঁ, রিং। ধোঁয়ার রিং। মানে কি জানো?'

'রিং মানে আংটি, 'ভুরু নাচিয়ে কবিতা বলল, 'আংটি মানায় নরম আঙুলে। নরম আঙুল হয় পরী-হুরীদের। পরী-হুরীরা জন্ম নেয় ধোঁয়া থেকে। ধোঁয়ার আংটি তাদের জন্যে।'

'মন্দ বলোনি।' বলল ইন্দ্রনাথ, 'লেখকের বউ তো। কল্পনায় ম্যাজিশিয়ান। কিন্তু আমি যা বলব, তা মনোবিজ্ঞানীদের কথা। ধোঁয়ার আংটি যারা রচনা করে, তাদের চরিত্রের একটা বিশেষ প্যাটার্ন আছে।'

'যেমন?' কবিতা বিলক্ষণ কৌতূহলী। ইন্দ্রনাথের ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি।

'এদের বিশ্বাস করা যায় না—এদের ওপর আস্থা রাখা যায় না।'

হাততালি দিয়ে কবিতা বললে, 'একদম খাঁটি কথা। আর কি?'

'ধোঁয়ার আংটি যতই দুলতে-দুলতে ওপরে উঠছে, ততই যেন বুক দশহাত হচ্ছে লেখক মহোদয়ের। কীরকম তাকিয়ে আছে দেখছ আংটিগুলোর দিকে? কেন জানো? মনে মনে ফন্দি আঁটছে। সে ফন্দি নিজেকে নিয়ে।'

'নির্জলা সত্য।' কবিতা বিলক্ষণ উল্লসিত।

'আরও আছে, বউদি। এ জাতীয় লোকেরা নিজেকে নিয়ে এত ব্যস্ত থাকে যে আর কারও ব্যাপারে মাথা গলানোর গরজ দেখায় না। কারণ, এদের ভাবনার মুখ বাঁকানো থাকে ভেতর দিকে। বাইরের কারও কথা শুনে সায় দিলেও জানবে মনে থেকে সায় দেয় না।'

'এগজ্যাক্টলি!' আমার স্বার্থপর চরিত্রকাহিনি শুনে যেন আহ্লাদে আটখানা হল কবিতা। 'ঠাকুরপো, হাড়ে ঘুন ধরিয়ে আমি যা জেনেছি, পাঁচ মিনিটে তুমি তা জানলে কী করে?'

'ওই যে বললাম, সিগারেটে টান মেরে রিং ছাড়ার বহর দেখে। শুনলে মনে হয় যেন খড়ি পেতে গুণে বলছি। অথচ একটু পড়াশুনো থাকলেই এমনি চমক লাগানো যায়। মনে হয় যেন ম্যাজিক। রবার্ট ব্লেকের কীর্তি। তাই না মৃগাঙ্ক?'

রাগের চোটে তখন আমার মুখে কথা সরছে না। সিগারেট খাওয়াও মাথায় উঠেছে। তাই কেবল কটমট করে তাকালাম বউয়ের হাসি মাখানো বড় বড় চোখ দুটোর দিকে।

ইন্দ্রনাথ বললে, 'ভায়া, রাগ করছ কেন? পেট থেকে পড়েই কি কেউ ডিটেকটিভ হয়? নিজেকে তৈরি করতে হয়। তুমি তো জানো, আমি কলেজের বই যত না পড়েছি, তার দশগুণ পড়েছি দশরকম সাবজেক্ট নিয়ে। পড়ার নেশায় পড়েছি। আজকের ডিটেকটিভ পেশায় তা কাজে লাগছে। সুতরাং রবার্ট ব্লেক বলে আমাকে ব্যঙ্গ করা কেন বন্ধু?'

আমি কি বলব ভেবে না পেয়ে তারস্বরে বললাম, 'কফি দাও।'

মুখ টিপে হেসে কফি এগিয়ে দিল কবিতা এবং ঠিক সেই সময়ে ডিং-ডং শব্দে ঘণ্টাধ্বনি হল সদর দরজায়।

একটু পরেই একটা কার্ড এসে পৌঁছোল আমার সামনে। আইভরি কার্ড। উঁচু উঁচু হরফে নাম লেখা—ডক্টর জাম্বুলিঙ্গম। নামের পাশে কয়েকটা ডিগ্রি।

খিঁচড়োনা মেজাজ নিয়ে খেঁকিয়ে উঠলাম, 'জাম্বুলিঙ্গম! কে জাম্বুলিঙ্গম? আমি চিনি না। বলোগে যা, দেখা হবে না।

'ও আবার কি অসভ্যতা!' ধমকে উঠল কবিতা। 'তোমার মতো জাম্বুবানের সঙ্গে দেখা করতে জাম্বুলিঙ্গম আসবে না তো কে আসবে? বঙ্কা, পাঠিয়ে দে বাবুকে।'

বঙ্কা বিদায় হল এবং অনতিকাল পরেই ঘরে ঢুকল যেন সাক্ষাৎ জাম্বুবান। শুনেছি, ত্রেতাযুগে ভল্লুকরাজ নাকি দারুণ যোদ্ধা ছিল। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকেও একুশ দিন নাজেহাল হতে হয়েছিল জাম্বুবান কে পরাস্ত করতে।

তা জাম্বুলিঙ্গম নামধারী দৈত্যাকার পুরুষটি ভল্লুকরাজ আখ্যার উপযুক্ত ব্যক্তিই বটে। মিশমিশে রং। দরজায় মাথা-ঠেকে যাওয়া তালঢ্যাঙা বপু। ছাইরঙের টেরিন সুট। হাতে ছড়ির মতো লিকলিকে একটা ছাতা। বাঁটটা মোষের শিংয়ের। দেখলে ছড়ি বলেই ভ্রম হয়।

ভল্লুকরাজকে দেখেই একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। বালি-সুগ্রীবের প্রতিবেশীরা সাধারণত খর্বকায় শীর্ণ হন বলেই জানি। এমন রাবণ-বপু দেখব আশা করিনি।

তাই জাম্বুলিঙ্গম ঘরে ঢুকতেই আমি তীব্র গলায় বললাম, 'ইয়েস?'

জাম্বুলিঙ্গম মোটা মোটা লেন্সের আড়াল থেকে তীকষ্ন চোখে তাকাল আমার পানে। হাত তুলে নমস্কার করল। এবং বলল অতি বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায়, 'আপনিই মৃগাঙ্কবাবু? লেখক?'

আর একবার হকচকিয়ে গেলাম। স্নায়ুর ওপর আর এক নির্যাতন। জাম্বুবানের কণ্ঠে বাংলা ভাষা!

কাষ্ঠহাসি হেসে বললাম, 'হ্যাঁ, আমিই মৃগাঙ্গ রায়। বসুন। কী ব্যাপার বলুন তো?'

জাম্বুলিঙ্গম বসল। ছড়ির মতো ছাতাটা রাখল সামনের টেবিলে। ভদ্রলোকের চেহারায়, চাহনিতে, কথায় বেশ ব্যক্তিত্ব আছে। বলল রেশমমসৃণ ভারী গলায়, 'আমি আপনার কাহিনির বিশেষ ভক্ত।'

'আপনি?' কৌতূহল আর বাগ মানল না।

হাসল জাম্বুলিঙ্গম, 'আশ্চর্য তাই না? যার চেহারা এমন কদাকার, যার মাতৃভাষা তামিল, বাংলা ভাষায় তার এত ব্যুৎপত্তি থাকবে কেন?'

'না, না, আমি তা বলিনি—'

'মৃগাঙ্কবাবু, শুধু বাংলা নয়, ইন্ডিয়ার আরও চারটে ভাষা আমি অনর্গল বলতে পারি। ফ্রেঞ্চ আমার কাছে জল-ভাতের সমান। কিন্তু সেকথা যাক। আমি আপনার কাহিনির দারুণ ভক্ত। সেই সঙ্গে পরম ভক্ত আপনার বন্ধুর।'

'আমার বন্ধু?'

'প্রাইভেট ডিটেকটিভ ইন্দ্রনাথ রুদ্র। যাঁর বিস্ময়কর কীর্তি অলীক শার্লক হোমসকেও ম্লান করে দিয়েছে।'

আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম, ক্ষীণ গোঁফ জোড়ার ওপর সগর্বে আঙুল বুলিয়ে নিল ইন্দ্রনাথ।

সুতরাং আবার কাষ্ঠহাসি হাসলাম। বললাম, 'ইন্দ্রনাথ রুদ্র আপনার সামনেই হাজির।'

চকিতে চোখ ফেরাল জাম্বুলিঙ্গম। আমি আলাপ করিয়ে দিলাম, 'ইনিই ইন্দ্রনাথ রুদ্র যাঁর কীর্তি রবার্ট ব্লেককে টেক্কা দিয়েছে। আর ইনি আমার অর্ধাঙ্গিনী।'

নমস্কার প্রতি নমস্কারের পর জাম্বুলিঙ্গম বলল, 'মৃগাঙ্গবাবু, আমি কিন্তু ইন্দ্রনাথ রুদ্রকে রবার্ট ব্লেকের সঙ্গে তুলনা করি না। ওঁর সঙ্গে তুলনা চলে একমাত্র ফাদার ব্রাউন বা শার্লক হোমসের। ওঁর মস্তিষ্কই ওঁকে সে মর্যাদা দিয়েছে।'

ঢোক গিলে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলাম, 'আপনি দেখছি মস্ত বৈজ্ঞানিক।'

'মস্ত নয় ক্ষুদ্র। আমার সমস্যাটা বৃহৎ।'

'সমস্যা?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি একটা সমস্যা নিয়ে এসেছিলাম আপনার কাছে। উদ্দ্যেশ ছিল, ইন্দ্রনাথবাবুর ঠিকানা নিয়ে তাঁর কাছে হত্যে দেব। আমার সৌভাগ্য, এক মন্দিরেই দুই দেবতার দর্শন পাওয়া গেল।'

খোসামোদে পাথর গলে, আমিও তুষ্ট হলাম। বললাম, 'সে কি কথা! অসুবিধে না থাকলে আপনার সমস্যা আমার সামনে বলতে পারেন। পুজোর লেখার খোরাক চাই তো!'

হেসে ফেললেন জাম্বুলিঙ্গম। ঝকঝকে সাদা দাঁত মিশমিশে মুখে খুব খারাপ দেখাল না। বলল, 'সমস্যাটা রক্তের শয়তানকে নিয়ে।'

'রক্তের শয়তান! সে আবার কী?'

'ব্লাড ক্যান্সার। আমি রঙ্গ করে নাম দিয়েছি রক্তের শয়তান। আপনি লেখক মানুষ, আমার কৌতুকবোধের তারিফ করবেন নিশ্চয়?'

'তা করছি,' বললাম, আমি, 'ব্লাড ক্যান্সার মানে, লিউকোমিয়ার এমন বাংলা উপাধি এর আগে শুনিনি। কিন্তু রক্তের শয়তানকে নিয়ে আপনি বিব্রত কেন?'

'কারণ, ব্লাড ক্যান্সার আমার গবেষণার বিষয়বস্তু বলে।'

'আপনি—'

'আমি ব্যাঙ্গালোর ক্যান্সার রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে আসছি। আসছি পার্সোনাল ক্যাপাসিটিতে। আমার সমস্যার গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত বলতে গেলে একটু সময় লাগবে। তার আগে যদি সাউথ ইন্ডিয়ান ড্রিঙ্ক দিয়ে গলা ভেজানো যেত—'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়!' বিষম লজ্জিত হয়ে বললাম, 'কবিতা, কফি দাও।'

জাম্বুলিঙ্গম বাগাড়ম্বরের ধার দিয়েও গেল না। বলল, 'আপনারা ১৩ জুলাইয়ের কাগজে একটা খবর নিশ্চয় দেখেছেন। খবরটা নিয়ে সম্পাদকীয়ও লেখা হয়েছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ খবর তো। পড়েননি? বেশ, কাগজটা আমি সঙ্গে এনেছি। পড়ে শোনাচ্ছি।'

বলে, বুক পকেট থেকে কাঁচি দিয়ে কাটা একটুকরো খবরের কাগজ বার করে ভারী গলায় পড়তে শুরু করল জাম্বুলিঙ্গম, 'রক্তের ক্যান্সার তথা লিউকোমিয়া নামক জটিল ও কঠিন রোগের নিরাময়কারক ঔষধ আবিষ্কার করিবার কৃতিত্ব যদি কেহ দাবি করেন, তবে বুঝিতে হইবে যে, তিনি মানব জীবনের কল্যাণ সম্ভব করিবার দুরূহ ও মহৎ একটি অঙ্গীকার সফল করিবার কৃতিত্ব দাবি করিতেছেন। দক্ষিণ ভারতের জনৈক চিকিৎসক 'সিদ্ধ' চিকিৎসা-পদ্ধতির তথ্য সম্বলিত একটি পাণ্ডুলিপি অধ্যয়ন করিয়া এবং তদনুযায়ী গবেষণা করিয়া লিউকোমিয়ার ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে। তিনি ভারত সরকারের বৃত্তিধারী গবেষক। সুতরাং, ভারতের সরকারি স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের আর কালবিলম্ব না করিয়া এই কৃতিত্বের যথার্থতা বিচার ও বিবেচনা করিয়া দেখা কর্তব্য। এই ঔষধ প্রস্তুত করিবার উপযোগী গাছগাছড়ার অভাব আছে বলিয়া গবেষক-চিকিৎসক যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহার গুরুত্ব ও যথার্থতা সম্বন্ধেও সরকারি কর্তৃত্বে অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন। কারণ দীর্ঘকালের গবেষণা ও কৃতিত্বে আবিষ্কৃত কোনও ঔষধের জন্য গাছগাছড়ার অভাব থাকিলে তাহা দূরীভূত করিবার ব্যবস্থা দ্রুত গ্রহণ করিতে হইবে। সরকারের পক্ষে সবার আগে জানিয়া লওয়া প্রয়োজন যে, আবিষ্কৃত ঔষধটি সত্যই যথার্থ নিরাময়কারণ ঔষধ।'

জাম্বুলিঙ্গম তামিলনাড়ুর বাসিন্দা হয়েও যেরকম স্বচ্ছন্দ গতিতে পরিষ্কার উচ্চারণে খবর পড়ে শোনাল, তা অল ইন্ডিয়া রেডিয়োর বহু সংবাদদাতার পক্ষেও সম্ভব হয় না।

খবর পড়া শেষ হতেই এই প্রথম ইন্দ্রনাথ মুখ খুলল, 'মোদ্দা বিষয় দাঁড়াচ্ছে এই—'সিদ্ধ' চিকিৎসা পদ্ধতির পুরোনো পুঁথিতে ব্লাড ক্যান্সারের দাওয়াই লেখা আছে। সেই পুঁথি এবং দাওয়াই এখন পাওয়া গেছে। পেয়েছেন একজন দক্ষিণ ভারতীয় ডাক্তার। এই তো?'

'হুবহু।'

'আপনিই কি সেই ডাক্তার?'

'না, আমার বন্ধু। মালুমঙ্গলম।'

'আপনার সমস্যা আপনাকে নিয়ে, না আপনার বন্ধুকে নিয়ে?'

'আমাদের দুজনকে নিয়ে।'

'যথা?'

'খবরে যা বলা হয়েছে, তা আংশিক। 'সিদ্ধ' চিকিৎসা-পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা মালুমঙ্গলম একা করেনি। আমিও ছিলাম সঙ্গে। বছর তিনেক আগে দেশে ফিরেছি আমি। মালুমঙ্গলমের সঙ্গে যোগাযোগ তখন থেকেই। রুগি দেখার ফাঁকে ফাঁকে গাছগাছড়া নিয়ে নাড়াচাড়া করার বাতিক ওর অনেকদিনের। ওর বিশ্বাস, বিধাতা

মানুষ সৃষ্টি করেছেন, মানুষের রোগের ওষুধও সৃষ্টি করেছেন। এই পৃথিবীতেই তা আছে। প্রাচীন পুঁথি ঘেঁটে, উদ্যোগী হয়ে শুধু খুঁজে নিলেই হল।

'দুরারোগ্য ব্লাড ক্যান্সারের দাওয়াই আবিষ্কারের গবেষণার শুরু তখন থেকেই। মালুমঙ্গলমের রিসার্চ ব্যাকগ্রাউন্ড নেই—আমার আছে। কিন্তু আমার প্রাচীন গাছগাছড়া সম্পর্কে কোনও জ্ঞান নেই—মালুমঙ্গলমের আছে। ফলে, জুটি বাঁধলাম দুজনে। আমার ডিগ্রির দৌলতে সরকারি বৃত্তিও জুটল। গবেষণাও অনেক এগোল। পরিশেষে ব্লাড ক্যান্সারের দাওয়াইয়ের সন্ধানও পেলাম।

'সমস্যা শুরু ঠিক তার পরেই।

'আমাদের গবেষণা কেন্দ্র কিন্তু কলকাতায় নয়—ব্যাঙ্গালোরে। গান্ধীনগরে মুনলাইট সিনেমার ঠিক পেছনে। ছোট্ট ল্যাবরেটরি। আমি, মালুমঙ্গলম আর প্রভাবতী। প্রভাবতী আমাদের ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্টও বটে, সেক্রেটারিও বটে। রিপোর্ট টাইপ করা থেকে শুরু করে কেমিক্যাল সংগ্রহ করা—সমস্তই প্রভাবতীর দায়িত্ব।

'গত ১০ জুলাই রক্তের শয়তানকে টিট করার জবর দাওয়াইয়ের সন্ধান পেলাম আমি আর মালুমঙ্গলম। ১৯৩০ সালে স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমণ ভারতের মুখোজ্জ্বল করেছিলেন পদার্থবিদ্যায় নোবেল প্রাইজ এনে। ১০ জুলাই সন্ধের দিকে আমি আনন্দে আটখানা হয়ে বলেছিলাম মালুমঙ্গলমকে—'ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।' চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ আনব তুমি আর আমি।

'বিধাতা তখন আড়ালে দাঁড়িয়ে হেসেছিলেন। নইলে পরের দিন সকালবেলা উধাও হবে কেন মালুমঙ্গলম?'

বলে কবিতার হাত থেকে কফির পেয়ালা টেনে নিল জাম্বুলিঙ্গম।

ইন্দ্রনাথ চোখ ছোট করে শুনছিল। এবার বলল, 'উধাও হলেন?'

'হ্যাঁ।' চুমুক না দিয়েই বলল জাম্বুলিঙ্গম, 'পরের দিন সকালবেলা ল্যাবরেটরিতে এসে দেখলাম, প্রভাবতীর টাইপরাইটারে একটা সাদা কাগজ। তাতে লেখা—জাম্বুলিঙ্গম, কাল রাতে রিপোর্ট ঘাঁটতে গিয়ে মাথা ঘুরে গেল। 'সিদ্ধ' চিকিৎসা-পদ্ধতিতে এক জায়গায় মারাত্মক কথা লিখেছে। এ ওষুধ ব্লাড-ক্যান্সার সারায় বটে, কিন্তু বছর দুয়েকের মধ্যে মাথার গণ্ডগোল দেখা দিতে পারে। আমাদের গবেষণা ব্যর্থ হয়েছে। তোমার সময় এবং সরকারের টাকা অপচয়ের কারণ আমি। বিবেকের দংশন আর আত্মগ্লানি সইতে না পেরে চললাম। শুনেছি, হিমালয় অঞ্চলে ব্লাড ক্যান্সারের ওষুধ আছে। যদি পাই, ফিরব। নইলে, এই যাত্রাই শেষ যাত্রা। এ মুখ আর কেউ দেখবে না। ইতি—মালুমঙ্গলম। এগারোই জুলাই।'

ইন্দ্রনাথ বলল, 'চিঠিটা দেখছি কণ্ঠস্থ করে রেখেছেন?'

'তা করেছি। মূল চিঠিও সঙ্গে এনেছি। এই দেখুন।'

হাত বাড়িয়ে ভাঁজ করা কাগজটা নিল ইন্দ্রনাথ। সেকেন্ড কয়েক চোখ বুলোলো এ-কোণ থেকে সে-কোণ পর্যন্ত।

বলল, 'টাইপ না করে হাতে লিখলেও তো পারতেন আপনার বন্ধু। টাইপ করলেন কেন? করলেনই যদি তো তলায় সই না করে টাইপ করে নিজের নাম লিখলেন কেন? আমার সন্দেহ হচ্ছে।'

'ও সন্দেহ আমার মনেও এসেছে।' বলল জাম্বুলিঙ্গম, 'এসেছে বলেই আপনার দ্বারস্থ হয়েছি।'

'কীসের সন্দেহ বলুন তো?' ইন্দ্রনাথ কৌতূহলী হল।

'চিঠিটা কি সত্যিই মালুর লেখা?'

'কারেক্ট। কাজেই প্রাথমিক তদন্ত টাইপরাইটার থেকেই শুরু করা দরকার। তার আগে একটা প্রশ্ন। আপনি পুলিশে না গিয়ে সোজা কলকাতায় এলেন কেন? তদন্ত গোপন রাখতে চাইছেন কেন?'

'গোপন রাখতে চাই সরকারি বৃত্তি এর সঙ্গে জড়িত বলে। পাবলিক কেলেঙ্কারী কে চায় বলুন? আপনি যদি তার হদিশ বার করে দেন, তাহলে তো গোল চুকেই গেল। নইলে শেষ পর্যন্ত পুলিশকেই ডাকতে হবে।'

'কলকাতায় এলেন শুধু আমার কাছে?'

'না, মালুর খোঁজে। হিমালয় যেতে গেল এই পথই সহজ পথ। কলকাতায় ক'দিন ওকে থাকতেই হবে। নিশ্চয় অভিযানের কেনাকাটা করবে, ব্যবস্থা করবে। যে কটা সাউথ ইন্ডিয়ান ডেরা আছে, তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। না পেয়ে আপনার খোঁজে এসেছি। ইন্দ্রনাথবাবু, আপনি পরের ফ্লাইটে ব্যাঙ্গালোর চলুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মালু ব্যাঙ্গালোরেই রয়েছে।'

ইন্দ্রনাথ সব শুনে কান-কাটা বেহায়ার মতো জিগ্যেস করল, 'আপনি জানেন নিশ্চয় গোয়েন্দাগিরি আমার পেশা?'

জাম্বুলিঙ্গমও কম স্মার্ট নয়। সপ্রতিভ কণ্ঠে জবাব দিল তৎক্ষণাৎ, 'তৈরি হয়েই এসেছি আমি।' বলে, ভেতর পকেট থেকে বার করল একটা চেকবই আর কলম। 'কত লিখব বলুন?'

'হাজার।' নির্লিপ্ত গলায় জবাব দিল ইন্দ্রনাথ।

সঙ্গে সঙ্গে চেক লিখতে শুরু করল জাম্বুলিঙ্গম।

চুপ করে বসে থাকা বোধহয় কোষ্ঠীতে লেখেনি ইন্দ্রনাথের। নইলে, হাত অত নিশপিশ করবে কেন? হাঁটুর ওপর সেকেন্ড কয়েক আঙুল বাজিয়ে টেবিলের ওপর থেকে টেনে নিল জাম্বুলিঙ্গমের ছাতাটা। মোষের শিংয়ের ছড়ি প্যাটার্নের বাঁট থেকে শুরু করে চোখ বুলানো হল লোহার ফেরুল পর্যন্ত। ইতিমধ্যে চেক লেখা শেষ করে চেকখানা এগিয়ে ধরল জাম্বুলিঙ্গম। ইন্দ্রনাথও ডান হাতে ছাতা বাড়িয়ে দিয়ে বাঁ-হাতে নিল চেকটা।

বলল, 'ভারি সুন্দর ছাতা তো! দেখে মনে হয় যেন ছড়ি।'

ছাতা নিয়ে উঠে দাঁড়াল জাম্বুলিঙ্গম। ছড়ির কায়দায় একপাক ঘুরিয়ে নিল ছাতা। বলল ছোট করে, 'বিলতে যখন মেঘ করত, তখনি এ-ছাতা থাকত সঙ্গে। আজও থাকে সঙ্গে।'

কে জানত, তখন যে এই ছাতা নিয়েই ভেল্কি দেখাবে ইন্দ্রনাথ রুদ্র এবং থোঁতা মুখ ভোঁতা করবে আমার?

মেঘলোক দিয়ে সেইদিনই দুজনে এল ব্যাঙ্গালোরে। এয়ারপোর্ট থেকে সিধে গান্ধীনগরের ল্যাবরেটরিতে গেল ইন্দ্রনাথ। প্রথমেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল টাইপরাইটারের ওপর। একটা সাদা কাগজ ঢুকিয়ে খটাখট করে নিজে কিছুক্ষণ টাইপ করল। তারপর ডাক পড়ল প্রভাবতীর।

প্রভাবতী দক্ষিণী ললনা হলেও রীতিমতো চটকদার। বিজ্ঞানের সাধনা করতে এসেও রূপের সাধনায় গাফিলতি নেই বিন্দুমাত্র। চোখে কটাক্ষ এবং অধরে লালসা কীভাবে জাগ্রত করতে হয়, সে কৌশল তার করায়ত্ত।

এ হেন অ্যাসিস্ট্যান্ট দেখে ভুরু কুঁচকে ছিল ইন্দ্রনাথ। এ মেয়েকে ক্যাবারে ড্যান্সে মানায়, ল্যাবরেটরিতে মানায় না।

কিন্তু কি আশ্চর্য, প্রভাবতীকে নিয়ে বিশদ জেরার ধার দিয়েও যায়নি ইন্দ্রনাথ। শুধু চেয়েছে, রিপোর্টের ফাইলটা। রোজকার গবেষণার প্রতিবেদন টাইপ হত প্রতিদিন। ফাইল নিয়ে নিতম্ব দুলিয়ে ভারী বুকে হিল্লোল তুলে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে প্রভাবতী। টানা টানা চোখে একবার মাত্র যৌবন বিজ্ঞাপিত তন্বীদেহ দেখে নিয়ে ফাইল খুলে বসেছে ইন্দ্রনাথ।

প্রথমেই দেখেছে ৯ জুলাইয়ের রিপোর্ট। তারপর ৮ জুলাইয়ের। তারপর ৭ জুলাইয়ের। তারপর ৬ জুলাইয়ের।

জাম্বুলিঙ্গম সামনেই দাঁড়িয়েছিল। বাংলায় বলেছে ইন্দ্রনাথ, 'ভদ্রমহিলাকে এখন যেতে বলুন। কথা আছে।'

জাম্বুলিঙ্গম তামিল ভাষায় তৎক্ষণাৎ বিদায় দিয়েছে প্রভাবতীতে। হেলতে দুলতে নিতম্বিনী অন্তর্হিত হতেই শুনিয়েছে উদগ্র কণ্ঠে, 'কিছু পেলেন?'

'পেয়েছি। এ চিঠি ডক্টর মালুমঙ্গলম টাইপ করেননি। দু-নম্বর, ১১ জুলাই সকালে এ চিঠি টাইপ করা হয়নি। হয়েছে ৬ জুলাই, কি তারও আগে।'

পুরু লেন্সের আড়ালে জাম্বুলিঙ্গমের চোখ দুটো বিস্ময়ে বড় হয়েই ছোট হয়ে এল, 'কী করে জানলেন?'

'৬ জুলাই পর্যন্ত পুরোনো রিবনে টাইপ হয়েছে। ৭ জুলাই নতুন রিবন মেশিনে বসেছে। মালুমঙ্গলমের চিঠি পুরোনো রিবনে টাইপ করা। তার মানে, উনি এ চিঠি এগারোই জুলাই ঝোঁকের মাথায় টাইপ করেননি। আর কেউ ৬ জুলাই কি তারও আগে টাইপ করে রেখেছিল।

'উদ্দেশ্য?'

'তাঁকে সরানো। ডক্টর, আমার ভীষণ সন্দেহ হচ্ছে। উনি এখন কোথায়, স্বর্গে না মর্তে?'

'আপনিই বলুন।'

'মালুমঙ্গলম থাকতেন কোথায়?'

'এই গান্ধীনগরেই। ব্যাচেলর তো। গোটা বাড়িতে একা থাকতেন। যাবেন?'

'চলুন।'

চাবি কী করে সংগ্রহ হল এবং কতক্ষণ ধরে বাড়ি তল্লাসী হল, তার বিবরণ দিয়ে অযথা গল্পকে লম্বা করতে চাই না। তল্লাসীর শেষে কি পাওয়া গেল—শুধু সেইটুকু জানলেই পাঠক-পাঠিকার কৌতূহল জাগ্রত হবে।

একটা উইল। ডক্টর মালুমঙ্গলমের বিষয়সম্পত্তির বিলিব্যবস্থার নির্দেশ। ভদ্রলোক ব্যাচেলর ছিলেন বটে কিন্তু দরিদ্র ছিলেন না। বিবিধ কোম্পানির শেয়ার কেনাই ছিল দু-লক্ষ টাকার। এ ছাড়াও ব্যাঙ্কে নগদ টাকা আছে আড়াই লাখ। ম্যাঙ্গালোর আর ত্রিবান্দ্রামে ভূসম্পত্তির আর্থিক মূল্য কম করেও পঞ্চাশ হাজার টাকা।

এত টাকার বিষয়সম্পত্তি হেলায় ফেলে অদৃশ্য হয়েছেন ডাক্তার। সব চাইতে আশ্চর্য হল, যে-কোনও মানুষ অজ্ঞাতবাস করার আগে টাকাকড়ি সঙ্গে নেয়। বনবাসে গেলে অথবা আশ্রমবাসী হলে অবশ্য পয়সাকড়ির দরকার হয় না। কিন্তু যাচ্ছেন হিমালয় অভিযানে বিশল্যকরণীর সমতুল্য দুষ্পাপ্য গাছগাছড়ার সন্ধানে। সেক্ষেত্রে টাকা ওড়ানো দরকার খোলামকুচির মতো।

অথচ, ভদ্রলোক বলতে গেলে এক কাপড়ে অভিযানে বেরিয়েছেন। না নিয়েছেন টাকা, না নিয়েছেন সুটকেশ। ব্যাঙ্ক থেকেও টাকা তোলেননি।

অদ্ভুত কাণ্ড। তাই না? বুদ্ধিমান পাঠক-পাঠিকা নিশ্চয় আঁচ করে ফেলেছেন ব্যাপারটা।

হ্যাঁ, ইন্দ্রনাথেরও তাই মত। জাম্বুলিঙ্গমও দ্বিমত হতে পারল না। ডক্টর মালুমঙ্গলম স্বেচ্ছায় হিমালয় যাননি। তাঁর অনিচ্ছাতেই যেতে হয়েছে। হিমালয়ে নয়—যমালয়ে!

অর্থাৎ তিনি গায়েব হয়েছেন। হয়তো গুমখুনও হয়েছেন। নোবেল প্রাইজ লাভের স্বপ্ন দেখতে দেখতেই বোধ করি পরলোকের পথে রওনা হয়েছেন।

কিন্তু কাজটা কার? তাঁর মৃত্যুতে লাভ কার? বিষয়-সম্পত্তির লোভে আকছার খুন হচ্ছে ঠিকই। উইলে যার নাম রয়েছে, যাকে ডক্টর মালুমঙ্গলম তাঁর সর্বস্ব দিয়ে গেছেন, তাঁর অবর্তমানে, সে ব্যক্তিই হঠাৎ-ধনী হওয়ার দুর্জয় প্রলোভনে মানব-হিতৈষী ডাক্তারকে যমালয়ের পথ দেখিয়েছে কি?

কার নাম ছিল উইলে? কল্পনাতীত সেই নাম দেখে জাম্বুলিঙ্গমের মতো কাঠখোট্টা মানুষও শিস দিয়ে উঠেছিল কেন?

কে জানত, চিরকুমার মালুমঙ্গলমের মনেও রং ধরেছে। প্রেমের ফুল ফুটেছে। দিবানিশি যিনি রুগি আর ল্যাবরেটরি নিয়ে নাওয়া-খাওয়া ভুলেছিলেন, কোনওদিন স্বপ্নেও ভাবা যায়নি অন্তরের অন্দরে তিনি একটি নারীকে পূজা করে এসেছেন। জাম্বুলিঙ্গম তাই বিস্ময়ে বোবা হয়ে গিয়েছিল। কথা বলতে পারেনি অনেকক্ষণ।

ইন্দ্রনাথও কম অবাক হয়নি। শুকনো কাঠের মতো মন যাঁদের, শোনা যায় সেই কঠোর ব্রহ্মচারীরাই শেষ পর্যন্ত উর্বশী-রম্ভার মতো নর্তকীদের হাতে ঘায়েল হন। এক্ষেত্রেও হয়েছে তাই। মালুমঙ্গলম মনে মনে যাকে ভালোবেসেছিলেন, মনের দিক দিয়ে তার সঙ্গে তাঁর কোনও মিল থাকতে পারে না।

মেয়েটির নাম প্রভাবতী। ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট ও সেক্রেটারি।

ইন্দ্রনাথ বলল, 'খটকা লেগেছে আমার মনে।'

জাম্বুলিঙ্গম বলল, 'কেন?'

ডক্টর মালুমঙ্গলমের ধোঁকা-চিঠি টাইপ করা হয়েছে প্রভাবতীর টাইপরাইটারে। এখন দেখা যাচ্ছে, উইলেও নাম রয়েছে প্রভাবতীর। তার মানে কী?'

'প্রভাবতী সরিয়েছে মালুকে?'

'এত সহজে তা বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু অমন একটা সন্দেহ মনের মধ্যে ঘুরঘুর করে বইকি। তাই ভাবছিলাম,' ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে উইল পরখ করতে করতে ইন্দ্রনাথ বলল, 'ইনফ্রা-রেড ছবি তুলব।'

'ইনফ্রা-রেড ছবি কার?'

'কারও নয়। এই উইলের।'

'কেন? কেন ইন্দ্রনাথবাবু?'

'উইলে জালিয়াতি আছে কিনা দেখা দরকার। মেয়ে জাতটাকে আমি মশাই একদম বিশ্বাস করি না। যাদের গোঁফ নেই, তাদের বিশ্বাস করলেই ঠকতে হয়। তাই ইনফ্রা-রেড ছবি তুলব! ব্যবস্থা করবেন?'

'আলবৎ।'

উঠল ইনফ্রা-রেড ফটোগ্রাফ। পাওয়া গেল আরও একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য।

উইলের যেখানে-যেখানে প্রভাবতীর নাম লেখা, সেখানে-সেখানে আসলে লেখা ছিল অন্য একটি নাম। সযত্নে সে নাম উঠিয়ে লেখা হয়েছে প্রভাবতীর নাম।

ডক্টর মালুমঙ্গলমের ইচ্ছা ছিল তাঁর অবর্তমানে তাঁর বিপুল ভূসম্পত্তির ওয়ারিশ হোক ডক্টর জাম্বুলিঙ্গম। সম্পত্তির আয় থেকে যেন ক্যান্সার নিয়ে গবেষণা চালানো হয় ব্যাঙ্গালোর ক্যান্সার রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায়। বিশেষ এই লাইনটি ছিল উইলের শেষের দিকে। পুরো লাইনটি কেমিক্যাল দিয়ে মোছা হয়েছে। কিন্তু যেখানে-যেখানে ছিল জাম্বুলিঙ্গমের নাম, সেখানে- সেখানে বসানো হয়েছে প্রভাবতীর নাম।

থ হয়ে গেল ডক্টর জাম্বুলিঙ্গম।

পুলিশ এল। প্রথমেই গ্রেপ্তার হল প্রভাবতী। তারপর মালুমঙ্গলমের বাড়ি তোলপাড় করা হল। শেষকালে একতলায় যে ঘরে কাঠ আর কয়লা গাদা করা থাকে, সেইখানে গিয়ে দেখা গেল, মেঝের ওপর বেশ কিছু সিমেন্ট বালি মাখা হয়েছে। শুকিয়ে পাথর হয়ে গেলেও দাগটা টাটকা।

কিন্তু গোটা বাড়িতে মেরামতির চিহ্ন কোথাও পাওয়া গেল না। সিমেন্ট-বালি লাগতে পারে, এমন কোনও কাজ বাড়িতে হয়নি।

বিস্তর নাজেহাল হবার পর ইন্দ্রনাথ ধরিয়ে দিল রহস্যের চাবিকাঠি। বলল, 'কয়লার গাদা সরানো হোক।'

ইন্সপেক্টর বললেন, 'কেন?'

ইন্দ্রনাথ বলল, 'শার্লক হোমস এক জায়গায় বলেছে, সবক'টা সম্ভব জায়গা খুঁজেও যদি হারানো জিনিস পাওয়া না যায়, তাহলে সব চাইতে অসম্ভব জায়গায় সেটা আছে। সুতরাং সরান না কয়লা আর কাঠের গাদা।'

ইন্সপেক্টর বেশ জোরেই ব্যঙ্গের হাসি হাসলেন। কিন্তু শেষমুহূর্তে সুবুদ্ধির উদয় হল। হল বলেই সমস্যার সুরাহা হল। নইলে মালুমঙ্গলমের লাশ আর পাওয়া যেত না।

কয়লার গাদা বেলচা দিয়ে পরিষ্কার করার পর দেখা গেল, সদ্য গাঁথা একটা ইটের কফিন। এক ফুট উঁচু। দেওয়াল থেকে এক ফুট ঠেলে এগিয়ে এসেছে। কয়লা ঢেকে ঢাকা হয়েছে এই কফিনকেই।

কফিন! হ্যাঁ, কফিন! শাবল মেরে ইট খসিয়ে ভেতরে পাওয়া গিয়েছিল মালুমঙ্গলমের বিকৃত মৃতদেহ।

সেই সঙ্গে একটা ছোরা। বুকের বাঁদিকে আমূল গেঁথেছিল ছোরাটা।

লোমহর্ষক কাহিনিটা শুনেছিলাম আমারই আড্ডাঘরে বসে—কলকাতায়। তেলমুড়ি চিবোতে চিবোতে যথারীতি নিজের জয়ঢাক পিটছিল ইন্দ্রনাথ। আমি আর গৃহিণী বলতে গেলে কানখাড়া করেই শুনছিলাম।

ডক্টর মালুমঙ্গলমের লাশ আবিষ্কারের নাটক শোনার পর আরও দুটো আলুর চপ চেয়েছিল ইন্দ্রনাথ। তাইতেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল কবিতা। খ্যাঁক করে বললে, 'একটাও দেব না।'

'কেন বউদি? আমার অপরাধ?' ইন্দ্রনাথ যেন কতই আহত।

'তুফান মেলের মতো গল্প বলা হচ্ছে কেন? ঘোড়ায় জিন দিয়ে আসা হয়েছে নাকি?'

'এই কথা।' আশ্বস্ত হল ইন্দ্রনাথ। 'আসল রহস্যে এখনও আসিনি বলেই তো বাঁই বাঁই করে বলছিলাম।'

'আসল রহস্যে এখনো আসোনি মানে? মালুমঙ্গলমের লাশটা কি তাহলে নকল বলতে চাও?'

'আহা লাশ নকল হবে কেন? লাশ কি নকল হয়? লাশ আসল—বিলকুল আসল। কিন্তু এ কাহিনির মোদ্দা প্যাঁচটুকুই তো শুরু করিনি এখনও।'

'থামাও নাটক। হেঁয়ালী করবার আর জায়গা পাওনি? প্রভাবতীকে গ্রেপ্তার করালে, লাশ বার করে ফেললে, জাল উইলের জালিয়াতি ধরে ফেললে—এরপর কি জট থাকতে পারে বুঝি না।' কবিতা যেন সাক্ষাৎ দেবী চৌধুরাণী।

'আছে বউদি, আছে। দেখবার চোখ থাকলেই দেখা যায়। আলুর চপের প্লেটটা এদিকে না আসা পর্যন্ত সে জিনিস বলা হবে না। ফলে আধখানা গল্প শুনে আধ-কপালে হয়ে থাকতে হবে। শুনলে অবশ্য চোখ কপালে উঠবে। না শুনলে আধ-কপালে হবে। বলো, কী করবে?'

'শুনব,' বলে চপের প্লেট এগিয়ে দিল কবিতা।

ইন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ করল, 'প্রভাবতী তো হাজতে গেল। সে কী কান্না মেয়েটার। কাঁদতে-কাঁদতে ফিট হয়ে যায় আর কি! তার বিরুদ্ধে অপরাধের ফিরিস্তি শুনে হাত-পা এমন ঠান্ডা হয়ে এল যে, শেষ পর্যন্ত ডাক্তার ডাকতে হল।

'জাম্বুলিঙ্গম নিজেও কেমন জানি হয়ে গিয়েছিল। দিন-রাত ঘরে বসে থাকত। বাইরে বেরোত না। শক তো বটেই সাংঘাতিক শক। ট্রিপল শক। বন্ধুর অপঘাত মৃত্যু। রাতারাতি কুবের হওয়া এবং প্রভাবতীর মুখোশ খুলে যাওয়া। কাজেই তিন ধাক্কা সামলাতে ও যখন কাহিল, আমি তখন কয়েকটা খোঁজ-খবর নিতে লাগলাম বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে।

'কী খবর নিলাম, কোন অফিসে গেলাম, কার সঙ্গে দেখা করলাম—এসব শুনতে চাও কি? ইচ্ছে নেই। বেশ বাদ দিলাম। পুরো দুটো দিন টো-টো করে ফের গেলাম পুলিশ অফিসে।

'সেই ফাজিল ইন্সপেক্টর এবার আমাকে সমীহ করে 'স্যার' বলল। জিজ্ঞেস করল, কিছু জিজ্ঞাস্য আছে কিনা।

আমি বললাম, 'ফোরেনসিক রিপোর্ট এসেছে?'

'কীসের?'

'স্ট্যাবিংয়ের।'

'এসেছে। ছোরা যে মেরেছে, সে ল্যাটা। মানে, বাম হাতে ছোরা মারতে পোক্ত। রিপোর্টের মোদ্দা কথা হল এই। আর কিছু?'

'না। আমিও এইটুকুই শুনতে এসেছিলাম। আর একটা কথা বলতে এসেছিলাম।'

'বলুন।'

'প্রভাবতীকে ছেড়ে দিন।'

'কেন?'

'ও নির্দোষ।'

'সে কী স্যার! ডক্টর মালুমঙ্গলমের ভাঁওতা চিঠি ও ছাড়া কে টাইপ করবে?'

'ও করেনি। অন্য কেউ করেছে ওর টাইপরাইটারে ওর ঘাড়ে দোষ চাপানোর জন্যে।'

ঢোক গিলল ইন্সপেক্টরঃ 'কিন্তু উইলটা? উইলে তো প্রভাবতীই নিজের নাম লিখেছে আগের নাম মুছে।'

'সেটাও অন্য লোকের কারসাজি। দোষ চাপাতে চায় প্রভাবতীর কাঁধে।'

'তাও কি হয় স্যার। নিজের নাম নিজে ছাড়া কেউ জাল করে অন্যের উইলে?'

'করে বইকি।'

'প্রভাবতীর নাম উইলে বসিয়ে কারও লাভ আছে?'

'আছে বইকি।'

'কী বলছেন স্যার! আমার মাথা বোঁ-বোঁ করে ঘুরছে।'

'ঘুরবে বইকি।' বলে একখানা মার্কামারা হাসি হাসলাম। যে হাসি যুগ যুগ ধরে দুঁপি, পয়রো, হোমসরা হেসে এসেছে রহস্যের নাটকীয় পরিসমাপ্তির ঠিক আগের মুহূর্তে—হাসলাম সেই হাসি। দেখেই তো ইন্সপেক্টর সাহেবের চক্ষু চড়কগাছ হল।

আমি বললাম, 'দরজাটা বন্ধ করে বসুন। সিগারেট খান? খান না। তাহলে আমি পাইপ ধরাই। একটু সময় লাগবে। কেননা, আশ্চর্য একটা কাহিনি আপনাকে শোনাব। শুনিয়ে আমি বিদায় নেব ব্যাঙ্গালোর থেকে। বাকি কাজ আপনার। আমি শুধু খেই ধরিয়ে দিয়ে যাব। শেষ করার পালা আপনার। নামও হোক আপনার।'

বলে পাউচ বার করলাম। একডালা টোব্যাকো নিয়ে ঠাসলাম বার্মিংহামের নতুন পাইপটায়। আর, আগাগোড়া হাঁ করে বসে রইল ইন্সপেক্টর।

বেশ কয়েকটা রাম-টান দেওয়ার পর বললাম, 'এ মামলার শুরু কলকাতায়—আমার এক লেখক বন্ধুর আড্ডাঘরে। ডিটেকটিভ জাতটা পেট থেকে পড়েই যে ডিটেকটিভ হয় না—এটাই মাথায় ঢোকাচ্ছিলাম বন্ধুবরের। এজন্যে পড়তে হয়, চোখ-মন-কানকে তৈরি করতে হয়। নইলে অনেক সূত্রই সামনে থেকেও কলা দেখায়। যেমন সিগারেট। সিগারেট যারা খায়, তারা কীভাবে আঙুলের ফাঁকে সিগারেট ধরে, কীভাবে ঠোঁটের গোড়ায় ঝোলায়, কীভাবে ধোঁয়া ছাড়ে, বা রিং ছাড়ে—এই দেখেই মানুষটার চরিত্র সম্বন্ধে অনেক কথা বলা যায়।

'এমনি ধরনের অনেক জ্ঞান দিচ্ছি বন্ধুকে—না দিলে পাঠকসাধারণ ভালো জিনিস পাবে কেন লেখকের কাছ থেকে—এমনি সময়ে আড্ডাঘরে ঢুকলেন আমাদের ডক্টর জাম্বুলিঙ্গম।

'জাম্বুলিঙ্গমের ব্যক্তিত্ব আমাদের মুগ্ধ করল। তাঁর বাচনভঙ্গি আমাদের মন কেড়ে নিল। তাঁর বাংলা ভাষায় ব্যুৎপত্তি দেখে নিমেষে তাঁকে আপন করে নিলাম।

'জাম্বুলিঙ্গম কলকাতা গিয়েছিলেন মালুমঙ্গলমের খোঁজে। না পেয়ে আমাকে পাকড়াও করলেন। আমার হাতে গোপন তদন্তের ভার দিতে চাইলেন।

'জাম্বুলিঙ্গমের হাতে একটা বাহারি ছাতা ছিল এমন সুন্দর ছড়ি প্যাটার্নের ছাতা সচরাচর দেখা যায় না। ছাতাটা উনি নামিয়ে রেখেছিলেন মাঝখানের উঁচু টেবিলের ওপর। ফেরুলটা ফেরানো ছিল আমার দিকে। তাই বৈশিষ্ট্যটা নজরে এসেছিল।

'অন্য কারো নজরে আসেনি। অমন যে ডাকসাইটে লেখক বন্ধু, যার গোয়েন্দা গল্প পড়ে পাঠকরা নাকি লেখককেই গোয়েন্দা বলে ধরে নেন, সেই লেখক বন্ধুরও নজরে আসেনি ছাতার তলার ফেরুলের অদ্ভুত বেয়াড়াপনা।

'ফেরুল প্রসঙ্গে পরে আসছি। জাম্বুলিঙ্গমের কথার ফাঁকে ফাঁকে ফেরুলটা দেখে নানা রকম কৌতূহল মনের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি মারতে শুরু করল। তাই নির্লজ্জ ভাবেই অ্যাডভান্স চাইলাম পারিশ্রমিক বাবদ। উনি

সঙ্গে সঙ্গে চেকবই বার করলেন। আমার সামনেই চেক লিখে দিলেন। আমার যা জানবার, সঙ্গে সঙ্গে জানা হয়ে গেল।

'সব জেনেই ব্যাঙ্গালোরে এলাম। সব জেনেও ন্যাকা সেজে তদন্ত করলাম। প্রভাবতীকে নির্দোষ জেনেও তাকে ধরিয়ে দিলাম। কারণ, হাতে সময় নেওয়া। যাতে আমার গোপন তদন্তের অত্যন্ত গোপন অংশটুকু খুবই গোপনে নিজেই খুঁজে বার করতে পারি।

'এই দু-দিনে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সব জানলাম। কোন মন্ত্রগুপ্তির বলে এত কাণ্ড জানলাম, তা বলতে গেলে সাতকাণ্ড রামায়ণ শোনাতে হয়। সংক্ষেপে শুনে রাখুন। মালুমঙ্গলমকে খুন করেছেন এমন একজন ব্যক্তি, যাঁকে উনি সবচাইতে বিশ্বাস করেছিলেন। ধরতে পারলেন না? ডক্টর জাম্বুলিঙ্গম।'

ভেবেছিলাম এমন একটা বম্বশেল নিউজ শুনে আঁতকে উঠবে ইন্সপেক্টর। কিন্তু অতি আঘাতে চেতনা অসাড় হয়ে যায় শুনেছি। ভদ্রলোকেরও হল তাই। চোয়াল ঝুলে পড়ল। মুখ দিয়ে টুঁ শব্দটি বেরোল না। ফ্যালফ্যাল করে কেবল তাকিয়ে রইল আমার পানে।

আমি বললাম—ইচ্ছে করেই বললাম, 'কী হল মশাই, অমন করছেন কেন?'

প্রায় খাবি খাওয়ার মতো মুখব্যাদান করে বলল ইন্সপেক্টর, 'স্যার, আপনি ঠাট্টা করছেন?'

'আরে গেল যা,' একটু বিরক্ত হয়েই বললাম আমি, 'ঠাট্টা করার সময় এটা?'

'ডক্টর জাম্বুলিঙ্গম বাজে লোক নন তো।'

'আমি কি বলেছি বাজে লোক? বাজে লোক কখনও এমন উল্টো দিক থেকে কেস সাজাতে পারে? অলপ্রুফ কেস মশাই। ছুঁচ ফোটানোর জায়গা নেই। ব্রেন না থাকলে কেউ কর্ণাটক থেকে বঙ্গে দৌড়ে ইন্দ্রনাথ রুদ্রকে অ্যাপয়েন্ট করে? কেন জানেন?'

'আজ্ঞে?'

'প্যাচের কেস বলে। ব্রেনি প্যাঁচ তো, জবর ব্রেন না হলে প্যাঁচ ধরতে পারত না। না ধরতে পারলে প্রভাবতীকে ফাঁসানো যেত না। প্রভাবতী না ফাঁসলে জাম্বুলিঙ্গম কেটে বেরিয়ে যেতে পারতেন না। বুঝলেন?'

'আজ্ঞে না।'

'বুঝিয়ে দিচ্ছি। এ কেসের প্রথম প্যাঁচ হচ্ছে টাইপরাইটারের চিঠি। ইচ্ছে করেই পুরোনো রিবনে টাইপ করা হয়েছিল চিঠিটা। পরের দিন নতুন রিবন লাগানো হবে জেনেই পুরোনো রিবনে টাইপ করে রাখা হয়েছিল। ফলে, ইচ্ছে করেই একটা অসঙ্গতি রেখে দেওয়া হয়েছে। অসঙ্গতিটা ধরা পড়লে প্রভাবতীকে সন্দেহ হবে। কিন্তু ধরবার মতো ব্রেন তো চাই। তাই ডাক পড়ল ইন্দ্রনাথ রুদ্রের।'

আবার খাবি খেলো ইন্সপেক্টর। আমি বললাম, 'এ কেসের দ্বিতীয় প্যাঁচ হল উইলের জালিয়াতি। নাম মুছে প্রভাবতীর নাম লেখা হয়েছে ইচ্ছে করেই। ইনফ্রা-রেড ফটো তুললেই তলায় অস্পষ্ট নামটা দেখা যাবেই। ফলে। সব সন্দেহ গিয়ে পড়বে প্রভাবতীর ওপর। কিন্তু ইনফ্রা রেড ছবি তোলার বিদ্যে বা আইডিয়া ক'জনের থাকে বলুন? যদি জালিয়াতিটা চোখ এড়িয়ে যায় স্থানীয় পুলিশের? তাই হত্যাকারীকে দৌড়তে হল কলকাতায়। আগাম টাকা দিয়ে ডেকে আনতে হল ইন্দ্রনাথ রুদ্রকে। ফলে, জালিয়াতি ঠিকই ধরা পড়ল। হত্যাকারীর প্যাঁচালো ফন্দিও পূর্ণ হল।

'কিন্তু হত্যাকারী গোড়ায় ভুল করে ফেলেছিলেন ওই ছাতা সঙ্গে রেখে। বিলেত থেকে আনা ছাতা। আকাশে বৃষ্টির আভাস দেখলেই সঙ্গে রাখার অভ্যেস। তাই ছাতা নিয়ে গেলেন আমাকে দিয়ে তাঁর প্যাঁচ ধরানোর বন্দোবস্ত করতে। পরিণাম কি হল জানেন? ভদ্রলোকের পুরো প্যাঁচটাই গোড়াতে আমি আঁচ করে ফেললাম। রগড় দেখতে এলাম ব্যাঙ্গালোরে।'

ইন্সপেক্টর বিহ্বল কণ্ঠে বলল, 'স্যার, আমি কিসসু বুঝতে পারছি না।'

'কেউই পারে না। পারে না বলেই আমার নাম দেয় রবার্ট ব্লেক। যাকগে সেকথা। আপনাকে আর একটা পিলে চমকানো খবর শোনাই। ডক্টর জাম্বুলিঙ্গম বলে যাকে আপনারা মাথায় তুলে নাচছেন, যাকে সরকার

মোটা টাকার বৃত্তি দিয়ে বসে আছে ব্লাড ক্যান্সার গবেষণার জন্যে, তিনি আসল জাম্বুলিঙ্গম নন।'

'আসল জাম্বুলিঙ্গম নন!' ইন্সপেক্টর ক্ষীণ কণ্ঠে মিনমিন করল, 'মানে?'

'মানে নকল জাম্বুলিঙ্গম। আসল জাম্বুলিঙ্গম সমুদ্রের তলায় বা হাঙরের পেটে।'

'কী বলছেন, স্যার?'

'অনেকগুলো টেলেক্স মেসেজ থেকে খবরটা জেনেছি। যে জাহাজে আসল জাম্বুলিঙ্গম দেশে ফিরছিলেন, সে জাহাজে প্রায় তাঁরই মতো চেহারার আর একজন সাউথ ইন্ডিয়ান ছিলেন। নাম তাঁর কৃষ্ণস্বামী। কৃষ্ণস্বামীকে সনাক্তকরণের বড় চিহ্ন হচ্ছে তাঁর হাত। ভদ্রলোক অসম্ভব ল্যাটা ছিলেন। বাঁ-হাতেই সব কাজ করতে অভ্যস্ত ছিলেন।

'ডক্টর জাম্বুলিঙ্গম ভারতের মাটিতে কোনওদিনই পৌঁছোননি। মদ খেয়ে এক ঝড়ের রাতে ডেকে মাতলামো করার সময় নাকি ভদ্রলোক সমুদ্রে পড়ে যান। আর পাওয়া যায়নি। অবশ্য কেউ তাঁকে পড়ে যেতে দেখেননি। লোকমুখে শোনা গিয়েছিল, মদ খেয়ে টলতে টলতে তিনি পায়চারি করছিলেন ডেকের ওপর ঝড়-জলের রাতে।

'জাম্বুলিঙ্গমের মালপত্র কেবিনেই ছিল—শুধু পাশপোর্ট আর ডিগ্রি সম্পর্কিত কাগজগুলো ছাড়া। ধরে নেওয়া হয়েছিল, ওগুলো পকেটে নিয়ে ঘুরতেন ভদ্রলোক। ফলে সবশুদ্ধ সলিলসমাধি হয়েছে।

'কিন্তু তা হয়নি। কৃষ্ণস্বামীর চেহারার সঙ্গে বেশ কিছু মিল ছিল জাম্বুলিঙ্গমের। ফটো তুললে তা ধরাই যেত না। তাই সস্তায় কিস্তিমাতের প্ল্যান এঁটেছিল কৃষ্ণস্বামী। জাম্বুলিঙ্গমের দীর্ঘদিনের সাধনার সিদ্ধিকে মুঠোয় আনতে সহজতম ফন্দি। ব্লাড ক্যান্সারের দাওয়াইয়ের একমাত্র আবিষ্কারক হতে চেয়েছিল একাই। ধোঁকা-চিঠিতে মিথ্যে লেখা হয়েছিল। ও ওষুধে মাথা খারাপ হওয়ার ব্যাপারটা স্রেফ বানানো।

'ঝড়জলের রাতে কৃষ্ণস্বামীই ঠেলে ফেলে দিয়েছিল জাম্বুলিঙ্গমকে। এটা আমার অনুমান। পরে মিলিয়ে নিতে পারেন। তারপর জাম্বুলিঙ্গমের নাম লেখা কাগজপত্র পাসপোর্ট হাতিয়ে নিয়ে দেশে ফিরেছিল।

'তারপর থেকেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দেখা গিয়েছে নকল ডক্টর জাম্বুলিঙ্গমকে। কথায় কথায় পাসপোর্ট খুলে ছবি দেখিয়েছে। চেহারায় ছবিতে কোনও অমিল নেই। সই নকল করতে একটু সময় লেগেছে অবশ্য। ডান হাতে সই করার প্র্যাকটিশ করতে হয়েছে। কারণ কৃষ্ণস্বামী ল্যাটা। জাম্বুলিঙ্গম নন।

'বিশাল এই উপমহাদেশে জাম্বুলিঙ্গমের নাম লেখা কাগজপত্র আর পরিচয়নামা নিয়ে তাঁরই মতো কোনও জুয়াচোর ঘুরে বেড়ালে তাকে ধরার সাধ্য কারোর নেই—যদি না নিজে ধরা দেয়। অতি-চালাকেরই গলায় দড়ি পড়ে। তাই ধরা শেষ পর্যন্ত পড়তেই হল। যেচে শেয়ালকে ভাঙা বেড়া দেখিয়ে নিজেই মরল।'

এই পর্যন্ত বলে আমি উঠে পড়লাম। হাঁ-হাঁ করে ইন্সপেক্টর বললে, 'স্যার, আসল কথাটাই তো বলে গেলেন না। নকল জাম্বুলিঙ্গমকে গোড়া থেকেই সন্দেহ করলেন কেন?'

'বললাম তো ছাতার ফেরুল দেখে।'

'কী ছিল ছাতার ফেরুলে?'

'কিচ্ছু ছিল না। শুধু একটা বিশেষ দিক ছিল।'

'ফেরুল ক্ষয়ে গিয়েছিল? তা তো যাবেই।'

'ওই যে বললাম, চোখ না থাকলে ডিটেকটিভ হওয়া যায় না। দরকারি অদরকারি সব কিছুই চোখে পড়া চাই। আমি দেখলাম, ফেরুলের যেদিকটা যেভাবে ক্ষয়েছে, সেদিকটা সেভাবে ক্ষইতে পারে তখনই, যদি ছাতার মালিক বাঁ-হাতে ছাতা নিয়ে হাঁটে।

'ডান হাতে ছাতা নিয়ে ছড়ির মতো দুলিয়ে হাঁটলে ফেরুলের যেদিকটা বেশি ক্ষয়ে যায়, সেদিকটা থাকে ফেরুলের ওপর দিকে সামান্য ডাইনে ঘেঁষে।

'কিন্তু বাঁ-হাতে ছাতা বা ছড়ি রাখলে ক্ষওয়ার দিকটা থাকবে সামান্য বাঁদিক ঘেঁষে।

'নকল জাম্বুলিঙ্গমের ছাতার ফেরুলও দেখলাম সামান্য বাঁয়ে ক্ষওয়া। কিন্তু ছাতা বা ছড়ি তো সবাই ডান হাতেই রেখে পথ চলে—বাঁ-হাতে হাজারে একজনও রাখে কিনা সন্দেহ। তবে কি ভদ্রলোক ল্যাটা?

'কৌতূহল হতেই পরখ করলাম। আগাম টাকা চাইলাম কায়দা করে। ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে চেক লিখলেন ডান হাতে—স্বচ্ছন্দগতিতে নয়। আড়ষ্টভাবে।

'বুঝলেন তো? অজ্ঞাতসারে দীর্ঘদিনের অভ্যাসমত যিনি বাঁ-হাতে ছাতা রাখেন, তিনি যে ল্যাটা সেটা চেক লেখবার সময়ে প্রকাশ করতে চান না। কেন? কেন এই গোপনতা? কেন এত লুকোচুরি?

'মনের মধ্যে ঘোর সন্দেহ নিয়ে ব্যাঙ্গালোরে এলাম। মালুমঙ্গলমের লাশ আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত পাকা প্রমাণ পাইনি। ছোরা মারার ধরন দেখেই অনুমান করেছিলাম, হত্যাকারী বাঁ-হাত চালিয়েছে। অর্থাৎ ল্যাটা। পোস্টমর্টেম রিপোর্টও তাই বলেছে।

'সুতরাং নকল জাম্বুলিঙ্গম, মানে ল্যাটা কৃষ্ণস্বামীই আসল খুনি। প্রভাবতী নয়।' বলে, পা বাড়ালাম চৌকাঠের দিকে।

ভ্যাবাচাকা ভাবে পেছন পেছন দৌড়ে এল ইন্সপেক্টর, 'স্যার, স্যার, কেস সাজাব কী করে?'

'সে ভার আপনার। আমার ভার ছিল মালুমঙ্গলমকে বার করা। টাকাও খেয়েছি তার জন্যে। নুন খেয়ে বেইমানি করতে পারব না। যার টাকা খেয়েছি, তার বিরুদ্ধে কী করে কেস সাজাই বলুন তো?' বলে আর দাঁড়ালাম না। আমি।

কাহিনি শেষ করে সশব্দে ঢেকুর তুলল ইন্দ্রনাথ। বলল, 'বউদির তেলেভাজা খেয়ে আমার অম্বল হয়ে গেল।'

'বেইমান!' বলল কবিতা।

** 'রোমাঞ্চ' পত্রিকার প্রকাশিত। শারদীয় সংখ্যা, ১৯৭১।*

পায়রাকুঠীর রহস্য

আসলে বাড়িটা সাহেব বাড়ি। অনেককাল আগে যখন সাহেবরা রাজত্ব করত এদেশে, এবাড়ি তখনকার তৈরি। মোটা মোটা থাম। এত মোটা যে দু-হাতেও আঁকড়ে ধরা যায় না। চুনবালির তৈরি হলেও দারুণ মজবুত, কামান দাগলেও ভাঙতে সময় লাগবে।

দুশো বছরের পুরোনো বাড়ি। কিন্তু আজও যেন নতুন। সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে প্রকাণ্ড বাগান। জনসন সাহেব যদ্দিন ছিলেন, সেখানে ফুলের বাহার দেখে চোখ জুড়িয়ে যেত। এখন শুধু জঙ্গল।

জনসন সাহেবের বউ মারা যেতেই মনের দুঃখে তিনি বিলেতে চলে যান। বাড়িটা জলের দরে কিনে নেয় নীলমাধব সিংহ। ভদ্রলোক পকেটে তামার পয়সা নিয়ে এসেছিল ব্যবসা করতে। কয়েক মাইল দূরে পাহাড়ের গায়ে তখন মিলিটারি ব্যারাক বসেছে। হরদম গাড়ি যাতায়াত করছে। রাস্তার ঠিক ধারে একটা পেট্রল পাম্প খুলে বসতেই দুদিনেই ফুলে লাল হয়ে গিয়েছিল সিংহমশায়।

সে আজ অনেকদিনের কথা। সিংহমশায় এখন মরে হেজে স্বর্গে। এত বড় বাড়িটা দিয়ে গিয়েছিল দুই ছেলেকে। বেণীমাধব আর ননীমাধবকে। দুজনেই দুধরনের মানুষ। বেণীমাধব শুধু পায়রা ওড়ায়। পায়রাকে এমন শিক্ষা দেয় যে অনেক মাইল দূর থেকে ছেড়ে দিলেও ঠিক উড়ে আসে কবুতর খোপে। বাড়ির মধ্যে ঘরে ঘরে নাকি শুধু পায়রার খোপ বানিয়েছে সে। দামি দামি পায়রা কিনে নিয়ে যাচ্ছে দেশ-বিদেশের লোকরা গোপনে খবর পাঠানোর জন্যে। পায়রার পায়ে চিঠি বেঁধে ছেড়ে দিলেই হল—ঠিক উড়ে ফিরে যাবে নিজের জায়গায়। পায়রা রেস জেতবার জন্যেও খদ্দের আসছে দামি দামি গাড়ি চেপে। আর আসছে নানারকমের লরি আর ভ্যান—পায়রাদের খাবার নিয়ে।

পাহাড়ি মানুষরা তাই সাহেব বাড়ির নাম দিয়েছিল—পায়রাকুঠী। দিনরাত পায়রা উড়ছে, নামছে বক-বকম করছে সেখানে। এ নাম সে বাড়িকেই মানায়। মাঝে মাঝে পেল্লায় মোটর হাঁকিয়ে পায়রাদের নিয়ে অনেক দূরে চলে যেত বেণীমাধব। পাহাড়ের ওদিকে গিয়ে পায়রাগুলোকে ছেড়ে দিয়েই জোরে মোটর হাঁকিয়ে ফিরে আসত পায়রাকুঠীতে। কিছুক্ষণ পরেই দেখা যেত নীল আকাশ থেকে দল বেঁধে পতপত করে নেমে আসছে ফেলে আসা পায়রার দল।

পায়রার মাস্টার বেণীমাধব বিয়ে-থা করেনি। বেণীমাধবের ভাই ননীমাধবও করেনি। বেণীমাধব পায়রা নিয়ে মশগুল। ননীমাধব মঠ-মন্দির নিয়ে উদাসীন। একমুখ দাড়ি, গেরুয়া বসন, রুদ্রাক্ষের মালা—এই ছিল ননীমাধবের সম্বল। মাঝে মাঝে আসত দাদার কাছে। স্টেশন থেকেই শোনা যেত তার হর-হর-ব্যোম-ব্যোম ডাক। হেঁটেই আসত। দুপাশের লোক সরে যেত তাকে দেখে। কেউ কেউ পেন্নাম ঠুকত ভক্তিভরে। মৃদু হেসে সবাইকেই নমস্কার করত ননীমাধব।

পায়রাকুঠীতে তাই কোনও রহস্য ছিল না। কিন্তু সংসারে কিছু রহস্যসন্ধানী আছেন মামুলী বস্তুর মধ্যে থেকেও যাঁরা চমকপ্রদ চক্রান্তকে উদ্ধার করতে পারেন। যেমন আমাদের ইন্দ্রনাথ রুদ্র। প্রাইভেট ডিটেকটিভ। চেহারাটা কবি কবি হলেও স্বভাবটা ঈগলপাখির মতো। শিকারকে ফসকাতে দেয় না।

এ কাহিনি সেই ইন্দ্রনাথ রুদ্রেরই।

পায়রাকুঠীর সিকি মাইল পূবদিকে থাকেন মিসেস শিকদার। বিধবা। ভীষণ মোটা। কিন্তু অনেক টাকার মালিক। জমিজমা বিস্তর। দেখাশুনার জন্যে এমন একজনকে রেখেছিলেন যিনি সারাজীবন আরবের

মরুভূমিতে কাটিয়েছেন ভারত সরকারের চাকরি নিয়ে। তারপর রিটায়ার করে ফিরে এসেছেন দেশে দুই ছেলেকে মানুষ করার জন্যে।

শোভনলাল তাঁর নাম। মেজর শোভনলাল। আকারে বেঁটেখাটো। ল্যাটা, কিন্তু রীতিমতো কর্মঠ। কম কথা বলেন। কেননা তাঁর মনে অনেক দুঃখ। অল্প বয়েসেই বউ মারা যান দুই ছেলেকে রেখে। ছেলেদের মুখ চেয়েই আর বিয়ে করেননি শোভনলাল। কিন্তু ছেলেদের শ্রদ্ধা ভালোবাসাও পাননি।

মদন আর বিজন ছেলেদুটি হয়েছে বিশ্ববকাটে। মা না থাকলে যা হয় আর কি। বাপ চাকরি নিয়ে ব্যস্ত, ছেলেরা ছিল বোর্ডিং হাউসে। কিন্তু সেখানে সুশিক্ষার বদলে কুশিক্ষাই শিখছে শুনে শোভনলাল ছেলেদের এনে রাখলেন নিজের কাছে—কিন্তু ছেলেদের দু-চোখের বালি হয়ে রইলেন।

অথচ ছেলেদের ভালোবাসা পাওয়ার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি শোভনলাল। মা-মরা ছেলেদের মায়ের মতোই স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে মানুষ করার জন্যে আরবদেশের এক শেখ সাহেবের মোটা মাইনের চাকরির প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করলেন। মিসেস শিকদারের ফল আর ফুলের বাগান দেখাশুনোর চাকরি নিলেন নামমাত্র মাইনেতে। সারা জীবন মরুভূমিতে কাটানোর জন্যে বাগান তৈরির দিকে ঝোঁক ছিল অনেকদিন থেকেই। শেষ জীবনের শান্তির আশায় তাই নিজেই ফল ফুলের চারা লাগাতেন, জল দিতেন, ফুল তুলতেন। এত কষ্ট করতেন শুধু দুই ছেলের মুখে চাঁদের হাসি ফোটানোর জন্যে।

ছেলেরা কিন্তু তাকে দেখলেই গম্ভীর হয়ে যেত। এতদিন শাসন না পেয়ে যারা বজ্জাতের ধাড়ি হয়েছে, হঠাৎ শাসন তাদের সইবে কেন? তাই বেশিরভাগ সময় কাটাত বাইরে—পায়রাকুঠীতে—

নিঃসন্তান বেণীমাধব মদন আর বিজনকে খুব ভালোবাসত। পায়রাকে কীভাবে শিখিয়ে পড়িয়ে চিঠি বওয়াতে হয়, তা হাতেনাতে দেখিয়ে দিত। মদন আর বিজনও তো তাই চায়। লেখাপড়া 'ডকে' উঠল। দিনরাত পায়রাকুঠীর পায়রা নিয়ে ব্যস্ত রইল মাঠে ঘাটে।

তিতিবিরক্ত হয়ে গেলেন শোভনলাল। বেশ বুঝলেন ছেলেরা শাসনের বাইরে চলে গেছে। সারা জীবন তিনি বাবার কর্তব্য করেননি—এখন কি পারবেন? মনে মনে নিজেকেই দোষী সাব্যস্ত করলেন ছেলেদের এই অধঃপতনের জন্যে। ভাবতে লাগলেন সত্যি সত্যিই শেখ সাহেবের চাকরিটা নিয়ে ফের আরবের মরুভূমিতে ফিরে যাবেন কিনা।

এই সময় একদিন সন্ধে নাগাদ শহর থেকে ফিরে স্টেশনে নামলেন শোভনলাল। কাঁধে ঝোলা নিয়ে রাস্তায় পা দিয়েছেন, এমন সময়ে দেখলেন মিসেস শিকদার তাঁর ফিয়াট গাড়িটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন গেটের কাছে।

শোভনলালকে দেখেই এগিয়ে এসে বললেন—আমার সঙ্গে আসুন, কথা আছে।

ফিয়াট এসে থামল মিসেস শিকদারের বাড়িতে। গাড়ির মধ্যে একটা কথাও বলেননি ভদ্রমহিলা। শোভনলাল নিজেও কম কথার মানুষ। তাই চুপচাপ চেয়েছিলেন জানলা দিয়ে বাইরে।

গাড়ি থেকে নামবার পর মিসেস শিকদার ভেতরে গিয়ে বললেন,—'আপনি আজ এখানেই খেয়ে যান।।'

'কিন্তু—' মৃদু আপত্তি জানালেন শোভনলাল।

'কোনও কিন্তু নয়। খেতে খেতে কথা বলব।' বলে মিসেস শিকদার রান্নাঘরে চলে গেলেন। বসবার ঘরে একা বসে রইলেন শোভনলার। হাতের ব্যাগটা পাশের সোফায় রেখে ভাবতে লাগলেন, কী এমন দরকার পড়ল মিসেস শিকদারের যে স্টেশন থেকে তুলে আনলেন গাড়িতে? ভদ্রমহিলা একা থাকেন। বিধবা তো, ভীষণ পিটপিটে। ঝি-রাঁধুনি একদম বরদাস্ত করতে পারেন না।

ভাবতে ভাবতে আনমনা ভাবে বাঁ-হাতে চারমিনার সিগারেটের নতুন প্যাকেট বের করে কাগজটা ছিঁড়ে মেঝেতে ফেললেন এবং একটা সিগারেট ঠোঁটের ডগায় ঝুলিয়ে নিলেন।

ছেঁড়া কাগজটা কিন্তু মেঝেতেই পড়ে রইল এবং সেইটাই হল তার মৃত্যুবাণ।

যা বলতে চেয়েছিলেন মিসেস শিকদার, তা খানিকটা আঁচ করতে পেরেই অত আড়ষ্ট হয়েছিলেন শোভনলাল। কথাটা অনেকদিন ধরেই বলি বলি করেও বলতে পারছেন না। কিন্তু আভাসে ইঙ্গিতে

শোভনলাল জেনে ফেলেছেন মিসেস শিকদারের মূল অভিপ্রায় কী।

খারাপ কিছু নয়। কিন্তু এই বয়েসে নিতান্তই অশোভন। বিশেষ করে ছেলেরা আর কচিখোকা নেই। শৈশবে যারা মা হারিয়েছে, অন্য মায়ের হাতে তাদের তুলে দেওয়া যায় কী?

'হ্যাঁ, মিসেস শিকদারের এই হল মনোগত অভিপ্রায়। তার বিরাট সম্পত্তি তিনি মদন আর বিজনকে দিয়ে দিতে চান—কিন্তু মা হিসেবে। ওদের ভালো বোর্ডিংস্কুলে রেখে লেখাপড়াও শেখাতে চান, কিন্তু শর্ত ওই একটাই। শোভনলালের মন সায় দেয়নি মিসেস শিকদারের এ-হেন উদারতায়। গর্ভধারিণী মায়ের স্থান কি অন্য মা এসে পূরণ করতে পারে?

রান্নাঘর থেকে ফিরে এলেন মিসেস শিকদার। ভীষণ মোটা হলেও ভদ্রমহিলা হাঁটাচলা করেন লঘুচরণে—দেহের ওজন নিয়ে কাতর নন মোটেই। শাড়ির খুঁট দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে হাসিমুখে বললেন—'আপনি কাঁচা লঙ্কার ঝাল খান তো?'

'খাই', চারমিনার নামিয়ে গম্ভীরমুখে বললেন শোভনলাল—'তার আগে একটা জবাব চাই।'

'বলুন', হাত মুছতে-মুছতে বললেন মিসেস শিকদার।

'আমাকে কি বলতে চান?'

সটান প্রশ্ন শুনে সটান চেয়ে মুচকি হাসলেন মিসেস শিকদার—'ধরুন মদন আর বিজনের ভার নেওয়ার প্রস্তাব।'

'সেটা সম্ভব নয়,' রুক্ষকণ্ঠে কথাটা বলতে চাননি শোভনলাল। তবুও গলাটা বড় কর্কশ শোনাল। তাই পরক্ষণেই মোলায়েম হবার চেষ্টায় হেসে বললেন—'ওটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমাকে ভাবতে দিন।'

গম্ভীর হয়ে গেলেন মিসেস শিকদার—'মদন আর বিজনের মুখ চেয়েই কি বলছেন? চোখের সামনে ছেলেদুটো বয়ে যাচ্ছে দেখেও চুপ থাকতে পারছেন? তাছাড়া আপনাকেও দেখাশুনা করবার জন্যে...'

ধাঁ করে রক্ত গরম হয়ে গেল শোভনলালের। মিলিটারি মেজাজ তো। রাগলে আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। উঠে দাঁড়িয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে শুধু বললেন—'আপনি নির্লজ্জ বেহায়া হতে পারেন, আমি নই। সবচাইতে বড় কথা, মদন আর বিজন আমার ছেলে—আপনার নয়। মায়ের চেয়ে মাসির দরদ নাই-বা দেখালেন।'

বলেই আর দাঁড়ালেন না শোভনলাল। ছিটকে বেরিয়ে এলেন বাড়ি থেকে। হন হন করে সটান ফিরে এলেন নিজের বাড়ি।

সে-রাতে আর ঘুমোতে পারলেন না শোভনলাল। বুঝলেন, মিসেস শিকদারের চাকরি খতম হয়ে গেল এইখানেই। কাল থেকে অন্য কাজের ধান্দায় বেরুতে হবে।

তার চাইতে বরং আরব দেশেই ফিরে যাওয়া যাক। আরব ভাষাটা তাঁর চোস্ত ভাবে জানা আছে বলেই ওদেশে চাকরির বাজারে তাঁর এত চাহিদা। শেখ সাহেবের মিলিটারি উপদেষ্টা হিসেবেই বাকি জীবনটা মরুভূমিতেই কাটানো যাক। ছেলেরা থাকুক বোর্ডিং হাউসে। এর বেশি আর কি বা করবেন শোভনলাল? তাঁর সব চেষ্টাই তো ব্যর্থ হল।

রাত তখন দুটো। বালিশে মাথা রেখে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলেন মেজর শোভনলাল।

পরের দিন সকালে পুলিশ তলব করল মেজরকে।

পুলিশ? অবাক হলেন শোভনলার। ভারত সরকারের আস্থাভাজন অফিসার ছিলেন এককালে। পুলিশ তাকে সমীহ করে সেই কারণেই। সাতসকালে কেন তবে তলব পড়ল?

কারণটা জানা গেল পুলিশ জিপ থেকে নামবার পর। জিপ গিয়ে দাঁড়াল মিসেস শিকদারের বাড়ির উঠোনে। সেপাইসান্ত্রী গিজগিজ করছে বাগানে। উৎসুক জনতা উঁকিঝুঁকি মারছে ভেতরে। বসবার ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়ালেন শোভনলাল।

পিঠ উঁচু সেকেলে সোফায় হেলান দিয়ে বসে আছেন স্থূলকায়া মিসেস শিকদার। চোখদুটো খোলা—পাতা নড়ছে না—চোখের মণি স্থির—প্রাণের চিহ্ন নেই।

বাঁদিকের রগে দুটো পাশাপাশি ফুটো। রক্ত জমে কালো হয়ে গেছে ক্ষতমুখে এবং গালের ওপর।

দারোগা বিষেণচাঁদ স্থির চোখে চেয়েছিলেন শোভনলালের মুখের দিকে—মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করছিলেন।

এখন আঙুল তুলে দেখালেন মিসেস শিকদারের ডান দিকে। শোভনলালের চামড়ার ব্যাগটা রয়েছে সেখানে। কালকে ফেলে গেছিলেন—হঠাৎ মাথা গরম হয়ে যাওয়ায় নিয়ে যেতে ভুলে গেছিলেন।

'চিনতে পেরেছেন?' কাঠখোট্টা গলা বিষেণচাঁদের।

'হ্যাঁ, আমার ব্যাগ,' যন্ত্রচালিতের মতো বললেন শোভনলাল।

'আপনি কাল এখানেই ছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'চারমিনার সিগারেট কি আপনিই খান?'

'হ্যাঁ।'

'কাল নতুন প্যাকেট কিনেছিলেন?'

'হ্যাঁ। কী করে জানলেন?'

মেঝে থেকে দুটো প্যাকেট ছেঁড়া কাগজ তুলে দেখালেন বিষেণচাঁদ।

'আপনার সিগারেটের প্যাকেট থেকে ছেঁড়া। কিন্তু মেজর, বিধবাকে গুলি করতে গেলেন কেন?'

ফ্যালফ্যাল করে শুধু চেয়ে রইলেন শোভনলাল।

একটা কথাও বলতে পারলেন না।

শোভনলালের ভাগ্যক্রমে ইন্দ্রনাথ রুদ্র সেই সময়ে ও-অঞ্চলে গিয়েছিল একটা চোরাই নটরাজ মূর্তির সন্ধানে। মূর্তি উদ্ধার করার পর দারোগা বিষেণচাঁদের ফাঁড়িতে গিয়েছিল বিদায় নিতে, এমন সময় শুনল একটা যাচ্ছেতাই রকমের খুন হয়েছে গতকাল।

বিধবা খুন। কিন্তু টাকাকড়ি গয়নাগাটির জন্য নয়। মিসেস শিকদারের হাতের হিরের আংটি, গলার সোনার হার, এবং কোমরের চাবি স্পর্শ করা হয়নি। লোহার সিন্দুকের লাখখানেক টাকা আর জড়োয়ার গয়নাও কেউ লোপাট করেনি। নিয়ে গেছে শুধু বিধবার প্রাণটা।

কেন? বিষেণচাঁদের এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই সরেজমিন তদন্তে নিজেই এসেছিলেন ইন্দ্রনাথ। স্রেফ কৌতূহল মেটানোর জন্যে। চৈত্র সংক্রান্তির ঢাক বাজলেই যেমন গাজনের সন্ন্যাসীর পিঠ চড়চড় করে, কোথাও কোনও খুন-জখম-চুরি-রাহাজানির খবর শুনলেই ইন্দ্রনাথের পা দুটোও সুড়সুড় করে ওঠে।

বিধবা হত্যাকাণ্ড রীতিমতো রহস্যজনক। শোভনলালের ব্যাগ পাওয়া গেছে অকুস্থলে—নিষ্প্রাণ বিধবার দেহের ঠিক পাশেই। সোফার হাতলে, দরজার গায়ে আঙুলের ছাপের ছবি তুলে দেখা যাচ্ছে হুবহু মিলে যাচ্ছে—শোভনলালের আঙুলের ছাপের সঙ্গে। শুধু একটা জিনিস এখনো মিলিয়ে দেখা যায়নি—মৃতদেহ নিয়ে কাটা ছেঁড়া করে ময়না তদন্ত করলে সে রিপোর্টও পাওয়া যাবে। গুলি দুটো রগ ফুঁড়ে মাথার মধ্যে রয়ে গেছে। সেই গুলি শোভনলালের রিভলভারের গুলির সঙ্গে মেলে কিনা দেখতে হবে। কিন্তু বিধবাকে মেরে শোভনলালের লাভ কী? চাকরিটা তো গেল। টাকা-পয়সাও লুঠ করা হয়নি। তবে?

শোভনলাল আর মদন-বিজনের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলার পর ফাঁড়িতে ফিরে এল ইন্দ্রনাথ।

বিষেণচাঁদ বললেন—'কী হে টিকটিকি, কিছু পেলে?'

বিষেণচাঁদ এককালে ইন্দ্রনাথের সঙ্গে স্কটিশচার্চ কলেজে একই ক্লাসে বি-এসসি পড়েছিলেন, সেইসূত্রেই 'তুমি' বলেই সম্ভাষণ করেন ইন্দ্রনাথকে।

ইন্দ্রনাথ বললে—'শোভনলাল নির্দোষ।'

চোখ নাচিয়ে বললেন বিষেণচাঁদ—'কী করে বুঝলে হে গণৎকার?'

'রগের বাঁ-পাশে ফুটো দেখে।'

হেঁয়ালির মানে বুঝেই হেসে বিষেণচাঁদ বললেন—'সেটা আমিও লক্ষ্য করেছি।'

'শুধু একটা প্রমাণ লক্ষ্য করোনি।'

'কোনটা বৎস?'

'চারমিনারের এই ছেঁড়া কাগজদুটো।'

'বলো কি হে? আমিই তো দিলাম তোমাকে।'

'শোভনলাল একটা প্যাকেটের কাগজ ছিঁড়েছিলেন। আর একটা প্যাকেটের কাগজ কে ছিঁড়ল?'

'নিশ্চয় শোভনলাল।'

'মোটেই না।'

'কী করে বুঝলে?'

'সেটাই তো আমার মন্ত্রগুপ্তি,' রহস্যগম্ভীর হেসে বলল ইন্দ্রনাথ। 'ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুলে না পড়েও যে ডিটেকটিভ হওয়া যায়, সে প্রমাণ এইবার তোমায় হাতেনাতে দেব।'

নিশুতি রাত।

পায়রাকুঠীর বিশাল বাগানের অযত্নবর্ধিত ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে এগুচ্ছে একটি কৃষ্ণকালো কৃশ মূর্তি। মার্জারের মতো লঘুচরণ তার। এক হাতে পেনসিলটর্চ। আরেক হাতে মিশমিশে রিভলভার।

এখন আর তাঁর পরনে মুগার পাঞ্জাবি নেই। কবি-কবি দেহ আবৃত কালো ট্রাউজার্স আর নাইলন পুলওভারে ইন্দ্রনাথ রুদ্র নিশীথ অভিযানে বেরিয়েছে।

কৃশ কিন্তু ব্যায়ামপটু ইন্দ্রনাথ পিচ্ছিল গতিতে এসে দাঁড়াল জলের পাইপের তলায়। বেল্টের আংটায় টর্চ ঝুলিয়ে রিভলভার রাখল চামড়ার খাপে। তারপর গিরগিটির মতো সরসর করে উঠে গেল ছাদে।

একঘণ্টা পরে ফের পাইপ বেয়ে নেমে এল ইন্দ্রনাথ। নিঃশব্দ চরণে মিলিয়ে গেল রাতের অন্ধকারে।

অন্ধকারে ইনফ্রা-রেড ফোটোগ্রাফ তুললে ইন্দ্রনাথের মুখে তখন দেখা যেত আশ্চর্য হাসি। যুদ্ধ জয়ের শব্দহীন অট্টহাসি।

সকালে বিষেণচাঁদকে ঘুম থেকে টেনে তুলল ইন্দ্রনাথ।

বলল—'তোমার হাতে সেপাই কজন আছে?'

হকচকিয়ে গিয়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বললেন বিষেণচাঁদ—'ইয়ার্কি মারছ নাকি?'

'আমার হাতে আর সময় নেই। ন'টার ট্রেনেই কলকাতা ফিরব। তাই যা বলবার তোমাকে বলে যাচ্ছি।'

এবার ঘুম ছুটে গেল বিষেণচাঁদের চোখ থেকে। বললেন—কি বলবে?

'বলব যে তোমার চাকরি যাওয়া উচিত। তোমার মতো একটা গর্দভ পাঁঠা উজবুককে দারোগা বানিয়ে আমাদের সর্বনাশ হচ্ছে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! তোমার নাকের ডগা দিয়ে এতবড় কাণ্ডটা হচ্ছে, কোনও খবরই রাখো না?'

ভীষণ ভড়কে গিয়ে এবং দারুণ রেগে গিয়ে বিষেণচাঁদ তেড়ে উঠলেন—'খবরদার ইন্দ্রনাথ, মুখ সামলে কথা বলবে।'

'তুমি মুখ সামলে কথা বলবে। নাদাপেটা হাঁদারাম কোথাকার! পায়রাকুঠীর রহস্য অ্যাদ্দিনেও মাথায় আসেনি কেন?'

'পায়রাকুঠীর রহস্য!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, পায়রাকুঠীর রহস্য! শুনেছ কোনওদিন এই আক্রাগন্ডার বাজারে শুধু পায়রাদের খাওয়ানোর জন্যে লরি-লরি খাবার আসে তেরপল চাপা দিয়ে? হেঁড়েমাথায় এতদিন কেন খেয়াল হয়নি যে পৃথিবীর সব গুপ্তচর আর বিপ্লবীরা একটা-না-একটা উদ্ভট রকমের পেশা নিয়ে লোকের চোখে সাধু সেজে থাকে? স্পাইরা সাজে আর্টিস্ট, বিপ্লবীরা কয়লাওলা, কেউ খোলে পোলট্রি, কেউ করে মাছের ব্যবসা। পায়রা ট্রেনিং সেন্টারের আড়ালেও যে এরকম একটা ব্যাপার চলছে না, এটা মাথায় আসেনি কেন মেড়াকান্ত হাঁদারাম?'

'ইন্দ্রনাথ! ইন্দ্রনাথ! কী বলতে চাইছ তুমি?'

নিজে গিয়ে দেখগে যাও। পায়রাকুঠী ঘেরাও করো আর্মড পুলিশ দিয়ে। সাংঘাতিক গুলিগোলা চলতে পারে। মিসেস শিকদারের হত্যাকারীকেও সেখানে পাবে।'

'কে? কার কথা বলছ?'

'বেণীমাধব।'

'প্রমাণ?'

'সিগারেটের প্যাকেট ছেঁড়া এই কাগজ দুটো।'

'ব্রাদার, আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে।'

'মাথায় গোবর থাকলে ওই রকমই হয়। আগেই তোমাকে বলেছিলাম, দুটো প্যাকেট ছেঁড়া হয়েছিল ওখানে। একটা শোভনলাল ছিঁড়েছেন—আর একটা অন্য কেউ।'

'কি করে বুঝলে অন্য কেউ?'

'আচ্ছা ইডিয়ট তো। প্রত্যেকেই সিগারেটের প্যাকেট ছেঁড়ে বিশেষ এক কায়দায়। পাশাপাশি দুটো ছেঁড়া কাগজ রেখে মুখে মুখে মেলালেই মাইক্রোসকোপের তলায় তফাতটা ধরা পড়ে। তুমি আমায় দুটো কাগজ দিয়েছিলে। একটা হুবহু মিলে গেল শোভনলালের প্যাকেটের কাগজের সঙ্গে। আর একটা মিলল বেণীমাধবের চারমিনার প্যাকেটের কাগজের সঙ্গে।'

'তুমি—'

'আমি পায়রাকুঠী থেকেই আসছি। শোভনলাল যে খুনি নন, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ কিন্তু রগের বাঁদিকের গুলির চিহ্ন। কেন জানো তো?'

এতক্ষণে হাসি ফুটল বিষেণচাঁদের মুখে। বললেন—'শোভনলালের ল্যাটা বলে। ল্যাটা হাতের গুলি রগের ডানদিক দিয়ে মাথায় ঢুকত।'

'যাক খানিকটা বুদ্ধি আছে তাহলে। আর হ্যাঁ ভালো কথা। ননীমাধবকেও গ্রেপ্তার করতে ভুলো না।'

'সন্ন্যাসী ননীমাধবকে? কেন বন্ধু, কেন?'

'কেননা বেণীমাধব শুধু অস্ত্রাগারের মালিক। লরি আর ভ্যান বোঝাই পায়রার খাবার আসত না হে, আসত শুধু রিভলভার, বোমা, নাইট্রোগ্লিসারিন আর বন্দুক। পাঠাত এই ননীমাধব। সে-ই যে এই গুপ্ত দলের অধিনায়ক।'

'অ্যাঁ! বলো কী হে! কিন্তু বিধবাকে মারা হল কেন বুঝলাম না তো?'

'অস্ত্রাগারের সন্ধান জেনে ফেলেছিলেন বলে। শোভনলালকে ডেকে সেই কথাটাই বলতে চেয়েছিলেন মিসেস শিকদার। কিন্তু শোভনলাল রেগে চলে এলেন। তার পরেই বেণীমাধব এল। মিসেস শিকদারকে চেয়ারে বসা অবস্থাতেই সামনে দাঁড়িয়ে গুলি করল বাঁ-রগে। চেনাজানা ছিল বলেই ভদ্রমহিলা চুপ করে বসেছিলেন সোফায়,—ভাবতেও পারেননি বেণীমাধব এসেছে তাঁকেই নিকেশ করতে। তারপর চারমিনারের প্যাকেট ছিঁড়ে সিগারেট ধরিয়ে ফিরে গেল পায়রাকুঠীতে।'

'আর তুমি সেই প্যাকেট ছেঁড়া কাগজটা দেখেই বুঝলে—'

'যে ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুলে পড়েও তোমাদের মাথা কত মোটা হয়। বিদায় বন্ধু, ফির মিলেঙ্গে।'

যথাসময়ে পায়রাকুঠীতে হানা দিল আর্মড পুলিশ। ঘরে ঘরে পায়রার খোপের বদলে পাওয়া গেল কেবল বাক্স বোঝাই আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র।

** 'রহস্য পত্রিকা'য় প্রকাশিত। শারদীয় সংখ্যা।*

ছিদ্রান্বেষী ইন্দ্রনাথ

গোয়েন্দা আমরা প্রত্যেকেই,' দাঁতে কামড়ানো চুরুটের ফাঁক দিয়ে জড়িয়ে মড়িয়ে বলল ইন্দ্রনাথ। 'প্রাত্যহিক জীবনে কে গোয়েন্দা নয় বলতে পারো?'

চাইনিজ শ্রিম্প বল খাওয়ার নেমন্তন্ন করেছিল কবিতা। সাদা বাংলায়, চিংড়ি, পকৌড়া। পাকস্থলী পরিপূর্ণ হওয়ার পর শুরু হয়েছে নির্ভেজাল আড্ডা।

'মেয়ে-গোয়েন্দা অবশ্য ঘরে ঘরে, সোয়ামীদের ওপর নজর রাখার সময়ে,' মুচকি হেসে চুটকি ছাড়ল কবিতাঃ 'যেমন আমার ঘরে আমি গোয়েন্দা।'

ইন্দ্রনাথ রসিকতার মুডে ছিল না। তাই একতাল ধোঁয়া ছেড়ে বললে, 'যেমন ধরো উকিল, ডাক্তার, অফিসার, ব্যবসাদার, রিপোর্টার। হোয়াইট হাউসের ভিত কাঁপিয়ে ছাড়ল দুজন রিপোর্টার। গিয়েছিল চুরির ঘটনার খোঁজে—পেলো সাপের সন্ধান। শুরু হল গোয়েন্দাগিরি। টেলিফোনে খবর নিতে হবে? প্রশ্ন করে চুপ করে থাকো দশ সেকেন্ড। জবাব না এলে বুঝতে হবে প্রশ্নের জবাব হল হ্যাঁ।' টেলিফোনও যখন বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াল, তখন হোয়াইট হাউসের 'কেউকেটা'টির সঙ্গে দেখা করার সঙ্কেত জানানো হত ঝুল বারান্দার কোণে ফুলদানি বসিয়ে দেখাসাক্ষাতের সময় জানানো হত পরের দিনের নিউইয়র্ক টাইমস-এর ২০ নম্বর পৃষ্ঠায়। সেই পৃষ্ঠায় ঘড়ির কাঁটা এঁকে গোপন সংবাদদাতা জানিয়ে দিতেন কোথায় কখন দেখা পাওয়া যাবে তাঁর। আশ্চর্য, তাই না? গোয়েন্দা- সাংবাদিকদের দৌলতেই সিংহাসনচ্যুত হলেন বহু কু-কর্মের নায়ক প্রেসিডেন্ট নিকসন।'

আমি বললাম, 'নতুন কথা কিছু শুনছি না।'

ভুরু তুলে ইন্দ্রনাথ বললে, 'নিকসনের ছিদ্র অন্বেষণ দূর করে শুধু একখানা বই লিখেই বব আর কার্ল আজ পর্যন্ত পিটেছেন এক কোটি চোদ্দো লক্ষ টাকা। বই লেখার আগেই প্রকাশকের কাছে পেয়েছেন পঁয়তাল্লিশ হাজার ডলার। প্লেরা পত্রিকা লেখাটা ছেপেছে ত্রিশ হাজার ডলার দিয়ে। ফিল্ম প্রোডিউসার সিনেমা করবেন বলে দিয়েছেন সাড়ে চার লক্ষ ডলার। পেপার ব্যাক বার করার জন্যে নিলাম করে বইটার দাম তুলে দিয়েছেন দশ লক্ষ ডলার পর্যন্ত। পুলিৎজার পুরস্কার পর্যন্ত পকেটে পুরেছেন ওঁরা। মৃগাঙ্ক, ইচ্ছে যায় আমার কেসগুলো বব আর কার্লের হাতে তুলে দিই। কলমের জোর থাকলে কি না হয়!'

মাথা গরম হয়ে গেল আমারঃ 'নিজেকে বিরাট মনে করছিস মনে হচ্ছে? আমার না হয় কলমের জোর নেই, তোরও গোয়েন্দাগিরির জোর এমন কিছু নেই যে রাতারাতি পৃথিবী-বিখ্যাত হবি। এত অহঙ্কার ভালো নয়। পতনের পূর্ব লক্ষণ।'

যেন শুনতেই পায়নি। এমন ভাবে জানলা দিয়ে আকাশ দেখতে দেখতে ইন্দ্রনাথ আত্মগত ভাবে বলে চলল, 'যত ভাবি ততই অবাক হই। গোয়েন্দা কে নয়? সব মানুষই নিজের নিজের পেশায় অল্পবিস্তর গোয়েন্দা। চিন্তাকে যে ডিসিপ্লিনে আনতে পেরেছে, বুদ্ধিকে যে একাগ্র করতে পেরেছে, পর্যবেক্ষণকে যে প্রয়োগ করতে পেরেছে—গোয়েন্দা হবার যোগ্যতা তার মধ্যে আছে। ভালো ডাক্তারকেও ফাঁদ পেতে রোগকে সন্ধান করতে হয়। এইরকম একটি চরিত্র শার্লক হোমস এবং সুবিখ্যাত ডিটেকটিভ মেথডের সৃষ্টি করেন কোনান ডয়াল। অফিসার যদি অন্ধ হয়, কারবারি যদি ভোঁতা-বুদ্ধি হয়, তাহলে লুঠেরা জোচ্চোরেরা দুদিনেই রাজা হয়ে বসত। বুদ্ধির লড়াই চলছে সর্বক্ষেত্রে। এরকম টুকটাক অনেক ঘটনা আমার জানা আছে। অফিসার নিজেই গোয়েন্দা হয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা বাঁচিয়ে দিয়েছে কোম্পানির।'

'তা ঠিক,' সায় দিল কবিতাঃ 'প্রবঞ্চকরা দুষ্ট জীবাণুর মতোই কিলবিল করছে আশেপাশে। যে যত ভালো গোয়েন্দা, সে তত নিরাপদ। কথাগুলো দামি কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার নিরীহ সোয়ামীকে ঠেস দিয়ে কথা বলার কি দরকার বলতে পারো?'

'কেন বলব না বলতে পারো?' চুরুট নামিয়ে বলল ইন্দ্রনাথ, 'স্ট্যানলি গার্ডনার, সিরিল হেয়ার—এঁরা প্রত্যেকেই পেশায় উকিল। তাই তাঁদের গোয়েন্দা গল্পে অত ধার। কোনান ডয়াল, নীহার গুপ্ত পেশায় ডাক্তার—তাই লেখাও ক্ষুরধার। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, জি-কে চেস্টারটন সাহিত্যের সম্রাট—গোয়েন্দা গল্পেও তার আভাস। কিন্তু আমাদের মৃগাঙ্ক রায়ের কি গুণ আছে বলতে পারো। না, না, চটলে চলবে না। গুণীর কাছে প্রশস্তির চেয়ে সমালোচনার কদর বেশি।'

'কিন্তু এর নাম ছিদ্রান্বেষণ—সমালোচনা নয়।' মুখ টিপে হেসে বলল কবিতা।

'ছিদ্র অন্বেষণ করাই তো আমার কাজ।' চুরুট ফের কামড়ে ধরে বলল ইন্দ্রনাথ, 'নিশ্ছিদ্র চক্রান্তে ছিদ্র খুঁজে বার করার সাধু নাম হল গোয়েন্দাগিরি। 'সত্য' আর 'ছিদ্র' এক্ষেত্রে একই টাকার এপিঠ-ওপিঠ।'

মুখ লাল করে বললাম, 'এর শোধ আমি তুলব, ইন্দ্র। এখন থেকে তোকে 'ছিদ্রান্বেষী' ইন্দ্রনাথ বলেই চালাব—'সত্যান্বেষী নয়।'

অট্টহেসে বললে ইন্দ্রনাথ, 'ভালোই তো, তাতে এক ঢিলে দু-পাখি মরবে। তোর ভাষায় গ্ল্যামারের অভাব প্রকাশ পাবে। আর, এতদিন বাদে আমার কপালে একটা খেতাব অন্তত জুটবে।'

এমন সময়ে কবিতা বললে সবিস্ময়ে, 'ওকি অবনীবাবু, নাক টিপে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?'

রাগ জল হয়ে গেল দরজার দিকে তাকাতেই। অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অবনী চাটুয্যে দাঁড়িয়ে সেখানে। তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপে আছেন বাঁ-নাকের বাম ছিদ্র। বললেন অনুনাসিক কণ্ঠে, 'দেঁখছি ডাঁন ফুঁটোয় নিশ্বেঁস পঁড়ছে কিঁনা।'

তাজ্জব হয়ে বললাম, 'সে আবার কী?'

নাক ছেড়ে দিয়ে বাঁ-পা আগে বাড়িয়ে ঘরে পদার্পণ করলেন অবনীবাবু। বললেন, 'শাস্ত্র তো মানেন না। মানলে এত দুর্ঘটনা দেশে ঘটত না।'

সকৌতুকে বলল ইন্দ্রনাথ, 'ইড়া আর পিঙ্গলার ব্যাপার মনে হচ্ছে?'

ভীষণ খুশি হলেন অবনীবাবুঃ 'যাক, জানেন তাহলে। শুভকর্মে চন্দ্রনাড়ী প্রশস্ত। মানে, বাঁ-নাকে নিশ্বেস পড়লেই শুভকর্ম করা উচিত।'

'এখন কোন নাকে পড়ছে দেখলেন?'

'বাঁ-নাকে। সেই জন্যেই তো বাঁ-পা ফেলে ঢুকলাম মশায়।'

'অশুভ ঝঞ্ঝাটে পড়েছেন মনে হচ্ছে?'

টাক চুলকে বললেন অবনীবাবু, 'আর বলেন কেন, একেবারে নিশ্ছিদ্র প্লট মশাই— স্কাউনড্রেলটাকে ধরেও ধরতে পারছি না।'

অপাঙ্গে আমার পানে চাইল ইন্দ্রনাথ। বলল, 'ছিদ্র খুঁজতে হবে তো? বলুন, বলুন, ছিদ্রান্বেষী হাজির।'

বলব কি মশায়, রাত দুটোর সময়ে সে কি উৎপাত! ঝন-ঝন-ঝন। বুঝছেন তো কীসের উৎপাত? টেলিফোন! টেলিফোন! যতক্ষণ মরে থাকে, ততক্ষণ ঘুমিয়ে খেয়ে জিরিয়ে বাঁচি মশায়, জ্যান্ত হলেই প্রাণান্ত!

যাক, যা বলছিলাম, রাত দুটোর সময়ে আরম্ভ হল টেলিফোনের বাঁদরামি। ঠিক যেন ঘুংড়ি কাসি। ইচ্ছে হল দিই ব্যাটাকে এক ডোজ 'স্পঞ্জি' খাইয়ে। হোমিওপ্যাথি বিদেশ থেকে এসেছে বলে এত হেনস্থা করবেন না। গরু হারালে শুধু গরু খুঁজে পাওয়া যায় না। বাদবাকি সব হয়। মহাত্মা হানিম্যান বলেছেন...

যাচ্চলে! যা বলতে যাচ্ছিলাম ভুলে গেলাম...। ও হ্যাঁ, নিশ্ছিদ্র প্লট। রাত দুটো। টেলিফোন। ঘুম ভাঙতেই তেড়েমেড়ে রিসিভার খামচে ধরে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'কে? কে? এত রাত্রে কীসের দরকার?'

অমনি মিষ্টি গলায় তোতলা স্বরে ককিয়ে উঠছিল একটা মেয়েছেলেঃ 'অবনীবাবু? বাঁ-বাঁচান! ওরা আ—আ—আমাকে কিডন্যাপ করতে আসছে!'

সে এক জ্বালা মশায়! ভগবান তোতলাদের মেরেছেন। আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু কথা বলতে গেলে বলুন দিকি মাথা গরম হয় না?

যাই হোক, হড়বড় করে তোতলাতে তোতলাতে মেয়েটা বললে পার্ক টেরেসের দশতলার ফ্ল্যাট থেকে তাকে গায়েব করতে আসছে ডাকাতরা। এক্ষুনি না এলেই নয়।

কথার শেষ পর্যন্ত শোনা গেল না, কড়-ড়-ড় করে গেল লাইনটা কেটে। এদিকে অ্যাটম বোমা ফাটিয়ে মরছি অথচ টেলিফোনটা পর্যন্ত নিখুঁত বানাতে পারি না। মাইক্রোস্কোপ আনাই বিলেত থেকে। ঘেন্না ধরে গেল মশাই দেখে শুনে।

ওইরকম টেলিফোন পেলে চুপচাপ থাকা যায় না। দূরভাষিণীর মুণ্ডপাত করতে করতে ধড়াচূড়া এঁটে নিলাম। পার্ক স্ট্রিটেই যখন বদলি হয়েছি, তখন পার্ক টেরেসে না গিয়েও তো থাকা যায় না। বেরোতে যাচ্ছি, এমন সময়ে আবার উৎপাত। ফের টেলিফোন!

এবার অবিকল সেই রকম মেয়েলি গলা। সেই রকমই মিষ্টি, কিন্তু যেন সর্দিবসা—মানে আপনাদের ছেলেছোকরাদের ভাষায় সেক্সি। শুধু যা তোতলা নয়।

ও হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি। প্রথম মেয়েটার নাম হিমি, দু-নম্বর মেয়েটার নাম হিমা। হিমি নাকি হিমার ছোটবোন। হিমা কান্না কান্না গলায় বললে, এক্ষুনি নাকি হিমিকে জোর করে নিয়ে যাবে মেয়েচোরেরা। ঠিকানাও বলে দিল। একই ঠিকানা। পার্ক টেরেসের দশতলা।

দুজন সেপাই আর একজন অফিসারকে নিয়ে ছুটলাম তক্ষুনি। নির্জন রাস্তা। পার্ক স্ট্রিটে অবশ্য রাত বলে কিছু নেই। দশতলা পার্ক টেরেসের সামনে আসতে না আসতে দেখলাম, সত্যি সত্যিই একটা মেয়েকে কাঁধের ওপর ফেলে বেরিয়ে আসছে একজন লোয়ার ক্লাসের লোক। পেছনে আরও দুজন। ওরা এসে দাঁড়াল একটা উইলিজ জিপের সামনে।

কিন্তু ঠিক সেই সময়ে মোড় ঘুরল আমার জিপ। ফুলস্পিডে গাড়ি চালাচ্ছিলাম। টহলদারি পুলিশকার হলে অত জোরে ছুটত না। ধড়িবাজ মেয়েচোরেরা তা বুঝেই বোধহয় মেয়েটাকে ফুটপাতে ফেলেই ফের ঢুকে পড়ল পার্ক টেরেসে।

মহা ফাঁপড়ে পড়লাম তাই দেখে। মেয়েটাকে সামলাব, না স্কাউনড্রেলগুলোর পেছনে দৌড়াব। বুড়ো বয়েসে আমি তো আর ছুটতে পারি না। পার্ক টেরেসের বাড়িখানাও চাট্টিখানি কথা নয়। ফ্ল্যাটের সংখ্যাই তো আড়াইশ'। শয়তান তিনটে কোথায় লুকিয়েছে দেখতে হলে আরও সেপাই চাই। আমি তাই মেয়েটাকে জিপে চাপিয়ে একজন সেপাই নিয়ে ফিরে এলাম থানায়। পরে ভ্যানভর্তি সেপাই পাঠালাম বটে—কিন্তু ওদের আর টিকি দেখতে পেলাম না। উইলিজ জিপটাও নাকি চোরাই জিপ।

চুলোয় যাক সেকথা। ফ্যাসাদের শুরু হল থানায় ঢুকতেই। দেখি কি আমার অফিস ঘরে বসে অবিকল, ওই রকম চেহারার একটা মেয়ে। বলব কি মশায়, ঠিক যেন সন্দেশের ছাঁচে তৈরি মুখ চোখ। যমজ। বুঝেছেন? বউমা, অমন চোখ বড় বড় করে তাকিও না মা। আরও আছে। শেষকালে চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসতেও পারে।

অজ্ঞান মেয়েটার জ্ঞান ফেরানোর ব্যবস্থা করলাম। যমজ বোনের পরিচয়ও পেলাম। হিমি আর হিমা। বড়লোকের মেয়ে মশাই। আদুরে আদুরে চেহারা। আইবুড়ো। অথচ বাপ এখনই দশতলা বারোতলা বাড়িতে একটি করে ফ্ল্যাট কিনে দিয়েছেন। ব্ল্যাকমানির খেলা তো, বলবার কিছুই নেই। মেয়েগুলিও হয়েছে তেমনি।

মরুকগে! ওদের কথা শুনব বলে বসতে না বসতেই রাতবিরেতে আর এক আপদ। বলুন দিকি কি আপদ? কল্পনাও করতে পারবেন না মশাই। মৃগাঙ্কবাবু অবশ্য আমাকে নিয়ে ঠেসে ক্যারিকেচার লিখছেন, কিন্তু বললে রাগ করবেন জানি—ওঁর কল্পনা শক্তিও তো তেমন নয়।

বউমার মুখ ভার হল কেন? আসল কথা না বলে, বাজে কথা বলছি বলে? বুড়ো হয়েছি তো। রিটায়ারের সময় হয়ে এল। এখন একটু ফালতু কথা বলে ফেলি। কিছু মনে কোরো না। কী বলছিলাম? ও হ্যাঁ। আর একটা আপদ। ধরতে পারেননি তো কি আপদ? মেয়েছেলে মশায়, আর একটা মেয়েছেলে। ভোর চারটের সময়ে হন্তদন্ত হয়ে থানায় ঢুকল আর একটা মেয়েছেলে। অবিকল অন্য দুজনের মতো দেখতে।

বললে না পেত্যয় যাবেন মশায়, থানাশুদ্ধ লোক ব্যোমকে গেল তিন তিনটে একই ছাঁচের সন্দেশ দেখে। সরেশ সন্দেশ। কিন্তু এরকম কাণ্ড কখনও দেখিনি হোল লাইফে। যমজ পর্যন্ত দেখেছি, কিন্তু...কিন্তু...তিনটে মেয়ে একই ডিম ফুটে বেরোলে কী বলা উচিত মৃগাঙ্কবাবু?...ত্রমজ? ঠিক, ঠিক! ত্রমজ! ত্রমজ বোনই বটে। নামও শুনলাম তিন নম্বরের। হিমু। মানে, হিমি, হিমা আর হিমু হল তিন বোন। তিনজনেরই তিনটে খানদানি ফ্ল্যাট। তিনজনেই আইবুড়ো। তিনজনেই ফ্ল্যাটে পৌঁছেছে অনেক রাত্রে গ্র্যান্ড হোটেলের বিউটি কনটেস্ট থেকে। তিনজনেই ড্রেসিং টেবিলে একটা করে চিঠি পেয়েছে। তিনজনের চিঠিতেই লেখা আছে—বাপের পকেট থেকে লাখখানেক টাকা খসিয়ে না আনলে, খাঁচায় পোরা হবে সেই রাতেই। রাজি থাকলে জানলায় টর্চের আলো জ্বেলে রাখতে হবে একটানা এক মিনিট—রাত ঠিক দুটোর সময়ে।

রূপকথা শোনাচ্ছি, ভাববেন না যেন। খাস কলকাতায় এমন অনেক ঘটনা ঘটে, যা মোহন সিরিজকেও টেক্কা মারতে পারে মশাই। সাঙ্কোপাঙ্গা শুধু রোমাঞ্চের পাতায় কেন, এই শহরেই আকচার পাবেন। হিমি, হিমা, হিমুর কাহিনিও স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশ্যান। মানে, তিন তিনটে ব্যাচেলার মেয়ে— ব্যাচেলার কিনা ভগবান জানেন—একা একা ফ্ল্যাটে থাকে—বাপ-মা অন্যবাড়িতে ফুর্তি করে নাগর- নাগরী নিয়ে—এ ভাবা যায় না!

এই দেখুন, আবার আলতু-ফালতু বকতে আরম্ভ করেছি। দেখছি, আমার নিজেরই 'ব্যারাকার্ব' খাওয়া উচিত। হোমিওপ্যাথি ওষুধ মশাই, বাচালতার দাওয়াই।

যাচ্চলে, আবার সব গুলিয়ে গেল। ও হ্যাঁ...হিমা আর হিমু চালাক মেয়ে। চিঠি পেয়েই টর্চ জ্বালিয়ে সঙ্কেত করেছে জানলায়। হিমি করেনি। ভয়ের চোটে সটান ফোন করেছে আমাকে। তারপর টেলিফোনে খবর দিয়েছে দুই বোনকে। টেলিফোন পেয়েই ওরা দুজনেই ছুটে এসেছে থানায়। এবার শুনুন, আসল কারবারটা!

তার আগে মা লক্ষ্মী, একটু চা-টা হবে? কফি-টফি না হলে গলাটা ইদানীং বড্ড শুকিয়ে যায়। আসছে? বেশ! বেশ! মা লক্ষ্মী আমাদের সাক্ষাৎ শচী দেবী—মৃগাঙ্কবাবু ভাগ্যবান ব্যক্তি। আমার গিন্নিটি হয়েছে বেয়াড়া টাইপের। কেউ চা চাইলেই এমন মুখখানা করবে, যেন ঘরে চিনি নেই।

গেল যা। আবার অন্য লাইনে চলে এসেছি। সেদিন একটা আমেরিকান নাটক দেখলাম মশাই। আমার হয়েছে ঠিক সেই অবস্থা। এক বুড়ো আর এক বুড়ি। দুজনেরই দ্বিতীয় বিয়ে। দুজনেই খালি খুলে যায়। দুজনেই এক পার্টনারের স্মৃতি, আরেক পার্টনারের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলছে। আমার হয়েছে...

ধুত্তোর! কী বলছিলাম? ও হ্যাঁ...আসল কারবারটা। আসল কারবারটাই বলা হয়নি এতক্ষণ। হিমি, হিমা আর হিমুর মাটি হলেন আর এক শচী দেবী। এই...এই...এই দ্যাখো মা! কী বলতে কী বলে ফেললাম। ইন্দ্রজায়া শচী দেবীর একটা মস্ত দুর্নাম আছে, জানো তো? যখন যার, তখন তার। পুরোনো ইন্দ্রকে হটিয়ে স্বর্গটা যে দখল করবে, শচী দেবী হাসি হাসি মুখে অমনি তার হেঁসেল ঠেলতে আরম্ভ করে দেবেন। হিমি, হিমা আর হিমুর জননীটি অনেকটা তাই। মানে, সোসাইটি গার্ল। গার্ল এককালে ছিল—এখন পাক্কা লেডি। ফাংশন, মিটিং, পার্টি নিয়েই ব্যস্ত। স্বামীর নাম? এখনও বলিনি? হ্যাঃ হ্যাঃ! এই জন্যেই বোধ হয় ডি-সি পোস্টে প্রোমোশনটা আটকে গেল আমার। ভদ্রমহিলার স্বামী মস্ত কারবারি। কোচিন থেকে নারকেল এনে কলের ঘানিতে পিষে তেল বার করে সাপ্লাই দেন নানা কোম্পানিতে। বি-এম-পি তেলের নাম শোনেননি? খাঁটি নারকেল তেল বলতে আর কিছু নেই এদেশে।

কোটি কোটি টাকার মালিক হওয়ার পর ভদ্রলোকের মতিভ্রম হয়েছে বোধ হয়। বিশেষ করে প্যারালিসিসে কোমর থেকে নীচ পর্যন্ত অবশ হয়ে যাওয়ার পর থেকেই মাথায় নাকি ভূত চেপেছে। অদ্ভুত

অদ্ভুত ব্যবসার পরিকল্পনা ফাঁদছেন। মানে, শেষ পর্যন্ত কারবারটাকে তুলে দেওয়ার মতলব আর কি।

একটা প্ল্যান শুনবেন? কোচিন আর সিলোন থেকে জাহাজ-ভর্তি নারকেল এনে নাকি পোষাচ্ছে না। ঠিক করেছেন, চাষ করবেন নিজের দেশেই। সুন্দরবনে নারকেল ফলিয়ে দেশের চেহারা পাল্টে দেবেন। হাসবেন না! হাসবেন না। প্ল্যানটা একেবারে অবাস্তব নয়। কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টাটা বাঁধবে কে? পশ্চিম বাংলার দক্ষিণ প্রান্তে বঙ্গোপসাগরের গায়ে যে রিজার্ভ ফরেস্ট আছে, সেখানকার নোনা মাটি আর আবহাওয়া নাকি নারকেল চাষের উপযুক্ত। উনি ঠিক করেছেন সেখানে এক লাখ নারকেল চারা লাগাবেন। মোটামুটি আট থেকে দশ বছরের মধ্যে ফল দেবে এক-একটা নারকেল গাছ। গাছ যতদিন বাঁচবে, ফলও তদ্দিন মিলবে। এক লাখ চারার মধ্যে পঁচাত্তর হাজার চারাও যদি বেঁচে থাকে, মন্দ কি? গাছ পিছু বছরে মাত্র একশো টাকার নারকেল ধরলেও, বছরে পঁচাত্তর লক্ষ টাকা নীট লাভ।

শুধু কি পঁচাত্তর লক্ষ টাকা? নারকেল তেল, নারকেল দড়ি ইত্যাদির জন্যেও কলকারখানা গড়ে তোলা যাবে ওখানে। ফলে, সুন্দরবন অঞ্চলের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। সুন্দরবনে হঠাৎ ক্রাইম বেড়ে যাওয়ায় কর্তাদের গরম মাথাও ঠান্ডা হয়ে যাবে। হাতে পয়সা এলে চুরি-ডাকাতির সাধ কার থাকে বলুন?

গভর্নমেন্ট প্রকল্পটি লুফে নিয়েছেন। রিজার্ভ ফরেস্ট থেকে জমিও দিয়েছেন। তাইতেই লেগেছে গৃহবিবাদে। মানে বি-এম-পি অয়েল মিলের মালিক সনাতনপ্রসাদের সঙ্গে তার বিদুষী বিবি অহল্যার।

নামখানা শুনেছেন? অহল্যা। মেয়েদের মুখে শুনলাম, মা নাকি সত্যিই অহল্যা—রূপের দিক দিয়ে। বাবা এই রূপ দেখেই টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছিলেন ভদ্রমহিলাকে। মেয়েদের জুলুষ দেখলেই অবশ্য খানিকটা আঁচ করা যায়। কিন্তু মায়ের ছিটেফোঁটাও নাকি ওদের বরাতে জোটেনি।

কী বলছিলাম মা লক্ষ্মী? কর্তা-গিন্নির ঝগড়ার কথা, তাই না? সুন্দরবনে নারকেল চাষ নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই খিটিমিটি লেগেছে, বাপ-মায়ের মধ্যে, বলল ত্রমজ মেয়েরা। সনাতনপ্রসাদ নাকি নিজে তো মরতে বসেছেন, মরার আগে কারবার পর্যন্ত মেরে যাবেন।

যাকগে সেসব ঘরোয়া কেচ্ছা। মেয়ে তিনটের ওপর এই সময়ে নেকনজর পড়ল কোন হারামজাদাদের, জানবার জন্যে শুরু করলাম তদন্ত। সেরকম তদন্ত, কিছু মনে করবেন না ইন্দ্রনাথবাবু, আপনিও পারবেন না। অত ঝক্কি সইবার ক্ষমতা আপনাদের নেই। মৃগাঙ্কবাবু অবিশ্যি রুটিন তদন্ত বলে যথেষ্ট বিদ্রূপ করেন আমাদের পদ্ধতিকে। কিন্তু রুটিন তদন্তে একবার করতে আসুন না। কাছা খুলে যাবে।

তদন্তর ফিরিস্তি দেব না। তবে কি জানেন, তদন্তই সার হল। বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরোর মতো আর কি। মেয়ে তিনটেকে কিছুতেই ফ্ল্যাট থেকে সরানো গেল না। সনাতনপ্রসাদের স্পেশাল রিকোয়েস্টে কনস্টেবল বসিয়ে রাখলাম ফ্ল্যাটের গোড়ায় দিন কয়েকের জন্যে। কিন্তু সাতটা দিনও গেল না।

এবার আসছি আসলের আসল ব্যাপারে। রিয়াল মিস্ট্রি এইখানেই। কান খাড়া করে শুনুন মৃগাঙ্কবাবু। দয়া করে, নেক্সট গল্পে আমাকে একটু ক্রেডিট দেবেন।

সনাতনপ্রসাদের ফ্যাক্টরিতে কিছুদিন আগে বিশ্রী লেবার মুভমেন্ট হয়ে গিয়েছিল। জানেন তো, আজকালকার শ্রমিক-কর্মচারীরা কোম্পানির ভবিষ্যৎ নিয়েও ভাবে। ম্যানেজমেন্টকে যা খুশি তাই করতে দেয় না। ইউনিয়নের সঙ্গে মিটিং করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

সনাতনপ্রসাদ তার ধার ধারেননি। সুন্দরবনে নারকেল চাষ প্রসঙ্গে সরাসরি সরকারের সঙ্গে চুক্তিতে নেমেছেন। ফলে, আতঙ্ক দেখা দিয়েছে কারখানায়। লিডাররাও কিছু একটা না পেলে লেবার তাতাতে পারে না। এই ইস্যু নিয়ে ওরা এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করল কারখানায় যে, সনাতনপ্রসাদের প্রাইভেট কোয়ার্টারের সামনে সি-আর-পি বসাতে হল চৌপর দিনরাত।

আরও খবর পেয়েছি মশাই। অহল্যা দেবী নিজেও নাকি কারখানার লোককে খেপিয়ে তুলেছেন। লিডারদের ডেকে উস্কে দিয়েছেন। উদ্দেশ্য, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। শ্রমিকদের চাপে যেন স্বামীরত্ন ভড়কে যান এবং নারকেল চাষ শিকেয় তুলে রাখেন। বড় ঘরের বড় ব্যাপার। দেখে দেখে চোখ পচে গেল।

হঠাৎ হিমি-হিমা-হিমুর কেস টেকআপ করার সাতদিন পরে, একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল সেদিন রাত্রে একটা বিয়ে বাড়িতে নেমন্তন্ন গিয়েছিলেন অহল্যাদেবী। আত্মীয় বাড়ির নেমন্তন্ন। মাঝরাতে লগ্ন। তাই ঠিক করেছিলেন, ভোররাতে ফিরবেন। রাত ন'টার সময়ে সেজেগুজে নীচে নেমেছিলেন। কারখানার পাশেই ওদের কোয়ার্টার। সি-আর-পি-দের বলেছিলেন, কর্তা একলা রইল। যেন একটু নজর রাখা হয়। আঙুল তুলে দেখিয়েছিলেন, আলো জ্বলছে তিনতলায়। বলেছিলেন, 'একটু বরং দাঁড়িয়ে যাই। আলো নিভিয়ে উনি শুয়ে পড়লে যাব।' ড্রাইভারও দেখেছে আলো জ্বলছে। তারপর সবার সামনেই আলো নিভে গেল। অর্থাৎ সনাতনপ্রসাদ মাথার কাছে বেডসুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিয়ে ঘুমের আয়োজন করছেন। তিনতলায় আর কেউ থাকে না—অ্যালসেশিয়ান কুকুরটা ছাড়া। সনাতনপ্রসাদ কাউকে বিশ্বাস করেন না রাত্রে—কুকুর ছাড়া।

অহল্যা দেবী তিনতলার দরজায় নিজে চাবি লাগিয়েছিলেন। একটা চাবি ছিল ভেতরে— সনাতনপ্রসাদের বালিশের তলায়। দরজায় ইয়েল লক লাগানো ছিল। একবার চাবি লাগালে নিশ্চিন্ত। বিয়েবাড়ি যাচ্ছেন বলে হ্যান্ডব্যাগ রাখেননি। তাই চাবির গোছা রাখতে দিয়েছিলেন ড্রাইভারকে। বিদূষী বিবি তো—আপটুডেট লেডি। আঁচলে চাবি বাঁধলে ইজ্জত চলে যায়।

পরের দিন সকালবেলা কুকুরের হাঁক-ডাকে চমকে উঠল কারখানার দারোয়ান থেকে আরম্ভ করে সি-আর-পি পর্যন্ত। চাকরবাকররা দোতলা থেকে ছুটে গেল তিনতলায়। সবাই শুনলে, অ্যালসেশিয়ান কুকুরটা ভেতর থেকে দরজা আঁচড়াচ্ছে আর ভীষণ চেঁচাচ্ছে। কোনওদিন কিন্তু এভাবে চেঁচায় না।

আচ্ছা জ্বালা তো! দরজা খোলারও উপায় নেই। চাবি মেমসাহেবের কাছে। ঘরে আলোও জ্বলছে। কিন্তু সাহেব তো কুকুরটাকে ধমক দিচ্ছেন না?

ভোর ছ'টায় এসে পৌঁছোলেন অহল্যা দেবী। কুকুরে হাঁক-ডাক শুনে আর দরজার সামনে চাকর-বাকরের জটলা দেখে ড্রাইভারের কাছ থেকে চাবি নিয়ে দরজা খুললেন। কুকুরটাকে ডেকে নিয়ে চলে গেলেন করিডরের দিকে। তারপর ফিরে এসে গেলেন বেডরুমে।

চাকরবাকররা ছুটে গেল চিৎকার শুনে। দেখল, সনাতনপ্রসাদ মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছেন বিছানায়। চোখ খোলা। মুখের ওপর মাছি উড়ছে।

জানেন তো, মরা হাতির দাম লাখ টাকা। ডাক পড়ল এই ঘাটের মড়া অবনী চাটুয্যের। চুলেচেরা রুটিন তদন্ত করে তো মশাই বিলকুল ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলাম। ঘর বন্ধ। চাবি ড্রাইভারের কাছে। আর একটা চাবি সনাতনপ্রসাদের বালিশের তলায়। বিয়েবাড়ির সবাই সাক্ষী—অহল্যা দেবী আর ড্রাইভার দুজনেই বাড়ি ছেড়ে নড়েননি। সনাতনপ্রসাদেরও বিছানা ছেড়ে ওঠার ক্ষমতা নেই। বেড সুইচ টিপে না হয় আলো নিভিয়েছিলেন রাত ন'টায়। কিন্তু আলোটা জ্বালল কে? সারারাত আলো জ্বলেনি—সি-আর-পিরা সাক্ষী। ভোরবেলা বন্ধ ঘরে আলো জ্বালল কে? সনাতনপ্রসাদ? কি যে বলেন! তিনি তো তখন মরে ভূত। ময়নাতদন্তে দেখা গেল, তিনি হার্টফেল করেছেন রাত ন'টা থেকে দশটার মধ্যে। মানে আলো নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়ার পর ঘুমের মধ্যেই স্থূল শরীর ত্যাগ করেছেন। আলোটা তাহলে জ্বালল কে? ভূত? অ্যালসেশিয়ানের পক্ষেও সম্ভব নয় দাঁতে কামড়ে আলো জ্বালানো। সেক্ষেত্রে সুইচে দাঁতের দাগ থাকত। মনিব মারা গেছে বুঝেই সে দরজা খুলতে চেষ্টা করেছে, চেঁচিয়েছে—সুইচ টিপে আলো নিশ্চয় জ্বালায়নি। কে টিপল বেড সুইচ? তবে কি সি-আর-পি-রা মিথ্যে বলছে? আলো সারারাত জ্বলে ছিল, কিন্তু ব্যাটারা ঘুমোচ্ছিল বলে দেখেনি? এখন মানতে চাইছে না?

একটা স্ট্রোকের ফলেই শুয়ে পড়েছিলেন সনাতনপ্রসাদ। চিন্তাভাবনাও ইদানিং খুব বেড়েছিল। হার্ট আর অত ধকল সইতে পারেনি। ফাইনাল স্ট্রোকেই শেষ হয়ে গেছেন। বিধাতার কি লীলা! এত টাকার মালিক! মৃত্যুকালে মুখে জলটুকুও পেল না। কারও দেখা পেল না। তা না হয় হল, কিন্তু আলোটা জ্বালল কে?

না, না, যা ভাবছেন তা নয়। আলো যে জ্বেলেছে, তার নাম জানতে আমি আসিনি। শোনাতে এসেছি। বুঝলেন না? কে আলো জ্বেলেছে, সবই মোটামুটি আঁচ করে ফেলেছি। না, না, আমাকে বলতে দিন...পুলিশ

গোয়েন্দারা ঘাসে মুখ দিয়ে চলে না। আমাদেরও ব্রেন আছে। আমি খবর নিয়ে জেনেছি, কারখানার ওয়ার্কস ম্যানেজারের সঙ্গে অহল্যা দেবীর একটু গুপ্ত প্রণয় ছিল। ভদ্রলোক খুবসুরৎ। বিলেত-ফেরত। ব্যাচেলর। আর কী চাই বলুন? আরও খবর পেয়েছি—পতিদেবতাকে রোজ স্বহস্তে ওষুধ খাওয়াতেন অহল্যা দেবী। এ ব্যাপারে কাউকে বিশ্বাস করতেন না সনাতনপ্রসাদ। শুনবেন আরও? সনাতনপ্রসাদের হার্ট হোঁচট খেয়ে খেয়ে চলছিল বলে একটা ওষুধ দেওয়া হত যার পাঁচ ফোঁটা মানে অমৃত, দশ ফোঁটা মানে বিষ—হার্টের রুগির পক্ষে। দোহাই মৃগাঙ্কবাবু, ওষুধটার নাম জিগ্যেস করবেন না। আপনারা—লেখকরা বড় অবিবেচক হন। যা শুনবেন তাই লিখবেন, তারপর আরও একশোটা খুনের কেস নিয়ে নাকের জলে চোখের জলে হতে হবে আমার মতো অনেক বান্দাকে। একটু বুঝে-সুঝে লিখবেন মশাই। জানেন তো, শতং বদ মা লিখ।

আচ্ছা মুশকিল তো, আবার বেরুটে চলে গেলাম। আসল কথাটাই তো এখনো বলিনি। বিয়েবাড়িতে যাওয়ার আগে কর্তা-গিন্নিতে বেশ খানিকটা বচসা হয়েছিল। চাকরবাকররা শুনেছিল। চড়া গলায় ধমক দিয়েছিলেন সনাতনপ্রসাদ। অহল্যাও দু-কথা শুনিয়ে দিয়েছিলেন। তারপরই সেজেগুজে হোল নাইট বাইরে থাকবেন বলে বেরিয়ে গিয়েছিলেন অহল্যা। যাবার আগে সেই বিশেষ ওষুধটা খাইয়ে গিয়েছিলেন কর্তাকে রোজকার মতো রাত ন'টায়।

এখন কথা হচ্ছে ক'ফোঁটা খাইয়েছিলেন? আমি বলব দশ ফোঁটা—মানে সঙ্গে সঙ্গে মারা গিয়েছিলেন সনাতনপ্রসাদ। প্রমাণ এখনও পাইনি কিন্তু বিষয় মানেই বিষ—বিষয়ের লোভে সবই সম্ভব। আর এখানে তো নাগর জুটেছে। ঘরে পঙ্গু স্বামী কাঁহাতক আর সহ্য করা যায়? সুতরাং পতিদেবতাকে তিনিই সরিয়ে দিয়েছেন ধরে নিলাম। কিন্তু আলোটা কীভাবে জ্বলল সেইটাই তো বুঝতে পারছি না।

দাঁড়ান, দাঁড়ান, এখনো শেষ হয়নি। আরও একটা জবর খবর শুনিয়ে দিই। শোনবার পর কিন্তু চোখ দুটো কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে পারে মা লক্ষ্মী। সাবধান! সাবধান!

হিমা-হিমি-হিমু, এই ত্রমজকে ফ্ল্যাট থেকে লোপাট করার ষড়যন্ত্রটি কে এঁটেছিল জানেন? কল্পনা করুন তো। পারলেন না তো? দুয়ো! দুয়ো! স্বয়ং গর্ভধারিণী মশাই। অহল্যা দেবী নিজে লোক লাগিয়ে মেয়েদের লোপাট করতে চেয়েছিলেন। কেন? কেন আবার—মেয়েরা কোনও গতিকে জেনে ফেলেছিল মায়ের হাতে বাবার জীবন বিপন্ন হলেও হতে পারে। অথচ সেকথা সবাইকে বলা যায় না। তাই ওরা ঠিক করল আমার দোর ধরবে। অহল্যা দেবী চলেন শিরায় শিরায়। মেয়েদের মতলব টের পেয়ে পুলিশের নজর অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্যে ইচ্ছে করেই মেয়েদেরকে গায়েব করতে আরম্ভ করলেন। আসলে পুরো ব্যাপারটাই সাজানো। অর্থাৎ সেই রাতে আমাকে স্রেফ বোকা বানিয়ে ছেড়েছেন অহল্যা দেবী তাঁর ভাড়াটে গুন্ডা দিয়ে। মেয়েরাও বিহ্বল হয়ে পড়ল হঠাৎ এই উৎপাতে। বাপের কথা খেয়াল রইল না।

তার সাতদিন পরেই কাজ হাসিল করে ফেললেন অহল্যা দেবী। তিনি জানেন, মেয়েরা বাপকে বাঁচাতে চেয়েছে ঠিকই, কিন্তু মাকে ফাঁসাতে চায়নি। পুলিশের কাছে এলেও তারা মায়ের নাম করত না। বাবা মারা যাওয়ার পর তো আরও বোবা হয়ে যাবে। সনাতনপ্রসাদ মারা যেতেনই—না হয় দুদিন আগেই তাঁর কষ্ট ঘুচিয়ে দেওয়া হল। মাকে ফাঁসিয়ে ঘরোয়া কেলেঙ্কারি ফাঁস করে আর লাভ আছে কী?

বলব কি মশায়, গোটা ফ্যামিলিটাই যেন কেমনতর। সব ছাড়া ছাড়া। অথচ তালে হুঁশিয়ার। মা থেকে মেয়েরা পর্যন্ত কেউ একটি কথাও ফাঁস করেনি। কিন্তু আমার নাম অবনী চাটুয্যে। ঠেঙিয়ে নকশাল তাড়িয়েছি। কি বললেন? খুব বাহাদুরি করেছি? চাকরি মশাই, চাকরি! চাকরি করতে গেলে নিজের ছেলেকেও ফাটকে পুরতে হয়, নকশাল তো ছার!

এখন বলুন, প্লটটা নিশ্ছিদ্র কিনা। বেশ বুঝতে পারছি, সনাতনপ্রসাদ এমনি এমনি মরেননি। কিন্তু শালা কিছুতেই তা প্রমাণ করতে পারছি না। নিশ্ছিদ্র প্লটে একটা ছিদ্রও আবিষ্কার করতে পারছি না। একি গেরোয় পড়লাম বলুন তো? আলোটা কে জ্বেলেছে, তা তো জানি। কিন্তু জ্বালল কী করে তাইতো বুঝছি না। বেশ বুঝছি, ছিদ্রটা ওইখানেই। ওই ছিদ্রটা আবিষ্কার করতে পারলেই ফাঁসিয়ে দেব অহল্যা দেবীকে।

ম্যারাথন বক্তৃতা থামতেই কবিতা বললে, 'আপনার কফি জুড়িয়ে গেল। চাইনিজ শ্রিম্প বলগুলো পর্যন্ত ইটের গুলি হয়ে গেল।'

'অ্যাঁ! কখন এল এসব? বলোনি তো?' আঁতকে উঠে প্লেটভর্তি চিংড়ি পকৌড়া আক্রমণ করলেন অবনী চাটুয্যে।

'বলতে দিলেন কই? যতবার মুখ খুলতে গেলাম, ততবারই তো দাবড়ানি দিয়ে থামিয়ে দিলেন।'

মুখভর্তি পকোড়া নিয়ে অঁ-অঁ-অঁ-অঁ করে কি যেন বললেন অবনী চাটুয্যে, বোঝা গেল না।

হাসি চেপে ইন্দ্রনাথ বলল, 'আস্তে আস্তে খান, বিষম লেগে যাবে। খেয়ে নিয়ে চলুন ঘরটা দেখে আসি।'

কোঁৎ করে গিলে নিয়ে বললেন, 'অবনীবাবু, 'কার ঘর?'

'সনাতনপ্রসাদের।'

'হা পোড়া কপাল! সপ্তকাণ্ড রামায়ণ শুনে সীতা কার বাবা! আরে মশায়, এখনো বুঝলেন না রুটিন-তদন্তে আমরা কিছুই বাদ দিই না?'

'রুটি আর লুচির মধ্যে যা তফাত, আপনার রুটিন-তদন্ত আর আমার লুচি—ন তদন্তেও সেই তফাত অবনীবাবু।'

'মানে? মানে? মানে? এত অবিশ্বাস আমার ওপর কেন?' বলেই খপাৎ করে আরও দুটো পকৌড়া মুখগহ্বরে ঠেসে দিলেন অবনীবাবু।

'দেখবেন শ্বাসনালীতে যেন আটকে না যায়।' বলল ইন্দ্রনাথ, 'আপনি এত সুন্দরভাবে সব কথা বললেন যে, অবিশ্বাস করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। জ্বলন্ত বর্ণনা যাকে বলে—আপনার বর্ণনাও তাই। বায়োস্কোপের ছবির মতো সব চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি বলেই একটা খটমট জায়গা ভেরিফাই করতে চাই।'

মুখভর্তি পকৌড়া চিবোনো বন্ধ করে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন অবনীবাবু। ভাবখানা—খটমট জায়গাটা আবার কোথায় দেখলেন মশায়?

ইন্দ্রনাথ বুঝিয়ে দিলে, 'অহল্যা দেবী বিয়েবাড়ি থেকে এসে দরজা খুলেই কিন্তু বেডরুমে যাননি—যা সবাই যায়। উনি কুকুরটাকে নিয়ে করিডরে গেলেন। কেন?'

চোখদুটো আস্তে আস্তে ছানাবড়ার মতো করে ফেললেন অবনীবাবু।

ইন্দ্রনাথ আরও বললে, 'উনি কি তাহলে জ্ঞানপাপী? উনি কি জানতেন, শোবার ঘরে স্বামীর মৃতদেহ পড়ে রয়েছে? কুকুরের অস্বাভাবিক চেঁচামেচির পর দরজা খুলেই ওঁর উচিত ছিল অসুস্থ স্বামীর কাছে ছুটে যাওয়া। কিন্তু কেন উনি করিডরে গেলেন, আমি গিয়ে দেখতে চাই।'

কণ্ঠনালী দিয়ে মস্ত ডেলাটাকে পাকস্থলীতে চালান করে দিয়ে বললেন অবনীবাবু, 'একটু দাঁড়ান। আর মোট চারটে আছে।'

ইন্দ্রনাথ আগে থাকতেই শিখিয়ে পড়িয়ে রেখেছিল অবনীবাবুকে।

সনাতনপ্রসাদের ঘরে ঢুকে তাই অবনী চাটুয্যে সোজা চলে গেলেন বেডরুমে। অহল্যা দেবীকে আবোল তাবোল কথায় আটকে রেখে দিলেন সেখানে।

ইন্দ্রনাথ এল করিডরে। ঢুকেই বাঁদিকে। শেষপ্রান্তে একটা কাঠের বাক্স। অ্যালসেশিয়ানের শোবার জায়গা। বাক্সটা তখন খালি। কুকুর বেরিয়েছে চাকরের সঙ্গে হাওয়া খেতে।

ইন্দ্রনাথ আগে থেকেই ভেবে রেখেছিল, কী করতে হবে। তাই হেঁট হয়ে কাঠের বাক্সটা সরিয়ে রাখল পাশে।

বাক্সর তলায় একটা ময়লা লিনোনিয়াম পাতা। লিনোনিয়ামটাও তুলে ফেলল ইন্দ্রনাথ।

তলায় একটা কাঠের পাটাতন। লম্বায় একফুট, চওড়ায় একফুট। দেওয়ালের গা ঘেঁষে কাঠের ঢাকনির গায়ে পেনসিল ঢোকানোর মতো একটা ফুটো।

ছিদ্রপথে কড়ে আঙুল ঢুকিয়ে পাটাতনটা উঠিয়ে ফেলল ইন্দ্রনাথ। মেঝের চৌকোণা গর্তে একটা বাক্স বসানো। ইলেকট্রিক মিটার আর মেন সুইচের জঙ্গল সেখানে। হালফ্যাসানের বাড়ি তো—দেওয়ালের গায়ে কিছু নেই।

পকেট থেকে টর্চ বের করে খুঁটিয়ে দেখল ইন্দ্রনাথ। কাঠের ঢাকনির যেখানে ফুটো, ঠিক তার তলায় কাঠের গায়ে দুটো ছোট ছোট ছিদ্র। যেন স্ক্রু লাগানো ছিল। মেন সুইচের মাথা থেকে দুটো তার বেরিয়েছে। একটা তারে কিন্তু ব্ল্যাকটেপ জড়ানো।

সন্তর্পণে ব্ল্যাক টেপ খুলে ফেলল ইন্দ্রনাথ তার না ছুঁয়েই। তারটা সত্যিই কাটা। দুটো প্রান্ত জুড়ে ব্ল্যাক টেপ দিয়ে মুড়ে রাখা হয়েছে।

বাক্সের তলায় ছোট্ট একটা টুকরো। সোলার ছিপির টুকরো।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ।

ফিরে এল শোবার ঘরে। অহল্যা দেবী গালে হাত দিয়ে নিশ্চুপ হয়ে শুনছেন অবনীবাবুর ফালতু বক্তিমে।

ভদ্রমহিলা নিঃসন্দেহে অপূর্ব সুন্দরী। খুঁত কোথাও নেই। বয়স হয়তো তিরিশ, মনে হচ্ছে আরও কম।

ইন্দ্রনাথকে দেখেই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন অবনীবাবু। চোখের মধ্যে প্রশ্ন ফুটিয়ে জানতে চাইলেন—হল কিছু?

গম্ভীর মুখে পলকহীন চোখে অহল্যা দেবীর পানে চেয়ে বলল ইন্দ্রনাথ, 'নমস্কার, আমার নাম ইন্দ্রনাথ রুদ্র। প্রাইভেট ডিটেকটিভ। আপনার কাছে শুধু দুটি জিনিস চাইতে এলাম।'

প্রতি নমস্কার করলেন অহল্যা, 'বলুন।'

'একটা কলিংবেলের টেপা সুইচ। আর একটা ছোট্ট সোলার ছিপি।'

নিমেষ মধ্যে নিরক্ত হয়ে গেলেন অহল্যা।

অবনীবাবুর পানে ফিরে বলল ইন্দ্রনাথ, 'এখন গ্রেপ্তার করতে পারেন। প্রমাণ পাওয়া গেছে।'

আবার চিংড়ি পকৌড়া। আবার কফি। আবার সরগরম বৈঠক।

ইন্দ্রনাথ বললে, 'ছিদ্রান্বেষী ছিদ্র খুঁজতে গিয়ে সত্যি সত্যিই ছিদ্র বের করে ফেলল।'

'কেসটা কিন্তু এখনও আমার কাছে পরিষ্কার হয়নি।' উৎকট গম্ভীর হয়ে বললাম আমি।

'ইহজন্মে হবে না। অবনীবাবু নিশ্ছিদ্র প্লটের ছিদ্রটা তাঁর অজান্তেই শুনিয়ে দিয়েছিলেন। তোরা প্রত্যেকে শুনেছিস। আমিও শুনেছি কিন্তু ওই যে বললাম, যার চিন্তার ডিসিপ্লিন, বুদ্ধির একাগ্রতা আর পর্যবেক্ষণ প্রয়োগশক্তি আছে—সে ছাড়া গোয়েন্দা হওয়া কাউকে সাজে না। তাই নিশ্ছিদ্র প্লটের ছিদ্র আমার মাথায় এসে গেল, তোদের মাথায় এল না।'

কবিতা একদম না ঘাঁটিয়ে ভালো মানুষের মতো মুখ করে বলল, 'হার মানছি ঠাকুরপো। কিন্তু আর সাসপেন্সে রেখো না। প্রেশার উঠে যাচ্ছে।'

প্রসন্ন হয়ে ইন্দ্রনাথ বললে, 'আমি এইখানে বসেই আঁচ করেছিলাম, আলোর তারে এমন কিছু কারচুপি করা হয়েছিল যা অহল্যা দেবীর অনুপস্থিতিতে আপনা থেকেই আলো নেভাবে বা জ্বালাবে। ঘরের মধ্যে প্রাণী ছিলেন দুজন। সনাতনপ্রসাদ আর কুকুর। সনাতনপ্রসাদ চলৎশক্তিহীন এবং আলো যখন জ্বলেছে বা নিভেছে—তখন তিনি মৃত। জীবিত প্রাণী বলতে রইল শুধু কুকুরটা। কুকুরটার সঙ্গে আলো জ্বলা নেভার কোনও সম্পর্ক নেই তো? অহল্যা দরজা খুলে ঢুকেই কুকুরটাকে নিয়ে করিডরে গেছিলেন কেন? করিডরেই কারচুপিটা নেই তো? হতে পারে কুকুরটা না জেনেই পুশ বাটনে চাপ দিয়ে ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়েছে অথবা জ্বালিয়েছে। কিন্তু নিভেছে রাত্রে— কুকুরের শোবার সময়। জ্বলেছে ভোরে—কুকুরের ওঠার সময়। তবে কি শোবার জায়গাটাতেই টেপা সুইচটা আছে?

'তাই তিনতলায় গিয়ে আমি আগে গেলাম করিডরে। দেখলাম, সত্যিই কুকুরের শোবার বাক্স রয়েছে সেখানে। সুসংবদ্ধ চিন্তা আর শৃঙ্খলাবদ্ধ যুক্তির প্রথমটি যদি সঠিক হয়, পরেরগুলোও সঠিক হতে বাধ্য।

তাই বাক্স সরাতেই কী-কী পেলাম তা আগেই বলেছি।

'মেন সুইচের একটা তার কেটে, সেই তারে বাড়তি তার জুড়ে এনে লাগানো হয়েছিল একটা টেপা সুইচে। সুইচটা স্ক্রু দিয়ে লাগানো হয়েছিল কাঠের ডালার ছোট্ট ফুটোর ঠিক তলায়। সুইচের ভেতরে কনট্যাক্ট প্লেট দুটোকে ইচ্ছে করে বেঁকিয়ে এমন জায়গায় রাখা হয়েছিল, যাতে বাক্সের মধ্যে কুকুর শুলেই ঢাকনি চেপে বসবে সুইচের ওপর। ফলে কনট্যাক্ট কেটে যাবে। মানে আলো নিভে যাবে। কুকুরটা বাক্স থেকে নেমে এলেই ডালাটা সুইচের ওপরে উঠে যাবে—আলো জ্বলে উঠবে। অর্থাৎ পুশ বাটন টিপে ধরলে আলো জ্বলে, ছেড়ে নিলে নেভে। এই সুইচে ঠিক তার উল্টো ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। টিপলে নিভবে, ছাড়লে জ্বলবে।'

'কিন্তু ছিপিটার ভূমিকা কী?' শুধোলাম আমি।

'কাঠের ঢাকনিটা সুইচের মাথায় ঠেকছিল না বলেই ফুটো দিয়ে সোলার ছিপি এঁটে দিয়েছিলেন অহল্যা দেবী। ছিপির তলাটাই সুইচের ওপর চেপে বসে আলো নিভিয়েছে কুকুরের শোবার সময়ে। ঘরে ঢুকেই ওই ছিপিটা সরিয়ে নেবেন বলে অহল্যা দেবী আগে করিডরে গিয়েছিলেন। পুশ বাটন সরিয়েছেন পরে ধীরে সুস্থে।'

বিমূঢ় কণ্ঠে কবিতা বললে, 'দরজা বন্ধ করে অহল্যা দেবী নীচে নামার আগেই তো কুকুরটা বাক্সে গিয়ে শুড়ে পড়তে পারত! তাহলে তো আলো নেভার ব্যাপারে সি-আর-পি-দের সাক্ষী রাখা যেত না?'

হাল ছেড়ে দিয়ে ইন্দ্রনাথ বললে, 'জন্মে এমন দেখিনি! আরে বাবা, খানকয়েক বিস্কুট শোবার ঘরে ছড়িয়ে এলেই তো হল! কুকুর বিস্কুট না খেয়ে শুতে আসবে না। ততক্ষণে অহল্যা দেবী নীচে পৌঁছে যাবেন। সি-আর-পি-দের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবেন—ঘরে আলো জ্বলছে। হয়েছেও তাই। সব কবুল করেছেন অহল্যা দেবী।'

'ত্রমজ মেয়ে তিনটে?' বোকার মতো জিগ্যেস করে ফেলেছিলাম আমি।

সঙ্গে সঙ্গে তেড়ে উঠেছিলঃ 'মরণ আর কি! সে-খোঁজে তোমার দরকার কী?'

** 'রোমাঞ্চ' পত্রিকায় প্রকাশিত।*

আদুরে খোকা

রাত তখন দুটো।

টেলিফোন এল শিকাগোর সীমানা ঘাঁটি থেকে। রাইটউড অ্যাভিন্যুতে ছোট্ট একটা পানাগারে এইমাত্র একটা রাহাজানি হয়ে গেল। টেলিফোনেই ঘটনাটার খুঁটিনাটি বিবরণ শুনলাম কর্তব্যরত সার্জেন্টের কাছ থেকে।

জায়গাটা শহরের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে। কাজেই চট করে একটা গাড়ি নিয়ে ঝটিতি পৌঁছে গেলাম অকুস্থলে। গিয়েই দেখা হয়ে গেল মার্টিন চৌয়ানস্কির সঙ্গে। দারুণ উত্তেজনায় প্রায় লাফাচ্ছিলেন ভদ্রলোক। ধড়ে যে তখনও প্রাণটা রয়ে গেছে, এ জন্যেও আনন্দের অবধি ছিল না তাঁর। ভয়ে প্রাণ উড়ে গিয়েছিল ভদ্রলোকের এবং সেই বৃত্তান্তই আমাকে বলতে পেরে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

'দুটো বাজতে তখনও দশ মিনিট বাকি। দোকান বন্ধ করব করব ভাবছি, এমন সময়ে একটা লোক এসে হাজির। লোকটাকে আমি চিনিই না। ঠিক বন্ধের মুখে হুট করে আসার জন্যে মেজাজ খিঁচড়ে গেল আমার। তাই সাফ বলে দিলাম, চটপট এক ঢোক গিলেই বিদেয় হতে হবে। খদ্দের বেশি ছিল না তখন। কপোত-কপোতীর মতো একটি যুগল মূর্তি আর মের্ডাড বসাকি। মেডার্ভ বসাকিকে তো আপনি চেনেনই। উনিও তো পুলিশ অফিসার। আজ রাতে ওঁর কোনও ডিউটি ছিল না।

'লোকটাকে জিগ্যেস করলাম কী ধরনের সুরা তাকে দেব। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর-টুত্তর না দিয়ে ফস করে এক জোড়া রিভলভার বার করে আমার দিকে তাগ করে ধরল সে। আর তার পরেই এক হুঙ্কার —'টাকাগুলো বার করে দিলে কীরকম হয়?'

'শুনেই বসাতি হাত বাড়ালেন তাঁর রিভলভারের দিকে। লোকটা কিন্তু ভারী হুঁশিয়ার। সঙ্গে সঙ্গে যেন কিছু হয়নি এমনি সবে বলে উঠল—'আপনি বরং ওটা টেবিলের ওপরেই রেখে দিন। তা না হলে আজ রাতেই একজনকে অক্কা পেতে হবে।'

'আমিই বললাম বসাকিকে—'শুনুন শুনুন, রিভলভারটা সরিয়েই রাখুন। আমি চাই না খামোকা একটা খুনোখুনি হয়ে যাক এখানে। নগদ যত টাকা আছে তা না হয় ওকে দিয়ে দিচ্ছি আমি।'

'কথা শুনলেন বসাকি। গোঁয়ার্তুমি করলেন না। বাস্তবিকই, আমাকে অথবা অন্য কাউকে বিপদে ফেলার ইচ্ছে তো ওঁর ছিল না।

'বন্দুকধারী এবার বসাকিকেই উদ্দেশ্য করে বললেন,—'ভালো মানুষের মতো রিভলভারটা আমার দিকে ঠেলে এগিয়ে দিন দিকি মশাই।' কথার সঙ্গে সঙ্গে ক্লিক করে শব্দ হল দুটো রিভলভারেরই।

'প্রথম থেকেই লক্ষ্য করলাম লোকটা একেবারেই নিরুত্তেজ, নিরুদ্বেগ, আর সংহত। বসাকি রিভলভারটা বারের টেবিলের ওপর দিয়ে ঠেলে এগিয়ে দিলে পর নির্বিকারভাবে লোকটা তা তুলে নিয়ে গুঁজে রাখল পকেটে। তারপর আমাকে লক্ষ্য করে বললে—'এবার স্মার্ট ছেলের মতো চটপট টাকা কড়িগুলো বার করে দিন তো। সবুজ রঙের যা কিছু নোট-ফোট আছে, তাই দিন। খুচরা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।'

'বাক্যব্যয় না করে কড়কড়ে ষাটটা ডলার তুলে দিলাম লোকটার হাতে। টাকাটা পকেটস্থ করেই এক দৌড়ে চোখের আড়াল হয়ে গেল সে।'

বসাকি এরপর এক মুহূর্তের বেশি সবুর করেননি। কিন্তু আততায়ী তার চাইতে অনেক বেশি ক্ষিপ্র। কাজেই পথে বেরিয়ে লোকটার টিকিও দেখতে পাননি বসাকি। রাস্তায় শুধু তাল তাল অন্ধকারই ছিল না,

ছিল অজস্র আঁকাবাঁকা সরু গলি। যে-কোনও একটার মধ্যে ঢুকে সটকান দেওয়া এমন কি আর কঠিন কাজ।

আমি আসার আগেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন বসাকি। খুব শিগগিরই তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনাও কম। তবুও বন্দুকধারী আগন্তুকের নিখুঁত দৈহিক বর্ণনা পেতে বিশেষ বেগ পেতে হল না আমাকে। লোকটা ধূমকেতুর মতো যখন ঢুকে পড়ে মদ্যশালায়, তখন যে তরুণ-তরুণী দুটি ছিল ঘরের মধ্যে, তাদের কাছ থেকে এবং চৌয়ানস্কির মুখে যা শুনলাম, তা থেকেই লোকটা স্পষ্ট হয়ে উঠল মনের চোখে। বয়সে সে যুবাপুরুষ, কালো-কালো এক মাথা চুল, ছিপছিপে চেহারা—দেখতে শুনতে মন্দ নয়। পরনে তার কালো প্যান্ট। খাটো হাতা স্পোর্টস শার্টটা প্যান্টের ওপর এমনভাবে ঝুলিয়ে দিয়েছিল সে যে বেল্টে গোঁজা রিভলভার দুটো তাইতেই ঢাকা পড়ে গিয়েছিল।

বসাকি আসার আগেই বেশ বুঝেছিলাম লোকটাকে। বসাকির কাছে পরে শুনলাম লোকটার চেহারার আর এক দফা বর্ণনা। আর এরকম হরিণের মতো দৌড়োতে নাকি তিনি এর আগে আর কাউকে দেখেননি। ঘাঁটিতে বসে এ সম্বন্ধে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা হল আমাদের মধ্যে। ১৯৫৫ সালের এপ্রিল ফুলের তারিখ দেওয়া আমার রিপোর্টটাও সঙ্গে ছিল। লেফটেন্যান্ট ফ্র্যাঙ্ক পেপে রিপোর্টটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে এক কথায় বলে দিলেন এ অপকর্ম কোনও মহাপ্রভুর।

বললেন—'এ কাজ ওই বোম্বেটে কার্পেন্টার ছোকরার। এই নিয়ে সত্তরবার হল। কিন্তু ওকে আমি বার করবই। এই যদি আমার জীবনের শেষ গ্রেপ্তার হয়, তাহলেও জেনো, ওর রেহাই নেই।'

বাস্তবিকই রেগে আগুন হয়ে গিয়েছিলেন ফ্র্যাঙ্ক পেপে। ঝানু অফিসার হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতা তো বড় কম নয়। সহকর্মীরা তাঁকে যেমন ভালোবাসত, শ্রদ্ধা করত ঠিক তেমনি তাঁকে যমের মতো ভয়ও করত আর দু-চক্ষে দেখতে পারত না শিকাগোর অপরাধদুনিয়ার বাসিন্দারা। বেশ কয়েকবার গুলি-গোলা চলেছিল পুলিশ আর শহরের গুন্ডাদের মধ্যে। ফ্র্যাঙ্ক পেপে কিন্তু লড়াই-অন্তে এমন আটজন মূর্তিমানবকে শ্রীঘরে পাঠিয়েছিলেন, খুন-জখম আর ডাকাতির জন্যে যারা কুখ্যাত।

পেপের সঙ্গে কথাবার্তা, শেষ হলে পর ফিরে এলাম আমার অফিসে। ধার করলাম রিচার্ড কার্পেন্টারের ইয়া মোটা ফাইলটা। ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে লোকটাকে খুঁজছি আমরা। উচ্চতায় সে পাঁচ-ফুট এগারো ইঞ্চি। ওজন ১৬৫ পাউন্ড। মাঝে মাঝে গোঁফ রাখে। কোটরে-বসা চোখ। বয়স ছাব্বিশ বছর। বিস্তর ডাকাতির মামলা ঝুলছে তার নামে। কিন্তু গত পনেরো মাস যাবৎ আরও ঘন ঘন আর বেশি সংখ্যায় রিপোর্ট আসা শুরু হয়েছে তার কীর্তিকলাপের ধরন দেখে মনে হয় শিকাগো শহরের বাইরে সে কোনও দিনই যায়নি। মুদিখানা, পেট্রোল পাম্প, পানাগার, হোটেল, লন্ড্রি ইত্যাদি ছোটখাটো জায়গায় ক্ষমতা জাহির করেই খুশি সে। ছদ্মবেশ ধারণের প্রচেষ্টা কোনও দিনই করেনি কার্পেন্টার এবং একলা কাজ করাই পছন্দ করে সে। এখনও কাউকে সে যমালয়ে পাঠায়নি বটে, তবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস একদিন না একদিন সে তা করবেই।

অনেক তথ্যই জানা গিয়েছিল ওর সম্বন্ধে। প্রতিবারই ক্যাশ লুঠ করার সময়ে হুমকি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পিস্তল দুটো বার করে ফেলে ও। তারপর কোনও গাড়ির সাহায্য না নিয়েই চক্ষের নিমেষে অন্তর্হিত হয় নগদ সমেত। দারুণ চটপটে সে। দৌড়োতেও পারে হরিণের মতো অস্বাভাবিক দ্রুত বেগে। এবং যেখানেই তার আবির্ভাব হোক না কেন, রিভলভার দুটো সব সময়ে তার সঙ্গে থাকবেই। ভয় দেখাবার জন্যে পিস্তলের হ্যামার ঠুকে ক্লিক ক্লিক শব্দ করাও তার আর একটা নিয়মিত নষ্টামি। বাঁধাধরা সূচি অনুসারেই কাজ চালিয়ে যায় কার্পেন্টার। দেখা গেছে, প্রতিদিন প্রায় পঁচিশ ডলার দরকার পড়ে ওর। উদাহরণ স্বরূপ, কোনও জায়গায় চড়াও হওয়ার পর যদি একশো ডলার হাতাতে পারে কার্পেন্টার, তাহলে অন্ততপক্ষে চারদিন আর কোনও উৎপাত করতে শোনা যায় না ওকে। আবার কখন-সখন যদি এর দ্বিগুণ অর্থ পকেটস্থ করতে পারে, তাহলে তো পুরো এক হপ্তা পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে জিরিয়ে নেয়। মদ্যশালায় তার আবির্ভাব ঘটে শুধু রাত্রে—দোকান বন্ধ করার সময়ে। কেননা, এই সময়ে ক্যাশে যত টাকা জমা পড়ে, তত টাকা সারা দিনে অন্য কোনও সময়ে পাওয়া সম্ভব নয়। কোনও কোনও পানাগারে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সামনে

বিয়ারের গেলাস নিয়ে ঝিমুতে থাকে ও। তারপর কাজ হাসিল করার পরেই গেলাসটি চুরমার করে দিয়ে যায় যাতে তার আঙুলের ছাপ গোয়েন্দাদের হাতে না পড়ে।

এইভাবে যাদের সিন্দুক ও হালকা করেছে তাদেরই একজনকে দিব্বি শান্তভাবে বলেছিল কার্পেন্টার —'আরে মশাই নিজের মগজ খাটান। উত্তেজিত হবেন না, নাভার্সও হবেন না। দেখতেই তো পাচ্ছেন কীরকম স্থির আমি। আপনাকে পরলোক পাঠানোর কোনও সদিচ্ছাই নেই আমার। কাজেই আমার মতোই নির্বিকার থাকুন। তবে, বেচাল দেখলেই আপনার ওই আস্ত মগজে একটা ফুটো করে দিতে এতটুকুও দ্বিধা করব না।' আর এক মদের দোকানের মালিকের কাছে শুনেছিলাম, কার্পেন্টার নাকি ক্যাশ থেকে তিনশো ডলার হাতিয়ে নিয়ে উধাও হওয়ার পরেও খদ্দেররা বিন্দুবিসর্গ টের পায়নি। পুলিশ আসবার পরে টনক নড়ে তাদের।

একবার ক্যাশ লুঠের পরেই একজন ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে আশাহত করেছিল কার্পেন্টার। ড্রাইভারকে ও বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলে যে, একটা মারমুখো লোকের কাছ থেকে প্রাণ নিয়ে পালাতে চাইছে সে। স্ত্রীর শোবার ঘরে নাকি কার্পেন্টারকে দেখতে পেয়েছিল লোকটা। তাই তার রক্তদর্শন না করলে নাকি স্বামী ভদ্রলোক শান্ত হবে না। কাজে কাজেই যত তাড়াতাড়ি এ অঞ্চল থেকে সটকান দিতে পারে সে, ততই মঙ্গল। ড্রাইভার ভাবলে বুঝি সত্যি সত্যিই আরোহীর জীবনরক্ষা করছে সে। কিন্তু এত ঝক্কি পোহাবার পুরস্কার মিলল মাত্র দশ সেন্ট বখশিশ! নিজের পরিবার ছাড়া, প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই এই একই রকম সঙ্কীর্ণমনা ছিল কার্পেন্টার। তাছাড়া, আরও একটা গুণ ছিল তার। বেশির ভাগ লুঠেরা খোলামকুচির মতো টাকা ছড়িয়ে দুদিনেই ফতুর হয়ে যায়। কিন্তু কার্পেন্টার ছিল বড় হিসেবী। অপচয় করা তার কোষ্ঠীতে লেখা ছিল না।

একবার খবর এল বেশ কয়েক মাস হল নর্থ ক্যারোনিলা অ্যাভিন্যুতে বোবা-কালাদের প্রতিষ্ঠান ক্র্যাকোভার হোম-এ আস্তানা নিয়েছে সে। জোর কানাঘুসো শুনলাম, এখানে গেলেই দর্শন মিলবে মহাপ্রভুর। বাড়িটা ঘেরাও করে ফেললাম আমরা। কিন্তু দেখা গেল দু-হপ্তা আগেই পাখি উড়েছে।

রাইটউড সরাইখানায় তার কুকীর্তির পর দু-মাস কেটে গেল। কিন্তু কোন গর্তে যে সে সেঁধিয়ে বসে রয়েছে, তার কোনও হদিশ পেলাম না আমরা। কার্পেন্টারের মার্জারের মতো ক্ষিপ্রতা আর তড়িৎ-তৎপরতায় প্রতিটি পুলিশকর্মী সজাগ হয়ে উঠেছিল। গায়ে এতটুকু আঁচ না লাগিয়ে পর-পর এতগুলি বে-আইনি কাজ করে সারা পুলিশবাহিনীকেই চ্যালেঞ্জ করে বসেছিল ও। শেষকালে সম্মেলনে বসলাম আমরা। নতুন কৌশল আর কর্মপদ্ধতির উদ্ভাবন করলাম। খুব সম্ভব মেয়েদের কাছ থেকেই পাওয়া যাবে তার বর্তমান ঠিকানা, এই আশায় এই ধরনের হেন মেয়ে নেই, যাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে ছাড়লাম আমরা। কিন্তু কার্পেন্টরের ছবি দেখা সত্ত্বেও কেউ চিনতে পারল না ওকে। শেষকালে বারমেড, সস্তা হোটেলের রিসেপশন ক্লার্ক, এবং অপরাধ দুনিয়ার ছিঁচকে চোর-ছ্যাঁচোড় থেকে শুরু করে রাঘব-বোয়ালদেরও রেহাই দিলাম না। কিন্তু বৃথাই। দেখা গেল, কার্পেন্টার বাস্তবিকই নির্বান্ধব। শিয়ালের মতো ধূর্ত সে। নিজের জীবিকা সমস্যার সমাধান করে সে নিজের বুদ্ধি-শক্তি দিয়েই—দুনিয়ার কারোর ওপর আস্থা নেই তার।

লোকটার সম্ভবপর গতিবিধি বিশ্লেষণ করার জন্যে হয়তো একজন মনোসমীক্ষকেরই দরকার ছিল আমাদের। অনেকবার এমন সম্ভাবনাও এসেছে আমাদের মাথায় যে হয়তো শহরতলীরই কোনও সম্মানজনক প্রতিষ্ঠানে দিনের বেলা ঘাপটি মেরে বসে রয়েছে সে। আর রাতের বেলা শ্রমিক হিসেবে কাজ করছে কোনও কারখানায় দিনের তৎপরতা গোপন করার জন্যেই। কিন্তু শিকাগো শহরটা তো আর ছোট শহর নয়। কাজেই এত সহজে এরকম চিরুনি-আঁচড়ানো তল্লাশি পর্ব পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না কোনওমতেই।

কার্পেন্টারের জন্ম হয় ১৯২৯ সালে। অর্থনৈতিক নিস্তেজনার সেই সঙ্কটময় দিনগুলিতে শান্তি ছিল না পরিবারে। ঝগড়াঝাঁটি লেগেই ছিল বাবা আর মায়ের মধ্যে। শেষকালে বিবাহবিচ্ছেদ করে পৃথক হয়ে গেলেন ওর মা ছেলেমেয়েদের নিয়ে। আর, তার কিছুদিন পরেই মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেলেন ওর বাবা। রিচার্ড কার্পেন্টারের বয়স তখন মাত্র দশ বছর। জীবন-বীমা না থাকায় দারুণ চাপ পড়ল ওর মায়ের ওপর।

অভাব-অনটনের নিত্য 'নেই নেই' হাহাকারে দেখতে দেখতে বুড়িয়ে গেলেন তার মা। তবুও ভেঙে পড়লেন না ভদ্রমহিলা। কষ্টেসৃষ্টে কোনওমতে শান্তি বজায় রাখলেন ছোট্ট পরিবারটির মধ্যে। রিচার্ড, তোর দুই বোন, আর নিজে—এই নিয়ে ছিল তাঁর ছোট্ট সংসার। ছেলেমেয়েদের মধ্যে রিচার্ডকেই তিনি বেশি ভালোবাসতেন। তাছাড়া, আশ্চর্য একটা সম্প্রীতিবোধ ছিল তিন ভাইবোনের মধ্যে। এমন বড় একটা দেখা যায় না। রিচার্ড কিন্তু মা বলতে অজ্ঞান। মা ছাড়া তার এক দণ্ডও চলত না। মায়ের কোলে বসে আদর পাওয়ার মতো লোভনীয় জিনিস তার কাছে আর কিছুই ছিল না। একদিন এইভাবেই কোলে বসে মাকে জড়িয়ে ধরে হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেলেছিল রিচার্ড। কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল—'মা, নিজেকে বড় একা লাগছে আমার। আমাকে ছেড়ে যেও না।' এরকম পরিস্থিতিতে সে যে মায়ের সবচেয়ে আদুরে হয়ে উঠবে, তা বলাই বাহুল্য।

সংসারের টানাটানি আরও বৃদ্ধি পেল। শেষকালে নিরুপায় হয়ে মিল-অকির একটা অনাথ আশ্রমে রিচার্ডকে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হলেন ওর মা। রিচার্ড কার্পেন্টারের পরবর্তী জীবনে যে কলঙ্কময় অধ্যায়ের সৃষ্টি হয়েছিল, তার সূচনা কিন্তু এইখান থেকেই। রিচার্ডের সঙ্গে কেউই নিষ্ঠুর ব্যবহার করেনি। বরং যত্ন পরিচর্যার সীমা ছিল না সেখানে। কিন্তু বাড়ি থেকে অনেক দূরে থাকার ফলে তার মানসিক অশান্তির সীমা-পরিসীমা ছিল না। কাজেই শত চেষ্টাতেও ওর শিক্ষকেরা এদিক দিয়ে ওকে সুখী করে তুলতে পারেননি। কোনও রকম ত্রুটি ছিল না তার আচার ব্যবহারে। চোখে-মুখে এমন একটা ছেলেমানুষি মিষ্টিভাব ছিল যে ভালো না বেসে পারা যেত না। কিন্তু পড়াশুনোর দিক দিয়ে ক্রমশই পিছিয়ে পড়তে লাগল রিচার্ড। আপ্রাণ চেষ্টা করলেন শিক্ষকরা। কিন্তু কিছুতেই স্কুলের পড়াশুনোয় মন বসাতে পারল না রিচার্ড কার্পেন্টার।

ষোলো বছর বয়সে তার চাইতে অনেক কমবয়সি ছেলেদের ক্লাসে বসতে হল তাকে। সমবয়সি ছাত্ররা তাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া, চেহারায়, পোশাকে নোংরা থাকার বদভ্যাস শুরু হয় এখান থেকেই। স্কুল ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর ও ঘুরতে থাকে এক কাজ থেকে আর এক কাজে। কখনও হয়েছে জাহাজঘাটার কেরানী, কখনও ট্রাক-ড্রাইভার। কখনও নিয়েছে ডিশ ধোওয়ার কাজ এবং এই ধরনের আরও কত ছোটখাটো কাজ। কিন্তু কোথাও বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি ও। যতবার চাকরি গিয়েছে তার, ততবারই সহানুভূতির স্নিগ্ধ প্রলেপে মনের জ্বালা জুড়োনোর জন্যে ছুটে গেছে মায়ের কাছে। প্রতিবারই অভিযোগ জানিয়েছে বড়ই অসুখী আর নিঃসঙ্গ সে।

আঠারো বছর বয়েসে সৈন্যবাহিনীতে নাম লেখাল রিচার্ড কার্পেন্টার। কিন্তু মিলিটারি সম্পত্তিতে ক্ষতি করা থেকে শুরু করে এত রকম নিয়ম লঙ্ঘন আরম্ভ হল যে গার্ডহাউসেই বিস্তর সময় ব্যয় করতে হল ওকে। শেষকালে এ ধরনের অবাঞ্ছিত লোককে বরখাস্ত করা ছাড়া আর কোনও উপায় রইল না। সৈন্যবাহিনী থেকে বেরিয়ে এল রিচার্ড কার্পেন্টার শুধু একটি জিনিস ভালোভাবেই রপ্ত করে এবং তা হচ্ছে পিস্তল চালানো। কিন্তু তার চরিত্রের আশ্চর্য দিকটুকু জানলে বাস্তবিকই অবাক হতে হয়। এ হেন লোকেরও আতীব্র আসক্তি ছিল সিরিয়াস সঙ্গীত, অপেরা সিম্ফনী আর কনসার্টে। বহু রবিবাসরীয় অপরাহ্নে ক্ল্যাসিকাল রেকর্ড বাজিয়ে শুনিয়েছে ও মা-কে। ভালো ভালো রেকর্ড সংগ্রহের বাতিকেই উড়ে যেত ওর যাবতীয় উদ্বৃত্ত অর্থ।

অপরাধী জীবনের গোড়ার দিকেই দু-দুবার পুলিশ পাকড়াও করে রিচার্ড কার্পেন্টারকে। প্রথমবার সৈন্যবাহিনী থেকে বরখাস্ত হওয়ার পর বেআইনীভাবে বিস্তল বহন করার অপরাধে। সৈন্যবাহিনীতে একসময়ে যারা কাজ করেছে, হামেশাই লুকিয়ে চুরিয়ে পিস্তল সঙ্গে রাখতে দেখা যায় তাদের। কাজেই কার্পেন্টারকেও একপ্রস্থ ধমকধামক দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হল। কঠিন শাস্তি হল না। এগারো মাস পরে বাড়ির মধ্যে বসে দুটো রিভলভার পরিষ্কার করছিল রিচার্ড। হঠাৎ বন্দুক থেকে গুলি ছুটে যায়—গুলি গিয়ে লাগে ওর মায়েরই গায়ে। কপাল ভালো, খুব গুরুতর চোট লাগেনি। কিন্তু পুলিশ যখন জানতে চাইল আসল ব্যাপারটা কী, তখন চটেমটে ওর মা পুলিশমহলকেই অভিযুক্ত করে বসলেন। তারা নাকি, খামোকা তার আদুরে ছেলেকে নাজেহাল করছে।

১৯৫১ সালে রিভলভার উঁচিয়ে একজন ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাছ থেকে আট ডলার ছিনিয়ে নেওয়ার অপরাধে গ্রেপ্তার হল রিচার্ড কার্পেন্টার। মূল সাক্ষী কিন্তু নিশ্চিতভাবে জানত না যে কার্পেন্টারই প্রকৃত অপরাধী। তা সত্ত্বেও গ্রেপ্তার করা হল ওকে। আটটা ডলার আর একটা রিভলভারও পাওয়া গেল ওর কাছ থেকেই। তাতেই আদালতের আর কোনও সন্দেহই রইল না কয়েদীর কুকীর্তি সম্বন্ধে। এক বছর কারাবাসের দণ্ড দিলেন ধর্মাবতার।

বড় কড়া দাওয়াই দেওয়া হল রিচার্ডকে। অন্তত সেইভাবেই শাস্তিটাকে নিয়েছিল ও। এক বছরের মধ্যে কোনও কয়েদীর সঙ্গেই বন্ধুত্ব করতে দেখা গেল না ওকে। মা মাঝে মাঝে আসতেন। সঙ্গে আনতেন মিঠাই আর কেক। কার্পেন্টার কাউকেই ভাগ দিত না এইসব খাবারদাবারের। খুপরির অন্যান্য কয়েদীরা 'আদুরে খোকা' বলে খেপাত ওকে। ফলে, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল ওর মনের জ্বালা।

শ্রীঘর থেকে বেরিয়ে এসে কার্পেন্টার প্রতিজ্ঞা করল জীবনে আর কখনও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে খেলা করবে না। খুঁজে পেতে একটা ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাজ জুটিয়ে ফেলল ও। প্রতি হপ্তায় আশি ডলার রোজগার করতে লাগল কার্পেন্টার। চরিত্রের মধ্যে অতিনৈষ্ঠিক বৈশিষ্ট্যের অঙ্কুরও দেখা গিয়েছিল সে সময়ে। বারবনিতা বা জুয়াড়িদের ট্যাক্সিতে তুলত না ও। নিঃসঙ্গ নেকড়ের মতোই ভয়াবহতা ওর প্রকৃতির কন্দরে সুপ্ত ছিল তখন। কিন্তু মাঝে মাঝে দুই বোন আর একজন খুড়তুতো বোনকে নিয়ে প্রায়ই সিনেমায় যেত। স্কেটিং করতেও যেত সবাইকে নিয়ে। পরে এই খুড়তুতো বোনের কাছে শুনেছিলাম—'রিচার্ড নিজে কিন্তু স্কেটিং জানতো না। তবুও রাত্রে আমাদের একলা ছেড়ে দিতে চাইত না ও। অনেক সৌভাগ্য থাকলে তবে এরকম ভাই পাওয়া যায়।'

তিন বোনের জন্যে সুন্দর সুন্দর পোশাক কিনে আনত রিচার্ড। নিজে কিন্তু নোংরা অগোছালো বেশবাস পরেই দিন কাটিয়ে দিত। একটি মাত্র সুট ছিল ওর। জুতোর অবস্থাও ছিল শোচনীয়—ঘন ঘন মেরামত না করলে চলত না। রীতিমতো উত্তেজনার ঝোঁকে যখন সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলছে কার্পেন্টার, তখনও কিন্তু ওর ঠাকুরদা বিশ্বাস করতে চাননি যে রিচার্ড কার্পেন্টার একজন বিপজ্জনক প্রকৃতির অপরাধী। জোর গলায় বলেছিলেন বৃদ্ধ—'ভারী ভালো ছেলে ছিল ডিকি। একটু খামখেয়ালী ছিল বটে কিন্তু তাতে কি আসে যায়? ও যখন ট্যাক্সি চালাত, তখন আমার জন্যে দুটো-তিনটে সিগার আনতে কোনওদিনই ভুল হত না ওর। বাজে সিগার নয়—যথেষ্ট ভালো সিগার।'

রিচার্ড কার্পেন্টারের পরিবারের সবাই ভাবলে ছেলেটির এত মানসিক অশান্তির মূল কারণ হল পুলিশের হয়রানি আর আদালতের সমবেদনার অভাব। ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাসের চার তারিখে আর একবার স্বরূপ প্রকাশ করে ফেলল কার্পেন্টার। একটা মোটর চুরি করল ও। পরে প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল গাড়িটা ওরই হাতে। একটা মুদিখানায় হানা দিয়ে লুঠ করল একশো ডলার। এই ঘটনার পর থেকে আর কোনওদিন সে ফিরে আসেনি নিজের বাড়িতে। পরিবারের কারোর সঙ্গেও আর দেখা করেনি। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগল কার্পেন্টার। পায়ে তার ক্রেপসোলের জুতো। বেল্টে গোঁজা একজোড়া রিভলভার। পরপর দুঃসাহসিক রাহাজানির এক ভয়ঙ্কর তালিকার সূচনা কিন্তু এই ঘটনা দিয়েই শুরু।

পুরো আঠারো মাস সবার চোখে ধুলো দিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে রইল রিচার্ড কার্পেন্টার। পুলিশ মহলের প্রত্যেকেই তখন খুঁজছে ওকে। তারপর এল ১৯৫৫ সালের আগস্টের সেই শোকাবহ দিনটি। আমার বন্ধু আর সহকর্মী ডিটেকটিভ মর্ফি বাড়ি থেকে হেডকোয়ার্টার আসছিল মাটির তলার রেলে চেপে। ডাকাতির তদন্ত করাই ছিল চশমাচোখো মর্ফির একমাত্র কাজ। কার্পেন্টারের রাহাজানি সম্পর্কিত সবক'টা স্টাফ মিটিংয়ে হাজির ছিল মর্ফি। কাজেই চলন্ত ট্রেনে বন্দুকধারী ছোকরাকে দেখে চিনতে ভুল হয়নি ওর। তৎক্ষণাৎ লম্বা লম্বা পা ফেলে রিচার্ডকে গ্রেপ্তার করে ফেলে ও। রুজভেল্ট রোড আর স্টেট স্ট্রিটের প্ল্যাটফর্মে কার্পেন্টারকে নিয়ে নেমে পড়ে মর্ফি। তারপর এক অসতর্ক মুহূর্তে পকেট থেকে কার্পেন্টারের ফোটোগ্রাফ বার করে যখন আসল লোকটার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে ব্যস্ত, ঠিক তখনই রিভলভার বার করে এক গুলিতেই মর্ফিকে খতম

করে দিলে কার্পেন্টার। ফোটোগ্রাফ গিয়ে পড়ল মেঝের ওপর। উদ্যত রিভলভারের সামনে ভয়চকিত জনতাকে স্থাণুর মতো দাঁড় করিয়ে রেখে ও গিয়ে উঠে পড়ল একটা মস্ত গাড়ির মধ্যে সাবওয়ে থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথ দিয়েই বাইরে যাচ্ছিল গাড়িটা। দরজা খুলেই ভেতরে উঠে পড়ে কার্পেন্টার। বিদ্যুৎ গতিতে আবার কার্তুজ ভরে নেয় রিভলভারে। এবং পরক্ষণেই ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে নলচেটা স্থির করে রেখে গর্জে ওঠে চাপা কণ্ঠে—'এইমাত্র কয়েকজনকে খুন করে এলাম আমি। চেঁচামেচি না করে গাড়িটা না চালিয়ে গেলে আপনাকেও খুন করব আমি।'

গাড়িটা চালাচ্ছিলেন তেষট্টি বছরের বুড়ো মিঃ চার্লস এ কোর্পার। কার্পেন্টারের বজ্রগর্ভ হুমকি শুনেই আঁতকে উঠে প্রাণ হাতে নিয়ে বায়ুবেগে গাড়ি চালালেন তিনি। দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলেন শিকাগোর সবচেয়ে সরগরম স্থান লুপ, ডিয়ারবর্ণ আর ম্যাডিসন স্ট্রিটের কেন্দ্রে। একলাফে গাড়ি থেকে নেমেই উল্কাবেগে উধাও হয়ে গেল কার্পেন্টার।

প্রথমেই যে পুলিশ প্রহরীটির সঙ্গে দেখা হল, তার কাছেই হাউ হাউ করে কোর্পার সাড়ম্বরে বর্ণনা করলেন এইমাত্র কি ভয়ঙ্কর ঘটনাটা ঘটে গেল। আঙুলের ছাপের বিশেষজ্ঞ এসে কোর্পারের গাড়ি থেকে উদ্ধার করলেন তালু আর তিনটে আঙুলের ছাপ। কার্পেন্টারের ছাপের সঙ্গেই তা হুবহু মিলে গেল।

পুলিশ অফিসারকে নিকেশ করেছে কার্পেন্টার। কাজেই পুলিশ ফোর্সের প্রত্যেকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলে তার পায়ে বেড়ি পরানোর। যেভাবেই হোক ফাঁদে ফেলতে হবে কার্পেন্টারকে, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করা যত সহজ, তাকে পূরণ করা ততটা সহজ নয়। একটা বাড়তি সূত্র অবশ্য পেয়েছিলাম। মিঃ কোর্পারের কাছে শুনেছিলাম হানাদার লোকটার মুখটা নাকি রোদে পোড়া তামাটে রঙের—প্রায় কালোই বলা চলে। স্থির করলাম, লেক মিচিগানে বেলাভূমিতে যে-ক'টা সমুদ্রস্নানের স্থান আছে, সবক'টাতেই একবার আমার যাওয়া দরকার। এ যেন অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া, লাগলেও লেগে যেতে পারে।

কিন্তু কিছুই হল না। চাঞ্চল্যকর গল্পে বোঝাই রইল খবরের কাগজের পাতাগুলো। আমাদের কাছেও এল এন্তার মিথ্যা সংবাদ। শিকাগোর একটি সংবাদপত্র পাঁচ হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করে বসল। এমনকী সাহায্য করার জন্যে এফ. বি. আই. (Fedral Bureau of Investigation) কয়েকজন এজেন্টকেও পাঠিয়ে দিলে আমাদের দপ্তরে। সবই হল। কিন্তু কার্পেন্টারের টিকি দেখা গেল না কোথাও।

ডিটেকটিভ মর্ফি নিহত হওয়ার তিনদিন পর পুলিশকর্মী ক্লারেন্স কের ছেলেমেয়েদের বাড়িতে রেখে বউকে নিয়ে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলেন একটা শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত হলে। মজার ব্যাপার কী জানেন? যে ছবিটা দেখতে গিয়েছিলেন ক্লারেন্স কের, তার নামও কিন্তু 'কল মি লাকি'।

সিনেমা হলে ঢুকেই ক্লারেন্স-এর চোখ পড়ল একটা লোকের ওপর। পেছনের সারিতে নাক ডাকিয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছিল লোকটা। এক নজরেই রিচার্ড কার্পেন্টারকে চিনতে পেরেছিলেন ক্লারেন্স। গোলমাল না করে বউকে বললেন, গাড়িতে ফিরে তার জন্যে অপেক্ষা করতে।

ইতস্তত করতে লাগলেন তাঁর স্ত্রী। তাঁর ইচ্ছে ছিল ফোন করে পুলিশ ফৌজ ডেকে আনা। কিন্তু ক্লারেন্সের সেই এক গোঁ—'কাজটা যখন আমারই আওতায় পড়ছে, তখন আমি একাই সামলাতে পারব তা।'

মাত্র বছরখানেক হল পুলিশ ফোর্সে যোগদান করেছিলেন ক্লারেন্স। নবাগত তিনি, অভিজ্ঞতাও ছিল অল্প। তাই বুদ্ধিমতী স্ত্রীর পরামর্শ শুনলেই ভালো করতেন। ঘুমন্ত কার্পেন্টারকে ঝাঁকুনি দিয়ে কড়া গলায় শুধোলেন ক্লারেন্স—'এটা কি ঘুমোবার জায়গা?'

'নিজের চরকায় তেল দিন।' ঘুম জড়ানো স্বরে উত্তর এল তখুনি।

'আমি পুলিশ অফিসার। লবিতে আসুন আমার সঙ্গে।'

ধীর পদে উঠে এল কার্পেন্টার। এমনভাবে এল, যেন তখনও পুরোপুরি ভাবে জেগে ওঠেনি ও। এক হাতে রিভলভার আর এক হাতে ব্যাগ নিয়ে সজাগ হয়ে রইলেন ক্লারেন্স।

ঘুম-ঘুম স্বরে আবার বলে ওঠে কার্পেন্টার—'বাইরে বড় গরম, তাই ঠান্ডায় বসে একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলাম। বে-আইনী কিছু তো করিনি।'

লবিতে প্রবেশ করে দুজনে। ঠিক এই সময়ে হোঁচট খাওয়ার ভান করেই রিভলভার বার করে সোজা ক্লারেন্সের বুকের ওপর গুলিবর্ষণ করলে কার্পেন্টার। ক্লারেন্সও পাল্টা গুলিবর্ষণ করলেন বটে, কিন্তু গুলিটা লাগল পলায়মান কার্পেন্টারের পায়ে। তিরবেগে ও ছুটে গেল জরুরি অবস্থায় বাইরে বেরোনোর দরজার দিকে। আড়াইশো লোক বসা থাকলেও তখনও বেশ অন্ধকার বিরাজ করছিল সিনেমা হলের মধ্যে। পটাপট শব্দে জ্বলে উঠল আলোগুলো—কিন্তু আবার পাঁকাল মাছের মতোই হাত ফস্কে অদৃশ্য হয়ে গেল রিচার্ড কার্পেন্টার।

গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ শুনেই লবির দিকে ছুটে গেলেন ক্লারেন্সের স্ত্রী। রাস্তা দিয়ে একজন যাজক যাচ্ছিলেন—ফায়ারিংয়ের শব্দে তিনিও বিলক্ষণ আঁতকে উঠেছিলেন। আসবার সময়ে তাঁকেই হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এলেন ক্লারেন্স পত্নী। এসে দেখলেন টমাস ব্র্যান্ড নামে একজন মেডিক্যাল ছাত্র প্রাথমিক শুশ্রূষা করার পর চেষ্টা করছেন কেরের বুক থেকে ফিনকি দিয়ে ছুটে আসা রক্তস্রোত বন্ধ করতে। ক্লারেন্সের চেতনা তখন বিলুপ্ত প্রায়। সেই অবস্থাতেই দুর্বোধ্য ভাবে বিড়বিড় করে চলেছেন—'কার্পেন্টার...কার্পেন্টার...আমি চিনেছি ওকে, কার্পেন্টার...।'

সেন্ট মেরী অফ নাজারেথ হাসপাতালে পুরো পাঁচ ঘণ্টা অপারেশন টেবিলে শুইয়ে রাখা হল ক্লারেন্স কের-কে। শিকাগোর সবচেয়ে নামকরা বুক আর হৃদযন্ত্র অস্ত্রোপচারক ডক্টর এডোয়ার্ড এ অ্যাভারী দুরূহ অস্ত্রোপচার করে জীবনরক্ষা করলেন ক্লারেন্সের। অত্যন্ত পলকা সুতোর ওপর ঝুলছিল তাঁর জীবন। কেননা হৃদযন্ত্রের কাছেই একটা ধমনী জখম হয়েছিল গুরুতরভাবে। পরে ডক্টর অ্যাভারী আমাদের বলেছিলেন—'হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে কের-কে। বুক ফুঁড়ে বুলেটটা বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে সঙ্কুচিত হয়েছিল ওর হৃদয়যন্ত্র। তা না হয়ে যদি প্রসারিত হয়ে থাকত, তাহলেই কিনারা কেটে বেরিয়ে যেত গুলিটা—সেক্ষেত্রে ওর মৃত্যু ছিল অবধারিত। কিন্তু এখন আর কোনও ভয় নেই।'

কার্পেন্টারের এই সর্বশেষ পাশবিক কুকীর্তির খবর ফলাও আকারে ছড়িয়ে পড়ল খবরের কাগজ, টেলিভিশন আর রেডিও মাধ্যমে। সে যে কোথায় ঘাপটি মেরে বসে রয়েছে, সে সম্বন্ধেও মন্তব্য করতে ছাড়ল না খবর পরিবেশকরা। কিন্তু এই একটিমাত্র সমস্যার সমাধান করতে গিয়েই পুলিশ হিমসিম খেয়ে গেল! কোন কোটরে যে সেঁধিয়েছে আহত কার্পেন্টার, তার কোনও হদিশই পেল না পুলিশমহল। জখম অবস্থায় গাড়ি না নিয়ে বেশি দূর যাওয়া কার্পেন্টারের পক্ষে সম্ভব নয় জানতাম। সারা শহর তখন সচকিত হয়ে উঠেছে—লোকের মুখে মুখে আলোচনা চলছে খুনে-প্রসঙ্গ নিয়ে। সেইজন্যেই আশা ছিল এবার জনসাধারণের পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া যাবে। তাছাড়া, কম করে ষাটটা পুলিশ স্কোয়াডকেও মোতায়েন করা হয়েছিল খুনে বন্দুকবাজকে পাকড়াও করার জন্যে। প্রতিটি হাসপাতালে খবর চলে গিয়েছিল—যে-কোনও মুহূর্তে ক্ষতস্থান চিকিৎসার জন্যে কার্পেন্টারের আগমন ঘটতে পারে। রেলপথ আর বাস স্টপেজেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিল গোয়েন্দারা। আজে-বাজে লোকের কাছ থেকে টেলিফোন মারফত কয়েকটা লোমহর্ষক গল্পও শুনলাম। তারা নাকি স্বচক্ষে দেখেছে রাস্তার অন্যদিক দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ছুটে চলেছে খুনে কার্পেন্টার। কেউ কেউ তাকে লুকিয়ে থাকতে দেখেছে বিশেষ কোনও ফ্ল্যাটে অথবা দোকানের মধ্যে। সে নাকি নতুন একপ্রস্থ পোশাক কেনবার চেষ্টা করছে, লেক মিচিগানের নৌকোয় তাকে নাকি উঠতে দেখা গেছে, এবং নিশ্চিন্তভাবে সে-ই নাকি একটা মালবাহী গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়েছে—এমনও দেখা গেছে। জনা ছয়েক তরুণকে হাতকড়া লাগিয়ে টেনে আনল পুলিশ। কিন্তু কার্পেন্টারের সঙ্গে তাদের মুখের কোনওরকম সাদৃশ্যই পাওয়া গেল না। একজন আঁতকে উঠে হন্তদন্ত হয়ে খবর আনলে একটা সিনেমাবাড়ির ছাদে নাকি খুনেটাকে দেখতে পেয়েছে সে। সঙ্গে সঙ্গে স্কোয়াডের অফিসাররা বাড়িটা ঘেরাও করে তল্লাশী করলে তন্নতন্ন

করে। পরিশেষে ছাদের ওপর পাওয়া গেল শুধু দুজন অর্ধ বসনা তরুণীকে—রৌদ্র-সুখ উপভোগ করছিল তারা।

এ হেন গদ্যময় পরিস্থিতিতে কার্পেন্টার গ্রেপ্তার হলে বাস্তবিকই ক্লাইমাক্স থেকে বঞ্চিত হত এই চমকপ্রদ কাহিনি। কিন্তু এরপর যা ঘটল, তাকে হলিউডি রীতি ছাড়া আর কিছু বলা চলে না—অলীক উপন্যাস যেন চাঞ্চল্যকর বাস্তবে রূপান্তরিত হল। যে রাত্রে সিনেমার মধ্যে পুলিশকর্মী ক্লারেন্স কের গুলিবিদ্ধ হলেন, ঠিক সেই রাত থেকেই বিচিত্র এই কাহিনির মধ্যে জড়িয়ে পড়ল একটা অতি সাধারণ মার্কিন পরিবার—ট্রাক-ড্রাইভার লিওনার্ড পাওয়েল, তার বউ আর সাত বছরের ছেলে রবার্ট আর তিন বছরের মেয়ে ডায়ানা। ওয়েষ্ট পোটোমাক অ্যাভিন্যুতে এদের নিবাস।

সেই রাতেই উৎসব ছিল পাওয়েলের বাড়িতে। সাড়ম্বরে ডিনারের আয়োজন করেছিল পাওয়েল তার নবম বিবাহ বছরে পদার্পণ উপলক্ষ্যে। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন নিয়ে স্ফূর্তিতে উচ্ছল হয়েছিল তারা রাত দশটা পঁচিশ মিনিট পর্যন্ত। অতিথিরা যখন বিদায় নিলে, তখন পাওয়েলের ছোট মেয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে, আর ছেলে অন্য ঘরে বসে টেলিভিশন দেখছে। দারুণ গরম পড়েছিল সে রাত্রে—গাছের পাতা নড়ানোর মতো হাওয়াও বইছিল না। রান্নাঘরে গিয়েছিল লিওনার্ড রেফ্রিজারেটর থেকে কোল্ড ড্রিংক বার করার জন্যে, এমন সময়ে পর্দা লাগানো দরজায় টোকা মারার শব্দ শুনতে পেল ও! সামনেই দাঁড়িয়েছিল রিভলভার হাতে রিচার্ড কার্পেন্টার। লিওনার্ড ওর দিকে ফিরতেই তুহিন-শীতল স্বরে বলল—'জানেন তো আমি কে?'

'নীরবে মাথা হেলিয়ে লিওনার্ড জানালে, হ্যাঁ, সে জানে।

'এইমাত্র আরও একজন পুলিশের লোককে গুলি করে এলাম আমি। আমি যা বলি, তা যদি করেন তো কোনও ক্ষতি হবে না আপনার। আর তা যদি না করেন, যদি দরজাটা খুলতে না চান—এইখান থেকেই আপনাকে গুলি করব আমি। খুলে দিন দরজাটা।'

কয়েক মাস আগে মদ্যশালায় পুলিশ কর্মী বসাকির যে রিভলভারটা পকেটস্থ করেছিল কার্পেন্টার, সেইটাই অকম্পিত হাতে উঁচিয়ে ধরে সে লিওনার্ডের দিকে।

স্বর শুনেই রান্নাঘরে ছুটে এসেছিল মিসেস পাওয়েল। খুব ধীরস্থিরভাবে সংক্ষেপে বলে উঠল লিওনার্ড—'ডার্লিং, উত্তেজিত হয়ো না। এরই নাম কার্পেন্টার। ও বলছে, ওর কথামতো কাজ করলে ও গুলি করবে না! আমাদের কোনও ক্ষতিই হবে না। চেঁচিও না।'

অন্য ঘরে টেলিভিশন সেটটা চালিয়ে দিল ববি। কথা বলার শব্দ কানে আসতেই সচকিত হয়ে ওঠে কার্পেন্টার। সুধোয়—'ওঘরে কে?'

'আমাদের দুই ছেলেমেয়ে। ববি এখন টেলিভিশন দেখছে। কিন্তু এখুনি এ-ঘরে আসবে ও শুভরাত্রি জানাতে। পিস্তলটা পকেটে রাখলে ভালো করতেন। ওকে বুঝিয়ে বলব-খন আমাদেরই বন্ধু আপনি। ও তা বিশ্বাস করবে। গণ্ডগোলও করবে না। কিন্তু রিভলভার দেখিয়ে ভয় পাইয়ে দিলে হয়তো ও চেঁচিয়ে কান্নাকাটি করতে পারে।'

ববি ঘরে ঢুকতেই রিভলবার আড়ালে সরিয়ে রাখল কার্পেন্টার। মদে জড়ানো গলায় আস্তে আস্তে কয়েকটি কথাও বলল তার সঙ্গে। কোনও কিছু সন্দেহ না করে শুতে চলে গেল ববি।

পর পর দু-গেলাস জল খেল কার্পেন্টার। তারপর মিসেস পাওয়েলকে হুকুম করলে ক্ষতস্থান বাঁধার জন্যে একটা ব্যান্ডেজ নিয়ে আসতে। লিওনার্ড নিজে থেকেই ওষুধের দোকানে গিয়ে বীজবারক (অ্যান্টিসেপটিক) কিনে আনতে চাইল। কিন্তু কার্পেন্টার বড় হুঁশিয়ার। বাড়ি ছেড়ে বেরোনো তো দূরের কথা, একটু বেচাল দেখলেই ভয়ংকর পরিণতির সম্ভাবনাটা সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিলে সে।

এরপর ট্রাউডার খুলে ফেলে আহত ঊরুর ওপর ব্যান্ডেজ বাঁধলে কার্পেন্টার। কের-এর প্রথম বুলেটটা মাংসর মধ্যে দিয়ে গেলেও দ্বিতীয় বুলেটটা গা ঘেঁষে বেরিয়ে গেছে—এতটুকু আঁচড়ও লাগেনি। মিসেস পাওয়েলকে দিয়ে টোস্ট আর কফি তৈরি করিয়ে আনল ও। কিন্তু খেল খুব অল্পই।

ক্ষুন্নিবৃত্তি এবং ক্ষতস্থান শুশ্রূষার পর লিভিংরুমে গিয়ে পাওয়েল দম্পতির সঙ্গে টেলিভিশন দেখতে বসল কার্পেন্টার। প্রোগ্রাম বন্ধ করে বিস্তারিতভাবে তার সর্বশেষ কীর্তির বুলেটিন প্রচারিত হওয়ার সময়ে নেকড়ের মতো দাঁত বের করে হি-হি করে হেসে উঠল কার্পেন্টার।

ট্রাক চালানোই লিওনার্ড পাওয়েলের পেশা। ছ'-ফুট চার ইঞ্চি উঁচু বিশাল শরীরে শক্তি বড় কম নেই। ওজনও কার্পেন্টারের চাইতে কম করে ষাট পাউন্ড বেশি। কিন্তু খুনে কার্পেন্টারের মন তো নয়—যেন একটা শক্তিশালী রাডার যন্ত্র। রাডার-মন দিয়ে পাওয়েলের চিন্তাশক্তি আঁচ করে নিয়ে ভ্রূকুটি করে চিবিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—'ও চেষ্টা করবেন না। বউ আর বাচ্চাগুলোর কথা মনে রাখবেন সবসময়ে।'

দেহের প্রতিটি তন্তুতে নিঃসীম ক্লান্তির গুরুভার নামলেও রীতিমতো হুঁশিয়ার রইল কার্পেন্টার। অনেকক্ষণ পরে পাওয়েল বললে এবার ঘরের আলো নিভিয়ে দেওয়া দরকার। তা না হলে প্রতিবেশীদের সন্দেহ হতে পারে। খড়খড়ির পাখিগুলো নামিয়ে দিতে হুকুম করল কার্পেন্টার। জানলার আর আলোর ওপরেও আবরণ টেনে দেওয়া হল তার নির্দেশে। দেখতে দেখতে ভ্যাপসা গরমে উনুনের মতোই তপ্ত হয়ে উঠল ঘরটা।

বহুদূর থেকে ভেসে আসছিল পুলিশ সাইরেনের তীক্ষ্ণ তীব্র শব্দ—আশপাশের অঞ্চল তন্নতন্ন করে খুঁজছিল ওরা। যেন নিজের সঙ্গেই নিজে কথা বলছে, এমনিভাবে বিড়বিড় করে ওঠে কার্পেন্টার—'আমার সম্বন্ধে খুব বেশি মাথা ঘামাবেন না আপনারা। শুধু এইটুকুই জানিয়ে রাখতে চাই, প্রথম গুলিটা আমি ছুঁড়িনি। যাকগে, ও নিয়ে আর এখন ভেবে লাভ কি।'

তন্ময় হয়ে টেলিভিশন শুনতে লাগল কার্পেন্টার। কের তখনও জীবিত ছিল কিনা, সেই খবরই জানার জন্যেই কানখাড়া করে বসে রইল অনেকক্ষণ। তারপর বলল—'শুধু একটি দুঃখ রয়ে গেল আমার জীবনে। এমন কোনও কাজ করে গেলাম না যার জন্যে আমার মা আর বোনেরা গর্ববোধ করতে পারে। অত্যন্ত নোংরা আর উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করেছি আমি। কিন্তু এখন বড় দেরি হয়ে গেছে। হয় ওই টিকটিকিগুলোর গুলিতে আমাকে মরতে হবে, আর না হলে ইলেকট্রিক চেয়ার তো রয়েছেই। মরবার আগে অন্তত একবারের জন্য মাকে দেখতে পেলে অনেকটা শান্তি পাব আমি।'

বন্ধুর মতোই সমবেদনার সুরে বলে লিওনার্ড—'চেষ্টা করলে আমার তো মনে হয় অনেক ভালো থাকতে পারতে তুমি, সবার ভালোবাসাও পেতে। তোমার বর্তমান হাল দেখে, এত কষ্ট দেখে, বাস্তবিকই দুঃখ হচ্ছে আমার।'

সঠিক মনোবিদ্যা প্রয়োগ করেছিল লিওনার্ড। সমবেদনার স্নিগ্ধ ছোঁয়া পেলেই সবকিছু ভুলে যেত কার্পেন্টার। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠল—'আজ সারারাত এখানেই থাকব আমি। কাল রাতও থাকব। অন্ধকার হলে তবে বেরুব। ততক্ষণে টিকটিকিগুলো নিশ্চয় এ অঞ্চল ছেড়ে অন্য অঞ্চলে যাবে আমাকে খুঁজতে।'

ছেলেমেয়েদের শোবার ঘরে ঘুমোবার ইচ্ছে ছিল কার্পেন্টারের। সেক্ষেত্রে তার রক্ষণাবেক্ষণের ভারটা থাকত নাকি ওদের ওপরেই। কিন্তু মায়ের মন কেঁপে উঠল তাতে। মরিয়া হয়ে এই বলে বোঝালে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে ছোটমেয়ে অচেনা মুখ দেখে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠতে পারে। তাহলেই মহাবিপদ। যুক্তিটা মনে ধরল কার্পেন্টারের। কাজেই বন্ধ ঘরে পাওয়েল দম্পতির সঙ্গেই রাত কাটানোর আয়োজন করল ও।

একটির পর একটি ঘণ্টা কাটতে থাকে। আরও গুমোট হয়ে উঠতে থাকে ছোট্ট ঘরটা। রিভলভারটা হাতেই রেখেছিল কার্পেন্টার। ঘুম-ঘুম চোখেও সজাগ রেখেছিল দৃষ্টি। ঘুমের দাপটে চোখ দুটো একেবারেই বন্ধ না হয়ে যায় সেজন্যে সারারাত সে কি প্রানান্তকর প্রচেষ্টা তার!

পরের দিন ভোরবেলা লিওনার্ড বললে—'আমাকে কাজে বেরুতে হবে। না বেরুলে কোম্পানি আর পাড়াপড়শীরা অনেক প্রশ্ন করতে পারে।' অপলক চোখে লিওনার্ডের মুখের দিকে তাকিয়ে কার্পেন্টার শুধু বললে—'যাচ্ছেন যান, কিন্তু মনে রাখবেন বাড়িতে রইল আপনার স্ত্রী আর দুই ছেলেমেয়ে। আমি যদি আপনি হতাম, তাহলে এরকম পরিস্থিতিতে আহাম্মকের মতো কিছুই করতাম না। বুঝেছেন?'

লিওনার্ড বুঝেছিল। সাড়ে ছ'টার সময়ে বেরিয়ে গেল সে। রাত্রেই তো আপদ বিদেয় বাড়ি থেকে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে ফোন করলেই চলবে খন। ওইটুকু সময়ের মধ্যে বেশি পথ আর যেতে হচ্ছে না বাছাধনকে। লাঞ্চ খাওয়ার অবসরে স্ত্রীকে ফোন করল লিওনার্ড সব শান্ত। কোনও হাঙ্গামা নেই।

দিনের বেলা কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিল কার্পেন্টার। ঘুম থেকে উঠে এক পেট খেয়েও নিল। তারপর গোঁফটা কামিয়ে ফেলে মুখ পরিষ্কার করে ফেলল। মিসেস পাওয়েলের ভয়ার্ত মুখচ্ছবি দেখে নিশ্চিন্ত ছিল কার্পেন্টার। নিদারুণ আতঙ্কে এমনই অন্তর-কাঁপুনি শুরু হয়েছিল তার যে কোনওরকম বিপদের সম্ভাবনাই ছিল না ওদিক থেকে। সেইদিনই বিকেলে মিসেস পাওয়েলের মা এল মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে। এই সময়টা ছেলেমেয়েদের শোবার ঘরে ঘাপটি মেরে রইল কার্পেন্টার।

দারুণ উদ্বিগ্ন মন নিয়ে কাজ থেকে ফিরে এল লিওনার্ড। সঙ্গে এনেছিল সেইদিনকার দৈনিকের সর্বশেষ সংস্করণ! কাগজটা ছিনিয়ে নিল কার্পেন্টার। তারপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল নিজের সম্বন্ধে টাটকা সংবাদ জানার আগ্রহে। আর তখনই অবস্থায় গুরুত্ব উপলব্ধি করে বলে উঠল ও—'অন্ততপক্ষে আরও দুদিন এ জায়গা ছেড়ে বেরোনো চলবে না। এখানে থাকার জন্যে আপনাদের খরচপত্রও আমি পরে পুষিয়ে দেব কিছু টাকা পাঠিয়ে।'

ডিনার তৈরি করে ডাক দিল মিসেস পাওয়েল। কিন্তু অচেনা লোকের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খেতে ছেলেমেয়েরা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করায় কালো আঙুর আর শাকসব্জীভরা প্লেটটা নিয়ে সামনের ঘরে উঠে এল কার্পেন্টার। ইতিমধ্যে খেতে খেতে ফিসফাস করে কি শলাপরামর্শ করে নিল পাওয়েল দম্পতি। তার পরেই লিওনার্ড উঠে গেল অন্য ঘরে কার্পেন্টারের কাছে। গিয়ে বললে যে তার ছেলেমেয়েদের একটা নিয়মিত অভ্যাস আছে। প্রতিদিন রাত্রে বাড়ির সামনে গিয়ে ওরা মা আর দাদু-দিদিমার সঙ্গে কিছুক্ষণ বসে থাকে। সে রাতেও ওদের যাওয়া দরকার। দুই কাঁধ ঝাঁকিয়ে অনুমতি দিল কার্পেন্টার।

কিছুক্ষণ পরে লিওনার্ড বলে উঠল—'এই যাঃ, ভুলেই গিয়েছিলাম। শ্বশুরের সঙ্গে ব্যবসা সংক্রান্ত কিছু কথা কইবো বলেছিলাম। আমারই যাওয়া দরকার নীচে। তা না হলে উনি নিজেই উঠে আসবেন।'

কার্পেন্টার বললেন,—'অত কথায় কাজ কি। ঠিক দশ মিনিটের মধ্যে আপনার ফিরে আসা চাই। ভুলে যাবেন না আপনার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা আমার রিভলভারের পাল্লার মধ্যেই রয়েছে।'

ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এল লিওনার্ড। পরক্ষণে গোটা কয়েক লম্বা লাফে পেছনের সিঁড়ি দিয়ে বাড়ির পেছনে এসে ইঙ্গিতে স্ত্রীকে ডেকে বলে দিল ছেলেমেয়ে আর তার বাবা-মাকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যেতে। ঠিক এইরকমটিই আশা করছিল মিসেস পাওয়েল। তারপর কী করা উচিত তা তাকে না বললেও চলত। রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল লিওনার্ড। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে খেলায় মগ্ন ছেলেমেয়েদের চিৎকার করে সাবধান করে দিলে—'পালাও এক্ষুণি—বন্দুক নিয়ে আসছে একটা খুনে গুন্ডা।'

ঠিক ন'টা বেজে এক মিনিটের সময়ে টেলিফোন পেলাম লিওনার্ড পাওয়েলের। ডিটেকটিভদের চিফ ফ্রাঙ্ক ও সুলিভ্যান টেলিফোন পেয়ে ছোট্ট করে বললেন লিওনার্ডকে—'গ্যাঁট হয়ে বসে থাকুন। আমরা আসছি।' তৎক্ষণাৎ বেতার বার্তা চলে গেল তিরিশটা পুলিশের গাড়িতে। প্রত্যেকেই চতুর্দিক থেকে এগিয়ে আসতে লাগল পাওয়ালের ফ্ল্যাটের দিকে। কয়েক মিনিট পরেই সার্জেন্ট মিকলাজ-এর গলা শুনলামঃ

'কার্পেন্টার...কার্পেন্টার...ওপরে হাত তুলে বেরিয়ে এসো। বাড়ি ঘেরাও করে ফেলেছি আমরা। সরে পড়ার কোনও সুযোগই নেই।'

জানলার সামনে আবির্ভূত হল কার্পেন্টার। দড়াম করে সার্জেন্টের দিকে গুলিবর্ষণ করেই সাঁৎ করে সরে গেল আড়ালে।

মিকলাজ এবার চিৎকার করে হুঁশিয়ার করে দিলে বাড়ির অন্যান্য বাসিন্দাদের। সবাই যেন মেঝের ওপর শুয়ে পড়েন—পুলিশ গুলিবর্ষণ শুরু করবে কার্পেন্টারের ওপর। ইতিমধ্যে প্রায় হাজার দুয়েক উৎসুক লোক দাঁড়িয়ে গিয়েছিল রাস্তার ওপর। সবার সামনেই আবার কার্পেন্টার দেখিয়ে দিয়ে গেল তার অসমসাহসিকতা

আর অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতা। পাওয়েলদের জানলা থেকে আচম্বিতে সে লাফিয়ে উঠল শূন্যপথে—চার ফুট দূরেই ছিল পাশের বাড়ির জানলাটা। জনতা এবং পুলিশ কিছু বোঝবার আগেই দারুণ শব্দে খোলা জানলাটার ওপর আছড়ে পড়ল সে। ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল সার্সির কাচ, অক্ষত রইল না তার মুখ আর হাত। চক্ষের নিমেষে ঘরের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল কার্পেন্টার।—ঘরের মধ্যে যে ক'জন ছিল, তারা তো ভয়ে কাঠ হয়ে প্রায় মিশে গেল দেওয়ালের সঙ্গে। কোনও দিকে না তাকিয়ে এক দৌড়ে ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল ও। সেখান থেকে সিঁড়ি টপকে পৌঁছোল আর এক ফ্ল্যাটে। মূর্তিমান বিভীষিকার মতো রিচার্ড কার্পেন্টারকে ধেয়ে আসতে দেখে সে ঘরের বাসিন্দারা আগেই উধাও হয়েছিল।

বাইরের বিস্ময়বিহ্বল দৃশ্য দেখার লোভ সম্বরণ করতে পারল না কার্পেন্টার। তাই জানলা দিয়ে উঁকি মারতেই কালি পটকার স্তূপে আগুন লাগার মতো প্রচণ্ড শব্দে এক ঝাঁক পুলিশের গুলি ছুটে এল তাকে লক্ষ্য করে। সাঁৎ করে কার্পেন্টার আড়ালে সরে এল বটে, কিন্তু টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল সার্সির কাচ আর ঝাঁঝরা হয়ে গেল কাঠের ফ্রেম। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই স্কোয়াড অফিসাররা ঢুকে পড়ল বাড়ির মধ্যে।

মেঝের ওপর বসেছিল কার্পেন্টার। পুলিশ অফিসারদের রণমূর্তি দেখেই নিরীহ নাগরিকদের মতোই বলে উঠল—'আমি না, আমি না, আমাকে আপনাদের দরকার নেই। আমি তো এইখানেই থাকি।'

কিন্তু এ ধোঁকাবাজিতে ভোলবার পাত্র নয় অফিসার। হিড়িহিড় করে সিঁড়ির ওপর দিয়ে ওকে টেনে নামিয়ে আনা হলে নীচে। একবার তো ফস করে রিভলভারটা বার করে ফেলেছিল আর কি! তবে তাতে সুবিধা করা গেল না। রাস্তায় টেনে নামানোর পরও মানুষ-নেকড়ের মতোই ও প্রাণপণে ধস্তাধস্তি করতে থাকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার। হই-হই করে এগিয়ে এল মারমুখো জনতা। আর সে কি চিৎকার —'মারুন, মারুন, খুন করে ফেলুন খুনে ছুঁচোটাকে!'

ঠেলেঠুলে পুলিশের গাড়িতে তুলে দিলাম ওকে, মিনিট কয়েক পরেই চার্জরুমে দেহতল্লাস করা হল ওর। পাওয়া গেল এই ক'টা জিনিসঃ দুটো রিভলভার, ছ'টা ৩৮ কার্তুজ, এক প্যাকেট অ্যাসপিরিন, হাতঘড়ি, পাঁচটা চাবি, দুটো পাঁচ ডলারের নোট আর খুচরো আটটা সেন্ট।

বিচার শুরু হলে কার্পেন্টারের হাত-পা বেঁধে এবং কোমরবন্ধনীর সঙ্গে পুরু চামড়ার ফিতে লাগিয়ে আদালতে নিয়ে যাওয়া হল তাকে। বড় বিশ্রী দেখাচ্ছিল ওকে দাড়ি না কামানোর জন্যে আর চুল না আঁচড়ানোর জন্যে। শুনানির সময়ে আগাগোড়া একজন আত্মীয়ার সঙ্গে কথা কইল কার্পেন্টার। স্টেট প্রসিকিউটর জোর গলায় বললেন, রিচার্ড কার্পেন্টার আইনত সুস্থ মস্তিষ্ক। বেশ কয়েকজন মনোসমীক্ষককে ডেকে তিনি প্রমাণ করে দিলেন কোনটা ন্যায় আর কোনটা অন্যায়, তা বোঝার টনটনে জ্ঞান আছে তার। কৌসিলীর সঙ্গে সহযোগিতা করার মতো বুদ্ধিবিবেচনারও অভাব নেই।

আর তাই, ডিটেকটিভ উইলিয়াম মর্ফিকে হত্যার অপরাধে ১৯৫৬ সালের ১৬ মার্চ আদুরে খোকা পুলিশ-হন্তা রিচার্ড ডি কার্পেন্টারকে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসিয়ে মৃত্যুদণ্ডের রায় দেওয়া হল শুনে কেউই অবাক হননি।

** জন ফ্লাননেগান (শিকাগো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) রচিত কাহিনি অবলম্বনেও।*

ম্যারিঅন-এর ঘটনা

কাপড়ের আবরণে মাথা-মুখ ঢাকা যেন চলমান প্রেতমূর্তি—গুপ্ত সমিতির সদস্য—এদের আমি দেখেছিলাম। সাদা পোশাক পরে ছিল সবাই। ঘোড়ায় চেপে স্রোতের মতো এসেছিল তারা। প্রদোষের ম্লান আলোয় ঘোড়সওয়ার মূর্তিগুলোকে সাক্ষাৎ শয়তানের মতো দেখাচ্ছিল। আমার তখন বয়স খুব অল্প। নেহাতই ছেলেমানুষ। ফ্লোরিডার মেরিয়ানার কাছাকাছি একটা গ্রামে আমি থাকতাম। অনেক রাত আমার জীবনে এসেছে, কিন্তু সে রাতটাকে আমি আজও ভুলতে পারিনি। ভুলতে পারিনি কীভাবে মাথা-মুখ আচ্ছাদিত লোকগুলো একটা জ্বলন্ত ক্রশ ঝুলিয়ে দিয়েছিল ক্যাথলিক গির্জের বাইরে তারপর ভেতরকার উপাসনারত সবাইকে হুকুম করেছিল বাইরে বেরিয়ে আসতে। বয়স তখন খুবই অল্প হলেও এ-সবের অর্থ যে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার ভয়াবহ সূচনা, তা বোঝার মতো বুদ্ধি আমার ছিল।

ক্যাথলিক, নিগ্রো, ইহুদি—এদের প্রত্যেককে ঘৃণা করত মাথামুখ ঢাকা এই লোকগুলো। গায়ের রং যাদের সাদা নয়, দক্ষিণদেশের মানুষ না হলেও যারা তাই মনে করে নিজেদের—এদের প্রত্যেককে মনেপ্রাণে ঘৃণা করত এরা, এই মাথা-মুখ আচ্ছাদিত লোকেরা। দীর্ঘদিন ধরে আমাদের গ্রামের সবার এবং খেত-খামারের চাষি মানুষদের অন্তরে বিভীষিকা রচনা করে এসেছে এই কু ক্লুক্স ক্ল্যান-য়েরা।

ছেলেবেলায় প্রথমদিকের স্মৃতি, বিশেষ করে এই সবের স্মৃতি কোনওদিনই মুছে যায় না মনের পট থেকে। পঞ্চাশ বছর আগেকার ঘটনা হলেও আজও আমি যখন জীবনে প্রথম দেখা মাথা-মুখ ঢাকা সেই লোকগুলোর কথা মনে করি, স্নায়ুতে স্নায়ুতে উপলব্ধি করি সেদিনকার রক্তজমানো আতঙ্ক।

পরে এদের সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্য আমি জেনেছিলাম। জেনেছিলাম কীভাবে গৃহযুদ্ধের সময়ে সর্বপ্রথম শুরু হয় কু ক্লুক্স ক্ল্যান-য়ের তৎপরতা। তারপর দাসত্ব প্রথা লোপ পাওয়ার পর আরও দুর্ধর্ষ হয়ে ওঠে এরা। সে সময়ে অজ্ঞতা, আতঙ্ক আর কুসংস্কার—এই সবক'টিকেই কাজে লাগাত ওরা। অনেক নিগ্রোর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ক্ল্যানসমেনরা সত্যি সত্যিই সাদা ভূত এবং তাদের অলৌকিক ক্ষমতাও তাই সীমাহীন।

কলেজে পড়ার সময়ে ক্ল্যানদের তৎপরতা সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্য আমি পড়েছিলাম। এদের বিচিত্র অনুষ্ঠান-পদ্ধতি যা শুনলে উপকথা বলে মনে হয়, এদের মৃত্যুর শপথ এবং কোনও সভ্যের নাম ফাঁস করে দেওয়ার দুঃসাহস যে দেখায় তার প্রতি পাশবিক দন্ডদানের বিধান—সবই আমি জানতে পারলাম। কশাঘাত এবং লাঞ্ছনার সে এক গা শিউরোনো কাহিনী। 'গ্র্যান্ড ইম্পিরিয়েল উইজার্ড অ্যান্ড মোগল' ইত্যাদি গালভরা নামগুলো শুনলে হাসি পেলেও কিন্তু বাস্তবিকই এদের অস্তিত্ব ছিল। ধর্মগত এবং জাতিগত বিদ্বেষকে জিইয়ে রাখার জন্যে যারা জীবন পণ করেছে, এ নাম ছিল তাদেরই।

তারপর বহু বছর পরের কথা। বড় হয়েছি আমি। দেহ-মনে পরিপূর্ণতা লাভ করেছি এবং অপরাধী সন্ধানী হিসেবে কিছু সুনামও হয়েছে। ওয়াশিংটন থেকে আমাকে পাঠানো হল একটা কু ক্লুক্স ক্ল্যান হত্যার তদন্তে। সমাজের দুষ্ট ব্রণস্বরূপ আমেরিকার রীতিনীতির পরিপন্থী এই গুপ্ত সমিতির কফিনে আরও এটা পেরেক পোঁতার জন্যে আমার সর্বশক্তি বিনিয়োগ করা সংকল্প নিয়ে রওনা হলাম আমি।

১৯৩০ সালের ৭ আগস্ট ইন্ডিয়ানার ম্যারিঅনে পৌঁছোলাম আমি। বিধির কি বিড়ম্বনা। এক সময়ে এই ম্যারিঅনের নামডাক ছিল অন্য কারণে। অবরুদ্ধ দক্ষিণ অঞ্চল থেকে বহু নিগ্রো ক্রীতদাস 'মাটির তলার রেলপথ' দিয়ে সটকান দিয়েছিল এইখান দিয়েই।

ম্যারিঅনের ঘটনাটা আসলে দু-পরিচ্ছেদে ভাগ করা একটিমাত্র কাহিনি—যার শুরু এবং শেষ মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে। ফেয়ারমন্ট জায়গাটা খুব কাছেই। ফেয়ারমন্টের একটি খামার থেকে একটি ছেলে তার আঠারো বছরের বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করার জন্যে এসেছিল ম্যারিঅনে। ঘটনার শুরু এইখান থেকেই। সিনেমা দেখতে গিয়েছিল দুজনে। তারপর একটা ড্রাগ স্টোরে দাঁড়ায় সোডা খাওয়ার জন্যে। সেখান থেকে দুজনে গাড়ি হাঁকিয়ে যায় মিসসিসিনউয়া নদীর দিকে। গাড়ি দাঁড় করানোর পর নদীর ধারে দুজনেই একটু ফূর্তিউচ্ছল হয়ে ওঠে। লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণীরা এ ধরনের পরিবেশে এসে যেরকম আনন্দে মেতে ওঠে, এ-ও তাই। কিন্তু এ হেন কবিতার ছন্দপতন ঘটল আচম্বিতে আতঙ্ক আর বিভীষিকার এক ঘন কালো মেঘের আবির্ভাবে। আচমকা এক ঝটকায় খুলে গেল গাড়ির দরজা এবং একটা ছায়ামূর্তি, নিগ্রো বলেই মনে হয়েছিল তাকে, একটা রিভলভার তুলে ধরল দুজনের পানে।

গুরু গম্ভীর গলা শোনা যায়, 'ওহে খোকাখুকুরা, বেয়াড়াপনা করলেই বিপদে পড়বে। ভালো চাও তো গুটি গুটি নেমে এসো দিকি গাড়ির ভেতর থেকে।'

বিনা দ্বিধায় হুকুম তামিল করে ছেলেটি। মেয়েটি গাড়ির মধ্যেই বসে থাকে। এবার পিস্তলধারীর সংকেত পেয়ে অন্ধকারের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে আরও দুজন ছায়ামূর্তি। ছেলেটির পকেট হাতড়ে তাকে কপর্দকহীন করে ওরা—খুচরোগুলোও নিতে ভোলে না। তারপর দলের পাণ্ডার হুকুম হয় 'মেয়েটিকে দেখাশুনা করার'। ওদের মধ্যে একজন সুট করে ঢুকে পড়ে গাড়ির ভেতর এবং পর মুহূর্তে মেয়েটির ভয়ার্ত চিৎকার ভেসে আসে ছেলেটির কানে। মরিয়া হয়ে ওঠে সে। নিজের বিপদ তুচ্ছ করে আচমকা এক মোক্ষম ঘুসি বসিয়ে দেয় পিস্তলধারীর মুখের ওপর।

এ কাজে রীতিমতো সাহসের দরকার—বিশেষ করে একজন অল্পবয়সি ছেলের পক্ষে এতখানি সাহস দেখানো বড় সোজা কথা নয়।

একটু টলে ওঠে পিস্তলধারী। তার পরেই সামলে নিয়ে পর পর তিনবার গুলিবর্ষণ করে। হাতে এবং পেটে গুলিবিদ্ধ হয়ে আছড়ে পড়ে ছেলেটি। ক্ষতমুখ দিয়ে ফিনকি দিয়ে ছুটে আসা রক্তের মধ্যে গড়িয়ে গিয়ে জ্ঞান হারায় সে।

হানাদার তিনজন তিরবেগে দৌড়ে গিয়ে উঠে পড়ে নিজেদের গাড়িতে। পুরোনো মডেলের একটা টি ফোর্ড গাড়ি। এবং সাংঘাতিক ভাবে আহত ছেলেটির পানে এক পলক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়েই ঝড়ের মতো বেগে গাড়ি চালিয়ে উধাও হয় সব্বাই।

প্রিয়তম ছেলেটির পায়ে নতজানু হয়ে বসে পড়ে মেয়েটি। ঘটনার আকস্মিকতায় এমনই অভিভূত হয়ে পড়েছিল বেচারি যে প্রথমেই আর্তস্বরে চিৎকার করে ওঠে সে। কিন্তু তার চিৎকার শুনে ছুটে আসার মতো লোক ধারে কাছে কেউই ছিল না। শেষকালে নিরালা জায়গাটা ছেড়ে সে দৌড়তে থাকে একটা খামারবাড়ি লক্ষ্য করে সাহায্যের আশায়। রাত তখন দশটা কুড়ি মিনিট।

গুলিবর্ষণের এই দৃশ্যটি যেখানে ঘটে, সে জায়গাটি ম্যারিঅনের বাইরে। কাজেই শহরের পুলিশরা সাফ বলে দিলে তদন্তটা পড়ছে কাউন্টি কর্তৃপক্ষের এক্তিয়ারে। ডাক পড়ল স্টেট হাইওয়ে পেট্রলের। শেষে ঠিক হল গ্রান্ট কাউন্টির শেরিফ জেক ক্যাম্পবেল হাতে নেবেন এই কেস।

ক্যাম্পবেল লোকটি ছিলেন ঝানু পুলিশ অফিসার। সাহসেরও তাঁর অভাব ছিল না। এবং অভাব যে বাস্তবিকই নেই, তা প্রমাণিত হয় তাঁর খুঁড়িয়ে চলার ধরন থেকেই। পিস্তলযুদ্ধে গুরুতরভাবে পায়ে চোট পেয়েছিলেন ক্যাম্পবেল। এ কেস যখন হাতে নিলেন, তখন ডাক্তারেরা উঠে পড়ে লেগেছেন ছেলেটির জীবন বাঁচানোর জন্যে। মেয়েটির জবানবন্দি থেকে ঘটনার নিখুঁত বিবরণও পাওয়া গিয়েছিল।

গুলিবর্ষণের পরেই সেই রাত্রে ম্যারিঅনে হাজির ছিলেন ক্যাম্পবেল। একটা সেকেলে মডেলের টি ফোর্ড গাড়ির মধ্যে তিনজন নিগ্রোকেও দেখেছিলেন। ওয়াশিংটন স্ট্রিট বরাবর বিকট স্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে গাড়ি চালাচ্ছিল ওরা। ওদের এই হুল্লোড় আর আচরণ দেখে তখন কিন্তু উনি বিশেষ কিছু ভাবেননি। উনি

জানতেন, মেজাজ খিঁচড়ে গেলে, খুব মুষড়ে পড়লে মানুষমাত্রই, তা সে কালো হোক আর সাদাই হোক, একটু বেসামাল হয়ে ওঠে। হাবভাবে আচার ব্যবহারে তখন অনায়াসেই একটা বেখাপ্পা বেয়াড়া ভাব লক্ষ্য করা যায়। যাই হোক, টি মডেল গাড়িটাকে দাঁড় করালেন উনি। দেখলেন, রেজিস্ট্রেশন হয়েছে টম শিপ-এর নামে। এই কাণ্ডর একটু পরেই ক্যাম্পবেল এবং তাঁর ডেপুটিরা রওনা হলেন টম শিপ-এর ঠিকানা খুঁজে বার করার জন্যে শহরের যে অঞ্চলে কালো চামড়ার লোকেরা থাকে সেই দিকে।

কোঠা বাড়িটায় রঙের কোনও বালাই ছিল না। আধা-অন্ধকারের মধ্যে বাড়িটা দেখে মনে হচ্ছিল যেন বয়সের ভারে বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বেচারী—নিজেকে খাড়া করে দাঁড় করিয়ে রাখার মতো শক্তিও তার নেই। গ্যারেজের ভেতরে হানা দিতেই ফোর্ড গাড়িটা চোখে পড়ল পুলিশ অফিসারদের। অ্যাক্সেলের চার পাশে ঘাস এবং গুল্ম লেগেছিল। মিসিসিসিনউয়া নদীর তীরে গেলে যে ধরনের ঘাস-গুল্ম পাওয়া যায়—ঠিক সেই রকমের।

পর্দা দেওয়া দরজাটা লাথি মেরে দুহাট করে খুলে ফেললেন ক্যাম্পবেল। এলোমেলো বিছানার ওপর জামাকাপড় পরেই চিৎপাত হয়ে শুয়ে ছিল টম শিপ। ঘুম ভাঙানোর পর সে স্বীকার করলে, হ্যাঁ, এক স্মিথ আর হার্ব ক্যামেরন নামে দুই বন্ধুর সঙ্গে সে একটু ফূর্তি করতে বেরিয়েছিল বটে। শিপকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন ক্যাম্পবেল। ডেপুটিরা পাকড়াও করে আনলেন স্মিথ আর ক্যামেরনকে।

আব্রাহাম স্মিথের বয়স উনিশ বছর। আর হার্ব ক্যামেরনের বয়স মাত্র ষোলো। উপবাসশীর্ণ ফিনফিনে চেহারা তার। হাতকড়া লাগিয়ে দুজনকে নিয়ে যাওয়া হল ম্যারিঅনের পুরোনো আদালত ভবনে। লাল ইট আর গ্র্যানাইট দিয়ে তৈরি সে বাড়ি।

নদীতীরে গুলিবর্ষণের অকুস্থলে এবং তার পরের ভয়াবহ উপসংহার নিয়ে তদন্তে ব্যস্ত থাকার সময়ে ক্যাম্পবেল অনেক কথা আমায় বললেন সে রাতের ঘটনা প্রসঙ্গে। কিন্তু গ্রেপ্তার করবার পর সেই রাতেই ডেপুটিরা এই তিনটি কালোচামড়া ছেলেদের নিয়ে আসলে কি যে করছিলেন, তার কোনও বৃত্তান্তই আমি বার করতে পারলাম না কারও কাছ থেকে। শুনেছিলাম 'থার্ড ডিগ্রি' নামক পদ্ধতিটিও বাদ যায়নি। কেউ কেউ বললে, ছেলেগুলোর পেট থেকে স্বীকরোক্তি আদায় করার পর নাকি বেদম হাঁপিয়ে পড়েছিলেন ডেপুটিরা।

নদীতীরে প্রেমিক-প্রেমিকার ওপর চড়াও হওয়ার কথা স্বীকার করেছিল টম শিপ। বাকি দুজনেই স্বীকার করেছিল, হ্যাঁ তারাও ছিল টম শিপ-এর সঙ্গে।

ম্যারিঅনের সীমানার বাইরে কু ক্লুক্স ক্ল্যান-এর সভার নির্ধারিত সময় ছিল ৭ আগস্টের রাত দুটো। সবাই মিলিত হবার পর নিষিদ্ধ জিন-এর স্রোত বয়ে গেল নির্বাধে। সেই সঙ্গে চলল নিগ্রোদের প্রতি অবাধে বিষোদগার। আলোচনা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে পেতে শেষ পর্যন্ত মতলব স্থির হয়ে গেলঃ ঠিক হল, দল বেঁধে সবাই হামলা দেবে জেলের মধ্যে। সভা যখন ভঙ্গ হল, তখন বেশির ভাগ ক্ল্যানসমেন-ই মদে চুর চুর এবং নষ্টামির জন্যে উদগ্রীব। জেলার প্রত্যেককে ডেকে তুলে বিরাট দল গড়ার পরিকল্পনাও হয়েছিল। স্লোগান তৈরি হল, 'কুত্তা নিগারগুলোকে যেভাবেই হোক পাঠাতে হবে যমালয়ে!'

সকাল দশটা নাগাদ আদালত ভবনের দিকে যে-ক'টা রাস্তা এসেছে, সবক'টায় জড়ো হল কাতারে কাতারে লোক। পিল পিল করে আরও লোক আসছিল ম্যারিঅনের বাইরে থেকে। রাগে গনগনে প্রত্যেকেরই মেজাজ। সত্যি কথা বলতে কি আসন্ন হাঙ্গামার সম্ভাবনায় দেখতে দেখতে থমথমে হয়ে উঠল চারপাশের আবহাওয়া। জেলের বাইরে জনতা যে কিছু গোলমাল শুরু করার জন্যেই ওত পেতে রয়েছে, এ সম্পর্কেও হুঁশিয়ার করে দেওয়া হল শেরিফ ক্যাম্পবেলকে। কয়েদিদের চুপিসারে ম্যারিঅনের বাইরে পাচার করে দেওয়ার পরামর্শও দেওয়া হল তাঁকে।

কিন্তু নিজের ক্ষমতায় বিশ্বাস রাখতেন শেরিফ। তাই জবাব দিলেন—'অর্থাৎ সবাই ভাবুক যে ভয়ের চোটে ল্যাজ গুটিয়ে সরে পড়ছি আমি। ওসব কিসসু হবে না। এ অঞ্চলের সবচেয়ে দুর্ভেদ্য জেল হল এইটা।

কারও ক্ষমতা নেই দরজা ভেঙে এর ভেতরে উৎপাত করবে।'

দারুণ ভুল করেছিলেন ক্যাম্পবেল। কেননা, খুব জোর ঘণ্টা তিনেক, কি তারও একটু পরেই জয়জয়কার পড়ে গেল সেই আইনের। যে আইন কোনও আইনের পরোয়া না করে নিজ হাতেই তুলে নেয় অপরাধীকে দণ্ড দেওয়ার গুরুভার। কড়া রোদ্দুরের মধ্যে ঝুলতে লাগল দু-দুটো নিষ্প্রাণ দেহ। আনুষ্ঠানিক বিচার প্রহসন বেমালুম কেটে ছেঁটে সংক্ষিপ্ত করে আনলে জনতা। রক্তের তৃষ্ণা মিটোনোর এই বীভৎস দৃশ্যে কিন্তু একটি জাতীয় রক্ষীও উপস্থিত ছিল না একাজ থেকে তাদের নিবৃত্ত করার জন্যে।

জেলের ওপর সর্বপ্রথম হামলা শুরু হয় চারজন মাথা মুখ ঢাকা ক্ল্যানসমেন-এর প্রচেষ্টায়। রাস্তার কোণ থেকে লোহার ট্রাফিক সিগন্যালটা মাটি খুঁড়ে তুলে আনে ওরা। তারপর, শুরু হয় আদালত ভবনের লোহার খিলমারা ওককাঠের ভারী দরজাটার ওপর আঘাতের পর আঘাত। কিন্তু এক চুলও নড়ে না পাথরের মতো শক্ত দরজাটা। বাধ্য হয়ে লোহার খেঁটে নামিয়ে রেখে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নেয় ওরা। রীতিমতো ঘামতে ঘামতে বিস্তর গালিগালাজ বর্ষণের পর আবার নতুন উদ্যমে শুরু হয়ে তাদের প্রচেষ্টা।

ইতিমধ্যে একটা কাঁদুনে গ্যাসের বোমা এসে পড়ে জনতার মাঝে তাদের ছত্রভঙ্গ করার জন্যে। কিন্তু একজন অতি-তৎপর ক্ল্যান হাঙ্গামাকারী চট করে বোমাটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিলে যেদিক থেকে এসেছে সেইদিকেই। দরজা-ভাঙার খেঁটে এবার আর ব্যর্থ হয় না। দরজার পাশে পাশে গাঁথুনিতে ফাটল দেখা যেতেই মুহুর্মুহু বিজয়ের উল্লাস ছড়িয়ে পড়ে এদিকে-সেদিকে। হুড পরা একজন চিৎকার করে ওঠে—'ওহে হাত লাগাও সবাই, বাস্টার্ডদের এবার আমরা হাতের মুঠোয় পাব।' হাতে হাতে চালান হয়ে গেল জিন মদের একটা বোতল। উইজার্ড অর্থাৎ জাদুকরের পোশাকের নীচ থেকে বেরিয়ে এল একটা দড়ি। এবং আরও রাশি রাশি লোক ছুটে এল হাত লাগানোর জন্যে।

জেলের বাইরের পৈশাচিক উল্লাসে উন্মত্ত হাঙ্গামাকারীদের নিরোধ করা যাবে না—এমন ধারণা কিন্তু তখনও জেলের ভেতরে শেরিফ ক্যাম্পবেলের মাথায় আসেনি। আগের চাইতেও জনতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। কাণ্ড দেখার জন্যে গাড়ির ছাদে ওপরেও উঠে পড়েছিল বিস্তর মানুষ। কেউ কেউ আবার আদালত ভবনের দরজা ভাঙার দৃশ্যটা ছেলেমেয়েদের দেখানোর জন্যে তাদেরকে তুলে নিয়েছিল নিজের কাঁধের ওপর। এ হেন হামলা স্বচক্ষে দেখে বিকৃত তৃপ্তি পাওয়ার জন্যে এসেছিল অনেকে। এ কাজে অংশ নেওয়ার অত সাহস তাদের ছিল না। বাধা দেওয়ার মতো সাহস বা সদিচ্ছাও কারও ছিল না।

জানলা থেকে তারস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে ক্যাম্পবেল—'থামো! দরজার দিকে আমি মেশিন গানের মুখ ঘুরিয়ে রেখেছি। প্রথমেই যে ঢুকবে, তার আর নিস্তার নেই।'

বিকট চিৎকার আর উল্লাসধ্বনির মধ্যে অব্যাহত থাকে হামানদিস্তা পেটার মতো দমাদম শব্দ। শেষকালে খসে পড়ে পাথর আর ইটের বাঁধুনি এবং বিজয়মাল্য এসে পড়ে কু ক্লুক্স ক্ল্যানদের গলে। ধুলো আর চুন-বালি-শুরকির কুয়াশার মধ্যে দিয়ে হুড়মুড় করে জনতা ঢুকে পড়ে ভেতরে। তারপর যে দৃশ্যের সৃষ্টি হয়, তা উন্মাদদের প্রলয়নাচন ছাড়া আর কিছুই নয়।

বেপরোয়া জনতার ওপর গুলি চালানোর ভয় দেখালেও শেষ পর্যন্ত তা আর করলেন না ক্যাম্পবেল। এ সম্পর্কে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে আসা বাস্তবিকই বড় সহজ কাজ নয়। উনি জানতেন ভিড়ের মধ্যে তাঁর বন্ধু আছে, প্রতিবেশী আছে, হয়তো দু-একজন আত্মীয়ও আছে। কয়েদিদের প্রতিরক্ষার জন্যে জন বারো কি তারও বেশি মানুষকে সাবাড় করাটা ন্যায়সঙ্গত কিনা, তা তাঁকে ভাবতে হয়েছে ওইটুকু সময়ের মধ্যেই। এবং তার চাইতেও দরকারি হল এই যে জনতার ওপর বেধড়ক গুলি চালিয়েও কি কয়েদিদের বাঁচাতে পারেন উনি?

মাথা মুখ ঢাকা ভেল্কিবাজরা শেরিফের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয় চাবির থোকা। খুলে যায় গারদের দরজা। দুজন চেপে ধরে টম শিপকে। অজ্ঞান হতে তখন তার বেশি দেরি নেই। একজন তাকে শক্ত হাতে ধরে রাখে, আর একজন ঘুসির পর ঘুসি বসিয়ে যেতে থাকে তার মুখের ওপর। টানতে টানতে ওকে আনা হয়

বাইরে। আদালত ভবনের সিঁড়ির ওপর থেকে লাথি মেরে গড়িয়ে দেওয়া হয় নীচের লনে। তারপর যখন দড়ির ফাঁস পরানো হয় ওর গলায়, তখন পুরোপুরি অচেতন হয়ে পড়েছে সে। গাড়ির ছাদের ওপর একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে গলা চিরে চিৎকার করতে থাকে—'খুন করো ওকে! খুন করো ওকে!'

এক মুহূর্তের মধ্যেই গাছ থেকে ঝুলতে থাকে টম শিপ। তারপর টেনে আনা হয় এব স্মিথকে। দু-হাত তার পিছনে বাঁধা। একজন মাতাল জড়িয়ে জড়িয়ে জিগ্যেস করে—'কিহে কালো শয়তান, কীরকম লাগছে তোমার?' দড়ির অন্য প্রান্তের ফাঁসটি ওক গাছের একটা শাখার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে আনা হয়। এবং নিষ্করুণভাবে ফাঁসবদ্ধ এই নিগ্রো ছোকরাও খুব দ্রুত ত্যাগ করে তার শেষ নিঃশ্বাস।

ষোলো বছরের হার্ব ক্যামেরন একজন স্ত্রীলোকের সেলে লুকিয়ে পড়ে রেহাই পেয়ে যায় সে যাত্রা। চুরির জন্যে স্রেফ দশদিনের হাজতবাসের গল্প ওরা বিশ্বাস করেছিল কিনা, অথবা ওরকম হাড্ডিসার ছোকরার জন্য দড়ির অপচয় করাটা ওরা অনুচিত মনে করেছিল কিনা—তা কেউ বলতে পারবে না। এমনও হতে পারে যে দু-দুটো খুনের পর জনতার হত্যালালসা এবং হাঙ্গামাতৃষ্ণা অনেকাংশে মিটে গিয়েছিল।

এই ভয়াবহ গল্প বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়ার পর দুনিয়ার পুলিশরা এসে হাজির হল ম্যারিঅনে। জাতীয় রক্ষীবাহিনীও এল। কিন্তু তখন ক্ল্যানসমেনদের কেউই আর ছিল না সেখানে—অন্তত হুড-পরা অবস্থায় নয়। অপরাধীদের খুঁজে বার করার চেষ্টায় আমি যখন কাজ শুরু করলাম, তখনও কিন্তু বেশ গরম ম্যারিঅনের আবহাওয়া। রুচিশীল নাগরিকেরা যে এই বীভৎস হাঙ্গামার জন্যে খুব মুষড়ে পড়েননি, এমন কল্পনাও যেন কেউ না করেন। এমনকী একজন পুরুতও হত্যাকারীদের সনাক্ত করতে যারা পারে তাদের প্রতি আবেদন করার সময়ে প্রকাশ করে ফেলেছিলেন, বহুজনের মতের সঙ্গে তাঁরও মতের মিল আছে এ বিষয়ে। উনি বলেছিলেন, 'খিÊস্টের নামে বলছি, জনতার ভয়াবহ জয়লাভের ফলে যারা অত্যাচারিত, তাদের সম্পর্কে সত্য কথা শুনতে চাই আমরা।'

সামরিক আইনের আওতায় এসে পড়ে ম্যারিঅন। জনতা আইনের নিয়ম লঙ্ঘন করার মতো সাহস যাদের আছে, তাদেরকে নিয়ে চার হপ্তা ধরে একনাগাড়ে আমি চেষ্টা করলাম ন্যায়চক্রকে ঘূর্ণ্যমান রাখতে। কিন্তু এত তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য যারা দেখেছে, তাদের অত জিজ্ঞাসাবাদ করেও আমি এমন দুজন সাক্ষী পেলাম না যারা দলের পাণ্ডাদের নাম বলতে রাজি আছে। দুজন তো দূরের কথা, এরকম লোক আমি একজনকেও পেলাম না। কেউই বলল না—'আমি দেখেছি—নিগ্রোদের গলায় ফাঁস পরাতে। আমি ওকে চিনি। ভালোভাবেই চিনি। আমার ভুল হতে পারে না এবিষয়ে। বহুবার তার গলাও আমি শুনেছি।'

গুজব শোনা গেল, ক্ল্যান পান্ডারা জর্জিয়া পালিয়েছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে আর করণীয় কিছুই ছিল না। পরবর্তী কর্মপন্থাকে কার্যকরী করতে গেলেই আমাকে প্রমাণ করতে হবে ব্যাপারটা দুই দেশের মধ্যে সন্ধি সম্বন্ধে আবদ্ধ অপরাধ। অর্থাৎ আন্তঃ প্রদেশ কিডন্যাপিং অথবা আন্তঃপ্রদেশ যোগাযোগ। কিন্তু তা অসম্ভব ছিল। গভর্নমেন্টের পক্ষেও করণীয় কিছু ছিল না। কাজে কাজেই কেসটা ছেড়ে দেওয়া হল প্রদেশ কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশের হাতে।

জেমস এম ওগডেন নামে এক সাহসী অ্যাটর্নি জেনারেল শেষ পর্যন্ত ম্যারিঅনের ক্ল্যানদের দলপতি হিসেবে দুজন পুরুষকে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রমাণাদির অভাবে কোর্ট এ অভিযোগ নাকচ করে দেয়।

হার স্বীকার করার পর ম্যারিঅন ছেড়ে এসেছিলাম আজ হতে প্রায় পঁচিশ বছর আগে। এর মধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে দক্ষিণ অঞ্চলে, সুদিন এসেছে, উন্নতি ঘটেছে। যদিও হেথায়-সেথায় এখনও জাতিবিদ্বেষ ফুটে রয়েছে দুষ্ট কীটঘ্ন ফুলের মতো, তবুও বেশির ভাগ আমেরিকান তাকিয়ে আছেন সেই সুদিনের দিকে যেদিন এই বিষ চিরতরে মুছে যাবে সমাজের বুক থেকে।

** জন কোন্যালী (আমেরিকা) রচিত কাহিনি অবলম্বনে।*

এক বোতল কাশাকা

সারা বিকেল তুমুল বৃষ্টি পড়েছিল রিও-ডি-জেনেরিও-তে। খুনটা হয়েছিল সেই রাতেই এবং তখনও জলের দাগ বুকে নিয়ে চিকচিক করছিল গোটা শহরটা। বেলাভূমি বরাবর অন্তহীন আলোর মালাটি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল নিস্তরঙ্গ শান্ত জলরাশির কালো কুচকুচে পটভূমিকায়। বন্দর অঞ্চল থেকে বেরিয়ে এসেছিল আরও একটা আলোর রেখা। আঁকাবাঁকা পথে না গিয়ে রেখাটা সিধে চলে গিয়েছিল শহরের বুক পর্যন্ত। আলোর ধারায় ঝকমক করছিল রাস্তাগুলো। কাদাজল ছিটিয়ে ছিটিয়ে ছুটে চলেছিল বড় বড় সব গাড়ি।

সুন্দর সুন্দর সব হোটেল, কারুকাজকরা বড় বড় বাড়ি আর কাচের দেওয়ালওলা প্রকোষ্ঠগুলোর খোলা জানালায় পাওয়া যাচ্ছিল আনন্দের উষ্ণতা হালকা হাসির ঠুনকো আওয়াজ, ম্যারিমবা আর ম্যারাকাস-এর শব্দ, বেহালার তারে উত্থিত সঙ্গীত আর ককটেল গেলাসের রিনিঝিনি আওয়াজ—সবই ভেসে আসছিল বাতায়নপথে। এ সময়ে এই রকমটি শোনাই তো স্বাভাবিক। স্বপ্ন দেখতে দেখতে হঠাৎ সুপ্তিভঙ্গ হওয়ায় জেগে উঠেছিল সারা শহরটা। নর এবং নারী, চটপটে তাদের প্রকৃতি, বিপুল তাদের অর্থ—প্রত্যেকেই এই ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে যেন আর একবার উপলব্ধি করছিল আনন্দের প্রতি, ফূর্তির প্রতি তাদের আতীব্র আকর্ষণ। নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মতোই তীব্র সে অনুভূতি।

শ্যাম্পেনের বুদবুদ আর মহার্ঘ সুগন্ধির বায়ুবহ সৌরভের আবেশে আবিষ্ট কেউই সে রাতে ক্ষণেকের জন্যেও ভাবেনি অপরূপ সুন্দর কোপকাবানার বালুকাবেলার কাছাকাছি পাহাড়ের সানুদেশের নিরানন্দ কুঁড়েঘরের শহরটির কথা। অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নজরে আসেছিল না মাঝে মাঝে এই নিরন্ধ্র তমিস্রার মধ্যে জেগেছিল কয়েকটা আলোর শুধু কম্পমান বিন্দু—মোমবাতির শিখা। আর ছিল নিস্তব্ধতা। শুধু শোনা যাচ্ছিল টুপ টুপ করে জল পড়ার আওয়াজ—মর্চে ধরা টিনের চাল থেকে বিন্দু বিন্দু জল ঝরে পড়ছিল ধরিত্রীর বুকে। এছাড়া সবকিছুই হারিয়ে গিয়েছিল নৈঃশব্দ্যের অতলে।

আচম্বিতে একটা কুঁড়েঘর থেকে ভেসে এল ক্রুদ্ধ চাপা কণ্ঠস্বর এবং পরক্ষণেই একটা আর্ত চিৎকার। আর তার পরেই সব চুপ। অসহ্য থমথমে নীরবতা। কুঁড়েঘরের ভেতরকার মোমবাতিগুলো নিভে গেল একে একে। এক মুহূর্ত পরেই সুট করে একটা মূর্তি বেরিয়ে এল ভেতর থেকে—চটপট পা চালিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে। নিম্নমানের জীবনধারা প্রবাহিত সমাজের এই দরিদ্র অংশটিতে কেউই কারও খবর রাখত না এবং এখানে খুনজখম ছিল নেহাতই একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। কাজে কাজেই পরের দিন সকাল না হওয়া পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত রয়ে গেল রোগা একহারা মেয়েটির লাশ। এবং তার পরেই খবর চলে গেল পুলিশের দপ্তরে।

যে কুঁড়ের নীচে খুনটি হয়েছে বিস্তর লোক তার চারধারে ভিড় করে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সবার আগে আমার চোখে পড়ল কয়েকটা ছেঁড়া পোশাক পরা ছেলেমেয়ে। বাচ্চাগুলো এদিক সেদিক দৌড়ে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে পথ করে নিয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছিল। জনতার এই জমাট প্রাচীর নাড়ায় কার সাধ্য। শেষকালে যখন চিৎকার করে উঠলাম ঃ 'পুলিশকে এগোতে দাও', তখনই চটপট পথ করে দিলে ওরা এবং কয়েকজনকে টুক করে সরে পড়তেও দেখলাম। কারণটা আমার অজানা নয়। সম্প্রতি এ অঞ্চলে পর পর কয়েকটা চুরি হয়ে গেছে রাতের অন্ধকারে। কিন্তু এসব ব্যাপার নিয়ে পুলিশকে যতখানি মাথা ঘামাতে হয়েছে, তার চেয়েও যে বেশিমাত্রায় তৎপর হতে হবে এ কেস নিয়ে—তা ওদের কারোরই জানতে বাকি নেই।

ঠেলেঠুলে এগিয়ে গেলাম সামনের দিকে। টানের চোটে খুলে গেল কোটের সামনের বোতাম। পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে অতখানি ওঠার ফলে রীতিমতো ঘেমেও গিয়েছিলাম। তাই মুছে নিলাম কপালের ঘাম। এতখানি হেঁটে আসার ফলে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। নোংরা পরিবেশের মধ্যে এসে পড়ে একটু মুষড়েও পড়েছিলাম। কিন্তু খুন যখন হয়েছে তখন খুনিকে আমাদের খুঁজে বার করতেই হবে।

আধপোড়া সিগারেটটার দিকে একবার তাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম আমি। তার পরেই মাথা নীচু করতে হল একটু নীচু বরগার আক্রমণ থেকে মাথা সামলানোর জন্যে। নোংরা নীচু কুঁড়েঘরটার অন্ধকারের মধ্যে থেকে ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল বরগাটা।

শুনতে পেলাম বাইরে সিগারেটটার প্রান্তভাগ নিয়ে ছেলেমেয়েগুলো মহাবাগবিতণ্ডা জুড়েছে এবং হাতাহাতি শুরু করে দিয়েছে। রিও ফোর্সে আঠারো বছর রয়েছি আমি পুলিশ চিফ-এর পদে। কাজেকাজেই রুগিকে পরীক্ষা করার সময়ে ডাক্তারের মনে যে ধরনের আগ্রহের সঞ্চার হয়, ঠিক সেই ধরনের পুলিশ চিফ সুলভ আগ্রহ দুই চোখে নিয়ে তাকালাম ঘরটার চারপাশে। এর আগেও এরকম ধরনের কয়েকশো চালাঘরে হানা দিতে হয়েছিল আমাকে। সে সবের থেকে কোনও প্রভেদ দেখতে পেলাম না এ ঘরটায়। একই রকমের নড়বড়ে আসবাবপত্র, হাড়জিরজিরে টেবিল, গোটা দুই ঝপ-করে-ভেঙে-পড়া চেয়ার এবং এক কোণে রাশীকৃত নোংরা কম্বল। সূর্যকিরণের প্রসাদবঞ্চিত হওয়ায় একই রকমের উৎকট গন্ধ আর মেঝের ওপর ধুলোর পুরু স্তর। কুঁড়ে ঘরের এই শহরে সবক'টা চালাঘরেই যেমনটি দেখতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ টিনের চাদর আর ধাতুর প্যানেল দিয়ে তৈরি বাঁধা-ছক-দেওয়াল আর ছাদ—এ ঘরের বৈশিষ্ট্যও দেখলাম তাই। হরেক রকমের এই জিনিসগুলো অবশ্য সবই চোরাই মাল—এক সময়ে যা ব্যবহৃত হত বিজ্ঞাপনের সাইনবোর্ড হিসেবে।

সেদিন সকালে অন্যান্য সবক'টা চালাঘর থেকে এই ঘরটিকে একেবারে আলাদা করে ফেলেছিল যে জিনিসটি তা হল একটা দেহ। মেঝের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়েছিল দেহটা। স্ত্রীলোকের লাশ। মুখ থুবড়ে পড়েছিল সে দুই হাত দুদিকে ছড়িয়ে দিয়ে।

ঝুঁকে পড়ে চিৎ করে শুইয়ে দিলাম ওর দেহ। এক সময়ে সুন্দরী ছিল সে। কিন্তু এখন যার মুখের দিকে তাকালাম তাকে মাঝবয়েসি স্ত্রীলোক ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। বহু বছর ধরে জীবনকে জোড়াতালি দিয়ে চালিয়ে নেওয়ার নিদর্শন ফুটে ছিল তার নিষ্প্রাণ মুখের পরতে পরতে। বলিরেখা গভীর হয়ে বসে গিয়েছিল তার চামড়ায়।

বিস্রস্ত কাঁচাপাকা চুল এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল বিস্ফারিত চোখের ওপর। জবরদস্তির কোনও চিহ্ন দেখতে পেলাম না কোথাও। অথচ সমস্ত চালাঘরটা আর্তসুরে বলতে চাইছিল—'খুন! খুন!'

নতজানু হয়ে বসেছিলাম এতক্ষণ। এবার উঠে দাঁড়ালাম। দরজার কাছে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল যারা, তাকালাম তাদের দিকে। ভিড়ের মধ্যে যে সব মুখ আমি দেখতে পেলাম, বহুদিন ধরে তাদের খোঁজ করছিল আমাদের দপ্তর। কিন্তু এখন সে সময় নয়। পরে এদের নিয়ে পড়া যাবে-খন।

প্রশ্ন করতে শুরু করলাম। বেশি প্রশ্ন নয়। কেননা আমি জানতাম এদের কাছ থেকে বিশেষ সাহায্য আমি পাব না। আতঙ্ক আর অনিশ্চয়তা—এই দুইয়ের তাড়নায় ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে ওরা কেউই চায় না অপরকে ফাঁসিয়ে দিতে। তাছাড়া পাশের চালাঘরের লোক কতটা খবর রাখে, তা তো কেউই জানে না। ওরা নাকি কাউকেই দেখেনি এবং অস্বাভাবিক কিছু শোনেও নি। কিছু দেখলে বা শুনতে পেলে তখুনি পুলিশকে না জানিয়ে কি তারা বসে থাকে হাত-পা গুটিয়ে?

মনে মনেই বলি, 'তাই বটে আইনকে অক্ষরে অক্ষরে তোমরা মেনে চলো কিনা। পুলিশকে সাহায্য করতেও কসুর করো না। কিন্তু তবুও যদিও বা কোনওদিন পাকড়াও করতে পারি খুনিকে—জানি তোমাদের এককণা সাহায্যও থাকবে না তার মধ্যে।'

ভিড়ের মধ্যে সামনে এগিয়ে গিয়ে এমনই একটা প্রশ্ন করলাম যার উত্তরে সত্য না বললেই নয়।

জিজ্ঞেস করলাম—'নিহত স্ত্রীলোকটি কে?'
একজন উত্তর দিলে—'এলসা।'
'পুরো নাম কী?'
'পুরো নাম কোনওদিনই আমাদের বলেনি ও।'
'পেট চলত কী করে?'
'ভিক্ষে করে।'
'আর কোনওপথে টাকা রোজগার করতো কি?'
'আমরা অন্তত জানি না।'
'বিয়ে করেছে?'
'যদিও বা করে থাকে, কোনওদিন দেখিনি ওর স্বামীকে।'
'ওর সঙ্গে আর কেউ থাকত এখানে?'
'দেখিনি কোনওদিন।'
'তোমাদের মধ্যে কেউ কিছু জানে কি?'
'সিনর মার্টিনেলি, আপনি তো জানেনই এর চেয়ে বেশি আর কিছু জানলে কতখানি খুশি হতাম আমরা।'

সেই একঘেয়ে পুরোনো গল্প। পেছন ফিরে আবার গেলাম চালাঘরটার ভেতরে। ওদের কাছ থেকে আর কোনও খবর জানার সম্ভাবনা নেই। সম্ভবত, বেশি কিছু জানেও না ওরা। খুনখারাপি করাটা চালাঘরবাসীদের আওতার মধ্যে পড়লেও জিনিসটা ওরা ফ্যামিলির চৌহদ্দির বাইরে সরিয়ে রাখাই পছন্দ করে।

পুলিশের ডাক্তার জানত নিছক পয়েন্ট নিয়ে লেখা খুব সংক্ষিপ্ত রিপোর্টই পছন্দ করি আমি। ফিরে এসে দেখি লাশ পরীক্ষাপর্ব সাঙ্গ করে ফেললে সে। আমাকে দেখেই বলল—'মাথায় চোট লাগছিল। খুলি চুরমার হয়ে গেছে। মারা গেছে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স মেয়েটার। পুষ্টিকর খাবার না খেতে পাওয়ায় চেহারা হয়েছে অস্থিসার। ঘণ্টা দশেক হল মারা গেছে।'

তার মানে দাঁড়াচ্ছে—এই যে গত রাতে দশটা নাগাদ খুন হয়েছে এলসা। ঠিক এই সময়টায় স্ত্রীকে নিয়ে আমি বাড়ির কাছাকাছি একটা সিনেমা হাউসে মিকিমাউজ-এর ছবি দেখতে দেখতে মনের আনন্দে হাসছিলাম। আবার ঠিক সেই সময়টাতেই কোপাকাবানায় শুরু হয়েছিল প্রথম ফ্লোর-শো এবং ঝলমলে আলোয় আনন্দে ফুর্তিতে উচ্ছল হয়ে উঠেছিল রিও-র একটা অংশ।

ডাক্তারকে শুধোলাম—'এই কী সব? আর কিছু নেই?'

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে যায় ডাক্তার দরজার কাছে। বলে—'আর একটা খবর। আকণ্ঠ মদ গিলেছিল মেয়েটা।'

'মদ গিলেছিল!' চিন্তার আনাগোনা শুরু হয় মস্তিষ্কের কোষগুলোয়। 'ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট। পয়সার লোভে নিশ্চয় একাজ কেউ করেনি। কেননা, পকেট হাতড়ে কয়েকটা ক্রুজিরোজও পাওয়া গেল না। তাছাড়া, নিজের পয়সায় সাধারণত কেউ মদ্য পান করে না। আর একবার চোখ বুলিয়ে দেখা যাক কী পাওয়া যায় আশেপাশে।'

আর একবার তল্লাসি চালিয়ে নতুন তথ্য বলতে বিশেষ কিছুই পাওয়া গেল না শুধু একটা খালি বোতল ছাড়া। মেঝের ওপর গড়াগড়ি যাচ্ছিল বোতলটা। তর্জনীটা বোতলের মুখে আঁকশির মতো আটকে দিয়ে তুলে ধরলাম নাকের কাছে। তখনও কাশাকার বিশ্রি অস্বস্তিকর গন্ধ পাচ্ছিলাম বোতলের মধ্যে। কাশাকা এক রকমের সস্তা মদ। আখ থেকে এখানকার লোকেরা চোলাই করে নেয় কাশাকা। বিশেষ করে এই কাশাকাটি যে সবচেয়ে সস্তা আর সবচেয়ে মারাত্মক, সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহই ছিল না। সামান্য কয়েকটা ক্রুৎজিরোজ-এর বিনিময়ে ধীরে ধীরে নিভিয়ে দিতে পারে তা যত কিছু যন্ত্রণা-চিন্তা-উদ্বেগ-ক্লেশ।

সন্তর্পণে বোতলটাকে কাগজ দিয়ে মুড়ে শেষবারের মতো চোখ বুলিয়ে নিলাম চারধারে। তারপর অ্যাসিস্ট্যান্টদের ডেকে হুকুম দিলাম লাশটাকে স্ট্রেচারে করে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে দিতে। পাহাড়ের পাশেই দাঁড়িয়েছিল অ্যাম্বুলেন্স।

ভিড় ঠেলে এগুচ্ছি, আস্তে আস্তে পা ফেলে নেমে আসছি ঢালু পথ বেয়ে এমন সময় শ্লেষতীক্ষ্ন সুরে কে যেন পেছন থেকে বলে উঠল—'গুড মর্নিং, সিনর মার্টিনেলি।'

কণ্ঠস্বরের অধিকারী যদি জানত যে আমার দুজন সহকারী ওইদিনই আবার ফিরে আসবে শহরে—হোল্ড-আপ চার্জের বলে তাকে গ্রেপ্তার করতে—তাহলে এতখানি চ্যাংড়ামি করতে সে যেত না।

এ ধরনের খুনের তদন্তের একটা বিরাট অংশই হচ্ছে নিরানন্দ কর্মসূচীর একঘেয়েমি। পুলিশ হেড কোয়ার্টারে ফিরে আসার পরেই শুরু হল এই চক্রবৎ কর্মসূচীর পুনরাবর্তন।

লাশটা আনার পর আঙুলের ছাপ নিয়ে সনাক্ত করা হয়েছিল। এলসা কোয়েলহার বয়স সাতচল্লিশ। রেসিফি শহরের উত্তরাঞ্চল তার আদি নিবাস। বহু বছর ধরে ভিক্ষুক-বৃত্তি আর যাযাবর বৃত্তির অভিযোগের রেকর্ড পাওয়া গেল এলসার। তার সর্বশেষ জেলখাটার মেয়াদ ছিল দশ দিনের এবং সে মেয়াদ শেষ হয়েছে তার মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগে।

কাশাকা বোতলের ল্যাবরেটরি রিপোর্ট তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। আঙুলের ছাপ মৃত মেয়েটারই। নীল কাচের সরু হয়ে ওঠা ঘাড়ের কাছে একটা ধ্যাবড়া তালুর ছাপ পাওয়া গিয়েছিল। ব্যস আর কিছু না।

বেশ কিছুদিন একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম তালুর ছাপটার দিকে। হৃদয় রেখা আর আয়ু রেখাদুটো নিবিড় হয়ে নেমে এসেছিল বোতলের তলার দিকে। একটু আবেগের সঞ্চার হয় আমার মনে। ভাবি, হাতের এই রেখা দেখে কোনওও হস্তরেখাবিদ কী বলতে পারত আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে ছিল এলসার ললাটলিপি? কিন্তু দিবাস্বপ্নর অথবা অনুধ্যান করার সময় এটা নয়।

ভাবলাম, 'কী করা যায় এবার? আচ্ছা, এলসার তো পেশা ছিল ভিক্ষে করা। পৃথিবীর যে-কোনও বড় শহরে আছে এই বিপুল অথচ একান্ত ঘনিষ্ঠ সমাজটার উৎপাত। আমার সুযোগ খুবই ক্ষীণ ঃ সমপেশার কাউকে পাকড়াও করে আলাপ করা ছাড়া আপাতত আর কোনও উপায় আমি দেখি না।

নগরবাসী ভিখিরিরা সাধারণত মামুলি শ্রেণির বদমাশ হয়। খুনটুন করা এদের ইতিহাসে বড় একটা দেখা যায় না। শুধু তাই নয় নিজের পেশার কেউ যে খুন হয় এটাও কেউ চায় না।

ল্যাটিন ভিখিরি জানে খুনিরা অনায়াসেই খুন করতে পারে তাকে। কেননা, দু-একটা ভিখিরিকে নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো সময় সাধারণত সমাজের নেই। কাজেকাজেই এলসার সহকর্মীরা যখন দেখলে যে ওর হত্যাকারীকে খুঁজে বার করার সমস্যা নিয়ে বেজায় দুশ্চিন্তায় পড়েছি আমি এবং এমনভাবে সেই খুনিটার সন্ধান করছি যেন একটা নামকরা লোককে খুন করে বসেছে সে, তখন ওরা আমায় সাহায্য করতে শুরু করল। ওদের কথার মধ্যে থেকেই এল অভীপ্সিত সাহায্য। এলসা সম্বন্ধে যা কিছু জানত সব বলল ওরা। এক সময়ে একটা রাঞ্চের পরিচারিকা ছিল সে। তখন তার যৌবন ছিল, রূপ ছিল, তারপর তাকে ব্যাভিচারের পথে নামিয়ে আনে রাঞ্চের মালিকের ছেলে এবং বাসনা পরিতৃপ্তির পর তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যায় ভাঙাচোরা লোহার টুকরোর একটা স্তূপের ওপর।

বন্ধুবান্ধব? প্রত্যেকেই ভালোবাসত ওকে। বিশেষ কোনও বন্ধু? আর্নেস্টো নামে একটা ভিখিরির সঙ্গে কিছুদিন ছিল এলসা। কিন্তু পরে ওদের মধ্যে ঝগড়া হয়ে যায়।

ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। ভিখিরিদের মধ্যে ভালোবাসা, থ্যাবড়া চালাঘরের ভেতরে মদের ঝোঁকে কোঁদল, মাথার ওপর আচম্বিতে চোট...হুঁ, এইভাবেই হয়তো ঘটেছে ব্যাপারটা।

কিন্তু আর্নেস্টো কোথায়? ভিখিরিরা তা জানে না। গত দিনদুয়েক ওকে দেখা যায়নি। কিন্তু সে নাকি রিও-র 'ব্রডওয়ে' সিনেলানডিয়া ডিস্ট্রিক্ট-এর থিয়েটারের ভিড়ে 'কাজ' করতো।

একজন ভিখিরি আমার সঙ্গে ফিরে এল পুলিশ হেডকোয়ার্টারে। জুয়াচোর বদমাশদের গ্যালারিতে আর্নেস্টোর ফোটোগ্রাফ দেখেই চিনতে পারল সে। সঙ্গে সঙ্গে হুলিয়া বেরিয়ে গেল তাকে গ্রেপ্তার করে আনার। কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার তাকে। আর, তারপরেই শুরু হল আমাদের ডিপার্টমেন্টের সেই কাজটি, যে কাজ সব গোয়েন্দাদের জীবনের একটা বিরাট অংশ জুড়ে থাকে এবং তা হচ্ছে প্রতীক্ষা—নিছক প্রতীক্ষা।

তিনদিন পরে নিয়ে আসা হল আর্নেস্টোকে।

ওর খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখের কোনাগুলো লাল, আর নোংরা চেহারার সঙ্গে পুলিশের ফটোগ্রাফের সাদৃশ্য বার করাই মহামুশকিলের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। জেলখানার মধ্যে দাড়ি-গোঁফ কামানোর পর এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার পর তোলা হয়েছিল ফোটোগ্রাফটি। সনাক্তকরণে একটু প্রাথমিক অসুবিধা দেখা গেলেও লোকটা আর্নেস্টোই বটে।

মানুষটি ছোটখাটো কৃশকায়। নার্ভাস চোখে মিটমিট করেও বার বার তাকাতে লাগল আমার পালিশকরা টেবিল আর অফিসের পুরোনো দেওয়ালের দিকে।

'মেয়েটাকে চেনো?' টেবিলের ওপর থেকে এলসার ছবি ঠেলে দিয়ে শুধোলাম আমি।

এক পলক ছবিটার দিকে তাকালে আর্নেস্টো।

তারপর জবাব দিলে মদে-ভাঙা গলায়—'নিশ্চয়। আমরা—আমরা খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু।' হলদে-হলদে দাঁত বার করে নার্ভাসভাবে একটু হাসবার চেষ্টা করল ও।

'এলসা যে মারা গেছে, এ খবর তুমি পেয়েছ কি?' প্রশ্নটা তিরের মতো ছুঁড়ে দিলাম ওকে লক্ষ্য করে।

বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে ওঠে আর্নেস্টোর চোখ।

'মরবার আগে তোমার সঙ্গে তার একচোট হাতাহাতি হয়েছিল—খুন হওয়ার একটু আগেই, তাই নয় কি?'

চুপ করে রইল আর্নেস্টো। অথবা মৃত্যুসংবাদ পেয়ে কথা বলার শক্তিও হারিয়ে ফেলল সে।

'কী জন্যে এ কাজ করলে আর্নেস্টো?'

'আমি? দিব্যি কেটে বলছি, আমি ওকে খুন করিনি...' কাশির ধমকে মাঝপথেই আটকে গেল বাকি কথাটা এবং তখনই দেখা গেল সে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত।

সামলে না নেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম আমি। তারপর আবার শুরু করলাম—'ঠিক আছে, ঠিক আছে, এবার আমি শুনতে চাই সব কিছু, গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত। এলসাকে তুমি কতদিন থেকে চিনতে? ঝগড়াই বা করলে কেন? সমস্ত বলো। বুঝেছ?'

সাগ্রহে মাথা নেড়ে সায় দিলে আর্নেস্টো। কাহিনিটা চটপট বলে ফেলার খুব ইচ্ছে দেখা গেল ওর মধ্যে। চার কি পাঁচ বছর হল এলসার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে তার। গত দু-বছর ওরা একসঙ্গে বাস করে এসেছে। কিন্তু ইদানীং ওর বিশ্বস্ততা সম্পর্কে সন্দেহ দানা বেঁধে উঠেছিল আর্নেস্টোর মনে। হপ্তা তিনেক আগে পুলিশের জালে ধরা পড়ে আর্নেস্টো। তারপর জেলের মধ্যেই কাটাতে হয়েছে কয়েকটা দিন।

জেল থেকে বেরিয়েই এলসার খোঁজ করতে লাগল ও। কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না ওকে। ও ভেবেছিল, নিশ্চয় অন্য কোনও ভিখিরির সঙ্গে সটকান দিয়েছে এলসা। তারপর কিন্তু এলসাকে আবার দেখতে পায় আর্নেস্টো। কিন্তু ওর অভিযোগ অস্বীকার করে এলসা। দারুণ ঝগড়া হয় দুজনের মধ্যে। তার বেশি কিছু নয়। এলসাকে খুন করেনি আর্নেস্টো।

শুধোলাম—'সোমবার রাতে কোথায় ছিলে তুমি? ওই রাতেই খুন হয়েছে এলসা।'

ঠোঁট চেটে নিলে আর্নেস্টো। বলল—'বন্দর অঞ্চলে ছিলাম। সারারাত সেইখানেই ঘুমিয়েছি আমি।'

'কেউ দেখেছিল তোমাকে? প্রমাণ করতে পারো তোমার কথা?'

'না, পারব বলে মনে হয় না আমার।'

'সে রাতে তাহলে এলসার ধারে কাছে যাওনি তুমি?'

'দিব্যি গেলে বলছি যাইনি।'

'ঠিক তো?'

'বেঠিক কিছু বলিনি সিনর মার্টিনেলি। ওই রাতে ওকে আমি দেখিইনি। একাজও আমি করিনি।'

আর্নেস্টোকে সেলের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দেওয়া ছাড়া করণীয় আর কিছুই ছিল না। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল, এই সে-ই লোক যাকে আমি খুঁজছি। ভিখিরিরা সবসময়ে জটলা পাকিয়ে বাস করে। সে রাতে যদি বন্দর অঞ্চলেই থাকত আর্নেস্টো, তাহলে সমশ্রেণির কেউ না কেউ ওকে ঠিকই দেখতে পেত। এবং সেক্ষেত্রে নিজে থেকেই ওর অ্যালিবি আমাকে জানিয়ে দিত আর্নেস্টো।

আর্নেস্টোই হত্যাকারী। কিন্তু কী করে তা প্রমাণ করা যায়? সন্দেহের অভিযোগ কাউকে যে ফাঁসিতে ঝোলানো যায় না, এ তথ্য আর্নেস্টো জানে। আদালতে হাজির করলে এই মস্ত সুবিধেটাই পেয়ে যাবে সে।

এর পর কিছুদিন ধরে অনেকভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক প্রশ্ন করেছিলাম আর্নেস্টোকে। যতই ওকে চাপ দিতে থাকি, ততই মনে হতে লাগল ও যেন বুঝতে পারছে যে অকাট্য কোনও প্রমাণ হাতে না নিয়ে স্রেফ সন্দেহের বশে জেরা করে চলেছি ওকে। এক এক দফা সওয়ালজবাব হয়ে যাবার পরে ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত অসভ্য হয়ে উঠতে লাগল আর্নেস্টো এবং দফায় দফায় আমিও ভেঙে পড়তে লাগলাম, রেণু রেণু হয়ে যেতে থাকে আমার মনোবল।

খুনের প্রায় দিন-দশেক পরে এক রাত্রে আর একবার শুরু করলাম আমার নিষ্ফল প্রচেষ্টা। শেষকালে যখন বুঝলাম আমার সমস্ত উদ্যমই নিরর্থক এবং কোনও মতেই পরিস্থিতির এতটুকু উন্নতিসাধন সম্ভব নয়, তখন কোটটাকে খামচে তুলে নিয়ে সিধে রওনা হলাম বাড়িমুখো। রীতিমতো নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছিলাম আমি। শরীর-মন ভরে উঠেছিল অপরিসীম অবসাদে।

আমার ছোট্ট ফ্ল্যাটের দরজায় চৌকাঠ পেরোনোর আগেই লক্ষ্য করলাম পালটে গেছে সমস্ত আবহাওয়া—রান্নাঘর থেকে ভেসে আসছিল ভালো ভালো খাবার রাঁধার সুগন্ধ। দরজা খুলতেই ময়দা মাখা দু-হাত বাড়িয়ে সাদরে অভ্যর্থনা জানালে আমার স্ত্রী। হাতের তালুতে চারু অধরোষ্ঠের চুম্বন তুলে নিয়ে আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে খুশি-উচ্ছল স্বরে বলে উঠল—'দু-এক মিনিটের মধ্যেই সব তৈরি হয়ে যাবে।'

'আমার খুব খিদে পায়নি।' আর্নেস্টোর ইস্পাত-কঠিন আত্মপ্রত্যয়ের কথা ভাবতে ভাবতে জবাব দিলাম আমি।

হেসে উঠল আমরা স্ত্রী, বলল—'টেবিলে খাবার এসে পৌঁছোনোর আগে পর্যন্ত চিরকালই ওই কথাই বলেছ তুমি।'

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লাম। দেখলাম, এক বোতল মদ তুলে নিয়ে একটা কেকের মিশ্রণের ওপর খানিকটা মদ ও ঢালছে। ঢালা শেষ হলে বোতলটা নামিয়ে রাখল ও। দেখলাম ওর ময়দা-মাখা তালুর পরিষ্কার ছাপ উঠে এসেছে বোতলটার ঘাড়ের কাছে।...হৃদয়রেখা আর আয়ুরেখা দুটি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে এসেছে ওপরে বোতলের মুখের দিকে।

আর একবার তাকালাম ছাপটার দিকে এবং তার পরেই বিদ্যুৎচমকের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল সবকিছু।

কোটটাকে ঝপ করে তুলে নিয়ে এমনভাবে বিকট চিৎকার করে উঠেছিলাম যা শুনলে মনে হত যেন একটা উন্মাদ তারস্বরে সম্বোধন করছে তার বউকে।

'এখুনি ফিরে আসছি,' বলেই বোঁ করে উধাও হয়ে গেলাম রান্নাঘর থেকে।

পিছু পিছু এল না আমার স্ত্রী। এমনকী ডিনার ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার অনুযোগ নিয়ে উষ্মাও প্রকাশ করল না। বহুদিন ধরে ঘর করতে হয়েছে তাকে গোয়েন্দার সঙ্গে—তাই এসব তার গা-সওয়া।

আমি তিরবেগে ফিরে চললাম অফিসে। কেসটার প্রমাণ রয়েছে সেইখানেই।

ঠোঁটের কোনে উপহাসের হাসি ঝুলিয়ে এল আর্নেস্টো। কিন্তু আমার চোখের দৃষ্টি দেখেই এ হাসি মিলোতে বিশেষ দেরি লাগল না।

শান্তস্বরে বললাম—'খুনের চার্জ আনছি আমি তোমার বিরুদ্ধে।'

বলে, টেবিলের ড্রয়ার থেকে বার করলাম কাশাকার বোতলটা—যে বোতলটা দিয়ে পরপারে পাঠানো হয়েছে এলসাকে।

বোতলটা দেখামাত্র আর্নেস্টো বুঝলে তার বরাত মন্দ। আমতা-আমতা করতে থাকে ও। 'না, না, আমি ইচ্ছা করে করিনি ও কাজ। ভুল হয়ে গিয়েছিল।'

আর একটা শব্দও সহ্য করার মতো মনের অবস্থা আমার ছিল না। এক ধমকে ওকে চুপ করিয়ে দিয়ে বললাম—'হ্যাঁ, ভুলই বটে, তোমারই ভুল। বোতলটাকে ওখানে ফেলে যাওয়াটাই হয়েছে মহাভুল। বোতলের ওপর তালুর ছাপটা দেখে প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম ও ছাপ এলসার।

'জিনিসটা আরও লক্ষ্য করা উচিত ছিল আমার। তালুর লম্বা লম্বা রেখাগুলো নীচের দিকে নামতে নামতে কাছাকাছি চলে এসেছে। তার মানে এই যে, বোতলটা যার হাতে ছিল, সে মদ ঢালবার জন্যে বোতল ধরেনি, ধরেছিল উল্টোভাবে হাতিয়ার হিসেবে, ঠিক এইভাবে।'

মুগুর ভাঁজার মতো বোতলটাকে এক পা ঘোরাতেই সে রাতের স্মৃতি হু-হু করে ভাসিয়ে দিল আর্নেস্টোর মনের দুকূল। শুরু হল দয়াভিক্ষার পালা। এলসার সঙ্গে মদ্যপান করার সময়ে নাকি কথা কাটাকাটি শুরু হয় ওর সঙ্গে আর্নেস্টোর। ঝগড়ার বিষয় সেই একই—এলসার ওপর সন্দেহ। তখনই, 'বোতল দিয়ে ওর মাথায় দড়াম করে এক ঘা বসিয়ে দিয়ে পালিয়ে যাই আমি'—স্বীকার করলে আর্নেস্টো।

আর্নেস্টার তালুর ছাপের সঙ্গে বোতলের ছাপ মিলিয়ে দেখলাম। না দেখলেও চলত। কিন্তু নিয়মের খাতিরে এটুকু করতে হল। দেখলাম, অবিকল মিলে গেল দুটি ছাপ।

কেসের পরিসমাপ্তি শুনে কিন্তু অবাক হয়ে গিয়েছিল আর্নেস্টো। বিচারপতির মুখে যাবজ্জীবন কারাবাসের দন্ডাজ্ঞা শুনেও কিন্তু যতখানি বিচলিত হওয়া উচিত ছিল, তার অর্ধেকও হয়নি আর্নেস্টো। কারণ কী জানেন? ওকে আমি বলেছিলাম, এলসা কোনওদিনই বিশ্বাসঘাতকতা করেনি তার সঙ্গে। আর্নেস্টো জেল খেটে বেরিয়ে আসার পর এলসাকে খুঁজতে গিয়ে তাকে পায়নি। কেননা, এলসাও তো তখন ভিক্ষুকবৃত্তির অপরাধে শ্রীঘরে চালান হয়েছে । আর্নেসেটা ভেবেছিল এলসা বুঝি কোনও প্রেমিকের সঙ্গে ফুর্তি লুটতে গেছে—আসলে সে তখন ছিল পুলিশেরই হেফাজতে।

চার বছর পরে আজ আমার শুধু বয়সই বাড়েনি, রিও-ডি-জেনেরিও-র সি আই ডি-র চিফ হিসেবে নতুন খেতাবও পেয়েছি। কিন্তু আজও আমি মনে করতে পারি সেই রাতটির কথা যখন বাড়ি ফিরে আসার পর দেখেছিলাম ডিনার সাজিয়ে বসে রয়েছে আমার স্ত্রী। খাবার যে এত সুস্বাদু হতে পারে, তা আগে জানতাম না। স্ত্রীর পাকা হাতের কেক-তৈরির সূত্র-কাহিনি যখন বললাম, তখন তো হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ল ও। হাসিমুখে গিন্নি সেদিন বলেছিল—'অফিসে যে সময়টা কাটাও, তার চাইতে বেশি সময় যদি আমার রান্নাঘরে খরচ করো, তাহলে হয়তো দেখা যাবে আরও অনেক কেস সমাধান করতে পারছ তুমি।'

** আলফোনসো মার্‌তিনেল্‌লি (ব্রাজিল) রচিত কাহিনি অবলম্বনে।*

বাদালোনা-র সেই লাশটি

ভুল যত সামান্যই হোক না কেন, তা যে সব সময়েই বুঝতে পারা যায় না—তা নয়। কিন্তু কঠিন হল এই ছোট্ট ভুল শুধরোনো। বিশেষ করে আপনি যদি সত্যান্বেষী অপরাধবিশেষজ্ঞ হন, আর রহস্য সমাধানের গুরুভার যদি চাপানো হয় আপনার কাঁধে—তাহলে এই ছোট্ট ভুলই যে শেষকালে কি মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে, তা শুধু আপনিই হাড়ে হাড়ে টের পান। তদন্তের শুরুতেই যদি কোনওরকমে ভুলপথে চালিয়ে দেওয়া যায় আপনাকে, তাহলেই তুমুল বিপর্যয়ের মাঝে পড়ে সম্পূর্ণ বিপন্ন হয়ে পড়তে আপনি বাধ্য।

প্রথম থেকেই আমার কেন জানি মনে হয়েছিল বাদালোনার খুনের কেসটাতে রহস্য রয়েছে প্রচুর। আপাতদৃষ্টিতে যত সরল মনে হয়েছিল, তত সরল নয় কেসটি। সমস্ত হত্যাপর্বটা এমনই গোলমেলে যে মেজাজ খিঁচড়ে গিয়েছিল আমার। খবরের কাগজে বর্ণিত লোমহর্ষক নাটক হিসাবেই প্রথম শুরু হয়, কাহিনি। স্বভাবমতো সাংবাদিকরা দিব্বি চাঞ্চল্যকরভাবেই পরিবেশন করেছিল খবরটা। কিছু কিছু আবছা ইঙ্গিত আর সম্ভাবনাও উল্লেখ করতে ভোলেনি। ১৯৩২ সালের মার্চ মাসের শেষাশেষি শুরু হয় এই সংবাদ-পত্র নাটকের। বাদালোনার একটা ভিলায় মাটির নীচে একটি যুবতী মেয়ের লাশ পাওয়া গিয়েছে। বাদালোনা অবশ্য বার্সিলোনার কাছেই। সম্ভবত মাসখানেক আগে খুন করা হয়েছিল মেয়েটিকে। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার করা হয় তার বিকৃত দেহ। মুখ দেখে জানার উপায় ছিল না তার প্রকৃত পরিচয়। কিন্তু এইটুকু বোঝা গিয়েছিল যে বছর তিরিশ হবে তার বয়স।

বাড়িটা একতলা। মালিকের নাম অ্যান্তোনিও ক্যারিরা জানকোসা। মাস তিনেক আগে আর্জেন্টিনার এক ভদ্রলোককে বাড়িটা ভাড়া দিয়েছিলেন তিনি। ভদ্রলোকের নাম অরিলিও মার্তিনেজ। নিজেকে আর্জেন্টিনার বাসিন্দা বলে দাবি করলেও আসলে তিনি ছিলেন স্পেনের অধিবাসী।

লাশ পাওয়ার একমাস আগে এই ভদ্রলোকই বাড়ির চাবি মালিকের হাতে তুলে দিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যান। দিনকয়েক পরে ঘরদোর তদারক করতে এলেন জানকোসা। তখনই কীরকম একটা গন্ধ পেলেন উনি। শুধু তাই নয়। লক্ষ্য করলেন মেঝের কয়েকটা টালিও আলগা হয়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের শরণ নিলেন জানকোসা। ম্যাজিস্ট্রেট হুকুম দিলেন মেঝের টালি সরিয়ে পরীক্ষা করা হোক। মাটি খুঁড়তেই পাওয়া গেল মেয়েটার দেহ। একটা থলির মধ্যে হাত-পা বাঁধা লাশটা ঠেসে সযত্নে সেলাই করে দেওয়া হয়েছিল মুখটা।

ড্রেসিং গাউন ছাড়া আর কিছুই ছিল না মেয়েটির পরনে। খবরের কাগজের সবজান্তারা লিখেছিল, গলা টিপে অথবা মাথায় চোট মেরে জীবনদীপ নিভিয়ে দেওয়া হয়েছিল হতভাগিনীর। লাশ পরীক্ষা করে ডাক্তার বললেন প্রায় তিরিশ বছর তার বয়স।

এখনও মনে পড়ে কেসটা হাতে নেওয়ার পর বাদালোনায় গিয়ে কি পরিমাণে দমে গিয়েছিলাম আমি। অল্প কয়েকটি শহরতলী ভিলা দিয়ে গড়ে-ওঠা অঞ্চলটিতে জীবনের চঞ্চল স্রোতস্বিনী যেন হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এরকম নিঝুম নিশ্চুপ জায়গা মোটেই ভালো লাগে না আমার। বিশেষ করে কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না খুন যেখানে হয়েছে, সেই ভিলাটিকে। পূতিগন্ধে ভরপুর বাতাসে যেন দম আটকে আসতে চায়। ঘরের মেঝেতে বিশাল একটা গর্ত দেখলাম। লাশটা থলিতে পাওয়া গিয়েছিল এই ঘর থেকেই।

তন্নতন্ন করে বাড়ি তল্লাস করে একগাদা পরিধেয়, একটা চশমা এবং একটা হাতব্যাগ জড়ো করলাম আমি, কতকগুলো পোশাকে রক্তের দাগ লেগেছিল। বলা-বাহুল্য জিনিসগুলো নিহত মেয়েটিরই। সারা

তল্লাটে দারুণ গুজব ছড়িয়ে গিয়েছিল খুন যেই করুক না কেন, এই তার প্রথম খুন নয়। পাড়াপড়শীদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে একটু বুদ্ধি খরচ করলেই পুলিশের কর্তারা এই 'মৃত্যু-ভবন' থেকে আরও অনেক লাশ আবিষ্কার করতে পারবে। গুজবগুলো যে নেহাতই গুজব এবং ভিত্তিহীন, তা না বললেও চলবে। সেই কারণেই প্রথমেই বলে নিয়েছি আমি কেসটার প্রকৃত রহস্য ধরতে না পারার ফলেই এতখানি জটিল হয়ে উঠেছিল এই তদন্ত পর্ব।

জটিলতা আরও বৃদ্ধি পেল শবব্যবচ্ছেদ করার পর। তাড়াহুড়ো করে কোনওরকমে ওপরে-ওপরে কর্তব্য শেষ করলেন ডাক্তার। মেয়েটির বয়স পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে, তথ্য পেলাম তাঁর কাছ থেকেই। ফলে, ওই বয়সের অনেকগুলি মেয়ের নাম পাওয়া গেল। খামোকা খানিকটা সময় নষ্ট করলাম তাদের প্রত্যেকের হদিশ বার করতে। শেষকালে দেখা গেল প্রত্যেকেই জলজ্যান্ত জীবিত।

হত্যা-রহস্য সমাধানে একটা মস্ত বড় বিষয় হচ্ছে মোটিভ অর্থাৎ হত্যার উদ্দেশ্য। প্রত্যেক গোয়েন্দাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মোটিভ নির্ণয় করার জন্যে আদাজল খেয়ে উঠে-পড়ে লাগে। কিন্তু এদিক দিয়েও আমি অসহায়। কেননা, খুনের আগে অরিলিও মার্তিনেজের জীবন সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গ জানতাম না আমি। মাস দুয়েকের জন্যে ভিলায় আস্তানা পেতেছিলেন ভদ্রলোক। তারপর আরও মাসদুয়েক কেটে গেছে, নতুন কোনও ভাড়াটে বসাননি তিনি বাড়িতে। পাড়াপড়শীদের কাছে শুনলাম সন্ধের অন্ধকার না নামলে ভদ্রলোককে বাইরে বেরোতে দেখা যেত না। দেখতে শুনতে যুবাপুরুষের মতোই। মৃদুস্বরে বড় সুন্দর কথাবার্তা বলে চিত্তজয়ের গুণ ছিল তাঁর। কৃশকায়। উচ্চতাও তেমন কিছু নয়। কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছদের দিক দিয়ে ফুলবাবুটির মতো সেজেগুজে থাকতেন। চেহারার ওপর যে বিলক্ষণ যত্ন ছিল মার্তিনেজের, তা তাঁকে দেখলেই বোঝা যেত।

বাড়ির লিজে সই দেওয়ার সময় আত্ম-পরিচয় দেওয়া আইডেনটিফিকেশন কার্ডটি সংলগ্ন করে রেখেছিলেন মার্তিনেজ। এই কার্ড পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলাম অনেক যত্ন নিয়ে সই করেছেন ভদ্রলোক। তাইতেই আমার আর তিলমাত্র সন্দেহ রইল না যে এ নাম তার পিতৃদত্ত নয়—ছদ্মনাম। আমি জানি অনেকে মনে করেন Graphology অর্থাৎ হাতের লেখা পরীক্ষা করে চরিত্র নিরূপণের শাস্ত্রে নাকি কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। তাঁদের সঙ্গে এ সম্পর্কে একমত নই আমি। ঠিকানা ছাড়া কার্ডে যা কিছু তথ্য পাওয়া গেল, তা ডাহা মিথ্যা। ঠিকানা দেওয়া ছিল ১০ নং ক্যাল্লি দ্য টলার্স, বার্সিলোনা। গেলাম সেখানে। বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল যে স্ত্রীলোকটির ওপর, তাকে জিজ্ঞাসা করলাম অরিলিও মার্তিনেজ বলে কেউ এ-বাড়িতে থাকতেন কিনা? বাড়ির মালিকের কাছে আমাকে নিয়ে গেল সে এবং তার কাছেই জানলাম অরিলিও মার্তিনেজের নাম এ-বাড়ির কেউ এর আগে শোনেনি। কিন্তু সহজেই হাল ছাড়বার পাত্র নই আমি। নামটা যে আসল নয়, তা তো আমি জানতামই। কাজেই, মার্তিনেজের চেহারার বর্ণনা দিলাম এবার। কাজ হল তাতে। বাড়িওলা বললেন—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, চিনি বইকি। বেঞ্জামিন বালসোনাকেই তো এই রকম দেখতে। আমার এই বাড়িতেই কিছুদিন ছিলেন ভদ্রলোক। বড় অল্প কথাবার্তা বলতেন। তাছাড়া বাঁধাধরা জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন না তিনি—বড় বিশৃঙ্খল ছিল তাঁর প্রকৃতি। মাঝে-মাঝে দারুণ টানাটানি চলত। তবে একবার শুনেছিলাম, বার্সিলোনাতে নাকি তাঁর একটা ভিলা আছে।'

নথিপত্র ঘেঁটে দেখা গেল পয়লা নম্বরের জোচ্চোর এই বালাসানো। অনেকগুলো শহরের পুলিশ মহলে বিলক্ষণ নামডাক আছে তার। দূরন্ত জুয়ারি সে, হাতের মারপ্যাঁচেও মহা ওস্তাদ। এ ধরনের লোকদের জীবনে অভাব অনটন আর স্বাচ্ছল্যের যেমন দ্রুত পরম্পরা দেখা যায়, বালসানোও তার ব্যতিক্রম ছিল না। বালসানো আর অরিলিও মার্তিনেজ যে এক এবং অভিন্ন পুরুষ, তা প্রমাণ করতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। ক্যাল্লি দ্য টলার্সের বাড়িওলা আর বাদালোনার প্রতিবেশীদের পুলিশ ফোটোগ্রাফ দেখাতে তারাও একবাক্যে সমর্থন জানাল আমার সিদ্ধান্তকে।

তদন্ত-পর্বের এই পর্যায়ে পৌঁছে অনায়াসেই বালসানোর নামে গ্রেপ্তার পরোয়ানা বার করে দিতে পারতাম। কিন্তু নিহত মেয়েটিকে তখনও শনাক্ত করে উঠতে পারিনি আমি। কাজেই চট করে কিছু করা সঙ্গত মনে করলাম না। এই সময়ে খবর পেলাম, ইউলেলিয়া মাইনো নামে একজন বিবাহিত মেয়ের সঙ্গে বার্সিলোনাতে প্রায় দেখতে পাওয়া যেত বালসানোকে। গোলগাল নধরকান্তি চেহারা মেয়েটার। চুলের রং কুচকুচে কালো। ক্যাল্লি দ্য লা ক্যাডেনাতে একসঙ্গে একটি ঘরে কিছুদিন ছিল ওরা দুজনে। তারপর উধাও হয়ে যায় বালসানো এবং মেয়েটি। এবং কেউ জানে না বর্তমানে পৃথিবীর কোনও মুলুকে আস্তানা নিয়েছে দুই মূর্তিমান।

আরও খবর পেলাম, ইউলেলিয়া তার সৎমায়ের সঙ্গে গ্র্যানোলর্স-এ থাকত। সঙ্গে সঙ্গে হাজির হলাম সেখানে। বিমাতা বাড়িতেই ছিলেন। আমাকে দেখেই না জানি কি হাঙ্গামার সূত্রপাত হয়েছে মনে করে রীতিমতো সঙ্কিত আর উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। এই বাড়িতেই একটা চিঠির কয়েকটা ছিন্ন অংশ পেলাম। জোড়া লাগাতেই পেলাম পুরো চিঠিটা। ইউলেলিয়ার চিঠি। একজন বন্ধুর সঙ্গে বার্সিলোনা ত্যাগ করে যাচ্ছে সে। বিমাতার কাছে তার অনুরোধ তিনি যেন পড়া শেষ হয়ে গেলেই চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলেন। চিঠির তারিখ ছিল ২৩ মার্চ, ১৯৩২। বাদালোনায় মৃতদেহ আবিষ্কারের ঠিক দুদিন আগেকার তারিখ।

এ-কেসের একটা অত্যন্ত দরকারি সূত্র হচ্ছে বালসানো-ইউলেলিয়া ঘটিত প্রণয় উপাখ্যানটি। কিন্তু তার চাইতেও দরকারি যা, তা হল খুনে পাষণ্ডটার নাম ধাম জানা। শবব্যবচ্ছেদ হওয়ার পর যে রির্পোট পেয়েছিলাম তা আমার কাছে অন্তত সন্তোষজনক মনে হয়নি। কিন্তু একগুঁয়ে ডাক্তার কিছুতেই তাঁর রিপোর্ট শুধরোতে রাজি হলেন না। মেয়েটির বয়স নাকি কোনওমতেই তিরিশের বেশি নয়—ছিনেজোঁকের মতো এই তথ্যকেই আঁকড়ে রইলেন ভদ্রলোক। ভেবে দেখলাম ক্যাল্লিন দ্য টলার্সের বোর্ডিং হাউসে গেলে অনেক জটিল প্রশ্নের উত্তর আমি পেলেও পেতে পারি। তাই আবার গেলাম বাড়িওলার সঙ্গে এ সম্পর্কে আলোচনা করার জন্যে।

এমি ল্যাঙ্গার নামে একজন জার্মান স্ত্রীলোকের সঙ্গে কিছুদিনের জন্যে এ-বাড়িতে সংসার পেতেছিল বালসানো। প্রায় ষাট বছর বয়স এমি ল্যাঙ্গারের। বিধবা। স্বামী ছিলেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। অবস্থা ভালোই ছিল তাঁর। আসক্তি মদ আর অন্যান্য মাদক দ্রব্যে। বিস্তর অর্থ ছাড়াও অনেক হিরে-জহরৎ ছিল নাকি তার গহনার পেঁটরায়। চলে যাওয়ার সময়ে সব কিছুই নিয়ে গিয়েছিল সে ফেলে গিয়েছিল শুধু একটা কাকাতুয়া। দিব্যি জার্মান বলতে পারে পাখিটা। দেখলাম, মনিবানীর আকস্মিক অন্তর্ধানে মুষড়ে পড়েছে বেচারি। খুঁজে পেতে এমন একজনকে বার করলাম যে জার্মান কথা কইতে পারে। তাকে নিয়ে এলাম কাকাতুয়ার সামনে। ওদের কথার্বাতা থেকে নতুন কোনও তথ্য জানতে পারব, এই আশা ছিল আমার। কিন্তু এবারও আশাহত হতে হল আমাকে।

কিন্তু এমি লাঙ্গারই যে বালসানোর হাতে খুন হয়েছে এবং বাদালোনার সেই লাশটি যে তারই সে বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল আমার। বাদালোনার ভিলাতে পাওয়া কিছু আসবাবপত্র আর বই যে এমি ল্যাঙ্গারেরই, তাও প্রমাণ করতে মোটেই বেগ পেতে হয়নি আমাকে। খুঁজতে খুঁজতে বার্সিলোনায় একটি দোকানের সন্ধান পেলাম। পুরোনো জিনিস খরিদ করত দোকানদার। এমি ল্যাঙ্গারের কিছু পোশাক উদ্ধার করলাম দোকান থেকে। বালসানোই বিক্রি করে ছিল। কিন্তু আসল কাজটাই যে তখনও বাকি। যেমন করেই হোক আমাকে প্রমাণ করতেই হবে যে লাশটা এমি ল্যাঙ্গারেরই এবং কোনও তরুণী মেয়ের নয়। এ ব্যাপারে আমার ওপর কিঞ্চিৎ কৃপাবর্ষণ করলেন ভাগ্যদেবী। হঠাৎ খবর পেলাম, এমির পায়ে একবার একটা দগদগে ঘা হয়েছিল। অস্ত্রোপচার করে তবে সুস্থ হয়েছিল সে। ভেবে দেখলাম এ খবর যদি নির্ভেজাল হয়, তাহলে লাশটা আর একবার পরীক্ষা করলেই মুশকিল আসান হয়ে যাবে। তৎক্ষণাৎ সে ব্যবস্থা হল। অপারেশনের চিহ্নও পাওয়া গেল পায়ে। ডাক্তারও শেষ পর্যন্ত সুর পালটে স্বীকার করলেন, মেয়েটার বয়স তিরিশ নয়, ষাট এবং সে এমি ল্যাঙ্গারই বটে।

এবার বালসানো আর তার নতুন প্রণয়িনীকে জালে ফেলতে হবে। কাগজে কাগজে ছেপে দিলাম ওদের ছবি আর দৈহিক বর্ণনা। পরিশেষে মাদ্রিদের লাভেপিসু কোয়ার্টারে একটা বোর্ডিং হাউসে গ্রেপ্তার করা হল দুজনকে যে ঘরে এমি ল্যাঙ্গারকে পুঁতে রেখে ছিল, তার নকশা আর খবরের কাগজে প্রকাশিত খুনের বিবরণটা নিজের কাছেই রেখে ছিল বালসানো।

গ্রেপ্তার হওয়ার পর এতটুকু চঞ্চলতা দেখা গেল না বালসানোর ধীর স্থির মুখে। ওর বিরুদ্ধে কেসটা যে ভাবে দাঁড় করিয়েছিলাম তাতে ফাঁক ছিল না কোথাও। কিন্তু অম্লানবদনে ও সব অভিযোগ অস্বীকার করে বসল। এমি ল্যাঙ্গারকে নাকি সে কস্মিনকালেও দেখেনি। এবং এ জঘন্য হত্যা তার নয়, তারই জানাশুনা আর একজন অপরাধীর। এমি ল্যাঙ্গার নিহত হওয়ার সময়ে শ্রীঘরে ছিল তার এই খুনে বন্ধুটি—এ খবর শুনেও তিলমাত্র বিচলিত হল না ও। ওর মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্যে বেশ কয়েকবার অকুস্থলে নিয়ে গেলাম ওকে। প্রতিবারই বিন্দু বিন্দু ঘামে ওর বিবর্ণ মুখ ভরে উঠলেও কিছুতেই স্বীকার করানো গেল না যে সেই হত্যাকারী।

ভিলার মধ্যে কিন্তু এমি ল্যাঙ্গারকে খুন করা হয়নি। ক্যাল্লি দ্য টলার্সের বোর্ডিং হাউস ছেড়ে বার্সিলোনার ক্যাল্লি দ্য রোজেনল-এ একটা বাড়িতে আস্তানা নিয়েছিল ও। খুনের দিন-তিনেক বাদে বালসানোকে একটা বিশাল সুটকেস বয়ে নিয়ে যেতে দেখেছিল একজন মেয়ে কুলি। বিশ্রি দুর্গন্ধ বেরুচ্ছিল ভেতর থেকে। জার্মান স্ত্রীলোকটি অসুস্থ হয়ে পড়ার ফলে সে নাকি একাই ফিরে যাচ্ছে এই সাফাই গেয়েছিল বালসানো।

নাক সিঁটকে শুধিয়েছিল মেয়ে-কুলিটা—কিন্তু ওই সুটকেসটা থেকে ও রকম যাচ্ছেতাই গন্ধ বেরুচ্ছে কেন বলুন তো? কী আছে ওতে?'

'সসেজ—একদম খারাপ হয়ে গেছে কিনা তাই,' চটপট জবাব দিয়েছিল বালসানো।

এই সুটকেসটাই ভিলাতে নিয়ে গিয়েছিল সে। ভেতরে ছিল হতভাগিনী এমি ল্যাঙ্গারের লাশ। সুটকেসটা পরীক্ষা করার পর রক্তের দাগ পাওয়া গেল ভেতরে। পেরেকে লেগে থাকা মেয়েদের পোশাকের সুতোও পেলাম। খুনের সূত্রপাত হয় একটা ঝগড়া থেকে। বালসানোর ধারণা ছিল কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আছে এমি ল্যাঙ্গারের। কিন্তু যখন সে দেখলে সব ভুয়ো—অত টাকাই নেই তার, তখন সংহার মূর্তি ধারণ করল সে। মদে চুর চুর হয়েছিল এমি। কথা কাটাকাটি হতে হতে ফস করে সে খামচে ধরে বালসানোর মুখ। তৎক্ষণাৎ ছুরি বাগিয়ে ধরে বালসানো এবং পরমুহূর্তে একটি মাত্র মোক্ষম টানে দু-টুকরো করে দেয় এমির কণ্ঠনালী। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসে রুধির স্রোত। আঘাতটা যে মারাত্মক, তখন বুঝতে পারেনি বালসানো। তাই গোটা দুই মোজা এমির গলায় পেঁচিয়ে রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করতে থাকে ও। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই নিষ্প্রাণ হয়ে যায় এমির দেহ। নির্বিকারভাবে এবার লাশ সরানোর আয়োজনে তৎপর হয়ে ওঠে বালসানো। স্বল্প পরিসরে দেহটাকে যাতে ঠেসে নিয়ে যাওয়া যায়, তাই আরও ক্ষতবিক্ষত করে নেয় লাশটা। এই কারণেই বিকৃত দেহটাকে পুলিশের হাতে পড়ার পর চুল চেরা পরীক্ষা না করার ফলে ঠিক কীভাবে খুন হয়েছিল এমি, তা জানা যায়নি অনেকদিন পর্যন্ত।

এমিকে কবর দেওয়ার জন্যে ভিলার বাগানটাই প্রথমে মনোনীত করেছিল বালসানো। কিন্তু যে রাতে কাজ সারবে বলে স্থির করলে সে, সেই রাতেই একজন চৌকিদার তাকে দেখতে পায়। কাজেই পরিকল্পনা পরিবর্তন করে ফেলল বালসানো। ঘরের মেঝেতেই সমাহিত করা হল এমি ল্যাঙ্গারকে। বার্সিলোনার ক্রিমিন্যাল কোর্টে খুনের অপরাধে বিচার শুরু করা হল তার আর ইউলেলিয়া মেইনের। কিন্তু তখনও অবিচল বালসানো। দৃঢ়কণ্ঠে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করার পর বারবার এই বলে সে হুঁশিয়ার করে দিলে আদালতকে যে নির্দোষীকে অবিচারের যাঁতায় ফেললে প্রত্যেকেরই সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। মুক্তি দেওয়া হল ইউলেলিয়াকে। কিন্তু খুন আর ডাকাতি করার জন্যে বাইশ বছর এবং দলিল দস্তাবেজ জাল করার জন্যে আরও দু-বছর সশ্রম কারাবাসের শাস্তি দেওয়া হল খুনে বদমাশ বেঞ্জামিন বালসানোকে।

১৯৩৬ সালে শুরু হয় স্পেনের গৃহযুদ্ধ। বালসানো তখনও জেলে। যুদ্ধের দুর্যোগ বার্সিলোনার ওপর ঘনিয়ে আসতেই অন্যান্য কয়েদিদের সঙ্গে তাকেও মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ১৯৫৫ সালের আবার নতুন অপরাধের জন্যে তাকে পাঠানো হয় কারাকপাটের অন্তরাল।

** ডন ভিসেনতি রেগুয়েনগো (মাদ্‌রিদ, স্‌পেন) রচিত কাহিনি অবলম্‌বনে।*

মধ্যরাতের মস্কো

ব্যক্তিগত শোকাবহ ঘটনার গল্প দিয়ে দৈনিকের পাতা ভরাতে অভ্যস্ত নই আমরা রাশিয়ানরা। অনেকরকম দুঃখময় দুর্ঘটনা ঘটতে দেখা যায় অনেকের অদৃষ্টে। বহু হতভাগ্য নর-নারী নিছক উচ্চাশা অথবা তীব্র অনুভূতির তাড়নায় হরেকরকম অপরাধও করে ফেলে। ফলাও করে এই সব কাহিনির প্রচার আমরা করি না। এর চাইতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়েই মাথা ঘামাতে হয় আমাদের। শুধু আমাদের জাতভাইদের দিক দিয়েই নয়, পৃথিবীর সব দেশের বাসিন্দাদের পক্ষেই গুরুত্বপূর্ণ এই সব সমস্যা। অনেক সমালোচকদের মতে ব্যষ্টির প্রতি অবহেলা থেকেই নাকি আমাদের এই ধরনের মতবাদ বা দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব হয়েছে। প্রকৃত সত্যটুকু কিন্তু ঠিক তার বিপরীত। আমরা বিশ্বাস করি, সামান্য কয়েকটা চোর-ছ্যাঁচোড়, খুনে-গুন্ডা, জালিয়াত-বদমাশ আর নারীধর্ষণকারীদের তৎপরতা আর তাদের সমুচিত দণ্ডদানের সমস্যাগুলোকে হারিয়ে যেতে দেওয়া উচিত নয়।

সে যাই হোক, সারা দুনিয়ার পুলিশ সহকর্মীর সঙ্গে আমার কর্মজীবনের সবচেয়ে মনে রাখবার মতো কাহিনি বলবার সুযোগ যখন আমাকেও দেওয়া হয়েছে, তখন সে সুযোগের পরিপূর্ণ সদব্যবহার আমি করব। শুনুন তবে এই ঘটনার বৃত্তান্ত।

১৯৫৫ সালের আগস্টের শেষাশেষি গ্রীষ্মের সেই রাতটার কথা এখনও ছবির মতোই মনে পড়ে আমার। রাতের তমিস্রা গাঢ় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দিনের দাবদাহও কমে এসেছিল অনেকখানি। আমার অধীনস্থ মস্কো মেট্রোর একজন ইন্সপেক্টরের ডিউটি শেষ হওয়ায় বাড়ির দিকে রওনা হয়েছিল। আর্কাডি গুরেলভিচ মানুষটি বড় ভালো। কাজ-কর্মে তার জুড়ি মেলা ভার, কমরেড হিসেবেও চমৎকার। প্রতিবেশী হিসেবে এই রকম মানুষকেই সবাই পেতে চায় যে যার পল্লীতে। একই ফ্ল্যাট-বাড়িতে থাকতাম আমরা। পাঁচতলার আর্কাডি আর দোতলায় আমি সপরিবারে। একই আমোদ-প্রমোদ কেন্দ্রে খেলাধুলো করত আমাদের ছেলেমেয়েরা, একই স্কুলে পড়তে যেত সবাই দল বেঁধে। সভা-সমিতিতে, সিনেমা-থিয়েটারে, পাবলিক স্কুলের সামাজিক অনুষ্ঠানে একই সঙ্গে যেতাম আমরা দুই পরিবার।

বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স আর্কাডির। দুনিয়ায় দুটি জিনিস তার দারুণ প্রিয় একটি কম্যুনিস্ট পার্টি এবং অপরটি ফুটবল খেলা। আগস্টের সেই রাতে সাবওয়ে স্টেশন থেকে বেরিয়ে যখন সে বাড়ির পথ ধরল, তখন ঘড়ির কাঁটা মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে। রাস্তার আলোগুলো অর্ধেক নিভিয়ে ফেলা হয়েছে। আলো অন্ধকার মিশানো জনহীন পথঘাটে প্রাণী বলতে সে তখন একা।

আচম্বিতে রাস্তার মোড় থেকে বাঁক নিয়ে টায়ারের তীব্র আর্তনাদ তুলে পথ ছেড়ে ফুটপাতের ওপর বেগে ধেয়ে গেল ছোট্ট একটা মোটরকার। সামনেই পড়ল আর্কাডি। এমনই প্রচণ্ড বেগে তার ওপর এসে পড়ল গাড়িটা যে আর্কাডির দেহটা ছিটকে গিয়ে আছড়ে পড়ল সামনের উইন্ডস্ক্রিনের ওপর—বলা বাহুল্য সেই প্রচণ্ড সংঘাতে স্ক্রিনের কাচও অটুট রইল না।

ধরা পড়ার ভয়ে গাড়ির গতি কমানো দূরে থাকুক, ক্ষিপ্তের মতো গাড়ি হাঁকিয়ে ছুটে চলল ড্রাইভার। সাংঘাতিকভাবে জখম আর্কাডির অচেতন দেহটা কিছু দূর পর্যন্ত গাড়ির সামনেই লেপটে ছিল, তারপর তা ঠিকরে পড়ল রাস্তার ওপর আমাদেরই ফ্ল্যাটবাড়ির প্রায় সামনেই। উল্কার মতো বেগে উত্তরদিকের শহরতলী অঞ্চলে দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল বেপরোয়া গাড়িটা।

টায়ারের কর্কশ আর্তনাদের পরেই ধপ করে একটা চাপা শব্দ এবং পরক্ষণেই কাচভাঙার ক্ষীণ ঝনঝন আওয়াজ শুনেই আশপাশের বাড়ি থেকে জনাছয়েক স্ত্রী-পুরুষ বেরিয়ে এসেছিল বাইরে। রাস্তার ওপর আহত আর্কাডিকে তারাই পড়ে থাকতে দেখে। একজন তখুনি আমার ফ্ল্যাটে দৌড়ে গিয়ে উত্তেজিতভাবে খবর দিলে যে সিরিয়াস অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে কমরেড গুরেলভিচের। তৎক্ষণাৎ ফোনে অ্যাম্বুলেন্স পাঠানোর নির্দেশ দিলাম। স্থানীয় পুলিশ স্টেশনেও খবর দিতে ভুললাম না।

বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি রাস্তার ওপরেই পড়ে রয়েছে আর্কাডি। একজন একটা ভারী কম্বল দিয়ে ঢেকে দিয়েছিল তার সর্বাঙ্গ। এমনই নিথর হয়ে শুয়েছিল ও যে প্রথমে ভাবলাম বুঝি বৃথা চেষ্টা, ও দেহে আর প্রাণ নেই। কিন্তু ঝুঁকে পড়তেই লক্ষ্য করলাম খুব ক্ষীণভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে—তবে চেতনার কোনও লক্ষণ দেখলাম না রক্তাক্ত দেহে। মস্ত বড় একটা ক্ষতচিহ্ন দেখলাম মাথার খুলিতে। গা শিউরে ওঠে সেই বীভৎস চোট দেখলে।

মিনিট কয়েকের মধ্যে অ্যাম্বুলেন্স এবং অনেকগুলো পুলিশের গাড়ি উত্তেজিত এবং উদ্বিগ্ন প্রতিবেশীদের ভিড় ঠেলে পৌঁছে গেল দুর্ঘটনাস্থলে। স্বামীর নেতিয়ে পড়া দেহ স্ট্রেচারে উঠিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে তোলার সময় হাউ-মাউ করে কাঁদতে লাগল আর্কাডির বউ।

অশ্রুসিক্ত সে কি কান্না। একজন মহিলা সযত্নে একটা শাল জড়িয়ে দিলে তার গায়ে। যথাসাধ্য সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল সবাই মিলে।

সাক্ষীদের সওয়াল জবাব শুরু করলেন পুলিশ অফিসাররা। কিন্তু আচম্বিতে ধেয়ে আসা গাড়ির গর্জন, টায়ারের তীব্র আর্তনাদ তুলে উধাও হয়ে যাওয়া এবং শীতার্ত রাস্তার ওপর মৃতপ্রায় অবস্থায় আর্কাডিকে পড়ে থাকতে দেখা ছাড়া নতুন কোনও খবরই কেউ শোনাতে পারলে না।

এ কেস সম্পর্কে ব্যক্তিগত এবং পেশাগত দুরকম আগ্রহই সমানভাবে জেগেছিল আমার মনে। তাই ঠিক করলাম পুলিশের গাড়ি নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সের পিছু পিছু গোর্কি হসপিটালে যাব। উত্তরমুখো পথে রওনা হলাম আমরা।

দুর্ঘটনাস্থল থেকে প্রায় গোটা তিরিশ বাড়ি পেরিয়ে আসার পর একটা মেরামত এবং সারভিস স্টেশনের সামনে এসে পৌঁছোলাম। নতুন তৈরি হয়েছে স্টেশনটা। দেখেই আমার মাথায় একটা মতলব এল।

'কমরেড, থামাও এখুনি।' আচমকা হুকুম শুনেই ক্যাঁচ করে ব্রেক টিপে ধরলে পুলিশ ড্রাইভার।

হাতে ফ্লাশলাইট নিয়ে অন্ধকার গলি পেরিয়ে গ্যারাজের পেছনে গাড়ি পার্ক করার জায়গায় পৌঁছোলাম আমরা। আলোর সরু রশ্মি গিয়ে পড়ল একটা বেজায় জখম গাড়ির ওপর। টুকরো টুকরো হয়ে গেছিল গাড়িটার উইন্ডস্ক্রিন। আর টোল খেয়ে গেছিল সামনের হুড।

এখনও সে আবিষ্কারের কথা মনে পড়লেই ভাবি বাস্তবিকই সেদিন অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন ছিল আমার। তা না হলে নিছক সাধারণ জ্ঞানকে সম্বল করে আততায়ীবিহীন গাড়িটাকে এত তাড়াতাড়ি এভাবে আবিষ্কার করতে পারতাম না আমি।

আরও কয়েক পা এগিয়ে যেতেই নিঃসন্দেহ হলাম আমরা। হ্যাঁ, একটাই সেই ধাক্কা মেরে উধাও হওয়া গাড়িই বটে। র‍্যাডিয়েটর তখনও গরম রয়েছে। হুডটার ঠিক মাঝখানের পাঁজরে লেগে রয়েছে আর্কাডির ফ্লানেল কোটের একটা ছিন্ন অংশ।

গাড়ির ওপর দিয়ে আলো বুলিয়ে নিতে গিয়ে এমনই একটা জিনিস নজরে পড়ল আমার যে তা দেখা মাত্র বিভীষিকা যেন সাঁড়াশি দিয়ে টিপে ধরল আমার হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকুনিকে। তারার মতো আকার নিয়ে ভেঙে গিয়েছিল কাচটা, আর, তার ঠিক মাঝখানে ভাঙা কাচের খাঁজে আটকে ছিল একটুকরো হাড়—মাথায় খুলির দশ সেন্টিমিটার লম্বা হাড়।

খুব সাবধানে হাড়টাকে খাঁজ থেকে উদ্ধার করে রুমালে মুড়তে যখন ব্যস্ত আমার কমরেড ততক্ষণে পুলিশ কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিলাম আমাদের আবিষ্কারের বৃত্তান্ত। গাড়িটা পরীক্ষা করার জন্যে পুলিশের গাড়ি

পাঠানোর ব্যবস্থাও করলে সে। এরপর আমি ফোন করলাম হসপিটালে। বললাম, এখুন অপারেশন রুমে আসছি আমরা।

সাইরেনের আর্তনাদে রাত্রির নিস্তব্ধতাকে ফালা-ফালা করে বাকি পথটা যেন উড়ে এসে গোর্কি হাসপিটালে পৌঁছোলাম আমরা। আমার জরুরি ডাকে বিলক্ষণ বিরক্ত হয়েছিলেন ডাক্তাররা। মরণোন্মুখ অপারেশন কেন যে স্থগিত রাখতে বলেছি তা তো তাঁরা জানতেন না।

হসপিটাল পৌঁছেই বললাম আর্কাডি আমার বিশেষ বন্ধু। তাই ভাবলাম ওর জীবনরক্ষার প্রচেষ্টার অপারেশন শুরু করার আগে এই জিনিসটা আপনাদের দেখালে হয়তো সত্যিই ওর কোনও উপকার করতে পারব আমি।

এমনভাবে ডাক্তারা তাকালেন যেন মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে আমার আর তার পরেই একজন হাড় রুমালের মোড়ক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন—হবে হবে, এইতেই হবে।

হাড়টা তখুনি খুব সন্তর্পণে পরিষ্কার করে ফেললেন ওঁরা। পরে অপারেশন থিয়েটারে গিয়ে আর্কাডি গুরেলভিচের করোটির সঠিক জায়গাটিতে তা বসিয়ে বেমালুম জুড়ে দিলেন। তিন ঘণ্টা পরে অস্ত্রোপচার শেষ হল। তারপর একজন ডাক্তার বেরিয়ে এলেন। আমি যেখানে ঠায় দাঁড়িয়েছিলাম এতক্ষণ, এসে দাঁড়ালেন সেখানে।

বললেন, 'কমিশনার, বিপদমুক্ত হয়েছেন আপনার বন্ধু। কিন্তু ওই হাড়টা না পাওয়া গেলে এ সুখবর হয়তো আপনাকে শোনাতে পারতাম না।'

মিনিট দশেক পরেই আর একটা পুলিশের গাড়ি এসে পৌঁছোল হসপিটালের প্রাঙ্গণে। গোয়েন্দার কাছে রিপোর্ট পেলাম, গাড়িটার নাম্বার প্লেট থেকে ধাক্কা মেরে উধাও হওয়া ড্রাইভারকে সনাক্ত করতে পেরেছি আমরা। বাড়িতেই ছিলেন ভদ্রলোক। মদের নেশা তখনও তাঁর কাটেনি। পুলিশের কাছে বিনা দ্বিধায় সব স্বীকার করেছেন তিনি। পার্টির উচ্চপদস্থ কর্মচারি তিনি। তা সত্ত্বেও এই গুরুতর অপরাধের জন্য আইনের রক্ত চক্ষুকে তিনি এড়াতে পারেননি। মাথা পেতে নিতে হয়েছিল ধর্মাধিকরণের গুরুদণ্ড।

দ্রুত গোয়েন্দাগিরি এবং তার চাইতেও বেশি কপালজোর—এই দুইয়ের ফলে এ-কেসে রক্ষা পেয়েছিল একজনের জীবন। অন্যান্য দেশে রাশিয়ান পুলিশদের বড় দুর্নাম আছে। তারা নাকি সোভিয়েট ইউনিয়নের যারা শত্রু তাদের গ্রেপ্তার করা এবং হনন করা ছাড়া অন্য কোনও বিষয়েই আগ্রহী নয়। কিন্তু আমি বলব দুনিয়ার যেখানে যত পুলিশ আছে তাদের সঙ্গে আমার এবং আমার সহ-কর্মীদের কোনও প্রভেদই নেই। আমরা সবাই সমান, একই আমাদের দায়িত্ব। কোনও জীবন বিনষ্ট করার চাইতে সে জীবন রক্ষা করার জন্যে হাজার রকম প্রচেষ্টা করতে আমরা দ্বিধা করি না।

** গ্রেগরী আরেন্সকী (রাশিয়া) রচিত কাহিনি অবলম্বনে।*

দামাস্কাসের উগ্র সূর্য

গ্রীষ্মের মাসগুলোয় দুপুরের সূর্য বড়ই নির্দয়ভাবে কিরণ ঢালতে থাকে আমাদের শহরের নতুন আর পুরোনো বাড়ির শীর্ষে, মসজিদের সাদা চুড়োয় আর মৌচাকের মতো গম্বুজগুলোয়। জীবনের চাঞ্চল্য একেবারেই উবে যায় শহরের বুক থেকে, খাঁ-খাঁ করে পথঘাট। দামাস্কাসের পুরোনো অঞ্চলের ছাদ-ঢাকা সঙ্কীর্ণ রাস্তায় অলসভাবে গাধাগুলোকে টানতে টানতে নিয়ে যায় শুধু কয়েকজন ফেজ টুপি-পরা বেদুইন। এমনকী সাদা গমগমে হট্টগোলে ভরা বাজারগুলো, যেখানে টাকাকড়ির ভাবনা-চিন্তা ছাড়া আর কিছুই স্থান পায় না, সেই বাজারগুলোও ঝিমিয়ে পড়ে। সারাদিন ধরে আগুন বর্ষণে ক্লান্ত তপনদেব যতক্ষণ না পশ্চিমে হেলে পড়ে, ততক্ষণে তলিয়ে থাকে সুপ্তির নিতলে।

কিন্তু এই ঝিমুনির অবসরেই তৎপর হয়ে ওঠার সুযোগ পায় দু-ধরনের অপরাধীঃ যে প্রকৃতির মানুষ শহরের কর্মবিরতি আর বিশ্রামক্ষণের সুযোগ নিয়ে খুন-জখম রাহাজানি আর হরেক রকম অপকর্মে মেতে ওঠে, তারা, এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে একটি অমানুষ তস্কর—আগুন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দামাস্কাস শহরের বুকে নির্বিবাদে লুঠতরাজ চালিয়েছে এই অমানুষ অপরাধীটি এবং দু-দুবার জমির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল এত বড় শহরটাকে।

কোনও রকম তঞ্চকতা না করে সবিনয়ে জানাচ্ছি, প্রথম অপরাধীর জন্যে যতখানি হুঁশিয়ার দামাস্কাসের পুলিশ বাহিনী, ঠিক ততখানিই দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রেও।

জুলাইয়ের সেই দিনটিতে প্রথম যে খবরটি এসে পৌঁছাল পুলিশ হেড কোয়ার্টারে তা হল একটি আগুন লাগার খবর। শৌখিন শহরতলী সৌকসারুজার একটা বাড়িতে অগ্নিদেবের তাণ্ডব নৃত্য দেখা গেছে। চিরাচরিতভাবে নিজেদের মধ্যেই বলাবলি করতে লাগলাম আগুনের উৎস সম্বন্ধে। আগুন লাগতে পারে 'দামাস্কাসের আগুন অভিশাপে'র জন্যে অথবা নেহাতই অসাবধান হওয়ার ফলে। কিন্তু ক্রিমিনাল ইনভেসটিগেশন ডিভিশনের চিফ হিসাবে ফোনের জবাব দিতে গিয়েই শুনলাম একটা উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। সৌকসারুজা থেকে একজন পুলিশম্যান বলছে—'চিফ, এ শুধু আগুন নয়, আরো কিছু। ফটকের ফাঁক দিয়ে দেখতে পাচ্ছি উঠোনের উপর পড়ে রয়েছে একটা মেয়ের দেহ। ধোঁয়ার জন্যে আর কিছু দেখা যাচ্ছে না।'

প্রথম রিপোর্ট পাওয়ার পর যে ঠিকানাটা টুকে রেখেছিলাম, তার ওপর এবার চোখ পড়তেই চিনতে পারলাম বাড়িটাকে। সেকেলে আমলের যে ধরনের জমজমাট আরব্য ভবনগুলো দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে দামাস্কাসের বুক থেকে, এ প্রাসাদটি তাদেরই অন্যতম। উঁচু-উঁচু পাঁচিলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে কতবার জালিকাটা ফটকের মধ্যে দিয়ে দেখেছি ভেতরকার শান্ত সুন্দর শুচিময় উঠোনটিকে। প্রাসাদটাকে বেষ্টন করে থাকত প্রাঙ্গণটা। বহু শতাব্দী আগে সোনা আর রেশম দিয়ে বোনা মূল্যবান বস্ত্রের জন্য যখন দিকে দিকে সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল আমাদের এই শহরটির তখন এক ধনবান ব্রোকেড ব্যবসায়ী প্রাসাদটা তৈরি করেছিলেন। কি লজ্জার কথা! এতদিন পর গৌরবময় অতীতের এত চমৎকার নিদর্শনটাকেই কিনা গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে সর্বভুক আগুনের দেবতা। কিন্তু এই অগ্নিকাণ্ডের সঙ্গে যে মৃত্যুও জড়িয়ে পড়েছে, তা মনে পড়তেই রোমান্টিক রোমন্থনকে নির্বাসন দিলাম মন থেকে।

অকুস্থলে পৌঁছেও করবার বিশেষ কিছু ছিল না। কেন না, তখনও আগুনকে বাগে আনতেই ব্যস্ত দমকলবাহিনী। ফটকের বাইরে দেখি কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে গেছে। কয়েকজন বললে বটে কে যেন

আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠে সাহায্য চেয়েছিল। কিন্তু পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়ার মেঘ ভেদ করে কিছুই করা সম্ভব হয়নি ওদের পক্ষে।

যে মুহূর্তে সম্ভব হল প্রাঙ্গণে পা দেওয়ার, আর একটা মুহূর্তও বাজে সময় নষ্ট করলাম না। ভেতরে গিয়ে দেখলাম পরমাসুন্দরী এক অষ্টাদশী তন্বী মেয়ের দেহ। যদিও বিস্তর ঝুল আর ভুষোয় মলিন হয়ে গিয়েছিল তার মুখশ্রী, যদিও পলকহীন বিস্ফারিত কালো চোখের মণি দুটো স্থির হয়েছিল নীল আকাশের পানে—তবুও এক নজরে বোঝা গেল বাস্তবিকই এরকম আলোকসুন্দর কান্তি বড় একটা দেখা যায় না। পরনে দামাস্কাসের পোশাক। টুকটুকে লাল রঙের রেশম। নরম। নমনীয়। মণিবদ্ধ আর গলায় সযত্ন খচিত বাহারি জড়োয়া অলংকার। কিন্তু তার ফ্যাকাশে নিরক্ত গলায় যে জিনিসটি নেকলেসের মতো অত সুন্দর ছিল না, তা হচ্ছে একটা দগদগে কুৎসিত ক্ষতচিহ্ন। এবং এই ক্ষতই নিভিয়ে দিয়েছে মেয়েটির জীবনের প্রদীপ।

নিষ্প্রাণ দেহটার পাশে নতজানু হয়ে বসে পড়েছিলাম। অবাক হয়ে গেছিলাম আমার অনুভূতিপ্রবণতা দেখে। বছরের পর বছর খুন-জখম হিংসা-জিঘাংসা নিয়ে নাড়াচাড়া করে এসেও এখনও আমার কোমল অনুভূতির ধারগুলো দেখলাম ভোঁতা হয়ে যায়নি। আচম্বিতে একটা চিৎকার শুনলাম। শব্দটা এল রান্নাঘর থেকে। তখনও গল-গল করে ধোঁয়া বেরুচ্ছিল ঘরটা থেকে। চটপট এগিয়ে দেখি আরও একটা মহিলার লাশের পাশে নীরবে দাঁড়িয়ে দমকলবাহিনীর দুজন লোক। যদিও আগুনের নিষ্ঠুর জিহ্বাস্পর্শে হতভাগিনীর দেহের খানিকটা অংশ পুড়ে গিয়েছিল, তবুও উঠোনের মরা মেয়েটির চাইতে এই মহিলার বয়স যে অনেক বেশি তা বুঝতে মোটেই বেগ পেতে হল না আমাকে। আরও বুঝলাম, জীবিতকালে অল্পবয়েসি মেয়েটির চাইতেও অনেক বেশি চটকদার ছিল মহিলাটির তনুশ্রী। সযত্নে প্রসাধন করা কাঁচা-পাকা চুলের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছিল একটা বিশ্রী আঘাত-চিহ্ন। এবং সে আঘাত হানা হয়েছে যে অত্যন্ত গুরুভার একটা হাতিয়ার দিয়ে, তা অতি সহজেই বুঝতে পারলাম আমি।

একলা আগুনকেই অভিশাপ দিচ্ছিলাম সবাই মিলে। এবার দু-একটা নৃশংস খুনের তদন্তের গুরুদায়িত্ব এসে পড়ল কাঁধে।

বাইরের জনতাকে এতক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করছিল আমাদের গোয়েন্দারা। তাইতেই জানা গেল জমকালো এই ভবনটার বর্তমান বাসিন্দা ছিল পুলিশ ডিপার্টমেন্টের ডাকাতি ডিভিশনের চিফ ক্লার্ক, তার বউ আর মেয়ে। পুলিশের সঙ্গে হত্যাকাণ্ডের যোগসূত্র বেরিয়ে পড়তেই সম্ভবপর একটা মোটিভের অঙ্কুর দেখা গেল আমার মধ্যে। প্রতিহিংসার জন্যেই কি তবে এই হনন-পন্থা? প্রতিহিংসা পাগল কোনও বিকৃত মগজই কি তাহলে পুলিশ বাহিনীরই একজনের দেনা-পাওয়া মিটিয়ে দিয়ে গেল এই ভাবে?

হেড কোয়ার্টারে একটা ফোন করতেই তৎক্ষণাৎ অকুস্থলে হাজির হলেন পুলিশ কমিশনার, করোনার, বিচার সম্পর্কীয় সাক্ষ্য প্রমাণদির অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এবং নরহত্যা স্কোয়াডের হোমরাচোমরারা। সবাই মিলে একসঙ্গে শুরু করলাম তাল তাল বাষ্পে ভরা প্রাসাদের ভেতরে চুলচেরা অনুসন্ধান পর্ব।

দেখে শুনে বেশ বোঝা গেল খুনের সব চিহ্ন মুছে দেওয়ার জন্যেই আগুনের সাহায্য নিয়েছিল খুনি। নিখুঁত হয়েছিল তার পরিকল্পনা। আগুনের শিখা যেটুকু নষ্ট করতে পারেনি ফায়ার ব্রিগেডের কেমিক্যালস আর জলেই তার দফারফা হয়ে গেছে।

মিনিট পনেরো ধরে জলে-ভেজা রাবিশ খোঁজার পর শেষকালে রান্নাঘরে একটা সূত্র পাওয়া গেল। মাংস থেঁতো করে 'কুব্বি' বানানোর জন্যে আমরা আরবীয়রা, যে ধরনের কাঠের হাতুড়ি ব্যবহার করি, সেই রকম একটা হাতুড়ি পেলাম আমরা। হাতুড়িটার ওজন পাউন্ড সাতেকের কম তো নয়ই। মেঝের ওপর যে জায়গায় তা পড়েছিল, তা দেখেই মনে হল বর্ষীয়সী মহিলার মাথায় ওই মারাত্মক আঘাত হানার পরেই হাতুড়িটা ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল খুনিটা। আধপোড়া হাতুড়িটা হাতে নিয়ে মনটা কীরকম যেন হয়ে গেল। ভাবলাম আর কি আমি সুস্বাদু 'কুব্বি' দিয়ে তারিয়ে তারিয়ে ভাত খেতে পারব? আমার রন্ধন পটিয়সী বউয়ের এটা আবার

স্পেশাল খানা। মনের পর্দায় চকিতে ভেসে গেল ক'টি কথা—'যে জিনিস দিয়ে এমন মুখরোচক খানা বানানো যায়, তা দিয়ে প্রয়োজন হলে নরহত্যাও করা যায় একইরকম পরিপাটিভাবে।'

অনুসন্ধানে ঢিলে পড়ল না এতটুকুও। হাতুড়িটা যেখানে পাওয়া গেছিল, তার কাছেই পড়ে থাকতে দেখলাম একটা কাচের টুকরো। করাতের মতো এবড়ো-খেবড়ো হলেও রীতিমতো ধারাল কাচটা। আয়না ভেঙে যাওয়ায় টুকরোটা পড়েছিল মেঝের ওপর। আগুনের তাপেও ভেঙে পড়তে পারে আয়নাটা। অথবা, উঠোনে পড়ে থাকা তরুণী মেয়েটির জীবনের সরু সুতো কাটবার জন্যেও এই অভিনব ছুরিটাকে বানিয়ে নিয়েছিল হত্যাকারী।

খোঁড়া-খুঁড়িতে বাধা পড়ল। করোনার তাঁর রিপোর্ট দিলেন আমাকে। মাথায় চোট পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছিল বর্ষীয়সী মহিলাটি। কিন্তু তার দেহটা যেভাবে পড়ে আছে, তা দেখে মনে হয় তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে রান্নাঘরের ভেতরে। তরুণী মেয়েটার গলা কাটবার আগে যে তাকে গলা টিপে মারা হয়েছিল, তার প্রমাণও পাওয়া গেছে। আর তার পরেই হতভাগিনীর লাশটাকে ফেলে দেওয়া হয় প্রাঙ্গণে।

দুই নারীর অঙ্গেই ছিল উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া মহার্ঘ অলংকারাদি। তাই লুঠতরাজ করার মোটিভ নিয়ে যে খুন করা হয়নি, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলাম আমরা। পোশাক এবং দেহে ধস্তাধস্তির কোনও চিহ্ন ছিল না। তাই, যৌনবাসনার পরিতৃপ্তির জন্যে যে এই জঘন্য খুনখারাপি—এমন সম্ভাবনাকেও বাতিল করতে হল।

তদন্ত পর্ব এই পর্যন্ত আসার পরই ভদ্রমহিলার স্বামীর অনুপস্থিতিটা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করলাম আমি। সে ভদ্রলোক কোথায়? এতক্ষণেও বউ আর মেয়ের এই শোচনীয় পরিণতি তার কানে পৌঁছয়নি, এমন কি হতে পারে? আমার তো তা বিশ্বাস হল না। খবর পাওয়া মাত্রই তো দুরন্ত আরব ঘোড়ার পিঠে চড়ে এতক্ষণে তাঁর পৌঁছে যাওয়ার কথা অকুস্থলে। ব্যাপার তো সুবিধের মনে হচ্ছে না।

ঘড়ি দেখছি, এমন সময়ে একজন ডিটেকটিভ জানালে নিপাত্তা স্বামী মহাপ্রভু নাকি অফিসেই কাজ করছিলেন। দুঃসংবাদটা শোনামাত্র অজ্ঞান হয়ে গেছেন ভদ্রলোক। খবরটা শুনে তার এতক্ষণ পর্যন্ত অদৃশ্য থাকার একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা পেলেও স্থির করলাম, ভদ্রলোক এখানে এসে পৌঁছোনোর পর থেকেই এ দৃশ্যের প্রতিক্রিয়া তাঁর ওপর কীভাবে ছড়িয়ে পড়ে, তা সজাগ চোখে লক্ষ্য রাখতে হবে।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ফটকের সামনে জমায়েত লোকের ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল একটা ট্যাক্সি। ভেতর থেকে রক্তহীন ফ্যাকাশে মুখে নামলেন এক ভদ্রলোক। তখনও ঠকঠক করে কাঁপছিলেন আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন তিনি।

নামার সঙ্গে সঙ্গে হিস্টিরিয়া রুগির মতো প্রথমেই আর্ত সুরে চেঁচিয়ে উঠলেন উনি—'আমার খুকি সে কোথায়?'

'কোন খুকি?' শুধোই আমি। 'খুকি বলতে যদি তরুণী মেয়েটাকে বোঝান তো দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে —'

'না। না। মারিহা মারা গেছে, আমি জানি। কিন্তু ইয়ামিন, আমার বাচ্চা মেয়েটা, সে কোথায়?'

এবার স্তম্ভিত হওয়ার পালা আমার। খুনের সংখ্যা কি তাহলে সবশুদ্ধ তিন? এমনও হতে পারে, চোখের সামনে মা আর দিদিকে খুন হতে দেখেছে বাচ্চা মেয়েটি। তারপর গায়েব করা হয়েছে তাকে। সম্ভবত এ খুনের একমাত্র মোটিভ কিডন্যাপ করাই। সে যাই হোক, নৃশংস খুনের সমাধানের আগে আমাদের জানার দরকার নিপাত্তা বাচ্চাটির পরিণতি এবং এই চিন্তাই প্রবল হয়ে উঠল আমাদের মগজে।

শোকবিহ্বল ভদ্রলোককে নার্ভ নিরুত্তেজ করার দাওয়াই খাইয়ে দিলাম এক ডোজ। অল্পক্ষণের মধ্যেই বাচ্চাটির চেহারার নিখুঁত বিবরণ পাওয়া গেল তাঁর কাছ থেকে। বয়স তার সাড়ে তিন বছর। লম্বা লম্বা কালো চুল আঁটো করে বাঁধা। ধূসর চোখ। আধো-আধো স্বরে কথা বলার দরুন সব কথা বোঝা মুশকিল। পরনে কী ধরনের পোশাক ছিল, তা বলা সম্ভব হল না তাঁর পক্ষে।

রাস্তার ভিড়ের মধ্যে হাঁটা শুরু করলাম আমি। ওদের মধ্যে অনেকেরই হয়তো কিছু কিছু বলার আছে। দেওয়ার মতো উপদেশও আছে বিস্তর। কিন্তু সবকিছু শোনার পর মূল্যবান কিছু পাওয়া গেল বলে মনে হল না আমার। বাড়ির মধ্যে কাউকে ঢুকতে বা বেরুতে কেউই দেখেনি। আগেই শুনেছিলাম, একটা আর্ত চিৎকার এদের কানে ভেসে এসেছিল। এই চিৎকার ছাড়া আর কোনওরকম সন্দেহজনক শব্দ কেউই শুনতে পায়নি। শহরতলীর এই অংশটাই যারা বাস করে, আইনের প্রতি অনুরাগ তাদের প্রত্যেকেরই আছে এবং সেই মার্জিত রুচি শান্তিপ্রিয় বাসিন্দাদের একজনের মনেও খটকা লাগতে পারে এরকম সন্দেহজনক কিছুই চোখে পড়েনি।

সবই বুঝলাম। কিন্তু এসব সত্ত্বেও দু-দুটো খুন হয়ে গেছে আজই। খুনের সংখ্যা দুই কেন, তিন হওয়াটাও অসম্ভব কিছু না। ভাবলাম দীর্ঘকাল ধরে গড়ে ওঠে মানব সভ্যতা। ভাবলাম কবে সেইদিন আসবে যেদিন তা হনন আর জিঘাংসার বহু ঊর্ধ্বে উঠে যেতে পারবে? ঋষিতুল্য ঐতিহাসিকরা গৌরবতিলক পরিয়েছেন দামাস্কাসের সুমহান ঐতিহ্যললাটে এই তথ্য জানিয়ে যে দামাস্কাসই হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন শহর যেখানে সর্বপ্রথম গড়ে উঠেছিল মানুষের জনপদ। গৌরবময় এই দামাস্কাস শহরে অন্তত এই ধরনের পৈশাচিক খুনজখম যেন আর না হয়। আমাদেরও জ্ঞানের সীমা আরও ছড়িয়ে পড়া দরকার। রক্তক্ষরণ না করে, বর্বর প্রবৃত্তিকে সমূলে বিনষ্ট করে কীভাবে বাঁচার মতো বাঁচতে হয় তা আমাদের এখনও জানা দরকার। আমরা এখনও তা শিখিনি এবং চারপাশের কাণ্ডকারখানা থেকেই তা বোঝা যায় হাড়ে হাড়ে।

ভাবালুতা আর রোমন্থনের ফলে অসহিষু হয়ে উঠেছিলাম আমি। এবং [illegible] এমনই একটা মনের গঠন যাকে প্রশ্রয় দেওয়া কোনও পুলিশম্যানেরই উচিত নয়। যেভাবেই হোক, বাচ্চাটাকে খুঁজে বের করতেই হবে। রহস্যের চাবিকাঠি সম্ভবত সে-ই। সারা দেশ জুড়ে তল্লাসি চালিয়ে কচি মেয়েটার হদিশ বার করার নির্দেশনামা বেরিয়ে গেল চারিদিকে। সজাগ হয়ে গেল প্রতিটি পুলিশ স্টেশন, রোড পেট্রল, ট্রাফিক অফিসার আর রেডিও স্টেশন। আর, হেড কোয়ার্টারে গোল হয়ে বসে নতুন খবরের প্রতীক্ষায় রইলাম আমরা।

অসহ্য শ্বাসরোধী সাসপেন্সে ভরা দু-দুটো ঘণ্টা কেটে গেল। কিন্তু একটা সূত্রও এসে পৌঁছোল না আমাদের হাতে। প্রতিটি সেকেন্ড অতীত হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিল তিল করে বৃদ্ধি পাচ্ছে হত্যাকারীর সুযোগ আর সুবিধে—বৃদ্ধি পাচ্ছে বাচ্চাটির বিপদাশঙ্কা, অবশ্য তখনও যদি জীবিত থাকে সে।

যখন প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছি, ভাবছি, কোনও সূত্র আমাদের চোখ এড়িয়ে গেছে কিনা, ঠিক এমনি সময়ে রেডিও-রুম থেকে খবর পাওয়া গেল আমাদের বর্ণনামাফিক একটা খুকিকে দামাস্কাকের প্রাচীন অঞ্চলের শহরতলীতে একলা ঘুরতে দেখা যাচ্ছে। মক্কা রোডে পাওয়া গেছে তাকে।

তল্লাশি পর্ব শেষ হয়ে গেল, এমন কথা বিশ্বাস করতে মন চাইল না আমার। কিন্তু বাচ্চাটাকে নিয়ে আসার পর দেখা গেল বাস্তবিকই হারিয়ে যাওয়া খুকির চেহারার বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে যায় তার চেহারা। বাঁ বাহুর ওপর বাঁধা ছোট্ট পাতলা সোনার তাবিজটার ওপর আরবীয় ভাষায় তার নামও খোদাই করা ছিল। কিন্তু সাক্ষী হিসেবে খুদে ইয়ামিনকে কোনও কাজেই লাগানো গেল না। শ্রান্তি, ভয়, অশ্রু আর আধো আধো স্বরে কথা বলা—এই সবকিছুর ব্যূহ ভেদ করে সে যে কোথায় ছিল এবং কার সঙ্গে ছিল, তা জানা একেবারেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল আমাদের পক্ষে। ওর বিড়বিড় বকুনির মধ্যে বারবার এই একই শব্দ আউড়ে চলেছিল সে। শব্দটার অর্থ 'আমার মামা।'

হুকুম চলে গেল এই মামা লোকটিকে খুঁজে পেতে আনার জন্যে। তাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার।

যে খবরের কাগজে অফিসে 'মামা' কাজ করত, সেখান থেকে রিপোর্ট পাওয়া গেল, খুনের দিন সকালে অফিসেই কাজ করেছে সে। তারপর সে বাইরে যেতে চায় এবং অনুমতি পাওয়ার পর অফিস ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে সে। অফিস ত্যাগ করার পর তার গতিবিধি সম্পর্কে কোনও খবরই আর পেলাম না আমরা।

অপরাধ-বিশেষজ্ঞ মহলে একটা খুব চালু কথা আছেঃ খুনি সব সময়েই ফিরে আসে খুনের দৃশ্যে। বহু পুরোনো এবং প্রায় সকলেরই জানা উক্তিটির মধ্যে কিছু মনোবৈজ্ঞানিক সত্য আছে। অপরাধ-ইতিহাসের

পাতায় পাতায় ঠাসা আছে এরকম বিস্তর কেস যা পড়লেই দেখা যাবে কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্যে ফেলে যাওয়া প্রমাণাদি নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্যে, বিকৃত বাসনার পরিতৃপ্তির জন্যে, এমনকী অকুস্থলে এসে সুতীব্র অনুতাপের মধ্যে মনে শান্তিলাভের জন্যেও খুনের দৃশ্যে বারবার ফিরে আসে খুনিরা।

আর তাই, চারজন ডিটেকটিভ নিয়ে একটা দল তৈরি করলাম। ধোঁয়ায় মলিন প্রাসাদের আশপাশেই মোতায়েন হল এরা। বেশি সময় অপেক্ষা করতে হল না। অচিরেই ওদের একজন খবর দিলে প্রাসাদটার আশেপাশেই সন্দেহজনকভাবে ঘুরঘুর করছে অদ্ভুত প্রকৃতির একটা লোক।

এইভাবে রিপোর্ট পেশ করছিল অফিসারটি—'শোকাবহ এই ঘটনা সম্বন্ধে লোকে কি বলাবলি করছে—তা শোনার নিবিড় আগ্রহ দেখা গেছে এই লোকটার হাবেভাবে। বিভিন্ন লোকের কাছে গিয়ে সে জিগ্যেস করে ঘটনা সম্বন্ধে তাদের মতামত কী। কিন্তু শুধু শুনেই যায় নিজের অভিমত একদম প্রকাশ করে না।'

আমরা তিনজন খুকিকে নিয়ে রওনা হলাম প্রাসাদ অভিমুখে। গাড়ির দরজা খুলতে না খুলতেই—বাচ্চাটা লাফিয়ে নেমে পড়ল ফুটপাতের ওপর এবং পরক্ষণেই তিরবেগে দৌড়ে গিয়ে মামা, বলে ঝাঁপিয়ে পড়ল যার প্রসারিত বাহুযুগলের মধ্যে, সেই লোকটিকে নিয়েই পুঞ্জিভূত হয়ে উঠেছিল আমাদের সন্দেহের রাশি। সনাক্তকরণ যা হল, তা চমৎকার। আর কিছু দরকার নেই। লোকটাকে গ্রেপ্তার করে হেড কোয়ার্টারে নিলে এলাম সওয়াল জবাবের জন্যে।

সন্দেহভাজন ব্যক্তিটির নাম আবদুল ওহাব সাক্কা আমিনি। বয়স তিরিশের এদিকে। খুকির মায়ের ভাই সে অর্থাৎ চিফ ক্লার্কের সম্বন্ধী। সওয়াল জবাবের সময়ে তার কথাবার্তায় সুগভীর আত্মপ্রত্যয় লক্ষ্য করলাম। আগাগোড়া একই কথা বল বারবার বলে গেল সে। তার বোন নাকি তাকে টেলিফোন করেছিল। দারুণ গরম পড়েছিল, তাই সে তাকে জিগ্যেস করে ছোট্ট ইয়ামিনকে বরদা নদীর ধারে বিকেলে বেড়াতে নিয়ে যাবে কিনা। বাচ্চাটাকে দারুণ ভালোবাসে তার মামা, 'নিজের মেয়ের মতোই', তাই এ প্রস্তাব শুনে বিলক্ষণ উল্লসিত হয়েছিল মাতুল মহাপ্রভু। খুকিকে নেওয়ার জন্যে বাড়িতে এলে অস্বাভাবিক কিছুই নাকি চোখে পড়েনি তার। কোনও আগন্তুককে ও দেখেনি। প্রাঙ্গণে বসে তার বোন সেলাই করছিল। তার শান্ত সুন্দর প্রকৃতিতে কোনওরকম বৈলক্ষণ্যও লক্ষ্য করেনি সে।

এ কাহিনি যে সত্য, তা বলবৎ করতে পারে, সুনিশ্চিত করতে পারে, এমন কোনও লোককে হাজির করতে পারবে কি সে?'

একটু ভেবে ও বললে—'হ্যাঁ, পারবো। আমাদেরই কাগজের একজন রিপোর্টারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার। নাম তার হামিন। একসঙ্গে বরফ-কুচো দেওয়া শরবৎও খেয়েছিলাম আমরা।'

রিপোর্টারকে ফোন করার পরেই প্রথম শক পেল আমিনি। বরফকুচো দেওয়া শরবৎ খাওয়া তো দূরের কথা, গত ক'দিনের মধ্যে সহকর্মীর টিকিও নাকি দেখেনি সে—সাফ জবাব দিয়ে দিলে রিপোর্টার ভদ্রলোক। একটু ভেবে নিয়ে আমিনি চটপট বুঝিয়ে দিলে তার অস্বীকার করার মূল কারণটা—'একটা গণিকালয় চালায় হামিন। তাই পুলিশের কোনও ঝামেলায় নিজেকে জড়াতে চায় না ও।'

বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে সমানে প্রশ্ন করে যেতে লাগলাম ওকে। উত্তর দেওয়ার সময়ে চোখ-মুখের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে লাগলাম তীক্ষ্ণ চোখে। আর, তখনই, আচমকা আমার চোখ পড়ল বাঁ-হাতের ওপর। টেবিলের কিনারাটা বাঁ-হাত দিয়ে চেপে ধরেছিল ও। বুড়ো আঙুলের নখের নীচে একটা লালচে দাগ দেখতে পেলাম আমি।

ভাবলাম, এ দাগ রক্তের না-ও হতে পারে। খুব সম্ভব কাজ করার সময় ছাপাখানার লাল কালি উঠে এসেছে ওর নখের ওপর। নখের ওপর খানিকটা ধুলোও লেগেছিল। মনের কন্দর থেকে উঠে এল হুঁশিয়ার থাকার হুকুমনামা। এই সূত্র বা অন্য কোনও সূত্রই উপেক্ষা করলে চলবে না।

ল্যাবরেটরিতে দ্রুত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ধুলোর মধ্যে রক্ত পাওয়া গেল। খবরটা মামার কানে পৌঁছে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একেবারেই ভেঙে পড়ল বেচারি আর তার পরেই কয়েক মিনিটের মধ্যেই শুনতে

পেলাম তার অপরাধ কাহিনি।

খবরের কাগজের অফিস থেকে যে মাইনে আমি পাই, তা দিয়ে আমার চলে না। আমার ভালো লাগে ভালো খাবার, প্রচুর মদ, সুন্দরী মেয়ে আর জুয়োর টেবিলের উত্তেজনা। আমার ফ্যামিলি যখন যথেষ্ট বিত্তবান, তখন এভাবে মাটিতে মুখ রগড়ে জীবনধারণ করা আমার পোষায় না। আমার সম্মানের হানি ঘটে তাতে।

'আমার বোনের অন্তরে দয়ামায়া ছিল প্রচুর। প্রায় তার সঙ্গে দেখা করতাম আমি। আমার টাকার দরকার হলেই মুক্ত হস্তে সব সময়ে আমাকে দেদার টাকা দিত সে। গতরাতে ভাগ্যের চাকা ঘোরে আমার প্রতিকূলে, আজ সকালে পথের ভিখিরি হয়ে গেলাম আমি। তাই এসেছিলাম বোনের কাছে। ফটকের কাছে খেলা করছিল ইয়ামিন। উঠোনে সেলাইয়ের কল নিয়ে বসেছিল আমার বোন। মামুলি কুশল বিনিময় করার পর আমি সরাসরি এসে পড়লাম আমার কথায়। আমার অর্থের দরকার এবং তা এখুনি দিতে হবে। ও বললে—'আজকে তো বাড়িতে টাকাকড়ি নেই, ভাইয়া।' কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি চাপ দিতে ধৈর্যচ্যুতি ঘটল ওর। বলল—'ঘ্যানঘ্যান কোরো না। বললাম তো হাতে টাকা নেই।'

'তখনই একটা শয়তানি মতলব উঁকি মারল আমার মগজে। একতলায় রাখা কাবার্ডে যে জড়োয়া গহনা আছে, সেগুলো পকেটস্থ করলে কেমন হয়? বললাম—'বহিন, তোমার জড়োয়া গয়নাগুলো আমাকে দিয়ে দাও, বলেই—বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম আমি।

'মুহূর্তের মধ্যে বুঝলাম, বড় বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি। চিৎকার করে উঠল আমার বোন— 'নেমকহারাম কুকুর কোথাকার। তোমার ওই নোংরা আমোদের জন্যে আমার মায়ের গয়নাগুলোকে এবার ভাগে লাগাতে চাও। অনেক বছর তোমাকে আড়াল করে রেখেছিলাম আমি। কিন্তু আর না। আজ রাতেই আমার স্বামীকে বলব তোমার এই জঘন্য আচরণের কথা। এখন দূর হও এখান থেকে—আর কোনও দিন এমুখো হোয়ো না।'

'ওর ক্রোধ আমার রক্তে আগুন লাগিয়ে দিলে। প্রচণ্ড রাগে যেন উন্মাদ হয়ে গেলাম আমি। ক্ষিপ্তের মতো ধেয়ে গিয়ে রান্নাঘরের মধ্যে সবার আগে চোখ পড়ল একটা জিনিস—একটা 'কুব্বি' হাতুড়ি। এক ঝটকায় হাতে তুলে নিলাম হাতুড়িটা। দরজার সামনেই মুখোমুখি হয়ে গেলাম ওর সঙ্গে এবং সজোরে হাতুড়ির একটা মোক্ষম ঘা মারলাম ওর মাথায়। ও লুটিয়ে পড়তেই লাশটা টানতে টানতে নিয়ে এলাম রান্নাঘরের ভিতরে।

'আমার বড় ভাগ্নি মারিহা চিৎকার শুনেই বারান্দায় দৌড়ে এসেছিল। এসেই দেখেছিল মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে তার মা। আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠল ও সাহায্যের জন্যে। ওকেও এবার থামানো দরকার। দৌড়ে ওর ঘরে ঢুকে গলা টিপে মারবার চেষ্টা করলাম আমি। কিন্তু দেখলাম, কাজটা খুব সহজ নয়। শেষ পর্যন্ত দমবন্ধ করে ওকে মারতে পেরেছিলাম কিনা, সে সম্বন্ধেও নিশ্চিত নই আমি। তখনি আয়নাটা ভেঙে ফেলে কাচের টুকরো তুলে নিয়ে ওর গলার শিরাটা কেটে দু-ফাঁক করে দিলাম।

'রাগ পড়ে আসতেই মাথা সাফ হয়ে গেল। এবার আমার দুষ্কর্ম ঢেকেঢুকে প্রমাণাদি বিনষ্ট করে সটকান দেওয়ার বাসনাই প্রবল হয়ে উঠল মগজের মধ্যে। সারা বাড়িটার স্প্রে করে তেল ছড়িয়ে দিলাম। তারপর আগুন ধরিয়ে দিয়ে লম্বা দিলাম। যাওয়ার আগে অবশ্য কাবার্ড থেকে জড়োয়া গয়নাগুলো আত্মসাৎ করতে ভুলিনি।

'তিরবেগে বেরিয়ে আসার সময়ে প্রবেশপথের কাছে দেখলাম ইয়ামিন খেলা করছে আপন মনে। ওকে কোলে তুলে নিলাম। শক্ত করে চেপে ধরলাম বুকের ওপর—উদ্দেশ্য ছিল রক্তের দাগ ওকে দিয়ে ঢেকে রাখা। রাস্তায় গাড়িতে উঠতে উঠতে ওকে বললাম, আমরা বেড়াতে যাচ্ছি।

'গাড়ির মধ্যে তেমন ঝামেলা পোহাতে হয়নি আমাকে। কয়েকজন যাত্রী ইয়ামিনের সঙ্গে খেলা জুড়ে দিলে, হাসিঠাট্টাও বাদ গেল না। বাড়ি পৌঁছেই জামাকাপড় পালটে ফেললাম। তারপর রাস্তায় অন্যান্য

ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ইয়ামিনকে খেলতে দিয়ে ফিরে এলাম বোনের বাড়িতে ব্যাপার কতদূর গড়িয়েছে তা দেখতে। তারপর তো আপনারা জানেনেই।'

আর তাই, 'খুনি সবসময়ে ফিরে আসে খুনের দৃশ্যে'—এই আপ্তবাক্য অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে জোড়া খুন আবিষ্কার হওয়ার বারো ঘণ্টার মধ্যে সমাধান করে ফেললাম কেসটার। যে চাবিকাঠি দিয়ে রহস্য ভেদ করলাম তা কিন্তু পুরোপুরি মনোবৈজ্ঞানিক।

যেরকম চটপট কেসের সমাধান হয়ে গেল, ঠিক সেইরকম চটপট সাঙ্গ হল দণ্ডবিধান পর্ব। এক হপ্তা পরেই ভবিষ্যতের হবু খুনিদের চরম শিক্ষা দেওয়ার জন্যে দামাস্কাসের প্রধান পার্কে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে লাগল আবদুল ওহাব সাককা আমিনির নিষ্প্রাণ দেহ।

** ইব্রাহিম গাজী (দামাস্কাস, সিরিয়া) রচিত কাহিনি অবলম্বনে।*

নেশা লাগে খুনের স্বাদে

কেঁদে ফেললেন প্রৌঢ়া। বললেন—'আমার দৃঢ়বিশ্বাস সাংঘাতিক কিছু একটা হয়েছে আমার ছেলের।'

এ ঘটনা যখন ঘটে, তখন আমি ছিলাম ব্লুমফনটিনের অপরাধী তদন্ত বিভাগের চিফ। আমারই অফিসঘরে বসে ঝরঝর করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন প্রৌঢ়া—'দিন তিনেক আগে আমার ভাইয়ের সঙ্গে গাড়িতে করে কোথায় যায় সে। কোথায় জানি গুপ্তধন খুঁড়ে বার করার মতলব ছিল ওদের। তারপর থেকেই আর কোনও পাত্তা নেই ওদের। বুঝতেই পারছেন আমার মনের অবস্থাটা।'

ভদ্রমহিলা যে কার্ড পাঠিয়েছিলেন, তাতে তার নাম লেখা ছিল মিসেস লুইসা মোলার। বিধবা। ছেলের নাম জন ফ্রেডারিক মোলার। বয়স আটাশ বছর। প্রৌঢ়ার দৃঢ়বিশ্বাস কোনও সাংঘাতিক কারণেই ফ্রেডারিক নাকি নিপাত্তা হয়ে গিয়েছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—'কিন্তু আপনি এত উদ্বিগ্ন হচ্ছেন কেন, তা তো বুঝলাম না। আপনার ভাইয়ের সঙ্গেই তো রয়েছে আপনার ছেলে, অজানা-অচেনা লোকের সঙ্গে তো নেই। তাছাড়া, কোনও অ্যাকসিডেন্ট হয়নি গাড়িটার। হলে এতক্ষণে তা জানতে পারতাম। খুব সম্ভব যে গুপ্তধনের সন্ধানে ওঁদের এই অভিযান, তা নিশ্চয় সহজে খুঁজে পাচ্ছে না ওরা। তাই এত দেরি।'

কিন্তু এ যুক্তিতে সান্ত্বনা পাবার পাত্রী নন মিসেস মোলার। বললেন—'আমার ভাইকে নিশ্চয় আপনি চেনেন না। অপরাধের ইতিহাস আছে তার জীবনে। শেষবার পুলিশের হামলায় জড়িয়ে পড়ার সময় কাকে জানি ও বলছিল আমার ছেলেই নাকি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার সঙ্গে। যদিও সম্পূর্ণ অসত্য এই অভিযোগ, তবুও ও শাসিয়ে ছিল জেল থেকে একবার খালাস পেলেই জনকে শায়েস্তা করে ছাড়বে সে। মাত্র এক হপ্তা হল জেলের বাইরে পা দিয়েছে ও।'

মিসেস মোলার বিদায় নেওয়ার পর তাঁর গুণধর ভাইয়ের পুরোনো রেকর্ড ঘাঁটতে বসলাম। ভায়ার নাম স্টিফেনাস লুই ভ্যানউইক। ডোসিয়ারটা বার করতেই তার মধ্যে পেলাম সব তথ্য। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স লোকটার। অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটের একটা খামারবাড়িতে অতিবাহিত হয়েছে তার যৌবন। এরপর এক শহর থেকে আর এক শহরে টো-টো করে ঘুরেছে স্টিফেনাস। শয়ন করেছে হট্টমন্দিরে এবং ভোজন জুটিয়েছে উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে। সম্প্রতি শ্রীঘর গিয়েছিল কয়েক শো পাউন্ড আত্মসাৎ করার অপরাধে। দীর্ঘ আঠারো মাস ঘানি টানতে হয়েছে বাছাধনকে এ যাত্রা। ধড়িবাজ-শিরোমণি প্রবঞ্চকদের মতোই তার যেমন আত্মপ্রত্যয়ের অভাব ছিল না, তেমনই অভাব ছিল না এন্তার অবিশ্বাস্য গল্পের। এই কারণেই নজরবন্দী রাখা হয়েছিল বটে, সেই সঙ্গে আরও একটি মন্তব্য জুড়ে দেওয়া হয়েছিল রিপোর্টের অন্তে। তার প্রতিভার প্রকৃতি দেখে বিশেষজ্ঞের ধারণা মাঝে মাঝে নাকি মানসিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনা দেখা যেতে পারে তার প্রকৃতিতে।

যে পুলিশ অফিসারের দায়িত্বে তৈরি হয়েছিল এই ডোসিয়ার, তিনি বিশ্বাস করতেন একদিন না একদিন খুনজখম জাতীয় কোনও গুরু অপরাধ করে বসবে ভ্যানউইক। এ জাতীয় সিদ্ধান্তে তিনি এসেছিলেন ভ্যানউইকের ছেলেবেলার ইতিহাস জানার পর। হামেশাই দুটো বেড়ালের লেজে গাঁট বেঁধে ছেড়ে দিত বালক ভ্যানউইক। তারপর শুরু হত চামড়ার চাবুক দিয়ে বেধড়ক পিটানো। তীব্র যন্ত্রণার মধ্যে শেষনিঃশ্বাস ফেলত অসহায় জীবগুলো। আর তাই দেখে, তাদের চরম বেদনা সমস্ত অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করে আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠত খুদে ভ্যানউইক।

আরও অনেক তথ্য পাওয়া গেল ডোসিয়ারে। অনর্গল কাঁচা মিথ্যে কথা বলায় তার নাকি জুড়ি নেই। বলার ধরনটিও বড় মার্জিত এবং ভদ্র। এই মহাগুণটি তার ছিল বলেই নাছোড়বান্দার মতো লেগে থেকে শিকারের পকেট হালকা করতে তাকে বেশি বেগ পেতে হত না।

মিসেস মোলারের কান্নাকাটির পরেই ব্লুমফনটিনের সুপ্রীমকোর্টে মাস্টারস অফিসে খোঁজখবর নিলাম আমি। এই অফিসেই ক্লার্কের কাজ করত তাঁর ছেলে। দক্ষিণ আফ্রিকায় যে চারটি প্রদেশ আছে, অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট তাদেরই অন্যতম এবং এই প্রদেশেরই রাজধানী হল এই ব্লুমফেনটিন শহরটি। হিরের খনির সুবিখ্যাত কেন্দ্র কিমবার্লি থেকে প্রায় শ'খানেক মাইল দূরে ছোট এই শহরটায় সে সময় ১৯৩০ সালে, শুধু শ্বেতাঙ্গই ছিল প্রায় ৩০,০০০। ব্রিটেনের সঙ্গে লড়াইয়ে ট্রান্সভালের সঙ্গে বুয়োরস-এর রিপাবলিকান গভর্নমেন্ট যোগদান করার পর থেকে উত্তেজনার লেশমাত্রও ছিল না সে শহরে। আইন অনুরাগী নাগরিকদের কেন্দ্র হওয়ার সুখ্যাতি অর্জন করেছিল ব্লুমফনটিন। খুনজখম জাতীয় অপরাধের নামও একরকম ভুলেই গিয়েছিল সবাই।

সুপ্রীমকোর্টের অফিসাররা আমাকে জানালেন যে, দিনকয়েক আগে ভাগ্নের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল ভ্যানউইক। আন্তরিকভাবেই বিস্তর আলোচনা হয় দুজনের মধ্যে। বাইরে থেকে কোনওরকম বিদ্বেষ বা অস্বাভাবিক কিছু দেখা যায়নি ওদের কথায়-বার্তায় আচরণে। ভ্যানউইক বিদায় নেওয়ার পর দারুণ উত্তেজিত হয়ে এক সহকর্মীর কাছে ফলাও করে গল্প করতে থাকে মোলার, যে সে নাকি তার মামার সঙ্গে গুপ্তধন খুঁড়তে বেরোবে শিগগিরই। ব্লুমফনটিন থেকে দেড়শো মাইল দূরে ওয়াটারভালে নাকি মাটির নীচে পোঁতা আছে এই সম্পদ।

জুলাই মাসের বারো তারিখে মামাকে নিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে মোলার। গাড়ির পেছনে ছিল একটা গাঁইতি আর একটা কোদাল। ওয়াটারভালের খামারবাড়িতেই মানুষ হয়েছিল ভ্যানউইক। কাজে কাজেই দুজন গোয়েন্দাকে পাঠিয়ে দিলাম তখুনি যদি কোনও হদিশ পাওয়া যায় এই আশায়। ঘণ্টা কয়েক পরেই এদেরই একজনের কাছ থেকে টেলিফোন এল। সেইদিনই সন্ধ্যার সময়ে খাবার বাড়ি ছেড়ে রওনা হয়েছে ভ্যানউইক আর তার ভাগ্নে। মিসেস সি জে হফম্যান ওই অঞ্চলেই থাকেন। রাতের অন্ধকারে তাঁর বাড়িতে নাকি ভ্যানউইক এসেছিল। গাড়ি খারাপ হয়ে গিয়েছিল তার। তাই মেরামত করার জন্যে একটা টর্চের দরকার হয়ে পড়েছিল। কিন্তু টর্চ দিয়ে ভ্যানউইককে সাহায্য করতে পারেননি মিসেস হফম্যান। বলেছিলেন, রাতটা যদি তাঁর বাড়িতেই কাটানো মনস্থ করে ভ্যানউইক তাহলে না হয় একটা শয্যার বন্দোবস্ত করে দিতে পারেন তিনি। ভ্যানউইক কিন্তু রাজি হয়নি। আর দেরি না করে যেমন করেই হোক তখুনি নাকি তার যাত্রা আবার শুরু করা দরকার।

ওয়াটারভাল তল্লাসি করার নির্দেশ পাঠালাম ফোন মারফত। তারপর খবরের কাগজের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিলাম মোলারের অন্তর্ধান কাহিনি এবং ভ্যানউইককে অনুরোধ জানলাম সে যেন তদন্তে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে আসে আমাদের পাশে। বহু প্রচলিত এই টোপ যে তাঁকে আকৃষ্ট করবে, এরকম কোনও দৃঢ় বিশ্বাস আমার ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য! জোহানেসবার্গ স্টারে খবরটা পড়ামাত্র প্রথম ট্রেন ধরেই সে রওনা হয়েছিল ব্লুমফনটিন অভিমুখে। নিশ্চয় আমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি গুলিয়ে গেছে এবং ওকে ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করিনি আমরা—এই ধারণার বশবর্তী হয়েই যে আমাদের ফাঁদে পা দিয়েছিল ও, সে বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই আমার।

ইতিমধ্যে আমার অনুচরেরা ওয়াটারভালে একটা শিয়ালের গর্তের হদিশ পেল। সম্প্রতি খোঁড়াখুঁড়ির চিহ্ন ছিল গর্তটার ওপর। তৎক্ষণাৎ মাটি সরিয়ে ফেলে ওরা এবং আবিষ্কার করে মোলারের কুণ্ডলী পাকানো লাশ। জমি থেকে প্রায় আড়াই ফুট নীচে মাটির মধ্যে মুখ গুঁজড়ে পড়েছিল দেহটা। জ্যাকেটের পেছনে ছিল একটা ছিদ্র। সে ছিদ্র শরীরের মধ্যেও প্রবেশ করেছে অনেকখানি। তীক্ষ্ণাগ্র কোনও হাতিয়ার দিয়ে চোট মারার ফলেই এই ছিদ্রের সৃষ্টি। ট্রাউজারের বোতাম দুটোও ছিঁড়ে গিয়েছিল কি এক অজানা কারণে।

পোস্টমর্টেমে হাজির থাকার জন্যে মোটর হাঁকিয়ে গেলাম ওয়াটারভালে। মোটামুটি একটা ছাউনির নীচে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল লাশটা। মোমের ল্যাম্প জ্বেলে শুরু হল পরীক্ষা পর্ব। চোকের সামনে বীভৎস দৃশ্য দেখেও নিজেদের সংযত করার বিদ্যে আয়ত্ত করতে হয় পুলিশ অফিসারদের। কিন্তু জন মোলারের সেই ভয়ঙ্কর পরিণতি কোনওদিনই ভোলবার নয়। ডিমের খোলা ফেটেফুটে গেলে যেরকম দেখতে হয়, ঠিক সেইভাবেই থেঁতো করা হয়েছিল বেচারার মাথার খুলিকে। আর শিরদাঁড়ার মূলে ওই আঘাতচিহ্নের সৃষ্টি যদি মোলারের জ্ঞান টনটনে থাকার সময়ে করে থাকে, তাহলে যে কি অসীম যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে জ্ঞান লোপ পেয়েছে ওর, তা আর না বললেও চলে!

শিয়ালের গর্তে কিন্তু ধস্তাধস্তির কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি। কাছাকাছি একটা ডোবার নীচে গাঁইতি আর কোদালটা পাওয়া গিয়েছিল। 'এস ভ্যান ডবলিউ' চিহ্নিত একজোড়া কাদামাখা মোজাও খুঁজে পেয়েছিল গোয়েন্দারা। ব্লুমফনটিনে ফিরে এসে দেখলাম কয়েক ঘণ্টা আগেই খবরের কাগজের আবেদন পড়ে পুলিশ স্টেশনে হাজির হয়েছে ভ্যানউইক।

নির্বিকার মুখে ফাঁড়ির ভেতর লম্বা লম্বা পা ফেলে ঢুকে ডিউটি অফিসারকে বলেছিল ভ্যানউইক —'কাগজে পড়লাম আমার সঙ্গে দেখা করতে চান আপনারা। তাই প্রথম ট্রেনেই ফিরে এলাম যদি আপনাদের কোনও কাজে লাগি এই আশায়।'

ভ্যানউইককে এরপর জানানো হল যে আর তার সাহায্যের দরকার নেই। কেননা তার ভাগ্নের লাশ খুঁজে পাওয়া গেছে এবং খুনের অপরাধেই এখন তাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। ডিউটি অফিসারের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল যথেষ্ট। তাই ভ্যানউইকের কাছ থেকে তখুনি কোনও বিবৃতি নিতে সরাসরি অস্বীকার করলেন তিনি। তার কারণ সেই মুহূর্তেই যদি বিবৃতি নেওয়া হয় ওর কাছ থেকে তাহলে পরে হয়তো বলপূর্বক বিবৃতি আদায়ের অভিযোগে অভিযুক্ত হতে পারেন তিনি এবং এই এক চালেই ফেঁসে যেতে পারে কেসটা।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই শোকাবহ শেষ দৃশ্যটার পূর্ণ অভিনয় করার জন্যে ভ্যানউইককে ওয়াটারভালে নিয়ে যাওয়ার আর্জি পেশ করলেন প্রতিবাদী পক্ষের আইনবিদ। বিচারবিভাগও মঞ্জুর করল সে আর্জি। সাক্ষ্য দেওয়ার জন্যে একজন ফটোগ্রাফার আর একজন ডাক্তারও গেলেন সেই দলে। শিয়ালের গর্তের কাছে এসে ঠিক কী ঘটেছিল সেদিন তা বলতে শুরু করল ভ্যানউইক।

আগের বছর প্রতারণার দায়ে গ্রেপ্তারের আশঙ্কায় হুঁশিয়ার ভ্যানউইক একটা বাক্সের মধ্যে তিন হাজার পাউন্ডের নোট ঠেসে বাক্সটাকে লুকিয়ে রেখেছিল বিশেষ একটা গোপন স্থানে। ওয়াটারভালের সেই বিশেষ স্থানটিতে। ওরা যখন পৌঁছোল তখন অমানিশার অন্ধকার ছড়িয়ে পড়েছে এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্তে।

'জমির উপরিভাগ থেকে আঠারো ইঞ্চির মধ্যে দুটো গর্ত দেখতে পেলাম আমরা। দুটো গর্তই বুজিয়ে ফেলা হয়েছে মাটি দিয়ে। ঠিক কোন গর্তটিতে যে বাক্সটি লুকিয়েছে তা যখন স্থির করতে পারলাম না, তখন স্থির করলাম দুটোই খুঁড়ে দেখা যাক। বেশ খানিকটা মাটি তুলে ফেলার পর কোদালটা সরিয়ে রেখে গাঁইতি তুললাম। বাক্সের ওপর যে পাথরটা চাপা দিয়ে গিয়েছিলাম, এই পাথরটা চড় দিয়ে উঠিয়ে ফেলার জন্যেই তুলেছিলাম গাঁইতিটা।

'এই সময়ে মোলার বললে তার বড় তেষ্টা পেয়েছে। জিগ্যেস করলে কোথায় জল পাওয়া যাবে। বললাম, খানিক দূরেই একটা জলের কল আছে। কলটা দেখার জন্যেই ও যখন ধপ করে বসে পড়ল গর্তের কিনারায় তখনই আচমকা আমার মনে হল গাঁইতি তোলার সময়ে হয়তো অজান্তে ওকে জখম করে ফেলেছি আমি। পেছন ফিরে দেখি টলমল করছে ও কিনারার ওপর। গাঁইতি ফেলে ওকে ধরতে গেলাম আমি কিন্তু তার আগেই মাথা নীচের দিকে করে পড়ে গেল ও গর্তের মধ্যে। এবং পড়ল আমারই ওপরে। সামলাতে না পেরে আমিও ছিটকে পড়লাম একদিকে। কানে ভেসে এল শুধু একটা ধপাস শব্দ।

'কান খাড়া করেও যখন আর তার কোনও শব্দ শুনতে পেলাম না তখন গর্তের মধ্যে হাতড়াতে হাতড়াতে খুঁজে পেলাম ওর নেতিয়ে পড়া দেহ। মাথার নীচেই পড়েছিল গাঁইতিটা। দেখলাম। বড় মারাত্মক জখম হয়েছে বেচারি। আর, তার পরেই অন্ধকার হয়ে গেল সব কিছু। এর পরে যে কি হয়েছে তা এখনও মনে করতে পারছি না আমি। এই শোচনীয় পরিণতির আকস্মিকতার আঘাত বোধহয় সামলাতে পারিনি—তাই লোপ পেয়েছিল চেতনা।'

'এরপর কী কী ঘটনা মনে পড়ে তোমার? প্রশ্ন করেন মিঃ এফ. পি. ডি. ওয়েট—কয়েদির কৌন্সলি।

'গাড়ির কাছে আবার ফিরে আসার পরেই চেতনা ফিরে আসে আমার। মাথা ঘুরছিল। ইচ্ছে হয়েছিল গলা ছেড়ে আর্ত চিৎকার করি, ঈশ্বরের কাছে আবেদন জানাই যেন আমাকেও শেষ করে ফেলেন তিনি এইভাবে। গাড়ির মধ্যে উঠে বসেছিলাম তারপর। গাড়িতে স্টার্ট দেওয়ার পর ভাবলাম, অনেক...অনেক দূর চলে যেতে হবে আমায়, তা না হলে শান্তি পাব না আমি।'

এরপর আবার অভিনয় করে দেখানো হল সেই শোচনীয় দুর্ঘটনা। গর্তের মধ্যে নেমে গাঁইতি তুললে ভ্যানউইক। আর, কিনারায় বসে রইল তার কৌন্সলি নিহত মোলার যে অবস্থায় বসেছিল হুবহু সেইভাবে। ফটোগ্রাফ নেওয়া হল এই দৃশ্যের এবং দেখা গেল শূন্যে আন্দোলিত গাঁইতির ফলাটা বাস্তবিকই আঘাত হানছে কিনারায় ঝুঁকে-বসা মানুষটার এমন একটা স্থানে যেখানে চোট পাওয়ার পরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে হতভাগ্য জন মোলার।

আগাগোড়া সমস্ত দৃশ্যটা দেখে ডাক্তারও বললেন যে বাস্তবিকই মোলারের পতন এবং মৃত্যুটি নিছক দুর্ঘটনা ছাড়া হয়তো আর কিছুই নয়। বললেন—'আমার তো মনে হয় তা খুবই সম্ভব। জ্যাকেট ছেঁদা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঠিক ওই জায়গাতেই মারাত্মক চোট পেয়েছে মোলার। আর তার পরেই ভ্যানউইক যেভাবে দেখাল, ঠিক ওইভাবেই সে তাল সামলাতে না পেরে গড়িয়ে পড়েছে গর্তের মধ্যে।'

মোজা ফেলে যাওয়া অথবা ডোবার মধ্যে গাঁইতি আর কোদাল রেখে যাওয়ার রহস্য কিন্তু ব্যাখ্যা করতে পারেনি ভ্যানউইক। জিনিসগুলো বলা ওর পক্ষে সম্ভব নয় এই কারণে যে তখনও নাকি ওর মনের আচ্ছন্নতা কাটেনি এবং সে সময়ে কি করেছে না করেছে তার বিন্দুমাত্র মনে নেই ওর। কিছুদিনের জন্যে মানসিক চিকিৎসালয়ে থাকতে হয়েছিল ভ্যানউইককে। কাজেই মোলারের মৃত্যুর রাতেও যে সে স্মৃতিহীনতায় আক্রান্ত হয়েছিল, তা বোঝা গেল ওর কাহিনি থেকে। মনোসমীক্ষকেরাও সমর্থন জানালেন এ কাহিনি শুনে। তাঁরা বললেন, ওই রকম অবস্থার মধ্যে পড়লে তার পক্ষে স্মৃতি হারিয়ে ফেলা খুবই সম্ভব।

এ কেস যে শেষ পর্যন্ত টিকিয়ে রাখা যাবে না এবং সাফল্য যে এক রকম অসম্ভব তা প্রতিবাদী পক্ষের বিপুল তোড়জোড় দেখেই বুঝলাম। ১৯৩০ সনের ২১ অক্টোবর ফ্রি স্টেটের বিচারপতি-সভাপতি স্যার ইটিন ভিলিয়ার্স এবং ব্লুমফনটিন ক্রিমিন্যাল সেশনের জুরির সামনে হাজির করা হল ভ্যানউইককে। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে অম্লানবদনে সে বললে অ্যাডভেঞ্চার করতে বেরিয়ে দুর্ঘটনায় মারা গেছে মোলার। বিশেষজ্ঞ সাক্ষীদেরও ডাকা হল তার এই কাহিনিকে সমর্থন জানানোর জন্যে।

অভিযোগ সমর্থন করার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে অ্যাটর্নি জেনারেল মিঃ ডব্লি%উ. জি. হোল. কে. সি. বললেন, ভ্যানউইকের বর্ণনা মতো কিনারায় বসে ঝুঁকে পড়ে জলের কল দেখা মোলারের পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয়। তাছাড়া, কাহিনির সত্যতা প্রমাণের জন্যে যে ফটোগ্রাফ তোলা হয়েছে সেগুলিও সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়। কেননা, ফটোগ্রাফার নিজেও স্বীকার করেছে ক্যামেরা একপাশে সরিয়ে বিশেষ এক কোণ থেকে তোলা হয়েছিল ছবিগুলো। কাজে কাজেই কাহিনির সত্যতা প্রমাণিত হওয়া দূরে থাকুক, সম্পূর্ণ মিথ্যা একটা ধারণাই প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস রয়েছে এসব ছবির মধ্যে। যেভাবে মোলার ঝুঁকে বসেছিল কিনারার ওপর এবং যেভাবে শূন্যে আন্দোলিত গাঁইতিটা এসে পড়েছিল তার পিঠের ওপর—তা কৌশলে তোলা ছবি দিয়ে সৃষ্ট চোখের ধাঁধার জন্যেই সম্ভবপর বলে মনে হতে পারে—প্রকৃতপক্ষে তা একেবারেই অসম্ভব। এ শুধু ক্যামেরার বাহাদুরি ছাড়া আর কিছুই নয়।

ঘণ্টা তিনেক পরে জুরিরা ফিরে এসে রায় দিলেন 'আসামী নির্দোষ'। বুক ফুলিয়ে কাঠগড়া থেকে নেমে এল ভ্যানউইক। আইনের প্রহসনে এতটুকু আঁচড়ও লাগল না তার দেহে।

পরের দিন রাস্তায় দেখা হয়ে গেল একজন জুরির সঙ্গে। আমাকে দেখেই পথের ওপরেই তিনি দাঁড় করালেন আমাকে। তারপর, যেন দারুণ অন্যায় করেছেন, এমনিভাবে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীমায় বললেন—'এ ছাড়া আর কী করার ছিল বলুন? ভেবে দেখলাম, বিচারপতি নিজেই ওকে খালাস দেওয়ার পক্ষপাতী। তাই তাঁর বিরুদ্ধে যাওয়া সঙ্গত মনে করলাম না আমরা।'

উত্তরে আমি বললাম—'লিখে রাখতে পারেন, আজ থেকে ছ-মাসের মধ্যে আরও একটা খুনের অপরাধে ভ্যানউইককে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। দ্বিতীয়বার আর পিছলে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না ওর পক্ষে। তবে তার আগে আরও একটা প্রাণ নষ্ট হবে, এই যা দুঃখ।'

তিনমাস পরে আর একটা নৃশংস হত্যার খবর এল। নিহত ব্যক্তি জাতিতে ব্রিটিশ। নাম সিরিল প্রিগ টাকার। ট্রান্সভালে প্রিটোরিয়ার কাছে অ্যাপলেডুর্নয়ে একটা খামারবাড়ির মালিক সে। তারই বাড়ির কাছে মাটির মধ্যে থেকে উদ্ধার করা হল তার দেহ। একটা বাক্সের মধ্যে লাশটা ঠেসে পুঁতে রাখা হয়েছিল একটা বড় ফাটলের মধ্যে। যে হাতুড়ি দিয়ে তাকে পিটিয়ে মারা হয়েছিল, রক্তমাখা সেই হাতিয়ারটাও ওয়াগন-হাউসের মধ্যে কাঠের গাদার নীচে পাওয়া গেল।

সন্দেহভাজন হত্যাকারীর চেহারার বিবরণ ছড়িয়ে দেওয়া হল দেশময় পুলিশের দপ্তরে দপ্তরে। ছোটখাটো মানুষটি, টাক মাথা, ঝুলে পড়া গোঁফ। সম্ভবত ফ্রি স্টেটেরই বাসিন্দা সে। টাকারের সঙ্গে খামারবাড়ি কেনা সম্পর্কে কথাবার্তা চলছিল তার।

আমার ভবিষ্যৎবাণী অর্ধ সময়ের মধ্যেই অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। এবার কিন্তু মস্তিষ্ক বিকৃতির দোহাই শুনলেন না জুরিরা। পূর্ব-পরিকল্পিত এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত হত্যার রায় দিলেন তাঁরা। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হল ভ্যানউইক। শেষ ক'টা দিন বাইবেল পড়ে এবং ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেই কেটে গেল তার। ১৯৩১ সালের ১২ জুন ফাঁসির দড়িতে দু-দুটো নরহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করে গেল সে।

কিছুদিন পরেই আবার আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন মিসেস মোলার। মৃত্যুর ঠিক আগে তাঁর কাছে একটা চিঠি লিখেছিল ভ্যানউইক। চিঠিখানা আমার হাতে দিলেন উনি।

'বোন লুইসা,

ক্ষমা চাওয়ার জন্যে তোমার কাছে যেতে পারছি না আমি। যে শোক তোমায় দিয়েছি জানি না তার কোনও ক্ষমা আছে কিনা। বোন, আমিই খুন করেছি তোমার ছেলেকে। যিশুর দোহাই আমাকে ক্ষমা করো।

স্বীকার করছি, অকারণে তার জীবন-প্রদীপ নিভিয়ে দিয়েছি আমি। যেখানে তাকে খুন করেছিলাম, আমার কোনও টাকাকড়িই পোঁতা ছিল না সেখানে। এই প্রথম আদালতে কেস জিতলাম আমি। আগাগোড়া ডাহা মিথ্যে বলেছি আমি। অন্যান্য কেসে সত্য বলেছিলাম বলেই শাস্তি পেয়েছি বার বার।'

নিছক টাকার লোভেই দ্বিতীয় খুনটা করে ভ্যানউইক! বিক্রয়দলিল জাল করে টাকারের খামারবাড়ির মালিক হয়ে বসার মতলবেই ভদ্রলোককে সরিয়ে দেয় পৃথিবী থেকে। লাশটাকে ফাটলের মধ্যে কবর দেওয়ার পর ধারণা ছিল শত চেষ্টা করলেও তা উদ্ধার করা কারোর পক্ষেই সম্ভব হবে না। একটা খুন করে অনায়াসেই যখন বুড়ো আঙুল দেখাতে পেরেছে সে আইনের রক্তচক্ষুকে, তখন আরও একটা করলেই বা ধরছে কে?

ভাগ্নে নিধনের মোটিভ পরিষ্কার হয়ে যায় যদি ধরে নেওয়া যায়—সত্যি সত্যিই সে বিশ্বাস করত যে মোলার তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আগের চুরির ব্যাপারে। লুকোনো চোরাই টাকা উদ্ধারের অ্যাডভেঞ্চারে একসঙ্গে দুজনের যাওয়া থেকেই এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে আগের চুরির ব্যাপারে মোলারেরও হাত ছিল। শেষ মুহূর্তের অনুতাপের দহনে জ্বলতে জ্বলতে ভ্যানউইক ভাগ্নের নাম মুছে

দিয়েছিল এ কলঙ্ক কাহিনি থেকে। বোনকে এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছিল, তার ছেলে এমন কোনও জঘন্য কাজ করেনি যে তার জন্যে লজ্জিত হতে হবে পরিবারের আর সবাইকে।

অসুন্দর পথে নোংরা জীবন-পর্বে বোধ করি এইটাই তার একমাত্র সুন্দর কীর্তি।

** উইলিয়াম বিনী (দঃ আফ্রিকা) রচিত কাহিনি অবলম্বনে।*

ব্লেড, ক্রিম আর ঘুমের বড়ি

কর্মজীবনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কেসটিকে কোনও তরুণ গোয়েন্দাই ভুলতে পারে না। তার কারণ সে সময়ে সে স্বপ্ন দেখে বুঝি বা এর সফল পরিসমাপ্তির ওপরেই নির্ভর করছে তার সারা ভবিষ্যৎ। যদিও এমনতর ধারণায় সত্যের ছিটেফোঁটাও নেই। পরে অবশ্য পরিণত বুদ্ধি দিয়ে, আরও পরিষ্কারভাবে বিচারবিবেচনা করার শক্তিলাভের পর সে উপলব্ধি করতে পারে কতখানি আজগুবি আর অলীক ব্যাপারের ওপর তার সম্ভবপর সাফল্য আর ব্যর্থতা নির্ভর করেছে। এই জাতীয় অকুতোভয় স্পার্টান দর্শনবাদ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভের পরেই সে গোয়েন্দাগিরিতে আরও পারদর্শী হয়ে উঠতে থাকে। এ জ্ঞানলাভের পথটি কিন্তু কুসুমাস্তীর্ণ নয়। আমার বেদনাময় অভিজ্ঞতা থেকেই আমি তা জেনেছি।

আজ আমি বেলগ্রেডের পুলিশ চিফ। কিন্তু এত বছর পরেও সেদিন ব্যর্থতার কামড় আমার তরুণ মনকে স্বভাবে দংশেছিল এবং যে নিদারুণ নিরাশা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল—আজও তা ঠিক তেমনিভাবে উপলব্ধি করতে পারি। সে সময়ে বেলগ্রেডের হেড কোয়ার্টারে ছিলাম অতি কম মাইনের গোয়েন্দা হিসেবে। যুগোশ্লাভিয়ায় তখন রাজতন্ত্র-শাসন কায়েমি রয়েছে। সালটা ১৯৩৪। গ্রীষ্মকাল। আমার ঠিক ওপরকার চিফ তার ছোট্ট অফিসঘরে আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন— 'জোসেফ, তুমি আমেরিকায় যেতে চাও?'

সেদিনকার আতীব্র উত্তেজনা আজও আমি মনে করতে পারি। প্রস্তাবটা শুনেই চট করে শুধিয়েছিলাম —'আপনি কি সত্যি সত্যিই যেতে বলছেন আমাকে? আমার কপাল ভালো, কিছু কিছু ইংরেজি আমি বলতে পারি।'

'সুযোগটা তোমাকে দেওয়া হচ্ছে শুধু ওই কারণেই। এই ফাইলটা নিয়ে যাও। খুব মন দিয়ে কাগজগুলো পড়ে ফ্যালো। বছরের পর বছর অপরাধীদের যত রেকর্ড আমরা সংগ্রহ করেছি, তার মধ্যে সবচেয়ে সম্পূর্ণ রেকর্ড হচ্ছে এটি। লোকটাকে আমি অন্য দেশের শাসনের আওতা থেকে টেনে এদেশের শাসনব্যবস্থার এখতিয়ারে ফেলতে চাই। কী করে তুমি তা করবে তা আমি জানতে চাই না। আমি শুধু চাই, বিচারের জন্যে তাকে তুমি যুগোশ্লাভিয়ার মাটিতে নিয়ে এসো। বহুদিন ধরে অনেক নারীকে শিকার বানিয়েছে সে। তার অগুন্তি (হলেও হতে পারে) বউয়ের অন্তত একজনকে যে সে খুন করেছে, সে বিষয়েও আমাদের মনে আর কোনও দ্বিধা বা সন্দেহ নেই। তার একমাত্র উপযুক্ত স্থান হচ্ছে যুগোশ্লাভ কারাগার।'

আইভান পোডারজে-র অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রথম খবর এইভাবেই কানে পৌঁছোল আমার। জন্ম তার যুগোশ্লাভিয়ায়। পেশায় সে পয়লা নম্বরের ভণ্ড। বহু নারীকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে সে এবং ধনবতী মহিলাদের সংখ্যাই তাদের মধ্যে বেশি। তার পিছু নিয়ে ইউরোপ থেকে যেতে হয়েছে আমেরিকায়, আবার ফিরে আসতে হয়েছে ব্রিটেন, ফ্রান্সে, জার্মানিতে আর অস্ট্রিয়ায়। শেষকালে ওয়ল্টাস আর প্রেটার ভায়োলেটের শহর ভিয়েনায় মুখোমুখি হয়েছিলাম তার।

কেসটা হাতে নেওয়ার পরেই নিউইয়র্কে হাজির হলাম আমি। কেসটা সম্বন্ধে তখন কত আশা, কত স্বপ্নই না ছিল আমার মনে। ভাবতাম যে লোকটাকে গ্রেপ্তার করে আদালতে হাজির করার গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমার কাঁধে, তাকে হাতের মুঠোয় আনার তদন্ত-পর্বের এই বুঝি প্রথম পর্যায়। ভাবতাম, এ তদন্তের অন্তে সাফল্য থাকবেই এবং ধুরন্ধর বদমাশটাকে আমি গ্রেপ্তার করবই। কেসটা প্রাথমিক কাজ দেখেই আমার হুঁশিয়ার হওয়া উচিত ছিল। পোডারজের ধড়িবাজি আর পিছলে বেরিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা এত বেশি যে,

বঁড়শিতে গাঁথা হতভাগিনীদের অর্থে সে শুধু বিলাসবহুল জীবনই যাপন করেনি, তার প্রাপ্য শাস্তিকে এক ধাপ টপকে যাওয়ার মতো বুদ্ধিমত্তা যে তার মগজে আছে, তার আমার বোঝা উচিত ছিল।

লোকটার গতিবিধি সম্বন্ধে খুবই আবছা খবর রাখত আমেরিকার ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্ট। গত বছরের আগে যুগোশ্লাভ কনটিনজেন্টের কেউই নাকি তাকে দেখেনি। কিন্তু নিউইয়র্কের পুলিশবাহিনীর কাছ থেকে সব সময়ে সব রকম সাহায্য আমি পেয়েছিলাম। তাঁরাই আমাকে জানালেন, কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিপথ থেকে বেমালুম উধাও হয়ে যাওয়ার কিছু আগেই পোডারজে নাকি আবার বিয়ে করেছিল। মেয়েটির নাম অ্যাগনেস টাফভারসন। শহরের নামকরা কর্পোরেশন আইনবিদ সে। বয়স প্রায় তেতাল্লিশ। দারুণ ধূর্ত। বিয়ের আগে পর্যন্ত একটু নিরিবিলি নিঃসঙ্গ জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিল সে।

মানহাট্টানে 'লিটল চার্চ অ্যারাউন্ড দ্য কর্নার'-এর মিনিস্টারের কাছ থেকে কয়েকটি তথ্য সংগ্রহ করলাম আমি।

ভদ্রলোক বললেন—'কিছুদিন আগেই এক যুগোশ্লাভ ভদ্রলোকের বিয়ের খুঁটিনাটি তদারক করতে হয়েছে আমাকে। বিয়ের সাক্ষীরা আসলে তাঁকে চিনতই না। এই গ্রামেরই বাসিন্দা তারা। খুব শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয় বিয়ের অনুষ্ঠান। তার পরেই গাড়ি হাঁকিয়ে চলে যান বর-বউ। আর তাঁদের দেখা যায়নি।'

অন্যান্য সূত্র থেকে অ্যাগনেস টাফভারসনের কুক্ষণে-শুরু রোমান্সের কাহিনিও শুনতে পেলাম। বিয়ের কয়েকমাস আগে সে ইউরোপে গিয়েছিল ছুটি উপভোগ করতে। তখনই ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরাতে তার সঙ্গে আলাপ হয় পোডারজে-র। মেয়েদের চিরকালই চুম্বকের মতো কাছে টেনে আনতে পারে পোডারজে। অ্যাগনেসের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। পোডারজেকে ভীষণ ভালো লেগে গেল তার। অ্যাগনেসকে পোডারজে বুঝিয়ে দিলে সে যুগোশ্লাভিয়ার অবসরপ্রাপ্ত আর্মি অফিসার। নিজের সম্পত্তিও আছে যথেষ্ট। নিজস্ব কতকগুলো পেটেন্ট কৌশল প্রয়োগ করাই পছন্দ করত পোডারজে। ব্যবসা সম্পর্কিত নানাবিধ ঝুঁকি নেওয়ার সময়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে বিস্তর আমোদ পেত। হাবভাব রীতিমতো মার্জিত আর শিক্ষিত ছিল সে। আন্তর্জাতিক আইনকানুনও কিছু কিছু জানত। যখনই দেখা হত দুজনের, খট করে গোড়ালি ঠুকে সম্ভ্রমভাবে অ্যাগনেসের হাতে চুম্বন এঁকে দিত পোডারজে। আর তাইতেই গলে গেল অ্যাগনেসের মন! অ্যাগনেস নিজেও কিন্তু বিলক্ষণ ধূর্ত ছিল। ধীশক্তিও ছিল যথেষ্ট। কিন্তু মেয়েদের প্রতি কোনও পুরুষ যে এতখানি আদবকায়দা আর শিষ্টাচার দেখাতে পারে, তা তার আগে জানা ছিল না। অন্তত তার বরাতে এমনটি এর আগে আর জোটেনি। বিশেষ করে ওই রকম বিপজ্জনক বয়েসে, যে বয়েসে প্রেমমাত্রই একদম অন্ধ, সে বয়েসে চিত্তজয়ের এই অভিনব পন্থাটির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম যা হবার, তা হল।

মায়াবী জাদুকরের মতোই অ্যাগনেসকে মোহমুগ্ধ করে ফেললে পোডারজে। কিন্তু প্রথম থেকেই হুঁশিয়ার হয়ে প্রেমাস্পদ সম্বন্ধে যদি একটু খোঁজ-খবর করতে। অ্যাগনেস, তাহলেই অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্যই জানতে পারত সে। চওড়া-কাঁধ কোঁকড়া চুল পোডারজেকে দেখে কিন্তু তার সত্যিকারের বয়েসের চাইতে অনেক কমবয়েসি বলেই মনে হত। এই কান্তিমান প্রিয়ংবদ মানুষটি যে আসলে একটা পাকা ঠগ—তা জানতে তার বেশি সময় লাগত না। তার সন্ধানে শুধু যে তার স্বদেশের পুলিশই ঘুরছে তা নয়—বহু জায়গায় পুলিশবাহিনী বিভিন্ন ধরনের বিস্তর আইনবিগর্হিত কার্যকলাপের জন্যে তাকে খুঁজছিল। এসব অপরাধের মধ্যে গভর্নমেন্ট এবং আর্মি অফিসারের ছদ্মবেশ ধারণও আছে। কিন্তু বুদ্ধিমতী হওয়া সত্ত্বেও এই ঝামেলাটুকুর মধ্যে আর যেতে চায়নি অ্যাগনেস। তার কারণও ছিল। প্রথমত সে নারী তার ওপর প্রেমে অন্ধ। দ্বিতীয়ত মনচোর প্রিয়জনের সঙ্গে ইউরোপের বড় বড় শহরগুলো দেখতে পাওয়ার সুখ স্বপ্নেও সে তখন মশগুল। পোডারজেও হচ্ছে সেই ধরনের লোক, যে জাতিগত সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে সব দেশকেই যে স্বদেশ মনে করে এবং এদিক দিয়ে তার অভিজ্ঞতাও বড় কম নেই। কাজে কাজেই দেশবিদেশের হরেকরকম গল্প শুনিয়ে অ্যাগনেসের মনের আকাশে রাশি রাশি রঙের স্বপ্ন ছড়িয়ে দিতে বিন্দুমাত্র কসুর করলে না সে।

ভিয়েনায় একসঙ্গে নাচলে ওরা দুজনে। নিউইয়র্কের রক্ষণশীল কোনও মহিলার কাছে এ অভিজ্ঞতা তো নিদারুণ রোমান্টিক মর্মস্পর্শী এবং কোনওদিনই ভুলতে পারা যায় না।

অ্যাগনেস নিউইয়র্কে ফিরে এল বন্ধুবান্ধব আর ব্যবসায়ী মহলের পরিচিত সবাই লক্ষ্য করলে সুখ আর আনন্দ যেন উপছে তার মনের দুকূল ছাপিয়ে, ঝরে পড়ছে তার চোখে, মুখে, হাসিতে। শুধু তাই নয়। তার বয়সও যেন কমে এসেছে অনেকটা। পোডারজের প্রতীক্ষায় ছিল অ্যাগনেস। কয়েকদিনের মধ্যেই রওনা হল সে। ১৯৩৩ সালের নভেম্বর মাসে যুগোশ্লাভের পুলিশ যখন তাকে তন্নতন্ন করে খুঁজছে, ঠিক তখনই জাহাজে চেপে পাড়ি দিলে সে আমেরিকার দিকে। নিউইয়র্কে পৌঁছে আস্তানা নিলে গ্রেমার্সি পার্কের একটা ছোট্ট হোটেলে।

পুনর্মিলনের কিছুদিন পরেই অসুস্থ হয়ে পড়ে অ্যাগনেস। সুযোগটাকে পুরোমাত্রায় কাজে লাগালে পোডারজে। অ্যাগনসের প্রতি তার অনুরাগ যে কতখানি গভীর তা এই সুযোগে অন্তরস্পর্শী অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে বুঝিয়ে দিলে ও। কথাবার্তা আদবকায়দায় তো তার জুড়ি মেলা ভার। তার ওপর মনটাও যে কতখানি নরম—তা প্রমাণিত হল তখনই। সুস্থ হয়ে উঠলে ডিনার, কনসার্ট আর ব্রডওয়ে শো নিয়ে ক'দিন খুব ফূর্তি করল দুজনে।

ওদের প্রাকবিবাহ প্রেমপর্বের শেষ পর্যায়টা কিন্তু খুবই সংক্ষিপ্ত। ওই বছরের ডিসেম্বরের চার তারিখে বিয়ে হয়ে গেল ওদের। যে ফ্ল্যাটে দীর্ঘদিন একাকী নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করেছে অ্যাগনেস, বিয়ের পর পর সেই ফ্ল্যাটেই উঠে এল পোডারজে। সবকিছুই ঘটে গেল খুবই তাড়াতাড়ি। অ্যাগনেসের ফ্যামিলির সঙ্গে পোডারজের কোনওদিনই দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। বিয়ের রাতে অ্যাগনেস ডেট্রয়েটে তার বাড়িতে আর মনট্রিয়ালে তার বোনকে টেলিফোন করে জানালে বিবাহসংবাদ।

কাকপক্ষীকে না জানিয়ে বিয়ে শেষ করার কারণ বোঝাতে গিয়ে অ্যাগনেস বলেছিল—'ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে তোমাদের কাউকেই আমন্ত্রণ জানাতে পারলাম না। ছ'ঘণ্টা আগেও আমি জানতাম না যে বিয়ে করতে চলেছি আমি। কিন্তু বিশ্বাস করো মানুষটিকে দারুণ ভালোবাসি আমি। সারা দুনিয়ার এমন চমৎকার মানুষ আর দুটি নেই।'

অ্যাগনেসের আত্মীয়স্বজনেরা পরে আমাকে বলেছিল পোডারজেও নাকি টেলিফোনে কথা বলেছিল তাদের সঙ্গে। বলেছিল—'মধুচন্দ্র যাপন করতে আমরা ইংল্যান্ড রওনা হচ্ছি। সেখান থেকে জার্মানিতে আমার এস্টেটে কয়েকটা দিন থাকব। সত্যি কথা বলতে কি মাস ছয়েকের আগে অ্যাগনেসের সঙ্গে আপনাদের আর দেখাই হবে না। জার্মানি থেকে আমরা যাব যুগোশ্লাভিয়ায়। যে দেশে আমার জন্ম, অ্যাগনেসকে আমি নিয়ে যেতে চাই সে দেশের মাটিতে।'

ছ'মাসব্যাপী মধুচন্দ্রের প্রস্তুতি নিয়ে কিছুদিন ব্যস্ত রইল অ্যাগনেস। কেনাকাটা করা, প্যাক করা ছাড়াও টাকাকড়িরও একটা পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করতে হল ওকে। ব্যাঙ্ক থেকে ২৫০০০ ডলার তুলল ও। ৫০০০ ডলার বাদে পুরো অর্থটাই তুলে দিলে তার প্রিয় 'ক্যাপ্টেনে'র হাতে। স্বামীকে সে ক্যাপ্টেন বলেই জানত। টাকা রাখা হল একটা জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে। বাকি টাকাটা পাঠিয়ে দেওয়া হল লন্ডনে। ডিসেম্বর মাসের কুড়ি তারিখে ওদের ইংল্যান্ড রওনা হওয়ার দিন ধার্য হয়েছিল। ওদের মধ্যে, ক্যাপ্টেন আর মিসেস পোডারজের। জাহাজটার নাম 'হামবুর্গ'। সে সময়ে নাৎসিদের পতাকা উড়ত হামবুর্গের ওপর।

যাত্রার দিনটি এগিয়ে আসতে থাকে। অ্যাগনেস একদিন জাহাজে গিয়ে কিছু মালপত্র রেখে এল তার কেবিনে। কেবিনটা শুধু তার একার জন্যেই বুক করা হয়েছিল। যাত্রীদের তালিকায় তার স্বামীর নাম ছিল না। নামটি যে কেন বাদ গেল এবং এই বাদ দেওয়ার পেছনে কোনও কুমতলব আছে কিনা—এ ধরনের কোনও সন্দেহ অ্যাগনেসের প্রণয়-নিবিড় মগজে স্থান পায়নি। স্বামীর ওপর তার অগাধ বিশ্বাস। পোডারজে বউকে কী বুঝিয়েছিল, তা কোনওদিনই জানা যায়নি। তবে অ্যাগনেসের পরিচারিকা ফ্লোরা মিলারের কাছে

জানা গেছিল মিসেস পোডারজে নাকি তাকে বলেছিলেন যে ব্যবসা-সম্পর্কিত কিছু কাজকর্মের জন্যে কিছুদিন পরে রওনা হবেন তাঁর স্বামী।

কয়েকজন সাক্ষী বললে, পোডারজে নাকি তাদের কাছে এমন একটা দোকানের ঠিকানা চেয়েছিল যেখানে দেশভ্রমণে উপযুক্ত একটা পেল্লায় ট্রাঙ্ক কিনতে পাওয়া যায়। সমস্ত জামাকাপড় সে একটা ট্রাঙ্কে রাখাই পছন্দ করে—বিশেষ করে সাগরপাড়ি দেওয়ার সময়ে। থার্ড অ্যাভিন্যুতে এমনি একটা দোকান পেয়েছিল সে। মস্ত বড় একটা পুরোনো ট্রাঙ্কও কিনেছিল। ডেলিভারি দেওয়ার পর তারই নির্দেশমতো ট্রাঙ্কটা রাখা হল বাড়ির নীচের তলায়। সেই রাতেই সেকেন্ড অ্যাভিন্যুতে সাইমন ফেইনগোল্ডের ওষুধের দোকানে গেছিল পোডারজে। ইউরোপের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা চলে দুজনের মধ্যে। ফেইনগোল্ড একবার বলেছিলেন, এ অবস্থায় পোডারজের আত্মীয়স্বজনের জীবনের আশঙ্কা পদে পদে। শুনে হেসে উঠেছিল পোডারজে। তার বিশ্বাস জার্মানির হর্তাকর্তা হিসেবে আর বেশিদিন টিকে থাকতে হবে না হিটলারকে। দশ ডলার দামের দাড়ি কামানোর ব্লেড, মুখে মাখার ক্রিম, আর ঘুমের বড়ি কিনে ছিল ও। সমুদ্রযাত্রার জন্য নাকি এগুলো তার দরকার। নিউইয়র্ক স্টেট ল-র বিধান অনুসারে ঘুমের বড়ির ক্রেতা হিসেবে রেজিস্টারে সই দিয়ে গেছিল পোডারজে।

দোকান থেকে সিধে ফ্ল্যাটে বউয়ের কাছে ফিরে আসে ও। এসে দেখে অ্যাগনেসকে জিনিসপত্র গুছোতে সাহায্য করছে পরিচারিকা ফ্লোরা মিলার। অনেক রাত হয়ে গেছিল। সারাদিন বড় খাটুনি গেছিল ফ্লোরার। তাই পোডারজে ওকে তখনকার মতো ছুটি দেয় এবং বলে পরের দিনও তার ছুটি রইল আজকের অতিরিক্ত খাটুনির দরুন।

একটু পরেই দরজায় টোকা শোনা যায়। টোকা দিচ্ছিলেন ওষুধের দোকানের মালিক ফেইনগোল্ট। পোডারজের কাছ থেকে বিশ ডলারের বিল নিয়ে বাকি ডলার ফেরত দেওয়ার সময়ে তিনি দুটো ডলার বেশি দিয়ে ফেলেছেন। দরজাটা সামান্য ফাঁক করে ফেইনগোল্ডের কথা শুনেছিল পোডারজে। তারপর ফাঁক দিয়ে বাড়তি ডলার ঠেলে দিয়ে রেগেমেগে দড়াম করে বন্ধ করে দিয়েছিল দরজার পাল্লা।

পরের দিন অ্যাগনেসকে দেখা গেল না। সন্ধের আগে পর্যন্ত তার স্বামীরও পাত্তা পাওয়া গেল না। সন্ধের সময়ে বাড়ি ফিরে একতলা থেকে ট্রাঙ্কটা নিজে ঘরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে লিফট-এ তুলে দিলে সে। পরের দিন সকলে উঈসবার্জার ট্রান্সপোর্ট কোম্পানিকে খবর দিলে ট্রাঙ্কটা নিয়ে যাওয়ার জন্যে। হোয়াইট স্টারের জাহাজ 'অলিম্পিকে' ট্রাঙ্কটা তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল পোডারজে। পোডারজের পরিকল্পনামতো বন্দোবস্তের কিছু কিছু একজন কেরানি জানত। ও তাকে বুঝিয়েছিল—'আমার স্ত্রী আগেই রওনা হয়ে গেছে। ইংল্যান্ডেই তার সঙ্গে দেখা হবে আমার।' ২২ ডিসেম্বর ফ্ল্যাটে ফিরে এসেছিল পরিচারিকা ফ্লোরা মিলার। তার জন্যেও একটা গল্প বানিয়ে রেখেছিল 'ক্যাপ্টেন'। বলছিল—'কয়েক দিনের জন্যে ফিলাডেলফিয়া গেছেন মাদাম।'

রওনা না হওয়া পর্যন্ত 'ক্যাপ্টেনের' টুকিটাকি কাজ করে দিলে ফ্লোরা। 'অলিম্পিকে' নিয়ে যাওয়ার জন্যে উঈসবার্জার কোম্পানি তার চারটে ট্রাঙ্ক আর অন্যান্য মালপত্র বুঝে নিতে এলে, পোডারজে কিন্তু তার 'ক্যাপ্টেন'-সুলভ পদমর্যাদা আর সম্ভ্রান্ত ঘরের অভিজাত পুরুষের চালচলনটা পুরোপুরি বজায় রাখতে পারলে না। মালপত্র বওয়ার কাজে একরকম জোর করেই নিজেও হাত লাগালে। শুধু তাই নয়। ট্রাক ড্রাইভারের সঙ্গে জেটি পর্যন্ত গেল এক গাড়িতে মালপত্রের সঙ্গে, সেখানে ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মালপত্র ঠিকমতো নামানো হচ্ছে কিনা, তার তদারকি করলে। এমনকী, যেভাবে তার হুকুম-মাফিক মাল নামানো উচিত, তা ঠিকমতো তামিল না হওয়ায় দু-চারবার তো অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজও করতে ছাড়লে না।

অর্ধেক মালপত্র নিয়ে যাওয়ার হল ডেকের নীচে। বাকি মাল, তার মধ্যে বিশাল ট্রাঙ্কটাও ছিল, রাখা হল পোডারজের কেবিনে। ওর সৌভাগ্যক্রমে কি দুর্ভাগ্যক্রমে তা জানি না, পোডারজের বরাতে যে কেবিনটি

জুটেছিল সেটি একদম নীচের ডেকের—জলরেখার ঠিক ওপরেই। ছোট্ট কিন্তু বেজায় আরামপ্রদ কেবিনটা। পোর্ট হোলের ভেতর দিয়ে কোনও কিছু সাগরের জলে ফেলে দেওয়াটাও মোটেই কঠিন কাজ নয়।

যাত্রা শুরু হওয়ার সময় ঘনিয়ে এলে নিজের কেবিনে সেঁধিয়ে পড়ল পোডারজে। সদ্যবিবাহিত হলেও তখন সে বধূহীন। অ্যাগনেসকে কেউই দেখেনি। সে কোথায় অথবা কি অবস্থায় আছে—তা কেউ জানত না। কিন্তু পোডারজের দিব্বি হাসিখুশি মেজাজে এতটুকু বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। বেয়ারা ধরনের কোনও প্রশ্নেরও সম্মুখীন হতে হল না তাকে।

ছ'দিনের যাত্রায় কিছু চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটল না। কেবিন ছেড়ে একেবারেই বাইরে বেরোয়নি পোডারজে। তাতে অবশ্য আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। বহু প্যাসেঞ্জারই তার মতো কেবিন ছেড়ে বাইরে আসা পছন্দ করেনি সমুদ্র-পীড়ার ভয়ে।

'অলিম্পিকে'র স্টুয়ার্ডের সঙ্গে অনেক কথা হল আমার। আমার আগেই অবশ্য নিউইয়র্ক পুলিশও তাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে গেছিল।

আমার প্রশ্নের উত্তরে সে বললে—'ক্যাপ্টেন পোডারজে মানুষটি ভারি চমৎকার। অল্প কথা বলার স্বভাব তাঁর একেবারেই নেই। সারবিয়ান চাষা আর তাদের খাসা খানা সম্বন্ধে কথা বলতে দারুণ ভালোবাসতেন তিনি। আমার মনে হয় ইউরোপের জন্যে তাঁর প্রাণ কেঁদেছিল বলেই ফিরে চলেছিলেন উনি। একবার কথায় কথায় আমাকে বলেছিলেন—আমেরিকা আমার জন্যে নয়। বেজায় বড় এই দেশটা। আর, এখানকার প্রতিটি লোক দিনরাত হন্যে হয়ে ছুটছে টাকার পেছনে। যে দেশে জীবনে এত সংঘাতময়, সে দেশের তোয়াক্কা করি না আমি।'

স্টুয়ার্ডের কাছে পোডারজে গল্প করেছিল সে নাকি একটা নতুন ধরনের সিন্দুক বিক্রি করতে এসেছিল আমেরিকায়। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে তার প্রচেষ্টা।

জিগ্যেস করেছিলাম—'ট্রাঙ্কটা তাঁকে কি কোনওদিন খুলতে দেখেছেন?

'ইয়েস, স্যার, হামেশাই দেখেছি। একবার ভেতর থেকে একটা নেকটাই বার করে আবার ভেতরে রেখে দিয়েছিলেন উনি।'

'কেবিনের মধ্যে কোনও বিটকেল গন্ধ পেয়েছিলেন কি?'

'না স্যার, ও ধরনের কোনও গন্ধ তো ছিল না!'

পরে আমি জেনেছিলাম 'ক্যাপ্টেনে'র জন্যে আরও একজন অপেক্ষা করেছিল ইংল্যান্ডে। নাম তার মার্গারিট সুজান বাট্রান্ড পোডারজে—তার আইন-সম্মত বউ। মার্গারিটের সঙ্গে বিয়ে হয় ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে। শুধু তিনজন নারীকেই সারা জীবনে বিয়ে করেছিল পোডারজে—অ্যাগনেস ছিল এই তিনজনেরই একজন। এ ছাড়াও তার হবু-পত্নীর সংখ্যা বড় কম ছিল না।

যুগোশ্লাভের রেকর্ড ঘেঁটে আমি জেনেছিলাম, বেলগ্রেডের একটি মহিলাকেও 'বিয়ে' করেছিল পোডারজে। প্রচুর অর্থ পকেটস্থ করে রাতারাতি মেয়েটাকে পথে বসিয়ে যায় সে।

পোডারজের সঙ্গে বিচ্ছেদজনিত বিরহবেদনা এতটুকু স্পর্শ করেনি মার্গারিটকে। অন্তত বাইরে থেকে দেখে তো তাই মনে হয়েছিল। দুজনের স্বচ্ছলভাবে চলে যাওয়ার উপযুক্ত টাকা না আনা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না তার। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দরকার তার এবং তা যেনতেন-প্রকারেণ পেলেই হল। স্বামীকে লেখা তার একটা চিঠি পরে পেয়েছিলাম। নিউইয়র্কে ক্যাপ্টেনকে লেখা এই চিঠিটায় সে লিখেছিলঃ

'কীভাবে তুমি টাকা রোজগার করে এনে দাও আমাকে। এন্তার টাকা জমিয়ে যাও—যে-কোনও পন্থায় প্রচুর টাকা রোজগার করে এনে দাও আমাকে। সে টাকা কীভাবে আসছে, তা নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর দরকার নেই। যে চালে আমরা চলতে চাই, সে চালে চলার মতো যথেষ্ট অর্থ পেলেই আমার হল।'

লন্ডনে পোডারজে এসে পৌঁছোলে স্বমূর্তি ধারণ করলো মার্গারিট। অ্যাগনেসের জড়োয়া গয়নাগুলো নতুন ডিজাইনে বানিয়ে নেওয়া হল। পোশাকগুলোও নতুন করে কেটে সেলাই করা হল মার্গারেটের গায়ের মাপে।

নিপাত্তা মহিলার ২৫০০০ ডলারেরও আর কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না।

অ্যাগনেসের আত্মীয়স্বজনরা জানত 'স্বামী'র সঙ্গেই ২০ ডিসেম্বর হামবুর্গ রওনা হয়েছে অ্যাগনেস। কয়েক হপ্তা পরে লন্ডন থেকে মনট্রিয়লে স্যালি টাফভারসনের কাছে একটা টেলিগ্রাম এসে পৌঁছোলঃ

'এখানকার আবহাওয়া ভালো লাগছে না। ভারতবর্ষের দিকে চলেছি। পরে চিঠি লিখব।— অ্যাগনেস।'

তিন মাস পরে ১৯৩৪ সালের এপ্রিলের শেষাশেষি ভারতবর্ষ বা পৃথিবীর কোনও দেশ থেকে কোনও খবর এসে পৌঁছোল না পরিবারবগের কাছে। মহা চিন্তায় পড়লেন স্যালি টাফভারসন। না ভেবেচিন্তে তো কোনও কাজ করার অভ্যেস নেই অ্যাগনেসের। বুদ্ধি বিবেচনাও ওর প্রচুর। বোনেদের মধ্যে বয়েসে সবচেয়ে বড় বলে স্যালির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতাটা একটু বেশি। আর তাই এরকম চুপচাপ থাকাটা তো অ্যাগনেসের পক্ষে শোভা পায় না।

নিউইয়র্কে এসে পৌঁছোলেন স্যালি টাফভারসন। দেখা করলেন নিরুদ্দেশ ব্যক্তিদের পুলিশ ব্যুরোর প্রধান ক্যাপ্টেন জন জে আয়ারস-এর সঙ্গে।

'নেহাতই ছেলেমানুষি বলে মনে হয় তাই নয়? দেহ-মনে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে যে মেয়েটি, আইনবিদ হিসেবেও সুনাম কিনেছে যে, সে কিনা হঠ করে বিয়ে করে বসল একজন বিদেশিকে এবং তার পরেই পা বাড়াল দেশের বাইরে। সে যাই হোক, কিন্তু এই চুপচাপ থাকাটাই যে বেজায় ভাবিয়ে তুলেছে আমায়। তিন মাস একটা খবর নেই, অদ্ভুত নয় কি? ওদেরকে খুঁজে বার করার কোনও উপায় কি নেই?' ক্যাপ্টেন আয়ারসকে শুধিয়েছিলেন স্যালি।

এই সাক্ষাৎকারের ফলেই বেলগ্রেডে একটা টেলিগ্রাম এসে পৌঁছোল আমাদের দপ্তরে। আইডান পোডারজের কুলজি জানাতে হবে। টেলিগ্রাম পেয়েই পোডারজের ক্রিমিন্যাল রেকর্ডের খুঁটিনাটি পাঠিয়ে দিলাম আমরা। সেই সঙ্গে প্রস্তাব করলাম তদন্তে সাহায্য করার জন্যে এখান থেকে কাউকে পাঠালে ভালো হয় না কি? দীর্ঘদিন ধরে যার সন্ধানে আমরা ঘুরছি, তাকে তো আমাদেরও গ্রেপ্তার করা চাই।

আর, এইভাবেই শুরু হল একটি মানুষের পেছনে দীর্ঘদিন ধরে যাওয়ার পালা। গেলাম নিউইয়র্কে। গেলাম পৃথিবীর আরও অনেক দেশে। দেশে দেশে ঘুরেছি একটি মাত্র লক্ষ্যকে সামনে রেখে, যেভাবেই হোক জালে ফেলতে হবে পোডারজেকে। কিন্তু খুবই অল্প সংখ্যায় আসতে লাগল সূত্রগুলো। তারপর নিউইয়র্ক ত্যাগ করার সময় ঘনিয়ে এল রওনা হলাম ফ্রান্স অভিমুখে। প্যারীতে পৌঁছে গেলাম ইন্টারপোল-এর (ইন্টারন্যাশনাল পুলিশ অরগ্যানাইজেশন) অফিসে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বেরিয়ে গেল ছদ্ম ক্যাপ্টেনের নামে।

কিন্তু অত্যন্ত তুখোর আর সাপের মতোই পিচ্ছিল সে। শেষকালে একটা খবর পেলাম। ভিয়েনায় মিস্টার এবং মিসেস পোডারজে নামে এক দম্পতিকে দেখা গেছে। প্রেমবুভুক্ষু হতভাগিনী মরণ-ফাঁদে পা দিয়েছিল এই ভিয়েনা শহরেই। আর জানা গেল, ক্যাপ্টেন আর তার স্ত্রী নাকি বেজায় ফূর্তিতে আছে। শহরের প্রান্তে বহাল তবিয়তেই দিন কাটছে দুজনের। হামেশাই দেখা যাচ্ছে দুটিকে।

ভিয়েনা শহরটা বরাবরই ভালো লাগে আমার। তাই এ শহরে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে খুশিই হলাম। শহরে পৌঁছোনোর পর দেখলাম মিসেস পোডারজে মেয়েটি অ্যাগনেস নয়, মার্গারিট—ধুরন্ধর শিরোমণির আসল বউ। এ তথ্য আবিষ্কার করার পর কিন্তু মোটেই অবাক হইনি আমি।

দুপাশে দুজন অস্ট্রিয়ান গোয়েন্দাকে নিয়ে দেখা করলাম পোডারজের সঙ্গে। ভয় পাওয়া তো দূরের কথা, ঘাবড়ে গিয়ে আমতা আমতা করার কোনও লক্ষণই দেখলাম না তার কথাবার্তায়।

মোলায়েম স্বরে আমার প্রশ্নের উত্তরে ও বললে—'অ্যাগনেস টাফভারসানকে চিনি বইকি। ভারি চমৎকার মহিলা। তাঁর কিছু উপকার করতে পেরে আমি নিজেও আনন্দ পেয়েছিলাম। লন্ডনে থাকার সময়ে তাঁর জন্যে কিছু টাকাও খরচ করেছিলাম।'

'বিয়ে করেননি অ্যাগনেসকে?' প্রশ্নটা করলাম ফরাসি ভাষায় যাতে মার্গারেটের বুঝতে অসুবিধা না হয়।

মার্গারিটের মুখচ্ছবি দেখে স্পষ্ট বুঝলাম বিয়ে সম্পর্কে বিন্দুবিসর্গ খবর রাখে না সে। ভাবলাম দেখা যাক নিজের পাতা ফাঁদ থেকে কী করে এবার বেরোয় বাছাধন।

'মিস টাফভারসনকে বিয়ে? হাসালেন যা হোক। তাঁকে যে ভালো করে চিনিই না আমি। নিউইয়র্কে বিয়ে করেছিলাম? না, না, যত সব গাঁজাখুরি গল্প শুরু করেছেন দেখছি। গ্রীষ্মের অবকাশে প্যারী গিয়ে তাঁর সঙ্গে কয়েকটা দিন বেশ আনন্দেই কেটেছিল। এখন তিনি ভারতবর্ষে রয়েছেন। এছাড়া তাঁর সম্বন্ধে আর কোনও খবরই রাখি না আমি। তাঁর সঙ্গে কেউ আছে কি, তিনি একলাই দেশভ্রমণ করছেন—অত খবর আমি রাখি না।'

খুব ভদ্রভাবে পোডারজেকে ধন্যবাদ জানালাম এতগুলো খবরাখবর সরবরাহ করার জন্যে। তারপর বিদায় নিলাম—এবং তাও একটা বিশেষ কারণেই। আমাদের মতলব ছিল যথেষ্ট দড়ি ছেড়ে ওকে খেলানো, তারপর এক মোক্ষম প্যাঁচে ফাঁসানো। এ ছাড়াও ওদের বিয়ের সার্টিফিকেটের একটা কপি অথবা অন্য কোনও দলিল হাতে আনতে চেয়েছিলাম আমি। এ দলিল আনতে হবে নিউইয়র্কের মিনিস্টারের কাছ থেকে এবং একটি জিনিস দিয়েই তর্কাতীতভাবে প্রমাণ করে দেওয়া যাবে যে নিউইয়র্কের লিটল চার্চ অ্যারাউন্ড দ্য কর্নার-এ বিয়ে হয়েছিল তাদের।

দিন কয়েক পরেই ফিরে এলাম পোডারজের আস্তানায়। নিউইয়র্কের পুলিশ আর মিনিস্টারের পাঠানো টেলিগ্রামগুলো আমার হাতেই ছিল। 'ক্যাপ্টেন' আর তার বউকে দলিলগুলো দেখালাম।

ফ্যাকাশে হয়ে গেল মার্গারিট। মিসেসের মুখ দেখে অনুনয়ের সুরে পোডারজে বলে উঠল—'এতে কি আসে যায়, মার্গারিট? তুমি তো সবই জানো। আমেরিকায় মেয়েগুলো এমনই নির্লজ্জ বেহায়া যে ওকে বিয়ে না করে পারিনি আমি। সাময়িক শান্তিলাভের জন্যেই বিয়েটা হয়েছিল। আমি যে বিবাহিত, সে তা জানত। কাজেই আমার আর কোনও উপায় ছিল না। ডার্লিং তুমি বিশ্বাস করো—'

কিন্তু কেউই বিশ্বাস করতে পারল না ওকে। মার্গারিট তো নয়ই আমিও না।

এরপর কিন্তু আমাদের কাছে সে সবকিছুই অস্বীকার করে বসল এমন কি বিয়েটাও।

২০শে ডিসেম্বর জাহাজে ওঠার জন্যে আমরা প্রস্তুত। এমন সময়ে জেটির ওপরেই ঝগড়া হয়ে গেল ওর সঙ্গে। রক্ষিতা স্ত্রী হিসেবে আমার সঙ্গে সাগর পাড়ি দিতে চাইল না অ্যাগনেস। চাপ দিতে লাগল আনুষ্ঠানিক বিয়ের জন্যে। কিন্তু আমার পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। কাজেই আমার সঙ্গ ত্যাগ করে চলে গেল ও। প্রথমে বলেছিল, সেই রাতেই একলা সাগর পাড়ি দেবে সে। কিন্তু ফ্ল্যাটে ফিরে আসার পরেই মনট্রিয়াল অভিমুখে রওনা হয়ে যায় সে। কথা দিয়ে গেছিল ফোন করবে। কিন্তু তা করেনি। কথা দিয়ে গেছিল লন্ডনে আমার সঙ্গে তার দেখা হবে। কিন্তু এ প্রতিশ্রুতিও সে রাখেনি। জেটির ওপর সেই ঝগড়াঝাটির পর থেকে আজ পর্যন্ত তার ছায়াটুকুও দেখিনি আমি।'

জোর গলায় পোডারজে বলতে লাগল, তার এই বিয়ের ব্যাপারটা নাকি ডাহা মিথ্যে আর সাজানো ব্যাপার। ধাপ্পা দিয়ে তাকে যুগোশ্লাভিয়ার মাটিতে টেনে নিয়ে যাওয়ার জঘন্য চক্রান্ত। আরও বললে—'অস্ট্রিয়ায় আমি রাজনৈতিক আশ্রয়ের সুযোগ সুবিধে পাচ্ছি। বেলগ্রেডের উদ্বাস্তু আমি। কাজেই স্বদেশের মাটিতে আইনের মারপ্যাঁচ দেখিয়ে আমাকে টেনে নিয়ে যাওয়া চলবে না।'

খানাতল্লাসি হল ওর বাড়িতে। কিন্তু কোনওরকম টেনেটুনে দোষারোপ করার মতো আবছা কোনও প্রমাণের চিহ্নও পেলাম না সেখানে। নিউইয়র্কেও ঘটল সেই কাণ্ড। অ্যাগনেস-নিধন (যদিও তা নিছক সন্দেহ) আর তদন্তের শুরু—এই দুইয়ের মাঝে রয়েছে বিপুল সময়ের ব্যবধান। 'অলিম্পিকে'র কেবিনটাও পরীক্ষা করা হল। কিন্তু ফলাফল হল সেই একই। পোডারজে সেখানে কয়েক রাত থাকার পর অসংখ্যবার ধোয়া মোছা হয়ে গেছে সে কেবিন। কাজেই সূত্র-টুত্রর আর কোনও বালাই ছিল না সেখানে।

যতদূর জানা গেল, অ্যাগনেস টাফভারসনের অন্তর্ধান রহস্যের তিমিরে আলোকপাত করার মতো একটি সূত্রেরও আর অস্তিত্ব ছিল না এই দীর্ঘ ক'টি মাস পরে। এ রহস্যের উত্তর যে পোডারজে জানে, সে বিষয়েও

আমাদের মনে তিলমাত্র সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সে-যে তাকে খুন করেছে, তা প্রমাণ করা কোনওমতেই সম্ভব ছিল না আমাদের পক্ষে। আদালতে এ কেস উঠলেই সাক্ষ্য প্রমাণাদির দরকার হবে—নিছক অনুমান নিয়ে তো কাউকে ফাঁসিকাঠে লটকানো যায় না। সন্দেহের বশে কাউকে খুনি সাব্যস্ত করা যায় না—সে সন্দেহ যতই জোরালো আর ভয়ঙ্কর হোক না কেন। কাজেই পোডারজের গায়ে আঁচড় কাটার ক্ষমতাও আমাদের রইল না।

ভিয়েনাতেও পোডারজেকে গ্রেপ্তার করা গেল না। তার কারণ, যতদূর জানা গেছিল, অস্ট্রিয়ায় কোনও বেআইনি কাজ ও করেনি। বিদেশ থেকে স্বদেশের মাটিতে তাকে আনার আয়োজন করা মানেই একটা বিলক্ষণ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। আর সে সময়ে ও রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করলেই তো আমরা নিরুপায়।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ভিয়েনায় বসে আলোচনা চলল আমাদের মধ্যে। আলোচনার বিষয় একমেবাদ্বিতীয়ম। এবং তা হল, লাশটাকে ও সরিয়েছে কি উপায়ে। থিওরির অভাব ছিল না। কিন্তু আইনের ঠেকা দিয়ে কোনওটিকেই খাড়া করা যাচ্ছিল না।

সম্ভবত নিউইয়র্কের ফ্ল্যাটে—অ্যাগনেসের লাশ টুকরো টুকরো করে কাটার পর বাড়ির চুল্লিতে ফেলে তা ছাই করে ফেলা হয়েছে। লাশ উধাও করার এইটাই কিন্তু সবচেয়ে সহজ উপায়। আর সম্ভাব্য থিওরি হল। পোডারজে হয়তো মারাত্মক ডোজের ঘুমের বড়ি খাইয়ে দিয়েছিল অ্যাগনেসকে। তারপর ওর আস্ত দেহটাকে অথবা টুকরো টুকরো দেহটাকে ট্রাঙ্কের মধ্যে ঠেসে নিয়ে গেছিল 'অলিম্পিকে'র কেবিনে। সাধারণত ফার্স্ট ক্লাসেই সাগর পাড়ি দিত 'ক্যাপ্টেন' কিন্তু 'অলিম্পিকে' সি ডেকের কেবিন নিতে গেল কেন সে? দশ ডলার দামের দাড়ি কামানোর ব্লেড, ঘুমের বড়ি আর মুখে মাখার ক্রিমই বা কিনল কেন?

আমার মতে লাশটাকে পাচার করার সবচেয়ে ভালো পন্থা যা তা হল এইঃ টুকরো টুকরো করে লাশটাকে ও কেটেছিল। তারপর আটলান্টিক মহাসাগর পেরনোর সময়ে এক একটা টুকরো ও ছুঁড়ে দিয়েছে জলের মধ্যে। অর্থাৎ সারা জনপথটায় সমানে ভোজ দিয়েছে মাংসভুক মাছেদের। ভিয়েনায় পোডারজে কতখানি নিরাপদে রয়েছে তা ওর অজানা নয়। অস্ট্রিয়ার কর্তৃপক্ষকে ও জানাল, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ওকে যুগোশ্লাভিয়ায় নিয়ে যাওয়ার জন্যেই সাজানো হয়েছে টাফভারসন কেসটা এবং সমস্ত ব্যাপারটা একটা বিরাট ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। আরও একটু জুড়ে দিলে সেই সঙ্গে—সে নাকি রাজতন্ত্রের শাসন-বিরোধী। কিন্তু ইটালি আর জার্মানির ডিকটেটরশিপ শাসনব্যবস্থায় তার পূর্ণ সমর্থন আছে। আর তাই...।

অস্ট্রিয়ানদের দর্শনবাদ হল নিজে বাঁচো এবং অপরকে বাঁচতে দাও। এই ধরনের জীবনদর্শনের ওপরে ওদের শ্রদ্ধা ছিল যথেষ্ট। তাই পোডারজের ব্যাপারে নাক গলাতে চাইল না ওরা। বিশেষ করে সে যখন প্রতিশ্রুতি দিলে সে ইটালি চলে যাবে, তখন এ নিয়ে তারা আর মাথা ঘামাতে চাইল না।

এই পরিস্থিতিতে আমি ভেবে দেখলাম মাত্র একটি পন্থায় মুঠোর মধ্যে আনা যায় পোডারজেকে। আমেরিকান গভর্নমেন্টকে চাপ দিতে হবে, তারাই যেন পোডারজেকে বিদেশ থেকে স্বদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। আমার লোকের হাতে রিপোর্ট পাঠালাম ওয়াশিংটনে। অ্যাগনেস টাফভারসন আমেরিকান মহিলা। তাকে ঘিরে যে রহস্য গড়ে উঠেছে, তা তো আর উপেক্ষা করা যায় না। পোডারজেকে জোর করে নিউইয়র্কে ফিরিয়ে আনতে গেলে যে কলাকৌশলের প্রয়োজন, তা পাওয়া গেল নিউইয়র্কের এফ বি আই (ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন) এবং ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে। ১৯৩৩ সালে আমেরিকার মাটিতে পা দিয়ে একটা ফর্মের ওপর, 'ক্যাপ্টেন' লিখেছিল, সে নাকি অবিবাহিত। আমেরিকায় পা দেওয়ার অনুমতি লাভ করতে গেলে এ ফর্মে সবাইকেই সই করতে হয়। কিন্তু মার্গারিটের সঙ্গে তার আগেই বিয়ে হয়েছিল। দরখাস্তে লেখা প্রতিটি কথাই যে সত্য সে বিষয়ে শপথ করার পরেই আমেরিকায় প্রবেশাধিকার পেয়ে ছিল সে। কাজেই, মিথ্যা শপথের দায়ে আইনের রক্তচক্ষু এবার এসে পড়ল তার ওপরে।

১৯৩৪ সালের দোসরা আগস্ট—মিথ্যা শপথের অভিযোগে পোডারজেকে অভিযুক্ত করল নিউইয়র্ক গ্র্যান্ড জুরি এবং রায় দিল তাকে স্বদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। ফলে, পোডারজেকে আনা হল ভিয়েনার এক

আদালতে। কিন্তু বাকচাতুরিতে ওস্তাদ পোডারজে সেখানে কোমল হৃদয় জুরিদের মন ভিজিয়ে দিলে এই বলে যে, স্রেফ ষড়যন্ত্র করে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমেরিকায়। আমেরিকা থেকে তাকে পাঠানো হবে যুগোশ্লাভিয়ায় এবং দেশদ্রোহীতার অপরাধে গুলি চালিয়ে খতম করে দেওয়া হবে তাকে। শুনে সমবেদনায় ভরে উঠল জুরিদের অন্তর। ওকে আমেরিকা পাঠাতে রাজি হল না তারা।

আরও কতকগুলো টেলিগ্রাম আসা-যাওয়া করল বেলগ্রেড আর নিউইয়র্কের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত দুটো বিবাহের অভিযোগ আনল নিউইয়র্ক পুলিশ পোডারজের বিরুদ্ধে। এবার আর বেঁকে বসল না অস্ট্রিয়ান কোর্ট। হুকুম বেরিয়ে গেল পোডারজেকে স্বদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার।

এ কাহিনি প্রথমেই বলেছি আমি, পোডারজে-তদন্ত আমার কর্মজীবনের প্রথম কেস। যদিও এর চাইতে কঠোর পরিশ্রম আর কোনও তরুণ গোয়েন্দা ইতিপূর্বে কখনও করেনি, তবুও সেদিন আমার শিকারকে সামান্যের ওপর দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখে শুকনো হাসি ছাড়া আর কোনও ভাবই ফোটেনি আমার চোখে-মুখে। যে-কোনও খুনির পক্ষে ওই শাস্তি সত্যিই লঘু—অত্যন্ত লঘু। আমি ভিয়েনা ছেড়ে চলে আসার সময়ে তখনও ও ওখানকার কারাগারেই ছিল। বেশ একটু মুষড়ে গিয়ে রওনা হলাম বেলগ্রেডের দিকে। যে দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছিল—যতদূর সম্ভব আমি তা পালন করেছি। আর কিছুই করণীয় ছিল না আমার।

নিউইয়র্কে নিয়ে যাওয়া হল পোডারজেকে। পরে শুনেছিলাম, এই ধরনের সামান্য অভিযোগের সম্মুখীন হয়ে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি ও। ঠোঁটের কোণে চিরকেলে মিষ্টি হাসিটি ঝুলিয়ে দিব্বি হাসিখুশি মেজাজ নিয়ে নিউইয়র্কে পৌঁছোয় ও। তার পরেই একটা টেলিগ্রাম পাঠায় মার্গারিটকে—'এবার একটা অলৌকিক কাণ্ড ঘটবে।'

১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দুই বিবাহের অভিযোগ আনা হল তার বিরুদ্ধে। অভিযোগ স্বীকার করে নিলে সে। তবে নিজের অপরাধ লঘু করার প্রচেষ্টায় শুধু এইটুকুই সে বলছিল—অ্যাগনেস টাফভারসনই নাকি বিয়ের জন্যে পীড়াপীড়ি করেছিল তাকে। এ জাতীয় অপরাধে সবচেয়ে গুরুদণ্ড যা, অর্থাৎ আড়াই থেকে পাঁচ বছর শ্রীঘর বাস, পোডারজের ক্ষেত্রে তারই বিধান দেওয়া হল। অবার্ন কারাগারে শুরু হল তার শাস্তির মেয়াদ। অন্যান্য কয়েদিদের সঙ্গে মোটামুটি মানিয়ে নিয়েছিল ও। তবে একজন ওকে দু-চক্ষে দেখতে পারত না। একদিন দারুণ মারপিট হয়ে গেল দুজনের মধ্যে। ওয়ার্ডাররা এসে পৌঁছোনোর আগেই একটা চোখ আর আটটা দাঁত হারাল পোডারজে।

উনিশ মাস কারাগার বাসের পর একটা লম্বা চিঠি লিখল ও ক্যাপ্টেন স্টাইনকে। ক্যাপ্টেন স্টাইন সে সময়ে নিরুদ্দেশ ব্যক্তিদের ব্যুরোতে ছিলেন। পোডারজে লিখল, খালাস পাওয়ার পর কর্তৃপক্ষ যদি তাকে ইউরোপে ফিরিয়ে না দেয়, তাহালে অ্যাগনেস টাফভারসনকে জীবন্ত ফিরিয়ে এনে দেবে সে। এ প্রস্তাবের কোনও উত্তর তার কাছে পাঠানো হয়নি। কারণটা খুবই সোজা। বহুদিন আগেই যে পরলোকের পথে যাত্রা করেছে অ্যাগনেস, এ বিষয়ে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মে গেছিল কর্তৃপক্ষর। অ্যাগনেসের পরিবারবর্গের মনেও তার মৃত্যু সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ ছিল না। আটলান্টিকের জলেই স্থান পেয়েছে হতভাগিনীর দেহ।

১৯৪০ সালের পয়সা ফেব্রুয়ারী জেলের বাইরে এসে দাঁড়াল পোডারজে। এতদিন পাথর ভেঙেও কিন্তু এতটুকু চিড় ধরেনি ওর গ্র্যানাইট কঠিন আত্মবিশ্বাসে। নষ্ট চোখের জায়গায় একটা কৃত্রিম চোখ বসিয়ে নিয়েছিল। মনোকল দিয়ে সযত্নে নকল চোখটা ঢেকে রাখত। পরে ওকে যুগোশ্লাভিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। নাৎসিরা যুগোশ্লাভিয়া আক্রমণ করলে যুদ্ধের বন্যায় সে-ও গা ভাসিয়ে দেয়। তারপর অনেক বছর অতীত হয়েছে। আর তার কোনও খবর পাওয়া যায়নি। যদি সে মারাই গিয়ে থাকে তাহলে অ্যাগনেস টাফভারসনের শেষ কয়েক ঘণ্টার রহস্যের মৃত্যু ঘটেছে সেইসঙ্গে...।

** জোসেফ জাগেব্রোভিচ (যুগোশ্লাভিয়া–রচিত কাহিনি অবলম্বনে।*

মেয়ে খুনে কাউন্ট সারভিয়াত্তি

যখনই নতুন কোনও খুনের তদন্তে তলব পড়ে আমার ডিপার্টমেন্টের, তখনই আপনা হতেই আমার ভাবনার পটে ভেসে ওঠে এ শতাব্দীর সবচেয়ে কুখ্যাত খুনে—কাউন্ট সিজারে সারভিয়াত্তির উপাখ্যান। আর বাস্তবিকই, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

অপরাধ-তদন্ত নিয়ে যারা দিনরাত মাথা ঘামায়, তাদেরকে হামেশাই যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, তার প্রতিটাই ছিল কাউন্ট সারভিয়াত্তির কেসে। কিন্তু মাদকদ্রব্যর বেআইনী আমদানির নতুন নতুন ঝামেলায় অথবা অতিদুষ্প্রাপ্য ডাকটিকিটের অতি-চমৎকার জালিয়াতির খবর পেয়ে অনামী কারিগরকে বার করার কাজে আমাকে যতখানি বেগ পেতে হয়, কাউন্টের কেস হাতে অবশ্য তার চেয়ে বেশি মাথা ঘামাতে হয়নি।

সারভিয়াত্তির শিকার ছিল মেয়েরা। কৌশলে মুঠোর মধ্যে এনে মেয়েগুলোকে খুন করত ও। এবং করত শুধু টাকার জন্যে। তারপর লাশগুলো এমনভাবে টুকরো টুকরো করে কাটত যেন পাকা কশাই সে। আর বাস্তবিকই সে তাই ছিল। ওর কপাল মন্দ। তাই কলঙ্কিত রক্ত নিয়েই ওর জন্ম। ওর বাবা ছিলেন ইটালিয়ান আর্মির ক্যাপ্টেন। পয়লা নম্বরের উচ্ছৃঙ্খল। বুদ্ধিজীবী মহলে তাঁর আত্মম্ভরিতারও সীমা-পরিসীমা ছিল না। ভদ্রলোক যখন ওপারের পথে রওনা হলেন সিজারের বয়স তখন মাত্র চোদ্দো। বাবার কাছে সে উত্তরাধিকারসূত্রে পেল ছোটখাটো একটা ঐশ্বর্য, শিল্পকলার প্রতি প্রীতি আর একটা অতি-দুষ্ট দর্শন-বাদ।

এক বছর আগে ছেলেকে গণিকালয়ে নিয়ে গিয়ে তত্ত্বকথা শুনিয়েছিলেন ভদ্রলোক—'মেয়েদের অস্তিত্ব শুধু আমাদের আনন্দ দেওয়ার জন্যে। তোমার সুখ-সুবিধার জন্যেই ওরা এসেছে এই দুনিয়ায় এবং এটুকু বাদ দিলে নিরেট মাথা শুয়োর ছাড়া আর কিছুই নয়।'

দুর্ভাগ্যক্রমে, যে ধরনের মহিলারা এই জঘন্য উপদেশ যে নিতান্তই অসার, তা প্রমাণ করে ছেলের স্নেহ-ভালোবাসা অর্জন করার চেষ্টা করতেন—ওর মা ঠিক এই ধরনের মহিলা ছিলেন না। অতি সাধারণ শ্রেণির জীব ছিলেন এই ভদ্রমহিলা। ঘন ঘন সুরাপান ছিল তাঁর প্রিয় নেশা। উৎকৃষ্ট আসবাব আর দুষ্প্রাপ্য সুরা ছাড়া অন্যকিছুর ভক্ত ছিলেন না তিনি। আরথ্রাইটিসে ভোগার ফলে মেজাজটা হয়ে গিয়েছিল বেজায় খিটখিটে। অহোরাত্র সুরাপাত্র কানায় কানায় টলটলে মদিরায় ভরিয়ে রাখার জন্য পতিদেবতার অতি কষ্টে সংগৃহীত মূল্যবান সম্পদগুলো একে একে বিক্রি করে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলেন না তিনি। তারপর তিনিও যখন ইহলোকের ধুলো ঝেড়ে পরলোকে গেলেন, তখন সিজারের বয়স মাত্র আঠারো। মায়ের সঙ্গে থেকে চিরতরে মুক্তি পাওয়ায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচল ও।

কয়েক বছরের মধ্যেই সম্পত্তির বাকিটুকু ফুঁকে শেষ করে ফেললে সিজারে। কোনও কাজের শিক্ষা সে কোনওদিন পায়নি। পেশার কথা উঠতেই পারে না। কাজেই একটা মেয়েলোকের বাঁধা প্রেমিক হিসেবে শুরু হল তার নতুন জীবন। লা স্পেজিয়াতে মেয়েদের টুপি, জরি, পোশাকের বিরাট দোকান ছিল স্ত্রীলোকটার। নাম তার রোজ। সারভিয়াত্তির চাইতে বয়সে বছর দশেকের বড় সে। প্রথম ক'টা দিন ভালোই কাটল কপোত কপোতীর। তারপর শুরু হল ঝগড়াঝাঁটির পালা। সম্ভবত রোজ যত টাকা দিতে প্রস্তুত ছিল তার চাইতেও বেশি টাকার দাবি জানাত সিজারে—ঝগড়ার সূত্রপাত এইখান থেকেই। দোকানের কোনও কাজই হত না সিজারেকে দিয়ে—ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি হওয়া তো দূরের কথা। ফলে, যতই দিন যেতে থাকে, ততই চোখমুখের চেহারার সজীবতা চনমনে খুশি-খুশি ভাব হারিয়ে ফেলতে থাকে রোজ।

এই কাহিনির উপসংহার ঘটল সেই দিনই যেদিন রোজ তার প্রেমাস্পদকে জানাল যে সে মা হতে চলেছে। কথাটা শুনে এমনিই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল সারভিয়াত্তি যে তখুনি আগুনের চুল্লী থেকে আগুন খোঁচাবার লোহার ডান্ডাটা তুলে নিয়ে উন্মাদের মতো রোজকে পিটিয়ে মেরে ফেলল। বাড়ির পেছনকার বাগানে লাশটা পুঁতে ফেলে কবরস্থানের ওপর সযত্নে পাথর-বাঁধানো একটা রাস্তা বানিয়ে রাখল।

একটা মুহূর্তের জন্যও উদ্বেগের ছায়ামাত্র দেখা যায়নি সারভিয়াত্তির মনে। রোজের প্রতিবেশীদের আর মক্কেলদের সে জানিয়ে দিলে যে রোমের শৌখিন মহলে একটা নতুন ব্যবসা ফেঁদেছে সিগনোরা। সিজারেকে এখানে রেখে গেছে সম্পত্তি উপযুক্ত দামে বেচে ফেলার জন্যে। লা স্পেজিয়ার এই কাজটুকু শেষ করেই সে রোজের কাছে চলে যাবে রোমে। মালপত্রসমেত দোকানটা জলের দামে বেচে দিল সে এবং বিক্রি করার অধিকার তার বাস্তবিকই আছে কিনা, এ প্রশ্নও কেউ তাকে জিগ্যেস করল না।

অতি সহজে লোক ঠকিয়ে নিজেকে সন্দেহমুক্ত রাখার এই ক্ষমতাই সারভিয়াত্তিকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে এক খুন থেকে আরেক খুনের দৃশ্যে। শেষকালে তার মুখোশ খুলে পড়ল মরণের সওদাগর হিসেবে। তার সমস্ত তৎপরতাকে সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিলে একটা খবরের কাগজ মাত্র কয়েকটা শব্দের মধ্যে। 'ফ্যালো কড়ি মাখো তেল-এর পদ্ধতিতে খুন—মেয়েরা এনেছে অর্থ আর কাউন্ট সরিয়ে দিয়েছে তাদের দেহগুলো।'—এই ছিল খবরে কাগজের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। তার কবলে পড়ে কত মেয়ে যে প্রাণ হারিয়েছে, তার সঠিক হিসেব জানা যায়নি। শুধু এইটুকুই বলা চলে যে সারভিয়াত্তির সঙ্গে মোলাকাত হওয়ার পর বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেছে—এরকম মেয়ের সংখ্যা বড় কম নয়। সারভিয়াত্তি কিন্তু চিরকুমার থেকেছে সমস্ত জীবন—যেন দিনের পর দিন খুঁজে বেরিয়েছে তার উপযুক্ত গৃহিণীকে—এই রকম একটা ভাব দেখিয়েছে সে।

পর পর দুটি দিন বিভিন্ন ট্রেনে মালপত্রের সঙ্গে খণ্ড-বিখণ্ড লাশ আবিষ্কার হওয়ার পরেই সেই প্রথম পুলিশ জানতে পারে সমাজের মধ্যে নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটা নররাক্ষস। ১৯৩২ সালের ১৬ই নভেম্বর টুরিন থেকে মর্নিং এক্সপ্রেস সবে এসে দাঁড়িয়েছে নেপলস-এর বিশাল খিলেনওয়ালা স্টেশনে। দুজন রেলওয়ে পুলিশ (ফ্যাসিস্ট শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের অনতিকাল পরেই একটা বাহিনী সৃষ্টি করেছিলেন মুসোলিনী) করিডর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা সেকেন্ড ক্লাস কমপার্টমেন্টে দুটো বড় বড় সুটকেস দেখতে পেল। আঁশের তৈরি পেল্লায় সুটকেস দুটো কে বা কারা ফেলে গিয়েছিল কামরার মধ্যে। সদ্যকেনা না হলেও খুব পুরোনো বলে মনে হল না সুটকেস দুটো। ওজনেও দারুণ ভারী। পুলিশ অফিসার দুজন সুটকেস দুটো নামিয়ে নিয়ে গিয়ে জমা দিয়ে দিলেন হারানো প্রাপ্তি অফিসে। একটা সুটকেসকে তাকের ওপর তুলে রাখার সময়ে খুট করে খুলে গেল তালাটা এবং সঙ্গে সঙ্গে ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়ল একটা মুন্ডু—মেয়েমানুষের মুন্ডু। পুরু বাদামি কাগজের লাইনিং দিয়ে মোড়া ছিল সুটকেসটা। গাঢ় লালচে রঙের কাঠের কুচো দিয়ে প্যাক করা ছিল ভেতরকার বস্তু। একজন অফিসার নিঃশব্দে তুলে ধরলে মুন্ডুটা। অপরজন চাড় দিয়ে দড়াম করে খুলে ফেলল দ্বিতীয় সুটকেস। ভেতর থেকে পাওয়া গেল—হতভাগিনীর হাত আর পা।

হাত-পা মুন্ডুবিহীন ধড়টা এসে পৌঁছোল পরের দিন ট্রেনে। লাস্পেজিয়া থেকে রোমে এসে পৌঁছোল যে ট্রেনটি, সেই ট্রেনেই এল এই ধড়টি। প্রথমবার যেভাবে পাওয়া গিয়েছিল সুটকেস দুটি, দ্বিতীয় আবিষ্কারটিও ঘটল ঠিক এ ভাবেই। সেকেন্ড ক্লাস কমপার্টমেন্টে একটা বড় সুটকেস খোলার পর ভেতর থেকে পাওয়া গেল উলঙ্গ ধড়টা। অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো যে একই দেহের, তা প্রমাণ করতে বিশেষ বেগ পেতে হল না ডাক্তারদের। হতভাগিনীর চেহারার মোটামুটি এবং বিশ্বাসযোগ্য একটা বিবরণও দিলেন তাঁরা। বয়স তার তিরিশ। উচ্চতা মাঝামাঝি। লালচে বাদামি চেস্টনাট রঙের চুল আর চোখ। বাঁ-পা-টা সামান্য বেঁকা। অনেকরকম পুরোনো ক্ষতচিহ্নও ছিল সারা দেহে।

পেছন থেকে ছুরি মারা হয়েছিল মেয়েটিকে। ছুরি মারার সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়নি বেচারি এবং যখন প্রমাণ পাওয়া গেল জীবন্ত অবস্থাতেই মেয়েটিকে টুকরো টুকরো করে কাটতে শুরু করেছিল খুনে জানোয়ারটা তখন এই বিভীষিকা উপাখ্যানের ওপর চড়ল আর এক পোঁচ বিভীষিকার রং।

অপরাধ সম্পর্কীয় যে-কোনও তদন্তে পুলিশি তৎপরতা যদি সর্বত্র ছড়িয়ে থাকত তাহলে অবিশ্বাস্যরকমের মসৃণগতিতে অব্যাহত থাকত, চালু থাকত পুলিশ মেশিনের অপরাধসমাধান পর্ব। কিন্তু তা যখন নয়, ব্যাপক, সুষ্ঠু আর নিখুঁত পুলিশি তৎপরতার যেখানে অভাব সে ক্ষেত্রে বুঝে নিতে হবে যে গোয়েন্দাদের সাফল্যের পরিমাপ সাধারণত এই ক'টি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হয়ঃ অসীম [illegible] আর হাল ছেড়ে না দিয়ে অহোরাত্র সজাগ থাকা—সম্ভাবনাঃ দশভাগের সাত ভাগ, সহজজ্ঞান অথবা দিব্যচক্ষেদর্শন—সম্ভাবনাঃ দশভাগের দু-ভাগ, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হওয়া—সম্ভাবনাঃ দশ ভাগের এক ভাগ! ধীশক্তির তথাকথিত চমক লাগানো নিদর্শন চেয়ারে বসা গোয়েন্দা আর রহস্য উপন্যাস লিখিয়েদের জন্যে—বাস্তব জীবনে আমাদের ক্ষেত্রে তার কোনও স্থান নেই।

স্কোয়াড্রা মোবাইল (নরহত্যা স্কোয়াড) হতভাগিনী মেয়েটার সনাক্ত করার প্রচেষ্টা শুরু করল। টুকরো টুকরো অংশে আবিষ্কৃত হয়েছিল তার দেহ। তাই বিভিন্ন সময়ে দেশের নানাস্থান থেকে যে কয়েকশো মেয়ে বেমালুম উবে গিয়েছিল, তাদের নামের তালিকা নিয়ে বসলেন তাঁরা—কোনও হদিশ পাওয়ার আশায়। কিন্তু বৃথাই, কোনও সূত্রই পাওয়া গেল না! রাশি রাশি টেলিগ্রাম টেলিপ্রিন্টার বার্তা ঘোষণা, বিজ্ঞপ্তি ইটালির পুলিশ স্টেশনগুলোয় পর পর এসে পৌঁছোতে লাগল—কিন্তু রহস্যের তিমিরে এতটুকু আলোকের সন্ধান পাওয়া গেল না।

এ ধরনের দৈহিক বর্ণনার মানুষ খোঁজার ব্যাপারে সুফল লাভ কেউই ঠেকিয়ে রাখতে পারে না যদি জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা পাওয়া যায়। কিন্তু এই বিশেষ তদন্তটিতে স্কোয়াড্রা মোবাইলের এই জাতীয় সাহায্যের প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে আদেশটি তা স্বয়ং মুসোলিনীর। তাঁর নিষেধাজ্ঞা বেরিয়ে গিয়েছিল কোনও খবরের কাগজ এ-কেসের খুঁটিনাটি ছাপতে পারবে না। তদন্তের মোটামুটি যে বিবরণ পুলিশের তরফ থেকে ছাড়া হত কাগজে প্রকাশের জন্য তার দৈর্ঘ্য তিরিশ লাইনের ওদিকে যেত না। এ আদেশের কারণও দেখিয়ে ছিলেন মুসোলিনী। বলেছিলেন, ফ্যাসিস্ট ইটালিতে এরকম পিশাচের মতো খুন-খারাপি করাটাই নাকি একদম অসম্ভব। আর যদিও বা কেউ করে থাকে তবে তা নিয়ে যত অল্প কথা বলা যায় ততই মঙ্গল।

যাই হোক শেষ পর্যন্ত তদন্ত যখন ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় এসে দাঁড়াল, তখন দৈনিকগুলো একযোগে ইল দুচের নিষেধ-বিজ্ঞপ্তিতে আর কোনও গুরুত্ব না দিয়ে খুঁটিনাটি জনসাধারণে প্রকাশ করে দেওয়াই সঙ্গত মনে করলে। প্রথম পাতা জুড়ে ছবি বেরুল খণ্ডবিখণ্ড মেয়েটার।

আর ঠিক তখন থেকেই সত্যি সত্যিই রহস্যের তিমিরাবগুণ্ঠন উঠে যেতে লাগল আস্তে আস্তে। প্রথম ট্রেনের দুজন যাত্রী খবর দিল যে হৃষ্টপুষ্ট চেহারার মাঝবয়সি এক ভদ্রলোক তাদের কম্পার্টমেন্টে ঢুকেছিল। ভদ্রলোকের গোঁফের ডগা বেশ পাকানো এবং ছুঁচোলো। লাগেজ র‍্যাকে দুটো আঁশের তৈরি সুটকেস রেখে এক কোণে বসেছিল ভদ্রলোক। একচোট ঘুম দিয়ে উঠে দুজনে দেখলেন নেপলস যাওয়ার পথে রোমের মধ্যে ঢুকছে তাদের ট্রেন, ভদ্রলোক অদৃশ্য হয়েছে কামরার ভেতর থেকে, কিন্তু মালপত্র দুটি ফেলে গেছে তাকের ওপর।

সুটকেসের মালিকের এহেন দৈহিক বর্ণনা পাওয়া যাবার পর স্কোয়াড্রা মোবাইল ভদ্রলোকের খোঁজ পেল না স্পেজিয়াতে। এইখান থেকেই রোম আর নেপলস যাওয়ার এক্সপ্রেস ধরেছিল ভদ্রলোক। পিসা পর্যন্ত ট্রেনভ্রমণ করেছিল। রওনা হবার পর প্রথম স্টপ ওইখানেই পিসাতে ট্রেন থেকে নেমে ফিরতি ট্রেন ধরে সে ফিরে আসে লা স্পেজিয়াতে।

এই তথ্য জানার পরেই খুনটা এসে পড়ল আমারই অফিসের আওতায়। তার কারণ, ওই সময় লা স্পেজিয়া নরহত্যা স্কোয়াডের চিফ ছিলাম আমি। লা স্পেজিয়া একটা সদাব্যস্ত বন্দর। টাইরেনিয়ান উপকূলে তার অবস্থান। এতক্ষণ পর্যন্ত সমস্যাময় জটিল কেসটা আমাদের সবার আলোচনার খোরাক জোগালেও মূল রহস্যভেদের সবটুকু দায়িত্বই ছিল রোমের পুলিশের। কিন্তু এই নতুন আবিষ্কারের বৃত্তান্ত শুনলেই খুবই সম্ভব

যে অনুমানটি সবার আগে মাথায় আসে তা হল এই যে খুনি এই লা স্পেজিয়া শহরে আমাদেরই মধ্যে থাকলেও থাকতে পারে—সেক্ষেত্রে তার সমুচিত দণ্ডবিধানের দায়িত্ব তো আমাদেরই। আমার ডিপার্টমেন্টে এমন লোক একটিও ছিল না যে ওই নররাক্ষসটার মণিবন্ধে লোহার গয়না পরিয়ে দেওয়ার আগ্রহকে ক্ষুরের মতো শাণিত করে রাখেনি। নির্দিষ্ট সময়ের চাইতেও আরও অনেক বেশি ঘণ্টা আমরা ব্যয় করতে লাগলাম হোটেলে হোটেলে এবং প্রতিটি বোর্ডিং হাউসের মালিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে। একমাত্র আশা, হয়তো গুরুত্বপূর্ণ কোনও তথ্য পাওয়া যাবে তাদের কাছ থেকে। বন্দর-অঞ্চলে আমাদের টিকটিকিরা অগুন্তি গণিকালয় আর পানাগারে তল্লাসি চালাল। কিন্তু কোথাও এতটুকু কানাঘুসোও শুনলাম না রাক্ষসটার সম্বন্ধে।

তার পরেই আচম্বিতে একদিন নীলাকাশ থেকে বাজ নেমে আসার মতো বিপুল সৌভাগ্য খসে পড়ল আমাদের তদন্ত-পর্বে। কি করে বরাত খুলল, সেই কথাই বলি এবার। তন্ন তন্ন করে তল্লাসি চালানোর পর যখন কোনওদিনই কোনও আলোর সন্ধান পেলাম না, তার দুদিন পর অফিসে বসে স্থানীয় খবরের কাগজটার পাতা ওলটাচ্ছি, এমন সময়ে নজরে পড়ল ছোট্ট একটা পরিচ্ছেদ। রেলওয়ে স্টেশনের কাছে রাবিশের স্তূপের ওপর একটা বড় সাইজের ছুরি পড়ে থাকতে দেখেছিল একটি অল্পবয়সি ছেলে। এ জাতীয় ছুরি রান্নাঘরের কাজেই লাগে। ছেলেটির মনে কোনও অসাধুতা ছিল না। তাই ছুরিটা পাওয়ামাত্রই সে জমা দিয়ে দেয় হারানো-প্রাপ্তি অফিসে।

ছুরিটা সম্পর্কেই ভাবছিলাম। ভাবছিলাম কী কী কাজে দরকার হতে পারে ছুরিটার। আর তার পরেই আচমকা ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মতো লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম আমি। তারস্বরে হুকুম দিয়ে ডাকিয়ে আনলাম আমার এক সহকারীকে এবং দুজনে মিলে তৎক্ষণাৎ গাড়ি হাঁকালাম হারানো প্রাপ্তি অফিসের দিকে। ছুরিটাকে নিয়ে রাখলাম আমাদের জিম্মায়। পুলিশ ল্যাবরেটরির রিপোর্ট থেকে জানা গেল ফলার ওপর যে দাগগুলো পাওয়া গেছে, আসলে তা মানুষের রক্ত ছাড়া আর কিছু নয়। অর্থাৎ পায়ের কাজ আরও কিছুটা বাড়লো। শহরে যে-ক'টা জিনিসপত্রের, কাচের বাসনপত্রের আর স্টেশনারি দোকান ছিল, সবক'টার মালিক আর কর্মচারীদের প্রশ্নে প্রশ্নে বিপর্যস্ত করে ফেললাম। শেষকালে যে প্রমাণের জন্যে এত পরিশ্রম, তা পাওয়া গেল। একজন সেলসম্যানের মনে পড়ল ওই রকম আকারের একটা ছুরি একদিন সে বিক্রি করেছিল হৃষ্টপুষ্ট চেহারার মাঝবয়সি ছুঁচালো গোঁফওয়ালা এক ভদ্রলোকের কাছে। রোম এক্সপ্রেসে লোকটার যেরকম বর্ণনা পাওয়া গিয়েছিল, সেলসম্যানের বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে গেল তা। আবিষ্কার শুধু এই একটাই নয়। কেননা কয়েকটা বাড়ি পরেই আরও একটা দোকান দেখলাম আমরা। এই দোকান থেকেই আমাদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গোঁফওয়ালা বন্ধুটি কিনেছিলেন তিন-তিনটে আঁশের তৈরি সুটকেস।

খুনে বদমাশটাকে যে এই লা স্পেজিয়াতেই পাওয়া যাবে, এ বিষয়ে আর তিলমাত্র সন্দেহ রইল না আমাদের মনে। এ কাজে যে ধরনের গোয়েন্দাদের দরকার, তাদের প্রতিজনকে পাঠিয়ে দিলাম আমি বাড়ি বাড়ি তল্লাসির হুকুম দিয়ে। একটা বাড়িও বাদ গেল না। তারপর শুধু একটা বিশেষ অঞ্চলে সঙ্কীর্ণ করে আনলাম এই চিরুনি দিয়ে আঁচাড়ানো তদন্ত-পর্ব। এবং শেষ পর্যন্ত তা সীমিত হয়ে এল একটি মাত্র বিশেষ রাস্তায়।

খুনটা আবিষ্কার হওয়ার ঠিক একমাস পরে ১৯৩২ সালের ১৫ই ডিসেম্বর আমি নিশ্চিন্ত হলাম। নিশ্চিন্ত হলাম এবার ঠিক কোন কোন জায়গাটিতে অভিযান চালাতে হবে, সে সম্পর্কে। জানলাম, লা স্পেজিয়ার দরিদ্রতম অঞ্চলের পাথর দিয়ে বাঁধানো এবড়োখেবড়ো সঙ্গীর্ণ রাস্তা ভায়া ডেনোভার একটা শ্রীহীন বাড়ির পাঁচ তলায় উঠে এবার তৎপর হতে হবে আমাদের। সেইদিনই দুজন গোয়েন্দাকে নজর রাখতে বলেছিলাম বাড়িটার ওপর। তারা খবর পাঠালে, সারাদিনের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে কেউ বাইরে আসেনি। স্থির করলাম, আর নয়, এবার ঢুকে পড়া যাক।

পিস্তল বাগিয়ে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ক্যাঁচকেঁচে সিঁড়ি বেরিয়ে ওপরে ওঠার সময়ে দারুণ উত্তেজনায় কি প্রচণ্ড শব্দে ধকধক করেছিল হৃদযন্ত্রটা, তা আজও আমার মনে আছে। শুধু এই মুহূর্তটির জন্যে কি প্রচণ্ড

খাটুনিটাই না গেছে ডিপার্টমেন্টের প্রত্যেকের। এসেছে সেই মুহূর্ত—পরিশ্রমের ফল হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গেল প্রায়। পাঁচতলায় পৌঁছনোর পর আমার পিছু পিছু এল একজন গোয়েন্দা। দেখলাম, করিডরের দুটো দরজার মধ্যে একটা সামান্য খোলা রয়েছে। পা টিপে টিপে ভেতরে ঢুকে দেখলাম ঘরটাকে রান্নাঘরই বলা উচিত। ঘরে ঢোকামাত্র যে জিনিসটা সবার আগে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল, তা হচ্ছে একটি বালতি। দেওয়ালের পাশেই বসানো ছিল বালতিটা। বালতিটার কিনারা পর্যন্ত উঁচু হয়েছিল কাঠের কুচো—যে ধরনের কুচো দিয়ে প্যাক করা হয়েছিল লাশটার মুন্ডুটা—হুবহু সেই রকমই।

রান্নাঘরের ভেতরের দরজা দিয়ে যাওয়া যায় আর একটি ঘরে। দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকলাম আমি। ঘরটা পুরোনো কিন্তু জমকালো আসবাবপত্রে একদম ঠাসা। দুজন পুরুষ আমার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল। বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়িয়েই আমার হাতে পিস্তল দেখামাত্র নিমেষের মধ্যে তারা হাত বাড়িয়ে দিলে নিজের নিজের পকেটের দিকে।

হুঁশিয়ার করে দিই আমি—'নড়বেন না। নড়লেই গুলি চালাব।'

মাথার ওপর হাত তুলে দেয় দুজনে। একজন বললেন—'আমাদের পরিচয়টা দেওয়া দরকার। আমি হলাম রোম ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্টের কমিশনার এরিকো। আর ইনি আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট, সিগনর মুস্কো।'

পরিচয় শোনার পর আমার রসনায় আর কোনও কথাই ফুটল না। মাথার মধ্যে রাগ, অপমান, হতাশার তুমুল দাপাদাপির চাইতেও হতভম্ব হয়েছিলাম সবচাইতে বেশি। তার কারণও ছিল যথেষ্ট। বুদ্ধিকৌশল দক্ষতার প্রতিযোগিতায় আমারই এক্তিয়ার শহরে বসে টেক্কা মারা হল আমার ওপর। শুধু তাই নয়। যে দুই আইন রক্ষক অফিসার এইভাবে আমার গালে চুনকালি লেপে দিলেন, সমস্ত তদন্তপর্বটা তাঁরা পরিচালনা করেছেন ২৫০ মাইল দূরে বসে। তারপর লা স্পেজিয়াতে এসেছেন তাঁদের পরিকল্পনার এতটুকু আভাস কাউকে না জানিয়ে।

'কাউন্ট সিজারে সারভিয়াত্তি কোথায়? এ বাড়িতে যার বাস এবং যাকে গ্রেপ্তার করার জন্যেই আমাদের আগমন, তাকে রেখেছেন কোথায়?'—শুধোলাম আমি।

খরখরে চোখে আমার দিকে তাকালেন কমিশনার এরিকো। জবাব দিলেন—'আপনি লা স্পেজিয়ার ডোসি। আমার বোঝা উচিত ছিল।'

এবার হতভম্ব হয়ে তাকানোর পালা তার। কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে তারপর উত্তর দিলেন আমার প্রশ্নের—'টুকরো টুকরো করে কাটা মেয়েটার হত্যাকারী হিসাবে আমরাও তাকে সনাক্ত করেছিলাম। গতকাল সারভিয়াত্তিকে গ্রেপ্তার করেছি আমরা। এখন সে রয়েছে রোমের রেজিনা কোয়েলি জেলখানায়।'

বটে, তাহলে এই ব্যাপার। মাস কয়েক মুহূর্ত আগেও আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, কুখ্যাত খুনেটার কোমরে বেড়ি পরানোর সম্মান এবার লা স্পেজিয়ার পুলিশ-মহলই পাবে। কিন্তু রোম তা ছিনিয়ে নিয়ে গেল একদিন আগে এসে।

কেসটা নিয়ে আলোচনা হল কমিশনার এরিকো আর আমার মধ্যে। শুনলাম খুনেটার হদিশ বার করার জন্যে তাঁরা নাকি সম্পূর্ণ অন্য ধরনের একেবারে নিজস্ব একটা পদ্ধতিমাফিক তল্লাসি পর্ব চালিয়েছিলেন। তদন্ত পর্বের প্রথম দিকেই একজন রোম গোয়েন্দা বলেছিলেন পাত্র-পাত্রী বিজ্ঞাপন থেকে হয়তো সূত্র পাওয়া যেতে পারে। তৎক্ষণাৎ বিভিন্ন দৈনিকের ফাইল ঘাঁটা শুরু হল। অনেক পরিশ্রমের পর সম্ভাবনাময় কয়েকটা পয়েন্টও পাওয়া গেল।

এরপর গোয়েন্দারা তৎপর হয়ে উঠল কয়েকটা লোককে নিয়ে। এরা প্রত্যেকেই মনোমত গিন্নি লাভের আশায় বিজ্ঞাপন দিয়েছিল কাগজে। এদের প্রত্যেকের গতিবিধি আর চরিত্র নিয়ে জোর গবেষণা চলল কিছুদিন। কিন্তু বৃথাই। এমন একটি লোককেও পাওয়া গেল না যার ওপর টেনেটুনে এতটুকু সন্দেহের ছায়া ফেলা যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একজন নাছোড়বান্দা টিকটিকির নজরে পড়ল বহু পুরোনো একটা বিজ্ঞাপন। লা

স্পেজিয়া শহরের এক অজ্ঞাতনামা পুরুষ বিবাহের আমন্ত্রণ জানিয়েছে বিজ্ঞাপনে। বিজ্ঞাপন-বার্তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু শহরের নামটি। খবরটা এইরকমঃ

'সম্ভ্রান্ত পুরুষ, বিত্তবান, যুবাপুরুষ নয়, কিন্তু উদার এবং কোমল স্বভাব, পারিবারিক বন্ধনবিহীন তরুণী, কন্যার সঙ্গে বিবাহের জন্যে পত্রালাপ করতে ইচ্ছুক।'

রোম-পুলিশ এই বিজ্ঞাপনের সঙ্গে একটি উধাও-হওয়া মেয়ের যোগসূত্র বার করে ফেললে। মেয়েটির বয়স বছর তিরিশ। একটা বাড়ির সাংসারিক কাজর্কম দেখাশুনো করত সে। নভেম্বরের গোড়ার দিকে ভোজবাজির মতো মিলিয়ে যায় সে। অন্নদাতাদের কাছে অবশ্য সে খোলাখুলি বলে গিয়েছিল তার গন্তব্য শহরের নামটা। সে নাকি পাত্র-পাত্রী বিজ্ঞাপনের উত্তর দিয়েছিল এবং তার ভবিষ্যৎ স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বন্দোবস্ত হয়েছে লা স্পেজিয়া শহরে। এরপর থেকে তার আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। পুলিশ আরও জানাল, মেয়েটির বাঁ-পা খোঁড়া ছিল, পা টেনে টেনে চলতে হত তাকে। আর ঠিক এই শারীরিক বিকৃতিটুকুই নিহত মেয়েটির লাশ পরীক্ষা করতে গিয়ে ডাক্তারদের নজরে পড়েছিল।

লা স্পেজিয়া শহরে 'উদার এবং কোমলস্বভাব সম্ভ্রান্ত পুরুষটির' হদিশ বার করা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। তৎক্ষণাৎ রোম থেকে গোয়েন্দাদের পাঠানো হল এ শহরে—লীলাখেলা যে সাঙ্গ হয়েছে এ খবর জানার আগেই তাকে গ্রেপ্তার করা দরকার। কমিশনার এরিকো যখন তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে এসে পৌঁছোলেন, তখন সবেমাত্র রোম অভিমুখে রওনা হয়েছে কাউন্ট সিজারে সারভিয়াত্তি। রোমের একটা হোটেলে পাওয়া গেল তাকে। ভদ্রলোককে হাজতে পুরে তাঁরা ফিরে এলেন লা স্পেজিয়াতে। এলেন সেই ঘরটিতে যে ঘরটি সারভিয়াত্তি ভাড়া নিয়েছিল বিজ্ঞাপনের টোপ গিলে আসা হতভাগিনী মেয়েগুলোকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে।

আগেই বলেছি, খুনে বদমাশটার বদলে কমিশনারকে গ্রেপ্তার করতে উদ্যত হয়েছিলাম—এ তথ্য জানার পর রীতিমতো খিঁচড়ে গিয়েছিল আমার মনমেজাজ। কিন্তু তবুও একদিক দিয়ে আমার ওই তিক্ত মেজাজে সন্তোষের বারি সিঞ্চন হয়েছিল। বেশির ভাগ সাক্ষ্য প্রমাণ জুগিয়েছিলাম আমিই এবং এই সাক্ষ্য-প্রমাণের বলেই চরম দণ্ড নেমে এসেছিল সারভিয়াত্তির শিরে। আমি আরও প্রমাণ করে দিয়েছিলাম যে পাওলিনা গোরিয়াত্তিই হচ্ছে সারভিয়াত্তির সর্বশেষ শিকার। রোমের যে মেয়েটি সংসারের কাজকর্ম দেখাশুনো করার কাজ ছেড়ে একদিন নিপাত্তা হয়ে গিয়েছিল, পাওলিনা গোরিয়াত্তি তারই নাম। বিবাহের প্রতিশ্রুতির প্রলোভন দিয়ে আসার পর যে-ক'টি মেয়েকে যমালয়ে পাঠানো হয়েছে, এ হচ্ছে তাদের সর্বশেষ। প্রতিটি মেয়ে আসবার সময়ে সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থ নিয়ে এসেছে এবং তাকে খুন করা হয়েছে এই কাঞ্চন লোভেই। তারপর দেহটাকে কেটে টুকরো করে পাচার করা হয়েছে নানাদিকে।

কাহিনির উপসংহারে এসে বিলক্ষণ বিরাগ সত্ত্বেও আর একটি নাম মনে পড়ছে। বেল গিনেস একটি অসুন্দর আমেরিকান মহিলার নাম। বিয়ের লোভ দেখিয়ে টাকাকড়িসমেত পুরুষদের ভুলিয়ে আনত সে নিজের খামার বাড়িতে। তারপর যথাসময়ে তাদের খুন করে দেহগুলি থোড়কুচি করত। এবং এই থোড়াকুচি পর্বটি যে কাঠের ব্লকটির ওপর হতো, তার ওপরেই জবাই করা শুয়োর কেটে কুচিকুচি করত বেল গিনেস। এই একই নারকীয় ব্যবসায় হাত পাকিয়েছিল কাউন্ট সারভিয়াত্তি। একটা অপরিচ্ছন্ন হোটেল মালিক ছিল ভদ্রলোক। সেখানে হানা দিতেই আরও দুই হতভাগিনীর দেহাবশেষ পেয়েছিলাম আমি।

তাদের একজনের নাম বিসে মারগারুচ্চি। স্থানীয় দাঁতের ডাক্তার তার দাঁতের চিকিৎসা করেছিলেন একবার এবং তারও রেকর্ডও রেখেছিলেন তিনি। তাই মেয়েটির দাঁত দেখেই তাকে সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছিল ডাক্তারের পক্ষে।

ইটালিতে আজকাল আর মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় না বটে, কিন্তু যে সময়ের কাহিনি লিখলাম সে সময়ে মুসোলিনী কয়েকটি অপরাধের শাস্তি এইভাবেই দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কাউন্ট সারভিয়াত্তিও রেহাই পেল না এই হুকুমনামা থেকে।

গ্রেপ্তার এবং অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ার কয়েক মাস পরে একদিন খুব ভোরে তাকে হিড়হিড় করে টেনে আনা হল ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে। ককিয়ে কাঁদতে কাঁদতে অনুনয় বিনয় করতে লাগল সে। তার পরেই একসঙ্গে গর্জে উঠল রাইফেলগুলো এবং চিরকালের মতো নির্বাক হয়ে গেল এযুগের সবচেয়ে কুখ্যাত মেয়ে-খুনে কাউন্ট সিজারে সারভিয়াত্তি।

** কম্যান্‌ডাটোর যুসেপেপদোসা (রোম ইতালি) রচিত কাহিনি অবলম্বনে।*

মানুষ দস্তানার কাহিনি

পুরোনো আমলের আইনরক্ষক অফিসার হিসেবে চোখের সামনেই দেখেছি সিডনি শহরকে গড়ে উঠতে। ঝোপঝাড়ভরা ছোটখাটো একটা নগরই দেখতে দেখতে ফুলেফেঁপে উঠে ঠাঁই দিল বিশ লক্ষ বাসিন্দাকে। পাপ আর অপরাধের দিকে থেকেও এর চাইতে ভালো বা খারাপ শহর আর আছে বলে মনে হয় না আমার।

সুকঠোর দুস্তর পথ পেরিয়ে তবে আমাকে নিউ সাউথ ওয়েলসের কমিশনার হতে হয়েছিল। সত্য কথা বলতে কি বীটের কনস্টেবলের স্তর থেকে ধীরে ধীরে উঠতে হয়েছে আমাকে এই দায়িত্বপূর্ণ পদে। তেতাল্লিশ বছরের দীর্ঘ কর্মজীবনে আমার অন্তত বিশ্বাস আইনের সব রকম শত্রুকেই আমি দেখেছি। সামান্য চোর-ছ্যাঁচোড় থেকে শুরু করে জালিয়াত 'কল'মেন দাঙ্গাবাজ খুনে-গুন্ডা—কিছুই বাদ যায়নি। এদের মধ্যে অনেকেরই উচ্চাশার বহর শুনলেও তাক লেগে যায়।

বর্তমান শতাব্দী শুরু হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই সিডনি পুলিশ হেড কোয়ার্টারের নিরুদ্দেশ ব্যক্তি বিভাগে সার্জেন্টের পদে উন্নীত হলাম আমি। আঙুলের ছাপ নিয়ে অপরাধী সনাক্তের পদ্ধতি সে সময়ে সদ্য প্রচলিত হয়েছে। সম্পূর্ণ নতুন বিজ্ঞানসম্মত এই তদন্ত পদ্ধতি আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছিল গতানুগতিক পুলিশী ধারায়। অস্ট্রেলিয়াতে সর্বপ্রথম এই অভিনব পদ্ধতির প্রচলন হয় আমাদের ডিপার্টমেন্টেই।

তন্ময় হয়ে গেলাম আমি আঙুলের ছাপের এই বিশাল দুনিয়ায়। বিভিন্ন ছাপের রেখার ফাঁস, আবর্ত আর বেঁকা খিলের সম্পর্কে বিস্তর জ্ঞানলাভের পর নিউ সাউথ ওয়েলস কারাগারের আট হাজার বাসিন্দার একটি রেকর্ড তৈরি করে ফেললাম।

সে সময়ে ডিপার্টমেন্টের কর্মীসংখ্যা পাঁচজনের বেশি ছিল না। কিন্তু আজ প্রায় একশো মেয়েপুরুষ নিয়ে গড়ে উঠেছে এই বিভাগের কর্মীবর্গ। সারা অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড আর অন্যান্য প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশের প্রায় দশ লক্ষ অপরাধী আর সন্দেহভাজনের আঙুলের ছাপের সারি সারি ফাইলও সংরক্ষিত রয়েছে আমাদের রেকর্ড বিভাগে। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের হেড কোয়ার্টার হয়ে দাঁড়িয়েছে নিউ সাউথ ওয়েলসের আঙুলের ছাপের বিভাগ। শুধু তাই নয়। সারা বিশ্বে যে-ক'টা অত্যন্ত দক্ষ ফিংগার প্রিন্ট ডিপার্টমেন্ট বর্তমানে রয়েছে, আমাদের এই বিভাগটি তাদেরই অন্যতম।

কর্মজীবনের গোড়ার দিকে আঙুলের ছাপ সম্বন্ধে এই বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেছিলাম বলেই 'মানুষ দস্তানা' হত্যা-তদন্তের সুরাহা করতে পেরেছিলাম আমি।

প্রথমেই বলে রাখি, আমি কমিশনার হয়েছিলাম মাত্র কয়েক বছরের জন্যে। ১৯৩৩ সালের বড়দিনে একটা লাশ চোখে পড়ল দুই ভদ্রলোকের। মুরুমবিজী নদীতে ছুটির দিনে মাছ ধরতে গিয়েছিল দুজনে। স্টেটের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী কৃষিপ্রধান কেন্দ্র ওয়াগা থেকে কয়েক মাইল গেলেই পাওয়া যাবে এই নদীটি।

লাশটি পুরুষমানুষের। খুন করা হয়েছিল তাকে বেশ কিছুদিন আগেই। কিন্তু তীরের কাছে উপড়ে পড়া একটা গাছের শাখাপ্রশাখার দেহটা আটকে পড়েছিল ক'টা দিন। তাছাড়া মুখখানা এমনভাবে থেঁতলে দেওয়া হয়েছিল যে সনাক্তকরণের উপায় ছিল না।

এ ধরনের পরিস্থিতিতে সনাক্ত করার শুধু একটি পন্থাই আমি জানতাম এবং তা হল আঙুলের ছাপের সাক্ষ্য। যদিও এক্ষেত্রে এ পন্থায় সুফলের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। কেননা, নিহত ব্যক্তি হয়তো সমাজের

বিলক্ষণ সম্মানীয় পুরুষ এবং সারা জীবনে পুলিশের দপ্তরে আঙুলের ছাপ দেওয়ার দুর্ভাগ্য তাঁর কোনওদিনই হয়নি। আইনভঙ্গের দায়ে পুলিশের হাতে ধরা না পড়লে নিউ সাউথ ওয়েলেসের কোনও নাগরিকেরই আঙুলের ছাপ রাখতাম না আমরা।

কেসটা সম্পর্কে তদন্ত করার জন্যে গোয়েন্দারা হেডকোয়ার্টার থেকে রওনা হলেন। চিফ ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর প্রায়রকে ডেকে আমি বলে দিলাম—আপনার সাঙ্গোপাঙ্গরা আর যাই করুক না কেন, আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু আঙুলের ছাপ যেন নিয়ে আসে ওরা। লাশ সনাক্ত করতে গেলে সম্ভবত এছাড়া আর কোনও উপায় আমাদের নেই।

ম্যাকরে, ক্রসবি আর রেমাসকে দ্রুতগামী গাড়িতে ওয়াগা পাঠিয়ে দিলেন প্রায়র। সিডনির গোয়েন্দা-বাহিনী আর ওয়াগার পুলিশ-ফোর্স একযোগে অতিরিক্ত যত্ন নিয়ে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখলেন নদী এবং তার দু-তীরের জমি। লাশটা পাওয়া গেছে যেখানে, খুনটা সেখানে হয়নি, তা ঠিক। কিন্তু ঠিক কোন জায়গায় তার প্রাণবায়ু বেরিয়েছে, তাও বলা সম্ভব ছিল না কারও পক্ষে। কেননা, উপড়ে পড়া গাছটার ডালপালার ফাঁকে দেহটা কত হপ্তা যে আটকা পড়েছিল এবং নদীর জলে লাশটা ফেলে দেওয়ার পর স্রোতের টানে যে কতখানি পথ তা পেরিয়ে এসেছে তাই বা জানছে কে। আরও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লাশ পরীক্ষা করতে গিয়ে ওরা আবিষ্কার করলে লোকটির ডান হাতটারই কোনও পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। অর্থাৎ নিহত ব্যক্তিকে সনাক্ত করার শেষ ক্ষীণ সম্ভাবনাটুকুও অন্তর্হিত হল তার নিখোঁজ ডান হাতের সঙ্গে সঙ্গে।

কিন্তু নদীর তীর বরাবর ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে তল্লাশী-পর্ব চালাতে গিয়ে আরও একটা জিনিস আবিষ্কার করলে একজন গোয়েন্দা। ছোট্ট একটা চ্যাপ্টা বাদামি থলি।

থমকে গিয়ে ঝুঁকে পড়েছিল গোয়েন্দা প্রবর থলিটা তুলে নেওয়ার জন্যে। সূত্রের সন্ধান পাওয়ার আশায় আনন্দে আর তর সইছিল না তার। আর তার পরেই নিঃসীম বিভীষিকায় বিস্ফারিত হয়ে উঠল তার দুই চোখের তারা। জিনিসটা বাদামি থলি নয়। মানুষের চামড়ার এতটুকু একটা টুকরো। তখনও ডান হাতের বুড়ো আঙুলের বিবর্ণ নখটা লেগে ছিল চামড়ার সঙ্গে।

সন্তর্পণে মোড়কের মধ্যে করে এই নতুন আবিষ্কারকে পাঠিয়ে দেওয়া হল হেড কোয়ার্টারের আঙুলের ছাপ বিভাগে। জিনিসটা পরীক্ষা করার পর শল্য-চিকিৎসকদের আর কোনও সন্দেহই রইল না। বিবর্ণ নখ সমেত চামড়ার টুকরোটা এক সময়ে একজন পুরুষ মানুষেরই ডানহাতের অংশ ছিল।

ওয়াগার পুলিশ-ডাক্তার রিপোর্ট দিলে নিহত ব্যক্তির কব্জি কৃমিকীট খেয়ে ফেলেছে।

নদীর স্রোতে ভেসে আসার সময়ে কোনও কাঠের গুঁড়িতে আটকে যায় লাশটা—হাতটা সম্ভবত বেরিয়েছিল জলের ওপরে। তখনই হাতের নরম মাংস নিয়ে মহাভোজ শুরু করে দেয় কৃমিকীটবাহিনী—পড়ে থাকে শুধু চামড়ার খোলসটা। পরে যখন স্রোতের হ্যাঁচকা টানে লাশটা ভেসে যায় নদীর তীর থেকে, তখনই এই চর্ম-আবরণই ছিঁড়ে গিয়ে লেগে থাকে ঝোপঝাড়ের মধ্যে। তীক্ষ্ন-চক্ষু গোয়েন্দা প্রবর পরে যা উদ্ধার করে আসলে তাকে, 'মানুষ দস্তানা' ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

ঠিক এই জিনিসটাই চাইছিলাম আমরা। ১৯৩৪ সাল শুরু হওয়ার অনতিকাল আগে পুলিশ ল্যাবরেটরিতে একজন পুলিশ সার্জন মৃত পুরুষের চামড়াটা নিয়ে জলে ভিজিয়ে নরম করে যে নাটকীয় মুহূর্তের সৃষ্টি করেছিলেন, তাও আমি কোনও দিন ভুলব না।

একজন গোয়েন্দাকে ডান হাতে সার্জিক্যাল দস্তানা পরবার নির্দেশ দিলেন ডাক্তার। তারপর চামড়াটা টানটান করে বিছিয়ে ধরতেই দস্তানা পরা ডান হাতটা সন্তর্পণে ভেতরে ঢুকিয়ে দিলেন গোয়েন্দা ভদ্রলোক।

প্রায় খাপে-খাপে লেগে গেল চামড়াটা। এর পর কালির প্যাডে আঙুল টিপে ধরে কাগজের ওপর ছাপ দিলেন গোয়েন্দাটি। অর্থাৎ মানুষ দস্তানার ছাপ থেকেই নিহত ব্যক্তির আঙুলের ছাপ উদ্ধার করা হল।

কিন্তু খুনিকে পাকড়াও করতে হলে আরও অনেক কাঠখড় পোড়ানো দরকার। লাশটা পড়ে ছিল ওয়াগা জেলা হাসপাতালের মর্গে। ডান হাতের ছাপ উদ্ধার করার পর বাঁ-হাতের চামড়াটাও লাশের দেহ থেকে

ছাড়িয়ে আনা একান্ত দরকার। কিন্তু মুশকিল তো এই বাঁ-হাত নিয়েই। পচে গলে দফারফা হয়ে এসেছিল চামড়াটার।

অত্যন্ত বীভৎস কাজের দায়িত্ব পড়ল ডাক্তারের ওপর। কিন্তু পেছপা হলেন না তিনি। সাদা গাউন, মুখোশ আর টুপি পরা তিনজন গোয়েন্দার সাহায্য নিয়ে শুরু করলেন অপারেশন। তারপর ছাড়ানো চামড়াটা সন্তর্পণে প্যাক করে হুঁশিয়ার বার্তাবাহকের হাতে পাঠানো হল হেড কোয়ার্টারে। সেখানকার ডাক্তাররা আর একবার মানুষ দস্তানা কৌশলের আশ্রয় নিয়ে আমাদের হাতে তুলে দিলেন বাঁ-হাতের সবকটি আঙুলের ছাপ।

তারপর শুরু হল অত্যন্ত বিরক্তিকর একঘেয়ে কিন্তু রীতিমতো পদ্ধতি মাফিক এক তল্লাসী পর্ব। ফিংগার প্রিন্ট দপ্তরে আঙুলের ছাপ ছিল প্রায় পাঁচ লক্ষ। এই রাশি রাশি ছাপের মধ্যে কোন ছাপটি যে আমাদের সংগৃহীত ছাপের অনুরূপ তারই সন্ধানে তন্ময় হয়ে গেলাম আমরা।

কাজটা সময়সাপেক্ষ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল বিরামবিহীন ক্লান্তিহীন এই অনুসন্ধানে। তারপর সার্থক হল আমাদের এত পরিশ্রম। মানুষ দস্তানার সঙ্গে হুবহু মিলে যাওয়া ছাপের হদিশ পেলাম ছাপ পঞ্জির মধ্যে। এর পরেই সর্বত্র নিহত ব্যক্তির চেহারার একটা বর্ণনা ছড়িয়ে দিলেন ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর প্রায়র। বর্ণনাটা এই রকমঃ চল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন বছর বয়স, উচ্চতা পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি, মাঝারি গড়ন, দাড়ি-গোঁফ কামানো পরিষ্কার গোল মুখ, ওজন প্রায় ১০ স্টোন ৭ পাউন্ড। ওপরের আর নীচের সারিতে দাঁত নেই কয়েকটা। পরনে কালো রঙের টিউনিক, ধূসর ফ্লানেল শার্ট, নীল রঙের পুরু ডুংগারি কাপড়ের ট্রাউজার্স, শক্ত চামড়ার ব্লুচার হাফ-বুট আট নম্বর সাইজ, মোজা নেই।

লোকটার নাম পার্সি স্মিথ। কিন্তু নামটা কাগজে দিলাম না বিশেষ কারণে। আমাদের মতলব ছিল নাম ঘোষণা করে খুনিকে সচকিত না করে তুলে গোপনে তার গতিবিধি নজর রাখা। বছর চারেক আগে মাতলামো আর উঞ্চবৃত্তির জন্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল স্মিথকে এবং এই লোকই যে সেই স্মিথ, সে সম্বন্ধে সন্দেহের ছায়ামাত্র ছিল না আমাদের কারো মনে।

আমাদের পরম সৌভাগ্য অল্পায়াসেই হদিশ পাওয়া গেল পার্সি স্মিথের। লোকটার কতকগুলো অসুবিধে ছিল। যেমন, যাচ্ছেতাই রকমের তোতলামো। কাজেই চট করে লোক তাকে ভুলতে পারত না। অচিরেই স্মিথ সম্বন্ধে আরও অনেক খবর সংগ্রহ করে ফেললাম আমরা। যাযাবরের মতো দেশময় চর্কিপাক দিত নিজের ওয়াগনেট হাঁকিয়ে। এটা কিন্তু দেশভ্রমণের বাতিক নয়। জীবিকার তাগিদে এ-শহর থেকে সে-শহরে ঘুরত টুকিটাকি কাজ পাওয়ার আশায়। মন্দার বছরগুলিতে অন্যান্য অনেক বেকারের মতো বাধ্য হয়ে এইরকম ভ্রাম্যময় কর্মজীবন নিতে হয়েছিল তাকে। যেখানেই কাজ পেত, সেইখানেই আস্তানা গেড়ে বসে যেত স্মিথ। কিন্তু দিন কয়েকের বেশি কোনও কাজই টিকত না। কাজ শেষ হলেই তল্পিতল্পা নিয়ে ওয়াগনেট হাঁকিয়ে যাত্রা করত অন্য কোনও অঞ্চলে।

দীর্ঘকাল ধরে খোঁজ-খবর নেওয়ার পর অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত স্মিথের গতিবিধির পূর্ণ বিবরণ পেলাম। ১৮ ডিসেম্বর মোরে নামে এক বন্ধুর সঙ্গে তাকে দেখা গিয়েছিল। সেই দিনই তার ওয়াগনেট যে জায়গায় দাঁড়িয়েছিল তার কয়েক মাইল দূরেই পরে পাওয়া গিয়েছিল তার মৃতদেহ।

সাক্ষীরা ১৯শে ডিসেম্বরেও স্মিথকে দেখতে পেয়েছিল তার ওয়াগনেটে। কিন্তু পরের রাত্রে মোরে একলাই ফিরে এল যাযাবর কর্মীদের ক্যাম্পে। তার তাঁবুর গায়ে অনেকেই রক্তের দাগ লেগে থাকতে দেখেছিল। মোরে কিন্তু নির্বিকার ভাবে একটা ঘোড়া আর কয়েকটা ব্যক্তিগত জিনিস বিক্রি করে দিলে সঙ্গীসাথীদের মধ্যে। পরে দেখা গিয়েছিল প্রতিটি জিনিসেরই প্রকৃত মালিকানা স্বত্ব ছিল স্মিথেরই।

জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে মোরেকে খুঁজে পেতে আনার হুলিয়া বেরিয়ে গেল তক্ষুনি। আবার প্রসন্ন হলেন আমাদের ভাগ্যদেবী। দেখা গেল, আদত লোকটা পুলিশের হেপাজতে রয়েছে। বড়দিনে ছোটখাটো অপরাধের অভিযোগে অল্প কয়েক দিন হল পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল তাকে। হপ্তা-দুয়েকব্যাপী হাজত বাস

করে এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করছিল সে। ইতিমধ্যে আরও একটা খবর পেলাম আমরা। জেমস এন্ডেজ নামে এক গ্যারেজের মালিক ওয়াগার কাছেই থাকতেন। ১৬ ডিসেম্বর তিনিও দেখেছিলেন মোরেকে এবং তার চার দিন পরেও আবার শ্রীমানের দর্শনলাভের সৌভাগ্য হয় তাঁর। দ্বিতীয় দর্শন ঘটে তাঁর গ্যারেজেই। একটা ওয়াগনেট হাঁকিয়ে এসেছিল মোরে। টুকটাক কয়েকটা মেরামতি কাজের জন্যে নগদ টাকাও ধরে দিয়েছিল সে।

হাজতের মধ্যে মোরেকে প্রশ্ন করা হলে অম্লান বদনে সে বললে ওয়াগনেটটা তার কাছে বিক্রি করেছে ও ডাউড নামে এক ভদ্রলোক। ওয়াগার কাছেই তাঁর নিবাস। কিন্তু বহু লোকের এজাহারের সঙ্গে এতটুকু সাদৃশ্য ছিল না তার এই জবানবন্দীর। কাজে-কাজেই স্মিথকে হত্যার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হল।

বিচার শুরু হয় ১৯৩৪ সালের ৮ মে। তিলধারণের স্থান ছিল না ওয়াগার ছোট্ট আদালত-ভবনে। কেসটার প্রচার তো কম হয়নি। কাজেই বহু মহিলাও সেদিন ভিড় করেছিলেন পাবলিক গ্যালারিতে। নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল মোরে। অশান্ত মনোভাবের অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছিল তার অসুস্থ-চঞ্চল হাবভাবে। প্রতিবাদীর বিশেষ সুবিধার সুযোগ নিয়ে সে চ্যালেঞ্জ করে বসল বারোজন জুরিকে।

জুরিকে দিয়ে চরম শপথ নেওয়ার আগে হামেশাই আদালত-কক্ষের গোলমাল থামানোর জন্যে হাতুড়ি পিটতে হয় ধর্মাবতারকে। কিন্তু সেদিন টু শব্দটি শোনা গেল না ঘরের মধ্যে। একের পর এক সাক্ষী কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যা বললে, তা একটু একটু করে জুড়ে গড়ে উঠল অবস্থাঘটিত প্রমাণ বা পরোক্ষ প্রমাণের এক সুদৃঢ় যুক্তি শৃঙ্খল। প্রথম সাক্ষী দিলে ক্যাম্পবাসীদেরই একজন। মোরেকে রক্তমাখা তাঁবু নামাতে দেখেছিল সে। রক্তের দাগের হেতুও জিজ্ঞেস করেছিল সে। উত্তর ধমকে উঠেছিল মোরে। মুখ বন্ধ করে নিজের চরকায় তেল দেওয়ার মূল্যবান উপদেশ শুনিয়েছিল দাঁত কিড়মিড় করে।

গ্যারাজের মালিক আরও একটা নতুন সংবাদ পরিবেশ করলেন। ওয়াগনেটের ক্যানভাসের মধ্যে গাঁথা একটা ছুরি দেখতে পেয়েছিলেন তিনি। রক্তরঞ্জিত ছিল ছুরিটার হাতল। আরও প্রমাণ পাওয়া গেল। এক ভদ্রলোকের কাছে একটা সোনার ঘড়ি বিক্রি করেছিল মোরে। 'এস' অক্ষরটি খোদাই করেছিল ঘড়ির গায়ে। অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে মাঝারি আকারের একটা জ্যাকেটও কিনেছিলেন ভদ্রলোক ওর কাছে থেকে। 'এস' চিহ্নিত ঘড়ি এবং বিশেষ মাপের জ্যাকেট দুটোই সূচনা করছে সেই একই সন্দেহের।

সাক্ষীদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিলেন যিনি তাঁর নাম জোন্স। পুলিশের কাছে তিনি বিবৃতি দিয়েছিলেন যে মোরে আর স্মিথের মধ্যে দারুণ কথা কাটাকাটির সময়ে তিনিও হাজির ছিলেন। রেগে আগুন মোরে শেষকাল স্মিথকে খতম করে দেওয়ার হুমকি দেখায়। আদালত থেকে যখন ডাক পড়ল এই সাক্ষীর, তখন কিন্তু তাঁর আর পাত্তা পাওয়া গেল না। কাজেই সেদিনের মতো মুলতুবী রাখা হল বিচারের পর্ব। পরের দিন সকালে আদালত শুরু হতেই বিচারপতি জিগ্যেস করলেন এজাহার দেওয়ার জন্যে সাক্ষী প্রস্তুত আছেন কিনা। কিন্তু সাক্ষীর বদলে কাঠগড়ায় উঠে এলেন এক পুলিশ অফিসার। বললেন—'সাক্ষী মৃত। মাথার পেছনে বুলেট বিদ্ধ অবস্থায় তার লাশ আবিষ্কার করেছি আমরা।'

তদন্তে প্রকাশ পেল যে নিহত ব্যক্তির স্ত্রীর সঙ্গে মোরের অবৈধ বন্ধুত্ব ছিল। স্বামী হত্যার দায়ে গ্রেপ্তার করা হল ভদ্রমহিলাকে। কিন্তু পরে তাকে খালাস করে দেওয়া হয়। খুনটা নাকি ইচ্ছাকৃত নয়। নেহাতই দুর্ঘটনা।

এজন্যে কিন্তু মোরের বিচার-পর্বে কোনও ছেদ দেওয়া হয়নি। আঙুলের ছাপের বিশেষজ্ঞ কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে 'মানুষ দস্তানা' মাধ্যমে নিহত ব্যক্তির আঙুলের ছাপ উদ্ধারের চাঞ্চল্যকর কাহিনি বর্ণনা করলেন, তখন জুরিরাও একাগ্র মনে শুনলেন সেই বীভৎস কিন্তু কৌতূহলোদ্দীপক উপাখ্যান। মোরে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি অভিযোগই অস্বীকার করলে। ক্রাউন প্রসিকিউটরও প্রতিবাদী পক্ষের সঙ্গে একমত হয়ে বললেন যে মোরের বিরুদ্ধে কেসটি যে সব সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে, সেগুলো অবস্থাঘটিত

পরোক্ষ প্রমাণ ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু তবুও এ সব প্রমাণ এত বেশি এবং এমনই জোরালো যে একবাক্যে মোরেকেই হত্যাকারী স্বীকার না করে উপায় নেই।

জুরিদের মতেও দোষী সাব্যস্ত হল মোরে। মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করার সময়ে এক হাত নিজের ঘাড়ে রেখে আর এক হাতের শক্ত মুঠিতে চেপে ধরল সে নেকটাইয়ের গিঁটটা। পরে মৃত্যুদণ্ড লাঘব করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয় তাকে। ১৯৫৩ সালের পয়লা ডিসেম্বর যক্ষ্মারোগাক্রান্ত মোরেকে মুক্তি দেওয়া হয় কারাগারের অন্ধকার থেকে। বিশ বছর শ্রীঘর বাস করে বন্ধু হত্যার চরম প্রায়শ্চিত্ত করে গেল সে রাজরোগকে আশ্রয় করে।

** ওয়ালটার হেনরী চাইল্ডস (অস্ট্রেলিয়া) রচিত কাহিনি অবলম্বনে।*

রাতের আতঙ্ক

রবিবার সকাল। দূরদর্শনে মহাভারতের পাট চুকে গেছে। সাপ্তাহিক আড্ডা মারতে বন্ধুবান্ধব আসবে এখন। আমি কলম মুড়ে রাখলাম। কবিতা আঁচলে মুখ মুছতে-মুছতে এসে বসল আমার পাশের চেয়ারে।

বললাম, 'গিন্নি, তোমার গা থেকে পাঁঠা-পাঁঠা গন্ধ বেরোচ্ছে।'

কবিতা বললে, 'ওটা সঙ্গ দোষের গন্ধ। বিয়ের আগে যখন আধপাগল হয়েছিলে, তখন পেতে আতরের গন্ধ—এখন পাচ্ছ পাঁঠার গন্ধ। সুতরাং গন্ধটা কোত্থেকে অর্জন করেছি, তা কি বলে দিতে হবে?'

আমি বললাম, 'বুঝলাম। আমি পাঁঠা। কিন্তু তুমি পাঁঠার ঝোল খেতে চেয়েছিলে বলে পাঁঠা কিনে আনলাম। পাঁঠাতে তোমার রুচি আছে বলেই পাঁঠার মালা গলায় পরেছ। তবে, পাঁঠার ঝোল তোমার এত প্রিয় জানলে তোমার ছায়া মাড়াতাম না।'

'তোমাকে রেঁধে খেয়ে ফেলব, সে আশায় থেকো না। তুমি একটা অখাদ্য।'

'অখাদ্য!'

'এক্কেবারে। নইলে কোনকালে চেখে দেখতাম।'

'রোজই তো সে কর্মটা করছ। করে-করে বুঝে গেছ, আমি একটা অখাদ্য।'

'মরণ।'

এই বলে রূপসী ভার্যা আরও একটু গা-ঘেঁষে বসল। অমনি দোরগোড়ায় শোনা গেল অতি পরিচিত বিষম-খাওয়ার শব্দ।

ঠোঁট বেঁকিয়ে চোখ পাকিয়ে কবিতা বললে, 'আপদ! সাতসকালে গলায় কাঁটা ঢুকিয়ে বসে আছে।'

চৌকাঠ পেরিয়ে এসে উত্তমকুমার ঢঙে ইন্দ্রনাথ বললে, 'হে মোর বন্ধুপত্নী, এ কাঁটা প্রেমালাপের কাঁটা। তোমাদের কাছে যা মধুময়, আমার কাছে তা কণ্টক।'

বিষদৃষ্টিতে সুদর্শন বন্ধুবরের আসন গ্রহণ নিরীক্ষণ করতে-করতে কবিতা বললে, 'তোমার মতো সুপুরুষ আইবুড়োদের এই ধরনের সেক্সুয়াল অ্যাভারসন থাকলেই ধরে নিতে হবে তোমরা প্রত্যেকেই এক-একটা ক্রিমিন্যাল।'

'খুনে ক্রিমিন্যাল', হৃষ্ট কণ্ঠে বললে ইন্দ্রনাথ, 'যেমন ছিল জন জর্জ হেগ। ১২৩ বছর আগে বেচারা ফাঁসিকাঠে ঝুলেছে। খুন করে গলা কেটে গেলাস ভরে রক্ত নিয়ে পান করত ঢকঢক করে। ভারি সুন্দর চেহারা, মেয়েবন্ধু ছিল অনেক, কিন্তু প্রেম করত না কারুর সঙ্গে—বিয়ের কথাও ভাবত না। খুন করে আর কাঁচা রক্ত খেয়েই তার যত আনন্দ। শেক্সপীয়রের কথা ভুল বলে প্রমাণ করে দিয়েছিল। প্রচণ্ডভাবে সঙ্গীতপ্রিয় ছিল—গানবাজনা ওকে নিয়ে যেত সুরলোকে—এই লোকই আবার অসুর হয়ে যেত, অনর্গল মিষ্টি মিথ্যে বলে যেত, পাকা শিল্পীর মতো সই জাল করত, হাতের লেখা নকল করত। খুন-টুন করে লাশগুলোকে সালফিউরিক অ্যাসিডে নিশ্চিহ্ন করে দিত। রির্মাকেবল!'

'রিমার্কেবল!' শিউরে উঠল কবিতা।

ইন্দ্রনাথ সিগারেট ধরিয়ে বললে, 'হেগ নাকি সিজোফ্রেনিয়া রোগে ভুগত। মনের রোগ। আমার কিন্তু সে রোগ নেই, বউদি। সুতরাং নির্ভয়ে থেকো।'

এইবার আর-একটা অতি-পরিচিত কৃত্রিম কাশির আওয়াজ ভেসে এল দোরগোড়া থেকে। কাশতে-কাশতেই ভেতরে এসে ইন্দ্রনাথের পাশে এসে বললে পুলিশবন্ধু জয়ন্ত, 'মাই ডিয়ার টিকটিকি এইসব

ব্যাপারই এখন আমার মাথায় ঘুরছে।'

'রক্তৃতৃষ্ণা জাগছে বুঝি?' সকৌতুকে বললে ইন্দ্রনাথ।

'অতীতে এ-রোগ কাদের হয়েছিল, সেই খোঁজ নিচ্ছি। হেগ রক্ত খেতে শিখেছিল 'ডাবল লাইফ' বইটা পড়ে—তাই না?'

গম্ভীর হয়ে গিয়ে ইন্দ্রনাথ বললে, 'খবর রাখিস তাহলে। গুড। 'ডাবল লাইফ' এক কশাই-এর গল্প। মানুষ মেরে তাদের রক্ত খেত, মাংস বেচে খদ্দেরদের খাওয়াত। এর বেশি আর কিছু জানিস?'

জয়ন্ত বললে, 'আরও আছে?'

'আছে। 'ডাবল লাইফ' উপন্যাসের নায়ক মনগড়া নয়। হ্যানোভারে তার নিবাস। নাম, ফ্রিজ হারম্যান। চব্বিশটা ছেলেকে খুন করে তাদের মাংস বেচেছে আর রক্ত খেয়েছে।'

'মাই গড!' বললে জয়ন্ত।

ইন্দ্রনাথ বললে, 'হেগ-এর রক্তৃতৃষ্ণা জেগেছিল আরও একজন নরপিশাচের কীর্তিকাহিনি পড়ে। নাম তার সিলভেস্টার মাটুস্কা। ১৯৩১ সালে বুদাপেস্তে ইচ্ছে করে ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট ঘটিয়ে বাইশটা নরহত্যা ঘটিয়ে অসীম তৃপ্তি পেয়েছিল। মানুষ মেরেই আনন্দ পেত সিলভেস্টার। হেগ আর সিলভেস্টারের মধ্যে এক জায়গায় অমিল আছে—মিল আছে অনেক জায়গায়।'

'অমিলটা কী?' জয়ন্তর প্রশ্ন।

'হেগ পাগলামির ভান করেছিল বাঁচবার জন্যে—সিলভেস্টার তা করেনি। সাফ বলেছিল, মানুষকে মরতে দেখলে আনন্দ পাই বলেই ট্রেন ধ্বংস করি।'

'মিলগুলো কোথায়?' জয়ন্ত ঝুঁকে বসেছে।

'একটাই এখন শোন। দুজনেই মনে করত, একটা অদৃশ্য অশরীরী সত্তার হিপনোটিক হুকুমে এ-কাজ তাদের করতে হয়।'

অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল কবিতা, 'প্লীজ। বিকট এই আলোচনা আর ভালো লাগছে না।'

তর্জনী তুলে ইন্দ্রনাথ বললে, 'তাহলে বলো আর কক্ষনও আমাকে ক্রিমিন্যাল বলবে না।'

'তুমি স্যাডিস্ট। মানুষকে দগ্ধে মেরে আহ্লাদে আটখানা হও।'

'তাহলে তো তোমাকে ডক্টর নক্স-এর গল্প শুনতে হয়।'

'ডক্টর নক্স।'

'এডিনবরার ডাক্তার। থাকতেন দশ নম্বর সার্জন স্কোয়ারে। লাশ কাটাকুটি করার জন্যে মানুষ মারিয়ে আনতেন খুনে দালাল লাগিয়ে। শেষকালে তিলোত্তমা এক বারবনিতার মড়া দেখে এমনই মুগ্ধ হয়ে গেলেন যে তাকে তিনমাস ধরে ডুবিয়ে রাখলেন হুইস্কির চৌবাচ্চায়। তিনমাস ধরে রূপসুধা পান করেছেন—শিল্পীদের ডেকে এনে সুন্দরীর ছবি আঁকিয়েছেন।'

জয়ন্ত বললে, 'ইন্দ্র, রক্ত আর রূপের তেষ্টা নিবারণের গল্প শুনে মোহিত হলাম। কিন্তু এখন যে জঘন্য খুনগুলো হয়ে চলেছে এই শহরে সেগুলোর মূলে কী ধরনের তেষ্টা আছে বলে তোর মনে হয়?'

ইন্দ্রনাথ পোড়া সিগারেট ফেলে দিয়ে নস্যির ডিবে খুলতে-খুলতে মঞ্চ-নায়কের পোজে আড়চোখে কবিতার দিকে চেয়ে বললে, 'সরি বউদি...খুবই নোংরা অভ্যেস—কিন্তু ভিখিরি জেমি উইলসনের পকেটে তামার নস্যির ডিবে আর পিতলের নস্যির চামচ ছিল বলেই ডক্টর নক্সের ল্যাবোরেটরিতে তার লাশ কাটাকুটি হয়ে যাওয়ার পরেও ধরা গেছিল খুনিকে—ডিবে আর চামচ পাওয়া গেছিল খুনে দালালের পকেটে।'

'ঠাকুরপো! ফের!'

জয়ন্ত বললে, 'আমার প্রশ্নটার জবাব জানা নেই মনে হচ্ছে?'

ইন্দ্রনাথ বললে, 'সত্যিই জানা নেই, জয়ন্ত। থাকলে এই নারকীয় কাণ্ড বন্ধ করতে আগে কোমর বেঁধে লাগতাম আমি। আবার কার মাথা ছাতু হল?'

এমন সময়ে ঘরে ঢুকল লোকনাথ পাল। ট্রাফিক পুলিশের ও-সি। যেমন টল, তেমনি হ্যান্ডসাম। যেন পাথরের গ্রীকমূর্তি হঠাৎ প্রাণ পেয়েছে। দুই চোখ আশ্চর্য শান্ত। ঠোঁটের কোণে-কোণে হাসির ঝিলমিল। ঈর্ষাকাতর মহলে শোনা যাচ্ছে, ডি-সি ট্রাফিক তাকে আরও ওপরে তুলবেন ঠিক করে রেখেছেন।

লোকনাথ বললে, 'হ্যালো বউদি, জয়ন্তদা এখানে কফি খেতে এসেছে শুনেই ভটভটি নিয়ে চলে এলাম। —ইন্দ্রদা, এবার মাথা গুঁড়োল যার, সে নিজেই পাগল। বয়স তিরিশও ছাড়ায়নি। নার্সিংহোম থেকে পালিয়ে এসে ঘুমিয়ে পড়েছিল ফুটপাতে। রাতের আতঙ্ক যথারীতি তার মাথার ঘিলু বের করে নিয়ে গেছে।'

'কোথায়?' নস্যি নেওয়া শেষ করে বললে ইন্দ্রনাথ।

'এখান থেকে মিনিট দশেকের পথ। যাবেন? ডেডবডি এখনও পড়ে রয়েছে।'

উঠে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ। সেইসঙ্গে আমি আর জয়ন্ত। ফ্যাকাশে মুখে বসে রইল কবিতা।

কিন্তু অতবেলা পর্যন্ত মড়া ফেলে রাখে না পুলিশ। ফটোগ্রাফাররা এসে পড়ার আগে লাশ পাচার হয়ে গেছে।

পুলিশের লাল মোটর সাইকেল দেখে ভিড় যেন আরও বাড়ল। ইঞ্জিন চালু রেখেই লোকনাথ বললে, 'মর্গে যাবেন?'

ইন্দ্রনাথ বললে, 'তাই চল।

আমি বললাম, 'তাহলে আমি বাড়ি যাই।'

'গিয়ে পাঁঠার ঝোল খা আর বউ-এর মুখনাড়া,' বলে আমাকে ঠেলে বাইক থেকে নামিয়ে দিল ইন্দ্র।

লাশকাটা টেবিলে শোয়ানো মড়াটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ইন্দ্রনাথ বলেছিল, 'হাঘরের ছেলে বলে তো মনে হচ্ছে না।'

সত্যিই তাই। করোটি গুঁড়িয়ে ঘিলু বেরিয়ে গেলেও চোখ-মুখের গড়নে শিক্ষাদীক্ষার ছাপ রয়েছে। গায়ের রং ময়লা হলেও চামড়ার কোথাও ময়লা নেই। গালে সামান্য দাড়ি—দিন কয়েক না কামানোর জন্যে। ঠোঁটের আর নাকের ধারে বুদ্ধির ছাপ রয়েছে।

লোকনাথ বলেছিল, 'কেয়াতলার তপোবন নার্সিংহোমে ছিল। মেন্টালি ডিরেঞ্জড। পকেটে কার্ড দেখে বুঝলাম।

'প্রথম তুই-ই দেখেছিলি।'

'হ্যাঁ। রাত দুটো নাগাদ। ঘণ্টা দুই আগেও পাক দিয়ে গেছি। একেও ঘুমোতে দেখেছি।'

'একা?'

'হ্যাঁ। ল্যাম্পপোস্টের তলায়। ও অঞ্চলে ফুটপাতের বাসিন্দা তেমন নেই।'

ইন্দ্রনাথ আর কথা না বাড়িয়ে থেঁতলানো করোটিটা খুঁটিয়ে দেখেছিল। এক ঘায়েই খুলি গুঁড়িয়ে ভেতরে ঢুকে গেছে। মগজের গ্রে-ম্যাটার আর হোয়াইট ম্যাটার লাল রক্তের সঙ্গে মিশে বেরিয়ে এসেছে।

ইন্দ্রনাথ বলেছিল, 'পাথরটা?'

'পড়েছিল ডেডবডির পাশে।'

'তুই যখন প্রথম দেখেছিলি, তখন ছিল না নিশ্চয়।'

'মনে তো পড়ে না। রানিং বাইক থেকে অত দেখা যায় না।'

'দুটো নাগাদ চোখে পড়েছিল?'

'ডেডবডির বুকের ওপরেই ছিল যে।'

'সে পাথর এখন কোথায়?'

'চল, নিজে দেখবে।'

'যাচ্ছি।' বলে, মৃতদেহের ডানহাতটা তুলে নিয়ে কনুইয়ের ভেতর দিকে চেয়ে রইল ইন্দ্রনাথ। চেয়ে থেকেই বললে, 'খুনিকে আটকাতে গেছিল ভিকটিম।'

'কী করে বুঝলে?'

'পাথরের চোটে থেঁতলে গেছে শিরা-টিরাগুলো। মাথায় পাথর পড়েছে বুঝেই নিশ্চয় রুখতে গেছিল। হাত জখম হওয়ার পরেই মাথা গুঁড়িয়েছে।—আগের পোস্টমর্টেম রিপোর্টগুলো দেখা যাবে?'

'দেখবে? চলে এসো।'

একটার পর একটা রিপোর্ট পড়ে নিয়ে ফাইল নামিয়ে রাখল ইন্দ্রনাথ।

লোকনাথ বললে, 'কী বুঝলে?'

'নিহত হওয়ার আগে প্রত্যেকেই পাথর আটকানোর চেষ্টা করেছিল। কখনও বাঁ-হাত দিয়ে, কখনও ডান হাত দিয়ে।'

'অনুমানের কারণ থেঁতলানো কনুই?'

'কনুইয়ের ভেতর দিক।'—অর্থাৎ প্রত্যেকেই দেখেছে পাথর নেমে আসছে মাথার ওপর। রুখেছে। তবুও মরেছে। আশ্চর্য!'

'কেন?'

'একটা পাথর দেখাবি?'

'একটা কেন—সবক'টা দেখাব। খুনে পাথরের মিউজিয়াম তৈরি হচ্ছে বলেই তো আমি পাগল হতে বসেছি, ইন্দ্রদা।'

'আমি এখনও হইনি।—চ।'

পাথরের মিউজিয়ামই বটে। তাকের ওপর সারি-সারি সাজানো পাথর। প্রত্যেকটার তলায় একটা কাগজ। তাতে লেখা কবে কোথায় কার ডেডবডির কাছে পাওয়া গেছে রক্তপিপাসু প্রস্তরকে। বেশির ভাগই মধ্য কলকাতায়। দুটি নর্থে। একটি সাউথে। এবং শেষেরটাই কাল রাতে উড়িয়েছে পাগলের প্রাণপাখি।

'ফিতে আছে?' বললে ইন্দ্রনাথ।

'ফিতে? কীসের ফিতে?' লোকনাথের প্রশ্ন।

'মাপবার ফিতে।'

মিউজিয়ামের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। টেবিলের সামনে গিয়ে ড্রয়ার টেনে ফিতে বের করে এনে দিলেন ইন্দ্রনাথের হাতে।

প্রতিটি পাথর মাপল ইন্দ্রনাথ।

বললে, 'কোনওটাই দেড়ফুটের বেশি লম্বা নয়, এক ফুটের বেশি চওড়া নয়, আড়াই ইঞ্চির বেশি পুরু নয়। —নিন, আপনার ফিতে। চলো হে লোকনাথ, বড় খিদে পেয়েছে।'

'তাহলে আমার ডেরাতেই খেয়ে নেবেন চলুন। আপনিও একা, আমিও একা।'

ঘর থেকে বেরোতে-বেরোতে মুচকি হেসে ইন্দ্রনাথ বললে, 'তুমি একা থাকতে যাবে কোন দু:খে? কত প্রজাপতি উড়ছে তোমাকে ঘিরে।'

সিঁড়ির ধাপে পা দিয়ে হাসতে-হাসতে লোকনাথ বললে, 'ভালো চাকরি আর ভালো চেহারা থাকলে বিয়ে পাগলীদের অভাব হয় না, ইন্দ্রনাথদা। আপনি নিজেও তা জানেন।'

'জানি,' কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলল ইন্দ্রনাথ, 'কিন্তু আমার মতো ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা তো তোমার নেই। গুজব যা শুনছি—'

'গুজব?' ঘাড় ফেরায় লোকনাথ। এখন তার চোখেও হাসি।

'তুমি নাকি ভীমরুলকে বিয়ে করবেই ঠিক করে ফেলেছ।'

প্রাণখোলা হাসি হেসে লোকনাথ বললে, 'ভোমরার নাম শেষপর্যন্ত ভীমরুল হয়ে দাঁড়াল আপনার কাছে?'

'কথা তো নয়—কটাস-কটাস হুল ফোটানো। ও মেয়েকে বিয়ে করলে পস্তাবে, লোকনাথ।'

'করছে কে?'

'তার মানে?' বাইকের সামনে থমকে গেল ইন্দ্রনাথ, 'কটাস-কটাস কপচানি মিঠে-মিঠে বুলির চেয়ে অনেক ভালো? সাচবাত কোনকালে মিঠে হয়? ভোমরা ভালো মেয়ে।'

কিক দিয়ে লোকনাথ বললে, 'নি:সন্দেহে। কিন্তু বিয়ের বাঁধন এখন নয়।'

'তবে কখন?'

'খুনে পাথরের মালিককে ধরবার পর। আমার ইজ্জত ঢিলে করে ছেড়েছে হারামজাদা।'

ভোমরা কিন্তু সশরীরে হাজির ছিল লোকনাথের নিরালা আলয়ে। কালো কুচকুচে মেয়ে—এক্কেবারে কালনাগিনী চেহারা। চোখমুখ যেন কাটারি দিয়ে তৈরি। তেমনি জিভের ধার। জীনস-এর দু-পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছোটবড় কোঁকড়ানো চুল ঝাঁকিয়ে বললে, 'স্বাগতম ভ্যামপায়ার!'

হেসে ফেলে বললে ইন্দ্রনাথ, 'দরজা বন্ধ অথচ ভেতরে তুমি, ব্যাপারটা কী কটকটি?'

'কটকটি কাকে বলছেন?'

'তোমাকে। তোমার নাম ভীমরুল, তোমার নাম কটকটি, তোমার নাম তেড়িমেড়ি—কালকুটি তো বলিনি।'

'কালকুটি!' সঙ্গে-সঙ্গে ফণা তুলে ফেলল কালনাগিনী।

'আহা! আহা! লোকনাথ তোমাকে আদর করে কালকুটি বলে ডাকতে পারে—কিন্তু আমি তো জানি কালো হিরে যদি কোথাও থাকে—তবে সে তুমি।'

'কালো হিরে তো কয়লা! আমি কয়লা?'

'কয়লাই তো সব গুণের আকর। কয়লার ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে গোটা পৃথিবীর মোটা-মোটা ইনডাস্ট্রি!'

'কয়লা ধুলেও ময়লা যায় না,' টিপ্পনী কাটল লোকনাথ।

আর যায় কোথায়! তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল ভোমরা। 'তুমি কী? তুমি তো রকবাজ, রিপ্টুবাজ, ভ্যানতারা ভ্যামপায়ার!'

কানে দু-আঙুল গুঁজে ইন্দ্রনাথ, 'মাথা ভোঁ-ভোঁ করছে! একী গরম-গরম গালাগাল রে বাবা। মানেও তো জানি না। ভ্যানতারা ভ্যামপায়ার কেন হবে লোকনাথ?'

'সারারাত তো বৈঠকবাজি করে বেড়ায়! কাজের নামে অষ্টরম্ভা। ফেরেববাজ কোথাকার!'

'কিন্তু রকবাজি লাইফে করিনি,' হাসি-হাসি মুখে বললে লোকনাথ। বলতে-বলতে কোমরের রিভলভার সমেত বেল্ট-টেল্ট খুলে রাখল টেবিলে। 'কোনও বন্ধুই ছিল না ছেলেবেলায়, বাবা-মা মিশতেই দেয়নি।'

'এখন তো লুসিমিসিবাবারা লাইন দিয়ে আছে পেছনে,' কালনাগিনীর গলায় সত্যিই যেন এখন হিসহিসানি শোনা যাচ্ছে।

'যেমন তুই দিয়ে আছিস,' চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে-বসতে বললে ইন্দ্রনাথ, 'কিন্তু কুকুরের ল্যাজে যতই তেল দিয়ে মলো না কেন—ও ল্যাজ সিধে হবে না।—তাই না লোকনাথ? বিয়ে তো তুমি করবে না?'

'যাও বা করব-করব ইচ্ছে করেছিল, এইরকম ক্যাটক্যাটানি শুনে মন এখন পালাই-পালাই করছে।' শার্টের বোতামে হাত দিল লোকনাথ, 'রান্নাঘরে যাও না কালকুটি, দেখছ না জামা খুলছি?'

'ওরকম বুকের লোম অনেক দেখেছি!...ইস কী বলতে কী বলে ফেললাম।'

অট্টহেসে ঘর ফাটিয়ে দিয়ে ইন্দ্রনাথ বললে, 'এই জন্যেই তো তোর ভাবী স্বামী বলে, তোকে বিয়েই করবে না।'

'ইস! আমি ছাড়া ওর গতি-ই নেই। জানেন না তো মেয়ে মহলে ওর কি নাম।'

'কী নাম রে?'

'রূপকুমার দ্য ইমপোটেন্ট।'

'ছি:-ছি:-ছি:? তা তুই-ই গণ্ডাখানেকের মা হয়ে দুর্নামটা ঘুচিয়ে দিস।'

'দেবই তো। সেই জন্যেই তো ঘুরঘুর করছি। রূপকুমার অবশ্য বস্তা-বস্তা চিঠি লিখেই যাচ্ছে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গর সই জাল করে—'

'মানে?'

'অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গকে চেনেন না? আপনি আর কী করে চিনবেন। আমার তিন স্তাবক—লাভারও বলতে পারেন—যদিও আমি লাভ-টাভ করি না—শুধু মিশি।'

'শুধু—মিশিস?'

'পারমিসিভ সোসাইটি না? সবার সঙ্গে মিশতে হয়—সবার সঙ্গে ঘুরতে হয়—কিন্তু কারও কোলে ধরা দিতে নেই।'

'শুধু রূপকুমার ছাড়া—'

'ইয়েস, স্যার। তারপর শুনুন—অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গকে খুব নাচিয়ে চলেছি—আর নিজে নেচে চলেছি এই কলির কেষ্টটার সঙ্গে—ইনি কী করেন জানেন? শুনলে ফের কানে আঙুল দেবেন...অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গর নামে বিচ্ছিরি-বিচ্ছিরি চিঠি লেখে আমার কাছে—আমি তো চিঠি পেয়েই তেড়ে গিয়ে ধরেছিলাম তিনজনকে। তিনজনেই বললে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাদেরই হাতের লেখা, সইগুলোও হুবহু এক—তবে মা কালীর দিব্যি—আমরা লিখিনি। তবে কে লিখেছে? ওরা ফের মা কালীর দিব্যি গেলে বললে, 'রূপকুমার। রূপকুমার! জালিয়াতি নম্বর ওয়ান! তাই তো এসেছিলাম হেস্তনেস্ত করতে। এসব কী হচ্ছে—হ্যাঁ-কী হচ্ছে?'

লুঙ্গি পরতে-পরতে লোকনাথ বললে, 'ওরা বলল আমি জালিয়াত?'

'তবে না তো কি ভগবান? তুমিই বলোনি আমাকে ছেলেবেলায় বাবার সই জাল করে মাস্টারদের ধোঁকা দিয়েছ?'

'বেশ করেছি।'

'কোনটা বেশ করেছ? অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গকে ভড়কি দেওয়া, না, বাবার নাম ডুবোনো?'

'বাবার নাম ডুবোব কোন দু:খে? অঙ্কের ক্লাসের চাইতে গানের ক্লাস ভালো লাগত বলেই সই জাল করেছি।'

মিটিমিটি হাসতে-হাসতে ইন্দ্রনাথ বললে, 'কালকুটি, থুড়ি, কটকটি, তুই-ই বা অত খাপ্পা হয়ে যাচ্ছিস কেন? কোন পুলিশের লোক এরকম গান-পাগল হয় রে? ও হে লোকনাথ, মোজার্ট শোনাও, বিঠোফেন রবিশঙ্কর শোনাও, বিসমিল্লা শোনাও—যা হয় একটা কিছু শোনাও—নইলে কালনাগিনী তোমাকে ছোবল মেরেই যাবে।'

'ঢোঁড়া সাপের বিষে আমার কচু হবে,' বলে একটা ক্যাসেট বেছে নিয়ে স্টিরিওতে ঢুকিয়ে দিল লোকনাথ। ঘর গমগম করে উঠল পাগল-করা সুরের ইন্দ্রজালে। সঙ্গে-সঙ্গে চোখের তারা ছোট হয়ে এল ভোমরার।

বললে অন্য সুরে, 'এই সুরটাই সেদিন তুমি অর্গ্যানে তুলছিলে না?'

লোকনাথের চোখেও যেন ঘোর লেগেছে। গলার স্বরে তার রেশ ভেসে ওঠে, 'হ্যাঁ, মোজার্টের সব চাইতে ফেমাস সুর। যতবার শুনি মনে হয় আমি এ জগতে আর নেই।'

ইন্দ্রনাথ বললে, 'আপাতত এই জগতেই থাকো—কেন না আমার খিদে পেয়েছে।'

'তাই তো...তাই তো...খিদে নিয়েই তো আপনি এসেছেন...ভোমরা, ও ভোমরা...দুটো ভাত ফুটিয়ে দেবে...মাংস করাই আছে ফ্রিজে।'

'আমি পারব না।'

'তবে আমার গিন্নি হবে কী করে?'

'ও:! গিন্নি হব কি তোমার রাঁধুনিগিরি করবার জন্যে! সিলি! তোমাকে চোখে-চোখে রাখতে হবে না?'

'ঠিক যেমন এখন রেখেছিস, বলে ইন্দ্রনাথ, 'এখনও কিন্তু বলিসনি—ঘরে ঢুকলি কী করে? নাইটল্যাচের চাবি নিশ্চয় কাছে রাখিস?'

ঠোঁট উলটে ভোমরা বললে, 'রাখতে হয় বইকি। নাইট বার্ডকে ফলো করার জন্যে অনেক কিছুই করতে হয়।'

'বেশ...বেশ...সেই জন্যেই রূপকুমারের বুকের লোম পর্যন্ত চেনা হয়ে গেছে।'

'অসভ্য!' ঠিকরে গিয়ে ফ্রিজ খুলল ভোমরা এক ঝটকায়, 'এই তো রয়েছে ব্রেড, এই তো রয়েছে মুরগির কারি—আর কী চাই? এসো, বোসো হে রূপকুমার।'

লোকনাথ বললে, 'আগে গেস্ট দুজনের উদর ঠান্ডা হোক—আমি আসছি টয়লেট ঘুরে। হোল নাইট—'

'লাম্পট্য করে এসেছ, এই তো? নিশাচর বাদুড় কোথাকার।' বলে ঘটাং-ঘটাং করে টেবিল সাজাতে শুরু করল ভোমরা।

ইন্দ্রনাথ নস্যির ডিবে খুলতে-খুলতে ঘরের জিনিসপত্র দেখতে লাগল। পুলিশম্যানের ন্যাড়া ঘর। দেওয়ালের তাকে খানকতক বই আর ম্যাগাজিন, একটা ইংরেজি বই হেগ-এর জীবন-কাহিনি। একটা কালো ট্রাঙ্ক—কাঠের টেবিলের ওপর। সিঙ্গল খাটের সাদা চাদর লাটঘাট হয়ে রয়েছে। ঘরের কোণে টানা দড়িতে ঝুলছে পুলিশি জামাপ্যান্ট। নিচে একটা টুল। টুলের তলায় একটা বড় মুখ কাচের জার, তার মধ্যে তরল পদার্থে চর্বির মতো কী যেন ভাসছে। হেঁট হয়ে জারটা টেনে নিয়ে গন্ধ শুঁকে ইন্দ্রনাথ বললে, 'অ্যাসিড।'

ভোমরা বলে উঠল, 'কলতলার জিনিস, কলতলায় রাখলেই হয়। এত অগোছালো ইন্দ্রদা, কী আর বলব, এ লোককে কে বিয়ে করবে?'

'কেউ নেই বুঝি?'

'আমি তো আছি। কিন্তু খালি ল্যাজে খেলছে। আপনিই বলুন, জোয়ান মানুষের জোয়ানী না থাকলে মানায়?'

খাটের ওপর বসতে-বসতে ইন্দ্রনাথ বললে, 'তোদের মধ্যে মিল আছে একটা জায়গায়।'

'কোন জায়গাটায়?' পাউরুটি কাটতে-কাটতে বললে ভোমরা।

'তোরা দুজনেই পাগল।'

'আমার চোদ্দোপুরুষ পাগল নয়।'

'কিন্তু তুই বদ্ধ পাগল। পয়লা নম্বর বিয়ে-পাগল, আর তোর ভাবীবর গান-পাগল।'

অমনি চোখে ঘোর এসে গেল ভোমরার, 'তা যা বলেছেন দাদা—এই কাঠখোট্টা বেটনবাবু—খোদ রবিশঙ্কর হয়ে যায় ক্লাসিক্যাল মিউজিক শুনলেই। আমারও অবশ্য তাই হয়।'

'সুতরাং পাগলে-পাগলে মিলবে ভালো।'

বাথরুমের দরজা খুলে বেরিয়ে এসে তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে-মুছতে লোকনাথ বললে, 'আপনার পাগলি বোনকে বলে দিন খাওয়া-দাওয়ার পর যেন কেটে পড়ে—টেনে ঘুম দিতে হবে।'

সটাৎ করে ফণা তুলে ফেলল কালনাগিনী, 'বয়ে গেছে তোমার সঙ্গে দুপুর কাটাতে।'

খাওয়ার টেবিলের চেয়ার টানতে-টানতে ইন্দ্রনাথ শুধু বলল—'নারদ! নারদ!'

গভীর রাত। শহরের পথগুলো এখন খাঁ-খাঁ করছে বললেই চলে। মাঝেমধ্যে একটা করে ট্যাক্সি উড়ে যাচ্ছে। তারপরেই আবার নিস্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে চারদিক।

নৈ:শব্দ্য ভাঙল একটা মোটর সাইকেলের আওয়াজে।

ধীর গতিতে রাস্তা কামড়ে ধরে গড়িয়ে যাচ্ছে চাকাদুটো। একচক্ষু দানবের চোখ জ্বলছে—অমাবস্যার রাতে আরও ধকধকে মনে হচ্ছে সেই চোখকে। মোড় ঘুরে দূর হতে দূরে মিলিয়ে গেল দ্বিচক্রযান।

প্রায় নি:শব্দে গড়িয়ে আসা মারুতিটাকেই দেখা গেল এরপরেই। হেডলাইট জ্বলছে না। টিমটিমে সাইডলাইট দুটো কোনওরকমে নিয়মরক্ষে করে চলেছে।

আচমকা ব্রেক কষেই বাঁয়ের গলিতে ঢুকে গেল ডিপ গ্রিন কালারের মারুতি।

মোটর সাইকেলের আওয়াজটা শোনা গেল তারপরেই। একটু আগেই যেদিকে অদৃশ্য হয়েছিল একচক্ষু ধীরগতি দ্বিচক্র দানব—এখন সেইদিক থেকেই উল্কাবেগে ধেয়ে আসছে এই মোটর সাইকেল। আওয়াজের গভীরতা একই। থ্রি পয়েন্ট ফাইভ হর্সপাওয়ারের এ মডেল একটা কোম্পানিই তৈরি করে ইন্ডিয়ায়।

মোড় ঘুরেই গতি কমে এল মোটর সাইকেলের। আস্তে ব্রেক কষল ল্যাম্পপোস্টের পাশে। চালক নেমে দাঁড়িয়ে স্ট্যান্ডে তুলে দিল ভারি যন্ত্রযান। পেছনের চাকার পাশের বাক্সে লাগাল চাবি।

ল্যাম্পপোস্টের অত্যাধুনিক আলোয় বড় লোলুপ, বড় তৃষিত মনে হচ্ছে লোকটার দুই চক্ষু। চোখের পাতা তার পড়ছে না। শিকারি শ্বাপদের মতোই অনিমেষে চেয়ে রয়েছে ফুটপাতে নিদ্রিত বাসিন্দাটির দিকে। বয়স তার অনেক, এক মুখ দাড়িগোঁফ—সবই সাদা। ময়লায় জট পাকানো চুলও সাদা। সুতো দিয়ে বাঁধা পুরু লেন্সের চশমাটা সযত্নে রেখেছে একরাশ বইয়ের পাশে। এই সেই পণ্ডিত পথের পাগল যার ছবি কিছুদিন আগে বেরিয়েছিল খবরের কাগজে। সারাদিন রোদে বই মেলে পড়ে হেঁট হয়ে—রাতে ল্যাম্পপোস্টের আলোয়—তারপর ঘুমোয় ভোরের আলো না ফোটা পর্যন্ত। অজাতশত্রু এই গ্রন্থকীটের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে যমালয়ের দূত...

বাক্স খুলে গেছে। ঘুমন্ত উন্মাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বাক্সের মধ্যে থেকে একটা পাথর টেনে বের করল নিশাচর পিশাচ। এখন জ্বলছে তার চোখ—দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা উদগ্র হয়ে উঠেছে শিরায় উপশিরায়।

পাথরটা লম্বায় দেড় ফুটের বেশি নয়, চওড়ায় এক ফুটের বেশি নয়, আড়াই ইঞ্চির বেশি পুরু নয়। বলিষ্ঠ দুই লোমশ হাতে পাথর ধরে মোটর সাইকেলকে পাক দিয়ে ঘুমন্ত বৃদ্ধের দিকে এগোল রাতের আতঙ্ক...

আচমকা দুটো বলিষ্ঠতর হাত ছোঁ মারল পেছন থেকে।

ছিনিয়ে নিল পাথর। একই সঙ্গে আগন্তুকের চামড়ার হোলস্টার থেকে ছিনতাই হয়ে গেল রিভলভার।

নল ঠেকল তারই পিঠে।

পাথর কঠিন কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল কানের কাছে, 'ঢের হয়েছে ভ্যামপায়ার—সিরিঞ্জটা এবার দাও।'

কবিতা বললে, 'আঁচ করলে কী করে?'

ইন্দ্রনাথ বললে, 'ক্যালকুলেশন করে।'

'ধুত্তোর তোমার ক্যালকুলেশন। ঝেড়ে কাশো, ঠাকুরপো।'

'আর্থার লা বার্ন-এর লেখা 'হেগ—দ্য মাইন্ড অফ-এ মার্ডারার' বইখানা তাকে যখন দেখলাম, কাচের জারে যখন অ্যাসিডে চর্বি ভাসতে দেখলাম—তখনি আমার সন্দেহের প্রমাণ পেয়ে গেলাম।'

'আরে গেল যা। সন্দেহটা তোমার মাথায় এল কী করে?'

'বউদি, এই জন্যেই বৈজ্ঞানিকরা বলেছেন, মেয়েদের মগজের ওজন পুরুষদের চেয়ে কম।... হ্যাঁ, হ্যাঁ, বডি ওয়েটের সঙ্গে রেসিও-টা ঠিকই আছে...কী বলছিলাম? সন্দেহ...হেগ একখানা উপন্যাস পড়ে আর জনাকয়েকের জীবনী জেনে ঠিক সেইরকমই হতে চেয়েছিল। হেগ-এর মতোই হাতের লেখা নকল করতে পোক্ত ছিল রাতের আতঙ্ক, হেগ-এর মতোই ছেলেবেলায় তার বাবা-মা সমবয়সিদের সঙ্গে তাকে মিশতে দেয়নি। হেগ-এর মতোই সে সঙ্গীতপাগল, সুদর্শন, রমণীপ্রিয় অথচ বিবাহে নারাজ। সুতরাং হেগ তাকে ইন্সপায়ার করেনি তো? বাড়িতে দেখলাম হেগ-এর চাঞ্চল্যকর জীবন-কাহিনি, দেখলাম কাচের জারে সালফিউরিক অ্যাসিডে ইঁদুর গলানোর চিহ্ন—হেগও এইভাবে প্র্যাকটিস করেছিল...ঠিক এইভাবে সালফিউরিক অ্যাসিডে ইঁদুর ফেলে দিয়ে দেখত গলে যায় কীভাবে...শুধু একটা ব্যাপারে মোডাস অপারেন্ডি-তে ইমপ্রুভমেন্ট দেখিয়েছিল রাতের আতঙ্ক...হেগ রক্ততৃষ্ণা মেটাত শিরা কেটে গেলাস ভরে রক্ত নিয়ে...আমাদের এই রক্তলোলুপের তৃষ্ণা মিটত সিরিঞ্জ ভর্তি রক্ত টেনে নিয়ে—কনুইয়ের কাছে শিরা থেকে—তারপর পাথর দিয়ে থেঁতো করে দিত ছুঁচ ফোটানোর চিহ্ন।'

নিরক্ত মুখে কবিতা বললে, 'কিন্তু ওকেই ঠিক সন্দেহ করলে কেন? কেন রাতের-পর-রাত মারুতি নিয়ে পেছনে লেগেছিলে?'

'কী বুদ্ধি! এখনও ধরতে পারলে না? সর্ষের মধ্যে ভূত থাকলে সেই সর্ষে পোড়ায় ভূত পালায় কি? রক্ষক যদি ভক্ষক হয়—আইন কি রক্ষে পায়? ভারি পাথর নিয়ে কোনও খুনি কি আজ সেন্ট্রাল, কাল নর্থ, পরশু সাউথে খুন করে বেড়াতে পারে? পাথরগুলো মাথায় বয়ে নিয়ে গেলেও তো টহলদার ট্রাফিক সার্জেন্টদের চোখে পড়বে? তবে কী করে বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মারণ প্রস্তর হাতিয়ার? রক্ষকদের বাহনে নয় তো? কিন্তু এক এরিয়ার ট্রাফিক সার্জেন্ট অন্য এরিয়ায় যায় কী করে? আজ মধ্য, কাল উত্তর, পরশু দক্ষিণ করে বেড়াচ্ছে কী করে? সারা শহরে টহল দিয়ে বেড়ানোর এমন অবাধ অধিকার থাকে কার? এমন একজন অফিসারের যার কাজের পরিধি সারা শহর জুড়ে। খোঁজ নিয়ে জেনে গেলাম, ঠিক যে-যে রাতে পাথর নেমে এসেছে পথের ঘুমন্ত মানুষের মাথায়—ঠিক সেই-সেই রাতে নাইট ডিউটি নিয়ে শহর তোলপাড় করেছে আমাদের এই রাতের আতঙ্ক...রক্তভৃষ্ণায় গলা টা-টা করলেই সে বুকপকেটে সিরিঞ্জটা আর মোটর সাইকেলের মেট্যাল বক্সে পাথর ভরে নিয়ে বেরিয়ে পড়ত মনের মতো শিকারের খোঁজে...প্রথমে দেখে যেত... তারপর ফিরে আসত...মনের মতো পাথরগুলো পেত কোথা থেকে? একটাই জায়গা থেকে...ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাশের পাশে নতুন বাড়িঘরদোরের জন্য এনে রাখা পাথরের গাদা থেকে...ভোমরা কি জানে? নিশ্চয় জানে...বিষে বিষক্ষয় হয়েছে...ভাবী বরের বিকট পাগলামির খবর পেয়ে ওর উৎকট বিয়ের পাগলামি সেরে গেছে...এখন চলি, বউদি...ফির মিলেঙ্গে।*

** কাহিনি-কল্পনার মূলে আছে যে অব্যাখ্যাত রহস্য, সবাই তা জানেন। তথ্য বর্ণনা এবং চরিত্র-চিত্রায়ণ একেবারেই মনগড়া নিছক গল্পের খাতিরে। কোনও ব্যক্তি বা দপ্তরের প্রতি তির্যক শর নিক্ষেপের তিলমাত্র অভিলাষ নেই। উদ্দেশ্য একটাই–পাঠকের চিত্ত বিনোদন।*

** 'কোলফিল্ড টাইমস' পত্রিকায় প্রকাশিত (শারদীয় সংখ্যা, ১৩৯৭)*

পাঁচ তারার প্যাঁচ

মাধুরী

কবিতা বললে, 'ঠাকুরপো কী ভাবছ?'

দোরগোড়া থেকেই দেখছিলাম, শিবনেত্র হয়ে রয়েছে ইন্দ্রনাথ রুদ্র। কড়িকাঠের দিকে চেয়ে রয়েছে। চাহনি কড়িকাঠ ভেদ করে ঊর্ধ্বলোকে প্রস্থান করেছে।

অর্থাৎ ও ভাবছে। বড় সোফায় আড় হয়ে শুয়ে, কনুইয়ের ওপর চিবুক ন্যস্ত করে, চিন্তালোকে অবস্থান করছে।

ভাবমগ্ন ইন্দ্রনাথকে আমি কখনও ঘাঁটাই না। কবিতা কিন্তু অন্য ধাতু দিয়ে গড়া। ঠিক এই মুহূর্তগুলোর মওকা পেলে ও কখনও ছাড়ে না। খোঁচা মারবেই। দেওর-বউদির এহেন সম্পর্ক ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে বঙ্গ যুবসমাজে। রাজনীতির উত্তাপে বোধহয় সব শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে।

ঊর্ধ্বলোক থেকে নেত্রযুগলের দৃষ্টিকে মর্ত্যে টেনে নিয়ে এল ইন্দ্রনাথ। ধড়মড় করে উঠে বসল। আকর্ণ হেসে বললে, 'কি সৌভাগ্য! একেবারে হরগৌরী যে।'

আমরা যেখানেই যাই, দুজনে মিলেই যাই। আমি বউকে ছেড়ে থাকতে পারি না, আবার বউও আমায় ছেড়ে থাকতে পারে না। এটা এখন বিশ্ববিদিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্ত্রৈণ বদনামও জুটেছে। জুটুক।

ইন্দ্রনাথের এই সুভাষ সরোবরের গাছপালায় ঘেবা নিবিড় নিকুঞ্জে ফি হপ্তায় দুজনে আসি। ব্যাচেলর বন্ধুকে সঙ্গে নিই, জানলা খুলে লেকের জল দেখি, মোলায়েম হাওয়া ভক্ষণ করি, কবিতা সেই ফাঁকে ব্যাচেলরের ঘরদোর গুছিয়ে দেয়, রান্নাঘরের অবস্থা দেখে নেয়, ভালোমন্দ রেঁধেও দেয়। কোথায় বালিগঞ্জ, আর কোথায় বেলেঘাটা—ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাস হয়ে যাওয়ার পর যাতায়াতের অসুবিধেটা ঘুচেছে।

প্রতি সপ্তাহে চৌকাঠ পেরোনোর পরেই ইন্দ্র ঘুরিয়ে ফিরিয়ে টিটকিরিটা ছুঁড়ে মারে আমাদের লক্ষ্য করে। কিন্তু তখন যে হাসিটা ওর চোখমুখকে ভাসিয়ে দেয়, তা আনন্দের হাসি, ওর হীরে-চোখ ঝিকমিক করে ওঠে, গলার আওয়াজে খুশি উপচে পড়ে। ওর নি:সঙ্গ ঊষর জীবনে আমরা দুজনে যে দু-ফোঁটা বৃষ্টির জল।

সেই রবিবারের সকালেও আমি ওর টিটকিরি শুনলাম—এ কান দিয়ে ঢোকালাম, ও কান দিয়ে বের করে দিলাম।

কবিতা কিন্তু পায়ে-পায়ে ওর সামনে এসে দাঁড়াল। চোখে চোখ রেখে বললে, 'বুঝেছি, পরীর ধ্যান করা হচ্ছে।'

কপট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ইন্দ্রনাথ বললে, 'নিখাদ উক্তি। হ্যাঁ, আমি একটা পরীর কথা ভাবছি।'

'মানুষ পরী?' ওর পাশে বসে বললে কবিতা।

'হ্যাঁ। দুটো ডানা কেবল নেই। কিন্তু কী রূপ, কী রূপ বউদি, দেখলে তোমার হিংসে হত।'

রূপসী কবিতা তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। বললে 'সে কোথায় থাকে?'

'ব্যারাকপুরে।'

'কী করে?'

'টিউশানি।'

'কত বয়স?'

'চব্বিশ।'

'সে কেন তোমার কাছে আছে?'

'তার একটা প্রবলেম নিয়ে।'

'কী প্রবলেম?'

'বিয়ের।'

'কাকে বিয়ে করতে চায়?'

'ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে।'

'ম্যানেজারের মতলবটা কী?'

'সেইটাই ধোঁয়াটে।'

'মেয়েটিকে সে ভালোবাসে?'

'প্রাণ দিয়ে।'

'তবে আর প্রবলেমটা কোথায়?'

'সে আরও একটা মেয়ের সঙ্গে ঘোরাফেরা করছে।'

'সেকী! ঝাঁটা মারো, ঝাঁটা মার অমন ম্যানেজারকে। এনে দাও আমার সামনে—খেংড়ে বিষ ঝেড়ে দিচ্ছি।'

'ঝাঁটা চালানোর অস্ত্রবিদ্যা লুপ্ত হতে চলেছে বঙ্গদেশ থেকে। তোমার যদি এখনও জানা থাকে, তাহলে মেয়ে পুলিশদের শিখিয়ে দিও বউদি। কিন্তু এটা ঝাঁটার কেস নয়।'

'তবে?'

ঘড়ি দেখল ইন্দ্রনাথ। সমকোণে কাঁটা দুটো দাঁড়িয়ে আছে নয় আর বারোর ঘরে।

বললে, 'এ কাহিনি রূপসি নায়িকাকে আসতে বলেছিলাম ঠিক ন'টায়। টাটকা রিপোর্ট নেওয়ার জন্যে। তোমাদের দেখানোর জন্যে। ত্রিভুজ প্রেমের গোলমালে মাথা গলাতে আমার ইচ্ছে নেই। তুমি গোয়েন্দা লেখকের বউ। অতএব, নিজেও গোয়েন্দানি। তাই তোমরা যখন আসবে, তাকে আসতে বলেছি। ইচ্ছে হলে, কেসটা তুমি টেক-আপ করতে পারো। আমি টায়ার্ড। কোনও পুরুষ যদি দুটো গার্ল ফ্রেন্ডকে খেলিয়ে যায়, তাতে আমার কী? বাজার যাচাই করে নেওয়ার অধিকার সবার আছে।'

'ছি:। নারী জাগরণের যুগে তুমি মেয়েদের পণ্যদ্রব্য মনে করতে পারলে? মেয়েরা কি আলু-পটল মাছ-মাংস? যাচাই যে করতে চায়, খেংড়ে তার—'

'বউদি সে এসেছে।'

লোহার গেট খোলার আওয়াজ শুনলাম। চটির চটাস-চটাস শব্দ হল। একটা সময় ছিল যখন, দূরায়ত নূপুরনিক্কণ শুনে চিত্ত চঞ্চল হত। মেয়েরাও জানত, সলাজ চরণধ্বনি শুনিয়ে বুক দুলিয়ে দেওয়ার কৌশল। জানত, অপাঙ্গ চাহনির ম্যাজিক। আজকালকার মেয়েরা বড্ড পুরুষালি হয়ে গেছে। ফুল আছে, ফুলের সুবাস নেই। এটা ওয়েস্টার্ন কালচারের প্রভাব। হিন্দি ফিল্মের ধাক্কা।

উঠোন পেরিয়ে, সিঁড়ির ওপর দিয়ে, চটাস-চটাস শব্দ এসে পৌঁছল দরজার সামনে। বুঝি এক টুকরো জ্যোৎস্নার আবির্ভাব ঘটল সেই মিষ্টি সকালে।

বাংলার মেয়েদের সম্বন্ধে একটু আগে আমি যা ভাবছিলাম, তার সংশোধন দরকার হয়ে পড়ল মেয়েটিকে দেখে। টাকাপয়সার চিন্তা নিয়ে যেদিন থেকে মেয়েরা পথে বেরিয়েছে —সেদিন থেকেই পুরুষের সঙ্গে তাদের টক্কর লেগেছে। ফলে, নমনীয়তা কমনীয়তা লাবণ্য লজ্জা ইত্যাদি ভালো-ভালো বিশেষণগুলো যেন মেয়েদের চেহারা থেকে উবে যাচ্ছে। রুক্ষ বাস্তব উবিয়ে দিচ্ছে Essential Essence গুলো।

কিন্তু এই মেয়েটি তার ব্যতিক্রম।

এর সারা শরীরের স্নিগ্ধতা যেন আরকের মতোই তাজা রয়েছে। পূর্ণিমার রাতে চাঁদের দিকে তাকালে মন যেমন জুড়িয়ে যায়, এর নরম চোখ দুটোর দিকে তাকালেও সেই রকম একটা আবেশ শরীরে মনে জড়িয়ে

যায়। রং ফরসা হলেই সব মেয়ে সুন্দরী হয় না, কিন্তু এ মেয়েটি ফরসা বটে, সুন্দরীও বটে। অথচ প্রসাধনের বাহুল্য নেই। এমনকি কানে দুল পর্যন্ত নেই। কব্জিতে শুধু একটা সরু ঘড়ি। পরনে হালকা গোলাপি রঙের তাঁতের শাড়ি। ব্লাউজও সেই রঙের। কিন্তু কাটছাঁটের মধ্যে দরজির আধুনিকতা দেখা দেয়নি। পায়ে রবারের হাওয়াই স্লিপার—তাই এত চটাস-চটাস আওয়াজ হচ্ছিল।

সে নিশ্চয় আশা করেছিল, ঘরের মধ্যে শুধু ইন্দ্রনাথ থাকবে। তাই আরও দুটি প্রাণী তার দিকে ড্যাব-ড্যাব করে তাকিয়ে রয়েছে দেখে একটু থতমত খেয়ে গেল।

আকৃতিতে কিছুটা পল্লীবালার মতো হলেও আচরণে সে তা নয়। মুহূর্তেই দ্বিধা খসিয়ে ফেলে দুহাত তুলে নমস্কার করল আমাদের তিনজনকেই।

বললে নরম গলায়, 'আসব?'

ইন্দ্রনাথ বললে, 'আসবেন না তো কি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবেন? আপনার কথাই হচ্ছিল এতক্ষণ। বসুন ওইখানে। বউদি, এঁর কথাই তোমাকে বলছিলাম। মাধুরী ঘোষদস্তিদার। আর এই যে দুটি মূর্তিকে দেখছেন মিস ঘোষদস্তিদার, এঁদের একজন আমার সাহিত্যিক বন্ধু মৃগাঙ্ক রায়—আর একজন তাঁর সারাজীবনের অপধর্মের সঙ্গিনী—ম্যাডাম কবিতা রায়।'

কবিতা বললে, 'আহা কথার কী ছিরি। বসো ভাই, তোমার নামটা এক্ষুনি শুনলাম। বেশ নাম। এ নাম তোমাকে মানায়। তোমার প্রাইভেট লাইফের প্রবলেম একটু জেনে ফেলেছি বলে লজ্জায় পড়ে যেও না। আমাদের এই তিনজনের মধ্যে কোনও কথাই চাপা থাকে না। প্রত্যেকে প্রত্যেককে কনসাল্ট করি, অ্যাডভাইসও দিই। তোমার ভাবী বর নাকি আর একটা মেয়ের সঙ্গে লটঘট করে বেড়াচ্ছে?'

একটু রাঙা হল মাধুরীর ফরসা গাল। দেখে বেশ লাগল। আজকালকার মেয়েরা লজ্জায় রাঙা হতে ভুলে গেছে। রাঙা হওয়াটা মেয়েদের একটা প্লাস পয়েন্ট। মাধুরী তা জানে।

চোখ নামিয়ে নিয়ে সেকেন্ড কয়েক পরে সে বললে, 'হ্যাঁ।'

'ঠাকুরপোর সামনে যা বলতে পারোনি, তা আমার সামনে বলো। দরকার হলে চলো পাশের ঘরে যাই—'

'তা দরকার হবে না,' মাধুরী এবার চোখ তুলেছে।

এতটুকু নার্ভাস নয় সে। দু-হাত রেখেছে দু-হাঁটুর ওপর। আঙুলে আঁচল পাকাচ্ছে না। বরং মেরুদণ্ড সোজা। সরল চোখ সোজা তাকিয়ে রয়েছে কবিতার দিকে, 'কোনও অন্যায় তো করিনি যে আড়ালে কথা বলব।'

এত সোজা কথা এত সরলভাবে যে বলতে পারে, তার মনে পাপ থাকতে পারে না।

কবিতা হেসে ফেলল, 'এত রূপ নিয়ে মনের মানুষকে একা দখলে রাখতে পারছ না? সে কি তোমার চেয়েও রূপসী?'

একটু বুঝি অন্যমনস্ক হল মাধুরী—'সে অনেক স্মার্ট। তা হোক। কাজের জায়গায় ছেলেদের মিশতেই হয় মেয়েদের সঙ্গে। তা নিয়ে আমি ভাবি না।'

'তবে ভাবছ কী নিয়ে?'

অন্যমনস্ক ভাবটা সরে গেল চোখ থেকে। স্পষ্ট উচ্চারণে থেমে-থেমে মাধুরী বললে, 'রঞ্জন বেনামে হোটেলে ঘর নিয়েছে কেন? কেন অফিস থেকে বেরিয়ে সেই হোটেলে গিয়ে ওঠে? কেন সেখানে গেলে আর তাকে দেখা যায় না?'

রঞ্জনের পুরো নাম কুমুদরঞ্জন ঘোষ। মাধুরী ওকে শুধু বলে, রঞ্জন। বলে, তুমি শুধু রং লাগিয়েই গেলে আমার মনে—তোমার মনেও কোনও রং নেই, শরীরে তো নেই-ই।

মানুষটাকে মাধুরী খুব ছোটবেলা থেকে দেখছে বলেই এত স্পষ্টাস্পষ্টি কথা বলতে পারে। প্রেমের প্রথম পর্যায়ে যে মেয়ে ভালোবাসার মানুষটাকে বলে বসে, ওগো তোমার শরীরে কোনও রং নেই—তার মতো মূর্খ মেয়ে ভূভারতেও আর নেই।

কিন্তু মাধুরী-রঞ্জনের প্রেম তো আজকের নয়। শরীরের রং যখন দুজনের কারোরই ছিল না—তখন থেকেই রং ধরেছে মনে। বড় পাকা রং, মলেও এ রং উঠবে না।

তাই রঞ্জনের শরীর নিয়ে অত ঠাট্টা করে মাধুরী।

ঠাট্টা করার মতো শরীরও বটে রঞ্জনের। শুধু তালপাতার সেপাই বললে কম বলা হয়। মুখের গড়ন লম্বাটে, চুলের কোনও বাহার নেই। নেই জামাকাপড়ের ছিরিছাঁদ। একটা ঢলঢলে সাদা বুশশার্ট, আর ততোধিক ঢলঢলে সাদা ফুলপ্যান্ট।

ওস্তাগর তার শ্রীহস্তের পরশ বোলালে তালপাতার সেপাইয়ের অঙ্গেও কিঞ্চিৎ সুষমা এনে দিতে পারত, কিন্তু রঞ্জন দরজির সঙ্গে আড়ি করেছে অনেকদিন। কেনাজামা আর প্যান্ট দেদার পাওয়া যায় এবং অনেক সস্তাতেও হয়—অতএব কেন বেশি খরচ করতে যাবে?

মাধুরী ওকে অনেক বলেছে, দ্যাখো, এটা দ্যাখন-এর যুগ। আগে বাইরেটা দেখাও, তবে তো লোক তোমার ভেতরটা দেখতে কাছে আসবে।

রঞ্জন ওর বিখ্যাত দাঁত বের করে হেসে-হেসে বলে, 'আরে রাখো তোমার মেয়েলি লজিক। আমি কি মেয়েছেলে যে নিজেকে সাইনবোর্ড করে রাখব? সোনার আংটি যদি বেঁকাও হয়—কাঞ্চন-শিল্পী তার কদর করে। যে করে না, সে সোনা চেনে না—তার কাছে আমি যেতেও চাই না।'

চিরকালই এমনই ফটর-ফটর বুকনি ছেড়ে এসেছে রঞ্জন। মুখে কোনও কথা আটকায় না। লম্বাটে করোটি দেখে ছেলেবেলায় বাড়ির মেয়েরা হাসাহাসি করত—কিন্তু চুপ মেরে যেত করোটির গ্রে সেল-দের কেরদানি দেখলে। একরত্তি ছেলের জিভ তো নয়—যেন শানানো ক্ষুর! ব্রেন তো নয়—যেন টগবগে লাভা। একটুও না রেগে এমন আঁতে ঘা মেরে কথা বলে যেত রঞ্জন—পাড়াপড়শি থ হয়ে যেত। গালে হাত দিয়ে বলত—এ ছেলে কিছু একটা হবে। বাব্বা, এত কথা শিখল কোত্থেকে?

কথায় রঞ্জনের সঙ্গে কেউ পেরে ওঠেনি—আজ পারে না। শুধু কথার ধোকড় নয়—বুদ্ধিতেও চৌকস। বীরভূমের ছেলেদের ধমনীতে বীর রস থাকবে—এটা স্বাভাবিক। শৌর্য বীর্য তাই কথাতেও ফুটে বেরোয়—দুনিয়ার কারও সে ধার ধারে না—জিভ ছোটালেই সেটা হাড়ে-হাড়ে টের পাওয়া যায়।

তার আগে নয়। তখন সে শান্তশিষ্ট, অমায়িক হাস্যবিশিষ্ট এক অতি সজ্জন পুরুষ।

কাঠি দিলেই কিন্তু সে অন্য পুরুষ। তখনও সে হাসে। হাসিতে তখন থাকে মিছরির ছুরি। বচনে থাকে লাভার ফুলকি।

শান্তিনিকেতনের হস্টেল লাইফে এই বচনের ক্ষুর চালিয়ে তছনছ করে ছেড়েছিল রঞ্জন। খোদ প্রধানমন্ত্রীও এক ঘরে এক মাদুরে সামনাসামনি থই পাননি। ভাঙা-ভাঙা বাংলায় ধমকেছেন। শেষে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেছেন। প্রধানমন্ত্রীত্ব যাঁকে করতে হয়, তাঁকে সবসময়ে তো সোজা পথে চলানো যায় না—

রঞ্জন কিন্তু সটান পথের পথিক। ওই তোমার লক্ষ্য—মারো গুলি—উড়িয়ে দাও চাঁদমারি।

কড়া বিবেকের শাসন তাই রঞ্জনকে বিপথে যেতে দেয়নি। কোনও লোভের ফাঁদে পা দিতে দেয়নি। বিবেক ছাড়া কাউকে গুরু বলে মানেনি—মানবেও না।

শান্তিনিকেতনের ছেলে, বীরভূমের ছেলে রঞ্জন যখন বড় হল, পর-পর অনেক পরীক্ষার বেড়া টপাটপ টপকে এসে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হয়ে বসল—তখনও পালটাল না ওর স্বভাব আর চরিত্র, নীতিবোধ আর বিবেক।

মাধুরীও আর ছোট খুকিটি নেই। শুধু শরীরে নয়, রং ধরেছে তার গোটা মনেও। সিউড়ির বড় পরিবারের মেয়ে সে। বোলপুরের পথেঘাটে দেখা হতে-হতে কখন যে এই লিকলিকে শ্রীহীন কালো রঙের মানুষটাকে মন দিয়ে ফেলেছিল, তা সে নিজেই জানে না। শরীর যখন পল্লবিত হল, যখন জ্যোৎস্নারাতে মন হু-হু করে উঠতে লাগল, যখন তালপাতার সেপাইকে দুদিন না দেখলেই মনের ভেতর অদ্ভুত এক মোচড়ানির আবির্ভাব ঘটতে লাগল, তখন...শুধু তখন সে বুঝল, এরই নাম প্রেম।

রঞ্জনও তা বুঝেছিল। কিন্তু এতই রসকষহীন যে দুটো প্রেমের কথাও গুছিয়ে বলতে পারত না। প্রেমের চিঠিও লিখতে পারত না। বিয়ের কথা উঠলেই খালি বলত, দাঁড়াও, একটু গুছিয়ে নিই।

'আর কী গুছোবে? পাকা চাকরি, নামী ব্যাঙ্ক, মোটা মাইনে। এবার মালাটা বদল করে নাও না গো। আর কত দিন মাস্টারি করব? আমারও কি ইচ্ছে যায় না সংসার করার?'

এইরকম ভাবেই সোজা কথা সোজাভাবে বলে এসেছে মাধুরী। এত দুদিনের মন দেওয়া-নেওয়া নয় যে হিসেব করে আলতো হাতে গিঁট দিতে হবে?

একবগ্গা রঞ্জনকে কিন্তু কিছুতেই রাজি করাতে পারেননি। বিখ্যাত দাঁত বের করে হেসে-হেসে বলত, 'কি বিয়ে পাগলি মেয়ে রে বাবা! দুটো দিনও তর সইছে না! দাঁড়াও, কিছু একটা করি।'

রেগে যেত মাধুরী, 'তদ্দিনে আমার স্বর্গের সিঁড়ি তৈরি হয়ে যাবে।'

'ভালোই তো, দুজনে হাত ধরাধরি করে, সেই সিঁড়ি বেয়ে স্বর্গে গিয়ে সেখানেই মালাটা বদল করে নেব। বিয়ের মন্ত্র কে পড়বে জানো? নারদ!'

এইভাবেই চলছিল দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। দুজনে থাকে কলকাতার দুদিকের মফস্বলে। রঞ্জনের ডেরা বর্ধমানে—মাধুরীর ব্যারাকপুরে। রঞ্জনকে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করতে হয় বলে শনি আর রোববার ছাড়া মাধুরীর সঙ্গে দেখা করতে পারে না। শনিবার মাধুরী চলে আসে কলকাতায় —অফিস থেকে রঞ্জন বেরিয়ে ওকে নিয়ে চলে যায় গঙ্গার ঘাটে। রবিবারে রঞ্জন চলে যায় ব্যারাকপুরে। মাধুরীকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে চলে যায় গান্ধীঘাটে।

গঙ্গা ওদের দুজনেরই প্রিয়। গঙ্গার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে দুজনেরই খুব ভালো লাগে।

কিন্তু মাস কয়েক ধরে যেন একটু বেশি চুপ মেরে থাকে রঞ্জন।

বেশি খোঁচালে শুধু বলে, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও, শিগগিরই একটা নতুন নাম নিতে যাচ্ছি।'

'কী নাম গো?'

'এক্স রে?'

'হ্যাঁ।'

'এ নাম কেন?'

'আমি হব অদৃশ্য রশ্মি। অদৃশ্য আলো হয়ে ঢুকে যাব একদম ভেতরে—যেখানে রয়েছে কংকালের বীভৎস হাড়গোড়।'

'কী বলছ?'

'বাইরের চাকচিক্য দেখে এ মিঞা কোনওদিন ভোলেনি—ভুলবে না—রক্তমাংসের রূপের আড়ালে রয়েছে হাড়ের কাঠামো—আসল স্ট্রাকচার। অদৃশ্য রশ্মি দেখতে চায় কোথায় চিড় ধরেছে সেই কাঠামোটায়।'

এসব হেঁয়ালির ব্যাখ্যা আর হাজির করেনি রঞ্জন। স্পষ্ট করে কিছু বলেনি। মাধুরী আর-পাঁচটা মেয়ের মতো নাছোড়বান্দার মতো লেগেও থাকেনি। রঞ্জন কিছু বলতে চাইছে না—বেশ তো সময় হলেই বলবে। না বলে যাবে কোথায়? মন খুলে কথা বলার মানুষ একজনই—মাধুরী?

কিন্তু এহেন অটল প্রত্যয়ে চিড় ধরল অকস্মাৎ। সেইদিন থেকে ভয়ে কাঁটা হয়ে রয়েছে মাধুরী। ঘটনাটা ঘটল এইভাবে।

স্কুলের একটা কাজে বি-বি-ডি বাগ গেছিল মাধুরী। আগে থেকে বলা থাকলে প্রাণের মানুষটাকে বলে রাখা যেত। কাজ শেষ করে একটা আড্ডা টাড্ডা দেওয়া যেত। কিপটের পকেট বেশি ফাঁসানো যেত না—কিন্তু চা আর কচুরি তো খাওয়া যেত।

কাজ শেষ হতেই পাঁচটা বেজে গেল। ব্যাঙ্কে গিয়ে আর লাভ নেই। রঞ্জন এতক্ষণে হাওড়ায় গিয়ে ট্রেনে চেপেছে। শিয়ালদার ট্রামে মানুষ ঝুলে-ঝুলে যাচ্ছে। বাকি মানুষ পিলপিল করে হাঁটছে বৌবাজারের স্ট্রিট

ধরে। তাদের সঙ্গেই মিশে গেল মাধুরী। ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সামনে দিয়ে যখন কোলের বাজারের দিকে যাচ্ছে, তখন দেখল রঞ্জন হনহন করে ঢুকে গেল একটা তিনতলা বাড়িতে।

সে বাড়ির দোতলায় ঝুলছে পেল্লাই একটা সাইনবোর্ড। তাতে লেখা : বিনয় লজ।

হাঁ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল মাধুরী। তারপর ভাবল, নিশ্চয় অফিসের কাজে ঢুকেছে ভেতরে। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার তো। অনেকে ক্যাশ ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট খোলে, হাইপোথিকেট করে। রঞ্জনকে এনকোয়ারি করতে যেতে হয় মাঝে-মাঝে। এসব গল্প গঙ্গার পাড়ে শুনেছে।

এখনও নিশ্চয় সেই কাজ নিয়ে এসেছে। ঢুকুক, মাধুরীরও ঢুকতে ক্ষতি নেই। ব্যারাকপুরের ট্রেন অনেক, পরের ট্রেনটা ধরলেই হবে। একটু দেখা করে গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।

বিনয় লজ-এর সিঁড়িতে পা দিয়েছিল মাধুরী। তিন ধাপ ওপরেই একটা ঘর। সেখানে পালিশওঠা কাঠের কাউন্টারে বসে একজন বুড়ো বিড়ি টানছিল। পাঞ্জাবির যা চেহারা, ম্যানেজার বলেও তো মনে হয় না।

বুড়ো হোক আর ছোঁড়া হোক—সুন্দরী দেখলেই একটু বেশি খাতির করে। মাধুরীকে দেখেই বিড়ি নামিয়ে বুড়ো চেয়ে রইল।

মাধুরী বললে, 'এইমাত্র যিনি এলেন ওঁর সঙ্গে একটু দেখা করে যাব!'

'কাঞ্চনবাবু? যান, ওপরে চলে যান, দোতলায় বাঁদিকের বারান্দার শেষের ঘর—তিন নম্বর...তিন নম্বর!'

যেন ভূতের রাজা বর দিচ্ছে, এমনিভাবে তিন নম্বর—তিন নম্বর শব্দদুটো আউড়ে গেছিল বুড়ো। হাসি চেপে সামনের চটাওঠা কানাভাঙা সিমেন্টের সিঁড়ি বেয়ে দোতলার তিন নম্বর ঘরের সামনে গিয়ে মাধুরী দেখেছিল, দরজায় তালা ঝুলছে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আকাশপাতাল ভেবেছিল মাধুরী। রঞ্জন তাহলে এখানে কাজে আসেনি, তিন নম্বর ঘরে এসেছে। কেন? কেন সে কাঞ্চন নামে পরিচিত?

নিচে নেমে এসে বুড়োকে জিগ্যেস করেছিল, 'কই, দেখলাম না তো। দরজায় তালা ঝুলছে।'

'তাহলে বেরিয়েছে। আশ্চর্য লোক, মা। ঠিক এই সময়ে রোজ আসে, পেছনের সিঁড়ি বেয়ে বেরিয়ে যায়। কিছু বলতে হবে?'

'না, না, আমি ব্যাঙ্কে দেখা করে নেব। হঠাৎ দেখলাম, তাই ভাবলাম একটু মুখটা দেখিয়ে যাই।'

'তাই করো। আমার সঙ্গে দেখাও হয় না। এখানে তো বসি না।'

নেমে এসেছিল মাধুরী। রঞ্জনের অদ্ভুত রুটিন শুনে অবাক হয়েছিল। ও যে বর্ধমানে রাতে থাকে না—কলকাতায় হোটেলে ওঠে, তাতো বলেনি। নাম ভাঁড়িয়েছে, তাও বলেনি। রাত কাটায় কোথায়, তাও তো বলেনি।

পরের দিন ঠিক ওই সময়ে বিনয় লজ-এর উলটোদিকের ফুটপাতে হিন্দু মহাসভার বারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে রইল মাধুরী।

বি.বি.ডি. বাগ এর দিক থেকে এল তালপাতার সেপাই। রঞ্জন চিরকাল মাথা হেঁট করে হাঁটে—যেন একটা গণ্ডার। এদিক-ওদিক তাকায় না। সেদিনও গণ্ডার-হাঁটা হেঁটে বিনয় লজে ঢুকে গেল...

এবং বেরিয়ে এল পেছনের ঘোরানো লোহার সিঁড়ি বেয়ে।

পেছনের সিঁড়িটা আগেই দেখে নিয়েছিল মাধুরী। তিনতলার ছাদ থেকে ঘুরে-ঘুরে, সব তলার বারান্দার প্রান্ত ছুঁয়ে নেমে এসেছে একতলায়। সেখানে রিক্সওলাদের মালিকের আড্ডা। টিনের শেড। এখান দিয়েই বেরিয়ে এল রঞ্জন।

কিন্তু এত ফিটফাট হয়ে এল কেন? এ যে একেবারে সাহেব। টাই কোট বুট ঝকঝক করছে। কেনা সুট নয়—বানানো। দারুণ মানিয়েছে। ছিপছিপে মানুষটাকে এখন খোলা কৃপাণ বলেই মনে হচ্ছে।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরল রঞ্জন।

চোখ কপালে উঠে গেছিল সেদিন। কিপটের রাজা রঞ্জন ট্যাক্সি চড়ছে অম্লান বদনে। চা খাওয়াতে গিয়ে যে কিনা বুকপকেট থেকে পাঁচ টাকার নোট বেরিয়ে গেলে মুখ বেঁকিয়ে ফের ঢুকিয়ে রাখে। বলে, 'আমার পাঁচখানা পাঁজর।'

হতভম্ব মাধুরীর সামনে দিয়ে হু-উ-স করে ট্যাক্সি বেরিয়ে যেতেই সম্বিৎ ফিরে পেয়েছিল সে। কপাল ভালো ফুটপাতের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল আর একটা ট্যাক্সি, উঠে বসেছিল পেছনে।

মিটার ডাউন করে ট্যাক্সি ড্রাইভার জিগ্যেস করেছিল, 'কোথায় যাবেন?'

উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে দূরের ট্যাক্সি দেখিয়ে মাধুরী বলেছিল, 'ওই ট্যাক্সি যেখানে যায়।'

আড়চোখে মাধুরীর দিকে একবার শুধু তাকিয়েছিল ড্রাইভার। তারপর আর কথা বলেনি। আজকাল মেয়েরাও গোয়েন্দা হচ্ছে—ড্রাইভার তা জানে।

চৌরঙ্গীর ওপর ট্যাক্সি ছেড়ে দিল রঞ্জন। ছেড়ে দিল মাধুরীও।

পাঁচতলা হোটেলের গাড়িবারান্দার তলায় দাঁড়িয়েছিল সুবেশা একটি মেয়ে। সুবেশা ছাড়া তাকে সুন্দরী আখ্যা দেওয়া যায় না। মেজেঘষে শরীরটাকে চলনসই করে রেখেছে, মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে তো বটেই। চেহারায় তার ছাপ রয়েছে।

রঞ্জন তাকে নিয়ে ঢুকে গেল পাঁচতারা হোটেলে।

ঘণ্টাখানেক এদিক-ওদিক করেছিল মাধুরী। কিন্তু জায়গাটা খারাপ। সুন্দরী মেয়ে একলা ঘুরঘুর করছে দেখে চারপাশ থেকে ঘিরে-ধরা, উঁকিঝুঁকি মারা, এমনকি 'চলুন না ঘুরে আসি' আপ্যায়নও শোনা হয়ে গেল।

মাধুরী আর দাঁড়ায়নি। দাঁড়াতে পারেনি। মাথা ঘুরছিল। চোখের জল চাপতে গিয়ে চোখে ঝাপসা দেখছিল। কোনওমতে ধর্মতলার মুখে এসে ট্রামে চেপে চলে এসেছিল শিয়ালদা।

পরের শনিবার যায়নি ব্যাঙ্কে। রবিবার কিন্তু রঞ্জন যথারীতি ব্যারাকপুরে এসে ওকে নিয়ে গেছিল গান্ধীঘাটে। শুধু জিগ্যেস করেছিল, 'শনিবার এলে না কেন?' তার বেশি কিছু না। মাধুরী যে অপকর্ম দেখেছে —তা নিশ্চয় জানতে পারেনি রঞ্জন। কিছু জিগ্যেসও করেনি।

তবে...আগের চাইতেও বেশি অন্যমনস্ক মনে হয়েছে তাকে।

মাধুরীর কথা যখন শেষ হল, তখন জলের ধারা নেমেছে ওর দু'গাল বেয়ে।

কবিতা শুধু চাইল ইন্দ্রনাথের দিকে।

ইন্দ্রনাথ বললে, 'ঠিক আছে, আমি দেখছি।'

মাঝের নাটক

পরের রবিবার নাটক দেখিয়ে দিল ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

সকালে আমি আর কবিতা যখন পৌঁছলাম, মাধুরী তার আগেই এসে গেছে। ইন্দ্রনাথ পাশের ঘরে যোগব্যায়াম করছিল। কবিতা ওকে হিড়হিড় করে টানতে লাগল।

'অসভ্যতার একটা সীমা আছে ঠাকুরপো। মেয়েটা এসে একলা বসে রয়েছে, আর তুমি শূন্যে ঠ্যাং তুলে ঘোড়ার ডিমের আসন করছ?'

'এটা ঘোড়ার ডিমের আসন হল?' গায়ে গেঞ্জি চড়াতে-চড়াতে প্রতিবাদ করেছিল ইন্দ্রনাথ, 'জানো এই আসন জহরলাল নেহরু করতেন। তাই অত শার্প ছিল ব্রেন।'

'মেয়েটাকে একলা বসিয়ে রেখে?'

'একলাই তো থাকবে এখন। তোমার মতো বেরসিক আমি নই।'

'তার মানে?'

'ওরা আসছে', ঘড়ি দেখল ইন্দ্রনাথ, 'সময় হয়েছে নিকট, এখন বাঁধন পরাতে হবে।'

*

ছিলেছেঁড়া ধনুকের মতো ঝট করে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল মাধুরী। মুখ থেকে নেমে গেছে সমস্ত রক্ত। একে তো হাতির দাঁতের মতো ফরসা গায়ের রং—আচমকা নিরক্ত হয়ে যাওয়ায় এখন তা কাগজের মতো সাদা।

খোলা দরজা দিয়ে ঢুকছে এক তালপাতার সেপাই।

ঢলঢলে শার্ট, প্যান্ট আর কালো গাত্রবর্ণ দেখলেই বোঝা হয়ে গেল, সে কে।

কুমুদরঞ্জন ঘোষ।

পেছন-পেছন এল যে মেয়েটি, তাকেও চিনতে দেরি হল না! এরকম সুবেশা কিন্তু সুরূপা নয় একজনই হতে পারে। পাঁচতলা হোটেলের সেই রহস্যময়ী।

খুব আওয়াজ করে নস্যি নিয়ে ইন্দ্রনাথ বলেছিল, 'ব্যস, এবার শুরু হোক শেষ অঙ্ক। মাধুরী ঘোষদস্তিদার, ওরকম কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে পেশি টেনে ধরবে—তখন ওই কুমুদরঞ্জন ঘোষকে দিয়েই পা টেপাতে হবে। যেখান থেকে দাঁড়িয়েছেন, ওখানেই টুপ করে বসে পড়ুন। শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন ঘোষ, আপনার রঞ্জনরশ্মির আশ্চর্য কাহিনি শুনব সব শেষে। বসুন, বসুন, মাধুরীর পাশে বসুন। ফাইন। এইবার শেফালিকা নন্দী। আপনিই যত নষ্টের গোড়া। আপনার কাহিনি শুরু হোক সবার আগে। স্টার্ট।'

শেফালিকা

নন্দী টাইটেলটা এখনও নিয়ে রেখেছি, রাখবও চিরকাল। কিন্তু ছাদনাতলায় দাঁড়িয়ে যে লোকটা আমার পদবী আর গোত্র পালটে দিয়ে গেল, সে যদি থাকত, আমার মতো সুখী মানুষ দুনিয়ায় আর কেউ থাকত না।

জন্মেছিলাম শেফালিকা দত্ত হয়ে। অনেক আশা আর আনন্দ নিয়ে বিয়ে করেছিলাম ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে। কুবেরদের বাজারদর অনেক।

রমাপতি নিজেও তো ছিল ছোটখাট এক কুবের। নন্দী পদবী শুনেই বুঝছেন? সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের চাপা টাকার খবর অনেকেই রাখে না। কলকাতায় এখনও কত প্রপার্টি ধরে রেখে দিয়েছে, তাও ঢাক পিটিয়ে কাউকে জানায় না।

কুবেরের বিষয়-আশয় পেয়েই বোধহয় এত নির্লোভ আর এত নীতিবাগীশ ছিল রমাপতি। সোনার খাটে গা আর রূপোর খাটে পা দিয়ে যে লোকটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারত—সে এসেছিল লাইনে—খেটে রোজগার করতে। বলত বাপঠাকুরদা বাগানবাড়ি বানিয়ে আর মেয়েছেলে রেখে যত পাপ করেছে, তার প্রায়শ্চিত্ত করছি।

সেইটুকু করলেই তো হত। কেন ও দৌড়ল কালো টাকা লুটেরাদের পেছনে। কেন তাদের মুখোশ খসানোর জন্যে কোমর বেঁধে লাগতে গেল। কুচক্রের অচলায়তন ভাঙার ক্ষমতা ওর ছিল না—টলানো তো দূরের কথা।

কিন্তু পায়ের তলায় যারা ঘাস গজাতে দেয় না তারা পায়ের তলায় কাঁটার খোঁচা কখনও সয়?

তাই একদিন কসবার খোলা হাইড্রেনের মধ্যে একটা লাশ পাওয়া গেল।

শেষ হয়ে গেল রমাপতি নন্দী। শেষ হয়ে গেল পুলিশি তদন্ত। অপরাধী রয়ে গেল অন্ধকারে।

আর রইল আমার বৈধব্য। থাকবে সারাজীবন।

সেই সময়ে আমার পাশে এসে দাঁড়াল এক আদর্শ মানুষ। এই কুমুদরঞ্জন ঘোষ।

আমাকে বললে,—'আমি সব জানি। সন্দেহ আমারও হয়েছে। আমি কিন্তু সাবধানে এগোচ্ছি। এই কুচক্র আমি ভাঙব, রমাপতির অপঘাত মৃত্যুর বদলা নেব, দেশের জন্যে একটা অন্তত ভালো কাজ করে যাব—তাতে আমারও মৃত্যু হয় হোক।

রঞ্জন

হ্যাঁ, একথা আমি বলেছিলাম শেফালিকাকে। আমি তাকে কথা দিয়েছিলাম—বদলা আমি নেবই।

সেইদিন থেকে কুমুদরঞ্জন ঘোষ হয়ে গেছিল রঞ্জনরশ্মি ঘোষ। মাধুরীকে এর বেশি আর বলিনি। বিয়েটা শুধু আটকে রেখেছিলাম। বিধবা থাকার চেয়ে আইবুড়ো থাকা অনেক ভালো।

দেশসুদ্ধ লোক এখন জেনে গেছে স্ক্যাম নামে শব্দটা। তিন হাজার কোটি টাকা উধাও হওয়ার চাঞ্চল্যকর অপব্যবস্থা। Scam শব্দটা কিন্তু ব্রিটিশ ডিক্সনারিতে খুঁজে পাবেন না। এটা একটা আমেরিকান স্ল্যাং। নিশ্চয় সেদেশেও এইরকম ব্যাঙ্ক কেলেঙ্কারি হয়।

দেশজুড়ে এই হইচই পড়ার অনেক আগে থেকেই টাকা সরে যাচ্ছিল ব্যাঙ্ক থেকে। কোটি-কোটি টাকা। চোখের সামনে দিয়ে টাকার এই রকম উড়ে যাওয়া দেখার পর মানুষের মতো মানুষরা চুপ করে বসে থাকতে পারে না। রমাপতিও পারেনি। ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু ধমক খেয়েছিল। শাস্তির হুমকি শুনেছিল। বেপরোয়া রমাপতি তখন একা এগিয়ে গেছিল। তাই ওর লাশ পড়েছিল। যেখানে কোটি-কোটি টাকার খেলা চলে, সেখানে দু-দশ হাজারেই একটা মানুষ খুন করিয়ে দেওয়া যায়, নিখুঁতভাবে কোথাও কোনও সূত্র না রেখে। রমাপতি কিন্তু একটু সূত্র রেখে গেছিল আমার কাছে, মরার আগে। অন্য ম্যানেজারদের সঙ্গে ওর তেমন দহরম-মহরম ছিল না। আমার সঙ্গে ওর মনের মিল ছিল অনেকগুলো বোকামির জন্য। আমরা সৎ, আমরা ঘুষ নিই না, আমরা মুখ বুজে অন্যায় বরদাস্ত করি না। অতএব আমরা মূর্খ।

টাকা জমা না রেখে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলিয়ে দেওয়ার বা তুলিয়ে নেওয়ার অনেকগুলো অপব্যবস্থা আছে। এদের নাম : রিফান্ড অর্ডার, ডিবেঞ্চার ইন্টারেস্ট, ডিভিডেন্ড ওয়ারেন্ট, ইন্টারেস্ট ওয়ারেন্ট, কমিশন ওয়ারেন্ট—ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় আরও অনেক পেমেন্ট।

এজন্যে ডেসিগনেটেড অ্যাকাউন্ট খুলতে হয়। এগ্রিমেন্ট করতে হয় ওয়ারেন্ট ইসু করার আগে। তারপর টাকা জমা দিতে হয়। তখন ব্যাঙ্ক হেড অফিস সার্কুলার ইসু করে দেয়। কোম্পানি তখন ওয়ারেন্ট বা পোস্ট-ডেটেড ওয়ারেন্ট বাজারে ছেড়ে দেয়। সার্কুলার অনুযায়ী ব্যাঙ্ক ম্যানেজাররা টাকা দিয়ে যেতে থাকে।

আমার প্রথম সন্দেহ দেখা দেয় একটা পাঁচতারা হোটেলের অ্যাকাউন্ট নিয়ে। নামটা বলব না। অফিসিয়াল সিক্রেসি।

প্রথমেই যে টাকা জমা দেওয়া উচিত, এই হোটেল কোম্পানি তা না জমা দিয়ে অর্ডিনারি অ্যাকাউন্টের মতোই আস্তে-আস্তে টাকা জমা দিয়ে যাচ্ছিল। অপরেটিং ব্রাঞ্চের ম্যানেজার আমি। কিছু নিয়ম আমাকে মেনে চলতে হয়। আর তখনি আমার সন্দেহ হয় এত কম টাকা জমা পড়ছে কেন?

কৌতূহলের শুরু তখন থেকেই।

তখন আমি ধাপে-ধাপে এগোতে লাগলাম। ছাত্রজীবনে সংগঠন করেছি, আন্দোলন চালিয়েছি, অন্যায়ের প্রতিকার করেছি। কিন্তু হঠকারিতা কখনও করিনি। এটাই আমার ছাত্র জীবনের শিক্ষা।

প্রথম ধাপেই ওয়াকিবহাল করলাম ওপরওলাদের। তাঁদের জানিয়ে দিলাম, কী ধরনের বেআইনি কাণ্ড চলছে আমার নাকের ডগায়। যে রিকুইজিট ফান্ড জমা দেওয়ার কথা—এই পাঁচতারা হোটেলটি তা না দিয়ে বাজার থেকে কোটি-কোটি টাকা তুলিয়ে নিচ্ছে।

রমাপতির কপালে যা ঘটেছিল, আমার কপালে ঘটল ঠিক তাই। ধমক আর শাস্তির হুমকি।

আমি যে ভুল সন্দেহ করিনি, এই হল তার প্রমাণ। চক্রান্ত একটা রয়েছে। হাতে হাত মিলিয়ে রয়েছে ব্যাঙ্কের ঊর্ধ্বতম ম্যানেজমেন্ট আর পাঁচতারা হোটেল। নিচুতলার ম্যানেজাররা নাক গলালেই নাক উড়ে যাবে। যেমন গেছে রমাপতির।

আমি তখন অপারেশন শুরু করলাম সম্পূর্ণ নিজের ঝুঁকিতে কারও সাহায্য না নিয়ে চাকরির পরোয়া না রেখে। একেবারে নিজের মনগড়া নিয়মে।

ব্যাঙ্ক-নিয়ম অনুযায়ী পাঁচতারা হোটেল কোম্পানির উচিত, বাজারে চলতি ইসুগুলোর যোগফল-টাকা ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া।

কিন্তু তা তারা করছে না। ডেলিডেবিটেড টাকার চাইতে মাত্র দশ-বিশ হাজার টাকার বেশি করে জমা দিচ্ছে।

আমি ঠিক করলাম, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাব পাঁচতারার প্যাঁচ।

কোম্পানির গড়পরতা যত সংখ্যক চেক ডেবিট হত, তা না করে, নামমাত্র দু-একটা চেক ডেবিট করে, বাকি চেকের আলাদাভাবে হিসেব তৈরি করে রেগুলার যোগ দিয়ে রাখতে শুরু করলাম।

এ হিসেব গোপনে রাখলাম নিজের কাছে।

ফলে, পাঁচতারা কোম্পানি সন্দেহও করতে পারল না, কত টাকার সত্যিকার চেক ব্যাঙ্কে জমা হয়ে গেছে। শুধু জানল, অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট ব্যালান্স রয়েছে। অডিটিং-এর নিয়ম অনুসারে তাই তারা ধরাছোঁয়ার বাইরে। পাঁচতারার অফিসার নিয়মিত পজিশন দেখে খুশি হয়ে চলে যায়—জানতেও পারে না আসল পজিশনটা।

সে হিসেব তো আমার কাছে।

এইভাবে একটু-একটু করে পাঁচতারাকে টেনে নিলাম আমার পাতা ফাঁদে।

তারপর গেলাম দ্বিতীয় ধাপে।

তিন-চারদিনের টানা ছুটি ব্যাঙ্কে প্রায়ই থাকে। তক্কে-তক্কে রইলাম এইরকম একটা ছুটির। ছুটির ঠিক আগের দিন দুম করে একদিনেই ২৪ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা ডেবিট করে দিলাম।

ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষদের তোষামোদ করার লোকের অভাব নেই কোনও ব্যাঙ্কেই। অভাব ছিল না আমার ব্রাঞ্চেও। ঝড়ের বেগে খবর চলে গেল সেখানে।

চাপ এসে গেল সঙ্গে-সঙ্গে। কাজটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না। যা করছ, কোম্পানিকে জানিয়ে করো।

আমার বয়ে গেছে জানাতে, ছুটি তো পড়ে গেছে। এই কদিন ব্যাঙ্ক বন্ধ। ২৪ কোটি ৯৮ লক্ষ জমা দেওয়ার সুযোগ তো পাচ্ছে না পাঁচতারা কোম্পানি।

এ টাকা খাতাকলমে ব্যাঙ্ক থেকে ধার নিলে ব্যাঙ্ককে দিতে হত বেশি করেও শতকরা ২৫ সুদ। কিন্তু কলমানি মার্কেটে খাটিয়ে পাঁচতারা কোম্পানি লুটে নিচ্ছে শতকরা ৩০ থেকে ৫০ সুদ।

কর্তৃপক্ষ তা জানে। জেনেশুনেও পাঁচতারাকে দিয়ে যাচ্ছে টাকা। রমাপতি বলতে গেছিল, তাকে লিখে জানিয়েছিল—বকেয়া টাকার জন্যে কোনও সুদ নিতে পারবে না। কেন?

আরে, ওই পরিমাণ টাকা তো ওরা অন্য জায়গায় রেখেছে। তোমার বাগড়া দেওয়ার কী দরকার।

বোকা রমাপতি তা সত্ত্বেও বাগড়া দিতে গিয়ে মরেই গেল।

আমি কিন্তু মরলাম না—যদিও যে-কোনওদিন বডি পড়তে পারে। মাধুরী ভয় পাবে বলেই এতদিন এসব বলিনি। কিন্তু কাঁহাতক আর সহ্য করা যায়? আমরা যারা খেটে খাই, সৎভাবে খেয়ে-পরে বাঁচতে চাই—আমরা চাকরি পাচ্ছি না—কিন্তু কালো টাকার মালিকরা ব্যাঙ্কের টপমোস্ট ম্যানেজমেন্টদের নিয়ে ফুর্তির ফোয়ারা ছুটিয়ে যাচ্ছে পাঁচতারার ঘরে-ঘরে। কত মধ্যবিত্তের মেয়ে কৌমার্য বলি দিচ্ছে সেখানে—কেউ তার খবরও রাখে না। যে পাপাচার কল্পনাতেও জানা যায় না—তাই চলছে অবাধে কারণ সর্ষের মধ্যেই ঢুকে রয়েছে ভূত। রক্ষক যে, সেই হয়েছে ভক্ষক। পাবলিক তা জানবে কী করে?

ভাগ্যিস আমি ব্যাঙ্ক ম্যানেজার হয়েছিলাম। তাইতো জানতে পারলাম। জানতে যখন পেরেছি, বিহিত না করলে আমি কি মানুষ পদবাচ্য?

যাক, যা বলছিলাম, ছুটির ঠিক আগের দিন আমার ওই কীর্তির ফলে পাঁচতারা কোম্পানির বেআইনি দাদন লেখা হয়ে গেল ২৪ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা। ব্যাঙ্কের ভাষায় যাকে বলে, Clean Advance—সিকিউরিটি ছাড়াই।

আনন্দে ডগমগ হয়ে আমি চলে গেলাম ছুটিতে। রমাপতির আত্মা বোধহয় সেদিন কিছুটা শান্তি পেয়েছিল।

ছুটি কাটিয়ে ফিরে এসে শুনলাম, ব্যাঙ্কের শিরায়-উপশিরায় রটে গেছে সেই খবর। কুমুদরঞ্জন ঘোষ ঘায়েল করেছে পাঁচতারাকে। পালটা প্যাঁচে ধরাশায়ী কোম্পানি পাগলের মতো ধর্না দিয়েছে টপমোস্ট ম্যানেজমেন্টের কাছে।

মুখরক্ষা করার জন্যে ম্যানেজমেন্ট চিঠি দিয়েছে পাঁচতারাকে—কিন্তু তুলোধোনা করছে বেঁড়ে ব্যাটাদের নিয়ে। পাচ্ছে না কেবল এই পাতি অফিসারকে।

অনেক চিঠির ঝড় বয়ে গেল দুই তরফে। পাতি অফিসারের সুবাদে প্রায় দশ লক্ষ টাকারও বেশি সুদ আদায় পেয়ে গেল ব্যাঙ্ক।

লাভ হল ব্যাঙ্কের।

আমার লাভও হল না, ক্ষতিও হল না। মাইনে তো পেলাম। মাইনে পাওয়ার কর্তব্য করে গেলাম—যা আর কেউ করতে সাহস পায় না।

কিন্তু ক্ষতি হয়ে গেল পাঁচতারা আর টপমোস্ট ম্যানেজমেন্টের। দশ লাখ কি কম কথা। কত বখরা থাকত ম্যানেজমেন্টের?

ফলে, মিটিং-এর পর মিটিং হয়ে গেল আমাকে নিয়ে—আমাকে ঠান্ডা করার জন্যে—নরমে-গরমে কতভাবেই না বোঝানো হল আমাকে—আর বেড়ো না—যা হচ্ছে হোক।

কিন্তু তাই কি হয়! কতরকম টোপ যে পড়েছিল আমাকে কব্জায় আনার জন্যে—তা বললে মাধুরী হয়তো মূর্ছা যাবে। কতরকম ঘেরাটোপ যে রচনা হয়েছিল আমার হাত-পা বেঁধে ঠুঁটো বানিয়ে রাখার জন্যে—তার বিশদ বর্ণনাও আর দিতে চাই না।

আমি শুধু চালিয়ে গেলাম। কে তখন রোখে আমায়। উচ্চিংড়ের মতো লাফিয়ে-লাফিয়ে যেখানে ফাঁক পেলাম, সেখানেই প্যাঁচ কষে গেলাম। কু-কাজ ফাঁস করে দিলাম। যা কিছু পাওনা, আদায় করে গেলাম।

ফল হল ভয়ানক।

আমাকে বদলি করে দেওয়া হল।

পাঁচতারাকে প্যাঁচ কষবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হল। তাতে কিন্তু ব্যাঙ্কের ক্ষতিই হল। কিন্তু তাতে কার কী এসে যায়? ওই ব্রাঞ্চে যদি আরও দশ থেকে পনেরো বছর আমি থাকতাম, ব্যাঙ্কের মুনাফা বা লভ্যাংশ হিসেবে কম করেও ২০ থেকে ৩০ কোটি টাকা ব্যাঙ্ককে হাতেকলমে পাইয়ে দিতাম—কাগুজে হিসেব নয়—কড়কড়ে টাকায়। ভাবতে পারেন? একটা ব্যাঙ্কের একটা শাখায় একজন মাত্র অফিসার যদি এই লভ্যাংশ এনে দিতে পারে, তাহলে অত্যন্ত বাস্তবসম্মত কনজার্ভেটিভ হিসেবে শতকরা দশটা শাখায় এই পরিমাণ লাভ এলে প্রতি বছরে আমাদের দেশের একটা করে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্যকর করা যায়। চরম অসংযমী ন্যায় নীতিহীন মুনাফাখোরদের হাতে পড়ে আপামর জনসাধারণের ভোগান্তি কোন পর্যায় পৌঁছেছে, তাও কি ব্যাখ্যা করে দিতে হবে?

না। কক্ষনও না। আজও গায়ের রক্ত টগবগিয়ে ওঠে সেই নাটকীয় মিটিং-এর কথা মনে পড়লেই। ২৪ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকার ভাউচার নিয়ে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল আমাকে। ভাউচার লিখেছিলাম আমি—সই করেছিলাম আমি। পাঁচতারার ওপরতলায় বসেছিল জরুরি অধিবেশন। মিটিং তো নয়—কাঠগড়া। সেখানে

হাজির হয়েছিলেন পাঁচতারার চিফ সেক্রেটারি, ফিন্যান্স ডিরেক্টর, জয়েন্ট সেক্রেটারি, কমপিউটার অপারেশন-এর ডিরেক্টর আর ডিলিং অফিসার।

ব্যাঙ্কের তরফ থেকে হাজির হয়েছিলেন জেনারেল ম্যানেজার, একজন ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, তিনজন অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার, একজন ডেপুটি ম্যানেজার আর এই পাতি অফিসার।

কত গুরুত্বপূর্ণ সেই মিটিং আন্দাজ করতে পারছেন? পাপচক্রের অংশীদার কারা, তা কি আর খুলে বলার দরকার আছে? ব্যাঙ্কের লাভকে এঁরাই এতদিন ভাগ করে নিয়েছেন—আমি বাগড়া দিয়েছি বলে আমাকে কাঠগড়ায় তুলেছেন।

রমাপতি মরেছে, আমিও না হয় মরব, কিন্তু মেরে মরব।

চিফ সেক্রেটারি ভদ্রলোককে এমনিতেই একটা ভদ্র বাঘ বললেই চলে। না...না...ভদ্র সিংহ। সিংহের মতোই তো কেশর, আলমগিরের মতো দাড়ি। চোখ দুটোয় সুমেরু-কুমেরুর জমাট বরফ।

কনকনে চোখে আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে স্রেফ তুলোধোনা করে গেলেন চোস্ত ইংরেজিতে। ভাগ্যিস ভাষাটায় দখল ছিল। তাই রক্ষে। ভদ্র সিংহ আমার চেহারা দেখে বোধহয় ভেবেছিলেন—কিংস ইংলিশ শুনলেই নিশ্চয় প্যান্ট নষ্ট করে ফেলব।

ধোপা, নাপিত, কুলি, মজুরকেও এভাবে আমরা গালাগাল দিই না।

আমি চুপ করে রইলাম।

ব্যাঙ্কের অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার আমাকে একটু স্নেহ করতেন। আমার হাড়মজ্জার খবর রাখতেন। কিন্তু আমি যে রঞ্জনরশ্মি হয়ে গিয়ে তাঁদেরও হাড়মজ্জার খবর রাখতে শুরু করেছিলাম, তা জানতেন না।

এই ভদ্রলোকই আমার হেনস্থা দেখে নরম গলায় আমার সেন্স অফ ডিউটি সম্বন্ধে দু-চারটে ভালো-ভালো কথা সেদিন বলেছিলেন।

ভদ্র সিংহ কনকনে চোখে তাকিয়েই রইলেন আমার দিকে। চিবিয়ে-চিবিয়ে বললেন, 'কুমুদরঞ্জন ঘোষ!'

সবিনয়ে আমি বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, অধীনের নাম কুমুদরঞ্জন ঘোষ। ওরফে কে আর ঘোষ। সংক্ষেপে রঞ্জন ঘোষ। আরও একটা নাম আছে আমার। রঞ্জনরশ্মি ঘোষ।'

'হোয়াট?'

'মানে, এক্স-রে ঘোষ। আপনার কোম্পানির ভেতর পর্যন্ত দেখে ফেলেছি তো।'

'ইউ পেটি অফিসার।'

'ও ইয়েস, আই অ্যাম এ ভেরি-ভেরি পেটি অফিসার। কিন্তু আপনার কোম্পানির সব অফিসার ঠিক আছে তো?'

'অ্যাকাউন্ট কীভাবে রাখতে হয়, শিখে নিন আমার কাছ থেকে।'

'আপনার কাছ থেকে? সরি, স্যার। আপনার কোম্পানির অ্যাকাউন্ট শিখে আমার কী লাভ?'

'ইউর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট—'

'সেটাও আপনার কাছ থেকে শিখব না।'

'ইউ ব্লাইটার।'

'ল্যাঙ্গুয়েজ প্লিজ। আপনার কোম্পানি-অ্যাকাউন্ট ঠিক আছে তো?'

'মানে?'

'যে টাকা রেখে যে টাকা তোলার কথা—তা কি হচ্ছে?'

'হু দ্য হেল ইউ আর টু কোশ্চন মি?'

'কত টাকা ব্যাঙ্কে রেখে, কত টাকার চেক ছেড়েছেন বা কত টাকা তুলিয়ে নিয়েছেন—তা তো আপনাকে জানাতে হবে—এখুনি।'

'আপনার সাহস তো কম নয়। আপনার ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানও আমাদের Credential নিয়ে প্রশ্ন তোলেন না। আপনার কি অথরিটি আছে?'

'আছে, আছে। তাছাড়া, এটা তো আপনার কোম্পানির Credential-এর প্রশ্ন নয়—ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের প্রশ্ন। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট 'রিকনসাইল' করতে গেলে এ প্রশ্নের সদুত্তর তো চাই।'

সবেগে মাথা ঘুরিয়ে ফিন্যান্স ডিরেক্টরের দিকে তাকালেন ভদ্র সিংহ। বললেন, 'এর সঙ্গে আপনি কথা বলুন।'

ফিন্যান্স ডিরেক্টর একটি অমায়িক পশু বিশেষ। তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন পাশের কামরায়। জামাই আদরে একটা দামি সোফায় বসালেন। হুইস্কি রেডি ছিল। অফার করলেন। আমি সেদিকে না তাকিয়ে বললাম, 'কী বলতে চান, বলে নিন।'

উনি জবাব না দিয়ে মস্ত টেবিল প্রদক্ষিণ করে পিঠ-উঁচু চেয়ারে বসলেন। তখন আমার খেয়াল হল, আমাকে ডেকে এনেছেন নিজের চেম্বারে। ড্রয়ার টেনে ডানহাতে কী যেন নাড়াচাড়া করতে-করতে আমার দিকে হাসি-হাসি মুখে চেয়ে রইলেন। এসব লোকেরা হাসিমুখেই খুন করে। তাই আমি সতর্ক হলাম।

উনি বললেন, 'চিফ সেক্রেটারির সঙ্গে এভাবে কথা বলতে আপনার ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানও সাহস পায় না।'

'আমি চেয়ারম্যান নই,' বললাম আমি।

'আপনি একটু বুঝেসুঝে কথা বলুন।'

'কী বলতে চান, প্রাঞ্জল করুন।'

'এভাবে, এইসব কথা না বললেই ভালো করতেন।' এবার দেখলাম ফিন্যান্স ডিরেক্টর তোতলাচ্ছেন।

আমি চালিয়ে গেলাম, 'আমি নিরুপায়। আপনার কোম্পানির অফিসার আমি নই। কাজেই আপনার চিফ সেক্রেটারির মন জুগিয়ে কথা বলার দরকার আমার নেই।'

'মি: ঘোষ—'

'কেন উনি আমাকে আপনার সঙ্গে কথা বলতে পাঠালেন, সেটা বলুন। যদি কিছু বলার না থাকে, এখানে সময় নষ্ট করার দরকার আছে বলে আমি মনে করি না।'

'আপনার যা প্রশ্ন সেটা আমাকে করুন।'

'প্রশ্ন তো একটাই : আপনার কোম্পানির অ্যাকাউন্ট ঠিক আছে কি?'

ফিন্যান্স ডিরেক্টর জবাব না দিয়ে ড্রয়ারটার দিকে চাইলেন। ডানহাতে যা নাড়াচাড়া করছিলেন, এবার তা বের করে এনে টেবিলের ওপর রাখলেন। একতাড়া নোট।

পাঁচশো টাকার একশোটা নোট। নতুন নোট। নগদ পঞ্চাশ হাজার।

উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, 'চলুন, আপনার কথা শোনা হয়ে গেছে।'

অমায়িক পশু বিশেষের মতোই ফিন্যান্স ডিরেক্টর আমাকে নিয়ে মিটিং রুমে ফিরে এলেন। চিফ সেক্রেটারিকে বললেন, 'স্যার, ইনি শুধু জানতে চাইছেন, আমাদের কোম্পানি অ্যাকাউন্ট ঠিক আছে কিনা।'

চিফ সেক্রেটারি চোখের পাতা না ফেলে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন ফিন্যান্স ডিরেক্টরের দিকে। কথা হয়ে গেল চোখে-চোখে, তাকালেন ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের দিকে।

বললেন, 'তাহলে তো আপনাদের সঙ্গে একটা সিটিং দিতে হয়।'

জেনারেল ম্যানেজারের জবাব যেন তৈরি ছিল। সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, 'তাহলে এখন যাই। ব্যাঙ্কের মিটিং ডাকছি—আপনারাও আসুন সেখানে।'

মিটিং কিন্তু আজও ডাকা হয়নি। যে তথ্য জানতে চেয়েছিলাম, আজও তা ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ জানতে পারেনি। জানতে চায়ও না। জানলে তো আর পাঁচতারার ঘরে-ঘরে মধুযামিনী করা চলবে না।

শুধু বদলি করা হয়েছে আমাকে।

তার আগে অবশ্য জেনারেল ম্যানেজার তলব করেছিলেন আমাকে তাঁর চেম্বারে।

বলেছিলেন রুষ্ট গলায়, 'তোমার এসব খোঁজখবরে দরকার কী, ঘোষ?'

'আপনি বলছেন, দরকার নেই?' বলেছিলাম বেঁকা সুরে, 'ভবিষ্যতে তাহলে আর কৈফিয়ৎ চাইবেন না কোনও কাজে গাফিলতির জন্যে।'

'ঘোষ—'

'আগে কথা দিন, কৈফিয়ৎ চেয়ে বিরক্ত করবেন না—'

'ওভাবে ব্যাপারটা নিচ্ছ কেন?'

'তাহলে কীভাবে নেব?'

'এরা তো খুব বড় কোম্পানি। এদের ব্যাপারে একটু রয়েসয়ে চারদিক ওজন করে কথা বলা দরকার।'

'মানতে পারলাম না স্যার, আমার কাছে সব অ্যাকাউন্ট হোল্ডারই সমান—কার বড় কোম্পানি, কার ছোট কোম্পানি—এ বিচার করি না ক্লায়েন্ট হ্যান্ডল করার সময়ে। সবাই খদ্দের, সবাই লক্ষ্মী।'

'তা তো বুঝলাম—'

'না স্যার, আপনি বোঝেননি। বুঝলে এই উপদেশ আমাকে দিতে আসতেন না। এই কোম্পানি আপনার আমার পেটের ভাত মেরে দিচ্ছে—চাকরির সুযোগ কেড়ে নিচ্ছে। এদের কাছ থেকে কে কত পেয়েছে জানি না—আমি তো কিছু পাইনি।'

দুম করে রেগে গেলেন জেনারেল ম্যানেজার। ভদ্রলোক এমনিতেই খুব কম কথা বলেন। যমের মতো সবাই ভয় পায়। আমি কিন্তু মরার ভয় কাটিয়ে উঠেছিলাম বলে যা-যা বলবার, কটাকট বলে যাচ্ছিলাম। রাগ তো হবেই।

কড়া গলায় বললেন, 'কী বলতে চাইছ?'

'রেগে গেলে তো চলবে না। যা ঘটবার ঘটে গেছে—ক'জনের চাকরি খাবেন, তাই ভাবুন। তার বাইরেও বড় ভাবনা হয়তো আপনার মাথায় ঘুরছে—আপনার নিজের চাকরিটাই না যায়, কারণ একটাই : এই যে টাকা তোলার হুলিয়া—এতে তো সই দিয়েছেন আপনি। এই হুলিয়ার ফলেই তো পাঁচতারা কোম্পানি গড়পরতা দশ লাখ টাকারও কম রেখে আজ পর্যন্ত ব্যাঙ্ক থেকে প্রায় পঁচিশ কোটি টাকা তুলিয়ে দিয়েছে। আপনার দায়িত্ব আপনি অস্বীকার করতে পারেন, আমি যে ভাউচার লিখেছি সেটা ঘুরিয়ে দিয়ে আপনি লিখতে পারেন? পারলে লিখুন না।'

'যাও, যাও, পরে ডাকছি।'

আমি কিন্তু যাইনি। জবাব না দিয়ে উঠব না ভান করেছিলাম। চোখ রাঙানিতেও ওষুধ ধরল না দেখে হাঁকডাক করে পারসোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্টকে ডেকেছিলেন জেনারেল ম্যানেজার, 'এটা করো ওটা করো'—আবোলতাবোল হুকুম ছেড়ে গেছিলেন। বেশ বুঝলাম, বিলক্ষণ ঘাবড়ে গেছেন—সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

আমি তখন উঠে চলে এসেছিলাম। আসবার সময়ে বলে এসেছিলাম, 'পরে ডাকবেন স্যার।'

স্যার আর ডাকেননি শুধু বদলির হুকুম জারি করেছিলেন। তারপর থেকেই আমি হুঁশিয়ার হয়েছি। রমাপতির কপালে কী ঘটেছিল, তা ভুলিনি। বর্ধমানে আমি একা থাকি পৈতৃক ভিটেতে। কেউ তো নেই। পাড়ার ছেলেদের দিয়ে খবর নিয়ে জানলাম—বাড়ির ওপর কেউ বা কারা নজর রাখছে।

বুঝলাম। রাতেই সাবাড় করার মতলব। একবার খতম হয়ে গেলে কে আর দেখছে।

বাড়ি যাওয়া বন্ধ করলাম। বিনয় লজে ঘরভাড়া নিলাম। সেখানে অনেক লোকজন। খুনখারাপি এত সোজা নয়।

দুদিনেই টের পেলাম, অফিস থেকে বেরোলেই পেছনে ফেউ লাগছে।

তখন থেকেই বিনয় লজে এ দরজা দিয়ে ঢুকে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া আরম্ভ করলাম। রাত কাটানোর জন্যে মুচিপাড়ার এক বস্তিঘর ভাড়া নিলাম। বিনয় লজ থেকে বেরিয়ে কিছুটা সময় নিরাপদে

কাটানোর জন্যে ঢুকতাম খোদ সিংহের গহ্বরে—পাঁচতারা হোটেলে। কেউ অন্তত সেখানে আমাকে খুঁজবে না। ওপরতলার বড় সাহেবরাও তো নিচে নামে না। রেস্তোরাঁয় ঢোকে না।

সঙ্গে নিয়ে যেতাম শেফালিকাকে। তাতে সন্দেহটা কম থাকে। ওসব জায়গায় একলা গেলেই তো সন্দেহ বাড়ে। শেফালিকা আমার প্ল্যানে সাহায্য করেছে। বৈধব্য বেশ ঘুচিয়ে সেজেগুজে হাজির থাকতে কষ্ট অবশ্য হয়েছে। মাধুরী কিন্তু ভুল ভেবেছে।

বেশ বুঝেছিলাম, এভাবে বেশিদিন চলবে না। মাধুরী যদি টিকি ধরে ফেলতে পারে—ওরাও ধরবে।

খবরটা পেলাম ইন্দ্রনাথবাবুর কাছে। মাধুরী আমাকে ফলো করেছে জেনে প্রথমে খুব হাসলাম। তারপর বুঝলাম খেল খতম হতে আর দেরি নেই।

কী করব জানি না। ইনি বললেন এখানে আসতে, তাই এলাম, এরপর?

শেষের নাটক

কবিতা বললে, 'আপনি আমার এই ঠাকুরপোটাকে চেনেন না। ও যদি মনে করে...সত্যিই যদি মনে করে...তাহলে পৃথিবীর কোনও শক্তিকে আপনার মাথার চুল ছুঁতে দেবে না।' বলে, চাইল ইন্দ্রনাথের দিকে।

ইন্দ্রনাথ সশব্দে এক-টিপ নস্যি নিয়ে বললে, 'তাই হবে।'

তাই হয়েছে। ইন্দ্র ওর মন্ত্রগুপ্তি খাটিয়েছে। কুমুদরঞ্জনের কেশাগ্র কেউ স্পর্শ করতে পারেনি—পারবেও না।

মাধুরীর গলায় মালা দেওয়ার সময়ে নারদকে ডাকতে হয়নি। খুব খেয়েছিলাম সেদিন। কঞ্জুষ দুর্নাম ঘুচিয়েছিল কুমুদ—একদিনের জন্যে।

সবচেয়ে বড় কথা, আজও সত্যিকারের দেশপ্রেম দেখিয়ে যাচ্ছে কুমুদরঞ্জন—অন্য এক ব্রাঞ্চে বসে।

** 'প্রসাদ' পত্রিকায় প্রকাশিত। (শারদীয় সংখ্যা, ১৯৯২)*

নিরুদ্দেশ নীলকান্তমণি

ইন্দ্রনাথের একটা বদখেয়াল আছে। হাতে যখন কোনও কাজ না থাকে, রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। তাতে ওর মন প্রসন্ন থাকে।

এইভাবেই একদিন বেরিয়েছিল বাড়ি থেকে। তখন সকাল সাতটা। চলে এল বেলেঘাটা মেন রোডে। চলল শিয়ালদার দিকে।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই খেয়াল হল, ওর হাত দশেক দূরে সামনে হাঁটছে লুঙ্গিপরা আধবুড়ো একটা লোক। গায়ে হলুদ হাতকাটা গেঞ্জি। তার হাতে একটা সাদা কাপড়ের থলি। মাঝে-মাঝে সে থমকে দাঁড়াচ্ছে, হেঁট হচ্ছে, থলি থেকে রাধাচূড়া ফুল বের করে ফুটপাতে ফেলছে, ফের সিধে হয়ে হাঁটছে।

পাগল নাকি? কিন্তু আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার যে দেখা যাচ্ছে উলটোদিকের ফুটপাতে। সেখানে হনহন করে হাঁটছে হাফপ্যান্ট পরা একটি ছেলে। বছর বারো বয়স। গা খালি। আশপাশের বস্তির ছেলে নিশ্চয়। এ-ফুটপাতের আধবুড়ো যেই হেঁট হয়ে ফুল ফেলছে, ও ফুটপাতের ছেলেটা তক্ষুনি খড়ি দিয়ে পাশের বাড়ির দেওয়ালে গোল কেটে মাঝখানে ক্রশ চিহ্ন দিচ্ছে।

এ তো ভারি মজার খেলা। নাকি বদমায়েশির যোগসাজস?

এইভাবে মোট উনিশবার ফুল ফেলা হল, উনিশবার দেওয়াল-লিখন হল—তারপরেই আধবুড়ো লোকটা রাস্তা পেরিয়ে চলে গেল ছেলেটার কাছে। প্যান্টের পকেট থেকে একটা পিস্তল বের করে ছেলেটা দিল আধবুড়োর হাতে। দুজনে মিলে দরজা খুলে ঢুকে গেল একটা বাড়ির মধ্যে।

বাড়িটা তিনতলা। নিচে দোকানপাট। ওপরের জানলাগুলো বন্ধ।

সদর দরজা খোলাই রয়েছে। ইন্দ্রনাথও ঢুকে গেল ভেতরে। সিমেন্ট বাঁধাই পুরোনো সিঁড়ি ওপরে উঠেছে দরজার ডানপাশ থেকে। দোতলার চাতালে দাঁড়িয়ে দেখল, লম্বা গলিপথ অন্ধকার। সব ঘর বন্ধ। এমন সময় কানে এল দুমদাম শব্দ তিনতলা থেকে। জিনিসপত্র ভাঙচুর চলছে।

এক-এক লাফে চারটে করে ধাপ টপকে তিনতলার চাতালে পৌঁছে গেল ইন্দ্র। লম্বা গলিপথে আলো এসে পড়েছে একটা খোলা দরজা দিয়ে। ঝড়ের বেগে পৌঁছল দরজার সামনে, দেখল সেই আধবুড়ো আর ছেলেটা দুখানা চেয়ার মাথার ওপর তুলে মেঝেতে আছড়ে-আছড়ে ভাঙছে।

হুঙ্কার ছেড়ে চৌকাঠ পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিল ইন্দ্রনাথ। সঙ্গে-সঙ্গে পেছনে শোনা গেল কৌতুক-তরল কণ্ঠস্বর—'সুপ্রভাত, ইন্দ্রনাথ রুদ্র।'

সবেগে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল ইন্দ্র। দেখেছিল, কালো চশমাপরা, কালো দাড়িওলা, ঘি রঙের সাফারি সুট গায়ে এক সুদর্শন পুরুষ দাঁত বের করে হাসছে।

কড়া গলায় বলল ইন্দ্র, 'কে আপনি? এ সব কী হচ্ছে?'

পকেট থেকে একখানা একশো টাকার নোট বের করে আধবুড়ো আর ছেলেটার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল সুদর্শন পুরুষ, 'তোমাদের কাজ শেষ। একশো টাকায় রফা হয়েছিল—দিয়ে দিলাম। যাও।'

কান এঁটো-করা হাসি হেসে দুই মূর্তিমান বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। অক্ষত একটা চেয়ার টেনে নিয়ে টেবিলের পাশে বসল সুন্দরদেহী পুরুষ। বললে, 'বসুন ওই চেয়ারটায়। আস্ত আছে। চিনতে পারলেন না আমাকে?'

চোয়াল শক্ত করে চেয়ে রইল ইন্দ্রনাথ। বুঝল, বিরাট একটা রঙ্গ হচ্ছে তাকে নিয়ে।

সুদর্শন পুরুষ কালো চশমাটা খুলে বললে, 'এবার?'

পৈশাচিক ওই বেড়াল-চোখ কি ভোলা যায়? দাঁতে দাঁত পিষে ইন্দ্রনাথ বললে, 'চন্দ্রকান্ত মল্লিক?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার ভাষায় আমি নাকি পাঁকাল মাছ। ধরেও ধরা যায় না। অবশ্য আমার মতোন সমাজবিরোধীর সঙ্গে টক্কর দিয়ে আপনি বেজায় খুশি হন—ঠিক কিনা?'

ইন্দ্রনাথ বললে, 'ইয়ার্কি হচ্ছে?'

চন্দ্রকান্ত বললে, 'জীবনটাই বিষ হয়ে গেল আমার! আপনার সঙ্গে ইয়ার্কি? ছি:! ছি:! আমি ডাকলে কি আপনি আসতেন? আসতেন না। তাই খেলিয়ে আনতে হল। রাস্তায় যদি না বেরোতেন—ওই দুজন অন্য খেলা দেখাত।'

'দরকারটা কী?'

'আপনাকে একটা মাথার খোরাক উপহার দিতে চাই—যা পেলে আপনি আনন্দ পান।'

ইন্দ্রনাথের এক চোখে বিরক্তি, আর এক চোখে কৌতূহল দেখা গেল।

চন্দ্রকান্ত কালো চশমাটা পরে নিয়ে বললে, 'কাল রাত এগারোটা নাগাদ বিদ্যাসাগর সেতুর তলা দিয়ে একটা লঞ্চ যাচ্ছিল। সেতুর ওপর থেকে একটা কাগজের প্যাকেট ফেলা হয় গঙ্গার দিকে—কিন্তু সেটা পড়ে লঞ্চের ওপর। এই সেই প্যাকেট।'

নীল নাইলন দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা কাগজের প্যাকেট টেবিলের ওপর রাখল চন্দ্রকান্ত মল্লিক। ইন্দ্রনাথ তাতে হাত দিল না। মুচকি হাসল চন্দ্রকান্ত। খুলল নাইলন দড়ির গিঁট। দুহাতে কাগজটাকে চেপে-চেপে মেলে ধরল টেবিলের ওপর। জিনিসগুলোকে সাজিয়ে রাখল কাগজের পাশে।

একটা ছোট ছোরা—ফলাতে লেগে শুকনো রক্ত। একটা পেতলের মোমবাতি স্ট্যান্ড—বেশ ভারি। একটা লাল সিল্কের স্কার্ফের আধখানা—তাতেও জায়গায়-জায়গায় লেগে শুকনো রক্ত। আর, একটা কাঁচি।

কেউ আর কথা বলছে না। ইন্দ্রনাথ চেয়ে আছে জিনিসগুলোর দিকে—চন্দ্রকান্ত চেয়ে আছে ইন্দ্রনাথের দিকে—তার মুখে দুর্জ্ঞেয় হাসি।

ইন্দ্রনাথের চোখ কিন্তু শক্ত হয়ে উঠেছে।

খুব আস্তে সে বললে, 'খুন হয়েছে একটি মেয়ে। পোশাকে শৌখিন।' বলে, কাগজটা উলটেপালটে দেখল, 'খুনি রেস খেলে। রেসের মরশুমে সন্ধের দিকে এই কাগজ বেরোয়। কিছু বাড়িতে কুরিয়ার ডেলিভারি দেয়। ব্রাউন র‍্যাপারের একটা কোণ আঠা লেগে সেঁটে রয়েছে কাগজে—এই র‍্যাপারে লেখা ছিল ঠিকানা।'—কাগজ রেখে তুলে নিল আধখানা স্কার্ফ। চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে রৌদ্রালোকিত জানলার কাচে চেপে ধরতেই দেখা গেল হাতের ছাপটা। রক্তমাখা হাতে স্কার্ফ খামচে ধরার ফলে পাঞ্জার ছাপ উঠেছে অসমানভাবে—কিন্তু এটুকু বোঝা যাচ্ছে যে, ছাপটা ডানহাতের।

ইন্দ্র বললে, 'খুনি ছোরা মারার পর ডানহাতে স্কার্ফ খামচে ধরে বাঁ-হাতে কাঁচি দিয়ে কেটেছিল—এই সেই কাঁচি। খুনি ল্যাটা।'

তন্ময় হয়ে শুনছে চন্দ্রকান্ত। মুখের হাসি অম্লান, 'তারপর?'

ইন্দ্রনাথ তখন দেখছে, স্কার্ফের প্রান্তের লাল ঝুমকো। সন্তর্পণে প্রতিটি লাল সুতো ফাঁক করে দেখবার পর খসে পড়ল একটা ছোট্ট জিনিস—খুট করে পড়ল মেঝেতে।

সঙ্গে-সঙ্গে চিতাবাঘের মতোন চেয়ার থেকে ছিটকে এসে ছোঁ মারতে গেছিল চন্দ্রকান্ত—তার আগেই বস্তুটা বাঁ-হাতে তুলে নিয়ে ডানহাত সামনে বাড়িয়ে ধরে বললে ইন্দ্রনাথ, 'তিষ্ঠ। আর এগোলেই বিপদ।'

বক্তা যে মিথ্যে বলছে না, তা বুঝল শ্রোতা। দাঁড়িয়ে গেল ওইখানেই। এখন কালো চশমার আড়ালে তার চোখ ধকধক করে জ্বলছে।

ইন্দ্র বললে, 'বুদ্ধি আছে তাহলে।' বলেই, দু-হাতে বস্তুটা ধরল চোখের সামনে। লাল সুতো দিয়ে ঘন প্যাটার্ন বুনে মোড়া হয়েছে জিনিসটাকে। নখ দিয়ে খুঁচিয়ে সুতো সরিয়ে দেখে নিল ইন্দ্র। দেখাল চন্দ্রকান্তকে।

বললে, 'লকেট। ওপরে লেখা রয়েছে 'মাউন্ট মেরি'। বম্বের কাছে এই চার্চে এরকম লকেট পাওয়া যায়। গলায় পরে থাকলে কপাল খুলে যায়—চন্দ্রকান্ত মল্লিক, মুখ দেখেই বুঝেছি, আপনি লকেট নয়—অন্য কিছু আশা করেছিলেন। তাই এত কষ্ট করে জিনিসগুলো বয়ে এনেছেন। খুনিকে আপনি চেনেন?'

'চিনি। নাম বলব না।'

'তার কাছেই জেনেছেন, মেয়েটাকে খুন করলে পাওয়া যাবে অত্যন্ত দামি একটা জিনিস। সাইজে ছোট হলেও খুব দামি।—রত্ন?'

'নীলকান্তমণি। দারুণ লাকি স্টোন। কিন্তু মেয়েটার নাম-ঠিকানা বলেনি পাছে আমি নীলকান্ত হাতিয়ে নিই। খুনির ঠিকানা? মাপ করবেন, আমরা নিচের তলার মানুষ, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা কখনও করি না। গঙ্গার ধারে কাছেই থাকে। খুঁজে নিন। এখন বাজে আটটা। পুলিশ লাশ নিয়ে নিশ্চয় মাথা ঘামাচ্ছে। যান, দেখুন যদি পান নীলকান্তমণি।'

'খুনি পায়নি?'

'না। মেয়েটার ঘরেই আছে। ভালো কথা, প্যাকেটের মধ্যে পেতলের মোমবাতি স্ট্যান্ড কেন ছিল, সেটা কিন্তু বলেননি।'

'প্যাকেট ভারি করবার জন্যে—যাতে জলে পড়েই ডুবে যায়।'

'কিন্তু পড়ল লঞ্চের ওপর। কার লঞ্চ? সরি, সিক্রেট আউট করা যাবে না। প্যাকেটের নাইলন দড়ির ব্যাখ্যাটা আমার মুখেই শুনে নিন। খুনি ওই দড়ি গলায় পেঁচিয়ে ঘাড় পর্যন্ত ভেঙে দেয়—ওস্তাদ কারিগর। দড়িটা সঙ্গে এনেছিল সেই কারণেই। চললাম।'

বলে, মিঠে হেসে, লম্বা-লম্বা পা ফেলে, ঘর থেকে বেরিয়ে গেল চন্দ্রকান্ত মল্লিক।

পুলিশের দপ্তর থেকে খবর নিয়ে নটা নাগাদ অকুস্থলে পৌঁছে গেল ইন্দ্রনাথ। রেসকোর্সের ধারে, ফ্ল্যাটবাড়ির তিনতলার লণ্ডভণ্ড ঘর, শুয়ে আছে মেয়েটা। বয়স তিরিশের মধ্যে। ফরসা, সুন্দরী, সুসজ্জিতা। প্রসাধনের পুরু প্রলেপ ভেদ করে ফুটে বেরুচ্ছে ভয়াবহ আতঙ্ক। পরপর দুবার ছোরা মারা হয়েছে বুকে। গোলাপী সালোয়ার কামিজ রক্তে ভিজে গায়ে লেপটে রয়েছে। ওড়নার বদলে লাল সিল্কের স্কার্ফ ব্যবহার করে মেয়েটি। কাঁচি দিয়ে কাটা আধখানা স্কার্ফ চেপে রয়েছে শক্ত মুঠোর মধ্যে।

গলায় কিন্তু নাইলন দড়ির ফাঁস লাগানো হয়নি। সাদা কোনও দাগ নেই, পুলিশ ডাক্তার বললেন, 'স্কার্ফ পেঁচিয়ে আগে দমবন্ধ করা হয়েছে—ছোরা মারা হয়েছে তার পরে।'

তদন্তকারী অফিসার বীরেন শাসমলকে ইন্দ্রনাথ বললে, 'খুনিকে ধরে দেব আজ রাতেই। কিন্তু আমার একটা কথা রাখতে হবে।'

'বলুন?'

'কাগজের এই প্যাকেটটা ততক্ষণ কাছে রাখব। ফেরত দেব খুনির সামনে।'

ধূর্ত চোখে সন্দেহ বিছিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে রাজি হলেন আই. ও.।

তখন বাজে এগারোটা। বারোটা নাগাদ গঙ্গার ধারে এক নামী কুরিয়ার-এর অফিসে দেখা গেল ইন্দ্রনাথকে। ম্যানেজারের চেম্বারে বসে বললে, 'রেসের এই সান্ধ-দৈনিক কোন কোম্পানি পৌঁছে দেয় বাড়ি-বাড়ি?'

ম্যানেজার খুব চৌকস ছোকরা। নামেই মাদ্রাজি—বাংলা বলে যে-কোনও বাঙালির চাইতে ভালো। প্যাকেটের কাগজ দেখেই বললে, 'আপনাকে বেশি ঘুরতে হবে না। এ-কাগজ আমরাই ঘরে-ঘরে পৌঁছে দিই—আমাদের এলাকায়।'

'গত সন্ধ্যায় যাদের ঘরে পৌঁছে দিয়েছিলেন, তাদের নাম-ঠিকানা দেবেন?'

'নিশ্চয়।'

আটজনের নাম-ঠিকানা নিয়ে বেরিয়ে গেল ইন্দ্রনাথ। সবই আলিপুর, খিদিরপুর, রেসকোর্স অঞ্চলে। ট্যাক্সি নিয়ে চতুর্থ ঠিকানায় পৌঁছে দেখল, সেটাও ফ্ল্যাটবাড়ি। খিদিরপুর অঞ্চলে। কেয়ারটেকার বললে, 'আশু দাস? কাল রাত আটটায় কাগজ ডেলিভারি হয়েছে—নটায় আমার কাছ থেকে নিয়ে বেরিয়ে গেছিলেন, ফিরেছেন রাত বারোটা নাগাদ।'

'ফ্ল্যাটে আছেন এখন?'

'খেতে বেরিয়েছেন। একা মানুষ তো—ব্যাচেলর। ফিরবেন এখুনি।'

'তাহলে বসে যাই,' বলে কেয়ারটেকারের টেবিলের সামনের চেয়ারে বসে পড়ল ইন্দ্রনাথ।

আধঘণ্টাও গেল না। বটলগ্রীন কালারের একটা মারুতি ঢুকল উঠোনে। গাড়ি থেকে নামল ব্লু-জিনস-এর প্যান্ট আর ইট রঙের ডবল-পকেট শার্ট পরা এক কৃশকায় পুরুষ। টকটকে ফরসা, হিলহিলে শরীর এবং বিলক্ষণ সুদর্শন। যদিও বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে। সরু গোঁফের দু-চারটে সাদা চুলে তার আভাস রয়েছে।

একহাতে একটা ছড়ি নিয়ে সে দরজার সামনে এগিয়ে আসতেই কেয়ারটেকার বললে, 'আসছেন।'

ভেতরে ঢুকতেই উঠে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ। ধুতি-পাঞ্জাবি পরা হিরো-হিরো চেহারার এক মানুষ তারই দিকে চেয়ে আছে দেখে প্রথমে থমকে দাঁড়াল আশু দাস। চোখে হিম চাহনি।

পরের মুহূর্তেই ঝট করে সরে গিয়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল পাশের দরজায়। ডানহাতে ছড়িটা সামনে বাড়িয়ে ধরে বাঁ-হাত চালান করলে পেছনে—খুঁজছে দরজার হাতল।

ইন্দ্রনাথ প্রথমে তাই ভেবেছিল। দরজার হাতল ঘুরিয়ে ভেতরে সটকান দেওয়ার ধান্দায় আছে আশু দাস। তাই ছড়ির ভয় না করে দু-পা সামনে এগোতেই মনে পড়ে গেল নিজেরই কথা—সকালেই বলেছিল চন্দ্রনাথকে।

খুনি ল্যাটা।

নিমেষে একপাশে ছিটকে গেছিল বলেই পর-পর দুটো বুলেটের কোনওটাই গায়ে লাগেনি। হিপ পকেট থেকে এত দ্রুত রিভলভার বের করার দৃশ্য কেবল সিনেমাতেই দেখা যায়।

তৃতীয়বার ট্রিগার টেপবার সময় দেয়নি ইন্দ্রনাথ।

আধঘণ্টার মধ্যে এসে গেলেন আই. ও. বীরেন শাসমল। ইন্দ্রনাথের রামরদ্দা খেয়ে বেহুঁশ আশু দাসকে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে গেলেন তারই ফ্ল্যাটে। টু-রুম ফ্ল্যাট। খাটের ওপরেই পাওয়া গেল নীল নাইলন দড়ির একটা গোলা। প্যাকেটের দড়ি যে এই গোলা থেকেই কেটে নেওয়া হয়েছে, তা কাটা প্রান্ত দুটো মেলাতেই পরিষ্কার হয়ে গেল।

ইন্দ্র বললে, 'আশু দাস, আপনার জ্ঞান এখন টনটনে। পম্পাকে যে আপনিই খুন করেছেন, সে প্রমাণ আমাদের হাতে। কিন্তু, দড়ির ফাঁস না লাগিয়ে স্কার্ফ দিয়ে দমবন্ধ করলেন কেন?'

হিমচোখে ইন্দ্রনাথকে নিরীক্ষণ করে নিয়ে আশু দাস বললে, 'পম্পার লাভার নাকি?'

'আজ্ঞে না। তবে, আপনার মতোই ব্যাচেলর—কিন্তু চরিত্র খোয়াইনি। পম্পা সান্যাল তো বেলি ড্যান্সার। হোটেলে-হোটেলে নাচ দেখাত। লাকি নীলকান্তমণির খোঁজে পেছনে লেগেছিলেন? রিয়্যাল লাভ নয়? ছি!'

'পাওয়া গেছে নীলকান্ত?'

'গেছে,' ছোট্ট হাসল ইন্দ্রনাথ, 'এখুনি দেখবেন।'

'ঘরেই ছিল?'

'ছিল। আপনার চোখের সামনেই—আপনার হাতের মুঠোয়।'

'আমার হাতের মুঠোয়?'

'আমার প্রথম প্রশ্নের জবাব কিন্তু এখনও পাইনি। সঙ্গে নাইলন দড়ি নিয়ে গেছিলেন গলায় ফাঁস লাগাবেন বলে। কিন্তু দড়ি রইল পড়ে—প্যাঁচ দিলেন স্কার্ফ দিয়ে। কেন?'

আশু দাস নিরুত্তর।

জবাবটা দিল ইন্দ্রনাথই, 'স্কার্ফের ঝুমকোর গিঁট খুললেই নীলকান্তমণি পাবেন বলে। তাই না?'

'আমাকে তো তাই বলল।'

'হাতও চালালেন সঙ্গে-সঙ্গে। স্কার্ফ দিয়েই খতম। গিঁট খুললেন—দেখলেন 'মাউন্ট মেরি'র লকেট। ঘর তছনছ করলেন। কিচ্ছু না পেয়ে খুনের সব প্রমাণ গুছিয়ে নিলেন প্যাকেটে। এই সেই প্যাকেট। এর মধ্যে রাখলেন মোমবাতি স্ট্যান্ড। এই সেই স্ট্যান্ড। জমাট মোম খোঁদল থেকে কেন বের করলেন না আশু দাস?'

বলে, খোঁদলের মোম খুঁচিয়ে বের করল ইন্দ্রনাথ।

দেখা গেল, নীল সূর্যের মতোন জ্বলন্ত সেই পাথর...নীলকান্ত মণি।

'নবকল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশিত। (শারদীয় সংখ্যা, ১৪০২)

মই

রবিনবাবুর বয়স ষাটের অধিক। খুব ফরসা। ঢ্যাঙা। খাড়াই নাক। চওড়া কপাল। চোখ দুটি কিন্তু এখনও উজ্জ্বল। মাথার সব চুল পেকে সাদা হয়ে গিয়েছে। নাকের নিচে দুপাশে পাকানো একজোড়া গোঁফ আছে—সাদা। এমনকি ভুরুর চুল পর্যন্ত সাদা। পরনে গিলেহাতা আদ্দির পাঞ্জাবি এবং পায়জামা। হাতে রুপো বাঁধানো ছড়ি। রবিনবাবু একা আসেননি। গিন্নিকে এনেছেন। রবিনবাবুর তুলনায় তিনি অল্পবয়স্কা। সিঁদুর দিতে-দিতে মাথার দিকের চুল প্রায় উঠে গিয়েছে। ইনিও খুব ফরসা। সাদাপেড়ে সাদা সিল্কের শাড়ি দিয়ে সর্বাঙ্গ মুড়ে বস্তার মতো বসে আছেন। স্থূলাঙ্গী। সে তুলনায় রবিনবাবু বেশ ছিপছিপে।

ছড়ির রূপো-হাতলে হাত বুলোতে-বুলোতে রবিনবাবু বললেন, 'ইন্দ্রনাথবাবু, এই হল ব্যাপার। জানলার নিচে শুধু মইটা পাওয়া গিয়েছে।'

গালের ব্রন খুঁটতে-খুঁটতে ইন্দ্রনাথ বললে, 'কীসের মই?'

'কাঠের।'

'আঙুলের ছাপ?'

'একদম নেই।'

'সেইসঙ্গে খোকাও নেই,' পাশ থেকে ডুকরে কেঁদে-ওঠা স্বরে বললেন রবিনবাবুর গিন্নি। ইন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'চলুন দেখে আসি।'

রাসবিহারী এভিন্যুর ওপরে বাগানওলা বাড়ি যে কজনের আছে, নি:সন্দেহে তারা বিত্তবান। রবিনবাবুও এই মুষ্টিমেয়দের মধ্যে পড়েন। চা-বাগান আছে, কয়লার খনি আছে। সুতরাং লক্ষ্মীর পায়ে শেকল পরিয়ে রেখেছেন সিন্দুকের মধ্যে। দোতলার বিরাট চওড়া বারান্দায় দাঁড়ালে বড় রাস্তা দেখা যায় আউট হাউসের মধ্যবর্তী গেটের মধ্যে দিয়ে! আউট হাউসে এইমাত্র ঘুরে এসেছে ইন্দ্রনাথ। জিজ্ঞাসাবাদ করে নতুন কিছু জানা যায়নি। এস্টেটের কর্মচারী, দারোয়ান, চাকর সে রাতে ঘর ছেড়ে বেরোয়নি তুমুল বৃষ্টির জন্যে। তাই দেখেনি কাউকে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে হেঁট হয়ে মইটার দিকে তাকিয়েছিল ইন্দ্রনাথ। পুলিশ বিশেষজ্ঞরা ওই মই খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছেন। কিন্তু কিডন্যাপার অতিশয় ধুরন্ধর। আঙুলের ছাপ রেখে যায়নি, কোথাও কোনও সূত্র ফেলে যায়নি। শুধু ওই মইটা ছাড়া।

বারান্দার রেলিংয়ে ভর দিয়ে হেঁট হয়ে মই নিরীক্ষণ করতে-করতে ইন্দ্রনাথ বললে, 'মৃগ, এরকম মই তো ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে বিস্তর পাওয়া যায়, তাই না?'

'হ্যাঁ। ঘরাঞ্চি ঠিক নয়, বাঁশের মইও নয়। প্যাকিং কাঠ কেটে তৈরি।'

মইয়ের ওপরের ধাপটা ঈষৎ চওড়া। অন্যান্য ধাপের মতো সরু নয়। কাঠটাও অন্যরকম। সাদাটে। গোটা মইটা কিন্তু নীলচে কাঠের তৈরি।

ইন্দ্রনাথ চেয়েছিল ওই ওপরের ধাপের দিকেই।

চেয়ে থাকতে থাকতেই বললে মৃদু কণ্ঠে, 'মৃগ, ধাপটার গায়ে কতকগুলো ফুটো রয়েছে।'

'পেরেকের ফুটো', বললাম আমি। 'প্যাকিং কেস ভাঙা কাঠে অমন থাকে।'

'ফুটোর মধ্যে মরচে নেই।'

'তার মানে বাক্সটা রোদে জলে বেশিদিন থাকেনি,' বললাম আমি।

'কাঠটার রং এদেশি কাঠের মতো নয়।'

'কারণ ওটা বিদেশি কাঠ। বিলিতি পাইন। কাঠের শুঁয়ো দেখছিস না কত মিহি। রঙটাও সাদা। সাহেবদের দেশের কাঠ তো।'

'সদ্য কেনা মই। কিডন্যাপিংয়ের জন্যেই যদি কেনা হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয় ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের দোকান থেকে কেনা?'

'তার কোনও মানে নেই,' বললাম আমি। 'কিডন্যাপার যদি বালিগঞ্জ অঞ্চলের মানুষ হয়, তাহলে এপাড়া থেকেই কিনতে পারে।'

'এদিকে এরকম দোকান আছে?'

'আছে। কলকাতার অন্যান্য অঞ্চলেও আছে। নিউমার্কেটের পেছনে ওদের বড় ঘাঁটি।'

আর কোনও কথা বলল না ইন্দ্রনাথ। প্রখর হল চক্ষু। হাত বাড়িয়ে মইটা টেনে আনল বারান্দার ওপর।

'কী দেখছিস?' শুধোই আমি।

নিরুত্তরে ওপর ধাপটার দিকে চেয়ে রইল ইন্দ্রনাথ। অনেকক্ষণ পরে সঙ্কুচিত চোখে বললে আস্তে-আস্তে, 'কাঠটা যাঁদা দিয়ে চাঁচা হয়েছে দেখছি।'

'তা তো হবেই,' দুই ভুরু কাছাকাছি এনে বন্ধুবরের দৃষ্টিরেখা অনুসরণ করলাম, ঠিক ঠাহর করতে পারলাম না যাঁদা দিয়ে কাঠ চাঁচা নিয়ে মন্তব্য করা হল কেন।

ইন্দ্র বললে, 'যাঁদা জোরে চাপার দরুন মাঝে-মাঝে কাঠের গায়ে বসে গিয়ে আটকে গিয়েছে। যেখানে-যেখানে এইভাবে আটকেছে, সেই-সেই জায়গায় তাকালেই বুঝবি, যাঁদাটা ভাঙা।'

'যাঁদা ভাঙা!'

'হ্যাঁ, ফলাটার মাঝখানে সামান্য ভাঙা ফাঁক আছে। সেই ফাঁকা জায়গায় কাঠ কাটেনি—উঁচু হয়ে রয়েছে।'

'ভারি আবিষ্কার করলি!' বললাম তাচ্ছিল্যের সুরে, 'তোর আগেই ফোরেনসিক এক্সপার্টরা ও জিনিস দেখেছে। তাঁরা নিশ্চয় ঘাস কাটেন না।'

'না, না, ঘাস কাটবেন কেন।—এমনি বললাম। নন্দনের হদিশ কি আর ওই ভাঙা যাঁদা থেকে বেরোবে। —তাই মাথা ঘামাননি।'

কান্নাজড়ানো কণ্ঠস্বর শুনলাম পেছনে, 'ইন্দ্রনাথবাবু, তাহলে কি খোকাকে পাওয়া যাবে না?'

রবিনবাবুর স্ত্রী। নন্দনের গর্ভধারিণী। নি:শব্দে এসে দাঁড়িয়েছিল পেছনে।

ইন্দ্রনাথ বললে, 'দেখুন আমার যথাসাধ্য আমি করব। —তার আগে বাড়ির সবাইকে দেখতে চাই।'

'কুন্দনকে ডাকব?'

'ডাকুন।'

আয়নার মতো চকচকে মার্বেল মেঝের ওপর শুভ্র নগ্ন পা ফেলে একজন সুদর্শন তরুণ এসে দাঁড়াল সামনে। বয়স কুড়ি-বাইশের বেশি নয়। সুকুমার মুখশ্রী। গড়ুর নাসিকা। সুদীর্ঘ চোখ। কৃষ্ণকালো মণিকায় সুগভীর ব্যঞ্জনা। দীর্ঘদেহী কন্দর্পকান্তি এই তরুণ যে শিল্পচেতনায় উদ্বুদ্ধ তার প্রমাণ ওই চোখে। বেশভূষা সাদাসিধে। খদ্দরের ঢিলেহাতা পাঞ্জাবি আর ধুতি। এই হল রবিনবাবুর প্রথমপক্ষের সন্তান। মাত্র এক বছরের শিশুকে আয়ার হাতে সঁপে দিয়ে তিনি ধরাধাম ত্যাগ করেছিলেন কর্কট রোগের আক্রমণে।

অপরিসীম মাতৃস্নেহ দিয়ে শিশু কুন্দনকে কৈশোরের সিংহদ্বারে নিয়ে এসেছিলেন এই আয়া। নাম সুচরিতা। কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করেছিলেন রবিনবাবু আয়াকে স্ত্রীর আসনে অভিষিক্ত করে। কুন্দনের বয়স তখন পনেরো। নন্দন এল বছর ঘুরতেই। সমান স্নেহ দিয়ে নন্দন আর কুন্দনকে সিঞ্চিত করে চললেন সুচরিতা। গর্ভধারিনী নন বলেই বরং কুন্দনের প্রতি তাঁর স্নেহ বর্ষিত হল একটু অধিক পরিমাণেই।

পাঁচ বছরের সেই নন্দনই দুদিন আগে নিখোঁজ হয়েছে। তার মায়ের ঘর থেকে। মই বেয়ে দোতলার বারান্দায় উঠেছে কিডন্যাপার। সুচরিতাকে ক্লোরোফর্ম দিয়ে ঘুম পাড়িয়েছে। নন্দনকে নিয়ে অদৃশ্য হয়েছে বৃষ্টিঝরা অমানিশায়।

রেখে গিয়েছে শুধু একটি চিঠি। কয়েক লাইনের বাংলা চিঠি। তাতে লেখা :

'অ্যানথ্রপলজিস্ট স্যার ফ্রান্সিস গ্যালটন ফিংগ্রারপ্রিন্টের প্রথম পরীক্ষা চালিয়েছিলেন ভারতবর্ষে। ড্যাকটিলোগ্রাফি আজকে একটা মস্ত বিজ্ঞান। কিন্তু ওপথে আমাদের ধরা যাবে না। আঙুলের ছাপ রইল না কোথাও। নন্দনকে ফিরিয়ে দেব শুধু টাকার বিনিময়ে। দশ লাখ কি খুব বেশি হল? কালো টাকার পাহাড় জমিয়েছেন মনে নেই?

বৈভব যদি অধিক প্রিয় হয়, নন্দনের লাশ ফেরত দিয়ে যাব। আর যদি তা না চান তো বাগানের রাধাচূড়ায় একটা সাদা কাপড় ঝুলিয়ে রাখবেন সামনের পূর্ণিমায়। টাকা সংগ্রহ করব পরে। আমরা বিজ্ঞান-জানা তরুণ দল। গোয়েন্দাও বটে। থানা পুলিশ করলে টের পাব পাঁচ মিনিটের মধ্যেই। লাশ পাবেন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে।'

ইন্দ্রনাথ তাই প্রথমে জিগ্যেস করেছিল, 'এই চিঠি পাওয়ার পরেও থানা পুলিশ করলেন? আপনার সাহস তো কম নয়?'

রবিনবাবু শুকনো হেসে বলেছিলেন, 'প্রশংসাটা সুচরিতার প্রাপ্য। আমার চেয়ে ওর মনের জোর বেশি।—এই দেখুন না, পুলিশ প্রকারান্তরে আমাকে দশ লাখ টাকা দিতে বলায় সুচরিতাই টেনে এনেছে আপনার কাছে।'

সেই সুচরিতা আর কুন্দন দাঁড়িয়ে আমাদের সামনে। ধাত্রীজননীর গা-ঘেঁষে এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে কুন্দন, যেন মহীরুহের পাশে লতাটি।

চোখ মুছে সুচরিতা বললেন, 'এই আমার বড় ছেলে কুন্দন। বড় ভালো ছেলে। স্কুলে কখনও সেকেন্ড হয়নি। এখন ঢুকেছে আর্ট কলেজে।'

ইন্দ্রনাথ শুধু বললে, 'দেখেই বুঝেছিলাম।'

কুন্দন মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল। ছেলেটি প্রকৃত শিল্পী। অন্তর্জগত নিয়েই তন্ময়।

সুচরিতা গর্বিত সুরে বললেন, 'ওর স্টুডিও দেখলে আপনার তাক লেগে যাবে। একাই একশো। কখনও কুমোর, কখনও পটুয়া, কখনও ছুতোর। সবরকম হাতের কাজের ব্যবস্থা আছে একতলায়।'

'একতলায়?'

'হ্যাঁ, ওইখানেই ওর স্টুডিও। ছেলের আমার বন্ধু টন্ধু তেমন নেই। দিন রাত ওই স্টুডিওতেই মাটি ডলছে নয় তো তুলি চালাচ্ছে, অথবা যাঁদা ঘষছে।'

যাঁদা শব্দটা শুনেই আপনা হতে আমার চোখ নেমে এল পায়ের কাছে রাখা মইয়ের দিকে।

ইন্দ্রনাথ হেসে বললে, 'তা হলে তো স্টুডিওটা একবার দেখে আসতে হয়।

মৃদু আপত্তির সুরে কুন্দন বললে, 'বড় নোংরা সেখানে—।'

'হোক। তবুও স্টুডিও তো।—তোমার আপত্তি না থাকলে—'

'না, না, আপত্তি কীসের! আসুন।'

নিখোঁজ নন্দনের তদন্তে এসে শিল্পী কুন্দনের শিল্পপ্রতিভা নিয়ে ইন্দ্রনাথের হঠাৎ আগ্রহ আমাকে বিস্মিত করেনি। যাঁদা শব্দটি ওর মনেও সাড়া ফেলেছে নিশ্চয়।

একতলায় পশ্চিমদিকের একটি বড় ঘর। জানালার পাশেই রাধাচূড়া। ঘরের এক দেওয়ালে আলমারি ঠাসা বই। টেবিলের ওপর হ্যান্ডব্যাগের খোপে কমপ্লিট ডু-ইট-ইওরসেলফ ম্যানুয়েল। আর একদিকের দেওয়ালে থরে-থরে সাজানো বিভিন্ন সাইজের তুলি, রঙের শিশি, ছুতোরের যন্ত্রপাতি। আরেক দেওয়ালের গায়ে কাঠ আর মাটির স্তূপ। ঘরের মাঝখানে ইজেল আর কুমোরের চাকা, ছুতোরের বেঞ্চি, আর একটা অর্ধসমাপ্ত মৃণ্ময় মূর্তি।

বিমুগ্ধ বিস্ময়ে চতুর্দিকে চোখ বুলিয়ে বললে ইন্দ্রনাথ, 'বা:! কুন্দনের দেখছি বহুমুখী প্রতিভা।'

পুত্রগর্বে গর্বিতা সুচরিতা বলে উঠলেন, 'কাঠের চেয়ারবেঞ্চি আর মাটির মূর্তি বানিয়ে ও কী করে জানেন?'

'কী?'

'বিক্রি করে। সেই টাকা অন্ধদের স্কুলে দান করে।'

এবার আমিও বিস্মিত হলাম। এ যে দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। বাপ কালো টাকার হিমালয় রচনা করেছেন—ছেলে প্রায়শ্চিত্ত করছে নিজের গতর দিয়ে।

কুন্দন মাথা হেঁট করে বললে, 'মা তুমি থামো।'

সস্নেহে কুন্দনকে ধমকে উঠলেন সুচরিতা, 'তুই থাম।'

স্মিতমুখে মা ছেলের কথা শুনতে-শুনতে যন্ত্রপাতির তাকের কাছে গিয়ে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ। আমার চোখ নিমেষে অনুসরণ করল ওকে। সর্বাগ্রে একটি র‍্যাঁদা তুলে নিয়ে উলটেপালটে দেখল ইন্দ্রনাথ। সব শেষের র‍্যাঁদাটির ফলার পানে অনিমেষে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর গেল বিপরীত দিকের দেওয়ালে। সেখানে কাঠের স্তূপ আর মাটির গাদা। শিকারি কুকুর যেমন গন্ধ শুঁকে-শুঁকে খরগোসের কান টেনে বার করে, বন্ধুবরও সন্ধানী চোখে তাকিয়ে কাঠের গাদা থেকে টেনে তুলল এক টুকরো কাঠ। বিলিতি পাইন কাঠ। কাঠটার গায়ে কতকগুলো পেরেকের ফুটো। ফুটোগুলো যে প্যাটার্নে রয়েছে, সেই একই প্যাটার্নে পেরেকের ফুটো একটু আগেই আমি দেখে এসেছি দোতলায় রাখা কাঠের মইতে। ওপরের ধাপের কাঠটা কেটে নেওয়া হয়েছে এই কাঠ থেকেই।

চোখ তুলল ইন্দ্রনাথ। ধীরে-ধীরে পাথরের মতো কঠিন হয়ে গেল মুখ। বললে মৃদু কঠিন কণ্ঠে, 'ছি: কুন্দন! সম্পত্তির লোভটাই বড় হল!—কোথায় রেখেছ নন্দনকে?'

কুন্দন যে 'গুডি' টাইপের গুড বয় নয়, তার প্রমাণ পেলাম পরক্ষণেই। আস্ত একটা ভিজে বেড়াল। এতক্ষণ মাথা হেঁট করে থাকা শান্ত মানুষটাই নিমেষে যেন জ্বলে উঠল। ইন্দ্রনাথের মৃদু কঠিন কণ্ঠের তীব্র শ্লেষ যেন সেই, দেশলাইয়ের আগুন। ছুঁয়ে গেল বারুদের স্তূপ। ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মতো টান-টান চেহারায় কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পরেই ঘৃণাকুটিল কণ্ঠে শুধু বললে, 'আপনি... আপনি।'

বলেই লাফ দিয়ে গিয়ে পড়ল যন্ত্রপাতির দেওয়ালের সামনে, খপ করে তুলে নিল একটা তুরপুন এবং ছোরার মতো উঁচিয়ে তেড়ে এল ইন্দ্রনাথের পানে।

চকিতের মধ্যে শক্ত হয়ে গেল ইন্দ্রনাথের দেহ। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে কুন্দনকে জাপটে ধরলেন সুচরিতা। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে বললেন, 'কুন্দন! কুন্দন!'

'মা!' হাঁফাচ্ছে কুন্দন, 'তুমি ছাড়ো—'

'কুন্দন! শেষে তুই!'

'মা!'

'কুন্দন!' বলতে-বলতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন সুচরিতা।

পাথর হয়ে গেল কুন্দন। শিথিল হাত থেকে খসে পড়ল তুরপুন।

'মা...আমি....আমি!'

নি:শব্দে কাঁদতে লাগলেন সুচরিতা।

ঝড়ের মতো ছুটে বেরিয়ে গেল কুন্দন। যাওয়ার সময়ে বিষদৃষ্টি হেনে গেল ইন্দ্রনাথের পানে।

চোখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদতে লাগলেন সুচরিতা।

কাছে গিয়ে নিবিড় কণ্ঠে বললে ইন্দ্রনাথ, 'রবিনবাবু উইল করে ফেলেছেন নিশ্চয়?'

ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন সুচরিতা।

'কাকে কত দিয়েছেন?'

অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে বললেন সুচরিতা, 'দশ আনা ছ'আনা। মা নেই বলে দশ আনা কুন্দনকে। তাতেও ও খুশি নয়। ছ'আনার লোভে ছোট ভাইকে—'বলতে-বলতে চোখ থেকে আঁচল নামিয়ে বললেন, 'খোকাকে পাব তো?'

'নিশ্চয় পাবেন। আপনিই তাকে ফিরিয়ে আনবেন।'

'আমি! আমি কী করে জানব—!'

'জানেন বইকি সুচরিতা দেবী,' অদ্ভুত স্বরে বললে ইন্দ্রনাথ।

'কী বলছেন—!'

স্ক্রু-প্যাঁচালো চোখে চেয়ে রইল ইন্দ্রনাথ। তারপর খপ করে ছুতোরের টেবিল থেকে পেনসিল তুলে নিয়ে খস-খস করে লিখল সাদা দেওয়ালে...

দু-টুকরো স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠল সুচরিতার গোলগাল ফরসা মুখের অক্ষিগহ্বরে।

ইন্দ্রনাথ কী লিখল দেওয়ালে?

মাতৃস্নেহের চরম পরীক্ষা এসেছিল ধাত্রী জননীর জীবনে—উইল লেখবার সময়ে। নাড়ী ছেঁড়া ধনকে সব পাইয়ে দেওয়ার অভিলাষে ছোট্ট একটি চক্রান্ত করেছিলেন সুচরিতা। রবিনবাবুর মন যাতে প্রথম পুত্রের ওপর বিষিয়ে যায়, তাই লোক লাগিয়ে নন্দনকে কিডন্যাপ করিয়েছিলেন কিছুদিনের জন্যে। ক্লোরোফর্মে বেহুঁশ হয়ে শুয়েছিলেন নিজে-নিজে। ভাড়াটে কিডন্যাপার আঙুলের ছাপ কোথাও রাখেনি—কিন্তু মইটি রেখে গিয়েছে। মই মেরামতের টুকরো কাঠটিও রেখে দেওয়া হয়েছিল কুন্দনের স্টুডিওতে—ওরই র্যাঁদা দিয়ে চাঁচা হয়েছিল মইয়ের কাঠ। স্বামীকে সুচরিতাই জোর করে পাঠিয়েছিলেন থানায়। থানা আমোল না দেওয়ায় ইন্দ্রনাথের কাছে। সূত্র প্রমাণগুলো রহস্যসন্ধানীর চোখে ধরা পড়লেই ভাড়াটে কিডন্যাপারকে দিয়ে ফিরিয়ে আনত নন্দনকে।

কিন্তু ইন্দ্রনাথের খটকা লাগল ছেলের লাশ দেখবার ঝুঁকি নিয়েও থানা পুলিশ ডিটেকটিভদের শরণাপন্ন হওয়ার আগ্রহ দেখে। আগ্রহটা একা সুচরিতারই। মায়ের জাত তো এরকম হয় না!

তাই দেওয়ালে লিখল ইন্দ্রনাথ—'পেটের বাচ্চা আর সতীন কাঁটা কখনও সমান হয়?'

** 'দক্ষিণী বার্তা' পত্রিকায় প্রকাশিত। (শারদীয় সংখ্যা, ১৯৭৭)*

ব্ল্যাকমেল

‘বলুন, আমি ইন্দ্রনাথ রুদ্র বলছি।'

'নমস্কার। আমার নামটা টেলিফোনে বলতে চাই না। কিন্তু দেখলেই চিনবেন।'

'দেখা করতে চান?'

'হ্যাঁ। আজ রাত দশটায়। যখন আপনি একা থাকবেন। বিষয়টা অত্যন্ত গোপনীয়। আমার কেস যদি টেক-আপ না-ও করেন, আপনি ছাড়া কেউ আর তা জানবে না—এই শর্তে যদি রাজি থাকেন, তাহলে আসব।'

'আসুন।'

'আমি নিজে গাড়ি ড্রাইভ করে যাব। সাদা অ্যামবাসাডর। সব কাচ তোলা থাকবে। আপনি কাইন্ডলি গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবেন। আশপাশে যখন কেউ থাকবে না, আমি গাড়ি থেকে নেমে আপনার বাড়ি ঢুকব।'

'তাই হবে।'

'লাস্ট রিকোয়েস্ট। অফেন্ডেড হবেন না। আপনার প্রফেশনাল ইথিকস-এর ওপর আমার বিশ্বাস আছে বলেই আপনার শরণাপন্ন হচ্ছি।'

'বুঝেছি। ঘরে টেপ রেকর্ডার জাতীয় কোনও 'বাগিং ডিভাইস' যেন না থাকে—এই তো?'

অস্ফুট হাসি ভেসে এল তারের মধ্যে দিয়ে। তারপরেই রিসিভার নামিয়ে রাখার আওয়াজ।

রাত ঠিক দশটায় সাদা অ্যামবাসাডর ব্রেক কষল সুভাষ সরোবরের পাশে একতলা বাড়ির সামনে। গাড়ির সব কাচ তোলা। ধোঁয়াটে ফিল্ম লাগানো বলে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে না চালককে।

ইন্দ্রনাথ ডাইনে-বাঁয়ে দেখে নিল। কেউ নেই। এ সময়ে সুভাষ সরোবর বলতে গেলে ফাঁকাই থাকে। এগিয়ে গেল গাড়ির দরজার সামনে।

খুলে গেল দরজা। সাদা ধুতি পাঞ্জাবি পরা মধ্যবয়স্ক নাতিদীর্ঘ ভদ্রলোক নেমে এসেই ইন্দ্রনাথের পাশ দিয়ে গেট পেরিয়ে দাওয়ায় উঠে, ঢুকে গেলেন ঘরের মধ্যে।

গেট বন্ধ করে দিয়ে ইন্দ্রনাথ ঢুকল তারপর। দরজা বন্ধ করে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল রাতের অতিথির দিকে।

মাথার ওপর ইলেকট্রিক বাল্ব জ্বলছে। ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন ঠিক তার নিচে। মাথায় বড় জোর পাঁচ ফুট। না-রোগা না-মোটা। বয়স পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্নর মধ্যে। সে অনুপাতে মাথার চুল বেশ পেকেছে। কপালের ওপর থেকে চুল উঠে গেছে। উঁচু চওড়া কপাল আরও চওড়া হয়েছে। বাঁদিকে সিঁথি। বেশি পেকেছে জুলপির চুল এবং অস্বাভাবিকভাবে চোয়ালের হাড় চাপা দিয়ে ঝুলছে ঘাড় পর্যন্ত। দাড়িগোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো। ভুরুর লম্বা-লম্বা চুল কখনও উঁচিয়ে রয়েছে, কখনও ঝুলে পড়েছে। নাক সিধে আর শক্ত। ঠোঁট চাপা আর কঠিন। লম্বা জুলপির আড়ালে চোয়ালের হাড়ও যে বিলক্ষণ কঠোর, তা আন্দাজ করে নেওয়া যায় গ্র্যানাইট মুখাবয়ব আর প্রদীপ্ত চোখ দেখলে। এঁর এই চোখ আর এই জুলপি কার্টুনিস্টদের কাজ অনেক সহজ করে দিয়েছে। ছোটখাট মানুষটার শক্ত ধাতকে ফুটিয়ে তুলতে বেগ পেতে হয় না। পার্লামেন্টে অথবা জনসভায় ইনি যখন উঠে দাঁড়ান—থমথমে নৈ:শব্দ্য নেমে আসে চারপাশে। এমনই এঁর ব্যক্তিত্ব আর বাগ্মিতা। প্রজ্ঞা আর পাণ্ডিত্য।

কিংবদন্তিসম সেই সম্মোহনী চাহনি ইন্দ্রনাথের ওপর নিবদ্ধ, রেশমমসৃণ কণ্ঠস্বরে তিনি বললেন, 'ইন্দ্রনাথবাবু, আমি যে বিপদে পড়েছি, তার সমাধান আমার ব্ল্যাককোট কমান্ডোরা করতে পারবে না। কারণ

আমাকে ব্ল্যাকমেল করছে একটি মেয়ে—যাকে নিয়ে এক সময়ে আমি মাতামাতি করেছিলাম—একটু বেশিমাত্রায় করেছিলাম—বুঝতেই পারছেন কী বলতে চাইছি—এর বেশি বলা সমীচীন নয়—আজ আমি নিষ্কলঙ্ক চরিত্র বলেই ইন্ডিয়ার হাল ধরতে পেরেছি—আমার ইন্টারন্যাশনাল ইমেজ অতিশয় উজ্জ্বল—গোটা ইন্ডিয়ার ফিউচার নির্ভর করছে আমার নীতি নির্ধারণের ওপর। কিন্তু এই মেয়েটি যদি তার স্মৃতিচারণ ছেপে বের করে দেয়, তাহলে সবাই জানবে, আমার ভেতরেও দুর্নীতি আছে, আমি চরিত্রহীন, দেশের ভার আমার হাতে রেখে দেওয়া নিরাপদ নয়। আমি তো ডুববই, নেক্সট ইলেকশনে আমার পার্টিও মুছে যেতে পারে।'

ইন্দ্রনাথ বললে, 'বসুন।'

পাশাপাশি বসল দুজনে। একই সোফায়।

ভদ্রলোক বললেন, 'আমি ডিকেটটিভ গল্প পড়তে ভালোবাসি ছেলেবেলা থেকেই। আপনার কাহিনি অনেক পড়েছি। অনেক উঁচুতে উঠে গেছি বলে, আর দরকার হয়নি বলে, আপনার সঙ্গে আলাপ হয়নি। আজ আমি হাতে অনেক সময় নিয়ে এসেছি—কাল ভোরের ফ্লাইটে দিল্লি ফিরে যাব। দরকার হলে সারারাত আপনার সঙ্গে গল্প করব। তাতে আমার টেনশন কাটবে।' টেনশনের শিখরে যাঁরা বসে থাকেন, টেনশন তাঁদের চোখেমুখে প্রকাশ পায় না। কণ্ঠস্বরে তো নয়ই। কণ্ঠস্বরে তো নয়ই। ইন্দ্রনাথ শুধু চেয়ে রইল।

তিনি বললেন, 'কোনান ডয়ালের 'চার্লস অগাস্টাস মিলভারটন' আপনি পড়েছেন, আমিও পড়েছি। ব্ল্যাকমেলার মিলভারটন-এর গল্পটা প্রথম ছেপে বেরয় কোলিয়ার্স ম্যাগাজিনে—১৯০৪ সালে। জানেন? তারিখটা ইন্টারেস্টিং। কেননা, ব্ল্যাকমেলাররা তাদের ক্রাইম অবাধে চালিয়ে গেছে সমাজে—সবই ধামাচাপা পড়েছে। শার্লক হোমস ওয়াটসনকে বলেছিলেন, চিড়িয়াখানার মাপের খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে কিলবিলে, হড়হড়ে, পিচ্ছিল, ক্লেদাক্ত প্রাণীগুলোর কালো মৃত্যুর মতো চকচকে চোখ আর কুটিল, চ্যাপ্টা মুখের দিকে তাকালে তোমার গা শিরশির করে না? আপাদমস্তক রি-রি করে ওঠে না অপরিসীম ঘৃণায়? সারাজীবনে পঞ্চাশজন খুনির সঙ্গে বুদ্ধির পাঞ্জা লড়েছি আমি, কিন্তু ওদের মধ্যে সবচেয়ে বদ লোকটার নাম শুনলেও আমার এতটা ঘৃণা আর বিদ্বেষ জাগে না, যতটা হয়, এই লোকটার নাম শুনলে। ওর ছায়া মাড়াবার প্রবৃত্তিও আমার নেই।—ইন্দ্রনাথবাবু, শার্লক হোমসের কথার প্রতিধ্বনি করে বলতে ইচ্ছে করছে, এই মেয়েটার হাতে লেখা চিঠি দেখলেও আমার গা শিরশির করে ওঠে।'

ইন্দ্র বলে, 'চিঠিতে ব্ল্যাকমেল করছে?'

'হ্যাঁ। এক্সিকিউটিভ বন্ড পেপারের মোটা সাদা খাম দেখলেই আজকাল আমার গা ঘিনঘিন করতে থাকে। বিশেষ করে সেই খামে যখন সবুজ কালি দিয়ে লেখা থাকে আমার নাম—অতিশয় চেনা হাতের লেখা—একটা সময় যখন এই হাতের লেখা দেখবার জন্যে পাগল হয়ে থাকতাম—আর এখন? বুক গুড়-গুড় করে।'

'আপনার?'

হাসলেন ভদ্রলোক। সীমিত হাস্য। যান্ত্রিক হাসিও বলা যায়। মনের হালকা রসকে প্রকাশ করবার এই ক্ষমতা ঈশ্বর দিয়েছেন শুধু মানুষকে। কিন্তু এই মানুষটার সেন্টিমিটার দিয়ে মাপা ক্ষীণ হাসিতে হালকা রস প্রকাশ পেল না—নি:সীম তিক্ততা ছাড়া সেখানে কিছুই নেই।

বললেন, 'আমি অকুতোভয়—সব্বাই তা জানে। কিন্তু আমার মনেও ভয়ের সঞ্চার করতে পেরেছে কন্যাকুমারিকা।'

'তার নাম?'

'হ্যাঁ। ইন্দ্রনাথবাবু, আমার অতীত পাঁচজনকে বলবার মতোন নয়। কামারপুকুরের পাশে বিশ বিঘে জমির মালিক ছিলেন আমার দাদু। ভট্টচাজ্যি বামুন। যজমান ছিল, গরু-লাঙ্গলও ছিল। আমার ছয় পিসি, বাবারা চার ভাই। আমার বাবা সবচেয়ে বড়। তিনি কলকাতার একটা জুটমিলে ক্যান্টিন সুপারভাইজার ছিলেন। দুই ছেলে থাকত তাঁর কাছে—কলকাতায়। আমি আর আমার মেজোভাই থাকতাম দাদু-দিদিমার কাছে। বাবা

মাসে-মাসে টাকা পাঠিয়ে দিতেন। দাদু-দিদিমা তখন খুব ভালোবাসতেন আমাকে। জুটমিল বন্ধ হয়ে যেতেই বাবা আর মা দুই ভাইকে নিয়ে চলে গেলেন দেশে। অত্যাচার শুরু হল আমার ওপর। দশটা গরু দেখতে হবে, যজমানদের দেখতে হবে, বাড়ির ঠাকুরঘরগুলোর দেখাশুনো করতে হবে—তারপর যদি সময় থাকে—স্কুলের পড়াশুনো করতে পারব। তাই করেছিলাম—রাত তিনটেয় উঠে সব কাজ সেরে পড়তে যেতাম। অঙ্ক পরীক্ষার আগে তিনদিন একটু বেশি তৈরি হতে চেয়েছিলাম। ছোটকাকা কোনও কাজ করত না। তাকে বলেছিলাম—এই তিনটে দিন তুমি সামলাও। সে আমাকে যাচ্ছেতাই বলে বেরিয়ে গেল বাজারে আড্ডা মারতে। দাদু আর দিদিমাকে বলতে গেলাম—তেনারা রেগে গেলেন। সব শেষের কথা, কাজ না করলে বাড়ি থেকে বিদেয় হও—পড়াশুনো গোল্লায় যাক।

'ইন্দ্রনাথবাবু, পরের দিন ভোর ছ'টা পাঁচের ট্রেনে কলকাতা রওনা হলাম। শিয়াখালায় টিকিট চাইতেই স্টেশনে নেমে পড়লাম। তখন মনে পড়ল, এখানে একজন কালীসাধক জ্যোতিষী থাকেন। তিনি শুধু মুখ দেখে ভবিষ্যৎ বলে যান। চলে গেলাম তাঁর ডেরায়। তিনি মন্দির থেকে পুজো শেষ করে বেরচ্ছিলেন। চৌকাঠে পা রেখেই আমাকে দেখলেন। দেখেই বললেন, 'যা, যা, তুই অনেক বড় হবি। শিগগিরই একটা মেয়ের পাল্লায় পড়বি—সে তোকে অনেকদূর নিয়ে যাবে।

'সেই মেয়েই এই কন্যাকুমারিকা। জ্যোতিষীর ওখান থেকে শিয়াখালা স্টেশনে চলে এসেছিলাম। আমার দূর-সম্পর্কের এক দাদু দাঁড়িয়েছিলেন—কলকাতায় যাবেন বলে। তিনিই আমাকে নিয়ে এসে ফেললেন এই বেলেঘাটায়। তখন এই অঞ্চলের এত রমরমা ছিল না। সুভাষ সরোবর ছিল না। বাইপাস ছিল না। শুধু ভেড়ি আর জঙ্গল। জোড়ামন্দিরের উলটোদিকে মসজিদের সামনেও এত দোকান ছিল না। ওইখানে একটা রঙের কারখানায় দারোয়ানের কাজ পেলাম। একটা বিরাট বাগানঘেরা পাথরের মূর্তি দিয়ে সাজানো চারতলা বাড়িতে রঙের কাজ চলছিল। তখনকার আমলে চারতলা বাড়ি যাদের থাকত, তারা কত বড়লোক হত বুঝতেই পারছেন। এদের ছিল ভেড়ির কারবার। এই বাড়িতে রং নিয়ে যেতাম। মিস্ত্রিদের কাজের তদারকি করতাম। আলাপ হল কন্যাকুমারিকার সঙ্গে। বাড়ির একমাত্র মেয়ে। একমাত্র সন্তানও বটে। বড় আদুরে। খামখেয়ালি। দাদুর চোখের মণি। তার ইচ্ছেতেই চলে এলাম বড় বাড়িতে। তার ইচ্ছেতেই মাস্টারের কাছে নতুন করে পড়াশুনো শুরু করলাম। এক অদৃশ্য শক্তি যেন আমাকে ধাপে-ধাপে তুলে নিয়ে গেল শিক্ষাদীক্ষার শিখরে। আজকের রাম ভট্টাচার্য তাই চিরকাল ঋণী থাকবে কন্যাকুমারিকার কাছে।

'বাড়ির পেছনে তিন বিঘে বাগানে পুকুর ছিল, বড়-বড় গাছ ছিল। আমরা সেখানে খেলা করেছি। তখনি অনেক বাড়াবাড়ি করেছিলাম। বড় বাড়িতে যা হয়। কিন্তু সবই গোপনে।

'কন্যাকুমারিকার চাপেই বিলেত গেছিলাম। ফিরে এলাম ব্যারিস্টার হয়ে, শুরু করলাম রাজনীতি। কলকাতার পাট চুকে গেছিল—দিল্লিতেই ঘাঁটি গাড়তে হয়েছিল। বিবেকানন্দই আমার জীবনে প্রথম আদর্শ। তাই সারা ভারতকে নিজের দেশ বলে ভেবেছিলাম। তাই ভারতের সবাই আমাকে নিজের লোক মনে করেন। আপনি তা জানেন।

'কন্যাকুমারিকা সেই কারণেই বলেছিল, কলকাতায় এলে তুমি আর এ-বাড়িতে উঠবে না। বালিগঞ্জে তোমাদের ডেরায় থাকবে। মাঝে-মাঝে সঙ্গ দিয়ে যাবে আমাকে।

'কন্যাকুমারিকা বিয়ে করেনি। আমারই মতোন। বিয়ে-থা'র কথাও কোনওদিন আমাকে বলেনি। বললেও রাজি হতাম না। কারণ, ওই বন্ধন আমাকে মানায় না। সময় কম, কাজ বেশি। সবই দেশের কাজ। স্ত্রী-র জন্যে সময় আমার নেই।

'কন্যাকুমারিকার মা-বাবা ছেলেবেলাতেই মারা গেছিলেন। দাদু মারা যান আমি বিলেতে থাকবার সময়ে। বিষয়সম্পত্তির চাপে কন্যাকুমারিকা সংসারী হওয়ার স্বপ্ন ছেড়ে দেয়। সবই আমাকে চিঠি লিখে জানাত। যা জানায়নি, তা জেনেছি অনেক পরে।

'কৈশোরেই যে শরীর নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে পারে, যৌবনে সে সন্ন্যাসিনী হয়ে যাবে না—এটা আমার ভাবা উচিত ছিল। যার হাতে টাকা, তার পারিষদবর্গের অভাব হয় না। কন্যাকুমারিকা একাধারে হয়েছিল চরিত্রহীনা আর উড়নচণ্ডে। কলকাতায় এসে মাঝে-মাঝে যখন তাকে সঙ্গ দিয়ে যেতাম, স্বাভাবিকভাবেই সে মেয়েলি কৌতূহলে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে আমার গোপনতম কথাও জেনেছে। কৈশোরের সেই চাপল্য আর দেখায়নি। আমি তার এই পরিবর্তন দেখে একটু অবাক হয়েছিলাম। ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারিনি সে দেউলে হতে বসেছে। দেনা যত বেড়েছে, রূপ আর যৌবনকে ততই উজাড় করে দিয়েছে কলকাতার ধনীদের পায়ে। সংক্ষেপে, সে ভদ্র-বারবনিতা হয়ে গেছে।

'রাষ্ট্রের বহু সিক্রেট কন্যাকুমারিকার কাছে বলেছিলাম। আমেরিকা, রাশিয়া, ইংল্যান্ড, জাপান, জার্মানি—কার সঙ্গে কখন কী কথা বলেছি—রঙ্গচ্ছলে গল্প করে যেতাম। আমার জীবনে একমাত্র সঙ্গিনী সে, আমার জীবনকে গড়ে দিয়েছে—তাকে ছাড়া বলব কাকে? যদিও সেসব গুহ্য কথা কারও জানবার কথা নয়। সে কিন্তু অনেকদিন ধরেই লিখতে শুরু করেছিল তার আত্মজীবনী। কলকাতায় এসে তাকে সঙ্গ দিতে গিয়ে দেখেছিলাম তাকে লেখার নেশায় ধরেছে। সবুজ কালির দোয়াতে কলম ডুবিয়ে লিখত, আর গালে হাত দিয়ে জানলা দিয়ে বাগানের গাছপালার দিকে চেয়ে থাকত—যে-বাগানে কেটেছে আমাদের দুজনের কৈশোর। চিঠির পর চিঠি লিখত—ডাকটিকিটে জিভ বুলিয়ে খামে সাঁটত—বরাবরের অভ্যেস। আমি ঠাট্টা করে ইদানীং বলতাম, "তুমি কি তসলিমা নাসরিন হওয়ার স্বপ্ন দেখছ?—ও হেসে বলত, তুমি যদি দেশের জন্যে জীবন দিতে পারো, আমি কেন পারব না?"

'স্মৃতিচারণ লেখা যে তখন থেকেই শুরু করেছিল, আমার জানা ছিল না। পরপর কয়েকটা কাজে ইন্ডিয়ার বাইরে কাটিয়ে দিল্লি ফিরেই ওর তিনটে চিঠি পেলাম। মাথা ঘুরে গেল। কন্যাকুমারিকা আমার কাছে একশো কোটি টাকা চেয়েছে।

'কলকাতায় এলাম। শুনলাম ওর সর্বস্বান্ত হওয়ার কথা। ভেড়ি লুঠ হওয়ার পর থেকেই কপাল পুড়তে থাকে। বিষয়জ্ঞান না থাকার ফলে প্রতারকদের খপ্পড়ে পড়ে অস্থাবর সম্পত্তি সবই বাঁধা পড়েছে। চিট ফান্ড করে টাকা তুলতে গিয়ে পুলিশকে দোরগোড়ায় এনে ফেলেছে। একশো কোটি পেলে সবদিক বাঁচবে।

'একশো কোটি কেন, একশো টাকারও এদিক-ওদিকে করেনি রাম ভট্টাচার্য—সেটাই সেদিন তাকে জানিয়েছিলাম। অন্য কীভাবে তার সমস্যা মিটোনো যায়, তাই নিয়ে ভাবতে বলেছিলাম। ও গোঁ ছাড়েনি। সব শেষে জানিয়েছে, যে স্মৃতিচারণটা লিখে রেখে দিয়েছে—সেটা কিনে নিতে চেয়েছে এক পাবলিশার—বাংলা থেকে হিন্দি আর ইংরেজি তর্জমাও তারা করে নেবে। তারা হয়তো লাখ কয়েক টাকার মুনাফা লুটবে—কিন্তু রাম ভট্টাচার্যর হাজার-হাজার কোটি টাকার মসনদ ধুলোয় গড়িয়ে যাবে—রাম ভট্টাচার্য যে নিখাদ সোনা নয়—এই বই হবে তার ডকুমেন্ট।

'লেখবার টেবিলে বসেই কন্যাকুমারিকা হেসে-হেসে বলে গেল সব কথা। একটা চিঠি সাদা খামের মধ্যে ভরা ছিল। জিভ বুলিয়ে তার মুখ জুড়ে এক টাকার ডাকটিকিটও লাগাল জিভে ঠেকিয়ে। বললে—পাবলিশারকে জানিয়ে দিলাম, আর এক মাসের মধ্যে রেডি হবে পাণ্ডুলিপি। পাবলিশারের নামটা দেখে রাখো।

'গোটা পৃথিবী জুড়ে ব্যবসা রয়েছে বিশেষ সেই প্রকাশকের।

'বুঝলাম, ঠিক এক মাস সময় পেলাম। একশো কোটি টাকা বের করে দিতে হবে আমাকে। অসৎ পথে নামতেই হবে।

'দিল্লি ফিরে যাওয়ার পথে প্লেনে বসে খটকা লাগল—এ ধরনের অসৎ পরিকল্পনা কন্যাকুমারিকার মাথায় এল কী করে? এ তো সাংঘাতিক সফিসটিকেটেড ব্ল্যাকমেল। কাকপক্ষীও জানবে না এত বড় একটা ক্রাইমের খবর। অথচ রাষ্ট্রশক্তি দুর্বল হবে, দেশের লোক প্রতারিত হবে। হর্ষৎ মেটার সঙ্গে আমার কোনও প্রভেদ থাকবে না।

'ইনটেলিজেন্স খবর এনে দিল লাইটনিং স্পিডে। কন্যাকুমারিকা যে কুপথগামিনী হয়েছে, রাতের অভিসারিকা হয়েছে, রাষ্ট্রের শত্রুদের অঙ্কশায়িনী হয়েছে—তা জানলাম এই সার্ভিসের মারফৎ।

'তাই এসেছি আপনার কাছে। ব্ল্যাকমেলারকে আমি ভালোবাসি—তার ক্ষতি করতে চাই না—অথচ নিজে বাঁচতে চাই, দেশকে বাঁচাতে চাই। ইন্দ্রনাথবাবু, কী করব?'

ইন্দ্রনাথ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, 'রাত ঠিক বারোটা। চরিত্রহীনা কন্যাকুমারিকা নিশ্চয়ই এখন জেগে আছেন। ফোন করুন।'

রাম ভট্টাচার্যর মুখ শক্ত হয়ে গেল—'না।'

'নাম্বারটা বলুন। আমি করছি।'

'কেন?'

পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ইন্দ্রনাথ বললে, 'কথায় সব হয়। আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলব। দরকার হলে আজ রাতেই দেখা করব। কূটনীতিতে আপনার কাছে আমি শিশু। কিন্তু একটা সহজ কৌশল বারেবারে কাজ দিয়েছে—সেই কৌশলটা প্রয়োগ করব।'

'কী কৌশল?'

'টু ক্রিয়েট এ বিগার প্রবলেম। আপনার সামনে যে প্রবলেম তুলে ধরেছেন কন্যাকুমারিকা—তার চাইতেও বড় প্রবলেম তৈরি করব কন্যাকুমারিকার জীবনে।'

'সেটা কী প্রবলেম?'

'এই প্রথম আপনার চোখের পাতা কাঁপতে দেখলাম। কারণ, আপনি তাকে ভালোবাসেন, ঘৃণাও করেন। —আর শুনতে চাইবেন না। আমার ওপর ছেড়ে দিন।—নাম্বারটা কী?'

'থ্রি ফাইভ জিরো...।'

ডায়াল করল ইন্দ্রনাথ। রিং হয়ে গেল। বার বার তিনবার। উঠে দাঁড়াল সোফা ছেড়ে। বললে, 'চলুন।'

'কোথায়?'

'কন্যাকুমারিকার বাড়ি।'

'আমি যাব? এত রাতে?'

'আপনার মুখ দেখিয়ে দরজা খোলাব—আমি গেলে সেটা হবে না। চলুন।'

লোহার ফটক ধরে নাড়া দিতেই গুমটি ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল দারোয়ান। রাম ভট্টাচার্যকে দেখে ভীষণ অবাক হয়ে বলেছিল, 'কী হল দাদাবাবু?'

'দিদিমণি ঘুমোচ্ছে নাকি?'

'নাতো। সেই যে দুপুরে আপনি চলে গেলেন—ঘর বন্ধ করে বসে রয়েছে। কত ডাকলাম—সাড়া দিল না। খাবার ঢাকা দিয়ে রেখেছি।'

ইন্দ্রনাথ বললে, 'নিয়ে চলো সেই ঘরে।'

চারতলা। বাগানের দিকের ঘরটার দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। দারোয়ানের ডাকে সাড়া মিলল না। রাম ভট্টাচার্যের অনুরোধও বিফলে গেল।

ইন্দ্র বললে, 'সাবেকি বাড়ি। ভেতরে নিশ্চয়ই খিল অথবা ছিটকিনি তোলা রয়েছে। চাড় মারলেই ভেঙে যাবে।'

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই দু-হাট হয়ে গেল দরজা।

ঘর অন্ধকার। করিডরের আলো পৌঁছচ্ছে না ঘরের ভেতরে।

ইন্দ্রনাথ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল দারোয়ানকে, 'টর্চ বা হ্যারিকেন—যা হয় কিছু নিয়ে এসো।'

'সুইচ টিপব? ঘরেই তো আলো আছে।' বললে দারোয়ান।

'যা বলছি তাই করো।'

সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল দারোয়ান।

ইন্দ্র বললে, 'ওকে সরিয়ে দিলাম। ঘরে ঢোকবার আগে, আলো জ্বালবার আগে একটা জিনিস জেনে নিই। আপনি এখানে এসেছিলেন আমার কাছে যাওয়ার আগে?'

'দুপুরে এসেছিলাম। ফিরে যাই বালিগঞ্জে। সেখান থেকে গেছি আপনার কাছে।'

'ঠিক। দুপুর থেকেই দরজা বন্ধ করে বসে আছেন কন্যাকুমারিকা। দিনের আলোয় আলো জ্বালানোর দরকার হয়নি। এখনও আমাদের ডাকে আলো জ্বালাননি—দরজা ভেঙে কথা বলে যাচ্ছি, উঠেও এলেন না। মানে বুঝছেন?'

রাম ভট্টাচার্যর গ্র্যানাইট মুখাবয়বে ভাবান্তর নেই—কিন্তু বুঝি ঈষৎ নিষ্প্রদীপ হল সদাপ্রদীপ্ত দুই চক্ষু।

আর কথা না বলে অন্ধকার ঘরে দেওয়াল হাতড়ে সুইচ টিপে দিল ইন্দ্রনাথ।

ঘরে এখন আলো ঝলমল করছে। টেবিলে মাথা রেখে বসে রয়েছে কন্যাকুমারিকা। অস্বাভাবিকভাবে একটা হাত ঝুলছে চেয়ারের পাশে। লাল টেলিফোন রয়েছে ভাঁজ করা বাঁহাতের কাছে।

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল ইন্দ্রনাথ। ছিটকিনি ভেঙেছে, কিন্তু খিল অটুট রয়েছে। তুলে দিল খিল।

টেবিলের ওপর কন্যাকুমারিকার মাথার কাছে একটা সাদা খাম। ওপরে সবুজ কালিতে লেখা বিখ্যাত এক প্রকাশকের নাম আর ঠিকানা।

খামের কোণ ধরে তুলে ঘুরিয়ে পেছন দিক দেখল ইন্দ্রনাথ। নামিয়ে রেখে টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিল এক টাকার বেশ কয়েকটা ডাকটিকিট। গান্ধীজির ছবি ছাপা ডাকটিকিট।

বললে, 'ছিল কুড়িটা ডাকটিকিট—এখন রয়েছে উনিশটা। —একটা নিশ্চয় ছিঁড়েছিলেন কন্যাকুমারিকা। কিন্তু খামে লাগাননি!' হেঁট হয়ে দেখল মেঝে, কুড়িয়ে নিল একটা ডাকটিকিট। 'এইটা ছিঁড়েছিলেন, খামে লাগাবেন বলেই। তার আগেই মন ঘুরে গেল —সুইসাইড করলেন।'

'সুইসাইড!' মৃদুস্বরে বললেন রাম ভট্টাচার্য, 'আমার সঙ্গে ঝগড়া হওয়ার পরেই?'

'হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে ঝগড়া হওয়ার পরেই। ছিটকিনি তুলে দিয়ে চিঠি লিখলেন। খামের মুখ বন্ধ করলেন। ডাকটিকিট ছিঁড়লেন। তার পরেই সুইসাইড করলেন—ডাকটিকিট খসে পড়ল মেঝেতে। স্ট্রেঞ্জ!'

'স্ট্রেঞ্জ কেন বলছেন?'

'ওঁর অভ্যেস তো জিভ বুলিয়ে ডাকটিকিট ভিজোনো। তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'ডাকটিকিটে নিশ্চয় জিভ বুলিয়েছিলেন?'

'মনে তো হয়।'

'হ্যাঁ বুলিয়েছিলেন। এই দেখুন পেছনটা। আঠা-ভাবটা তেমন নেই—যেন জল লেগেছিল। ফোরেনসিক রিপোর্টেই জানা যাবে, জিভের লালা কন্যাকুমারিকার।—জানা যাবে আর একটা জিনিস,' বলতে-বলতে উনিশটা ডাকটিকিটের পাত তুলে নিল ইন্দ্রনাথ।—চোখ কুঁচকে দেখল পেছনের আঠার দিক।

বললে, 'বাদামি রঙের কী যেন লেগে রয়েছে, তাই না?'

'তাই তো দেখছি।'

'এই উনিশটা ডাকটিকিট আর এই খসে-পড়া ডাকটিকিট কি আমি নিয়ে যাব?'

'কোথায়?'

'ফোরেনসিক টেস্ট করার জন্যে।'

'কেন?'

'আমার অনুমান, এতে লাগানো রয়েছে পটাসিয়াম সায়ানাইড।'

'কন্যাকুমারিকা—'

'না, তিনি লাগাননি। ডাকটিকিটে জিভ বুলোনার অভ্যেস আছে কন্যাকুমারিকার, একথা যিনি জানতেন, তিনি লাগিয়ে রেখে গেছিলেন আজ দুপুরবেলা। তাঁর অপূর্ব বাগ্মিতা দিয়ে খেপিয়ে দিয়ে গেছিলেন যাতে তিনি চলে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে প্রকাশককে চিঠি লিখতে বসেন কন্যাকুমারিকা। কিন্তু বিরাট এই প্রতিভা আমার মতোন ক্ষুদ্র ব্রেনের শরণ নিলেন কেন, সেটা বুঝলাম না।'

'ইন্দ্রনাথবাবু, আপনি যে এত লাইটনিং স্পিডে অ্যাকশন নেন, আমার তা জানা ছিল না।' মন্দ্রমন্থর কণ্ঠস্বরে বলে গেলেন রাম ভট্টাচার্য—'রাত দশটায় আপনার কাছে যাওয়ার কারণ একটা—যাতে আপনার অ্যাকশন শুরু হয় পরের দিন সকালে—আমি তখন দিল্লির পথে—আকাশে। আজ আপনার বাড়ি থেকে বেরিয়ে কন্যাকুমারিকার এই ঘরে আসতাম—কারণ আমি জানতাম, সে আর বেঁচে নেই—আপনার বাড়ি যাওয়ার আগে ফোন করেছি—কন্যাকুমারিকা বেঁচে থাকলে টেলিফোন ধরত—তাই নিশ্চিন্ত হয়ে আপনার কাছে এসেছিলাম। এ ঘরে এসে দরজা ভেঙে আগে ডাকটিকিটগুলো সরাতাম—তারপর দারোয়ানকে দিয়ে পুলিশে খবর দেওয়াতাম—তাকে শিখিয়ে যেতাম—আমি যে এত রাতে এসেছি—কাউকে যেন না বলে। কাল সকালে শুরু হত তদন্ত। সরকারি তদন্ত একটু এগিয়েই ধামাচাপা পড়ে যেত। নিছক আত্মহত্যা—পটাসিয়াম সায়ানাইডের জন্যে। তখন আপনার টনক নড়লেও আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারতেন না—ষড়যন্ত্রের চাপে এরকম আত্মহত্যা অনেকেই করে।—যাক সে কথা, আগেই কথা দিয়েছেন, এ-কেস যদি টেক-আপ নাও করেন—মুখ খুলবেন না।

'আপনার শরণ নিয়েছিলাম কেন? পাপ চেপে রাখবার ক্ষমতা নেই বলে। হালকা হয়েছিলাম আপনার কাছে গিয়ে। আপনি সব জেনেও অপরাধী কে, তা জানতে পারতেন না। কিন্তু জেনেই যখন ফেলেছেন, তখন ডাকটিকিটগুলো ফিরিয়ে দিন। ওদের কাজ ফুরিয়েছে। দেশ রক্ষে পেয়েছে।'

'নিন। কিন্তু স্মৃতিচারণের পাণ্ডুলিপি?'

'যে ব্যাঙ্কলকারে আছে, তা 'সীজ' করা হবে। তারপর...'

'বুঝেছি। দারোয়ানকে বলে দিন, পুলিশে খবর দিতে—কিন্তু পুলিশকে যেন না বলে যে আমরা দুজন এসেছিলাম আজ রাতে।'

'বলে দিচ্ছি। ইন্দ্রনাথবাবু, একটা অনুরোধ করব?'

'স্বচ্ছন্দে।'

'আপনি মুক্তপুরুষ। দিল্লিতে একটা বিশেষ দপ্তরের ভার গ্রহণ করবেন?'

'মাপ করবেন। আমি মুক্ত-ই থাকতে চাই।'

** 'কোলফিল্ড টাইমস' পত্রিকায় প্রকাশিত। (শারদীয় সংখ্যা, ১৯৯৪)*

রাজা কঙ্ক

বাই রোড গাড়িটাকে পাঠিয়েছিলাম আগের দিন চম্পকনগরে। ট্রেন থেকে সেখানে নেমেই গাড়ি হাঁকিয়ে যাব বন্ধুদের বিবরে—এই ছিল আমার প্ল্যান।

হাওড়া থেকে ট্রেন ছাড়বার মিনিট কয়েক আগেই আমার কামরায় এসে উঠল সাতজন আরোহী। পাঁচজন আবার সিগারেটখোর। এতটা পথ এদের সঙ্গে যেতে হবে ভেবে মেজাজ খিঁচড়ে গেল। স্টেটসম্যান আর ব্র্যাডশ নিয়ে চলে এলাম পাশের কামরায়।

আমাকে দেখেই খুবই বিরক্ত হল যে মেয়েটি তার বয়স পঁচিশও নয়। ভারী মিষ্টি মুখখানা। পানপাতার মতো গড়ন। চোখ-মুখ-নাক নিখুঁত। ঢলঢলে চোখে মাদকতা বা সেক্স যাই বলুন না কেন আছে। কামরার একমাত্র আরোহী সে। তাই আমাকে দেখে ভুরু কুঁচকে ফিসফিস করে কী যেন বলল ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে থাকা ভদ্রলোকটিকে।

বুঝলাম আমার সম্বন্ধে লাগানো হল। ভদ্রলোক মেয়েটির স্বামী নিশ্চয়। ট্রেনে তুলে দিতে এসেছেন। আমার আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখলেন। সন্তুষ্ট হলেন এবং মৃদু হেসে বোধহয় অভয় দিলেন স্ত্রীকে। শুনে মেয়েটিও হাসল আমার দিকে চেয়ে। ছোট্ট কামরায় ঘণ্টাকয়েক আমার সঙ্গে তালা চাবি দিয়ে রাখলেও যেন তার আর কোনও ভয় নেই।

ভদ্রলোক বললেন, 'রাগ কোরো না মণি কেমন? চলি, নইলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফেল করব।'

জানলা থেকে রুমাল নেড়ে বিদায় জানাল মেয়েটি এবং লুকিয়েচুরিয়ে আঙুলের ডগায় অধর ছুঁইয়ে কয়েকটা তোফা চুম্বনও নিক্ষেপ করল স্বামীর পানে।

গার্ড হুইশল দিয়েছে। ট্রেন চলতে শুরু করেছে।

ঠিক এই সময়ে প্ল্যাটফর্ম দিয়ে ছুটতে-ছুটতে এল একটা লোক।

লোকজন হইচই করে উঠল তার দু:সাহস দেখে। কিন্তু কোনওদিকে না চেয়ে ফুটবোর্ডে লাফিয়ে উঠেই দড়াম করে দরজা খুলে ভেতরে এসে পড়ল আগন্তুক।

আমার সঙ্গিনী অন্যমনস্ক ছিল। আচমকা ওইভাবে একজনকে কামরায় ঢুকতে দেখেই আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠে ধপ করে বসে পড়ল বেঞ্চিতে।

আমি ভীতু নই। কিন্তু প্ল্যাটফর্ম থেকে ট্রেন বেরিয়ে যাওয়ার ঠিক আগেই এভাবে কামরায় ছিটকে আসা মোটেই স্বাভাবিক নয়। বদ মতলব না থাকলে সচরাচর....

লোকটার চেহারা দেখে কিন্তু সেরকম কিছু মনে হয় না। ঠিক যেন পাকা মাকাল ফলটি। যেমন টুসটুসে রং—টুসকি দিলেই যেন ফেটে পড়ে—তেমনি ফিটফাট সাজগোজ। যে লোক এ-রকম তেড়েমেড়ে ছুটন্ত ট্রেনে লাফিয়ে ওঠে, তার চেহারা আর পোশাক আর একটু নিরেশ হলে যেন মানাত। চেহারা দেখলে মনে হয় বুঝি পারস্যের খানবাহাদুর কিম্বা আরব দেশের তৈল সম্রাট। লাল-লাল ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, টানা-টানা চোখ, চোখা-চোখা নাক। আর পোশাক? র‍্যানকিন-হার্মান গোলাম মহম্মদরাও বুঝি অমন কাট-ছাঁট রপ্ত করতে পারেনি এখনও। যেমন দামি কাপড় তেমনি বাহারি স্যুট। অমন সুন্দর টাইও বড় একটা দেখা যায় না। জোডিয়াক তো নয়ই বিলিতি নিশ্চয়ই।

দেখেই আমার কিন্তু খটকা লাগল। হ্যান্ডসাম ফিগার, চোস্ত পোশাক-আশাক, মুখটাও কেমন জানি চেনা-জানা। চেনা লোকের ফটোগ্রাফ অনেক দিন পর দেখলে যেমন চিনেও চিনে ওঠা যায় না এ যেন তেমনি।

কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারলাম না কোথায় দেখেছি নবরূপী কার্তিক মহাশয়কে।

সঙ্গিনী মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখি অবস্থা তার শোচনীয়। দু-চোখ কোটর থেকে খসে পড়ার উপক্রম হয়েছে—আতঙ্ক মূর্ত হয়েছে বিস্ফারিত চোখের তারায়। ফরসা রং ফ্যাকাশে হলে বিশ্রী লাগে—মেয়েটিকেও বিশ্রী লাগছে মুখটা কাগজের মতো সাদা হয়ে যাওয়ার দরুন। বেঞ্চির ওদিকে বসে সুদর্শন আগন্তুক—এদিকে বসে সুন্দরী সঙ্গিনী। আগন্তুক চেয়ে আছে জানলা দিয়ে বাইরে, সঙ্গিনী ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে আগন্তুকের দিকে। ভ্যানিটি ব্যাগ পড়ে রয়েছে ইঞ্চি কয়েক দূরে। মেয়েটির ইচ্ছে ব্যাগটাকে কাছে টেনে আনে—কিন্তু ভয়ের চোটে হাত বাড়াতেও পারছে না। থরথর করে আঙুল কাঁপছে, চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে। অবশেষে আঙুল দিয়ে পৌঁছল ব্যাগের হাতলে এবং কোলের ওপর উঠে এল হলুদ থলে।

এতক্ষণে চারচোখে মিলন হল আমার সঙ্গে মেয়েটির। আমি ওর নার্ভাসনেস দেখে না বলেও পারলাম না 'ব্যাপার কী? শরীর খারাপ নাকি? জানলা খুলে দেব?'

জবাব না দিয়ে ভীরু চোখে মেয়েটি কেবল চেয়ে রইল। কথা বলার মতো সাহসও তার নেই বুঝে আমি অভয় চোখে তাকিয়ে রইলাম। মেয়েটি আমার চোখের মধ্যে তাকিয়ে আড়চোখে বারবার ইশারা করতে লাগল আগন্তুকের পানে। চোখের ইশারায় সে যেন বলতে চায়, 'লোকটাকে দেখেছেন? সুবিধের নয়।'

আমি ওর সভয় চাহনির জবাব দিলাম অভয় হাসি হেসে—ঠিক যেভাবে হেসেছিল তার স্বামী আমার সম্বন্ধে তার ভয় কাটিয়ে দেওয়ার জন্যে। ইঙ্গিতে বললাম—ভয় কী? আমি তো রয়েছি। যুবতীদের দেখলেই যুবকদের প্রাণে বীররসের সঞ্চার ঘটে। আমিই বা বাদ যাই কেন?

ঠিক এই সময়ে আগন্তুক চাইল আমাদের পানে। পর্যায়ক্রমে চোখ বুলিয়ে নিল আমার আর সঙ্গিনীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত। সে চোখে জিজ্ঞাসা নেই, ঔৎসুক্য নেই, ঔদাসীন্যও নেই। পর্যবেক্ষণ সমাপ্ত হতেই চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ফের চেয়ে রইল জানলা দিয়ে বাইরের দিকে।

কামরার মধ্যে আর কোনও কথা নেই। মেয়েটি এই নৈ:শব্দ্য সইতে পারল না যেন। সর্বশক্তি কেন্দ্রীভূত করল সুচারু রসনায়—বললে ফিসফিস করে, 'শুনেছেন?'

'কী?'

'এই ট্রেনে সে চলেছে?'

'কে?'

'সে আবার কে...একা!'

'কে? কার কথা বলছেন?'

'রাজা কঙ্ক।'

আগন্তুকের পানে চেয়েই শেষ কথাটা বলল মেয়েটি। অর্থাৎ রাজা কঙ্ক তার দৃষ্টিপথেই আবির্ভূত হয়েছে। বেঞ্চের অপর প্রান্তেই উপবিষ্ট রয়েছে।

সুতরাং আমি নিশ্চিন্ত হলাম। ভয়াবহ ওই নামের মর্যাদা থেকে আমি রেহাই পাওয়ায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

আগন্তুক কিন্তু ঘাড় হেঁট করে বসেই রয়েছে। মুখটা ঈষৎ ফেরানো—যেন আমরা দেখেও চিনতে না পারি। প্রতিবাদের সুরে বললাম, 'রাজা কঙ্কর কিন্তু বিশ বছর সশ্রম কারাদণ্ডর হুকুম হয়েছে গতকাল—পলাতক থাকা অবস্থাতেই। সুতরাং পলাতক রাজা কঙ্ক খামোকা লোকের সামনে এসে নতুন ঝামেলায় জড়াতে যাবে বলে মনে হয় না। সবচেয়ে বড় কথা খবরের কাগজওয়ালারা পর্যন্ত জেনে গিয়েছে রাজা কঙ্ক ছুটি উপভোগ করতে গিয়েছে লঙ্কার সমুদ্রতীরে—পাকিস্তান থেকে লম্বা দেওয়ার পর থেকে ইন্ডিয়ার মাটি তার কাছে এখন বিষবৎ। সুতরাং—'

'রাজা কঙ্ক এই ট্রেনেই রয়েছে,' বলল মেয়েটি। একটু জোর গলাতেই বলল যাতে গলাটা আগন্তুকের কান পর্যন্ত পৌঁছয়। 'আমার হাজব্যান্ড ডেপুটি জেল-সুপার। স্টেশনেও শুনলাম পুলিশ তাকে খুঁজছে।'

'কিন্তু খুঁজবে কেন?'

'টিকিট কাউন্টারে তাকে দেখা গেছে বলে। চম্পকনগরের টিকিট কেটেছে রাজা কঙ্ক।'

'সেখানেই তার কলারটা চেপে ধরা হল না কেন?'

'অদৃশ্য হয়ে গেল বলে। টিকিট কালেক্টর তার টিকিও দেখতে পেল না। তাই সবাই ভাবলে নিশ্চয় এক্সপ্রেস ট্রেনে উঠে এসেছে রাজা কঙ্ক। জানেন তো এই ট্রেনের দশ মিনিট পরেই আছে এক্সপ্রেস।'

'তাহলে তো ল্যাঠা চুকেই গেল। এক্সপ্রেসেই পুলিশ তাকে হাতকড়া লাগাবে।'

'লাস্ট মোমেন্টে নিশ্চয় এক্সপ্রেস থেকে লাফিয়ে এই ট্রেনে উঠে পড়েছে রাসকেল।'

'বেশ তো রাসকেলকে এই ট্রেনেই ধরা যাবে'খন।'

'ধরবে? রাজা কঙ্ককে ধরবে?'

'চম্পকনগরেই সে ধরা পড়বে।'

'ইহজীবনে আর ধরা পড়বে না। রাজা কঙ্ককে ধরা যায় না। ঠিক পালাবে।'

'তাহলে পালাক। যাত্রা তার শুভ হোক।'

'তার আগে কী সর্বনাশটা করবে ভেবেছেন?'

'কী সর্বনাশ?'

চুপ মেরে গেল ভয়াতুরা সঙ্গিনী। নীরবে আঁকড়ে ধরল ভ্যানিটিব্যাগ। বললাম, 'অত ঘাবড়ালে চলে কি? রাজা কঙ্ক ট্রেনে উঠেছে মেনে নিয়েও বলব সে বোকা নয়। খামোকা নতুন ফ্যাসাদ ডাকতে যাবে না।'

আমার কথায় বিশ্বাস হল না মেয়েটির। ভয়ও কমল না।

কি আর করা যায়? আমি খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে রাজা কঙ্কর বিচারকাহিনি পড়তে লাগলাম। সবই অবশ্য জানা। তবুও মন্দ লাগছিল না রংচঙে উপাখ্যানটা। পড়তে-পড়তে চোখের পাতা ভারী হয়ে এল। পরপর দুটো রাত কম ধকল হয়নি শরীরের ওপর। ঘুম তো পাবেই।

চমকে উঠলাম মেয়েটির চাপা আর্তনাদে। খপ করে কাগজটা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ককিয়ে উঠল সে, 'কী সর্বনাশ! ঘুমোচ্ছেন নাকি?'

'না, না, ঘুমোব কেন?' প্রাণপণে সজাগ থাকবার চেষ্টা করে বললাম।

'এখন ঘুমোনো মানেই রাজা কঙ্ককে সুযোগ দেওয়া!'

'একশোবার!' সায় দিলাম তৎক্ষণাৎ।

এই বলে চোখ পাকিয়ে চেয়ে রইলাম জানলা দিয়ে বাইরে। ঘুমোবো না পণ করলেও ঘুমকে কি ছাই আটকানো যায়। ট্রেনের টিকি-টিকি ছন্দ আর দুই বিনিদ্ররজনীর অবসাদ—দুয়ে মিলে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুম পাড়িয়ে ফেলল আমাকে। চোখের সামনে থেকে মুছে গেল নিসর্গ দৃশ্য।

স্বপ্নজগতে দেখলাম রাজা কঙ্ক নামধারী সেই রহস্যাবৃত অতিমানবটিকে। দেখলাম ধনীর সিন্দুক শূন্য করে দুর্লঙ্ঘ্য পাঁচিল টপকে দুর্গম অঞ্চলেও বিজয়কেতন উড়িয়ে ছায়ার মতো অপসৃয়মান কিংবদন্তীর নায়ক রাজা কঙ্ককে। দেখলাম দরিদ্রের বন্ধু এবং শোষকের শত্রু রাজা কঙ্কর পাঁকের মতো পিচ্ছিল দেহরেখা, অশরীরীর মতো যে ধরাছোঁয়ার বাইরে, ঈগলের মতো যে দুরন্ত দু:সাহসী—দেখলাম সেই অমিতশক্তিধর অসামান্য পুরুষটিকে। সেইসঙ্গে দেখলাম আর একটি চরিত্রকে যে রাজা কঙ্কর নাম নিয়েও রাজা কঙ্ক নয়। দেখলাম ছায়ার মতো শরীর নিয়ে অকস্মাৎ লাফিয়ে ঢুকল কামরার মধ্যে, হনুমানের লঙ্কাদাহনের সময়ে শরীর বিবর্ধনের মতো ক্রমশ ফুলে উঠল তার ছায়াময় কায়া এবং চেপে বসল আমার বুকের ওপর। তার সাঁড়াশীর মতো শক্ত আঙুলের নিষ্পেষণে চোখ ঠেলে বেরিয়ে এল আমার, রুদ্ধ হয়ে এল নিশ্বাস। দমবন্ধ হয়ে মরতে বসেও রক্তজমা চোখে দেখলাম বেঞ্চিতে শুয়ে হাত-পা খেঁচছে ভয়কাতুরে মেয়েটা।

বাধা দিতে চেষ্টা করলাম না...শক্তিও ছিল না...রগ দপদপ করছে অক্সিজেনের অভাবে...বড়জোর আর একটা মিনিট...তারপরেই সব শেষ।

আগন্তুক তা বুঝল। আঙুল শিথিল করল বটে, বুক থেকে উঠল না। ডানহাতে একটা নাইলন দড়ি বার করল পকেট থেকে। দড়ির প্রান্তে ঢিলে ফাঁস। ফাঁসের মধ্যে আমার দুহাত গলিয়ে আমাকে বেঁধে ফেলল নিমেষমধ্যে...মুখে রুমাল ঠেসে, দু-পা বেঁধে পোঁটলার মতো ফেলে রাখল বেঞ্চির কোণে। ধড়ফড় করল না উদ্বিগ্ন হল না। ঠান্ডা মাথায় ঝড়ের মতো হাত চালিয়ে এত সংক্ষেপে অথচ এমন পরিপাটিভাবে বাঁধল আমাকে যে বুঝলাম লাইনের লোক। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা না থাকলে এমন নৈপুণ্য অর্জন করা যায় না। বাহাদুর বটে! রতনেই রতন চেনে! পুলিন্দার মতো অসহায় অবস্থায় বেঞ্চিতে শুয়ে মনে-মনে তাকে এক লক্ষবার প্রশংসা করলাম আমি—রাজা কঙ্ক!

পরিস্থিতিটা হাস্যকর। আসল রাজা কঙ্ককে পিছমোড়া করে বেঁধেছে নকল রাজা কঙ্ক। শুধু তাই নয় আমার পকেট মেরে বারো হাজার টাকা সমেত নোটবইটা নিজের পকেটে চালান করেছে। রাজা কঙ্ক আনাড়ির মতোই মার খেয়েছে, সর্বস্বান্ত হয়ে আছে একটা মস্ত গর্দভের মতো!

মহিলা সঙ্গিনী চোখ মুদে পড়ে আছে কাঠের মতো। আগন্তুক তার যৌবনের দিকে ফিরেও তাকাল না। মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিল ভ্যানিটি ব্যাগটা। অমনি আঙুল থেকে সোনার আংটিটা খুলে বাড়িয়ে ধরল নকল মূর্ছায় মূর্ছিতা সঙ্গিনী। আগন্তুক আংটি নিয়ে গিয়ে বসল কোণে। ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে কোলের ওপর ঢালল কতকগুলো জড়োয়া গয়না। উলটেপালটে দেখে হৃষ্ট হল নিশ্চয়। লুঠের মালের দাম যে সামান্য নয়, আমিও তা দূর থেকে বুঝলাম।

আগন্তুক আমাদের নিয়ে আর চিন্তিত বলে মনে হল না। সিগারেট ধরিয়ে বসে রইল চুপচাপ।

আমি রাজা কঙ্ক জুল-জুল করে চেয়ে রইলাম তার পানে। পরিস্থিতি খুবই ঘোরতর। হাওড়া পুলিশ যখন আমায় দেখেছে চম্পকনগরের পুলিশকেও সজাগ করা হয়েছে। স্টেশনে নামলেই আমাকে পুলিশ ঘেরাও করবে আমি জানি। এও জানি, হাওড়া পুলিশের চাইতে বেশি বুদ্ধি ধরে না চম্পকনগরের পুলিশ। পোস্টাল আইডেনটিটি কার্ডে আমার নাম লেখা আছে অভীক সামুই। চম্পকনগরের বন্ধুবান্ধবরাও জানে অভীক সামুই আসছে তাদের বিবরে। রাজা কঙ্ককে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। রাজা কঙ্ককে সবাই চেনে তার ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আর ঈগল চাউনির জন্যে। সিনথেটিক পরচুলা আর কনট্যাক্ট লেন্সের দৌলতে দুটিই আমার ছদ্মবেশ। দুটিই এখন অনুপস্থিত। ছদ্মবেশহীন রাজা কঙ্ককে তাই চেনা অত সহজ নয়। অভীক সামুই লেখা পোস্ট্যাল আইডেনটিটি কার্ডটা যেন অন্যমনস্কভাবেই দেখিয়েছিলাম হাওড়ার টিকিট কালেক্টরকে—একই কায়দায় চম্পকনগরেও চম্পট দেব আমি—এই ছিল প্ল্যান।

কিন্তু পরিস্থিতি এখন অন্যরকম। হাত-পা বাঁধা রাজা কঙ্ককে পুলিশ এত সহজে প্রিজন ভ্যানে তুলবে, এ যে ভাবাও যায় না। বারো হাজার টাকার কথা বাদ দিলাম—তার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা নাম ঠিকানা রয়েছে নোটবইয়ের পাতায়। আমার আগামী অভিযানের প্ল্যান পর্যন্ত ছকে রেখেছি নোটবইয়ে। সুতরাং পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ার চাইতেও আমার কাছে এখন বড় সমস্যা হল নোটবইটা উদ্ধার করা।

কিন্তু আগন্তুকের মতলবটা কী? লাইনের লোক বলেই কৌতূহলটা হতভম্ব করল আমাকে। আমি একলা হলে তার কোনও ঝামেলাই ছিল না। চম্পকনগরে ট্রেন দাঁড়ালেই দরজা খুলে প্যাসেঞ্জারদের ভিড়ে মিশে যাওয়া যেত। কিন্তু কামরায় রয়েছে ওই মেয়েটি। সামনে কঙ্ক বসে আছে বলেই মূর্ছার ভান করে এলিয়ে আছে বেঞ্চির ওপর। কিন্তু চম্পকনগরে ট্রেন দাঁড়ালেই চিলের মতো চেঁচিয়ে উঠবে সে। সুতরাং এখন থেকেই মেয়েটির মুখ বন্ধ করা দরকার। কিন্তু তাতো করছে না আগন্তুক। সুতরাং তার মতলবটা কী?

আগন্তুকের কিন্তু খেয়াল নেই আমাদের পানে। একদৃষ্টে চেয়ে আছে বাইরের দিকে—তাল-তাল ধোঁয়া উঠছে সিগারেটের প্রান্ত থেকে। একবার কেবল হাত বাড়িয়ে আমার ব্র্যাডশটা টেনে নিয়ে পাতা উলটোনো ছাড়া কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না তার হাবভাবে। আশ্চর্য ব্যাপার তো!

মেয়েটি এখনও মূর্ছার ভাবটা টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে চলেছে প্রাণপণে। একবার কেবল খুক-খুক করে কেশে উঠল সিগারেটের ধোঁয়ায়, তাইতেই বোঝা গেল মূর্ছাটা বিলকুল নকল—আসল মোটেই নয়।

শত্রুকে ঠান্ডা রাখার কৌশল।

আমার সারা গা টনটন করছে বাঁধনের জন্যে। মন কিন্তু বসে নেই...ফন্দি রচনা চলছে পুরোদমে মনের কারখানায়...।

একটার পর একটা স্টেশন টপকে ছুটে চলেছে ট্রেন।

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল আগন্তুক। দু'পা এগিয়ে এল আমাদের পানে। মেয়েটির দিকে চাইতেই তক্ষুনি জবাব এল সেদিক থেকে, 'ওগো তুমি কোথায়!' চিৎকারের সঙ্গে-সঙ্গে সত্যিকারের মূর্ছা।

লোকটার মতলব ধরতে পারলাম না। আমার পাশের জানলা তুলে বাইরে চেয়ে রইল। বৃষ্টি পড়ছে রিমঝিম শব্দে। যেন বিরক্ত হল তাই দেখে। সঙ্গে ছাতা নেই বলেই যেন ব্যাজার মুখে চেয়ে রইল বাইরে।

তারপর মেয়েটির ছাতা আর আমার রেনকোট নিয়ে এগোল দরজার দিকে।

দরজা খুলেই রেনকোট গায়ে চাপিয়ে নিল আগন্তুক। এক-পা নামিয়ে রাখল পাদানিতে। সর্বনাশ। চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপ দেবে নাকি? বাইরে ধোঁয়া আর বৃষ্টির মধ্যে তাকিয়ে শিউরে উঠলাম আমি। উন্মাদ নাকি?

ঠিক এই সময়ে স্যাকসবি-ফার্মারের ব্রেক চেপে বসল লোহার চাকায়। গতি কমে আসছে, লোহার ক্যাঁচক্যাঁচ আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে।

চকিতে পরিষ্কার হয়ে গেল আগন্তুকের উদ্দেশ্য। লাইন মেরামত চলছে নিশ্চয়। লোকটা তা জানে। গাড়ির গতি কমবেই। সে হেঁটে উধাও হবে জহরৎ আর নোটবই নিয়ে।

রগদুটো দপদপ করতে লাগল তার নিখুঁত প্ল্যান দেখে।

ফুটবোর্ডে দুটো পা নামিয়েছে আগন্তুক। ট্রেন আরও আস্তে চলছে। হঠাৎ জানলার সামনে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। ওভারব্রিজ।

অন্ধকার কেটে গেল সেকেন্ড কয়েকের মধ্যেই। লোকটাকে আর দেখলাম না।

অন্ধকারের মধ্যেই ওভারব্রিজের তলায় নেমে পড়েছে সে। চম্পকনগরও এসে গেল বলে। আর একটা ওভারব্রিজ পেরোলেই ট্রেন দাঁড়াবে চম্পকনগরে।

রেগুলেট করা মূর্ছা কাটিয়ে সটান উঠে বসল মেয়েটি। প্রথমেই শুরু হল বিলাপ—জহর হারানো শোকোচ্ছ্বাস। (ওগো তোমার দেওয়া নেকলেসটা...ইত্যাদি)

আমি কাতর নয়নে চাইলাম। মেয়েটি বুঝল। উঠে এসে খুলে দিল মুখের রুমাল। হাত-পায়ের বাঁধনও খুলতে যাচ্ছিল আমি বাধা দিলাম।

বললাম, 'না-না, থাকুক। পুলিশ এসে দেখুক রাস্কেলটা কী হাল করেছে আমার!'

'চেন টানব?'

'সেটা আগেই টানা উচিত ছিল, এখন আর দরকার নেই। আমার গলা টিপে ধরার সঙ্গে-সঙ্গে যদি চেনটা ধরে ঝুলে পড়তেন...'

'তাহলেই তো আমাকে চটকে পিণ্ডি বানাতো! আপনাকে বলিনি রাজা কঙ্ক এই ট্রেনে উঠেছে! ছবি দেখেই চিনেছি আমি।'

'এবার আর নিস্তার নেই—পুলিশ ধরল বলে।'

'কাকে? রাজা কঙ্ককে? পুলিশের...ক্ষমতা নেই।' ফুটকি দেওয়ার জায়গায় উচ্চারিত শব্দটা লেখা চলে না।

'ম্যাডাম, আপনি যদি ঠিক থাকেন, রাজা কঙ্ক ধরা পড়বেই। যা বলছি শুনুন। স্টেশনে ট্রেন ঢুকলেই আপনি চেঁচাতে থাকবেন। পুলিশ ছুটে আসবে। দু-চার কথায় তাদের বুঝিয়ে দেবেন রাজা কঙ্ক এসেছিল, আমার ওপর চড়াও হয়েছিল। কীভাবে পালিয়েছে ট্রেন থেকে তাও বলবেন। বলবেন, তাকে দেখতে কীরকম। খানদানি চেহারা পায়ে অ্যামবাসাডর বুট, হাতে ছাতা—আপনার গায়ে রেনকোট—'

'আপনার', বললে তন্বী।

'আমার? না, না, ওর নিজের। আমার রেনকোট নেই।'

'কিন্তু আমার যেন মনে হল রেনকোট ছাড়াই ট্রেনের মধ্যে লাফিয়ে এসেছিল রাজা কঙ্ক।'

'ভুল দেখেছিলেন,...রেনকোট গায়ে না থাক হাতে ছিল নিশ্চয়...নয়তো কামরার মধ্যে কেউ ফেলে গিয়েছিল...রাজা কুড়িয়ে পেয়েছে। যেখান থেকেই আসুক না কেন, রেনকোটটা গায়ে চাপিয়ে সে পালিয়েছে। পয়েন্টটা দারুণ, ইমপরট্যান্ট...গায়ে চেক কাটা গ্রে রেনকোট...বলতে ভুলবেন না। গোড়াতেই আপনার হাজব্যান্ডের নামটা বলবেন। নাম শুনলেই ওরা কানখাড়া করে আপনার সব কথা গিলবে...কাজও করবে...জুয়েলগুলোও ফেরত পাবেন।'

চম্পকনগর আর বেশি দূরে নেই। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখছে কারারক্ষকের যুবতী বধূ। আমি চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে তার ব্রেনের মধ্যে গেঁথে-গেঁথে বললাম :

'আমার নাম অভীক সামুই। যদি দরকার মনে করেন, বলবেন আমাকে আপনি চেনেন...তাতে অনেক সময় বেঁচে যাবে...প্রিলিমিনারী এনকোয়ারি যত ঝটপট শেষ করা যায়, ততই মঙ্গল...মোদ্দা কথা হল রাজা কঙ্ককে পাকড়াও করা...আপনার জুয়েল সমেত... বুঝেছেন? অভীক সামুই আপনার স্বামীর বন্ধু।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ...অভীক সামুই।'

জানলা দিয়ে হাতছানি দিতে শুরু করে দিয়েছে সুন্দরী সঙ্গিনী সেইসঙ্গে চেঁচিয়ে চলেছে তীক্ষ্ণ তীব্র কণ্ঠে। ট্রেন নিশ্চল হওয়ার আগেই পাদানিতে লাফিয়ে উঠল কয়েকজন ষণ্ডামার্কা পুরুষ। সবশেষে কামরায় উঠল আরেকটি লোক। সঙ্কট সময় এসেছে!

গলায় শির তুলে চেঁচিয়ে চলেছে মেয়েটি :

'রাজা কঙ্ক...অ্যাটাক করেছিল আমাদের...আমার জড়োয়া গয়না নিয়ে পালিয়েছে...আমার নাম মিসেস আচারী...আমার হাজব্যান্ড ডেপুটি জেল সুপার...এই তো আমার ভাই এসে গেছে...আশু... আশু...রাজা কঙ্ক আমার সর্বনাশ করে গেছে রে...ওরে আমার কী হবে রে...তোর জামাইবাবু শুনলে কী ভাববে রে...'

প্ল্যাটফর্ম থেকে দিদিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যেই আশু নামধারী ভাইটি কামরায় পা দিয়েছিল।

স্মার্ট চেহারার একজন সুদর্শন কিশোর। মিসেস আচারী তাকে জাপটে ধরে কেঁদে উঠল হাউহাউ করে।

তারপর বললে ফোঁপাতে-ফোঁপাতে, 'রাজা কঙ্ক...এই ভদ্রলোকের টুঁটি টিপে ধরেছিল ...উনি তখন ঘুমোচ্ছিলেন...মিস্টার সামুই, অভীক সামুই, আমার হাজব্যান্ডের ফ্রেন্ড।'

'কিন্তু রাজা কঙ্ক এখন কোথায়?'

'ওভারব্রীজের তলায় ট্রেন আসতেই লাফিয়ে পড়ল বাইরে।'

'আপনি ঠিক দেখেছিলেন তো? রাজা কঙ্কই তো?'

'হ্যাঁ...হ্যাঁ...হ্যাঁ...দেখেই চিনেছি। হাওড়াতে। তাকে দেখা গেছে বুকিং অফিসের সামনে...হাতে ছাতা, পায়ে অ্যামবাসাডর বুট—'

'একসক্লুসিভ সু', পুলিশ অফিসার আমার জুতো দেখিয়ে বলল, 'এইরকম?'

'না, না, যা বলছি শুনুন, আমবাসাডর বুট, চেককাটা গ্রে রেনকোট।'

'কিন্তু', মাথা চুলকে বলল পুলিশ অফিসার, 'টেলিগ্রামে তো রেনকোটের কথা লেখা ছিল না। ছাই রঙের কোটপ্যান্টের কথা লেখা ছিল শুধু।'

'ঠিক বলেছেন অ্যাশ কালারের সুট', সোল্লাসে বললে মিসেস আচারী। এতক্ষণে নিশ্বাস নিলাম আমি। এই না হলে বান্ধবী...চরম বিপদেও কী রকম বাঁচিয়ে দিল আমাকে।

কথা শুনতে-শুনতে আমার হাতের বাঁধন খুলে দিল পুলিশ অফিসার। আমি অবশ্য তার আগেই ঠোঁট কামড়ে রক্ত বার করে ফেলেছিলাম। বন্ধনমুক্ত হয়েও যেন কাহিল হয়ে পড়েছি, এমনিভাবে চিঁ চিঁ স্বরে বললাম :

'রাজা কঙ্ক...রাজা কঙ্ক...মনে কোনও সন্দেহ করবেন না... এখনও দৌড়োলে তাকে ধরা যাবে!'

এমনভাবে বললাম যেন ধুঁকছি। রাজা কঙ্ক আমাকে চোরের মার মেরেছে। প্রাণটা কেবল রেখে গেছে।

আমার রক্তমাখা ঠোঁটের দিকে সমবেদনা মিশোনো চোখে চেয়ে রইল পুলিশ অফিসার। প্রথম রাউন্ডে রেহাই পেলাম।

কামরাটা পুলিশ ইন্সপেকসন হবে বলে কেটে রাখা হল সাইডিংয়ে। বাকি ট্রেন রওনা হল গন্তব্যস্থানে। আমরা এসে বসলাম স্টেশন মাস্টারের ঘরে। কাতারে-কাতারে লোক মজা দেখবার জন্যে ছেঁকে ধরল আমাদের। কারো সর্বনাশ, কারো পৌষ মাস!

টনক নড়ল আমার। আর দেরি করা সমীচীন নয়। হাওড়া থেকে নতুন টেলিগ্রাম এসে পৌঁছোলেই আমি গেছি! কোনও একটা অছিলা নিয়ে প্ল্যাটফর্মের বাইরে আমাকে যেতেই হবে। গাড়িটা খুঁজে নিয়ে সটকান দিতে হবে এক্ষুনি!

কিন্তু তস্কর মহাপ্রভু কি সত্যিই একহাত নেবে আমার ওপর? এদিকের রাস্তাঘাট আমি চিনি না—কিন্তু সে চেনে। তাকে ধরা কি সম্ভব হবে?

আমার মন বলল, চেষ্টা করতে দোষ কী? অসম্ভবকে সম্ভব করাই তো রাজা কঙ্কর ব্রত। ঠগকে ঠকানোই তো রাজা কঙ্কর আদর্শ।

পুলিশ অফিসার তখনও রুটিনমাফিক এজাহার লিখছে দেখে হঠাৎ চেঁচিয়ে বললাম আমি :

'শুনছেন? রাজা কঙ্ক কিন্তু প্রতিমুহূর্তে দূরে সরে যাচ্ছে। স্টেশনের বাইরে কার পার্কে আমার গাড়ি রয়েছে। আপনি অনুমতি দিলেই গাড়ি নিয়ে তাকে ধাওয়া—'

'মতলবটা মন্দ নয়।' হেসে বলল অফিসার। 'আপনি বলার আগেই দুজন এস আইকে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

'তাই নাকি?'

'সাইকেলে করে খুঁজছে রাজা কঙ্ককে।'

'কোথায় খুঁজেছে?'

'ওভারব্রীজের ধারেকাছে। ওখানে গেলেই এক-আধটা ক্লু পাওয়া যাবেই। রাজা কঙ্কও ধরা পড়বে।'

'দূর মশাই, আপনার অফিসাররা খালি হাতে ফিরবে। ক্লু পাবে না।'

'আপনি কি জ্যোতিষী?' একটু চটেছে মনে হল পুলিশ অফিসার।

'ওভারব্রীজ থেকে বেরোনোর সময়ে কেউ যাতে তাকে দেখতে না পায়, সেইমতো হুঁশিয়ার থাকবে রাজা কঙ্ক। সুতরাং কোনও সাক্ষী আপনি পাবেন না। সবচাইতে কাছের রাস্তা ধরে সে—'

'রাস্তা তো গেছে কোহিমায়। সেখানেই ধরব তাকে।'

'কোহিমায় সে যাবে না।'

'না গেলে আশেপাশেই থাকবে। তাতে তো আমাদেরই সুবিধে।'

'আশপাশেই থাকবে না।'

'বটে? বটে? বটে? লুকোবে কোথায়? মাটির তলায়?' ঘড়ির দিকে তাকালাম।

বললাম—এই মুহূর্তে বলরামপুরে স্টেশনের আশপাশে ঘুরঘুর করছে রাজা কঙ্ক। দশটা পঞ্চাশে মানে, এখন থেকে ঠিক বাইশ মিনিট পরে কোহিমা থেকে একটা ট্রেন এসে দাঁড়াবে বলরামপুরে। রাজা কঙ্ক তাতে উঠে বসবে—যাবে মহেন্দ্রনগর জাংশনে।'

'তাই নাকি? তাই নাকি? জানতে পারি কি তার গতিবিধির খবর আপনি জানলেন কী করে?'

'খুব সহজে। কম্পার্টমেন্টে বসে রাজা কঙ্ক আমার ব্র্যাডশ খুলে দেখছিল। কী দেখছিল? যেখানে সে অদৃশ্য হবে, ঠিক সেইখানে আর কোনও ট্রেন আসার সম্ভাবনা আছে কিনা—এই জন্যেই খুলেছিল ব্র্যাডশ। আমিও এই মাত্র দেখেছি ব্র্যাডশ। ওভারব্রীজের কাছেই বলরামপুর স্টেশনে দশটা পঞ্চাশে কোহিমা থেকে আসছে একটা ট্রেন।'

শুনে চোয়াল ঝুলে পড়ল পুলিশ অফিসারের।

'মার্ভেলাস! মিস্টার সামুই, আপনি ডিটেকটিভ হলেন না কেন? এ লাইনে এক্সপার্ট হতে পারতেন।'

সেরেছে। বেশি বুদ্ধি দেখাতে গিয়ে নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মেরে বসেছি। পুলিশ অফিসারের চোখে বিস্ময় দেখলাম, আর দেখলাম চাপা সন্দেহ। কপাল ভালো যে রাজা কঙ্কর ফোটো সে পেয়েছে ওপরমহল থেকে, তার সঙ্গে সামনে-বসা এই রাজা কঙ্কর কোনও মিল নেই। আসল রাজা কঙ্ককে চিনতে পারল না শুধু ওই ছদ্মবেশী রাজার ছবি দেখেছিল বলেই। তা সত্বেও দেখলাম বিষম ঘাবড়ে গিয়েছে, বিষম অস্থির হয়েছে, বিষম উত্তেজিত হয়েছে ভদ্রলোক।

কিছুক্ষণ আর কোনও কথা নেই। শ্বাসরোধী নীরবতা। চাপা উদ্বেগে আমি নিজেও শিউরে উঠেছিলাম কিনা বলতে পারব না। তবে হাজার হোক আমি রাজা কঙ্ক। নিমেষ মধ্যে জাগ্রত হল ইস্পাত কঠিন মনোবল।

হেসে উঠলাম। বললাম, 'মশাই, পকেট-বই খোয়া গেলে গর্দভের মাথাতেও বুদ্ধি খেলে। আপনার জনা দুই লোক দিতে পারেন? তিনজনে মিলে চেষ্টা করলে হয়তো তাকে ধরা যাবে—'

'প্লীজ, প্লীজ', মিনতি করল সুন্দরী সঙ্গিনী। মিস্টার সামুই প্র্যাকটিক্যাল কথা বলেছেন। আর দেরি করবেন না। আমার জুয়েলগুলো....'

মহীয়সী বান্ধবীর একটি কথাতেই দাঁড়িপাল্লার কাঁটা হেলে পড়ল। ডেপুটি জেল সুপারের স্ত্রী আমাকে ডাকছে মিস্টার সামুই নামে। বড় অফিসারের বউয়ের মুখে জাল নামটা যেন নতুন মর্যাদা নতুন প্রতিষ্ঠা পেল। আর কোনও সন্দেহ থাকতে পারে কি? উঠে দাঁড়াল পুলিশ অফিসার।

'চলুন মিস্টার সামুই। রাজা কঙ্ককে আপনারও দরকার, আমারও দরকার।'

ভদ্রলোক আমাকে নিয়ে এল বাইরে—আমার গাড়ির সামনে। আলাপ করিয়ে দিল দুজন শক্ত-সমর্থ জোয়ানের সঙ্গে—বাঁটলো বটব্যাল আর তলাকান্ত তালুই। দুই চ্যালাকে নিয়ে উঠে বসলাম আমার গাড়িতে। আমি বসলাম ড্রাইভারের জায়গায়। ড্রাইভার বসল পেছনে। মিনিট খানেক পরেই স্টেশন রইল পেছনে। উড়ে গেল রাজা কঙ্ক।

সত্যি কথাই বলব মশায়, অহংকার একটু হয়েছিল বইকি। পাওয়ারফুল ইঞ্জিন তখন ফুসছে, পয়ত্রিশ হর্স পাওয়ারের ইমপোর্টেড মোরো-লিপটন বাঘের বাচ্চার মতোই ধেয়ে চলেছে ফাঁকা রাস্তা দিয়ে। হু-হু হাওয়ায় চুল উড়ছে আমার। ইঞ্জিনে যেন একটা ভোমরা গুনগুনিয়ে চলেছে—ভ্রমরগুঞ্জন ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। দু-পাশের গাছগুলো সটাসট পেছিয়ে যাচ্ছে পেছনে। মুক্তি পেয়েছি ঠিকই কিন্তু এখনও কিছু কাজ বাকি। স্রেফ প্রাইভেট ব্যাপার বলতে পারেন।

সরকারি কর্মচারীদের সাহায্যেই আইনানুগভাবেই কাজটা সারব আমি। তাই তো রাজা কঙ্ক চলেছে রাজা কঙ্কর সন্ধানে—সরকারিভাবে।

যাই বলুন, সরকারের সাহায্য না পেলে সেদিন আমি অত সহজে গাড়ি হাঁকতে পারতাম কি? রাস্তা তো চিনি না। কখন মোড় ঘুরতে হবে, কোন রাস্তা ছাড়তে হবে, কোন সড়কে ঢুকতে হবে—আমি জানি না। নির্ঘাত পথ হারিয়ে গোলকধাঁধায় ঘুরে মরতাম। রাজা কঙ্ক পথ হারাতো, আরেক রাজা কঙ্ক সেই ফাঁকে হত পগাড়পার।

কিন্তু ওই যে বললাম, সরকার আমাকে সাহায্য করল সরকারি কর্মচারী জুগিয়ে। তলাকান্ত তালুই আর বাঁটলো বটব্যাল জীবন্ত গাইডবুক বললেই চলে।

অথচ পলাতক রাজা কঙ্কর সঙ্গে হিসেবনিকেশ মিটিয়ে নেওয়ার সময়ে বাঁটলো আর তলাকান্তকে চোখের আড়াল করতে হবে। আমার নোটবই ওদের খপ্পরে দেওয়া তো দূরের কথা নোটবইয়ের পাতাতেও যদি চোখ দিয়ে ফেলে দুই মূর্তিমান তাহলেও সর্বনাশ।

বলরামপুর পৌঁছে শুনলাম তিন মিনিট আগেই ট্রেনটা বেরিয়ে গেছে। আমার ভুল হয় না। রেনকোট পরা একটা দাড়িওয়ালা কার্তিক-কার্তিক চেহারার লোক সেকেন্ড ক্লাসের টিকিট কেটে উঠেছে—যাবে মহেন্দ্রনগর জাংশনে।

জীবনে প্রথম ডিটেকটিভ হল রাজা কঙ্ক—সফল ডিটেকটিভ—শার্লক হোমস মেডেল দেওয়া উচিত আমাকে।

শুনলাম—ট্রেনটা এক্সপ্রেস। মহেন্দ্রনগর জাংশনের আগে কোথাও দাঁড়াবে না। সেখানে তাকে ধরা না গেলে সে চম্পট দেবে কলকাতার দিকে—মিলিয়ে যাবে জনারণ্যে।

'মহেন্দ্রনগর কদ্দূর এখান থেকে?'

'সাড়ে চোদ্দ মাইল।'

'উনিশ মিনিটে সাড়ে চোদ্দ মাইল?...ঠিক আছে—আগেই পৌঁছব।'

মোটর রেসে নাম লেখালে নিশ্চয় গোল্ডকাপ পেতাম সেদিন। মোরো-লিপটন আমার হুকুমের দাস বরাবরই, কিন্তু সেদিন যেন আমার অন্তরের আকুলতাকে ও স্পর্শ করল। ওর যান্ত্রিক ব্যাকুলতা মূর্ত হল অসম্ভব গতিবেগের মধ্যে। আমার ইচ্ছাশক্তি যেন তার পয়ত্রিশ হর্স পাওয়ারকে উদ্দীপিত করল অলৌকিকভাবে এবং যেন সত্যি সত্যিই পঁয়ত্রিশটা ঘোড়া একযোগে পক্ষিরাজ ঘোড়ার মতোই উড়ে চলল পথের ওপর দিয়ে। শয়তান রাজা কঙ্ককে পাকড়াও করতেই হবে। রাস্কেল! স্কাউন্ড্রেল। চোর! কে কাকে টেক্কা দেয়, দেখা যাক এবার। আসল জেতে কি নকল জেতে—শুরু হল সেই পরীক্ষা।

'ডাইনে!...বাঁয়ে...সোজা।' হাঁক দিচ্ছে তলাকান্ত আর বাঁটলো।

পেছনের ধুলোর ঝড় উড়ছে। মাইল পোস্টগুলো দেখতে-দেখতে মিলিয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে।

হঠাৎ একটা মোড় ঘুরে দেখলাম ধোঁয়ার মেঘ। এক্সপ্রেস ট্রেন।

আধঘণ্টা ধরে চলল দারুণ রেস। ট্রেনে-মোটরে প্রতিযোগিতা। তারপর মাত্র বিশ গজের ব্যবধানে স্টেশনে আগে পৌঁছলাম আমরা।

তিন সেকেন্ড লাগল প্ল্যাটফর্মে উঠে সেকেন্ড ক্লাস কামরার সামনে পৌঁছতে। কিন্তু সে নেই। রাজা কঙ্ক মিলিয়ে গেছে।

রেগেমেগে বললাম, 'কী বোকা আমি। ট্রেন থেকেই আমাকে দেখেছে গাড়ির মধ্যে। নিশ্চয় লাফিয়ে পড়েছে চলন্ত ট্রেন থেকে।'

গার্ডসাহেব সায় দিলেন। প্ল্যাটফর্ম থেকে শ-দুই গজ আগে একজনকে তিনি দেখেছেন বাঁধ বেয়ে নেমে যাচ্ছে।

'ওই তো। ওই যে যাচ্ছে।...লেবেল ক্রসিংয়ে।'

তীরবেগে ছুটলাম। সরকারি সাগরেদ দুজনও এল পেছন-পেছন। কিন্তু তলাকান্ত দেখলাম খরগোশের মতো দৌড়োয়। আমাদের ছাড়িয়ে নকল রাজার নাগাল ধরে ফেলে আর কি। প্রমাদ গুণলাম আমি।

হাঁপাতে-হাঁপাতে একটা ঘন ঝোপের কাছে পৌঁছে দেখি তলাকান্ত চুপ করে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। পাছে আমরা খুঁজে না পাই তাই আর এগোয়নি।

'ভালোই করেছেন।' আন্তরিকভাবেই বললাম আমি। 'আপনি দাঁড়ান বাঁ-দিকে ওই ঝোপের আড়ালে, বাঁটলোবাবু যান ডানদিকের ঝোপে। আমি পেছন দিক থেকে তাড়া দিচ্ছি ওকে। বেরোলে আপনাদের সামনে দিয়েই বেরোবে। ও হ্যাঁ—বিপদে পড়লে গুলি ছুঁড়ব—মাত্র একবার।'

বলে ওদের দুজনকে পাঠিয়ে দিলাম ঝোপের মধ্যে। চোখের আড়াল হতেই আমি সোজা উঠে গেলাম এবং কাঁটাঝোপের ফাঁকে-ফাঁকে একটু ঘুরপথে এগোতেই দেখলাম নকল রাজা কঙ্ক আমার দিকে পেছন করে গুটি গুটি এগোচ্ছে।

লম্বা দুটো লাফ দিয়ে পড়লাম তার ঘাড়ে। হাতের রিভলভার ঘুরিয়ে সে চেয়েছিল আমাকে গুলি করতে। কিন্তু আমার যুযুৎসু তার চাইতেও বেশি চটপটে। নিমেষমধ্যে তাকে মাটিতে পেড়ে ফেলে বসলাম বুকের ওপর।

বললাম চাপা গলায়, 'উজবুক কাঁহাকার। আমি রাজা কঙ্ক। এক মিনিটের মধ্যে আমার নোটবই আর ভদ্রমহিলার ভ্যানিটিব্যাগ ফেরত দাও...তার বদলে পুলিশের খপ্পর থেকে তোমাকে রেহাই দেব, আর আমার দলে টেনে নেব। রাজি?'

'রাজি।'

উঠে দাঁড়ালাম আমি। লোকটা পকেট হাতড়ে একটা ছুরি নিয়ে তেড়ে এল আমার দিকে।

'গাধা কোথাকার' বলে বাঁ-হাতে তার ছুরিসুদ্ধ হাতের কবজি চেপে ধরে ডানহাতে প্রচণ্ড ঘুসি ঝাড়লাম ক্যারোটিড আর্টারির ওপর। একেই বলে 'ক্যারোটিড হুক্'—এক ঘুসিতেই এক লক্ষ সর্ষে ফুল দেখতে-দেখতে ঘুমিয়ে পড়ল হতভাগ্য।

কাগজপত্র, নোটের তাড়া—সবই পেলাম আমার নোটবইয়ে। লোকটার কাগজপত্র কৌতূহল ভরে দেখতে গিয়ে একটা খানে দেখলাম নাম লেখা রয়েছে বিম্পে ফিরিঙ্গি। বোম্বাই, কলকাতা, দিল্লির তিন-তিনজন শেঠজিকে গলা কেটে খুন করে যে চম্পটি দিয়েছে! বিম্পে ফিরিঙ্গি। সোনার বিস্কুট আর হিরের বুদ্ধ কোটিপতি মালহোত্রার তোষাগার থেকে গায়েব করে যে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছে।

বিম্পে ফিরিঙ্গি শুধু গলা কাটা খুনে নয়, ধুরন্ধর চোরও বটে। এতক্ষণে বুঝলাম, ট্রেনের কামরায় তাকে কেন অত চেনা মনে হচ্ছিল।

সময় বিশেষ নেই। দুটো একশো টাকার নোট খামের মধ্যে রেখে বাইরে লিখলাম:

'সুযোগ্য সহকারী বাঁটলো এবং তলাকান্তকে—রাজা কঙ্ক'

খামটা রাখলাম ঘাস জমির ওপর। মিসেস আচারীর ভ্যানিটিব্যাগটা ফিরিয়ে দেওয়া দরকার। ভদ্রমহিলা অনেক উপকার করেছে আমার। তাই ব্যাগটাও রাখলাম খামের পাশে। হিরে জহরতগুলো অবশ্য আমার পকেটে রাখলাম। বিজনেস ইজ বিজনেস! তা ছাড়া যার স্বামী ওইরকম বিচ্ছিরি চাকরি করে, তাকে করুণা করা সঙ্গত নয়...!

বাকি রইল বিম্পে ফিরিঙ্গি। দেখলাম, একটু-একটু করে জ্ঞান ফিরছে তার। কী করব একে নিয়ে? পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার অধিকার আমার নেই। ও কাজ যাদের তারা করুক।—

সুতরাং ওর রিভলভারটা পকেটে পুরলাম। আমার রিভলভার বার করে একবার মাত্র ফায়ার করলাম শূন্যে...

ছুটে আসুক তলাকান্ত আর বাঁটলো...আমি আমার পথ দেখি।

উলটো দিকে দৌড়োলাম। আসবার সময়ে দেখে এসেছিলাম গাড়িতে পৌঁছনোর শর্টকাট। সেই পথেই উঠে বসলাম মোরো-লিপটনে।

চারটের সময়ে টেলিগ্রাম করে দিলাম বন্ধুদের—বিশেষ কাজে এ-যাত্রা আর দেখা করা সম্ভব হচ্ছে না। দু:খিত।

ছটার সময়ে পৌঁছলাম কলকাতায়।

পরদিন সকালবেলায় যুগান্তরে পড়লাম বিম্পে ফিরিঙ্গির ধরা পড়ার কাহিনি :

চম্পকনগরের কাছে বেশ খানিকটা প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দেওয়ার পর বিম্পে ফিরিঙ্গিকে অ্যারেস্ট করিয়েছে রাজা কঙ্ক। গলাকাটা খুনে এবং ধুরন্ধর জহর-চোর ডেপুটি জেল সুপারের গৃহিণীর জড়োয়া চুরি করে সটকান দেওয়ার তালে ছিল। রাজা কঙ্ক যে ভ্যানিটিব্যাগে জড়োয়া গয়না ছিল, সেটি ফিরিয়ে দিয়েছে এবং দুজন সরকারি গোয়েন্দার সাহায্যে নাটকীয় গ্রেপ্তার সম্ভব হয়েছে, তাদেরকে মোটা বখশিশ দিয়ে গেছে।'

'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত। (১০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮১)

শনিবারের মড়া

নারায়ণী গোয়েন্দানীর এই তেরোতলার অফিসঘর থেকে পাতালরেলের খোঁড়াখুঁড়ি দেখা যায়। এ ঘরের পুরো পশ্চিমের দেওয়ালটা অদ্ভুত পুরু কাচ দিয়ে তৈরি। পশ্চিমে যখন সূর্য অস্ত যায় গঙ্গার ওদিকে, কালচে কাচ পড়ন্ত রোদ্দুরকে ফিলটার করে ঘরে ঢোকায়। পুরো ঘরখানায় তখন গোধূলির রহস্য ভাসতে থাকে। দিনের বেলায় এ ঘরে নকল আলোর দরকার হয় না। সূর্য তাঁর আলো পাঠান কালচে কাচের মধ্যে দিয়ে। মোটা পরদা দিয়ে ইচ্ছে করে খানিকটা কাচ ঢেকে রেখে দেয় নারায়ণী গোয়েন্দানী—যাতে বেশি আলো চোখের মধ্যে দিয়ে ঢুকে মাথা গরম না করে দেয়।

নারায়ণী গোয়েন্দানীর চোখ দুটো অবশ্য বেশ বড়ই—জগতের আলো আর অন্ধকার দুটোই একটু বেশি করে ঢুকে পড়ে—চোখের সুড়ঙ্গ দিয়ে পৌঁছয় মগজে। সমাজের ওপরমহল আর নিচের মহল—দুটো মহলের খবর রাখে। রাঘববোয়াল আর চুনোপুঁটি—সব্বাই তাই তাকে যমের মতো ভয় পায়।

কারণ, নারায়ণী গোয়েন্দানী রহস্যের কিনারা করে দেয় বটে—কিন্তু সোজাপথে করে না। এক পয়সা দক্ষিণাও নেয় না। আইন-টাইন কিচ্ছু মানে না। ছুঁচবুদ্ধি, গণ্ডারের গোঁ, সিংহের সাহস, আর হাতির শক্তি নিয়ে ও বদমাশ ঘায়েল করে, ষড়যন্ত্র ছিন্নভিন্ন করে, ছদ্মবেশীর মুখোশ ছিঁড়ে উড়িয়ে দেয়—গরিবকে বাঁচায়, অত্যাচারের অবসান ঘটায়।

হ্যাঁ, এতগুলো গুণের সঙ্গে আরও একটা উপাদান ও মিশিয়ে দেয় কাজ উদ্ধারের সময়ে। ওর রূপ। শান্তশিষ্ট অবস্থায় মা লক্ষ্মী বলে মনে হয় বটে, কিন্তু রণক্ষেত্রে যখন নামে, তখন ওর বড়-বড় চোখ দুটো দিয়ে ধকধক করে আগুন ছিটকোয়, তখন ওর দশবাই চণ্ডীরূপ দেখে মূর্ছা যেতে পারলে বেঁচে যায় কুটিলকরাল কুচক্রীরা।

মানুষ গড়ার কারিগর নারায়ণী গোয়েন্দানীকে বানিয়েছিলেন আরও অনেক বিচিত্র উপকরণ দিয়ে। সেসব একটু-একটু করে প্রকাশ পাবে। হাতির মতো বিরাট দেহ তো ওর নয়—ছিপছিপে হিলহিলে যেন এক নাগিনী। কিন্তু ক্যারাটে ফ্যারাটে শিখে একাই দশজনের মহড়া নিতে পারে। অবিশ্বাস্য বেগে ঘুরতে থাকে তখন ওর মা লক্ষ্মীর মতো বডিখানা—শত্রুদের হাড়গোড় ভেঙে পঙ্গু করে দেয় চক্ষের নিমেষে।

কলকাতা এখন একটা আজব জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গোটা দেশটাই তাই হয়েছে—কলকাতার আর দোষ কি। এ দেশে এখন যে যত কুকর্ম করতে পারবে—সে তত শিরোপা পাবে। কুকাজের অবসান ঘটানোর জন্যে অলিতে-গলিতে এখন ডিটেকটিভরা দোকান খুলে বসেছে। কেউ বলছে আমি 'গোমেশ গোয়েন্দা'। এরা যে-যার পাড়ার রহস্যসন্ধানের ব্যবসায় নেমেছে।

নারায়ণী গোয়েন্দানী কিন্তু ব্যবসা-ট্যবসা বোঝে না। ও স্রেফ ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ায়। যেহেতু গোঁফ দেখলেই ও শিকারি বেড়াল চিনতে পারে—তাই ওর হাতে রক্ষে নেই দুর্জনের।

আজব শহর কলকাতায় ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটাতেই আবির্ভূত হয়েছে গোয়েন্দানী নারায়ণী। অপকর্ম দিয়ে অপকর্মের অবসান ঘটাতে তার তিলমাত্র অরুচি নেই। এইসব কারণেই তার কীর্তিকাহিনি লিখতে চাইনি এতদিন। হয়তো অপকর্মকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়ে যাবে। কিন্তু উদ্দেশ্য যখন সাধু হয়, তখন...

নারায়ণীর মতো রূপসী মেয়ে সচরাচর চোখে পড়ে না। কিন্তু বিখ্যাত সেই প্রবাদের মতো তার রূপ নয়। প্রবাদটা যাঁদের এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না, তাঁদের অবগতির জন্যে জানাই :

ইষ্টকালয়, শ্যামা নারী, বটচ্ছায়া, কৃপাবারি।

এইসব কে না চায়? ইটের বাড়ি, কালো মেয়ে, বটের ছায়া আর দয়ার দান।

নারায়ণী কিন্তু এই ফরমুলায় পড়ে না। সে মোটেই কালো নয়, অথচ তাকে দেখলেই সব পুরুষই ড্যাবড্যাব করে চেয়ে থাকে। তার গায়ের রঙটা কীরকম জানেন? এরকম গাত্রবর্ণ শুনেছি নাকি শুধু রূপকথার রাজকন্যেদেরই থাকে। প্রথম পরিচয়ের সময়ে আমি কিন্তু নারায়ণীর গায়ের রং দেখে ফস করে বলে ফেলেছিলাম, 'এক বাটি দুধে একটু আলতা মিশিয়ে দিয়ে গায়ে মেখেছেন নাকি?'

নারায়ণী তখন ওর দাঁতের ঝিলিক দেখিয়ে বলেছিল (দাঁত তো নয়, কোথায় লাগে সিংহলী মুক্তো), 'গালটা একটু চেটে দেখবেন?...'

শুধু আমিই লজ্জায় লাল, মানে বেগুনি হয়ে গেছিলাম। (কারণ আমি কালো মহাদেশের মানুষদের মতোই তিমির বর্ণের অধিকারী)।

যাক সেই প্রথম পরিচয়ের কথা। নারায়ণী গোয়েন্দানীর অভিনব কীর্তিকলাপ আমাকে এমনই অভিভূত করেছে যে, তার সর্বশেষ কীর্তিটি সবিস্তারে আপনাদের সমীপে উপস্থিত করার অনুমতি প্রার্থনা করছি।

আবেদন মঞ্জুর? তাহলে শুনুন!

নারায়ণীর কথা লিখতে গেলে আমার কথাও একটু বলতে হবে। আমি লোকটা একেবারেই ছাপোষা। আমার এমন কিছু এলেম নেই যে পাঁচজনের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি। অথচ চেষ্টার কসুর করিনি। আমার মা-বাবা পটকে গেছে কোনকালে; ভাইবোন আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। আমি থাকি মুচিপাড়ার নেবুতলা পার্কের কোণের মেসবাড়িতে। আমি চেষ্টা করেছিলাম ফিল্ম ডিরেক্টর হতে, সাংবাদিক হতে এবং লেখক হতে—যেগুলো হতে গেলে মগজের পুঁজি বেশি দরকার হয় না—পকেটে টাকা না থাকলে হওয়া যায় (এর ব্যতিক্রম আছে নিশ্চয়—আমি সে দলে পড়ি না)। এত ঘাটে জল খাওয়ার ফলে আমার যোগাযোগ অনেক—সাদা বাংলায়, আমার আড্ডাখানার শেষ নেই। ছেলেদের সঙ্গে যেমন রকবাজি করি, ঠিক তেমনি মেয়েদের সঙ্গেও গুলতানি চালাই। সবাই আমাকে পছন্দ করে। ফিল্ম লাইন আর লেখাজোখার লাইনে একটা ম্যাজিক আছে। এ লাইন যে ছুঁয়ে থাকে, তাকেই সবাই ম্যাজিশিয়ান মনে করে।

আমাকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে মেয়েরা। আমাকে দেখলেই দাঁত বের করে হেসে গায়ে ঢলে পড়ে কতরকম রগড়ই না করে। কারণ কী জানেন? আমি নির্বিষ। আমি কুৎসিত। গরিলা আর মানুষের মধ্যে আমি একটা মিসিং লিঙ্ক। আমার হাইট সাড়ে চার ফুট। গুহামানবদের কপাল যেরকম কার্নিশের মতো সামনে ঝুঁকে থাকত, আমার বিরাট কপাল ঠিক সেইভাবে অনেকখানি এগিয়ে এসে দুটো চোখের ওপর ঝুলে থাকে। কার্নিশ থেকে লম্বা-লম্বা ভুরুর লোম যখন ঝুলে পড়ে, তখন চোখে ঢুকে গিয়ে চোখের মধ্যে কড়কড়ানি শুরু করে দেয়। সে এক বিচ্ছিরি অবস্থা। আমার গালের হনু দুটোও ছোট টিলার মতো উঁচিয়ে থাকে। এমনকী আমার চোয়াল বেধড়ক বড় হওয়ায় ওপরের দাঁতের পাটিকে পেছনে রেখে এগিয়ে থাকে সামনে আধইঞ্চির মতো। আমার ঘাড় আছে কিন্তু গর্দান নেই। তাই বিশাল চিবুক ঠেকে থাকে লোমশ বুকে। কাঁধ দুটো ষাঁড়ের কাঁধের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। ধড়টা যে অনুপাতে নিরেট আর বিরাট—পা দুটো সেই অনুপাত মেনে চলেনি; দুটো পা-ই বেঁটে আর বাঁকা। আমি অষ্টপ্রহর পাঞ্জাবি আর পাজামা পরে থাকি গরিলা আকৃতিটাকে কিঞ্চিৎ সভ্যভব্য করে তোলার জন্যে।

এ রকম চেহারার ব্যাটাছেলেকে কোনও মেয়েছেলেই ভালোবাসতে পারে না—মানে, প্রেমের পুরুষ করে তুলতে পারে না—কিন্তু তাকে নিয়ে অনায়াসে রঙ্গপরিহাস করা চলে। আমিও আমার গজালের মতো দাঁত বের করে হাসি। তাই আমি সবার প্রিয়।

কলেজ স্ট্রিটে আমার একটা ডেরা আছে। এক প্রকাশকের খাস কামরায়। এখানে জলপথের বিহার করতে অনেক কেষ্টবিষ্টু আসেন। জলপথে মানে বুঝলেন না? বড্ড ব্যাকডেটেড আপনি। কলেজ স্ট্রিটে লক্ষ্মী, সরস্বতী আর গণেশের উপাসকরা দুটো পথে পরিভ্রমণ করেন। একটা বিদ্যাসাগরীয় পথ—সেটা স্থলপথ;

রঙিন জলের স্কোপ এ পথে নেই। আর একটা মধুসূদনীয় পথ—এটা জলপথ; এখানে রঙিন জলের ফোয়ারা ছোটে। রঙিন জলের ব্যাখ্যা নিশ্চয় করতে হবে না। সিরাজি এখন কালচারের ওপিঠ।

আমি এই আড্ডায় প্রায় যেতাম অফুরন্ত সময়ের কিছুটা কাটানোর জন্যে। প্রকাশক ছোটখাট কাজ দিতেন আর লাল-হলুদ-সাদা জল খাওয়াতেন। এই আড্ডাতেই একদিন জমে গেলাম নারায়ণীর সঙ্গে।

নারায়ণীর যে রূপ পরে দেখেছিলাম, প্রথম পরিচয়ে কিন্তু তার ছিটেফোঁটাও চোখে পড়েনি। ভারি ভদ্র, ভারি মিষ্টি, নিপাট সুন্দরী মেয়ে। চোখ-মুখ-দাঁত-নাক-চিবুক সবই যেন সাদা পাথর কেটে বানিয়েছে এক ভাস্কর যিনি কামিনীকে দামিনী করার গুপ্ত কৌশল রপ্ত করে ফেলেছেন। এই দামিনীর ঝলক মাঝে-মাঝে টের পেতাম নারায়ণীর বড়-বড় চোখের মধ্যে। কণ্ঠ তখন রণরণিয়ে উঠত—এর বেশি কিছু না। এই মেয়েই যে পরে তার ভয়ঙ্করী রূপ দেখিয়ে থ করে দেবে দুর্জনদের—তা কল্পনাও করতে পারিনি।

আমার সঙ্গে বিলকুল জমে গেছিল নারায়ণী। 'বিউটি অ্যান্ড দ্য বীস্ট' উপন্যাসটা যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা আমাদের মুখোমুখি ছবিটা আন্দাজ করে নিতে পারবেন। আমাদের প্রকাশক বন্ধুটি বিলক্ষণ রসিক পুরুষ এবং জলপথে দীর্ঘকাল ভ্রমণ করছেন। তাঁর আপ্যায়নকে আমরা অপমান করতে পারতাম না। আমি আর নারায়ণী দুজনেই জলপথের পথিক হয়ে যেতাম। সেই সময়ে খুলে যেত ওর মনের আগল। হুড়হুড় করে বলে যেত নিজের কথা। দিদি মরে যাওয়ার পর জামাইবাবুর আশ্রয় থেকে চলে এসেছে। দিদির শেষ ইচ্ছে ছিল যেন জামাইবাবুর হাতে সিঁথিতে সিঁদুর পরে নেয়। কিন্তু নারায়ণী তো অন্য ধাতু দিয়ে তৈরি হয়েছিল। অত্যাচারী এই সমাজটার ওপর সীমাহীন আক্রোশ বুকের মধ্যে নিয়ে ও ঘরছাড়া হয়েছিল। থাকত একটা মেয়েদের হস্টেলে—ভবানীপুরে। খরচপত্র জুটিয়ে নিত টিউশনি আর প্রুফ দেখে। এরই মধ্যে পড়াশোনা চালিয়েছে আর গড়েছে নিজেকে। আজকাল মার্শাল আর্ট অনেক রকম বেরিয়েছে। নারায়ণী সেই বিদ্যে দিয়ে ওর নরম তুলতুলে শরীরটাকে প্রয়োজনের মুহূর্তে শতঘ্নী অস্ত্র বানিয়ে তুলতে পারে—একই সময়ে একশো লোককে নাকি ঘায়েল করতে পারে। ওর হাত আর পা তখন চারখানা গদা হয়ে যায়—হাতের মুঠো দুটো হয়ে যায় দুটো লোহার বল।

জলপথে ভ্রমণবীরদের মুখে এরকম আস্ফালন ঢের-ঢের শুনেছি—আর এ তো বীরাঙ্গনা। কাজেই বিশ্বাস করতাম না একবর্ণও। তবে অবাক হয়ে যেতাম অকপট কথাবার্তা শুনে। মনের মধ্যে কোনও কপাট তো রাখেইনি—লজ্জা-ফজ্জারও ধার ধারত না। সিগারেট টানতে-টানতে কামসূত্র নিয়েও দিব্যি আড্ডা চালিয়ে গেছে। বাৎস্যায়ন মুনি কত রকম আসনের বর্ণনা দিয়ে গেছেন এবং কোনটা কোনদিক দিয়ে উৎকৃষ্ট, তার নিপুণ ব্যাখ্যা দিয়ে তাক লাগিয়ে দিত আমাদের। আমি আমার গরিলা-চোয়াল ঝুলিয়ে ফেলে তাজ্জব গলায় বলতাম, 'তুই তো বিয়েই করিসনি—এত খবর জানলি কী করে?'

অমনি প্রাণখোলা হাসি হেসে নারায়ণী বলত, 'তুই কী করেছিস?'

এই হল নারায়ণী। দেখলে মনে হয় মা লক্ষ্মী—বাংলার বধূ, মুখে তার মধু, নয়নে নীরব ভাষা। কিন্তু জমে গেলেই ঠেলা বুঝবেন। তখন সে জীবন্ত শতঘ্নী। মা দুর্গার রূপটা দেখেছিলাম পরে। ক্রমে-ক্রমে আসছি সে প্রসঙ্গে।

সে ব্যাপারে হোতা ছিলাম কিন্তু আমিই। গুচ্ছের বিলিতি বই পড়তাম। কলেজ স্ট্রিটের পুরোনো বইয়ের দোকান থেকে জলের দামে লোমহর্ষক রহস্য উপন্যাস কিনতাম। একদিন পড়লাম সাইমন টেম্পলারের কাহিনি। 'সেন্ট' অর্থাৎ সন্ত নামে যে দুর্জনদের কাছে একটা বিভীষিকা। সমাজের দুর্গ্রহদের সে টাইট দিত আইন-ছাড়া পথে—রেখে যেত একটা স্কেচ।—সেন্ট-এর নিজের হাতে একটানে আঁকা দেহরেখা।

নারায়ণী বইটা আমার কাছ ছেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছিল। দুদিন বাদে ফেরত দিল। সেই সঙ্গে দেখাল পেনসিলে আঁকা একটা স্কেচ।

স্কেচ দেখেই বুঝেছিলাম 'সেন্ট'-এর প্রভাব ওর ওপর পড়েছে। নিজেও তাই বললে, 'নরহরি, এই হল আমার প্রতীক। সমাজের আঁচিলদের শায়েস্তা করব এই প্রতীক পাঠানোর পর।'

আমার নামটাই এতক্ষণ বলা হয়নি। নরহরি সরকার। জাতে কায়স্থ। কিন্তু গরুর মাংসও খেয়েছি। শুওর আরও ভালো লাগে। ভালো লাগে নারায়ণীকেও। নারায়ণীও আমাকে দারুণ পছন্দ করে। কিন্তু তাই বলে যেন কেউ ভাববেন না আমরা প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি। ওসব ছেনালিপনা আমাদের মধ্যে নেই। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও একটা আড়াল থাকে—সব কথা বলা যায় না; ভাইবোন আর বন্ধুবান্ধবীদের মধ্যেও রেখে ঢেকে কথা বলতে হয়। কিন্তু নরহরি আর নারায়ণীর মধ্যে কোনও কথাই আটকায় না। দুজনেই দুজনের কাছে দুটো তেপান্তরের মাঠ। তাই তো আমাদের জলপথের পথিক প্রকাশক বন্ধুটি আমাদের নাম দিয়েছেন—নর-নারায়ণী।

আমি আগেই নিজের গাওনা গেয়ে নিচ্ছি এই কারণে, যে এর পর থেকে শুধু নারায়ণী স্তোত্রপাঠই করতে হবে। নারায়ণীর গায়ের রঙের সঙ্গে আমার গায়ের রঙের আশমান-জমিন ফারাক আছে, সে কথা আগেই লিখেছি। কালার কমপিটিশনে আমি দাঁড়কাককেও হারিয়ে দিতে পারি। উপরন্তু এই গরিলা-ফিগার। কাজের মধ্যে ভ্যারান্ডা ভাজা। ট্যাঙস-ট্যাঙস করে কলকাতায় চক্কর না মারলে আমার বেঁটে আর বাঁকা পা কটকট করে। পাঁচজনের চোখে আমি একটা পয়মাল। কিন্তু নিশ্চয় নারায়ণীর কাছে নয়। তাই সে একদিন আমাকে বলেছিল, 'নরহরি, আমি হব কলকাতার প্রথম মেয়ে ডিটেকটিভ।' আমি বলেছিলাম, 'তোকে কেটে ফেলবে, খুবলে-খুবলে খাবে, ধর্ষণ পর্যন্ত করে ফেলতে পারে। কলকাতার দোগলাবাজদের তুই চিনিস না।' নারায়ণী হেসে গড়িয়ে পড়ে বলেছিল, 'তুই সত্যিই আর জন্মে গরিলা ছিলিস। মানুষ মেয়েদের এখনও চিনতে পারিসনি। মেয়েদের বুদ্ধি, মেয়েদের হিসেব, মেয়েদের সাহস তোদের চেয়ে বেশি। ঘাটতি ছিল শুধু গায়ের জোরে। মার্শাল আর্ট শিখে সেদিকেও মেরে দিয়েছি। মেয়েদের সবচেয়ে বড় গুণটা কী বলতো?' আমি বলেছিলাম, 'চোখ মারা। ভদ্রভাষায় কটাক্ষ।' ও বলেছিল, 'তুই একটা গাধা। মেয়েদের মোক্ষম মারণাস্ত্র হল তাদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। ইনটিউশন। এর সঙ্গে আমি আরও দু-চারটে বিদ্যে শিখে নিয়েছি। এক নম্বর হল বডি ল্যাঙ্গুয়েজ। যে-কোনও মানুষের হাত-পা-চোখ-মুখের ভঙ্গিমা দেখেই আঁচ করতে পারি তার মনের চেহারা—এর জন্যে টেলিপ্যাথি জানার দরকার হয় না। এই সঙ্গে জানি আর একটা বিদ্যে। পৃথিবীর যে-কোনও ভাষা একবার শুনেই উলটোদিক থেকে বলে যেতে পারি—বলার শব্দটাকেই শুধু নকল করি। এটা আমার কোড ল্যাঙ্গুয়েজ। নারায়ণী গোয়েন্দানীর সাংকেতিক ভাষা।'

আমি বলেছিলাম, 'নারায়ণী গোয়েন্দানী। এটা একটা নাম হল?'

ও বললে, 'মাই ডিয়ার হাফ-গরিলা, আমার এই অভিযানে তোকে মাঝে-মাঝে শাগরেদি করতে হবে। কেননা, তোর মতো ভিজে বেড়াল চট করে খুঁজে পাওয়া যায় না। আমার কোড ল্যাঙ্গুয়েজটা তোকে শিখে নিতে হবে। শত্রুদের সামনেই হয়তো এই ভাষায় কথা বলব—লোকে ভাববে ভয়ের চোটে আবোলতাবোল বকচি। ট্রেনিং এখুনি শুরু করছি : নায়ন তাকিচ নিরীহ লাঞ্চচ। কী বুঝলি?'

আমার কানের মধ্যে ঝমঝমাঝম করে যেন একটা অজানা গানের পশলাবৃষ্টি হয়ে গেল। কিচ্ছু না বুঝে গজাল দাঁত বের করে হেসে ফেললাম। রেগে নিয়ে নারায়ণী বললে, 'তুই একটা আস্ত মর্কট। নায়ন তাকিচা নিরীহ লাঞ্চচ। শুধু শব্দ শুনে উলটোদিক বুঝতে পারছিস না? চঞ্চলা হরিণী চকিতা-নয়না। হল?'

নারায়ণী কিন্তু এই ভাষা আমাকে শিখিয়ে ছেড়েছিল।

এর পর থেকেই নারায়ণীর সঙ্গে কলেজ স্ট্রিটের জলপথ জাহাজঘাটায় তেমন আর দেখাসাক্ষাৎ হত না। বেশ কিছুদিন যেন উবেই গেছিল। তারপর পরপর দুটো পিলেচমকানো ঘটনা ঘটিয়ে ছেড়েছিল এই কলকাতায় আর আশেপাশে। আক্কেল গুড়ুম করে ছেড়েছিল পুলিশমহল আর মুখোশধারী শয়তানদের। সে দুটো ব্যাপারে আমার কোনও হেল্প নেয়নি। বলেছিল, 'এখন হাত পাকাচ্ছি। ইনকাম ভালোই হচ্ছে। সমাজের বুকে বসে যারা গরিবদের রক্ত শুষে খাচ্ছে পুলিশ প্রোটেকশন নিয়ে তাদের রক্তমোক্ষণ করিয়ে দেওয়ার মধ্যে একটা চার্ম আছে। সেই রক্ত মানে বস্তাপচা কালো টাকা দিয়ে সর্বহারাদের উপকার করে যাচ্ছি। আমার একটু কমিশন রেখে দিচ্ছি অবশ্য। নইলে এসটাব্লিশমেন্ট চালাব কী করে।'

এসব কথা বলেছিল ওর তেরোতলার অফিসঘরে বসে। এইরকম খানদানি এলাকায় এরকম একটা ঘর ম্যানেজ করল কী করে, ভেবে অবাক হয়ে গেছিলাম। লিফট থেকে নেমেই বাঁ-হাতি দরজা। কালো কাচের পাল্লা। ভেনেসিয়ান ব্লাইন্ড দিয়ে ঢাকা। ওপরে কাচের ওপর সোনালি সুতো দিয়ে আঁকা ওর সেই নারায়ণী স্কেচ। তলায় কিছু লেখা নেই। আমি ইতিউতি তাকাচ্ছিলাম কলিংবেল-এর বোতাম টিপব বলে, এমন সময় প্রায় কানের কাছে শুনলাম নারায়ণীর হাসি আর বিদ্রূপবচন, 'ওরে-ওরে মর্কট, চলে আয় ভেতরে, দরজা খোলাই আছে, হেলেদুলে আয় রে!'

নারায়ণীর এরকম ফচকেমি আমার গা-সওয়া। তাই কিচ্ছু মনে করলাম না। পাল্লা ঠেললাম। খুলে গেল। ভেতরে ঢুকে ছেড়ে দিলাম, আপনিই বন্ধ হয়ে গেল। দেখলাম খাঁটি কাশ্মিরী কার্পেটে মোড়া একটা দারুণ ঘরে দাঁড়িয়ে আছি। এ ঘরের মেঝেতে কার্পেট, দেওয়ালে কার্পেট, কড়িকাঠে কার্পেট। প্রকৃতই কার্পেটকক্ষ। নেই শুধু নারায়ণী। কেউই নেই।

শুনলাম আবার সেই খিলখিল হাসি আর বিচ্ছিরি ইয়ারকি, 'ওরে আয়, ওরে আয়, ওরে আয়—দরজা ঠেলে চলে আয়!'

তাকিয়ে দেখি, সামনে দরজার মতো কী একটা রয়েছে বটে, আমি তো ভেবেছিলাম পারস্যের কার্পেট। সোনালি হাতল চোখে পড়তেই সেটা আঁকড়ে ধরলাম। অমনি গোটা পাল্লাটা সাঁৎ করে বাঁ-দিকের দেওয়ালে ঢুকে গেল!

চমকে উঠেছিলাম। দরজার এরকম ব্যবহার আমি আশা করিনি।

তারপরেই দেখেছিলাম এই কাহিনির নায়িকা গোয়েন্দানী নারায়ণীকে (আমাকে নায়ক যদি মনে করে থাকেন, তাহলে মস্ত ভুল করলেন—আমি যে কী তাই আমি জানি না)।

নারায়ণী ওর ভুবন-ভোলানো হাসি হেসে আমার দিকে তাকিয়েছিল। এতদিন পরে দেখে আমার তাক লেগে গিয়েছিল। মেয়েদের একটু মেজে-ঘষে দিলে দেখতে আরও ভালো হয়। নারায়ণী কী দিয়ে মেজেছে নিজেকে? এরকম অপ্সরার মতো লাগছে কেন? কাচের ঘরের জেল্লার জন্যেও চেহারা হয়তো আরও খুলে গেছে। পাজামা পাঞ্জাবি পরা এই হাফ-গরিলা যে নিতান্তই বেমানান এখানে!

নারায়ণী বললে, 'নরহরি, তোর বাঁকা পা আরও বেঁকে গেছে। বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বলছে, তুই ঘাবড়ে গেছিস—মুখ যদিও নির্বিকার। বোস। এ ঘর আমি ম্যানেজ করেছি খোদ পুলিশ কমিশনারের কৃপায়—তাঁর একটা ছোট্ট উপকার করে দিয়েছিলাম। উনিই দরজার বাইরে টিভি ক্যামেরা বসিয়ে রেখেছেন—এই দ্যাখ স্ক্রিন—এখানে বসেই আমি দেখতে পাই এল কোন মক্কেল। কোড ল্যাঙ্গুয়েজটা ভুলে যাসনি দেখে আই অ্যাম গ্ল্যাড।'

মেসবাড়ি থেকে টেলিফোনে ডেকে পাঠিয়েছিল নারায়ণী। তিনতলা বাড়িতে ফোন একটাই। ওর ফোন যখন গেছিল, আমি তখন আমার মাসিক ২৬২ টাকার তক্তপোশে শুয়ে দৈনিক গল্প-পত্রিকা পড়ছিলাম। বেড়ে গল্প লেখে প্রতিদিন—মনে হয় যেন টাটকা খবর। এমন সময়ে শুনলাম-কে একটা মেয়েছেলে আমাকে ডাকছে।

মেসের চাকর এসেই দিয়ে গেল খবরটা। মেয়েছেলেদের পাতে পড়বার যোগ্য আমি নই, তা সে জানে। তাই মুচকি হাসল না।

লুঙ্গি সামলে নিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলে নিয়ে যেই বলেছি 'হ্যালো', অমনি নারায়ণীর কোড ল্যাঙ্গুয়েজে কলকলিয়ে উঠেছিল খোদ নারায়ণীর কণ্ঠস্বর—

রকারদ ইকেমাতো

সয়ে লেচ রেক টচ

রকারস রিহরন

রেমাতো ছিনেচি ছিনেচি।

একবার শুনেই শিহরণ বয়ে গেছিল শিরদাঁড়া দিয়ে। এ যে মদ্দানি নারায়ণীর পেটেন্ট ভাষা!

বলেছিলাম, 'আর একবার হোক, আর একবার।'

তখন নারায়ণী টেলিফোনের তারের মধ্যে দিয়ে যে হাসিখানা পাঠিয়েছিল, তা শুনলে (আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি) যে-কোনও মুনি-ঋষির শরীরে উত্তেজনা ঘটে যেত। আমি কিন্তু রইলাম নির্বিকার (জিনিসই আলাদা) এবং শুনলাম আজব ভাষার পুনরাবৃত্তি। মানেও করে নিলাম তক্ষুনি। নারায়ণী ছড়া কাটছে এইভাবে :

চিনেছি চিনেছি তোমারে

নরহরি সরকার

চট করে চলে এস

তোমাকেই দরকার।

ঠিকানা নিলাম। চলে এলাম এই তেরোতলার মুকুরমহলে।

আমি চেয়ার টেনে নিয়ে বসতেই নারায়ণী টেবিলের তলা দিয়ে নিজের পা দুখানা ছড়িয়ে দিল সামনে। শিরদাঁড়াটাকেও হড়কে নামিয়ে নিল পিঠ-উঁচু গদি চেয়ারের ওপর দিয়ে। কাঁধের হলুদ শাড়ির আঁচল খসে পড়ল হেঁচড়ানির ফলে। ওর তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই।

আমি বললাম, 'আমাকে কি নাগর পেয়েছিস? ওইভাবে বুকের আঁচল খসালি কেন? খোলা বুক উঁচিয়ে বসাটা বেহায়া মেয়েদের সাজে।'

ও বললে, 'তোকে আমি ছেলে বলেই মনে করি না। তাই তো এত ভালোবাসি।'

আমিও বললাম, 'তোকেও আমি মেয়ে বলে মনে করি না, তাই তো এত কাছে আসি।'

ও বললে, 'এটা আড্ডায় জায়গা নয়—কাজের জায়গা।'

আমি বললাম, 'কী কাজ?'

ও বললে, 'মন্টেগু জন ড্রুইট খুব সম্ভব কলকাতায় পুনর্জন্ম নিয়েছে। চিনিস মন্টেগুকে? গুড। স্কটল্যান্ডের সন্দেহ, এই ছোঁড়াই জ্যাক দ্য রিপার নাম নিয়ে লন্ডনের ইস্ট এন্ডে পরপর ছজন বেশ্যাকে খুন করে কেটে ছিঁড়ে ফালা-ফালা করেছিল। মাংস কেটে নিয়ে নিয়ে ছবি ঝোলানোর পেরেকে টাঙিয়ে রেখেছিল, নাড়িভুঁড়ি চেঁচে বের করে নিয়েছিল, হার্ট, কিডনি, ব্রেস্ট কেটে নিয়ে টেবিলের ওপর পাশাপাশি সাজিয়ে রেখেছিল, মুখ চিরে ফালা-ফালা করেছিল, নাক আর কান কেটে রেখেছিল, গলা কেটে দু-টুকরো করেছিল। কসাই-এর অধম হলেও ছিল তার কবিত্ববোধ। তার লেখা একটা কবিতা আজও রেখে দিয়েছে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড।'

আমি বললাম, 'সে কবিতাটা এই :

I'm not a butcher,

I'm not a yid,

Nor yet a foreign skipper,

But I'm your own light-hearted friend,

Yours truly, Jack the Ripper."

নারায়ণী বললে, 'তোর গরিলা ব্রেনের শার্পনেস দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি। নরহরি, জ্যাক দ্য রিপার আত্মহত্যা করেছিল আজ থেকে ঠিক একশো চার বছর আগে। মেয়েখুনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সে নিশ্চয় ফের জন্ম নিয়েছে ধরাধামে—এবার এই কলকাতায়।'

আমি গালে হাত দিয়ে বললাম, 'একদিক দিয়ে ভালোই করেছে। বড্ড এডস রোগ ছড়াচ্ছে বেশ্যারা।'

'বেশ্যা নয়, ধরেছে বাড়ির বউদের।'

সত্যিই আঁতকে উঠলাম—'ক'টা খুন হয়েছে? কোথায়? কাগজে বেরোয়নি কেন?'

'হয়েছে আপাতত একটা। কাল রাতে। কাগজওয়ালারা এখনও খবর পায়নি। কাল ছিল শনিবার। কথায় আছে, শনিবারের মড়া দোসর চায়, তাই আরও মৃত্যু আসন্ন বলেই আমার বিশ্বাস। অবলা মেয়েদের এইভাবে যে খুন করে, আমিও তাকে খুন করব। তোকে শুধু একটা কাজ করতে হবে।'

আমি বললাম, 'হয় তুই বেশি হুঁশিয়ার, না হয় বাতিকে ভুগছিস। আইবুড়ো থাকলে ও রোগ হয়। ধরে নিয়েছিস, জ্যাক দ্য রিপার নতুন জন্ম নিয়ে মেয়ে খুন শুরু করেছে। যেহেতু শনিবারে মড়া পড়েছে অতএব আরও খুন হবে। কিন্তু তোকে তো খুন করবে না। তুই বয়ে একার, শয়ে য-ফলা আকার নস, তুই কারও বউও নস, তোর ভয় কী?'

নারায়ণী বললে, 'ব্যাপারটা আগে শোন। তারপর ফুট কাটিস। এই যে বাড়িটায় বসে আছিস, এটা ইংরেজি E অক্ষরের প্যাটার্নে তৈরি। এই কমপ্লেক্সে মোট ফ্ল্যাটের সংখ্যা ২৯৩। এত বড় ফ্ল্যাটবাড়ি গোটা ওয়েস্ট বেঙ্গলে আর নেই। এখানে ব্যবসা চলছে, ফ্যামিলি নিয়ে থাকাও হচ্ছে। এক ফ্ল্যাট থেকে আর এক ফ্ল্যাট দেখা যায়। ইচ্ছে করেই তা করা হয়েছে—যাতে ২৯৩টা ফ্ল্যাট মালিকদের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই বিল্ডিংয়েরই ১২৩ নম্বর ফ্ল্যাটে মিসেস সাহানা সিকদারকে কাল রাতে জন্মান্তরিত জ্যাক দ্য রিপার মাথা থেকে পা পর্যন্ত ক্ষুর চালিয়ে সরু-সরু করে ফালি করে রেখে গেছে। গলাও দু-টুকরো করেছে। শুধু রেপ করেনি। রক্তমাখা ক্ষুরখানা রেখে গেছে। কাঠের বাঁটে তার বুড়ো আঙুলের ছাপও পাওয়া গেছে।'

'সাহানা সিকদারের স্বামী তখন কোথায় ছিলেন? ছেলেমেয়ে?'

'স্বামী রয়েছেন ব্যাঙ্গালোরে—অফিস থেকে পাঠিয়েছে সেখানকার হেড-অফিসে—ফেরার কথা পনেরো দিন পর—কিন্তু খবর চলে গেছে। আজকের ফ্লাইটেই ফিরছেন। ওঁদের কোনও ছেলেমেয়ে নেই। সাহানার বয়স ছাব্বিশ। স্বামী সুজন সিকদার মাত্র দু-বছরের বড়। সাহানাকে আমি দেখেছি। খুব একটা আহামরি রূপসি নয়। হিংসে করে বলছি, ভাবিসনি যেন, সাহানার রং মাঝারি, অতিরিক্ত স্মোকিং-এর ফলে দাঁতে ছোপ পড়েছে, হাসলে চোখের কোণ আর ঠোঁটের কোণে চামড়া ইকড়িমিকড়িভাবে ভাঁজ খেয়ে যায়। স্বামীকে মাসের মধ্যে দিন পনেরো কলকাতার বাইরে থাকতেই হয়। তখন সাহানা একপাল পরপুরুষ নিয়ে গাড়ি নিয়ে বেরোয়—মানে বেরোত। বাড়িতেও অনেক রাত পর্যন্ত হুল্লোড় চলত।'

'তুই জানলি কী করে?'

হাসল নারায়ণী, 'হাজার হোক মেয়ে হয়ে জন্মেছি, কেচ্ছা জানবার কৌতূহল তো আছেই। এই ঘর থেকেই দেখা যায় ১২৩ নম্বর ফ্ল্যাট। আয় দেখাচ্ছি।'

গদিচেয়ার ছেড়ে ওঠবার আগে বেঁকে গিয়ে, টেবিলের ড্রয়ার টেনে একটা বাইনোকুলার বের করল নারায়ণী। তারপর গেল পশ্চিম দিকের দেওয়ালের কাছে। এখানে কাচ নেই। ইটের দেওয়ালে সারি-সারি তাকে বিস্তর বই। সবই ক্রাইমের বই। খাড়াইভাবে রাখা বইয়ের ভিড়ের ওপর শুইয়ে রাখা হয়েছে ফ্রেডরিক ফোরসাইথ-এর লেখা 'দ্য নিগোসিয়েটর' বইখানা। এই বইয়ের প্লট নকল করেই খুন করা হয়েছে রাজীব গান্ধীকে। বুঝলাম নারায়ণী বইটা ফের পড়ছিল।

আমি যখন বই দেখছি, নারায়ণী তখন তাক-ভর্তি দেওয়াল ধরে টানছে। কাঠের পাল্লার ওপর বই রাখায় দরজা দেখা যাচ্ছিল না। এখন তা খুলে গেল। এসে দাঁড়ালাম ব্যালকনিতে। চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে ফোকাস করে নিল নারায়ণী। তারপর আমার হাতে তুলে দিয়ে বললে, 'দ্যাখ।'

১২৩ নম্বর ফ্ল্যাটের দরজা-জানলা সব বন্ধ।

নারায়ণী বললে, 'জানলা যখন খোলা থাকত, তখন তো আমি দেখেছি ওদের কীর্তি। চারজনকে নিয়ে ফুর্তি করত সাহানা। পুলিশ তাদের খবর পাবে না। কারণ সাহানা আর নেই। প্রতিবেশীরা মুখ খুলবে বলে মনে হয় না—মার্ডার কেসে আন্দাজে মার্ডারারের নাম কেউ বলতে চায় না। সুজন সিকদারও জানে না, এই চারজন কে-কে। কিন্তু আমি চিনি এই চারজনের একজনকে।

এই বলে নারায়ণী আমাকে ঘরের ভেতর টেনে নিয়ে এল—তাকভর্তি পাল্লা বন্ধ করতে-করতে বললে, 'ওই ফ্ল্যাটের ঠিক ওপরকার ফ্ল্যাটে সে থাকে।'

'তার নাম?'

'বিনয় মালাকার। ছবি আঁকতে জানে। কিন্তু রোজগার তেমন নেই। আমার নারায়ণী স্কেচ দেখে নিজে এসে আলাপ করে গেছিল—তাই আমি এই সময়ে লোকটার কাছে ঘেঁষতে চাই না। লম্বায় সে ছ'ফুটের কাছাকাছি। আগের জন্মের জ্যাক দ্য রিপার ছিল বেশ ছিপছিপে সুশ্রী ছোকরা। বেশ্যাপ্রিয় পুরুষ। আর এই লোকটা মানুষ-দানব। চোখের তারা দেখলেই বুঝবি মেয়ে-পটানো চাহনিটা কি মারাত্মক। আমাকেও হিপনোটাইজ করতে চেয়েছিল। ওরকম চেহারা দেখলে সব মেয়েই ঢলে পড়ে। সাহানার দোষ কী। মাসের পনেরো দিন স্বামীছাড়া থাকা একটু কষ্টকর ব্যাপার বইকি। বিনয় ওই ফ্ল্যাটে প্রায় যেত। এক বিছানায় শুতেও দেখেছি।'

'খুব খারাপ কাজ করেছিস,' বললাম আমি—'নিষিদ্ধ দৃশ্য দেখা অত্যন্ত কুরুচি। তোকে মানায় না। যাক, দেখেই যখন ফেলেছিস, তখন আমাকে জড়াচ্ছিস কেন?'

'পৈতে পুড়িয়ে ব্রহ্মচারি হতে যাসনি, নরহরি। দোব হাটে হাঁড়ি ভেঙে। বিনয় মালাকার খুনি কিনা সেটা প্রমাণ করতে হবে। তুই ওর ঘরে যাবি জার্নালিস্ট সেজে। টিপিক্যাল জার্নালিস্টদের মতোই তুই কদাকার, পোশাকও সেই রকম, জার্নালিজম-ও করিস—কিন্তু কল্কে পাসনি, তবে ইন্টারভিউ নিতে হয় কী করে তা জানিস। এই নে আমার ক্যামেরা। এক গেলাস জল এনে দিতে বলবি বিনয়কে—সেই গেলাস হাতসাফাই করে কাঁধের ঝোলায় ফেলবি—ফিংগার-প্রিন্টের ফটো নিয়ে মিলিয়ে দেখব ক্ষুরের ফিংগার-প্রিন্টের সঙ্গে মিলে যায় কিনা। ক্ষুরের ফিংগার-প্রিন্ট কাল সকালেই পেয়ে যাব—সে লাইন করে রেখেছি। এলোমেলো খানকয়েক ফটো তুলবি। আর জেনে নিবি, সাহানার সঙ্গে আর যে তিনজন ছোকরা ঘুরঘুর করত, তাদের নাম কী? ধাম কোথায়?'

আমি বললাম, 'বিনয় মালাকার সাহানাকে খুন করতে যাবে কেন? মোটিভ কী?'

'জেলাসি। এক মেয়ে চার নাগর—নিশ্চয় বিনয়কে কাট করতে চেয়েছিল সাহানা। তুই যা—এখন বিনয় একা আছে।'

'ফ্ল্যাটে আর কেউ থাকে নাকি?'

'ওর বউ থাকে। বাঁজা মেয়েছেলে। হস্তিনী বললেই চলে। কিন্তু রোজগার করে ভালো। নইলে এ ফ্ল্যাট কিনতে পারত না। অনেক রাত করে বাড়ি ফেরে। নাম তার হাসি। দেখে হেসে ফেলিসনি যেন। যদিও এখন নেই। যা, যা।'

প্রায় ঘাড়ধাক্কা দিয়েই আমাকে বের করে দিল নারায়ণী।

হাসি কিন্তু ফ্ল্যাটেই ছিল। আমার ধারণা ছিল, সৃষ্টিকর্তা শুধু আমাকেই অমাবস্যার অন্ধকার দিয়ে গড়েছেন। এখন তো দেখছি হাসি মেয়েটাও কম যায় না। আমি তো মশাই হাঁ করে চেয়েছিলাম দরজা খোলার পরেই। বেল টিপতেই ইলেকট্রনিক মিউজিক শুরু হয়েছিল। শুনছিলাম আর তৈরি হচ্ছিলাম মানব-দানব বিনয় মালাকারের সঙ্গে মোলাকাতের জন্যে। তার বদলে দরজা খুলে দিল হাসি মালাকার স্বয়ং। রক্ষেকালীর বাচ্চা বললেই চলে। দাঁত ছরকুটে রয়েছে। মোটা-মোটা কাফ্রী ঠোঁট ফেটেফুটে রয়েছে। নাক থ্যাবড়া—প্লাস্টিক সার্জারি করে একটু উঁচু করা হয়েছে কিনা ঈশ্বর জানেন। উটকপালী নাম্বার ওয়ান। অনায়াসে ফুটবল খেলা যায় যেন সেই কপালে। চুল এতই পাতলা যে নেই বললেই চলে। চোখ গোল-গোল। মুখও গোল। কালো হাঁড়ি বলা চলে। পুরো বডিখানাও বোধহয় গোল। তাই গলা থেকে পা পর্যন্ত ম্যাক্সি দিয়ে ঢেকে রেখে দিয়েছে। গোটা অবয়ব থেকে এমনই একটা বিশ্রী ব্যাপার বিচ্ছুরিত হচ্ছে যে আমি হাসতে ভুলে গিয়ে হাঁ করে চেয়ে রইলাম। হাসিও আমার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল। সে-ও তো আমার মতো কদাকার পুরুষ কখনও দেখেনি।

দুজনেই যখন হাঁ, তখন পেছনে এসে দাঁড়াল মানব-দানব বিনয় মালাকার। দানবদেহী হলেও মানব তো বটে। চব্বিশ ঘণ্টাও হয়নি পরকীয়া প্রেমের পাত্রীটি নৃশংসভাবে নরকে প্রস্থান করেছে। তার প্রতিক্রিয়া চোখেমুখে ফুটে উঠেছে। উদ্বেগে কালো, উৎকণ্ঠায় টানটান।

আটঘাটের জল-খাওয়া ঘোড়েল মাল আমি। নিমেষে ম্যানেজ করে নিলাম নিজেকে। জার্নালিস্টের জয় যে সর্বত্র, তার আর একদফা প্রমাণ হাতেনাতে জুটিয়ে নিলাম। আমি যে কাগজের লোক এবং বিশেষ তদন্তে বেরিয়েছি—একথা জানামাত্র দুজনেরই মুখ আরও শুকিয়ে গেল। হাসিদেবী এমনিতেই কান্নাকান্না মুখ করেছিল। এখন তা শুকনো আমড়া হয়ে গেল। সাহানাকে ক্ষুর দিয়ে চেরা হয়েছে শুনে ইস্তক ভয়ে আধমরা হয়ে রয়েছে হাসিরাশি দেবী। (পুরো নামটা তাই—রাশি রাশি হাসি-কে উলটে নিলেই হাসিরাশি!) ভীষণ টেনশন চলছে। মানব-দানব স্বামী তাকে অনেক বুঝিয়ে গেল আমার সামনেই। বাড়ি থেকে বেরোনো বন্ধ করলে কী হয়? সব কাজ চলুক। সবসময়ে ব্যালকনি থেকে ১২৩ নম্বর ফ্ল্যাটের দিকে তাকিয়ে থাকলে টেনশন তো বেড়েই চলবে। মডার্ন জ্যাক দ্য রিপার অন্তত এ ফ্ল্যাটে ঢুকবে না—শিরদাঁড়া টেনে ছিঁড়ে দেবে বিনয় মালাকার।

কিন্তু তাতেও স্বস্তি পাচ্ছে না হাসিরাশি দেবী। আরও শুনলাম, এই ফ্ল্যাটবাড়ির ঘরে-ঘরে আতঙ্ক ঢুকে গেছে। প্রত্যেকেই 'ম্যাজিক আই' দিয়ে আগে দেখছে, কে বেল টিপছে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। আমাকেও ম্যাজিক আই দিয়ে দেখে নিয়েছে হাসিরাশি। চিনেছে বলেই তো দরজা খুলেছে। একটু আগেই আমি নিচের ফ্ল্যাটে ঢুকেছিলাম তো? নিচের বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে দেখছিলাম ১২৩ নম্বর ফ্ল্যাট। রূপসি মেয়েটার সঙ্গে যখন আমার এতই ভাব, তখন আমাকে দরজা খুলে দিতে ডর লাগেনি।

অথচ ভয়ডর কাকে বলে, এতদিন তা জানত না হাসিরাশি। ছেলেবেলা থেকেই ডানপিটে। বড়লোকের মেয়ে। কনভেন্টে পড়া মেয়ে। ইংলিশ, ফ্রেঞ্চ, জার্মান ভাষা জানা মেয়ে। কাজ করে বিভিন্ন এমব্যাসিতে। ফরেনার এলে কলকাতা ঘুরিয়ে দেখায়। বাড়ি ফেরার সময়ের ঠিক নেই। কখনও মাঝরাতে, কখনও রাতভোরে। বাপ-মা'র অমতে বিনয়কে মালা পরিয়েছে বলে ত্যাজ্যকন্যা হয়েছে। তাতে ওর বয়ে গেল। রোজগারের টাকায় ফ্ল্যাট তো কিনেইছে। টাকাও জমিয়েছে। কাল সকালেই লাখ টাকার ইনসিওর করেছে নিজের নামে, রাতেই ফর্দাফাঁই হল সাহানা। এর পর কে হবে? ভাবতে ভাবতেই একরাতেই খানকয়েক চুল পাকিয়ে ফেলেছে হাসিরাশি দেবী।

আমি বকবকানি শুনছি আর টুকটাক প্রশ্ন চালিয়ে যাচ্ছি। হাসি যেই রান্নাঘরে আমার তেষ্টা মেটাতে গেলাসভর্তি কোল্ড ড্রিঙ্ক আনতে গেল, অমনি আমি জিজ্ঞেস করে নিলাম বিনয় মালাকারকে, 'সাহানা দেবীর বাকি তিনজন পরপুরুষ বন্ধুর নামধাম কি বলবেন?' বিনয় চমকে উঠেছিল। আমি গজাল দাঁতের হাসি হেসে দেখিয়ে বলেছিলাম, 'সবাই সব জানে মশাই। আপনারই কোনও রাইভ্যাল তো এ কাজ করতে পারে?' বিনয় যেন কীরকম হয়ে গেল। গলার কণ্ঠা ওঠানামা করছে দেখে হাসিরাশি দেবীকে বললাম আর এক গ্লাস ঠান্ডা পানি তাকে এনে দিতে এবং তা আনতে চোঁ-চোঁ করে শেষ করে দিল মানব-দানব। মুখ তার ফ্যাকাশে। আমি বললাম, 'আপনার এত ভয় কীসের? আমি তো আছি। কাগজের লোককে মশাই পুলিশেও ভয় পায়—খুন যে করেছে, সে আর এ তল্লাটে ভিড়বে না—আপনি শুধু আমাকে হেল্প করুন।'

আমি ধানাই-পানাই করে যাচ্ছি আর ভাবছি কোন ফাঁকতালে বিনয়ের আঙুলের ছাপ লাগা গেলাসটা সরানো যায়। দেবা আর দেবী দুজনেই যে উপস্থিত, আগে তো জানতাম না। আমাকে এই সংকট থেকে মুক্তি দিল স্বয়ং নারায়ণী।

ইলেকট্রনিক মিউজিক বেজে উঠল দরজার পাশে। মানব-দানব উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই ভুবনমোহন হাসি হেসে ঘরে ঢুকল নারায়ণী—এ হাসি যে হাসতে পারে দুনিয়ায় তার অপ্রাপ্য কিছু থাকে না। কাঁধে ঝুলছে জরিদার কাচ-চুমকি-পুঁতি বসানো রাজস্থানী ঝোলা। ঘরভরতি বিষাদ-মেঘকে চকিতে উড়িয়ে দিল প্রাণবন্ত কথাবার্তায়। প্রতিবেশিনী হিসেবে তার দায়িত্ব রয়েছে এই ফ্ল্যাটবাড়ির সব মেয়ের দেখভাল করার।

কথা বলতে-বলতে উঠে গেল ব্যালকনিতে। ঝোলা থেকে বাইনোকুলার বের করে দেবা আর দেবীর হাতে গছিয়ে দিয়ে ফিরে এল ঘরে। শরবতের গেলাস তিনটে (একটা গেলাসে হাসিও শরবত খেয়েছিল) তুলে নিয়ে গিয়ে রেখে দিল রান্নাঘরে। ফিরে গেল ব্যালকনিতে। আরও কিছুক্ষণ বকর-বকর করে আমাকে নিয়ে চলে এল নিচের তলায় নিজের ফ্ল্যাটে। ঝোলা থেকে গেলাস তিনটে বের করে রাখল টেবিলে।

বললে, 'চুরি করে আনলাম। শরবতের গেলাস সবসময়ে দরকার হয় না। চুরি গেছে জানতে পারার আগেই কাজ উদ্ধার হয়ে যাবে।'

আমি বললাম, 'তুই নিজেই যদি যাবি তো আমাকে পাঠালি কেন?'

'কারণ আছে, কারণ আছে,' বলতে-বলতে ফোনের রিসিভার তুলে নিল নারায়ণী। ডেকে পাঠাল পুলিশেরই এক ফিংগার-প্রিন্ট এক্সপার্টকে।

সন্ধের সময়ে বিনয় বেরিয়ে গেছিল গঙ্গার হাওয়া খেতে। তখন ঘড়িতে বাজে ছ'টা। আধঘণ্টা পরেই ইলেকট্রনিক মিউজিক শুনে ম্যাজিক আই দিয়ে তাকিয়ে হাসি দেখল বিনয় ফিরে এসেছে। দরজা খুলে দিল। বিনয় ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে সোফায় গিয়ে বসল। মুখ পাথরের মতো শক্ত। হাসিও বসল ওর গাঁ-ঘেঁষে। মুখের পরতে-পরতে অশান্ত স্নায়ুর নৃত্য চলছে। বিনয় উঠে গেল টয়লেটে। ফিরে এসে দাঁড়াল সোফার পেছনে—হাসির ঠিক পেছনে। বাঁ-হাতে বউয়ের থুতনি চেপে ধরে পেছনে হেলিয়ে চুমু দিল কপালে। ডান হাতে পকেট থেকে বের করে আনল ক্ষুর। আঙুলের কায়দায় খুলে গেল ফলা। এর পর একটানে দু-টুকরো হবে হাসির গলা।

কিন্তু তা হয়নি। পর্দার আড়ালে আমি আর নারায়ণী দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। বিনয় বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে দুজনে ঢুকেছিলাম ফ্ল্যাটে। হাসিকে বলেছিলাম—খোদ পতিদেবতাও যদি ফিরে আসে আমাদের অস্তিত্ব যেন না জানায়। জানান দেব আমরা নিজেরাই।

ক্ষুর যখন খেলে গেল বাতাসে, নারায়ণীর হিলহিলে বডিও খেলে গেল বাতাসে। পর্দার আড়াল থেকে বিনয় পর্যন্ত দূরত্বটা যেন বিদ্যুতের পিঠে চেপে পৌঁছে গেল—ক্যারাট মারে উড়িয়ে দিল ক্ষুর।

তারপরেই পরের পর মার। তছনছ হয়ে গেল লিভিংরুম, ঠিকরে গেল হাতির দাঁতের স্ট্যান্ড ল্যাম্প। দানবদেহী বিনয় মালাকারকে নিয়ে কিছুক্ষণ যেন লোফালুফি খেলে গেল নারায়ণী। তারপর তার হাত-পা পাঁজরা ভাঙা শরীটাকে এক লাথি মেরে ঘরের কোণে গড়িয়ে দিয়ে তুলে নিল ফোনের রিসিভার। ডেকে পাঠাল পুলিশের লোকদের।

তারা এল। গদগদ গলায় নারায়ণীকে বললে, 'সাধু! সাধু! এত সহজে সাহানার হত্যাকারী ধরা পড়বে ভাবতেই পারিনি।'

চোখ পাকিয়ে গলা রণরণিয়ে নারায়ণী বললে, 'এইজন্যেই রসাতলে যাচ্ছে কলকাতার পুলিশ। আপনারা যাকে ধরলেন, সে তার নিজের বউয়ের গলায় ক্ষুর চালাতে যাচ্ছিল বউয়ের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স আর ইনসিওরেন্সের টাকার জন্য। আপনারা ভাবতেন সাহানার হত্যাকারী হাসিরাশি দেবীকেও খুন করে গেছে। কোনওদিনও জানতে পারতেন না কে খুন করেছে সাহানাকে।'

চোখ ছানাবড়া করে (নারায়ণীর দশবাই চণ্ডীরূপের জন্যেও বটে) পুলিশ অফিসার বলেছিল, 'আপনিও জানেন মনে হচ্ছে?'

'না জানলে কি ন্যাকামি করছি?'

'নামটা জানতে পারি?'

'হাসিরাশি মালাকার। আপনার সামনেই বসে রয়েছে।'

হাসি তক্ষুনি চোখ উলটে অজ্ঞান হয়ে গেছিল। নারায়ণী ফাঁস করে দিয়েছিল হাসির কুকীর্তি। লম্পট স্বামীর জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করেছে। অথচ লাম্পট্য চলছে অবাধে। চোখের সামনে। ১২৩ নম্বর ফ্ল্যাটে। স্বামীকে রোখা দরকার। ব্যাভিচারিণীকে মারা দরকার। তাই ক্ষুর চালিয়েছিল কাল রাতে। তাই এত ভয়।

প্রমাণ? ক্ষুরের বাঁটে আঙুলের যে ছাপ পাওয়া গেছে, সেই একই ছাপ রয়েছে শরবতের গেলাসে—হাসি শরবত খেয়েছিল যে গেলাসে।

সন্দেহটা নারায়ণীর মাথায় আসতেই দৌড়ে উঠে এসেছিল ফ্ল্যাটে আমি থাকতে থাকতেই। ক্লু একটাই।

সাহানাকে রেপ করা হয়নি।

নারায়ণী-নৃত্য নেচে এসে গোয়েন্দানী মহারাণী শরীর চাঙা করার জন্যে সিরাজির পেয়ালা বের করেছিল (যদিও একটুও হাঁপায়নি, শাড়িও হাঁটু ছাড়িয়ে ওপরে ওঠেনি)।

আমি বাধা দিইনি। দিলেই তো বলবে, 'দেবতারা সোমরস খেলে দোষ হয় না, মানুষের হবে কেন?'

খাক, খেয়েই তো শরীটাকে অমন টসটসে আঙুর করে রেখেছে। তাই শুধু একটাই প্রশ্ন করেছিলাম, 'তুই বুঝলি কী করে, আজ রাতেই বিনয় ক্ষুর চালাবে?'

নারায়ণীর চোখ তখন ঢুলঢুলু হয়ে এসেছে। আমার চোখেও রং ধরেছে। তাই একজোড়া নারায়ণী দেখছিলাম। মনে হচ্ছিল, রূপ যেন আরও বেড়ে গেছে। গেছো মেয়েরা একটু বেশি রূপসিই হয়, এটা তো ঠিক। ঝাঁটা হাতে মারকুটে হলে তো সোনায় সোহাগা।

মদির চোখে তাকিয়ে নারায়ণী বলেছিল, 'প্রথমে খটকা লেগেছিল বিনয়ের বডি ল্যাংগুয়েজ দেখে। যে মিথ্যে বলে, তার অঙ্গভঙ্গি দেখে তা ধরা যায়। মনের মধ্যে ফন্দির তোড়জোড় চললে, চাহনি দেখে তা আঁচ করা যায়। এ বিদ্যে অনেক কষ্টে শিখতে হয়েছে আমাকে। সেইসঙ্গে কাজ করেছে আমার ইনটিউশন—যে জিনিসটা অন্য মেয়েদের চেয়ে আমার একটু বেশিই আছে বলে আমি জানি। এটা একটা সাইকিক ফোর্সও বলতে পারিস। তখন খাটালাম আমরা যুক্তি। এখন হাওয়া গরম। আরও মেয়ে চেরাই হবে—এই আতঙ্ক জেগেছে ঘরে-ঘরে। গরমে-গরমে নিজের ঘরের বউটাকে একই কায়দায় কেটে ফেললেই তো একঢিলে দুই পাখি মারা হয়ে যায়। পুলিশ জানবে, জন্মান্তরিত জ্যাক দ্য রিপার-ই খুন করে গেল হস্তিনী হাসিকে। মরা হাসির আঙুলের ছাপও কেউ নেবে না—সাহানার খুনি কে, তা অজানাই থেকে যাবে। ফাঁকতালে হাসির ফ্ল্যাট, বীমার টাকা, ব্যাঙ্কের টাকা—সব পেয়ে যাবে। এন্তার মেয়ে ভোগ করা যাবে। আরও একটা মোটিভ তো নিজের কানেই শুনলি। কী বলছিল বিনয় ধোলাই খাওয়ার সময়ে?'

'সাহানাকে মেরেছে ক্ষুর চালিয়ে—আমিও মারব ক্ষুর চালিয়ে!'

'অর্থাৎ প্রতিহিংসা। হাসির অস্বাভাবিক আতঙ্ক দেখে সন্দেহ হয়েছিল বিনয়ের। খটকা লেগেছিল আমার আবির্ভাবে—তাই আর সময় নষ্ট করতে চায়নি। গোয়েন্দানী যখন চর পাঠায়, তখন তার সন্দেহটাকে ঝটপট ঘুরিয়ে দেওয়া দরকার।'

'প্ল্যান এঁটেই তাহলে তুই আগে আমাকে পাঠিয়ে পরে নিজে গেছিলি?'

'আজ্ঞে। আমার না গেলেও চলত, কিন্তু মূল সূত্রটা মাথায় ঝলক দিতেই আর দেরি করিনি—দরকার ছিল হাসির ফিংগার প্রিন্ট।'

'এ তো দেখছি আড়াই প্যাঁচ।'

'নারায়ণীর আড়াই প্যাঁচ। ছেলে গোয়েন্দাদের মাথায় এসব কুচুটে প্ল্যান গজাবে? নে, ওঠ, আর গিলিসনি!'

*'নবকল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশিত। (শারদীয় সংখ্যা, ৩৩শ বর্ষ।)

শিয়রে শমন

গোয়েন্দানী নারায়ণী বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আয়নার সামনে। তার নীল রঙের দু-পকেটওলা ডেনিম শার্টের দুটো পকেটই ঠেলে উঠেছে। উদ্ধত বুকের নিচেই কটিদেশ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়েছে দেড়ইঞ্চি চওড়া বেল্টের বন্ধনে। নিম্নাঙ্গ আবৃত ব্লু-জিনস প্যান্টে। নিতম্ব কামড়ানো জিনস।

গোয়েন্দানী নারায়ণী প্রসাধন পছন্দ করে না। সুর্মাটানা চোখের চাইতে অনেক বেশি বিপজ্জনক ওর পিঙ্গল চক্ষুর চাহনি। বাঘিনী চক্ষু বললেই চলে। নিমেষে হিপনোটাইজ করে ফ্যালে। রসিকা প্রকৃতিদেবী তার অধর আর ওষ্ঠের আধারে এত রস দিয়েছেন যে রঞ্জক পদার্থ দিয়ে তাদের আকর্ষণ বৃদ্ধির দরকার হয় না।

এই মুহূর্তে সে মুক্তোর মতো সুন্দর সাজানো দাঁত দিয়ে কামড়ে রয়েছে নিচের ঠোঁটের বামপ্রান্ত।

সে ভাবছে। খুন করবে, না স্রেফ পিটিয়ে ছেড়ে দেবে।

আয়নার ঠিক ওপরের জোরালো স্পট লাইট ফোকাস করে রয়েছে ওর তিলোত্তমা দেহবল্লরীকে। প্রতিটি লোমকূপে বিধৃত অজস্র রূপের কণা। বিধাতা মাঝেমধ্যে এই রকম এক একটি রমণীকে সৃষ্টি করেন। পুরুষের প্রতাপ ভাঙবার জন্যে। অন্যায়ের কাণ্ডারিদের নিধন করবার জন্যে। তিল-তিল সঞ্চিত রূপরাশিই এদের অমোঘ অস্ত্র। কটাক্ষের দামিনীই এদের দধীচির অস্থি। এরা সুন্দরী অথচ ভয়ঙ্করী। এদের সাবধান।

কলিকালের কুটিল কলকাতায় নারায়ণী তাই মূর্তিমতী বিভীষিকা। যারা ওর রূপের আকর্ষণে কাছে এসেছে—তারাই টের পেয়েছে, নারায়ণীকে বিধাতা শুধু রূপের অস্ত্রই দেননি—দিয়েছেন পেশির শক্তি। নারায়ণী নিয়মিতো শরীরচর্চা করে এই পেশিদের বজ্রাধিক সর্বনাশা করে তুলেছে। মার্শাল আর্টের প্রশিক্ষণ ওর নরম শরীরে এনে দিয়েছে মৃত্যুর হাতছানি। সেই সঙ্গে গ্রহণ করেছে আধুনিক মারণাস্ত্রের সর্ববিধ শিক্ষা।

তাই বলছিলাম, রূপসী নারায়ণীর রণরঙ্গিনী রূপের স্বাদ যারা পেয়েছে, তাদের অধিকাংশই ধরাধাম ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে—যাদেরকে শেষ মুহূর্তে কৃপা করেছে রহস্যময়ী এই নিতম্বিনী—তারাই পঙ্গু দেহে আতঙ্কিত কণ্ঠে হুঁশিয়ার করে গেছে জানপহচান ব্যক্তিদের : খবরদার, ল্যাজে পা দিও না নারায়ণীর। নিজেকে সে গোয়েন্দানী বলে ঠিকই—কিন্তু আইনের ধরাবাঁধা লাইনে গোয়েন্দাগিরি করে না। যে দেশে বিচারপতিকেও কাঠগড়ায় উঠতে হয়, যেদেশে কুখ্যাত বহু-বিজ্ঞাপিত খলনায়করা নির্বিচারে পার পেয়ে যায়, সে দেশে থানা-পুলিশ-প্রমাণ-আদালতের প্রহসন কীসের?

নারায়ণী তাই নিজেই শিকার ধরে, নিজেই তার বিচার করে, নিজেই তাকে নিকেশ করে। নারায়ণীর বিচারালয়ে আপিল হয় না, পলিটিক্যাল কানেকশন কাজ দেয় না, উৎকোচের স্তূপ তাকে আরও ক্ষমাহীনা করে তোলে।

এই মুহূর্তে তাই ঘটেছে। তার কাছে একটা লকারের চাবি এসেছে। ব্যাঙ্ক লকারের চাবি। বিলিতি ব্যাঙ্ক। এ ব্যাঙ্কে যাদের লকার থাকে, তারা কোটিপতি তো বটেই—বিদেশের বহু ব্যাঙ্কেও তাদের বেনামি অ্যাকাউন্ট খুলে রাখতে হয় বিবিধ গোঁজামিল ব্যবসার জন্যে।

চকচকে চাবিটা আয়নার সামনে। সামান্য একটা চাবি। কিন্তু এই চাবি যে লকারের দ্বার উদঘাটন করে দেবে—তার অন্দরে যে আলিবাবার রত্ন আছে—নারায়ণী তা জানে।

জানে বলেই কঠিন চোখে নিজেকে দেখছে আয়নার মধ্যে দিয়ে। জিগ্যেস করছে বিবেককে, 'কী করব? খুন? না, পিটুনি?'

'খুন,' জবাব দিল বিবেক।

পরের দিন কাঁটায়-কাঁটায় দশটায় ব্যাঙ্কের সামনে ব্রেক কষল একটা হেভি মোটর বাইক। বাইক যে চালিয়ে নিয়ে এল, তার ওজন বাইকের চাইতে কম। কিন্তু গুরুভার গম্ভীর নিনাদী এই বাইক তার হাতে যেন খেলার পুতুল। পৃথিবীবিখ্যাত এই ব্র্যান্ডের বাইক একসময়ে ছিল ব্রিটিশ আর্মিতে। ১৯৪০-এ তারা বেচে দেয় ভারতের মানুষকে। আজকে সেই বাইক রূপান্তরিত হয়েছে। দিল্লির ফটফটিয়া-য় রেড ফোর্ট থেকে কনট সার্কাস যায় একেবারে আটজন যাত্রী নিয়ে। মাথাপিছু ভাড়া তিনটাকা।

কিংবদন্তীসম এই বাইক পথের রাজা হয়ে রয়েছে ১৯৩০ সাল থেকে—যে সালে রাইট ব্রাদার্স আকাশে উড়িয়েছিলেন তাঁদের প্রথম উড়োজাহাজ।

আজও সে পথের রাজা। হার্লে ডেভিডসন। ব্যাঙ্কের সামনে এসে দাঁড়াল লেটেস্ট মডেল—আলট্রা ক্লাসিক ইলেকট্রা গ্লাইড। ১৩৪০ সিসি ইঞ্জিন থেকে গম্ভীর গজরানি বেরয় এই কারণেই। ঝকঝক করছে পেছনের টুরিং কম্পার্টমেন্ট—সেখানে রয়েছে দুটি ফুল-ফেস হেলমেট। হেলমেটের মধ্যে রয়েছে স্পিকার—যাতে চালক রেডিও ইনটারকম-এর মাধ্যমে কথা বলতে পারে পেছনের রাইডারের সঙ্গে, রয়েছে ইলেকট্রনিক ক্রুইজ কন্ট্রোল, ক্যাসেট স্টিরিও সিসটেম।

ছোট গাড়ির চাইতে অনেক বেশি দাম এই দ্বিচক্রযানের। কিন্তু এ বাহন যাকে সাজে, দামের পরোয়া সে করে না। কারণ, স্পিড তার কর্মযজ্ঞের মূল মন্ত্র, জীবন আর মৃত্যু তার দুই পায়ের দুই ভৃত্য।

নিতান্ত অবহেলায় মেটাল মন্সটারকে স্ট্যান্ডে দাঁড় করিয়ে ব্যাঙ্কের প্রবেশ পথের দিকে অগ্রসর হল টেরিফিক বিউটি। পথের লোক হাঁ করে চেয়ে রয়েছে তার দিকে আর তার চোখ ধাঁধানো বাহনের দিকে। মাথায় তার হেলমেট নেই—কারণ কলকাতার সার্জেন্টদের সে তোয়াক্কা করে না। হালকা খাটো চুলের শোভা নষ্ট করতে যাবে কেন শিরস্ত্রাণ দিয়ে? কক্ষনও না। অঙ্গে গাঢ় বেগুনি প্যান্টসুট। কাঁধ, বুকের ওপর দিক আর বাহু সম্পূর্ণ অনাবৃত। কলমকারি ছাপার একটা হালকা চাদর একটা কাঁধের কিছুটা ঢেকে রেখেছে—বাকি চাদর ঝুলছে বামবাহুর ওপর। এইভাবেই সে হার্লে ডেভিডসন চালিয়ে এসেছে রাজপথ দিয়ে—নিশানের মতো পত-পত করে উড়ছে তার কলমকারি ফুলকাটা চাদর।

মোহিনী নারায়ণী নেমেছে অভিযানে। পাঠক, ত্রস্ত হোন।

পাথরের চওড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠে গিয়ে কাচের দরজা ঠেলে বাঁদিকে মোড় নিল নারায়ণী। বিশাল হলঘর পুরোপুরি এয়ারকন্ডিশনড। মোলায়েম শীতলতায় শীতল প্রত্যেকেরই মস্তিষ্ক। তা সত্বেও রুধির স্রোত দ্রুতগতি হল সামনের সুবেশ তরুণের ধমনীতে। পার্সোনাল কমপিউটার নিয়ে বসে আছে সে লকার-হোল্ডারদের পথ দেখিয়ে পাতাল ঘরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। নারায়ণীর পেলব বাহু আর ঝকঝকে পিঙ্গল চোখ উত্তাল করেছে তার হৃৎপিণ্ডকে।

বাক্যব্যয় করল না নারায়ণী। কোড নাম আর নম্বর লেখা কার্ডে বাঁধা চাবিটা রাখল টেবিলে।

নিমেষে ভাবলেশহীন হয়ে গেল সুবেশ তরুণের মুখমণ্ডল।

যেন তৈরি ছিল এই চাবি আর এই কোড নম্বর দেখবার জন্যে। আশা করেনি শুধু নারায়ণীর মতো অপ্সরাকে। অথচ হাঁটছে দেখ! চলমান দামাস্কাস তরবারি বললেই চলে।

তরুণের মুখচ্ছবি পাঠ করে নিয়েছে নারায়ণী। সব মিলে যাচ্ছে। অঢেল পয়সা উড়ছে। ক্রীতদাস বনেছে এই ছোকরাও।

উঠে দাঁড়িয়েছে ছোকরা। ফাইলিং ক্যাবিনেটের সামনে গিয়ে দোসরা চাবি বের করে এসে বসল টেবিলে। এখন একটা ফর্ম সই করতে হবে। নারায়ণী জানে। লকার খোলা হয়েছে তারই নামে। সই নিয়ে যাতে মাথা ঘামানো না হয় তাই তো কেনা হয়েছে ছোকরাকে।

ফর্মে সই টেনে দিল নারায়ণী। বললে, 'বাকি যা লেখবার লিখে নেবেন। চলুন।'

রোবটের মতো উঠে দাঁড়াল ছোকরা। ডানাকাটা পরীর গলা দিয়ে যে এরকম গম্ভীর মেঘের ডাক বেরতে পারে, তা সে জানত না। পট-পট করে নেমে গেল বাঁ দিকের সিঁড়ি বেয়ে। লাল কার্পেট পাতা পাতাল ঘরের

সিঁড়ি। নিচের চাতালে নেমেই ডাইনে লকার রুম। সারি-সারি লোহার ক্যাবিনেট। ফাইলিং ক্যাবিনেট বলেই মনে হয়।

নম্বর মিলিয়ে একটা চাবি লাগিয়ে ঘুরিয়ে দিয়েছে তরুণ। নারায়ণী লাগাল নিজের চাবি। শুধু চাইল তরুণের দিকে। সরে গেল সে নি:শব্দে। হাড় হিম হয়ে গেছে তার ওই এক চাহনিতেই। বাঘিনীর কটাক্ষ কি এরই নাম?

চাবি ঘুরিয়ে হাতল ধরে টান দিল নারায়ণী। বেরিয়ে এল একটা ড্রয়ার। লকার। গুপ্তধন রাখার আইনসঙ্গত অধিকার।

পাতাল ঘরে আর কেউ নেই।

ড্রয়ারে রয়েছে তাড়াতাড়া নোট। একশো টাকার নোট। পঁচিশটা থাক। প্রতিটা থাকে দশটা বান্ডিল।

এক-এক বান্ডিলে দশ হাজার। মোট পঁচিশ লাখ।

অনিমেষে সেকেন্ড কয়েক চেয়ে রইল নারায়ণী। স্পর্শ করল না। শুধু তেউড়ে গেল রসালো অধর। শ্বাপদ ভঙ্গিমায়।

ঠিক এই সময়ে বেলেঘাটার সুভাষ সরোবরের পাড়ে ইন্দ্রনাথ রুদ্রর বৈঠকখানা ঘরে জমে উঠেছে আর এক নাটক।

অনেকদিন পর পাইপের তাম্রকুট সেবন করছে ইন্দ্রনাথ। ব্রায়ার নয়, স্ট্রেট পাইপ। ডানহিল পাইপ, শুধু পাইপটারই দাম পাঁচ হাজার টাকা। এইমাত্র উপহার দিলেন অ্যাডভোকেট রতিকান্ত সমাদ্দার।

উনি বসে আছেন ইন্দ্রনাথের সামনের সোফায়। বয়স প্রায় পঞ্চান্ন। অতিশয় রোমশ। তাঁর কানে চুল। ভুরুর চুল বাড়ির কার্নিশের মতো ঠেলে রয়েছে। মাথাভরতি কাঁচাপাকা চুল গালপাট্টা হয়ে নেমে এসেছে চোয়াল পর্যন্ত। বলিষ্ঠ আকৃতি। গায়ে খদ্দরের হাফহাতা বুশশার্ট। ট্রাউজার্স এতই ঢলঢলে যে পাজামা হিসেবে চালিয়ে দেওয়া যায়। বড় গম্ভীর। কাজ ছাড়া কিছু বোঝেন না।

আসন গ্রহণ করেই তিনি বলেছিলেন, 'ইন্দ্রনাথবাবু, শুনেছি আপনি রহস্যভেদ করেন তাতে আনন্দ পান বলে। ব্রেনওয়ার্ক না থাকলে কেস টেকআপ করেন না। আমি এইরকম একটা কেস আপনার কাছে নিয়ে এসেছি। যার কেস, মানে আমার যে মক্কেল, সে খুন হয়েছে গতকাল রাতে। প্রাইভেট ডিটেকটিভ অ্যাপয়েন্ট করার ভার সে আমাকে দেয়নি। টাকা পয়সার ব্যবস্থাও করে যায়নি। আমি নিজেই এসেছি। পারিশ্রমিক দিতে পারব না। তবে একটা স্মোকিং পাইপ উপহার দেব। যা আপনি একসময়ে খুব ভালোবাসতেন।'

ভূমিকা শেষ করে ডানহিল পাইপটা আর টোব্যাকো ইন্দ্রনাথের হাতে তুলে দিয়েছিলেন রতিকান্ত সমাদ্দার।

মৌজ করে সেই পাইপ থেকেই এখন অনর্গল ধূম বিতরণ করছে ইন্দ্রনাথ। আধবোজা চোখে চেয়ে আছে সমাদ্দার মশায়ের দিকে।

রতিকান্তবাবু বলছেন :

আমার সমস্ত মক্কেল অবাঙালি। গুড পে-মাস্টার। পয়সাকড়ি নিয়ে কখনও ভোগায় না। রাকেশ মালহোত্রা এদের একজন।

জন্ম তার পাঞ্জাবে। ডাকাতদের গুলিতে খতম হয়েছিল বাবা আর দাদা। তখন তার বয়স বারো। মা'কে নিয়ে লড়তে হয়েছে তখন থেকেই। লেখাপড়া করবার সুযোগ পায়নি। পয়সা তো ছিল না। মায়ে-পোয়ে রাস্তাও ঝেঁটিয়েছে, নর্দমা সাফ করেছে, তাতেও দুবেলা খাবার জোটেনি।

একটু বড় হয়ে ট্রাক ড্রাইভারি আরম্ভ করেছিল। বছর তিনেক সেই কাজ করে হাতে একটু পয়সা জমতেই চলে আসে কলকাতায়। হাওড়া স্টেশনে যখন পা দিয়েছিল, তখন তার পকেটে ছিল মাত্র চোদ্দো টাকা।

নতুন জায়গা। নতুন মানুষ। বাংলাও জানে না। কিন্তু উদ্যোগী পুরুষের ভাগ্য সহায় হয়। কাজ জুটিয়ে নিয়েছিল একটা গ্যারেজে। লরির যন্ত্রপাতিতে গ্রিজ লাগানোর বাঁদুরে কাজ, মজবুত চেহারার দৌলতে পরে একটা কারখানায় দারোয়ানি করেছে। রাস্তায় হেঁকে তালা বিক্রিও করেছে।

কিছু টাকা জমতেই চলে গেছে অমৃতসর। মা ছিল ওইখানেই। নিয়ে এসেছে কলকাতায়। তারপর শুরু করেছে জমি কেনাবেচার কাজ।

ভাগ্য খুলেছে তখন থেকেই। ফুলে উঠেছে ব্যাঙ্কের ব্যালেন্স। পরের কয়েক বছরে বেশ কয়েকবার ঘুরে এসেছে অমৃতসরে। একা। কারণ অমৃতসরে ছিল ওর গার্লফ্রেন্ড। মার্গারেট। জন্ম তার গোয়ায়। খ্রিস্টান। বাবার চাকরি ছিল অমৃতসরে। বন্ধুত্ব জমেছিল রাকেশের সঙ্গে।

কিন্তু ওই পর্যন্তই। বছরের পর বছর, সেধেছে রাকেশ। কলকাতায় আসেনি মার্গারেট। বিয়ে নিয়ে অ্যাডভেঞ্চার চলে না।

ফলে, শীতল হয়ে আসে দুজনের সম্পর্ক।

এদিকে ফুলে ফেঁপে উঠছিল রাকেশের বিজনেস। জমি কেনাবেচা ছাড়াও ফ্ল্যাট বানিয়ে বেচে দেওয়ার আইডিয়াটা তখনই মাথায় আসে ওর। এখন যাকে প্রোমোটার বলি, তাই। কোম্পানির নাম দিয়েছিল ইডেন গার্ডেন্স লিমিটেড।

চড়চড় করে ব্যবসা বেড়ে যেতেই যাতায়াত শুরু হয়েছিল বোম্বাইতে। টাকা তো ওখানেই। কৌশলও ওখানে।

এই সময়ে ক্রিস্টিন-এর সঙ্গে আলাপ হয় রাকেশের। গোয়ানিজ খ্রিস্টান। লাভলি মেয়ে। রিয়াল বিউটি। পেশায় ছিল মডেল। রাকেশের সঙ্গে আলাপ একটা ফিল্ম প্রোডিউসারের অফিসে। এই অফিসেই মডেলিং করছিল ক্রিস্টিন। রাকেশ গেছিল ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি সম্বন্ধে জানতে। কাঁচা টাকা হাতে এলে সবাই যা করতে চায়।

শেষ পর্যন্ত ফিল্ম লাইনে যায়নি রাকেশ। তবে ওই লাইন থেকেই তুলে এনেছিল ক্রিস্টিনকে। যে প্রোডিউসারের অফিসে আলাপ, তাকেই বিয়ে করবে ঠিক করেছিল ক্রিস্টিন। কিন্তু সে প্ল্যান ভেস্তে দিয়েছিল রাকেশ। টাকা মানুষকে পালটে দেয়। কথায় সে চৌকস। চেহারায় রাজপুত্র। টাকার কুমির। প্লেনে চাপিয়ে ক্রিস্টিনকে নিয়ে এল কলকাতায়। বিয়ে করল পরের মাসেই।

বিয়ের পরও মডেলিংয়ের কাজ ছাড়েনি ক্রিস্টিন। এ এক নেশার কাজ। আনন্দ ছাড়া বাঁচবে কী করে মেয়েটা। তাই পার্ক স্ট্রিটের একটা মডেলিং এজেন্সিতে নাম লিখিয়ে রেখেছিল। তখন ওর বয়স সাতাশ। সূচনা থেকে বোঝা গেছে উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে বিলক্ষণ। বম্বের মেয়ে, গোয়ানিজ কালচার। ফ্রী, ফ্র্যাঙ্ক, স্মার্ট, ইজি। বিজ্ঞাপনের একটা সিরিজে ওই মেয়ে ছাড়া আর কাউকে পাওয়াই গেল না কলকাতায়। গাড়ি কোম্পানির বিজ্ঞাপন। বেরিয়েছিল খবরের কাগজে। চিতাবাঘের চামড়া দিয়ে তৈরি অদ্ভুত ড্রেস পরে বাগিয়ে রয়েছে একটা বর্শা—বিঁধিয়ে দিতে যাচ্ছে সামনের চকচকে সাদা গাড়িটার গায়ে। আইডিয়ার বলিহারি যাই! কাগজে দেখেছেন? গুড। সেই মেয়েই হল ক্রিস্টিন—আমার মার্ডাড ক্লায়েন্ট। ক্লিক করেছিল সিরিজটা। কপাল খুলে গেছিল ক্রিস্টিনের।

সেই সঙ্গে ওর স্বামীরও। কথায় বলে স্ত্রীভাগ্যে ধন। টাকায় টাকা বাড়ে। রাকেশের টাকা বস্তায় বেঁধে রাখবার সময় এসে গেছিল। দুদিনেই একটা আনকোরা নতুন মারসিডিজ বেঞ্জ কিনে দিয়েছিল ক্রিস্টিনকে। বিয়ের উপহার। ওই গাড়ি নিয়েই বেরিয়েছিল দেশ বেড়াতে—আপনারা যাকে বলেন হানিমুন—তাই আর কি—গেছিল গোয়ায়। টাকা উড়িয়ে ছিল জলের মতো। শ্বশুরবাড়ির লোকের চক্ষুস্থির করে ছেড়েছিল ঐশ্বর্য দেখিয়ে। হইহই পড়ে গেছিল গোটা গোয়ায়।

থাক সে কথা। কলকাতায় ফিরেই নিজের নতুন বাড়ি বানিয়েছিল রাকেশ। এতদিন পরকে জায়গাজমি বাড়ি জুটিয়ে দিয়েছে—এবার বউয়ের চাঁদমুখে আরও হাসি ফুটোনোর জন্যে তৈরি করে নিল নিজের থাকবার জায়গা। ছোটখাট একটা প্রাসাদ। শহর থেকে অবশ্য দূরে। ডায়মন্ডহারবার যাওয়ার পথে। ছ-বিঘে

ফুলের বাগানের ওপর ছিমছাম বাড়ি। অথচ তার মধ্যে আছে রাজসিক রুচি। বিলাস কাকে বলে, এ বাড়িতে ঢুকলে হাড়ে-হাড়ে টের পাওয়া যায়। এমনকি গাড়ি রাখার গ্যারেজেও রেখেছে চোখ ট্যারা করে দেওয়ার ব্যবস্থা। গ্যারেজের সামনে এসে দাঁড়ায় গাড়ি। ড্রাইভার গাড়িতে বসেই রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে রোলিং শাটার ঘুরিয়ে তুলে দেয় ওপরে। শুনেছেন? তাহলে দেখেই আসুন। রাকেশের সঙ্গে আপনার কথা বলা দরকার।

সুখেই ছিল দুজনে। এ যুগের লায়লা মজনু। দেখে ঈর্ষা হত মশাই। চোখ টাটাত পাঁচজনের। হিন্দি সিনেমাতেই এমনি রূপকথা দেখা যায়। রূপকথা যে সত্যি হয়, তা এই কলকাতায় এসে দেখিয়ে দিল রাকেশ। ছেঁড়া কাঁথা থেকে সোনার খাটে গা রূপোর খাটে পা। বুক ফেটে যাবে না?

পরশ্রীকাতরদের কথা বাদ দিচ্ছি। কথায় বলে নজরে বিষ থাকে। সেই বিষেই বুঝি ধ্বংস হয়ে গেল সুখের ফ্যামিলিটা। এবার আসি সেই কথায়।

কয়েক হপ্তা ধরেই ডায়মন্ডহারবার অঞ্চলের খুনখারাপির কথা কাগজে বেরচ্ছে বটে—কিন্তু দায়সারাভাবে। গোটা দেশজুড়ে চলছে নারকীয় নৃত্য। ডায়মন্ডহারবারের দু-চারটে মানুষের প্রাণ গেলে কারও গদি কাঁপে না।

কয়েক সপ্তাহের আগের ঘটনা বলছি। স্কুলের একটি মেয়েকে রেপ করে মেরে ফেলা হয়। রাকেশ-ভিলা থেকে মাত্র মাইলখানেক দূরে। আর একটা মেয়েকে খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না।

তারপরেই ঘটল কাল রাতের ঘটনা।

বাড়িতে লোকজন এসেছিল। রাকেশেরই বন্ধুবান্ধব। হইহুল্লোড় চলেছে সকাল থেকেই। ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, সাঁতার...

বলতে ভুলে গেছি। ছ'বিঘে বাগানবাড়ির মধ্যে সুইমিং পুলও রেখেছে রাকেশ। ভারি সুন্দর ডিজাইন। ঠিক যেন নীল রঙের একটা ঝিনুকের খোলা।

একদম তলায় কাচঢাকা আলো। সে আলো জ্বললে মনে হয় বুঝি মুক্তো ঝিলিক মারছে শুক্তির বুকে।

দুপুর নাগাদ খানাপিনা শেষ করে বন্ধুবান্ধব নিয়ে কলকাতায় শপিং করতে গেছিল রাকেশ। নিয়ে গেছিল ক্রিস্টিনের মার্সিডিজ ৩০০ সেল গাড়িখানা। নিজের ক্যাডিলাক গাড়ি রেখে গেছিল গ্যারেজে। টাকার তো মা-বাপ নেই। প্রোমোটার হলে যা হয়—যেভাবে পারে টাকা উড়িয়েছে।

ফটকে দাঁড়িয়ে বিদায় জানিয়েছিল ক্রিস্টিন। সঙ্গে যায়নি। বাড়িতে তার অনেক কাজ। ঘরদোর পরিষ্কার করতে হবে। রাতের খানাপিনা রেডি করতে হবে। তিন বছরের মেয়েটাকে সঙ্গ দিতে হবে।

কত বয়স ক্রিস্টিনের।

তেত্রিশ। রাকেশের চল্লিশ। দেখলে অবশ্য বুঝবেন না। সুখ মানুষের বয়স কমিয়ে দেয়।

গেস্টদের নিয়ে রাত পৌনে ন'টায় বাড়ি ফিরেছিল রাকেশ। গাড়িতে বসে বলেছিল বন্ধুদের, 'কাঁটায় কাঁটায় পৌনে নটা। এক রাউন্ড কফি হয়ে যাক। তারপর চলবে হুইস্কি। জনি ওয়াকার।'

এই বলেই রিমোট কন্ট্রোলে খুলে দিয়েছিল গ্যারেজের রোলিং শাটার, মার্সিডিজের জোরালো হেডলাইট গিয়ে পড়েছে শাটারে। মেঝে ছেড়ে একটু-একটু করে উঠছে ওপর দিকে। তলার ফাঁকে দেখা গেছিল চকচক করছে রক্তের ধারা—গড়িয়ে বেরিয়ে আসছে গ্যারেজের ভেতর থেকে।

শাটার তখনও উঠছে ওপর দিকে। স্টিয়ারিং হুইলে হাত রেখে থ হয়ে বসে রয়েছে রাকেশ। চোখ ঠিকরে আসছে গেস্টদের। তারপরেই শুধু একটা নাম আর্তনাদের আকারে বেরিয়ে এল রাকেশের ভাঙা গলা দিয়ে —'ক্রিস্টিন।'

শাটার পুরো উঠে গেছে ওপরে। মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে ক্রিস্টিন। রক্তের নদীর মধ্যে। রক্ত ছিটকে লেগেছে পাশের ক্যাডিলাক গাড়িতে। ভোঁতা ভারি হাতিয়ার দিয়ে পিটিয়ে ছাতু করা হয়েছে মাথা। পাশবিক জিঘাংসা না থাকলে এমনভাবে খুন করা যায় না।

গ্যারেজে যখন নরপশু পিটছে মা-কে, মেয়ে তখন কোথায় জানেন? ওপরতলায়। মুগ্ধ চোখে দেখছে টেলিভিশন। রোলিং শাটার যখন উঠে গেল—তখন সে বসে টিভির সামনে। মা কখন আসবে, গল্প বলবে, ঘুম পাড়াবে—এই প্রতীক্ষায় একদম নড়েনি বিছানা ছেড়ে। পুলিশ এসেছিল কাল রাতেই। পাড়াপড়শি বলেছে, এ সেই প্রফেশনাল কিলার-এর কাজ। হপ্তা কয়েক আগেই যে লোকটা স্কুলের মেয়েকে রেপ করে পিটিয়ে মেরেছে—একই ভাবে—মাথা গুঁড়িয়েছে ডান্ডা মেরে—আর একটা মেয়েকে তো খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না।

ক্রিস্টিনের সুন্দর শরীরটাকেও কি ভোগ করেছিল নরপশু?

টাকায় সব হয়। কনট্যাক্ট থাকলে সবাই নড়ে বসে। আজ সকালেই স্পেশাল অটোপ্সি রিপোর্ট পাওয়া গেছে। রেপ করা হয়নি ক্রিস্টিনকে। খুবলোয়নি শরীরের কোনও জায়গা। শুধু সাতবার ডান্ডা মেরেছে মাথায়।

পুলিশের সিদ্ধান্ত এক্ষেত্রে যা হওয়ার তাই হয়েছে; কেস আত্মহত্যার নয়—নরহত্যা। চুরি ডাকাতিও হয়নি। রাকেশ সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত। কোনও জিনিসই খোয়া যায়নি। খুন হয়েছে চকিতে আর নি:শব্দে। এত চুপিসারে যে নির্জন বাড়ির দোতলায় বসে টিভি দেখে গেছে তিনবছরের মেয়েটা টের পায়নি কিচ্ছু। রাকেশরা ফিরে আসার একটু আগেই হয়েছে মার্ডার। কেননা, ডেডবডির চারপাশে পড়ে থাকা রক্ত তখনও ছিল টকটকে লাল—পুরোপুরি অক্সিজেন বোঝাই। ফুলবাগান আর গাছপালা দিয়ে ঘেরা বলে বাড়িটা পাড়াপড়শিদের উঁকিঝুঁকির বাইরে। খুনি সহজেই চম্পট দিয়েছে।

ইন্দ্রনাথবাবু, এই পর্যন্ত সব পরিষ্কার। এ কেস নিয়ে পুলিশ আর মাথা ঘামাবে না—তাদের অনেক বড় কাজ রয়েছে। স্ত্রী যখনই খুন হচ্ছে, রাকেশ তখন বন্ধুবান্ধব নিয়ে প্রায় বিশ মাইল দূরে কলকাতার নিউমার্কেটে—সুতরাং স্ত্রী-হত্যার দায়ে তাকে ফেলা যায় না।

কিন্তু আমার সন্দেহ তাকেই। কারণ? মাস তিনেক আগে ক্রিস্টিন আমার কাছে গেছিল। গোয়া থেকে তার বাবা আর মা বলেছিল অ্যাডভোকেটকে সব কথা জানিয়ে রাখতে। সব কথার সার একটাই কথা। রাকেশকে ডিভোর্স করতে চায় ক্রিস্টিন। বাবা-মা'কে যা লিখে জানিয়েছে আমাকেও বলে গেল সেই কথা।

বাইরে সুখের চালচিত্র আঁকলেও ভেতরে-ভেতরে জ্বলছিল অশান্তির আগুন। সুখের হয়নি এ বিয়ে। আগেই বলেছি আপনাকে, অমৃতসরের বান্ধবী মার্গারেটকে কলকাতায় এনে বিয়ে করতে চেয়েছিল রাকেশ। মার্গারেট আসতে চায়নি—কারণ, তখন রাকেশের পকেট ছিল গড়ের মাঠ—ছুঁচোয় ডন মারছিল সেখানে। ঘোড়েল মেয়ে মার্গারেট তাই ছিল তফাতে।

বোম্বাই গিয়ে আর এক গোয়ানিজ মেয়ে পেয়ে তাই বর্তে গেছিল রাকেশ। মার্গারেটকে টাইট মারার মোক্ষম সুযোগ। টাইট খেয়ে গেছিল মার্গারেট।

গোয়ায় ক্রিস্টিনকে নিয়ে গিয়ে ঢাকঢোল পিটিয়ে নিজের ঐশ্বর্যের কথা জাহির করেছিল রাকেশ ভয়ানক ঘুঘু বলেই—খবর চলে যাক মার্গারেটের কাছে। জ্বলে মরুক ঈর্ষায়।

হয়েও ছিল তাই। ধূর্ত মার্গারেট যখন দেখলে, পাখি প্রায় উড়ে গেছে, তখন ফাঁদ পেতেছিল মেয়েদের চিরকালের ছলাকলা দিয়ে।

সে ফাঁদে ধরা পড়েছিল রাকেশ।

চিঠিপত্র চলছিল সমানে—প্রথম-প্রথম ক্রিস্টিন কিসসু জানতে পারেনি।

পারল সেইদিনই, যেদিন মার্গারেট এল কলকাতায়। লর্ড সিনহা রোডের একটা গোয়ানিজ ফ্যামিলির বাড়িতে উঠল পেয়িং গেস্ট হয়ে। গোপনে দেখাসাক্ষাৎ চালিয়ে গেল রাকেশের সঙ্গে।

ক্রিস্টিনের তা অজানা রইল না। প্রথম সন্দেহটা হয়েছিল রাকেশের হাবভাব দেখে। মেয়েরা সব বোঝে। ওদের কাছে কিছুই লুকোনো যায় না। প্রাইভেট ডিটেকটিভ লাগিয়ে—

এই পর্যন্ত শুনে ইন্দ্রনাথ ডানহিল নামালো দাঁহের ফাঁক থেকে।

বললে, 'জানি।'

আশ্চর্য হলেন রতিকান্ত সমাদ্দার, 'কীভাবে?'

'প্রথমে এসেছিল আমার কাছে। এসব পেটি কেস আমি হ্যান্ডল করি না শুনে রেগেমেগে বেরিয়ে গেছিল। তবে কোথায় গেছিল, সেটা জানি। ঠিকানাটা আমিই দিয়েছিলাম।'

জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে রইলেন রতিকান্ত সমাদ্দার।

ইন্দ্রনাথ বললে, 'প্রেমচাঁদ প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সিতে—আমার বন্ধুর অফিসে।— তারপর?'

রতিকান্ত সমাদ্দার বলে চললেন তাঁর বাকি কথা। প্রায় একই কথা।

ঠিক সেই সময়ে শোনা যাচ্ছিল গোয়েন্দানী নারায়ণীর কণ্ঠ—অন্য জায়গায়।

সে এখন বসে রয়েছে রাজাবাজারের বস্তি পাড়ায়। দিনের আলোয় এখানে হাজারো বিজনেসের জলুস। রাতের অন্ধকারে গলিঘুঁজিতে চোখ জ্বলে আদিম কামনায়, চলে হরেক পাপের অগুন্তি ব্যবসা। গেরস্থরা সেসবের খবর রাখে না।

রাখে কিন্তু গোয়েন্দানী নারায়ণী। সে যে এই লাইনের লোক। বিচরণ করে অবশ্য রাজহংসীর মতো। কাদা আর পাঁক গায়ে লেগে থাকে না।

রাতের নগরী কলকাতায় যে-যে অঞ্চল কুৎসিত আর ভয়াবহ হয়ে ওঠে—এই পাড়া সেগুলোর একটা।

বড় রাস্তায় ট্রামলাইন ঘেঁষে সারি-সারি ঝকমকে দোকান। তিনতলা একটা বাড়ির একতলাতেও তাই। দোতলা আর তিনতলায় অন্য অফিস। বৈধ উপায়ে অবৈধ কাজের অফিস।

নারায়ণী বসে রয়েছে এমনি একটা অফিসে। ওর সামনে একটা চৌকোনো টেবিল। অদ্ভুত ডিজাইন। ঘরটাও চৌকোনা। সিলিং খুব নিচু। সাদা প্লাস্টারের ফুল লতাপাতা। দেওয়ালে ডুমোডুমো ফোম রবারের গদি। সাউন্ড-প্রুফ ঘর। একটি মাত্র দেড় টন এয়ারকন্ডিশনার চলছে ফুর-ফুর করে।

টেবিলের ওদিকে বসে কর্নেল ফ্লিন্ট। সেল্ফ-স্টাইলড কর্নেল। আর্মিতে জীবনে নাম লেখায়নি। তার আর্মি সে নিজে গড়ে নিয়েছে। বেকারের অভাব নেই। তার কাজের লোকের অভাব নেই। নিজে জন্মেছিল পতিতার গর্ভে। ব্যবসা জমিয়েছে পতিতাপল্লীতেই। জমজমাট ব্যবসা। তার শেকড় সর্বত্র। বটগাছ বললেই চলে।

বয়স বেশি নয় কর্নেল ফ্লিন্টের। মাত্র পঁয়ত্রিশ। নিপাট ভালো মানুষের মতো চেহারা। রোগা। বেঁটে। শুকনো। এরকম অ্যাংলো গণ্ডায়-গণ্ডায় দেখা যায় ইলিয়ট রোডে।

নারায়ণী তার চোখে-চোখে চেয়ে বলে যাচ্ছে, 'কর্নেল, প্রেমচাঁদ ডিটেকটিভ এজেন্সিতে ক্রিস্টিন দরবার করার আগে ওর প্রাণের সখী সিনথিয়াকে জানিয়ে রেখেছিল রাকেশের সঙ্গে বিয়েতে ঘুণ ধরেছে। এজেন্সি থেকে সিক্রেট রিপোর্ট পাওয়ার পর বলেছিল সিনথিয়াকে, 'ওরা আমাকে সরিয়ে দেবেই। ঘর করছি একটা পিশাচের সঙ্গে। ডিভোর্স দেবে না। দিলেই তো খোরপোষ চাইব। প্রপার্টির শেয়ার চাইব। বিজনেস দারুণ চলছে। বছর পনেরো নিশ্চিন্ত—টাকার হিসেব থাকবে না। ডিভোর্স দেবে না ওই জন্যেই। কিন্তু আমাকেও বাঁচতে দেবে না।'—সিনথিয়ার বিশ্বাস, রাকেশই খতম করেছে ক্রিস্টিনকে। কাল এসে বলে গেল সব কথা। পুলিশ কিচ্ছু করবে না। কিনে রেখেছে রাকেশ। সিনথিয়াকে বলে দিয়েছি, রাকেশকে দিয়েই কবুল করাব—বিশ মাইল দূরে থেকেও ভাড়াটে লোক দিয়ে সে-ই খুন করিয়েছে ওয়াইফকে।'

কর্নেল এক দৃষ্টে চেয়ে আছে নারায়ণীর চোখের দিকে—যে চোখে চোখ রাখলেই রোমাঞ্চিত-কলেবর হয় না—এমন পুরুষ ধরাধামে নেই।

কর্নেল ফ্লিন্টের ধমনীতে বইছে অর্ধেক ব্রিটিশ রক্ত। বাকি অর্ধেক এসেছে আরবের মরুভূমি থেকে।

ধূসর নির্ভাষ চোখে তার আভাস মেলে যখন সে পলকহীন চোখে চেয়ে থাকে। এখনও সে চেয়ে আছে সেইভাবে।

শকুনির চোখে পলক পড়ছে না।

নারায়ণী বললে, 'প্রেমচাঁদ ডিটেকটিভ এজেন্সির রিপোর্ট সব রহস্য ফাঁস করে দিয়েছে। প্রমাণ এনে দিয়েছে ক্রিস্টিনের হাতে। মার্গারেটের সব চিঠি রাকেশ রেখে দিয়েছিল অফিসে। বিজনেস ফাইলে। চিঠির তাড়া চলে এসেছিল ক্রিস্টিনের হাতে। ব্যভিচারিতার কেস মজবুত করার ডকুমেন্টারি এভিডেন্স। রাকেশকে চার্জ করেছিল ক্রিস্টিন। বলেছিল—শেয়ার দাও—ডিভোর্স দেব। প্রচণ্ড চেঁচামেচি হয়ে গেছিল সেদিন। বাড়ির ঝি জিনিসপত্র নিয়ে চলে গেছে। যাওয়ার সময়ে বলে গেছে—এ বাড়িতে আর টেকা যাবে না। ঝি-কেও জেরা করে প্রেমচাঁদ ডিটেকটিভ এজেন্সি জেনেছে সেদিন কী-কী কথা হয়েছিল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে।'

কী যেন জিজ্ঞেস করতে গিয়েও চুপ করে গেল কর্নেল ফ্লিন্ট।

নারায়ণী বললে, 'ক্রিস্টিন খুন হয়েছে, এ খবর পেয়েই অত রাতে সিনথিয়া ছুটে এসেছিল আমার কাছে। রাকেশের পরনারী গমনের ডকুমেন্টারি এভিডেন্স তুলে দিয়ে গেছে আমার হাতে। তার কিছুক্ষণ পরেই পেলাম একটা খাম। লকারের চাবি আর তোমার চিঠি। টাকা নিয়ে সরে দাঁড়াতে বলেছ। তাই এলাম তোমার কাছে। চিঠির জবাব মুখেই দিয়ে যাই। রাকেশ মরবে—আমার হাতে। এই রইল তোমার লকারের চাবি—ক্ষমতা আছে বটে তোমার। অত রাতে বিলিতি ব্যাঙ্কের লোককে ম্যানেজ করলে কীভাবে?'

বুকের খাঁজে হাত গলিয়ে দিয়ে লকারের চাবি টেনে এনে টেবিলে ছুঁড়ে দিল নারায়ণী। সেদিকে তাকাল না কর্নেল।

শুধু বললে রেশম মসৃণ নরম গলায়, 'দেবী, তুমি কথা বলছ ঠিক ভারতীয় নারীদের মতো। অনেকদিন ধরেই তোমার খোঁজ রাখছিলাম। তুমি আমাদের পথের কাঁটা। পঁচিশ লাখেও তোমাকে কেনা গেল না। এরকম পঁচিশ আরও পেতে সুন্দরী—যদি আসতে আমার আর্মিতে। চোখা মেয়ের বড্ড অভাব চলছে। যাক, যখন এলে না—তখন তোমাকেও রাখব না। পায়ের তলাতে ঘাস গজাতে আমি দিই না। ক্রিস্টিন আর সিনথিয়ার যে দশা হয়েছে—তোমারও হবে তাই।'

চোখের পাতা একটুও কাঁপল না নারায়ণীর, দুহাত রয়েছে টেবিলের ওপর। চোখের কোণ দিয়ে টের পেল পেছনের দরজা নিশ্চয়ই একটু ফাঁক হয়েছে আলো ঢুকছে সেই কারণে। ফাঁক যখন হয়েছে, ফায়ার আর্মস-এর চোখও নিশ্চয় টিপ করেছে ওর পৃষ্ঠদেশ।

পিঠ সিধে রেখে বললে, 'ক্রিস্টিনকে খুন করেছে তোমার লোক?'

'এ বাড়িতেই সে আছে। আগে বকসিং লড়ত। এখনও লড়ে দুশমনদের সঙ্গে। বড় বাজে অভ্যেস। হাত ভেঙে দেয় মোচড় দিয়ে। তোমার সঙ্গেও লড়বে। ধৈর্য ধরো, ভারতীয় নারী।'

অবিচলিত কণ্ঠে বললে নারায়ণী, 'সিনথিয়ার কী দশা হয়েছে?'

ভারি মিষ্টি হাসল কর্নেল ফ্লিন্ট, 'সে তো আমার হিট লিস্টেই ছিল। যার নুন খাব, তার কাজ পুরো করে দেব। রাকেশ সাহেবই দিয়েছিল মেয়েটার নাম ঠিকানা। নজরে ছিল বলেই দেখলাম অত রাতে দৌড়েছে তোমার কাছে। মাই গড। তোমার ডেরা থেকে বেরতেই তুলে আনলাম। সারারাত তাকে এনজয় করেছে আমার লোকগুলো। এখন ঘুমোচ্ছে। আজ রাতে তোমার পালা। তার রেস্ট। এইভাবেই চলুক কিছুদিন—তারপর লড়িয়ে দেব বক্সারের সঙ্গে—মেয়ে মর্দানির সঙ্গে কক্ষনও লড়েনি। নতুন টেকনিক দেখাবে মনে হচ্ছে। হাত না ভেঙে হয়তো টেনে ছিঁড়ে আনবে—

বলে নারায়ণীর বক্ষশোভার দিকে তাকিয়ে উচ্চহাস্য করে উঠল ফ্লিন্ট।

এইটাই ছিল সঙ্কেত। এই হাসিটা। পুরো খুলে গেল পেছনের দরজা। উঠতে যাওয়াটা ভুল হবে বুঝে বসেই রইল নারায়ণী। পিঠে অনুভব করল শক্ত খোঁচা। ফায়ার আর্মস।

মিঠে হাসে ফ্লিন্ট, 'আমার অস্ত্রাগারের লেটেস্ট অটোমেটিক এখন তোমার পিঠে লেগেছে, সুন্দরী। দলে এসো, এরকম জিনিস অনেক পাবে—না এলে,' ঈষৎ সঙ্কুচিত হল ফ্লিন্টের একটা চোখ।

খুলে গেল পরক্ষণেই, 'ভালো কথা, মাই বিউটি। এই কেসে অনেক খবরই রেখেছ—একটা খবর পাওনি। জানা দরকার তোমার। জানবার পর হয়তো রাকেশ হত্যার প্ল্যান মাথা থেকে মুছে ফেলবে। মাসুদ, লক্কা

পায়রাটাকে পাঠিয়ে দে।'

নারায়ণীর পিঠ থেকে নলচে সরে গেল না। মাসুদ নামধারী স্যাঙাৎ নিশ্চয় দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ। ফ্লিন্ট চেয়েছিল সেইদিকেই। পায়ের আওয়াজ সরে গেল দূরে।

ফ্লিন্ট বলে গেল সিল্ক-নরম গলায়, 'তোমার মতো সুন্দরী একজনও যদি থাকত আমার আর্মিতে—ডোজ পড়লেই সুর অবশ্য পালটাবে—খালিস্তানিদের হাতেই তোমাকে ছেড়ে দেব ভাবছি। কলকাতায় ওদের সেলটার দিচ্ছি তো আমিও—মাথা পিছু এক লাখ অ্যাডমিশন ফী—রাতের খরচ আলাদা—তুমি থাকলে রোজগার হবে ভালোই।—এই যে লঙ্কা, এসো, ভেতরে এসো।'

মার্জারের মতো নি:শব্দ চরণে একব্যক্তি টেবিল ঘুরে গিয়ে দাঁড়াল ফ্লিন্টের চেয়ারের পাশে। গায়ে গিলে করা কেমব্রিকের পাঞ্জাবি। বোতাম হিরের। ভেতরে গেঞ্জি নেই। ফরসা গা ফুটে বেরচ্ছে। ডুমোডুমো পেশি ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ঘাড়েগর্দানে সমান। শুয়োরের মতোন। মুখখানাও সেইরকম। অমানুষিকতা প্রকট হয়েছে প্রতিটি রেখায়। চাহনি ক্ষুধার্ত। চোখ দিয়ে যেন চেটে খাচ্ছে নারায়ণীর সর্বাঙ্গ।

সিল্ক-সফট গলায় ফ্লিন্ট বললে, 'এই আমাদের লঙ্কা—বাহিনীর বক্সার—হাত ভেঙে দেয় হারিয়ে দিয়ে। তোমার কী করবে, সেটা পরে টের পাবে। লঙ্কা, তুই খুন করেছিস ক্রিস্টিনকে? উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর মতলবে হপ্তাকয়েক আগে স্কুলের মেয়েটাকে রেপ করে খতম করেছিলিস? আর একটা মেয়েকে লোপাট করে চালান দিয়েছিস?'

ঘাড় নেড়ে সায় দিল লঙ্কা। চোখ কিন্তু নারায়ণীর দিকে। ঠোঁট চাটছে জিভ দিয়ে।

'ক্রিস্টিনকে তুই আগে থেকে চিনতিস?'

আবার ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে গেল লঙ্কা নামধারী লম্পট।

'সেই জন্যেই নির্জন বাড়ির গ্যারেজ ঘরে দেখা করেছিল তোর সঙ্গে?'

'হ্যাঁ,' এতক্ষণে একটি অক্ষরে জবাব দিল লঙ্কা। চেঁচিয়ে গলা ভেঙে ফেললে কণ্ঠস্বর যেরকম দাঁড়ায়—লঙ্কার গলার সুর সেইরকম।

'তার আগে ক্রিস্টিনের সঙ্গে তোর আলাপ হয়েছিল কেন?'

দাঁত বেরিয়ে পড়ল লঙ্কার। লালচে-হলুদ দাঁত। হাসছে। হেসে-হেসে যা বলে গেল, শুনে থ হয়ে গেল গোয়েন্দানী নারায়ণী।

বকে-বকে ক্লান্ত হয়েছেন রতিকান্ত সমাদ্দার। এখন তিনি স্তব্ধ।

ইন্দ্রনাথ ডানহিল নামিয়ে রেখেছে। দুই চোখে দূরবিস্তৃত চাহনি। চিন্তাচ্ছন্ন চোখে তাকিয়ে আছে ঘরের ওপর কোণে।

একটু পরে দৃষ্টি ফিরে এল টেলিফোনের দিকে। তুলল রিসিভার। কথা হয়ে গেল প্রেমচাঁদ ডিটেকটিভ এজেন্সির ক্যালকাটা ব্রাঞ্চে। ছোট্ট রিপোর্ট শুনে নিল টেলিফোনেই।

বললে, 'ডকুমেন্টারি এভিডেন্স সবই কি ক্রিস্টিনের কাছে?'

'না,' জবাব এল তারের মধ্যে দিয়ে, 'উনিই আমাদের জানিয়েছিলেন—বাড়িতে রাখা নিরাপদ নয় বলে গচ্ছিত রেখেছেন বান্ধবীর কাছে।'

'বান্ধবীর নাম?'

'সিনথিয়া ডিয়েট্রিক।'

'তার ঠিকানা জানেন? জানেন। দেখুন তাকে পান কিনা।'

আস্তে রিসিভার নামিয়ে রাখল ইন্দ্রনাথ। চিন্তাকুটিল চোখে কিছুক্ষণ মেঝের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বললে রতিকান্ত সমাদ্দারকে, 'রাকেশের ঠিকানা দিয়ে যান। হ্যাঁ, আপনি যান—আপনার কার্ডও রেখে যান। এর মধ্যে ব্রেনওয়ার্কটা কোথায়, তাই তো বুঝছি না। রাকেশ মার্ডার করিয়েছে কাউকে দিয়ে—তাকে চাই?'

'আজ্ঞে। তাহলেই রাকেশকে কোর্টে ফাঁসানো যাবে।'

'দেখি।'

একঘণ্টা পরে বাজল রিঙ। ঘর এখন ফাঁকা। আর এক ছিলিম টানা হয়ে গেছে ডানহিলে। ঘণ্টা বাজতেই ছোঁ মেরে রিসিভার তুলে নিল ইন্দ্রনাথ। কানপেতে শুনল পিঁক পিঁক রিপোর্ট। নামিয়ে রাখল যন্ত্র।

সিনথিয়া কাল রাত থেকে নিরুদ্দেশ।

বাড়ি বটে একখানা। ছ-বিঘে ফুলবাগানে মাত্র দোতলা বাড়ি। প্রাসাদের খুদে সংস্করণ।

একতলার ঘরে পরিচয় হল রাকেশ মালহোত্রার সঙ্গে। অতিশয় সুদর্শন, অতিশয় মিষ্টভাষী, অতিশয় সফিসটিকেটেড এক যুবক। হিন্দি সিনেমার পরদা থেকে নেমে আসা হিরো বললেই চলে। এখন তার মুখ জুড়ে থই-থই করছে বিষাদ-সমুদ্র। ঘরে সে একা ছিল না। সমবয়েসি প্রায় সমান-সুদর্শন এক যুবক বসেছিল গম্ভীর মুখে। রাকেশই আলাপ করিয়ে দিল তার সঙ্গে। যুবকের নাম রোশনলাল। বাড়ি চণ্ডীগড়ে। অফিসও সেখানে। সল্টলেকে এসেছিল অফিসের কাজে। সকালে ইংরেজি কাগজ খুলে খবরটা পড়েই দৌড়ে এসেছে। রাকেশ তার অনেকদিনের বন্ধু। বিয়ের আগে থেকে।

পরিচয়-পর্ব সাঙ্গ হওয়ার পর রাকেশ চতুরভাবে চট করে চলে এল কাজের কথায়, 'মি: রুদ্র, আপনি ডিটেকটিভ। এ কেসে কে আপনাকে লাগিয়েছে?'

'কেউ না। নিজের ইন্টারেস্টেই এলাম।'

সরু চোখে চেয়ে রইল রাকেশ। এখন তার মুখের বিষাদের মেঘ অনেকটা ফিকে।

'কী জানতে চান বলুন?'

'আপনার স্ত্রীর এক বান্ধবীর নাম সিনথিয়া? সিনথিয়া ডিয়েট্রিক?'

ঘাড় নেড়ে নীরবে সায় দিয়ে গেল রাকেশ। অনিমেষ চক্ষু নিবদ্ধ ইন্দ্রনাথের হীরক চক্ষুর ওপর।

গলায় শান দিয়ে নিল ইন্দ্রনাথ, 'তিনি এখন কোথায়?'

অসাধারণ অভিনেতা বটে রাকেশ। অবিচল রইল মুখভাব। কিন্তু চোখের তারায় যেন লাগল ছোট্ট ধাক্কা। ক্ষীণ কাঁপুনি চোখ এড়াল না ইন্দ্রনাথের।

রাকেশ বলল, 'এ প্রশ্ন আমাকে কেন?'

কারণ তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না কাল রাত থেকে।

'সিনথিয়া? কাল রাতেই তো ফোন করেছিল—যাকে চাইছিল, সে তখন ছিল না। এর বেশি তো জানা নেই।'

উঠে দাঁড়িয়েছে রোশনলাল। হাওয়া যেরকম ভারি হয়ে উঠেছে, তার আর থাকা সমীচীন নয়। রাকেশের অনুরোধ এড়িয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। একটু পরেই শোনা গেল তার গাড়ির আওয়াজ। জানলা দিয়ে নম্বর প্লেটটা দেখে নিল ইন্দ্রনাথ।

শক্ত গলায় বললে রাকেশ, 'মি: রুদ্র, কেউ যখন আপনাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়নি—তখন আমি দিচ্ছি আপনাকে। পুলিশকে দিয়ে হবে না। ক্রিস্টিন-এর মার্ডারারকে বের করুন। আপনার পারিশ্রমিক কত?'

একটু থেমে ইন্দ্রনাথ বললে, 'টোয়েন্টি থাউজান্ড। ফিফটি পারসেন্ট ইন অ্যাডভান্স।'

পাঁচ মিনিট পরে ট্যাকসিতে উঠে বসল ইন্দ্রনাথ। ওর পকেটে ফুটছে দশহাজার টাকার একখানা চেক।

ঘুষ!

রাকেশ ভিলা থেকে বেরিয়ে কিছুদূর এসে তেমাথা। বাঁদিকে মোড় নিতে গিয়ে দাঁড় করাতে হল ট্যাক্সি।

রোশনলাল রাস্তায় দাঁড়িয়ে। হাত বাড়িয়ে রুখেছে ট্যাক্সি। বললে, 'ট্যাক্সি ছেড়ে দিন, ইন্দ্রনাথবাবু, চলে আসুন আমার গাড়িতে।'

সুভাষ সরোবর। ইন্দ্রনাথের বাড়ি। বৈঠকখানা ঘর।

ইন্দ্র বলছে, 'প্রথম পরিচয়েই আপনার পরিষ্কার বাংলা শুনে আঁচ করেছিলাম আপনি আদতে কলকাতার মানুষ। গাড়ির নাম্বার নোট করে নিয়েছিলাম—খুঁজে বের করতামই। কিন্তু আপনি এক ধাপ এগিয়ে গেলেন।

যা বললেন তা থ্রিলিং।'

রোশনলাল বললে, 'কিন্তু প্রমাণ?'

'এই নিন টেপরেকর্ডার। ফিরে যান বন্ধুর কাছে। ছোট্ট ক্যাসেট রেকর্ডার। পকেটেই রাখবেন। কথা বলুন পুরোনো প্রসঙ্গ নিয়ে—সেই সব কথা—যা শুধু প্রাণের বন্ধু হিসেবে রাকেশ বলেছিল আপনাকে। ক্রিস্টিনকে খুন করবার কত রকম ফন্দি এঁটেছিল—'

'মোট আটরকম। প্রথমে ঠিক করেছিল, গুলি করাবে ভাড়াটে খুনি দিয়ে ডাকাতির অছিলায়। তারপর ভেবেছিল, গাড়ির ব্রেক বিগড়ে রাখবে। তিন নম্বর প্ল্যানটা ছিল, সুইমিং পুলে ইলেকট্রোফিউশন—

ক্যাসেট ফুরোনোর আগেই সব কথা বলবেন—ওকে দিয়েও সায় দেওয়াবেন। বলবেন, কাজটা ভালো করলে না...'

পরের দিন সকালে ক্যাসেট রেকর্ডার পৌঁছে গেল ইন্দ্রনাথের বাড়িতে। শেষের দিকে রাকেশ বলছে, 'তুমিই শুধু জানলে...।'

ইন্দ্রনাথের টেপ শেষ হল, হার্লে ডেভিডসন ব্রেক কষলো ওর বাড়ির সামনে। আওয়াজ শুনেই উঠে দাঁড়িয়েছিল ইন্দ্রনাথ—ঘর থেকে বেরোনোর আগেই ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকল একটি নারীমূর্তি। তার নাকের পাটা ফুলে-ফুলে উঠছে, দুই চোখে আগুন ঝরছে। চুল তার উসকোখুসকো, পোশাক ছেঁড়াখোঁড়া।

মূর্তিমতী প্রভঞ্জন বললে তীব্রস্বরে, 'আপনি ইন্দ্রনাথ রুদ্র? আমি গোয়েন্দানী নারায়ণী।'

স্থির চোখে তাকিয়ে ইন্দ্র বলল, 'নাম শুনেছি। কী কাণ্ড করে এলে, বোন?'

'কর্নেল ফ্লিন্টের আস্তানা উড়িয়ে দিয়ে এলাম। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল একটা পাপের ডেরা। রাজাবাজার বস্তির আগুন নেভাতে কলকাতার সব দমকল এখন হাজির। নাইট্রোগ্লিসারিন আর আর. ডি. এক্স-এর গুদোম ছিল—উড়িয়ে দিয়েছি রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে। আমার গায়ে হাত। শয়তান। সিনথিয়াকে কিন্তু বাঁচাতে পারলাম না।'

চমকে উঠল ইন্দ্রর শিরদাঁড়া, 'সিনথিয়া ওখানে?'

'হ্যাঁ আপনাকেও যেতে হত। রাকেশ ফোনে জানিয়ে দিয়েছে ফ্লিন্টকে। তাই তাড়াতাড়ি বেরোতে গিয়ে লক্কাও খতম হয়ে গেল। যাকে দিয়ে খুন করানো হয়েছে ক্রিস্টিনকে। কিন্তু আপনি আসল জিনিসটা জানেন না—আমিও জানতাম না। জানত লক্কা—সে থাকলে নিজেই কবুল করত।'

'আসল জিনিস মানে?'

'লক্কার কাছে অ্যাপ্রোাচ করেছিল ক্রিস্টিন-ও। খুন করাতে চেয়েছিল রাকেশকে। স্বামী আর স্ত্রী দুজনেই চেয়েছে একজন আর একজনকে খতম করতে। হরিবল। ইন্দ্রনাথদা, আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—খতম করবই রাকেশকে।'

স্নেহনিবিড় গলায় বললে ইন্দ্রনাথ, 'দরকার কী? বাঘের শত্রু যাঁড়ে মারে। রাকেশের বিরুদ্ধে কেস পাকা করে এনেছি। এগোক আইনের পথে।'

'তাহলে আমি চলি আমার পথে।'

নিমেষে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল মূর্তিমতী প্রভঞ্জন। নিরেট গম্ভীর নিনাদে সুভাষ সরোবর কাঁপিয়ে উধাও হয়ে গেল মেটাল মন্সটারি।

প্রশ্ন একটাই থেকে যায়। একা নারায়ণী কর্নেল ফ্লিন্টের দুর্ভেদ্য দুর্গ উড়িয়ে দিল কী করে? বেরিয়ে এল কীভাবে?

আজকের ভারতীয় নারীই বিশ্বের প্রথম নারী যারা এভারেস্টের শৃঙ্গ জয় করেছে।

কৌশলে সবই হয়। সূক্ষ্ম বুদ্ধির কাছে চিরকালই পরাজিত হয়েছে মোটা বাহুবল।

মার্শাল আর্টে বলীয়সী নারায়ণী অবশ্য বাহুবলের একটা স্বাক্ষর রেখে গেছে দুর্গ উড়িয়ে দেওয়ার আগে। লক্কার পায়রার শিরদাঁড়া মাঝখান থেকে ভেঙে দিয়েছে। মুচড়ে দিয়েছে গলা—পুরো একপাক।

বাকি কাহিনি দীর্ঘ, বীভৎস এবং লোমহর্ষক। রক্ত জল হয়ে যেতে পারে। সুতরাং...!

** 'মনোরমা' পত্রিকায় প্রকাশিত। (শারদীয় সংখ্যা, ১৪০০)*

জিরো জিরো গজানন

ত্রিশূল এর আমন্ত্রণ

জিরো জিরো গজানন পরপর দুটো ট্যাবলেট মুখে ফেলে দিয়ে বললে পুঁতিবালাকে, লাশটা কোথায়?

পুঁতিবালা তখন হাঁফাচ্ছে। অনেকটা পথ ছুটে আসতে হয়েছে খবরটা দিতে। একে তো এই পাহাড়ি রাস্তা। ওঠো আর নামো, ওঠো আর নামো। ধুস! দম বেরিয়ে যায়!

বললে জোরে-জোরে নি:শ্বাস নেওয়ার ফাঁকে-ফাঁকে—এখন ও রাস্তায়...মানে, বস্তির দিকে যে সিঁড়িটা নেমে গেছে, তার ওপর।

ট্যাবলেট দুটো ততক্ষণে জিভের তলায় মিলিয়ে গেছে। বেশ চাঙ্গা লাগছে গজাননের। আমেরিকান বড়ি। ব্রেনটাকে ঝাঁকুনি মেরে সজাগ করে দেয় চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে।

মোষের শিংয়ের নস্যাধার খুলে এক টিপ নস্যি নিয়ে নাসিকা গহ্বরে সশব্দে চালান করে দিয়ে ভারিক্কি গলায় বললে গজানন, মানে জিরো জিরো গজানন, ওরফে সুপার স্পাই ট্রিপলজি—পুঁতিবালা, যে অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে এসেছি, মনে হচ্ছে, এবার তার ভেতরে প্রবেশ করব। এ সময়ে তোমার এই ভয়ংকর হাঁপানিটা সব বানচাল করে দিতে পারে।

পুঁতিবালা নামটা গেঁইয়া হতে পারে, কিন্তু মেয়েটি খাসা। সুপার মডার্ন গার্ল বললেই চলে। গজানন একে আবিষ্কার করেছিল হিন্দ সিনেমার সামনে থেকে। কলগার্ল পুঁতিবালা ষোড়শী বালিকার মতোই ডাগর চোখে উৎসুক পথচারীদের প্রাণে পুলক জাগিয়ে চলেছিল। গোধূলির লাল আভা গণেশ এভিনিউ বেয়ে তার মুখে পড়েছে। চৌমাথায় ট্রাফিক পুলিশ যথারীতি কথাকলি নৃত্য করে যানবাহন জট রুখে দিচ্ছে। পুঁতিবালাকে সে রোজই দেখে। ছেলেছোকরা থেকে আরম্ভ করে প্রৌঢ়রা পর্যন্ত হেসে-হেসে তার সঙ্গে কথা বলে স্কুটার অথবা গাড়িতে চাপিয়ে হু-উ-উ-স করে উধাও হয়। কনস্টেবল পুঙ্গব তা দেখেও দেখে না। আহা, মেয়েটা রোজগার করছে, করুক।

কিন্তু জিরো জিরো গজাননের চোখের কোয়ালিটিই আলাদা। মেন্টাল হোমে থাকতে থাকতেই তার চোখের আর মনের ধার বেড়েছে। ম্যাচুইরিটি এসেছে। ইনটেলেকচুয়াল ম্যাচুইরিটি।

তারপরেই বেপারিটোলা লেনে ভোলা হাউসের ঠিক পেছনের লাল বাড়িটায় পেয়ে গেল একটা ঘর। আশেপাশে কালোয়ারদের আড্ডা। পুরোনো মাল নীলামে কিনে এনে খুলে রকমারি পার্টস চড়া দামে বেচেই এরাই এখন লাখোপতি কোটিপতি। শুধু নীলামে নয়, চোরাই মালও আসছে এই তল্লাটে। সুতরাং এসপায়োনেজ অ্যাকটিভিটির পক্ষে জায়গাটা উপযুক্ত।

মেন্টাল হোম থেকে বেরোনোর আগেই গজানন ঠিক করেছিল সে স্পাই হবে। নিক কার্টার পড়েছে বিস্তর। জেমস বন্ড তার প্রিয় হিরো। ব্রুস লীর পরম ভক্ত। এই সবগুলো মাথার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে যাওয়ার ফলেই যেতে হয়েছিল মেনট্যাল হোমে। ঝাঁকড়া চুল নেড়ে একদিন লরির ওপর লাফিয়ে উঠে লাথি মেরে উইন্ডস্ক্রিন ভেঙে দিতেই পা কেটে গেছিল—ভ্রূক্ষেপ করেনি। কিন্তু লরির ভেতর স্মাগলার তিনজন যখন ছুরি হাতে বেরিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল গজাননের ওপর—টনক নড়েছিল তখনই।

একটা বাচ্চা মেয়েকে ঠিকরে ফেলে দিয়ে উধাও হওয়ার ফিকিরে ছিল বলেই অসম সাহসিকতাটা দেখিয়ে ফেলেছিল গজানন। নিমেষের মধ্যে আত্মবিস্মৃত হয়েছিল। বেঞ্চিতে বসা ইয়ারবন্ধুদের সঙ্গে গল্প করা মাথায় উঠেছিল। হুঙ্কার ছেড়ে লাফিয়ে উঠেই নক্ষত্রবেগে ধেয়ে গিয়ে ঠিকরে গেছিল লরির ওপর।

তারপরেই প্রচণ্ড লাথি। ঝনঝন করে ভেঙেছে কাচ। থেমেছে লরি। পরমুহূর্তেই ভাঙা কাচে রক্তরক্তি ড্রাইভারের পাশে বসা তিন মস্তান বেরিয়ে এসে খোলা ছুরি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল গজাননের ওপর।

বেলেঘাটা মেন রোডের ওপর বোমা নিয়ে দু-দলে মারামারি নতুন দৃশ্য নয়। কিন্তু সে দিনের সেই দৃশ্য ছিল একেবারে অন্যরকম। তিন-তিনটে ঝকঝকে ছুরি তিনদিকে ঝলসে উঠতেই গজাননের মাথার মধ্যে কী যেন ঘটে গেল। মনে হল পটাং করে একটা টান করে বাঁধা তার ছিঁড়ে গেল। সেতারের তার ছেঁড়ার মতো আওয়াজটা মাথার মধ্যে মিলিয়ে যেতে না যেতেই গজানন হয়ে গেল আর এক মানুষ।

তিন-তিনটে ছুরিধারী মস্তানকে কীভাবে রুখেছিল গজানন, তা তার কিচ্ছু মনে নেই। পটাং করে তার ছিঁড়ে যাওয়ার পর থেকেই কী-কী ঘটেছিল, কিসসু মনে নেই।

রাস্তার লোকে দেখেছিল যেন স্বয়ং জেমস বন্ড, ব্রুস লী আর অমিতাভ বচ্চন একইসঙ্গে মিলেমিশে গেছে গজাননের বিদ্যুৎ গতি ক্ষিপ্রতার মধ্যে। ক্যারাটে, মার, লাথি, ঘুসি চলছে এত দ্রুত পরম্পরায় যে ভালো করে দেখা যাচ্ছে না কী ঘটে চলেছে। সেকেন্ড কয়েকের মধ্যে তিন-তিনটে হাত-পা-মাথা ভাঙা জোয়ান ঠিকরে পড়ল বেলেঘাটা মেন রোডের খোলা ড্রেনে পাঁকের মধ্যে।

আর রক্তাক্ত দেহে দাঁড়িয়ে সুন্দরবনের আহত বাঘের মতো সমানে গর্জে চলল গজানন। তিনটে ছুরির একটা তার পেটের চামড়া এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত কেটে দিয়েছে, আর একটা গোটা পিঠটাকে কোণাকুণিভাবে চিরে দিয়েছে, তৃতীয়টায় কেটেছে ডান গাল।

বীভৎস মূর্তি নিয়ে তাই হুঙ্কারের পর হুঙ্কার ছেড়ে চলেছে গজানন। চোখ ঘুরছে বনবন করে। দাঁত খিঁচিয়ে রয়েছে হিংস্র হায়নার মতো।

বন্ধুরাই ওকে জাপটে ধরে এবং দশ-দশটা বন্ধু নাকানি চোবানি খেয়ে যায় তাকে মেনট্যাল হোমে নিয়ে যেতে। স্ট্রেটজ্যাকেট পরিয়ে সেল-এ রাখতে হয়েছিল কিছুদিন। মাথায় শক দিতে হয়নি—স্রেফ শক থেরাপিতেই কাজ হয়েছিল। মাস কয়েক পরে ডা: রাঘব বক্সীর চেম্বার থেকে যখন বেরিয়ে এল, তখন আর গজাননকে চেনা যায় না। বাবরি প্যাটার্নের অসুর মার্কা চুল ওর বরাবরই। কিন্তু শরীর আরও মজবুত হয়েছে। গায়ের রং আগে ছিল ফরসা, এবং লালচে। চোখ-মুখ-নাকের ধার আরও বেড়েছে। সব মিলিয়ে ঝকঝক করছে চেহারাটা।

ডা: বক্সী তাকে পিটিয়ে শক্ত করে দিয়েছেন। লোহা থেকে ইস্পাত। আসবার সময়ে চোখে চোখ রেখে কঠোর কাটা-কাটা স্বরে শুধু বলেছিলেন, 'গজানন, আর যাই করো, কুপথে যেও না, তোমার মধ্যে যে সম্পদ আছে, তা দেশের কাজে লাগিও।'

তাই স্পাই কোম্পানি খুলে বসেছিল গজানন ওরফে ট্রিপল-জি ওরফে জিরো জিরো গজানন।

উদ্দেশ্য একটাই, দুর্নীতির অবসান। কালোবাজারি হটাও, দেশকে বাঁচাও—এই হচ্ছে জিরো জিরো গজানন কোম্পানির পলিসি।

বেপারিটোলা লেনের অফিস থেকে বেরিয়ে একদিন হিন্দ সিনেমার সামনে ট্যাক্সির জন্যে দাঁড়িয়ে থাকার সময়ে দেখেছিল কলগার্ল পুঁতিবালাকে। দেখেই বুঝেছিল, এমন মেয়েকেই তার দরকার সাগরেদ হিসেবে। ন্যাতাজোবরা মেয়েদের দিয়ে এ লাইনে কিছু হবে না। চাই শার্প, ডেয়ারিং, বডি অ্যাফেয়ার্স নিয়ে সনাতনী ধারণাহীন বলগা ছাড়া মেয়ে। যার তেরচা চাহনি, বুকের ইশারা আর নিতম্বের দুলুনি দেখে পার্টি মজবে, পথ পরিষ্কার হবে—দরকার হলে বডিলাভেও পার্টিকে ঘায়েল করবে—মনে কিন্তু দাগ পড়বে না। ইমোশন-টিমোশন নিয়ে এ কারবার চলে না। টিট ফর ট্যাট।

পুঁতিবালাকে অফিসে নিয়ে এসেছিল গজানন। তিনকূলে কেউ নেই শুনে, বউবাজারের হাড়কাটা গলির ডেরা তুলে দিয়ে ঠাঁই দিয়েছিল অফিস ঘরেরই পাশের ঘরে। পুঁতিবালার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল শার্দুল-চরিত্র ট্রিপল-জি।

ট্রেনিং? বেলেঘাটার রাস্তার ধারে বসে আর পাড়ায়-পাড়ায় মস্তানি করে যে ট্রেনিং পেয়েছে গজানন, তা কম কী? যে-কোনও টেররিস্ট বর্তে যাবে এই জাতীয় কলকাত্তাই ট্রেনিং পেলে। কথায় বলে যা নেই কলকাতায় তা নেই....

যাক সে কথা। গজানন কোম্পানি দু-বছরেই গাড়ি কিনে ফেলেছে। অফিস চেম্বারটিকেও মডার্ন করে ফেলেছে। এই কলকাতারই বেশ কয়েকটা বড় কোম্পানি তাকে দিয়ে অনেক কালো কারবার ধরে ফেলেছে। লোকসান কমতেই কোম্পানির লাভের অঙ্ক বেড়েছে। গজাননের কোনও নির্দিষ্ট দক্ষিণা নেই। যত লোকসান বাঁচিয়ে দেবে তার ফাইভ পারসেন্ট দিতে হবে।

তাতেই এই অবস্থা। যার জীবনের ভয় নেই, রাতদুপুরেও যে খিদিরপুর ডকে গিয়ে বিদেশি মাল চুরি হচ্ছে দেখে, লুকিয়ে থেকে, বিদেশি জাহাজ থেকে নৌকোয় আউটরাম ঘাটে প্যাকেটে দামি বস্তু হস্তান্তরের সময়ে সাহেব পার্টিকেও খপাত করে চেপে ধরতে দ্বিধা করে না—এমন ডাকাবুকো মূর্তিমান যমকেই তো চায় বড়-বড় কোম্পানিরা।

বর্তমান কাহিনির শুরু বেশ কিছুদিন আগে। এয়ারকন্ডিশনড ঘরে বসে নস্যিও নিচ্ছে, পাইপও খাচ্ছে গ্রেট গজানন। পুঁতিবালা বেরিয়েছে একটা ধুরন্ধর অ-বাঙালি স্মাগলারের পেট থেকে কথা বার করতে। তৈরি হয়েই বেরিয়েছে। হয়তো রাত্রে নাও ফিরতে পারে। বেশ আছে ছুঁড়ি। মজাও লুটছে, কাজও করছে। গজানন অবশ্য এই সময়গুলোয় বেশ উদ্বেগের মধ্যেই থাকে পুঁতিবালার জন্যে। হাজার হোক মেয়েছেলে তো। গজানন ওকে দেখে নিজের বোনের মতো। তাই....

এমন সময়ে বাজল টেলিফোন। লাল টকটকে রিসিভার তুলে নিল গজানন। তারের মধ্যে দিয়ে ভেসে এল সুমিষ্ট নারীকণ্ঠ—জিরো জিরো গজানন?

বলছি।

একটু ধরুন।

সেকেন্ড কয়েক পরেই ভারি গলা ভেসে এল তারের মধ্যে দিয়ে।

মি: ট্রিপল জি, আমি ত্রিশূল বলছি। একটু থেমে—চিনতে পারছেন?

আন্তর্জাতিক দুর্নীতি প্রতিরোধ সঙ্ঘ?

রাইট, মি: ট্রিপল-জি আপনার সাহায্য দরকার।

আমি তো পিঁপড়ে আপনাদের কাছে। টিপে মেরে ফেললেই পারেন।

আরে ছি: ছি:। উদ্দেশ্য আমাদের একই। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। যাক, টেলিফোন ট্যাপিং হতে পারে।

হয়ে গেল বোধ হয় এতক্ষণে।

পাবলিক টেলিফোন থেকে কথা বলছি ওই কারণেই। আমাদের প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস জানেন?

অতবার ঠিকানা পালটালে জানব কী করে?

নোট ডাউন। থ্রি লেটার্স—সিক্স—টোট্যাল লাইন। মাইনাস থ্রি। ফাইন্যাল সিক্স। সুপ্রভাত।

লাইন কেটে গেল।

সুপ্রভাত দৈনিকটা সামনেই পড়ে। 'সুপ্রভাত' বলে শুভেচ্ছা জানানো হল না গজাননকে, সেটুকু বোঝবার বুদ্ধি ওর ব্রেনে আছে। কোড মেসেজে বলা হল সুপ্রভাত কাগজটা দেখতে। দেখতে হবে সম্পাদকীয় পাতা। এইটাই নিয়ম। সম্পাদকীয় বার করে প্রথম প্যারাগ্রাফের প্রতি ষষ্ঠ শব্দ বেছে নিয়ে কাগজে লিখল গজানন। লেখাটা দাঁড়াল এই :

দিলদার ভবন। অরুণাভ। পঁয়ত্রিশ।

পাইপ নিভে গেছে। নস্যির ডিবে পেঁচিয়ে খুলতে-খুলতে হাতঘড়ি দেখে নিল গজানন। ঠিক পনেরো মিনিটেই পৌঁছে যাবে দিলদার ভবনের পঁয়ত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটে অরুণাভর কাছে।

যন্ত্রদানবের সামনে

অরুণাভ লোকটা যে এত কালো আর বেঁটে, এত মোটা আর কদাকার হবে, গজানন ভাবতেই পারেনি।

কালো জুতোয় কালো পালিশ লাগিয়ে বুরুশ দিয়ে ঘষলে যা দাঁড়ায়, শ্রী অরুণাভর মুখের কান্তি সেই রকম। তার ওপর মাথাজোড়া টাক। গদিমোড়া কালো রিভলভিং চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই চেয়ার বেচারি যেন স্বস্তির নিশ্বেস ফেলে পিঠঠাকে একটু সিধে করল। মোটা বটে। কী খায়? এত চর্বি আসে কোত্থেকে?

বলুন গজাননবাবু, কালো মুখে সাদা দাঁত বার করে ভারি অমায়িক হাসি হাসল অরুণাভ। ওই হাসি আর কথাগুলোর মধ্যে দিয়েই প্রকট হল লোকটার ভেতরে সচল রয়েছে বুঝি একটা ডায়নামো। শক্তির ডায়নামো। ঝকঝকে কিন্তু ছোট-ছোট দুই চোখে যেন তারই স্পার্ক।

সতর্ক হল গজানন। বেলেঘাটার রাস্তা থেকে আজ সে উঠেছে যেখানে, এই ত্রিশূল সঙ্ঘ কিন্তু সেখান থেকে অনেক উঁচুতে। পৃথিবী জুড়ে জাল পেতে খপাখপ ধরছে রাঘববোয়ালদের। তার মতো চুনোপুটিকে কী দরকারে তলব পড়ল, ঠিক ভেবে ওঠা যাচ্ছে না। খতম-টতম করে দেবে না তো? সিক্রেট এজেন্টদের পক্ষে সবই সম্ভব। এই লাইনে প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ রাখতে চায় না।

বসল গজানন। একটু ঝুঁকেই বসল। যাতে বাঁ-দিকের কোমরে হোলস্টারটা টেবিলে ঠেকে যায়। বুশ শার্টের তলায় থেকেও খাপে গোঁজা নাইন এম এম লুগারটা অনেকটা ধাতস্থ করে তোলে ট্রিপল জি'কে। শক্তির আধার তারও হাতের কাছে। এক থেকে তিন গুনতে যেটুকু সময় লাগে, তার মধ্যেই লুগার চলে আসবে হাতে—রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবে চক্ষের নিমেষে।

চোখে-চোখে চেয়ে মিটিমিটি হাসছিল অরুণাভ। যেন গজাননের মনের কথা টের পেয়েছিল। ড্রয়ার টেনে একটা চকচকে উইলহেলমিনা বার করে রাখল সাড়ে পাঁচ মিলিমিটার পুরু কাচ দিয়ে ঢাকা টেবিলের ওপর।

বলল, আপনারটাও এখানে রাখতে পারেন।

বিনা বাক্যব্যয়ে নাইন এম এম লুগার বের করে উইলহেলমিনা-র পাশে রেখেছিল গজানন। দুটো আগ্নেয়াস্ত্রই প্রায় একই রকম দেখতে। দুটোই প্রাণ-প্রদীপ নিভিয়ে দিতে মোক্ষম।

এবার কাজের কথায় আসা যাক, বলেছিল অরুণাভ—আপনি রিসেন্ট সুইসাইড কেসগুলো নিয়ে ভেবেছেন?

কাজের লোক বটে এই অরুণাভ। এক্কেবারে আসল পয়েন্টে চলে এসেছে। মাস দুয়েকের মধ্যে তিনটে সুইসাইডের রহস্য গজাননের মগজেও আলোড়ন তুলেছে। এদের মধ্যে একজন ছিল তারই পার্টি। হরেন জোয়ারদার। কোটিপতি। উলটোডাঙায় গেঞ্জির কল আছে। মিজোরামে নিজের জমিতে ঔষধি গাছের চাষবাসও করত। মিজোরামের হার্বস এক্সপোর্ট করে যখন কোটিপতি, ঠিক তখন ভদ্রলোক দ্বারস্থ হয়েছিল গজাননের। কারা যেন তাকে সমানে হুমকি দিয়ে চলেছে টেলিফোনে আর চিঠিতে। ওখানে অত টাকা রাখো, এখানে এত টাকা রাখো—নইলে বোমা মেরে দেব খুলি উড়িয়ে।

গজানন নেমে পড়েছিল মাঠে। নেমে, কাজটা টেক-আপ করেই ধড়াধড় এগিয়ে গেছিল বেশ খানিকটা। হাতেনাতে ধরেও ফেলেছিল হুমকি দেনেওলাকে। হ্যাঁ, একজনই। জোয়ারদারের গেঞ্জির কলের ইউনিয়ন লিডার।

সে কেস মেটবার মাসখানেক পরেই একটা টেলিফোন এল গজাননের কাছে। ফোন করছে জোয়ারদার স্বয়ং।

গজাননবাবু? ভারী বিমর্ষ স্বর—এসব কী হচ্ছে?

কী হচ্ছে মানে? ঘাবড়ে গেছিল গজানন। অন্যায়-টন্যায় করে ফেলল না কি? ডা: বক্সীর কাটা-কাটা কথা এখনও কানে লেগে রয়েছে—'অন্যায় পথে যেও না।' জ্ঞাতসারে তো যায়নি গজানন। তবে?

জোয়ারদারের বিষণ্ণ কণ্ঠস্বর হঠাৎ বিষম উত্তেজিত হয়ে ওঠে—ওই...ওই শুনুন আবার ওরা শাসাচ্ছে...।

কারা? কারা? কারা? চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে গজানন—কোন শয়তানের বাচ্চারা?

ওই তো—ওই তো দলে-দলে দরজা দিয়ে ঢুকছে আর জানলা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমাকে ডাকছে, গজাননবাবু, আমাকে ডাকছে, বলছে—শান্তি, শান্তি, এই পথেই শান্তি—উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তার শান্তি এইখানে, এই জানলার বাইরে। গজাননবাবু, ও গজাননবাবু বেরিয়ে যাব জানলা দিয়ে?

না, না, না, এমন জোরে সেদিন গজানন চেঁচিয়েছিল যে তিনদিন ভোক্যাল কর্ড ভালো কাজ দেয়নি—ভাঙা গলায় কথা বলতে হয়েছে—চোদ্দোতলার জানলা দিয়ে বেরিয়ে যাবেন কী? আপনার মাথা কি খারাপ হয়েছে?

আমার মাথা খারাপ? হা: হা: হা:! হা: হা: হা:! হা: হা: হা:! আমার মাথা খারাপ বলার আগে গজাননবাবু আপনার মাথাটা মনের ডাক্তার দিয়ে দেখিয়ে নিন। ওই ওই ওই কটমট করে আবার তাকাচ্ছে, শাসাচ্ছে—বলছে, চলে আয়—চলে আয়—চলে আয়—ওরে আয়, ওরে আয়, ওরে আয়! যাই গজাননবাবু, এত করে ডাকছে—।

দড়াম করে টেলিফোন আছড়ে পড়ার শব্দ ভেসে এসেছিল। মনশ্চক্ষে গজানন দেখতে পেয়েছিল, টেলিফোন ক্রেডল-এ রিসিভার বসানো হয়নি। ঝুলছে। তাই শোনা যাচ্ছে জোয়ারদারের জোরাল গলায় অট্টহাসি দূর হতে দূরে সরে যাচ্ছে। তারপরেই—নৈ:শব্দ্য!

মনের চোখে বাকি দৃশ্যটুকুও কল্পনা করে শিউরে উঠেছিল গজানন। ধাঁই করে রিসিভার নামিয়ে রেখে ধড়মড় করে বেরিয়ে এসেছিল বাইরে। উল্কাবেগে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের চোদ্দোতলা বাড়িটার সামনে পৌঁছেই দেখেছিল কাতারে-কাতারে লোক জমে রয়েছে রাস্তা পর্যন্ত।

জোয়ারদার তার কথা রেখেছিল। এই বহুতল অট্টালিকার কোনও ঘরেই জানলায় গরাদ নেই। জানলার বাইরে তাই পাটাতন পেতে ফুলের টব রাখা হয়। এই রকমই জানলা গলে হাসতে-হাসতে শূন্যে লাফ দিয়ে—আছড়ে পড়েছে একতলায়।

থ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল গজানন। আচমকা শক খেয়েই স্থাণু হয়ে গেছিল। মস্তিষ্ক একদম কাজ করেনি।

তারপরেই বিদ্যুৎ খেলে গেছিল কোষে-কোষে। জোয়ারদারকে কি ভূতে পেয়েছিল? নাকি পাগল হয়ে গেছিল? মনের ডাক্তারকে দিয়ে গজাননের মাথাটা দেখাতে বলছিল। ভদ্রলোকের জানা ছিল না, ও কাজটি সেরেই এ লাইনে এসেছে গজানন। তাহলে, তাহলে—

দি আইডিয়া। মনের ডাক্তারের কাছেই ছোটা যাক।

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড থেকে বাঁই-বাঁই করে গাড়ি চালিয়ে একেবারে ইন্দ্র দত্ত রোড—এক কোণে ডা: বক্সীর কেয়ার ক্লিনিক। লোহার গেটের ভেতরে চাবি হাতে বসেছিল নেপালি দারোয়ান। গজাননকে দেখেই একগাল হেসে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল :

—কী খবর?

ডাক্তারবাবু—ডাক্তারবাবু আছেন?

গজাননের মুখের চেহারা আর কথার ধরন দেখে হাসি মিলিয়ে গেছিল দারোয়ানের মুখ থেকে। কেস গড়বড় মনে হচ্ছে? অনেকেই এরকম ফিরে আসে বটে। কিন্তু এভাবে নিজে থেকে—

তাড়াতাড়ি তালা খুলে গজাননকে ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়েছিল দারোয়ান।

—বসুন, খবর দিই।

একটু পরেই ডাক এসেছিল ওপর থেকে। বাইরের ঘরে গদিমোড়া চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে পাইপ টানছিলেন দীর্ঘদেহী অতীব সুপুরষ ডা: বক্সী। ফরসা দুই চোখে যেন ঈগলের চাহনি।

কী ব্যাপার, গজানন?

ব্যাপার কী তা ব্যক্ত করেছিল গজানন। শুনেটুনে হা-হা করে হেসে ডা: বক্সী বলেছিলেন—না, না ভূত নয়, প্রেত নয়, দত্যি নয়, দানো নয়, পিশাচ নয়—কিসসু নয়। গজানন, ব্যাপারটা তোমার বোঝা উচিত ছিল।

কী, স্যার?

অডিটরি হ্যালিউসিনেশন। অপটিক্যাল হ্যালিউসেনশন। কর্ণ বিভ্রম আর দৃষ্টি বিভ্রম। এরকম কেস তো এখানেই ছিল—তুমি যখন ছিলে। এখনও আছে। মনে হয় যেন দেবব্রত বিশ্বাসের রবীন্দ্রসঙ্গীত অবিরাম শুনে যাচ্ছে। অথবা চোখের সামনে সায়রা বানুকে দেখতে পাচ্ছে। ইডিয়ট!

অরুণাভ চেয়েছিল গজাননের দিকে। দুই চোখে সেই স্পার্ক। এখন বললে—বুঝতে পারছেন কেন আপনাকে ডাকা হয়েছে? আপনারই একজন ক্লায়েন্ট পাগল হয়ে গিয়ে আত্মহত্যা করেছে। ঠিক একইভাবে পাগল হয়ে গিয়ে একজন চলন্ত লরির সামনে লাফিয়ে পড়েছে হাসতে-হাসতে। আর একজন হাওড়ার পোল থেকে। গজাননবাবু, এই দুজনেই ছিল আমাদের ক্লায়েন্ট।

অ্যাঁ।

আজ্ঞে হ্যাঁ। কুচক্রীদের হাত থেকে বাঁচতে এই তিনজনেই শরণ নিয়েছিল আমাদের। এই ঘটনা পরপর ঘটে যেতে থাকলে কেউ আর আমাদের কাছে আসবে না। কুচক্রীদের কারবার ফলাও চলবে। আপনি কি তাই চান?

কক্ষনও না।

তাহলে শুনুন এখনও যা জানেন না। জোয়ারদার আপনার মক্কেল ছিল—কারেক্ট?

সব খবরই তো রাখেন।

একটু বেশিই রাখি। জোয়ারদার কিছুদিন নিউইয়র্কে ছিল জানেন?

জানি। বেড়াতে গেছিল।

আজ্ঞে না। কারবার করতে গেছিল। কুল ড্রিঙ্কস-এর নাম শুনেছেন?

নিশ্চয়।

দীর্ঘ কুড়ি বছর পরে পৃথিবী বিখ্যাত এই কোম্পানি আবার ইন্ডিয়ায় ব্যবসা করার জন্যে লাইসেন্স চেয়েছে। এখন ইন্ডিয়ায় সফট ড্রিঙ্কস এর যা টোট্যাল মার্কেট—তার সবটুকু মিটোনোর মতো প্ল্যান্ট ক্যাপাসিটি চেয়ে দরখাস্ত করেছে। অথচ ইন্ডিয়ায় এই টোট্যাল মার্কেটটা ধরে রেখেছে তিনটে কোম্পানি। তাদের নাম বলার দরকার আছে কি?

না। বলে যান।

বলে গেল অরুণাভ, এই তিনটে কোম্পানির তিন ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যাপ্রোচ করেছে গভর্নমেন্টকে, লাইসেন্স যেন ইস্যু করা না হয়। পেল্লায় আমেরিকান কোম্পানির দাপটে ধুলোয় মিশে যাবে তিন-তিনটে ইন্ডিয়ান কোম্পানি। ক্লিয়ার?

ও ইয়েস, তারপর? নস্যি নিল গজানন।

নস্যির ডিবের দিকে তৃষ্ণার্ত চোখে চেয়ে অরুণাভ বললে, আমাকেও দিন।

খুশি হল গজানন। নস্যি-কালচার সিক্রেট এজেন্ট মহলেও তাহলে ঢুকে পড়েছে! গুড! বাড়িয়ে দিল ডিবেটা—তারপর?

তারপর-এর কথাটা নস্যি নেওয়ার পরে বলল অরুণাভ। এই তিন জনের দুজন সুইসাইড করেছে। কাগজে ছবিও বেরিয়েছে।

কিন্তু জোয়ারদার তো এসবের মধ্যে ছিল না।

মশায় গজানন, আই মীন, মাই ডিয়ার গজাননবাবু, হার্বস বেচতে জোয়ারদার নিউইয়র্কে গেছিল ঠিকই, কিন্তু তাকে মোটা রকমের শেয়ার অফার করা হয়েছিল কুল ড্রিঙ্কস-এর তরফ থেকে যাতে ইন্ডিয়ায় জবর

ঘাঁটি গড়ে তোলা যায়। জোয়ারদারের আসল জোর কোথায় ছিল জানেন তো?

সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে।

রাইট। জোয়ারদার অফার অ্যাকসেপ্ট করেনি। তিন-তিনটে ইন্ডিয়ান কোম্পানির সর্বনাশ করতে চায়নি, এই তার অপরাধ।

কিন্তু জোয়ারদার তো পাগল হয়ে গেছিল।

বেঁটে মোটা কালো শরীরখানা দুলিয়ে-দুলিয়ে কিছুক্ষণ ধরে অট্টহাসি হাসল অরুণাভ। হাসির মধ্যেও যেন ব্যাটারির চার্জ।

বললে, ইন্ডিয়ার পয়লা সারির বিজনেস ম্যাগনেটগুলো হঠাৎ পাগল হয়ে গিয়ে আত্মহত্যা করছে, মনে একটুও ধন্দ লাগছে না?

তা ইয়ে...খটকা একটু লাগছে বইকী।

সফট ড্রিঙ্কস ম্যানুফাকচারারদের তিন ম্যানেজিং ডিরেক্টরদের মধ্যে বাকি আছে একজন, রাম সিং। এই মুহূর্তে দার্জিলিংয়ে।

আই সী।

ইয়েস, নাউ ইউ সী। হাসল অরুণাভ। যেন কালো মেঘের মধ্যে থেকে ঝিলিক দিল বিদ্যুৎ। এই রাম সিংকে প্রোটেকশন দিতে হবে আপনাকে। তককে-তককে থাকলে মিস্ট্রিটা সলভ করে ফেলতেও পারেন।

বাট, বাট আপনাদের এত বড় সংগঠনের কাউকে না পাঠিয়ে হোয়াই আমাকে...

বিকজ আপনার একজন ক্লায়েন্টের মুখ চিরকালের মতো বন্ধ করা হয়েছে বলে। বিকজ আরও অনেকের মুখ এভাবে বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে বলে। বিকজ আপনাকে কাউন্টার স্পাই হিসেবে লাগাতে চাই বলে।

কা-কাউন্টার স্পাই!

ইয়েস মাই ডিয়ার মিস্টার গজানন। ত্রিশূল সংগঠনের কেউ ওখানে নেই, একবারও কি আপনাকে তা বলেছি? বলিনি। তা সত্বেও আপনাকে পাঠাতে চাই—ডবল এজেন্ট হিসেবে। আপনি তার ওপরেও নজর রাখবেন—রাম সিংকেও দেখবেন। হাসল অরুণাভ—লাইনটা খারাপ জানেন তো। টাকার টোপ বড় সাংঘাতিক জিনিস। কিন্তু আপনার সম্বন্ধে আমাদের রিপোর্ট অন্যরকম। আপনি জান দেবেন, তবু মান দেবেন না।

থ্যাংক ইউ ফর দ্য কমপ্লিমেন্টস, ডা: বক্সীর কাছে শেখা উচ্চারণে চোস্ত ইংরেজিটা ঝেড়ে দিল গজানন। এ রকম গোটা বারো বাঁধা গৎ তার মুখস্থ। বিজনেস চালাতে গেলে একটু দরকার বইকী।

বললে—ত্রিশূল এজেন্টের নাম?

চেহারাটাই দেখিয়ে দিচ্ছি। চিনতে সুবিধে হবে, বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল অরুণাভ। ডানদিকের দেওয়াল ঘেঁষে লাগানো ছোট ড্রয়ার ক্যাবিনেটের ওপরের ড্রয়ারটা খুলল চাবি ঘুরিয়ে। ভেতর থেকে বার করল ছোট্ট একটা রূপোর কার্ড। কমপিউটার কার্ড যেভাবে পাঞ্চ করা থাকে, রূপোর এই কার্ডও সেইভাবে পাঞ্চ করা। কার্ডটা হাতে নিয়ে গেল পেছনের দেওয়ালে লাগানো ফাইলিং ক্যাবিনেটের সামনে। রূপোর কার্ডটা ঢুকিয়ে দিলে ক্যাবিনেটের গায়ে সরু ফোকর দিয়ে। কালো ইস্পাত ক্যাবিনেট মসৃণগতিতে সরে গেল একপাশে—দেখা গেল দেওয়ালের ভেতরে বসানো চৌকো স্টিল সিন্দুক।

গজাননের চোখ তখন ছানাবড়া সিন্দুকের ঠিক মাথার লেন্সটা দেখে। শরীরের প্রতিটি পেশি টান-টান হয়ে উঠেছে আপনা থেকেই। এ দৃশ্য সে আগেও দেখেছে এবং দেখেছে বলেই প্রবল ইচ্ছে হচ্ছে এই মুহূর্তে টেনে লম্বা দেওয়ার। ত্রিশূল সঙ্ঘের টপ-সিক্রেট ডকুমেন্টস আছে এই সিন্দুকে। সেই সঙ্গে আছে বিস্তর বিস্ফোরক। শুধু এই ঘরখানা কেন, পুরো বাড়িটাকে পাউডার করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। ত্রিশূল সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতারা ভারতের বড় বড় সংস্থার মালিক। সারা পৃথিবীতে ছাড়ানো ব্যবসার জাল। দুর্নীতিচক্র রোধ

করার জন্যে নিজেদের স্বার্থে বেসরকারি এই সিক্রেট-এজেন্ট অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি আমদানী করে আশ্চর্য কৌশলে।

ত্রিশূল তাই একটা বিভীষিকা—ভারত-শত্রুদের কাছেও।

সিন্দুকের পাশে একটা লিভারে অরুণাভ চাপ দিতেই আচমকা ফ্ল্যাশে চোখ ধাঁধিয়ে গেল গজাননের। পিলে চমকে উঠলেও স্বস্তি পেল প্রাণটা এখনও যায়নি দেখে। সিন্দুকের সামনেই দাঁড়িয়ে থাকা অরুণাভর ফটো তুলে নিল লেন্স। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল গজানন তফাতে। দাঁড়িয়ে আছে অরুণাভও। লেন্স তার কাজ করে চলেছে। কমপিউটারের মেমারি ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অরুণাভর ফটোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখছে। দাঁড়িয়ে থাকা অরুণাভর ফটোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখছে। দাঁড়িয়ে থাকা অরুণাভর শরীরের প্রতিটি লাইনের সঙ্গে ফটোর অরুণাভর প্রতিটি লাইন মিলে যাওয়া চাই। না মিললেই অনর্থ ঘটবে। কমপিউটারের সঙ্গে সরাসরি লাগানো রয়েছে ডিটোনেটর যন্ত্রপাতি বিস্ফোরণ ঘটবে এক্ষুনি।

এত আধুনিকতা ভালো নয়, মনে-মনেই বলে গজানন। আরে বাপু, অরুণাভর একটা চুলও যদি পেকে গিয়ে থাকে এবং সেই পাকা চুলের চিহ্ন যদি ফটোতে না পাওয়া যায়, বেআক্কেলে যন্ত্রদানব বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বসবে এখুনি। অথবা যদি তাড়াহুড়োয় দাড়ি কামাতে ভুলে যায়, তাহলেও রক্ষে নেই।

তাই ভেতরে-ভেতরে ঘেমে ওঠে গজানন দ্য গ্রেট।

কিন্তু সন্তুষ্ট হয়েছে কমপিউটার। নি:শব্দে খুলে গেল সিন্দুকের পাল্লা। ভেতর থেকে একটা ফাইল বার করে আবার লেন্সের সামনে দাঁড়াল অরুণাভ। চাপ দিল লিভারে। আবার দেখা গেল ফ্ল্যাশ। বন্ধ হয়ে গেল পাল্লা। ফাইলিং ক্যাবিনেট পিছলে এল সিন্দুকের সামনে।

চেয়ারে এসে বসল অরুণাভ। ফাইল খুলে মেলে ধরল গজাননের সামনে।

ভারি মিষ্টি চেহারার একটি মেয়ের দিকে অপলকে চেয়ে রইল ট্রিপল জি। পরনে টাইট জিনস প্যান্ট। হাফ হাতা ঢিলে শার্ট। গলায় একটা লকেট। ছোট করে ছাঁটা চুল। অনেকটা ছেলে-ছেলে চেহারা হলেও মুখের লাবণ্যের জন্যে বোঝা যায় মেয়ে। ঠোঁট দুটো কিন্তু পুরু এবং শক্ত। ওই ঠোঁট আর বেশবাস দেখে গজাননের ধারণা হয়ে গেল, এ মেয়ে লবঙ্গলতিকা নয় মোটে—রীতিমতো ব্যায়াম বীরাঙ্গনা।

সে অভিজ্ঞতাও হয়েছিল যথাসময়ে।

বললে চোখ তুলে—চিনে নিলাম। কিন্তু সে আমাকে চিনবে কী করে?

আপনার চেহারার ডেসক্রিপসন একটু পরেই ওয়্যারলেসে চলে যাবে।

নাম?

অনিমা।

বাঙালি?

অবাক হচ্ছেন কেন? আপনার সাগরেদ পুঁতিবালাও তো বাঙালি।

তা ঠিক। তবে আপনাদের তথ্যের একটু ভুল আছে। পুঁতিবালা নামটা যাচ্ছেতাই বলে ওর একটা বেটার নেম আমি দিয়েছি।

প্রীতিবল।

মাই গড! চোখ কপালে তুলে ফেলে গজানন—তাও জানেন? হাসল অরুণাভ। সেই ব্যাটারি চার্জড শক্তিমানের হাসি।

বললে, কত নেবেন?

কত দেবেন?

এখন বিশ হাজার। ক্যাশ। অন্য খরচ আমাদের।

কাজ শেষ হলে?

কাজের শেষটা কী হয় দেখা যাক, আবার সেই ব্যাটারি চার্জড হাসি। এবারে রীতিমতো নিগূঢ়। অর্থাৎ বেঁচে ফিরে আসো কিনা দেখি? এক লাখেও পৌঁছতে পারে।

খুব কম।

ডোন্ট বারগেন, একটু কর্কশ শোনায় অরুণাভর স্বর। চোয়ালও কঠিন। চোখের স্পার্ক দ্বিগুণ-ত্রিশূলের একটা কাজ করলেই সারাজীবন পায়ের ওপর পা তুলে বসে কাটিয়ে দেওয়া যায়।

জানি, হাসল গজাননও। বেলেঘাট্টাই হাসি—বাজিয়ে নিলাম। ডোন্ট মাইন্ড।

বাঘের গুহায়

কিন্তু বাঁচানো গেল না রামসিংকে। হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে পুঁতিবালা ওরফে প্রীতিবল যে খবর দিল তা সাংঘাতিক।

লাশ দেখে আর লাভ কী? বিশ হাজার নগদ নিয়ে ত্রিশূলের পয়সায় দার্জিলিং-এর মতো জায়গায় এত লপচপানি করে শেষে এই হল? অরুণাভ যা টেঁটিয়া লোক, এবার জানে না মেরে দেয়।

মুখের ভেতরটা বেশ গরম-গরম লাগছে। আমেরিকান ট্যাবলেটের কারবারই আলাদা। মাথার ভেতরকার ভোঁ-ভোঁ ভাবটাও একটু কেটেছে। মনে-মনে ডা: বক্সীকে স্মরণ করল গজানন। লোকটা নির্ঘাত দেবতা। আপদে-বিপদে অলক্ষিতে এমন বাঁচিয়ে দেয়। এই ট্যাবলেট যদি সঙ্গে না থাকত, মেন্টাল শকেই আবার মেন্টাল হোমে দিন কাটাতে হত।

মেজাজ খিঁচড়ে গেলে গ্রেট গজানন পুঁতিবালার ওপরেই ঝাল ঝাড়ে। পুঁতিবালা যদিও এখন আর সেই পুঁতিবালা নেই। অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়েছিল বলে শরীরেও গ্লানি জমা হয়েছিল। এখন তার চেহারা ঝকঝকে, চোখ চকচকে, রং টকটকে। তবুও গজাননের কাছে আগুনের শিখা এই প্রীতিবল-নুয়ে পড়ে আগেকার পুঁতিবালার মতোনই।

তেড়ে বললে গজানন, তোকে যে বলেছিলাম, রাম সিং-এর সঙ্গে ফ্লার্ট করতে। করেছিলি?

মুচকি হেসে পুঁতিবালা বললে, তা আর করিনি। মনে রং ধরিয়ে তবে ছেড়েছি।

তবে মরতে গেল কেন?

পাগল হয়ে যাচ্ছিল যে।

হয়ে যাচ্ছিল! চোখ বড় হয়ে যায় গজাননের।—এতদিন বলিসনি কেন?

মুখের সামনে দু-হাত ঘুরিয়ে বুড়ি খুকির মতো বললে পুঁতিবালা—কখন বলব গো? যখনই অমি একা হই, তখনই দেখি তুমি দোকা।

শাট আপ।

ফিক করে হেসে ফেলে পুঁতিবালা—বেড়ে মেয়েটা, না দাদা? বিয়েই করে ফ্যালো না।

আমাদের লাইনে কেউ বিয়ে করে না। করলেই ফ্যাঁস—গলায় ছুরির কোপ দেখানোর ভঙ্গিমা দেখিয়ে।—অথবা দুম!—রগে পিস্তল ছোঁড়ার অভিনয় করে।—তোকেই বলছি, বিয়ে ফিয়ের কথা মনেও আনবি না। বুঝেছিস?

দাদা গো দাদা, তা আর বুঝিনি। হাড়ে-হাড়ে বুঝছি। কিন্তু দাদা, প্রথম দিন যেদিন ম্যালে গিয়ে ঘোড়া নিলে। অনিমা বউদি—।

বউদি!

মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। অনিমাদির ঘোড়ায় চড়াটা লাভলি, তাই না?

গেছো মেয়ে নাম্বার ওয়ান।

গোছো মেয়েই আমার ভাল্লাগে, মুখ গোল করে বললে পুঁতিবালা—তা দুটিতে জলাপাহাড়ে গিয়ে কী করলে গো?

গেট আউট!

পুঁতিবালা তো গেট-আউট হলই না, উলটে আরও বেশি 'ইন' হয়ে গেল। অর্থাৎ সোফায় ঝপ করে শুয়ে পড়ে পায়ের ওপর পা তুলে নাচাতে লাগল। আড়চোখে কিন্তু তাকিয়ে রইল গজাননের দিকে।

গজাননের মাথায় তখন চিন্তার তুফান। প্রথম দিনেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট মতো ম্যালেতে চিনে ফেলেছিল অনিমাকে। ঘোড়ায় চড়ে জলাপাহাড়ে যেতে-যেতে কথাও হয়েছে। ঠিক হয়েছে গোপনে দেখাশুনো হবে বোটানিক্যাল গার্ডেনে, দিনের আলোয়, গাছপালার আড়ালে। প্রতিদিনই দুপুর দুটোর সময়ে একবার দেখা হবেই।

তা দুদিন দেখা হয়েছে বইকী। জানা গেছে অনেক কথা। গজানন আর পুঁতিবালা টুরিস্টের ভিড়ে এখনও মিশে আছে বলে রক্ষে, কিন্তু বেশিদিন থাকলেই সজাগ হবে অদৃশ্য চক্ষুরা। অনিমার সে ভয় নেই। স্কুলের শিক্ষয়িত্রী সে। থাকে লেডিজ হোস্টেলে। প্রতি সন্ধ্যায় যায় ভিডিও গেমের জুয়োর আসরে। এবং ওইখানেই রয়েছে সন্দেহজনক কিছু লোকের আনাগোনা।

ভাবতে-ভাবতেই মতলব স্থির হয়ে যায় গজাননের। প্রাণ নিয়ে টানাটানির গেম-এ নেমে প্রাণটাকেই পণ করে এবার খেলায় নামা যাক। মরতে ভয় পায় না গজানন। কিন্তু কোন...বাচ্চারা রাম সিং এবং আরও তিনজনকে পাগল বানিয়ে আত্মহত্যা করাচ্ছে, কীভাবে পাগল বানাচ্ছে, তা না জানলে গজানন নিজেই তো ফের পাগল হয়ে যাবে। তার চাইতে বাঘের গুহাতেই ঢোকা যাক। যা থাকে কপালে।

পুঁতিবালা, আই মীন, প্রীতিবল—গম্ভীর স্বর গজাননের। দ্বিধা কাটিয়ে উঠেছে। সঙ্কল্পে পৌঁছেছে। গলার স্বর পালটে গেছে।

বুঝল পুঁতিবালাও। গজাননকে সে চিনে ফেলেছে। অসম্ভব ডেয়ারিং। আর অসম্ভব গোঁয়ার। গজানন নিজেও বলেছিল একদিন, ওর নাকি অবসেসন্যাল পার্সোন্যালিটি আছে। যা ধরবে, তা করে তবে ছাড়বে। পুঁতিবালা বলেছিল, শুয়োরের গোঁ বললেই হয়। খেপে গেছিল গজানন।

কিন্তু আজকে আর টিটকিরি দেওয়ার সাহস হল না পুঁতিবালার। গ্রেট গজাননের মুখ থমথম করছে। ভুরু কুঁচকে গেছে। চোখ আর চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে। বেলেঘাট্টাই গজানন জাগছে ট্রিপল জি-এর মধ্যে।

বলো দাদা—মিনমিনে গলায় বললে পুঁতিবালা।

রিভলভারটা দে।

সোফা ছেড়ে উঠে পড়ল পুঁতিবালা। সুবোধ বালিকার মতো বালিশের তলা থেকে হোলস্টার সমেত রিভলভার এনে দাঁড়াল গজাননের সামনে। গজানন ততক্ষণে বুশশার্ট খুলে ফেলেছে। দু-হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। নিপুণ হাতে কাঁধে আর বগলের তলা দিয়ে চামড়ার বেল্ট বেঁধে আগ্নেয়াস্ত্র ঝুলিয়ে দিল পুঁতিবালা। হাত নামিয়ে বুশশার্ট পরে নিল গজানন। ঘড়ি দেখল। দুপুর একটা।

বলল—দুটোর সময়ে বোটানিক্যাল গার্ডেনে দেখা হবে অনিমার সঙ্গে। সন্ধ্যায় যাব ভিডিও গেমের আড্ডায়। খুঁচিয়ে ঘা করে ধরা দেব। নিয়ে যাক ওদের ঘাঁটিতে। তারপর এসপার কি ওসপার। দাঁত কিড়মিড় করে গজানন—শালা—বাচ্চা! দেখি তোদের কত মুরোদ।

গজাননের চেহারা এক্কেবারে পালটে গেছে। প্রমাদ গণে পুঁতিবালা। গান ডুয়েলের জন্যে তৈরি হয়েই বেরোচ্ছে গজানন। রক্ত ঝরাবে। নিজেও মরতে পারে। তারপর?

আমার কী হবে? ককিয়ে ওঠে পুঁতিবালা।

শাট আপ! সন্ধ্যার পর নজর রাখবি ভিডিও গেমের আড্ডায়। ভেতরে ঢুকবি না। খবরদার! আমাকে নিয়ে গেলে পেছন নিবি না। চোপরাও। কোনও কথা না। কাল সকালে না ফিরলে পুলিশে খবর দিবি। নিজে থেকে ওস্তাদি মারতে যেও না, বুঝেছ? গেছো মেয়ে অনিমা থাকছে সঙ্গে, ভয় কী? সস্নেহে পুঁতিবালার মাথা চাপড়ে দেয় গজানন, এ লাইনে সে অনেক বেশি এক্সপার্ট। বায়-বায়, মাই সিস্টার। বলেই ঝড়ের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে গেল গজানন দ্য গ্রেট। কিন্তু হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়তে-পড়তে বেঁচে গেল বাইরে

গিয়েই। টুরিস্ট এসেছে। মালপত্র নামাচ্ছে। একটা বড় প্যাকেট ছিল গজাননের গমন পথে। বেশ বড় প্যাকেট। ট্রিপল-জি তাতেই হোঁচট খেয়েছে।

এমনিতেই মেজাজ সপ্তমে চড়ে। তার ওপর এই প্যাকেট। বেরোচ্ছে একটা শুভ কাজে, প্রথমেই বাধা। গজানন আবার এগুলো মেনে চলে। হাঁচি, কাশি, টিকটিকির সঙ্কেতকে বিলক্ষণ পাত্তা দেয়। তাই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেও সুড়সুড় করে ফিরে এল ঘরে। এসেই দেখল সোফায় শুয়ে খবরের কাগজ পড়তে-পড়তে চোখ বড়-বড় করে উঠে বসেছে পুঁতিবালা।

গজাননকে ব্যাজার মুখে ফিরে আসতে দেখেও চোখ নামিয়ে নিয়ে খবরের কাগজ পড়ে যাচ্ছে দেখে ট্রিপল-জি-এর আর সহ্য হল না। দুন্দুভি কণ্ঠে হুঙ্কার ছেড়ে বললে, সিনেমার পেজ নাকি?

পড়া হয়ে গেছিল পুঁতিবালার। বিস্ফারিত চোখে কাগজখানা দিল গজাননের দিকে, পড়েছ?

পুঁতিবালা এরকম করে কেন? মরতে চলেছে গজানন, এখন কি খবরের কাগজ পড়ার সময়? কিন্তু কী আছে কাগজটায়?

হ্যাঁচকা টানে কাগজ টেনে নিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরল গজানন। কোন খবরটা? কাগজটা তো দেখা যাচ্ছে বাংলা। কলকাতার অফসেটে পি টি এস টাইপে ছাপা।

সোফা ছেড়ে পুঁতিবালা উঠে এসে আঙুল দিয়ে দেখাল—এই বিজ্ঞাপনটা।

পড়ল গজানন।

মানুষের মগজে দশহাজার কোটির ওপর নিউরোণ রয়েছে। কিন্তু এগুলোর দশ ভাগের এক ভাগেরও বেশি নিষ্ক্রিয় থাকে। এই নিষ্ক্রিয় নিউরোণগুলোর মধ্যে মানুষের পূর্বজন্ম আর অতীতের বহু জন্মের পঞ্চেন্দ্রিয় আর মন দিয়ে অর্জিত সমস্ত অভিজ্ঞতা স্মৃতির আকারে ধরা থাকে। নিষ্ক্রিয় নিউরোণগুলোকে সক্রিয় করলেই পূর্বজন্মের ও অতীতের বহু জন্মের স্মৃতি সক্রিয় হয়ে ওঠে।

মাত্র তিনমাসের মধ্যে যে-কোনও মানুষের পূর্বজন্মের স্মৃতিকে সক্রিয় করা হয়। সম্পূর্ণ চিকিৎসা ব্যয় পঞ্চাশ হাজার মার্কিন ডলার। অগ্রিম দশ হাজার ডলার। বুকিং চলছে। যোগাযোগ :

নিচের নাম ঠিকানার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল গজানন। এ যে কলকাতার ঠিকানা। কলকাতায় এজেন্ট বসিয়ে আমেরিকার এক্সপার্ট ব্রেনসেলে অ্যাকটিভিটি জাগিয়ে মানুষকে জাতিস্মর করে তুলছে!

ব্রেন সেল! আমেরিকান এক্সপার্ট! অকস্মাৎ বিজনেস ম্যাগনেটদের পাগল হয়ে আত্মহত্যার হিড়িক। প্রত্যেকেই আমেরিকান কুল ড্রিঙ্কস কোম্পানির বিষনজরে ছিল।

ফ্যালফ্যাল করে বিজ্ঞাপনটার দিকে চেয়ে থাকে গজানন। দশহাজার কোটিরও বেশি নিউরোণ-এর দশ ভাগের ন'ভাগ নিষ্ক্রিয়। তাদের খাটিয়ে নিলে পূর্বজন্মের স্মৃতি ফিরে পাওয়া যায়। কোটি-কোটি নিষ্ক্রিয় নিউরোণের মধ্যে আরও অনেক ক্ষমতা নিশ্চয়ই আছে, যা এই জন্মেরই ব্যাপার। পূর্বজন্মের স্মৃতি জাগানোর আগে এই জন্মের অকল্পনীয় সেই শক্তিগুলো কি জেগে উঠছে না? সেই শক্তি দিয়ে একটার-পর-একটা সুস্থ মানুষকে পাগল করে দেওয়া কি খুব কঠিন?

বোঁ-বোঁ করে মাথা ঘুরতে লাগল গজাননের। কাগজটা মাটিতে ফেলে দিয়ে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বাধা পেলে যে একটু বসে যেতে হয়, তাও ভুলে গেল।

অ্যাকশন

ঠিক দুটোর সময়ে বিশাল পাইন গাছটার তলায় পৌঁছল গজানন। দূরে-দূরে কিছু কপোত-কপোতী প্রেমালাপে বিভোর। গজাননের মাথার মধ্যে তখন এমনই গোলমাল চলছে যে, এদিকে ওদিকে কৌতুকী চাহনি নিক্ষেপ করবার মতো মেজাজও নেই।

কিন্তু অনিমা মেয়েটা গেল কোথায়? পরপর দুদিন এল, আজকেই আরও বেশি করে আসা দরকার। কেননা রাম সিং পটল তুলেছে। রহস্য আরও বেশি গভীর হয়েছে। চোখের সামনে অরুণাভর কালো পাথরের চকচকে মুখ আর বিরাট টাক ভেসে উঠছে। দু-চোখের স্পার্ক যেন কলকাতা থেকে ছুটে এসে গায়ে ছ্যাঁকা দিচ্ছে। মনের অবস্থা খুবই খারাপ। অনিমাটার সঙ্গে শলাপরামর্শ করে নেওয়া খুবই দরকার। কিন্তু বেআক্কেলে মেয়েটা ঠিক আজকেই ডুব দিল?

ত্রিশূলের কারসাজি নয় তো? নির্দেশ বেতারে—অ্যাসাইনমেন্ট ফেলিওর—লিকুইডেট গজানন!

আপনা থেকেই হাতটা চলে যায় বগলের তলায়। কে জানে এই মুহূর্তে কোন ঝোপে রিভলভার তাগ করছে অনিমা। অথবা সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল। গোর্খাল্যান্ড নিয়ে যে হাঙ্গামা হয়ে গেল সম্প্রতি, বোটানিক্যাল গার্ডেনে একজনের লাশ নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না।

গাছের গুঁড়ির দিকে সরে যায় গজানন। গুঁড়িতে পিঠ লাগিয়ে বাঘের মতো তাকায় আশেপাশে। ঠিক এই সময়ে পায়ের তলায় কী খচমচ করে উঠতেই লাফিয়ে ওঠে হরিণের মতো।

রিভলভার চলে এসেছে হাতে, গুলিও বেরিয়ে যেত আর একটু হলে। কিন্তু কাকে গুলি করবে গজানন? ওই খবরের কাগজটাকে? পা দিয়ে মাড়িয়ে ফেলেছে বলে?

কিন্তু একটুকরো পাথর দিয়ে কাগজটা চাপা দেওয়া কেন? পাছে উড়ে যায় বলে? এত যত্ন করে কে কাগজ রেখে গেল এখানে?

গুটি-গুটি এগিয়ে গেল গজানন। বলা যায় না কাগজের তলায় হয়তো বিস্ফোরক আছে। কাগজ তুললেই ফাটবে প্রলয়ঙ্কর শব্দে। ত্রিশূলের অসাধ্য কিছু নেই।

কাছে এসে হেঁট হল গজানন। আরে, এ যে সেই বাংলা কাগজটা, একটু আগেই পড়তে দিয়েছিল পুঁতিবালা। পাথরটা যেখানে চাপা দেওয়া রয়েছে, তার ওপরের লাইন কটা পড়া যাচ্ছে : মানুষের মগজে দশহাজার কোটির বেশি নিউরোণ...

নিচের ঠিকানাটাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

তবে কী, তবে কী, এই খবরটাতেই দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে এক কপি খবরের কাগজ এখানে চাপা দিয়ে রেখে যাওয়া হয়েছে? রেখেছে কে?

নিশ্চয় অনিমা। ত্রিশূল এজেন্ট।

বিদিগিচ্ছিরি এই কেসটার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে কি তাহলে কোটি-কোটি নিউরোণ-এর রহস্য?

মাথা ঘুরে যায় গজাননের। আস্তে-আস্তে বসে পড়ে ঘাসের ওপর। পাখির ডাক শুনতে-শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে এক সময়ে। এটা ওর একটা গ্রেট ক্যাপাসিটি। মনের সেফটি মেক্যানিজম। উদ্বেগ উৎকণ্ঠা চরমে পৌঁছালে আপনিই ঘুম এসে যায়। মন শান্ত হয়ে যায়।

ঘণ্টাখানেক দিবানিদ্রা দিয়েই ধড়মড় করে উঠে পড়ল গজানন। আর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে পৌঁছতে হবে ভিডিও গেম-এর আসরে।

এবং পৌঁছল ঘড়ি ধরেই। তখন রোদ্দুর একটু-একটু করে মুছে যাচ্ছে দার্জিলিং-এর বুক থেকে। বড়-বড় ছায়া এগিয়ে আসছে একটার-পর-একটা পাহাড়ের ওপর দিয়ে।

আড্ডা এর মধ্যেই সরগরম। ঘর বুঝি ফেটে যাচ্ছে অনেকগুলো ভিডিও গেম-এর সম্মিলিত মিউজিক আর আওয়াজে। এক কোণে চলছে জুয়া।

তার পাশেই ওই হট্টগোলের মধ্যে চেয়ার টেবিল পেতে মদ্যপান করে চলেছে কিছু লোক। আজকের সাজগোজ আরও উগ্র। কামনা জাগানো। নিতম্ব কামড়ে ধরা ব্লু জিনস-এর তলায় টাইট গেঞ্জি গোঁজা। কোমরে চওড়া চকচকে বেল্ট। গেঞ্জির ওপর লেখা আই লাভ ইউ। দুই বক্ষ চূড়ার ওপর ঢেউ খেলানো অবস্থায় লেখাটা যেন জীবন্ত হয়ে দুলে-দুলে হাতছানি দিচ্ছে লুব্ধ পুরুষদের।

পুরুষগুলো কেউ নিচু ক্লাসের নয়। এই ধরনের জুয়োর আড্ডায় আর মদের আসরে পকেট ভারি না থাকলে কাউকে ঢুকতেও দেওয়া হয় না। গজাননকেও দশ টাকার টিপস দিতে হয়েছে গেটম্যানকে। তাছাড়া ওর চালচলনেও যে এখন নবাবিয়ানা—যে লাইনের যে দস্তুর।

অনিমার দিকে তাকানো, তাকে নিয়ে হাসাহাসি করা, এমনকী তার সঙ্গে কথাও বলা হচ্ছে। পুরু ঠোঁট বেঁকিয়ে অনিমাও হাসছে এবং লাস্যময়ীর মতোই অভিনয় করে চলেছে। কে বলবে এই মেয়ে স্কুলের শিক্ষয়িত্রী।

গজানন গুটিসুটি গিয়ে বসে পড়ল মদের আড্ডায়। অনিমা ওকে দেখেও দেখল না। প্রথমে হুইস্কির অর্ডার দিল। যে-সে হুইস্কি নয়—ভুটানি হুইস্কি হওয়া চাই। যার জোর আরও বেশি। পরপর তিন পেগ যখন শেষ হয়েছে, পাশের টেবিল থেকে কালো চশমা পরা মজবুত চেহারার লম্বামতো একটা লোক এসে বসল ওর টেবিলে। লোকটার কালো গোঁফ দু-দিকে পাকানো এবং ছুঁচাল। গজাননের দিকে তাকিয়ে সে হাসতেই গজাননও হাসল। ভুটানি মদ্য রক্তে এনেছে বেপরোয়া ভাব। হেসেই বললে ইংরেজিতে, রাত্রে কেউ গগলস পরে? চোখের দোষ আছে বুঝি?

ঠিক ধরেছেন। একটা চোখ কানা। চশমা খুলে দেখাল লোকটা—নতুন এসেছেন?

হ্যাঁ।

গেমস খেলবেন?

জানি না কী করে খেলতে হয়।

শিখিয়ে দিচ্ছি। আসুন।

এইটাই চাইছিল গজানন। তক্ষুনি উঠে গেল জুয়োর আড্ডায়। সবক'টা খেলাতেই সে পোক্ত। কিন্তু এমন ভান করে গেল যেন এক্কেবারে আনাড়ি। ফলে হারতে লাগল প্রতি গেমে। আধঘণ্টাও গেল না। পাঁচ হাজার দশ টাকা হেরে বসল গজানন।

কাগজে হিসেব রাখছিল কালো চশমাধারী। স্পষ্টত খেলানো এবং খেলিয়ে পথে বসানোই এর কাজ। সব জুয়োর আড্ডায় এরকম একজন বুদ্ধিমান মাসলম্যান থাকে। কাগজের হিসেব দেখে সে বললে—পাঁচহাজার দশ। মিস্টার, টাকাটা রাখুন, তারপর খেলবেন।

আকাশ থেকে পড়ল গজানন—অত টাকা কোথায় পাব?

তবে খেলতে এলেন কেন? শক্ত গলা কালো চশমাধারীর।

টাকা চাইলেই পাব বলে।

চাইলেই পাবেন? কে দেবে?

রাম সিং, জড়িত স্বর গজাননের, একটা কাগজ দিন চিঠি লিখে দিচ্ছি। গিয়ে নিয়ে আসুন। না পারলে আমার সঙ্গে চলুন। জ্বালাবেন না মাইরি।

কালো চশমার আড়ালে একটা চোখ ঈষৎ চমকে উঠলেও মুখের ভাবে তা প্রকাশ পেল না। গজাননের ডাইনে-বাঁয়ে পেছনে তিনজন গাঁট্টাগোট্টা নেপালি এসে দাঁড়িয়ে গেল সঙ্গে-সঙ্গে।

কালো চশমাধারী চেয়ে আছে তো আছেই। গজাননের মুখের প্রতিক্রিয়া দেখছে। না, লোকটা খবরই রাখে না রাম সিং সুইসাইড করেছে আজই সকালে। মুখ ভাবলেশহীন, বরং একটু ক্ষুব্ধ টাকা নিয়ে চাপ দেওয়ায়। কিন্তু রাম সিং-এর সঙ্গে যার এত দোস্তি, তাকে তো চট করে ছাড়া যায় না।

রাম সিং আপনার কে হন?

দুম করে রেগে যায় গজানন (মানে রাগার ভান করে)—তাতে আপনার দরকার কী?

কালো চশমাধারী আর কথা বাড়ায় না। কলম আর প্যাডটা এগিয়ে দিয়ে বলে, লিখুন।

ঝড়াঝড় করে ইংরেজিতে লিখে দিল গজানন :

মাই ডিয়ার রাম সিং,

আই অ্যাম ইন এ ফিক্স। কাইন্ডলি হ্যান্ডওভার ফাইভ থাউজ্যান্ড টু দ্য বেয়ারার অফ দিজ লেটার। আই শ্যাল মীট ইউ টুমরো। ইওরস—জ্ঞানপান।

প্যাড থেকে চিঠি ছিঁড়ে নিয়ে কালো চশমাধারী পকেটে পুরতে-পুরতে বললে, কোথায় আছেন আপনার রাম সিং?

মনে-মনে বলল গজানন, শালা, বাজিয়ে নিচ্ছ আমাকে? মুখে বললে—লোহিয়া প্যালেস, জলাপাহাড়। কুইক। বেরিয়ে যেতে গিয়েও দাঁড়িয়ে গেল কালো চশমাধারী। গজানন তখনও চেঁচিয়ে চলেছে—হেই, গেট মী মোর ড্রিঙ্কস। আই ওয়ান্ট টু ড্যান্স। হু উইল ড্যান্স উইথ মী?

বলেই এদিক-ওদিক চাইল গজানন। হাত বুলিয়ে নিলে বাঁ-গালের কাটা দাগটার ওপর। বডি থ্রো করার আগে এটা করা ওর স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। ক্রিকেট মাঠে বল করার আগে প্যান্টে বল ঘষে নেওয়ার মতো। গজাননের হাতে-পায়ে বিদ্যুৎশক্তির আধারগুলো পটাপট ছিপিখোলা হয়ে যায় গালের ওই পুরোনো ক্ষতস্থানে হাত বুলোলেই।

অনিমা ঘাড় বেঁকিয়ে চেয়ে আছে ওর দিকে; চোখে বিজাতীয় দৃষ্টি। বন্ধুত্বর বাষ্পটুকুও নেই। ঘর থেকে সটকান দেওয়ার একটাই পথ। দরজার ঠিক পাশেই দু-হাত বুকের ওপর জড়ো করে দাঁড়িয়ে যেন পাথরপ্রতিমা, শরীরী বিস্ময়।

গাল থেকে হাত নামাল গজানন এবং দু-হাতের দুই ঝটকায় ডাইনে-বাঁয়ের দুই নেপালী পুঙ্গবকে দশ হাত দূরে ছিটকে ফেলে দিয়ে কামানের গোলার মতো ধেয়ে গেল দরজার দিকে।

গজানন দ্য গ্রেটের এ হেন আচমকা ছিটকে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত ছিল না কেউই। সেই ফাঁকেই দরজায় পৌঁছে গেল গজানন। চাপা গলায় অনিমার দিকে না চেয়ে শুধু বললে—ল্যাং মার আমাকে।

অনিমা মেয়েটি সাঙ্ঘাতিক ধুরন্ধর। মুখখানায় একটু মঙ্গোলিয়ান ধাঁচ আছে বলেই মনের কথা মুখে ফোটে না। কিন্তু চকিতের মধ্যে বুঝে নিল একঘর বিমূঢ় শত্রুর আস্থা কুড়োতে গেলে গজাননের নির্দেশ অতি উত্তম।

অতএব অতি উত্তমভাবে ডান পা-টা সামনে বাড়িয়ে ল্যাং মারল অনিমা। লিখতে যেটুকু সময় গেল, তার অনেক কম সময়ের মধ্যে ঘটে গেল সমস্ত ব্যাপারটা। এক ফুট দূর থেকে গজানন বললে ল্যাং মারতে, এক ফুট এগিয়ে আসতেই ল্যাং মারল অনিমা এবং দশ ফুট দূরে মুখ থুবড়ে পড়ল ট্রিপল-জি।

হই-হই করে তেড়ে এল পেছনকার জুয়ারিরা। লাফিয়ে পড়ল গজাননের ওপর। গোলমালের মধ্যে দরজা দিয়ে হাওয়া হয়ে গেল অনিমা।

ঘা কতক খেয়ে মনে হল নেশা ছুটে গেছে গজাননের। বিরাশি সিক্কা ওজনের একটি চড় পড়ল কাটা গালটার ওপর—ব্লাইটার। যার গাল এরকম কাটা, সে যে সাধুপুরুষ নয়, আগেই বুঝেছিলাম। বল তুই কাদের এজেন্ট?

এজেন্ট? ককিয়ে ওঠে গজানন, কারবার-টারবার কিছুই নেই আমার, এজেন্সি নিতে যাব কেন? কোঁক! ঘুসি পড়েছে তলপেটে। দম আটকে আসে গ্রেট গজাননের। মনে কিন্তু খুশির ফেয়ারা। কাজ ভালোই এগুচ্ছে। এবার বডি সার্চ করুক। রিভলভারটা বেরিয়ে যাক। নিয়ে যাক ওদের ঘাঁটিতে...

ঠাস!

মাথা ঘুরে যায় গজাননের। সেই সঙ্গে ছিটকে পড়ে চেয়ার থেকে। বুকের ওপর জুতোর হিল ঘষছে একজন। আর একজন ঠিক কণ্ঠার ওপর। আর একজন দ্রুত বডি সার্চ করে হোলস্টার থেকে বার করে ফেলেছে রিভলভারটা।

রিভলভার এখন কালো চশমাধারীর হাতে। মুখ তার [illegible] করাল। কণ্ঠে শঙ্খচূড়ের রক্ত হিম করা গজরানি, আগেই বুঝেছিলাম। থাক এখানে। আসছি আমি।

গজাননও তাই চায়!

মনের শক্তি

দার্জিলিং শহর থেকে যে রাস্তাটা নেপালের পশুপতি মন্দিরের দিকে গেছে, যে পথ দিয়ে অবাধে নেপাল থেকে বিদেশি সামগ্রী কিনে আনে পর্যটকরা, সেই পথের বেশ কয়েক জায়গায় দু-পাশে গভীর পাইন অরণ্য নেমে গেছে ঢালু পাহাড় বেয়ে, কোথাও বা উঠে গেছে মেঘলোকের দিকে।

কালো চশমাধারী হেঁটেই বেরিয়ে এল শহর থেকে। হাঁটছে লম্বা-লম্বা পা ফেলে। অন্ধকারে আর কুয়াশায় বেশি দূর দেখা যাচ্ছে না। পেছন ফিরে তাকালেও তাই সে দেখতে পেত না অনিমাকে। চিতাবাঘের মতো নি:শব্দে সে আসছে পেছন-পেছন।

জঙ্গলে ঢুকে পড়ল কালো চশমাধারী। বড়-বড় গাছের তলা দিয়ে সরু পায়ে-চলা রাস্তা। শেষ হয়েছে একটা দোতলা কটেজ প্যাটার্নের বাড়ির সামনে।

ফ্যান-লাইটের তলায় গিয়ে দাঁড়াতেই খুলে গেল সদর দরজা। ভেতরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিতেই সামনে এসে দাঁড়াল সুবেশ সুন্দর এক পুরুষ। গালে চাপ দাড়ি। চোখে বুদ্ধির দীপ্তি। কিন্তু সারা মুখে যেন নিষ্ঠুরতা মাখানো। ঠোঁটের কোণে লেগে থাকা হাসিটাও নির্মম।

নির্মম হাসি হেসেই বললে লোকটা—সমসের, কী ব্যাপার? হঠাৎ এলে কেন?

রাম সিং-এর এজেন্ট জালে পড়েছে। গেমস-এর আড্ডায় এসেছিল। আনব এখানে?

ম্যাডামকে জিগ্যেস করতে হবে। একা এসেছ?

হ্যাঁ।

ইউ ফুল। স্পাই এনেছ পেছন-পেছন।

স্পাই!

ওই দ্যাখো। দেওয়ালের গায়ে ক্লোজড সার্কিট টিভি স্ক্রিনের দিকে আঙুল তুলে দেখায় নিষ্ঠুর-বদন ব্যক্তি। রঙিন পরদায় দেখা যাচ্ছে জঙ্গলের মধ্যে থেকে পা টিপে-টিপে এদিক ওদিক তাকাতে-তাকাতে বেরিয়ে আসছে চাবুক চেহারা একটি মেয়ে। টাইট গেঞ্জিতে বুকের ওপর লেখা—আই লাভ ইউ।

অনিমা ভাবতে পারেনি শহরের এত কাছে স্কাউন্ড্রেলগুলো ঘাঁটি গেড়েছে। এই পথ দিয়ে গাড়ির স্রোত বয়ে যায় সকাল সন্ধ্যা। কিন্তু রাস্তা থেকে দেখাই যায় না জঙ্গলের ভেতরকার এই নিরালা বাড়িটাকে।

ভেতরে কোনওমতে যদি ঢুকতে পারা যেত...

আগে বাড়িটাকে এক পাক ঘুরে দেখে নেওয়া যাক। পথ নিশ্চয় আছে। জঙ্গলের মধ্যে পাহারার কড়াকড়ি নাও থাকতে পারে।

পেছন দিকে এসে কিন্তু ভুলটা ভাঙল। দরজা খুলে বেরিয়ে এল কালো চশমাধারী সেই লোকটা। হাতে রিভলভার। মোলায়েম গলায় বললে—ভেতরে এসো সুন্দরী। বাইরে বড় ঠান্ডা।

বড় ঘরটায় চেয়ারে বসে অনিমা। ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। টাইট গেঞ্জি লুটোচ্ছে মেঝেতে। নিষ্ঠুর বদন ব্যক্তির একটা হাত তার বাম স্তনে মোচড় দিচ্ছে, এখনও বলো মহারানি তুমি কাদের এজেন্ট?

বলব না।

খুব মিষ্টি স্বর ভেসে এল করিডরের দরজার কাছ থেকে, রূপকুমার, ওকে আমার হাতে ছেড়ে দাও। তোমরা পাবে পরে।

দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে অবিশ্বাস্য রকমের স্থূলকায়া এক মহিলা। চর্বি ঝুলে পড়েছে সারা দেহে, গালে চিবুকে। মাথার চুল ঝুঁটি করে ওপরে বাঁধা। আরও কুৎসিত দেখাচ্ছে ঠোঁটে লাল রং মেখে থাকায়। ফরসা গাল এমনিতেই লালচে। শুধু একটা ব্লাউজ আর স্কার্ট শরীরের কদাকার মেদবহুল অংশগুলোকে প্রকটতর করে তুলেছে।

থপথপ করে অতি কষ্ঠে গুরুভার দেহটাকে অনিমার সামনে নিয়ে এল চর্বির এই সচল পাহাড়টি। লাল ঠোঁট বেঁকিয়ে গা ঘিনঘিনে হাসি হেসে বললে, তুমি কাদের বাড়ির মেয়ে গো?

যমের বাড়ির—গা রি-রি করছে অনিমার। বুকটাও টনটন করছে শয়তানটার কদর্য হাতের নিষ্পেষণে। মুখ দিয়ে ভালো কথা বেরোয়?

নোংরা হাসি আরও একটু নোংরা হল প্রৌঢ়ার মুখে, বড় কষ্ট দিচ্ছে এরা, না? মেয়ে মানুষই মেয়ে মানুষের দু:খ বোঝে। রূপ থাকা বড় জ্বালা, বাছা। হাত ধরে অনিমাকে চেয়ার থেকে উঠাল চর্বির পাহাড়। অনিমাও টুক করে মেঝে থেকে উলের গেঞ্জিটা কুড়িয়ে নিয়ে পরে নিল মাথা গলিয়ে। বুকে ঢেউ খেলে গেল লেখাটা—আই লাভ ইউ।

সে কী হাসি প্রৌঢ়ার, ইয়েস, ইয়েস, ইয়েস, আই লাভ ইউ। কাম উইথ মী। সমসের, রূপকুমার, তোমরা এখানেই থাকো।

ম্যাডাম, আর একজন রয়েছে গেমস-এর আড্ডায়।

সমসেরের কথায় কান দিল না ম্যাডাম।

ছোট ঘর। প্রায় অন্ধকার বললেই চলে। একটা শুধু ঘেরাটোপ দেওয়া টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে বড় সোফার পাশে।

অনিমাকে নিয়ে পাশাপাশি বসে আছে ম্যাডাম। দৃশ্যটা বিচিত্র। একজনের দেহের যৌবনের বন্যাকে আঁটসাঁট পোশাকে বাগে রাখার চেষ্টা; আরেকজনের চেষ্টা চর্বির বোঝাকে বেঁধেসেঁধে রাখার।

ম্যাডাম চেয়ে আছে অনিমার দিকে। কৌতুকভরা ছোট চোখ। অনিমার কিন্তু কেন জানি না অস্বস্তি লাগছে চোখে-চোখে চাইতে। চোখ নামিয়ে নিতেই অদ্ভুত ঘড়ঘড়ে গলায় হাসল ম্যাডাম—নাম কী তোমার?

বলব না।

আমার চোখের দিকে তাকাচ্ছ না কেন?

ঘেন্না হচ্ছে বলে।

তাকাও—আচম্বিতে কর্কশ হয়ে ওঠে ম্যাডামের স্বর। আরও শক্ত হয়ে যায় অনিমা।

তাকাও—অদ্ভুত একটা অনুভূতি জাগে অনিমার মস্তিষ্কের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে। নিজেকে এলিয়ে দিতে ইচ্ছে যাচ্ছে, আলগা হয়ে যেতে ইচ্ছে যাচ্ছে।

তাকাও। অদৃশ্য একটা শক্তি ওর চাহনিকে টানছে, টানছে, টানছে, ম্যাডামের দিকে!

চোখ তোলে অনিমা।

ম্যাডাম চেয়ে আছে। ছোট চোখ দুটো এখন অগ্নিগর্ভ। যেন দু-দুটো আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ। ভলকে-ভলকে অদৃশ্য শক্তিধারা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এ শক্তি চোখে দেখা যায় না। শক্তির উৎস কিন্তু এই দুটো চোখ। চোখ না চুম্বক? দৃষ্টি সরাতে পারছে না কেন অনিমা? শুধু ওই চোখ ছাড়া আশেপাশে যেন আর কিছুই নেই। অনিমা নিজেও যেন আর নেই। ওই চোখ। ওই চোখ তাকে গিলে নিয়েছে!

ভালো লাগছে?—অনেক দূর থেকে যেন ভেসে-ভেসে আসে ম্যাডামের মধুর স্বর। ঠিক যেন মা কথা বলছে। অনেক, অনেক বছর আগে হারিয়ে যাওয়া মা।

হ্যাঁ।

প্রাণ খুলে কথা বলো। এককেবারে গোড়া থেকে বলো। যখন স্কুলে পড়তে, যখন ছোট্ট ছিলে, তখন থেকে।

বলব, সব বলব, মানসিক চাপ, ভীষণ, অসহ্য, মন খুলে কথা বলার কেউ ছিল না।

আমাকে বলো।

বলছি।

গজাননের পরীক্ষা

গজানন গ্যাঁট হয়ে বসেছিল চেয়ারে। গেমস-এর আড্ডা এখন খালি। মেশিনগুলো নিস্তব্ধ। ছ'জন ভদ্রবেশি গুন্ডা তাকে ঘিরে বসে সিগারেট টানছে। আর সকৌতুকে দেখছে গজাননের নস্যি নেওয়া। নৈ:শব্দ্য খান-খান হয়ে যাচ্ছে এক-একটা টিপ নেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে।

কালো চশমাধারী ঢুকল ঘরে। মুখভাব অনেক নরম—চলো হে টিকটিকি।

টিকটিকি! আশেপাশে তাকায় গজানন; কোথায় টিকটিকি?

এতক্ষণ যারা নস্যি নেওয়ার ধরন দেখে অতিকষ্টে হাসি চেপে রেখেছিল, এবার তারা হেসে উঠল ঘর কাঁপিয়ে।

মুখ শক্ত হয়ে যায় কালো চশমাধারীর, মস্করা হচ্ছে? এসো।

কোথায়?

আমার বস-এর কাছে।

ও! চলো! যেন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হাল ছেড়ে দিয়ে কাঁধ নাচায় গজানন। মনটাও নেচে ওঠে সঙ্গে-সঙ্গে। তখন যদি জানত অদৃষ্টে ওর কী আছে, কুরুক্ষেত্র কাণ্ড ঘটিয়ে পিঠটান দিত ওইখান থেকেই।

জঙ্গলের মধ্যে নিরালা বাড়িটার সদর দরজা খুলেই দাঁড়িয়েছিল রূপকুমার। যেন যাত্রার হিরো। পেছনে থেকে আচমকা গজাননের কাঁধে রাম রদ্দা মারল সমসের। হুড়মুড় করে ভেতরে ঠিকরে গেল ট্রিপল-জি।

সঙ্গে-সঙ্গে অবশ্য সামলে নিল নিজেকে। কণ্ঠে জাগল চিল-চিৎকার, বলি, ব্যাপারটা কী? এইটুকু রাস্তা গাড়ি করে জামাই-আদরে এনে—

কথা আটকে গেল বিদ্রূপতরল একটি কণ্ঠস্বরে। বিদ্রূপের সঙ্গে মেশানো রয়েছে বেশ খানিকটা পৈশাচিকতার গরল।

গজানন নাকি? এসো, এসো, আমি বলেছিলাম বলেই তো অত খাতির করে এনেছে তোমাকে?

লাট্টুর মতো ঘুরে যায় গজানন। থিরথির করে কাঁপে গালের কাটা দাগটা।

দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে মেদবিপুলা এক প্রৌঢ়া। দু-কানের লতিতে দুটো সোনার রিঙ। ঠোঁটে থ্যাবড়া করে লাগানো লাল রং। মাথার চুল উঁচু করে খোঁপা বাঁধা। ডাইনি নাকি? মনে-মনে বলে গজানন।

মুখে বলে বিষম বিস্মিত স্বরে—আপনি?

নিরীহ একটি মেয়েছেলে, বাবা। সাতে নেই, পাঁচে নেই।

কিন্তু এই গুন্ডাগুলোর ব্রেন আপনিই?

রক্ত মাখানো ঝুলে পড়া ঠোঁট দুটো অদ্ভুত ভঙ্গিমায় বেঁকে যায় হাসতে গিয়ে।

হ্যাঁ, আমি। শুনলাম, তুমি নাকি কি সব দুষ্টুমি করেছ। এসো, এসো, কাছে এসো।

দুষ্টুমি? পকেটে পয়সা নেই বলে রাম সিং-এর কাছে চিঠি পাঠানো—

তুলতুলে নরম হাতে গজাননের দু-হাত চেপে ধরে ম্যাডাম। ছোট চোখে আর ভিজে ঠোঁটে দুর্জ্ঞেয় সেই হাসি—রাজপুত্তুরের মতো চেহারা! আহা! মেয়েরা নিশ্চয় জ্বালাতন করে?

নরম ছোঁয়াটার মধ্যে কী যেন ছিল। গা শিরশির করে ওঠে গজাননের। কণ্ঠস্বর [illegible] হয়, জুয়ো, আনাড়ি তো, তাই—

কথা বলতে গেলেই চোখের দিকে তাকাতে হয়। গজাননও তাকিয়েছিল। সঙ্গে-সঙ্গে শরীরের প্রতিটি অণুপরমাণু দিয়ে অনুভব করল অদৃশ্য শক্তির একটা ঝাপটা যেন ওকে টলিয়ে দিয়ে গেল। ভয়াবহ শক্তি। চোখে দেখা যায় না, কিন্তু যেন দুরমুশের ঘা লাগল সমস্ত সত্তায়।

মিহি গলায় বিমূঢ় গজাননের চোখে চোখ রেখে বললে ম্যাডাম—সত্যি? বুড়িকে মিথ্যে বলতে নেই, বাবা।

নিস্তেজ গলায় বলে গজানন—সত্যি।

ছোট চোখ দুটোকে আরও কাছে নিয়ে আসে ম্যাডাম। তারকা-রন্ধ্রে ও কীসের শিখা। আচমকা বিস্ফারিত হয়ে ওঠে দুই চক্ষু। গজাননের দৃষ্টিপথে এখন কেবল ওই চোখ, ভয়াল, ভয়ংকর, পৈশাচিক, মোহময়!

গজানন, ও গজানন, মন খুলে বলো; স-ব কথা বলো।

ব-বলেছি তো; জুয়ো খেলতে এসেছিলাম, পকেটে...পকেটে...

আচমকা শিথিল হয়ে গেল ম্যাডামের চাহনির বজ্র আঁটুনি। গজাননের হাত ছেড়ে দিয়ে বললে কর্কশ গলায়—মিথ্যে কথা! জুয়ো খেলাটা তো একটা দুর্বলতা। অনেক বেশি শক্তিমান তুমি।

মা-মানে?

তোমার চোখের মধ্যেই রয়েছে অনেক কথা। অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ তুমি, গজানন। গজানন, গজানন, তোমার চোখেই দেখেছি যে আমার প্রতিবিম্ব।

অত কথার দরকার কী? রাম সিং-র কাছে চিঠিটা পাঠান, টাকা এসে যাবে। আমাকে রেহাই দিন।

সোফায় বসল ম্যাডাম। দু-হাত একত্র করে থলথলে মুখখানা ফিরিয়ে রইল গজাননের দিকে, ইন্টারেস্টিং। অনেক কিছুই জানো দেখছি।

হ্যাঁ, জানি, হঠাৎ খেপে যায় গজানন, কী জানি বলুন তো? মুরোদখানা দেখা যাক।

মুরোদ দেখতে চাও? হাসছে ম্যাডাম। সেই রকম শিথিল ঠোঁট বেঁকিয়ে বিকৃত হাসি, গা ঘিনঘিন করে গজাননের—বৎস গজানন, যদি বলি তুমি একটা জঘন্য নোংরা স্পাই? এসেছ আমার কাজে নাক গলাতে?

বললেই হল?

কিম্ভূতকিমাকার ম্যাডাম শুধু ইশারা করল হাত নেড়ে। সমসের খুলে দিলে একটা দরজা। পায়ে-পায়ে ঘরে ঢুকল অনিমা।

আচ্ছন্ন অবস্থাটা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করে গজানন প্রাণপণে। দু-হাত দু-পাশে ঝুলিয়ে অমন পুতুলের মতো হাঁটছে কেন অনিমা? টগবগে ঘোটকীর মতো যে তেজস্বিনী, তার আপাদমস্তকে এ ধরনের আড়ষ্টতা কেন?

বিদ্রূপের ছুরি ঝলসে ওঠে ম্যাডামের তীক্ষ্ণ স্বরে,—চেনা-চেনা মনে হচ্ছে তাই না? একই দলের দুই স্পাই, তাই না?

তুখোড় গজানন তখন নির্নিমেষে চেয়ে আছে অনিমার দারুপুত্তলিকার মতো দেহবল্লরীর পানে। তাই চাবুকের মতো জবাবটা জিভে এসেও জড়িয়ে গেল,—জীবনে দেখিনি।

মেপে-মেপে পা ফেলে আরও একটু এগিয়ে এল অনিমা। মিশরের মামী নাকি? গজানন চোখ কুঁচকে চেয়ে আছে। কোথায় যেন বিচ্ছিরি একটা ব্যাপার ঘটে গেছে! অনিমা অমন শূন্য চাহনি মেলে রয়েছে কেন তার দিকে? চোখের মণি দুটো দু-টুকরো আয়নার মতো চকচক করছে না তো, ঠিক যেন ঘষা কাচ!

গজাননের বুকে বুক ঠেকিয়ে বললে অনিমা, যে স্বরে বললে তাতে উত্থান নেই, পতন নেই, প্রাণ নেই, উত্তাপ নেই; ঠিক যেন একটা যন্ত্র কথা বলে গেল যান্ত্রিক স্বরে—চিনি, একে আমি চিনি, ত্রিশূলের এজেন্ট। এর সঙ্গেই দেখা করতে বলা হয়েছিল আমাকে।

গজানন কি অজ্ঞান হয়ে যাবে?

সোফায় বসে মিটিমিটি হাসছে ম্যাডাম।

না, অজ্ঞান হয়ে যায়নি গজানন। সে পাত্রই সে নয়। ব্রেনটা কিন্তু নিমেষে তরতাজা হয়ে উঠেছিল। বুঝে ফেলেছিল কীসের প্রভাবে অনিমা আর নেচে বেড়াচ্ছে না, হেঁকে-হেঁকে কথা বলছে না, তেড়েমেড়ে ল্যাং মারছে না!

হিপনোটিজম! ম্যাডাম ডাইনি তার ওপরেও সম্মোহনের ম্যাজিক দেখাতে গেছিল। ল্যাজেগোবরে হয়েছে। অনিমা বেচারা হাজার হোক মেয়ে তো, ডাইনির খপ্পরে পড়েছে।

নিবিড় চোখে অনিমা চেয়ে রয়েছে ওর দিকে, ঈষৎ ঘাড় বেঁকিয়ে। চাহনির মধ্যে নেই সেই প্রাণময়তা।

সোফায় বসে মাথা তুলে বললে ম্যাডাম,—কী গো গজানন, এবার কথা শোনো, খুলে বলো কী মতলবে আসা হয়েছে? মিছে বলে লাভ নেই দেখতেই তো পাচ্ছ।

চোয়ালের হাড় কঠিন হয়ে ওঠে গজাননের,—যা বলবার তা বলা হয়ে গেছে। অত সহজে আমাকে ঘায়েল করা যাবে না।

ঘড়ঘড় শব্দে হেসে ওঠে ম্যাডাম। হাসির আওয়াজ যে এমন বিকট বিদিগিচ্ছিরি হয়, জানা ছিল না গজাননের।

ম্যাডামের চোখ আবার ছোট হয়ে এসেছে। ভিজে লাল ঠোঁটের ফাঁকে সাদা দাঁত দেখা যাচ্ছে—সবাই তাই বলে, গজানন। তারপর ন্যাতা হয়ে পড়ে থাকে আমার কাছে। বিরাট পাঁজর খালি করা দীর্ঘশ্বাসে যেন ভেঙে খানখান হয়ে যায় ম্যাডাম,—বেচারারা!

অবাক হয় গজানন। একই গলায় কতরকমই আওয়াজ শোনা গেল এইটুকু সময়ের মধ্যে। একটু আগেই কদর্য হাসি আর কর্কশ হুমকি। আবার এখন তা মখমল কোমল, কবোষ্ণ, স্নেহময়।

রূপকুমার আর সমসের মিটিমিটি হাসছে গজাননের দিকে চেয়ে। অনিমার চোখের পাতা পড়ছে না। চর্বির পাহাড় দুলিয়ে অনামিকা নাড়িয়ে বলছে ম্যাডাম—গজানন, কী চাও। মেয়েমানুষ না মদ? ক্ষমতা না টাকা? খারাপ চাও তো, তাও পাবে। সব ব্যাপারেই সাহায্য পাবে আমার। মনের গোপনে লুকিয়ে থাকা স্বপ্নগুলোকে যদি ভোগ করতে চাও—

কিছু চাই না। যা বলবার বলেছি, বলেই ঘুরে দাঁড়ায় গজানন। পা বাড়ায় সদরের দিকে। কিন্তু রূপকুমার আর সমসের তো সেখানে পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খোলা দরজা দিয়ে আরও এক মস্তান চেহারার মাসলম্যান এসে লোলুপ চোখে তাকিয়ে রয়েছে গজাননের দিকে। যেন কতদিন পেটাই-কর্ম হয়নি। হাত নিশপিশ করছে। সারা মুখে বসন্তর ক্ষত, চোখ দুটো কটা আর বাঘের চোখের মতো পাশবিক।

পেছন থেকে ভেসে আসে ম্যাডামের মোলায়েম হাসি-উচ্ছল স্বর।

গজানন, জানি না কেন তোমাকে দেখেই আমার ভালো লেগে গেছে। নিশ্চয় একটা-না-একটা দুর্বলতা তোমার ভেতরেও আছে। যদি না-ও থাকে, বানিয়ে দেব আমি। রূপকুমার, বেরোতে দিও না!

রাইট, ম্যাডাম, এগিয়ে আসে তিন চক্রী এক সাথে।

গজানন এখন কী করবে?

ছুঁচের মহিমা

ছোট্ট ঘরটায় শুইয়ে ফেলা হয়েছে গজাননকে। পাশবিক হাসি হাসতে-হাসতে বসন্ত ক্ষতআকীর্ণ লোকটা চেপে রয়েছে ওর দুটো হাত। রূপকুমার ধরেছে দুটো পা। মাথাটা ঠুসে ধরেছে সমসের। গজানন নিরুপায়। চোখের কোণ দিয়ে দেখল, টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে একটা অ্যাম্পুল থেকে হাইপোডারমিক সিরিঞ্জে ওষুধ টেনে নিচ্ছে ম্যাডাম।

গর্জে ওঠে গজানন—এই মুরোদ! হিপনোটিজমের ক্ষমতা নেই, আরক দিয়ে ঘুম পাড়াতে চান?

জলহস্তীকে কখনও হাসতে দেখা যায় শব্দ না করে? না। পশুরা হাসতে পারে না। কিন্তু মানুষ পারে। ম্যাডামের মুখে এখন যে হাসিটা দেখা গেল, তা জলহস্তীরা দেখলে তাজ্জব হয়ে যেত।

বৎস গজানন, তোমার মতো কুঁচো চিংড়িকে আমার পুরো মুরোদটা দেখাতে চাই না, তাই এই ইঞ্জেকশন। ঠান্ডা মেরে আনবে, বড় ক্ষতি হবে না।

বড় ক্ষতি মানে?

অব্যাহত রইল জলহস্তী হাসি—মানে, তোমার ইচ্ছেটাকে জোর করে যদি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিই—তা হলে, তা হলে পাগল হয়ে যাবে, গজানন। আমি চাই তোমাকে আমার গোলাম, আমার প্রেমিক, আমার পুত্র

বানিয়ে রাখতে। নানাভাবে তোমার ওই মজবুত শরীরটাকে চাই কাজে লাগাতে।

শয়তানী! তুই-ই তাহলে জোয়ারদারকে পাগল করেছিস?

বেশি জেনে ফেলেছ, গজানন।

তুই পারিস আমাকে জাতিস্মর করে তুলতে?

চমকে উঠল ম্যাডাম। চমকে উঠেছে সমসেরও। হাত শিথিল হয়ে গেছে। গজানন ঘাড় বেঁকাতে পারছে। গনগনে চোখে ম্যাডাম চেয়ে আছে তার দিকে।

গজানন, জাতিস্মর হতে চাস?

হ্যাঁ, চাই।

কিন্তু কীভাবে জানলি আমার সে ক্ষমতা আছে?

আছে না কচু। আমেরিকায় গিয়ে পঞ্চাশ হাজার ডলার খরচ করলেই ব্রেনের ন'হাজার কোটি নিষ্ক্রিয় নিউরোণকে সক্রিয় করতে গিয়ে হয়তো মনের শক্তি একটু বেড়ে গেছে। পূর্বজন্মের স্মৃতি ফিরিয়ে আনা অত সোজা নয়। পারে শুধু মুনি-ঋষিরা।

গজানন!

চোপরাও মাগী! গজানন এবার ফ্রি ল্যাংগুয়েজ ছাড়তে থাকে—আমেরিকার কোটিপতিদের টাকা খেয়ে ইন্ডিয়ার লাখোপতি কোটিপতিদের খতম করে চলেছিস একে-একে। তোর মুখে থু-থু দিতে ইচ্ছে যাচ্ছে।

তাই নাকি? তাই নাকি? টকটকে লাল হয়ে ওঠে ম্যাডামের মুখমণ্ডল—সমসের! রূপকুমার! পঞ্চানন! কিল হিম! কিল হিম! খুব বেশি জেনে গেছে! অ্যাট ওয়ান্স!

ত্রিশূল

অন্য ঘরে খাবার টেবিলে বসেছিল অনিমা। ছুরি কাঁটাচামচের দিকে চেয়ে রয়েছে নির্নিমেষে। পুতুলের মতো হাত বাড়িয়ে তুলে নিল। এক হাতে ছুরি, আর এক হাতে কাঁটা চামচ। এবার কেক কাটবে। খাবে।

কিন্তু চোখ আটকে গেল কাঁটা চামচে। চেয়েই রইল। চোখ আর সরে না। চোখের পাতাও পড়ে না।

ঈষৎ সঙ্কুচিত হল চক্ষুতারকা। সম্মোহিত হওয়ার পর এই প্রথম চোখ কুঁচকোচ্ছে সে। কারণ কাঁটাচামচের তিনটে মাত্র কাঁটার গড়নটা তার যেন চেনা-চেনা লাগছে।

কোথায় যেন দেখেছে...

মন ছেয়ে ফেলছে ওই তিনটে কাঁটা, মিলেমিশে যাচ্ছে আরও তিনটে সূচীতীক্ষ্ণ শলাকার সঙ্গে।

ত্রিশূল!

যেন বজ্রালোকে ঝলকিত হল অনিমার মস্তিষ্কের অভ্যন্তর। অব্যাখ্যাত এক দীপ্তি নিমেষ-মধ্যে ঘুচিয়ে দিল সম্মোহনের নিরন্ধ্র তমসা।

ত্রিশূল!

কাঁটাচামচটা দেখতে ত্রিশূলের মতো।

সে ত্রিশূলের এজেন্ট।

এখন কোথায়? শত্রুপুরীতে। ত্রিশূলের আর একজন এজেন্ট গজানন কোথায়? শত্রুদের হাতে!

কাঁটাচামচ টেবিলে রেখে উল্কাবেগে দরজা দিয়ে করিডরে বেরিয়ে গেল অনিমা। সামনেই সেই ছোট ঘর। ঘরের মধ্যে বিদিগিচ্ছিরি গলায় চেঁচাচ্ছে ম্যাডাম—কিল হিম! কিল হিম! খুব বেশি জেনে গেছে। অ্যাট ওয়ান্স!

অনিমা যেন সাইক্লোন হয়ে গেল মুহূর্তে। দমকা বাতাসের মতো ঢুকল ঘরে। রূপকুমার রিভলভার বার করেছে, তুলছে গজাননের খুলি লক্ষ্য করে।

শূন্যপথে ধেয়ে গেল অনিমার পেটাই শরীর। দু-পায়ের মধ্যে রিভলভারটা মুঠো থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অবতীর্ণ হল খাটের ওপাশে, পরমুহূর্তেই পায়ের ফাঁক থেকে রিভলভার তুলে নিয়ে বিনা দ্বিধায় পরপর গুলি করে গেল সমসের, পঞ্চানন আর রূপকুমারকে। হতভম্ব তিনজনেরই খুলি গেল উড়ে, নিষ্প্রাণ দেহগুলো লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে।

লুটিয়ে পড়ার আগেই অবশ্য তড়িৎ গতিতে শয্যা থেকে উঠে পড়েছে গজানন। একটি মাত্র হনুমান লম্ভ দিয়ে গিয়ে পড়েছে ম্যাডামের ওপর। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে শূন্যপথে উড়ন্ত মানবী, গুলিবর্ষণ এবং হনুমান লম্ভ দেখে জলহস্তিনী ম্যাডাম ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছিল। হাত থেকে সিরিঞ্জটা কেড়ে নিয়ে প্যাঁট করে বাহুমূলে বিঁধিয়ে দিল গজানন।

বললে আকর্ণ হেসে—ঘুম, ঘুম, টানা ঘুম এবার। ম্যাডাম, চোখ মেললেই দেখতে পাবে খাঁচাঘর। গুড নাইট!

ঘুমিয়ে পড়ল ম্যাডাম।

তারপর?

গোপন সে কাহিনি এখানে লেখা যাবে না।

** 'ঘরোয়া' পত্রিকায় প্রকাশিত। (শারদীয় সংখ্যা।)*

জিরো জিরো গজানন রেগেছে

১

বেপারীটোলা লেনের এয়ারকন্ডিশনড চেম্বারে বসে 'দৈনিক হযবরল' কাগজের একটা খবর পড়েই সোজা হয়ে বসল গজানন।

পুঁতিবালা।

নিস্তব্ধ ঘরে আচমকা বাজখাঁই ডাক শুনেই চমকে উঠল বেচারা পুঁতিবালা। হাতে কোনও কাজকর্ম নেই। কাত হয়ে বসে তাই আদিরসাত্মক ছবির বই দেখছিল, এমন সময়ে ব্রেনের ওপর এক ধাক্কা।

হাত থেকে বইটা ছিটকে পড়ল মেঝেতে।

সটান হয়ে বসে থাকা গজাননের চোখ গিয়ে পড়ল মলাটে।

চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। সেকেন্ড কয়েক চেয়ে থেকেই যেন সভয়ে চোখ বন্ধ করল গ্রেট স্পাই।

বলল বজ্রগর্জনে, বইটা মুড়ে রাখ।

চোখ মুদেই বললে কিছুক্ষণ পরে—রেখেছিস?

ভেসে এল পুঁতিবালার করুণ স্বর—হ্যাঁ।

চোখ খুলল গজানন। চোখে রক্তের ছিটে। প্রমাদ গুণল পুঁতিবালা। পুঁতি, আবার ওইসব ছাইপাঁশ দেখছিস?

সময় কাটছিল না।—

ড্যাম ইওর সময়। গোল্লায় যাচ্ছে দেশটা...গোল্লায়! একদল ছেলেমেয়ে হেরোইন খেয়ে মরছে—আর একদল পর্নোগ্রাফি নিয়ে মাতছে। ছ্যা :...ছ্যা :...ছ্যা : !

শরমে মরে গেল পুঁতিবালা। যৌবনের পাখা যখন ফুরুক-ফুরুক করে সবে বেরোতে আরম্ভ করেছে, তখন অভাবের জ্বালায় সেই যে স্বভাবটা নষ্ট করে ফেলেছিল, এখনও তার ছিটেফোঁটা রয়ে গেছে ভেতরে-ভেতরে। চড়া দুনিয়া আর কড়া গজানন'দাকে লুকিয়ে মাঝেমধ্যে একটু-আধটু এদিক-ওদিক করে ফ্যালে—কিন্তু এরকম হাতেনাতে ধরা পড়েনি কখনও।

পুঁতিবালার লজ্জারাঙা অবনত নয়ন মুখখানার দিকে চেয়ে মায়া হল গজাননের। অমনি জল হয়ে গেল চিড়বিড়ে রাগটা।

'হযবরল' কাগজটা পুঁতিবালার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে গলার স্বর নামিয়ে বললে গ্রেট গজানন—পাপিষ্ঠা। খবরের কাগজ না পড়লে স্পাইগিরি করা যায় না—কতবার আর বলব?

'পাপিষ্ঠা' গালাগালটা গজাননের নরম মুডের গালাগাল। বুকের ধড়ফড়ানিটা একটু কমল পুঁতিবালার। একে তো ওই বাবরি চুল—ঝাঁকাল বটগাছ বললেই চলে—তারপর কটমট চাউনিতে যদি রক্তের ছিটে দেখা যায় —হৃৎপিণ্ডটা মনে হয় যেন সাঁৎ করে তলপেটেই গেল নেমে। মা দুর্গার অসুরকে দেখেও এত ভয় হয় না।

চোখ তুলে মিঠে সুন্দরী পুঁতিবালা প্রথমে দেখল ছুঁড়ে ফেলে-দেওয়া কাগজটার দিকে। তারপর আড়চোখে দেখে নিল গজাননের চোখ দুটো।

না। রক্তের ছিটে নেই, চোখও আর পাকানো অবস্থায় নেই।

ধাতস্থ হয়ে কাগজটা তুলে নিল পুঁতিবালা।

কাষ্ঠ হেসে বললে, কোন পৃষ্ঠায়? কত নম্বর কলমে?

এ:! বিদ্যে জাহির করা হচ্ছে আবার! দে, দে, দেখিয়ে দিচ্ছি। কাগজ হাতে উঠে গেল পুঁতিবালা লীলায়িত ভঙ্গিমায়—দেখেই আবার খেঁকিয়ে ওঠে গজানন—এটা কি নাট্যশালা? অ্যাঁ? বৈজয়ন্তীমালার নাচ হচ্ছে নাকি?

ফিক করে এবার হাসল পুঁতিবালা। লিপস্টিক রাঙানো পাতলা ঠোঁট জোড়ার তলায় যেন লাইনবন্দি কমল হিরে ঝিলমিলিয়ে উঠল।

বলল, মাগো! কী ব্যাকওয়ার্ড! বৈজয়ন্তীমালা এখন আর নাচে না—রিটায়ার করেছে। এম-পি হয়েছে জানো না?

হয়েছে নাকি? ঢোক গেলে গ্রেট গজানন। স্পাই বিজনেসে এসে ইস্তক সিনেমা-টিনেমাগুলোও রেগুলার দেখা হচ্ছে না। দেখলেই তো সময় নষ্ট। দেওয়ালের পোস্টারটা এক ঝলক দেখেও নিল। বড়-বড় হরফে সেখানে লেখা আছে—টাইম ইজ মানি। সময়ই হল গিয়ে টাকা।

কই? কোন খবরটা গজাননদা?

চমকে ওঠে গজানন—এই তো এইটা!

খবরটা পড়ল পুঁতিবালা। সঙ্গে-সঙ্গে কালো-কালো চোখ দুটো কীরকম যেন হয়ে গেল।

বললে অস্ফুট গলায়, শম্ভু নায়েক মানে সেদিন যে এসেছিল?

হ্যাঁ। সেই শম্ভু নায়েক। হেরোইন নেশার টাকা জুগোতে-জুগোতে যে ফতুর হয়েছিল—

আত্মহত্যা করার আগে হিরোইন স্মাগলার যেন ধরা পড়ে তোমাকে কাকুতিমিনতি করে বলে গেছিল।

সেই শম্ভু নায়েকই ফট করে আত্মহত্যা করে বসল।

অথচ হিরোইন স্মাগলার ধরা পড়ল না।

পুঁতিবালার ফুটুনি স্তব্ধ হতে না হতেই বাজল লাল টেলিফোন। অর্থাৎ 'কল' এসেছে 'ত্রিশূল' দপ্তর থেকে।

২

গজাননের কীর্তিকলাপ যাঁরা এর আগে পড়েছেন, তাঁরা জানেন 'ত্রিশূল' কী জিনিস। শিবের হাতে যে অস্ত্রটি দেখা যায়, এ সে বস্তু নয়, যদিও মহিমায় শিবের হাতিয়ারের সমান যায়।

আজ্ঞে হ্যাঁ, এই সেই গুপ্ত সংস্থা—ভারতের স্বার্থরক্ষায় যার জন্ম, ভারতের মানুষ, ভারতের মাটি, ভারতের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে যার দাপটে বহু বিদেশি গুপ্তচর সংস্থারও ঘিলু নড়ে উঠেছে বিলক্ষণ।

'ত্রিশূল' সেন্ট পারসেন্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। কোটি-কোটি মুদ্রার খেলা চলছে 'ত্রিশূল'-এর রক্তচক্ষু অতন্দ্র রাখার জন্যে।

রামভেটকি সুরকিওয়ালা এই ভয়ঙ্কর প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় মাথা। পাঠকপাঠিকারা অনেকেই জানেন, রামভেটকিকে দেখলে মানুষের শাখামৃগ পূর্বপুরুষদের কথা মনে পড়ে, কম্যান্ডো থাকার সময়ে বেমক্কাগুলি খেয়ে সে হাঁপানি রোগে ভোগে এবং এন্তার তাড়ি খায় (হাঁপানির ওষুধ বলে)! প্রতাপে আর ব্যক্তিত্বে, নিষ্ঠুরতায় আর বিচক্ষণতায় সে কিন্তু অদ্বিতীয়।

এহেন রামভেটকির কর্কশ স্বর ধ্বনিত হল গজাননের কর্ণরন্ধ্রে লাল টেলিফোনের রিসিভার কানে লাগাতেই।

জিরো জিরো গজানন?

আই, আই, স্যার, মার্কিন সিনেমা দেখে এই বুকনি সম্প্রতি রপ্ত করেছে গজানন।

হেরোইন মানে নায়িকা নয়...জানা আছে তো?

আই অ্যাম নট সো ফুল, স্যার।

জানি, জানি, গজানন। হেরোইন যে দেশটাকে জাহান্নমে নিয়ে যাচ্ছে, তাও নিশ্চয় জানো।

সেই কথাই হচ্ছিল এতক্ষণ। শম্ভু নায়েক সুইসাইড করেছে।

ওটা সুইসাইড নয়—হোমিসাইড।

মা...মানে?

মার্ডার। হেরোইন স্মাগলারের ঠিকানা বের করার চেষ্টা করেছিল শম্ভু নায়েক, তাই তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া হল।

কপালের শিরা ফুলে ওঠে গজাননের—নাম কী ব্যাটাচ্ছেলের?

তার আসল নাম কেউ জানে না। হেরোইন কিঙ নামেই তার নাম ডাক নেশারু মহলে।

হেরোইন কিঙ!

ইয়েস, মাই ডিয়ার গজানন—

জিরো জিরো গজানন।

অফকোর্স, অফকোর্স—জিরো জিরো গজানন। আমার এক এজেন্ট তার হাতে গতকাল খুন হয়েছে।

আপনার এজেন্ট?

ডাবল এজেন্ট বলতে পারো। হেরোইন কিঙের এজেন্টকে আমারও এজেন্ট বানিয়েছিলাম। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা বলতে পারো। কিন্তু ধুরন্ধর 'কিঙ' তাকে গতকাল শেষ করে দিয়েছে।

কোথায়? কীভাবে?

বাংলাদেশ থেকে বেশ কিছু মাল আসছিল। এই এজেন্টকে ভার দেওয়া হয়েছিল। আর আমি তাকে ভার দিয়েছিলাম, ওই সূত্র ধরে কিঙকে কাত করতে। কিন্তু...

কিন্তু ব্যাপারটা হয়েছিল অন্যরকম। রামভেটকি সুরকিওয়ালা নিজেও তা জানে না।

বিজু সেন ন'মাসে ছ'মাসে একবার ফিল্ডে নামে, মানে মাল পাচার করে। মোটা মুনাফা লুটে হাওয়া হয়ে যায় মাস কয়েকের জন্যে। শিলং থেকে গোয়ার নানান খানদানি হোটেলে তাকে দেখা যায় বিভিন্ন 'বিউটি'র সঙ্গে, দামি সুরা আর দামি গাড়ি নিয়ে মেতে থাকে মাসের পর মাস।

সে একা। একেবারে একা। প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার আসরে সঙ্গী নেওয়া বিপজ্জনক। তাই সে একা।

মাথায় সে খুব লম্বা নয়, খুব বেঁটেও নয়। কিন্তু পেটাই চেহারা। নাক-মুখ-চিবুকের গড়ন দেখে মনে হয় বুঝি মার্কিন মুলুকে তার জন্ম। বিশেষ করে তার টকটকে গায়ের রং আর কোব্যাল্ট ব্লু চোখ দেখে ভুল করে অনেকেই।

বিদেশিনী মা আর ভারতীয় বাবার মিশ্র শোণিত ধমনীতে ধারণ করেই সে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। তাই তার চেহারায় সাগরপারের ছাপ এত বেশি।

চরিত্র? অতীব নিষ্ঠুর। টাকা ছাড়া সে আর কিছু বোঝে না। এই দুনিয়ায় টাকা থাকলেই সব থাকে—নইলে সব ফক্কা। নিকষ এই তত্ব এবং জীবনদর্শন বিজু সেনকে অমানুষ করে তুলেছে কৈশোর থেকেই।

ইছামতী নদীর ধারে এই বিজু সেনকেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছিল গত রাতে—এ কাহিনি যখন শুরু হচ্ছে, ঠিক তার আগের রাতে।

নদীর ওপারে বসিরহাটের আলো দেখা যাচ্ছে। টর্চের নিশানা করতে হবে এপার থেকে। নৌকো চলে আসবে তক্ষুনি। তিরিশ কিলো সাদা গুঁড়ো নিয়ে সেই নৌকোয় চেপে বসবে বিজু সেন।

তিরিশ কিলো! ছেষট্টি পাউন্ড। খাঁটি সাদা গুঁড়ো। হেরোইন। পলিথিন প্যাকেটে মোড়া রিফাইনড হেরোইন। প্রায় ষোলো কোটি টাকার মাল। খুচরো বাজারে গেলে দশগুণ দাম।

জীবনে এত টাকার মাল পাচারে নামেনি বিজু সেন। চার মাস ঘাপটি মেরে থেকেছে সে এইরকম মোটা একটা দাঁও পেটার জন্যে। ছেষট্টি পাউন্ড হেরোইন পাচারই অবশ্য তার মূল লক্ষ্য নয়।

বিজু সেন খুন করতে চায় হেরোইন কিঙ-কে। স্মাগলার নৃপতিকে স্বহস্তে নিধন করে সে নিজেই রাজ সিংহাসন দখল করতে চায়। চার মাস ধরে সেই প্রস্তুতিই চালিয়ে এসেছে সে।

আকাঙ্ক্ষা তার আকাশচুম্বী—স্বপ্ন ছুঁয়ে যায় স্বর্গকে। হেরোইন কিঙ-এর অনেক মাল সে পাচার করেছে, লুটেছে অনেক টাকা, জেনেছে অনেক গলিঘুঁজির খবর—হেরোইন আমদানির কারবারে যা নিতান্তই দরকার।

এবার তাই সরে যেতে হবে স্বয়ং রাজামশায়কে। রাতের অন্ধকারে নীলকান্তমণির মতো জ্বলছে বিজু সেনের কোব্যাল্ট ব্লু নয়নযুগল। বুকে ঝুলছে হাইপাওয়ারড বাইনোকুলার। ইনফ্রারেড লেন্স লাগানো দূরবীন। যাতে রাতের অন্ধকারেও হাজার গজ দূর থেকে সামান্যতম নড়াচড়াও চোখ না এড়ায়।

ঢিলে শার্টের তলায় বগলের ফাঁকে চামড়ার ফিতেতে ঝুলছে পয়েন্ট থ্রি এইট ক্যালিবারের রিভলভার। হয়তো দরকার হবে না। বিপদ এলে অস্ত্র চালানোরও সুযোগ মিলবে না। রাইফেল আনেনি সেই কারণেই...

হিপ পকেটের টর্চটাই কাজে লাগাবে নৃপতি-নিধনের পর। ইস্পাতকঠিন ঠোঁট বেঁকিয়ে মৃদু হাসে বিজু সেন।

ধুরন্ধর কিঙ কিন্তু একাজের ভার তাকে দেয়নি। মজাটা এইখানেই। ছেষট্টি পাউন্ড হেরোইন পাচার হবে বাংলাদেশের বর্ডারের ওপর দিয়ে—

এ খবরটা তাকে দিয়েছে একজন পুলিশ দারোগা।

বিজু সেনের অন্তরে তাই সামান্য সংশয় আছে বইকী। দারোগা যে খবর জানে—সে খবর নিশ্চয় আরও অনেকে জেনে বসে আছে। 'কিঙ' বরাবর কাজ করে নিখুঁতভাবে—এবারে বিজু সেনকেও সে জানায়নি। কিন্তু জেনেছে দারোগা।

রাত দশটা। সময় হয়েছে। কয়েকশ গজ চওড়া এই ফাঁকা মাঠ পেরিয়ে এখুনি আসবে কিঙ। মাঠের ওপারে নারকেল গাছগুলোর তলা দিয়ে আবির্ভূত হবে তার মূর্তি।

ঝোপের মধ্যে গুঁড়ি মেরে বসল বিজু সেন।

মিনিট পনেরো পরেই দেখা গেল একটা ছায়ামূর্তিকে। পরনে লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি। হাতে একটা ব্যাগ। হনহন করে মাঠ পেরিয়ে আসছে।

দূরবীন কষতে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসতে হয়েছিল বিজু সেনকে। দুলে উঠেছিল ঝোপটা। তারার আলোর ঝিকিমিকিও নিশ্চয় দেখা গেছিল দূরবীনের লেন্সে।

জীবনমরণের খেলায় সামান্য ওই ভুলটুকুই যথেষ্ট।

মাঠের ওপারে কয়েকশ গজ দূরে ঝোপের মধ্যে লক্ষ্য স্থির হয়ে গেল শক্তিশালী ম্যাগনান আগ্নেয়াস্ত্রের—টেলিস্কোপিক নাইট-শাইট ফিট করা মারণাস্ত্রের বুলেটটা নিক্ষিপ্ত হল নির্ভুল লক্ষে।

বিজু সেনের টুঁটি উড়ে গেল। বিশাল গর্ত দিয়ে কলকল করে বেরিয়ে এল রক্ত।

মাঠের মাঝে লুঙ্গি পরা লোকটা চমকে উঠল আওয়াজ শুনে। দশটা টাকা তাকে দেওয়া হয়েছে ব্যাগটাকে মাঠ পার করে দেওয়ার জন্যে। নদীর ধারেই নাকি লোক দাঁড়িয়ে আছে। বর্ডার পেরোলেই...

কিন্তু গুলি ছুঁড়ল কে? কার দিকে?

ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটতে যাচ্ছে নিরীহ মানুষটা, মারণাস্ত্র থেকে ছুটে এল লক্ষ্যভেদীর আর একটা বুলেট। হৃৎপিণ্ড ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল মৃত্যুদূত।

ঝোপের মধ্যে থেকে বেরিয়ে গেল হেরোইন কিঙ। বিজু সেন যে ডাবল এজেন্টের কাজ নিয়ে তাকেই নিকেশ করে হেরোইন-সম্রাট হওয়ার স্বপ্ন দেখছে—এখবর পেয়েই জাল পাততে হয়েছিল কিঙকে। টোপ ফেলেছিল অনেক কায়দা করে।

রামভেটকি সুরকিওয়ালা কল্পনাও করতে পারেনি পুরো প্ল্যানটা কিঙ-এর—দারোগাও তার হাতের পুতুল। অজান্তে কবর রচনা করে ফেলেছে বিজু সেনের।

৩

গজানন, কী বুঝলে? রামভেটকির প্রশ্নটা টেলিফোনের তারের মধ্যে দিয়ে এসে কিলবিলিয়ে ওঠে গ্রেট গজাননের ব্রেনের মধ্যে।

দাঁতে দাঁত পিষে বাজনা বাজানোর চেষ্টা করল গজানন। দেখে মুখ টিপে হেসে ফেলে পুঁতিবালা। কিড়মিড় আওয়াজের বদলে একটা বিচ্ছিরি আওয়াজ গিয়ে পৌঁছল রামভেটকির কানে।

গজানন, এটা কিসের শব্দ?

আমি রেগেছি।

রেগেছ? জিরো জিরো গজানন রেগেছে! তবে আর কী, কিঙ এবার কঙ হবে।

কিঙ কঙ হবে?...

মানে, কিঙ কঙের যে দশা হয়েছিল, তাই হবে। মানে, পটল তুলবে। তাই তো?

ইয়েস, বস। গজানন তার মুন্ডু ছিঁড়বে। গেণ্ডুয়া খেলবে। কিন্তু তাকে পাব কোথায়?

সেটাই তোমার কাজ। খুঁজে নিতে হবে।

খুঁজব কোন চুলোয়?

ল্যাঙ্গুয়েজ!...ল্যাঙ্গুয়েজ!...মাই ডিয়ার গজানন, তুমি হলে ভীষণ ভয়ঙ্কর প্রচণ্ড টঙ্কার—ত্রিশূলের বাণ নিয়ে ধ্বংসের মন্ত্র কপচাতে-কপচাতে যাচ্ছ অদ্ভুত প্রলয়কে অঙ্কুরে বিনাশ করতে। তোমার মুখে 'চুলোয়' শব্দটা মোটেই খাপ খায় না।

বসো, আমার মাথা ভোঁ-ভোঁ করছে আপনার ল্যাং...ল্যাং...

ল্যাঙ্গুয়েজ শুনে—এই তো? বৎস গজানন, বৎস বললাম বলে ফির ভি রেগে যেও না। তুমি যাচ্ছ সেই খাঁটি বাংলাভাষার দেশে—

আই মীন বাংলাদেশে?

ইয়েস, ইয়েস, মাই বয়, গ্রেট হারামজাদা কিঙ এখন রয়েছে বাংলাদেশে।

হেরোইন নিয়ে আসেনি ইন্ডিয়ায়?

বড্ড হুঁশিয়ার যে! ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেয়েই পিছু হটে গেছে। বিবরে প্রবেশ করেছে।

স্যার, বিবর না কবর—কী বললেন?

ননসেন্স! বেলেঘাটায় থেকে তোমার কালচারটা একদম নষ্ট হয়ে গেছে দেখছি।

এইবার আঁতে ঘা লাগে গজাননের। মাতৃভূমির নিন্দে শুনলে যে কোনও স্বদেশপ্রেমীরই গোঁসা হয়। আমাদের গ্রেট গজাননও বেলেঘাটার মাটিকে ভালোবাসে।

অতএব সে গর্জে উঠল তৎক্ষণাৎ—মি: রামভেটকি সুরকিওয়ালা!

ভড়কে গেল রামভেটকি—কী...কী হল?

আপনি জানেন, যার আছে অনেক টাকা, সেই থাকে বেলেঘাটা?

তা-আমি তো জানতাম, যার নেই পুঁজিপাটা, সেই থাকে বেলেঘাটা।

ওটা আগেকার কথা। এখন দিন চেঞ্জ হয়েছে। এটাও কি জানেন, যার আছে অনেক টাকা, তার থাকে ইজ্জৎ, কালচার?

তা...হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ, গজানন।

তাহলে কথা ফিরিয়ে নিন। বলুন বেলেঘাটায় থেকে গজাননের কালচার এক্কেবারে ভালচার হয়ে গেছে।

ভা...ভা...ভালচার! কিন্তু ভালচার মানে তো—

শকুনি। আমিও তাই। স্পাইরা শকুনি ছাড়া আর কী? অনেক উঁচুতে উড়লেও নজর থাকবে ঠিক ভাগাড়ের দিকে—যেখানে দেখিবে মড়া, ঠোকরাইয়া দ্যাখো তাই।

গজানন, ইউ আর গ্রেট।

আই অ্যাম! আই অ্যাম! গোঁফ নেই, তবু গোঁফে তা দিয়ে নেয় গজানন। কালচারের সঙ্গে ভালচারের মিলটা ফটাং করে মাথায় এসে গেল। সত্যিই, কী রহস্যময় ব্রেন।

পুঁতিবালা পর্যন্ত অবাক হয়ে দেখছে গজাননকে। কী অপূর্ব কালচার! ভালচার না হলে আদর্শ স্পাই তো হওয়া যায় না। মাতাহারির কথা মনে পড়ে যায় পুঁতিবালার। মাতাহারিকে যদিও ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়াতে হয়েছিল। রাইফেলের নলচেগুলো কিন্তু লক্ষ্যস্থির করতে পারেনি। সমানে বুক দুলিয়ে গেছিল মাতাহারি—ট্যারা করে ছেড়েছিল রাইফেলধারীদের।

কী দুর্জয় সাহস। মৃত্যু সামনে—অথচ বুক দোলাচ্ছে মাতাহারি। আপন মনেই নিজের পীন পয়োধরা একবার দুলিয়ে নেয় পুঁতিবালা।

পরক্ষণেই মাতাহারির স্বপ্ন টুটে যায় গজাননের আচমকা চিৎকারে, কী বললেন? কিন্তু এখন—

টেলিফোনে ভেসে এল কড়া ধমক—গজানন, আর কোনও কথা নয়, শহরটার নাম টেলিফোনেও বলা ঠিক নয়। বড্ড ক্রশ কানেকশান হচ্ছে আজকাল। কোড ল্যাঙ্গুয়েজে যা বললাম। তা মনে রেখো। ঠিক দু-ঘণ্টা পরে একটা লাল রংয়ের পনটিয়াক গাড়ি যাবে বেপারীটোলা লেনে। তোমাকে সটান বর্ডার পার করে ঠিক সেই জায়গাটায় পৌঁছে দেবে। গাড়ি থাকবে তোমার হেপাজতে। বাংলাদেশের ড্রাইভার্স লাইসেন্স করা আছে—তোমার পাশপোর্ট হচ্ছে মহম্মদ হোসনের নামে। ইন্ডিয়ান টুরিস্ট। বুঝেছ?

জি হ্যাঁ।

পুঁতিবালাকে নেওয়া যাবে না।

যাবে না?

না। বড় ডেঞ্জারাস গেম, গজানন। কিঙ ওই শহরেই আছে খবর পেয়েছি। সাদা গুঁড়োও তার কাছে। তুমি তাকে খুঁজে বের করবে, মুন্ডু ছিঁড়বে—

গেণ্ডুয়া খেলব।

যা খুশি। যদি তার আগে তোমার মুন্ডু ছেঁড়া যায়?

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলোরে!

ননসেন্স!

লাইন ডেড হল। গজানন প্রোজ্জ্বল চোখে পুঁতিবালার দিকে চাইল। বলল, এই ছুঁড়ি, এবারকার অ্যাডভেঞ্চারে তোর ঠাঁই নেই।

পুঁতিবালা কিচ্ছু বলল না। একটা কথাও না।

কিন্তু পুঁতিবালা যে কী চীজ, তা গজাননও জানত না। মেয়েরা যখন গুপ্তচরী হয়, বাঘিনীদেরও হার মানায়। পুঁতিবালা যে লাইন থেকে এসেছে, সে লাইনে মোহিনী হওয়ার ছলাকলা শিক্ষার বিলক্ষণ স্কোপ ছিল। পুঁতিবালা এই মস্ত আর্ট-টি রপ্ত করেছে।

বাকিটা তার বডি খেলিয়ে ঠিক ম্যানেজ করে নেয়।

ফলে, বাংলাদেশের সেই শহরটিতে গজানন যখন ঢুকল তার গাড়ি নিয়ে—অনেক পেছনে একটা ট্যাক্সিতে বোরখাপরা একটা মেয়েকেও দেখা গেল—ফলো করছে গজাননকে। গজানন গিয়ে উঠল একটা ফাইভ স্টার হোটেলে, পুঁতিবালাও (বোরখা পরিহিতা) উঠল সেখানে। রেজিস্টারে গজানন নাম লেখালো মহম্মদ হোসেন। পুঁতিবালা লিখল সুলতানা রাজিয়া। তারপর কী অপূর্ব কৌশলে, কী দৈবক্রমে জানা নেই—দু-জনেরই ঘর পড়ল পাশাপাশি—একই করিডরে।

তখন রাত হয়েছে। হোটেলের ঘরেই ধড়াচূড়ো পালটে নিল গজানন। রিভলভারটা নেবে কি নেবে না ভাবল সেকেন্ড কয়েক। তারপর না নেওয়াটাই ঠিক করল। যাচ্ছে তো খড়ের গাদায় ছুঁচ খুঁজতে। সিকিউরিটিতে রিভলভার ধরা পড়লেই যাবে সব গুবলেট হয়ে।

এদিকে পাশের ঘরে পুঁতিবালা কী করছে?

বোরখা ছুঁড়ে ফেলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছে। পটাপট ব্লাউজ খুলে সড়াৎ করে শাড়ি আর সায়া খুলে—(না...না...অতটা সে যায়নি!)...পরনের একটি মাত্র জাঙ্গিয়ার মতো পরিধেয়কে লোলুপ নয়নে দেখছে। একবার নিতম্ব নাচিয়ে দেখে নিল সব ঠিকঠাক আছে কিনা।

আছে, আছে। পুঁতিবালা এখনও মরেনি। মাতাহারিও বোমকে যাবে তার এই অপ্সরী মূর্তি দেখলে। বুকের এক চিলতে আবরণী থাকুক—দরকার হলে টান মেরে খুলে ফেলা যাবে।

রাইফেল, রিভলভার, চাকু, হাতবোমকেও এখন আর ভয় পায় না পুঁতিবালা। মুখের রং-টঙগুলো আর একবার ফ্রেস করে নিল গজাননের চ্যালা। কিঙকে রং নিয়েও যদি ঘায়েল করতে না পারা যায়—তাহলে পুঁতিবালার লাইন ছেড়ে দেওয়া উচিত।

বোরখাটা মাথা দিয়ে গলিয়ে নিয়ে দরজা ফাঁক করে দাঁড়াল পুঁতিবালা।

আর ঠিক সেই সময়ে ঝাঁকড়াচুলো গজানন গ্যাটর-গ্যাটর করে বেরিয়ে গেল ওর ঠিক নাকের ডগা দিয়ে। নাকে এল আতরের গন্ধ।

গজাননদা আতর মেখেছে। বলি ব্যাপারটা কী!

নীরস কাঠখোট্টা গজাননদা গন্ধদ্রব্য কস্মিনকালেও দু-চক্ষে দেখতে পারে না—নাকে শুঁকে ফেললে পচা গোবর শুঁকে ফেলেছে, এমনিভাবে নাক সিঁটকোয়।

সেই মানুষটা কিনা সারা গায়ে আতর মেখে পাঁচতারকা হোটেলের অলিন্দ পথ হাঁটছে। মতলবটা কী দেখতে হচ্ছে তো!

সুরুৎ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল পুঁতিবালা। গটগট করে চলল গজানন ওরফে মহম্মদ হোসেনের পেছন-পেছন। উঠল একই লিফটে। একতলায় নামল একইসঙ্গে। চোখ পাকিয়ে জিরো জিরো গজানন একবারটি দেখেছিল পাশের বোরখাধারিণীকে। সন্দেহ করেনি। করবেটা কী করে? বোরখা ফুঁড়ে দেখবার ক্ষমতা তো নেই। থাকলে দেখতে পেত হেসে কুটিপাটি হচ্ছে পুঁতিবালা। আর মনে-মনে বলছে—বটে! বটে! গজাননদা! বিদেশে এসে শেষকালে কামিনীকাঞ্চনে মজবে! আমি থাকতে তা হতে দেব না। সাধনার ব্যাঘাত ঘটতে দেব না!

একতলায় লিফট থেকে বেরিয়ে গজানন জিগ্যেস করে নিল, গেমরুম কোথায়। গেমরুম মানে জুয়ো খেলার আড্ডাঘর। এ হোটেলে সে ঘর আছে একতলারও নিচে—মানে পাতালঘরে।

গজানন চলল সেই দিকে। পকেটে কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকায় একবার হাত বুলিয়ে নিল। টাকার বান্ডিলে হাত বুলোলে নার্ভ-টার্ভগুলো বেড়ে ঠান্ডা হয়ে যায়!...তারপরেই জমাটি ঠেঙানি শুরু করা যায় শীতল মস্তিষ্কে।

কে জানে পাতাল ঘরে এখুনি তাই শুরু হবে কিনা! এসে গেছে গেমরুম। পুরো করিডরটা এয়ারকন্ডিশন করা। গেমরুমের দরজায় খেলাটেলার ছবি থাকলে বোঝা যেত ঘরটায় কী হয়।

কিন্তু যে ছবি রয়েছে, তা দেখলে ভুল ধারণা ঢুকে যায় মগজে।

একটা মেয়ের ছবি। ঘূর্ণমান গ্যালারি থেকে রাশি-রাশি নক্ষত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে সে যেন নেমে আসছে মর্ত্যে। অহো! অবতীর্ণ হওয়ার কী অপূর্ব ছন্দ! মনোমুগ্ধকর নি:সন্দেহে। অবশ্য সেইরকম মনই মুগ্ধ হবে এই তিলোত্তমাকে দেখলে।

কেননা, প্রথম মানব আদম প্রথম মানবী ঈভকে পরিধেয় আবিষ্কারের বহু আগে যে সজ্জায় দেখেছিল—কটাক্ষময়ী এই ললনাও যে রয়েছে সেই সজ্জায়।

দেখেই সভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল গজানন। সামলে নিল অবশ্য মুহূর্তের মধ্যেই। এসব মামলা হাতে নিলে চোখ খোলা রাখা দরকার—চোখের সামনে যা-ই পড়ুক না কেন—দেখতেই হবে।

অতএব খুঁটিয়ে দেখল গজানন। কোথায় যেন পড়েছিল, ভালো করে চোখ মেলে দেখার নাম পর্যবেক্ষণ, তাই পর্যবেক্ষণ করল অতীব নিষ্ঠার সঙ্গে।

খুব একটা খারাপ লাগল না। নারীদেহ বরাবরই তার কাছে একটা অজ্ঞাত মহাদেশ অথবা মহাসমুদ্র—হারিয়ে যাওয়ার চান্স এত বেশি...

কিন্তু এই রূপসিটির অধরে, ললাটে, নয়নে, গ্রীবায় এবং সেখান থেকে পদযুগল পর্যন্ত প্রদেশগুলিতে এমন-এমন সব পেলব সৌন্দর্য আছে যা অচল মনকেও সচল করে দিতে পারে!

একদা মানসিক ক্লিনিকবাসী গজাননেরও ব্রেনের কোষগুলো অদ্ভুতভাবে সচল হয়ে ওঠে।

দরজার সামনে টুলে বসেছিল হোটেলের লোক। সাধারণ কর্মচারী নয়। লড়াকু চেহারা। চুল এত ছোট করে কাটা যে মুঠো করে ধরা সম্ভব নয়। চোখ দুটি মার্বেলগুলির মতো গোল-গোল। গায়ে সিকি ছটাক চর্বিও নেই। জামাটা মোটা কাপড়ের—অনেকটা ফতুয়ার মতো দেখতে, প্যান্টটা তো পাছা কামড়ে রয়েছে।

ঠোঁট ফাঁক করে অত্যন্ত অমায়িক হাসি হেসে-হেসে গজাননের পর্যবেক্ষণ পর্ব অবলোকন করছিল লোকটা। হাসিটাকে অনেক ট্রেনিং দিয়ে অমায়িক করবার চেষ্টা করেও পারছিল না। মনে হচ্ছিল যেন একটা হিংস্র হায়না দাঁত খিঁচিয়ে আছে।

গজাননের পর্যবেক্ষণ পর্ব প্রলম্বিত হচ্ছে দেখে সে টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

বললে, ভেতরে যাবেন?

চমকে ওঠাটাকে বিউটিফুলি ম্যানেজ করে নিল গজানন। আদি জেমস বন্ড মানে সীন কোনারির চার্মিং হাসি হাসল।

বললে—অফ কোর্স।

আমি সিকিউরিটি স্টাফ। আপনাকে নতুন দেখছি, সার্চ করব।

হোয়া-ট!

অবিচল কণ্ঠ সিকিউরিটি স্টাফের—নিয়মিত এলে আর করব না। ঝুঁকি নিতে চাই না। অনেক ধরনের লোক তো এখানে আসে।

অনেক ধরনের লোক এখানে আসে! এবং এই জন্যেই তো গজাননের আবির্ভাব এই নির্বান্ধব পুরীতে। পাঁচতারা হোটেলের গেমরুমে লাখ টাকার খেলা দেখাতে যারা আসে, তাদের লাখ টাকা সাদাপথে আসে না কখনওই। কালোপথে পাথর পথিকদের পেট থেকেই তো খবর পাওয়া যাবে 'কিঙ' মহাপ্রভুর।

বুক চিতিয়ে বললে বেলেঘাট্টাই মস্তান (প্রাক্তন)—ও ইয়েস। ভাগ্যিস, রিভলভার আনেনি সঙ্গে!

দরজা খুলে ধরল গাঁট্টাগোট্টা লোকটা। ছোট্ট একটা চেম্বার। তার পরের দরজাটা খুললে গেমরুমে ঢোকা যায়। পৃথিবীর সবরকম কান ফাটানো শব্দ বোধহয় সেখানে মিশেছে। ছোট্ট চেম্বারে তার রেশ ভেসে আসছে গুমগুম করে।

কম্যান্ডোর চাকরি করত নাকি কদমছাঁট এই মর্কটটা? দ্রুত হাত বুলিয়ে গেল গজাননের সর্বাঙ্গে। বাহুমূল, ঊরুসন্ধি—কিচ্ছু বাদ গেল না।

কপট অমায়িক হেসে বললে, যান। খুলে ধরল দরজা গেমরুমের।

কান ঝালাপালা আওয়াজে প্রথমটা মাথা ধাঁধিয়ে গেল গজাননের। কীরকম যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে মনে হল। তারপরেই তেড়েমেড়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

বোরখাপরা পুঁতিবালা দাঁড়িয়েছিল করিডরে। বোরখাটা খুলবে কিনা তাই নিয়ে ভাবছিল। গজাননদার সামনে খোলা মানেই কেলেঙ্কারি। অথচ মন চুলকোচ্ছে বডিখানা কাউকে দেখাতে—স্বভাব যায় না মলে।

এসে গেল সেই সুযোগ। গজাননকে গেমরুমে চালান করে দিয়ে করিডরের দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল কদমছাঁট লোকটা।

বোরখার মাথা থেকে পা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে রুক্ষ কণ্ঠে—ফরমাইয়ে?

দরজাটা খুলুন, কাটকাট কথা পুঁতিবালার।

বোরখা পরে ভেতরে যাওয়া যায় না।

তাই নাকি? তাই নাকি? কেন যাওয়া যায় না শুনতে পারি?

সার্চ করিয়ে যেতে হয়।

তাই বলুন। সার্চ করিয়ে গেলেই হবে। তা করুন না।

বোরখা খুলতে হবে।

তাই নাকি? তাই নাকি? এই খুললাম, বলেই হ্যাঁচকা টানে মাথা গলিয়ে বোরখা খুলে যেন হাওয়ায় উড়িয়ে দিল পুঁতিবালা। দুই হাত দু-পাশে ছড়িয়ে সশব্দে তুড়ি দিয়ে কবজি ঘুরিয়ে বললে সে এক অপরূপ কায়দায়—কী সার্চ করবেন, মি: সার্চম্যান? কী আছে আমার—এই বডিখানা ছাড়া। বলতে-বলতেই মোক্ষম মোচড় দিল বক্ষ শোভায় মাতাহারি-স্টাইলে।

চোখের মধ্যে আলপিন ফুটিয়ে দিলেও বোধহয় এত তাড়াতাড়ি চোখ বন্ধ করত না দ্বাররক্ষক। আঁতকে উঠে দরজা খুলে দিয়ে বললে—কী হচ্ছে কী খোলা জায়গায়! যান ভেতরে।

বিজয়িনী পুঁতিবালা এক পা দিল ছোট্ট চেম্বারে।

বললে ঘাড় ঘুরিয়ে—মি: সার্চম্যান, সার্চ করবেন কি বন্ধ জায়গায়? আসুন, আসুন, কতক্ষণই বা আর লাগবে।

ভেতরের দরজা খোলার জন্যে বেগে ছোট্ট চেম্বারে প্রবেশ করতে যাচ্ছে কদমছাঁট—গায়ে গা ঘষটে যেতেই এককালের বাজারি মেয়ে পুঁতিবালা দেখিয়ে দিল তার 'ফর্ম'টা।

ঝাঁ করে জাপটে ধরল বেঁটে লোকটাকে। সশব্দে চুম্বন করল ঠিক ঠোঁটের ওপর। সাঁৎ করে বেরিয়ে গেল বাইরে। করিডর থেকে বোরখাটা তুলে নিয়েই পরে নিল চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে। ফিরে এল চেম্বারে। মূহ্যমান কদমছাঁটকে বললে দেবী চৌধুরানির গলায়—খুলুন দরজা।

'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' গোছের শুকনো হাসি হেসে দরজা খুলে ধরল কদমছাঁট। দৃপ্ত ভঙ্গিমায় পুঁতিবালা ঢুকে গেল ভেতরে।

বোরখার মধ্যে থেকে কিন্তু তার চোখ ঘুরছে মস্ত বড় ঘরটার এদিকে থেকে সেদিকে। জগঝম্প আওয়াজে কানের পরদা ফুটিফাটা হলেও আশ্চর্য হবে না পুঁতিবালা। এ কী পাগলের কারখানা রে বাবা! একদিকে সারি-সারি ভিডিও গেম নিয়ে বিকট বাজনা বাজিয়ে জুয়ো খেলে যাচ্ছে একপাল পুরুষ এবং মহিলা। যত না খেলছে, চেঁচাচ্ছে তার চাইতে বেশি। আর এক পাশে একটা হাঁটু সমান উঁচু মঞ্চে উল্লোল নাচ নাচছে একটি ষোড়শী, গেমরুমের সামনের দরজায় আঁকা ছবির সঙ্গে তার মিল আছে শুধু একটি ব্যাপারে...পাঠক-পাঠিকাদের অনুমানের ওপরেই সে ব্যাপারটা ছেড়ে দেওয়া গেল।

মঞ্চের সামনে বেশ কিছু চৌকোনা টেবিল আর প্রতিটা টেবিলের চারদিকে চারখানা চেয়ারে বসে নানা বয়সি পুরুষরা উৎকট উল্লাসে ফেটে পড়ছে আদিম নৃত্য দেখে—ষড়রিপুর প্রথম রিপুকে যা প্রজ্বলন্ত করার পক্ষে যথেষ্ট।

একজন তরুণ আর সইতে পারল না প্রথম রিপুর অগ্নিদহন। ছিটকে গেল মঞ্চের ওপর! যেন তৈরি হয়েই ছিল ষোড়শী। আঁকাবাঁকা বিজলী রেখার মতো মঞ্চের ওপর তরুণটিকে খেলিয়ে নিয়ে উন্মত্ত অট্টরোল সৃষ্টি করে সাঁৎ করে অদৃশ্য হল পেছনের দরজায়—তরুণটিও তিন লাফ মেরে ঢুকে গেল ভেতরে।

বন্ধ হয়ে গেল দরজা। পরমুহূর্তে আর একটি ললনা পাশের দরজা দিয়ে ছুটে এল মঞ্চে—যেন গেমরুম-এর দরজায় আঁকা ছবির অনুরূপ একটি মূর্তি...শুরু হয়ে গেল হাসি মুখে মদির চোখে আদিম নৃত্য...

এতক্ষণে দম আটকে দেখছিল পুঁতিবালা। বহুবল্লভা পুঁতিবালা! কিন্তু এ হেন রাধাবল্লভী নাচ তাকেও কখনও নাচতে হয়নি।

তোবা! তোবা! বেশ বোঝা যাচ্ছে এই খেলাই চলবে সারারাত। কিন্তু জিরো জিরো গজানন গেল কোথায়? পুঁতিবালা আসবার আগেই গ্রীনরুমে উধাও হয়নি তো একটা চলমান ছবির পেছন-পেছন?

বড্ড উৎকণ্ঠা হয় পুঁতিবালার। বড় আনাড়ি এই দাদাটি। তাই তো একলা ছেড়ে দেওয়া যায় না। সঙ্গে-সঙ্গে থাকতে হয়,—আড়ালে থেকে রক্ষা করতে হয়।

ওই তো...ওই তো গজাননদা! কিন্তু সামনে ওই মেয়েছেলেটা আবার কে? গজাননদার ঝাঁকড়া চুল দেখেই মজেছে মনে হচ্ছে। খুব যে হেসে-হেসে বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে কথার রঙ্গ হচ্ছে! ওই তো চেহারা! কালো! তবে হ্যাঁ, চেহারায় চটক আছে বটে। কালো মেয়েরা একটু 'সেক্সি' হয় ঠিকই। কিন্তু এই ঢলানিটা যেন একটু বেশি রকমের সেক্সি। যৌনতা বুঝি উপচে-উপচে উঠছে পা থেকে মাথা পর্যন্ত—গড়িয়ে-গড়িয়ে নামছে শরীরের খাঁজ খোঁদল বেয়ে পাহাড়ি ঝরনার মতো!

গজাননদা পটে গেল নাকি? মরেছে! তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায় পুঁতিবালা, এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে উদ্দাম নাচ দেখতে থাকে, যেখানে গজাননের চোখ যাবে না—কিন্তু ওদের কথা কানে ভেসে আসবে।

বলছে কী হারামজাদী? অ্যাঁ! নেমন্তন্ন করছে গজাননদাকে। বলছে ছেনালিগলায়—মি: ওয়াভারম্যান, আপনার জন্ম কি হারকিউলিসের ঔরসে? চলুন আমার ঘরে।

পুঁতিবালার ইচ্ছে হল তেড়ে গিয়ে ঠাস করে একটা চড় কষায় আন্নাকালীর গালে। আস্পর্ধা তো কম নয়। গজাননদা বোঝে কি এ সবের? হারকিউলিসের সঙ্গে বাপের তুলনা! এই রাত্রে তাকে ঘরে তোলার মতলব? গজাননদা, গজাননদা, কথার ফাঁদে পা দিও না—মরবে বলে দিলাম। ওই আন্নাকালী তোমাকে খেয়ে ফেলবে।

কী বলছে গজাননদা? হাসছে। হাসিটা কিন্তু বেশ প্যাঁচাল ধারাল। হাজার হোক জিরো জিরো গজানন তো। কায়দা কানুনগুলো প্র্যাকটিস করছে ভালোই।

বলছে হেসে-হেসে—ডার্লিং, আপনার হাজব্যান্ড অ্যাংরি হতে পারেন।

ও:! আবার ইংলিশ ছাড়া হচ্ছে! স্বামী মহাশয় রাগ করবেন বলেই যাওয়ার ইচ্ছে নেই। রাগ না করলেই সুড়-সুড় করে চলে যেতে, তাই না গজাননদা? মাইরি, তোমাদের এই পুরুষ জাতটাকে 'দেবা ন জানন্তি—'

বলে কী কেলে মেয়েমানুষটা? উৎকর্ণ হয় পুঁতিবালা।

আন্নাকালী বলছে, আমার হাজব্যান্ড এখন ডিউটিতে।

এত রাতে?

সারা রাতই তো ওর ডিউটি। তাই সারারাত আমার বড় একা-একা লাগে—ঘরে তো আর দ্বিতীয় প্রাণী নেই। চলুন না—

ডার্লিং, আমি এসেছি দেশ দেখতে—

ও নটি বয়! নতুন দেশের নতুন মেয়েদের আগে দেখতে হয়। আমার দেশকে ভালোবাসি বলেই তো এত ডাকাডাকি, মি: সন অফ হারকিউলিস!

আরে বাস! এ যে দেখছি ছেনালিপনায় মহারানি। গজাননদা, গজাননদা, অমন করে আন্নাকালীর মুখের দিকে চেয়ে আছে কেন?

তারা! তারা! ব্রহ্মময়ী! গজাননদা, তুমিও? তুমিও ওই মেয়ে হ্যাংলাদের দলে?

বিড়বিড় করে আবার কী বলা হচ্ছে আন্নাকালীকেও। পুঁতিবালার কানকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না, গজাননদা, যত আস্তেই বলো না কেন।

কেয়াবাত! গজাননদা, তোমার চোখ এত ধারালো?

খুব আস্তে বললেও কথাগুলো সুস্পষ্ট ধ্বনিত হল পুঁতিবালার কানে—আপনি ড্রাগ অ্যাডিক্ট? হেরোইন খান?

চোখের তারা খুব একটা কাঁপল না আন্নাকালীর।

বললে একই রকম নিনাদী কণ্ঠে—ওটা তো স্ট্যাটাস সিম্বল, মি:...মি:..

হোসেন। মহম্মদ হোসেন।

বুঝলেন কী করে?

আপনার চোখের তারা দেখে। আসলে আন্দাজ মিশিয়ে ঢিল ছুঁড়ছিল গজানন—লেগেছে ঠিক জায়গায়। আমারও ইচ্ছে যায় জিনিসটা চেখে দেখতে।

ও মাই মি: ওয়ান্ডারম্যান। তাহলে চলে আসুন আমার ঘরে। ভয় নেই, আমার গাড়িই আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যাবে হোটেলে।

গেল! গেল! সব গেল! পুঁতিবালা ইচ্ছে করে বোরখার ভেতর থেকেই হাউমাউ করে ওঠে। গজাননদা, ও গজাননদা, তোমার এতটা মতিচ্ছন্ন হয়েছে, জানা ছিল না তো! হেরোইন খাওয়ার শখ হয়েছে! অ্যাঁ! হেরোইন কিঙকে ধরতে এসে হেরোইন চেখে দেখবার শখ হয়েছে! কী চাখতে চাও, গজাননদা! কষ্টিপাথরের মতো কালো ওই ঢলানিটাকে? ওটা তো বাজারের মেয়েরও অধম—ঘরে স্বামী থাকতে পরপুরুষ নিয়ে—ছি:-ছি:-ছি:।

ও কী! একি কাণ্ড! গজাননদা যে ঢলানিটার পেছন-পেছন চলল গো! ওমা কী হবে গো! ওরা যে গাড়ি করে যাবে। পুঁতিবালা সঙ্গে যাবে কেমন করে?

হিল্লে একটা হবেই। পুঁতিবালাও মেয়ে কম নয়। কোথাকার কে এসে গজাননদাকে বাগিয়ে নিয়ে যাবে—সেটি হতে দেওয়া চলবে না।

আন্নাকালীর পেছন-পেছন গ্রেট-গজানন যাচ্ছে অন্য দরজার দিকে। যে দরজা দিয়ে ভেতরে এসেছে—সে দরজা দিয়ে নয়। কেলে ঢলানি এখানকার সব খবরই রাখে তাহলে। ইস। আবার তাঁতের শাড়ি পরা হয়েছে। কালচার তো কচু! পরপুরুষকে নিয়ে রাত কাটাস। তবে হ্যাঁ, শাড়িটা চমৎকার। পছন্দ আছে বটে ঢলানির।

আগে বেরিয়ে যাক দুজনে, ও:! হাঁটছে দ্যাখো, ঠিক যেন কপোত-কপোতী। ঝাড়ু মার পুরুষ জাতটার মুখে। গজাননদার এতখানি অধ:পতন হবে, ভাবতেই পারেনি পুঁতিবালা।

বেরিয়ে গেছে ওরা। বেরোবে পুঁতিবালা। না কোথাও বাধা নেই। হোটেলের পেছনদিকটা যে এত অন্ধকার, কে জানত। অন্ধকারই বা হবে না কেন। যা কাণ্ডকারখানা চলেছে ভেতরে—তাদের জন্যেই তো দরকার অন্ধকারের যবনিকা।

গেল কোথায় দুশ্চরিত্র দুটো? ওই তো...ওই...ওই কিন্তু একটা ছায়া কেন? হরি! হরি! দুজনে গায়ে গা দিয়ে এক হয়ে গেছে। গজাননদাকে হয় হারামজাদী চুমু খাচ্ছে, নয় তো গজাননদাই—

আচম্বিতে গাছের আড়াল থেকে ধেয়ে এল দুটো ছায়ামূর্তি।

ছিটকে সরে গেছে গজাননদা আর আন্নাকালী। আন্নাকালী ছুটছে হরিণীর মতো। কোথায় যাচ্ছে? ওহো। গাড়ি এনেছিল। সেই গাড়িতে উঠে বসে ঝড়ের মতো চালিয়ে দিয়েছে। হেডলাইটের ডবল আলোয় অন্ধকার ছিঁড়েখুঁড়ে মিলিয়ে যাচ্ছে দূর হতে দূরে।

গজাননদাকে দুদিক থেকে ঘিরে ধরেছে দুই আগন্তুক। ঠিক হয়েছে।

বিদেশে এসে বিদেশিনীকে আস্বাদনের বড় শখ হয়েছিল। এখন ঠেলা সামলাও।

বোরখাটা খুলে অলিম্পিক স্পিড দেওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে পুঁতিবালা—প্ল্যান কষা হয়ে গেছে কীভাবে ক্যারাটে ঝেড়ে দুদিকে ছিঁটকে দেবে দুই হানাদারকে, এমন সময়ে...

গম্ভীর গলায় বললে একজন আগন্তুক—মানিব্যাগটা বার করুন।

ব্যাগ বের করে ছুঁড়ে দিল গজানন। সঙ্গে-সঙ্গে ছুঁড়ে দিল নিজেকেও। মরি! মরি! এ সেই বিখ্যাত গজানন লম্ভ। হনুমানও যা দেখে লজ্জা পায়!

মানিব্যাগ লুফবে, না গজাননকে রুখবে? শূন্য পথে ধেয়ে আসছে যে দুটোই। চোখের পলক ফেলতে-না-ফেলতেই ভ্যাবাচ্যাকা আগন্তুকের ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়ল গজানন, তারপর গোঁ-গোঁ একটা আওয়াজ শোনা গেল।

নেতিয়ে পড়ে কাতরাচ্ছে লোকটা। হাত-টাত ভেঙে দিল নাকি গজাননদা? গুণের তো শেষ নেই তোমার। রাগলে চণ্ডাল! উন্মাদ। কী করছ তখন আর খেয়াল থাকে না।

দ্বিতীয় লুঠেরাটা মহা ধড়িবাজ তো! ধরাশায়ী দোস্তের বুকের ওপর থেকে গজাননদা উঠে দাঁড়াতে-না-দাঁড়াতেই তীরের মতো ছুটে এসে অন্ধকারেই ছোঁ মেরে মাটি থেকে কী তুলে নিয়ে ভোঁ দৌড় দিল অন্ধকারে।

কাওয়ার্ড! দুটো মার খেয়ে গেলি না গ্রেট গজাননের হাতে? বাপের নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দিত।

একী! গজাননদা 'আমার মানিব্যাগ' বলে অন্ধকারে বিলীয়মান মূর্তিটার পেছনে তেড়ে যেতেই ভূলুণ্ঠিত আহত লোকটা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

রাম! রাম! এত ভীতু! জিরো জিরোর আসল খেল না দেখেই চম্পট দিলি! এখনও তো তার অ্যাসিস্ট্যান্ট নামেনি আসরে। নরম হাতের গরম ধোলাইয়ে পিত্তি ছরকুটে যেত তোদের!

বোরখাটা পরে দিল পুঁতিবালা। বডি খেলানোর যাও-বা একটা চান্স পাওয়া গেল—মিসড হয়ে গেল।

গজাননদা ফিরে আসছে। পলাতকদের পালাতে দিয়ে ফিরে আসছে।

অন্ধকারে গা-ঢাকা দিল পুঁতিবালা।

দরজা খুলে গেমরুমে ঢুকে গেল গ্রেট গজানন। কিছুক্ষণ পরে ঢুকল পুঁতিবালা। কিন্তু গজাননকে দেখতে পেল না।

বেরিয়ে এল সামনের দরজা দিয়ে। ওই তো করিডোরের মোড় ঘুরে হোটেল অফিসের দিকে যাচ্ছে গজাননদা।

যাক। মানিব্যাগের জন্যে হাল্লাক হয়ে মরুক। যাচ্ছে তো নালিশ ঠুকতে। পুলিশকে খবর দেবে কি?

৪

দিতেও পারে। দাদার প্ল্যানটা ঠিক বুঝে ওঠা যাচ্ছে না। কিঙ-য়ের শহরে পা দিতে না দিতেই এই যে হামলা, একি শুধু মানিব্যাগের লোভে?

মনে তো হয় না।

আড়াল থেকে সব দেখল পুঁতিবালা। অফিস থেকে পুলিশ অফিসেই টেলিফোন করল গজাননদা। তারপর গটগট করে লিফটে চড়ল। পুঁতিবালাও উঠল লিফটে। আড়চোখে তাকে একবার দেখে নিল গজানন। কটমটে চাহনি দেখে মনে-মনে হেসে কুটিপাটি হল পুঁতিবালা। লিফট থেকে সটান নিজের ঘরে ঢুকল গ্রেট গজানন। পুঁতিবালা নিশ্চিন্ত হয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল একতলায়। সেখান থেকে পাতাল ঘরের গেমরুমে।

আসল গেমটাই যে এখনও খেলা হয়নি।

কদমছাঁট এবার তাকে দেখেই একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে শুধু বললে—আবার?

কী আবার? প্রচণ্ড মুখ ঝামটানি দেয় পুঁতিবালা—সার্চ হবে নাকি আবার?

না, না, না, না, বলতে-বলতে দরজা খুলে ধরে পাংশু মুখে বললে কদমছাঁট—যান।

যাব তো বটেই, কিন্তু বোরখাটা রইল এখানে। যাওয়ার সময়ে নিয়ে যাব, কেমন?

—বলেই বোরখা খোলা হয়ে গেল পুঁতিবালার। ছোট্ট চেম্বারে পুঁটলি পাকিয়ে ফেলে ঝাঁ করে ঢুকে পড়ল গেমরুমে।

সত্যিই! শেষ নেই ওই আদিম নাচের! এখনও মঞ্চে চলছে সেই একই উদোম লীলা। জঘন্য!

ওভাবে পুরুষ মজাতে সবাই পারে। পারবি পুঁতিবালার মতো? এই দ্যাখ!

কটিতে আর বক্ষদেশে যার সামান্যতম বস্ত্রের আবরণ, এহেন লাস্যময়ীর দিকে মুনি ঋষিরও দৃষ্টি চলে যায়। পুঁতিবালাও চুম্বকের মতো ঘরসুদ্ধ লোকের নজর কেড়ে নিল চক্ষের নিমেষে।

কিন্তু পুঁতিবালার নজর কাড়ল কে?

একজন পুলিশ অফিসার। বয়েস চল্লিশের ওপরে। সেই কারণেই শিকার ভালো।

তাছাড়া পুলিশের লোক। হাতে রাখাও দরকার।

বার কাউন্টারে হাতে স্কচ হুইস্কি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল ব্রোঞ্জ মূর্তির মতো সেই অফিসার। বেশ চেহারা। পছন্দ হয় পুঁতিবালার।

চোখে-চোখে আমন্ত্রণ বিনিময় হয়ে যায় তৎক্ষণাৎ। কাছে এগিয়ে যায় পুঁতিবালা।

এক গেলাস 'জিন উইথ লাইম অ্যান্ড বিটার' চেয়ে নিয়ে চুমুক দিয়ে চোখ রাখে পুলিশ অফিসারের চোখের ওপর।

নেশা জড়ানো চোখ নয়। বেশ হুঁশিয়ার। কর্তব্যেনিরত নি:সন্দেহে।

গেলাসটা চোখের সামনে তুলে ধরে মদিরার ফিকে হলুদ রংটা দেখতে-দেখতে যেন আপনমনেই বলে পুঁতিবালা—আমার নাম রাজিয়া সুলতানা। আজ এসেছি। তিনশো দু-নম্বর ঘর। একা। সঙ্গ পেলে বাঁচি।

যাচ্ছি, বলে গেলাসটা এক চুমুকে শেষ করে দিল পুলিশ অফিসার। খর নজর কিন্তু পুঁতিবালার ওপর।—আমার নাম আমিনুল হক। ডি আই জি। চলুন।

এক চুমুকে গেলাস শেষ করে দিয়ে কাউন্টারে রুম নাম্বারটা বলে দিল পুঁতিবালা। পেমেন্ট হবে বিলে। বডি খেলানোর সুযোগটাকে পুরোপুরি কাজে লাগানোর উদগ্র অভিপ্রায় নিয়ে অগ্রসর হল দরজার দিকে।

ছোট্ট কোর্টশিপ। পাঠক-পাঠিকারা ক্ষমা করবেন। পুঁতিবালার মতো মেয়েরা এসব মামুলি ব্যাপারে নাহক সময় খরচ করতে রাজি নয়।

পরের দিন ডি আই জি আমিনুল হকের সামনে এসে বসল গ্রেট গজানন।

বলল—আমিই ফোন করেছিলাম আপনাকে। আমার মানিব্যাগ চুরি গেছে কাল রাতে।

গম্ভীর গলায় বললে, ব্রোঞ্জ মূর্তি—হোটেল অফিস থেকেও কমপ্লেন এসেছে। কিন্তু আপনি হোটেলের পেছনে গেছিলেন কেন?

ব্যক্তিগত ব্যাপার।

মৃদু কঠিন হাসল, ব্রোঞ্জ মূর্তি—তাহলে আপনার মানিব্যাগ খোয়া যাওয়ার ব্যাপারটাকেও ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে ধরতে পারেন। সরি, আপনি আসতে পারেন।

গ্রেট গজাননের মাথায় চড়াত করে রক্ত উঠে গেল কথাটা শুনেই। তারপরের কথাটা শুনেই কিন্তু রক্ত নেমে গেল মুখ থেকে।

কেটে-কেটে বললে, ব্রোঞ্জ মূর্তি—জিরো জিরো গজানন, ছেষট্টি পাউন্ডের অর্ধেক যদি আমাকে দিয়ে যান, তাহলে আপনাকে হেল্প করতে পারি।

কিছুক্ষণ সব চুপ। চোখে-চোখে চেয়ে দুই বড় খেলোয়াড়।

তারপর আশ্চর্য শান্তগলায় বললে গজানন—

সব জানেন?

জানাটাই আমার কাজ।

কিওয়ের ঠিকানা?

এখনও জানি না। তবে জানতে পারব। আপনার পেছনে লেগে থাকলেই জানতে পারব। কেননা, কিঙ আপনার পেছনে লেগেছে।

এত তাড়াতাড়ি?

তাই তার নাম কিঙ। আপনার নিস্তার নেই, গ্রেট গজানন। মরবেনই। হয় তার হাতে, আর না হয়—একটু থেমে খুব আলতোভাবে—আমার হাতে।

চেয়ে রইল গজানন। সর্ষের মধ্যেই ভূত থাকে—সুতরাং তার চোখের পাতা কাঁপল না।

বললে, ছেষট্টি পাউন্ডের অর্ধেক দেব না। দশ পাউন্ড বড় জোর।

তেত্রিশ পাউন্ড।

না।

তাহলে আগে পুঁতিবালার নাচ দেখবার জন্যে তৈরি হোন।

পুঁতিবালা। এবার কিন্তু আর চমকানি আটকাতে পারে না গজানন—সে কোথায়?

এখন বলা যাবে না। তেত্রিশ পাউন্ড।

বিশ পাউন্ড।

তেত্রিশ পাউন্ড।

ও-কে, ও-কে। রাজি। পুঁতিবালা কোথায়?

এখন বলা যাবে না।

কিঙ কোথায়?

আগে বলুন হোটেলের পেছনে কেন গেছিলেন?

এক মহিলার আমন্ত্রণে।

কী নাম তার? কীরকম দেখতে?

খুব কালো। দারুণ স্মার্ট। বিউটিফুল ফিগার। হেরোইনের নেশা আছে। তাই তার সঙ্গ ধরেছিলাম।

খুব কালো! দারুণ স্মার্ট! বিউটিফুল ফিগার! হেরোইনের নেশা আছে! নাম কী বলেছিল?

মমতাজ সিরাজ!

বিসমিল্লা!

চেনেন?

আপনি যে হোটেলে উঠেছেন, তার মালিকের বেগম।

জয় মা কালী!

গ্রেট গজানন।

জিরো জিরো গজানন।

ইয়েস, ইয়েস, আপনি আজ রাতে আবার গেমরুমে যাবেন?

সে কি আর আসবে?

দেখা যাক।

তা এল বইকী মমতাজ। স্বপ্নিল চোখে হেরোইনের আভাস ফুটিয়ে সে আবার আমন্ত্রণ করল গজাননকে। গতরাতের ঘটনা প্রসঙ্গে শুধু বললে, ভয়ে পালিয়ে গেছিলাম, মি: ওয়ান্ডারম্যান! অন্ধকারের উৎপাতদের আমার বড় ভয়।

কাজেই মমতাজের গাড়ি চেপে গজানন গেল শহর থেকে দূরে নিরালা একতলা বাড়িটায়।

পুঁতিবালা তখন কোথায়?

ফাইভ স্টার হোটেলে অন্তত নেই। ব্রোঞ্জ মূর্তি যখন একটু ঘুমিয়ে ছিল, তখন ঘুমের ঘোরে সে উচ্চারণ করেছিল শুধু একটি কথা—পুঁতিবালা, মার্ভেলাস!

ব্যস, ভোর হতেই বিদেয় হল পুলিশ অফিসার। তারপর হাওয়া হয়ে গেল পুঁতিবালা।

হে পাঠক! হে পাঠিকা! আসুন এবার গজাননের পেছনে। দেখুন তার আজব কীর্তি।

মমতাজ গাড়ি চালায় ভালো। বাংলাদেশে বিলিতি গাড়ির ছড়াছড়ি এখন। মমতাজের গাড়ি নির্মিত জাপান দেশে। টয়োটা।

দরজা খুলে প্রথমে গজানন উঠেছিল ভেতরে। উঠেই দেখে নিয়েছিল সিটের তলায় খাঁজের মধ্যে, পয়েন্ট থ্রি এইট স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন রিভলভারটা গোঁজা আছে কিনা।

আছে। নিশ্চিন্ত হয়েছিল গজানন। এ কাজটা তাকে করতে হয়েছে মমতাজের অজান্তে। গেমরুমে রিভলভার নিয়ে ঢোকা অনুচিত। ধরা পড়ে যেতে পারে। তাই টয়লেটে ঘুরে আসার নাম করে সটান গেছিল নিজের ঘরে। রিভলভারটা নিয়েই দৌড়ে গেছিল হোটেলের পেছন দিকে—যেখানে আছে মমতাজের গাড়ি। গাড়িটা কী ধরনের গত রাতেই তা দেখে রেখেছিল গ্রেট গজানন। দরজায় চাবি লাগানোর অভ্যেস নেই মমতাজের, তাও লক্ষ করেছিল চকিতে। দুই আততায়ী তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে মমতাজ ছুটে গিয়ে এক ঝটকায় দরজা খুলে উঠে বসেছিল সিটে—সবই দেখেছে জিরো জিরো। তাই রিভলভার লুকিয়ে রাখার প্ল্যানটা আগে থেকেই রেখেছিল মগজের মধ্যে।

নিজে যে সিটে বসবে এখুনি, সেই সিটের তলায় রিভলভার আর কিছু বাড়তি বুলেট রেখে অন্ধকারেই ফের মিশে গেছিল গজানন। ফিরে এসেছিল গেমরুমে।

তারপর সেই একই কথার চর্বিতচর্বণ। একই কথার ছেনালিপনা। একই কথা নিয়ে ঢলাঢলি। উস্কে দিয়েছে গজানন এবারে। মমতাজ সে রাতে ডিপ ব্লু শাড়ি পরেছে। খুবই মিহি শাড়ি। অত্যন্ত হালকা। তার আশ্চর্য কালো তনু ঘিরে গাঢ় নীল বসন আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে যৌনতাকে। হেরোইন সেবন কি আজ মাত্রা ছাড়িয়েছে? যেন একটু বেশি বকছে মমতাজ। একটু যেন বেশি প্রগলভা। ক্ষণে-ক্ষণে গজাননের গায়ে গা দিচ্ছে, গালে গাল ঠেকাচ্ছে, চোখের সঙ্কুচিত তারা কাম-টু-দ্য-বেড আমন্ত্রণ জানিয়ে চলেছে।

গজানন ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুমান করেছে, অভিযান পৌঁছেছে সম্ভবত অন্তিম পর্বে। আমিনুল হক নামধারী পুলিশ অফিসার যখন হিরোইন কারবারে লিপ্ত এবং কিঙয়ের হদিশ জানতে আগ্রহী—তখন হোটেল মালিকের ব্যাভিচারিণী বউকে নিয়ে তার নিরালা আলয়ে গেলে প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়তে পারে।

প্রাণ দিতে প্রস্তুত গজানন। মেন্টাল ক্লিনিকের ডাক্তারবাবু শাঁখের আওয়াজের মতো গলাবাজি করে তাকে বলেছিলেন—গজানন, দেশের জন্যে তোমার ট্যালেন্টকে কাজে লাগিও—নিজের জন্যে নয়।

গজানন আজ তাই এক্কেবারে বেপরোয়া। যে নরাধমরা হেরোইন প্রবেশ করাচ্ছে, ইন্ডিয়ার রন্ধ্রে-রন্ধ্রে, যুবসমাজকে মেরুদণ্ডহীন করে ছাড়ছে—তাদের পালের গোদাকে সে জবাই করবে নিজের হাতে। একটার পর একটা খুন করে যাবে। সে যে রেগেছে, তার প্রমাণ রেখে দেবে রক্তগঙ্গার মধ্যে। যদি নিজের রক্তও মিশে যায় তার মধ্যে—মিশুক। কেউ তো কাঁদবে না। এক-আধফোঁটা চোখের জল হয়তো ফেলত পুঁতিবালা, সে ছুঁড়িও তো নিপাত্তা। কেনই বা এসেছিল পেছন-পেছন। আমিনুল যদি তাকে কবজা করে থাকে—তাহলে সর্বনাশ।

গজানন সে চেষ্টাও করবে বলে ঠিক করেছিল, আমিনুলের কাছ থেকে ঠিকানা বের করবেই পুঁতিবালার।

কিন্তু তার আর দরকার হয়নি।

পুলিশ অফিস থেকে ফিরে হোটেলে ঢুকতে যাচ্ছিল গজানন—আজই সকালবেলা। গাড়ি পার্ক করার জায়গায় ঝাড়ন হাতে দাঁড়িয়েছিল একটা ছেলে। ময়লা গাড়ি ঘষে সাফ করে দেয়। বিনিময়ে নেয় সামান্য দক্ষিণা।

গজানন গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াতেই ছেলেটা একগাল হেসে দাঁড়াল সামনে।

হাসি দেখে পিত্তি জ্বলে গেছিল গজাননের—কী চাই? গাড়ি মুছতে হবে না।

নীরবে একটা চিরকুট এগিয়ে দিয়েছিল ছোকরা। তাতে মেয়েলি হাতে লেখা—দাদা গো দাদা মমতাজকে নিয়ে কাদা! আমিনুলকে সাবধান—সে জানে তোমার নামধাম!

ছড়া পড়েই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছিল গ্রেট গজানন। ছড়া লেখা হচ্ছে! ছড়া লেখবার সময় এটা! ফাজিল ডেঁপো মেয়ে কোথাকার! কোথায় একটু পাশে এসে দাঁড়াবে, তা না আড়ালে টিটকিরি দিচ্ছে মমতাজকে নিয়ে ফষ্টিনষ্টি করা হচ্ছে বলে। বেশ করছে গজানন, আলবত করবে, একশোবার করবে। তুই পুঁতিবালা, তুই কি কম যাস? কাজের ফিকিরে যত অকাজ আছে—সবই তো করিস। গজানন না হয় দেশের জন্যে, দশের জন্যে মমতাজকে নিয়ে একটু খেলবে।

কিন্তু কোথায় গেল ফচকে মেয়েটা? চোখ পাকিয়ে ছোকরাকে শুধোয় গজানন—চিঠি কার কাছে পেলি?

ওই তো ওখানে দাঁড়িয়ে...যা:! চলে গেছে। আপনাকে তো চিনিয়ে দিল।

ননসেন্স! বলে হনহন করে হোটেলে ঢুকে গেছিল গজানন। নিশ্চিন্ত হয়েছিল অবশ্য পুঁতিবালার ব্যাপারে। আমিনুল তার টিকি ধরতে পারেনি নিশ্চয়। স্রেফ হুমকি দিয়েছিল গজাননকে।

পুঁতিবালা এই মুহূর্তে স্বাধীন। ও মেয়ে সব করতে পারে। ওর কাছে বিদেশের মাটি আর স্বদেশের মাটির মধ্যে কোনও তফাত নেই। ও জানে শুধু পুরুষ মানুষ আর নিজের বডির যাদুশক্তি। ভক্তি-শ্রদ্ধা, এমনকী একটু ভয়ও করে বটে—এই দাদাটিকে। গজাননদার অকল্যাণ হবে জানবে তা রুখতে দুনিয়ার হেন অপকর্ম নেই—যা ওর অসাধ্য।

মমতাজ চালিত টয়োটায় বসে এইসব কথাগুলোই আর একবার ভেবে নিল গজানন। অ্যাসিস্ট্যান্ট একটা বানিয়েছিল বটে। গুরুকেও বোকা বানায়। বেপারীটোলা লেনে যদি জান নিয়ে ফিরতে পারে, কান ধরে এমন একটা চড় লাগাবে...

ব্যাকভিউ আয়নায় দেখা গেল একটি গাড়ির সাইডলাইট। বেশ দূরত্ব বজায় রেখে আসছে গাড়িটা। ফলো করছে কে? আমিনুল না পুঁতিবালা? গেমরুমে আজকে ব্রোঞ্জমূর্তিটাকে দেখা যায়নি। তাই বলে গজাননকেও নিশ্চয় নজর ছাড়া করেনি। হেরোইন কিঙের ঠিকানার লোভে হয়তো আসছে পেছন-পেছন।

গজানন যদি দূরদর্শনের শক্তি লাভ করত সেই মুহূর্তে, তাহলে অবশ্য দেখতে পেত অন্য দৃশ্য।

চুপি-চুপি গাড়ি চালিয়ে আসছে তারই সাকরেদ পুঁতিবালা!

আমিনুল হক ওঁৎ পেতে আছে বনানীর মধ্যে সেই নিভৃত আলয়ে—যেখানে বৃন্দাবনলীলা চলেছে প্রতি রাতে। মমতাজ সুন্দরী যেখানকার অকথ্য নায়িকা।

গাড়ি চালাচ্ছে এই অতৃপ্ত কামনাময়ী। শ্যাম্পু করা ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা চুল উড়ছে হাওয়ায়। সারি-সারি মিটার থেকে বিচ্ছুরিত আলো পড়েছে তার চিবুকের নিচ থেকে ওপরের দিকে। আলো আর ছায়ায় নিখুঁত কালো মুখটা অপরূপ শুধু নয়, আশ্চর্য লাবণ্যে ভরা বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু পাতলা কাজল ছাওয়া চোখে সে যখন মদির কটাক্ষ হানছে, ঈষৎ স্ফীত নাসারন্ধ্র আর উত্তাল বুকে অবদমিত বাসনাকে জাগ্রত করছে—তখন আর শুধু তাকিয়ে দেখা যায় না তাকে...ইচ্ছে যায়...

ইচ্ছে যায়...

এই প্রবল ইচ্ছেটাকেই প্রবলতম সংযম দিয়ে রুখতে-রুখতে চলেছে বেচারা গজানন। খাই-খাই মেয়েমানুষদের সামাল দেওয়া যে কঠিন হাড়ে-হাড়ে তা মালুম হচ্ছে। একে তো ব্যাচেলার তার ওপর লেডি কিলারদের পাঠশালাতেই পড়েনি। সুতরাং নিজেকে সামলে রাখতে গিয়ে মাথা গরম করে ফেলছে। মাথা গরম হয়ে গেলেই ভায়োলেন্ট হতে ইচ্ছে যাচ্ছে। তাতেও তো সুস্থ বোধ করে গজানন। ভগবান কেন যে মেয়েমানুষ জাতটাকে সৃষ্টি করেছিল। দূর। দূর!

বনের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে গাড়িটা চলেছে কোথায়? সতর্ক হয় গজানন।

ভুজঙ্গিনী ভঙ্গিমায় ঘাড় বেঁকায় মমতাজ—ভয় করছে, মি: ওয়ান্ডারম্যান?

না। ভাবছি, এতটা পথ আপনিই আবার ড্রাইভ করে হোটেলে ছেড়ে দিয়ে আসবেন তো?

অসুবিধে নেই। রাত জাগার অভ্যেস আছে আমার।

আমার নেই।

একরাশ কাচের বাসন ভেঙে গেল যেন। বাব্বা। কি হাসি। বুক ছলাৎ করে ওঠে।

গাড়িটাও ব্রেক কষল সঙ্গে-সঙ্গে—আসুন মি: ওয়ান্ডারম্যান, এই আমার কুটির।

গাড়ি থেকে নেমে তাকিয়ে দেখল গজানন। চারপাশে বড়-বড় গাছ। মাঝে একটু ফাঁকা জায়গা। তার মাঝে একতলা বাড়ি। একদম সাদা। ঠিক যেন ফ্রেমে বাঁধানো একটা ছবি।

অন্ধকার যে, মৃদুস্বরে বলে গজানন—ইলেকট্রিসিটি নেই?

জেনারেটর আছে। চলুন।

নুড়ি মাড়িয়ে গেট খুলে মমতাজ সুন্দরী গেল আগে-আগে—পেছনে অতি হুঁশিয়ার গজানন। চোখ ঘুরছে ডাইনে-বাঁয়ে সামনে-পেছনে। যে-কোনও মুহূর্তে একটা বুলেট উড়ে আসতে পারে—গজাননের ভবলীলা সাঙ্গ হতে পারে। বনেবাদাড়ে কে আসছে খোঁজ করতে?

গজানন না জানলেও যে আসবার সে ঠিক এসে গেছিল।

পুঁতিবালা। দূরে গাড়ি রেখে বনের মধ্যে দিয়ে নি:শব্দ সঞ্চারে ছুটেও এসেছিল। আর...

সতর্ক চাহনি মেলেও গ্রেট গজানন যাকে দেখতে পায়নি—তাকে ও দেখেছিল।

আমিনুল হক। সেই ব্রোঞ্জ মূর্তি। অন্ধকারেই চিনেছে পুঁতিবালা। অন্ধকারেই তো চিনবে। অন্ধকারেই তো মানুষ চেনা যায়। অন্তত পুঁতিবালারা চিনতে পারে।

তাই আমিনুল হকের পেটাই মুখাবয়ব দেখেই গা শিরশির করে উঠেছিল পুঁতিবালার। ভয়ে নয়,—রোমাঞ্চে। সুখকর স্মৃতির রোমাঞ্চে!

দূর থেকে চোখ রাখল দুই পুরুষের ওপর। গজানন আর আমিনুল। কালো কষ্টিপাথরটাকে অত না দেখলেও চলবে। হারামজাদী ভুলিয়ে ভালিয়ে ঠিক নিয়ে এসেছে জিরো জিরোকে। শয়তানি ঢলানি! ফুলে-ফুলে মধু খাও বলে গজাননদাকে ধরে পার পেয়ে যাবে ভেবেছ?

আর গজাননদা, তোমাকেও বলিহারি যাই। হেরোইন অন্বেষণে এসে মানবী-হেরোইনের ফাঁদে ধরা পড়লে। ও রাক্ষসী তোমাকে যে গিলে ফেলবে।

তবে হ্যাঁ, পুঁতিবালা যখন এসে গেছে—

আলো জ্বলে উঠেছে বাংলোবাড়িটায়। জেনারেটরের আওয়াজ হচ্ছে। আলো জ্বলছে শুধু একতলার ঘরটায়। আমিনুল হক গুঁড়ি মেরে এগোচ্ছে আলোকিত জানলার দিকে।

মরণ আর কী! উঁকি মেরে দেখার শখ হয়েছে। কাল রাতেও কি শখ মেটেনি। মুখে ঝাড়ু তোমার...

গজানন আর মমতাজ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। হেরোইনের নেশা বেশ চেপে বসেছে সুন্দরীর মগজে। চোখের আবেশ অতন্দ্র সমুদ্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কালো সমুদ্র।

হুঁশিয়ার হয়েছে গজানন। এ মেয়ে এই মুহূর্তে সব করতে পারে।

[illegible] শাড়ির দিকে নজর নেই মমতাজের। কাঁধের ওপর থেকে কোনওকালে আঁচল খসে পড়ে লুটোচ্ছে পায়ের কাছে। পীবর বুক মিশিয়ে দিয়েছে গজাননের কপাট বুকে। দুই হাত তার গজাননের দুই কাঁধে। ঠোঁট উঁচিয়ে ধরেছে গজাননের ঠোঁটের কাছে। চোখের তারায় আকুল আমন্ত্রণ।

কিস মি, ওয়ান্ডারম্যান, কিস মি। গলার মধ্যে ঝোড়ো হাওয়ার চাপা হাহাকার।

গজাননকে এখন একটু অ্যাকটিং করতে হবে। উপায় নেই। এই একটি সূত্র ধরেই তাকে এগোতে হচ্ছে। এখানে না হলে অন্যত্র চেষ্টা চালাবে।

মমতাজ, উত্তমকুমার ঢঙে বললে গজানন। কণ্ঠস্বরটা বেশ গুরুগম্ভীর শোনাচ্ছে বটে।

হোসেন সাব।

জানি। সাদা গুঁড়ো চাখবে।

আছে—সামান্য।
সামান্য কেন?
আমার কাছে তো থাকে না।
তবে কার কাছে থাকে?
সোজা জবাব দিতে গিয়েও কথা ঘুরিয়ে নিল মমতাজ—
তার কাছ থেকে নিয়ে আসতে হয়। না গিয়েও পারি না। নেশা ধরিয়েছে সে—চালান দেবেও সে—বিনিময়ে নেবে আমার সর্বস্ব।
সে কে?
সে কে? অদ্ভুত হাসি ফুটে ওঠে—সে আমার সব।
নাটক রাখো মমতাজ, সামান্য কড়া হয় গজানন—আমি যদি নেশায় পড়ি—পড়তেই তো চাই—ব্যাচেলারের একটা নেশা তো চাই। তখন কে জোগান দেবে আমাকে?
আমি, নিবিড় হয় মমতাজের বাহুবন্ধন। আমি তো জানি। আমার মধ্যে থেকেই তুমি পাবে সব সুখ, সব শান্তি, সব নেশা।
যদি সে চালান বন্ধ করে দেয়?
তোমাকে দিলেও আমাকে না দিয়ে পারবে না। মমতাজের গলার স্বর ক্রমশ আরও মথিত হচ্ছে। চোখের তারায় অমানিশা গাঢ়তর হচ্ছে!
স্বর তীব্র করে গজানন—কেন, তুমি কি তার হাতের পুতুল?
একরকম তাই। নাও, স্টার্ট।...
হাত দিয়ে মমতাজের চিবুক ঠেলে সরিয়ে দিল গজানন—তোমার মতো ব্ল্যাক বিউটিকে হাতের পুতুল করতে পারে—সে কে?
সে যে আ-মার গড, এক হাত গজাননের কাঁধ থেকে নামিয়ে নিজের শাড়ি ধরে মমতাজ। শক্ত মুঠিতে হাতের কবজি চেপে ধরে গ্রেট গজানন।
তোমার গড তো একজনই—তোমার স্বামী।
গডফাদার...গডফাদার—
ঠিক এই সময়ে ঝপ করে নিভে গেল ঘরের আলো। স্তব্ধ হল জেনারেটরের শব্দ। সবলে গজাননকে জাপটে ধরে জড়িত ভয়ার্ত স্বরে মমতাজ বলে উঠল—নুরুল হাসান এসে গেছে। ও গড।...
সে কী আলিঙ্গন। অন্ধকারে ঝটাপটি। নাগিনীর বাহুপাশ থেকে মুক্তি পাওয়ার আপ্রাণ প্রয়াস। এরই মাঝে ঘটে গেল অঘটন।
মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল গজাননের। জ্ঞান হারাল সঙ্গে-সঙ্গে।
জ্ঞান ফিরে পেয়ে গজানন দেখল, আমিনুল হকের ব্রোঞ্জ মূর্তি ঝুঁকে রয়েছে তার ওপর। গজানন চোখ মেলতেই সরে গিয়ে বসল একটা চেয়ারে। হাতে রিভলভার।
গজানন পড়ে মেঝেতে। মাথার ওপর জ্বলছে আলো, আওয়াজ শোনা যাচ্ছে জেনারেটরের।
গজানন বললে, কী ইয়ার্কি হচ্ছে? মাথায় মারল কে? আপনি?
হাতের রিভলভারের কুঁদো দেখাল আমিনুল—মুখে কিছু বলল না।
গজানন বললে, ভারি চোয়াড়ে লোক তো আপনি। অমনি করে মাথায় মারে? ভাগ্যিস একেবারে অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম—নইলে দেখতেন খেলাটা।
মাথায় চোট পড়লেই বুঝি আপনি খেলেন ভালো? [illegible] হেসে বলল ব্রোঞ্জ মূর্তি।
লোকে তাই বলে। তখন আমার আর কিছু মনেই থাকে না।
বটে! বটে! মাথায় চোট পড়লে আর কিছু মনে থাকে না। তাই না?

তাই তো বললাম, মি: ফোর টোয়েন্টি।

ফোর টোয়েন্টি। আমি?

তা ছাড়া আর কে?

মমতাজ মাথায় চোট মেরেছিল নাকি?

না তো...।

নিশ্চয় মেরেছিল। তারপর আর কী করেছেন, মনে নেই।

কী করেছি? কী মনে নেই? শঙ্কিত হয় গজানন। মেন্টাল ক্লিনিক থেকে বেরোনোর পর ইস্তক এমন অঘটন তো আকছার ঘটছে। না জানি কী করে ফেলল এখানে। অন্ধকারে ঝটাপটির সময়ে অবশ্য হাত চালিয়েছিল গজানন—মমতাজও কী হাত চালিয়েছিল? মাথায় কি মেরেছিল?

গুলগুল চোখে তাকায় গজানন—কী হয়েছে বলুন তো?

জানেন না?

এক্কেবারে না?

লায়ার! মিথ্যুক! উঠে পড়ুন। বেচাল দেখলেই গুলি চালাব। ক্র্যাকশট আমিনুল হক ন'টা মেডেল পেয়েছে গুলি চালানোয়—খেয়াল থাকে যেন।

থাকবে, থাকবে, ভূমিশয্যা ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে বললে গজানন—কী করে ফেলেছি, আগে দেখান।

পাশের ঘরের দরজা খোলা আছে। চৌকাঠ থেকে দেখুন, ভেতরে ঢুকবেন না।

তিন পা যেতেই পাশের ঘরের দরজা। উঁকি মারবারও দরকার হল না। বীভৎস দৃশ্যটা অতিশয় প্রকট দরজার বাইরে থেকেই।

মেঝে থেকে ইঞ্চি ছয়েক উঁচু একটা লাল রঙের ডিভান জাতীয় মখমল শয্যা। তার ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে মমতাজ। দু-পা দু-পাশে ছড়ানো। চোখের তারা খোলা।

ডিপ ব্লু শাড়িটা দিয়ে তার দেহটাকে ঢাকা দেওয়া হয়েছে। স্পষ্টত ওই আবরণ ছাড়া তার দেহে আর কোনও আবরণ নেই।

শিউরে ওঠে গজাননের মতো মানুষও। এই তো কিছুক্ষণ আগে প্রাণস্পন্দনে স্পন্দিত ছিল ছন্দমাধুরীতে ভরা ওই দেহটা।

এইটুকু সময়ের মধ্যে প্রাণপাখি উড়ে গেল দেহপিঞ্জর ছেড়ে। কীভাবে? কেন?

অনুক্ত প্রশ্নের জবাবটা এল পেছন থেকে—ধর্ষণ এবং মৃত্যু। জিরো জিরো গজানন, এই একটা চার্জেই আপনাকে আমি ফাঁসাব।

আস্তে-আস্তে ঘুরে দাঁড়াল গজানন। চোখমুখ হাত-পা সব প্রশান্ত।

আমি করেছি?

প্রত্যক্ষ প্রমাণ আদালতে হাজির করব।

তেত্রিশ পাউন্ড পেলেও?

পথে আসুন। কিঙ-এর ঠিকানা?

জানি না।

নির্নিমেষে চেয়ে রইল ব্রোঞ্জ মূর্তি—ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখেছি মানিব্যাগের মধ্যে।

মানিব্যাগ পেয়েছেন?

কথার জবাব দিল না ব্রোঞ্জ মূর্তি—গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে চলুন।

টয়োটা?

হ্যাঁ।

চলুন।

জেনারেটর নিভিয়ে দিয়ে গজাননের পেছন-পেছন বেরিয়ে এল আমিনুল হক। জিরো জিরো বোকা নয়। ক্র্যাকশট এবং ন'টা মেডেল পাওয়া বন্দুকবাজের সঙ্গে চ্যাংড়ামি করতে যাওয়া হঠকারিতা, তা কি সে জানে না!

তা ছাড়া, টয়োটার সিটের তলায় আছে তার পয়েন্ট থ্রি এইট। সিটটায় আগে বসতে হবে, তারপর...

বাড়ি এখন অন্ধকার। টয়োটার পেছনের সিটে আগে উঠে বসল আমিনুল হক। তারপর রিভলভার নির্দেশে সামনের সিটে ওঠাল গজাননকে। দুহাত মাথার ওপর তুলে বসল স্টিয়ারিং হুইলের সামনে। কলের পুতুলের মতো আমিনুলের হুকুম তামিল করে গাড়ি বের করে আনল বনের মধ্যে থেকে। হাইওয়েতে উঠে গাড়ি যখন স্পিড নিয়েছে, তখন পেছন থেকে বললে আমিনুল—মমতাজের লাশের কাছাকাছি আপনার লাশ ফেলাটা ঠিক হত না। ঘরের মধ্যে রক্ত ছড়াতেও চাইনি। এবার তৈরি হতে পারেন।

আমার অপরাধ। তৈরি হয়েই বললে গজানন। তবে সে তৈরিটা কী ধরনের, আমিনুল যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারত...

কুকর্মের সঙ্গী রাখতে নেই, জানেন তো?

ভালো করেই জানি। আমিও একা অপারেট করি।

এবার একাই বেহেস্তে যান। জাহান্নমেও যেতে পারেন।

আমার অপরাধ?

মমতাজকে ধর্ষণ এবং হত্যা।

মিথ্যে কথা।

হেরোইন স্মাগলিংয়ে আপনিও অংশীদার। কিংয়ের ঠিকানা জেনেই আপনি এসেছেন—

মিথ্যে কথা।

মমতাজও সে ঠিকানা জানত বলে আপনি তাকে খুন করেছেন।

এবার এক সেকেন্ড বিরতি দিয়ে প্রশ্ন করল গজানন—মমতাজ জানত ঠিকানাটা?

আলবত জানত।

আপনিই তাকে ধর্ষণ করেছেন এবং খুন করেছেন—পেট থেকে ঠিকানাটা জেনে নিয়েই—

এতগুলো কথা লিখতে যতটা সময় গেল, তার চাইতে অনেক কম সময়ে ঘটে গেল অনেকগুলো ঘটনা।

আচমকা ছোট্ট ব্রেক কষল গজানন। আমিনুলের রিভলভারের নলচে ঠেকানো ছিল তার মাথার পেছনে। সামান্য হুমড়ি খেল আমিনুল। নলচে সরে গেল লক্ষ্য থেকে। গজানন এক হাত দিয়ে রিভলভারসুদ্ধ কবজি চেপে ধরল অমানুষিক শক্তি দিয়ে (মাথায় চোট বৃথা যায়নি)—আর এক হাত দিয়ে সিটের তলা থেকে পয়েন্ট থ্রি এইট বের করে সটান গুলি করল আমিনুলের রগ লক্ষ্য করে।

স্টিয়ারিং হুইল ছাড়া গাড়ি তখন এলোমেলোভাবে ছুটছে, পথ থেকে নেমে পড়ছে। একটা গাছের গুঁড়িতে ধাক্কা মেরে উলটে গেছে।

হাঁচোড়-পাঁচোড় করে জিরো জিরো বেরিয়ে এল ভাঙা দরজায় প্রচণ্ড লাথি কষিয়ে। ভাঙা কাচে কপাল কেটে রক্ত পড়ছে। স্টিয়ারিং হুইল বুকে চেপে বসে পাঁজরা গুঁড়িয়ে দেয়নি, এই রক্ষে।

ক্যাঁচ করে একটা গাড়ি ব্রেক কষল পাশে।

থাক, থাক, রিভলভার আর লুকোতে হবে না! এই তো মুরোদ! আমি না থাকলে এতটা পথ যেতে কী করে! নাও, উঠে বসো।

পুঁতিবালা! ডিসিপ্লিন ব্রেক করেছিস। কে তোকে এখানে আসতে বলেছে? তোর চাকরি আর নেই।

নেই তো নেই। ঝটপট উঠে বসো। কে কোন দিক দিয়ে এসে পড়বে। এটা হাইওয়ে।

সুবোধ বালক হয়ে গেল গ্রেট গজানন। গাড়ি উড়ে চলল ফাঁকা রাস্তা বেয়ে। পুঁতিবালার এলো চুল লেপটে যাচ্ছে চোখেমুখে। আজ সে এসেছে রণরঙ্গিনী মূর্তিতে। পরনে টাইট জিনস প্যান্ট আর শার্ট।

বল, কেন এসেছিস? গর্জে ওঠে গজানন।

তোমার মুরোদ দেখতে, মিটি-মিটি হাসছে পুঁতিবালা—ঠিকানা পেয়েছ?

কার?

কিঙের।

না।

হ্যাঁ।

বলছি না।

আমি বলছি হ্যাঁ। আলো নেভবার সঙ্গে-সঙ্গে মমতাজ কী বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল?

তুই সব দেখেছিস?

পেছনের জানলা থেকে।

দ্যাখ পুঁতিবালা, মেয়েটা এত বজ্জাত—

সাফাই গাইতে হবে না, গজাননদা। তোমার সব খেলাই আমি দেখছি। ছি:-ছি:-ছি:। কী নাম বলেছিল মমতাজ?

নাম? নাম?

বলো, বলো, মনে করবার চেষ্টা করো—

মাথায় এমন মারল—

ঠিক তার আগে কী যেন বলে চেঁচিয়ে উঠল?

নু...নু...মনে পড়েছে। পুঁতিবালা, মনে পড়েছে।

নামটা কী?

নুরুল হাসান। বলেছিল, নুরুল হাসান এসে গেছে, ও গড!

নুরুল হাসানই তাহলে মমতাজের গড?

তাই তো দেখছি। ওর স্বামীর নাম—

নুরুল হাসান নয়।

তবে কার নাম?

গজাননদা, তোমার সাগরেদি করে ব্রেনটাকে কীরকম পাকিয়েছি এবার দ্যাখো। এটা কী দেখছ?

টেলিফোন গাইড।

এই শহরের টেলিফোন গাইড। মমতাজের ওপর যখন ধর্ষণ আর মারধর চালাচ্ছে আমিনুল, আমি তখন —

আমিনুল!

আবার কে? ভারি পাজি লোক। কাল রাতেই আমি বুঝেছি।

কী...কী বুঝেছিস তুই?

সে অন্য কথা। মমতাজকে জঘন্য ভাবে ধর্ষণ করে ওর মুখ থেকেই নুরুল হাসান নামটা বের করে নেয় আমিনুল। হেরোইন মানুষের আগল আলগা করে দেয়—বিশেষ করে আন্নাকালীর মতো মেয়েদের—

আন্নাকালী!

ওই হল গিয়ে! মমতাজ মানেই আন্নাকালী। গায়ের যা রং—ম্যাগো। যাক যা বলছিলাম, মমতাজের কাছ থেকে নামটা জেনে নিয়ে তাকে অমানুষিক ভাবে পিটিয়ে মেয়ে ফেলে আমিনুল। আমি বাধা দিইনি। অমন মেয়ের ওই দশাই হয়। আমি তখন খুঁজছিলাম টেলিফোন গাইডটা। তারপর পাহারা দিচ্ছিলাম তোমাকে।

আমিনুল ট্রিগার টেপবার আগেই—টাইট সার্টের বক্ষদেশ থেকে খুদে রিভলভারটা বের করে দেখাল পুঁতিবালা—পৌরুষ উড়িয়ে দিতাম আমিনুলের।

স্যাডিস্ট!

যা খুশি বলো। আমি গাড়ি চালাচ্ছি—দেখতেই পাচ্ছ। তুমি গাইডখানা দ্যাখো। নুরুল হাসান নিশ্চয় বড় দরের লোক। কিঙ-য়ের আসল নাম যদি নুরুল হাসান হয়—টেলিফোন তার নামে থাকবেই। দ্যাখো।

ভালো ছেলের মতো ছুটন্ত গাড়িতে গাইডের পাতা উলটে গেল গজানন। পাওয়া গেল নুরুল হাসানের নাম আর ঠিকানা।

হাসল পুঁতিবালা—আমিনুল জানত তুমিও ঠিক এইভাবে পেয়ে যাবে ঠিকানা। তাই বধ করতে চেয়েছিল তোমাকে। দাদা গো, এখন বলো কী করতে চাও।

বধ করব।

কাকে?

কিঙকে।

তবে চলো—এখুনি।

হাইওয়ে থেকে একটু ভেতরে বাড়িটা। দোতলা। পেট্রল পাম্পে জিগ্যেস করতেই পাওয়া গেল পথনির্দেশ।

গাড়ি দূরে রেখে ভাইবোন এগিয়ে গেল মরণের টঙ্কার বাজাতে।

দুজনেই এগোল বাড়ির সামনের দরজার দিকে। পেছনে পাহারা থাকতে পারে। সেখানে অন্ধকার। সামনে কেউ থাকবে না। এখানে আলো।

দরজা খোলাই রয়েছে। কোনও গোপনতা নেই। আর পাঁচটা গেরস্থ বাড়ির মতোই। করিডরে জ্বলছে আলো।

চৌকাঠ পেরিয়েছে গজানন, এমন সময়ে পাশের দেওয়ালের খুপরি থেকে একটা ষণ্ডামার্কা লোক বেরিয়ে এসে দাঁড়াল সামনে।

কী যেন বলতেও গেল। কিন্তু বলবার অবকাশ ছিল না গ্রেট গজাননের। মাথার চোট পেয়ে তখন তার কোষগুলো নিদারুণ টনটনে—

ফলে, এক হাতে তার মুখ চেপে ধরল গজানন, আর এক হাতের ছোট্ট ছুরিটা বসিয়ে দিল তার বুকে।

নিষ্প্রাণ দেহটাকে আস্তে-আস্তে শুইয়ে দিল মেঝেতে।

এবার তার চোখ জ্বলছে। গজানন রক্ত দেখেছে। গজানন রেগেছে।

খুশি হল পুঁতিবালা।

করিডরের শেষে একটা ঘরে কারা যেন কথা কইছে।

পা টিপে-টিপে দুজনে এগিয়ে গেল দরজার পাশে।

ভারি গলায় একজন বলছে—মমতাজের ওপর হুকুম আছে গজাননকে পটাসিয়াম সায়ানাইড দিয়ে চলে আসবে এখানে।

শুনেই মাথার চুল খাড়া হয়ে যায় গজাননের। কী নৃশংস মেয়েছেলে রে বাবা! হেরোইনের নাম করে পটাসিয়াম সায়ানাইড খাওয়ানোর প্ল্যান করেছিল তাকে। পুঁতিবালা কি সাধে বলে আন্নাকালী! ভগবান বাঁচিয়েছেন।

ভারি গলায় আবার বললে—দরজা খোলাই আছে—মমতাজের এত দেরি হচ্ছে কেন বুঝছি না। কী হে কেমিস্ট, তুমি আর দেরি কোরো না। মাল খাঁটি আছে কিনা টেস্ট করে বলে দাও, ওজন করে ভাগ করে দাও।

ভাঙা গলায় একজন বললে—তাই হোক বস। দেনাপাওনা এখানেই মিটে যাক। যে যার মাল ইন্ডিয়ায় নিয়ে যাক। পেছনে ফেউ যখন লেগেছে।

ভারি গলায় বললে—ক'ভাগ হবে তাহলে?

সরু গলায় একজন বললে—চার ভাগ। আপনি রাখবেন?

ভারি গলা—না।

সরু গলা—তাহলে তিনভাগ হোক। আমার বাইশ পাউন্ড।

ভাঙা গলা—আমার বাইশ পাউন্ড।

হেঁড়ে গলা—হেঁ-হেঁ, আমারও বাইশ পাউন্ড।

দোরগোড়ায় শোনা গেল বজ্রগর্জন—আমার ছেষট্টি পাউন্ড।

সবেগে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল পাঁচটা লোক। প্রত্যেকেই ভীষণ চমকে উঠে তাকিয়ে দরজার ফ্রেম জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা কালান্তক যমদূতের মতো মানুষটার দিকে। কে রে বাবা? মানুষ না অসুর? ঝাঁকাল চুল ফুলেফেঁপে বিচ্ছিরি কাণ্ড বাঁধিয়ে বসে আছে মাথার চারপাশে। চোখ দুটো দু-টুকরো জ্বলন্ত কয়লার মতো গনগনে রাঙা। চাহনিও পৈশাচিক...অমানুষিক।

সবার আগে কিঙ সামলে নিল। দীর্ঘদেহী যে পুরুষ মূর্তি—ভারি গলাটা তারই। মাথার সামনে টাক, পেছনে লম্বা চুল। টিকোলো নাক। জমিদারি গোঁফ। রীতিমতো কর্তৃত্বব্যঞ্জক খানদানি চেহারা।

বললে ভারি গলায়—গজানন?

জিরো জিরো গজানন। বলতে-বলতে টেবিলে স্তূপাকার ছেষট্টিটা পলিথিন প্যাকেট দেখে নিল গ্রেট গজানন। সাদা মিহি গুঁড়ো প্রতিটি প্যাকেটে। নিক্তি হাতে নিয়েই দাঁড়িয়ে উঠেছে যে চশমাধারী ভদ্রলোক-ভদ্রলোক মানুষটা, ওই নিশ্চয় কেমিস্ট। না। ওকেও বাদ দেওয়া যাবে না। এ ঘরের সবাই পাজি। তাই এ ঘর ছেড়ে কেউ জীবন্ত বেরোতে পারবে না। এ ঘরের এক কণা সাদা গুঁড়োও ভারতের মাটিতে পৌঁছবে না।

মৃত্যুর দ্রিমি-দ্রিমি ডম্বরুধ্বনি বোধহয় আগেই শুনতে পেয়েছিল ভারি গলার অধিকারী লম্বা লোকটা। একটুও না নড়ে বললে—ওয়েলকাম, মাই ফ্রেন্ড। তিন ভাগ নয়, চার ভাগই হোক।

মহাশয়ের নাম?—গজাননের গলায় কি করাত বসানো? কথাগুলো কানের মধ্যে দিয়ে কেটে-কেটে বসে যাচ্ছে কেন?

নুরুল হাসান।

ওরফে কিঙ।

ইয়েস।

এরপর আর কোনও কথাই হল না ঘরের মধ্যে। শুধু শোনা গেল গুলির শব্দ।

বাইরের হাইওয়েতে সে আওয়াজ পৌঁছেছিল। আতশবাজি পোড়ানো হচ্ছে মনে করেই কেউ কান দেয়নি।

মাত্র পাঁচটা বুলেট খরচ করেছিল গজানন আর পুঁতিবালা। তিনটে জিরো জিরো—দুটো তার সাগরেদের।

প্রথম বুলেটটা অবশ্য জিরো জিরোর। কিঙ-য়ের দুই ভুরুর ঠিক মাঝখান দিয়ে করোটিতে প্রবেশ করেছিল গরম সীসের টুকরোটা।

টেবিলের ওপরেই ছিল ব্যাগ। ছেষট্টিটা প্যাকেট তার মধ্যে ভরে বেরিয়ে এসেছিল ভাইবোন স্পাই কোম্পানি।

দিন কয়েক পরেই 'ত্রিশূল' দপ্তরের রামভেটকি সুরকিওয়ালার টেবিলে প্যাকেটগুলো সাজিয়ে রেখে শুধু বলেছিল গজানন—সরি, লাশ সাতটা আনতে পারলাম না।

** 'ঘরোয়া' পত্রিকায় প্রকাশিত। (শারদীয় সংখ্যা।)*

আবার জিরো জিরো গজানন

বেপারিটোলা লেনের অত্যাধুনিক অফিসকক্ষে বসে জিরো জিরো গজানন ওরফে বেলেঘাট্টাই গজানন টেবিলের ওপর দু-পা তুলে দিয়ে পাইপ টানা প্র্যাকটিস করছে। এককোণে টাইপরাইটার নিয়ে বসে উদাসভাবে কাচের জানলা দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে আছে তার অ্যাসিস্ট্যান্ট মিস প্রীতি বল ওরফে পুঁতিবালা। বোধহয় নাগরের কথা ভাবছে।

জিরো জিরো গজাননের প্রথম কাহিনি যাঁরা পড়েছেন, তাদের কাছে এই দুজনের নতুন পরিচয় দেওয়ার আর দরকার নেই। গজানন একসময়ে ছিল মেন্টাল ক্লিনিকে—রাগের মাথায় লরির ওপর লাফিয়ে উঠে এক লাথিতে উইন্ডস্ক্রিন চুরমার করে ড্রাইভার-ট্রাইভার সবাইকে পিটিয়ে ঠান্ডা করার পরেই তার মাথার গোলযোগ দেখা যায় এবং বন্ধুরা টেনে হিঁচড়ে তাকে নিয়ে যায় পাগলের ডাক্তারের কাছে। ওষুধ নয়, স্রেফ বাক্যের মহিমায় সুস্থ হয় গজানন এবং ডাক্তারের নির্দেশে প্রতিভাকে কাজে লাগায় দেশের স্বার্থে।

অর্থাৎ স্পাইয়ের ব্যবসা করে। এ ব্যবসায় মারপিট উত্তেজনা হাঙ্গামা আছে, প্রাণটা যখন-তখন পালাই-পালাই করে এবং সেইটাই গজাননের প্রচণ্ড রাগী ব্রেনটাকে বরফের মতো ঠান্ডা রেখে দেয়।

পুঁতিবালাকে সে সংগ্রহ করেছে হিন্দ সিনেমার সামনে থেকে। সন্ধের দিকে দাঁড়িয়ে কাপ্তেন পাকড়াবার ফিকির আঁটছিল চটুল চোখের ঝলক হেনে, অভাবে স্বভাব নষ্ট আর কী! দেখেই মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠেছিল জিরো জিরো গজাননের।

তার ওই ঝাঁকড়া অসুর মার্কা চুলের রুদ্রমূর্তি আর তীব্র চাহনি দেখেই প্রমাদ গুনেছিল পুঁতিবালা। কিন্তু পালাবে কোথায়? গজানন তাকে অ্যাসিস্ট্যান্ট বানিয়েছে, তবে ছেড়েছে। তবে বয়সের ধর্ম তো যায় না। শিকার ধরতে বেরোলেই শ্রীমতী পুঁতিবালা একটু-আধটু এদিক-ওদিক করে বসে। গজানন তা জানে। বকে। দরকার হলে চাঁটি-টাঁটিও মারে। দু-জনের মধ্যে কিন্তু ভারি মিষ্টি ভাইবোনের সম্পর্ক।

এই গেল গজানন-পুঁতিবালার ইতিবৃত্ত। দার্জিলিঙে হিপনোটিক কিলারদের বিরাট গ্যাংটার বারোটা বাজানোর পর থেকে গজাননের দক্ষিণা আর খাতির দুটোই বেড়ে গেছে। ইন্টারন্যাশনাল সিক্রেট সোসাইটি 'ত্রিশূল' এখন আর তাকে ব্যঙ্গার্থে নেকনজরে দেখে না, সত্যি-সত্যিই নেকনজরে দেখে এবং জটিল প্রাণঘাতী কেস না হলে তাকে তলব করে না।

গজাননের সুবিধে হচ্ছে সে একাই অ্যাকশনে নেমে পড়ে। ইন্ডিয়ান আর্মির রেড ডেভিল কম্যান্ডোদের মতো। হয় কাজ শেষ করে ফরসা হয়ে যাও, নইলে মরো—এই হল তার সোজা সরল কাজের দর্শন। কারও সাহায্য চাই না। 'এসেছি একলা, যাইব একলা, কেউ তো সঙ্গে যাবে না'—জিরো জিরো গজাননের এটা একটা প্রিয় গান। আর একটা প্রিয় গান হল, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল রে।' গজানন লেখাপড়া শেখবার চান্স পায়নি—কিন্তু গুরুদেবকে বেশ শ্রদ্ধা করে।

হঠাৎ পাইপ টানা বন্ধ করল গজানন। সাদা প্রিয়দর্শিনী টেলিফোনের পাশে লাল ইলেকট্রনিক আলোটা জ্বলছে আর নিভছে।

ত্রিশূল-এর টেলিফোন এসেছে। এসব কারিগরি ত্রিশূল কর্তৃপক্ষদের। স্পেশাল এজেন্টের স্পেশাল ব্যবস্থা তারাই করে দিয়ে গেছে।

মুখ থেকে পাইপ এবং টেবিল থেকে পা দু-খানা ঝট করে নামিয়ে নিয়ে রিসিভার তুলে নিল গজানন। মেরুন কালারের টি-শার্টের ওপর সাদা যন্ত্রটাকে প্রায় ঠেকিয়ে সদ্য রপ্ত করা ইয়াঙ্কি টানে বললে

—'ইয়া...ইয়া...দিস ইজ জিরো জিরো গজানন।'

ওপার থেকে ভেসে এল রামভেটকি সুরকিওয়ালার অতীব মধুর কণ্ঠস্বর—'গজানন, মাই ডিয়ার গজানন, আর ইউ ফ্রি নাউ?'

'আই অ্যাম অলওয়েজ ফ্রি ফর দ্য কানট্রি।' এ ক'টা কথাও লিখে-লিখে প্র্যাকটিস করে নিয়েছে গজানন। দু-চারটে ইংলিশ বুকনি না ছাড়লে এ লাইনে প্রেস্টিজ থাকে না।

'গজানন, মাই সুইট গজানন, এখুনি চলে আসুন; ভেরি সুইট গলায় বললে রামভেটকি সুরকিওয়ালা—যার চোদ্দো পুরুষেও রামছাগল, ভেটকি মাছ বা সুরকির ব্যবসা করেনি। গুপ্তচর পেশায় নাকি অদ্ভুত-অদ্ভুত নাম নিলে শত্রুপক্ষের গায়ে কাঁটা দেয়। রামভেটকি সুরকিওয়ালাকে এমনিতে দেখলেও অবশ্য গায়ে কাঁটা না দিয়ে যায় না।

গজাননের সঙ্গে অনতিকাল পরেই দেখা হল এহেন লোমহর্ষণকারী পুরুষটির। ছোট্ট একটা বুলেট-প্রুফ ঘরের মধ্যে বসে তাড়ি খাচ্ছিল রামভেটকি। তাড়ি খেলে নাকি হাঁপানি সেরে যায়। তাই হুইস্কি ছেড়ে তাড়ি ধরেছে অতিশয় কদাকার এবং রীতিমতো ভয়ানক এই মানুষটা। মানুষের আগের কোন এক পুরুষ গরিলা ছিল। কীভাবে জানা নেই, বিধাতার দুর্বোধ্য লীলাহেতু বহু জন্ম পারের সেই বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে রামভেটকি জন্ম নিয়েছে। গুলি বিনিময়ের ফলে একটা কান হারিয়েছে। বুকেও একটা ফুটো আছে—সেই থেকেই হাঁপানির ব্যয়রাম, ডাইরেক্ট অ্যাকশনে আর নামতে পারে না। কিন্তু ডাইরেক্ট ডিসিশন নিতে তার জুড়ি নেই। ব্ল্যাক ক্যাট কম্যান্ডো ছিল সে এক সময়ে। যুদ্ধের সময়ে শত্রুপক্ষের পেছনে প্যারাসুট নিয়ে লাফিয়ে নেমেছে, টেলিকমিউনিকেশন সেন্টার ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে, অপারেশনাল হেড কোয়ার্টারে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, বড্ড ঝামেলা পাকাচ্ছিল বলে বিশেষ এক কম্যান্ডারকে খতমও করেছে। ফিরে আসার পর এমন প্রস্তাবও উঠেছিল ব্ল্যাক ক্যাট কম্যান্ডোর নাম এখন থেকে ব্ল্যাক গরিলা কম্যান্ডো রাখা হোক।

কিন্তু বেসরকারি সংস্থা 'ত্রিশূল' তাকে টেনে নিয়েছে ভারতের স্বার্থরক্ষার জন্যে। এখন রামভেটকি সুরকিওয়ালার ডিম্যান্ড দেশে-বিদেশে—আজ কলকাতায়, এক মাস পরে মস্কোয়, তার পরের মাসে হয়তো ওয়াশিংটনে।

এহেন কালান্তক যমের সামনে অকুতোভয়ে দাঁড়িয়ে বললে আমাদের জিরো জিরো গজানন, 'ইয়েস বস, হোয়াট অর্ডার?'

'গজানন, কেস সিরিয়াস। অবতার সিং খতম।'

'অবতার সিং...অবতার সিং!...কোন অবতার?'

'ননসেন্স! অবতার সিং আমাদের কান্ট্রির বেস্ট সায়েন্টিফিক ব্রেন—মিলিটারি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এমন গবেষণা করেছেন যে ভয়ে কাঁটা হয়ে গেছে তামাম দুনিয়া।'

'তাই নাকি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। একটু কারেন্ট খবর রাখুন, গজানন। এই যে আইসল্যান্ড সামিট ব্যর্থ হল, গর্বাচভ আর রেগান যে যাঁর দেশে ফিরে গেলেন। কারণ কী? স্টার ওয়ার্সের চাইতেও ভয়ানক যুদ্ধ পরিকল্পনা অবতার সিং মাথায় এনে ফেলেছিলেন বলে। খবরটা হাইলি সিক্রেট—তা সত্বেও লীক আউট হয়ে গেছিল। ফলে আইসল্যান্ডের আইস গলল না—মাঝখান থেকে অবতার সিং-এর মাথাটা গেল।'

'মাথাটা গেল?' বসে পড়ল গজানন। রামভেটকির শেষের কথায় 'মাথাটা' শব্দের ওপর কেন এত জোর দেওয়া হল? নিশ্চয় তার মানে আছে।

'হ্যাঁ, অবতার সিং-এর ব্রেন সমেত মাথাটা উধাও হয়েছে। শুধু চোয়াল আর মাথার পেছন দিকটা গলার সঙ্গে লেগে আছে।'

দমদম এয়ারপোর্ট থেকে হেলিকপ্টারটা কলাইকুন্ডার যেখানে এসে নামল, তার আশেপাশে ধু-ধু মাঠ! বেশ কয়েক বছর আগে এখানে এয়ারফোর্সের মহড়া দেখে গেছিল গজানন। সে এক সাঙ্ঘাতিক দৃশ্য।

ভারতীয় বিমানবহর যে কী দুর্ধর্ষ, সেদিন তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছিল।

রামভেটকি আগে নামল কপ্টার থেকে। পেছন-পেছন গজানন। এই ফাঁকা মাঠে মুন্ডুহীন একটা দেহ দেখবার প্রত্যাশায় যখন ইতি-উতি তাকাচ্ছে, রামভেটকি তখন হেলিকপ্টারকে পেছনে ফেলে হেলেদুলে এগিয়ে যাচ্ছে ছোট্ট একটা টিলার দিকে। কপ্টারের বিকট আওয়াজ শোনা গেল পেছনে। সচমকে ঘাড় ফিরিয়ে গজানন দেখলে শূন্যে উড়েছে অতিকায় গঙ্গাফড়িং। একটু কাত হয়ে উড়ে যাচ্ছে যেদিক থেকে এসেছে, সেই দিকেই। দেখতে-দেখতে দিকচক্রবালে হারিয়ে গেল যন্ত্রযান।

এটা আবার কী ব্যবস্থা? ফেরা হবে কী করে? চমক ভাঙল পেছন থেকে গরিলা বপুর সুমধুর কণ্ঠস্বরে, 'মাই ডিয়ার গজানন, হাঁ করে তাকিয়ে না থেকে চলে আসুন।'

পেছন ফিরল গজানন। রামভেটকি টিলার কাছে পৌঁছে গেছে। এরকম উইয়ের ঢিপির মতো টিলা অজস্র রয়েছে এ অঞ্চলে। বিশেষ এই টিলাটির সঙ্গে রামভেটকির এত প্রণয় কেন বুঝল না।

তবুও পা দুটোকে টেবিল ফ্যানের মতো বনবন করে ঘুরিয়ে পৌঁছে গেল অতীতের ব্ল্যাক কম্যান্ডোর কাছে।

রামভেটকি ওর দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছিল। গজানন জানে ঠিক ওইরকম স্বর্গীয় হাসি হাসতে-হাসতে রামভেটকি যে-কোনও মানুষের টুঁটি কেটে দিতে পারে—চক্ষের নিমেষে, অথবা জামাকাপড়ের অদৃশ্য কোনও অঞ্চল থেকে ফস করে আগ্নেয়াস্ত্র টেনে বের করে বেধড়ক গুলি চালিয়ে যেতে পারে নির্ভুল নিশানায়। রামভেটকি মূর্তিমান আতঙ্ক অকারণে হয়নি।

এহেন জীবন্ত বিভীষিকাটি মিঠে হেসে বুক পকেট থেকে একটা সরু ডটপেন বের করে হেঁট হল টিলার ওপর। এক হাতে খানকয়েক নুড়ি আর কিছু মাটি সরাতেই চোখে পড়ল এক ইঞ্চি বর্গক্ষেত্রের একটা ইস্পাতের পাত। ঠিক মাঝখানে ছোট্ট একটা ফুটো।

ডটপেনের যে জায়গা দিয়ে লেখা হয়, সেই জায়গাটা পেঁচিয়ে খুলে নিল রামভেটকি। কালির ছোট্ট টিউবটাও বেরিয়ে এল সেইসঙ্গে। এবার ডটপেন টর্চের মতো ফোকাস করল ইস্পাতের পাতটার ওপর। পেছনের ক্লিপটা ঘুরোতেই সরু রশ্মি রেখা গিয়ে পড়ল প্লেটের মাঝখানকার ফুটোয়। ক্লিপ আরও ঘোরাতেই সরু হয়ে এল রশ্মি—শেষপর্যন্ত বিন্দুর আকারে স্পর্শ করল ছোট্ট ফুটোটাকে।

সঙ্গে-সঙ্গে ভোজবাজি দেখা গেল চোখের সামনে। বেলেঘাটার মস্তান গজানন এরকম ম্যাজিক জীবনে দেখেনি—সিনেমা টিনেমায় দেখার কথাটা ধর্তব্যের মধ্যে নয় বলে বাদ দেওয়া গেল।

বাঁ-দিকের কাঁকড় ছাওয়া ভূতল নি:শব্দে সরে গেল পাশের দিকে। চৌকোনা ফোকর বেরিয়ে পড়েছে। সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে।

চোখ ছানাবড়া করল না গজানন। না করার জন্যে ট্রেনিং নিতে হয়েছে বিস্তর। শুধু বললে সহজ গলায় —'যে ফুটোটায় রে ফেললেন, ওটা তো বৃষ্টির জলে নষ্ট হয়েও যেতে পারে।'

ডটপেনের রিফিল লাগিয়ে নিয়ে পকেটে রাখতে-রাখতে বললে রামভেটকি, 'মাই ডিয়ার গজানন, ওই গুপ্ত রহস্যটা আপনাকেও দেখাইনি।'

'মানে?'

'ফুটোর মুখটা ঢাকা ছিল। পায়ের চাপে অনেক আগেই ঢাকনা সরিয়েছি।'

'স্প্রিং টিপে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু স্প্রিং লাগানো বোতামটা কোথায় আছে, তা জানতে চাইবেন না। দেখলেন না হেলিকপ্টারটাকেও সরিয়ে দিলাম। আমাদের এই গোপন আস্তানার খবর যত কম লোকে জানে, ততই ভালো। আসুন!' বলে সিঁড়িতে পা দিলে রামভেটকি।

একটু পরেই কবন্ধ দেহ দেখে শিউরে উঠল গজানন।

কলাইকুণ্ডার এই তেপান্তরের মাঠের পাতালে এরকম এলাহি কাণ্ডকারখানা কে কবে দেখেছে? গজানন আবার পাগল হয়ে যাচ্ছে না তো?

দু-হাতের দুই মুঠো দিয়ে ঝাঁকড়া চুল খামচে ধরে মাথাটাকে বেশ করে ঝাঁকিয়ে নিল জিরো জিরো গজানন। স্পেশাল কম্যান্ডো ট্রেনিং নেওয়ার সময়ে সুবেদার ছাতু সিং ওকে পইপই করে বলেছিল, 'বাপুহে, চুল কেটে ছোট করে নাও। কেউ যেন খামচে ধরে তুলে আছাড় না মারতে পারে।'

ভীষণ রেগে গেছিল গজানন, 'ধরলেই হল? আমার চুল ধরবে আর আমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে নিজের আছাড় খাওয়া দেখব? ধরুন না আপনি...চেষ্টা করে দেখুন।'

গজাননের কটমটে চোখ আর অসুরমার্কা মুন্ডু দেখে সুবেদারের আর সে ইচ্ছে হয়নি। শুধু বলেছিল, 'বুঝবে ঠ্যালা।'

'চুল কাটব না।'

হাজার হোক বাঙালি মস্তান। স্যামসনের চুলের মধ্যেই শক্তি নিহিত ছিল। বাঙালি মস্তানরাও তা বিশ্বাস করে। চুল কাটতে দেবে কেন? চুলের বাহারেই যে আসল বল।

তাই চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যেতেই চুল ধরে মাথাটাকে ঝাঁকিয়ে নিল গজানন। অন্য কারও ঘিলু হলে নিশ্চয় নড়ে যেত, কিন্তু জিরো জিরোর ঘিলু যে-সে ঘিলু নয়—নিরেট। তাই অমন প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতেও স্থানচ্যুত হল না।

কী দেখল গজানন? লম্বা করিডর সিঁড়ির একদম নিচের ধাপ থেকে শুরু হয়েছে। শেষ দেখা যাচ্ছে না—কেননা আলোগুলো সব নিভানো রয়েছে। সিঁড়ির মাথা থেকে দেখেছিল নিরন্ধ্র অন্ধকার বিরাজ করছে পায়ের তলায়। শেষ ধাপে পা দিতেই আপনা হতেই দপ করে জ্বলে উঠেছিল গোপন আলো—ঠিক পনেরো ফুট পর্যন্ত করিডর আলোকিত হয়েছিল সেই আলোর আভায়। রামভেটকি হনহন করে এগিয়েছে, যতই এগিয়েছে, ততই সামনের করিডর আলোকিত হয়েছে এবং পেছনের ফেলে আসা করিডর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছে।

তাজ্জব হলেও চোখেমুখে তা প্রকাশ করেনি গজানন। সবই অতিরিক্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বা অতি সাবধানতা। দৈবাৎ যদি পাতাল ঘাঁটিতে কেউ প্রবেশ করে, অন্ধকারে নিশ্চয় টর্চ ফেলবে...

ফেলেওছিল গজানন। সিঁড়ির মাথা থেকেই অন্ধকারকে টিপ করে পেনসিল টর্চ ফোকাস করেছিল।

সঙ্গে-সঙ্গে অভূতপূর্ব কাণ্ড। সিঁড়িটা আচমকা লাল আলোয় ছেয়ে গেছিল। দু-পাশের দেওয়ালের গায়ে সারি-সারি ফোকর আবির্ভূত হয়েছিল এবং প্রত্যেকটা ফোকর দিয়ে একটা করে কালচে ইস্পাতের আগুন বর্ষণ করার নল বেরিয়ে এসেছিল। সবক'টা নল ফেরানো টর্চ যে ধরে রয়েছে তার দিকে। অর্থাৎ গজাননের দিকে।

মেঘমন্দ্র চ্যালেঞ্জ শোনা গেছিল স্পিকারে—পাতাল পথ গমগম করে উঠেছিল সেই আওয়াজে, 'হু ইজ দেয়ার?'

চকিতে পেছন ফিরে হতচকিত গজাননের হাত থেকে পেনসিল টর্চ ছিনিয়ে নিয়েছিল রামভেটকি সুরকিওয়ালা, স্পিকারে ততক্ষণে কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেছে।

'থ্রি...টু...ওয়ান...'

'জিরো' বলার আগেই 'ত্রিশূল' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল রামভেটকি, সেইসঙ্গে একটা সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করেছিল। খুবই জটিল এবং খটমট মন্ত্র। কিন্তু কীভাবে জানা নেই, গজাননের গজ-মস্তিষ্কে তা অক্ষরে-অক্ষরে গেঁথে গেছিল।

ঐন্দ্রীকুলিশপাতেন শততো দৈত্যদানবা:।

পেতুর্ব্বিদারিতা: পৃথ্বাং রুধিরৌঘ প্রবার্ষিণ:।।

ব্যস, অমনি লাল আলো গেল মিলিয়ে, তার আগেই রোমাঞ্চিত কলেবরে গজানন প্রত্যক্ষ করে নিয়েছিল, সারি-সারি নলগুলোও অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ফোকরগুলোর মধ্যে।

ভয়ের চোটে যে গা ঘামে, তা সেদিন হাড়ে-হাড়ে উপলব্ধি করেছিল গজানন। কপালের ঘাম মুছতে-মুছতে কাষ্ঠ হেসে জিগ্যেস করেছিল রামভেটকিকে, 'ওটা কীসের মন্ত্র, বস?'

'চণ্ডীপাঠ করলাম। প্রতিবার শ্লোক পালটায়। মুখস্থ করেও লাভ নেই। ইডিয়ট। আর আলো জ্বালাবেন না।'

না, আর আলো জ্বালায়নি গজানন। শুধু তখনই মাথার চুল খামচে ধরে ঘিলু নাড়ানোর চেষ্টা করে ধাতস্থ হয়েছিল এবং তারপরেই দেখেছিল, পরের পর অদৃশ্য আলো জ্বলছে আপনা থেকেই করিডর বেয়ে এগোনোর সঙ্গে-সঙ্গে। সুবোধ অনুচরের মতো রামভেটকির পেছনে-পেছনে যেতে-যেতে দেখেছিল দু-পাশে সারি-সারি দরজায় সংস্কৃত অক্ষরে একটা করে লাইন লেখা রয়েছে। গজানন আবার সংস্কৃত পড়েনি। কোনও ল্যাঙ্গুয়েজই ভালোভাবে পড়েনি, সংস্কৃত বয়কট করেছিল বাল্যকালেই। তাই মানে বুঝতে পারেনি। কিন্তু রামভেটকি টোলের পণ্ডিতের মতো প্রতিটি নামের ওপর চোখ বুলিয়ে বিড়বিড় করে পড়তে-পড়তে সহসা থমকে দাঁড়াল একটা দরজার সামনে। পাল্লায় হাত বুলিয়ে অদৃশ্য কোনও বোতামে চাপ দিল বোধহয়—নি:শব্দে পাল্লা সরে গেল পাশে।

আলো ঝলমল ঘরের মধ্যে দেখা গেল...

পুরো ঘরটাই খুব সম্ভব অ্যালুমিনিয়াম জাতীয় ধাতুর প্লেট দিয়ে মোড়া। এমন কিছু পেল্লাই ঘর নয়। লম্বায় চওড়ায় বড় জোর দশ ফুট। ঠান্ডা কনকনে ঘর। মনে হল যেন এইমাত্র ফ্রিজের পাল্লা খোলা হল। ভেতরে পা দিতেই গজাননের হাড় পর্যন্ত কেঁপে উঠল শুধু ঠান্ডায় নয়, টেবিলের ওপর রাখা বস্তুটি দেখে।

একটাই মাত্র টেবিল ঘরের ঠিক মাঝখানে। চকচকে স্টেনলেশ স্টিলের। তার ওপর শায়িত বস্তুটাকে এখন বস্তুই বলা উচিত, কেননা, যার মধ্যে প্রাণের নাচানাচি নেই, তাকে বস্তু বলাই সঙ্গত।

এই যে বস্তুটা জিরো জিরো গজাননের হাড় পর্যন্ত কালিয়ে দিল, এর হাত-পা-বুক-পেট অবিকল মানুষের মতোই। কিন্তু মানুষ নামক প্রাণীটার মুন্ডু বলেও একটা জিনিস থাকে ধড়ের আগায়—এর তা নেই।

শুধু নেই বললে কম বলা হবে, মুন্ডু যেখানে থাকবার কথা, সেখানে রয়েছে কাটা নখের মতো একফালি চোয়াল আর চিবুক। মুখের ওপর দিকটা অবিশ্বাস্যভাবে গোল করে কেটে নেওয়া হয়েছে। চোয়ালের আর চিবুকের হাড় মাখনের মতো যেন কেটে গেছে শল্যচিকিৎসকের ছুরিতে। কিন্তু এক ফোঁটা রক্ত নেই। চুঁইয়েও পড়েনি। ক্ষত মুখ বেমালুম জুড়ে গেছে।

পেটের মধ্যে গুলতানি শুরু হয়েছে টের পেল গজানন। এরকম তো কখনও হয় না। বেলেঘাট্টাই গজানন মুন্ডুহীন ধড় অনেক দেখেছে, নীলরতন সরকার মেডিক্যাল হাসপাতালের মর্গে উঁকি মেরে দেখেছে কবন্ধ দেহ (ফুটবল পেটানোর ফাঁকে-ফাঁকে), কিন্তু মানুষের মুন্ডু নিয়ে এরকম বিচ্ছিরি কারবার কখনও দেখেনি।

চিত্রার্পিত, মানে, ছবির মতোন দাঁড়িয়ে থাকা গজাননের পাশে এসে দাঁড়িয়ে রামভেটকি বললে, 'এই হচ্ছে অবতার সিং।'

ঢোক গিলে গজানন বললে, 'কালী—কালী...' (গজানন সার্বজনীন কালী পুজোর বিরাট পাণ্ডা ছিল এককালে)—'অবতার সিং বলে চিনব কী করে?'

'আপনি জীবনে দেখে থাকলে তো চিনবেন। আমরা দেখেছিলাম। এখন চিনেছি ফিঙ্গারপ্রিন্ট মিলিয়ে দেখে।'

'অবতার সিং!'

আধ কলসি জল ঝাঁকুনি দিলে যেরকম আওয়াজ হয়, প্রায় সেই ধরনের একটা আওয়াজ বেরোল রামভেটকির গলা দিয়ে। হাসি না হাহাকার ঠিক বোঝা গেল না।

বললে, 'না, অবতার সিং নন।'

চমকে উঠল গজানন। এত জোরে পাশের দিকে মুন্ডু ঘোরাল যে ঝাঁকড়া চুল চোখে মুখে এসে পড়ল।

বললে [illegible] স্বরে, 'একবার বলছেন অবতার সিং, আবার বলছেন অবতার সিং নন। মানে...মানেটা কী?'

'মাই ডিয়ার ডিয়ার গজানন, হুঁশিয়ার হতে হয় এ লাইনে গোড়া থেকেই। অবতার সিং অদৃশ্য হয়ে যেতে পারেন, এই আশঙ্কায় আমরা নকল অবতার সিংকে বাজারে ছেড়ে রেখেছিলাম—আসল অবতার সিং এখন বহাল তবিয়তে আছেন আমাদের গোপন আস্তানায়।'

'আসল নকল।' গজানন ঈষৎ বিমূঢ়।

'ইয়েস, ইয়েস, মাই—'

'নকলকে পেলেন কোত্থেকে?'

'যমজ ভাই অবতার সিং-এর।'

'কালী! কালী!'

'জিরো জিরো গজানন,'—অকস্মাৎ কঠিন হয়ে ওঠে রামভেটকির স্বর, 'এ কাজ নিতে পারবেন?'

'মুন্ডুকাটাদের ঠিকানা বার করতে হবে?'

'হ্যাঁ। এভাবে মুন্ডু উড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা কারা ঘটাতে পারে, তারা কোন দেশের মানুষ কীভাবে ঘটায়—সব জানতে হবে। দেশের স্বার্থে।'

'দেশের স্বার্থে; প্রতিধ্বনি করল গজানন। কানের মধ্যে অনুরণিত হল ডা: বক্সীর উপদেশ, 'দেশের স্বার্থে প্রতিভাকে কাজে লাগাবে গজানন, মস্তানিতে নয়।'

'জীবন যায় যাক, নৃশংস হত্যাকারীকে দরকার হলে হত্যাও করতে হতে পারে।'

'তা আর বলতে, দাঁত বার করে হাসল গজানন। এতক্ষণে বেশ ফ্রি মনে হচ্ছে নিজেকে। কতদিন যে খুনজখম, দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়নি।—'লাশটা পেলেন কোথায়?'

'দুর্গাপুরের জঙ্গলে।'

নক্ষত্রবেগে হাইওয়ে ধরে ছুটে চলেছে গজাননের গাড়ি। লেটেস্ট মডেলের মারুতি। মেরুন কালার। ড্রাইভ করছে নিজেই। হাতে কাজ নিয়ে বেপারীটোলা লেনের অফিস ঘরে বসে থাকবার পাত্র সে নয়। পুঁতিবালাকে রেখে এসেছে অফিস ম্যানেজ করতে। ছুটকো পার্টি এলে ভাগিয়ে দেবে'খন। গা-গতরের ব্যাপার থাকলে নিজেই ভিড়ে যাবে। ভাবতে ভাবতেই মুচকি হাসল গজানন। পুঁতিবালার এই দেহসর্বস্ব তদন্তধারা খুবই বাজে ব্যাপার সন্দেহ নেই, কিন্তু ওই তো বয়স...বয়সের ধর্ম তো থাকবেই, তাছাড়া কাজও হয় বটে...

আচমকা ব্রেক কষল গজানন। সরু রাস্তার ওপর দমাস করে একটা শালগাছ ফেলা হল। এই হল, এইমাত্র। আর একটু আগে ফেললে নির্ঘাত উলটে যেত মারুতি।

হালকা গাড়ি নিমেষে এক পাক ঘুরে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল বটে, কিন্তু বগলের তলা থেকে রিভলভারটা টেনে বের করার আগেই ঝনঝন করে জানলার কাচ ভেঙে ঠিকরে এল ভেতর দিকে, সেই সঙ্গে ভীমের গদার মতো একটা শাল কাঠের খুঁটি।

খুঁটির টিপ ঠিক করাই ছিল। রগে ধাঁই করে মারতেই যে-কোনও ভদ্র সন্তানের মতো চোখে সরষের ফুল দেখল গজানন।

সিটে এলিয়ে পড়া দেহটার ঠ্যাং চেপে ধরে এক হ্যাঁচকায় রাস্তার ওপর টেনে নামাল যে দৈত্যটা, আকারে আয়তনে সে দানবসমান হলেও মানুষ। ঘাড় পর্যন্ত লুটোচ্ছে বাবরি চুল। কপালের ওপর দিয়ে একটা বড় চিত্রবিচিত্র রুমাল মাথার পেছন দিকে গিঁট দিয়ে বাঁধা। পরনে ঢিলে পায়জামা আর পাঞ্জাবি—দুটোই রঙিন ছিটের! মুখখানা রোদেপোড়া। গোঁফ আর দাড়ি প্রায় জঙ্গলের মতো বললেই চলে—কুচকুচে কালো।

যে শালকাঠের খুঁটি দিয়ে গজাননের জ্ঞানলোপ করা হয়েছে, সেটা এক হাতেই ছিল। চটি পরা পা দিয়ে জিরো জিরোর মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা দেহটাকে ঠোক্কর মেরে চিৎ করে শোয়াল মানুষ-দানব। তারপর হাতের খুঁটি দু-হাতে বাগিয়ে ধরে আর একটা মোক্ষম ঘা মারল গজাননের মাথায়।

জিরো জিরোর মাথা বলেই রক্ষে, সাধারণ মানুষের মাথা ওই চোটেই দু-ফাঁক হয়ে যেত। কিন্তু শৈশব থেকেই গজাননের মাথার খুলির হাড় খুব মোটা—বোধহয় মোটা বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই স্রষ্টা মাথার ডিজাইনটা করেছিলেন।

খটাং করে করোটিতে চোট পড়তেই গজাননের ব্রেনের ভেতরে রাশি-রাশি নিউরোণের মধ্যে নিমেষে অজস্র সঙ্কেত বিনিময় ঘটে গেল। মগজের রহস্য বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মগজ বিশারদরাও আজও জানতে পারেননি—গজাননের মতো সৃষ্টিছাড়া মগজের খবর কে রাখে?

চক্ষের পলকে চনমন করে উঠল গজাননের সমস্ত সত্তা। ঠিক যেন প্রলয় ঘটে গেল কোষে-কোষে, সেন্টারে-সেন্টারে। মুহূর্তের মধ্যে—সটান উঠে বসল গজানন। এ আর এক গজানন। বেলেঘাট্টাই গজানন। চোখ জ্বলছে। দাঁত কিড়মিড় করছে।

মাথার খুলি দু-ফাঁক হওয়া দূরে থাক, এ যে উঠে বসেছে! তাকাচ্ছে অমানুষিক চোখে! দানোয় পেল নাকি? মারাদাঙ্গা দানবটা ক্ষণেকের জন্যে ঘাবড়ে গেছিল।

ওইটুকু সময়েরই দরকার ছিল গজাননের। পুরো শরীরটা বসা অবস্থাতেই শূন্যে ছিটকে গেল বিশাল আততায়ীর দিকে। (এই প্যাঁচটা জনৈক ব্ল্যাকবেল্ট ক্যারাটে মাস্টারের কাছে শিখেছে গজানন) এবং ছ'ফুট শূন্যে উঠেই জোড়া পায়ের সজোর লাথি কষিয়ে দিল খুঁটিধারীর চোয়াল লক্ষ্য করে।

চোয়াল ভেঙে গেল আততায়ীর। কয়েকটা দাঁত ছিটকে পড়ল এদিকে-সেদিকে এবং সেইসঙ্গে নিজেও উলটে পড়ল পেছন দিকে।

গজানন শূন্য থেকে অবতীর্ণ হল তার বিশাল বপুর ওপর এবং পলকের মধ্যে দমাদম ক্যারাটে মার মেরে গেল চোখ, নাক টুঁটি লক্ষ্য করে। ফলে লোকটা চোখে অন্ধকার দেখল, ভাঙা নাক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে টের পেল এবং কণ্ঠনালীর বারোটা বাজায় বিষম শব্দে কাশতে লাগল।

কিন্তু নাম তার খান বুদোশ। জিপসীদের পাণ্ডা খান বুদোশ। পূর্বপুরুষদের ইরানি রক্ত বইছে ধমনী-শিরায়। দু-হাজার জিপসী তার কথায় ওঠে-বসে। পয়সার বিনিময়ে হেন কাজ নেই যা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

খান বুদোশের মুখে লাথি? গায়ে হাত? চোখে এমনিতেই অন্ধকার দেখছিল খান বুদোশ, এবার যন্ত্রণায় বুদ্ধির আলোও গেল নিভে। বিকট জিপসী হুঙ্কার ছেড়ে পাঞ্জাবির তলা থেকে টেনে বের করল রিভলভার এবং ট্রিগার টিপে গেল আন্দাজে জিরো জিরোকে তাগ করে।

নিস্তব্ধ বনভূমি শিউরে ওঠে হুঙ্কার এবং গুলিবর্ষণের শব্দে। বনের মধ্যে থেকে শোনা গেল আরও কয়েকজনের চিৎকার। হই-হই করে ছুটে আসছে। চেঁচাচ্ছে অনেকগুলো কুকুর।

আসছে খান বুদোশের সাঙ্গপাঙ্গরা। ইরান যাদের নাগরিক অধিকার দেয়নি—তারা। ইরানে ফিরতে না পেরে বনের নেকড়ের মতো রয়েছে যারা—তারা।

তারা এসে পড়লে গজাননের মুন্ডু নিয়ে গেণ্ডুয়া খেলা হত নি:সন্দেহে, হাত-পা-ধড় চিবিয়ে খেত উপোসী কুকুরগুলো।

কিন্তু তার আগেই ঘটে গেল একটা আশ্চর্য ব্যাপার।

খান বুদোশ রিভলভার ধরতেই বিদ্যুৎগতিতে গজানন সরে গেছিল নিরাপদ দূরত্বে। দমাদম শব্দে গুলিগুলো এদিক-ওদিক ধেয়ে যাচ্ছে দেখে নি:শব্দে শিস দেওয়ার ভঙ্গি করেছিল আপনমনে। মাথার মধ্যে সেই চিড়বিড়ে ভাবটাও অনেক কমে এসেছে।

এমন সময়ে জঙ্গলের গহনে শোনা গেল আগুয়ান কোলাহল।

সচকিত হল জিরো জিরো। কী করবে ভাবছে, অতর্কিতে বনের মধ্যে থেকে কক্ষচ্যুত উল্কার মতো ধেয়ে এল যেন সাক্ষাৎ বনদেবী।

অহো! অহো! কী রূপ! কী বিম্বাধর। কী তনুবর! কী বক্ষদেশ! টাইট জিন প্যান্ট আর গেঞ্জি পরা এহেন রূপসী শরীরী বিদ্যুতের মতো ছুটে এসে গজাননকে বলল, 'কুইক। খান বুদোশকে তুলুন গাড়ির মধ্যে।'

'খান বুদোশ।' ফ্যালফ্যাল করে অপরূপার দিকে চেয়ে বললে গজানন।

'আমাকে দেখবার অনেক সময় পাবেন।' (অসহিষ্ণু স্বর বিম্বাধরার—'ওরা যে এসে গেল।' বলেই কোত্থেকে একটা রিভলভার বের করে দমাস করে মারল খান বুদোশের মাথায়। বেশ ভালো মার। জ্ঞান হারাল জিপসী-পাণ্ডা। ওদিকে গাছপালাদের ফাঁক দিয়ে দলে-দলে বেরিয়ে আসছে রংবেরঙের পোশাক পরা জিপসীদের দল।

দেখেই টনক নড়ল জিরো জিরোর। শুধু জিগ্যেস করলে, 'সুন্দরী, কে আপনি?'

'ত্রিশূল।'

'ও মাই গুডনেস,' বলেই বীর বিক্রমে খান বুদোশকে টেনে নিয়ে গিয়ে ঢুকিয়ে দিল মারুতির পেছনের সিটে। ত্রিশূল সুন্দরীও সেখানে বসে পকেট থেকে নাইলন দড়ি বের করে বাঁধতে লাগল জিপসী সর্দারের হাত পা।

ততক্ষণে গাড়ি ঘুরে গিয়ে ছুটছে কলকাতার দিকে—টপ স্পিডে। মাথার ফুলোটায় হাত বুলোতে-বুলোতে 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে' গানটা গলা ছেড়ে গাইছে গজানন।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে মাথা ঠান্ডা করে ফেলল গজানন। 'ত্রিশূল' সংস্থাটার শুধু টাকার জোর নেই, রুচিও আছে বটে। খাসা বাংলো-বাড়ি! দার্জিলিংয়ে-কালিম্পঙে যেমন কটেজ প্যাটার্নের দোতলা বাড়ি দেখা যায়, (গজানন শুনেছে বিলেতেও নাকি এমনই বাড়ি আছে)—অবিকল সেই ধরনের ছিমছাম বাড়ি গড়ে তুলেছে সল্টলেকের এই নিরালা সেক্টরে। চারপাশে অনেকখানি বাগান—মাঝে তন্বী শিখরদশনা পীন পয়োধরার মতো এই বাড়ি। বাস্তবিকই মনোরম।

ত্রিশূল সুন্দরীর নাম এলোকেশী, নামটা শুনে প্রথমে হেসেই ফেলেছিল গজানন। এলোকেশী তো তার পিসির নাম। ন্যাড়ামাথা বুড়িকে কতই না খেপিয়েছে গজানন। আর এই ডানাকাটা অপ্সরীর নাম কিনা এলোকেশী। যার চুল এলিয়ে দেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। কারণ চুল তো ব্যাটা ছেলের মতো ছোট-ছোট করে কাটা।

এলোকেশী মুক্তাহাসি হেসে গজাননকে নিয়ে এসেছে সল্টলেকের এই ডেরায়। একাই থাকে নাকি এখানে। দেশবিদেশ থেকে ত্রিশূল এজেন্টরা এলে নিশ্চয় ওঠে এখানে। এলোকেশী অবশ্য তা বলেনি, বুঝে নিয়েছে গজানন।

অচৈতন্য খান বুদোশকে একতলার হলঘরে শুইয়ে এলোকেশী গেল একটা দেওয়ালের সামনে। গজাননকে বললে, 'আপনি বারান্দায় যান—দোতলায়।'

গজানন এতটা পথ ড্রাইভ করে এসে ভেবেছিল এলোকেশীর সঙ্গে কিঞ্চিৎ হাস্য পরিহাস করবে অথবা একত্রে রামভেটকিকে ফোন করবে। তাই একটু মন:ক্ষুণ্ণ হয়েই হনহন করে চলে গেল দোতলায়।

যাওয়ার আগে আড়চোখে দেখে নিল পকেট থেকে ডটপেন বার করছে এলোকেশী। এই সেই ধরনের ডটপেন যার দৌলতে রামভেটকি পাতাল বিবরের দ্বার উন্মোচন করেছিল। এখানেও নিশ্চয় সেইরকম ব্যাপার ঘটবে। দেওয়াল চিচিং ফাঁক হয়ে যাবে আলিবাবার রত্ন গুহার মতো।

কিন্তু দাঁড়িয়ে দেখবার প্রবৃত্তি হয়নি। এলোকেশী যখন সরাতে চায়, তখন সরেই যাওয়া যাক।

তখন সবে সন্ধে নামছে। সামনের বাগানে আধো-অন্ধকার। গজানন সিগারেট ফিগারেট খায় না। পাইপ টানে অথবা নস্যি নেয়। নস্যির ডিবেটা বার করে বাঁ-হাতের তেলোতে বেশ খানিকটা ঢালছে, এমন সময়ে চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল নিচের বাগানে গাছপালার তলা দিয়ে সাঁৎ করে মিলিয়ে গেল একটা ছায়ামূর্তি।

হাতের নস্যি থেকে চকিতে চোখ তুলেছিল গজানন। কিন্তু ছায়ামূর্তি যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। ওপর থেকে ভালো করে ছাই দেখাও যায় না। কাজেই নস্যিটাকে সশব্দে নাকের ফোকরে চালান করে দিয়ে প্রবল

বেগে নেমে এল নিচের তলায়। সামনের ঘরটা পেরিয়ে তবে যেতে হবে বাগানে। কিন্তু ঘরটা আর পেরোতে হল না।

সোফা থেকে গড়িয়ে পড়েছে খান বুদোশ। পুরো বুকখানা জুড়ে রয়েছে একটা গোল গহ্বর। ধড়ের ঠিক মাঝখানে এরকম খাঁ-খাঁ শূন্যতা চোখে দেখা যায় না।

গজাননের মনের চোখে ভেসে ওঠে অবতার সিং-এর মুন্ডুহীন ধর। এখানে রয়েছে বক্ষহীন ধড়।

কারা করছে এই কু-কাণ্ড? কীভাবে?

ত্রিশূল-এর গোপনঘাঁটির কি শেষ নেই? গজানন তাজ্জব হয়ে গেল এই কলকাতারই বুকে আর একটা অত্যাধুনিক ঘাঁটি দেখে।

ওকে সল্টলেকের বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিল রামভেটকি। এলোকেশী গুম হয়ে বসে রয়েছে পাশে। নক্ষত্রবেগে গাড়ি এল দমদম এয়ারপোর্টের দিকে। তারপর ঢুকে গেল একটা বাগানবাড়ির মধ্যে।

খান বুদোশের বক্ষহীন ধড় আগেই পাচার করে দিয়েছিল রামভেটকি।

গাড়ি দাঁড়াতেই প্লেন ড্রেস পরা একজন কম্যান্ডো (চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। কদমছাঁট চুল, বুলডগের মতো মুখ, পেটাই চেহারা।) এসে শুধু বলল গজাননকে, 'আজকের মন্ত্র?'

'সব ব্যাটাকে ছেড়ে দিয়ে বেঁড়ে ব্যাটাকে ধর' টাইপের ব্যাপারটা হয়ে গেল না? চড়াৎ করে রক্ত চড়ে গেল গজাননের মাথায়। একে তো সংস্কৃতটা সে জানে না, তার ওপর ডাইনে বাঁয়ে ত্রিশূল-এর দুই কেউকেটা থাকতে তাকে মন্ত্র জিগ্যেস করা কেন?

মুচকি হেসে (গরিলা মুখে যতটা হাসা যায়) রামভেটকি বললে, 'সিকিউরিটি কাউকে বিশ্বাস করে না—আমাদেরকেও নয়। মন্ত্রটা আমাদের তিনজনকেই বলতে হবে।'

'কিন্তু জিগ্যেস তো করা হল শুধু আমাকে।' গজাননের গলা তীক্ষ্ণ হয়ে গেছে।

'আপনার মুখ এখানে নতুন বলে,'—বলেই রামভেটকি নোটবই বের করে একটা পাতা খুলে বলল, 'যা লেখা আছে, তাই বলুন।'

দেখল গজানন। একটাই মন্ত্র। ছোট্ট।

বলল, 'হ্রীং।'

'ক্রিং।' বলল রামভেটকি।

'ক্রিং।' বলল এলোকেশী।

পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল প্লেন ড্রেসের কম্যান্ডো।

গাড়ি ছেড়ে নেমে পড়েছে তিনজনে। গাছপালার মধ্য দিয়ে কিছুদূর যেতেই চোখে পড়ল একটা কটেজ প্যাটার্নের বাড়ি। দু-দিকে অ্যাসবেসটসের এবং অন্য দু-দিকে লাল টালির ঢালু ছাদ। অ্যাসবেসটসের চালে আঁকা একটা লাল হরতন।

'এটা কি তাসের দেশ?' বলে ফেলেছিল গজানন।

রামভেটকি কিছু না বলে গটগট করে গিয়ে দাঁড়াল দরজার সামনে। দরজা মানে একটা গোটা টেক্কা তাস। সামনে দাঁড়াতে-না-দাঁড়াতেই পাল্লা সরে গেল পাশে। পরপর ঢুকে এল তিনজনে। গজানন দেখল ও-পাশে আর একটা ঘর। এদিকের দরজা থেকে ওদিকের দরজা পর্যন্ত তেরোজন ষণ্ডামার্কা কম্যান্ডো দাঁড়িয়ে লাইন দিয়ে। প্রত্যেকেই অ্যাটেনশন ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে চেয়ে আছে সামনের দিকে।

এদের সামনে দিয়ে গজানন, রামভেটকি আর এলোকেশীকে যেতে হল ওদিকের দরজার সামনে এবং যাওয়ার সময়ে আড়চোখে গজানন দেখলে প্রত্যেকেই খর চোখে দেখে নিচ্ছে তিনজনের মুখ, কেউ-কেউ হাতের ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখছে ঠিক লোক যাচ্ছে কিনা সামনে দিয়ে। গজাননের ছবিও তাহলে আছে এদের কাছে।

সামনের দরজা আপনা হতেই খুলে গেল রামভেটকি কপাটের সামনে হাজির হতেই। ভেতরে একটা লম্বা টেবিলে শোয়ানো খান বুদোশের বীভৎস দেহাবশেষ। পাশে দাঁড়িয়ে দাড়িওলা এক বৃদ্ধ। চোখে চশমা, গায়ে সাদা অ্যাপ্রন।

পরিচয় করিয়ে দিল রামভেটকি, 'জিরো জিরো গজানন, ইনিই আমাদের ব্যালিস্টিক এক্সপার্ট ডক্টর সিঙ্কারো। এককালে হিটলারের কনসেনট্রেসন ক্যাম্পে ছিলেন। গ্যাস চেম্বারে ঢুকে ছেলেবেলায় মরতে-মরতে বেঁচে গেছিলেন। সিঙ্কারো ওঁর ছদ্মনাম, আসল নাম জানলে বুঝবেন হিটলারের কত কাছের লোক ছিলেন ইনি। ডক্টর সিঙ্কারো, কী বুঝলেন? যে অস্ত্র দিয়ে এইভাবে মানুষ খুন করা হচ্ছে, তা তৈরি হয়েছে কোন দেশে?'

'নো,' ছোট্ট জবাব ডক্টর সিঙ্কারোর। বৃদ্ধের চুলগুলো ধবধবে সাদা, এলোমেলো, অনেকটা আইনস্টাইনের মতো—মুখে কেবল পাইপটা নেই।

'তার মানে কোন দেশ আমাদের পেছনে লেগেছে, তা জানা যাচ্ছে না। আর কোনও খবর?'

কাঁপা গলায় আশ্চর্য বাংলা বলে গেলেন ডক্টর সিঙ্কারো। গজানন তো হতবাক।

'হিটলার যখন বাঙ্কারে বসে বার্লিনের সাবওয়েতে জল ঢুকিয়ে গাদা-গাদা মানুষকে ইঁদুরের মতো চুবিয়ে মারছে, তখন একজন বলেছিল, 'নতুন অস্ত্রটা এদের ওপর পরখ করুন না—জলে চুবিয়ে মেরে কী হবে? চেহারাগুলো হবে এই রকম।' বলে একটা কন্ধকাটা নাশ দেখিয়েছিল—যার মুন্ডুটা অবতার সিং-এর মুন্ডুর মতো মাঝখান থেকে অর্ধেক উধাও।'

'মাই গড!' নিমেষে অ্যাটেনশন হয়ে গেল রামভেটকি। 'এ অস্ত্র তাহলে জার্মান ব্রেনের?'

'এগজ্যাক্টলি। কিন্তু এখন আর জার্মানদের হাতে নেই। পরে আমি অনেক খুঁজেছি। অস্ত্রটাকেও চোখে দেখিনি—ডিজাইনও পাইনি।'

'কীভাবে এরকম গর্ত হচ্ছে বলে মনে হয় আপনার?'

মাথা চুলকোলেন ডক্টর সিঙ্কারো, 'সেইটাই তো মাথায় আসছে না। একটা বিস্ফোরণ ঘটছে শরীরের মধ্যে—কিন্তু রক্ত-মাংস-হাড় সব হাওয়া হয়ে যাচ্ছে কীভাবে, ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'একটা হাতিয়ার হাতে পেয়ে গেলে বুঝতে সুবিধে হবে?'

চোখ উজ্জ্বল হল ডক্টর সিঙ্কারোর—'নিশ্চয়।'

গজানন দাঁড়িয়ে আছে মেরিন ড্রাইভার-এর একটা খানদানী হোটেলের বারান্দায়। দুর্গাপুরের জঙ্গল তন্নতন্ন করে খুঁজে খান বুদোশের দলকে আর পাওয়া যায়নি। পায়ে হেঁটে নয়, ট্রেনে চড়ে তারা নাকি এসেছে আমেদাবাদে। দলে আছে গাপ্পা বুদোশ—খান বুদোশের ছোট ভাই। নওজোয়ান গাপ্পা বুদোশ নাকি চেহারায় চলনে বলনে ইউরোপিয়ান। রামভেটকির ধারণা এই গাপ্পাই হল পালের গোদা। ইরান থেকে খেদিয়েছে, এখন কোন দেশের টাকা খেয়ে ইন্ডিয়ায় মানুষ খতম করে চলেছে, তা গাপ্পাকে গায়েব করতে পারলেই ধরা যাবে।

তাই গজানন এসেছে প্রাণটাকে হাতে নিয়ে। একা। কিন্তু ও জানত না ওকে গার্ড দেওয়ার জন্যে এলোকেশীকেও পাঠানো হয়েছে ওর অজান্তে।

জানল বোম্বাই হোটেলে পা দেওয়ার দিনই রাতে। মেরিন-ড্রাইভ-এর হাওয়া খেয়ে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে গজানন, এমন সময় নজরে পড়ল মাইক্রো-ক্যামেরাটা টেপ দিয়ে লাগানো দরজার ফ্রেমে পায়ের কাছে।

নিজেই লাগিয়ে দিয়েছিল ঘর থেকে বেরোনোর সময়ে। রামভেটকির দেওয়া ক্যামেরা। ডটপেনের ডগা পেঁচিয়ে খুলে নিলেই বেরোয় এই ক্যামেরা। আর একটা ডটপেনের মধ্যে থাকে মাইক্রোব্যাটারি। পাশাপাশি রাখলেই চুম্বকের টানে জুড়ে থাকে ব্যাটারি আর ক্যামেরা। ক্যামেরা তখন অটোমেটিক হয়ে যায়, অন্ধকারে বা আলোয় ঘরের মধ্যে যে-ই ঢুকুক না কেন, তার ছবি উঠে যাবেই।

ফ্রেমের ফাঁকে প্রায় অদৃশ্য ও খুদে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে হাসল গজানন। এই মুহূর্তে তারও ছবি উঠছে ক্যামেরায়। সেকেন্ডে পাঁচটা। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার।

ঘরে ঢুকল গজানন। দরজা বন্ধ করে দিয়ে আলো জ্বালল। ঘরে কেউ নেই। জামাকাপড় খুলে সটান ঢুকে গেল স্নান ঘরে। পাঁচ তারা হোটেলের স্নান কক্ষ দেখলে দিল্লির বাদশারাও ট্যারা হয়ে যেতেন নিশ্চয়। গজানন তো হবেই। বেলেঘাটায় কে কবে দেখেছে এমন এলাহি ব্যবস্থা।

নরম-গরম জলের শাওয়ারটা খুলে দিয়ে গলা ছেড়ে গান গাইছে, 'এসেছি, একলা যাইব একলা, কেউ তো সঙ্গে যাবে না, 'হাত থেকে সড়াৎ করে পিছলে গেল সাবানটা। হেঁট হয়ে মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিতে গিয়ে হামাগুড়ি দিয়েছে সবে, এমন সময়ে...

শাওয়ারের ঠিক পাশেই গ্লেজড টালি উড়ে গেল পরপর তিনটে। খান-খান হয়ে এসে পড়ল গজাননের মাথাতেই খটাং খট করে।

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকিয়েছিল গজানন। টালির জায়গায় তিনটে গর্ত দেখেই চোখ কপালে উঠে গেছিল ক্ষণেকের জন্যে। তারপরই চোখ ঘুরিয়ে দেখলে স্নানকক্ষের প্রবেশ পথের দামি পরদাটাতেও তিনটে ছ্যাঁদা পাশাপাশি। তখনও ধোঁয়ার সুতো বেরোচ্ছে পরদা থেকে।

অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে গজানন—শুধু ওই হড়কে যাওয়া সাবানটার জন্যে। পরদা ফুটো করে টালি উড়িয়ে দেওয়ার পথেই তো ছিল গজাননের প্রিয় নিরেট মাথাটা। এতক্ষণে তারও উড়ে যাওয়ার কথা।

অতএব দিগম্বর গজানন আরও একটু সরে গেল কলতলার বাথটবের দিকে। নজর পরদার দিকে। পরদা দুলে উঠল। প্রথমে দেখা গেল একটা বিদঘুটে অস্ত্র। পেটমোটা রিভলভার। জন্মে এমন রিভলভার দেখেনি গজানন।

রিভলভার ধরে যে লোকটি ঢুকল ঘরের মধ্যে, তাকে যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। চোখে তার বাঘের চাহনি, পা ফেলার ভঙ্গিমাও বাঘের মতো। লাফ দেয় আর কী!

লোকটা দেখে ফেলেছে শাওয়ারের নিচে প্রত্যাশিত বস্তুটা নেই; অর্থাৎ গজাননের কবন্ধ দেহ নেই। চকিতে বিদঘুটে রিভলভার বাগিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছে, তার আগেই যেন বাজ ভেঙে পড়ল মাথায়।

গজানন, ন্যাংটা গজানন, এখন ফুল ফর্মে। ক্যারাটে গুরু কি বৃথা মার শিখিয়েছেন? বোধহয় আলোর চেয়ে বেশি গতিবেগে দিশি গাঁট্টা মেরেছে গুপ্তঘাতকের মাথায়। ক্যারাটের মশলা মিশোনো গাঁট্টা তো—এক মারেই চোখে সর্ষে ফুল দেখতে-দেখতে বাথটবের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে বদমাশটা। গরম জলের কলটা খুলে দিল গজানন। মুখে ফোসকা পড়ুক আগে—পরে আরও পেটানো যাবে।

আগে দেখা যাক বিদঘুটে অস্ত্রটা। গাঁট্টার চোটে হাতিয়ার ঠিকরে গেছে কলতলার বাইরে ঘরের কার্পেটে। হেঁট হয়ে পাশে বসল গজানন। কার্পেট পুড়ছে কেন? আশ্চর্য আগ্নেয়াস্ত্রের পেটটা দেখে মনে হচ্ছে যেন গভীর জলের মাছ জেলের জালে পড়ে উঠে এসে পড়ে আছে সমুদ্রের বালির ওপর—হাওয়া ঢুকে পেটটা ফুলেই চলেছে। একটু যেন লালও হয়ে উঠেছে। গনগনে আভা ছাড়ছে। কার্পেট পুড়ছে সেই কারণেই।

সভয়ে চেয়ে রইল গজানন। ফাটবে নাকি? কিন্তু একটু আগেই তো এই অস্ত্র ধরেই আততায়ী তার মাথা ওড়াতে গেছিল। নলচেটা বেঁটে, কিন্তু বেশ ফাঁদালো। রিভলভার এরকম হয় নাকি? জল-পিস্তল বলেই তো মনে হচ্ছে। দোল খেলার সময়ে পিচকিরির মতো জল ছুঁড়ে দেওয়ার খেলনা।

কিন্তু এ খেলনার মুখ থেকে বেরোয় সাক্ষাৎ মৃত্যু। এ আবার কী ধরনের মারণাস্ত্র?

বিমূঢ় গজাননের চোখের সামনেই বিচিত্র মারণাস্ত্রের উদর আরও একটু স্ফীত হল। গনগনে আভা আরও একটু প্রকট হল। কোনও ধাতু যে এভাবে রবারের মতো ফুলতে পারে, তা তো জানা ছিল না গজাননের।

হঠাৎ গজাননের গজ-মস্তিষ্কের কোষগুলোয় কী সঙ্কেত বিনিময় ঘটল, তা দেবা না জানন্তি। মৃত্যুকে সামনে দেখলেই বরাবরই ও এমনিভাবে হাত বাড়িয়ে মৃত্যুকে ক্যাঁক করে ধরতে যায়।

চ্যাপটা হাতল ধরে মারণাস্ত্রটা তুলে দূরের খাটের দিকে তাগ করল গজানন।

সঙ্গে-সঙ্গে একটা জার্ক লাগল হাতে। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি। কিন্তু হাত স্টেডি রইল। কানে ভেসে এল একটা বিস্ফোরণের শব্দ।

খাটের ওদিকের স্টিল আলমারিটা বিস্ফোরিত হয়েছে। বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে যে বস্তুটি তা খাটের গদির এদিক থেকে ঢুকে ওদিক দিয়ে বেরিয়েছে।

কী ভয়ানক শক্তি অদৃশ্য বিস্ফোরকের। মাখনের মতো গদি ফুটো করে বেরিয়ে গিয়ে শক্ত আলমারিতে আছড়ে পড়তেই ফাটিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে আলমারি।

হাতের মারণাস্ত্রের দিকে তাকিয়ে থ হয়ে গেল গজানন। পেটের ফুলোটা হঠাৎ এত কমে গেল কী করে? গনগনে আভাটাও আর নেই।

ভয়ে-ভয়ে আজব অস্ত্রকে কার্পেটে নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল গজানন। যার হাতে এই অস্ত্র একটু আগে শোভা পেয়েছে সেই ব্যাটাচ্ছেলেকে মনের সুখে এবার ধোলাই দেওয়া যাক।

কলতলার দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখল পরদা সরিয়ে বিহ্বল দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে ঘাতক মহাশয়। বিস্ফারিত চক্ষু যুগল নিবদ্ধ কার্পেটের ওপর রাখা বিটকেল অস্ত্রটার দিকে। একটু আগে আলমারি বিস্ফোরণের শব্দ শুনে এবং গরম জলের ছ্যাঁকা খেয়ে নিশ্চয় সম্বিৎ ফিরে পেয়েছে।

এখন আবার সম্বিৎ হারাবে নাকি? ওরকম আতঙ্কঘন চোখে চেয়ে আছে কেন পেটমোটা দানব অস্ত্রর দিকে?

গজানন যখন এই প্রশ্নটা মাথার মধ্যে এনে মন্থরগতিতে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছে, ঠিক সেই সুযোগে লোকটা সোজা ডাইভ মারল মারণাস্ত্রের দিকে।

নিমেষে গজানন ফিরে এল গজাননের মধ্যে। বাঁ-পায়ের শট ওর চিরকালই প্রচণ্ড। ঘাতক প্রভু যখন মেঝের ছ'ইঞ্চি ওপর দিয়ে ধেয়ে যাচ্ছে মারণাস্ত্রের দিকে ঠিক তখনি পাশ থেকে বাঁ-পায়ে পেনাল্টি কিক করল গজানন—লোকটার পেটে।

কোঁক-ধড়াম—ধুম। পুরো বপুটা নিক্ষিপ্ত হল শূন্য পথে। খাটের ওপর দিয়ে ছিটকে পড়ল জানলার সামনে।

মারণাস্ত্র পাকড়ে ধরে সেইদিকেই তাক করল গজানন। অমনি নরকের বিভীষিকা যেন ফেটে পড়ল খুনে লোকটার চোখেমুখে।

ঠেলে বেরিয়ে আসা দুই চোখ মেলে সেকেন্ড কয়েক চেয়ে রইল বিকট অস্ত্রের দিকে। পরক্ষণেই স্প্রিংয়ের পুতুলের মতো লাফিয়ে উঠে ছুটে গেল খোলা জানলার দিকে এবং একলাফে জানলা দিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে।

বাইশ তলা শূন্যপথ অতিক্রান্ত হতে গেলে যেটুকু সময়। তারপর বাইশ তলা নিচ থেকে ভেসে এল আছড়ে পড়ার শব্দ।

ফ্যালফ্যাল করে হাতের অস্ত্রটার দিকে চেয়ে রইল গজানন।

গজাননের চমক ভাঙল দরজায় টোকা পড়ায়। খট খট...খট খট খট খট...খট!

ত্রিশূল দলের সঙ্কেত! কে এল?

বিকট অস্ত্র হাতে নিয়েই দরজার সামনে ছুটে গেল গজানন। ম্যাজিক হোলে চোখ রেখে দেখল...

বাইরে দাঁড়িয়ে এলোকেশী।

এলোকেশী। এ সময়ে? এখানে?

ঝটাং করে পাল্লা খুলতেই এলোকেশী আঁতকে উঠে বললে, 'গজাননবাবু, ডোন্ট বি সিলি। বলেই বোঁ করে পেছন ফিরে বললে, 'জামাকাপড় পরে নিন।'

তাই তো! গজাননের খেয়ালই নেই বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসার পর থেকে গায়ে সুতোটি চাপাবার সময় পায়নি। দুই সারি গজদন্তের ফাঁকে বিরাট জিভটা ঠেলে দিয়ে সাঁৎ করে ঢুকে গেল কলতলায় এবং এক

মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে এল পাজামায় পা গলিয়ে।

এসেই সে কী তড়পানি, 'আপনি কোত্থেকে এলেন?'

এলোকেশী তখন একটা সোফায় বসে বুকের উপত্যকায় ঝোলানো একটা নেকেড মেয়ের লীলায়িত পোজের লকেটের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রয়েছে। গজাননের প্রশ্নটা শুনে আড়চোখে এমনভাবে তাকাল প্রশ্নকর্তার দিকে যে, সেই ব্যক্তির পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ থেকে মাথার চুলের ডগা পর্যন্ত শিরশির করে উঠল অনাস্বাদিত পূর্ব উত্তেজনায়। এ সেই চাহনি যার সামনে মুনিঋষিরা টলে যান, দেব সাধন ভুলে বাৎস্যায়ন শাস্ত্রচর্চায় মত্ত হন।

গজাননের ফুলো-ফুলো পাথরের মতো পেশিগুলো অনাবৃত অবস্থায় দেখেই যে এলোকেশী এলিয়ে পড়েছে, তা হাড়ে-হাড়ে বুঝল জিরো জিরো।

বাট ডিউটি ইজ ডিউটি—মেয়েরাই সব সাধনার পতন ঘটায়, শাস্ত্র-টাস্ত্র না পড়লেও গজানন তা জানে। তাই গলাটাকে যদ্দূর সম্ভব কর্কশ করে (করা কি যায়!) বললে, 'এখানে কেন এসেছেন?'

কাম-টু-দ্য-বেড চোখ তুলে তাকাল এলোকেশী। যার সাদা বাংলা হল, এসো, শোবে এসো। কিন্তু ছুঁড়িদের সঙ্গে শোওয়া গজাননের পোষায় না। ওইরকম চাহনি দেখলেই গা পিত্তি জ্বলে যায়। একটু আগে আচমকা চাহনির ঝলকে গা শিরশির করার জন্যে (হাজার হোক পুরুষ মানুষ তো) রাগও হয়ে গেল নিজের ওপর। গজদন্ত খিঁচিয়ে আর একবার যেই দাবড়ানি দিতে যাচ্ছে, এলোকেশী বললে, 'আমি এসেছি আপনাকে গার্ড দিতে।'

এমন নেচে উঠল গজানন (অভিনব পিস্তল হাতেই রয়েছে), পাজামার দড়ি ঢিলে হয়ে গেল এবং পাজামা নেমে এল ইঞ্চি তিনেক নিচে। খপ করে দড়ি ধরে পাজামা তুলে বললে যথাসম্ভব বজ্রগর্ভ স্বরে, 'একমাত্র ভগবান শালা ছাড়া আমাকে গার্ড দেওয়ার কেউ নেই।'

অহো! অহো! কী ডুমোডুমো পেশি বুকের! মি: ইউনিভার্স হলে পারত গজানন। মুগ্ধ (এবং বিলোল) চোখে চেয়ে এলোকেশী বললে, 'নিচের তলায় এখুনি একটা লাশ পড়ল আপনার জানলা থেকে।'

তিড়বিড়িয়ে ওঠে গজানন, 'জানলা থেকে জ্যান্তই বেরিয়ে গেছিল—নিচে গিয়ে লাশ হয়েছে।'

'আপনি ফেলে দিয়েছেন?'

'আজ্ঞে না,' অজান্তেই দাঁত কিড়মিড় করে ফেলে গজানন, 'ধরতে পারলে মুন্ডুটা ছিঁড়ে নিতাম।'

'ও,' ঠোঁটের ওপর ছোট্ট তিলটা চুলকে নিল এলোকেশী। অমনি গজাননের মনে পড়ে গেল পিসির কথা—ওরে গজানন, ঠোঁটে তিলওয়ালা মেয়ে দেখলেই জানবি পরপুরুষে আসক্তি আছে। ঠিকই বলেছে তো পিসি। এলোকেশীর রকমসকমও ভালো ঠেকছে না। এমনভাবে চাইছে যেন গজানন একটা মুচমুচে নানখাতাই বিস্কুট, পেলেই চিবিয়ে খাবে।

কাজেই শক্ত চোখে চাইতে হল গজাননকে, 'রাস্কেলটা এসেছিল এই দিয়ে আমার মুন্ডু উড়োতে,' দেখাল হাতের বিদঘুটে অস্ত্রটা।

'জীবনে দেখিনি বাপু এমনি রিভলভার। নিন, ব্যাগের মধ্যে রাখুন,' বলে নিজের ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে ধরল এলোকেশী।

গজানন কিন্তু দেখেছে বিটকেল হাতিয়ার মাঝে-মাঝে বিচ্ছিরিভাবে ফুলে ওঠে, লাল হয়, বিস্ফোরণ সৃষ্টি করে। কাজেই টেবিলের ওপর থেকে নিজের বুলেট-প্রুফ ব্রিফকেসটা টেনে নিতে নিতে বললে, 'এর মধ্যেই থাক।'

ব্রিফকেস আর হাতছাড়া করেনি গজানন। রামভেটকি বলেছিল আজব হাতিয়ার একখানা আনতেই হবে। এই সেই হাতিয়ার।

হোটেলের ঘর থেকে বেরোনোর আগে, দরজার ফ্রেমের পাশ থেকে মাইক্রো-ক্যামেরা খুলে নিয়ে রেখেছিল ডটপেনের মধ্যে।

এলোকেশী তখন নেমে গেছে। দেখতে পায়নি খুদে ক্যামেরার গোপন অবস্থান। পায়নি বলেই রক্ষে। নইলে...

কানহেরী কেভস বোম্বাই শহর থেকে বেশ দূরে। পর্বতগুহা দেখতে বিস্তর টুরিস্ট যায় ইলেকট্রিক ট্রেনে, ফরেন টুরিস্টরা যায় গাড়িতে। ঝকঝকে গাড়ি ধূলি ধূসরিত হয়ে যায় গুহা অঞ্চলে একবার টহল দিয়ে।

কিন্তু সে ধুলো বাইরে, মানে, এই আস্তানার বাইরে। এলোকেশী বিলিতি গাড়িতে চাপিয়ে গজাননকে ঝড়ের বেগে কানহেরী কেভস অঞ্চলের এই গোপন আস্তানায় এনে ফেলার পর—বেলেঘাট্টাই মস্তান বেচারার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেছে একটার পর একটা কাণ্ডকারখানা দেখে।

জবরদস্ত পার্টি বটে এই ত্রিশূল। সংগঠন কাকে বলে দেখিয়ে দিয়েছে, সারা ভারতটাকে রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ফেলেছে বিবরঘাঁটি আর গুপ্তচর দিয়ে। উদ্দেশ্য একটাই, ভারতের স্বাথরক্ষা। সরকারি ব্যবস্থায় যে সর্ষের মধ্যে ভূত, তা বুঝে গেছে।

দেশকে সত্যিই ভালোবাসে এই ত্রিশূল। যতই দেখছে গজানন, ততই বিমোহিত হচ্ছে। কোনওকালে ভাবতেও পারেনি গুহা থেকে বেশ খানিকটা দূরে জঙ্গলের মধ্যে এ রকম একখানা আস্তানা বানিয়ে বসে আছে রামভেটকির ওপরওয়ালারা।

গাড়িখানা এলোকেশীই চালিয়ে নিয়ে এসেছে। জঙ্গলের মধ্যে বাঁই-বাঁই করে ঢুকে পড়েছে। দূর থেকে মনে হয় যেন একটা পায়ে চলা পথ কিছুদূর গিয়েই বনের মধ্যে হারিয়ে গেছে অথবা শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু কিছুদূর ঢোকবার পর দেখা যায় মাটির রাস্তা পিচের রাস্তা হয়ে গেছে এবং এক-এক জায়গায় রাস্তা চার-পাঁচটা রাস্তা হয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেছে। যে-কোনও নবাগত এই পয়েন্টে পৌঁছেই দুরুদুরু বুকে নিবিড় বনানীর রহস্যময়তা উপলব্ধি করেই পিছু হটে আসবে।

কিন্তু পথ যারা চেনে, তারা পেছোয় না। পিচমোড়া এই রাস্তার গোলকধাঁধা ইচ্ছে করেই সৃষ্টি হয়েছে কৌতূহলীদের দূরে ঠেকিয়ে রাখার জন্যে, দলের লোকেদের নির্বিঘ্নে নিয়ে আসার জন্যে।

এলোকেশীর গাড়িও তাই চরকিপাক দিতে-দিতে এ রাস্তা সে রাস্তা হয়ে ঢুকে গেল গভীর থেকে গভীরতর জঙ্গলে। এক জায়গায় একটা পরিত্যক্ত এয়ারপোর্টও দেখতে পেল গজানন। যুদ্ধের আমলে নিশ্চয় বিমানবাহিনী বানিয়েছিল, এখন আর তার খোঁজ কেউ রাখে না। বিলিতি গাড়ি প্রায় নি:শব্দে গিয়ার চেঞ্জ করতে-করতে সেই এয়ারপোর্টের পাশ দিয়েই ঢুকল অন্য একটা রাস্তায়। রাস্তা হঠাৎ শেষ হয়েছে একটা ফাঁকা জায়গায়। যেন টেক অফ করার জন্যেই রাস্তার শেষ ওখানেই।

গাড়িটা কিন্তু টেক অফ করল না, 'টেক ডাউন' করল। মানে, স্রেফ পাতালে ঢুকে গেল। রাস্তাটা যে আসলে ইস্পাতের ঢাকনি তা কে জানত। কবজার ওপর লম্বাটে কৌটোর ঢাকনি যেমন ওপর দিকে খুলে যায়, ঠিক সেইভাবে প্রায় পনেরো ফুট রাস্তা মেঝে উঠে গেল ওপর দিকে।

গাড়ি থেকে নেমে গেল ঢালু পাতাল-বিবরে। মাথার ওপরকার ঢাকনি নেমে এসে বন্ধ করে দিলে বিবর পথ।

আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল গজাননের। এ কাদের পাল্লায় পড়েছে সে? এরা যে আরব্য রজনীর মতো কাণ্ডকারখানা দেখিয়ে চলেছে ভারতের বুকে।

কাণ্ডর তখনও দেখেছে কী গজানন দ্য গ্রেট। দেখল এরপরেই।

গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে দাঁড়াল একটা কুয়োর ওপরকার চাতালে এবং চাতালটা লিফটের মতো নেমে গেল কুয়োর মধ্যে। সাঁ-সাঁ করে বেশ খানিকটা নামবার পর রুদ্ধ হল নিম্নগতি।

আলো ঝলমলে একটা বিশাল হলঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে গাড়ি। জানলার কাচের মধ্যে দিয়ে হলঘরের বিশালতা এবং বিচিত্র যন্ত্রপাতির বিপুল সমাবেশ দেখে গজানন দ্য গ্রেট চোখ দুটো প্রায় ছানাবড়ার মতো করে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ।

হলঘরের চারপাশে ছড়ানো ছিটোনো যন্ত্রপাতিগুলো চলছে আপনা হতেই। অনেকগুলো বিদঘুটে চেহারার রোবট চালাচ্ছে কলকবজা। নিজেরাও তো এক-একটা কল, কাউকে দেখতে বাচ্চাদের মোটরগাড়ির মতো —চাকার ওপর গড়গড়িয়ে যাচ্ছে।

এই রকমই একটা খুদে মোটরগাড়ি সাঁ করে ছুটে এল গজাননদের দিকে। চকিতে টান-টান হয়ে গেল গ্রেট স্পাইয়ের আপাদমস্তক। কেননা, আগুয়ান যন্ত্রের মাথার ওপরে একটা ইস্পাতের নল ফেরানো রয়েছে তাদের দিকে। পেটের কাছে একটা টি-ভি স্ক্রিনের মতো পরদায় রংবেরঙের জ্যামিতিক নকশা আঁকা হয়ে যাচ্ছে অতি দ্রুত ছন্দে।

বগলের তলা থেকে লুগারটা টেনে বের করতে যাচ্ছে গজানন, বাধা দিল এলোকেশী। মুখে সেই অপ্সরা হাসি।

বললে স্টিরিও মিউজিক কণ্ঠে, 'গজাননবাবু, ঘাবড়াবেন না, রোবট সেন্ট্রিকে গুলি করবারও সময় পাবেন না।'

তা বটে। এলোকেশী ওর হাতখানা বেশ মোলায়েম করে ধরে (এত মোলায়েম ভাবে যে সন্দেহ হতে লাগল যার ঠোঁটে তিল...) নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। পুঁচকে মোটরগাড়িটা তখন সামনেই দাঁড়িয়ে। মাথার ওপরকার ইস্পাতের নলচের সরু ফুটোটার দিকে সভয়ে তাকিয়ে গজানন।

এলোকেশী হেসে চণ্ডীপাঠ করে গেল। টিভি স্ক্রিনের বুকে লেখা হয়ে গেল—"Ok Hop in."

মানে, সব ঠিক আছে। গাড়িতে লাফ দিয়ে উঠে পড়।

বলে কী খুদে গাড়ি। ওইটুকু গাড়িতে...

এলোকেশী ততক্ষণে উঠে গেছে গাড়িতে।

খেলনার গাড়ির সিটের মতো ছোট্ট সিটে বসে হাতছানি দিয়ে আর চোখ টিপে ডাকছে গজাননকে।

—আচ্ছা ঢলানি মেয়ে তো। রাগে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে গেল গজাননের। গালের কাটা দাগটাও সুড়সুড় করে উঠল এই সময়ে। কিন্তু অতিকষ্টে সেখানে হাত বুলোল না গজানন। কেননা, ওর মারদাঙ্গা ফিচারের সুইচ ওই কাটা দাগটা। হাত বুলোলেই মাথার মধ্যে পটাং করে যেন তার ছিঁড়ে যায়, তারপর প্রলয় ঘটিয়ে ছাড়ে চক্ষের নিমেষে—নিজের অজান্তেই।

অতএব কাটা জায়গায় হাত বুলোনো সমীচীন হবে না। বিশেষ করে ইস্পাতের নলচেটা এখনও যে ফিরে রয়েছে তার দিকেই।

অগত্যা মুখটা প্যাঁচার মতো করে গাড়িতে উঠে এলোকেশীর গায়ে গা দিয়ে বসল গজানন। মুহূর্তের মধ্যে পুঁচকে মোটর ভীষণ বেগে ছুটে গেল হলঘর পেরিয়ে একটা করিডরের দিকে। এ করিডর সে করিডর ঘুরে দাঁড়াল একটা দরজার সামনে।

এলোকেশী নেমে পড়েছে। ডাকছে গজাননকে। হাতের ব্রিফকেস নিয়ে নামতে যাচ্ছে সে, এমন সময়ে একটা কলের হাত এসে খামচে ধরল ওর হাত—হাতটা বেরিয়ে এল গাড়ির অজস্র কলকবজার মধ্যে থেকেই।

ফিউরিয়াস হয়ে গেছিল গজানন। সাঁড়াশির মতো আঁকড়ে ধরা হাতটাকে ছাড়াতেও পারছে না, ধস্তাধস্তিই সার।

আবার সেই স্টিরিও মিউজিকের মতো হাসি হাসল এলোকেশী, 'আমার ব্যাগ রেখে এসেছি দেখছেন না? আপনারটাও রেখে আসুন। কমপিউটার চেকিং হবে।'

কমপিউটার চেকিং। সেটা আবার কী?

গজগজ করতে-করতে নেমে এল গজানন। কলের হাত ওর হাত ছেড়ে দিয়েই আচমকা পেছন থেকে এমন একটা পদাঘাত করল পশ্চাৎদেশে যে ছিটকে গিয়ে দড়াম করে দরজার ওপর পড়ল গজানন দ্য গ্রেট

এবং দরজা স্পর্শ করার আগেই পাল্লা খুলে গেল আপনা থেকে। তাল সামলাতে না পেরে গজানন মুখ থুবড়ে পড়ল ভেতরে।

এ অবস্থায় গজানন কেন, স্বয়ং দশাননও মাথার ঠিক রাখতে পারে না। তিড়িং করে লাফিয়ে মোটরটাকে তুলে আছাড় মারবে বলে বেরোতে যাচ্ছে গজানন এমন সময় দরজা বন্ধ করে দিয়ে ছিটকিনি টেনে সামনে এসে দাঁড়াল এলোকেশী।

আশ্চর্য এইটুকু সময়ের মধ্যেই ভোল পালটে ফেলেছে। জিনস প্যান্ট আর ঢিলে শার্ট অন্তর্হিত হয়েছে। পরনে শুধু ব্রা আর ব্রিফ। ফরসা বডিখানা লীলায়িত ভঙ্গিমায় মেলে ধরেছে গজাননের সামনে। কণ্ঠে মদির আহ্বান, 'গজানন, এখন আমাদের আধঘণ্টার রেস্ট। কাম, এনজয়—আই ওয়ান্ট ইউ।'

বলে কী হারামজাদি! আই ওয়ান্ট ইউ বললেই হল! গজানন কি তেলেভাজা যে ফুটপাতে কিনতে পাওয়া যায় এবং খাওয়া যায়?

কিন্তু...কিন্তু গজানন এরকম হকচকিয়ে যাচ্ছে কেন? ঘরের মায়াময় আলো-আঁধারির জন্যে কি? ছোট্ট ঘর। একপাশে পুরু গদির ডাবল বেড। গজাননকে ওই দিকেই ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে প্রায় বিবসনা এলোকেশী। গজাননের সর্বাঙ্গ অসাড় হয়ে আসছে। হাত বাড়িয়ে গজাননের সার্টের বোতাম খুলে দিচ্ছে এলোকেশী। খাটে বসে পড়েছে গজানন। ভ্যাবা গঙ্গারামের মতো চেয়ে রয়েছে এলাকেশীর সরীসৃপের মতো ক্ষিপ্রতার দিকে। পাশের ছোট্ট টেবিল থেকে একটা মদের বোতল তুলে নিয়ে দুটো গেলাসে ঢেলে একটা এগিয়ে ধরেছে গজাননের দিকে। না...না...গজানন সুরাপান করবে না...কিছুতেই না...! এলোকেশী দু-হাতে দুটো গেলাস নিয়ে সবলে জাপটে ধরেছে গজাননকে—ঠোঁটে ঠোঁট...গরম হলকায় যেন পুড়ে যাচ্ছে গজাননের মুখ...কিন্তু মুখ সরাতে পারছে না...লিপস্টিকে মুখ মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে—তবুও না—গজানন চিৎ হয়ে পড়ে গেছে খাটে। গেলাস দুটো টেবিলে রেখে টান মেরে ট্রাউজার্সটা খুলে দিল এলোকেশী। চকিতে গজাননের দিকে পেছন ফিরেই ব্রায়ের মধ্যে থেকে একটা হোমিওপ্যাথিক গ্লোবিউলের মতো সাদা জিনিস বের করে ফেলে দিল একটা গেলাসে। পরমুহূর্তেই দুটো গেলাস নিয়েই ঘুরে দাঁড়াল গজাননের দিকে। যে গেলাসে পড়েছে সাদা গ্লোবিউল, সেই গেলাসটা ঠুসে ধরল গজাননের হাঁ করা ঠোঁটের মধ্যে।

আর একটু হলেই সুরাপান করে বসত গজানন। তারপর 'ইয়া আল্লা' বলে ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিত নিজেকে। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে ছোট্ট ঘরের একদিকের দেওয়ালের খানিকটা সরে যেতেই চৌকো খুপরির মধ্যে দিয়ে আবির্ভূত হল একটা বিকটাকার মুখোশ—শূন্যে ভাসছে। মুখোশের দাঁতের ফাঁকে একটা সিগারেট। সিগারেটের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল একটা ছোট্ট বুলেট—ঢুকল এলোকেশীর রগে।

গজাননের ঠোঁটের সামনে থেকে মদিরাপাত্র ছিটকে গেল খাটে। এলোকেশী তার নরম বুক নিয়ে শিথিল দেহে পড়ে রইল গজাননের ওপর।

গজানন এখন জামাপ্যান্ট পরে নিয়েছে। আঙুল দিয়ে আঁচড়াচ্ছে মাথার লম্বা চুল। ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে রামভেটকি এবং ডক্টর সিঙ্কারো নামে সেই দাড়িওলা বৃদ্ধ যিনি কিনা এককালে হিটলারের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন।

ডক্টরের হাতে রয়েছে বিদঘুটে সেই অস্ত্র। জোরালো স্পট লাইটের তলায় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছেন।

রামভেটকি হাসি গোপন করার চেষ্টা করে বলছে, 'মাই ডিয়ার গজানন, আপনার [illegible] হচ্ছিল বলে এলোকেশীকে শট ডেড করা হয়েছে একথা যেন ভাববেন না।

কটমট করে তাকাল গজানন, 'টার্গেট ছিলাম নিশ্চয় আমি?'

জিভ কাটল রামভেটকি। গরিলামুখে জিভ কাটার ফলে আরও হাস্যকরই দেখাল শ্রীহীন মুখাবয়ব।

বলল, 'ও নো। কমপিউটার চেকিং-য়ে ধরা পড়ল এলোকেশী ডাবল গেম খেলে চলেছে।'

'মা—মানে?'

'দরজার ফ্রেমে লাগানো আপনার ক্যামেরার ফিল্মে কার ছবি উঠেছে জানেন? এলোকেশীর। বিটকেল ওই হাতিয়ার নিয়ে বেরিয়ে আসছে আপনার ঘর থেকে।'

'এলোকেশী।'

'ও ইয়েস। যাকে আপনি এনজয় করতে যাচ্ছিলেন।'

'শাট আপ।'

'এলোকেশীই প্রথম গিয়েছিল আপনাকে সাবাড় করতে—তখন আপনি ঘরে ছিলেন না নিশ্চয়—'

'ডাইনিং রুমে গেছিলাম।'

'রাইট। তারপরেই এল সেই লোকটা। তার ফটোও উঠেছে সিক্রেট ক্যামেরায়।'

গজাননের গজমস্তিষ্কে একটা সূক্ষ্ম চিন্তা স্মৃতির আকারে ঝাঁ করে দেখা দিল সেই মুহূর্তে। মস্তিষ্ক কখন যে কী করে বসে তা তাবড় মস্তিষ্কবিশারদরাও জানেন না। তাই আচম্বিতে গজাননের মনে পড়ে গেল সল্টলেকের ত্রিশূল ঘাঁটির দোতলায় দাঁড়িয়ে যখন যে নস্যগ্রহণ করছে, নিচের বাগানে সন্ধের আঁধারে সাঁৎ করে মিলিয়ে গেছিল একটা ছায়ামূর্তি। তড়িঘড়ি নিচে নেমে এসে দেখেছিল খান বুদোশের কবন্ধ দেহ।

এলোকেশীই কি তাহলে...?

সন্দেহটা মুখে প্রকাশ করতেই রামভেটকি সায় দিলে, 'রাইট ইউ আর। খান বুদোশ অনেক জানত। তাই মুন্ডু উড়িয়ে দিয়েছিল এলোকেশীই—ইস তখন যদি জানতাম।'

'হারামজাদি ওই জন্যেই সরিয়ে দিয়েছিল আমাকে, 'দাঁত কিড়মিড় করে গজানন।

গলা খাঁকারি দিলেন ডক্টর সিঙ্কারো। ভালো বাংলায় বললেন, 'মহাশয়গণ, এই সেই অস্ত্র যার গোপন ফরমুলা হিটলার ছাড়া কাউকে জানানো হয়নি।'

সিঙ্কারো এখন ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। হাতে সেই ভয়াল অস্ত্র।

বলছেন, 'অজানা এক দো-আঁশলা ধাতু দিয়ে এর বডি তৈরি হয়েছে। সামান্য তাপ পেলেই রবারের মতো ফুলে উঠতে থাকে। তারপর আগের অবস্থায় ফিরে যায় হঠাৎ। চেম্বারে যে অ্যাটমিক রিঅ্যাকশন ঘটে, তার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে দেয় প্রচণ্ড প্রেসার দিয়ে। এক সেন্টিমিটার ডায়ামিটারের গোল বুলেট ঠিকরে গিয়ে ফাটে ছোট্ট অ্যাটম বোমার মতো—কিন্তু শব্দ হয় না। নিশ্চিহ্ন করে দেয় টার্গেট।'

চোয়াল ঝুলে পড়েছিল গজাননের। রবারের মতো বেড়ে যায় এ আবার কী ধাতু?

রামভেটকি কিন্তু চোয়াল শক্ত করে বললে, 'এরকম কটা গুলি আছে ভেতরে।'

'আরও ছত্রিশটা।'

'মাই গড।'

'এই ট্রিগারটা টিপলেই—'

ঘরে ঢুকল একটি মূর্তি। পুরুষ। ভাবলেশহীন মুখে রামভেটকির দিকে তাকিয়ে বললে, মেসেজ এসেছে জিরো ওয়ান ফোর টু থেকে।'

গজাননের ঝোলা চোয়াল উঠে এসেছিল লোকটাকে দেখেই। আচমকা সুড়সুড় করে উঠেছিল গালের কাটা দাগটা। অজান্তেই হাত বুলিয়ে ফেলতেই মাথার মধ্যে সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল।

রামভেটকি আর সিঙ্কারো দেখলেন শুধু আশ্চর্য দৃশ্য। দাঁড়িয়ে থেকেই বডি থ্রো করল গজানন। দু-হাত সামনে প্রসারিত। ক্যাঁক করে পুরুষমূর্তির গলা টিপে ধরে হেঁকে উঠল ছাদ কাঁপানো স্বরে—'অত উঁচু থেকে পড়েও মরিসনি?'

রহস্য! রহস্য! রহস্য!

কে এই আগন্তুক যাকে দেখেই গজাননের তাৎক্ষণিক পাগলামি চাগিয়ে উঠল?

এই সেই আততায়ী—বোম্বাই হোটেলে যে বিকট হাতিয়ার নিয়ে গজাননকে কবন্ধ বানাতে গেছিল—গজাননের হাতে হাতিয়ার দেখেই জানলা দিয়ে লাফ মেরেছিল। কিন্তু সে কি মরেনি?

'মরেছিল। হাড়গোড় ভেঙে পিণ্ডি পাকিয়ে গেছিল।'

'তবে এ লোকটা কে?'

'তারই ডবল।'

রহস্য পরিষ্কার হয়েছিল আস্তে-আস্তে অনেক জেরা এবং অনেক কাণ্ডকারখানার পর।

অবতার সিং-এর নকল সাজিয়েছিল ত্রিশূল আসল অবতার সিংকে বাঁচাবার জন্যে। বিকট হাতিয়ারের কোপটা তাই গেছে নকল অবতারের মুন্ডুর ওপর দিয়ে।

কিন্তু যারা এই নৃশংস কাণ্ড করে চলেছে, তারা নকল মানুষ বানানোর ব্যাপারে এগিয়ে গেছে আরও কয়েক ধাপ। যে-কোনও প্রাণীর দেহকোষ থেকে সম্পূর্ণ সেই প্রাণীটাকে সৃষ্টি করতে পারে ল্যাবরেটরিতে। এক কথায় যাকে বলে ক্লোনিং। আফ্রিকান ব্যাঙকে ক্লোন করে নকল ব্যাঙ তৈরির পর নোবেল পুরস্কার বিজয়ী এক বৈজ্ঞানিক হুঁশিয়ার করেছিলেন—'খবরদার। মানুষ ক্লোন করতে যেও না। দানব তৈরি হয়ে যেতে পারে।'

গুপ্ত শত্রুরা ঠিক তাই করেছে। রামভেটকির এই বিশ্বস্ত অনুচরটিকে মদের আড্ডায় ঘুম পাড়িয়ে তার হাতের চামড়া চেঁচে নিয়ে সেই কোষ থেকে বানিয়েছিল হুবহু দুই অনুচর। একজনকে পাঠানো হয়েছিল গজানন নিধনে। আর একজন মোতায়েন রয়েছে ত্রিশূলেরই এই গোপন আস্তানায়। গজানন যদি তাকে চিনে না ফেলত, না জানি আরও কত নৃশংস কাণ্ড ঘটিয়ে ছাড়ত দানব-মগজওলা এই নকল পুরুষটি।

'আসল অনুচরটি তাহলে এখন কোথায়?'

'সব চেয়ে কঠিন প্রশ্ন!'

জবাব পেতে কালঘাম ছুটে গেছিল ত্রিশূলবাহিনীর। নিষ্ঠুর নিপীড়নে প্রাণটাকে শুধু টিকিয়ে রেখেছিল নকল অনুচরদের মধ্যে। তারপর হিপনোটিক সাজেশানের পর বেরিয়ে এল জবাবটা।

আন্দামান আর নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের যে ক'টি দ্বীপে আগ্নেয়গিরি আছে, তারই একটিতে নিবিড় বনানীতে ভারত-শত্রুদের ঘাঁটিতে বন্দি রয়েছে ত্রিশূলের পরম বিশ্বস্ত এই অনুচরটি। হয়তো তার দেহকোষ থেকে অ্যাদ্দিনে তৈরি হয়ে গেছে আরও অনেক চলমান দানব।

ডুবো জাহাজ চলেছে আন্দামানের জলতল দিয়ে। ভারত সরকারের সাবমেরিন। যেন একটা তিমি মাছ।

আগ্নেয়দ্বীপে দিবালোকে বা নিশীথ রাতে ডাঙায় নামা বিপজ্জনক, এ খবরটা আগেই দিয়ে রেখেছিল নকল অনুচর। তাই এই ব্যবস্থা।

গজানন গ্যাঁট হয়ে বসে ছোট্ট একটা চেম্বারে। বেপারীটোলা লেনের অফিসে বসে থাকার মতোই পোজ মেরে রয়েছে। মুখ দেখে মনে হচ্ছে যেন বেড়াতে বেরিয়েছে। মাথার কোটরে যে চিন্তাকীট রাশি-রাশি কুরেকুরে খাচ্ছে, তা প্রকাশ পাচ্ছে না মোটেই। একেই বলে গুরুর ট্রেনিং।

গুরুর নির্দেশটাও সুরুৎ করে চলে যাচ্ছে মগজের অযুত নিযুত রন্ধ্রের মধ্যে দিয়ে। দেশের সেবায় এই দেহমন্দিরকে উৎসর্গ করে চলেছে গজানন দ্য গ্রেট। শত্রুপুরীতে প্রবেশ করবে একা। তারপর?

তারপর নাস্তি।

রামভেটকি এসে দাঁড়াল সামনে। গরিলাআননে সংশয়। পারবে তো গজানন দুর্ভেদ্য দুর্গকে ভেতর থেকে উড়িয়ে দিতে?

গজানন সটান চাইল রামভেটকির চোখে-চোখে। মাথার মধ্যে চিন্তাকীট রাশি-রাশি ফুসফাস করে মিলিয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। রামভেটকির ওই সংশয় ভরা চাহনি নিমেষে পালটে দিয়েছে গজাননের মুখচ্ছবি। কঠিন প্রত্যয় আর সর্বনাশা জেদ ফের মাথাচাড়া দিয়েছে।

বললে সংক্ষেপে, 'নামবার সময় হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

গজানন এখন দ্বীপে দাঁড়িয়ে। সাবমেরিন বিদায় নিয়েছে। ইষ্টমন্ত্র জপ করতে গিয়ে পুঁতিবালার নাম স্মরণ করে ফেলেছে গজানন বেশ কয়েকবার। ভাবনাটা যে শুধু ওকে নিয়েই। ছাতার তলায় ছিল এতদিন। গজানন অক্কা পেলে ভেসে যাবে বেচারি। রূপ আর যৌবন...

অন্ধকার অন্ধকার...চারিদিকে নি:সীম অন্ধকার। আশেপাশে ছোট-বড় গাছের ভিড়। পেছনে সমুদ্রের বিরামবিহীন কলরব। রাতজাগা প্রাণীও কি নেই ছাই এই ভয়ঙ্কর দ্বীপে?

এত নৈ:শব্দ্য ভালো লাগছে না গজাননের। পায়ে-পায়ে নিবিড় বনানী ছাড়িয়ে এক চিলতে ফাঁকা জায়গায় আসতেই আচম্বিতে সারা দেহে অনুরণন অনুভব করল গ্রেট জি।

প্রতিটি লোমকূপ যেন তরঙ্গায়িত হচ্ছে। গোড়ায়-গোড়ায় যেন বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হচ্ছে। বডিটাও বেশ হালকা লাগছে। পা ফেলতে গিয়ে সেটা আরও ভালোভাবে টের পাওয়া গেল। পা-খানা মাটিতে পড়ল না।

জোর করে পা দিয়ে মাটি স্পর্শ করতে গিয়ে পেছনের পা-খানাও উঠে এল মাটি ছেড়ে—গজানন না চাইতেই।

পায়েদের এবম্বিধ অবাধ্যতা গজানন অন্তত সইতে পারে না।—কোনওমতেই না। হেঁট হয়ে তাই দেখতে গেছিল পা দু-খানা আছে কোথায়...

চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ।

দুটো পা-ই মাটি থেকে অনেক ওপরে। তা প্রায় দশফুট তো বটেই। অন্ধকারে সঠিক মালুম হচ্ছে না। তবে হাড়ে-হাড়ে টের পাওয়া যাচ্ছে একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

গজানন শূন্যে ভেসে উঠেছে। এবং আরও উঠছে। দেখতে-দেখতে গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে দেহমন্দির উঠে এল বেশ উঁচুতে।

আর তারপরেই দেহময় বিদ্যুৎপ্রবাহ এমনই প্রবল হয়ে উঠল অকস্মাৎ যে জ্ঞান লোপ পেল গজাননের।

গজানন জ্ঞান ফিরে পেয়েছে। প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে আছে। মাথার ওপর জ্বলছে চৌকো টালির মতো একটা সাদা আলো। নরম আভায় চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে না।

চোখের মণি ঘুরিয়ে (দেহ না নাড়িয়ে) আশপাশ দেখে নিল গজানন। জ্ঞান ফিরে পেলেই তথাকথিত নায়কদের মতো 'আমি কোথায়?' বলার ট্রেনিং সে পায়নি। ব্যাপারটা গুরুতর, তা আঁচ করেছে চৈতন্য ফিরে আসতেই। তার আগে জানা দরকার, বেলুনের মতো শূন্যে ভাসিয়ে তাকে আনা হয়েছে কোথায়।

বিশাল গহ্বর মনে হচ্ছে না? আশেপাশে অনেকদূর পর্যন্ত ফাঁকা তারপর পাহাড়ের দেওয়াল বলেই তো মনে হচ্ছে। সে দেওয়াল আঁধারের মাঝে উঠে গেছে অনেক ওপরে—অনেকটা গম্বুজঘরের মতো গোল হয়ে জড়ো হয়েছে মাথার ওপর।

চৌকো আলোক-টালির ফাঁক দিয়ে বহু উঁচুতে দেখা যাচ্ছে রন্ধ্রপথ। পর্বতচূড়া নি:সন্দেহে। আকাশ আর তারা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে সুস্পষ্ট।

জয় মা কালী! এ কোথায় এনে ফেললে মা আমাকে! এ যে ফোঁপরা পাহাড়। প্রকৃতিতে এরকম বিস্ময় বিরল নয়, তা জানে গজানন। নেচার বহুত মিস্টিরিয়াস। কি-কিন্তু শত্রু ঘাঁটি এহেন স্থানে।

জুল-জুল করে চেয়েই রইল গজানন। একটা আঙুল আগে নাড়াল। নড়ছে। তারপর টের পেল সারা দেহটাই নাড়ানো যাচ্ছে। অর্থাৎ, শত্রুপক্ষ তাকে না বেঁধেই ফেলে রেখে গেছে। তোবা! তোবা! কিন্তু কেন? লম্ভ দিয়ে চম্পট দেবে নাকি?

কিন্তু তা হল না। ওই একটু আঙুল নাড়ানোতেই সজাগ হয়ে উঠেছিল পাশের একটা যন্ত্র। দেখতে অবিকল স্টার ওয়ার্স সিনেমার পিপে রোবটের মতো। যন্ত্রচক্ষু এতক্ষণ সজাগ নজর রেখেছিল তার ওপর। এবার সরব হল যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর।

'গজানন মহাশয়, আপনি অযথা নড়িবেন না। প্রাণ যাইতে পারে।'

ওরেব্বাস! এ যে সাধু ভাষায় কথা বলে। গলার আওয়াজটা যদিও খাসা—স্টিরিও বাজনার মতো।

যথাসম্ভব মধুর কণ্ঠে গজানন বললে, 'বৎস রোবট, আমাকে এই স্থানে লইয়া আসিয়াছ কেন?'
'আপনার মস্তিষ্ক কাটিয়া ক্লোনিং-কপি রোবট বানাইব বলিয়া।'
'ভেতরে-ভেতরে আঁতকে উঠলেও গজানন অকস্মাৎ অট্টহাস্য করে উঠল। যন্ত্ররা বিরক্ত হতে জানে না। তাই অবিচল কণ্ঠে বললে, 'হাস্যের কারণ জানিতে পারি কি?'
'নিশ্চয়, নিশ্চয়। বৎস রোবট—'
'আমার নাম সি-কে-টু-ফোর।'
'ওকে! ওকে! মাই ডিয়ার সি-কে-টু-ফোর, আমি যে অলরেডি রোবট।'
'প্রাঞ্জল করিয়া বলুন।'
'আমি উন্মাদ হইয়া গিয়াছিলাম। মানসিক ডাক্তার আমার ব্রেনটাকে বদলাইয়া দিয়া সুস্থ করিয়াছে।'
'ব্রেন স্ক্যান করিয়া সেরূপ কোনও লক্ষণ দেখা যায় নাই।'
'তোমাদের যন্ত্রে দেখা যাইবে না। ইহা এক প্রকার কেমিক্যাল হরমোন—ধাতু নয় যে দেখা যাইবে।'
'কেমিক্যাল হরমোন?'
'ইয়েস মাই ডিয়ার সি-কে-টু-ফোর, ইতিপূর্বে ক্লোনিং-কপি রোবট বানাইয়াছ এবং আমাকে খতম করিবার জন্য পাঠাইয়াছ, তাহাদের আমি খতম করিয়াছি এই কারণেই।'
যন্ত্র চুপ। আর এক দফা অট্টহাসি হাসল গজানন।
বলল, 'শূন্যপথে আনিলে কীভাবে আমাকে?'
'হাইপার ফোর্স দ্বারা।'
'সে বস্তুটা কী?'
'অ্যান্টিগ্র্যাভিটি।'
'সে তো কল্পবিজ্ঞানে হয় শুনিয়াছি।'
'বিজ্ঞান তাহার হদিশ জানিয়াছে। এই পৃথিবীতেই ছ'শো ফুট ওপর পর্যন্ত হাইপার ফোর্সের অস্তিত্ব রহিয়াছে। আমরা কেবল তাহাকে জোরদার করিয়াছি।'
'উত্তম করিয়াছ। এবার আমাকে ছাড়িয়া দাও।'
'তৎপূর্বে আপনার ব্রেনের কেমিক্যাল টেস্ট হইবে।'
'তোমার মুন্ডু হইবে,' বলেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছে গজানন, এমন সময়ে থ হয়ে গেল পুঁতিবালাকে দেখে।
বহু উঁচু থেকে পাহাড়চুড়োর ছিদ্রপথ দিয়ে লম্বভাবে সটান শূন্যপথে নেমে এল একটা নারীমূর্তি। দাঁড়াল তার সামনে।
পুঁতিবালা। কটমট করে তাকিয়ে আছে সি-কে-টু-ফোরের দিকে। সি-কে-টু-ফোর যেন সন্ত্রস্ত হল সেই মূর্তি দেখে। কয়েক ইঞ্চি পেছনে সরেও গেল। কিন্তু তার আগেই ধেয়ে গেল পুঁতিবালা। খোঁপা থেকে একটা চুলের কাঁটা বের করে ঢুকিয়ে দিলে রোবটের অনেকগুলো ফুটোর একটায়।
সবক'টা আলো নিভে গেল সি-কে-টু-ফোরের গায়ে, গোঙানির মতো একটা যান্ত্রিক আওয়াজ কেবল নির্গত হল স্পিকার থেকে।
ঘুরে দাঁড়াল পুঁতিবালা। বললে খুব সহজ গলায়—'ফিউজ করে দিলাম।'
'তু-তুই এখানে কীভাবে এলি?' গজানন হতবাক।
'সে অনেক কথা। পরে শুনবে, হারামজাদারা অনেক আগেই এনেছিল আমাকে। এদের বস ব্যাটাচ্ছেলের নিজের বউ আছে—কিন্তু পরকীয়া লোভী কিনা—তাই...' নিগূঢ় হাসল পুঁতিবালা।
গা পিত্তি জ্বলে গেল গজাননের।
'এখানেও ওই সব করছিস।'

'ডিউটি ফার্স্ট', উৎকট গম্ভীর মুখে বললে পুঁতিবালা, 'বাকি সব নেক্সট। পুরো তল্লাটটার খবর নেওয়া হয়ে গেছে। ওরা মোট ন'জন আছে। ওদিকের স্টিল চেম্বারে একজনকে ক্লোনিং কপি রোবট বানাচ্ছে—আমাকেও করত। পরকীয়ার জোরে—' ফিক করে হেসে ফেলে পুঁতিবালা।

'কী করবি এখন?' রাগ চেপে বলে গজানন।

'এসো আমার সঙ্গে,' এগিয়ে যায় পুঁতিবালা হরিণীর মতো ক্ষিপ্র গতিতে। গজাননও চলে পেছন-পেছন।

সাদা হেলিকপ্টারের সামনে দাঁড়িয়ে বললে পুঁতিবালা, 'চালাতে জানো?'

'সব জানি।'

'তবে উঠে বোসো।'

'তারপর? পাহাড়ের ওই ফুটো দিয়ে হেলিকপ্টার তো বেরোবে না।'

'ফুটো দিয়ে নয়, এই বোতামটা টিপলেই—' পাহাড়ের গায়ে একটা বোতাম টিপল পুঁতিবালা—'চিচিং ফাঁক করে।'

হলও তাই। পাথুরে দেওয়াল সরে গেল একপাশে। স্টিল ডোর। পাথরের মতো নকশা করা বলে পাথুরে দেওয়াল বলে মনে হয়েছিল এতক্ষণ।

সামনে খোলা চত্বর। তারপর...

পুঁতিবালাকে ফেলেই ভেতরে উঠে গেল গজানন। রামভেটকির দাপটে তাকে অনেক কিছুই শিখতে হয়েছে। এবার তা কাজে লাগাল।

কিন্তু পুঁতিবালা আসছে না কেন?

হেঁকে ডাকা তো যাচ্ছে না। মুখ বাড়িয়ে চক্ষু স্থির হয়ে গেল গজাননের।

লাল রঙের একটা পেল্লায় ঘড়ির কাঁটা ঘুরোচ্ছে পুঁতিবালা। ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে এক জায়গায় রেখেই দৌড়ে এসে উঠে পড়ল হেলিকপ্টারে।

বললে রুদ্ধশ্বাসে, 'ঝটপট চলো। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সরে যেতে হবে। আওয়াজ পেয়ে ওরা ছুটে এলেই —'

আর বলতে হল না গজাননকে। ইঞ্জিন স্টার্ট করে হেলিকপ্টার চালু করল চক্ষের নিমেষে। পর্বতকন্দর থরথর করে কেঁপে উঠল ভীষণ আওয়াজে। হইহই আওয়াজ শোনা গেল দূরে। ঘাড় কাত করে দেখল গজানন ন'টা মূর্তি ছুটে আসছে এদিকে। দুমদাম শব্দে তপ্ত বুলেট ঠিকরে আসছে ওদের দিকে।

আর তাকায়নি গজানন। ঈষৎ কাত হয়ে হেলিকপ্টার চক্ষের নিমেষে বেরিয়ে এল পাহাড়ের বাইরে এবং সেইভাবেই ছিটকে গেল আকাশের দিকে।

পাঁচমিনিট পূর্ণ হতেই পুঁতিবালার হাতে সেট করা টাইম বোমা বিস্ফোরিত হল।

বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। আন্দামানের সেই দ্বীপটি আজ প্রায় নিশ্চিহ্ন বললেই চলে।

গুপ্তচর বাহিনীর বাকি ঘাঁটিগুলোও নির্মূল হয়েছে এরপরে পুঁতিবালার সংগৃহীত তথ্যের বলে।

অতএব অতীব রোমাঞ্চকর এবং অবিশ্বাস্য এই কাহিনিরও সমাপ্তি এইখানে।

** 'দ্বীপবাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত। (শারদীয় সংখ্যা।)*

ব্রোঞ্জের গণেশ

প্রথম দৃশ্য

(বসবার ঘর। ছন্দা বসে আছে। মনীশ নাগরাজনকে টানতে-টানতে ঢুকছে।)

মনীশ—ছন্দা, ছন্দা—দ্যাখো, কে এসেছেন। আসুন, আসুন স্যার, বসুন। ভাগ্যিস দেখা হয়ে গেল। ধরে না আনলে তো আর আসতেন না।

ছন্দা—কী ব্যাপার, কাকে ধরে আনলে। ও, মি: নাগরাজন—নমস্কার।

নাগরাজন—নমস্কার।

মনীশ—দারোগাসাহেবকে ধরে আনলাম—উনি দারোগা, সবাইকে ধরেন-টরেন। আজ আমাকেই ধরে আনতে হল ওঁকে।

ছন্দা—খুব খুশি হলাম, মি: নাগরাজন। ভাবতেই পারিনি গরিবের ঘরে আপনার পায়ের ধুলো পড়বে।

নাগরাজন—Please, অমন করে বলবেন না, ম্যাডাম। জানেনই তো আমাদের যা কাজ। তবে একথা বিশ্বাস করতে পারেন যে, আজ আপনাদের এখানেই আসছিলাম।

মনীশ—আপনি তো তাহলে অনেকদিন জ্বালাবেন।

নাগরাজন—জ্বালাব? মানে?

মনীশ—জ্বালাবেন বইকি। একটু আগেই আমাদের মধ্যে কথা হচ্ছিল আপনাকে নিয়ে। ভাগ্যিস সেদিন আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল—নইলে ওর হারানো হাত ঘড়িটা তো আর ফিরে পেতাম না। নতুন জায়গায় এসেছি। সঙ্গে-সঙ্গে একটা অমঙ্গল ঘটলে মন খারাপ হয়ে যেত না? উ:, চিমটি কাটছ কেন?

নাগরাজন—সাজপোশাক দেখে মনে হচ্ছে আপনারা কোথাও বেরুচ্ছিলেন। আমি এসে শুভযাত্রায় বাদ সাধলাম নিশ্চয়ই। আমি বরং—

মনীশ—আরে না মশাই। রাখুন আপনার ওঠা। আপনি এলেন আর আমরা বেড়াতে বেরুব? না, না। তার চেয়ে বরং Let us celebrate your presence today. কী বল?

ছন্দা—আপনারা বসুন—আমি আসছি।

নাগরাজন—না, না, আপনি আবার কেন ব্যস্ত—

ছন্দা—আ:, আপনি বসুন তো চুপচাপ। এ বাড়িতে আমি গিন্নি তা জানেন?

(ছন্দার প্রস্থান)

নাগরাজন—(সপ্রশংসভাবে) Really she is a gem. সত্যি মশাই—স্ত্রীভাগ্য আছে বটে আপনার।

মনীশ—ওকে নিয়েই তো আছি মশাই। ওর জন্যেই সব ছেড়েছি, বাপ মায়ের স্নেহ হারিয়েছি। আবার ওর মধ্যেই পেয়েছি ঘরের সমস্ত উত্তাপ উষ্ণতা। যা হারিয়েছিলাম সব পেয়েছি। জানেন ইন্সপেক্টর, ও ছাড়া আমার আর কেউ নেই এ সংসারে।

নাগরাজন—শুনে খুশি হলাম। যাক, মাইশোর কেমন লাগছে বলুন?

মনীশ—প্রথম-প্রথম তো সব জায়গাই ভালো লাগে। বিশেষ করে মহীশূরের মতো সুন্দর জায়গা কার না ভালো লাগে। খুব বেড়াচ্ছি-টেড়াচ্ছি তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। তবে কতদিন এ চার্ম বজায় থাকবে তা জানি না।

নাগরাজন—থাকবে থাকবে মশাই। আমি তো প্রায় তিন বছর কাটিয়ে দিলাম। এখনও তো বেশ ভালো লাগছে। আপনাদের কলকাতার সেই কর্ম্মমুখর প্রাণচাঞ্চল্য এখানে নেই বটে—কিন্তু এখানকার এই নৈ:শব্দ্যই এর প্রাণ। থাকুন, ভালোবাসুন—তখন ছাড়তেই চাইবেন না।

মনীশ—(মুগ্ধভাবে) বা:! পুলিশে চাকরি করেও ভারি চমৎকার কবি-প্রকৃতি তো আপনার। বাংলা vocabulary তো বেশ strong করেছেন দেখছি। কী স্যার, লেখার অভ্যাস- টভ্যেস আছে নাকি?

(ট্রে হাতে ছন্দার প্রবেশ)

ছন্দা—খুব তো জমিয়ে গল্প হচ্ছে। নিন এবার কিছু খেয়ে নিন।

নাগরাজন—Very good, দিন মিসেস সরকার। Mr. Sarkar জিগ্যেস করছিলেন, আমি সাহিত্যচর্চা করি কিনা। বলছিলাম আমার তো বই পড়াই হয়ে ওঠে না, লেখা দূরে থাক।

ছন্দা—ও হো, আপনি তো আসল ব্যাপারটাই জানেন না। আসুন পরিচয় করিয়ে দিই। Mr. Nagrajan আপনি যেমন পুলিশের কাজে গোয়েন্দাগিরি করেন, ইনি মনীশ সরকার তেমনি বাংলা পাঠক সমাজে গোয়েন্দা কাহিনি লিখে বিলক্ষণ দুর্নাম কিনেছেন সেই সাথে আমাকেও ডুবিয়েছেন। আ: চুল টানছ কেন?

নাগরাজন—By jove, আপনি ডিটেকটিভ গল্প লেখেন নাকি?

ছন্দা—আপনি মশাই, ওর কাছে খুনের গপ্পটপ্প করবেন না যেন। ঘুমিয়ে জেগে সবসময়ে তো খুন করে চলেছে। কোনওদিন না আমাকেই—

নাগরাজন—(হেসে) না: আপনাদের দেখছি কস্মিনকালেও বনিবনা হবে না।

মনীশ—নতুন কী অ্যাডভেঞ্চার করলেন মশাই?

নাগরাজন—অ্যাডভেঞ্চার বলতে যা বোঝায় ঠিক তা নয়, তবে সম্প্রতি একটা অদ্ভুত খুনের ঘটনা আমাকে বড়ই ভাবিয়ে তুলেছে।

মনীশ—তাই নাকি! কী ব্যাপারটা বলুন তো?

নাগরাজন—অবশ্য অত্যন্ত গোপনীয় ব্যাপারটা। মহীশূর রাজপরিবারের সমস্ত সম্মান নির্ভর করছে এই ব্যাপারটা সমাধানের ওপর। তবে আপনাদের বলতে বাধা নেই, কারণ আপনাদের আমি Family friend বলেই মনে করি। (একটু থেমে) ললিতা মহল দেখেছেন আপনারা?

মনীশ—কোন ললিতা মহল? গেস্ট হাউসের কথা বলছেন?

নাগরাজন—হ্যাঁ।

মনীশ—বাড়িটার কথা শুনেছি বটে। দেখা হয়ে ওঠেনি এখনও।

নাগরাজন—দেখে আসবেন একদিন। এখান থেকে মাইল চারেক দূরে মহারাজ কৃষ্ণরাজা ওয়াদিয়ার রাজবাড়ি। প্রাসাদ তোরণের সামনেই দেখবেন একটি Circle. ঠিক কেন্দ্র থেকে পরস্পর সমকোণে চলে গেছে দুটি রাস্তা। একটি রানি মহলের দিকে—নাম শুনেই বুঝতে পারছেন রানি মহল কী। আর একটা গিয়ে পৌঁছেছে এই ললিতা মহলে। মহীশূর রাজন্যবর্গের সম্মানিত অতিথিদের জন্য সংরক্ষিত গেস্ট হাউস। এই ললিতা মহলেই কয়েকদিন আগে পাওয়া গেছে একটি মৃতদেহ। হৃৎপিণ্ডের মাঝখান দিয়ে কেউ ধারালো সরু একটা শলাকা চালিয়ে দেওয়ার ফলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটে।

মনীশ—মৃত ব্যক্তি কে?

নাগরাজন—তাঁর কথা বলতে গেলে রাজপরিবারের একটা ছোট্ট ইতিহাস বলতে হয়।

মনীশ—বলতে বাধা থাকলে বরং থাক।

নাগরাজন—না, আপনাদের বলতে কোনও বাধা নেই। প্রথমেই বলে রাখি বর্তমান মহারাজা কৃষ্ণরাজা নি:সন্তান। এই সন্তান না হওয়ার পেছনে আছে এক করুণ অথচ Interesting কিংবদন্তী। বহু বছর আগে এ বংশের এক রাজকন্যা কুলদেবীর আরাধনায় উন্মাদিনী হয়েছিলেন। নিজেকে দেবীর চরণে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিয়ে দিবানিশি বিভোর হয়ে থাকতেন তাঁর পূজায়। একদিন তিনি মনস্থ করলেন তাঁর যাবতীয় রত্নালঙ্কার

দেবীকে উৎসর্গ করবেন নদীগর্ভে বিসর্জন দিয়ে। সমস্ত রত্নালঙ্কার তিনি সেই উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করতে শুরু করলেন। তখনকার মহারাজা ছিলেন তাঁর ভাই। তিনি বোনের এই সঙ্কল্পের কথা জানতে পেরে তাঁকে জানালেন—রাজপরিবারের সমস্ত অলঙ্কার আর রত্নরাজি দেশবাসীর। তাদের অমতে এবং অজ্ঞাতসারে কোষাগারের একরতি স্বর্ণও তিনি অপব্যয় করতে পারেন না। রাজভগ্নী বোঝাবার চেষ্টা করলেন—এ অপব্যয় নয়, দেবীর কাছে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু মহারাজ তাঁর সিদ্ধান্তে অটল। বোনের খেয়াল চরিতার্থ করতে দেশবাসীকে তিনি বঞ্চিত করতে পারেন না।

ছন্দা—Interesting গল্প তো—

নাগরাজন—সেই রাতেই নদীতীরে আবির্ভূত হল অভিমানী রাজকন্যার তপ:ক্লিষ্ট দেহ। বসনাঞ্চলে তাঁর যাবতীয় স্বর্ণালঙ্কার। সেই বিপুল ঐশ্বর্য হাতে নিয়ে তিনি নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে রাতের অন্ধকারে উচ্চারণ করলেন এক অভিশাপ বাণী—দেবীর চরণে অঞ্জলি সমর্পণে বাধা দেয় যে রাজবংশের মহারাজা, আজ থেকে সে রাজন্যবর্গ হবেন নি:সন্তান। এই বলে তিনি অলঙ্কার সমেত নদীগর্ভে তলিয়ে গেলেন।

মনীশ—কী ভয়ানক! তারপর?

নাগরাজন—তারপর উত্তাল উদ্দাম হাওয়া হাহাকার রবে আছড়ে পড়ল তাঁর ওপর—নি:শব্দ ক্রন্দন যেন। ফিরিয়ে আনতে চাইল তাঁকে। কিন্তু নদীগর্ভের আবর্ত আরও দুর্নিবার বেগে আবিল হয়ে আহ্বান জানালেন রাজকুমারীকে। মুহূর্তের মধ্যে পুঞ্জ-পুঞ্জ ফেনার মাঝে হারিয়ে গেল রাজকন্যার শুভ্র বরতনু—সেই সাথে যাবতীয় রত্নরাজি। এরপর থেকেই দেখা গেছে—সিংহাসনে সমাসীন এক মহারাজার সন্তান হয়েছে—কিন্তু পরবর্তী মহারাজা থেকেছেন নি:সন্তান। তাঁর পরবর্তী রাজার আবার সন্তান হয়েছে। জানি না এর মধ্যে অলৌকিক ব্যাপার আছে কিনা। কিন্তু বংশানুক্রমিক ভাবে এই ব্যাপারেই পুনরাবৃত্তি হতে দেখা গেছে। বর্তমান মহারাজা নি:সন্তান। প্রচলিত প্রথানুযায়ী তিনি পোষ্য নিয়েছেন যুবরাজ চন্দ্রকেতুকে।

ছন্দা—বাবা! দেবী তাহলে খুব জাগ্রত বলুন?

নাগরাজন—আজ্ঞে হ্যাঁ। সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই। তাঁর প্রসাদেই এ রাজ্যের আজ এত উন্নতি। কৈশোরেই এই চন্দ্রকেতুকে মহারাজ ইংলন্ডে পাঠিয়েছিলেন উচ্চশিক্ষার জন্য। Physics-এ ডক্টরেট নিয়ে আট বছর পর যুবরাজ যখন স্বদেশে ফিরলেন তখন তিনি আর একা নন—সঙ্গে তাঁর স্ত্রী পেট্রিসিয়া। পেট্রিসিয়া স্পেনের মেয়ে। পড়াশুনো করতে এসেছিলেন লন্ডনে। সেখানেই তাঁদের পরিচয়, প্রণয় এবং পরিণয়। মহারাজা যুবরাজকে স্নেহ করতেন প্রাণের চেয়েও বেশি। তাই অন্তরে শেল হানলেও ক্ষমা করলেন তাঁকে। কিন্তু যুবরানির থাকার ব্যবস্থা হল মূল প্রাসাদের বাইরে—রানি মহলে। যুবরাজ আপত্তি করলেন না। এসব ঘটনা ঘটে বছর তিনেক আগে। যুবরানির প্রথম আগমনে কিছুটা চাঞ্চল্যের সূত্রপাত হয়েছিল—কিন্তু কালের প্রবাহে ধীরে-ধীরে সবই স্বাভাবিক হয়ে আসে। মাসখানেক আগে যুবরানির এক বাল্যবন্ধু এলেন এখানে ভারতবর্ষ বেড়াতে। নাম এ্যান্টনি মার্সডেন।

ছন্দা—রানির লাভার নিশ্চয়।

নাগরাজন—হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। এই ললিতা মহলেই উঠেছিলেন। ললিতা মহলের বিরাট লাইব্রেরিতে আছে নানারকম সংগ্রহ। সেইসব নিয়েই মেতেছিলেন। প্রায় দিন সাতেক আগে মার্সডেনকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় এই লাইব্রেরির মধ্যে গণেশ মূর্তির পায়ের কাছে।

মনীশ—গণেশ মূর্তি?

নাগরাজন—হ্যাঁ। যুবরাজের সংগ্রহ বাতিক আছে। নানারকম মুদ্রা থেকে শুরু করে মূর্তি ইত্যাদি সংগ্রহ করে এক ছোট আর্ট মিউজিয়ামও করেছেন ললিতা মহলে। ব্রোঞ্জের তৈরি এই বিরাট গণেশ মূর্তিটি লাইব্রেরি রুমেই রাখা হয়েছে একটি সিংহাসনের ওপর। তারই পায়ের তলায় মার্সডেনকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। একটা সরু ধারালো অস্ত্র দিয়ে কেউ তার হৃৎপিণ্ডটা এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয় মৃতদেহের মুখে কোনও ভয় বা যন্ত্রণার চিহ্নমাত্র ছিল না। ছিল অপার বিস্ময়।

মনীশ—ঘরটা আপনি হত্যার পর দেখেছেন নিশ্চয়। কিছু ক্লু পাননি?

নাগরাজন—কিস্যু না। মার্সডেন মারা গেছে আগের রাত্রে—পোস্টমর্টেমে এর বেশি কিছু পাওয়া যায়নি।

মনীশ—সে রাত্রে গেস্ট হাউসে কে-কে ছিল?

নাগরাজন—মার্সডেন আর নিয়মিত দারোয়ান, বয়, বাবুর্চি—এরা ছাড়া আর কেউ না।

মনীশ—যুবরাজ?

নাগরাজন—যুবরাজ সে রাত্রে রাজধানী থেকে প্রায় মাইল দশেক দূরে রিজার্ভ ফরেস্টে শিকার করতে গিয়েছিলেন। সকালে খবর পাঠানো মাত্র ফিরে আসেন।

মনীশ—তাহলে মোটের ওপর কোনও দরকারি সূত্রই আপনি পাননি—তাই না?

নাগরাজন—একেবারে না।

মনীশ—আচ্ছা, ব্যক্তিগতভাবে কারও ওপরে সন্দেহ হয় না আপনার?

নাগরাজন—সন্দেহ আর কাকে করব? যতদূর জানা গেছে, মার্সডেনের সঙ্গে এ রাজ্যে পরিচয় ছিল শুধু দুজনের—যুবরাজ ও যুবরানির। এই ক'দিনের মধ্যে তাঁদের সঙ্গে শত্রুতা গড়ে ওঠাও অস্বাভাবিক। তাছাড়া ললিতা মহল থেকে উনি বাইরে বেরুতেন কদাচিৎ—বেরোলেও গন্তব্যস্থান ছিল রানিমহল। কিন্তু যুবরাজ ও যুবরানির alibi অকাট্য। একজন ছিলেন রানিমহলে। আর একজন রিজার্ভ ফরেস্টে। এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রমাণও পেয়েছি যথেষ্ট।

মনীশ—আশ্চর্য!

নাগরাজন—আরও আশ্চর্য হবেন যে, লাইব্রেরি ঘরের সমস্ত দরজা জানলা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। প্রত্যেকটি স্ল্যাস উইন্ডো আর দরজা শক্তভাবে আঁটা ছিল ভেতর থেকে। সকালে দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকার পর তাই দেখা গেছে।

মনীশ—বন্ধ ঘরের মধ্যে মৃতদেহ পাওয়া গেলে দুটো পথে এ রহস্যের সমাধান পাওয়া যেতে পারে। এক নম্বর—মৃতব্যক্তি আত্মহত্যা করেছে কিনা। দু-নম্বর—ঘরের মধ্যে কোনও গুপ্ত দরজা আছে কিনা। বিশেষ করে রাজা-মহারাজার বাড়ি যখন।

নাগরাজন—মি: সরকার, আমারও সেকথা মনে হয়েছিল। কিন্তু Postmortem report বলছে তীক্ষ্ণ শলাকাটা যেভাবে হৃৎপিণ্ডে বিঁধেছে, আত্মহত্যায় সেটা সম্ভব নয়। তাছাড়া অস্ত্রটাই বা যাবে কোথায়? সেটাও তো অনেক খোঁজা হয়েছে। কাজেই আত্মহত্যার প্রশ্নটা ধোপে টেকে না।

মনীশ—গুপ্ত দরজার খোঁজ করেছিলেন?

নাগরাজন—মহারাজকে আমার সন্দেহের কথা খোলাখুলি বলেছিলাম। উনি আমায় গেস্ট হাউসের পুরোনো নক্সা দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে ললিতা মহলের কোথাও নেংটি ইঁদুরের জন্যেও গুপ্তপথ রাখা হয়নি।

ছন্দা—আচ্ছা, আপনি যুবরাজ বা যুবরানির সঙ্গে এ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেননি? তাঁদের কী মত?

নাগরাজন—এটা অবশ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, সন্দেহ নেই। দেখুন, আপনাদের আমার ভালো লেগেছে। এসব ব্যাপার অত্যন্ত Secret, তবু এতটা যখন আপনাদের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করেছি, তখন সঙ্কোচের বাধা আর রাখব না। যুবরাজের সঙ্গে আমার যে আলোচনা হয়েছিল তা খুব প্রীতিকর নয়।

মনীশ—যেমন।

নাগরাজন—শুনুন তবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(রাজঘর। যুবরাজ চন্দ্রকেতু বসে আছেন দামি চেয়ারে।

নাগরাজন দাঁড়িয়ে সামনে, পুলিশি বেশে।)

চন্দ্রকেতু—এ কেস হাতে নিয়েছেন আপনি?

নাগরাজন—Yes, your হাইনেস।

চন্দ্রকেতু—সবাইকে জেরা করেছেন?

নাগরাজন—Yes, your—

চন্দ্রকেতু—কী বলে তারা?

নাগরাজন—রাত্রে ইনি ছাড়া এখানে কেউ ছিলেন না। দরজা জানলা ভিতর থেকেই বন্ধ ছিল। কোনও চিৎকারও শোনা যায়নি।

চন্দ্রকেতু—কী মনে হয় আপনার? Suicide ?

নাগরাজন—কোনও অস্ত্র তো পাওয়া যাচ্ছে না।

চন্দ্রকেতু—মার্ডার?

নাগরাজন—দরজা-জানলা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল, হাইনেস। খুনি এল কোথা দিয়ে গেলই বা কী করে?

চন্দ্রকেতু—খুনও নয়—আত্মহত্যাও নয়। Well, then ?

নাগরাজন—এ রহস্যের কিনারা করতে সময়ের প্রয়োজন।

চন্দ্রকেতু—বটে। সময় পেলে কিনারা করতে পারবেন? বেশ, দিলাম সময়। করুন কিনারা। You want my statement ?

নাগরাজন—If you please।

চন্দ্রকেতু—মার্সডেনের সঙ্গে আমার আলাপ মাত্র একমাসের আর গতরাত্রে আমি Forest-এ ছিলাম আমার অনুচরদের সঙ্গে—এই আমার জবানবন্দি। আর খুনি কে—তা যদি জানতে চান তাহলে শুনুন—খুনি আমি নিজে।

নাগরাজন—Your হাইনেস, আমি একজন নগণ্য কর্মচারী। আপনার পরিহাসের যোগ্য নই।

চন্দ্রকেতু—পরিহাসের সময় এটা নয় Inspector। আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, এটা আত্মহত্যা না খুন—আমি বলব খুন। যদি জিগ্যেস করেন, খুনি কে? বলব আমি স্বয়ং। তারপরের কাজটা—প্রমাণ করার দায়িত্বটা আপনার—আমার নয়। প্রমাণ করুন, আমি খুনি। সময় চাইছিলেন—সময় দিলাম।

(শিস দিয়ে প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(বসবার ঘর। নাগরাজন, ছন্দা আর মনীশ বসে রয়েছে।)

নাগরাজন—(চিন্তিতভাবে) যুবরাজ সময় দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু প্রায় একমাস হয়ে গেল Mr. Sarkar, এক পা-ও এগুতে পারলাম না।

মনীশ—যুবরাজের কথা শুনে আপনার কী মনে হল? সত্যিই কি তিনি—

নাগরাজন—ভগবান জানেন। যে সুরে তিনি কথা বললেন—তা থেকে সত্যি মিথ্যে ধরা অসম্ভব।

মনীশ—মার্সডেনের সঙ্গে কি যুবরাজের কোনওরূপ শত্রুতা থাকা সম্ভব? মানে যদি কোনও ত্রিভুজ প্রেমের ব্যাপার—

নাগরাজন—কী করে বলি বলুন? যদি সেরকম কিছু থেকে থাকেও, যুবরানির confession ছাড়া তো সেকথা জানা যাবে না কোনওদিন।

মনীশ—তাঁর Statement নেননি এখনও?

নাগরাজন—রাজাদের ঘরের বউয়ের নাগাল কি আর অত সহজে পাওয়া যায় মনীশবাবু। দরখাস্ত করেছি মহারাজের কাছে। এখনও অনুমতি মেলেনি। তবে গতকাল একটা চিরকুট পেয়েছি যুবরানির কাছ থেকে। এই দেখুন—

(নাগরাজন চিরকুট দিল মনীশের হাতে। মনীশ সামনে ধরে রয়েছে)

মনীশ—(নারীকণ্ঠে শোনা যায় চিরকুটের কথাগুলি) মার্সডেনের মৃত্যু রহস্য নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করলে উপকৃত হবেন। কোনও Signature নেই দেখছি। কবে যাচ্ছেন?

নাগরাজন—কাল যাওয়ার ইচ্ছে আছে। আপনিও চলুন না আমার সঙ্গে।

মনীশ—আমি—মানে—কিন্তু তিনি ডেকেছেন আপনাকে—আমাকে allow করবেন কেন?

নাগরাজন—সে দায়িত্ব আমার। দেখুন crime detection-এর দিক দিয়ে কলকাতা যে আজ ভারতবর্ষকে পিছনে ফেলে দিয়েছে তা আমার অজানা নয়। এদিক দিয়ে বাঙালিদের আমি শ্রদ্ধা করি। তা ছাড়া আপনি ডিটেকটিভ গল্প লেখেন—জেরা করার একটা সহজাত প্রবণতা থাকা আপনার স্বাভাবিক। কী বলেন, মিসেস সরকার?

ছন্দা—তা আর বলতে। আমি তো একেবারে জেরবার হয়ে যাচ্ছি দিনেরাতে।

(সকলে হেসে ওঠে)

মনীশ—কিন্তু।

নাগরাজন—আর কোনও কিন্তু নয়, তাহলে ওই কথাই রইল।

চতুর্থ দৃশ্য

(রানির ঘর। যুবরানি প্যাট্রিসিয়া, নাগরাজন আর মনীশ।)

প্যাট্রিসিয়া—Your name please ?

নাগরাজন—আলেক নাগরাজন—C.I.D. Inspector, যাকে আপনি আসতে বলেছিলেন। আর ইনি হচ্ছেন আমার বন্ধু মনীশ সরকার—বাঙালি। ইনি একজন অ্যামেচার প্রাইভেট ডিটেকটিভ।

প্যাট্রিসিয়া—বিশ্বাস করতে পারি নিশ্চয়ই?

নাগরাজন—আমাকে যদি পারেন—তাহলে ওঁকেও পারবেন।

প্যাট্রিসিয়া—বেশ, বলুন কী জানতে চান।

নাগরাজন—Your highness আমাকে আজ ডেকে পাঠিয়েছিলেন to discuss Mr. Marsden's death।

প্যাট্রিসিয়া—Right. But do you think it an ordinary death ?

নাগরাজন—Postmortem একে আত্মহত্যা নয় বলেই Report দিয়েছে।

প্যাট্রিসিয়া—Alright. আপনি কি জানেন It is a case of murder ?

নাগরাজন—Yes, your highness।

প্যাট্রিসিয়া—হত্যাকারী কে, জেনেছেন?

নাগরাজন—আমি যদি বলি, বিশ্বাস করবেন না, Your highness।

প্যাট্রিসিয়া—হত্যাকারীকে উচিত শাস্তি দিতে পারবেন? ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলুন।

নাগরাজন—শপথ করছি।

প্যাট্রিসিয়া—মার্সডেনের সঙ্গে এ দেশে কার কার আলাপ আছে জেনেছেন?

নাগরাজন—যতদূর জেনেছি, শুধু আপনার সঙ্গে আর যুবরাজের সঙ্গে।

প্যাট্রিসিয়া—এদের মধ্যেই একজন খুনি।

মনীশ—মাপ করবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে স্পষ্ট প্রশ্ন করা ছাড়া উপায় নেই।

প্যাট্রিসিয়া—Don't hesitate।

মনীশ—আপনি নিশ্চয় খুন করেননি?

প্যাট্রিসিয়া—(মৃদু হেসে) আপনার অনুমান সত্য। আমি তাকে ভালোবাসতাম।

মনীশ—একথা যুবরাজ জানতেন?

প্যাট্রিসিয়া—Yes, জানতেন।

মনীশ—কতদিন থেকে।

প্যাট্রিসিয়া—স্পষ্টভাবে জানতে পারেন বিয়ের ছ'মাস পর থেকে।

মনীশ—Excuse me, এরপর থেকে কি আপনাদের মধ্যে অশান্তির সূত্রপাত হয়?

প্যাট্রিসিয়া—That's right।

মনীশ—কিন্তু Mr. Marsden হঠাৎ এ দেশে এলেন কেন?

প্যাট্রিসিয়া—আমায় নিয়মিত চিঠি লিখত Marsden। আমিও লিখতাম। আমার এ দেশে আসার পর প্রায় ছ'মাস ঠিকমতো তার চিঠি পেয়েছিলাম। তারপর হঠাৎ একদিন বন্ধ হয়ে গেল চিঠি আসা। অধীর হয়ে চিঠির পর চিঠি লিখতে লাগলাম। কিন্তু কোনও উত্তর পেলাম না। তারপর হঠাৎ একদিন মার্সডেন এসে হাজির হল এখানে।

মনীশ—আমার ঔদ্ধত্য মার্জনা করবেন, কিন্তু Mr. Marsden-এর চিঠিগুলো যুবরাজের হস্তগত হয়েছে, একথাই কি আপনি বলতে চাইছেন?

প্যাট্রিসিয়া—আপনার অনুমান সত্য এবং সেই ব্যাপারেই বোঝাপড়া করতে চেয়েছিল মার্সডেন।

মনীশ—তারপর?

প্যাট্রিসিয়া—এখানে এসে মার্সডেন প্রথমেই আমার সঙ্গে দেখা করে সব ব্যাপারটা আমায় জানায়। তারই নির্দেশমতো আমি যুবরাজের সঙ্গে দেখা করি। ভালোভাবেই শুরু করি কথাবার্তা—একথা-সেকথার পর আসল প্রসঙ্গে এলাম।

পঞ্চম দৃশ্য

(রাজঘর। যুবরাজ আর যুবরানি বসে আছেন)

চন্দ্রকেতু—কিছু বলবে?

প্যাট্রিসিয়া—হ্যাঁ ডার্লিং, একটা কথা তোমায় বলার ছিল—If you don't mind—

চন্দ্রকেতু—Oh yes, বলবে বইকী। বলার যখন আছে তখন নিশ্চয় বলবে। বলো —আমি শুনছি।

প্যাট্রিসিয়া—বেশ কিছুদিন ধরে আমার চিঠিপত্র নিয়মিত পাচ্ছি না।

চন্দ্রকেতু—তাই নাকি? বেশ, আমি খোঁজ নিচ্ছি।

প্যাট্রিসিয়া—খোঁজ আমি নিজেই নিয়েছি। অন্য সব চিঠি আমি ঠিক পেয়েছি। শুধু একজনের চিঠিরই গোলমাল হচ্ছে।

চন্দ্রকেতু—কে সেই ভাগ্যবান?

প্যাট্রিসিয়া—তার নাম তোমার অজানা নয়, চন্দ্র। মার্সডেনের একটা চিঠিও আমি গত ক'মাস ধরে পাইনি। What happened to those letters?

চন্দ্রকেতু—(তীব্রস্বরে) আমার সঙ্গে নরম সুরে কথা বলো, প্যাট। মনে রেখো এটা তোমার মাদ্রিদ নয়।

প্যাট্রিসিয়া—জানি এটা মাদ্রিদ নয়—এটা Mysore, তোমার স্বদেশ—তোমার স্বেচ্ছাচারিতার, তোমার উচ্ছৃঙ্খলতার লীলাক্ষেত্র। কিন্তু তাই বলে আমার ব্যক্তিগত চিঠি চুরি করার মতো মনোবৃত্তি আমি তোমার কাছে আশা করিনি।

চন্দ্রকেতু—চুরি।

প্যাট্রিসিয়া—Yes চুরি। না বলে পরের জিনিস নেওয়াকে চুরি বলে—তা কি তুমি জানো না।

চন্দ্রকেতু—মূর্খ! তুমি পুরুষ হলে চাবুক দিয়ে তোমায় শিখিয়ে দিতাম কী করে যুবরাজ চন্দ্রকেতুর সঙ্গে কথা বলতে হয়। Yes, তোমার সব চিঠি আমিই নিয়েছি—নিয়েছি এ রাজ্যের মঙ্গলের জন্য। তোমার মতো পরপুরুষ আসক্ত নারীর যাতে এ রাজ্যের রানি হওয়ার কোনও দাবি না থাকতে পারে—তার ব্যবস্থাই করতে হবে আমায়।

প্যাট্রিসিয়া—Well, তুমি যদি ভেবে থাকো, তোমার রানি হওয়ার জন্য আমি আকুল—তবে, তুমি খুব ভুল করেছ। তুমি জানতে মার্সডেনের সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক আছে। তা সত্বেও রূপের মোহে তুমি আমায় বিয়ে করেছিলে। আমার দরিদ্র বাবা-মাকে পয়সার লোভ দেখিয়ে মত আদায় করতে তোমার বাধেনি। বাবা-মার মনে কষ্ট দিতে চাইনি তাই মার্সডেনের সঙ্গে সকল সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে, এসেছিলাম তোমার সঙ্গে।

চন্দ্রকেতু—কিন্তু এখন আবার সে সম্পর্ক পুন:স্থাপিত হল কেন? আমাকে দোহন করার জন্যে?

প্যাট্রিসিয়া—নিজে ব্যভিচারের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে নিশ্চয় আশা করো না তোমার স্ত্রী তোমার কীর্তিকলাপ শুনে পরম সুখে দিন যাপন করবে রানিমহলের নি:সঙ্গ বিলাসকক্ষে? তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের শ্লেষটুকু আমি গায়ে মাখলাম না। মাদ্রিদে আমাদের বংশের ঐতিহ্য যে কত সুপ্রাচীন তা তোমার অজানা নয়।

চন্দ্রকেতু—নিশ্চয়ই অজানা নয়। আর তাই প্রমাণ করে দেব সে বংশে জন্মগ্রহণ করেও কত নিচে তুমি নেমেছ। একটা রাজ্যের যুবরানির পদে অভিষিক্ত থেকেও সামান্য একটা পর পুরুষের সঙ্গে প্রেম পত্রালাপ করতে তোমার ঐতিহ্যে বাধে না।

প্যাট্রিসিয়া—তার জন্যে তুমিই Responsible। আমি তো সব ছেড়েই চলে এসেছিলাম। কিন্তু তুমি...

চন্দ্রকেতু—Yes, আর সেইসঙ্গে ঘুচিয়ে দেব এ রাজ্যের সঙ্গে তোমার সব সম্পর্ক। এই মার্সডেনের সঙ্গে তোমাকে ফেরত যেতে হবে তোমার বাবা-মা'র কাছে—মাদ্রিদে।

প্যাট্রিসিয়া—না, কেতু। তা তুমি কখনও করতে পারো না। আমার বৃদ্ধা মা, বাবা, আমার আত্মীয়স্বজন আমার বংশ—

চন্দ্রকেতু—অনেক-অনেক আগে তোমার ভাবা উচিত ছিল, তোমার মা-বাবা, আত্মীয়স্বজনের কথা। এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। মজার কথা কি জানো, আমাদের হিন্দু বিবাহে Divorce পাওয়া খুব সোজা নয়। তাই তোমায় যদি আমি ত্যাগ করি, তাহলে স্বামী পরিত্যক্তার কলঙ্কিত জীবন নিয়ে তোমাকে হয়তো একা জীবন কাটাতে হবে।

প্যাট্রিসিয়া—না, না, চন্দ্র। এত নিষ্ঠুর তুমি হয়ো না। একদিন তো তুমি আমায় ভালোবেসেছিলে?

চন্দ্রকেতু—হ্যাঁ বেসেছিলাম। সে ভালোবাসার ফল তুমি পেয়েছ। এখন আমি তোমায় ঘৃণা করি। সে ঘৃণার বিষফলও তোমায় পেতে হবে। Good night, My Queen, Good night।

ষষ্ঠ দৃশ্য

(রানির ঘর। মনীশ, যুবরানি, নাগরাজন বসে আছে।)

মনীশ—এ ঘটনাটা ঘটেছে কতদিন আগে?

প্যাট্রিসিয়া—মার্সডেনের মৃত্যুর পনেরো দিন আগে।

মনীশ—এ বিষয়ে মার্সডেনের সঙ্গে যুবরাজের কথা হয়েছিল?

প্যাট্রিসিয়া—হয়েছিল।

নাগরাজন—কবে?

প্যাট্রিসিয়া—তার মৃত্যুর রাত্রেই।
মনীশ—আপনি জানেন সেসব কথা?
প্যাট্রিসিয়া—জানি। (গলা ধরে আসে) সে রাতে লতিতা মহলের লাইব্রেরি রুমে ওদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়েছিল।
মনীশ—যদি আপত্তি না থাকে...
প্যাট্রিসিয়া—বেশ শুনুন...

সপ্তম দৃশ্য

(লাইব্রেরি ঘর। একটা ব্রোঞ্জের গণেশ মূর্তি সিংহাসনে। সামনে পাদানী।

মুকুট থেকে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। চন্দ্রকেতু আর মার্সডেন তার
সামনে দাঁড়িয়ে। পাশে একটা ডায়াল টেলিফোন। ব্রোঞ্জের মূর্তি,
সদ্য ব্রোঞ্জপেন্ট করা। মূর্তির মুকুট থেকে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে।)

মার্সডেন—যুবরাজ, এত রাত্রে আমরা কেন এখানে মিলিত হয়েছি তা নিশ্চয়ই আপনার অজানা নয়।
চন্দ্রকেতু—নিশ্চয়ই। অজানা কেন হবে?
মার্সডেন—What's your decision in the matter জানতে পারি কি?
চন্দ্রকেতু—চিঠিগুলো সম্বন্ধে—তাই না?
মার্সডেন—Yes।
চন্দ্রকেতু—সে কথা তো আপনার বান্ধবীকেই জানিয়েছি।
মার্সডেন—তা আমি জানি। But is that all ?
চন্দ্রকেতু—Do you expect anything more ?
মার্সডেন—ভেবে দেখুন তার মান-সম্মান, তার ভবিষ্যৎ জীবন, মাদ্রিদে তার বংশের সুনাম।
চন্দ্রকেতু—জানি, জানি। তার মান-মর্যাদার কথা ভাববার দায়িত্ব শুধু আমার একার নয়। তারও ভাবা উচিত ছিল।
মার্সডেন—তার সেই ভুলের সুযোগ নিয়েই কি তার সমস্ত জীবনটা নষ্ট করে দিতে চান আপনি?
চন্দ্রকেতু—Shut up। আমার সিদ্ধান্তের ওপর একজন বিদেশির সমালোচনা শুনতে চাই না আমি। যাকে স্পেনের এক সামান্য পরিবার থেকে তুলে এনে বসিয়েছিলাম রানির সিংহাসনে—একদিন যার পুত্রসন্তান হত এ রাজ্যের রাজা—এই তার প্রতিদান? ভুল আমারই হয়েছে—মানুষ তার প্রকৃতির ঊর্ধ্বে কখনওই উঠতে পারে না। আপনার স্পর্ধা দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। জানেন, প্যাট্রিসিয়ার এই অবনতির জন্যে—তার এই চরম দুর্ভাগ্যের জন্যে দায়ী কে?
মার্সডেন—আপনার মতে আমি?
চন্দ্রকেতু—হ্যাঁ আপনি। আপনি সেই লোক যার জন্যে আজ তাকে পেতে হবে সারাটা জীবন ধরে অশেষ যন্ত্রণা।
মার্সডেন—ভুলে যাচ্ছেন, যৌবনের শুরু থেকেই আমাদের মধ্যে ভালোবাসা ছিল। সে ভালোবাসা আজও অক্ষয়, অম্লান।
চন্দ্রকেতু—থামুন! ভালোবাসা! ভালো তাকে আমি বাসিনি? যে সিংহাসনের জন্যে এ রাজ্যের বহু সম্ভ্রান্ত বংশ প্রতীক্ষা করছে বহুদিন—সে সিংহাসনে তাকে বসবার অধিকার দিয়েছে কে?

মার্সডেন—আপনি কি মনে করেন সেইটেই আপনার ভালোবাসার যথেষ্ট প্রমাণ? আসলে ভালো তাকে আপনি কোনওদিন বাসেননি। বেসেছিলেন তার রূপকে! সত্যিই যদি ভালোবাসতেন, তাহলে সে আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী জেনেও শুধু রূপের মোহে তাকে জোর করে বিয়ে করতেন না। আপনার লজ্জা হওয়া উচিত যে আজ আপনি আপনার ভুলের সমস্ত দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাপাতে চাইছেন।

চন্দ্রকেতু—Language! Language! Mr. Marsden। এই ধরনের মন্তব্য করার পরেও আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকার সাহস আজ অবধি কারুর হয়নি। However, আপনার সঙ্গে বেশি সময় নষ্ট করার মতো সময় আমার নেই। বলুন, কী চান আপনি?

মার্সডেন—আমার চিঠিগুলো ফেরত চাই।

চন্দ্রকেতু—পাবেন না।

মার্সডেন—পাবই। এবং আপনি হাতে করে দেবেন।

চন্দ্রকেতু—তাই নাকি?

মার্সডেন—Exactly। মনে রাখবেন যুবরাজ। আগুন নিয়ে খেলা করছেন আপনি। আমাদের দুজনকে যদি আপনি কলঙ্কের পাঁকে ডোবাতে চান, মনে রাখবেন, আপনিও রেহাই পাবেন না। আপনাকে নিয়েই আমরা ডুবব।

চন্দ্রকেতু—অর্থাৎ?

মার্সডেন—অর্থাৎ চিঠি শুধু আমিই প্যাট্রিসিয়াকে লিখিনি, সেও আমায় লিখেছে। আর সে আপনার বিবাহিতা স্ত্রী।

চন্দ্রকেতু—Blackmail!!

মার্সডেন—অনেকটা। তবে আমার শর্ত ব্ল্যাকমেলারদের মতো অতটা কঠিন নয়। শুধু চিঠির প্যাকেটটা আমাকে দিলেই আপনি মুক্ত হতে পারেন। প্যাট্রিসিয়ার চিঠিগুলো আপনার সামনেই পুড়িয়ে ফেলব আমি।

চন্দ্রকেতু—ব্ল্যাকমেলারদের বিশ্বাস...

মার্সডেন—করা না করা আপনার মর্জি। তবে করলে আপনি উপকৃতই হবেন।

চন্দ্রকেতু—Mr. Marsden।

মার্সডেন—বলুন।

চন্দ্রকেতু—এ বিষয় নিয়ে আমার একটু চিন্তার দরকার। কয়েক মিনিট একলা থাকতে দেবেন?

মার্সডেন—Of course। আমি আমার ঘরে যাচ্ছি। আপনি ডেকে পাঠাবেন।

অষ্টম দৃশ্য

(রানির ঘর। যুবরানি, মনীশ আর নাগরাজন।)

মনীশ—এসব কথা আপনি জানলেন কী করে?

প্যাট্রিসিয়া—যুবরাজের সঙ্গে অদ্ভুত এক চুক্তিতে রফা হওয়ার পর মার্সডেন সেখান থেকেই টেলিফোন করে আমায় সব জানিয়েছিল। তার মনে তখন ছিল জয়ের উল্লাস।

মনীশ—কী অদ্ভুত চুক্তি? আপনি জানেন নাকি?

প্যাট্রিসিয়া—হ্যাঁ, শুনুন তবে।

নবম দৃশ্য

(লাইব্রেরি ঘর। গণেশ মূর্তি। যুবরাজ আর মার্সডেন।)

চন্দ্রকেতু—Mr. Marsden। চিঠিগুলো আপনাকে আমি দেব, কিন্তু একটি শর্তে।
মার্সডেন—বলুন?
চন্দ্রকেতু—চিঠিগুলো আপনাকে খুঁজে নিতে হবে।
মার্সডেন—আমাকে?
চন্দ্রকেতু—হ্যাঁ। আমি এখন ফরেস্টে যাচ্ছি শিকার করতে। চিঠিগুলো এই লাইব্রেরি ঘরেই আছে। খুঁজে নিন।
মার্সডেন—এই ঘরেই?
চন্দ্রকেতু—হ্যাঁ, এই ঘরে। খুঁজে নেওয়ার ভার আপনার। যদি পান ভালো—না পেলেও ভয় নেই—চিঠিগুলো আপনি পাবেন—তবে আপনাকে এবং প্যাটকে নি:শর্ত ক্ষমা চাইতে হবে।
মার্সডেন—বেশ, আমি রাজি।
চন্দ্রকেতু—ঠিক আছে। আমি চললাম।
(চন্দ্রকেতু বেরিয়ে যেতেই টেলিফোনের রিসিভার তুলল মার্সডেন।)
মার্সডেন—হ্যালো, প্যাট্রি, মার্সডেন Speaking....

(মঞ্চ অন্ধকার হয়ে এল...মার্সডেনের কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে এল।)

দশম দৃশ্য

(রানির ঘর। যুবরানি, মনীশ আর নাগরাজন বসে রয়েছে।)

প্যাট্রিসিয়া—তারপর সারাটা রাত কাটিয়েছি অস্থিরভাবে। ভোর হয়ে গেল কিন্তু মার্সডেন ফিরল না। বারবার ফোন করেছি। প্রতিবারই ফোনে Ring হয়েছে শুধু, কেউ ধরেনি। তখনই দারুণ সন্দেহ আর আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে পড়ি। তারপর কী হয়েছে—আপনারা তো জানেন।
মনীশ—হত্যাকারী কে, তা তো পরোক্ষভাবে বলেই দিলেন আপনি। কিন্তু প্রমাণ কোথায়? ঘটনার সময় তো তিনি ফরেস্টে রাইফেল চালাচ্ছেন। নিখুঁত alibi। ঘরের দরজা জানলা ভেতর থেকে বন্ধ থাকায় যুবরাজের নিয়োজিত অন্য কারুর পক্ষেও ঘরের মধ্যে ঢুকে খুন করা Practically impossible।
প্যাট্রিসিয়া—Inspector। প্রমাণ খুঁজে বার করার ভার আমার নয়, আপনার। আপনাদের আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে কি? I am so tired।
নাগরাজন—না, Your highness। ভবিষ্যতে যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে হয়তো আপনাকে বিরক্ত করতে হতে পারে। আজ আমরা চলি।
প্যাট্রিসিয়া—Just a minute. আজ সকালে যুবরাজ টেলিফোনে আমাকে Contact করেছিলেন। আমাকে আজ রাত্রে Guest House-এর লাইব্রেরি রুমে দেখা করতে বলেছেন।
নাগরাজন—রাত্রে কখন?
প্যাট্রিসিয়া—রাত আটটায়।
নাগরাজন—ব্যাপারটা অদ্ভুত! যুবরাজ আপনার সঙ্গে তো এখানেই দেখা করতে পারেন। উদ্দেশ্য কিছু জানিয়েছেন?
প্যাট্রিসিয়া—উদ্দেশ্য একই। চিঠির প্যাকেট নিয়ে আমার সঙ্গে একটা Final বোঝাপড়া করতে চান।
নাগরাজন—আপনি কি যাচ্ছেন?
প্যাট্রিসিয়া—না। একলা অত রাত্রে নিজের মহল ছেড়ে অতদূরে যাওয়ার কোনও বাসনাই নেই। I suggest আমার বদলে যাবেন আপনারা। আমার মনে হয় এমন কিছু আপনারা আজ দেখতে পাবেন

সেখানে, যাতে আপনাদের তদন্তের অনেক সুবিধা হতে পারে।

নাগরাজন—মি: সরকার কী বলেন?

মনীশ—যুবরানির Plan-এর প্রশংসা করছি। রহস্যময় ঘরখানি দেখতে পারলে ভালোই হয়।

নাগরাজন—বেশ তাহলে আমার অফিসে চলুন। রাত আটটা বাজতে তো বেশি দেরি নেই। ওখান থেকে আমরা আমাদের নিরাপত্তার কিছু সরঞ্জাম নিয়ে নিতে পারব। Good night your Highness।

একাদশ দৃশ্য

(লাইব্রেরি ঘর। গণেশ মূর্তি। সামনে দাঁড়িয়ে নাগরাজন আর মনীশ।)

নাগরাজন—দেখুন Mr. Sarkar, এই সেই অভিশপ্ত কক্ষ যেখানে মৃত মার্সডেনকে পাওয়া গিয়েছিল। ওই সেই গণেশ মূর্তি—ওই সিংহাসনের তলায় পড়েছিল লাশ।

মনীশ—মূর্তিটি অপূর্ব। মাথার মুকুট থেকে বিচ্ছুরিত ওই আলোয় কেমন যেন একটা Hypnotic spell রয়েছে। কিন্তু সময় তো উত্তীর্ণ হয়ে গেল। কই, যুবরাজ তো এলেন না।

নাগরাজন—সেই কথাই তো ভাবছি। তবে কি যুবরাজ সব টের পেয়ে গেলেন? তা হলে তো বিপদের কথা।

মনীশ—(ভীতস্বরে) তাহলে আমাদেরই বা থেকে কী লাভ। অনর্থক সমস্ত রাত এখানে বসে থাকার কোনও মানে হয় না। চলুন ফিরে যাই।

নাগরাজন—আর একটু বসুন। ন'টা বাজলেই ফিরব।

দ্বাদশ দৃশ্য

(বসবার ঘর। মনীশ আর ছন্দা বসে আছে।)

মনীশ—শুনলে তো আমাদের আজকের Adventure-এর Report।

ছন্দা—তা তো শুনলাম। কিন্তু যুবরাজ যে সব জানতে পেরে গেছে। কী হবে তাহলে?

মনীশ—কী আবার হবে? অত ভাববার কী আছে?

ছন্দা—দ্যাখো, অমন করে সব উড়িয়ে দিও না। এদেশের লোক আমরা নই, বলতে গেলে বিদেশি—শুধু-শুধু ভবিষ্যৎ মহারাজের বিরাগভাজন হওয়া কি ভালো?

মনীশ—খারাপটাই বা কি?

ছন্দা—(রেগে) খুব বীরত্বপনা দেখানো হয়েছে। কিছুই যেন হয়নি। আমি বলে দিলাম তোমায়—এ ব্যাপারে তোমার আর মাথা গলাবার দরকার নেই। খুনের গল্প লেখো যত খুশি আপত্তি নেই। কিন্তু এ ব্যাপারে যদি আবার মাথা গলাও তবে—তবে দেখবে মজাটা।

মনীশ—আহা, রাগ করো কেন, ছন্দা। কাল নাগরাজন আসবে। তখন অনেক আলোচনা করা যাবে। অত চট করে চটলে কি চলে?

ছন্দা—না, চটবে না। এই বিদেশে সত্যিকার আপনজন বলতে কেই বা আছে বলো তো? বিপদে পড়লে কে দেখবে? দুজনের মধ্যে একজনের যদি কিছু হয় তখন আমার কী হবে? তুমি কি তা ভাবো না?

ত্রয়োদশ দৃশ্য

(অন্ধকার মঞ্চে শুধু স্পটলাইটের ফোকাসে দেখা যাচ্ছে মনীশের প্রায়-উন্মাদ আকৃতি। কান্নাজড়ানো গলায় সে বলে যাচ্ছে...)

"সেদিনের স্মৃতি আজও আমার মনের মধ্যে দগদগে হয়ে রয়েছে—আজও মনে হয় এ বুঝি মাত্র সেদিনের ঘটনা। স্বামীর অমঙ্গল কামনায় উদগত অশ্রু কম্পিত কণ্ঠ ছন্দার সেই মিনতি যদি রাখত, মহীশূরের রাজপরিবারের রহস্য থেকে যদি নিজেকে সরিয়ে আনতাম, তবে জীবন আমার এমন অভিশপ্ত হত না। ভগবান, আর যে আমি পারি না।"

চতুর্দশ দৃশ্য

(বসবার ঘর। মনীশ আর ছন্দা।)

ছন্দা—কী গো, দেখছ কী অমন করে? নিজের বউকে চিনতে পারছ না?

মনীশ—হঠাৎ একি বেশ, দেবী। সোনার গয়না ফেলে সর্বাঙ্গে ফুলের সাজ, কবরীতে করবী—গলায় মালা—আমি তো বাপু মুনি ঋষি নয়। আমাকে ভোলাবার জন্যে এত সাজ কেন প্রিয়ে। আমি তো প্র্যাকটিকালি ভুলেই রয়েছি।

ছন্দা—বা: বা:! বেশ মানুষ যা হোক। আমি কি তোমায় ভোলাতে এসেছি? কেন আজকের তারিখটা মনে নেই?

মনীশ—আজকের তারিখ...১৭ই ফেব্রুয়ারি। ও: হো:, একদম ভুলে গেছি। আর তোমারই বা আক্কেলটা কী? মনে করিয়ে দেবে তো। কিছু কেনাকাটা হল না।

ছন্দা—কেন? আমি কেন মনে করাব? দেখছিলাম পুরুষের মন। কিছুই মনে থাকে না। আমি মরলেই তো—

মনীশ—এই সেরেছে। হে সম্রাজ্ঞী, ক্রোধ সংবরণ করুন। আমি আপনার দাস বই আর কিছু না। দাসের সঙ্গে এ মতো ব্যবহার আপনার সাজে না, মহিষী। আমি আপনাকে Gentleman's word দিচ্ছি, যে কানন থেকে এই পুষ্পসম্ভার সঞ্চয় করেছেন আপনি, আমি হবো সেই মালঞ্চের মালাকার।

ছন্দা—বাবা:, পেটে পেটে এত! নাও ছাড়ো, অনেক কাজ আছে।

(নেপথ্যে নাগরাজনের গলা—আসতে পারি?)

ছন্দা—এই...নাগরাজন...ছাড়ো না।

মনীশ—আরে আসুন আসুন Inspector। এত সকালে কি ব্যাপার?

নাগরাজন—কী ব্যাপার? ম্যাডাম যে একেবারে বনলক্ষ্মী সেজেছেন! Splendid! কোনও Occassion আছে নাকি?

মনীশ—না, না, occassion মানে আজ আমাদের বিবাহবার্ষিকী কিনা।

ছন্দা—আপনার যদি আপত্তি না থাকে আজ আমাদের এখানে lunch খেয়ে যাবেন।

নাগরাজন—My goodness! নিশ্চয়ই খাব। কিন্তু কোনও special arrangement করতে পারবেন না। আপনার যা রান্নাবান্না হবে তাই এক মুঠো দেবেন। যাক মিসেস সরকার, কালকের ঘটনা সব শুনেছেন তো?

মনীশ—হ্যাঁ। ও তো একেবারে ভয়ে সারা। বলছে রাজারাজড়ার সঙ্গে বিবাদ করা—

নাগরাজন—না, মিসেস সরকার—আপনি ভয় পাবেন না। Mr. Sarkar-এর সব দায়িত্ব আমার। আমি Government-এর একজন গেজেটেড অফিসার। আমার কথার একটু মূল্য তো আছে?

(ঘোড়ার পদশব্দ)

নাগরাজন—ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ। ঘোড়ায় চড়ে এখানে আবার কে এল? যুবরাজ নাকি?

(চন্দ্রকেতুর প্রবেশ)

চন্দ্রকেতু—(ব্যঙ্গচ্ছলে অভিবাদন) Yes Inspector। যুবরাজই বটে। আপনাকে এ বাড়িতে ঢুকতে দেখেই নামলাম।

নাগরাজন—(স্যালুট করে) Yes, Your honour।

চন্দ্রকেতু—এখানে কি আপনার C.I.D. ডিপার্টমেন্টের Branch Office খুলেছেন নাকি?

নাগরাজন—আমার বন্ধু Mr. Manish Sarkar, Mrs. Sarkar—যুবরাজ চন্দ্রকেতু।

চন্দ্রকেতু—ও, Mr. Detective, তাই না?

মনীশ—আজ্ঞে না। আমি সামান্য গৃহস্থ ঘরের ছেলে। কাজের ধান্দায় এখানে এসেছি।

চন্দ্রকেতু—তাই নাকি। কিন্তু Mr. Sarkar, জানেন তো আগুন নিয়ে খেলতে গেলে সে আগুন মধ্যে-মধ্যে নিজের দেহেও ছড়িয়ে পড়ে।

মনীশ—জানি Your Highness। এও জানি যে যারা আগুন নিয়ে খেলতে জানে, তারা নিজের শরীর বাঁচিয়ে খেলা দেখায়।

চন্দ্রকেতু—বটে! আচ্ছা আশা করি আবার দেখা হবে। তবে মাইন্ড ইউ মি: সরকার, তখনও যেন যুবরাজ চন্দ্রকেতুর সঙ্গে এইভাবে মাথা তুলে কথা বলতে পারেন। চিয়ারিও Inspector, কতদূর এগোলেন? সময় তো যথেষ্ট নিয়েছেন।

নাগরাজন—কাজ, এগুচ্ছে, স্যার।

চন্দ্রকেতু—এগোচ্ছে নাকি? Very good Very good. I wish your every success Inspector। হা:-হা:-হা:।

(চন্দ্রকেতুর প্রস্থান। অশ্বখুর ধ্বনি দূরে মিলিয়ে গেল)

ছন্দা—সর্বনাশ! উনি কি করে জানলেন যে তুমি এর মধ্যে গোয়েন্দাগিরি করছ?

মনীশ—(কঠিনভাবে) জেনেছেন যে করেই হোক। মনে হচ্ছে ওঁর আর কিছুই অজানা নেই। তাই সাবধান করতে এসেছিলেন আমাকে।

নাগরাজন—Mrs. Sarkar, যুবরাজের কোপদৃষ্টিতে শুধু আমি নয়—আপনারাও পড়লেন শেষে।

মনীশ—সে জন্যে চিন্তা করবেন না Inspector। সত্যের অন্বেষণ করা আপনার পেশা—আর আমার নেশা। দেখাই যাক না শেষ পর্যন্ত কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।

পঞ্চদশ দৃশ্য

(অন্ধকার মঞ্চে শুধু স্পটলাইটের ফোকাসে দেখা যাচ্ছে মনীশের প্রায়-উন্মাদ আকৃতি। কান্নাজড়ানো গলায় সে বলে যাচ্ছে...)

"সমস্ত দিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর গৃহলক্ষ্মীর মধু সঙ্গলাভের সুখচিন্তাই ছিল আমার কাজের প্রেরণা। প্রতিদিন পথের মোড় থেকে জানলায় প্রতীক্ষারতা ছন্দাকে দেখা ছিল আমার দৈনন্দিন কার্যসূচির একটা অঙ্গ। কপালে ছোট্ট কুমকুমের টিপ—সিঁথিতে জ্বলজ্বলে সিঁদুর রেখা—বাঁকানো ভ্রূ আর মিষ্টি হাসি দিয়ে সে প্রতিদিন অভ্যর্থনা জানাত তার এই দীন স্বামীকে। বিয়ের পর থেকে একটি দিনের জন্যেও ব্যতিক্রম দেখিনি এ নিয়মের। অসুস্থ শরীর নিয়েও উঠে এসেছে জানলায়। কিন্তু হঠাৎ সেদিন দেখলাম চিরন্তন এ নিয়মের ব্যতিক্রম। সেই প্রথম, সেই শেষ। যুবরাজের সঙ্গে আলাপের ঠিক পরের দিন বাড়ি ফেরার পথে দূর থেকে

দেখলাম জানলা শূন্য—ধড়াস করে উঠল বুকটা। নাম-না-জানা এক ভয় সাপের মতো পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে ধরতে লাগল হৃৎপিণ্ডটাকে। দুরুদুরু বুকে প্রবেশ করলাম গৃহে। সারা বাড়ি খুঁজে কোথাও দেখতে পেলাম না ওকে। রান্নাঘর বাথরুম খুঁজি—নাম ধরে ডাকি, অপেক্ষা করি, কিন্তু কোনও সাড়া নেই। দু-একজন প্রতিবেশীর বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নিলাম—সেখানেও নেই। এই করে কাটল দুটি অসহ্য ঘণ্টা। সে কী রুদ্ধশ্বাস উৎকণ্ঠা! কোথায় গেল? কোথায় যেতে পারে? আমার ফেরার সময় সে তো কোথাও যায় না। তবে কি কোনও accident হল রাস্তায়! আর পারলাম না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছুটতে লাগলাম নাগরাজন-এর অফিসের দিকে।''

ষষ্ঠদশ দৃশ্য

(পুলিশ অফিসারের ঘর। যুবরাজ বসে, নাগরাজন দাঁড়িয়ে। যুবরাজের জামার আস্তিনে আর কাঁধে লেগে ব্রোঞ্জ পাউডার। ঝড়ের বেগে মনীশের প্রবেশ)

মনীশ—মি: নাগরাজন...

নাগরাজন—কী হয়েছে, মি: সরকার? আপনার চোখমুখ এরকম কেন? কী হয়েছে?

মনীশ—(ঠোঁট কেঁপে ওঠে) ছন্দা নেই, নাগরাজন—ছন্দা নেই—

নাগরাজন—কেন? কোথায় গেছেন তিনি?

মনীশ—জানি না। বাড়ি ফিরে তাকে দেখতে পেলাম না—দু-ঘণ্টা অপেক্ষা করেছি। মি: নাগরাজন, এই সময় সে কোথাও যায় না। নিশ্চয় তার কিছু হয়েছে। আপনি—আপনি আমায় help করুন।

(চন্দ্রকেতু উঠে দাঁড়াল। মুখে [illegible] ব্যঙ্গ-হাসি)

চন্দ্রকেতু—All right, Inspector। আমি তাহলে এখন চলি। আপনার Progress কেমন হচ্ছে সে বিষয়ে আমার খুবই কৌতূহল। তাই আমি আসি মাঝে-মাঝে। আশা করি কয়েকদিনের মধ্যেই আপনার তদন্তের report পাব। এতদিন সময় লাগানো অবশ্য আপনাদের মতো দক্ষ অফিসারের উচিত নয়। বিশেষ করে মি: সরকারের মতো প্রাইভেট ডিটেকটিভের সাহায্য যখন নিচ্ছেন—চলি—

(চন্দ্রকেতুর প্রস্থান। ঘোড়ার পায়ের শব্দ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে...ফ্যালফ্যাল করে নাগরাজন–দাঁড়ান মি: সরকার, ছুটবেন না–আমি আসছি।)

সপ্তদশ দৃশ্য

(মঞ্চ অন্ধকার। মোটরের শব্দ। মোটর থামার শব্দ। ধাবমান দরজায় দুমদাম ধাক্কা দেওয়ার শব্দ।)

মনীশ—(নেপথ্যে) দরজা খোলো—শিগগির দরজা খোলো। কে আছ ভেতরে। যেও না গণেশের কাছে। যেও না, তুমি যেই হও। গণেশের দিকে যেও না। দোহাই তোমার! Inspector, দরজা ভেঙে ফেলুন—সর্বনাশ হয়ে যাবে এখুনি।

(দরজা ভেঙে ফেলার শব্দ—ছন্দার অস্ফুট আর্তনাদ...মনীশের চিৎকার—ছন্দা-া-া)

(মঞ্চ আলোকিত হল। গণেশ মূর্তির সামনে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকা ছন্দা লুটিয়ে পড়েছে মেঝেতে। নিষ্প্রাণ। বুক রক্তরঞ্জিত। বেগে মঞ্চে ঢুকছে মনীশ আর নাগরাজন। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা রয়েছে একটা লম্বা লাঠি।)

নাগরাজন—এ কি মিসেস সরকার—ও: হো My God—may her soul rest in peace।

(একটু চুপচাপ)

নাগরাজন—মি: সরকার, আপনাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করব না। দেওয়া যায় না—তা বিশ্বাস করি। কিন্তু একটু শক্ত হোন আপনি। হত্যাকারীকে ধরার এমন সুযোগ আর পাব না। এখানেই কোথাও লুকিয়েছে সে। দেখি তো গণেশ মূর্তির পিছনে কেউ লুকিয়ে আছে কিনা।

মনীশ—(চিৎকার করে) For God's Sake. Don't go there. ওই লম্বা লাঠিটা হাতে নিন Inspector। ওটাকে মূর্তির মাথার মুকুটের বিচ্ছুরিত আলোর ওপর নাড়ুন। (দেওয়ালে ঠেস দেওয়ানো লম্বা লাঠিটা তুলে নিয়ে নাগরাজন গণেশ মূর্তির মুকুটের বিচ্ছুরিত আলোর সামনে ধরল। ঘটাং করে শব্দ হল লাঠিটা আলোর ওপর ধরতেই, মূর্তির বুক থেকে একটা তীক্ষ্ণ ফলা বেরিয়ে এসেই আবার ঢুকে গেল। ব্লেডটার গায়ে রক্ত।)

নাগরাজন—একি! ব্লেডের গায়ে রক্ত!

মনীশ—হ্যাঁ। আমার ছন্দার রক্ত। এইবার আপনি যুবরাজকে arrest করতে পারেন। তীক্ষ্ণধী যুবরাজের মস্তিষ্ক বিজ্ঞানের নবতম আবিষ্কারকে কাজে লাগিয়েছে এইভাবে। আজ আর নয় Inspector। আমি আর পারছি না।

অষ্টাদশ দৃশ্য

(অন্ধকার মঞ্চে শুধু স্পটলাইট ফোকাসে দেখা যাচ্ছে মনীশের প্রায়-উন্মাদ আকৃতি। কান্নাজড়ানো গলায় সে বলে যাচ্ছে...।)

"তার পরেও নি:সঙ্গ একাকী জীবন বয়ে নিয়ে চলেছি আজ ২০ বছর ধরে। জানি না কবে তার সঙ্গে আবার মিলতে পারব। ছন্দা...ছন্দা...ছন্দা...জন্ম-জন্মান্তরের সঙ্গিনী আমার। আর কতদিন—আর কতদিন বইতে হবে আমার এ জীবন-যন্ত্রণা!"

(মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল। তারপরেই মঞ্চ আলোকিত হল। বসবার ঘর। মনীশ শুষ্ক উদভ্রান্ত মুখে বসে রয়েছে। নাগরাজন ঘরে ঢুকছে।)

মনীশ—আসুন Inspector, বসুন। আজ আর আপনাকে চা খাওয়াতে পারব না। কারণ, চা আমি ছেড়ে দিয়েছি। ছন্দা চা ভীষণ ভালোবাসত, ও চলে যাওয়ার পর...

নাগরাজন—এ জন্যে আমিই দায়ী মি: সরকার।

মনীশ—যাক গে। যুবরাজ ধরা পড়েছেন?

নাগরাজন—না।

মনীশ—কেন?

নাগরাজন—সাধারণ অপরাধীর মতো বিনা পরোয়ানায় রাজবংশের কাউকে গ্রেপ্তার করার অধিকার আমাদের নেই। পরোয়ানা নিয়ে পৌঁছতে দেরি হয়ে গিয়েছিল আমার। যুবরাজ মহলে পৌঁছে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে পরপর দুটি ফায়ারিং-এর শব্দ শুনলাম। ঘরে ঢুকে আমরা দেখলাম দুটি প্রাণহীন দেহ—যুবরাজ ও যুবরানির । পাশেই যুবরাজের সিক্সচেম্বার কোল্টখানা পড়েছিল। কিন্তু মি: সরকার, আসল রহস্যটা তো এখনও অস্পষ্ট রয়ে গেল আমাদের কাছে। মার্সডেন ও ছন্দাদেবী কী করে মারা গেলেন—তা তো বুঝলাম। কিন্তু মূর্তির মেকানিজমটা—লাঠি নাড়ানোর সঙ্গে ওই লোহার ফলাটার কী যোগাযোগ—এ ব্যাপারটা তো ঠিক বুঝতে পারলাম না?

মনীশ—ফটো ইলেকট্রিক সেলের নাম শুনেছেন?

নাগরাজন—Electric eye যাকে বলে?

মনীশ—হ্যাঁ। মূর্তির মুকুটে ওইরকম একটা ইলেকট্রিক আই লাগানো আছে। সেল বিচ্ছুরিত রশ্মি কোনও কিছুতে বাধা পেলেই ভেতরের দুটি পয়েন্টে বৈদ্যুতিক প্রবাহের সঙ্গে সংযুক্ত আছে automatic machine।

বুকের খুপরি খুলে বেরিয়ে আসে মৃত্যুদূত। সামনে দাঁড়ানো মানুষের হৃৎপিণ্ডের স্বাদ গ্রহণ করে। আলোকরশ্মির সামনে বাধাটুকু সরে গেলেই আবার circuit বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, কৃপাণটিও ভিতরে ঢুকে যায় সঙ্গে-সঙ্গে।

নাগরাজন—আশ্চর্য! কী অপূর্ব মেধা যুবরাজের! কিন্তু কী নৃশংস জঘন্য তার প্রয়োগ!

মনীশ—প্রতিভার [illegible]

নাগরাজন—কিন্তু আপনি জানলেন কি করে এসব? আমাকে তো কিছুই বলেননি?

মনীশ—বলবার আর সময় পেলাম কোথায় বলুন? বলবার সময় পেলে কি আর এভাবে ছন্দাকে হারাতে হতো আমায়? পাঁচ মিনিট—শুধু পাঁচ মিনিট আগে যদি জানতে পারতাম সব কথা!! যে মুহূর্তে যুবরাজ আমার সামনে দিয়ে আপনার অফিস থেকে চলে গেলেন—সেই মুহূর্তে আমার চোখের সামনে খুলে গেল সমস্ত রহস্যের দ্বার।

নাগরাজন—ঠিক বুঝলাম না।

মনীশ—যুবরাজ আমার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় আচমকা লক্ষ করলাম, তাঁর জামার আস্তিনে আর কাঁধে লেগে রয়েছে তামাটে ব্রোঞ্জ পাউডার। সঙ্গে-সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকের মতো চোখের সামনে ভেসে উঠল ব্রোঞ্জের গণেশ মূর্তিটা। আর সঙ্গে-সঙ্গে মুকুটের রশ্মি আর স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে পুলিশ জার্নালে প্রকাশিত হল Photo electric cell-এর ওপর একটি প্রবন্ধ। কী করে যে সেই মুহূর্তে আমার সে কথা মনে এল আমি নিজেই জানি না। হয়তো ছন্দার বিপদাশঙ্কাই আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিতে সাহায্য করেছিল। যুবরাজের কাঁধে ব্রোঞ্জ-পাউডার দেখেই মনে হল যুবরাজ নিশ্চয়ই মূর্তির গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কিছু করছিলেন। মার্সডেনের মৃতদেহও পাওয়া গিয়েছিল মূর্তির পায়ের কাছে। লক্ষ করেননি, সদ্য ব্রোঞ্জ পেন্ট করা হয়েছে গণেশকে চকচকে রাখার জন্যে? যাতে চট করে চোখ টানে সেদিকে।

নাগরাজন—কিন্তু মার্সডেন বা মিসেস সরকার মূর্তির কাছে গেলেন কেন?

মনীশ—মার্সডেন চিঠির তাড়াটা খুঁজতে মূর্তিটার কাছে গিয়েছিল। মুকুটের পেছনে ফাঁকটা তো লক্ষ করেছেন? অনায়াসেই লুকিয়ে রাখা যায় সেখানে। মার্সডেন সিংহাসনের ওপর উঠে হাত বাড়াল মুকুটের ওপর। রশ্মি বাধা পেতেই ফলাটা বেরিয়ে এসেই আবার ঢুকে গেল। মার্সডেনের মৃতদেহ পড়ল লুটিয়ে—সবার অগোচরে। তার মুখে যে বিস্ময়ের চিহ্ন দেখেছেন—তার কারণ এখন নিশ্চয় বুঝছেন। আপনিও তো কম অবাক হননি ব্যাপারটা দেখে। অথচ যুবরাজ তখন ফরেস্টে শিকার করছেন। নিখুঁত alibi, কী বলেন?

নাগরাজন—কিন্তু অন্য নির্দোষ লোকেরও তো প্রাণ যেতে পারে এভাবে?

মনীশ—সেখানেই যুবরাজের বাহাদুরি। ইলেকট্রিক সেল সবসময় চালু থাকত না। কোনও নির্দোষ লোকের যাতে ক্ষতি না হয় সেজন্যেই যুবরাজ মূর্তির গায়ে গুপ্ত সুইচ লাগিয়ে রেখেছিলেন। মার্সডেনের মৃত্যুর সময় তিনি মার্সডেনের কাছে কয়েক মিনিট সময় নিয়েছিলেন মনে আছে?

নাগরাজন—হ্যাঁ। সেই সময়েই বোধহয় তিনি সুইচ অন করে দিয়েছিলেন?

মনীশ—হ্যাঁ। কিন্তু crime never pays। তাই ছন্দার বেলায় সুইচ অন করতে গিয়ে তাঁর পোশাকে ব্রোঞ্জ পাউডার লেগে গেল। আর তাতেই ধর্মের কল বাতাসে নড়ে উঠল। নিজের alibi establish করতে যদি না তিনি আপনার অফিসে এসে বসে থাকতেন, তাহলে আমার সঙ্গে ওঁর দেখা হত না—তিনি ধরাও পড়তেন না। এমনকি যদি না আমি সেদিন ওঁকে খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ করতাম তা হলেও হয়তো এ রহস্যের যবনিকা কোনওদিন উঠত না। সবই বিধাতার খেলা Inspector, দেখুন না—রহস্যের সমাধান হল, অপরাধী নিজের হাতেই শাস্তি গ্রহণ করল। কিন্তু বড় বেশি মূল্য দিতে হল আমাকে। এত আমি চাইনি। এ মূল্য দিয়ে গোয়েন্দাগিরি করতে আমি চাইনি।

(সহানুভূতিপূর্ণ কাঁধ চাপড়ায় নাগরাজন। মনীশ একটু সামলে ওঠে।)

নাগরাজন—কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, মি: সরকার—ছন্দা দেবী কেন ওখানে গেলেন আপনাকে না জানিয়ে? কেনই-বা আপনার ডাকে সাড়া না দিয়ে উঠতে গেলেন সিংহাসনের ওপরে?

(ফের মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল। শুধু স্পটলাইটের ফোকাস রইল মনীশের মুখের ওপর। সে বলছে...)

মনীশ—কী জবাব দেব? কী জবাব দেব এ প্রশ্নের? জানি এই রহস্যের সমাধান হয়তো কেউ খুঁজে পাবে না। এই প্রহেলিকার উত্তর আমাকে সারাজীবন বয়ে বেড়াতে হবে। কেন গেল সে ওখানে? কেমন করে গেল? কী করে ঢুকল লাইব্রেরি রুমে? কেন সাড়া দিল না আমার নিষেধে? কেন এগিয়ে গেল সে কালান্তক গণেশ মূর্তির সামনে? অপহরণ? সম্মোহন? নাকি কোনও ওষুধের প্রভাব? জানি—জানি—আমি জানি এর উত্তর।

আর ভাবতে পারি না...একই বিষয়ে চিন্তা করে-করে আমার স্নায়ুমণ্ডলীও হয়ে পড়েছে বিপর্যস্ত। আবোল-তাবোল অসংলগ্ন চিন্তা যেন মাথার ভেতর কুরে-কুরে খায় আজকাল। জানি মরণের ওপারে গিয়ে যতদিন না তার সাক্ষাৎ পাচ্ছি ততদিন আমার এ যন্ত্রণার শেষ নেই। কিন্তু কবে আসবে সে পরম লগ্ন? কবে আমি আবার তার দেখা পাব? কবে? কবে? কবে? কবে সে নিজের মুখে আমাকে বলবে অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে—

(মঞ্চ একদম অন্ধকার। স্পটলাইট নিভে গেল। নেপথ্যে ছন্দার কান্নাজড়ানো প্রতিধ্বনিময় স্বর শোনা যাচ্ছে...ওগো, কেন তুমি আমার কথা শুনলে না...কেন তুমি যুবরাজের হুঁশিয়ারি শুনলে না...তাই সে আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে গণেশ মূর্তির সামনেই আমাকে....তারপর, গণেশ মূর্তি দেখিয়ে বলেছিল–এ মুখ আর স্বামীকে দেখিও না...ওই সিংহাসনের ওপর গিয়ে দাঁড়াও...আত্মহত্যা করো...আমি তাই করেছি...নোংরা শরীরটা নিয়ে তোমার কাছে যেতে চাইনি...তুমি তা জানতে...তাই আমার পোস্টমর্টেম করতে দাওনি...)

প্রেতিনী কন্যার কাহিনি

আপনি ভূত মানেন?'

'মানি।'

'তবে কেন বলছেন, পেতনি খুন করেনি আপনার নাতনিকে?'

অসহায় চোখে তাকিয়ে রইলেন জগদীশ গুপ্ত। ভদ্রলোক প্রায়-বৃদ্ধ। অথচ বেশ শক্ত সমর্থ। দাড়িগোঁফ ভালোই কামিয়েছেন। কিন্তু চুল আঁচড়াননি। একমাথা সাদা চুল পাখির বাসার মতো ছড়িয়ে রয়েছে মাথা ঘিরে। ফরসা তিনি কোনওকালেই নন। তার ওপর রোদে পুড়েছেন সারাটা জীবন। খদ্দরের ধুতি আর পাঞ্জাবিও লাট খাওয়া। পাঞ্জাবির বোতাম থেকে কালো 'কার' বেরিয়ে ঢুকে রয়েছে চোরা-পকেটে। নেহাতই সেকেলে মানুষ। এখনও পকেটঘড়ির অভ্যেস ছাড়তে পারেননি।

ইন্দ্রনাথ রুদ্রর বসবার ঘরে বসে অনেক অদ্ভুত কাহিনি শুনেছি। অনেক রোমাঞ্চর স্বাদ পেয়েছি। কিন্তু যে কাহিনিটা আজ বলতে বসেছি তা লিখতে গিয়েও আমার গা শিরশির করছে।

চোখ কুঁচকে জগদীশবাবুর দিকে চেয়ে আছে ইন্দ্রনাথ। আমি বসেছি ওর পাশে। সকালে এইখানেই আমার আড্ডা। সেই আড্ডায় ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হয়েছেন জগদীশ গুপ্ত।

এসেই জানিয়েছেন, তাঁর একমাত্র নাতনিকে পাথর দিয়ে পিটিয়ে মেরেছে একটা পেতনি। তিনি বিপত্নীক। তেল-সাবান কারখানার মালিক। স্বদেশি জিনিস প্রচার করার আদর্শ সামনে রেখে ব্যবসা আরম্ভ করেছিলেন। এখন তাঁর ভেষজ সাবান ভারতের পয়লা সারির সাবান। পয়সা কামিয়েছেন অনেক। দানধ্যানও করেছেন প্রচুর। একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন কারখানারই ম্যানেজারের সঙ্গে। প্লেন অ্যাকসিডেন্টে একই সঙ্গে মারা গেছে তাঁর স্ত্রী, মেয়ে আর জামাই। নাতনি ছাড়া দুনিয়ায় কেউ ছিল না। মাত্র ষোলো বছর বয়স তার। বড় দুরন্ত। মা ছাড়া কি বাচ্চা মানুষ করা যায়? নাতনিকে নিয়েও তিনি হিমশিম খেয়েছেন। মেয়ে বলে কথা। মা বেঁচে থাকলে তাকে চোখে-চোখে রাখতে পারত। জগদীশবাবু তা পারেননি। ভূতের বাড়িতে অ্যাডভেঞ্চার করতে গিয়েই সেই নাতনিই প্রাণ দিয়েছে। একটা ফরাসি পেতনি পাথর দিয়ে পিটিয়ে তার খুলি ভেঙে দিয়েছে।

ভূতের বাড়িটা চন্দননগরে। তিনশো বছর ধরে হানাবাড়ি হিসেবে কুখ্যাত হয়ে রয়েছে।

'তিনশো বছরের হানাবাড়ি?' কৌতূহলী হয়েছিল ইন্দ্রনাথ।

জগদীশবাবু তখন শুনিয়েছিলেন গা-ছমছমে সেই কাহিনি। অবিশ্বাস্য অথচ সত্য।

ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ভারতে এসেছিল ফরাসিরা। চতুর্দশ লুইয়ের রাজত্বকালে গড়ে ওঠে ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। কুঠি বসায় চন্দননগরে ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে। তার ক'বছর পরেই গঙ্গার ধারে গড়ে ওঠে সন্ন্যাসীদের একটা মঠ। পুরুতমশায়ের দোতলা বাড়িও ছিল এই মঠের এলাকায়।

এই বাড়িই এখন ভূতের বাড়ি দুর্নাম কিনেছে দেশ-বিদেশে। এসেছেন অনেক ভূত-শিকারি। তাঁরাও হতভম্ব হয়েছেন।

বাড়িটা কদাকার। লাল ইট দিয়ে তৈরি। জানলাগুলো লম্বাটে আর সরু। আলো ঢুকতেও যেন ভয় পায়। সবসময়ে যেন ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকে সামনের নোংরা লনের দিকে। এ লনে গাছের চাইতে বেশি আছে আগাছা। বড়-বড় ঘাস। কাঁটাঝোপ।

তিনশো বছর বয়েসেও বাড়িটায় চিড় খায়নি—একখানা ইটও খসে পড়েনি। তবে ছ্যাতলা লেগেছে সারা গায়ে। কখনও সবুজ, কখনও কালচে। পেটাই ছাদ নেই। আছে ঢালু টালির চাল। এককালে লাল ছিল এই টালি—এখন তা বহুবর্ণ।

লনের তিনদিকে বড়-বড় ঝুপসি গাছ। বটগাছই বেশি। মোটা ডাল লতিয়ে থাকে মাটির ওপর। বটের ঝুরি বাড়তে-বাড়তে পুরো জায়গাটাকে দুর্গম করে তুলেছে।

গঙ্গার দিকেও রয়েছে বড়-বড় গাছ। এই গাছের সারির জন্যেই গঙ্গার বুক থেকে দেখা যায় না হানাবাড়িকে। চোখে পড়ে শুধু একটা জঘন্য জঙ্গল। রাতে সেখানে জোনাকি জ্বলে। পুরো জায়গাটাকে আরও ভয়াবহ মনে হয়।

তল্লাটের সব্বাই জানে, এ বাড়িতে ভূত আছে। তাদের আবির্ভাব বিশেষ একটা লোমহর্ষক ঘটনার পর থেকেই। তিনশো বছর ধরে ঘটনাটা মুখে-মুখে টিকে রয়েছে। বীভৎস কাহিনি। সে ঘটনা না ঘটলে এ বাড়ি নাকি প্রেতপুরী হত না।

এ জন্যে দায়ী তিনশো বছর আগের ধর্মান্ধ কিছু মানুষ। জাতে তারা ফরাসি। ধর্মে খ্রিস্টান। ভারতের মাটিতে উপনিবেশ টিকিয়ে রাখার জন্যে তাদের অনেকেই ছিল আদিম বর্বর। তাদের এই পৈশাচিকতাই নাকি নি:শব্দ প্রতিবাদ তুলেছে প্রেতলোকে। আজও তাই রক্ত-জল করা ঘটনার পর ঘটনা চলেছে এই নির্জন নিকুঞ্জে।

মঠে ছিল সন্ন্যাসিনীদেরও আস্তানা। ফ্রান্সের সবচেয়ে উঁচু পাহাড় 'মব্লাঁ', যেখানে ইতালির সঙ্গে সীমান্ত রচনা করেছে, দুর্গম সেই পাহাড়ি অঞ্চলের একটি মেয়ে ছিল মঠে। গঙ্গার রূপ দেখত সে সকাল-সন্ধে, ১৫,৭৮১ ফুট উঁচু 'মব্লাঁ'-র রূপও ভাসত চোখের সামনে। বিশাল পাহাড় আর বিরাট নদী নিশ্চয় আকুল করেছিল তার অন্তর। বড় বেশি নি:সঙ্গ মনে হয়েছিল নিজেকে।

প্রকৃতির হাতছানি যখন প্রবল হয়ে ওঠে মনের মণিকোঠায়, তখন কিন্তু শিথিল হয়ে পড়ে নিয়মের নিগড়।

রূপসী, তরুণী, একাকিনী এই সন্ন্যাসিনীর অন্তরে প্রেমের তুফান রচিত হয়েছিল তখন থেকেই। মনের দিক দিয়ে একাকিনী। তাই অন্বেষণ করেছিল মনের মতো দোসর।

পেয়েও ছিল।

মঠেরই এক সন্ন্যাসীকে।

প্রথমে মিটেছিল চোখের তৃষ্ণা। দূর থেকে দুজনে দুজনকে দেখে মিটিয়েছিল হৃদয়ের আশ। মন কিন্তু ইন্ধন জুগিয়ে গেছিল শরীরকে। তিল-তিল করে কামনা সঞ্চিত হয়েছিল প্রতিটি রক্তবিন্দুতে। লোমকূপের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে জমেছিল বারুদ—শরীরী-তৃষ্ণার বিস্ফোরক। দেহমিলনেই যার পরিসমাপ্তি—আর কিছুতে নয়।

তাই একদিন দেখা গেছিল অভাবনীয় সেই দৃশ্য। তামাটে রঙের দুটি ঘোড়া পবনবেগে টেনে নিয়ে চলেছে একটা শকটকে। মাথায় ছাদ নেই। লাগাম ধরে বসে আছে তরুণ সন্ন্যাসী। হাওয়ায় উড়ছে তার লম্বা সোনালি চুল। পাশে বসে মুক্তির আনন্দে ঝকমকে চোখে শেষবারের মতো মঠ দেখবে সন্ন্যাসিনী। ফ্রান্সে তাদের একজনের জন্ম ইতালির সীমান্তে, আরেকজনের স্পেনের সীমান্তে। পাহাড় আছে দু-জায়গাতেই। গঙ্গা খুঁচিয়ে জাগিয়ে দিয়েছে পাহাড়ের আহ্বানকে।

আচমকা মুখ শুকিয়ে গেল মেয়েটির। অশ্ব নীরবে চলতে শেখেনি—বিশেষ করে ছোটবার সময়ে। যুগল অশ্বের খুরধ্বনিতে মুখর হয়েছিল নির্জন বন। সেই সঙ্গে চাকার ঘড়ঘড় আওয়াজ। মঠের মানুষরা তো সচকিত হবেই।

তাই তারা বেরিয়ে এসেছে দলে-দলে। তাদেরও বাহনের অভাব নেই। ধেয়ে আসছে দুই পলাতককে পাকড়াও করবে বলে।

ধরা পড়েছিল তিনশো বছর আগের সেই রোমিও আর জুলিয়েট। প্রেমের পূতশিখায় জীবন উজ্জ্বলতর করে নেবে ভেবেছিল তারা। কিন্তু তা হল না। বিচার হয়ে গেল দুজনের। শাস্তি একটাই। মৃত্যু।

লনের একটা গাছ থেকে দড়ি ঝুলিয়ে ফাঁসি দেওয়া হল তরুণ সন্ন্যাসীকে।
নির্মমতম মৃত্যুর স্বাদ দেওয়া হল তরুণীকে।
জীবন্ত কবর দেওয়া হল মঠেরই দেওয়ালে—দাঁড়ানো অবস্থায়।
সেই মঠ এখন পরিত্যক্ত। ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাদেরকে যমালয়ে পাঠানো হয়েছে—সূক্ষ্ম শরীরে আজও তারা টহল দিচ্ছে মঠের সর্বত্র। আজও দেখতে পাওয়া যায়, গাছতলা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে বিষণ্ণবদনা এক নারীমূর্তি। হাওয়ায় উড়ছে তার শ্বেতবসন, উড়ছে স্বর্ণকেশ। মুখ তার ফ্যাকাসে, চক্ষু নিবদ্ধ পথের দিকে।
দেখা যায় ঘোড়া দুটিকেও। গায়ের রং তাদের ঘোর তামাটে। বায়ুবেগে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে সেকেলে শকট। মঠের বাগানেই তার আবির্ভাব ঘটে, মিলিয়ে যায় সেখানেই।
ষোলো শতক থেকেই নাকি চলছে এই কাণ্ড। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতের সবক'টা ফরাসি উপনিবেশ ইংরেজদের অধিকারে চলে যায়। ফিরে পায় ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে—ভিয়েনা চুক্তির শর্ত অনুসারে।
অশরীরীরা কিন্তু থেকে যায় এই সময়েও। পার্থিব সম্পত্তির হাত বদলে তারা নির্বিকার। অপার্থিব আকৃতি নিয়ে মঠকে দখলে রেখে দিয়েছে শতাব্দীর-পর-শতাব্দী ধরে।
প্রেতলোকের বাসিন্দাদের সঙ্গে সহাবস্থান সম্ভব হয়নি মঠের মানুষদের। যদিও বিদেহীরা কক্ষনও কারও ক্ষতি করেনি—শুধু বহি:প্রকাশ ঘটিয়েছে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার। দেখা গেছে, দু-হাত বাড়িয়ে সাদা পোশাক পরা দুটি মূর্তি পায়ে-পায়ে এগোচ্ছে পরস্পরকে বুকে টেনে নেবে বলে—কিন্তু মিলিয়ে যাচ্ছে মুখোমুখি হয়েই।
দিনের-পর-দিন, রাতের-পর-রাত এ দৃশ্য কি দেখা যায়? চম্পট দিয়েছে মঠের সবাই।
বনাকীর্ণ হানাবাড়ি নিয়ে কেউ আর তেমন মাথা ঘামায়নি। বাঙলার মানুষ বাঘ আর ভূতের সঙ্গে ঘর করে অভ্যস্ত। সাপ আর মশা তাদের গা-সওয়া।
সাড়া পড়ে গেল কিন্তু ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে। তখনও চন্দননগর ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে আসেনি—এসেছিল ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে। ভারতের মাটিতে ফরাসি উপনিবেশ দেখতে ছুটে আসত সাহেব-মেমরা। পণ্ডিচেরি আর কারিকল, মাহে আর ইয়ানাম তাদের বুকে যত না স্পন্দন জাগিয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি উত্তাল করেছে হুগলি জেলার এই চন্দননগর।
কারণ এখানে রয়েছে একটা ভূতের বাড়ি। সত্যি ভূতের বাড়ি। ফরাসি বর্বরতার স্বাক্ষর বহন করে চলেছে বিদেহীরা। কখনও মানুষের চেহারায়, কখনও ঘোড়ার চেহারায়।
পর্যটকরা চাঞ্চল্যকর সংবাদটা পৌঁছে দেয় লন্ডন শহরে। লুফে নেয় 'ডেলি মিরর' দৈনিক পত্রিকা। হেডলাইন দিয়ে ছেপে দেয় চন্দননগরে হানাবাড়ির লোমহর্ষক সমাচার আর তিনশো বছর আগেকার ফরাসি বর্বরতার মুখরোচক কাহিনি।
খবরটা পড়েই লন্ডন দিয়ে ভারতে ছুটে আসেন বিখ্যাত ভূত-শিকারি এডগার লুসি। ভূতের বাড়ির খবর পেলেই ভদ্রলোক ছুটে যেতেন। সত্যি ভূত হলে তাদের রিপোর্ট লিখে বই ছেপে ফেলতেন। মিথ্যে ভূত হলে তাদের জালিয়াতি ধরিয়ে দিতেন।
ভূত-শিকার ছিল তাঁর নেশা। নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল পেশা। ভূত ধরার কাহিনি কে না পড়তে চায়। বই বিক্রি হত দেদার। রোজগার হচ্ছিল ভালোই।
ব্রিটিশ ভারতে ফরাসি উপনিবেশে কায়াহীনরা গ্যাঁট হয়ে বসে রয়েছে শুনেই তিনি জাহাজের খরচ পকেট থেকে বের করেছিলেন।
এসে দেখেছিলেন হানাবাড়ির দুর্নাম ঘোচানোর জন্যে এক পাদরি সেখানে বসবাস শুরু করেছেন। নাম তাঁর রেভারেন্ড অ্যান্টনি গোমেজ। স্বামী-স্ত্রী থাকেন। বাচ্চাকাচ্চা নেই। ভয়ডরও কম।
'ভূত আছে কি? ঘোড়া ভূত?'

ভূত-শিকারির প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন পাদরি সাহেব—'বিলক্ষণ আছে। একটু-আধটু উপদ্রব করে বটে। কিন্তু অনিষ্ট তো করে না। একসঙ্গে আছি বেশ।'

'উপদ্রবগুলো কীরকম?'

পাদরি সাহেব তখন সব লিখে দিয়েছিলেন। সেই লেখা বগলে নিয়ে ভূত-শিকারি ফিরেছিলেন লন্ডনে। প্রতিবেদন বেরিয়ে গেছিল 'ডেলি মিরর' পত্রিকায়।

'অদ্ভুত কাণ্ডকারখানাগুলো কী ধরনের?'

'তালা ঝুলছে ঘরের বাইরে থেকে। অথচ আলো জ্বলে ওঠে ঘরের মধ্যে। সেই আলো নড়েচড়ে বেড়ায়। লণ্ঠন নিয়ে কেউ বা কারা যেন ঘরে পায়চারি করছে।'

'পায়চারি করছে? পায়ের আওয়াজ শোনা যায় না?'

'নিশ্চয় যায়। পা ঘষটানির আওয়াজ। পা যেন চলতে চাইছে না। ক্লান্ত চরণ। তবুও হাঁটতে হচ্ছে পায়ের মালিক বা মালকিনকে। দুলছে লণ্ঠনের আলো।'

'ঘোড়ার গাড়ি? সত্যি দেখা গেছে?'

'স্বচক্ষে দেখেছে বাড়ির ঝি। লনের ওপর দিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে গেছে অশ্বশকট। তারার আলোয় স্পষ্ট বোঝা গেছে গাড়ি উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে দুটি ঘোড়া। সওয়ার দুজন পাশাপাশি বসে। দুজনেরই গায়ে সাদা পোশাক। বাগান পেরিয়ে ফটক পর্যন্ত গিয়েই আচমকা হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে ছায়াবাজি।'

'ছায়াবাজি? চোখের ধাঁধা নয়তো? অথবা ধোঁকাবাজি? ম্যাজিক লণ্ঠনের কারসাজি?'

'তাহলে ফিসফিস করে কারা অত কথা বলে ঘরে-ঘরে? তালাবন্ধ ঘরে কে তাদের ঢুকতে দিয়েছে? শোনা যায় পুরুষকণ্ঠে বিড়বিড় বকুনি—নারীকণ্ঠের চাপা কান্না।'

'নারীকণ্ঠ? দেখা দেয়নি সেই রমণী?'

'অবশ্য দিয়েছে। বহুবার দিয়েছে।'

'গোটা তল্লাট জুড়ে তখন খোঁজখবর নেওয়া শুরু করেছিলেন ভূত-শিকারি। এ ব্যাপারে ভদ্রলোক শার্লক হোমসের কায়দায় ডিটেকটিভগিরি করেন। জোচ্চুরি ফাঁস করতে গেলে গোয়েন্দাগিরির মুন্সিয়ানা তো দরকার। জনে-জনে জিগ্যেস করে একটা ব্যাপারে তাঁর বেজায় খটকা লেগেছিল।'

'যে বাড়িতে এখন ভূতের খেলা চলছে, সন্ন্যাসীদের মঠ আদৌ সেখানে ছিল কিনা—এই একটি ব্যাপারে তো কেউ দিব্যি গেলে কথা দিতে পারছে না। তিনশো বছর আগের ব্যাপার। কেউ বলে, মঠের পুরুত থাকতেন এই হানাবাড়িতে। কেউ বলেন সন্ন্যাসীদের থাকার জায়গাও ছিল এই বাড়ি।'

'সন্ন্যাসিনীদের আস্তানা? থাকার কথা তো এই মঠের এলাকাতেই। কিন্তু সেরকম কোনও ডেরা দেখতে পেলেন না এডগার লুসি। তবে কি সবটাই কপোলকল্পনা? গ্রাম্য উপকথা?'

সন্ন্যাসিনী-প্রেতিনীর সম্ভাবনা তাই উড়িয়ে দিলেন ভূত-শিকারি। গোয়েন্দারা তাই করেন। যার প্রমাণ নেই—তা খারিজ করেন।'

'কিন্তু তামাটে ঘোড়ায় টানা সেই গাড়িটাকে তো দেখা গেছে বারবার। পনেরো শতকের আগে ঘোড়ায় টানা গাড়ির আবির্ভাব ঘটেনি খাস লন্ডন শহরেও। কিন্তু ষোড়শ শতকে সেই গাড়ি যদি চন্দননগরের ফরাসি মঠে দেখা যায়, তাহলে তো গ্রামের মানুষদের মনে দাগ কেটে যাবেই। বানিয়ে নেওয়াও সম্ভব নয়। না দেখলে বলতে যাবে কেন?

তবে হ্যাঁ, সন্ন্যাসিনীরা যত বেয়াদপিই করুক, জ্যান্ত গোর দেওয়ার নজির তো গোটা ইউরোপে কখনও দেখা যায়নি। ইউরোপীয়রা এত বর্বর নয়। এরকম বর্বর ছিল নাকি মোগল পাঠান সুলতান-নবাব-বাদশারা। কোমলপ্রাণ পাদরি সাহেব মঠের মেয়েকে মঠের দেওয়ালেই দাঁড় করিয়ে ইট গেঁথে কবর দেবেন—এমন পৈশাচিকতা কল্পনাও করা যায় না।'

ভৌতিক কাহিনির এই অংশটুকুও স্রেফ মনগড়া—এই সিদ্ধান্তেই এলেন ভূত-শিকারি সাহেব প্রাথমিক তদন্তের পর।

'বেশ, বেশ, গোর দেওয়ার ব্যাপারটা না হয় শোনা কথা। চোখে তো কেউ দেখেনি। রং চড়ানো রটনা হলেও হতে পারে।

কিন্তু বিদেশিনী প্রেতিনীকে তো দেখা গেছে। বহুবার বহু জায়গায়। কখনও লনে, কখনও বাগান, কখনও ঝোপের বর্ডার দেওয়া পথে। শুধু রাতে নয়—দিনের আলোতেও।'

'দিনের আলোয়? সূক্ষ্মশরীরীর পক্ষে তো কায়াগ্রহণ সম্ভব নয়। একটোপ্লাজম জোগাড় করবে কী করে? আলোকতরঙ্গের ধাক্কায় তো শরীরী হওয়া যায় না।'

নিছক গল্পকথা নিশ্চয়। তুড়ি মেড়ে উড়িয়ে দিলেন ভূত-শিকারি ইংরেজ।

আর তারপরেই শুরু হল তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়। প্রেতলোক যেন এই ক'দিন তক্কে-তক্কে ছিল—তাঁর হাস্যকর অনুসন্ধান-পর্বের ইতি হওয়ার প্রতীক্ষায় ছিল। অবিশ্বাসের হাসি হেসে 'সব বুজরুকি'—এই রিপোর্ট যেদিন লিখলেন, তার পরের দিন থেকেই শুরু হয়ে গেল হানাবাড়ির হট্টগোল।

এবার আরও বেশিমাত্রায়। যেন তাঁকে তুমুল অভ্যর্থনা জানাতে কোমর বেঁধে লেগেছে সাহেব ভূতপেতনীরা। হাজার হোক, একই মহাদেশের মানুষ তো। এত দূর থেকে, এত পয়সা খরচ করে এসে খালি হাতে ফিরে যাবেন?

'গেঁইয়াদের গল্প'—এইরকম একটা শিরোনামও লিখেছিলেন লুসিসাহেব তাঁর ডাইরিতে। লিখেছেন রাত্রে। ঘুমোতে যাওয়ার আগে। সকালে উঠে নাস্তা সেরে ফের কলম বুলোতে গেছিলেন ডাইরিতে।

চক্ষুস্থির হয়েছে তখনি।

'গেঁইয়াদের গল্প'—এই হেডলাইনটাই নেই। ডাইরির যেখানে লিখেছিলেন সেখানটা বিলকুল সাদা। কস্মিনকালেও যেন সেখানে কলমের আঁচড় পড়েনি। ম্যাজিক কালি দিয়ে লিখতেও তো নিব চেপে বসার দাগ থাকবে। তাও নেই। ম্যাজিক কালির প্রশ্ন অবশ্য ওঠে না। একই দোয়াতের কালি দিয়ে বাকি অংশটা লিখেছেন—তা যেমন তেমনই রয়েছে।

নেই শুধু 'গেঁইয়াদের গল্প' শিরোনামটা!

তাজ্জব কাণ্ড! গালে হাত দিয়ে বসে রইলেন ভূত-শিকারি ইংরেজ। কায়াহীন বড় রসিক তো! হেডলাইনটাকেই উড়িয়ে দিয়েছে!

উপদ্রব শুরু হল সেইদিনই সন্ধে থেকে। উপদ্রবের পর উপদ্রব। উৎসব শুরু হয়ে গেছে যেন অতিপ্রাকৃত দুনিয়ায়—অসম্ভব কাণ্ড ঘটাতে লেগেছে কোমর বেঁধে।

দোতলার ঘরে বসেছিলেন ভূত-শিকারি। বড় ঘর। এক কথায়, হলঘর। আড্ডা মারবার জন্যে তৈরি। খানদানি সাহেববাড়ি আর জমিদারবাড়িতে এই ধরনের বড়-বড় ঘর দেখা যায়। বিলাসী জমিদারবাবুরা নাচঘর বানাতেন এই কায়দায়। গোটা ঘর মোড়া থাকত দামি কাশ্মিরী কার্পেটে।

সেসব দিন গেছে। চন্দননগরের এই ফরাসি যাজক বোধহয় সেই বাবুয়ানির রেশ টেনে আনতে চেয়েছিলেন বিশাল এই ঘরখানায়। গাঁয়ের লোকদের মুখে কানাঘুষোয় অনেক গল্পকথাও শুনে এসেছেন ভূতশিকারি। ষোড়শ শতকের পাদরির কিঞ্চিৎ নারীঘটিত দোষ ছিল। মঠের মেয়েদের মাঝেমাঝে এই ঘরে নিয়ে আসতেন। যে মেয়েটি অশরীরী হয়ে আজও টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, তাকেও কবজা করতে চেয়েছিলেন। রূপে সে ছিল তিলোত্তমা, স্বভাবে সরস্বতী। যাজকের কামনার ইন্ধন জোগাতে মন চায়নি। প্রেমের আগুনেই পুড়ে মরেছে। মঠেরই সন্ন্যাসীকে নিয়ে চম্পট দেওয়ার চেষ্টায় শাস্তি হয়েছে ভয়াবহ। কুটিল পাদরি একটা দৃষ্টান্ত খাড়া করতে চেয়েছিলেন। ভবিষ্যতে কেউ যেন তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাওয়ার দু:সাহস না দেখায়।

বিরাট এই ঘরেই রেভারেন্ড অ্যান্টনি গোমেজের সঙ্গে বসেছিলেন এডগার লুসি। ছিলেন মায়া গোমেজ—রেভারেন্ডের সাতপাকে বাঁধা বউ। হিন্দুমতে বিয়ে। মায়া চন্দননগরের সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের মেয়ে। ভয়ানক

রূপসী। রং যেন ফেটে পড়ছে। চোখে যেন বিদ্যুৎ জ্বলছে—রেগে গেলে মনে হয় মা দুর্গা মহিষমর্দিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণা হতে চলেছেন।

মায়া বিদূষী মেয়ে—সুবর্ণবণিক মেয়েদের মতো লবঙ্গলতিকা নয়। পড়াশুনা শেষ করেছিল কনভেন্টে। তারপর রেভারেন্ডের টানটান বপু, মিষ্টি-মিষ্টি হাসি আর চোখা-চোখা বুলি শুনে তাঁকেই বিয়ে করে ফেলে। সাতগেঁইয়া নিষেধের তোয়াক্কা রাখেনি।

লুসির সঙ্গে খোশগল্প চালিয়ে যাচ্ছে এই মায়া। ঘরে জ্বলছে তেলের প্রদীপ আর মোমবাতি। ১৯২৯ সালেও এই হানাবাড়িতে বিদ্যুতের লাইন আনাননি রেভারেন্ড। মায়া-ই আনতে দেয়নি। বাড়িটার সাবেকিয়ানা তাহলে যে গোল্লায় যাবে। এ বাড়িতে থাকার মাধুর্যই যে নিষ্প্রদীপের রোমাঞ্চ!

'বোগাস!' বলেছিলেন লুসি। 'এইরকম একটা বুড়ো বাড়ি আর বাগানকে যদি আলো-অন্ধকারের ছায়ামায়া দিয়ে ঘিরে রাখা হয়, তাহলে গা ছমছম করবে আপনা হতেই—বিদেহিনীকে কষ্ট করে প্রেতলোক থেকে জার্নি করতে হবে না।'

কথাটা সবে বলেছেন লুসি সাহেব—বলেই হো-হো করে অবশ্য হেসেছিলেন—এমন সময়ে ঘটল সেই কাণ্ড।

পেল্লায় একটা শামাদান হেলেদুলে বাতাসে ভাসতে-ভাসতে দরজা দিয়ে ঢুকল ঘরে।

দেখেই আতীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠেছিল বেনের মেয়ে মায়া, 'এ কী ম্যাডাম! আমার বাবার দেওয়া বিয়ের জিনিস! এই নিয়ে এ কী ইয়ার্কি!'

শামাদানটা বিলকুল বেলজিয়ান কাচ দিয়ে তৈরি। লম্বা স্ট্যান্ডের ওপর পাঁচখানা মোমবাতি বসানো যায়। চিলেকোঠার ঘরে ঠাকুরঘর বানিয়ে মায়া এই দীপাধার রেখে দিয়েছিল সেখানে। বিলিতি পন্থায় পঞ্চপ্রদীপের আরতি করবার জন্যে।

আশ্চর্য সুন্দর গুরুভার সেই বাতিদানই বাতাসে ভেসে এসে ঢুকল হলঘরে।

দমাস করে আছড়ে পড়ল লুসির পায়ের কাছে।

বলা বাহুল্য, ওইরকম একটা আছাড় খাওয়ার পর কাচের শামাদান আর আস্ত থাকতে পারে না। খানখান হবেই। প্রায় ডুকরে কেঁদে উঠেছিল মায়া মল্লিক, থুড়ি, গোমেজ।

তড়াক করে সটান দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন ভূত-শিকারি ইংরেজ মহাশয়। এসব ভেলকি তিনি অনেক দেখেছেন। কিছু ভূত অবশ্য বিশেষ এই ক্ষমতার অধিকারী হয় বটে, কিন্তু চন্দননগরের মতো নেটিভ জায়গায় এহেন ভৌতিক ক্রীড়া আশা করা যায় না।

অতএব তিনি স্বজাতীয় ভাষায় তীব্র কণ্ঠে জানতে চাইলেন—'এইসব গাড়োয়ানি ফচকেমির মানেটা কি?'

বলেই, তাঁর খেয়াল হয়েছিল—তিনি বসে আছেন ফরাসি মঠে। এখানকার জড়পদার্থের অণু-পরমাণুতেও ফরাসিয়ানা বিধৃত রয়েছে।

সুতরাং গমক মারা যাক ফরাসি ভাষায়। তাই করেছিলেন।

পরিণামটা হল আরও ভয়ানক।

রাশি-রাশি নুড়ি উড়ে এল দরজা দিয়ে—কড়াং-কড়াং দুমদাম ঠকঠকাস করে আছড়ে পড়ল লুসি সাহেবের পায়ের কাছে। কখনও একটা, কখনও একাধিক—শূন্যপথে ধেয়ে এসেই পড়ছে সাহেবের সামনে।

চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল সাহেবের। এ নুড়ি তিনি চেনেন। বাগানের পথে রয়েছে বিস্তর।

আচম্বিতে বন্ধ হয়ে গেল নুড়ির স্রোত। লুসি সাহেব তখনও দাঁড়িয়ে আছেন। চোখ পাকিয়ে চেয়ে আছেন দরজার দিকে। লম্বায় তিনি প্রায় সাড়ে ছ'ফুট। বাঁশের মতো শক্ত সিধে শিরদাঁড়া। লম্বা নাকের নিচে গোঁফজোড়া ঝোপের মতো এলোমেলো করে রাখেন ইচ্ছে করে—বুজরুকরা দেখলেই যাতে ভয় পায়।

সেই গোঁফ এখন খাড়া হওয়ার উপক্রম হল বিদেহীদের পরবর্তী বিটলেমি দেখে।

বাগানের কুয়োর ধারে পাড়ে পড়ে থাকে বিস্তর ভাঙা ইট আর পাথর। বেশ কয়েকটা আধলা নিশ্চয় সাড়া দিয়েছে কায়াহীনদের আহ্বানে। শ্যাওলামাখা নোংরা আধলাগুলো সগৌরবে দরজা দিয়ে ধেয়ে এসে দমাদম করে আছড়ে পড়ল সাহেবের পদতলে।

বাকরহিত হয়ে গেছেন এখন তিনজনেই। সাহেব প্রত্যক্ষ করছেন অবিশ্বাস্য দৃশ্য—রেভারেন্ড গোমেজ এবং তদীয় স্ত্রী অবলোকন করছেন শিষ্ট ভূতপ্রেতের অশিষ্ট আচরণ। তাঁরা বিলক্ষণ বিক্ষুব্ধ। অতিথি আপ্যায়নে এহেন ত্রুটি বরদাস্ত করা যায় না।

কিন্তু ভূতপ্রেতের দল কি সহসা ক্ষিপ্ত হয়েছে? মস্তিষ্ক কি তাদের উত্তপ্ত হয়েছে? এত কাণ্ডের পরেও কি তাদের কি ক্ষ্যামা দেওয়া উচিত ছিল না? ঢের হয়েছে—এই বলে রঙ্গ বন্ধ করা উচিত ছিল না?

তা না করে, তারা এবার গাছের শুকনো পাতা বাগান থেকে এনে উড়িয়ে দিয়েছে ঘরময়।

ঘরে হাওয়া নেই। শীতের সন্ধে। জানলা বন্ধ। অথচ যেন হাওয়া ঘূর্ণিপাক রচনা করে চলেছে বিশাল হলঘরে। ঘুরে-ঘুরে নাচের ছন্দে উড়ছে ঝরাপাতার দল।

ক্লাইমাক্সটা ঘটল তারপরেই। নাটকীয় সেন্স না থাকলে এমন চরম কাণ্ড ঘটানো যায় না।

ঢং-ঢং-ঢং-ঢং করে বেজে উঠল একতলার দরজা-ঘণ্টা। সাবেকি বাড়ির সব হালচালই বজায় রেখেছিল বেনের মেয়ে মায়া। সদর দরজায় অতিথি-ঘণ্টা বাজালে অদ্ভুত আভিজাত্যে বাড়ি গমগম করে ওঠে।

সেই ঘণ্টাই এখন বাজছে অশরীরীদের হাতে। মাংসহীন অস্থিহীন করপল্লবে ঘণ্টার দড়ি ধরে বোধহয় ফরাসিনী প্রেতিনী হ্যাঁচকা টান মারতে-মারতে নাটকীয়ভাবে জানান দিয়ে যাচ্ছে তার অস্তিত্বের, 'আমি আছি! আমরা আছি! ও সাহেব—লিখে রাখো—আমরা ছিলাম, আছি, থাকব!'

এই জাতীয় বেল্লিকপনা কোনও সাহেব ভদ্রলোক সইতে পারে? সকালে উঠে খটকা লেগেছিল ডাইরির পাতা থেকে হেডলাইন অদৃশ্য হওয়া দেখে—সন্ধে হতেই হানা দিল অদৃশ্য কারিগররা? এইভাবে?

সেই রাতেই তন্নতন্ন করে অভিযান চালালেন লুসিসাহেব। নিচের দরজা বন্ধ ছিল ভেতর থেকে—নেমে নিয়ে দেখলেন বন্ধ রয়েছে তখনও। ঝি-চাকররা কেউ রাত কাটায় না এ বাড়িতে—হাজার বখশিস দিলেও। বাড়িখানাও এককালে মঠবাড়ি ছিল বলে এমন কায়দায় নির্মিত যে, সদর দরজা বন্ধ হয়ে গেলে বাড়িতে প্রবেশের আর কোনও পথ থাকে না।

তা সত্ত্বেও বাগানের পাথর আর নুড়ি, কুয়োর ইট আর পাথর, গাছতলার ঝরাপাতা তারা বোধহয় ঝুড়ি ভরতি করে দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে কি এক অলৌকিক পন্থায় পাচার করেছে বাড়ির ভেতরে।

তদন্ত সম্পন্ন হল রাতেই। আর কোনও নাটক দেখায়নি বিদেহীরা। বোধহয় সারারাত হেসেই কুটিপাটি হয়েছে।

পরের দিন পিঠটান দিলেন এডগার লুসি। খিদিরপুরে গিয়ে জাহাজে চেপে লন্ডন। লন্ডনে পৌঁছেই লম্বা কাহিনি ছাপিয়ে দিলেন 'ডেলি মিরর' কাগজে। হইহই পড়ে গেল গোটা কন্টিনেন্টে এবং এই উপমহাদেশেও। ভূত-শিকারির বিশ্বাস জেগেছে যে হানাবাড়িতে রাত্রিবাস করে সে বাড়ি তো একবার দেখে আসা দরকার।

হুজুগে মানুষের অভাব কোনও দেশেই নেই। বিলেত-আমেরিকার মানুষ দলে-দলে তো এলই—এল ভারতের নানান অঞ্চলের মানুষও। বেশি এল কলকাতার মানুষ। হুজুগের চাটনি ছাড়া যাদের ভাত হজম হয় না।

ফলে জীবন দুর্বিষহ হয়ে দাঁড়াল মায়া আর রেভারেন্ডের। নির্জনে রোমান্স আর রোমাঞ্চর ডবল লাভের আশাতেই ঘর বেঁধেছিলেন তাঁরা এই পোড়োবাড়িতে। দিনগুলো যাচ্ছিল ভালোই। সূক্ষ্মশরীরীরা ঈর্ষায় জ্বলে গেলেও স্থূলশরীরী দুজনের পাকাধানে মই দেয়নি এতদিন। এখনও দিল না। তবুও বাড়ি ছেড়ে সরে পড়তে হল গোমেজ দম্পতিকে। ভূতের উৎপাতে নয়—দর্শনার্থীদের উপদ্রবে। দিবারাত্র খালি লোক আর লোক। বাগানে লোক, বাগানের বাইরে লোক, ঘরে লোক। ঘণ্টা বাজছে যখন-তখন। পিলপিল করে আসছে উৎসুক

মানুষ—চন্দননগরের সস্তা সুপেয় পানীয় পান করছে এবং ঢংঢং করে ঘণ্টা বাজিয়ে দেখছে—বিদেহীদের হাতে কতখানি শক্তি থাকলে তবে এই ভারি পেতলের ঘণ্টার কণ্ঠা নাড়ানো যায়।

তাই পালিয়ে গেলেন রেভারেন্ড দম্পতি। লুসিসাহেব যেদিন কাষ্ঠ হেসে বিদায় নিলেন, ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে, বাড়ির দিকে মুখ ফিরিয়ে, বিদেহীদের উদ্দেশে টা-টা, 'অ-রিভয়ের', 'অ্যাডিউ' বলে গেলেন—তার একমাস পরেই ছলছল চোখে মায়াও খ্রিস্টান স্বামীর হাত ধরে চলে এল শ্রীরামপুরে।

তারপর কেটে গেছে আঠারোটা মাস। পরিত্যক্ত থেকেছে পোড়োবাড়ি।

১৯৩১-এর নভেম্বরে আর এক কাঠগোঁয়ার রেভারেন্ডের ইচ্ছে হল ওই বাড়িতে থাকবেন। বিলিতি শিক্ষার একটু ছোঁয়া পেলেই দেশীয় বিশ্বাসগুলোকে কুসংস্কারের বাতি জ্বালিয়ে ছাই করে দেওয়ার মহান উদ্দেশ্য প্রজ্জ্বলিত তখন অনেক মহাশয় ব্যক্তির মধ্যে। রেভারেন্ড রামকানাই বিশ্বাস তার ব্যতিক্রম নন। ইনিও এলেন তাঁর বাঁজা বাঙালি বউকে নিয়ে। সন্তান-টন্তান না হলে মেয়েদের মাথায় বোধহয় ছিট গজায়—সবকিছুর মধ্যেই বাতিক দেখা যায়। বাঁজা বউটির নাম ময়নামতী। খাসা নাম। রামকানাই এই নাম শুনে আর শ্যাম অঙ্গ দেখে ময়নামতীকে সহধর্মিণী বানিয়ে নিয়েছিলেন। তারপর বুক ফুলিয়ে একদিন উঠে এলেন পোড়োবাড়িতে।

বুক চুপসে গেল দুদিনেই। অপদেবতারা মানুষের অহঙ্কার দু-চক্ষে দেখতে পারে না। চোখের ঘুম উড়ে গেল রামকানাই আর ময়নামতীর। রাতের শয়ন পর্যন্ত নির্বিঘ্ন রইল না।

রামকানাই পড়েছিলেন এডগার অ্যালান পো-র 'ব্ল্যাক-ক্যাট' গল্পটা। দেওয়ালে জ্যান্ত কবরস্থ হয়েছিল কালো বেড়াল বাড়ির বউয়ের ডেডবডির সঙ্গে। তাই তিনি মঠের সমস্ত দেওয়াল ঠুকে-ঠুকে দেখতেন ফোঁপরা দেওয়াল কোথাও পাওয়া যায় কিনা।

আর যায় কোথা? ভয়ানক খেপে গেছিল প্রেতিনী আর তার হবু বর। বাগানের নুড়ি ছুঁড়ে জানলার কাচ গুঁড়িয়েছে, ঘণ্টা বাজিয়ে কান ঝালাপালা করে দিয়েছে। তাতেও যখন পোড়োবাড়ি ছেড়ে 'পাদমেকং ন গচ্ছামি' পণ করেছে রেভারেন্ড দম্পতি—তখন আরও উৎপাত শুরু করেছে ফরাসি ভূতপেতনি।

ময়নামতী এক সন্ধ্যায় বায়ুসেবন করছিল বাগানের পথে। আচমকা একটা আধলা ইট তেড়ে এসেছে তাকে লক্ষ্য করে। অদৃশ্য হাতে ইটের আবির্ভাব ঘটেছে দেখে বুদ্ধিমতী ময়নামতী পিছু ফিরেই দৌড়েছিল সদর দরজার দিকে। বেরসিক বিদেহী তখন সেই ইট আছড়ে মেরেছে তার পিঠে।

বউয়ের গায়ে হাত! রেগে লাল হয়েছিলেন রামকানাই রেভারেন্ড। চিঠি লিখেছিলেন এডগার লুসিকে। এই আঠেরো মাস চন্দননগরের পোড়োবাড়ির নামও মুখে আনেননি ভূত-শিকারি। রামকানাইয়ের সনির্বন্ধ অনুরোধ পায়ে ঠেলতে পারলেন না। ফের এলেন বাংলার হুগলি জেলায়।

হাওয়ায় খবর এসে গেছিল পোড়োবাড়িতে—তৈরি হয়েই ছিল অশরীরীগণ। চৌকাঠে পা দিলেন এডগার লুসি—ঢংঢং করে বেজে উঠল পেতলের মস্ত ঘণ্টা!

থ হয়ে গেলেন ভূত-শিকারি। আপ্যায়নটা হুবহু আগের মতোই হবে নাকি?

হলও তাই। আবার দোতলার ঘরে উড়ে এল ঝরাপাতা আর নুড়ি—আছড়ে পড়ল আধলা ইট!

ভাবনায় পড়লেন ভূত-শিকারি। এ বাড়ির ভূতপেতনি তাঁকে বন্ধু হিসেবে দেখছে, না শত্রু হিসেবে চোখে-চোখে রেখেছে, আঁচ করতে পারলেন না। তবে ক্ষণে-ক্ষণে রোমাঞ্চিত হতে লাগল তাঁর উসকোখুসকো গুম্ভ।

উঠে গিয়ে টেনে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তুলে দিলেন ছিটকিনি।

তাঁর চোখের সামনেই খট করে নেমে এল ছিটকিনি—ফট করে দু-হাট হল দরজা।

চোয়াল ঝুলে পড়েছিল সাহেবের। আর ঠিক তক্ষুনি হিপপকেট থেকে তাঁর রূপোর চিরুনি উঠে এসে ঠকাস করে মাথায় বাড়ি মেরে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে।

সাধের চিরুনি আর খুঁজে পাননি এডগারসাহেব।

ক্ষিপ্ত অশরীরীদের ঠান্ডা করার জন্যে ধূপ জ্বালিয়েছিল ময়নামতী। নিভে গেছিল সেই ধূপ। ভূত-শিকারির মাথায় এসেছিল বদবুদ্ধি। মেয়েভূতকে বশ করার জন্যে ল্যাভেন্ডারের শিশি খুলে ঘরময় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন সুগন্ধি।

দক্ষিণ ফ্রান্সের হালকা সুবাস কিন্তু পাগল করে দিয়েছিল ফরাসি ভূতপেতনি দুজনকে। মুর্হুমুহু : বেজে গেছিল পেতলের ঘণ্টা, দেওয়াল থেকে আছড়ে-আছড়ে পড়েছিল ছবির-পর-ছবি।

তিন দিনের বেশি হানাবাড়িতে থাকতে পারেননি এডগারসাহেব। আগে যা হয়নি—এবার তা হয়েছে। ইট আর পাথর ছোঁড়া হয়েছে তাঁকে টিপ করে। বুকে আর পিঠে।

তিন দিন পর, সটান বিলেতে ফিরে গেলেন ভূত-শিকারি। লিখলেন 'ইন্ডিয়ার সবচেয়ে কুখ্যাত হানাবাড়ি' নামে একখানা বই। সেই বই ছেপে বেরোতে-বেরোতে গেল একটা বছর।

এই এক বছর কিন্তু হানাবাড়িতেই থেকেছেন রেভারেন্ড রামকানাই এবং তাঁর ভার্যা। লিপিবদ্ধ করেছেন প্রায় দুহাজার অলৌকিক ঘটনা। তার মধ্যে আছে শূন্য থেকে মদের বোতলের আবির্ভাব—চেয়ারে আছড়ে পড়ে গুঁড়িয়ে যাওয়া। অবশ্যই তা চন্দননগরের বিখ্যাত সরাব। সাদা দেওয়ালে অদৃশ্য হাতে লিখন। একটাই নাম বারবার লেখা হয়েছে দেওয়ালে। 'মেরিয়ানা' সেই নাম।

রামকানাই প্রতি ঘটনা চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন এডগার লুসিকে। বইতে ঠাঁই পেয়েছিল সমস্ত ঘটনা।

বইটা বেরিয়ে যাওয়ার পর বাড়িময় যেন তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ হয়ে গেছিল। ময়নামতীর সাধের কাচের বাসনপত্র যখন চুরমার হতে লাগল, গয়নার বাক্স আলমারি থেকে উধাও হয়ে পড়ে রইল লনে—তখন স্বামী-স্ত্রী লম্বা দিলেন বাড়ি ছেড়ে।

জগদীশ গুপ্তর একটা হাস্যকর মুদ্রাদোষ আছে। তিনি তোতলা নন, কিন্তু কথা শুরু করার আগে প্রথম অক্ষরটা জোর দিয়ে বার কয়েক উচ্চারণ করেন। দীর্ঘকাহিনি তিনি নিবেদন করলেন এইভাবেই। বলার ভঙ্গিমা অতিশয় বিরক্তিকর। কিন্তু কাহিনির প্রমাদে উৎকর্ণ হয়ে রইলাম।

তিনি স্তব্ধ হতেই ইন্দ্রনাথ বললে, 'বুঝলাম। পার্থিব পন্থায় আপনার নাতনি খুন হয়েছে—পেতনি করেনি—এ বিশ্বাসটা কেন আপনার মাথায় এসেছে, তার জবাব পেলাম।'

'ক্যা ক্যা-ক্যানো বলুন তো?'

'ফরাসি ভূতপেতনী ভয় দেখিয়েছে পাথর ছুঁড়ে—মেরে ফেলেনি কক্ষনও, বড় অনিষ্ট করেনি।'

'ঠি-ঠি-ঠিক ধরেছেন। তবে কেন নাতনির খুলি গুঁড়িয়ে গেল?'

'মানুষের হাত গুঁড়িয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'একাই গেছিল?'

'সেটা আপনি বের করুন। একা যাওয়ার মেয়ে সে নয়। গাদাগাদা ছেলেবন্ধু। শাড়ি কক্ষনও পরেনি। জিনস আর শার্ট। ক্যারাটে জানত। ফায়ার আর্মসয়ে দারুণ ইন্টারেস্ট। চালাতেও জানত। গুলি ফসকায়নি। নীতিবোধ কম। কী বলছি, বুঝছেন নিশ্চয়। দাদু হয়ে আর কী বলব। আমি স্বদেশি করেছি, দেশসেবা করেছি, জীবনে আদর্শ রেখে এতগুলো বছর কাটালাম। এসব আমার ভালো লাগে না। মা নেই, বাবা নেই—আমি আর কতদিক দেখব?'

'বুঝেছি। ভূতের বাড়ির খবরটা পেল কী করে?'

জগদীশ গুপ্ত তখন তাঁর ব্যাগের চেন টানলেন। একটা বই বের করলেন। ইন্দ্রনাথের হাতে গছিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই বই পড়ে।'

বইটার নাম 'দ্য মোস্ট হন্টেড হাউস ইন ইন্ডিয়া'। লেখকের নাম এডগার লুসি।

চোখ তুলে বললে ইন্দ্রনাথ, 'পুস্তনিতে তো দেখছি আপনার নাম লেখা রয়েছে।'

'আমারই বই। এসব ব্যাপার মানি বলেই কিনি। ময়না যে এই পড়ে দৌড়বে, তা ভাবিনি।'

'ময়না? আপনার নাতনির নামও ময়না?'

'ময়নামতী। ওর মায়ের নাম ছিল ইন্দুমতী। তার মায়ের নাম বিন্দুমতী—মানে, আমার স্ত্রী।'

চুপ করে রইল ইন্দ্রনাথ। ভাবছে।

বললে, 'বইখানা আমার কাছে থাক। আপনার নাম-ঠিকানা ফোন নম্বর দিয়ে যান।'

ঘণ্টাখানেক লাগল বাগবাজারে পৌঁছতে। ইন্দ্রনাথ আমাকে ল্যাজে বেঁধে নিয়ে গেল। মান্ধাতার আমলের দোতলা বাড়িটার সরু সিঁড়ি দিয়ে সটান উঠে গেল। চাতালে দাঁড়িয়ে তিন দিকের তিনটে দরজার একটার কড়া নেড়ে বললে, 'ভূতনাথবাবু, জেগে আছেন, না ঘুমোচ্ছেন?'

কর্কশ খিটখিটে বুড়োটে জবাব ভেসে এল ভেতর থেকে, 'আবার কে আপদ এল? মোক্ষদা...ও মোক্ষদা...বলে দে ঘুমোচ্ছি।'

দরজা ঠেলতেই খুলে গেল। ভেতরে পা দিল ইন্দ্রনাথ। আঠার মতো পেছনে লেগে আছি আমি। ঢুকেই বললে, 'মানুষ বিপদে পড়লেই আপনার কাছে আসে। আপদ হব কেন?'

তক্তপোশে বসে এক বুড়ো। তিনদিকে তিনটে তাকিয়া। শিরদাঁড়া কুঁজো। গায়ে ময়লা গেঞ্জি। একমাথা টাক। গোটা শরীরটার হাড়গুলো চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। কোনও মানুষ যে এত রোগা আর কঙ্কালসার হয়, না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।

চশমাটা চোখে আঁটতে-আঁটতে খিটখিটে বুড়ো বললেন, 'চেনা-চেনা গলা মনে হচ্ছে...আরে কে ও! ইন্দ্রনাথ...ভূতনাথের চ্যালা...কী জাদু...এতদিন পরে কী মনে করে? ভূতধরা আমি ছেড়ে দিয়েছি। গেট আউট।'

অম্লানবদনে তক্তপোশে গিয়ে বসল ইন্দ্রনাথ। আমাকে বললে বসে পড়তে। বুড়োর তেউড়ে যাওয়া ওপরের শিরদাঁড়া টিপে দিতে-দিতে বললে, 'ব্যথাটা তো এই তিনখানা ভার্টিব্রায়?'

'হ্যাঁ...হ্যাঁ...ন্যাকামো হচ্ছে?'

'ভূতনাথবাবু, এডগার লুসিকে চেনেন?'

'দ্যাট ফোর-টোয়েন্টি? চারশো বিশ নম্বর ওয়ান? চন্দননগর নিয়ে যে গুলগাপ্পা ঝেড়েছে?'

'দ্য মোস্ট হন্টেড হাউস ইন ইন্ডিয়া আপনি পড়েছেন?'

'হোয়াট! এডগারের নষ্টামি আমি পড়ব না? গেট আউট।'

শিরদাঁড়া টিপতে-টিপতে ইন্দ্রনাথ বললে, 'আরাম লাগছে?'

'হুঁ।'

'এডগার ফোর-টোয়েন্টি কেন?'

'সব বোগাস। ও বাড়িতে কী আছে, সেটা এখনও গবেষণার বিষয়। আমার শিরদাঁড়াটা বেগড়বাঁই না করলে অ্যাটেম্প নিতাম। তবে এডগার ব্যাটাচ্ছেলে অ্যান্টনি গোমেজ আর রামকানাইয়ের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে সব বানিয়ে লিখেছে। যত না কাণ্ড ঘটেছে, তার বিশ গুণ বাড়িয়েছে। ননসেন্স! স্কাউন্ড্রেল!'

'আপনি জানলেন কী করে?'

'ইউ ফুল! ইউ ড্যামড! আমি জানলাম কী করে? ভূত-শিকারি ভূতনাথকে এ কথা বলবার সাহস তোমার হয়? গেট আউট!'

'বলুন না।'

'ইন্ডিয়ার একমাত্র ভূত-শিকারি আমি। ভূতের বাড়িগুলোর বদনাম ঘোচানোর জন্যে কোথায় যাইনি? কিন্তু বদনাম বাড়িয়ে লিখে যে লোক বই বিক্রির ধান্দায় থাকে—সে আমাদের প্রফেশনের কলঙ্ক। এডগার তাই করেছে। টাইমস আর বিবিসি থেকে রিপোর্টার পাঠিয়েছিল ঘটনাগুলোর সত্যি-মিথ্যে যাচাই করতে। গোমেজের ওই বউটার নাম যেন কী?'

'মায়া।'

'বেনেদের সেই মেয়েটা। ভালো মেয়ে। ইংরেজিটা বেশ জানে। স্বামীর কুকীর্তি চিঠি লিখে আমেরিকান সাইকিক্যাল রিসার্চ সোসাইটিতে পাঠিয়ে দিয়েছিল। ওদের জার্নালে তা ছেপে বেরোয়—ওই তো ওই তাড়ার মধ্যে আছে। খাসা চিঠি। নাম কেনার জন্যে অ্যান্টনি হাত মিলিয়েছিল এডগারের সঙ্গে। মায়ার তা ভালো লাগেনি।'

'ময়নামতী কিছু বলেনি?'

'রামকানাইয়ের সেই মিচকেপোড়া বাঁজা বউটা? দুটোই ফোর টোয়েন্টি। নাম আর পয়সা—দুটোরই দরকার ছিল। কম দক্ষিণা লুটেছে?'

'কিন্তু লোকে তো দেখেছে ভৌতিক কাণ্ড?'

'ভৌতিক কাণ্ড? স্টুপিড! ওসব ম্যাজিক আমিও জানি। বুড়বকদের বুদ্ধু বানাতে জানতে হয়। সৎ বলেই এই হাল আমার।—এসেছ কেন? মতলবটা কী?'

'ওই বাড়িতে একটা মেয়েকে মেরে ফেলা হয়েছে।'

'কে মেরেছে?'

'ভূতে নিশ্চয়। পাথর পিটে খুলি ভাঙা হয়েছে।'

'খবরদার! খবরদার! মেরিয়ানা খুনি নয়। অভাগিনী মুক্তি পাচ্ছে না বলেই দুষ্টুমি করছে—খুন করার ধাত তার রক্তে ছিল না—মনেও ছিল না।'

'মরে গেলে তো ধাত পালটে যায়?'

'কোথাকার জ্ঞানদাতা রে? গেট আউট! গেট আউট! পরলোক নিয়ে পকড়-পকড় করতে এসেছে ভূতনাথ শিকদারের কাছে। —যা জানতে চাও, সেটা জেনে যাও। মেরিয়ানার প্রেতাত্মাকে কেউ স্কেপগোট খাড়া করতে চেয়েছ। পাথর পিটিয়ে খুলি গুঁড়িয়ে বোঝাতে চাইছে—প্রেতিনীর কীর্তি। কক্ষনও না। মানুষের কীর্তি। মাগী ওখানে গেছিল কেন?'

'মাগী নয়—মেয়ে। ষোলো বছর বয়স।'

'আইব্বাস! 'লভ' করতে তো? ওই হানাবাড়ির বাগান তো লভের জায়গা। কলকাতা থেকেও ছোটে ছোঁড়াছুঁড়িরা। এই ছুঁড়িটার লাভার আছে...নিশ্চয় আছে...গেট আউট...আমার খিদে পেয়েছে।'

চন্দননগর পুলিশ থানা।

থানাদার ডিসুজা সাহেব বেশ খাতির করলেন আমাদের। ইন্দ্রনাথের চেয়ে বেশি করলেন আমাকে। কারণ আমি লিখি। ট্যাঁকের জোর না থাকলেও আজকাল লেখকরা ইদানীং বেশ কলকে পাচ্ছে এই একটা জোরে। কলমের জোরে।

অ্যালকাথিনের একটা প্যাকেট ইন্দ্রনাথের সামনে রেখে তিনি বললেন, 'গল্পের গোয়েন্দা আমি নই। হলে তুচ্ছ এই জিনিসটা নিয়ে মাথা ঘামাতাম।'

খোঁচাটা হজম করে নিয়ে বুদ্ধদেবের হাসি হাসল ইন্দ্রনাথ। হাসিতে যেন বরাভয় ঝরে পড়ছে।

বললে, 'কোথায় পেলেন?'

'বাগানের রাস্তায়। পাথর নুড়ির ওপর পড়েছিল। কত ছোট দেখেছেন? আলপিনের ডগার চেয়ে একটু বড়।'

'রঙটা সবুজ।'

'জিনিসটাও। ম্যাগনিফাইং গ্লাসে দেখেছি। শার্লক হোমস-এর মতো।'

এবারের খোঁচাটা যেন শুনতেই পেল না ইন্দ্রনাথ, 'বস্তুটা ধার দেবেন?'

'স্বচ্ছন্দে। আমরা প্র্যাকটিক্যাল ডিটেকটিভ। নাইনটি পারসেন্ট পার্সপিরেশন—টেন পারসেন্ট ব্রেন ওয়ার্ক। আচ্ছা আসুন, নমস্কার।'

জগদীশ গুপ্ত সত্যিই আদর্শবান পুরুষ। এত বড় শিল্পপতি—অথচ তিনতলা বাড়িটাকে বানিয়েছেন মধ্যবিত্তের মতো।

দোতলার বৈঠকখানা ঘরে বসে তিনি বললেন, 'আপনাকে তো বলেইছি, ময়নার নীতির বালাই ছিল না। দেদার ছেলে-বন্ধু।'

'মেয়ে-বন্ধু?'

'কম।'

'বিশেষ কারও নাম?'

রিসিভারের দিকে হাত বাড়ালেন জগদীশবাবু, 'কমলি, স্কুটারটা আছে? নিয়ে চলে আয়। দশ মিনিটের মধ্যে।'

কমলির পরনে কমলা রঙের সালোয়ার কামিজ। কালো বডিখানা স্টিলের তলোয়ার বললেই চলে।

বললে, 'একটা ছেলেই বড় হ্যাংলামো করত ময়নার সঙ্গে। আমাদের সঙ্গেও করেছে। একটু বেশি চায়। ও দাদু, আপনি কানে চাপা দিন।'

ইন্দ্রনাথ বললে, 'তার কি সবুজ গাড়ি আছে?'

চোখ বড় হয়ে গেল কমলির, 'মারুতি।'

'কোথায় পাব তারে?'

গ্রেট ইন্ডিয়ান রেফ্রিজারেশন কোম্পানির মালিকের একমাত্র ছেলে তার চেম্বারে বসে বললে, 'হ্যাঁ, আমার মারুতি আছে। সবুজ রঙের। চন্দননগরের ডিসুজাসাহেবেরও পার্সোনাল গাড়িটা মারুতি। সবুজ রং। চেনেন ডিসুজাকে? থানাদার ডিসুজা?'

'এখুনি এলাম তাঁর কাছ থেকেই।'

'থানায় গেছিলেন? গাড়িটা দেখেননি? ওর অফিসের সামনেই থাকে।'

'আপনার গাড়িটা কোথায়?'

'এই জানলা দিয়ে তাকান। ওই দেখুন।'

ইন্দ্রনাথ উঠে গেল জানলার কাছে। চেয়ার ছেড়ে উঠে গেছে ছেলেটাও। মিঠুন চক্রবর্তীর কায়দায় চুলের ছাঁট। পাতলা নাক, একটু টিকোলো। শান্ত সুন্দর চোখের চাহনি—অনেকটা ইন্দ্রনাথের মতোই। লম্বায় দুজনেই সমান। দেখতেও সমান সুন্দর। শুধু পোশাক আলাদা। ধুতি-পাঞ্জাবির পাশে সাফারি সুট।

এখন ওরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। চোখে-চোখে তাকিয়ে।

'আপনি তাহলে যাননি ময়নার সঙ্গে?'

'না।'

'কোথায় ছিলেন?'

'এখানে।'

'তার প্রমাণ? আপনি মালিকের ছেলে। হাজিরার খাতা আপনার জন্যে নয়।'

কাঁধ ঝাঁকাল সুদর্শন তরুণ, 'বিশ্বাস করুন।'

জয়ন্তকে অফিস থেকে তুলে নিয়ে ফিরলাম ইন্দ্রনাথের ডেরায়।

'জয়ন্ত,' বললে ইন্দ্রনাথ, 'থানাদার ডিসুজার মারুতি আর সুরেশ লাম্বার মারুতি—দুটোই এখন সন্দেহের আওতায় চলে এসেছে।'

সুরেশ লাম্বা সুদর্শন ওই ছেলেটার নাম। চেহারায় নবাবপুত্তুর। স্বভাবে মেয়েঘেঁষা। মাড়োয়ারি জন্মসূত্রে—শিক্ষায়-দীক্ষায় বাঙালি।

জয়ন্ত বললে, 'থানাদারের গাড়ি তোলা পরে হবে'খন। সুরেশের গাড়ি তুলিয়ে নিচ্ছি। আর কী হুকুম?'

জবাব না দিয়ে টেলিফোন তুলল ইন্দ্রনাথ। নিমেষে তারের ও-প্রান্তে এসে গেল প্রেমচাঁদ—প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সির কর্ণধার। দিল্লি যার হেড অফিস।

দিল্লি আর কলকাতায় কথা হয়ে গেল এইভাবে :

'ইন্দ্র বলছি। হেল্প চাই।'

'ফরমাইয়ে।'

'সরকারি ফোরেনসিক ল্যাবের দুরবস্থা তোর অজানা নয়।'

'সেইজন্যেই তো ইমপোরটেড ইকুইপমেন্ট দিয়ে সাজিয়েছি আমার ফোরেনসিক ডিপার্টমেন্ট। সেটাও তোর অজানা নয়।'

'কাল সকালে ক্যালকাটা অফিসের ইনচার্জকে পাঠিয়ে দে।'

'তোর কাছে? কী মতলবে?'

'এক টুকরো রং পাঠাব..না, না, দুটো টুকরো। দুটোই সবুজ রঙের।'

'বেশ?'

'স্পেকটোগ্রাফিক অ্যানালিসিস করতে হবে।'

'প্রতিটি নমুনায় কী-কী উপাদান আছে জানতে হবে? মিলে যাছে কিনা বলতে হবে?'

'ইয়েস, মাই বয়।'

'হেল উইথ ইউ। ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে এইভাবে কেউ কথা বলে?'

'প্রেম, স্ক্যানিং ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপ আছে? যা দিয়ে এক্স-রে অ্যানালিসিস করা যায়?'

'কী নেই বন্ধু? দিস ইজ প্রেমচাঁদ প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি—'

'রঙে ক'টা স্তর আছে, বলতে হবে।'

'আর কী?'

'লেজার এনার্জি দিয়ে এক-একটা রঙের স্তরকে ভেপার করে দেওয়ার প্রসেসটার কী যেন নাম?'

'লেজার মাইক্রোপ্রোব। ভেপারকে অ্যানালাইজ করতে হয় এমিসন স্পেকট্রোগ্রাফি দিয়ে। রঙের প্রত্যেকটা উপাদানের ওয়েভ লেন্থ জানা যায়। এত দরকার আছে কি?'

'আছে। অকাট্য প্রমাণ ছাড়া মাল ফসকে যাবে। টাকার মালিক। পলিটিক্যাল কানেকশন আছে নিশ্চয়। আমি চাই বৈজ্ঞানিক প্রমাণ। হেল্প মি।'

'ডোন্ট ওয়ারি।'

অনেক রাতে বাড়ি ফিরলাম। কবিতা সারাদিন হেদিয়ে মরেছে। ভাগ্যিস ইন্দ্র সঙ্গে আসেনি। ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দিত কবিতা।

কথার তোড় নীরবে শুনে গেলাম। তারপর বললাম সারাদিনের কাহিনি। সবশেষে বললাম, 'সুরেশ লাম্বাই গেছিল ময়নার সঙ্গে হানাবাড়িতে।'

'জানলে কীভাবে?'

'বাগানের নুড়ি চাকায় লেগে ছিটকে গিয়ে লেগেছিল ড্রাইভারের দরজার প্যানেলে। রং চটে গিয়েছিল নুড়িতেই। ডিসুজা কূর্ম অবতার-থানাদার হলেও এই একটি উত্তম কাজ করেছে। কুচি রং হুবহু মিলে গেছে চটা রঙের জায়গায়। নিজের চোখে দেখে এলাম।'

হুম করে দম ফেলে কবিতা বললে, ঠাকুরপোর ব্রেন আছে বটে। ডিটেকশনে ডক্টরেট। এখন মাইক্রোসকোপিক এগজামিনেশন করে মিলিয়ে নেওয়া বাকি। ফাইন! লাম্বা ছোঁড়া কি লম্বা দিয়েছে?'

'তাকে বাড়ি ছেড়ে নড়তে বারণ করে এল ইন্দ্রনাথ। লোকাল থানাদারও নজর রেখেছে।'

নজর রাখাই সার হয়েছিল।

পরের দিন সকালেই টেলিফোন এসেছিল ইন্দ্রনাথের, 'মৃগ চলে আয়। লাম্বা-লম্বা দিয়েছে।'

গেলাম লাম্বার বাড়ি। ঊষালগ্নে গোটা বাড়ি কেঁপে উঠেছিল ঘন-ঘন গুলির আওয়াজে। গুলি চলছে সুরেশ লাম্বার ঘরে। আধ মিনিটেই থেমে গেছিল শব্দ।

দরজা ভেজানো ছিল। মেঝেতে লুটিয়ে আছে সুরেশ। হাতে রয়েছে দুশমন আকৃতির একটা হ্যান্ডগান। ভোঁদা, কালচে। চিক্কণ নয় মোটেই। খ্যাঁদা চোঙা লম্বায় মোটে দু-ইঞ্চি। দেখলেই গা হিম হয়ে যায়। 'স্টার ওয়ার্স' সিনেমার ডার্থ ভেডার-এর রশ্মিবন্দুক বললেই চলে।

আমেরিকার কুখ্যাত কোবরে M-11/9—যার ম্যাগাজিন থেকে বত্রিশটা নাইন মিলিমিটার সাইজের তামার গুলি বেরিয়ে যায় পরপর—একবার ট্রিগার টিপে ধরলেই।

সুরেশ তার নিজের ব্রেন ঝাঁঝরা করেছে বত্রিশটা মৃত্যুদূতকে দিয়ে।

তার আগে লিখে গেছে ছোট্ট চিঠি। পরিষ্কার বাংলায় :

আমার অপরাধ আমি মারোয়াড়ির ছেলে। ময়নাকে এত ভালোবেসেও তার মন পেলাম না। ও আমাকে চায়নি। চেয়েছিল আমার কোবরেকে। হানাবাড়িতে গেছিল কোবরের শক্তি যাচাই করতে। খালি করেছিল ম্যাগাজিন। তারপর সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। আমি দিইনি। কেড়ে নিতে গেছিল। পারেনি। ক্যারাটে 'চপ' মেরেছিল আমার কণ্ঠা টিপ করে। আমি থার্ড গ্রেড ব্ল্যাক বেল্ট ও নই। ঘুরে গিয়ে বেঁচে গেছিলাম। হাতের কোবরেও ঘুরে গিয়ে ওর মাথায় মেরেছিল। ভীষণ ভারি। মারা যায় তক্ষুনি। বাঁটের খাঁজ ছিল চোট-এর জায়গায়। লেভেল করে দিয়েছিলাম পাথর দিয়ে। ময়না নেই। আমি চললাম। রইল অভিশপ্ত কোবরে। আর যেন কাউকে ছোবল না মারে।

* 'নবকল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশিত (শারদীয় সংখ্যা, ১৪০০)

বেঁচে উঠলেন ফাদার ঘনশ্যাম

সুনামের মতো একটা জিনিস ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল মাঝে-মাঝে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেন। আবার এক-একটা সময় আসে, সুনামের আনন্দে বুঁদ হয়ে থাকতে পারেন না। অল্প সময়ের জন্য হলেও এইরকম ঘটনা তাঁর জীবনে প্রায় ঘটে। কখনও তিনি কাগজে-কাগজে পৃথিবীর নবম আশ্চর্য হয়ে থাকেন, সাপ্তাহিকীর সমালোচনা স্তম্ভের বাগবিতণ্ডার মধ্যেও তাঁর ঠাঁই হয়ে যায়, ক্লাব আর ড্রইংরুমে তাঁকে নিয়ে মুখরোচক আড্ডা জমে—সেইসব আড্ডায় তাঁর নিপুণ আর বুদ্ধিদীপ্ত গোয়েন্দাগিরির অনুপুঙ্খ বর্ণনা অত্যন্ত ভুলভাবে পরিবেশন করা হয়। আর এই জিনিসটা বেশি করে ঘটে এই পশ্চিমবঙ্গেই। ফাদার ঘনশ্যামকে যারা জানে, তাদের কাছে এই গপ্পোগুলো বেশ বেখাপ্পা আর অবিশ্বাস্য মনে হয়। তা সত্বেও, ডিটেকটিভ হিসাবে ফাদার ঘনশ্যামের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি অনেক ম্যাগাজিনেই বেরচ্ছে।

আশ্চর্য এই যে, ভ্রাম্যমান এই বহুল প্রচারিত আলোকবর্তিকা দীপ্যমান হলেন অতি প্রত্যন্ত এক অঞ্চলে—সুদূরের সেই অঞ্চল তাঁর নিবাস থেকে বহু-বহু দূরে। তাঁকে একটা দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছিল বিশেষ সেই জায়গায়। কাজটা মিশনারী বিষয়ক বটে, আবার গ্রাম্য গির্জা বিষয়কও বটে। জায়গাটা ভারতের একদম উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে। যেখানে স্বাধীনতাকামী উপজাতীয়রা নিত্য সংঘর্ষ আর চোরাগোপ্তা খুন-জখম যেন তেন প্রকারেণ চাগিয়ে রেখেছে, যেখানকার সন্ত্রাসবাদে গোপনে মদত দিয়ে চলেছে ভারতের বাইরের রাষ্ট্রশক্তিরা—ভারতকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন আর দুর্বল করার প্রয়াসে। সব রকম গাত্রবর্ণের মানুষই এখানে থাকে—সাদা, কালো, হলদেটে। পর্যটন পিয়াসীরা প্রায় সারা বছর টহল দিয়ে যায় সেখানে—কারণ, জায়গাটাকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক দিয়ে ভারতের দ্বিতীয় ভূস্বর্গ বলা চলে।

গোলমালটা শুরু হল এইরকমই এক পর্যটককে নিয়ে। দ্বিতীয় ভূস্বর্গে পা দিয়েই তিনি তাঁর একটা ব্যাগ হারিয়ে ফেলেছিলেন। ভীষণ বিরক্ত, ভীষণ [illegible] হয়ে তিনি ঢুকে পড়লেন প্রথমেই যে বাড়িটা দেখলেন, সেই বাড়ির মধ্যে।

বাড়িটা সেই অঞ্চলের মিশন-হাউস, গ্রাম্য-গির্জা রয়েছে পাশেই। বাড়ির সামনে টানা লম্বা বারান্দা। সারি-সারি পোঁতা খুঁটি পাক দিয়ে বেড়ে উঠেছে কালো আঙুর—পাতায় ম্যাড়মেড়ে লালচে ভাব। এর ঠিক পেছনে একইভাবে সারবন্দি ভাবে বসে রয়েছে সিধে শক্ত খুঁটির মতো অনেকগুলো মানুষ—গায়ের রং তাদের আঙুর ফলের মতোই কালো। তাদের কারোরই চোখের পাতা পড়ছে না। চামড়ায় লেগে আছে যেন বৃষ্টিবনের গাছের শ্যাওলা। এদের অধিকাংশ লম্বা বিড়ি টানছে—ছোট চুরুট বলা যায়। ছোট্ট এই দলে ধূমপানই একমাত্র নড়াচড়ার চিহ্ন। পর্যটক মহাশয়ের বর্ণনায় এরা নিছক উপজাতি ছাড়া কিছু নয়। যদিও এদের কয়েকজন মহাভারতের মধ্যম পাণ্ডবের বংশধর বলে দাবি করে।

ভদ্রলোক কলকাতায় থাকেন। একটি দৈনিক সংবাদপত্রের সাংবাদিক। ছিপছিপে তনু, চুল ফাঁকা-ফাঁকা, অসাধারণ নাক। অ্যাডভেঞ্চারাস এই নাক দেখলেই মালুম হয় পিঁপড়ে-খেকো প্রাণী যেমন তার দীর্ঘ নাকের ডগা দিয়ে পরখ করে নেয় সামনের পথ ঠিক আছে কিনা, ইনিও সেই বিদ্যায় বিলক্ষণ রপ্ত। সংবাদ নাকি সাংবাদিকদের কাছে দৌড়ে চলে আসে। ইনি এঁর নাকের ডগা দিয়ে সংবাদ টেনে নেন, যাচাই করেন, তারপর ছেপে দেন।

আশ্চর্য এই পুরুষের নামটাও। নাক উঁচু করে চলবেন ভবিষ্যতে, নামকরণের সময়ে তাঁর বাবা-মা বোধহয় সেই তথ্য অবগত ছিলেন—তাই তাঁর নাম রেখেছিলেন—নাকেন্দ্র। পরে নিশ্চয় তাঁরা ধ্যানযোগে উপলব্ধি

করেছিলেন, এহেন নামের অধিকারী হয়ে পুত্রকে বিস্তর প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। তাই তাঁরা অন্য একটা নাম দেন—বরেন্দ্র। যৌবন উপস্থিত হওয়ার পর বরেন্দ্র জানতে পারলেন, দুটি কারণে তিনি কোনও মহিলার বর হতে পারছেন না। এক, তাঁর অ্যাডভেঞ্চারাস নাক—দুই, তাঁর বরেন্দ্র নাম। নাক ছাঁটাই করা সম্ভব নয়। তাই তিনি নাম ছাঁটাই করলেন। 'বর' বাদ গেল, হয়ে গেলেন শুধু ইন্দ্র। যদিও নামের দৌলতে ঋগবেদের প্রধান দেবতার একটি ছাড়া কোনও গুণই তিনি অর্জন করতে পারলেন না। যেটি পারলেন, সেটি হল, অন্যান্য সাংবাদিকদের ওপর ছড়ি ঘোরানো। যেমন করতেন দেবরাজ—দেবতাদের ওপর কর্তৃত্ব।

এঁর উন্নাসিকতা একটি ব্যাপারে তাঁকে উগ্রপন্থী করে তুলেছিল। ধর্মচর্চা হোক স্বত:স্ফূর্ত—তা যেন থাকে সংগঠনের বাইরে। দেবালয় ছিল তাঁর দু-চক্ষের বিষ, সাংগঠনিক ধর্ম প্রচারের ব্যাপারে তাঁর কলম থেকে অ্যাসিড ঝরে। এহেন মানসিকতার মানুষ যখন ব্যাগ হারিয়ে ক্ষিপ্ত হন এবং প্রথম বাড়িটাকেই দেখেন মিশন-হাউস, তখন তাঁর ওপর উগ্রচণ্ডীর ভর হওয়া স্বাভাবিক। গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো তিনি দেখলেন বিলকুল নিষ্কর্মা এবং ধরণী সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন কয়েকটি মানুষ নিমগ্নচিত্তে বিড়ি সেবন করছে কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদানের মতোই চিড়বিড় করে উঠলেন ধ্যানস্থ ধূমপায়ী ওই কয়েকজনের ওপর। নির্লজ্জভাবে সময়ের এহেন অপব্যবহার যে নিদারুণ অদক্ষতার লক্ষণ, তা জ্বালাময়ী ভাষায় প্রকাশ করতে কসুর করলেন না। অত:পর তিনি যে প্রশ্নবাণটি নিক্ষেপ করলেন, সেটি তাঁর প্রিয় ব্যাগঘটিত। প্রিয় বস্তু ফিরিয়ে আনার তিলমাত্র উদ্যোগ না দেখিয়ে ধূমপায়ী ক'জন যখন ধূমপানকেই ধ্যানযোগের প্রথম ধাপ বলে বিবেচনা করল এবং বাক্যহারা হয়ে রইল—তখন তিনি বাগবিস্তারের গুরুদায়িত্ব নিজের কাঁধে রাখলেন এবং একাই কথা বলে গেলেন।

কল্পনার চোখে দেখে নিন, প্রখর রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে কয়েক বিঘৎ লম্বা পেরেকের মতো সিধে একটা লোক গলা চড়িয়ে কথাই বলে যাচ্ছেন, তাঁর পোশাক অতীব পরিচ্ছন্ন, ইস্পাত-কঠিন মুঠোয় ঝুলছে একটা ব্রিফকেস। ছায়ায় সমাসীন নিষ্কম্প কয়েকটি মানুষকে লক্ষ করে তিনি অনর্গল বকে চলেছেন। উচ্চকণ্ঠে অতি যত্নে তিনি প্রথমে ব্যাখ্যা করেছিলেন কীভাবে ধূমপায়ী পুরুষ ক'জন এমন অলস আর কদর্য হয়ে উঠেছে। এদের এই পশুবৎ আচরণ চূড়ান্ত তামসিকতার লক্ষণ এবং এরা পশুর চাইতেও অধম। অনেক আগেই নিজেদের এহেন আদিম বর্বরতা এদের বোঝা উচিত ছিল। বক্তার ধারণা, পাদরিদের অনিষ্টকর প্রভাব রয়েছে এর মূলে। এই একটি কারণে এতগুলি লোক দারিদ্রের চরম সীমায় পৌঁছেছে, চূড়ান্তভাবে নির্যাতিত হয়েছে এবং উপায় না পেয়ে ছায়ায় বসে অনর্গল ধূমপান করে চলেছে।

তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতার শেষাংশ ছিল এইরকম, 'অত্যন্ত নরম প্রকৃতির মানুষ তোমরা, তাই তোমাদের পায়ে মাড়িয়ে যাচ্ছে মুকুটধারী পাদরিরা, তাদের গায়ে ঝকমকে সোনার আলখাল্লা, তোমাদের পরণে ছেঁড়া পোশাক। অত্যাচারীর ভূমিকায় থেকে এরা ফেটে পড়ছে আত্মম্ভরিতায়। ঠকিয়ে যাচ্ছে তোমাদের ঝকমকে ক্রাউন, চাঁদোয়া আর পবিত্র ছাতার ঐশ্বর্য দেখিয়ে, তোমরা বোবা বনে রয়েছ এদেরই সামনে। ভাবছ এবং তোমাদের ভাবানো হয়েছে—এরাই নাকি ধরণীর রাজা, আকাশ থেকে নেমে এসেছে তোমাদের ভালো করার জন্যে। কতখানি ভালো হয়েছে তা আয়নায় নিজেদের দেখলেই হাড়ে-হাড়ে টের পাবে। নিজেদেরই কান্না পাবে। বড়-বড় কথা আর জাঁকজমক দেখিয়ে তোমাদের ভুলিয়ে রাখা হচ্ছে বলেই আজ তোমাদের এই হাল হয়েছে। বর্বরতার পর্যায়ে নেমে এসেছ, লিখতে জানো না, পড়তেও জানো না—'

ঠিক এই সময়ে পাদরিসাহেব স্বয়ং বেরিয়ে এলেন মিশন-হাউসের বাইরে। নিতান্ত দীনহীন পোশাকে। প্রায় ছুটতে-ছুটতে এলেন। তাঁর মাথায় নেই স্বর্ণকিরীট, অঙ্গে নেই মহার্ঘ বস্ত্র। চালচলন মর্যাদাব্যঞ্জক নয় মোটেই। বরং তার বিপরীত। গগন থেকে খসে পড়া ধরণী-সম্রাট মনে হওয়া দূরে থাক, প্রথম দর্শনেই তাঁকে নিতান্ত হাঘরে মানুষ বলে মনে হয়। অন্যের ব্যবহার করা কালো আলখাল্লায় মোড়া যেন একটা বেঢপ বাণ্ডিল। মাথায় মুকুট- ফুকুটের বালাই নেই। চকচক করছে টাক। হোঁৎকা আকৃতি নিয়ে তিনি বিষম বেগে বেরিয়ে নিস্পন্দ ধূমপায়ীদের কী যেন বলতে গেলেন, কিন্তু আগন্তুককে দেখেই দ্রুতস্বরে বললেন—

'আরে! আরে! বলুন কীভাবে সাহায্য করতে পারি। ভেতরে আসতে পারেন—স্বচ্ছন্দে।'

ভেতরে এলেন সাংবাদিক ইন্দ্র। বিবিধ বিষয়ে তাঁর জ্ঞানবৃদ্ধিও ঘটতে লাগল তখন থেকে। ধরে নেওয়া যেতে পারে, পূর্ব ধারণার চাইতে শক্তিশালী ছিল ভদ্রলোকের সাংবাদিক-কৌতূহল আর সহজাত প্রবৃত্তি। সেয়ানা সাংবাদিকদের যা অবশ্যই থাকে। প্রচুর প্রশ্ন করে গেলেন। জবাব শুনে চমৎকৃত হলেন। আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পেল। যা ছিল তাঁর বক্তৃতার পাদদেশে—অর্থাৎ কেলে মর্কট মানুষগুলো লিখতে জানে না, পড়তেও জানে না—এই ব্যাপারেই আবিষ্কৃত করলেন যে তথ্য, তা তাঁর পূর্ব ধারণা নস্যাৎ করে ছাড়ল। এরা সবাই দিব্বি লিখতে পারে, চমৎকার পড়তে পারে। কারণ একটাই। বেঢপ চেহারার এই পাদরি নিজে তাদের লিখতে পড়তে শিখিয়েছেন। কিন্তু কেউই এই দুটোর ধার ধারে না। তারও কারণ আছে। ওরা কথা বলতে ভালোবাসে। কথার মাধ্যমেই শেখে, কথার মাধ্যমে শেখায়, কথার মাধ্যমেই বোঝায়। স্রেফ প্রাকৃতিক পন্থা তাদের বেশি পছন্দসই। সাংবাদিক মশায় আরও জানলেন, এই যে অদ্ভুত মর্কুটে মানুষগুলো আবলুস কাঠের তৈরি পুতুলের মতো চুপচাপ বসে, মাথার এক গাছি চুলও না নাড়িয়ে, অপদার্থ অলসের মতো এক নাগাড়ে লম্বা বিড়ি টেনে যাচ্ছে—এরা প্রত্যেকেই অত্যন্ত কর্মঠ নিজস্ব জমিতে। সাংবাদিকের বিস্ময় আরও বেড়ে গেল যখন জানলেন, ভিখিরির মতো দেখতে হলেও ওদের প্রত্যেকের নিজেদের চাষ-আবাদের জমিজমা রয়েছে। অর্থাৎ দারিদ্র্য কী জিনিস, তার স্বাদ এখনও পায়নি। এরা গতর খাটায়, অল্পে সন্তুষ্ট হয়, বাকি সময়টা প্রতিবেশীদের মঙ্গল চিন্তা করে এবং অত্যন্ত সুখী জীবনযাপন করে। জমিজমার মালিক হওয়ার ব্যাপারে পাদরি সাহেবের অবদান আছে সামান্য এবং পলিটিক্সে শুধু এই ক্ষেত্রেই তিনি নাক গলাতে বাধ্য হয়েছেন। বংশ পরম্পরায় এরা জমি ভোগ করে এসেছে। পাদরি সাহেব শুধু দেখেছেন, বংশধরদের কেউই যেন জমি নেই বলে গা ঢালা দিয়ে কাটায়। জমি পাইয়ে দিয়েছেন প্রত্যেকেই। স্থানীয় পলিটিক্সে এইটাই সর্বশেষ হস্তক্ষেপ। নাস্তিকদের আধিপত্য এখানে বেড়েই চলেছে। তাদের প্রচার বিজ্ঞানকেন্দ্রিক। ফলাও করে বিজ্ঞান যুক্তিনিষ্ঠ সংগঠনরা জানিয়ে যাচ্ছে, ভগবান-টগবান কিছু নেই। চার্বাকনীতি অনুসরণ করো। পরলোকের কথা না ভেবে ইহলোকেই গুছিয়ে নাও। ঠাকুর দেবতাদের নিয়ে ব্যবসা, তা লাটে তুলে দাও। দৈব ঘটনা, অলৌকিক ঘটনা—এসব ধর্মব্যবসায়ীদের বাকতাল্লা—একদম কান দেবে না। জানবে, সবই বিজ্ঞাননির্ভর। বিজ্ঞানে যার ব্যাখ্যা হয় না, বুজরুকি দিয়েও তা মগজে ঢোকানো যায়। ব্যাখ্যা একটা কোথাও আছে, বিজ্ঞান সেই ব্যাখ্যার নাগাল ধরে ফেলবেই। সেদিনই বুঝবে দৈব মাহাত্ম্য স্রেফ বোলচাল, ধর্মের নামবলী গায়ে দিয়ে লোক ঠকানোর কারবার।

একটা গুপ্ত সমিতির অভ্যুদয় ঘটেছে স্থানীয় পলিটিক্সের এহেন গোলমেলে পরিস্থিতিতে। মাঝে-মাঝে দাঙ্গা বাধাচ্ছে এই সমিতি বিজ্ঞান আর সমাজ কল্যাণের অজুহাতে। প্রচলিত বিশ্বাস আর সংস্কারের এক তীব্র সমালোচক এই সমিতির কর্ণধার। নাম তাঁর আলভারেজ। পূর্বপুরুষ ছিলেন পর্তুগীজ। রক্তের গরম এখনও তাঁর ধমনিতে বইছে। নিন্দুকরা অবশ্য বলে, নিগ্রো রুধির কিঞ্চিৎ পরিমাণে মিশেছে তাঁর ধমনীতে। ভদ্রলোক সুসংগঠক। এ জায়গার বেশ কয়েকটা লজ আর মন্দিরের একচ্ছত্র অধিপতি, সেসব জায়গায় গোপনে চলে নাস্তিকতার আরাধনা—কাজকর্ম বিলক্ষণ হেঁয়ালিপূর্ণ।

রক্ষণশীল যারা, তারা সংগঠিত হয়েছে যে ব্যক্তির ছাতার তলায় তিনি বিলক্ষণ বিত্তবান পুরুষ। বেশ কয়েকটা কারখানার মালিক। পয়সা আছে, মানসম্মানও আছে। তবে তাঁর নাম শুনলেই লোকে চনমনে বোধ করে না। নিজে সম্ভ্রান্ত হয়েও পাঁচজনের সঙ্গে মিশে থাকেন। নাম তাঁর রঞ্জুলাল। রঞ্জুলাল যদি উঠেপড়ে না লাগতেন এবং মিশন-হাউসের পাদরির সঙ্গে হাত না মেলাতেন তাহলে এখানকার সব চাষি জমির মালিক হতে পারত না। ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল সুকৌশলে এই ব্যক্তিকে দিয়ে মস্ত এই কাজটা করাতে পেরেছেন বলেই দাঙ্গাহাঙ্গামা এখানে কমে গেছে—শান্তি-শৃঙ্খলা বহাল রয়েছে।

সাংবাদিক ইন্দ্রকে এইসব কথা যখন বলে যাচ্ছেন ফাদার ঘনশ্যাম, সেই সময়ে রক্ষণশীল নেতা রঞ্জুলাল ঢুকলেন ঘরে। ভদ্রলোক কৃষ্ণকায় পুরুষ। অস্বাভাবিক পেটমোটা। গোটা শরীরটায় যেন হাওয়া ঢুকিয়ে

ফুলিয়ে টানটান করা হয়েছে—ফুটবলে যা করা হয়। টোকা মারলেই বুঝি টং করে আওয়াজ হবে। তাঁর মুখ গোল, গালে আর চিবুকে প্রচুর মাংস, কিন্তু মাথায় চুল নেই মোটে, বিলকুল তেলতেলে মাথা। সুগন্ধী চুরুট টানতে-টানতে ঘরে ঢুকেই তিনি থিয়েটারি ঢঙে চুরুট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পা দিয়ে মাড়িয়ে নিভিয়ে দিলেন। যেন ফাদার ঘনশ্যামকেই তিনি খোদ গির্জে বলে মনে করছেন। বাতাসে মাথা ঠুকে অভিবাদনও সারলেন আশ্চর্যভাবে কোমর বেঁকিয়ে—ওইরকম টাইট ফিগারে ঝট করে এতখানি বেঁকে পড়া অসম্ভব। কিন্তু অসম্ভবকেই তিনি সম্ভব করলেন। তবে হ্যাঁ, সামাজিক মেলামেশায় রঞ্জুলাল অতি মাত্রায় নিষ্ঠাবান পুরুষ—বিশেষ করে ধার্মিক ব্যক্তিদের সমীপে এলে তিনি যেন তাঁর সমস্ত অহংবোধ নিমেষে নিক্ষেপ করেন মাটির দিকে। এই ব্যাপারে তিনি পাদরিদের চেয়েও বেশি পাদরিপ্রতিম। বিড়ম্বিত বোধ করলেন ফাদার ঘনশ্যাম—প্রাইভেট লাইফে এতটা বিনয় তাঁকে বরাবর বিচলিত করে।

বললেন ফিকে হেসে, 'পাদরিদের মতো গড়ে উঠিনি আমি। তবে এটাও ঠিক যে পাদরিদের হাতে গড়বার ভার পুরো ছেড়ে দিলে, পাদরিজনোচিত হত না কিছুই।'

হঠাৎ উৎফুল্ল হলেন সাংবাদিক ইন্দ্র—'মি: রঞ্জুলাল, আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় তো আগেই ঘটেছে। মনে পড়ছে? বম্বের ট্রেড কংগ্রেসে গেছিলেন?'

মি: রঞ্জুলালের মাংসল চোখের পাতা পাখা ঝাপটাল বারকয়েক। হাসলেন নিজস্ব ঢঙে। বললেন, 'মনে পড়েছে।'

'ঘণ্টা দুয়েক চলেছিল মিটিং। কাজ হয়েছিল অনেক। আপনিও অনেক বদলে গেছেন।'

'কপাল ভালো অমন জায়গায় যেতে পেরেছিলাম,'—রঞ্জুলাল বেশ বিনীত।

'সৌভাগ্য তাদের কাছেই আসে সৌভাগ্যকে যারা লুফে নিতে পারে,'—সোৎসাহে বলে গেলেন সাংবাদিক ইন্দ্র, 'কথায় বাধা দিচ্ছি না তো?'

'একদম না।' রঞ্জুলালের জবাব, 'পাদরিসাহেবের কাছে হামেশা আসি স্রেফ দুটো কথা বলার জন্য—যা প্রাণে আসে, তাই বলে যাই—কাজের কথা থাকে না।'

ফাদার ঘনশ্যামের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর অন্তরঙ্গতা সঞ্চারিত হয়েছিল সাংবাদিক ইন্দ্রর মধ্যেও। দেখতে-দেখতে নৈকট্যবোধ এসে গেল তিনজনের মধ্যেই। রকমারি আলোচনায় মুখর হলেন তিন পুরুষ। অচিরে সাংবাদিক ইন্দ্র উপলব্ধি করলেন, মিশন-হাউস ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁর পূর্ব ধারণাকে বেশি পাত্তা দেওয়া ঠিক হচ্ছে না সাদামাটা পাদরির সামনে। ইনি মুখে খই না ফুটিয়ে আর চেহারায় চমক না দেখিয়ে সমাজের যা মঙ্গল করে চলেছেন, তা অনেক বাক্যবীরের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তিনি নিজেই শেষকালে প্রস্তাব করলেন, ফাদার ঘনশ্যামের এত কিছু সুকর্ম, তিনি দেশময় প্রচার করতে চান তাঁর সুলেখনীর মাধ্যমে। আর ঠিক সেই কথার পরেই ফাদার ঘনশ্যাম বুঝলেন, সাংবাদিক ইন্দ্রর বৈরী আচরণ যদিও বা বরদাস্ত করা যায়, তাঁর সহানুভূতির সুর তিনি সহ্য করতে পারছেন না।

সাংবাদিক ইন্দ্র কিন্তু এমন উপকরণ কি ছাড়তে পারেন? কোমর বেঁধে লেগে গেলেন। ফাদার ঘনশ্যামকে নিয়ে ফিচারের পর ফিচার লিখে গেলেন ইংরিজি আর বাংলা পত্রপত্রিকায়। উচ্চ প্রশংসায় ঠাসা সেইসব লেখা সাগরপাড়ের কাগজেও ছাপা হতে লাগল বিশেষ করে আমেরিকায়। মধ্যপ্রাচ্য ছেয়ে গেল তাঁর লেখালেখিতে। মিডলওয়েস্টের দেশগুলি উদগ্রীব হয়ে রইল ফাদার ঘনশ্যামের নতুন-নতুন কাহিনি জানবার আশায়। খর্বকায় কুমড়ো আকৃতি ফাদারের নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও তাঁর ফটো তোলা হল দেদার এবং বিশাল ছবি ছাপা হয়ে যেতে লাগল যুক্তরাষ্ট্রের বহুল প্রচারিত রবিবাসরীয় পত্রিকাগুলোয়। বেচারা ফাদার ঘনশ্যাম! প্রচারের দানবিক চাকার ঘূর্ণন বন্ধ করতে পারলেন না তিনি কিছুতেই। তাঁর নিছক কথাগুলোকে তাঁর বাণী বানিয়ে কাগজে-কাগজে ছাপিয়ে যেতে লাগলেন সাংবাদিক ইন্দ্র। ফাদার ঘনশ্যামের বাণী ফ্যালনা জিনিস নয়। বড়-বড় পোস্টার বানিয়ে বিক্রির ব্যবসাও জমে উঠল দেখতে-দেখতে। মোটা হরফের ওপর ফাদারের শ্রীহীন আকৃতি শোভা পেতে লাগল ঘরে-ঘরে। এরপর দেখা গেল, তাঁর মুখের সামান্য কথা বাণীতে

রূপান্তরিত হয়ে যাওয়ার পর স্লোগানে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন মিছিলে সেই স্লোগান পাইকারি হারে কাজে লাগানো হচ্ছে। আমেরিকা ছাড়া অন্য দেশের মানুষের কাছে একসময় বড় একঘেয়ে লাগতে লাগল ফাদার ঘনশ্যামকে নিয়ে বাড়াবাড়ি দেখে। কিন্তু আমেরিকা জাতটা আলাদা। ম্যাডাম ব্লাভাটস্কি, কর্নেল অলকট, অ্যানি বেসান্ত প্রমুখ থিয়সফিস্টদের ধারণা অনুসারে মানুষ জাতটার বর্শাফলক এই আমেরিকান জাত—এগিয়ে যাচ্ছে দুর্বার গতিতে। নতুন কিছু পেলে তার সমাদর করতে তারা জানে। তাই তারা সাদর আমন্ত্রণ জানাল ফাদার ঘনশ্যামকে। বেশি কিছু না, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি স্টেটে যাবেন এবং একটি করে বক্তৃতা দেবেন। ফাদার ঘনশ্যাম সবিনয়ে সেই সব আমন্ত্রণ প্রত্যাখান করলেন। পরিণামে তাঁর সম্পর্কে আমেরিকান মানুষের শ্রদ্ধা দ্বিগুণ-ত্রিগুণ হয়ে গেল। ফাদার ঘনশ্যাম নাকি এক বিস্ময়। আমেরিকায় বিনা পয়সায় বেড়াতে চান না যিনি, তিনি নিশ্চয় লোকাতীত ক্ষমতার অধিকারী। সুতরাং আরও লোভনীয় প্রস্তাবের পর প্রস্তাব আসতে লাগল তাঁর কাছে। বেচারি ফাদার ঘনশ্যাম! ঠিক এই সময়ে গল্পের সিরিজ ছাপা হতে লাগল তাঁকে কেন্দ্র করে, শার্লক হোমস-এর গল্পের মতো। বলা বাহুল্য, এই জাতীয় গল্প লেখা আর ছাপানোর মূলেও সক্রিয় রইল সাংবাদিক ইন্দ্রর অত্যুৎসাহ। প্রায় সব গল্পের প্লটে অনুরোধ থাকছে একটাই—মহামান্য বুদ্ধিবর ফাদার ঘনশ্যাম যেন এই জটিল সমস্যাটার সমাধান করে দিয়ে যান শার্লক হোমস স্টাইলে। গল্পের স্রোত বাড়তে-বাড়তে যখন মহানদী হতে চলেছে, অনুরোধ-উপরোধের ঢেউ যখন প্লাবন আকারে ফাদার ঘনশ্যামকে ভাসিয়ে দিতে চলেছে, যখন প্রত্যাখান করার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছেন ফাদার, তখন তিনি একটাই অনুরোধ করেছিলেন—বন্ধ করো এইসব গল্প ছাপানো, প্রত্যাখ্যান করলেই যখন তা নব কলেবরে নতুন আমন্ত্রণ আকারে আবির্ভূত হচ্ছে, তখন দিলেন স্থগিতাদেশ, অবশ্যই বিনীত অনুরোধের মোড়কে পুরে।

সাংবাদিক ইন্দ্র এই পয়েন্টটা লুফে নিয়ে মোচড় দিলেন অন্যদিকে। গুজবের স্রোত বইয়ে দিলেন অন্য খাতে। ডক্টর ওয়াটসনের হিরো একদা সাময়িকভাবে পাহাড়চুড়ো থেকে যেভাবে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল—ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডলও সেইভাবে সাময়িকভাবে অদৃশ্য হয়ে গেলেই তো হয়।

যথা নিয়মে কাকুতি-মিনতি তেড়ে এল ফাদার ঘনশ্যামের দিকেই। কেন তিনি বিশ্ববরেণ্য শার্লক হোমসের অনুকরণে সাময়িকভাবে লোকচক্ষু থেকে অদৃশ্য হচ্ছেন না?

দাবির পর দাবি। দাবির পর দাবি। হেদিয়ে উঠেও অপরিসীম ধৈর্য সহকারে প্রতিটি দাবির জবাব লিখে জানিয়ে দিলেন ফাদার ঘনশ্যাম, সাময়িকভাবে নিজেকে অন্তর্ধান করানোর বিকল্প প্রস্তাবে জানালেন—তাঁকে নিয়ে লেখা গল্পগুলো সাময়িকভাবে অন্তর্ধান করলেই তো ল্যাটা চুকে যায়। তিনি নিজে অন্তর্হিত হবেন কি না হবেন—সেটা নির্ভর করছে গল্পগাছার তিরোধানের ওপর। দিনে-দিনে জবাব দেওয়া তিনি কমাতে লাগলেন। জবাবের বয়ানও দিনে-দিনে সংক্ষিপ্ত থেকে সংক্ষিপ্ততর হতে লাগল। শেষ জবাবটা লেখবার পর হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

আমেরিকা জুড়ে যখন কোনও হইচই আরম্ভ হয় তখন তার রেশ এসে পড়ে এই পোড়া দেশে। একেই বলে পশ্চিমী প্রভাব। সাদা চামড়া যখন নেচেছে কালো চামড়ার ফাদার ঘনশ্যামকে নিয়ে, তখন এখানেও শুরু হয়ে যাক হুজুগের নাচ। বিশেষ করে যে অঞ্চলটিতে ফাদার ঘনশ্যাম প্রায় লুকিয়ে থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের কাজ করে যাচ্ছিলেন প্রচার আর আড়ম্বর বাদ দিয়ে, ঠিক সেই জায়গাটাতেই হুদো-হুদো পর্যটকের আসা শুরু হয়ে গেল, শুধু গোটা ভারত থেকে নয়, আমেরিকা আর ইউরোপ থেকেও। পর্যটন ব্যবসায়ীদের পোয়াবারো ঘটে গেল। ফাদার ঘনশ্যামের নামাঙ্কিত পথ নির্দেশক ফলক পুঁতে দেওয়া হল রাস্তার মোড়ে-মোড়ে। ফাদার ঘনশ্যামের নাম লেখা বিশেষ টুরিস্ট বাসও আসতে লাগল। দুর্গমতম সেই দ্বিতীয় ভূস্বর্গে। দলে-দলে মানুষ পিলপিল করতে লাগল ছোট্ট ওই জায়গায়। যেন কুতুবমিনার দেখতে ছুটছে। সবচেয়ে ঝামেলা বাধাল স্থানীয় দোকানদাররা। তাদের কেউ ফাদার ঘনশ্যামের মূর্তি বানিয়ে চড়া দামে বেচে লাল হয়ে গেল দু-দিনেই, কেউ বেচতে বসল তাবিজ-মাদুলি-লকেট। সবেতেই ঝুলছে ফাদার ঘনশ্যামের ছবি, নয়তো লেখা রয়েছে তাঁর মুখনি:সৃত অমৃতবাণী। নাজেহাল হলেন আর এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের

ধান্দাবাজিতে। অষ্টপ্রহর তারা হানা দিয়ে গেল গোবেচারা পাদরির ওপর একটা মাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে—তাদের বানানো দ্রব্যটার গুণের তারিফ করে দেওয়া হোক লিখিতভাবে। কোনও শংসাপত্রই যখন ছাড়া হল না ফাদারের তরফ থেকে, তখন আসতে লাগল চিঠির স্রোত। সবাই জানে ফাদার ঘনশ্যামের এই একটি দুর্বলতার সংবাদ—সাহিত্যিক না হয়েও তিনি পত্র-সাহিত্যের সমাদর করেন। কারও মনে কষ্ট দেন না। চিঠি এলে চিঠির জবাব দেন। প্রথম-প্রথম তিনি পত্রদাতাদের উদ্দেশ্য ধরতে পারেননি বলে এন্তার জবাব দিয়ে গেছেন। তারপর জানলেন—তাঁর সই-এর জন্যই এত চিঠি লেখা হচ্ছে, আর তাঁর অটোগ্রাফ চড়া দামে বাজারে বিক্রি হচ্ছে। ভালো মানুষের এই অবস্থাই হয়। কাউকে ফেরাতে পারেন না, ফেরাতে পারেননি মদ্য প্রস্তুতকারক সুরজলালকে। খচমচ করে দুটো লাইন লিখে দিয়েছিলেন পুঁচকে একটা কার্ডে। আর এই লেখাটাই হল তার কাল। জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিল বড় ভয়ংকরভাবে।

সুরজলাল মানুষটা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে অনর্থক বাড়াবাড়ি করেন। ছোটখাটো চেহারা, ঝাঁকড়া চুল, চোখে সোনার রীমলেস চশমা। উনি একটা মেডিসিন্যাল পোর্ট মদ্য প্রস্তুত করেছিলেন। দাম খুবই কম রেখেছেন। গরিব-গেরস্তরা যাতে অসুখ-বিসুখ কাটিয়ে উঠে স্বচ্ছন্দে কিনে খেতে পারেন। ফাদার ঘনশ্যাম গরিবদের কাছে ভগবান সমান। তিনি যদি এই ওষধি-সুরা সামান্য চেখে দেখেন এবং তাঁর মতামত জানিয়ে দেন, তাহলে আখেরে গরিবদেরই উপকার হবে। এরপরেও একটু আব্দা দেখালেন সুরজলাল। কখন এবং কোথায় বসে সুরা চাখবেন ফাদার ঘনশ্যাম তা যদি দয়া করে সংলগ্ন কার্ডটায় লিখে দেন, তাহলে চিরঋণী থাকবেন মদমেকার সুরজলাল।

আব্দা শুনে অবাক হলেন না ফাদার ঘনশ্যাম। বিজ্ঞাপনদাতাদের উৎকট উন্মাদনা কত দিকে মোড় নিতে পারে, তা তাঁর অজানা ছিল না। তাই তিনি কার্ডে যৎসামান্য লিখে দিয়ে হাতের কাজে মন দিলেন। যে কাজ করলে তিনি আনন্দ পান। কিন্তু বাধা পেলেন আবার। এবার চিরকূট পাঠিয়ে কাজে বাগড়া দিলেন যিনি, তিনি বাজে লোক নন। পাঠিয়েছেন তাঁর পলিটিক্যাল শত্রু আলভারেজ। গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ের মিটমাট করতে চান তিনি। মিটিং হোক আজকেই রাতে—শহরের প্রাচীরের বাইরে একটা কফি হাউসে। ফাদার ঘনশ্যাম যদি রাজি থাকেন, এক লাইন লিখে বার্তাবাহকের হাতে যেন এখুনি পাঠিয়ে দেন। বার্তাবাহক লোকটা মার্কামারা দাঙ্গাবাজ টাইপের। যেমন চেহারা, তেমনি চাহনি। তাকে বিদেয় করার জন্য ঝটপট এক লাইনে সম্মতি জানিয়ে দিলেন ফাদার ঘনশ্যাম। তারপর দেখলেন, এখনও ঘণ্টাদেড়েক হাতের কাজ করা যাবে। সুতরাং তন্ময় হলেন সেই কাজে। ঘড়ি দেখে কাজ বন্ধ করলেন। কুতকুতে দুই চোখে কৌতুক ভাসিয়ে সুরজলালের পাঠানো অত্যাশ্চর্য ওষধি সুরার দিকে চেয়ে রইলেন, এক গেলাস পান করলেন এবং নিশার আঁধারে বেরিয়ে পড়লেন।

কড়া চাঁদের আলোয় ছোট্ট শহর ভেসে যাচ্ছে। ছবির মতো সুন্দর ফটকের ওপর বাঁকা খিলেনের দিকে চেয়ে রইলেন ফাদার। ফটকের ওদিকে রয়েছে আশ্চর্য বাহারি পাম গাছের ঝালর। ফোকাস মেরে যেন রঙ্গমঞ্চ সাজানো হয়েছে। খিলেনের অন্যদিকে ঝুলছে পাম গাছের খাঁজকাটা একটা পাতা। চাঁদ রয়েছে তার পেছন দিকে। এদিক থেকে মনে হচ্ছে যেন কালো কুমিরের চোয়াল। স্রেফ এই কল্পনায় তিনি আকৃষ্ট হতেন না যদি না তাঁর সহজাত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখে ফেলত আরও একটা ব্যাপার।। বাতাস কোথাও নেই, সবই নিথর। অথচ স্পষ্ট দেখলেন, ঝুলে থাকা পামগাছের পাতা একটু-একটু নড়ছে।

চারপাশ দেখলেন। উপলব্ধি করলেন, তিনি একা নন। ছাড়িয়ে এসেছেন শহরের শেষ বাড়ি। বেশিরভাগ বাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। জানলার পাল্লাও অনেক বাড়িতে খোলা নেই। উনি হেঁটে চলেছেন দুটো দেওয়ালের মাঝখান দিয়ে। এবড়োখেবড়ো আর বড়-বড় পাথর দিয়ে তৈরি। পাথরের ফাঁকে-ফাঁকে গজিয়েছে গোছা-গোছা কাঁটা ঝোপ। দেওয়াল দুটো সমান্তরালভাবে প্রসারিত ফটকের দিকে। ফটকের ওদিকে কফি হাউসের আলো দেখা যাচ্ছে না। নিশ্চয় অনেক দূরে রয়েছে। ফটকের নিচে কী রয়েছে, তাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। শুধু বোঝা যাচ্ছে, বড়-বড় পাথর দিয়ে মেঝে বাঁধাই করা হয়েছে। চাঁদের আলো

ঠিকরে যাচ্ছে সেই পাথর থেকে। এখানে সেখানে রয়েছে এলোমেলো ন্যাশপাতি গাছ। দেখেই অশুভ সংকেতের ডংকা বাজল তাঁর মনের মধ্যে। অদ্ভুত একটা চাপ অনুভব করলেন। কিন্তু পা থামালেন না। একটুও থমকে দাঁড়ালেন না। সাহস তাঁর আছে। সাহসকে ছাড়িয়ে যায় তাঁর কৌতূহল। সারাজীবন কাটিয়েছেন সত্যের অন্বেষণে, ক্ষুধিত বুদ্ধিসত্তা দিয়ে মিথ্যের বিনাশ ঘটিয়েছেন। সত্যানুসন্ধান যত তুচ্ছ ব্যাপারেই হোক না, কৌতূহল চরিতার্থ করার অদম্য আকাঙ্ক্ষা তাঁকে বিপদের দিকে টেনে নিয়ে যাবে জেনেও পেছিয়ে আসেননি। তবে মাত্রা ছাড়িয়ে যাতে না যায়, সেদিকে খরনজর রেখেছেন। নিজেকেও সেই অজুহাতে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখেছেন। এক্ষেত্রে তার অন্যথা ঘটল না। সোজা হেঁটে গেলেন পামগাছের দিকে। গাছের ওপর থেকে লাফিয়ে এসে একটা লোক ছোরা মারল তাঁকে। একই সময়ে বানরের ক্ষিপ্রতায় পাঁচিলের ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ধেয়ে এল একটা লোক। সে উঁচিয়ে রয়েছে একটা কাঠের মুগুর। ছোরা মারার সঙ্গে-সঙ্গে মুগুরও নেমে এল তাঁর মাথার ওপর। ফাদার ঘনশ্যাম একপাক ঘুরে গিয়ে টলে উঠলেন এবং মালভর্তি বস্তার মতো ধপ করে পাথরের মেঝেতে পড়ে গেলেন। পড়ে যখন যাচ্ছেন, তখন তাঁর মুখের পরতে-পরতে ফুটে উঠল মৃদু কিন্তু নিবিড় বিস্ময়বোধ।

নান্দুরাম ঠিক এই সময়ে জানলায় দাঁড়িয়েছিলেন। ভদ্রলোক ধর্মে খ্রিস্টান কিন্তু চার্চে যান না। তবে যে-কোনও কারণেই হোক সমীহ করেন ফাদার ঘনশ্যামকে। এই শহরেই তাঁর জন্ম। শিক্ষাদীক্ষা আমেরিকায়। পেশায় ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। কাজ কারবারও করেন আমেরিকায়। পয়সা-কড়ি আছে, নাম-যশ আছে, তাই আলাপ পরিচয় আছে সাংবাদিক ইন্দ্র, ব্যবসায়ী কিন্তু ধার্মিক রঞ্জুলাল আর নাস্তিক শিরোমণি আলভারেজের সঙ্গে। তিনি এক বিচিত্র চরিত্র। বৈচিত্র্য-পিয়াসী বলেই ফাদার ঘনশ্যামকে ভালোবাসেন।

এহেন মানুষটাকে কালো কুমড়োর মতো ছাতা বগলে জানলার সামনে দিয়ে এমন সময়ে হেঁটে যেতে দেখে তিনি অবাক হলেন। চাঁদের আলোয় চকচকে ওই টাক, ওইরকম বিচ্ছিরি আলখাল্লা আর ভাঙা ছাতা বগলে যাচ্ছেন কোথায় ফাদার?

চোখ ছিল তাঁর জানলার দিকে। তাই পরক্ষণেই দেখলেন আরও দুটো মনুষ্যাকৃতি হনহনিয়ে চলে গেল তাঁর জানলা পেরিয়ে। ঝাঁকড়া চুলো খর্বকায় মানুষটাকে এক ঝলকেই চেনা গেল—মদ্য প্রস্তুতকারক সুরজলাল। কিন্তু তার পাশে ঢ্যাঙা বৃষস্কন্ধ ও লোকটা কে?

হুমড়ি খেয়ে জানলায় পড়লেন নান্দুরাম। পেছন থেকে বৃষস্কন্ধ ব্যক্তিকে চিনতে পারলেন। ডাক্তার যোশী। রঞ্জুলালের ব্লাডপ্রেসার দেখতে গেছিলেন যখন তখন আলাপ হয়েছিল নান্দুরামের সঙ্গে।

ঠিক এই সময়ে আর্ত চিৎকার শুনলেন ফটকের দিক থেকে। ধপ করে একটা আওয়াজ। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে অনেক লোকের চিৎকার। হট্টগোল।

নান্দুরাম বেগে নামলেন পথে। দৌড়লেন চন্দ্রালোকিত ফটকের দিকে। দেখলেন, ঠিক নিচেই লম্বমান কালো বস্তাবৃত একটা খুদে দেহ। ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল। তিনি নড়ছেন না।

কফি হাউস থেকে দৌড়ে এসেছে অনেক লোক। এসেছেন স্বয়ং আলভারেজ। তিনি ফাদারের বডির কাছে কাউকে আসতে দিচ্ছেন না। এই মুহূর্তে তাঁর পরনে রয়েছে রক্তরাঙা সফরি স্যুট। মাথার লম্বা সোনালি চুলে চাঁদের আলো ঠিকরে দিচ্ছে সোনালি আভা। মাথায় তিনি কম করেও সাত ফুট। সেই অনুপাতে প্রস্থেও বিশাল। রাজ সেনাপতির মতো খানদানি বপু নিয়ে তিনি দু'দিকে দুহাত বিস্তার করে জনগণকে রুখে দিচ্ছেন। নিরক্ত মুখে পাশে দাঁড়িয়ে সুরজলাল। নান্দুরাম যখন হাঁফাতে-হাঁফাতে এসে পৌঁছলেন, তখন ফাদারের নাড়ি দেখা শেষ করে উঠে দাঁড়িয়ে আখাম্বা চেহারার ডাক্তার যোশী বললেন একটাই কথা, 'ডেড।'

'সন্ত্রাসবাদীরা শেষ করে দিল একটা ভালো মানুষকে,'—উৎফুল্ল গলায় বললেন আলভারেজ, 'আমি কিন্তু মারিনি, লোক দিয়েও মারাইনি। যদি সেরকম লোক ধরা পড়ে, এই মুহূর্তে তাকে লটকে দেব এই গাছে।'

নান্দুরাম বললেন, 'আপনি কোথায় ছিলেন?'

'কফি হাউসে। ফাদারের জন্য বসেছিলাম। গোপন মিটিং ছিল জরুরি বিষয়ে।' সুরজলাল আর ডাক্তারকে দেখিয়ে বললেন, 'এঁরাও যাচ্ছিলেন মিটিং-এ।'

গাছের ছায়া থেকে ফ্যাকাশে মুখে বেরিয়ে এলেন সাংবাদিক ইন্দ্র, 'সর্বনাশ হয়ে গেল। গোটা পৃথিবীর ক্ষতি হয়ে গেল। ফাদার ঘনশ্যাম ইজ ডেড।'

রঞ্জুলাল এলেন দৌড়তে-দৌড়তে। তাঁর চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে, বললেন ডাক্তারকে, 'সিওর ডেথ?'

'হানড্রেড পারসেন্ট।'

'তাহলে ফাদারের ডেডবডি সরিয়ে নেওয়া হোক।'

টলতে-টলতে বাড়ি ফিরে এলেন নান্দুরাম। ঝিম মেরে বসে রইলেন ঘরে। ফাদারের সঙ্গে তাঁর দোস্তি তেমন প্রগাঢ় না থাকলেও লোকটার বোকা বোকা চেহারা আর ভালো- ভালো কাজগুলো তাঁর ভালো লাগত। এমন একটা মানুষকে খতম করে দিয়ে গেল চণ্ডালরা। ঘরে বসেই শুনলেন, রাত ভোর হওয়ার আগেই কবরস্থ হবেন ফাদার ঘনশ্যাম। খবরটা দিয়ে গেলেন সাংবাদিক ইন্দ্র। কারণ, ভয়ানক দাঙ্গা লাগবার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই ঝটপট ডেডবডি মাটির নিচে চালান করে দিতে হবে। মিশন-হাউসে লোক জড়ো হচ্ছে।

আলো ফোটার আগেই কফিনে শোয়ানো হল ফাদারকে। তাঁর মুখের বিস্ময় বোধ প্রকৃতই রহস্যবহ। আততায়ীদের অন্য কেউ না জানলেও, ফাদার ঘনশ্যাম নিশ্চয় চিনতে পেরেছিলেন। তাই অত অবাক হয়েছিলেন। আলভারেজ কিন্তু কফিনের কাছেই দাঁড়িয়ে গলাবাজি করে গেলেন সমানে। এ খুন তিনি করেননি। তাঁর দলের কেউ করেনি। খুনিকে পাওয়া গেলে তিনি নিজের হাতে তাঁকে ফাঁসিতে লটকাবেন।

মিশন-হাউসের মস্ত ক্রসের তলায় রাখা হয়েছে কফিন। একটু উঁচু জমিতে, তিনদিকে সবুজ ঝোপ, সামনের দিকে কিছু নেই, তাই রাস্তা থেকে দেখা যাচ্ছে কফিন। কাতারে-কাতারে লোক দাঁড়িয়ে গেছে রাস্তায়। তাদের চোখ ছলছল করছে। পিতৃহারা হওয়ার শোকে আচ্ছন্ন প্রত্যেকেই। একদম বোবা। কোথাও নেই কোনও শব্দ। এমনকী আলভারেজও আর তড়পাচ্ছেন না।

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার কাজ শুরু হতে যাচ্ছে, আর সময় নেই দেখে রঞ্জুলাল আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলেন না। টাইট গোল শরীরের গলা দিয়ে যতখানি আওয়াজ বের করা সম্ভব, ততখানি আওয়াজ ছেড়ে বললেন—'কে খুন করেছে ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডলকে? তাঁকে দুচক্ষে দেখতে পারত না যে লোকটা—খুন করেছে সে।'

আর যায় কোথা। এতক্ষণ যে আম জনতা গলা বুজিয়ে ছিল, অট্টরোলে ফেটে পড়ল তারা। তাদের ক্রোধারুণ চোখ ঝলসে ফেলছে একজনকেই—আলভারেজকে।

বীর-শরীরী আলভারেজ যেন এইরকম একটা মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। নিমেষে তাঁর চেহারা গেল পালটে। আফ্রিকার অরণ্যের জঘন্য জিঘাংসা আশ্রয় করল তাঁর সমস্ত মুখাবয়ব। রক্তলাল পরিচ্ছদের মতনই লাল টকটকে হয়ে উঠল দুই চক্ষু। সাত ফুট লম্বা শরীরটা ফুলে যে ডবল হয়ে গেল এবং মনে হল, আদিম বর্বরতা যদি কোথাও থাকে, তবে তা এখানে, এই দেহে।

গলা চিরে বেরিয়ে এল নারকীয় হুঙ্কার—'খবরদার। ফাদারকে খুন করেছে খোদ ভগবান। যদি বিশ্বাস থাকে ভগবানে। কিসসু নেই। এই ব্রহ্মাণ্ডে ভগবান-টগবান কেউ নেই। থাকলে মরতে হত না নিরীহ মানুষটাকে।'

ওই একটা বক্তৃতাই যথেষ্ট। তৎক্ষণাৎ জনগণের অট্টনিনাদ হল স্তব্ধ। এইবার নিশ্চয় শোনা যাবে গুলিগোলার আওয়াজ। কিন্তু তা হল না।

নৈ:শব্দ্য খান-খান করে দিয়ে বিষম বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলেন সাংবাদিক ইন্দ্র, 'ফাদার নড়ছেন।'

বাতাস পর্যন্ত বুঝি থেমে গেল এই কথায়। নিথর হল গাছের পাতা।

কফিনের ওপর ঝুঁকে পড়েছেন ডাক্তার যোশী। দেখলেন, ফাদারের মুখ পাশ ফিরেছে।

তারপরেই নান্দুরাম দেখলেন, ফাদার চোখ পিটপিট করছেন। গুঙিয়ে উঠছেন। কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে বসে কুতকুতে চোখে জ্বলজ্বল করে তাকিয়ে আছেন ডাক্তার যোশীর দিকে।

জীবনে অনেক ইলেকট্রিক্যাল মিরাকল দেখেছেন এবং দেখিয়েছেন নান্দুরাম, কিন্তু এই মিরাকল কখনও দেখেননি। কোনও বিজ্ঞানের ক্ষমতা নেই এরকম মিরাকল দেখায়। অসম্ভবকে প্রত্যক্ষ করা কাকে বলে, সেই প্রথম তিনি জানলেন। হাজার বছরেও যা দেখা যায় না, তা দেখবার জন্য আধঘণ্টার মধ্যে ভেঙে পড়ল গোটা শহরের মানুষ। ঈশ্বরকে সশরীরে ধরায় অবতীর্ণ হওয়া বুঝি একেই বলে। হাজার-হাজার লোক উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল সামনের রাস্তায়। এমন অলৌকিক ঘটনা কে কবে দেখেছে? এমনকী আলভারেজের মতো পাষাণ হৃদয় মানুষেরও মাথা ঘুরে গেল। দু-হাতে রগ টিপে ধরে তিনি ঘাসের ওপর বসে পড়লেন।

স্বর্গসুখের এহেন টর্নাডোর মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা খর্বকায় ব্যক্তিটার কোনও কথাই শোনা গেল না। একে তো তিনি চেঁচিয়ে কথা বলতে পারেন না, তার ওপর মরে বেঁচে ওঠার ধকলে তাঁর কণ্ঠস্বর ক্ষীণতর হয়েছে। হট্টগোলও কর্ণবধিরকারী। তাঁর দুর্বল অঙ্গভঙ্গি দেখে শুধু বোঝা যাচ্ছে, তুমুল এই হর্ষ তাঁর চিত্তে বিলক্ষণ বিরক্তি উৎপাদন করছে। জনতার সামনে উঁচু জমিতে এসে দুহাত নেড়ে উত্তাল জনগণকে শান্ত করবার বৃথা চেষ্টা করে চলেছেন—হাত নাড়া দেখে মনে হচ্ছে যেন একটা পেঙ্গুইন পাখনা ঝাপটাচ্ছে। উদ্দামতা একটু স্তিমিত হতেই গলা চড়িয়ে, তাঁর পক্ষে যতখানি রাগ দেখানো সম্ভব, ততখানি রাগ দেখালেন, 'আ:! কী হচ্ছে!'

পরক্ষণেই ঘুরে দাঁড়ালেন সাংবাদিক ইন্দ্রর দিকে। বললেন, 'এখুনি এই মুহূর্তে ফ্যাক্স করে গোটা পৃথিবীতে আসল খবরটা ছড়িয়ে দিন।'

'মিরাকল?' মিনমিন করে বুঝি জীবনে এই প্রথম কথা বললেন সাংবাদিক ইন্দ্র।

'না, না, না। ঠিক উলটো। এখানে কোনও মিরাকল ঘটেনি। আমি মিরাকল ঘটাতে পারি না।'

ঢোক গিললেন সাংবাদিক ইন্দ্র। অধোবদনে নেমে গেলেন ফ্যাক্স মেশিনের সন্ধানে।

নান্দুরাম বললেন, 'ফাদার, আপনার সঙ্গে কথা আছে।'

কুতকুতে চোখে তাকিয়ে গোলমুখে বোকা-বোকা ভাব ফুটিয়ে বললেন ফাদার ঘনশ্যাম, 'কী কথা?'

'কৌতূহল।'

'চলুন।'

ওঁরা এখন বসে আছেন গির্জের আচার্যর ঘরে। কাগজপত্র যেভাবে গতকাল ছড়িয়ে গেছিলেন ফাদার, রয়েছে সেইভাবেই। পাশেই ওষধি সুরার বোতল এবং শূন্য গেলাস।

গম্ভীর বদনে বললেন ফাদার, 'কীসের কৌতূহল?'

নান্দুরাম বললেন, 'মরে বেঁচে উঠলেন কীভাবে?'

ফাদার বললেন, 'জীবনে বেশ কিছু মার্ডার কেসের সমাধান ঘটিয়েছি। এবার তদন্ত হবে আমার নিজের মার্ডারের।'

নান্দুরাম বললেন, 'যদি কিছু মনে না করেন, বোতল থেকে ঢেলে একটু মদ খাব?'

উঠে দাঁড়ালেন ফাদার ঘনশ্যাম। গেলাসে সুরা ঢাললেন। গেলাস চোখের সামনে এনে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর গেলাস নামিয়ে রেখে ফের চেয়ারে বসলেন।

বললেন, 'মরার সময়ে আমি কী অনুভব করছিলাম জানেন? শুনলে বিশ্বাস করবেন না। বিস্ময়—সীমাহীন বিস্ময়বোধে আচ্ছন্ন হয়েছিলাম।'

'মাথায় চোট পাওয়ায়?'

ঝুঁকে পড়লেন ফাদার। বললেন খাটো গলায়, 'মাথায় চোট না পাওয়ার জন্যই অবাক হয়েছিলাম।'

চেয়ে রইলেন নান্দুরাম। ভাবলেন, চোট-টা নিশ্চয় তেমন জোরদার হয়নি। বললেন, 'কী বলতে চান?'

'বলতে চাই যে, লোকটা অত জোরে মুগুর নামিয়ে আনল মাথা টিপ করে, কিন্তু মুগুর থেমে গেল মাথার কাছে এসে—খুলিতে ছোঁয়া পর্যন্ত লাগল না। একইভাবে আর একজন ছোরা মারল বটে, কিন্তু ছোরার ডগা আমার গা স্পর্শ করল না। ঠিক যেন খেলার ছলে খুনজখম করা। হ্যাঁ, ঠিক তাই। অসাধারণ ব্যাপারটা ঘটল ঠিক তার পরেই।'

চিন্তাবিষ্ট চোখে টেবিলে ছড়ানো কাগজপত্রের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ফের মুখ খুললেন ফাদার, 'মুগুরের চোট, ছোরার কোপ—কোনওটাই গায়ে লাগল না। অথচ টের পেলাম আমার হাঁটু ভেঙে যাচ্ছে, প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। চোট খেয়েই প্রাণটা বেরিয়ে যাচ্ছে, তা বুঝলাম। তবে সেটা মুগুর বা ছোরা নয়। কোনও অস্ত্র নয়, জানেন কী?'

এই বলে দেখালেন টেবিলে রাখা মদ।

মদের বোতল তুলে নিলেন নান্দুরাম। গন্ধ শুঁকলেন।

বললেন, 'মনে হচ্ছে আপনি ধরেছেন ঠিক। ড্রাগিস্ট-এর কাজ করেছিলাম আমেরিকায় বছর-খানেক। কেমিস্ট্রি পড়েছিলাম। অ্যানালিসিস না করে সঠিক বলতে পারব না, শুধু বলব, অস্বাভাবিক কোনও উপাদান রয়েছে এই মদের মধ্যে। আফ্রিকার জঙ্গলের মানুষরা একরকম আরকের খবর রাখে, যা মৃত্যুর মতো সাময়িক নিদ্রা এনে দেয়।'

শান্ত গলায় বললেন ফাদার, 'কারেক্ট। যে কোনও কারণেই হোক, একটা মির‍্যাকল ঘটানো হয়েছে। যা বিলকুল ধাপ্পাবাজি। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার দৃশ্য নাটক ছাড়া কিছু নয়। ঘড়ি ধরে কাজ করা হয়েছে। সাংবাদিক ইন্দ্র পাবলিসিটির বাহবা পেতে-পেতে মাথা খারাপ করে ফেলেছেন বলেই মনে হয় আমার। তবে শুধু এই কারণে এতদূর উনি যেতে পারবেন বলে মনে হয় না আমার। একবার আমাকে জাল শার্লক হোমস হিসাবে ওয়ার্ল্ড পাবলিসিটি দিয়েছেন। আবার—'

বলেই থেমে গেলেন। যেন দম আটকে এল। টলতে টলতে এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে।

ব্যাকুল গলায় বললেন নান্দুরাম, 'যাচ্ছেন কোথায়?'

'প্রার্থনা করতে।'

'হঠাৎ এই সময়ে?'

'সমাধানটা ঈশ্বর আমার মাথায় খেলিয়ে দিলেন বলে। যাই—'

'দাঁড়ান। সমাধানটা কী?'

'ওই যে বলছিলাম, জাল শার্লক হোমসের কথা। শার্লক হোমস আর সাংবাদিক ইন্দ্র—এই নাম দুটো পাশাপাশি মাথায় আসতেই পরমপিতা সত্যের ঝলক ঘটালেন মগজের মধ্যে। উ:। কী বোকা আমি।'

'বলুন। আমাকে বলে যান।'

'আমাকে শার্লক হোমসের কায়দায় মরিয়ে বাঁচিয়ে তোলার গল্পের কথা মনে পড়ছে? আইডিয়াটা সাংবাদিক ইন্দ্র মাথায় এনেছিলেন তখনই। মরে বেঁচে উঠব আমি শার্লক হোমসের মতো। আরক মিশোনো মদ খাওয়ানো হয়েছিল ঘড়ি ধরে—মড়ার বেঁচে ওঠার সময়ও নির্ধারণ করা হয়েছিল ঘড়ি ধরে। কী বুঝলেন?'

মাথা নাড়তে-নাড়তে নান্দুরাম বললেন, 'হ্যাঁ, এবার বুঝছি।'

'মির‍্যাকলের খবর বোমা ফাটাত গোটা দুনিয়ায়। তারপরেই মির‍্যাকল-এর জালিয়াতি ধরিয়ে দেওয়া হত। প্রমাণ করে ছাড়ত, ষড়যন্ত্রে রয়েছি খোদ আমি—ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল। আর-এক দফা পাবলিসিটি অভিযানে জগৎ ছেয়ে যেত—খ্যাতির মধ্যগগনে পৌঁছে যেতেন সাংবাদিক ইন্দ্র।'

সোজা চোখে তাকালেন নান্দুরাম, 'আর ক'টা নরপশু আছে এই ষড়যন্ত্রে?'

'আলভারেজ তো বটেই, ভুয়ো মির‍্যাকল প্রমাণ করতে পারলে তাঁর পোয়াবারো।'

'আর?'

'রঞ্জুলাল। ওঁর ভাঁড়ামি আর ভণ্ডামি অনেক আগেই আঁচ করেছিলাম। ওঁর ব্যবসা- বাণিজ্যের কাঁটা ছিলাম আমি।'

'এতগুলো বাজে লোকের সঙ্গে এখানে থাকতে চান? চলুন আমার সঙ্গে আমেরিকায়।'

তৎক্ষণাৎ মদের বোতলের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন ফাদার ঘনশ্যাম, 'তাহলে এক গেলাস খাই?'

(বিদেশি ছায়ায়)

** 'স্বস্তিকা' পত্রিকায় প্রকাশিত (পূজা সংখ্যা, ১৪০৩)*

সবুজ মানুষ

একমনে নিজের সঙ্গে গলফ খেলা প্র্যাকটিশ করে চলেছে এক যুবক সমুদ্রের ধারে বালুকা সৈকতের ওপর। গোধূলির ধূসর রঙের ছোঁয়া লেগেছে সমুদ্রে। কোনও স্ট্রোকের মধ্যেই হেলাফেলা নেই, আছে একাগ্র নিষ্ঠা, আণুবীক্ষণিক প্রচণ্ডতা। যেন নিখুঁত খুদে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হচ্ছে এক-একটা স্ট্রোক মারার সঙ্গে-সঙ্গে। চটপট অনেক খেলাই সে রপ্ত করেছে এই জীবনে; কিন্তু চটপট খেলা রপ্ত করে নেওয়ার প্রবণতা আছে বলেই যেসব খেলা চটপট শেখা যায় না, সেসবও রপ্ত করেছে খুবই তাড়াতাড়ি। অ্যাডভেঞ্চার জিনিসটাকে সে ভালোবাসে, অ্যাডভেঞ্চার-ঠাসা পরিবেশে থাকতে পারলে আর কিছুই চায় না। বর্তমানে সে স্যার প্রদ্যুম্ন মল্লিকের প্রাইভেট সেক্রেটারি। বালুকা-সৈকতের ঠিক পাশেই এই যে বিরাট উদ্যান, তার ঠিক পেছনেই স্যার প্রদ্যুম্নর বিশাল ইমারত। উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে বলেই অনন্তকাল কারো প্রাইভেট সেক্রেটারি হয়ে থাকার অভিপ্রায় নেই যুবকটির। কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানও আছে সেই সঙ্গে; তাই সে যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে বুঝেছে সেক্রেটারি জীবনটায় ছেদ টেনে দেওয়ার শ্রেষ্ঠ পন্থা হল, নিষ্ঠার সঙ্গে সেক্রেটারিগিরি করে উত্তম সেক্রেটারিরূপে স্বীকৃতি পাওয়া। কার্যত সে তাই বটে। অতি উত্তম সেক্রেটারি। গলফ বলটিকে যেরকম ক্ষিপ্রতা সহকারে নিয়ে ফেলছে একদিক থেকে আর একদিকে, হুবহু সেই ক্ষিপ্রতা দিয়ে একাই জবাব দিয়ে যাচ্ছে স্যার প্রদ্যুম্নর নিত্য জমে যাওয়া চিঠির তাড়ার। চিঠির জবাব নিজের মর্জিমাফিক একাই দিয়ে যেতে হচ্ছে বর্তমানে। বলতে গেলে, একাই লড়ে যাচ্ছে পত্রবাহিনীর সঙ্গে। কারণ স্যার প্রদ্যুম্ন তাঁর বিলাস-তরণী নিয়ে জলে ভেসেছেন ছ'মাস আগে। ফেরার সময় হয়েছে—ফিরেও আসছেন—কিন্তু বেশ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সে সম্ভাবনা নেই।—কয়েক ঘণ্টা কেন, কয়েক দিনও কেটে যেতে পারে। তারপর হয়ত ফিরবেন।

যুবকটির নাম বিপুল ব্যানার্জি। খেলোয়াড়ি পদক্ষেপে বালুকা সৈকতের গা-ঘেঁষে ঘাসজমিটুকু পেরিয়ে এসে দৃষ্টিচালনা করল সমুদ্রের দিকে। দেখল একটা অদ্ভুত দৃশ্য। সুস্পষ্ট দেখতে পেল না অবশ্য। ঝোড়ো মেঘের আড়ালে গোধূলির আলো মিলিয়ে যাচ্ছে একটু-একটু করে—ঘনীভূত হচ্ছে তমিস্রা। কিন্তু পলকের জন্যে মনে হল যেন ইতিহাস-আশ্রিত একটি নাটক, অথবা একটা ভৌতিক নাটক স্বপ্নাকারে অভিনীত হয়ে চলেছে অদূরে—মুহূর্তের মরীচিকার মতো যেন বহু যুগের ওপার থেকে ভেসে এসেছে একটা দৃশ্য।

সূর্যাস্তের শেষ রশ্মি তাম্রবর্ণ এবং সুবর্ণবর্ণ সুদীর্ঘ রেখাপাত করেছে কালচে সমুদ্রের ওপর। নীল সমুদ্র আর নীল নেই—কৃষ্ণবর্ণ হয়ে এসেছে এর মধ্যেই—অন্ধকারের এই পটভূমিকায় দেখা যাচ্ছে আরও অন্ধকারময় দুটি মূর্তিকে। যেন ঐতিহাসিক নাটকের দুটি চরিত্র। যেন মূকাভিনয় চলছে ঘনিয়ে আসা আঁধারের বুকে। একজনের মাথায় উষ্ণীষ—আরেকজনের কোমরে তরবারি। যাত্রাদলের দুটি চরিত্র যেন সহসা নেমে এসেছে ছায়াময় দেহ নিয়ে দারুময় কোনও জাহাজের মধ্যে থেকে।

মরীচিকা দর্শনের প্রবণতা নেই বিপুল ব্যানার্জির। ছায়াদৃশ্যও মরীচিকাসম নয় মোটেই। যুক্তিবুদ্ধি বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠা নিয়ে যে-কোনও পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করে নেওয়ার ক্ষমতা তার আছে। অতীত অথবা ভবিষ্যতের গর্ভ থেকে যে-কোনও দৃশ্যই ভেলকির মতো সহসা আবির্ভূত হলে মন দিয়ে যাচাই করে নিতে সে পারে। তাই বিচিত্র এই মূকাভিনয় দেখে মুহূর্তের মধ্যে উপনীত হল যে সিদ্ধান্তে—দুঁদে ভবিষ্যদ্বক্তাও অত তাড়াতাড়ি সে সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছতে পারত কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে বিলক্ষণ।

চক্ষুভ্রম কেটে যায় মুহূর্তের মধ্যে। পরমুহূর্তেই চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে বিপুল ব্যানার্জি যা দেখল তা অস্বাভাবিক হতে পারে, অবিশ্বাস্য নয় মোটেই। একটি মূর্তি রয়েছে আরেকটি মূর্তির পেছনে—প্রায় পনেরো

গজ পেছনে। দুজনকেই দেখে মনে হচ্ছে যেন—রাজবেশ আর সেনাপতির বেশ পরে নেমে এসেছে দুটি মানুষ সমুদ্র অভিযান সাঙ্গ করে। ঝলমলে পোশাকের জরি আর ঝালর, উষ্ণীষের মণি আর তরবারির সুদৃশ্য কোষ দূর থেকেও আর ততটা অস্পষ্ট মনে হচ্ছে না। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এহেন বেশ পরে যাত্রাদলে অভিনয় চলে, মঞ্চে বীরদর্পে হাঁটা যায়, নিরালা সমুদ্রতীরে কেউ এভাবে হাওয়া খেতে আসে না। সামনের মূর্তিটি হনহন করে হাঁটছে, আপনমনে, খেয়ালই নেই যে পেছনে আসছে আর একজন। প্রথম ব্যক্তির খাড়া নাক আর ছুঁচলো দাড়ি দেখেই কিন্তু চিনতে পেরেছে বিপুল ব্যানার্জি। স্যার প্রদ্যুম্ন মল্লিক—তার মনিব। পেছন-পেছন যে আসছে, তাকে সে চেনে না। কিন্তু যাত্রা-পার্টির অভিনেতাদের মতো এই যে কুচকাওয়াজ, এর অর্থ অস্পষ্ট নয় তার কাছে। স্যার প্রদ্যুম্ন যাত্রা-পাগল মানুষ। বছরের বেশির ভাগ সময় নিজস্ব বজরায় যাত্রার সরঞ্জাম আর অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যাত্রা দেখিয়ে বেড়ান এমন-এমন জায়গায়, যেখানে শহরের কোনও যাত্রা-পার্টির পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয় কোনওমতেই। যাত্রাই তাঁর প্রাণ, যাত্রাই তাঁর জীবন। শখের পার্টি নিয়ে জলবেষ্টিত বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে গিয়ে প্রমোদ বিতরণ করে যতটা আনন্দ দেন, তার শতগুণ আনন্দ পান নিজে। সেই বজরা যে ফেরার পথে, এ খবর রাখে বিপুল ব্যানার্জি। ছ-মাস পরে বাড়ি ফিরছেন স্যার প্রদ্যুম্ন। বজরা রেখে এসেছেন নিশ্চয় কাছাকাছি কোথাও। পরনে তাই যাত্রার রাজবেশ। কিন্তু বজরা থেকে রাজবেশ পরে তিনি নেমে এলেন কেন, এই রহস্যটা রহস্যই রয়ে গেল বিপুল ব্যানার্জির মস্তিষ্কে। মিনিট পাঁচেক তো লাগত ধড়াচূড়া পালটাতে। ধুতি-পাঞ্জাবি পরে নিয়ে বাড়ির পথে রওনা হলেই পারতেন। রহস্যটা তাই জটিল ধাঁধার আবর্ত রচনা করে গেল সেক্রেটারি মশায়ের মগজের কোষে-কোষে। স্যার প্রদ্যুম্নর অভ্যেস সে জানে। কোথায় কী ধরনের পোশাক পরতে হয়, কখন কার সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয়—স্যার অন্তত তা ভালো করেই জানেন। রহস্যটা তাই বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে জবর রহস্য থেকে গেছিল রহস্যময় এই ব্যাপারের সবচেয়ে বড় রহস্যের আকারে। ধূসর গোধূলি, ঘনায়মান আঁধার আর চলমান ওই দুটি নি:শব্দ মূর্তি যেন যাত্রা-পার্টিরই একটি নাটকের অংশবিশেষ।

প্রথম ব্যক্তির চেয়েও অনেক বেশি অসাধারণ দ্বিতীয় ব্যক্তি। পরনে যদিও সেনাপতির পরিচ্ছদ—কিন্তু চেহারা অতি অসাধারণ, তার চেয়েও অসাধারণ তার আচরণ। হাঁটছে অদ্ভুতরকম এলোমেলোভাবে—অস্বস্তি যেন ঠিকরে-ঠিকরে পড়ছে প্রতিটি পদক্ষেপে, প্রতিটি অঙ্গসঞ্চালনে। কখনও হাঁটছে দ্রুতচরণে, কখনও মন্থর গতিতে। স্যার প্রদ্যুম্নর নাগাল ধরে ফেলা উচিত হবে কিনা, যেন ভেবে ঠিক করে উঠতে পারছে না কিছুতেই। স্যার প্রদ্যুম্ন কানে কম শোনেন বলেই বোধ হয় পেছনে বালির ওপর পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন না। যদি শুনতে পেতেন এবং যদি ডিটেকটিভগিরি জানতেন, তাহলে শুধু পদশব্দ শ্রবণ করেই আঁচ করে নিতে পারতেন পায়ের মালিক কখনও খুঁড়োচ্ছে, কখনও নাচছে, এবং এই দুইয়ের মাঝখানে আরও প্রায় বিশ রকমের ভঙ্গিমায় পেছন-পেছন আসছে। লোকটার মুখ আঁধারে ভালো করে দেখা না গেলেও চকিত চাহনির ঝলক দেখতে পাচ্ছে বিপুল ব্যানার্জি—নিরতিশয় উত্তেজনা যেন অদৃশ্য রশ্মি আকারে বিচ্ছুরিত হচ্ছে মুর্হুমূহু চঞ্চল দুই অক্ষিতারকা থেকে। একবার সে পাঁইপাঁই করে দৌড়তে গিয়েও সামলে নিল পরক্ষণেই—মন্থরচরণে পা ফেলে গেল অন্যমনস্কভাবে। তারপরেই যে কাণ্ডটি করে বসল, তা কোনও যাত্রাদলের অভিনেতার কাছে অন্তত আশা করেনি বিপুল ব্যানার্জি—বিশেষ করে নিরালা এই সমুদ্রসৈকতে।

লোকটা খাপ থেকে টেনে বার করল তরবারি!

নাটকের এই নাটকীয় মুহূর্তে ক্লাইম্যাক্স যখন ফেটে পড়তে চলেছে, ঠিক তখনি চলমান মূর্তিদুটি অন্তর্হিত হল সৈকতভূমির একটা টিলার আড়ালে। ক্ষণেকের জন্যে বিস্ফারিত চক্ষু সেক্রেটারি শুধু দেখলে অবহেলাভরে বেগে তরবারি চালনা করে একটা সামুদ্রিক উদ্ভিদের শিরশ্ছেদ করল বিচিত্রবেশী আগন্তুক। ভাবসাব দেখে মনে হল যেন প্রথম ব্যক্তিটিকে কচুকাটা করতে পারার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় বিষম আক্রোশে ঝাল ঝাড়ল নিরীহ উদ্ভিদটার ওপরেই।

কিন্তু ভয়ানক চিন্তাকুটিল হয়ে উঠল মিস্টার বিপুল ব্যানার্জির বদনমণ্ডল। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সৈকতভূমিতে ঘনায়মান চিন্তার মেঘে আচ্ছন্ন দুই চোখ মেলে।

তারপর গম্ভীরবদনে মন্থরচরণে অগ্রসর হল রাস্তার দিকে। সমুদ্রের ধার ঘেঁষে রাস্তা বেঁকে গেছে অনেক দূর পর্যন্ত—স্যার প্রদ্যুম্নর বিশাল প্রাসাদের পাশ দিয়ে গেছে এই সড়ক আরও কিছু দূরে।

সমুদ্রতীর থেকে প্রাসাদে পৌঁছতে গেলে স্যার প্রদ্যুম্নকে আসতে হবে এইপথ ধরেই। দূর থেকে সেক্রেটারি তাঁর হাঁটার ধরন দেখে আন্দাজে তাই রওনা হল সেইদিকেই। নিশ্চয় বাড়ির দিকেই চলেছেন স্যার প্রদ্যুম্ন। অচিরে আবির্ভূত হবেন বাঁকা সড়কে। পথটির প্রথম অংশ বালিতে ঢাকা—যেহেতু সৈকত বরাবর গিয়েছে। তারপর বালি শক্ত হয়েছে আরও কিছুদূর এগিয়ে—অনতিদূরে দেখা যাচ্ছে মল্লিকভবন। প্রথমে মন্থরচরণে, তারপর দ্রুত পদক্ষেপে, অবশেষে নক্ষত্রবেগে নিরেট বালি দিয়ে তৈরি এই পথের দিকেই ধেয়ে গেল বিপুল ব্যানার্জি। গড়িমসি করা তার ধাতে নেই, সবকিছুই করে তড়িঘড়ি—সফল জীবনের মন্ত্রগুপ্তি তো সেইটাই।

কিন্তু একী! বাড়ি ফেরার পথ ধরে স্যার প্রদ্যুম্নকে তো বাড়ি ফিরতে দেখা গেল না। কোথায় গেলেন তিনি?

তার চাইতেও আশ্চর্য ব্যাপারটা দেখা গেল কিন্তু এর পরেই।

বাড়ি অভিমুখে রওনা হল না বিপুল ব্যানার্জিও।

গেল কোথায়, তা জানে শুধু বিপুল ব্যানার্জিই। বাড়ি ফিরেছিল ঠিকই—বেশ কয়েক ঘণ্টা পরে। বিপুল রহস্য এবং ভয়ানক উত্তেজনার সঞ্চার ঘটিয়ে বসিয়েছিল মল্লিকভবনের প্রতিটি প্রাণীর অন্তরে দীর্ঘ অনুপস্থিতির দরুন।

বিরাট-বিরাট থাম আর পামবৃক্ষ সুশোভিত প্রাসাদে অধীর হয়ে উঠেছিল প্রত্যেকেই। এত দেরি হচ্ছে কেন? সাগ্রহ প্রতীক্ষার পরিশেষে উপস্থিত হল নিদারুণ অস্বস্তি। সবচেয়ে বেশি ছটফট করতে দেখা গেল খাসভৃত্য কদমচাঁদকে। বিপুলকায় এই জীবটি স্বভাবে অতিশয় শান্ত, অস্থিরতা বস্তুটা ধাতে নেই মোটেই। কথা বলে খুব কম—অস্বাভাবিক নীরবতাই তার চরিত্রের বৃহত্তম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এহেন শান্তশিষ্ট নিশ্চুপ প্রকৃতির জীবটিই মুর্হুমুহু গবাক্ষপথে দৃষ্টিচালনা করতে থাকে সমুদ্রসৈকতের ওপর দীর্ঘ বাঁকা সাদা পথটির দিকে—সবেগে পাদচারণা করতে থাকে সামনের বড় হলঘরটিতে।

স্যার প্রদ্যুম্নর প্রাণপ্রিয় ভগ্নী প্রমীলার চিত্তও চঞ্চল হয়েছে বিলক্ষণ। খেয়ালি ভাই যাত্রা নিয়ে ব্যস্ত থাকে বারোমাস। এত বড় বাড়ি আর সংসারের যাবতীয় ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয় তাকেই। নামটা তার প্রমীলা—আকৃতিতেও রাবণপুত্র মেঘনাদের পত্নী প্রমীলার মতোই। বিবাহ নামক শুভকার্যটি ললাটে লেখা ছিল না সেই কারণেই। ভাইয়ের মতই তার নাসিকা প্রত্যঙ্গটি অবিকল খাঁড়ার মতোই শাণিত এবং কোপ মারার ভঙ্গিমায় উদ্যত। শুধু এই খাঁড়া নাকের মহিমাতেই জবরদস্ত এই মহিলাটিকে ভয় পায় এ তল্লাটের কাক-চিল পর্যন্ত। এই পৃথিবীর সব্বাই জানে, মেয়েরা জিহ্বা চালনায় এবং অবিরল কথা বলে যাওয়ায় টেক্কা মারতে পারে যে-কোনও বচনবাগীশ পুরুষকে। প্রমীলা হার মানিয়ে দেয় দুনিয়ার সব মেয়েছেলেকে। মুখে কথার তুবড়ি ফোটে অনর্গল—বিরাম নেই এক মুহূর্তের জন্যেও। ঘ্যানোর-ঘ্যানোর করা নয় কিন্তু। কানের পোকা বার করে দেওয়ার মতো আতীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর মাঝে-মধ্যে যখন কাকাতুয়ার তীব্র ডাকের মতো প্রচণ্ড হয়ে ওঠে, তখন কাক-চিল পর্যন্ত উড়ে পালায় মল্লিকবাড়ির ত্রিসীমানা ছেড়ে।

স্যার প্রদ্যুম্নর প্রাণাধিকা কন্যা অলিম্পিয়া কিন্তু একেবারেই বিপরীত প্রকৃতির। পিসির মতো ডাকসাইটে তো নয়ই, আকৃতিতেও মেঘনাদ-পত্নীর মতো নয়। রঙটা একটু ময়লা বটে, কিন্তু আয়ত দুই চোখে অষ্টপ্রহর স্বপ্ন যেন লেগেই আছে। চেঁচিয়েমেচিয়ে পিসি বাড়ি মাতিয়ে রাখে বলেই বোধ হয় তার আর চেঁচানো তো দূরের কথা, টুঁ শব্দটিও করার দরকার হয় না। চোখেমুখে মাখানো অদ্ভুত বিষাদ। কেন, তা জানা নেই এই কাহিনিকারের। এহেন ভাইঝির সঙ্গে তাই একাই তড়বড় করে কথা বলে যেতে হয় খান্ডারনি পিসিকে এবং

বিন্দুমাত্র অনিচ্ছা প্রকাশ পায় না অনর্গল কথা বলার সময়ে। কানে তো আর তুলো গুঁজে রাখা যায় না, তাই চুপচাপ সব শুনে যায় অলিম্পিয়া। মাঝে-মাঝে কিন্তু এমন প্রাণখোলা হাসি হেসে ওঠে, যা শুনলে এবং দেখলে থমকে যায় উড়ন্ত কাক-চিলও। হাসিটি বড় মিষ্টি, বড় সুরেলা, বড় ঝঙ্কারময়। অলিম্পিয়ার ভেতরটা যে সঙ্গীতময় এবং প্রাণময়—তার প্রকাশ ঘটে চকিতের জন্যে অপূর্ব ওই হাস্যধ্বনির মধ্যে।

আড়িপাতা যাক এবার পিসি-ভাইঝির কথোপকথনে।

পিসি বলছে, 'এতক্ষণে তো এসে যাওয়া উচিত ছিল দুজনের।'

ভাইঝি উদাস চোখে তাকিয়ে রইল সমুদ্রের দিকে।

খরখরে চোখে সেদিকে (মানে যুগপৎ ভাইঝি এবং সমুদ্রের দিকে) তাকিয়ে নিয়ে পিসি বললে, 'চিঠি দিতে এসে পিয়ন কিন্তু দিব্যি গেলে বললে, 'দাদাকে আসতে দেখেছে সমুদ্রের তীর বেয়ে। পেছনে ছিল সেই ভয়ানক জীবটা—'

'ভয়ানক জীব?' চোখ না ফিরিয়েই বলে অলিম্পিয়া।

'পীতাম্বর! পীতাম্বর! কেন যে সবাই ওকে সেনাপতি পীতাম্বর বলে, ভেবে পাই না।'

ক্ষণেকের জন্যে অলিম্পিয়ার বিষাদ-কালো দুই চোখে কৌতুকের বিদ্যুৎ খেলে যায়, 'সেনাপতি বলেই বোধ হয় সেনাপতি বলে। রাজাকে রক্ষে করাই যার কাজ, তার নামই হয় সেনাপতি।'

'ওরকম বিতিকিচ্ছিরি লোককে ল্যাজে বেঁধে কোথাও নিয়ে যাওয়ার কোনও মানে হয়? চাকরি খেয়ে দিলেই ল্যাটা চুকে যায়।'

দাদাকে বিষম ভালোবাসে প্রমীলা। কিন্তু লোক চেনার ব্যাপারে দাদার ওপর তিলমাত্র আস্থা তার নেই। এই একটি বিষয়ে সে সর্বেসর্বাই থাকতে চায়। কিন্তু দাদাটা যেন কী! যত্তো সব আপদদের জুটিয়েছে চারপাশে।

'পীতাম্বর মুখচোরা বলেই গায়ে পড়ে কারও সঙ্গে কথা বলতে পারে না—বিশেষ করে মহিলাদের সঙ্গে।' শেষ কথাটা বলার সময়ে অলিম্পিয়া আয়ত নেত্রপাত করলে প্রমীলা পিসির দিকে, 'কিন্তু তার মানেই এই নয় যে সে লোক খারাপ, সেনাপতি হওয়ার অযোগ্য এবং ঘাড়ধাক্কা দেওয়ার পক্ষে যোগ্যতম পুরুষ।'

প্রমীলার কণ্ঠে এবার জাগ্রত হল সেই বিখ্যাত কাকাতুয়ানিনাদ, 'সেনাপতি! সেনাপতি কাকে বলে জানিস? আমি জানি। অ্যাত্তটুকু বয়স থেকে কত সেনাপতি দেখেছি, সবই অবশ্য যাত্রার সেনাপতি! সেনাপতিদের সবসময়ে লম্পঝম্প করতে হয়, চেঁচিয়ে আকাশ ফাটাতে হয়, চেঁচিয়ে আকাশ ফাটাতে হয়—'

অলিম্পিয়া মৃদুস্বরে শুধু বললে, 'পীতাম্বর যাঁর সেনাপতি, তিনি নিজেও লম্পঝম্প করতে জানেন না, চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করতে জানেন না।'

'ওটা কথার কথা।' ঝটিতি বললে প্রমীলা পিসি, 'যা বলতে চাই, তা হল...তা হল—পীতাম্বর ঝলমলে চকচকে নয় মোটেই—'

'ছ্যাতলা-পড়া সোনা কি ঝকমকে চকমকে হয়?'

'টগবগে খলবলও যদি হত—'

'সে তো পাগলা ঘোড়ারাই হয়।'

'তুই থাম। কিছুতেই বলতে দিচ্ছিস না যা বলতে চাই।'

'তুমি তো পীতাম্বরের কথাই বলছ।'

'একদম না। বললেই হল? আমি ওই বিপুল ব্যানার্জির কথা বলছি। খাসা ছোকরা। টগবগে তেজি ঘোড়া, ঝকঝকে হিরের টুকরো।'

পরমুহূর্তেই অলিম্পিয়ার সেই আশ্চর্য হাসি সপ্তসুরে জাগ্রত হল কণ্ঠে। এ সুরের তুলনা হয় না—এ হাসি হাসতে পারে, এমন মানুষ দুনিয়ায় আর দুটি নেই। চোখের তারায়, মুখের প্রতিটি পেশিতে হাসি বন্যার মতো ধেয়ে গেল চক্ষের নিমেষে।

'ঘোড়ার মতো লাফ দেওয়া আর হিরের মতো চকচক করার গুপ্তবিদ্যেটা বিপুলবাবু অন্যসব বিষয়ের মতোই শিখে নিতে পারেন পলকের মধ্যে। কৌশল রপ্ত করতে তাঁর জুড়ি নেই।'

পিসির মুখের রং পালটে যাচ্ছে দেখে আশ্চর্য হাসিটাকে পত্রপাঠ মনের কন্দরে নিক্ষেপ করে সহজ হয়ে গেল অলিম্পিয়া।

বললে উদাস-উদাস গলায়, 'সত্যিই তো, বিপুলবাবু এখনও এসে পৌঁছলেন না কেন?'

'গোল্লায় যাক বিপুলবাবু।' বলে গাত্রোত্থান করল প্রমীলা পিসি—জানলা দিয়ে চেয়ে রইল বাইরে।

গোধূলির ধূসর রং আর ধূসর নেই। চাঁদের আলোয় ধরার ধূসর রং এখন প্রায় সাদাটে বললেই চলে। সমুদ্রের ধার বরাবর যেদিকে দু'চোখ যায়, সেদিকেই এই আশ্চর্য রহস্য-থমথমে আলো ছড়িয়ে পড়ছে একটু-একটু করে। বহুদূরে দেখা যাচ্ছে তীরের ভেতর দিকে একটা পুকুর—পুকুর ঘিরে তেড়াবাঁকা গাছের জটলা। তারও ওপাশে সৈকতভূমিতে প্রায় গা ঘেঁষে একটা শ্রীহীন দীনহীন চেহারার টিনের চালাঘর। এ অঞ্চলের চা-পানের একমাত্র আড্ডাখানা। নামটা বিচিত্র। সবুজ মানুষ।

হ্যাঁ। চায়ের দোকানের নাম 'সবুজ মানুষ'। কেন যে দোকানের এহেন নামকরণ করেছে কৃষ্ণকায় দোকানদার হরিহর—তা শুধু হরিহরই জানে। গায়ের রং তার কালো জামরুলের মতোই ঘোর কালো। কিন্তু সবুজ রঙের ওপর তার অহেতুক প্রীতি-রহস্য সমাধান করার জন্যে যখন এ কাহিনির অবতারণা করা হয়নি, তখন বিচিত্র নাম নিয়ে অযথা গবেষণা করার আর দরকার নেই।

সাদাটে চাঁদের আলোয় দেখা যাচ্ছে 'সবুজ মানুষ' চায়ের দোকান পর্যন্ত। জীবন্ত কোনও প্রাণী নেই কোথাও। একটু আগেই গোধূলির আলোয় এই অঞ্চলেই কিন্তু হেঁটে গেছিল নতমুখ স্যার প্রদ্যুম্ন আর নৃত্যপর পীতাম্বর। কিন্তু কেউ তাদের দেখেনি। দেখেছিল শুধু একজন। বিপুল ব্যানার্জি। তাকেও কেউ দেখেনি।

রাত গভীর হল। মাঝরাত পার করে দিয়ে আবির্ভূত হল বিপুল ব্যানার্জি। অতিশয় বিপুল বেগে এবং বিষম চেঁচিয়ে ঘুম-ঘর থেকে টেনে আনল বাড়ির প্রত্যেককে। প্রেতের মতো ফ্যাকাশে মুখ বিপুল ব্যানার্জির। আরও ফ্যাকাশে লাগছে পুলিশ ইনসপেক্টরের ভাবলেশহীন নিরেট মুখ এবং অবয়বের পাশাপাশি থাকায়। কিন্তু ভাবলেশহীন থাকার বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ভাবলেশহীন থাকতে পারেনি আরক্ষাবাহিনীর এই অফিসারটি। মনে হয়েছিল যেন নির্বিকার একটা মুখোশ পরে প্রাণপণে চেপে রাখতে চাইছে ভেতরকার আবেগকে। প্রমীলা পিসি আর অলিম্পিয়ার সামনে যথাসম্ভব রেখে-ঢেকে খবরটা হাজির করা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তা চক্ষের নিমেষে যেন হাওয়ায় ভর করে ছড়িয়ে গিয়েছিল বাড়িময়।

বড় ভয়ঙ্কর সংবাদ বহন করে এনেছে নিশীথ রাতের এই দুটি পুরুষ। অনেক চেষ্টার পর অবশেষে পাওয়া গেছে স্যার প্রদ্যুম্নর দেহ। শুধু দেহ। প্রাণহীন দেহ। গাছ-ঘেরা পুকুরে জাল ফেলে পচা পাঁক আর কাদার মধ্যে টেনে তোলা হয়েছে সেই দেহ।

জলে ডুবে মারা গেছেন স্যার প্রদ্যুম্ন মল্লিক।

বিপুল ব্যানার্জিকে যারা চেনে এবং জানে, তারা নিশ্চয় আঁচ করে নিয়েছে মহা তৎপর এই মানুষটি রাতের উদ্বেগ উত্তেজনা বেমালুম ঝেড়ে ফেলবে সকাল হতে-না-হতেই। কার্যক্ষেত্রেও দেখা গেল তাই। গতরাতের উদভ্রান্ত বিপুল ব্যানার্জি এখন রীতিমতো প্র্যাকটিক্যাল। তড়িঘড়ি হাজির হয়েছে ইনসপেক্টর রাজীবলোচনের কাছে। গতরাতে এই রাজীবলোচনের সঙ্গেই পথে দেখা হয়ে গিয়েছিল বিপুল ব্যানার্জির। 'সবুজ মানুষ' চায়ের দোকানের ঠিক পাশটিতে। সকাল হতেই ইনসপেক্টরকে নিরালা একটা ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে প্রশ্নে-প্রশ্নে নাস্তানাবুদ করে তুলল বিপুল ব্যানার্জি—যেন জেরা করার অধিকারটা আছে শুধু তারই—রাজীবলোচনের নয়।

রাজীবলোচন লোকটিও বড় কম যায় না। শুধু বাইরেটা নয়, ভেতরটাও যেন আস্ত গ্র্যানাইট পাথর দিয়ে তৈরি। একেবারে নিরেট। হয় নিরেট বোকা, না হয় দারুণ ধূর্ত। তাই এইসব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মাথা গরম

করবার পাত্র নয় মোটেই।

অচিরেই দেখা গেল, রাজীবলোচনের চেহারা আর চাউনি যতই বোকা-বোকা হোক না কেন, ভেতরে-ভেতরে সে নিদারুণ সেয়ানা। বিপুল ব্যানার্জিকে সব প্রশ্নেরই জবাব দিয়ে গেল বেশ ওজন করে-করে। খামতি বা ঝুঁকতি নেই কোনও জবাবেই।

প্রশ্নগুলো এল ঝড়ের বেগে, কিন্তু জবাবগুলো গেল গদাই লস্করি চালে—রীতিমত যুক্তিতে ঠাসা অবস্থায়।

বিপুল ব্যানার্জির মাথায় তখন ঘুরঘুর করছে সদ্য-পড়া একটা বইয়ের বিষয়বস্তু। বইয়ের নাম, *'কী করে দশদিনে ডিটেকটিভ হওয়া যায়'*। তাই শেষমেষ বললে, 'ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে তাহলে এই : 'অ্যাক্সিডেন্ট, সুইসাইড অথবা মার্ডার।'

চেয়ে রইল রাজীবলোচন।

ঝটিতি বললে বিপুল ব্যানার্জি, 'ত্রিভুজ রহস্য—চিরকাল যা ঘটে এসেছে, ঘটে চলবে।'

রাজীবলোচন বললে, 'অ্যাক্সিডেন্ট? কক্ষনও না।'

'কেন না?'

'অ্যাক্সিডেন্ট মানে বলতে চাইছেন, অন্ধকারে দেখতে পাননি—জলে পড়ে গেছেন স্যার প্রদ্যুম্ন, কেমন?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়।'

'কিন্তু ঘটনাটা যখন ঘটে, তখন তো অন্ধকার তেমন গাঢ় হয়নি। তা ছাড়া, রাস্তা থেকে পুকুরটা কম করেও পঞ্চাশ গজ দূরে। রাস্তাও অচেনা নয়—চোখ বেঁধে ছেড়ে দিলেও পৌঁছে যেতেন নিজের বাড়ি। পঞ্চাশ গজ দূরে পুকুরের দিকে যাবেন কেন? না, একে অ্যাক্সিডেন্ট বলা যায় না। কোনওমতেই না। জেনেশুনে গিয়ে ধীরে-সুস্থে নিশ্চয় শুয়ে পড়েননি পুকুরের জলে।'

'সুইসাইড করার ইচ্ছে থাকলে—'

'সুইসাইডও নয়। মানুষ সুইসাইড করে কেন? জীবনে বিতৃষ্ণা এসে, মনে প্রচণ্ড আঘাত পেলে, অথবা দারিদ্র্যের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পারলে—'

'বটেই তো! বটেই তো!'

'স্যার প্রদ্যুম্নর ক্ষেত্রে এর কোনওটাই খাটে না। জীবনে তাঁর তৃষ্ণা না থাকুক, বিতৃষ্ণা নেই। যাত্রাটাত্রা নিয়ে ছিলেন মনের সুখে। মনে আঘাত পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কেননা, তাঁর পারিবারিক জীবন অত্যন্ত সুখের। টাকা-পয়সার অভাব কাকে বলে, তা তিনি জন্মাবধি জানেননি—কোটিপতি বলা যায় এক কথায়। নইলে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর মত যাত্রা-পার্টির পেছনে দু-হাতে টাকা ওড়াতে যেতেন না। সুখে ছিলেন, বড় সুখে ছিলেন—সুইসাইড করতে যাবেন কোন দু:খে?'

রহস্যনিবিড় চাপা স্বরে বললে বিপুল ব্যানার্জি, 'তাহলেই দেখুন এসে যাচ্ছে তৃতীয় সম্ভাবনাটা।'

'তৃতীয় সম্ভাবনাটা নিয়ে এই মুহূর্তে এত তাড়াহুড়ো করার কোনও প্রয়োজন দেখছি না,' থেমে-থেমে নিরুত্তেজ গলায় বললেন রাজীবলোচন।

শুনে বিলক্ষণ বিরক্ত হল বিপুল ব্যানার্জি। তার আবার তাড়াহুড়ো করা স্বভাব সব ব্যাপারেই। তড়বড় করে মন্তব্য প্রকাশও করতে যাচ্ছিল, কিন্তু রাজীবলোচন সে সুযোগ দিলে না। বললে, 'শেষ সম্ভাবনাটা আদৌ সম্ভব কিনা জানবার আগে দু-একটা বিষয় জানা দরকার। স্যার প্রদ্যুম্নর সেক্রেটারি আপনি। এই দু-একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করতে পারবেন শুধু আপনিই।'

'বিষয়গুলো কী যদি জানতে পারি—'

'ওঁর প্রপার্টি।'

'প্রপার্টি?'

'হ্যাঁ। ওঁর বিরাট সম্পত্তিটা দিয়ে যাচ্ছেন কাকে কাকে? সম্পত্তির পরিমাণটা কত? উইল নিশ্চয় একটা আছে। কী লেখা আছে, সেক্রেটারির জানা থাকতে পারে। জানেন কী?'

'যে ধরনের প্রাইভেট সেক্রেটারি হলে এই বিষয়টা অন্তত জানা যায়, সেই ধরনের প্রাইভেট সেক্রেটারি আমি নই।'

'বটে।'

'কিন্তু যাদের জানা আছে, তাদের নামটা জানি।'

'তারা কারা?'

'মেসার্স লাহিড়ী, মুখার্জি অ্যান্ড ব্যানার্জি কোম্পানি। গুরু নিবাস রোডে এঁদের অফিস। স্যার প্রদ্যুম্নর ইনকাম ট্যাক্স থেকে আরম্ভ করে বিষয়-সম্পত্তির দেখাশুনা করা—সমস্ত করেন এঁরা।'

'সলিসিটর কোম্পানি?'

'হ্যাঁ। উইলের খবর এঁরাই জানেন নিশ্চয়।'

'ঠিক বলেছেন। উইল বাড়িতে রাখা সমীচীন নয়। সলিসিটরদের জিম্মাতেই থাকে। তাহলে ওঁদের ওখানে ঢুঁ মারা যাক!'

'এখুনি।' বিপুল ব্যানার্জির আর তর সইছে না।

কিন্তু রাজীবলোচন লোকটা যেন কী! উইলের পেছনে সঙ্গে-সঙ্গে দৌড়নোর কোনও অভিপ্রায় আছে বলে মনেই হল না। নিরেট বপু আর নির্ভাষ চাহনি নিয়ে বসে রইল চুপচাপ।

বিপুল ব্যানার্জি কিন্তু আর সামলাতে পারছে না নিজেকে। তড়াক করে লাফিয়ে উঠল চেয়ার ছেড়ে। সবেগে দু-পাক ঘুরে এল ঘরময়। উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে। যেন একটা চাপা আগ্নেয়গিরি। ফেটে পড়ল বলে।

এবং ফেটেও গেল পুরো দুটো মিনিট যেতে না যেতেই।

প্রশ্নটা ঠিকরে বেরিয়ে এল লাভা উদগীরণের মতোই, 'রাজীবলোচনবাবু, স্যার প্রদ্যুম্নর ডেডবডিটা এখন কোথায়?'

'ডক্টর তলাপাত্র তলিয়ে দেখছেন।'

'মানে?'

'মানে, এগজামিন করছেন। মৃত্যুর কারণ খুঁজছেন।'

'কোথায় দেখছেন? মানে, বডিটা এখন কোথায়?'

স্রেফ পাথরের মূর্তির মতোই চেয়ে থেকে রাজীবলোচন বললে, 'থানায়।'

'রিপোর্ট রেডি হতে কত দেরি?'

'ঘণ্টাখানেক তো লাগবেই।'

'অসম্ভব।'

'কী অসম্ভব?'

'এত তাড়াতাড়ি এ ধরনের রিপোর্ট লেখা যায় না। হাপিত্যেশ করে বসে না থেকে চলুন সলিসিটর কোম্পানিতে যাওয়া যাক। বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

রাজীবলোচনের পাথর-চাহনি দেখে পরমুহূর্তেই কিন্তু থিতিয়ে গেল বিপুল ব্যানার্জি। সুর পালটে নিল চক্ষের নিমেষে। ইনসপেক্টরের ধীর-স্থির ভাবভঙ্গি তাকে যে বিলক্ষণ অপ্রস্তুত করেছে, তা প্রকট হল চোখে-মুখে।

বিপুল ব্যানার্জি যতখানি অস্থির উইল-বৃত্তান্ত জানতে, ঠিক সেই পরিমাণে প্রশান্ত রাজীবলোচন উইলের বৃত্তান্ত না জানতে। অথবা বলা যায়, জানতে সে চায় ঠিকই—কিন্তু যথাসময়ে—এত হুটোপাটি করতে রাজি নয়।

তাই সুর বদলাতে হল বিপুল ব্যানার্জিকে। রাজীবলোচনের নিরেট বদনের দিকে চেয়ে আমতা-আমতা করে বললে ওভার-স্মার্ট বিপুল ব্যানার্জি, 'ব্যাপারটা...মানে, ঠিক বোঝাতে পারছি না—ইয়ে...স্যার প্রদ্যুম্নর

মেয়ের কথা বলছি...তার কথাটাও একটু ভাবা দরকার...এত বড় একটা শক...বুঝতেই পারছেন...'

'পারছি।' অমায়িক বচন রাজীবলোচনের।

আরও ঘাবড়ে গেল বিপুল ব্যানার্জি। ফলে স্পিড বেড়ে গেল কথার, 'মানে, সে বেচারি হয়তো অনেক হাবিজাবি কথাই ভেবে মরছে...দুশ্চিন্তা তো হবেই...ঠিক কিনা বলুন?'

'এক্কেবারে ঠিক।'

'ফালতু চিন্তা থেকে ওকে মুক্তি দেওয়া দরকার।'

'তা তো বটেই।'

'খামোকা ভেবে মরছে। এর মধ্যেই ঘনিষ্ঠ বন্ধুটন্ধুর সঙ্গে কনসাল্ট করবে ঠিক করে ফেলেছে। একজন তো এই মুহূর্তে এই টাউনেই রয়েছে।'

'কে বলুন তো?'

'নামটা তার যেমন বিদঘুটে, পেশাটাও তেমনি বিদঘুটে। ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করে যারা তাদের আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি না।'

'ধর্মের ব্যবসাদারদের অনেক সময়ে দু'চোখ দিয়ে দেখাও যায় না।'

'মানে? মানে?'

'মনের চোখ দরকার।'

এবার বিলক্ষণ চটিতং হল বিপুল ব্যানার্জি, 'আরে মশায়, এ লোকটা পয়লা নম্বর বুজরুক। ঈশ্বর নিয়ে কারবার করে, অথচ পাইপ খায় যখন-তখন।'

'খাক না। সাধু-সন্ন্যাসীরা গাঁজাও খায়।'

'যাচ্চলে! শিব গাঁজা খায় বলেই সন্ন্যাসীরা গাঁজা খায়। কিন্তু যীশু কি কোনওদিন পাইপ খেত?'

'কার কথা বলছেন?' এবার যেন আগ্রহের রোশনাই দেখা যায় রাজীবলোচনের পাথর চোখে।

'যার ভাঙা ছাতা, ন্যাতার মতো আলখাল্লার আর কুমড়োর মতো চেহারা দেখলে আপনি হেসে গড়িয়ে পড়বেন।'

'নামটা?'

'ফাদার ঘনশ্যাম।'

'ঘনশ্যাম পাদরি!'

'চেনেন নাকি?'

'আপনার চাইতে বেশি চিনি।'

'আ-আমার চাইতে! মা-মানেটা কী হল?'

'মানে হল এই যে, ফাদার ঘনশ্যামকে আমি যতটা চিনি, আপনি তার দশ ভাগের এক ভাগও চেনেন না। আইসবার্গের ওপরটুকুই কেবল আপনি দেখেছেন—চোখের আড়ালে যা আছে, তা দেখেননি।'

'আইসবার্গ! মা-মা—'

'মানে, হিমবাহ। ফাদার ঘনশ্যাম একটা মানুষ-হিমবাহ। তাঁর বাইরেটা হাস্যকর। কিন্তু ভেতরটা যে কত ভেতরে গেছে, তা তলিয়ে দেখার ক্ষমতা সাধারণ মানুষের নেই।' বলে বিপুল ব্যানার্জির দিকে নির্নিমেষে চেয়ে থেকে রাজীবলোচন বুঝিয়ে দিলে সাধারণ মানুষটা বর্তমান ক্ষেত্রে কে—'অদ্ভুত একটা জুয়েল কেসে তাঁর যে ভেল্কি দেখেছি, তাতেই বুঝেছি, ফাদার ঘনশ্যাম পাদরি না হয়ে পুলিশ হলে পারতেন।'

অত:পর ঘরের মধ্যে থাকা আর সমীচীন বোধ করেনি বিপুল ব্যানার্জি। বিপুল বেগে ঘর থেকে উধাও হয়ে যেতে-যেতে শুধু বলে গেছে, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, তাহলে সলিসিটর কোম্পানিতে ফাদার ঘনশ্যামও আসুক। ডাক্তারও আসুক। এক জায়গাতেই সবকথা হয়ে যাক।'

ব্যবস্থা হল সেইভাবেই। সমুদ্রসৈকত থেকে খুব দূরে নয় টাউন। ইনসপেক্টর রাজীবলোচনকে নিয়ে হুড়মুড় করে সলিসিটর কোম্পানির অফিসে ঢুকল বিপুল ব্যানার্জি। ফাদার ঘনশ্যাম পৌঁছে গেছে তাদের আগেই। কোলের ওপর বিরাট (এবং ভাঙা) ছাতাটা রেখে বসে আছে চেয়ারে। দু'হাত রয়েছে তালিমারা নোংরা ছাতার ওপর। জমিয়ে গল্প করছে কোম্পানির সেকেন্ড পার্টনার সলিল মুখার্জির সঙ্গে। ডক্টর তলাপাত্রও হাজির অফিসরুমে। নিশ্চয় এইমাত্র এসেছেন। সুদৃশ্য ছাতাটা ঘরের কোণে রাখছেন। এখুনি এসেছেন বলেই নিশ্চয় স্যার প্রদ্যুম্নর মৃত্যুসংবাদ এখনও দেননি ফাদার ঘনশ্যাম এবং সলিল মুখার্জিকে। দুজনেরই মুখে তাই কৌতুক ঝলমল করছে। হাসির কথাই বলছে বোধ হয় ফাদার ঘনশ্যাম। চাঁদের মতো মুখ আর চশমার আড়ালে কুৎকুতে চোখে রসবোধ যেন উপচে উঠছে। সলিল মুখার্জি শুধু শুনে যাচ্ছে আর শব্দহীন হাসি হেসে চলেছে। ভদ্রলোকের মাথার চুলে পাক ধরেছে। বিলক্ষণ আমুদে বলেই দুই চোখ নাচিয়ে-নাচিয়ে ঘনশ্যাম পাদরির কথা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে। চকচকে কাগজকাটা ছুরির পাশে পড়ে থাকা ধুলোয় ময়লা কলমটা নাড়তে-নাড়তে নিমগ্ন হয়ে রয়েছে রসালাপে।

রাজীবলোচন আর বিপুল ব্যানার্জি সবেগে আবির্ভূত হতেই গোল চশমার ফাঁক দিয়ে চাইল ফাদার ঘনশ্যাম। বললে, 'ফাইন মর্নিং। ঝড় পালিয়েছে, সকালটাও যেন হাসছে।'

রাজীবলোচন বললে, 'আপনার হাসিও তাই খুলেছে।'

'পুরোপুরি খোলেনি,' বললে ফাদার ঘনশ্যাম, 'এখানে সেখানে এখনও কিছু কালো মেঘ জমে রয়েছে। তবে বৃষ্টি আর পড়েনি।'

'হ্যাঁ, এখনও কিছু কালো মেঘ জমে রয়েছে।' বললে রাজীবলোচন।

'কিন্তু এক ফোঁটা বৃষ্টিও আর পড়েনি।' ফাদার ঘনশ্যামের সুরে সুর মিলিয়ে বললে সলিসিটর সলিল মুখার্জি, 'ও মেঘে আর বৃষ্টি হবে না। ছুটির মেজাজ আসে এমন দিনেই।'

'অথবা ছুটির মেজাজ উবে যায় এমন দিনেই।' বললে রাজীবলোচন।

বিপুল ব্যানার্জি এতক্ষণ কোনও কথা বলেনি। তাই এবার তার দিকে অ্যাপায়নের সুরে বললে সলিল মুখার্জি, 'আছেন কেমন ব্যানার্জি সাহেব? স্যার প্রদ্যুম্ন নাকি ফিরে আসছেন?'

'আসছিলেন, কিন্তু আর আসবেন না।' ফাঁকা গলায় বললে বিপুল ব্যানার্জি।

কলম নামিয়ে রাখল সলিল মুখার্জি, 'কেন আসবেন না?'

'জলে ডুবে মারা গেছেন বলে।'

মুহূর্তের মধ্যে পালটে গেল অফিসরুমের হালকা পরিবেশ। কিন্তু চেয়ারে আসীন মূর্তি দুটির সকৌতুক মুখচ্ছবি কৌতুক-ঝলমলেই রইল আগের মতো। যেন এইমাত্র একটা মস্করা করে বসল বিপুল ব্যানার্জি—তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করে গেল সলিল মুখার্জি এবং ফাদার ঘনশ্যাম। ঠোঁটগুলো রইল কেবল নিস্পন্দ—নিস্পন্দ রইল অবয়বও।

তারপর দুজনেই মৃদুকণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করলে একই কথাটা, 'জলে ডুবে মারা গেছেন!'

বলে, ফাদার ঘনশ্যাম তাকালেন সলিল মুখার্জির মুখের দিকে। সলিল মুখার্জিও তাকাল ফাদার ঘনশ্যামের মুখের পানে।

দৃষ্টি বিনিময় সাঙ্গ করে দুজনেই দৃষ্টিশর নিক্ষেপ করল বার্তাবহ বিপুল ব্যানার্জির পানে। কয়েক সেকেন্ড সব চুপচাপ।

পরমুহূর্তেই শুরু হয়ে গেল প্রশ্নের-পর-প্রশ্ন।

পাদরির প্রশ্ন, 'কখন?'

সলিল মুখার্জির প্রশ্ন, 'কোথায়?'

জবাবটা দিল ইনসপেক্টর, 'সবুজ মানুষ চায়ের দোকানের কাছেই যে পুকুরটা আছে—সেইখানে। সবুজ পাঁক আর সবুজ শ্যাওলায় মাখামাখি লাশটা টেনে তোলবার পর চিনতে কষ্ট হয়েছে। ডক্টর তলাপাত্র তারপর

—আরে! আরে! ফাদার ঘনশ্যাম! আপনার কী হল? শরীর খারাপ নাকি?'

শিউরে উঠে বললে ফাদার ঘনশ্যাম, 'সবুজ মানুষ! সবুজ মানুষ!'

'লাশটাকে সবুজ মানুষের মতোই লাগছিল বটে—'

'সরি, ইনসপেক্টর! মাথাটা হঠাৎ কীরকম ঘুরে যাওয়ায়—বলুন, বলুন, আপনি বলে যান।'

রাজীবলোচন চোখ দুটো একটু ছোট করে ফাদার ঘনশ্যামের দিকে চেয়ে রইল সেকেন্ড কয়েক। তারপরে বললে, 'মাথাটা হঠাৎ ঘুরে গেল কেন?'

কাষ্ঠহাসি হাসল ফাদার ঘনশ্যাম। বললে আমতা-আমতা করে—'ডেডবডিটা সবুজ পাঁক আর সবুজ শ্যাওলায় মাখামাখি হয়েছিল শুনেই—'

'কী মুস্কিল! তাতে মাথা ঘুরে যাবে কেন?'

'আমি ভেবেছিলাম, সমুদ্রের সবুজ উদ্ভিদের জন্যে সবুজ মানুষ হয়ে গেছেন স্যার প্রদ্যুম্ন। সেইটা হলেই বরং ছিল ভালো—পাঁক আর শ্যাওলাটা বড় বিচ্ছিরি জিনিস।'

ঘরসুদ্ধ সবাই নিমেষহীন চোখে তাকিয়ে থাকে ঘনশ্যাম পাদরির দিকে। পাগল নিশ্চয়। মাথায় ছিট আছে। ঘর নিস্তব্ধ।

নৈ:শব্দ্য ভঙ্গ করলেন ডাক্তার তলাপাত্র।

ভদ্রলোক নি:সন্দেহে অসাধারণ পুরুষ। অন্তত বাহ্য-আকৃতির দিক দিয়ে। মাথায় তালঢ্যাঙা। রোগা ডিগডিগে। চর্বি-টর্বির বালাই নেই। তাই বলে অস্থি-চর্মসার মোটেই নন। পোশাক-আশাকেও রীতিমত পারিপাট্য। যে ধরনের কোট-প্যান্ট পরলে ডাক্তার বলে মনে- মনে সম্ভ্রম জাগে—পরেছেন ঠিক সেই ধরনের কোট-প্যান্ট-টাই। তবে যা একটু সেকেলে। কোট-প্যান্টের কাট-ছাঁট অথবা নেকটাইয়ের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ আধুনিক ফ্যাশন অনুযায়ী অচল। বয়স কিন্তু তেমন কিছু নয়। চল্লিশও ছাড়িয়েছে কিনা সন্দেহ। ধড়াচূড়ায় সেকেলে, কিন্তু দাড়ি রাখার ব্যাপারে আধুনিক। মাইকেল মধুসূদন টাইপের দাড়ি রেখে আঁতেল হতে চায় এ যুগের অনেকেই। ডাক্তার তলাপাত্রও সযত্নে মাইকেল-দাড়ির চাষ করেছেন দুই গালে। বরং একটু বাড়িয়েই রেখেছেন। রাবীন্দ্রিক স্টাইলে বুক পর্যন্ত লুটিয়ে দিয়েছেন। দুই চোখে কিন্তু রাবীন্দ্রিক বা মাইকেলি চাহনির ছিটেফোঁটাও নেই। অন্তর্ভেদী রুক্ষ চাহনি। মুখভাব তা সত্ত্বেও সুন্দর। কিন্তু এই মুহূর্তে কেন জানি বড় ফ্যাকাশে মনে হচ্ছে। সরু ছুরির মতো চোখজোড়া বড় চঞ্চল। কোনওদিকে বা কারও দিকেই স্থির থাকছে না, অথচ স্থির রাখার চেষ্টা চলছে অবিরাম।

ঘরের প্রত্যেকেই লক্ষ করল এইসব কিছুই। কেউ কিছু বলার আগেই মুখ খুললেন ডাক্তার। কণ্ঠস্বরে জাগ্রত হল কর্তৃত্ব, প্রখর ব্যক্তিত্ব। নায়ক যেন তিনি এখন নিজে। আশ্চর্য এই কর্তৃত্বব্যঞ্জক কণ্ঠস্বরকে ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন। বুঝে নিতে হবে।

যা বললেন তিনি, তা এই : 'স্যার প্রদ্যুম্নর লাশ জলের মধ্যে পাওয়া গেছে ঠিকই, কিন্তু তার মধ্যেও রয়েছে একটা রহস্য।'

থামলেন। সবাইকে দেখলেন। তারপর বললেন, 'জলে ডুবে উনি মারা যাননি।'

তড়িৎস্পর্শে যেন সচকিত ইনসপেক্টর রাজীবলোচন। এবং সেই প্রথম তীব্র কণ্ঠে প্রশ্ন করতে শোনা গেল তাকে, 'এক্সপ্লেন।'

'ডেডবডি এগজামিন করে এলাম এইমাত্র। স্যার প্রদ্যুম্নর মৃত্যু হয়েছে হৃৎপিণ্ডের মধ্যে একটা সরু তীক্ষ্ণ বস্তু ঢুকে যাওয়ার ফলে। ছোট ছোরাজাতীয় কিছু।'

রাজীবলোচন চেয়ে আছে। চোখের পাতা পড়ছে না। গোল চশমার আড়ালে চোখের পাতা বন্ধ করে যেন মনের চোখে দৃশ্যটা কল্পনা করার চেষ্টা করছে ঘনশ্যাম পাদরি।

বললেন ডাক্তার, 'মৃত্যুর বেশ কিছুক্ষণ পর ডেডবডি লুকিয়ে রাখা হয়েছিল পুকুরের জলে।'

এইবার দুই চোখ খুলে গেল ফাদার ঘনশ্যামের। নিষ্প্রভ মণিকা দুটো এখন আশ্চর্য উজ্জ্বল। যেন প্রাণশক্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে তারারন্ধ্র থেকে। একদৃষ্টে চেয়ে আছে ডাক্তারের পানে। ফাদার ঘনশ্যামকে যারা দীর্ঘদিন ধরে চেনে, তারা অন্তত জানে, কদাচিৎ এভাবে কারও দিকে তাকিয়ে থাকে বিচিত্র এই পাদরি।

অফিসরুম থেকে একে-একে সবাই বেরিয়ে আসে রাস্তায়। ফাদার ঘনশ্যাম কিন্তু আঠার মতো লেগে আছে ডাক্তারের পেছনে। হঠাৎ গায়ে পড়ে আলাপ শুরু করে দেয় অত্যন্ত অমায়িক ভঙ্গিমায়।

ঘর ছেড়ে বেরোনোর আগেই অবশ্য আসল প্রসঙ্গটি নিয়ে আলোচনা সেরে নিয়েছে বিষম-কৌতূহলী বিপুল ব্যানার্জি।

প্রসঙ্গটা স্যার প্রদ্যুম্নর উইল সংক্রান্ত।

সলিল মুখার্জি প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ আইনবিদ। উইলের ব্যাপারে চট করে মুখ খুলতে চায় না কোনও আইনজীবীই। বিপুল ব্যানার্জির অস্থিরতা তাকে একটু বিরক্তই করেছে বলা চলে। চুলচেরা চোখে লক্ষও করেছে, উইলের বৃত্তান্ত না জানা পর্যন্ত যেন স্বস্তি পাচ্ছে না সেক্রেটারি।

রাজীবলোচনও দেখেছে বিপুল ব্যানার্জির অধীর কৌতূহল। পুলিশি কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে সলিল মুখার্জির মুখ বন্ধ রাখতেও পারত সেই মুহূর্তে। কিন্তু যে ব্যাপারে কোনও রহস্য নেই, অযথা সেই ব্যাপারটাকে রহস্যময় করে তুলতে চায়নি ফাদার ঘনশ্যাম। বলতে গেলে তারই অনুরোধে অবশেষে মনের আগল খুলেছে সলিল মুখার্জি।

মৃদু হেসে বলেছে পাদরিকে, 'ফাদার, স্যার প্রদ্যুম্নর উইলে ঘোরপ্যাঁচ কিচ্ছু নেই। সবাই যা করে, উনিও তাই করেছেন। স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি দিয়ে গেছেন একমাত্র সন্তান অলিম্পিয়াকে।'

এরপরেই রাস্তায় নেমে এসেছে সবাই। রওনা হয়েছে মল্লিকভবনের দিকে। হন্তদন্ত হয়ে সবার আগে-আগে চলেছে বিপুল ব্যানার্জি। গন্তব্যস্থানে আগেভাগে না পৌঁছলেই যেন নয়।

কিন্তু সেরকম কোনও তাড়াহুড়োই দেখা যাচ্ছে না পেছনের দুটি মূর্তির ক্ষেত্রে। ধীরেসুস্থে যেন হাওয়া খেতে-খেতে চলেছে দীর্ঘকায় ডাক্তার আর হ্রস্ববপু পাদরি। গন্তব্যস্থানে তড়িঘড়ি পৌঁছনোর চাইতে অনেক বেশি আগ্রহ দেখা যাচ্ছে সাতপাঁচ কথাবার্তায়।

জীবন্ত প্রহেলিকা বলা যায় ডাক্তার তলাপাত্রকে। হাঁটছেন মুখ বুজে। পাদরি ঘনশ্যামের হযবরল কথাবার্তা যেন এ-কান দিয়ে ঢুকে বেরিয়ে যাচ্ছে ও-কান দিয়ে।

প্রশ্নটা করলেন হঠাৎ।

'ফাদার, একটা কথা জিগ্যেস করব?'

কুৎকুতে চোখ ফিরিয়ে তাকায় ফাদার, 'কী বলুন তো?'

'ব্যাপারটা আপনার লাগছে কীরকম?'

সেকেন্ড কয়েক অনিমেষে ডাক্তারের পানে চেয়ে রইল ফাদার। তারপর বললে, 'কীরকম মানে?'

'মানে, সব তো শুনলেন, এখন কী মনে হচ্ছে আপনার?'

'দু-একটা ধাঁধা ঘুরঘুর করছে মাথার মধ্যে।'

'ধাঁধা!'

'স্যার প্রদ্যুম্নকে তেমনি ঘনিষ্ঠভাবে জানতাম না বলেই একটু গোলমাল লাগছে?'

'গোলমালটা কোথায়?'

'স্যার প্রদ্যুম্নকে তেমন না জানলেও, ওঁর মেয়ে অলিম্পিয়াকে জানি বেশ ভালো করেই।' ডাক্তারের সরাসরি প্রশ্নটাকে পাশ কাটিয়ে যায় ফাদার।

'অজাতশত্রু ছিলেন স্যার প্রদ্যুম্ন।' সুন্দর মুখখানাকে উৎকট গম্ভীর করে বলল ডাক্তার।

'আছে, কিছু আছে।' নিরীহ স্বরে বললে পাদরি ঘনশ্যাম।

'কিছু আছে! কোথায়? কী?'

'আপনার কথার মধ্যেই। যা আপনি খুলে বলতে চান না।'

'দেখুন মশায়,' স্বর রুক্ষ হয়ে ওঠে ডাক্তারের, 'আমার এই নাকটা দেখেছেন?'

'সুন্দর নাক।'

'এই নাকের আত্মসম্মান বোধটা একটু প্রখর। যেখানে সেখানে নাক-গলানো আমার ধাতে নেই। বুঝেছেন?'

'বুঝলাম।'

'স্যার প্রদ্যুম্ন খুন হয়েছেন তো আমার কী? ভদ্রলোকের মেজাজের একটু নমুনা পেয়েছি। কাজেই তাঁর মৃত্যুরহস্য নিয়ে কোনও মাথা-ব্যথাই নেই আমার।'

'কীরকম নমুনা শুনতে পারি?'

'আরে মশাই, সামান্য একটা ব্যাপার। অপারেশন করতে গেলে ওরকম একটু-আধটু ভুল সব ডাক্তারই করে। কিন্তু তিলকে তাল করে তুললেন উনি। কোর্টে পর্যন্ত যাওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন।'

'শেষপর্যন্ত আর যাননি?'

'সুবুদ্ধিটা শেষকালে এসেছিল বলেই যাননি। ওঁর নিচের থাকের মানুষদের পোকামাকড়ের মতো দেখতেন। ব্লু ব্লাড থাকলে যা হয় আর কী।'

জবাব দিল না ফাদার ঘনশ্যাম। চেয়ে রইল একদৃষ্টে সেক্রেটারির দিকে। হনহন করে হাঁটতে-হাঁটতে অনেকটা এগিয়ে গেছে বিপুল ব্যানার্জি। হন্তদন্ত হয়ে হাঁটার কারণটাও আবিষ্কার করে ফেলল ফাদার ঘনশ্যাম।

অলিম্পিয়া। স্যার প্রদ্যুম্নর কন্যা। এখনও পঞ্চাশ গজ এগিয়ে রয়েছে বিপুল ব্যানার্জির সামনে। চলেছে মল্লিকভবনের দিকেই।

পঞ্চাশ গজ পথ হনহনিয়ে পেরিয়ে গিয়ে অলিম্পিয়ার নাগাল ধরে ফেলল সেক্রেটারি। দূর হতে মিলিয়ে গেল পাশাপাশি দুটি মূর্তি। অপলকে মূকাভিনয় দেখে গেল ফাদার ঘনশ্যাম পেছন থেকে। খুবই উত্তেজিত মনে হল সেক্রেটারিকে। কারণটা ফাদার ঘনশ্যাম আঁচ করতে পারলেও মুখে প্রকাশ করল না। ডাক্তারের সঙ্গে পাশাপাশি হেঁটে পৌঁছল মোড়ের মাথায়—অদূরে মল্লিকভবন।

আচমকা প্রশ্নটা করল ঠিক তখন।

'ডাক্তার, আপনার আর কিছু বলার আছে বলে মনে হচ্ছে না।'

'কেন থাকবে শুনি?' সঙ্গে-সঙ্গে মুখের ওপর জবাবটা ছুঁড়ে দিয়েই এমনভাবে লম্বা-লম্বা পা ফেলে উধাও হলেন ডাক্তার যেন জবাব নয়, প্রশ্নই করে গেলেন—বলার যদি কিছু থাকেও, বলতে যাবেন কেন? আদৌ কিছু বলার আছে কিনা, সেটাও অনিশ্চিত রয়ে গেল অদ্ভুত ভঙ্গিমায় নিক্ষিপ্ত শব্দ তিনটের মধ্যে। জবাব না জিজ্ঞাসা—কিছুই আঁচ করা না গেলেও ফাদার ঘনশ্যামের মস্ত মাথার মধ্যে শব্দ তিনটে কিন্তু ঘুরপাক খেয়েই গেল। একা-একা হেঁটে গেল বিপুল ব্যানার্জি আর অলিম্পিয়ার পেছন-পেছন।

কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে গেল মল্লিকভবনের ঝাউবীথির সামনেই।

আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়েছে অলিম্পিয়া। দ্রুত চরণে এগিয়ে আসছে ফাদারের দিকেই। মুখভাব অস্বাভাবিক ফ্যাকাশে। জ্বলজ্বল করছে কিন্তু দুই চোখ। যেন টাটকা অথচ নামহীন আবেগে আপ্লুত হয়েছে অন্তরপ্রদেশ।

কাছে এসেই বললে চাপা গলায়, 'ফাদার, জরুরি কথা আছে। এখুনি শুনতে হবে। কী করব ভেবে পাচ্ছি না।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়। এখুনি শুনব। কিন্তু কোথায় বসে শুনব?'

ঝাউবীথির দুপাশে বিরাট বাগান। ফাদার ঘনশ্যামকে এই বাগানের মধ্যেই নিয়ে গেল অলিম্পিয়া। বসল ঝরাপাতায় ঢাকা ঘাসজমির ওপর। মুখ খুলল সঙ্গে-সঙ্গে। যেন পেট থেকে কথা বার করে না দেওয়া পর্যন্ত আবেগকে আর ধরে রাখতে পারছে না—অজ্ঞান হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

কথাটা এই, 'বিপুল ব্যানার্জি এইমাত্র বড় ভয়ঙ্কর-ভয়ঙ্কর কথা বলে গেল।'

নীরবে মস্ত মাথা নেড়ে সায় দিলে ফাদার ঘনশ্যাম। কথাগুলো যে খুবই ভয়ঙ্কর, তা পেছন থেকে বিপুল ব্যানার্জির ভয়ঙ্কর উত্তেজনা দেখেই আঁচ করা গেছিল।

অলিম্পিয়া বললে, 'কথাটা পীতাম্বরকে নিয়ে। চেনেন পীতাম্বরকে?'

'চিনি...মানে—'

'সে চেনা নয়,' অধীর কণ্ঠে বলে অলিম্পিয়া, 'জানেন তার নাড়ীনক্ষত্র? তার চরিত্র? তার স্বভাবপ্রকৃতি?'

'অত কি আর জানি। যেটুকু শুনেছি, তা একটু গোলমেলে বইকী।'

'কী রকম? কী রকম?'

'পীতাম্বরকে যাত্রা-পার্টির সবাই পীতাম্বরানন্দ বলে ডাকে। অথচ সে আনন্দে ভরপুর নয় কখনওই। তাকে দেখলেই মনে হয় যেন একটা জীবন্ত বিষের বোতল—কঙ্কালের করোটির ওপর যেন আড়াআড়িভাবে রাখা দুটো মড়ার হাড়।'

'কী ভয়ঙ্কর! কী ভয়ঙ্কর!'

'ভয়ঙ্কর তো বটেই। ওরকম চেহারা যার—'

'পীতাম্বরকে মোটেই ওরকম দেখতে নয়। কিন্তু...কিন্তু' বলতে-বলতে খাদে নেমে আসে অলিম্পিয়ার কণ্ঠস্বর, 'অদ্ভুত কিছু একটা ঘটেছে ওর মধ্যে। এইটুকু বয়স থেকে ওকে আমি চিনি—হাড়ে-হাড়ে চিনি—মড়ার হাড় ওর মুখের ওপর কখনও কল্পনাও করতে পারি না—ভেতরে তো নয়ই। কত খেলা খেলেছি দুজনে সমুদ্রের ধারে বালির ওপর। ঝিনুক কুড়িয়েছি, কাড়াকাড়ি করেছি, বালির কেল্লা গড়েছি, ভেঙে তছনছ করে দিয়েছি। ওর কথাগুলো একটু ঝাঁঝালো। বড় চোখা-চোখা। মনের ভেতর পর্যন্ত কুপিয়ে কাটে। যারা ওকে চেনে না, জানে না, বোঝে না—তাদের কাছে তাই ও বিষের বোতল, কঙ্কালের করোটি আর মড়ার হাড় হতে পারে—আমার কাছে নয়। কেননা, আমি জানি ওর ছুরির মত ধারালো কথাবার্তার মধ্যে আছে কবিতার সুর আর ছন্দ, ফুলের মতো ওর মনের গন্ধ আর রং। সেই সময়ে আমিও ওকে পীতাম্বরানন্দ বলে খেপাতাম। আনন্দ দিতে জুড়ি ছিল না। আনন্দ বিতরণ করতে ভালোবাসত বলেই যাত্রা-পার্টিতে ঢুকেছিল পাঁচজনকে আনন্দ দেবে বলে। কিন্তু...কিন্তু—'

'তারপর?' অসহিষ্ণু কণ্ঠে শুধু বললে ফাদার ঘনশ্যাম।

'ইদানীং যে যাত্রা-পার্টিতে আনন্দের খোরাক আর পাচ্ছে না, আমার কাছে তা বলেছিল। আমার কাছেই শুধু বলেছিল—আর কাউকে নয়। কিন্তু ভেতরে যার আনন্দ নেই, সে তো নিরানন্দ থাকবে বাইরেও। কাঠের মতো শক্ত হয়ে মুখখানাকে পেঁচার মতো করে—না-না, কঙ্কালের করোটির মত কক্ষনও নয়—পেঁচার মতো করে দিনগত পাপক্ষয়ই কেবল করে গেছে। মড়ার মতো হেঁটে যাওয়া বলতে পারেন—আড়ষ্ট, প্রাণহীন। প্রাণে ফুর্তি থাকলে তো বাইরে বেরোয় ফুর্তির ফোয়ারা—কেন, আমি জানি না! এড়িয়ে চলে আমাকে। তাতে আমার কিছু এসে যায় না। আমার জন্যে ওর ভেতরটা গুঁড়িয়ে গেছে, আমার তা মনে হয় না। খুব বড় রকমের একটা দু:খ শুকিয়ে দিয়েছে ওর ফুর্তির ফোয়ারা। এখন যা শুনলাম বিপুল ব্যানার্জির মুখে, তা যদি সত্যি হয়, তাহলে বলব, ওর এই দু:খটা এসেছে পাগলামি থেকে। অথবা—'

'অথবা?'

'ওর ঘাড়ে ভূত চেপেছে।'

'বিপুল ব্যানার্জির কাছে কী শুনেছ, অলিম্পিয়া?'

'তা এতই ভয়ঙ্কর যে বলতেও মুখে আটকাচ্ছে।'

'আটকাক। তবুও বলো।'

'বিপুল ব্যানার্জি নিজের চোখে দেখেছে, বাবার পেছন-পেছন পা টিপে-টিপে আসছিল পীতাম্বর। কিছুতেই যেন মনস্থির করে উঠতে পারছিল না। তারপর খাপ থেকে টেনে বার করেছিল তলোয়ার...'

'তারপর?'

'ডাক্তার তো বলছেন, ইস্পাতের সরু ফলা দিয়ে বুক ফুটো করা হয়েছে বাবার।'

'বলেছেন বটে।'

'ফাদার, আপনার কী মনে হয়—'

'তোমার কী মনে হয় অলিম্পিয়া, আগে তা বলো।'

'আমার কী মনে হয়? আমার কী মনে হয়, তা কি আপনি আঁচ করতে পারেননি ফাদার? পীতাম্বর ইদানীং মুষড়ে থাকত। বাবার মেজাজ তো জানি—মেজাজ সপ্তমে উঠতে দেরি লাগে না। পীতাম্বরের সঙ্গে খিটিমিটি লেগে থাকতই। তবু বলব, বিপুল ব্যানার্জি নিজের চোখে যাই দেখুক না কেন, পীতাম্বরের পক্ষে এ কাজ সম্ভব নয় কোনওমতেই।'

'কিন্তু বিপুল ব্যানার্জি তো ভুল দেখেনি।'

'আমিও আমার পুরোনো বন্ধুর হয়ে ওকালতি করতে বসিনি। তা ছাড়া, পীতাম্বর তো এখন আমার বন্ধু নয়—ছিল এককালে—অনেক-অনেক বছর আগে। এখন আমার ছায়া মাড়ানো দূরে থাক—দূর থেকেই ছায়া দেখলে সরে যায়। বন্ধু সে আর নয়, শত্রুও নয়। সুতরাং পীতাম্বরের পক্ষে যা অসম্ভব, তা হাজারবার বলতে দ্বিধা নেই আমার। অথচ প্রায় হাজারবার ওই একটা কথাই বলে গেল বিপুল ব্যানার্জি—'

'একই কথা হাজারবার বলাটা বিপুল ব্যানার্জির মুদ্রাদোষ।'

'মুদ্রাদোষ!'

বলেই থেমে গেল অলিম্পিয়া। গুম হয়ে মাথা নিচু করে বসে রইল বেশ কিছুক্ষণ।

তারপরেই মুখ তুলে বললে এক্কেবারে অন্য সুরে, 'মুদ্রাদোষটা আমার ক্ষেত্রে না দেখালেই ভালো হত না? বিশেষ করে এই সময়ে?'

'তোমার ক্ষেত্রে?' জুলজুল করে তাকায় ফাদার ঘনশ্যাম।

'হাজারবার বলে গেল একটাই কথা—বিয়ে করতে চায় আমাকে।'

'সুসংবাদ।'

'সুসংবাদ?'

'অভিনন্দনটা কাকে জানাব, সেটাই শুধু ঠিক করে উঠতে পারছি না। তোমাকে, না বিপুল ব্যানার্জিকে?'

'ফাদার!'

'অলিম্পিয়া, উত্তেজনা কোনও সমস্যারই সমাধান করতে পারে না, বরং আরও জট পাকিয়ে দেয়।'

'উত্তেজিত এখন হয়েছি—তখন হইনি।'

'আমিও তা দেখেছি। খুবই উত্তেজিত হয়েছিল বিপুল ব্যানার্জি। বিয়ের প্রস্তাবটা শোনবার পর কী বললে তুমি?'

'বললাম, এখন ওসব কথা থাক।'

'চমৎকার বলেছ। বিপুল ব্যানার্জি কী বলল?'

'কথা কানেই তুলতে চায় না। একই কথা বলে গেল হাজার বার।' বলতে-বলতে অলিম্পিয়ার কথায় জাগল সেই আমুদে সুর—যা ওর অন্তর-প্রকৃতির মধ্যে সুপ্ত থাকে—বাইরে থেকে দেখে মোটেই বোঝা যায় না, 'কত কথাই না বলে গেল। জীবনে বড় হতে চায়, অনেক উচ্চাশাকে সফল করতে চায়। এক সময়ে নাকি আমেরিকাতে ছিল—অথচ আমেরিকার ডলার ছাড়া আর কোনও আমেরিকান বিষয় নিয়ে ওকে কথা বলতে এর আগে শুনিনি। উচ্চাশাগুলো যে কত উচ্চে পৌঁছেছে, তাও জানবার সৌভাগ্য কখনও হয়নি—জানলাম এই প্রথম। বিয়ে করে নিয়ে যেতে চায় আমাকে আমেরিকার স্বর্গরাজ্যে।'

'সেটা সৌভাগ্য, না দুর্ভাগ্য?'

'আমার ভাগ্যে যা আছে, তা কি আমিই জানি? ফাদার, প্রশ্নটা বিপুল ব্যানার্জির উচ্চাশা সফল করার ব্যাপারে নয়।'

'জানি।' নরম গলায় বললে ফাদার ঘনশ্যাম, 'বিপুল ব্যানার্জি কোনও প্রবলেমই নয় এই মুহূর্তে। প্রবলেম হল—'

'পীতাম্বর।'

'হ্যাঁ, পীতাম্বর। বিপুল ব্যানার্জি ওর সম্বন্ধে যা-যা বলে গেল, তা কি সত্যি? তোমার তো মনে হয় সত্যি নয়।'

শক্ত কাঠ হয়ে গেল অলিম্পিয়া। অদ্ভুত চোখে চেয়ে রইল ফাদার ঘনশ্যামের চশমার আড়ালে কুৎকুতে চোখজোড়ার দিকে। সে চোখে শ্যেনদৃষ্টি নেই, তবুও অলিম্পিয়ার মনে হয় যেন তার ভেতর পর্যন্ত দূরবীণ দিয়ে দেখে নিচ্ছে অদ্ভুত নিস্তেজ ওই চোখজোড়া।

ভুরু কুঁচকে মুচকি হেসে বললে, 'অনেক কিছুই জানেন দেখছি।'

ফাদার ঘনশ্যাম কিন্তু হাসির ধার দিয়েও গেল না। কণ্ঠস্বরেও অটুট রইল গাম্ভীর্য। বললে থেমে-থেমে, 'অলিম্পিয়া, জানি আমি অনেক কিছুই। কিন্তু এই ব্যাপারে জানি খুব সামান্যই। কিন্তু একটা ব্যাপারে জানি খুব ভালো করেই। আমি জানি, কে খুন করেছে তোমার বাবাকে।'

ভীষণ চমকে উঠল অলিম্পিয়া। বসে থাকতেও পারল না। ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে হেঁট হয়ে চেয়ে রইল ফাদারের দিকে ফ্যালফ্যাল করে। মুখ সাদা হয়ে গেছে। ফ্যাকাশে।

ফাদার ঘনশ্যাম কিন্তু নির্বিকার। বললে শুষ্ক কণ্ঠে, 'আমি একটা গাধা। নিরেট বোকা। বোঝা উচিত ছিল তখনই।'

'কখন?'

'যখন জিগ্যেস করা হচ্ছিল, কোথায় পাওয়া গেছে তোমার বাবাকে। সবুজ পাঁকে মাখামাখি অবস্থায়। ঠিক যেন সবুজ মানুষ।'

বলে উঠে দাঁড়াল ঘনশ্যাম পাদরি। বিশাল ছাতাটা বাগিয়ে ধরল এমনভাবে যেন হঠাৎ নতুন একটা সঙ্কল্প কঠিন করে তুলেছে অন্তরপ্রদেশকে।

কথার মধ্যেও প্রকট হল নতুন গাম্ভীর্য। বললে, 'তোমার বাবার মৃত্যুকে ঘিরে যে হেঁয়ালি গড়ে উঠেছে, তার সমাধান-সূত্রটিও আমি জেনে ফেলেছি।'

'আ-আপনি জানেন?'

'কিন্তু এখুনি তোমাকে বলব না। খবরটা শুভ নয়, এইটুকুই শুধু জেনে রাখো। তবে যে অশুভ পরিস্থিতির সামনে এসে দাঁড়িয়েছ, তার চাইতে বেশি অশুভ নয়।' বলতে-বলতে কোটের বোতাম এঁটে নিল ফাদার। ঘুরে দাঁড়াল ফটকের দিকে, 'চললাম।'

'কোথায়?'

'পীতাম্বরের সঙ্গে দেখা করতে।'

'জানেন, কোথায় থাকে পীতাম্বর?'

'জানি। সমুদ্রের ধারে টালির ঘরটায়। বিপুল ব্যানার্জি সেখানেই তো দেখেছে ওকে পায়চারি করতে।'

বেগে সমুদ্র-সৈকতের দিকে উধাও হয়ে গেল ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল।

অলিম্পিয়া কল্পনার জগতে বাস করতে ভালোবাসে। কল্পনায় আকাশপাতাল রচনা করে। তাই এই মুহূর্তে বয়স্ক এই বন্ধুটি যে ভয়াবহ ইঙ্গিতটি নিক্ষেপ করে অন্তর্হিত হয়ে গেল, সেই কল্পনা মনে নিয়ে একা-একা দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ মনে করল না। অথচ স্থানত্যাগ করে যেতেও পারল না। আচমকা অমন একটা ভয়াবহ ইঙ্গিত দিয়ে ঝড়ের মতো কেন যে উধাও হয়ে গেল ফাদার ঘনশ্যাম, আকাশপাতাল ভেবেও তার কুলকিনারা পেল না। ফাদার নাকি জানে কে খুন করেছে তার বাবাকে। কী করে জানল, সেটা একটা রহস্য।

তার চাইতেও বড় রহস্য পুকুরের সবুজ পাঁকে সবুজ হয়ে যাওয়া মৃতদেহটাকে সবুজ মানুষ নামকরণ করা। সবুজ মানুষ! কীসের প্রতীক? এত হেঁয়ালি করে কথা বলে গেল কেন ফাদার? হেঁয়ালির মধ্যে হেঁয়ালি রচনা না করলেই কি চলত না? মনের চোখে যেন দেখতে পেল ভূতের মতো সবুজ মানুষ চক্কর দিচ্ছে পুকুরের পাড়ে—চাঁদের আলোয়। দিনের আলোয় এ ধরনের গা-ছমছমে কল্পনা মনের মধ্যে কেন যে হঠাৎ ডালপালা মেলে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, বুঝে উঠল না অলিম্পিয়া। দিনের আলোটাকেই বরং আরও বেশি রহস্যময় মনে হল চাঁদনি রাতের চেয়ে।

পুকুর। পাঁক। সবুজ মানুষ।

গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অলিম্পিয়া।

সূর্য অস্ত যাওয়ার আগেই অনেক দূরে দেখা গেল দ্রুত আগুয়ান একটা মূর্তিকে। আসছে তার দিকেই। দেখেই বুকের রক্ত চঞ্চল হল অলিম্পিয়ার। দুনিয়াটা মনে হল যেন হঠাৎ উলটে গেছে। যা কল্পনা করা যায় না, চোখের সামনে তাই দেখছে।

হনহন করে যে মূর্তি এগিয়ে আসছে তার দিকে সমুদ্রের ধার থেকে, তাকে চেনে অলিম্পিয়া। খুব ভালো করেই চেনে। কিন্তু তার হাঁটার ধরন আজ এরকম কেন? এরকম উচ্ছল ভঙ্গিমায় তো সে অনেকদিন হাঁটেনি?

আরও কাছে এগিয়ে এসেছে সে। না, ভুল হয়নি। পীতাম্বর আসছে। পড়ন্ত আলোয় ক্রমশ সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তার মুখচ্ছবি। আনন্দের রোশনাইতে ঝলমল করছে সারা মুখখানা।

বিমূঢ় হয়ে কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রইল অলিম্পিয়া।

হাসতে-হাসতে উল্লাসে ফেটে পড়ল পীতাম্বর তার সামনে এসে। এতদিন যার ছায়া দেখলেই সরে গেছে দূর থেকে, এসে দাঁড়াল একেবারে তার সামনে। দু-হাত রাখল তার দু-কাঁধে। বললে সহর্ষে, 'মুখ তুলে চেয়েছেন ভগবান। এখন থেকে তোমার ভার আমার।'

অলিম্পিয়া হতভম্ব। কিছুক্ষণ শুধু চেয়েই রইল ফ্যালফ্যাল করে পীতাম্বরের আনন্দনিবিড় চোখের তারা দুটোর দিকে। তারপর বলেছিল স্বগতোক্তির সুরে, 'এত আনন্দ কীসের? হঠাৎ এমনভাবে পালটে গেলে কেন পীতাম্বর?'

'কারণ, এইমাত্র শুনলাম অশুভ সংবাদটা। অলিম্পিয়া, আজ আমি সুখী, সত্যিই বড় সুখী!'

মল্লিকভবনের সামনের বাগানে জড়ো হয়েছে সকলেই। বিচিত্র এই রহস্য উপাখ্যানে যাদের কিছু ভূমিকা আছে, তারা যেমন এসেছে, তেমনি এসেছে তারাও যাদের কোনও ভূমিকাই নেই। সবাই দাঁড়িয়ে আছে দু-পাশে ঝাউবীথি শোভিত পথের ওপর। উদ্দেশ্য একটাই। আইনবিদ মহাশয় এখুনি আনুষ্ঠানিকভাবে করবেন তাঁর কর্তব্যটি। অর্থাৎ পড়ে শোনাবেন স্যার প্রদ্যুম্ন মল্লিকের শেষ ইষ্টিপত্র। সেইসঙ্গে জ্ঞানদানও করবেন। সেটাও তাঁর কর্তব্য। এহেন সঙ্কটাবস্থায় যা-যা করণীয়, আইনজ্ঞ হিসেবে তা তাঁকে বলতেই হবে। ফলে, কী ঘটবে আর কী না ঘটবে, জানবার আগ্রহ প্রত্যেকেরই মনে।

দলিল-দস্তাবেজের ফাইল বগলে দাঁড়িয়ে আছেন সলিসিটর সলিল মুখার্জি। পাশেই দাঁড়িয়ে ইনসপেক্টর রাজীবলোচন। আইনের হাতিয়ার চালিয়ে হত্যাকারীকে কুপোকাত করার জন্যেই উইলের বয়ান শুনতে বড়ই ব্যগ্র সে। পীতাম্বর মহাপ্রভু কিন্তু নির্লজ্জভাবে ব্যস্ত অলিম্পিয়াকে নিয়ে। ভ্রূক্ষেপ নেই কোনওদিকেই। দীর্ঘদেহী ডাক্তারকে দেখে বিস্মিত অনেকেই, তার চাইতেও বেশি অবাক হচ্ছে কুমড়োর মতো বপু যার—সেই ঘনশ্যাম পাদরিকে দেখে। ধর্ম নিয়ে যার কারবার, অধর্মের ব্যাপারে তার আগ্রহটা যেন কেমনতর।

ছোট্ট দলটাকে দেখেই বাড়ির দিক থেকে উল্কার মতো বেগে ধেয়ে এল বিপুল ব্যানার্জি। মানুষ-উল্কাই বটে। খাতির করে সবাইকেই নিয়ে গেল মল্লিকভবনের সামনের সবুজ ঘাসজমিতে। পরমুহূর্তেই পুনরায় উল্কাবেগে অন্তর্হিত হল বাড়ির মধ্যে—অভ্যর্থনার আয়োজন করতে। যাওয়ার সময়ে বলে গেল দ্রুত কণ্ঠে, 'আসছি এখুনি।'

লোকটার সচল ইঞ্জিনের মতো এনার্জি দেখে তাজ্জব হয়েছে প্রত্যেকেই। সেক্রেটারি বটে একখানা। প্রাণশক্তিতে ভরপুর। কোনও কাজে ত্রুটি নেই।

প্রথম মন্তব্যটা শোনা গেল পীতাম্বরের কণ্ঠে, 'ক্রিকেটের রান তুলছে মনে হচ্ছে!'

দ্বিতীয় মন্তব্যটা করলেন সলিল মুখার্জি, 'ছোকরা খাপ্পা হয়েছে আইনের মন্থরগতি দেখে। আইন কেন ওর মতো স্পিডে ছুটছে না—অতএব ছুটে মরছে নিজেই। মিস মল্লিক অবশ্য বোঝেন, এহেন পরিস্থিতিতে আইনবিদরা কখনওই ক্রিকেট রানারের মতো পাঁই-পাঁই করে দৌড়োতে পারে না। এসব ব্যাপারে আইনগত অসুবিধে আছে—তার জন্যে সময় যা লাগবার, তা লাগবেই। আমার ঢিমেতালে কাজ করায় মিস মল্লিক অন্তত অখুশি নন।'

তৃতীয় মন্তব্যটা আচমকা নিক্ষেপ করলেন ডাক্তার, 'বিপুল ব্যানার্জির ছুটোছুটি এখন কিন্তু আমার ভালোই লাগছে। যা করতেই হবে, তা ঝটপট সেরে ফেলাই ভালো।'

ভুরু কুঁচকে বললে পীতাম্বর, 'কথাটার অর্থ? বিপুল ব্যানার্জির তাড়াহুড়োটা এখন আপনার ভালো লাগছে কেন?'

'বিপুল ব্যানার্জির বৈশিষ্ট্য তো ওইখানেই।' হেঁয়ালির সুরে বললেন ডাক্তার, 'কখনও তাড়াহুড়ো করে মরে, কখনও ঢিমেতালে চলে।'

'এটা আবার কীরকম কথা হল?'

'তাড়াহুড়ো করলে যখন আরও মানাতো, তখন কিন্তু ঢিমেতালেই চলেছিল সেক্রেটারি সাহেব।'

'কখন বলুন তো?'

'পুকুরপাড়ে আধখানা রাত ঘুরঘুর না করে কাটালেই পারত। সবুজ-মানুষকে পুকুর থেকে তোলার ব্যবস্থাটা তাড়াহুড়ো করে সারলেই পারত। ইনসপেক্টরের সঙ্গে হঠাৎ দেখা না হয়ে গেলে বাকি রাতটাও বোধ হয় কেটে যেত পুকুরের পাড়েই। তাই বলছিলাম, বিপুল ব্যানার্জি কখনও কাজ করে স্লো স্পিডে, কখনও হাই স্পিডে। ইন্টারেস্টিং।'

পীতাম্বর বললে, 'তাহলে কী বলতে চান, বিপুল ব্যানার্জি যা বলেছে, তার মধ্যে মিথ্যের ভেজাল আছে?'

ব্যস, আর কথাটি নেই ডাক্তারের মুখে। গূঢ় কৌতুকের হাসি হাসল কেবল সলিসিটর সলিল মুখার্জি। বলল তরল স্বরে, 'ছোকরার বিরুদ্ধে কিন্তু আমি কিছু বলব না। তবে—'

অধীর হল পীতাম্বর, 'তবে আবার কী?'

'আমার কাজ আমি ভালো বুঝি, সে ব্যাপারে আমাকে জ্ঞানদান করার চেষ্টাটা না করলেই ভালো করত।'

'তাই নাকি? আইন শেখাতে গেছিল আপনাকে?'

'খুব প্রশংসনীয়ভাবেই শেখাতে গেছিল এবং তিলমাত্র দেরি না করে। মানে বুঝেছেন? উইলটা পড়ে শোনানো হোক ঝটপট—দেরি করছি কেন?'

এতক্ষণে মুখ খুলল ইনসপেক্টর রাজীবলোচন, 'সে চেষ্টা আমার ওপরেও হয়েছে। আমার চরকায় কীভাবে তেল দিতে হয়, সেটা আমার চাইতে বিপুল ব্যানার্জির বেশি জানা উচিত নয়। মরুকগে, তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ডাক্তার সাহেব কি সন্দেহ করেন বিপুল ব্যানার্জিকে? সেক্ষেত্রে কিন্তু ছোকরাকে এখুনি জেরা করা দরকার।'

'ওই তো আসছে বিপুল ব্যানার্জি।' বললে পীতাম্বর।

দোরগোড়ায় আবার বায়ুবেগে আবির্ভূত হতে দেখা গেল সেক্রেটারিকে।

ঠিক এই সময়ে প্রত্যেককেই অবাক করে ছাড়ল ফাদার ঘনশ্যাম। এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল সবার পেছনে। নিজেকে জাহির করার চেষ্টা করেনি একেবারেই। আচমকা হনহনিয়ে এল সবার সামনে। বোঁ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে দু-হাত শূন্যে তুলে দাঁড়িয়ে গেল এমন ভাবে, যেন আগুয়ান সৈন্যবাহিনীকে আর এক ইঞ্চিও না এগোনোর নির্দেশ দিচ্ছে সেনাপতি।

কুমড়োপটাশ মন্থরগতি ফাদার ঘনশ্যামের পক্ষে এবম্বিধ আচরণ অতীব বিস্ময়কর। বিশেষ করে যারা তাকে চেনে এবং জানে, তাদের চোখ কপালে উঠে যাওয়ার উপক্রম হল স্থূলকায় পাদরির নাটকীয় কাণ্ড দেখে।

'দাঁড়ান! আর এগোবেন না!'

রীতিমত ধমক দিচ্ছে যে পাদরি! ব্যাপারটা কী?

'ফাদার—' পীতাম্বর মুখ খুলেছিল বটে—কিন্তু দাবড়ানি দিয়ে থামিয়ে দেয় ঘনশ্যাম পাদরি :

'আগে আমাকে যেতে দিন। বিপুল ব্যানার্জির সঙ্গে আমাকে আগে কথা বলতে দিন। আমি যা জানি, আমার মুখেই আগে ওকে শুনতে দিন। প্লিজ, আপনারা কেউ যা জানেন না এখনও পর্যন্ত, আমি তা জানি। আপনাদের বলার আগে ওকে তা বলা দরকার। কেন জানেন? একটা মস্ত ভুল বোঝাবুঝির হাত থেকে বেঁচে যাবে অন্তত একজন।'

'কী বলতে চান বলুন তো?' সলিল মুখার্জির ঝাঁঝালো প্রশ্ন।

'অশুভ সংবাদটা শুনিয়ে দিতে চাই।' বললে ফাদার ঘনশ্যাম।

তেড়ে উঠল রাজীবলোচন, 'দেখুন ফাদার—,' পরমুহূর্তেই সামলে নিল নিজেকে ঘনশ্যাম পাদরির কুতকুতে চোখজোড়ার দিকে চেয়ে। এ দৃষ্টি সে আগেও দেখেছে অনেক অদ্ভুত ঘটনার ঠিক আগের মুহূর্তে। সুর পালটে নিয়ে বললে সঙ্গে-সঙ্গে, 'আপনি না হয়ে আর কেউ হলে কিন্তু আমাকে রুখতে পারত না—'

কিন্তু যার উদ্দেশে এ কথা বলা, সেই ফাদার ঘনশ্যাম ততক্ষণে বাঁই-বাঁই করে দৌড়ে পৌঁছে গেছে গাড়িবারান্দায়—হাত-মুখ নেড়ে কথা আরম্ভ করে দিয়েছে বিপুল ব্যানার্জির সঙ্গে। জায়গাটা অন্ধকার বলেই দেখা গেল না নাটকের বাকি অংশটুকু। মিনিট বারো পরে একলাই বেরিয়ে এল ফাদার ঘনশ্যাম।

এবং আর-এক দফা তাজ্জব করে দিল প্রত্যেককেই।

কারণ, বাড়ির মধ্যে ঢোকবার কোনও সদিচ্ছাই দেখাল না ফাদার। ঝুপ করে বসে পড়ল নড়বড়ে বেঞ্চিতে, পকেট থেকে বার করল পাইপ আর তামাক, দেশলাই জ্বেলে অগ্নিসংযোগ করে ফুকফুক করে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল তন্ময় চোখে গাছের পাতার দিকে চেয়ে—দু-কান ভরে যেন শুনছে পাখিদের কাকলি। জগতে এর চাইতে মধুর, এর চাইতে প্রিয় যেন আর কিছুই নেই।

বিমূঢ় দলটা অগত্যা ফাদারকে ওই অবস্থায় রেখেই প্রবেশ করল বাড়ির মধ্যে।

কিছুক্ষণ পর।

দড়াম করে খুলে গেল সদরদরজা। ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে আসতে দেখা গেল তিনটি মূর্তিকে। সবার আগে অলিম্পিয়া আর পীতাম্বর। ভারী দেহ নিয়ে দৌড় প্রতিযোগিতায় হেরে যাওয়ায় পিছিয়ে পড়েছে রাজীবলোচন।

ফাদার কিন্তু তখন ধূম্রজালে আচ্ছন্ন। দুই চোখে স্বপ্নিল চাহনি।

মত্তহস্তীর মতোই বাগান কাঁপিয়ে অবশেষে সামনে এসে দাঁড়াল রাজীবলোচন। ক্রোধে আরক্ত মুখ।

রেগেছে অলিম্পিয়াও, 'ফাদার! ব্যাপার কী বলুন তো? বিপুল ব্যানার্জি কোথায়?'

বোমার মতো ফেটে পড়ল পীতাম্বর, 'পালিয়েছে! সুটকেশ গুছিয়ে নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে পাঁচিল টপকে পালিয়েছে! ফাদার, কী বলেছিলেন ওকে?'

'কী আবার বলবেন?' বললে অলিম্পিয়া, 'শয়তানিটা ধরিয়ে দিয়েছিলেন—মিথ্যের মুখোশ খুলে দিয়েছিলেন।'

হুঙ্কার ছাড়ল রাজীবলোচন, 'একী করলেন ফাদার? এভাবে কেন ল্যাং মারলেন আমাকে?'

'কী করলাম তাই তো বুঝতে পারছি না।' নিরীহ স্বরে বললে ঘনশ্যাম পাদরি।

'পারছেন না? আর কত ন্যাকা সেজে থাকবেন? খুনিকে পালিয়ে যেতে দিয়েছেন আপনি...হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি! নিরেট গাধা আমি—তাই খুনিকে হুঁশিয়ার করার সুযোগটা আমিই দিয়েছি আপনাকে,' সারা বাগান

থরথর করে কাঁপতে লাগল রাজীবলোচনের বজ্রনাদে, 'হেল্প করেছেন—মার্ডারারকে হেল্প করেছেন পালিয়ে যেতে—সেইসঙ্গে বসিয়ে গেছেন আমাকে! আর কি ওকে ধরা যাবে? এতক্ষণে রাস্কেলটা—'

'বেশ কয়েক মাইল দূরে—আপনার নাগালের বাইরে।' রুষ্ঠ কণ্ঠে বললে পীতাম্বর।

হৃষ্টকণ্ঠে বললে ফাদার ঘনশ্যাম, 'খামোকা চেঁচাচ্ছেন। অতীতে অনেক খুনিকে আমি সাহায্য করেছি ঠিকই—কিন্তু খুন করতে সাহায্য করিনি কোনও খুনিকেই।'

'যাই বলুন আর তাই বলুন, গোড়া থেকেই আপনি জানতেন খুনি বিপুল ব্যানার্জি।' অলিম্পিয়াকে এ মূর্তিতে কখনও দেখা যায়নি। রাগে মুখ থমথম করছে। আতীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে গাছের পাতাগুলো পর্যন্ত যেন শিউরে উঠছে, 'ডেডবডি কোথায় পাওয়া গেছে, এই নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই তাই আপনি আর নিজেকে সামলে রাখতে পারেননি। ডাক্তার ঠিকই বলেছেন। পুকুরপাড়ে অত রাত পর্যন্ত ঘুরঘুর করছিল ওই কারণেই।'

'খটকা আমারও লেগেছিল। তখনি যদি রাস্কেলটাকে পাকড়াও করতাম—' রাজীবলোচন প্রায় নৃত্য করতে থাকে প্রচণ্ড আফশোসে।

'রাস্কেল বলে রাস্কেল!' রণচণ্ডিনী মূর্তি অলিম্পিয়ার, 'এখন তো দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে গেল বাবাকে খুন করেছে—'

'সলিসিটর সলিল মুখার্জি।' ভারি শান্ত গলায় বললে ফাদার ঘনশ্যাম।

'কে?' যেন হেঁচকি তুলল রাজীবলোচন।' থ হয়ে গেল অলিম্পিয়া। চক্ষু ছানাবড়া করে চেয়ে রইল পীতাম্বর। অকস্মাৎ যেন শ্মশান নৈ:শব্দ্য নেমে এল ঠিক ওইটুকু জায়গায়—আশপাশে অব্যাহত রইল বিহঙ্গ কুজন।

'সলিসিটর সলিল মুখার্জি!' থেমে-থেমে আবার বললে ফাদার ঘনশ্যাম। এমন সুস্পষ্ট উচ্চারণে বললে যেন বাচ্চাদের ক্লাশ নিচ্ছে—নতুন শব্দ শেখাচ্ছে—বোঝার সুবিধের জন্যে ধীরে-সুস্থে পরিষ্কার উচ্চারণ করতে হচ্ছে। 'ওই যে ভদ্রলোক, চুল যার কাঁচাপাকা, উইল বগলে এসেছেন পড়ে শোনানোর জন্যে।'

বলে, পাইপের ছাই ফেলে দিয়ে ফের তামাক ঠাসতে লাগল ফাদার ঘনশ্যাম নিশ্চিন্ত মনে, তিন-তিনটে মূর্তি অবিকল কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রইল সামনে। তিনজনেরই চোখ গোল-গোল, বিষম বিস্ময়ে তিনজনেরই চোয়াল ঝুলে পড়েছে, কথা গেছে আটকে।

বেশ বার-কয়েক ঢোক গিলে অবশেষে স্বরযন্ত্রকে সরব করল রাজীবলোচন, 'কিন্তু কেন?'

'ঠিক কথা। কেন? কেন সলিল মুখার্জি খুন করতে গেল স্যার প্রদ্যুম্ন মল্লিককে।' পাইপে তামাক ঠাসা হয়ে গেছিল ফাদার ঘনশ্যামের। এখন তা ধরিয়ে নিয়ে ফুকফুক করে বার-কয়েক টেনে নিয়ে বললে, 'কারণটা বলার সময় এখন হয়েছে। খুবই অন্যায়, বিরাট অপরাধ করেছেন সলিল মুখার্জি—জঘন্য এই ব্যাপারটার মূলে রয়েছে জঘন্যতম সেই অপরাধ এবং—' একটু থেমে, বারকয়েক পাইপ টেনে, 'স্যার প্রদ্যুম্ন মল্লিককে খুন করার চাইতেও কদর্য সেই অপরাধের কোনও ক্ষমা নেই।'

মুখ থেকে পাইপ নামাল পাদরি। সটান চাইল অলিম্পিয়ার মুখের দিকে। মুখভাব সিরিয়াস—কণ্ঠস্বরও তাই।

'অলিম্পিয়া, কথাটা এখনই শোনা দরকার তোমার। আমি জানি, ধাক্কা তুমি সইতে পারবে। সে মনের জোর তোমার আছে বলেই বলছি—নইলে বলতাম না। তুমি প্রায় পথে বসেছ বললেই চলে।'

'পথে?' ছুঁচের ডগার মতো সুর হল অলিম্পিয়ার নয়নতারকা।

'হ্যাঁ। মানে, পীতাম্বরের সঙ্গে তোমার আর বিশেষ তফাত নেই। রাজ-ঐশ্বর্য আর তোমার নেই। ফুঁকে উড়িয়ে দিয়েছে সলিসিটর সলিল মুখার্জি হাজাররকম বিজনেস অ্যাডভেঞ্চারে। পয়লা নম্বর জোচ্চোর, এক নম্বরের প্রতারক সলিল মুখার্জি। টাকার পাহাড় থেকে তোমাকে যে নামিয়ে আনা হয়েছে মাটির ওপর—এই তথ্যটাই কিন্তু এতগুলো রহস্যকে বুঝে ওঠার একমাত্র সূত্র। এই যে ভ্যাবা গঙ্গারামের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে পীতাম্বর, ওকে গিয়ে আমি শুধু সেই খবরটাই দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, রুপোর চামচ মুখে দিয়ে জন্মেও

এখন তুমি প্রায় পথের ভিখিরি। শুনেই বাঁই-বাঁই করে দৌড়ে এসেছিল তোমার পাশে দাঁড়াতে, বুক দিয়ে তোমাকে সাহায্য করতে, প্রাণ দিয়ে তোমার প্রাণে আশার আলো জ্বালাতে। অসাধারণ মানুষ এই পীতাম্বর।'

'দূর মশায়! কী ফালতু বকছেন!' রেগেমেগে বললে পীতাম্বর।

প্রশান্ত স্বরে বললে ফাদার ঘনশ্যাম, 'অথবা বলা যায় পীতাম্বর লোকটা প্রাগৈতিহাসিক দৈত্য—প্লেসিওসরাস অথবা ওই জাতীয় দানব। গুহামানবদের হৃদয়ও বোধ হয় এত নির্লিপ্ত, এত নির্দয় এবং এত উদাসীন ছিল না। টাকার পাহাড়ে অসীন স্ত্রীর সঙ্গে ঘর করতে সে চায়নি। বউয়ের টাকায় দু'বেলা খেয়ে-পরে থাকতে চায়নি। দু-বেলা বউয়ের মুখনাড়া খেয়ে শ্বশুরের ভিটেয় বসে ঘরজামাই হয়ে থাকতে চায়নি। গুহামানবেরও অধম। জঘন্য। বিচিত্র। তাই একেবারেই নির্লিপ্ত, উদাসীন হয়ে গেছিল তোমার ব্যাপারে। তাই অমন কিম্ভূতকিমাকার হয়ে থেকেছিল এতগুলো বছর। তাই তোমার ছায়া দেখলেও দূর থেকে সটকান দিত, পাছে টাকার ছায়ায় গায়ে ফোস্কা পড়ে যায়। কিন্তু যেই আমার মুখে শুনল পথে বসেছ তুমি, তোমার গা থেকে সরে গেছে টাকার ছায়া—অমনি প্রাণবন্ত হল চক্ষের নিমেষে—এতদিন ছিল জ্যান্ত মড়া—হঠাৎ হল জ্যান্ত প্রেমিক—পাঁই-পাঁই করে দৌড়ে এল গতর খাটিয়ে ভাবীবউকে সাহায্য করার আশ্বাসবাণী শোনাতে—সে যে চায় বউ খাবে তারই টাকায়—বউয়ের টাকায় সে খাবে না কোনওদিনই। এমন অদ্ভুত লোককে প্রাগৈতিহাসিক জীব ছাড়া আর কিছু বলা চলে কি? গুহামানবরাও এমন আহাম্মক ছিল কি? জঘন্য! অতি জঘন্য লোক এই পীতাম্বর।'

ফুক...ফুক...ফুক! তাল-তাল ধোঁয়া উড়ে গেল ফাদারের পাইপের গর্ত থেকে। নির্নিমেষে তার নির্বোধ আকৃতির দিকে চেয়ে রয়েছে তিন-তিনটে মূর্তি। নাক সিঁটকে রয়েছে কেবল পীতাম্বর। প্রাগৈতিহাসিক জীব অথবা গুহামানবের চাইতেও অধম বিশেষণ দুটো বোধহয় মন:পূত হয়নি।

ফিসফিস করে বললে অলিম্পিয়া, 'ফাদার, পীতাম্বরের চাইতেও জঘন্য লোক আপনি।'

'কেন? কেন? কেন?' যেন বিষম আহত হয়ে পাইপ নামিয়ে চশমার ফাঁক দিয়ে চেয়ে রইল ঘনশ্যাম পাদরি।

'বিপুল ব্যানার্জি পালিয়ে গেল কেন, তা তো বললেন না।'

'পালিয়ে গেল তুমি পথে বসেছ শোনামাত্র। মুখ থেকে কথাটা খসতে-না-খসতেই বেশ কিছুক্ষণ ডাঙায় ওঠা মাছের মতো খাবি খেয়েছিল অবশ্য। বড্ড বেশি স্বপ্ন দেখে ফেলেছিল কিনা—রাজা হবে রাজকন্যেকে বিয়ে করে, টাকার আণ্ডিল নিয়ে পৃথিবীটাকে চক্কর দিয়ে বেড়াবে—কত কী প্ল্যানই ঘুরঘুর করছিল মাথার মধ্যে। আকাশ থেকে মাটিতে পড়ায় ঘিলুটিলু দারুণ ঝাঁকুনি খাওয়ায় কিছুক্ষণ কিং...কিং—কী যেন কথাটা?'

'কিংকর্তব্যবিমূঢ়।' বললে অলিম্পিয়া।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারপরেই চটপটে ব্রেন চালিয়ে চকিতে কর্তব্য স্থির করে নিলে। এমতাবস্থায় কপর্দকহীন ভাবী বউকে ফেলেই চম্পট দেওয়া বিধেয়। যার টাকা নেই, সেরকম মেয়েকে বিয়ে করার মতো গোমূর্খ অন্তত নয় বিপুল ব্যানার্জি। ভয়ানক স্পিডে তাই ছুটে গেল বাড়ির মধ্যে—তারপর—'

'ভয়ানক স্পিডে পাঁচিল টপকে পালাল এমন জায়গায়, আমার নামও যেখানে পৌঁছবে না।' ভারি মিষ্টি গলায় বললে এবার অলিম্পিয়া, 'কিন্তু বাবাকে খবরটা কে দিয়েছিল শুনি? আপনি?'

'পাগল নাকি! কিন্তু এসব কথা হাওয়ার আগে ছোটে। কপর্দকহীন হয়েছেন, এ খবরটা পেয়েই ফিরে এসেছিলেন স্যার প্রদ্যুম্ন। ভারি রাগী মানুষ তো। রাগে ফুঁসতে-ফুঁসতে যাত্রার পোশাক পরেই চলেছিলেন সলিল মুখার্জির দফারফা করবেন বলে—পোশাক পালটানোর মতো মেজাজও ছিল না। হাবভাব দেখেই পীতাম্বর আঁচ করেছিল, নিশ্চয় বিরাট একটা গন্ডগোল হয়েছে। রাশভারী মনিবকে জিগ্যেস করার সাহসও নেই—অথচ গন্ডগোলটা জান দিয়েও মিটিয়ে ফেলার জন্যে আকুলিবিকুলি করছে বুকের ভেতরটা। কী করা উচিত ভেবে না পেয়ে দোনামোনা মনে ছুটছিল স্যার প্রদ্যুম্নর পেছন-পেছন। দেখে খটকা লেগেছিল বিপুল

ব্যানার্জির। দ্বিধাটা কেন, তা আঁচ করতে পারেনি। মনে-মনে হিরো হওয়ার বাসনা থাকে সব মানুষেরই—পীতাম্বরও হিরো হতে চেয়েছিল। সমুদ্রের ধারে ভেবেছিল একলাই রয়েছে —কেউ দেখতে পাবে না। তলোয়ার বার করে বাচ্চাছেলের মতো আস্ফালন জুড়েছিল তোমার বাবার পেছনে—দূর থেকে দেখে বিপুল ব্যানার্জি ভেবেছে, মনিবকেই কচুকাটা করতে চলেছে পীতাম্বর পাগলা—'

'খবরদার! পাগলা বলবেন না!' খ্যাঁক করে ওঠে পীতাম্বর।

মুচকি হাসে অলিম্পিয়া, 'চোপরাও! গুহামানবেরও অধম কোথাকার!—ফাদার, তারপর কী হল?'

'তোমার বাবা থানায় খবর পাঠিয়েছিলেন আগেই। তাই হনহন করে 'সবুজ মানুষ' চায়ের দোকানের দিকে আসছিলেন ইনসপেক্টর রাজীবলোচন—তাই তো?'

'হ্যাঁ।' বললে রাজীবলোচন।

'পীতাম্বর শেষমেশ আস্ফালনই করে গেছে, অগ্নিশর্মা মনিবের পেছন-পেছন আর যায়নি—গেলে খুনটা আটকানো যেত। গুহামানবদের অধম যারা—'

'তাদের বুদ্ধিও থাকে কম।' পাদপূরণ করল অলিম্পিয়া। 'কিন্তু আপনি জানলেন কী করে খুন করেছে সলিল মুখার্জি?'

'গোড়াতেই একটা বেফাঁস কথা বলে ফেলেছিল বলে। রাজীবলোচনবাবু এসে খবর দিলেন, জলে ডুবে মারা গেছেন স্যার প্রদ্যুম্ন মল্লিক। আমরা কিন্তু তখন জানি, উনি বাড়ি ফিরে আসছেন জলপথ যাত্রা স্থগিত রেখে। জলে ডুবে গেছেন—এই কথাটা শোনার সঙ্গে-সঙ্গে যে মৃত্যু-দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তা হল সমুদ্রের জলে ডুবে মৃত্যু। সেই দৃশ্য মনের মধ্যে নিয়েই আমি জিগ্যেস করেছিলাম—কখন? কিন্তু সলিল মুখার্জির মনের মধ্যে ভাসছিল অন্য মৃত্যু-দৃশ্য। উনি ফস করে জিগ্যেস করলেন, 'কোথায়?' অবান্তর প্রশ্নটা শুনেই বোঁ করে মাথাটা ঘুরে গেল আমার। সমুদ্র থেকে ফেরার পথে যে মারা যায়—সে তো সমুদ্রেই ডুবেছে ধরে নিতে হবে। তা সত্বেও উনি প্রশ্ন করলেন, মৃত্যুটা ঘটেছে কোথায়। তার মানে, উনি জানেন মৃত্যুর জায়গাটা—মানে, মৃতদেহটাকে যেখানে রেখে এসেছেন—সেই পুকুরটা—যার দূরত্ব সমুদ্র থেকে বেশি দূরে নয়। একটা জঘন্য খুনির পাশে বসে আছি জেনেই তৎক্ষণাৎ বমি-বমি পাচ্ছিল বলেই অমন ফ্যাকাশে মেরে গিয়েছিলাম। মৃতদেহটাকে সবুজ মানুষ বলে বসেছিলাম। সবুজ শ্যাওলায় সবুজ মৃতদেহটা সমুদ্রের সবুজ শ্যাওলায় সবুজ হয়ে গেলেই বরং ভালো ছিল—এই রকম একটা ইঙ্গিত করেছিলাম। সেই মুহূর্তে জেনে ফেলেছিলাম, স্যার প্রদ্যুম্নর ডেডবডি সবুজ পাঁকের মধ্যেই ঢুকিয়ে দিয়ে এসে ন্যাকা সাজছেন সলিল মুখার্জি। খুন করেছেন যে অস্ত্রটা দিয়ে, জ্ঞানপাপী বলে হাতও দিচ্ছেন না তাতে—

'কোন অস্ত্রটা বলুন তো?' সবিস্ময়ে জিগ্যেস করে রাজীবলোচন।

'যাচ্চলে। তাও দেখেননি? টেবিলে পাশাপাশি ছিল কালি-মাখা ধুলো-মাখা কলম আর চকচকে পরিষ্কার কাগজ-কাটা ছুরি—যা সরু ছোরার মতোই বুকের মধ্যে ঢুকে যেতে পারে চেপে বসিয়ে দিলেই। সলিল মুখার্জি কলমবাজ মানুষ—কথা বেচে আর কলম চালিয়ে রোজগার করেন—ছুরি চালনা নিশ্চয় তাঁকে মানায় না। কিন্তু কাজের ফাঁকে-ফাঁকে অন্যমনস্ক থাকলে, চকচকে কাগজকাটা ছুরি নিয়ে নাড়াচাড়া করে না, এমন কাউকে দেখাতে পারেন? সলিল মুখার্জি কিন্তু সদ্য পরিষ্কার করা ছুরিটাতে আঙুল না ছুঁইয়ে ধুলো আর কালি-মাখা কলম দিয়েই নাড়াচাড়া করে যাচ্ছিলেন সমানে। ছুরি থেকে রক্তের দাগ ধুয়ে ফেললেও মন থেকে তো ধুতে পারেননি, কাজেই—'

সলিল মুখার্জি সেই দিনই নিজের ব্রেন উড়িয়ে দিয়েছিল রিভলভারের গুলিতে— রাজীবলোচন হাতকড়া হাজির করার আগেই।

ঠিক সেই মুহূর্তেই পুরোনো দিনের মতোই সমুদ্রসৈকতে ছেলেখেলা করতে দেখা গিয়েছিল দুটি মূর্তিকে।

পীতাম্বর আর অলিম্পিয়া।

বিদেশি ছায়ায়

* 'রোমাঞ্চ' পত্রিকায় প্রকাশিত।

ইফেল টাওয়ার বিক্রি হয়ে গেল

জোচ্চোরদের জগতে কাউন্ট ভিক্টর লাসটিগ একটা বিস্ময়। একটানা বিশ বছর ধরে সে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছে দু-দুটো মহাদেশের বাঘা-বাঘা পুলিশ অফিসারদের। আশ্চর্য তার প্রতিভা। তার বৈষ্ণব-বিনয় দুঁদে রাষ্টদূতকেও লজ্জা দেয়; তার অভিনয় দক্ষতা শ্রেষ্ঠ অভিনেতাকেও তটস্থ করে। তার বুকের পাটা বনের বাঘকেও হার মানায়।

কাউন্ট ভিকটর লাসটিগ কখনও কারও নকল করেনি। তার মৌলিক কুকীর্তির শ্রেষ্ঠ নজির হল প্যারিসের ইফেল টাওয়ার বিক্রি। এতবড় প্রতারণা জোচ্চুরির ইতিহাসে বিরল।

ইফেল টাওয়ার বিক্রির পুরো ফন্দিটা লাসটিগের মাথায় এসেছিল খবরের কাগজ পড়তে-পড়তে।

লাসটিগের হাতে তখন কোনও কাজ নেই। সাতদিনও হয়নি নোট-নকলের ম্যাজিক বাক্স বিক্রি করে এক হঠাৎ বড়লোককে পথে বসিয়ে প্যারিসে পালিয়ে এসেছিল লাসটিগ। হাতে মেলাই টাকা। অফুরন্ত সময়। কাজের মধ্যে শুধু ফুটপাতের কাফেতে বসে ভারমুথ খাওয়া আর হাই তুলতে-তুলতে কাগজ পড়া। সঙ্গে রয়েছে পাপকাজের দোসর ড্যাপার ড্যান কলিনস। বাইরের লোকের কাছে তার পরিচয় অবশ্য কাউন্ট ভিকটর লাসটিগের প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসেবে।

লাসটিগের কুঁড়েমি দেখে কলিনস যখন তিতিবিরক্ত, ঠিক তখুনি খবরের কাগজটা ভাঁজ করে এগিয়ে দিল কাউন্ট।

বলল, 'শিকার পাওয়া গেছে। কে টোপ গিলবে, এখুনি তা বলতে পারব না। তবে তার ধান্দা জেনো পুরোনো জং-ধরা লোহা কেনাবেচা। শাঁসালো পার্টি। দু'পয়সা আছে। তক্কেতক্কে রয়েছে নতুন দাঁও পেটবার তালে। নাও, পড়ো।'

বলে, একটা বিশেষ প্রবন্ধ দেখিয়ে দিল লাসটিগ। তাতে লেখা আছে, ইফেল টাওয়ারের যা ঝরঝরে অবস্থা, তাতে শুধু মেরামতি কাজেই হাজার ফ্রাঁ খরচ হবে। তাই গভর্নমেন্ট ভাবছে, খামোকা ঠাট বজায় না রেখে ওটাকে ভেঙে ফেললেই ল্যাটা চুকে যায়। খরচও অনেক কম হয়।

চোখ কপালে তুলে ড্যাপার ড্যান বলল,—'অসম্ভব। এ কাজ আমাদের দ্বারা হবে না। তোমার মাথা খারাপ হয়েছে?'

'মোটেই অসম্ভব নয়। শক্ত কাজটা খবরের কাগজওয়ালারা আমাদের হয়ে সেরে দিয়েছে। এখন দরকার শুধু সরকারি শিলমোহর আর চিঠির কাগজ। তা নিয়ে ভেবো না। আমার এক বন্ধু আছে, চাইলেই পাঠিয়ে দেবে। এবার গা তোলো, কাজে নামা যাক।'

দিনকয়েক পরে প্যারিসের পাঁচজন কালোয়ারের কাছে সরকারি চিঠি পৌঁছে গেল। চিঠি লিখছেন এমন এক ডেপুটি ডিরেক্টর-জেনারেল ইফেল টাওয়ার যার এখতিয়ারে পড়ে। পাঁচজনকেই তিনি নেমন্তন্ন করেছেন সরকারি চুক্তি সম্পর্কে কথাবার্তা বলার জন্যে। সময় : শুক্রবার। বেলা তিনটে। স্থান : ক্রিলন হোটেলে ডেপুটির স্যুট।

যথাসময়ে এল পাঁচজনে। লাসটিগ বললে, 'মঁসিয়েরা মন দিয়ে শুনুন। প্রধানমন্ত্রী আর প্রেসিডেন্ট ছাড়া এ গোপন খবর আর কেউ জানে না।'

এই পর্যন্ত বলে নাটকীয় ভাবে একটু বিরতি দেওয়া হল। চাট্টিখানি ব্যাপার নয়তো। ক্লাইম্যাক্স সৃষ্টি না করলে কদর পাওয়া যাবে না। সবার কৌতূহল যখন তুঙ্গে, তখন থেমে-থেমে বলল—'গভর্নমেন্ট ঠিক

করেছে, ইফেল টাওয়ার ভেঙে ফেলবে।'

আবার থামল লাসটিগ। তারপর বলল, 'মন খারাপ হওয়ার মত খবরই বটে। কিন্তু ভেঙে ফেলা ছাড়া আর পথও নেই। টাওয়ার মেরামতের খরচ তো কম নয়। কাগজে তো দেখেছেনই। ইফেল টাওয়ার তৈরি হয়েছিল ১৮৮৯ সালে প্যারিস প্রদর্শনীর আকর্ষণ হিসেবে। তখন কিন্তু শহরের বুকের ওপর বারো মাস টাওয়ার খাড়া রাখবার কোনও প্ল্যান ছিল না। রুচি যাদের সূক্ষ্ম, তাঁরা তো গোড়া থেকেই রাগারাগি করে এসেছেন টাওয়ারের ছিরিছাঁদ দেখে। প্যারিসের মত শহরে এ টাওয়ার একেবারেই বেমানান। আপনারাই বলুন মানায় কিনা।'

কাউন্টের পাঁচ মক্কেলের অতশত রুচিবোধ না থাকলেও মুনাফা লোভ ছিল বিলক্ষণ। কাজেই পাঁচজনেই একবাক্যে রায় দিল, অবিলম্বে ইফেল টাওয়ারকে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া উচিত।

লাসটিগ তখন পাঁচ মক্কেলকে নিয়ে টাওয়ার পরিদর্শনে বেরুল। বুঝিয়ে দিলে, যে টাওয়ার তৈরি করতে সত্তর লক্ষ ফ্রাঁ লাগে, তার ভাঙা লোহা বেচলেও কম মুনাফা হয় না। ভাঙা লোহার মোট ওজন দাঁড়াবে সাত হাজার টন। ঝানু ব্যবসাদারের মত কড়ি বরগার মোট সংখ্যা, প্রতিটির চুলচেরা মাপ, এমনকী ওজন পর্যন্ত বলে গেল গড়গড়িয়ে। সবশেষে বলল, ক্রেতারা যেন আগামী বুধবারের মধ্যে শিলমোহর করা টেন্ডার হোটেলের ঠিকানায় পৌঁছে দেয়। একথাও যেন মনে থাকে, বিষয়টা গভর্নমেন্ট সিক্রেট। অত্যন্ত গোপনীয়। পাঁচকান না হয়।

আসল শিকার কে হবে, সেটা অবশ্য আগেই আঁচ করে নিয়েছিল লাসটিগ। নাম তার আঁদ্রে পয়সন। চাষার ছেলে। সমাজে পাত্তা পায় না। তাই মরিয়া হয়ে পণ করেছে, ঝটপট আরও টাকা কামিয়ে নাক উঁচুদের মুন্ডু ঘুরিয়ে দিয়ে সমাজে গ্যাঁট হয়ে বসতে হবে।

টেন্ডার বুধবারের আগেই এসে গেল। বেস্পতিবার ড্যাপার ড্যান আঁদ্রে পয়সনকে গিয়ে বলে এল, তিনিই সবচাইতে বেশি দাম হেঁকেছেন। সুতরাং এক সপ্তাহের মধ্যেই টাকা জোগাড় করে ফেলল আঁদ্রে পয়সন। আবার গেল ড্যাপার ড্যান। খবর দিল, লাসটিগের হোটেল স্যুটে আর একটা মিটিং হবে এই নিয়ে। ফিরে এসে বলল লাসটিগকে—শিকার ভড়কেছে মনে হচ্ছে। জিগ্যেস করছিল, সরকারি ব্যাপারে দপ্তর ছেড়ে হোটেলে কেন?

শুনে মোটেই ভড়কালো না ফিচেল শিরোমণি লাসটিগ। বলল, 'বেশ তো, আমরা যে সত্যি সত্যিই সরকারি অফিসার, সেটা প্রমাণ করে দিলেই তো মনে আর ধাঁধা থাকে না। সে ভার আমার।'

যথাসময়ে এল শাঁসালো পার্টি। সোল্লাসে বলল লাসটিগ, 'মঁসিয়ে পয়সন, অভিনন্দন নিন। আসুন, আপনার সৌভাগ্যলক্ষ্মীর সম্মানে আগে এক গেলাস মদ খাওয়া যাক।'

'কনট্র্যাক্টটা আগে সই করলে হয় না?' আমতা-আমতা করল পয়সন।

'তাও তো বটে। আগে কাজ, পরে মদ্যপান,' বলে কলিনস-এর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল লাসটিগ, 'তুমি আপিসে যাও। তিনটের সময়ে আমি আসছি।'

কলিনস চৌকাঠ পেরোতে না পেরোতেই মুখের চেহারা পালটে গেল লাসটিগের। উবে গেল অফিসারি দাপট। কাঁচুমাচু মুখে বলল—'আপনাকে ডেকেছি একটা রফা করার জন্যে। সরকারি অফিসারদের হাঁড়ির হাল কেনা জানে বলুন। ঠাটঠমক বজায় রাখতেই মাইনের টাকা ফুটকড়াই হয়ে যায়। তাই রেওয়াজ দাঁড়িয়ে গেছে চুক্তি সই করার আগে অফিসারদের—'

'ঘুষ দিতে হয়?' ফস করে বলে ফেলল পয়সন।

'মঁসিয়ে দেখছি দারুণ ঠোঁটকাটা!'

'সেইজন্যেই বুঝি আপিসে না ডেকে বারবার হোটেলে ডাকাচ্ছেন?'

'যা বলেন,' কাষ্ঠহাসি হাসল লাসটিগ।

হঠাৎ নিজেকে 'কী-হনু' মনে হল পয়সনের। ঘুষখোর জাঁদরেল অফিসারের তুলনায় নিজেকে কেউকেটা ঠাউরে নিল। বিজ্ঞের হাসি হেসে বললে, 'দেখুন মঁসিয়ে, আমাকে গেঁইয়া ভাববেন না। এসব কাজে আমি পোক্ত। বলে, এক পকেট থেকে বার করল সার্টিফাই করা একটা চেক। আর এক পকেট থেকে নোটঠাসা মানিব্যাগ। স্মিতমুখে আবার মদের গেলাস এগিয়ে ধরল লাসটিগ। একঘণ্টার মধ্যেই পয়সনের চেক ভাঙিয়ে লাসটিগ কেটে পড়ল অস্ট্রিয়ায়।

মাসখানেক ভিয়েনার সেরা হোটেলে খুব ফুর্তি করল দুই জোচ্চোর—লাসটিগ আর কলিনস। সেইসঙ্গে তন্নতন্ন করে পড়ল প্যারিসের সবকটা দৈনিক। একমাস পর লাসটিগ বলল, 'ওহে কলিনস, বোকাপাঁঠা পয়সন তো দেখছি পুলিশের ছায়াও মাড়াল না। বুঝেছি, কেন। লজ্জা হয়েছে। আহাম্মুকি চেপে যেতে চাইছে, পুলিশকে জানানো মানেই ঢেঁড়া পিটে নিজের বোকামো জাহির করা। এদিকে ইফেল টাওয়ারের দখলও নিল না। তাই ভাবছি, আরেকবার টাওয়ার বেচলে কেমন হয়?'

সত্যি সত্যিই আবার মোটা দামে ইফেল টাওয়ার বেচে দিল লাসটিগ।

তৃতীয়বার বেচবার জন্যে খদ্দের খুঁজছে, এমন সময় দু'নম্বর শিকার এমন হায়-হায় করে উঠল যে পিঠটান দেওয়া ছাড়া পথ রইল না কাউন্ট ভন লাসটিগের।

*'মাসিক গোয়েন্দা' পত্রিকায় প্রকাশিত। শারদীয় সংখ্যা, ১৩৭৯।

মূর্তি জালিয়াতির চালিয়াতি

কাহিনিটা ২৫ বছরের পুরোনো। একাদশ শতাব্দীর শিবপুরম নটরাজ মূর্তি স্মাগলড হয়ে পৌঁছেছিল আমেরিকায়। 'পঞ্চলোহা' মূর্তিটার ওজন পঞ্চাশ কিলোগ্রাম। ১৯৫৬ সালে তাকে উদ্ধার করা হয় মৃত্তিকার তলদেশ থেকে। স্ট্যাচুটি মেজেঘষে ঝকঝকে সুন্দর করে দেওয়ার গুরুদায়িত্ব দেওয়া হল এক মূর্তি কারিগরকে। ধুরন্ধর কারিগরটি অভিনব উপায়ে প্রতারণা করলেন কর্তৃপক্ষকে—আসল দিলেন বেচে। একটা হুবহু নকল বানিয়ে ফেরত দিলেন স্ট্যাচু মালিককে।

কিন্তু কারও চোখে ধরা পড়ল না এতবড় জালিয়াতি। পরপর বারোজন ভারতীয়র হাতবদল হল জাল মূর্তি। কারিগর বেচেছিলেন পাঁচ হাজার টাকায়। হাতবদল হতে-হতে সেই মূর্তির দাম গিয়ে দাঁড়াল পাঁচ লক্ষ টাকায়। বিপুল অঙ্কের দামটি পকেট থেকে বার করল এমন এক কারবারি যার বিলক্ষণ সুনাম আছে 'হন্ট স্ট্যাচু' কেনাবেচায়।

নিউইয়র্কের এক সংগ্রাহক মূর্তিটি হাতে পেয়ে আনন্দে উল্লসিত হয়ে তো বলেই ফেললেন—পাঁচ লক্ষ রুপেয়া এর দামই নয়—হওয়া উচিত নব্বই লক্ষ।'

মূর্তিটি বর্তমানে রয়েছে সাইমন নর্টন ফাউন্ডেশনে। তারা কত দাম দিয়েছিল 'হন্ট স্ট্যাচু'টির মালিক হওয়ার জন্যে, তা অবশ্য এখনও জানা যায়নি—কোটির ওপর তো বটেই।

কিন্তু আমেরিকা এক আশ্চর্য দেশ। অন্যদেশের সম্পত্তি চুরি করে এনে হজম করবে দেশের একটা নামী সংস্থা, তা জেনেশুনে চোখ বুজে থাকার পাত্র তারা নয়। প্রতিবাদের ঝড় উঠল দেশময়। ইন্ডিয়া হলে পাবলিকের আপত্তিতে বয়ে যেত যে-কোনও মূর্তি সংগ্রাহকের, কিন্তু সাইমন নর্টন ফাউন্ডেশন শেষপর্যন্ত রাজি হল চোরাই মাল ফিরিয়ে দিতে।

কিন্তু ধুরন্ধর ইন্ডিয়ান কারিগরকে তো আর বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। আরও চারটে অনুরূপ বিগ্রহ তাকে দেওয়া হয়েছিল মাজাঘষার জন্যে—তাদের কপালে কী জালিয়াতি ঘটেছে, কে এখন সে রহস্যের সমাধান করবে? ডিটেকটিভ কোথায়? ফেলুদা, ব্যোমকেশ, ইন্দ্রনাথ-কিরীটির তলব তো এখনও পড়েনি।

এই একটি ঘটনা থেকেই অ্যান্টিক সামগ্রী দেখলেই এখন সমঝদার ব্যক্তিরা আঁতকে উঠছেন। আসল কি নকল যাচাই করবে কে? মিউজিয়ামে এমনি অ্যান্টিকের তো পাহাড় জমে রয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে কোনটা জাল, কোনটা আসল চীজ—তা কে জানছে? চুরি যেমন ধরা পড়ছে না, জালিয়াতিও তেমনই ধরাছোঁয়ার বাইরে!

আশ্চর্য, নয় কী?

পুরীর জগন্নাথ মহাপ্রভুর হিরের চোখ চুরি হয়ে গেল যখন, তখন ছোটখাট মন্দির দেবালয়ের লুঠতরাজের কাহিনি দেশবাসীর কানে আদৌ কি পৌঁছোচ্ছে? ১৯৭৩ সালের আর্টস অ্যান্ড অ্যান্টিকুইটিস অ্যাক্ট-য়ের যথা প্রয়োগ করার লোক কোথায়? তা না হলে চিতোরগড় অস্ত্রাগারে এমার্জেন্সির সময়ে সংরক্ষিত একশোটা মূল্যবান বিগ্রহ হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে কেন? কর্তৃপক্ষের টনক নড়ল মাত্র গতবছর, যখন বিগ্রহ-মালিক মূর্তিগুলো ঘষামাজার জন্যে চেয়ে পাঠালেন দরখাস্ত মারফৎ।

যাক সে কথা, নটরাজ-জালিয়াত ভদ্রলোক নকল-মূর্তি বানানোর এমন খাসা কায়দাটি নিজেই উদ্ভাবন করেছিলেন, না, ভুবন কাঁপানো ঠিক এই ধরনের আর একজন জালিয়াতকে গুরু বলে মেনে নিয়েছিলেন, সেই আলোচনাই এখন করা যাক—কাগুজে-গোয়েন্দাগিরিও বলতে পারেন।

চলুন, সময়ের সড়কে অতীত ভ্রমণে যাওয়া যাক।

সালটা ১৯২০। রোম শহর। আপনি দাঁড়িয়ে আছেন (অদৃশ্য অবস্থায় অবশ্য) একটা খুদে স্টুডিওর মধ্যে। কৃষ্ণনগরে মূর্তি কারিগরদের স্টুডিও দেখেছেন? হুবহু সেই রকমই এই স্টুডিওটি। সমাপ্ত, অর্ধসমাপ্ত মূর্তি এবং বিস্তর পাথরের স্তূপ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে ছোট্ট স্টুডিওটিতে।

ছেনি হাতুড়ি নিয়ে তন্ময় হয়ে খটাং-খটাং করে মূর্তি খোদাই করে চলেছেন ওই যে শিল্পীটি, ওঁর নাম অ্যালসিও ডোসেনা। ইটালিয়ান। নামী শিল্পী নন। আসলে উনি পাথর খুদে নতুন-নতুন বাড়ির কার্নিশ তৈরি করে পেট চালাতেন। এখন তাঁর ভাবনাচিন্তা উধাও হয়েছে কয়েক শতাব্দী পেছনে। বাটালির এক-এক কোপে প্রবেশ করছেন ফ্যানট্যাসি দুনিয়ার আরও গভীরে। নিজেকে এখন লিওনার্ডো দ্য ভিন্সির জায়গায় বসিয়েছেন। এরপর অবশ্য হবেন মাইকেল এঞ্জেলো—হবেন গ্রেট রেনেসাঁ যুগের আরও অনেক ভাস্কর—যাঁদের কীর্তি তিনি জানেন এবং ভালোবাসেন।

অস্থিরতার শুরু এই ভাবনাচিন্তা ভালোবাসা থেকেই। কার্নিশ তৈরির কাজ একদিন নিক্ষেপ করলেন—দূর, দূর। এর মধ্যে সৃষ্টির আনন্দ কোথায়! এক-ডেলা মার্বেল পাথরের ওপর ঝুঁকে পড়লেন বাটালি হাতুড়ি নিয়ে। শুরু হয়ে গেল খোদাই কর্ম। ফ্যানটাসি স্বপ্নে মশগুল থাকায় তখন কিন্তু জানতেনও না যে, অজান্তে যে পথ উনি ধরলেন, সেই পথেই অচিরে তাঁর বরাতে নাচছে বিশ্বব্যাপী কুখ্যাতি।

দীর্ঘ আট বছর ধরে খ্যাতির স্বপ্নজগতে বিচরণ করলেন পাথর রাজমিস্ত্রি। ডজন-ডজন অপরূপ সুন্দর খোদাই বানিয়ে গেলেন খুদে কারখানায়। তারপরেই ১৯২৮ সালের যাচ্ছেতাই এক নভেম্বর দিবসে যেন প্রচণ্ড ভূমিকম্পে নড়ে উঠল শিল্প-দুনিয়া : নিউইয়র্ক, ক্লিভল্যান্ড, বোস্টন, রোম, বার্লিন এবং মিউনিখের কর্তৃপক্ষরা আঁতকে উঠল ভয়াবহ একটা সংবাদে—বহু কষ্টে সংগ্রহ করা তাঁদের অধিকাংশ অমূল্য খোদাই শিল্পই নাকি জাল-কার্নিশ মিস্ত্রীর নির্দোষ সাধনার ফলশ্রুতি অনুপম শিল্প নিদর্শন ঢুকে বসে আছে মিউজিয়ামে মিউজিয়ামে!

বিশ্ববন্দিত গুরুদেবদের মহান শিল্পকর্ম বছরের পর বছর খুঁটিয়ে দেখেছিলেন ডোসেনা। বিশেষ করে একজন আর্টিস্ট তাঁর চিন্তাজগতে আলোড়ন তুলেছিল সবচেয়ে বেশি—নাম তার সাইমন মার্টিনি—চতুর্দশ শতাব্দীর চিত্রশিল্পী।

মার্টিনি কিন্তু পাথর নিয়ে কোনওদিন কাজ করেননি। ডোসেনা মার্টিনির ক্যানভাসে আঁকা শক্তিশালী চিত্রকর্ম দেখতে-দেখতে কল্পনারঙিন চোখে দেখেছিলেন, মার্টিনির হওয়া উচিত ছিল ভাস্কর। চোখ বন্ধ করে ডোসেনা যেন স্পষ্ট দেখতে পেতেন ছ'শো বছর আগে মার্বেল খোদাই করে মার্টিনি সৃষ্টি করছেন সারি-সারি অদ্ভুত সুন্দর মূর্তি।

সৃষ্টির প্রেরণা অথবা আইডিয়ার ঝলক তো এমনি করেই উন্মত্ত করে তুলেছে শিল্পীদের যুগ-যুগ ধরে। ডোসেনাই বা বাদ যান কেন! পরিত্যক্ত পাথর খাদে আর প্রহরাহীন ধ্বংসস্তূপে ঘুরে-ঘুরে ডোসেনা শেষপর্যন্ত সংগ্রহ করলেন শিরাসমৃদ্ধ উৎকৃষ্ট মার্বেল পাথর—ঘর বোঝাই করে ফেললেন এই পাথরে। রেনেসাঁ যুগের ভাস্কররা যে-পাথর নিয়ে কালজয়ী সৃষ্টি করে গেছেন, এ সেই পাথর। তারপর মার্টিনি যে স্টাইলে পেন্টিং করেছেন, হুবহু সেই স্টাইলের অনুকরণে নিপুণ হাতে খোদাই করলেন অতীব সুন্দর একটা ম্যাডোনা ও শিশুমূর্তি।

এরপর রেনেসাঁ যুগের অন্যান্য যেসব শিল্পীদের মনে-মনে পূজা করেছেন ডোসেনা, তাঁদের বিশেষ কায়দা অনুকরণ করলেন এবং হুবহু সেই স্টাইলে সৃষ্টি করলেন চমকপ্রদ স্ট্যাচুর পর স্ট্যাচু।

নিজের কীর্তি দেখে নিজেই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ডোসেনা। আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেতেই সাহসও বাড়ল। সময়-পথে পেছিয়ে গেলেন আরও পেছনে। গ্রিক ধ্বংসস্তূপ ছিল আশেপাশেই। সেখান থেকে মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করেছিলেন এমন সব মার্বেল পাথর যা ব্যবহার করা হয়েছে এথেন্সের মতো গৌরবময় যুগে। এইসব

মার্বেল খুদে সূক্ষ্ম মূর্তির-পর-মূর্তি বানালেন, যা দেখলেই মনে হবে গ্রিসদেশের স্বর্ণযুগ ফিরে এসেছে—প্রতিটি মূর্তি যেন খোদিত হয়েছিল সেই সময়ে।

পাথর-মিস্ত্রির কারখানা ধীরে-ধীরে মিউজিয়ামের রূপ নিতে লাগল এইভাবেই। কোণে-কোণে খাড়া রইল পঞ্চাদশ শতাব্দীর সমাধি মন্দিরের খোদিত অংশ—কে বলবে পঞ্চদশ শতাব্দীতে নয়—আসল জিনিসের সঙ্গে তফাত নেই কোথাও; রইল চতুর্দশ শতাব্দীতে নির্মিত প্রদীপের তৈলাধারের নকল আর গ্রীক দেবীমূর্তি।

সৃষ্টির খেয়ালেই বুঁদ হয়েছিলেন ডোসেনা—বিক্রি করার কোনও চেষ্টাই করেননি। কিন্তু একদিন পাথর-মিস্ত্রীর রেনেসাঁ স্ট্যাচু দেখতে এলেন আলফ্রেডো ফাসোলি নামে এক অ্যান্টিক ডিলার। প্রাচীনকালের দুষ্প্রাপ্য ললিতকলার সামগ্রী বেচাকেনাই তাঁর ব্যবসা। কাজেই চেনবার চোখ তাঁর ছিল। নকল মূর্তি দেখে তো তাঁর চক্ষু চড়কগাছ। কিন্তু মহাধুরন্ধর বলেই উত্তেজনার প্রকাশ ঘটতে দিলেন না চোখেমুখে। বললেন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে, 'দূর! দূর! এসব জিনিসের আবার বাজার আছে নাকি! তবে আপনি যদি চান, এখানকার বোঝা খানিকটা কমিয়ে দিতে পারি—সস্তায় যদি দিতে পারেন, তবেই।'

ডোসেনা বেচারি জানবেন কী করে চতুর ফাসোলির মাথার মধ্যে তখন ঘুরছে অন্য প্ল্যান? তাই রাজি হয়ে গেলেন এককথায়। পাথর-মিস্ত্রির একটা খোদাই মূর্তি নিয়ে ফাসোলি গেলেন তাঁরই এক সতীর্থের কাছে। এঁর নাম পালেসি—আন্তর্জাতিক আর্ট মার্কেটে দারুণ নাম—একডাকেই সবাই চেনে। দুই ধুরন্ধর বিহ্বল চোখে অনিমেষে চেয়ে রইলেন অনিন্দ্যসুন্দর স্ট্যাচুটির প্রতিটি খাঁজ, ভাঙাচোরা, ফাটাফুটো, রং জ্বলে যাওয়া অংশের দিকে—সবই যেন আসলের ভাঙচোর এবং বিবর্ণতা! বহু শতাব্দী পরে সব মূর্তিতেই যা দেখা যায়। মূর্তি বেচে লাভের অঙ্কও ভেসে উঠল চোখের সামনে।

রোমের একটা মিউজিয়ামে বিক্রির জন্য হাজির করা হল সেই স্ট্যাচু। মিউজিয়ামের অফিসাররা মূর্তি দেখেই বললেন, 'উঁহু, এ যে জাল মনে হচ্ছে!' বুক ধড়াশ-ধড়াশ করতে লাগল দুই প্রবঞ্চকের। তলব পড়ল মূর্তি বিশেষজ্ঞদের। তারা খুঁটিয়ে দেখে রায় দিল একবাক্যে—'আসলি চিজ!'

আনন্দে নেচে উঠলেন প্রতারক-যুগল। আর্ট এক্সপার্টদের কথার ওপর আর তো কথা বলা যায় না। মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ মোটা দাম মিটিয়ে দিলেন এমন একটা আসলি চিজ সংগ্রহ করে আনার জন্যে।

ডোসেনাকে অবশ্য বলা হল, সস্তার নকলি চিজ হিসেবে বিকিয়ে গেছে মূর্তিটা—দাম পাওয়া গেছে সামান্যই। খানকয়েক নোট জুটল তার বরাতে! সামান্য টাকা পেয়ে আনন্দে আটখানা হয়েই ফাসোলির ফাঁদে পা দিলেন ডোসেনা। ওঁর সমস্ত খোদাইকর্মের একমাত্র বিক্রয়স্বত্ব চাইলেন অসৎ আর্ট ডিলার ফাসোলি। কৃতজ্ঞচিত্তে তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলেন পাথর-মিস্ত্রি। তাঁর এই সামান্য শিল্পকর্মে এত আগ্রহ দেখেই তিনি ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছিলেন— অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করার বুদ্ধি হারিয়েছিলেন সেই কারণেই। ফলে রেনেসাঁ আমলের অকৃত্রিম শিল্প নিদর্শন হিসেবে চালিয়ে দেওয়া হল ডোসেনার আরও অনেক স্ট্যাচু—সারা ইউরোপের মিউজিয়াম আর প্রাইভেট সংগ্রাহকরা কাড়াকাড়ি করে নিয়ে গেল সেগুলো। প্রতিবারেই সামান্য টাকা গুঁজে দিয়ে গেলেন ফাসোলি পাথর-মিস্ত্রির হাতে, সেই সঙ্গে শুনিয়ে গেলেন হাড় কালি হয়ে যাচ্ছে তাঁর নকলি চিজ বেচতে গিয়ে—নকলের দর কি বেশি পাওয়া যায়? ডোসেনা ঘুণাক্ষরেও কিছু সন্দেহ করলেন না—প্রশ্নও করলেন না! উলটে আরও উৎসাহিত হয়ে একটার পর একটা মাস্টারপিস উৎকীর্ণ করে গেলেন বাটালি-হাতুড়ি দিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত।

বিশ্বের বহু বিখ্যাত মিউজিয়াম ধোঁকা খেয়ে গেল ডোসেনার গ্রিক আর রেনেসাঁ ললিতকলার নিদর্শন চড়া দামে কিনে। নিউইয়র্ক সিটির মেট্রোপলিটান মিউজিয়াম অফ আর্ট কিনেছিল একটা গ্রীক কুমারীর প্রস্তরমূর্তি—যার বয়স নাকি খ্রিস্টপূর্ব ৫০০! ক্লিভল্যান্ড মিউজিয়াম বর্তে গেল ম্যাডোনা এবং শিশুর একটা দারুণ মূর্তি পেয়ে—এ মূর্তির স্রষ্টা নাকি জিওভানি পিসানো; চতুর্দশ শতাব্দীর প্রাত:স্মরণীয় এই ভাস্করের পাথরের কাজ এতকাল অনাবিষ্কৃতই ছিল! বোস্টনের মিউজিয়ামে অফ ফাইন আর্টস তো ঊর্ধ্ববাহু হয়ে নৃত্য করতে

বাকি রেখেছিল রেনেসাঁ ভাস্কর মিনো দ্য ফিসোল নির্মিত একটা পাথরের শবাধার পেয়ে! পরে যখন ধোঁকাবাজি ধরা পড়ল, তখনও কিন্তু বোস্টন মিউজিয়ামের এক মুখপাত্র মন্তব্য করেছিলেন—'হোক জালিয়াতি, এমন জিনিস সাজিয়ে রাখতে ইচ্ছে যায়। বড় সুন্দর! বড় সুন্দর! যে-ই করুক না কেন, তাতে কিসসু এসে যায় না।'

এই তো সেদিন ১৯৫৮ সালে, কয়েকজন আর্ট এক্সপার্ট বলে বসলেন, সেন্ট লুই মিউজিয়ামে পরম যত্নে সংরক্ষিত 'ডায়ানা উইথ ফন' প্রস্তরমূর্তিটাও নাকি ডোসেনার স্টুডিওতে তৈরি হয়েছে। কিন্তু তাতেও কি চৈতন্য হয় মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষের! সঙ্গে-সঙ্গে একান্ন পৃষ্ঠার ইয়া লম্বা একখানা প্রতিবেদন ছাপিয়ে তাঁরা ছড়িয়ে দিলেন বিশেষজ্ঞ মহলে— জিনিসটা বিলকুল খাঁটি, তার স্বপক্ষে হাজার-হাজার যুক্তি প্রমাণ হাজির করে সযত্নে স্ট্যাচুটাকে সাজিয়ে রাখলেন মিউজিয়ামের স্ফটিক-আধারে!

এ তো বড় তাজ্জব কি বাত! তাবড়-তাবড় শিল্প-বিশেষজ্ঞরা বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতম কলকবজার ব্যবহার সত্বেও ডোসেনার শিল্পকর্মে জালিয়াতি ধরতে পারলেন না কেন? কেন বারে বারে ধোঁকা তো খেলেনই, উলটে জাল জিনিসকেই আসল প্রমাণ করার জন্যে কোমর বেঁধে লাগলেন?

কারণ একটাই। তাঁর আগে কোনও জালিয়াত যা কখনও করেননি, উনি তাই করেছেন। প্রতিটি শিল্পকর্মের মধ্যে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছেন। নিবিড় নিষ্ঠা সহকারে অত্যুৎকৃষ্ট ললিতকলা সৃষ্টি করেছেন—জাল করবেন বলে করেননি, সৃষ্টি করবেন বলেই করেছেন। সৃষ্টির আনন্দে সৃষ্টি বলেই তাঁর সৃষ্টিকে আসল বলে সোচ্চার হয়েছে ধোঁকা খাওয়া মানুষগুলো।

শোনা যায়, ডোসেনা নাকি একটা গুপ্ত রসায়ন আবিষ্কার করেছিলেন। পাথর ফুঁড়ে কেমিক্যালটা প্রবেশ করত ভেতরে এবং পাথরের গায়ে মাটির দাগ ফুটিয়ে তুলত এমন নিখুঁতভাবে যে দেখেই মনে হত যেন মহাকালের নিষ্ঠুর হস্তক্ষেপে কালজীর্ণ হয়েছে মূর্তিগুলো।

আরও একটা কারণ আছে বইকি। খোদাই কর্মগুলোকে যথাবিহিতভাবে যাচাই করেনি বেশিরভাগ মিউজিয়াম।

সবচেয়ে বড় কারণ কিন্তু ওই একটাই। খুঁটিয়ে পরীক্ষা সত্বেও নকলকে নকল বলে চেনা যায়নি কেননা নকল-মাস্টার অ্যালসিও ডোসেনা ছিলেন বাস্তবিকই প্রতিভাধর—জিনিয়াস।

জিনিয়াস হলেও সৃষ্টিকর্মগুলো তো আসল নয়। কাজেই এমন জিনিস ফেরি করতে বেরিয়ে পরিণাম সম্বন্ধে সতর্ক হয়ে রইলেন ফাসোলি আর তাঁর প্রবঞ্চক সতীর্থ। কোনও স্ট্যাচু সম্বন্ধে কোনও মিউজিয়াম সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেই সঙ্গে-সঙ্গে টাকা ফেরত দিয়েছেন দুজনে। এত সতর্কতা সত্বেও ১৯২৮ সালে জব্বর দুটো ভুল করে ফেললেন ঠগযুগল। চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে ঠকাতে গেলেন ডোসেনাকে এবং নকলি স্ট্যাচুগুলো বিক্রি করতে গেলেন ফ্রিক কালেকশন অফ নিউইয়র্কে।

দুষ্প্রাপ্য সামগ্রীগুলো দেখে আকৃষ্ট হয়েও কিন্তু হুঁশিয়ার রইলেন মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ। টাকাকড়ি মিটিয়ে দেওয়ার আগে ঠিক করলেন নিজেদের এক্সপার্টদের পাঠাবেন ইটালিতে যাচাই করে নেওয়ার জন্যে। বড় অশুভ লগ্নে এসে পৌঁছল আমেরিকান বিশেষজ্ঞরা। আর একজন সাক্ষাৎপ্রার্থী এসে চমকপ্রদ একটা সমাচার দিয়ে গিয়েছিল ডোসেনাকে—তাঁর শিল্পসামগ্রী নাকি আসল রেনেসাঁ সামগ্রীরূপে প্রদর্শিত হচ্ছে বার্লিন মিউজিয়ামে।

আঁতকে উঠলেন ডোসেনা। সর্বনাশ! তাহলে তো দেখা যাচ্ছে তাঁর সব শিল্পকর্মই অসৎ উদ্দেশ্যে কিনেছে তাঁর এতদিনের দুই উপকারী দোস্ত। তিনি নিজেও তো এই প্রতারণার শরিক হয়ে পড়েছেন নিজের অজান্তেই! ভয়ের চোটে মামলা দায়ের করে বসলেন ডোসেনা।

খবরটা যাতে ফ্রিক প্রতিনিধিদের কানে না পৌঁছয়, সে চেষ্টার কসুর করেননি ফাসোনি আর প্যালেসি। কিন্তু অচিরেই চাঞ্চল্যকর খবরটা ছড়িয়ে পড়ল আটলান্টিকের দুই পারের দুই মহাদেশের সবক'টা খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় বড়-বড় হেডলাইনের আকারে। হিসেব করে দেখা গেল, ডোসেনার জাল মাল বেচে

ফাসোলি, প্যালেসি আর একটি বেনামী আন্তর্জাতিক ললিতকলার কোম্পানি পকেটস্থ করেছে প্রায় এক কোটি আশি লক্ষ টাকা! শুধু একটা খোদাই কর্মই বিক্রি হয়েছে এক কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকায়।

জোর তদন্ত চালালেন ইটালিয়ান গভর্নমেন্ট। প্রমাণ করে দিলেন তিপ্পান্ন বছর বয়স্ক ডোসেনার কোনও দোষই নেই। প্রবঞ্চক দুজনকে বাধ্য করলেন প্রতারিত ক্রেতাদের অন্তত কিছু টাকা ফিরিয়ে দিতে।

এত কাণ্ড হয়ে যাওয়ার পরেও রেনেসাঁ স্টাইল নিয়ে কাজ চালিয়ে গেলেন ডোসেনা—যা তাঁর প্রাণ, যা তাঁর সাধনা—তা ছাড়েন কী করে? এই সাধনার মধ্যেই ছিলেন তিনি আমৃত্যু—মারা যান সাত বছর পরে—মৃত্যুর পরে কিন্তু একটা শ্লেষাত্মক উপসংহার গজিয়ে উঠল তাঁর কাহিনিতে।

১৯৩৩-এর ৯ই মার্চ নিউইয়র্কের হোটেল প্লাজায় গ্র্যান্ড বলরুমে অ্যালসিও ডোসেনার অনুপম ললিতকলার ৩৯টি সংগ্রহ নিলেম করে বিক্রি করে দেয় ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি। একটির পেছনে সবচেয়ে বেশি দাম ওঠে মাত্র ৬২৭৫ টাকা। পুরো সংগ্রহটি বিক্রি হয় ৮২,১২৫ টাকায়। প্রতি ক্রেতাকে একটা রুচিসুন্দর প্রশংসিকা অর্পণ করেন ইটালিয়ান গভর্নমেন্ট। ভাবগম্ভীর ভাষায় তাতে গ্যারান্টি দিয়েছিলেন সরকার—প্রতিটি শিল্পসামগ্রী 'আসল নকল'!

কে জানে, শিবপুরম নটরাজনের জালিয়াত ভাস্কর ডোসেনাকেই গুরু বলে মেনে নিয়েছিলেন কিনা!

** 'ক্রাইম' পত্রিকায় প্রকাশিত।*

সবচেয়ে বড় হিরে

লর্ড ডানসানী শুধু লেখক হিসেবে নয়, সৈনিক, ক্রিকেট-খেলোয়াড় আর শিকারি হিসেবেও ওদেশে সুপরিচিত। হালকা রসিকতা মিশিয়ে আষাঢ়ে গল্প পরিবেশনায় তাঁর একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। বিলিয়ার্ডস ক্লাবের সভ্য জরকেন্স হল তাঁর অননুকরণীয় সৃষ্টি। তাঁরই 'Travel Tales' থেকে 'A Large Diamond' অনুবাদ করা হল। আজ পর্যন্ত জরকেন্সের গল্পের সত্যতা নিয়ে কেউই চ্যালেঞ্জ করার স্পর্ধা দেখায়নি—তবুও শ্রোতাদের অস্বস্তি কমেনি এক বিন্দুও।

আগুনের সামনে বসেছিলাম আমরা ক'জন। লাঞ্চের পর ক্লাবের এই ঘরটাতেই নিয়মিত জমায়েত হই আমরা। সোফাতে কয়েকজন গা এলিয়েছিল, বাকি সবাই বসেছিল এদিকে-ওদিকে ছড়ানো চেয়ারগুলোতে। শীতের ম্যাজমেজে বিকেল, কুয়াশায় ধোঁয়াটে হয়ে এসেছে চারদিক। বিকেল তো নয়—রাত্রিই বলা উচিত। বেলা এগারোটায় যে দিনের শুরু হয়েছিল, তিনটে বাজার আগেই তা মুছে গিয়ে যেন রাতের ঘোমটা টানা শুরু হয়ে গেছে। এহেন অলস অপরাহ্নে না জানি কত মধুর চিন্তাই ভিড় করে আসে মনে, সে বিকেলে কিন্তু কুয়াশায় হাবুডুবু খেয়ে রীতিমতো মুষড়ে পড়েছিলাম আমরা। যতদূর মনে পড়ে এইভাবে শুরু হয়েছিল আমাদের কথাবার্তা।

'আশ্চর্য! এ যে মস্ত বড় হে!'

'মস্ত বড়? কোনটা?'

'এই হিরেটা।'

'ও:। আমি ভাবলাম তুমি বুঝি মাছটার কথা বলছ।'

'মাছ নয় এটা, হিরে।'

'কিন্তু শুধু ছবি দেখে ওভাবে তো কিছুই বলা সম্ভব নয় তোমার পক্ষে।'

'নিশ্চয়ই সম্ভব।'

'কী করে?'

'হিরের আসল মাপের ছবি এটা।'

'বুঝলে কেমন করে?'

'আরে গেল যা, তা তো লেখাই রয়েছে।'

'তোমার কি মনে হয় সম্পাদক মশাইও সঠিক মাপ জানেন?'

'নিশ্চয় জানেন।'

'কেমন করে?'

'কী মুশকিল! এরকম একটা দামি পাথরকে পৃথিবীতে চেনে না কে? শুধু কষ্ট করে একে-ওকে জিগ্যেস করা, তার বেশি তো নয়।'

'কিন্তু শুধু একটা ছবি দেখে হিরের আকার বলা যে কী করে সম্ভব, তা তো ভেবে পাচ্ছি না।'

'পাচ্ছ না?'

'না।'

'না পেলেও খুবই বড় হিরেটা।'

'তবে বড়।'

'চমৎকার। আমিও তাই বলছিলাম।'

বাগবিতণ্ডার এই একঘেয়েমি থেকে শুধু একটি জিনিসই আমাকে রেহাই দিলে। তা হল জরকেন্সের মাথা নাড়া। সেদিন ক্লাবেই ছিল জরকেন্স। গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ছিল সে। মস্তবড় হিরেটার প্রসঙ্গ শুরু হওয়ার সময়ে প্রথমে সে মাথা নাড়ে—তারপর আগাগোড়া কথা কাটাকাটির সময়ে আস্তে-আস্তে মাথা নেড়েই চলল সে। প্রথমে ওকে আমি বিশেষ লক্ষ করিনি; হয়তো করতামই না, যদি না 'মস্তবড় হিরে' এই শব্দ দুটো প্রতিবার শোনার সঙ্গে-সঙ্গে প্রবলতর হয়ে উঠত তার মাথা নাড়ার বেগ। শুধু এইটুকু না থাকলে তার মতানৈক্যের একঘেয়েমি হয়ত আমার দৃষ্টিই আকর্ষণ করতে পারত না। নিশ্চয় কিছু বলবে জরকেন্স, এই আশায় কান খাড়া করে রইলাম—কিন্তু টুঁ শব্দটি এল না ওর দিক থেকে। অথচ বসে-বসে এমন নিষ্ঠার সঙ্গে সে মাথা নাড়তে লাগল যে আমার মনে হল হিরে সম্বন্ধে এমন কিছু নিশ্চয় ও জানে যা আজ পর্যন্ত আমরা শুনিনি। কিন্তু এতক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পাত্র তো সে নয়। শেষপর্যন্ত কৌতূহল চাপতে না পেরে আমিই ওর নীরবতা ভঙ্গ করলাম। নিরেট-মাথা তর্কবাগীশ দুজন কাগজের নক্সা নিয়ে বাগবিতণ্ডা সবে শেষ করেছে। কাগজটার দিকে একঝলক তাকিয়ে নিয়ে সোজা শুধোলাম জরকেন্সকে, 'হিরেটা সত্য-সত্যিই মস্তবড় হে, তাই না?'

'না।' শান্তভাবে বলল জরকেন্স।

'কেন নয়?' বললাম আমি। 'এর চাইতে বড় হিরে কি তুমি দেখেছ?'

'হ্যাঁ। বললে ও।

'কোথায়?'

'যারা এরকম একটা পাথরকে মস্তবড় বলে মনে করে—তারা আমার কাহিনি বিশ্বাসই করবে না।' বললে জরকেন্স।

আমার যতদূর স্মরণ হয়, স্কেচটা কোহিনূরের।

বললাম, 'আমি কিন্তু করব।'

আরও দু-একজন, খুব সম্ভব কুয়াশায় তিতিবিরক্ত হয়ে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'আমরাও।'

শুনে বেশ খুশি হয়ে উঠল জরকেন্স—উৎসাহ পেয়ে কোনওরকম গৌরচন্দ্রিকা না করে তৎক্ষণাৎ শুরু করে দিলে গল্পটা।

'অনেক বছর আগে রাশিয়ার অনেক উত্তরে একটা উল্কা পড়েছিল এস্কিমোদের দেশে। বিরাট সে উল্কা। এক বছর কি তারও পরে খবরটা এসে পৌঁছল ইউরোপে—তাও গুজবের ছদ্মবেশে। গুজবটা শোনার সঙ্গে-সঙ্গে একটা জিনিস বুঝলাম যে উল্কাটা পাহাড়ের মতো বিরাট না হয়ে যায় না। গুজব থেকে আদত খবরটা নিংড়ে বার করা খুব কঠিন ব্যাপার নয়—ঠিক পথ ধরলেই হল। এস্কিমোদের নিছক একটা উপকথার ছদ্মবেশে প্রথম এল গুজবটা। ওরা বললে, লকলকে অগ্নি শিখাময় জ্বলন্ত রথে চড়ে আকাশ থেকে এক দেবতা নেমে এসেছে তাদের দেশে—রথ হাঁকিয়ে গেছে দক্ষিণের দেশে। সারারাত আকাশ নাকি সিঁদুরের মত লাল হয়েছিল—আর চারদিকের চল্লিশ মাইল পর্যন্ত তুষার নাকি গলে জল হয়ে গেছিল।

'বুঝতেই পারছ, এস্কিমোদের এসব গাল-গল্প বিশ্বাস করিনি আর আমি। কিন্তু জানোই তো সাদাসিধে মানুষগুলো সরল কারণেই গল্পের সৃষ্টি করে—ওদের এ কাহিনিরও উৎস একটা আছে নিশ্চয়। খবরটা সবারই চোখ এড়িয়ে গেল। আমার কিন্তু মনে হল, এ কাহিনির পেছনে একটা কারণই শুধু থাকতে পারে। নিশ্চয় এইরকম একটা কিছু ঘটেছে ওদের দেশে। উল্কাপাত হওয়াই সম্ভব। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে যত উল্কা পড়েছে, তাদের চেয়েও অনেক বড় সে উল্কা। শেষপর্যন্ত এই উল্কার সন্ধানেই বেরিয়ে পড়লাম আমি।

'খুঁজে বার করতে বিশেষ বেগ পেতে হল না আমায়। ভৌগোলিক তথ্যগুলো এস্কিমোরাই দিয়ে দিয়েছিল। বেগ পেতে হয়েছিল আসল কারণটুকু খুঁজে বার করতে। উপকূল থেকে পুরো দেড়দিন যেতে না যেতেই meteoric iron-এর একটা পাহাড় দেখলাম—যার সন্ধানে আসা তারই হদিশ পেলাম বলেই মনে হল।

ম্যাপে এ পাহাড়ের কোনও উল্লেখই ছিল না—অবশ্য সে সময়ে ওদিককার ম্যাপে উল্লেখ থাকত না কোনও কিছুরই—কাজেই প্রমাণ হল না কিছুই। পাহাড়টার উপাদান কিন্তু ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত, সেইরকম। যেখানে উল্কাটা পড়েছে, তার চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইলের মধ্যেই পড়েছিল পাহাড়টা—তবুও আমার খটকা গেল না। তাই চোখ-কান বুঁজে আবিষ্কারের উল্লাসে আত্মহারা হলাম না। পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক অভিযানে বেরিয়েছিলাম আমি—আর জানোই তো বেখাপ্পা ব্যাপার তালে-গোলে ধামাচাপা দেওয়ার রেওয়াজ বিজ্ঞানে নেই। সেসব দিনে বিজ্ঞানের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে খুব সচেতন থাকতাম আমি। অনেক বৈজ্ঞানিক অভিযানও পরিচালনা করেছিলাম। কয়েকটা হয়তো তোমাদের কাছে বলে থাকতে পারি।'

জরকেন্স অবাক হোক, তা আমি চাইনি। কেননা এবার যদি তা হয়, তাহলে ওকে কায়দা করাই মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে।

শুধোলাম, 'কিন্তু পাহাড় দেখে তোমার খটকা লাগল কেন, তা তো কই বললে না?'

'আরে, অত বড় একটা বিশাল জিনিস—আকারে যা আল্পসের চেয়ে কম হবে না—অকল্পনীয় গতিতে মহাশূন্য পথে ধেয়ে এসে ধাবমান পৃথিবীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লে কী হবে বলো তো? বিপুল সংঘর্ষের ফলে জিনিসটা সিধে ঢুকে যাবে পৃথিবীর বুকে, সেঁধিয়ে যাবে ধরিত্রীর জঠরে চিরকালের জন্যে। কিন্তু তা তো হয়নি। চোখের সামনেই সেন্ট গোথার্ডের চূড়ার মতো নাক উঁচু করে পড়ে রয়েছে পাহাড়টা। বল্গা হরিণ-টানা শ্লেজ চালানোর জন্যে জন তিন-চার এস্কিমোকে সঙ্গে এনেছিলাম আমি। ওদেরকে বাধ্য হয়ে জিগ্যেস করলাম। জানোই তো, ইউরোপের এদিকে উল্কা সম্বন্ধে একমাত্র এস্কিমোদের গুজব ছাড়া আর কোনও খবরই আসেনি। আর এই গুজব ছাড়া কাজ শুরু করার মতো বিজ্ঞানসম্মত তথ্য কিছুই ছিল না আমার হাতে। ওদেরকে জিগ্যেস করতে ওরা কিন্তু সেই একই কাহিনি বারবার শোনাতে লাগল আমায়। পেল্লায় রথ চড়ে দেবতা আরও উত্তরে নেমেছে পৃথিবীতে—রথ চালিয়ে ছুটে এসেছে এই দিকেই। যেখানে সে নেমেছে, অগ্নিকাণ্ডটা ঘটেছে সেইখানেই—এদিকে নয়। আর তাই শুনেই বেশ কিছুক্ষণের জন্য মাথা গুলিয়ে গেল আমার। অগ্নিকাণ্ডের সহজ ব্যাখ্যা শুধু একটাই হওয়া সম্ভব। জ্বলন্ত জঙ্গলে লেলিহান আগুনই দেখেছে এরা দূর থেকে, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে কী, উত্তরে তো কোনও জঙ্গলই নেই। শুধু তুষার আর বরফ। বছরের মধ্যে শুধু মাসখানেকের জন্যে সে বরফ গলে যায়—সামান্য যা উদ্ভিদ দেখা যায়, তা নি:শেষ করে দেয় ক'টা বল্গা হরিণেই। এস্কিমো-ভাষার ডজন খানেক শব্দ আমার জানা ছিল—কাজেই ওই সামান্য পুঁজি নিয়ে আর প্রচুর ইশারা-ইঙ্গিত মিশিয়ে অনেক প্রশ্ন করলাম ওদের। বিশাল একটা অগ্নিকাণ্ড যে বহু উত্তরে দেখা গেছে—সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই শেষ অবধি রইল না আমার।

'আর তারপরেই বুঝলাম আসল কারণটা। নিশ্চয় খোলা একটা কয়লার স্তর ছিল ওদিকে। জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডটা তার ওপর এসে পড়ায় দপ করে জ্বলে উঠেছে সমস্ত স্তরটা।

'পাহাড়টার ধারেকাছে কিন্তু কোনও কয়লার চিহ্নই দেখতে পেলাম না। বুঝলাম, কয়লার স্তরের ওপর ঠিকরে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছিটকে উঠে লাফাতে-লাফাতে উল্কাটা এগিয়ে এসেছে এই দিকেই। আমার এই সিদ্ধান্তই কিন্তু শেষপর্যন্ত সত্য হল। তোমরাও বুঝে দেখো, উল্কাটা তো আর টুপ করে খসে পড়েনি পৃথিবীর বুকে। তার ওপর শুধু পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবই ছিল না—তাহলে তো সিধে পথেই আসত সে। কিন্তু তা তো নয়, উল্কার নিজস্ব কক্ষপথ আর নিজস্ব গতিবেগ একটা ছিল : এরই সঙ্গে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এক হওয়ায় ঢালু হয়ে গেল তার গতিপথ। সিধে না এসে তির্যক রেখায় আছড়ে পড়ে লাফাতে-লাফাতে এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

'অনেক ভেবেচিন্তে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর পর খুবই সহজ হয়ে গেল আমার কাজ। উল্কার গতিপথ অনুসরণ করে প্রথম যেখানে সে আছড়ে পড়েছে, সেখানে যাওয়া এরপর আর মোটেই কঠিন কাজ নয়। কঠিন শুধু থিওরি তৈরি করা—হাতেনাতে কাজ তো যে কেউ করতে পারে। দেখলাম, বেশ কয়েক জায়গায় পাহাড়টা ধাক্কা মেরেছে ভূস্তরকে—এক মাইল অন্তর-অন্তর সেইসব সংঘর্ষস্থানগুলোয় সৃষ্টি হয়েছে জলশূন্য

হ্রদের মতো অগভীর গর্তের। আরও কিছুদূর যাওয়ার পর ব্যবধান বেড়ে যেতে লাগল—সেইসঙ্গে গভীর হয়ে উঠতে লাগল গর্তগুলো, বেশিরভাগ গর্তেই হ্রদের মতো জল জমেছিল। তুষার খুব তাড়াতাড়ি গলে যাচ্ছিল বলে পাহাড়টার কাছে বল্গা হরিণগুলোকে রেখে আসতে হয়েছিল আমায়। বছরের যে মাসে বরফ গলে যায়, সেই মাসেই শুরু করেছিলাম আমার অভিযান—তাই জমি দেখতে কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না।'

'ভালো কথা,' ফস করে প্রশ্ন করে একজন, 'রাশিয়ায় কি হিরে আছে?'

'রাশিয়ায় কি হিরে আছে?' অনুকম্পা মিশিয়ে প্রতিধ্বনি করল জরকেন্স।

'কিন্তু হিরের গল্পই তো বলছ, তাই নয় কি?'

'শুনতেই পাবে তা, শুনতেই পাবে,' বলে জরকেন্স। তারপর শুধোয়, 'হিরে জিনিসটা আদতে কী তা নিশ্চয় জানো আশা করি?'

'ইয়ে, তা জানি বইকী।' দু-একজন আমতা-আমতা করে ওঠে, স্পষ্ট বুঝলাম কেউই জানে না আসল উত্তরটা কী। একজন শুধু জানত। সে-ই বললে, 'দানা বেঁধে যাওয়া কার্বন।'

আবার গল্প শুরু করল জরকেন্স।

'তুষার সমস্তই গলে গেছিল। এইভাবে আগে থেকেই সময় হিসেব করে যাত্রা শুরু করেছিলাম। তিনটে গাধা নিয়ে এগিয়ে চললাম সামনের দিকে—সঙ্গে রইল শুধু তিনজন এস্কিমো। গাধা তিনটে কিনেছিলাম গ্রামের মতো একটা জায়গা থেকে; অবশ্য ক'টা কুঁড়েঘরকে তোমরা গ্রাম নিশ্চয় বলবে না। আজ যেখানে দেখবে সেগুলো—পরের বছর এসে তাদের আর কোনও পাত্তাই পাবে না সেখানে। কিটব্যাগগুলো গাধার পিঠে চাপিয়ে হেঁটে চললাম আমরা।

'মস্ত একটা গহ্বরের কাছে এসে পৌঁছলাম সবাই—জল জমে বরফ হয়ে গেছে সেখানে। বিশাল একটা হ্রদ—নলখাগড়ার চিহ্ন ছিল না আশেপাশে—কোনও বুনোপাখিও সন্ধান পায়নি হ্রদের। নি:সীম শূন্যতায় ধু-ধু করছিল চারদিক। কনকনে ঠান্ডা আর মরা দীপ্তির ঝিকিমিকিতে সে নির্জনতা যেন আরও অসহ্য হয়ে উঠেছিল। বরফ গলে প্যাচপেচে হয়ে এসেছিল চারদিক। এরপর পঁচিশ মাইলের মধ্যে আর কোনও গহ্বর নেই। এইটাই তাহলে পৃথিবীর সঙ্গে পাহাড়টার শেষ সংঘাত, অথবা প্রথমও হতে পারে, কেননা আমি তো হাঁটছিলাম বিপরীত দিকে। বিশাল হ্রদটার দশ মাইল উত্তরে তাঁবু ফেললাম আমরা। পরের দিন তাঁবুটাবু গুটিয়ে নিয়ে পাড়ি দিলাম আরও পনেরো মাইল। পথের শেষে এসে পৌঁছলাম উল্কা যেখানে সর্বপ্রথম পৃথিবীর বুকে ঠিকরে পড়ে ছিটকে উঠেছিল, সেইখানে। মাধ্যাকর্ষণের টানে নিজের গতিপথ ছেড়ে এইখানেই আছড়ে পড়ে উল্কাটা—তারপর ছিটকে উঠে লাফাতে-লাফাতে এগিয়ে গেছে যেদিক থেকে এসেছি, সেইদিকে।

প্রথম সংঘাত যে এইখানেই, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই আর রইল না আমার। প্রথমত কয়লা সম্বন্ধে আমার সিদ্ধান্ত যে অভ্রান্ত তার প্রমাণ পেলাম মাইলখানেক পরে শুধু অঙ্গার দেখে—যদ্দূর মনে হল খুব পুরু একটা কয়লার স্তরের একেবারে নীচ পর্যন্ত জ্বলে গেছে। তারপরই এসে পড়লাম বিশাল একটা মসৃণ সমতলভূমির ওপর—বহু দূরে দিগরেখায় গিয়ে মিশেছিল চ্যাটালো জমিটা। আর কী দারুণ ঠান্ডা। সর্বত্র তুষার গলে গেছে—কিন্তু এ জমি তখনও ঢাকা রয়েছে সাদা তুষারে। পরের দিন সকালে এই ধু-ধু ফাঁকা জমিটার ওধারে আরও কয়েক মাইল যাওয়ার ইচ্ছে ছিল, তাই রাতের মতো সেইখানেই তাঁবু ফেলতে বললাম, কিন্তু রাজি হল না এস্কিমোরা। কারণ জিগ্যেস করলাম। ওরা বললে, খারাপ বরফ। তুষারের মধ্য দিয়ে খোঁচা দিয়ে দেখলাম, বাস্তবিক ইস্পাতের মতো কঠিন সে বরফ। ওরা কিন্তু বারবার বলতে লাগল, 'খারাপ বরফ।' তাতে ক্ষতি কী?' ওদের ভাষা যতটা পারলাম বললাম।

'দারুণ ঠান্ডা। খুব খারাপ বরফ।' বললে ওরা।

'বরফ ঠান্ডা হলে বুঝি খুশি হও না তোমরা?' জিগ্যেস করার চেষ্টা করি আমি। কিন্তু দেশি লোকদের সঙ্গে এ শ্লেষের কোনও মানেই হয় না—বিশেষ করে ইঙ্গিত দিয়ে তো শ্লেষ ফোটানো যায় না।

ওরা শুধু বললে, 'না। খুব ঠান্ডা।'

'ধুত্তোর,' বলে শেষ অবধি তাঁবু সমেত একটা গাধা নিয়েই রওনা দিলাম তুষারের মধ্য দিয়ে। খুঁটি পুঁতে গাধাটাকে বাঁধবার কোনও ব্যবস্থা করতে পারলাম না—কাজেই একটু জিরিয়ে নিয়ে সেই রাতেই সরে পড়ল সে; আমি কিন্তু কোনওরকমে তাঁবু খাটিয়ে হাড়-কাঁপানো নিদারুণ ঠান্ডা সত্ত্বেও একটু ঘুমের চেষ্টা করলাম। সেই আশ্চর্য নিথর নৈঃশব্দ্যকে কোনও ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়; বরফ ভাঙার ক্ষীণ শব্দও নেই, নেই জলের কুলকুল ধ্বনি। বরফের মধ্যে দিয়ে গুঙিয়ে ওঠে কত হাজারও রকমের বিচিত্র শব্দ, কিন্তু শুধু গাধাটার শ্বাসপ্রশ্বাসের ফোঁস-ফোঁস শব্দ ছাড়া পেলাম না কোনও প্রাণের সাড়া, ফিসফিসানি অথবা মর্মরধ্বনি; সব কিছুকেই টুঁটি টিপে কেউ যেন বোবা করে দিয়েছে। শেষপর্যন্ত গাধাটাও চলে গেল, পাঁচ মাইল পর্যন্ত শুনলাম ওর যাওয়ার শব্দ—সে শব্দ ছাড়া চারপাশের দিগন্ত জোড়া ধু-ধু শূন্যতার মাঝে ছিল না আর কোনও শব্দ। তাই পাঁচ মাইল পেরিয়ে অপর পারে পৌঁছনো না পর্যন্ত স্পষ্ট শুনতে পেলাম তার পায়ের শব্দ। কনকনে ঠান্ডার মধ্যে সেই অস্বাভাবিক নিঝুম নিস্তব্ধতা অনেকক্ষণ পর্যন্ত জাগিয়ে রাখলে আমায়। ভোর হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে স্কেট পরে নিলাম; কিন্তু তার আগেই বুঝেছিলাম, একটা কিছু গলতি আছে এখানে, এস্কিমোদের কথাই ঠিক। স্কেট পরে নিলাম, কেননা তুষার একেবারে গলে গেছিল—কোনও চিহ্নই আর দেখলাম না তার। হার্ড টেনিস কোর্টের ওপর তুষার গলে গেলে যেমন দেখায়, সেইরকমই দেখাচ্ছিল চারদিক। বল্গা হরিণের গাড়িতে ফেলে এসেছিলাম তুষার জুতো, তাই রাত্রে বুট পরে হাঁটতে হয়েছিল। কিন্তু এখন স্কেট পরে নিয়ে মনেমনেই হিসেব করে দেখলাম ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পৌঁছে যাব অপর পারে। কিন্তু আশ্চর্য একটা জিনিস লক্ষ করলাম। বরফের এরকম জৌলুস এর আগে কখনও দেখিনি। অচিরেই পায়ের তলার বরফের আর একটা বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করলাম। ইস্পাতের চেয়েও অনেক কঠিন সে বরফ। আমার স্কেটজোড়া তো কিছুতেই আঁকড়ে ধরতে পারল না তার মসৃণ গা—বারবার হড়কে গিয়ে আর আছাড় খেয়ে সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল আমার। উল্কার সঙ্গে সংঘর্ষে কী এমন পরিবর্তন আসতে পারে এখানকার বরফে—তাই ভাছিলাম। আর তখনই আচমকা বুঝলাম ব্যাপারটা। বরফের চেয়ে কঠিন যদি হয়—তবে এ বরফ নয়। চার হাত পায়ে ভর দিয়ে নীচু হয়ে বরফের দীপ্তির গভীরতায় তাকিয়ে থাকতে-থাকতে বুঝলাম আসল ব্যাপারটা। পকেট-ছুরিটা বার করে আঁচড় কাটবার চেষ্টা করলাম। কোনও দাগই পড়ল না। যেসব জিনিসের ওপর ইস্পাতেরও কোনও দাগ পড়ে না, তাদের সংখ্যা পৃথিবীতে খুব বেশি নয়—এ জিনিসটাও তাদেরই অন্যতম। সে সময়ে একটা আংটি পরতাম আমি; আংটিটার সোনার মাঝে গাঁথা ছিল একটা পাথর। পাথরটা আসলে একটা পাথুরে কৃস্টাল। না, না, এখন যেটা দেখছ আঙুলে, এটা নয়—সেটা আসল পাথর ছিল। লোকে ভাবত হিরে—যদিও সে উদ্দেশ্যে কিনিনি পাথরটা। কী কারণে কিনেছিলাম তাও মনে নেই—বোধহয় নিছক খেয়ালের বশে অথবা দেখতে ভালো লেগেছিল বলেই। সে যাই হোক, পাথর সমেত আংটিটা আঙুলেই ছিল তখন। খুলে নিয়ে ঠান্ডা ঝকঝকে জিনিসটার ওপর বেশ করে ঘষলাম সেটা—কোনও আঁচড়ই পড়ল না। দুটোই যদি পাথুরে কৃস্টাল হত, তাহলে আঁচড় নিশ্চয় পড়ত। কাজেই সম্ভাব্য জিনিসগুলোর সংখ্যা আরও কমে এল। ভিজে পাথরটার ওপর বসে খুলে ফেললাম স্কেট। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ভয়ানক দীপ্তি থেকে চোখ আড়াল করে ভাবতে লাগলাম। এ বিশাল সমতল জমিটা যে বরফ—সে কথা ভেবে আর লাভ নেই। অবিজ্ঞানীরাই এ ধরনের আজেবাজে চিন্তায় সময় নষ্ট করত। কিন্তু ইস্পাত ছুঁইয়ে তো প্রমাণ হয়ে গেছে বস্তুটা আদতে কী। কাজেই নতুন থিওরি চিন্তা করতে হল আমায়। খুব সহজেই শেষ হল আমার চিন্তা। ধরো, তুমি নিজেই একজন বিজ্ঞানবিৎ; তাহলে যে-কোনও একটা পাথর দেখলে প্রথমেই কী করো তুমি? কোন স্তরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, সেইটাই লক্ষ কর, কেমন? একথা ভাবামাত্রই দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে গেল সবকিছু। আমি দাঁড়িয়েছিলাম কয়লার ওপর; কিনারার চারধারে পোড়া অঙ্গার আমি দেখে এসেছি। আর জানোই তো কয়লা কী।'

'কার্বন।' শেষ যে কথা বলেছিল, সে-ই আবার উত্তর দিলে।

'কিন্তু...', আর একজন শুরু করে। শান্তভাবে জরকেন্স তাকেই শুধোয়, 'আচ্ছা, কার্বন বা ওই জাতীয় কিছুকে দানা বাঁধাতে কী দরকার তা জানো নিশ্চয়?'

'চাপ, তাই না?' বলে অপরজন।

'কল্পনা করতে পারি না এমনই চাপ, আর আজ পর্যন্ত যত আগুন আমরা জ্বালাতে পেরেছি, তার চাইতে কল্পনাতীত বেশি উত্তাপ।' বললে জরকেন্স। 'অবশ্য ক্ষমতাতীত নয়, কেননা, ল্যাবরেটরিতে একটা হীরা আমরা তৈরি করতে পেরেছি। কিন্তু তার আকার এতই ছোট্ট আর প্রয়োজনীয় চাপ এমনই ব্যয়বহুল যে আমার তো মনে হয় না সে চেষ্টা আর কেউ করেছে বলে। কিন্তু কল্পনা করো তো উত্তাপে সাদা একটা পাহাড় মিনিটে হাজার মাইল বেগে ধেয়ে চলেছে; সেই সঙ্গে যোগ দাও আমাদের পৃথিবীর গতিবেগ—তাও প্রায় মিনিটে হাজার মাইল, বরং মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্য আরও কিছু বেশি। তারপর সমস্ত জিনিসটাকে সিধে আছড়ে ফ্যালো কার্বনের একটা জমির ওপর। ফলাফল জানার জন্যে কষ্ট করে এতদূর না হলেও চলত আমার। কিন্তু এসেই যখন পড়েছি, তখন স্থির করলাম ওদিক পর্যন্ত গিয়ে সবটুকু দেখতে হবে আমায়। কিন্তু কী কষ্টে যে এই পথ চলেছিলাম, তা বোঝাতে পারব না। ভয়ংকর কঠিনতা, নিদারুণ ঠান্ডা আর মারাত্মক জৌলুস, শ্রান্ত পা, মাথা আর মন। আসলে আমি খুঁজছিলাম সামান্য একটু খাঁজ কি চিড়-যার ফাঁকে আমার ছুরির ফলাটা বা স্কেট ঢুকিয়ে বেশ বড় একটা চাঁই খসিয়ে আনতে পারি। কিন্তু—জানি না বিশ্বাস করবে কিনা—সমস্ত পথ হেঁটেও এতটুকু ফাটল দেখতে পেলাম না কোথাও।

'সাঙ্ঘাতিক জ্বলজ্বলে ওই দীপ্তিতে মাথা ধরে গেছিল আমার—যতই এগোতে লাগলাম, ততই তা বাড়তে লাগল। ওদিককার অক্ষাংশে জুন মাসের শেষে এমন কোনও রাতের আবির্ভাবের সম্ভাবনা ছিল না যাতে আমি একটু আরাম পেতে পারি। শ্রান্ত পা দুটো টেনে-টেনে চলতে লাগলাম আমি—হিরে দেখে এরকম ক্লান্ত আর কখনও হইনি আমি। লেডি ক্লাশনের ইভনিং পার্টিতে আমার না যাওয়ার এইটাই আসল কারণ—যাকে খুশি এখন তা বলতে পারো। যাক, চললাম তো চললামই। তারপর অনেকক্ষণ পরে, অন্য দেশে যখন সন্ধ্যা, এসে পৌঁছলাম অপর পারে। পোড়া অঙ্গার ছাড়া সেখানে আর কিছুই দেখার ছিল না। ছাই আর ধুলোর মধ্যে হাঁটা খুবই কষ্টকর সন্দেহ নেই, কিন্তু তবুও হিরেটা আবার এড়োএড়ি পেরোবার চেষ্টা না করে সমস্ত পথটা ছাই মাড়িয়েই এলাম। সলোম পশুচামড়ার পোশাক পরেছিলাম—তাই ঘুমোতে পেরেছিলাম পথেই। দিনভোর বিশ্রাম নিয়ে রওনা দিলেও একদমে সমস্ত পথটা পেরোবার ক্ষমতা আমার ছিল না। হিরের পার বরাবর ছাই মাড়িয়ে দীর্ঘপথ পেরিয়ে ফিরে এলাম যাত্রা শুরুর জায়গাটিতে।

'এস্কিমোগুলোকে দেখলাম বটে, কিন্তু কোনও প্রলোভনেই ওরা হিরেটার কাছে যেতে রাজি হল না। দেবতা বিদায় নেওয়ার পর শয়তান এসে আড্ডা গেড়েছে ওখানে—জাদুমন্ত্রে সমস্ত জায়গাটুকু ঠান্ডায় আর জ্বলজ্বলে দীপ্তিতে ভরিয়ে তুলেছে। ওদের ভাষা তো বেশি বুঝি না, তাই বুঝলাম না, শয়তান মহাপ্রভু দেবতার পিছুপিছু পৃথিবীতে এসেছিল, না দেবতার অন্তর্ধানের পর বেদখল করেছে জমিটুকু। সে যাই হোক, সব কিছুরই সহজ একটা ব্যাখ্যা থাকে; ওরা গেল ধর্মের ব্যাখ্যায় আর আমি এলাম বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায়।

'উপকূলে এসে অনেক পরিশ্রম আর বেশকিছু প্রচারকার্য চালিয়ে হয়তো খানিকটা ডিনামাইট সংগ্রহ করে ফিরে এসে Rue de la Paix-এর ভাঁড়ার ভরাবার মতো বেশকিছু টুকরো হিরে নিয়ে যেতে পারতাম। প্যারীর নাম শুনেছ তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেইখানেই। কিন্তু আমার স্বপ্ন ছিল তার চাইতেও অনেক বড়। পৃথিবীর সবক'টা বাড়ি আমি সুন্দর করে তুলতে চেয়েছিলাম। এমন একটা কোম্পানি গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম, যারা মধ্যবিত্তের হাতের মুঠোয় এনে দিত আশ্চর্য সুন্দর হিরের বেলওয়ারী ঝাড়। জমকালো ফুলদানির পরিকল্পনাও ছিল। আরও রকমারি রোজকারের ব্যবহারের জিনিসপত্র তৈরির পরিকল্পনা এসেছিল আমার মাথায়।

'কিন্তু শেষপর্যন্ত হল কী? ঠিক যেদিন আমি লন্ডনে পৌঁছলাম, সেদিনই রাস্তায় পোস্টার দেখলাম—'বিরাট ভূমিকম্প...' শুধু এইটুকু দেখেই ছুটলাম খবরের কাগজওয়ালাদের দোকানে। একটা কাগজ ছিনিয়ে নিয়ে

দেখলাম, হ্যাঁ তাই বটে। রাশিয়াতেই হয়েছে ভূমিকম্পটা।

'আমি জানতাম। পৃথিবী যে কী প্রচণ্ড ঘা খেয়েছে, তা আমি জানতাম। জানতাম, ওই ভীষণ সংঘর্ষে পৃথিবীর বুক থেকে বহু মাইল ভেতর পর্যন্ত টুকরো-টুকরো হয়ে গেছে, ফেটে-ফুটে গেছে সমস্ত স্তরগুলো। ধরো, তোমার কোনও বন্ধুর গোড়ালি বা হাঁটু জখম হয়েছে, তারপরেই হঠাৎ একদিন কাগজে তার নাম দেখলে। তৎক্ষণাৎ তুমি বুঝে নেবে আদতে হয়েছে কী। জখম হাঁটু আর গোড়ালি যে বন্ধুটির দেহভার বইতে পারেনি, পড়ে গিয়ে বেশ আহত হয়েছে সে, তা বুঝতে তোমার এক লহমাও লাগে না। প্রবীণা ধরিত্রীর বেলাও ঘটেছে তাই। কী প্রচণ্ড আঘাত যে সে বুক পেতে নিয়েছে, তা আমি জানতাম। তাই যে মুহূর্তে 'ভূমিকম্প' শব্দটা দেখলাম, বুঝলাম সব কিছুই। ওরা সিসমোগ্রাফ দেখে উৎপত্তিস্থান বার করেছে—আমি কিন্তু কিছু না দেখেই ঠিক আসল কেন্দ্রটি বলে দিতে পারতাম।

'তৎক্ষণাৎ ফিরে গেলাম আমি সবকিছুই নিজের চোখে দেখতে। স্বচক্ষে না দেখে তো আর কোম্পানি গঠন করা চলে না। পরের বোটেই গেলাম। যে ভয় করেছিলাম, অবস্থা দেখি তার চাইতেও অনেক খারাপ। সাঙ্ঘাতিক ভূমিকম্প। আশ্চর্য হলাম না মোটে—আঘাতটা তো আর সামান্য নয়। বরং ওই আঘাত সয়ে এতদিন ধরে দাঁড়িয়ে থাকাটাই তো আশ্চর্য। অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে উঠেছে। সামান্য একটু ঢালু অবস্থায় দেখে গেছিলাম হিরেটাকে। ও অবস্থায় না থেকে যদি সমতল অবস্থায় থাকত, তাহলে কখনই এভাবে বেমালুম চোখের আড়াল হত না। কিন্তু এতটা আশা করাও যায় না। কল্পনাতীত একটা রেল দুর্ঘটনার পর সেতুর খিলানগুলো যেরকম টুকরো-টুকরো হয়ে যায়, সেইভাবেই গুঁড়িয়ে গেছিল ভূ-স্তরগুলো। কাজেই দীর্ঘদিন কোনওরকমে খাড়া থাকলেও এক সময়ে আর ভার সইতে না পেরে স্রেফ টুপ টুপ করে ভূগর্ভে ধ্বসে পড়েছে স্তরগুলো। যেভাবেই হোক না কেন অদৃশ্য হয়ে গেছে হিরেটা। এমনকী অঙ্গারগুলোরও কোনও হদিশ পেলাম না। হিরের ধার বরাবর সাগরের বেলাভূমির মতো পড়েছিল অঙ্গারের রাশ। সব চিহ্ন সমেত তলিয়ে গেছে হিরে আর সবকিছু নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে বন্ধ হয়ে গেছে ধরিত্রীর মুখ। এই হয়তো ভালো। হিরে রইল না বটে কিন্তু তাতে মানবসমাজের মঙ্গল বই অমঙ্গল কিছু হল না। কিন্তু কস্মিনকালেও দার্শনিক নই আমি, তা তো জানো। হিরেটার আকারও তুচ্ছ নয়—যে ক্ষতি আমার হল, তাও বলবার নয়। তবুও মুখ বুজেই থাকি। কিন্তু বড় হিরেটিরে নিয়ে কেউ যদি বড়-বড় কথা বলে, তাহলেই মেজাজ যায় বিগড়ে। কী করব বলো, সামলাতে পারি না নিজেকে।'

'কিন্তু মাটি খুঁড়ে কি উদ্ধার করা যেত না!' হঠাৎ রাগে দু:খে যেন কী বলবে ভেবে পায় না জরকেন্স।

'মাটি খুঁড়ে কি উদ্ধার করা যেত না! নিশ্চয় যেত। কিন্তু শুরুতেই লাগত হাজার দুয়েক লোক। ঠিকমত আটঘাট বেঁধে কাজ করতে গেলে হাজার পঞ্চাশের কমে অবশ্য সম্ভব নয়—মজুরিও তো খুব সস্তা ওখানে—হপ্তায় দশ শিলিংই যথেষ্ট ওদের পক্ষে। তাহলে গিয়ে প্রতি হপ্তায় যাচ্ছে পঁচিশ হাজার পাউন্ড। দশ হপ্তায় যদিও কাজ শেষ হত না—তবুও ফলাফলের মুখ দেখতে পেতাম খানিকটা। তাহলে শুধু মজুরিই যেত আড়াই লক্ষ পাউন্ড। সেই অনুপাতে টাকা লাগত ওদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে—আর প্রায় তত টাকাই যেত গাড়ির আয়োজনে। তারপর ছিল বাড়ি ঘর-দোর তৈরির খরচ; স্রেফ আদিম প্রথার কুঁড়ে বানালেই কাজ চলে যেত আমাদের। মোটমাট দশ লক্ষ পেলেই কাজ শুরু করা যেত। লন্ডন শহরে দশ লক্ষ পাউন্ড কি সোজা কথা হল? সবরকম চেষ্টাই করেছি আমি; বকবক করেছি একনাগাড়ে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা, যত পেরেছি মদ গিলিয়েছি। কিন্তু কেউই রাজি হল না দশ লক্ষ ঢালতে। হায়রে, লাভের হিসেবটা একবার ভাব তো! তুচ্ছ ওই দশ লক্ষ পাউন্ডের লাভ দাঁড়াত, শতকরা কোটি-কোটি পাউন্ড। কিন্তু রাজি হল না কেউই। শেষপর্যন্ত ওরা যে আসলে কী, তা ওদের মুখের ওপর বলে দিয়ে ছেড়ে দিলাম সব প্রচেষ্টা।'

'ওয়েটার!' হাঁক দিল জরকেন্স। 'খু-ব ছোট্ট একটা হুইস্কি এনে দাও—আর সামান্য একটু সোডা ছিটিয়ে দিও তাতে।'

আমাদের ক্লাবে খু-ব ছোট্ট হুইস্কি পাওয়া যায় না। ছোট্ট হুইস্কি অবশ্য আছে—কিন্তু সব ওয়েটারই জানে জরকেন্সের কাছে ছোট্ট হুইস্কি কখনও না চলে না।

** 'মাসিক রোমাঞ্চ' পত্রিকায় প্রকাশিত। (কার্তিক, ১৩৬৬।)*

সবুজফল ও শ্বেতসুন্দরী

নোগোনে ক্রীকয়ের হলদে জলে বিদ্যুৎবেগে দাঁড় টানতে টানতে বললে জো—মি: গড, যমের মুখে যাচ্ছেন কিন্তু।

ক্যানোর মুখে দাঁড়িয়ে ধর্মের বই পড়ছিল সুদর্শন এক তরুণ। চোখ তুলে হেসে বললে—বলছি না, আমাকে মি: গড বলবি না?

উকো দিয়ে ঘষা দাঁত বার করে হাসল পাপুয়ান।

—কেন বলব না? আপনি তো ভগবানের দূত। মি: গড। কিন্তু বড় বোকা। শিগগিরই মরে ভূত হবেন।

—তা হলে এলি কেন আমার সঙ্গে?

—ভয় পাই না বলে।

বইটার পাতায় চিহ্ন দিয়ে মুড়ে রাখল তরুণ পাদ্রী। বললে—হল্যানডিয়ার বর্বরদের মতই কি এরা বিপজ্জনক?

—তার চাইতেও খারাপ। এরা মানুষ খায়।

—বলিস কিরে?

—আজ্ঞে। আমার বাবা ওদের ন'জনকে খেয়েছিল লড়াই জেতার পর। সে কী পেট কামড়ানি। সাধুদের পেটে মানুষ সয় না।

—বাবার মত তুইও মানুষ খাস নাকি?

—দরকার কী? আমার কি খাবারের অভাব?

ঠিক এই সময়ে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত একজন দাঁড়িয়ে মুখ দিয়ে ঝলক রক্ত উঠে এসে ছলকে পড়ল পাদ্রীর সাদা গাউনে। মুখ থুবড়ে পড়ল সে ক্যানোর মধ্যে। পিঠে একটা তির। সবুজ টিয়ার পালকগুলো কেবল বেরিয়ে রয়েছে বাইরে।

জলের ধারে ম্যাড়মেড়ে লাল অর্কিডের মধ্যে কী যেন নড়ে উঠল।

হতভম্বের মতো সবুজ পালকের দিকে তাকিয়ে বললে তরুণ পাদ্রী—জো, এ তো দেখছি—

হ্যাঁচকা টানে পাদ্রীকে ক্যানোর মধ্যে শুইয়ে দিয়ে জো বললে—উপুড় হয়ে শুয়ে থাকুন। দেখলেন তো, জো মিথ্যে বলে না।

খেপে গেল পাদ্রী—জো, ওল্ড টেস্টামেন্ট যা বলেছে, এখন ঠিক তাই করব। রাইফেলটা দে।

—শুয়ে থাকুন।

—কক্ষনো না। খুনেদের টিট করতে ওল্ড টেস্টামেন্টই দরকার। দে রাইফেল আমার। ঠিক আছে। দাঁড় করা ক্যানো।

অর্কিডের দিকে ৩০৩ উদ্যত হতেই সবেগে নিক্ষিপ্ত হল অর্কিডের একটা লতা—সে জায়গায় আবির্ভূত হল একটা মুখ।

বিকট মুখ। কপাল আর চিবুকে কমলা কাদা। থ্যাবড়া নাকের দু'দিক দিয়ে বেরিয়ে একটা লম্বা রূপোলি হাড়। [illegible] দু-চোখে জ্বলন্ত চাহনি। পরমুহূর্তেই মুখ ঢেকে উঠে এল একটা ধনুক।

সঙ্গে-সঙ্গে গর্জে উঠল পয়েন্ট তিন-শূন্য-তিন। শূন্য পথে ধেয়ে এল একটা তির। বিঁধল গাছের ডালে। পাকসাট খেয়ে জল থেকে লাফিয়ে উঠেই মুখ থুবড়ে পড়ল একটা উলঙ্গ পুরুষ।

—সাবাস! দারুণ হাত তো আপনার।
—যাচ্ছলে! মরে গেছে দেখছি।

জো একাই দাঁড় টানতে লাগল দুই হাতে। মৃত দাঁড়িকে ফেলে দেওয়া হল জলে ভার কমানোর জন্যে। ধর্মের বই খুলে আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা শেষ করে পাদ্রী বললে —গ্রামে গিয়ে কি এইরকম অভ্যর্থনাই পেতে হবে, জো?

—গাঁয়ের লোক খারাপ। তার চাইতেও খারাপ সাদা মানুষ।

—কেন?

—শয়তানের জল খাওয়ায়। সোনালি পাখির চামড়া নিয়ে যায়।

চুপ করে রইল পাদ্রী। জিন মদের চালান দিয়ে বার্ড অফ প্যারাডাইজের চামড়া কিনে নিয়ে যায় একজন শ্বেতাঙ্গ। এই জঙ্গলে। ডাচ নর্থ নিউগিনির প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে মৃত্যু ওৎ পেতে আছে। কিন্তু সেখানেও পাপের ব্যাবসা চালিয়ে যাচ্ছে একজন। কে সে?

সূর্য ডুবে গেল। নোগোনে গ্রামের ছায়ায় এসে ক্যানো ভিড়ল।

এক হাতে বাইবেল, আর এক হাতে রাইফেল নিয়ে তিরে নামল পিটার থারথ—তরুণ পাদ্রী। গোধূলির ম্লান আলোয় দেখল, সারি-সারি কুঁড়েঘর দানবিক মাকড়সার মতো খাড়া লিকপিকে সরু-সরু ঠ্যাঙের ওপর।

হাঁক দিল জো। গাঁয়ের লোক এল সেই হাঁক শুনে। উলঙ্গ জংলি। পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল গাঁয়ের নতুন পাদ্রীকে।

বিরাট অগ্নিকুণ্ডের সামনে এসে দাঁড়াল পিটার। আগুনের পাশে আটটা খুঁটির ডগায় লাগানো আটটা বিকট নরমুণ্ড। কয়েক শ' জংলি দাঁড়িয়ে খুঁটিগুলোর ওপাশে।

পিটারের কুঁড়ে এই আগুনের পাশেই।

জোকে ডাকল পিটার—ক্যাম্প-খাট পাত। বলে দরজা পেরিয়ে ঘরে ঢুকে যেন দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছে, এমন সময় উলঙ্গ বর্বরদের ঠেলে সামনে এগিয়ে এল একটা জীবন্ত বিস্ময়।

থ হয়ে গেল পিটার।

—জো! আগে বলিসনি কেন? দাড়িটা পর্যন্ত যে কামাইনি এখনও।

আগুনের ধারে দাঁড়িয়ে এক শ্বেতসুন্দরী।

জো নিজেও চমকে উঠেছে—জানলে তো বলব। এ আবার কে?

—গুড ইভনিং! গুড ইভনিং! আপনি কি স্বর্গ থেকে নেমে এলেন?

দরজার সামনেই এসে দাঁড়াল শ্বেতসুন্দরী। সস্তা পোশাক ফুঁড়ে চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়া উদ্ধত যৌবনের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল, পিটার, তরুণ পাদ্রী। হাতির দাঁত আর গোলাপ মিলিয়ে ঈশ্বর যেন সৃষ্টি করেছেন অপরূপা এই মেয়েকে। কিন্তু এই জঙ্গলে এ হেন রূপসি কেন?

ঠোঁট কেঁপে উঠল শ্বেতসুন্দরীর—আপনি তো পাদ্রী?

—একশ বার। কিন্তু কী মিষ্টি গলা আপনার।

হাসল শ্বেতসুন্দরী—পাদ্রীর মত কথা বলছেন না কিন্তু।

—পাদ্রী হলেও আমি তো মানুষ। পিটার থারথ আমার নাম। আপনার?

—জ্যাসোনা ল্যামারে। নোগানোতে থাকি। এই গ্রামেই আমার বাড়ি। আপনাকে ভালো লাগল। তাই বলছি, এখুনি সরে পড়ুন।

—এ আবার কী কথা। ভালো লাগল, অথচ বিদেয় হতে বলছেন?

—আপনার ভালোর জন্যেই বলছি। যান—এখুনি।

—আপনি এখানে কেন? গির্জের কেউ কি?

—আমার বাবা ডাক্তার ছিলেন। এখানেই মারা যান। আমরা ফরাসি। আমার মা নোগোনের রাজকুমারী।

—মানে?
—মানে আবার কী? মাকে বাবা বিয়ে করেছিলেন বাইবেলের মন্ত্র পড়ে।
—ভালোই হল। আপনার সাহায্যও পাওয়া যাবে গির্জের কাজে।
—সাহায্য! আরে মশাই, সরে পড়ুন—এখনি, এই রাতেই।
—কেন?
—এখুনি আসছে সে।
—জিন মদের কারবার করে যে?
—হ্যাঁ।
—বদলোক বুঝি?
—কোরাল সাপ দেখেছেন? ঠিক সেই রকম। সুন্দর, কিন্তু মারাত্মক। আপনি থাকলে তার কাজের অসুবিধে হবে। খুন করে ফেলবে। যান—এখুনি যান।
—জ্যাসোনা, এমন একটা সুন্দর রাত নষ্ট করতে রাজি নই। আসুন, গল্প-সল্প করা যাক।
—প্রাণে বড় শখ হয়েছে দেখছি।
অন্ধকারের মধ্যে থেকে ভেসে এল একটা কণ্ঠস্বর। দরজা পেরিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল ছ'ফুট লম্বা এক শ্বেতকায়। চওড়া কাঁধ। গলায় ঝুলছে একটা আগাটা রুবি পাথর। দুই চোখে যেন চুম্বকের আকর্ষণ। সুপুরুষ। কিন্তু ভয়াল।
—পাদ্রী যে, খবর ভালো?
—গুড ইভনিং।
—কী নাম আপনার?
—থারথ। আপনার?
—আর্চিবল্ড ওয়েপস।
কিছুক্ষণ আর কথা নেই। তারপর যেন আঁতকে উঠল তরুণ পাদ্রী।
আর্চিবল্ড অক্সফোর্ড ওয়েপস?
—কিছু বাজে লোক ওই নামেই ডাকে আমাকে।
—ওয়েপস! খুনি ওয়েপস?
—ঠিকই ধরেছেন।
—ওয়েপস—ক্রীতদাস-কারবারি ওয়েপস?
—নি:সন্দেহে।
—জংলি বউ নিয়ে যে ঘর করে, সেই ওয়েপস?
—মোট চারটে বউ আমার। চারটেই জংলি মেয়ে। কিন্তু খাসা।
—আপনার কথাবার্তা—
—বরদাস্ত করা যায় না, কেমন? বেশ তো, যাওয়ার আগে আসুন, একসঙ্গে খেয়ে যান।
—আমি থাকতে এসেছি, যেতে নয়।
দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়াল দানবপুরুষ। প্যান্টের পকেট থেকে লাল বেরি বার করে মুখে পুরে বললে—জিন আর ধর্ম পাশাপাশি থাকতে পারে না। অশান্তি করবেন না। পথ দেখুন।
—যদি না যাই?
—তাহলে জোর করে যাওয়াব। বেরি খাবেন? খাসা খেতে।
—ধন্যবাদ। জোর করলেও যদি না যাই?
—অদৃশ্য করে দোব।

—ম্যানোকড়ির ওপরতলা কিন্তু ছেড়ে দেবে না।

—সে ভাবনা আমার। আপনি পথ দেখুন।

সিগারেট বার করে ধরাল পাদ্রী।

বললে—জ্যাসোনা—ইয়ে—মিস ল্যামারে। যা বলছিলাম আপনাকে—কথাটা মাঝপথে আটকে গেল খট করে একটা শব্দ হওয়ায়। পাদ্রীর বাঁ-হাতের তর্জনী আর অনামিকার মধ্যে দিয়ে একটা ছোরা বিঁধে রয়েছে প্যাকিং কেসে।

ঠান্ডা গলায় বললে ওয়েপস—ফের যদি মিস ল্যামারের নাম মুখে শুনি, ওই ছোরা বুকে বিঁধবে। পায়ের তলায় ঘাস গজাতে দেয় না আর্চিবল্ড ওয়েপস। সরে পড়ুন। নইলে নোগোনে ক্রীকয়ের কুমিরদের পেট ভরাব আপনার মাংস দিয়ে। চলবে একটা বেরি? না? গুড নাইট!

—দাঁতখোটাটা ফেলে গেলেন যে?

কাঠের গায়ে ইস্পাত গেঁথে যাওয়ার তীব্র শব্দ হল। আর্চিবল্ডের কানের এক ইঞ্চি পাশে দরজার ফ্রেমে গেঁথে গেছে ছোরাটা। ফলার দিকে চোখ কুঁচকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল দানবপুরুষ।

বললে টেনে-টেনে—হাতটা ভালোই দেখছি। বলেই অদ্ভুত হেসে হলদে চিতাবাঘের মতো একলাফে অদৃশ্য হয়ে গেল বাইরের অন্ধকারে।

পেছন থেকে হেঁকে বলল পাদ্রী—গুড নাইট।

নিরুদ্ধ নিশ্বাসে এতক্ষণ বাদে কথা বলল শ্বেতসুন্দরী—এবার যাবেন তো?

—যাব? কক্ষনো না।

—থাকলে মারা পড়বেন। জংলিদের লেলিয়ে দেবে।

—দিক।

—ঠিক আপনার মতো একজনেরই পথ চেয়েছিলাম এতদিন।

অন্ধকারে হারিয়ে গেল শ্বেতসুন্দরীও।

পরের দিন থেকেই পরিবর্তন দেখা গেল নোগোনে গ্রামে। নরমুণ্ড শিকারিদের গ্রামে সেই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হল সত্যিকারের গির্জে। বড় করে নেওয়া হল পিটারের কুঁড়ে ঘর। প্রতিদিন জংলিদের নিয়ে ধর্মালোচনা আরম্ভ হল সেই ঘরে।

দিন কয়েক বেশ উৎকণ্ঠার মধ্যেই কাটল কিন্তু পিটার থারথের। দানবপুরুষ ওয়েপস হুমকি দিয়ে গিয়েছিল তার মাংস দিয়ে পেট ভরাবে কুমিরের। কিন্তু তার টিকি দেখা যাচ্ছে না।

দেখা গেল তার নাম লেখা কার্ডটাকে তার বদলে।

একদিন বিকেলে ঘরে ফিরে পিটার দেখল বন্দুক ঝোলানোর পেরেকে গাঁথা রয়েছে কার্ডটা : আর্চিবল্ড ওয়েপস, এফ. আর জি. এস.।

নেই কেবল রাইফেলটা।

কার্ডের তলায় লেখা—ভীমরুলের হুল না থাকাই ভালো।

তৎক্ষণাৎ আর্চিবল্ডের কুঁড়েঘরে ধাওয়া করেছিল পিটার। ন্যাংটা চাকরটা জঙ্গলের দিকে আঙুল তুলে বলেছিল—ওইখানে। এখানে নেই।

রাইফেল তো গেল। তা সত্বেও পিটার থারথের চঞ্চল মন শান্ত হয়ে রইল শ্বেতসুন্দরীর সান্নিধ্যে। প্রতিদিন সে আসত। প্রথমে গির্জেতে বসে তরুণ পুরুতের মুখে বাইবেল অথবা স্তোত্রপাঠ শুনত। ভগবানের নামগানের ফাঁকে-ফাঁকে ভয়াবহ এই জঙ্গলের অনেক খবর শিখিয়ে দিত পুরুতঠাকুরকে। কোথায় গুঞ্জন-পক্ষী থাকে, কোন লাল বেরি ফল নিশ্চিন্তে খাওয়া যায়। কিন্তু তাদের জাতভাই সবুজ বেরি ফলকে জিভেও ঠেকাতে নেই। পাকা হলেও সবুজ সেই ফল বিষে ভরা—মৃত্যু আসে সঙ্গে-সঙ্গে। শিখিয়ে দিল পাইথনের

গন্ধ চিনতে হয় কীভাবে এবং কোন গাছের রস দিয়ে গেছো মাকড়সার হুলের জ্বালা কমানো যায় চক্ষের নিমেষে।

পারস্পরিক শিক্ষার মাধ্যমে অনেক কাছে চলে এল দুটি মন।

একদিন গোধূলি লগ্নে নদীর ধারে পাশাপাশি বসে দুজনে শেখাচ্ছে দুজনকে, গাছের মাথায় চাঁদ উঁকি দিয়ে দেখছে আদম আর ঈভের কাণ্ড। এমন সময়ে দুজনেরই মুখের কথা হারিয়ে গেল—নৈ:শব্দ্য ভঙ্গ করে চলল কেবল গাইয়ে ব্যাঙের দল—বিরামহীনভাবে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পিটার বললে—কথাটা পেটে গজগজ করছে। কিন্তু মুখে আনতে পারছি না।

—কী কথা?

—বলব?

—নিশ্চয়।

—আ-আমি তো-তোমাকে—

—ভালোবাসো। এই তো? শ্বেতসুন্দরীর হাতের পরশ পেল তরুণ পুরুষ। খসে গেল সংযমের বাঁধন। ঠিক সেই সময়ে নির্ভুল লক্ষে দুষ্ট চন্দ্র তার কিরণপাত করল শ্বেতসুন্দরীর মোমের মতো সাদা নরম মুখে।

বিহ্বল কণ্ঠে পিটার বললে—জ্যাসোনা।

—পিটার, আমিও

—তুমিও?

—যেদিন থেকে তোমাকে দেখছি, সেইদিন থেকে। এই কদিন যে সুখ পেয়েছি তোমার সঙ্গে থেকে, তা হারাতে চাই না।

—জ্যাসোনা।

—আমাকে হরণ কর, পিটার।

—হরণ!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। আজ রাতেই চল পালাই।

—সে ভাবা যাবে'খন।

—নাগো, না। আজ রাতেই পালাতে হবে। আর সুযোগ আসবে না।

—কেন? আজ রাতেই কেন? কী বলতে চাও তুমি?

দ্বিধায় জিভ জড়িয়ে গেল জ্যাসোনার।

বললে আস্তে আস্তে—ওয়েপস আজ আমাকে চেয়েছে।

—চেয়েছে? মানে, ওয়েপস তোমাকে ভালোবাসে?

—দূর! আমাকে...আমাকে ওর দরকার।

—ও:! মাটির দিকে চেয়ে রইল পিটার। কথাটার মানে বুঝতে যেটুকু সময় লাগল, তার মধ্যেই দূরে জঙ্গলের মধ্যে শোনা গেল ব্যাঞ্জোর ঝংকার।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে জ্যাসোনা বললে—এসে গেছে ওয়েপস। যেতে আমাকে হবেই, পিটার। জংলিরা ওর হাতের মুঠোয় জিনের লোভে। গুলিবারুদও কেবল ওর কাছেই। উপায় নেই, পিটার, উপায় নেই। যেতে আমাকে হবেই।

লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল পিটার। ঠোঁটে ঠোঁট রেখে উন্মত্ত আবেগে ভালোবাসার পরশ এঁকে দিয়ে তিরের মতো জঙ্গলের অন্ধকারে হারিয়ে গেল শ্বেতসুন্দরী।

দন্তনির্ঘোষ শোনা গেল পেছনে। দাঁত কিড়মিড় করছে পিটার।

পরের দিন সন্ধ্যার দিকে গির্জের ঘরে নতুন দৃশ্য দেখা গেল।

জংলিরা যোদ্ধার বেশে এসেছে। মুখে লাল আর হলদে কাদার প্রলেপ, চুলে মধু-পক্ষী আর বুনো ময়ূরের পালক, গলায় মানুষের দাঁতের মালা। বাঁশের চেয়ারে আসীন তরুণ পুরুতের দিকে না তাকিয়ে মশগুল নিজেদের মধ্যে।

উসখুস করে উঠল জো। কোমরের খাপে গোঁজা ছোরার বাঁটে হাত চলে গেল বারবার।

বাইরে তখন সবুজ গোধূলি।

অবাক হয়ে চেয়েছিল পিটার। নিরস্ত্র সে। কিন্তু নির্ভীক।

জো'কে বলল—কী চায় এরা?

জো জিগ্যেস করলে জংলি ভাষায়। ওয়েপসের দৌলতে কিছু কিছু ইংরেজি শব্দ জানে জংলিরা। একজন লাফিয়ে উঠে বুক বাজিয়ে দাঁতের মালা ঝাঁকিয়ে উগ্র নাচ নেচে যা বললে জগাখিচুড়ি ভাষায়, জো তার সাদা মানে করে দিলে পিটারকে।

গির্জের দফারফা করে দেওয়া হবে। সোনালি মানুষ বলেছে, শয়তানের জল বন্ধ হয়ে যাবে পিটার এ গাঁয়ে থাকলে। কাজেই খানাপিনা নাচগান হবে শিগগিরই। চাই শয়তানের জল। মি: গড যেন কেটে পড়েন তার আগেই।

—খানাপিনা নাচগান হোক না, আমিও থাকব। নিরীহ সুরে বললে পিটার।

—হেড-হান্টারদের খানাপিনা নাচগানে কী হয় জানেন? অধীর কণ্ঠে বললে জো—কেন মুণ্ডুটা খোয়াবেন?

—জো, আরও নিরীহ সুরে পিটার বললে—ওদের বলে দাও, সোনালি মানুষ যদি ভগবানের পথ জুড়ে দাঁড়ায়, তাহলে তাকেও যেতে হবে শয়তানের কেল্লায়—সেইসঙ্গে নিয়ে যাবে সব্বাইকে—যারা যারা খাবে শয়তানের জল।

শুনে আর একটি কথাও বলল না জংলি যোদ্ধার দল। নি:শব্দে বেরিয়ে গেল কুঁড়ে ছেড়ে।

পনের মিনিটও গেল না।

দোলনা-বিছানায় শুয়ে বই পড়ছে পিটার, এমন সময়ে খুকখুক কাশি শুনে চোখ তুলে দেখল দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে দানবপুরুষ ওয়েপস। মুখে মিষ্টি হাসি। গালে বেরি ফল।

চিবোতে-চিবোতে বললে মধুক্ষরা কণ্ঠে—হ্যালো পাদ্রী, বাইবেল পালিশ করছেন নাকি?

—না। আপনার পথ চেয়ে আছি।

—আমার পথ চেয়ে? সত্যি?

—রাইফেলটা এনেছেন?

—রাইফেল!

—রাইফেলটা ফিরিয়ে দেবেন, এই আশায় পথ চেয়ে আছি।

—সে গুড়ে বালি, পাদ্রী, তা ছাড়া ভগবানকে নিয়ে যে ব্যাবসা করে, তার রাইফেল দরকার হয় না।

—আমার দরকার হয়।

—সেকথা যাক। শুনুন। কালকেই আপনি এ গাঁ ছেড়ে যাবেন।

—আবার সেই ছেঁদো কথা?

—যাওয়ার আগে একটা ছোট্ট পুরুতগিরি করে যাবেন।

—যথা?

—জ্যাসোনার সঙ্গে আমার বিয়েটা দিয়ে যাবেন।

—কক্ষনো না।

—তাহলে তাকে রক্ষিতা করেই রাখব।

হ্যামক থেকে ছিটকে গেল পিটার। কিন্তু দানবপুরুষ তৈরি ছিল। মোক্ষম এক ঘুষিতে পিটার ছিটকে গেল মাটিতে।

আঙুলের গাঁটে ফুঁ দিয়ে বললে ওয়েপস—ঠিক এইভাবেই শেষ হয়ে যাবেন আপনি। ছোরা ছুঁড়তে শিখিয়ে দেব—বিশ ফুট দূর থেকে চোখের পাতা কীভাবে কাটতে হয়—শিখিয়ে দেব। ইডিয়ট! রাইফেল পর্যন্ত নেই—এত সাহস কীসের?

মুখ থুবড়ে পড়ে রইল পিটার। জবাব দিল না।

পকেট থেকে আর এক মুঠো লাল বেরি বার করে মুখে পুরে বললে ওয়েপস—কালকে বিয়ে দেবেন। আর আজ রাত্রে ঠিক আটটার সময়ে পাকা দেখার খানা খেয়ে নেবেন। এই ঘরেই। বেচাল দেখলে শেষ করে দেব। রাত ঠিক আটটায়।

শূন্য হল দোরগোড়া। একভাবে মেঝেতে মুখ দিয়ে পড়ে রইল পিটার। পাক্কা আধ ঘণ্টা।

তারপর উঠে বসল। ঝোলা টেনে নামাল। ছবি আঁকা তার হবি। রঙের তুলি আর লাল রঙের শিশিটা নিয়ে মিলিয়ে গেল জঙ্গলের অন্ধকারে।

ফিরে এল আধ ঘণ্টা পরে। ঘর খালি। জংলি রাঁধুনী উধাও। কিন্তু টেবিল সাজিয়ে রেখে গেছে। পাঁচটা মোমবাতি জ্বলছে। অর্কিড ফুল ছড়ানো রয়েছে। বেগুনি পায়রার রোস্ট, মিষ্টি আলু আর এক বাটি লাল বেরি। যেমনটি ভেবে রেখেছিল পিটার—ঠিক তাই।

পকেট খালি করে ফেলল তরুণ পাদ্রী। মুখ ধুয়ে এসে বসল হ্যামকে। কিন্তু হনুর কালসিটে মিলোল না।

ঠিক আটটার সময়ে ঘরে ঢুকল ওয়েপস। পেছনে মোমসুন্দরীর মতোই তার ভাবী বউ। কাঠের পুতুল যেন। বসল টেবিলের সামনে।

হাসিমুখে দোলনা-বিছানা ছেড়ে নেমে এল পিটার। বসল ওয়েপসের ঠিক সামনের চেয়ারে।

হাসছিল ওয়েপস। উল্লাসের হাসি। কিন্তু আস্তে-আস্তে তা মিলিয়ে গেল পিটারের হাসি দেখে।

ভ্রূকুটি করে বললে—এত হাসি কীসের পাদ্রী?

—পাকা দেখার সময় মুখ গোমড়া করতে নেই। অমঙ্গল হয়।

নির্নিমেষে চেয়ে রইল ওয়েপস—মতলবটা কী?

—কিসসু না। আজ পাকা দেখা—

—পাদ্রী, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় না থাকলে এত বিপদ মাথায় নিয়ে এ জঙ্গলে কেউ থাকতে পারে না। আমার তা আছে। মেয়েদের মতোই আসন্ন বিপদ টের পাই আমি। রাত ফুরোলেই যার প্রিয়তমা আমার শয্যাসঙ্গিনী হয়ে যাচ্ছে বাইবেল সাক্ষী রেখে—আজ তার মুখে এত হাসির ফোয়ারা কেন?

হাসতে হাসতেই বললে পিটার পাদ্রী—সেইটাই যে আমাদের কাজ।

নির্নিমেষে তবুও চেয়ে রইল ওয়েপস। অন্যমনস্কভাবে হাত বাড়িয়ে বাটি থেকে পাকা বেরি তুলে নিয়ে গালে ফেলে চিবুতে-চিবুতে কী যেন ভাবতে লাগল। চোখ ঘুরে এল ঘরময়। কোথাও কোনও অস্ত্র নেই। চোখ ফিরে এল পিটারের ওপর। মুখে হাসি লেগে তখনও।

আর এক মুঠো বেরি মুখে পুরল ওয়েপস। মুখটা বিকৃত হয়ে এসেছে।

না, রাগে নয়। যন্ত্রণায়। চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ঠোঁটের কোণ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরুচ্ছে।

টলছে তার দৈত্যদেহ। পরক্ষণেই থু-থু করে মুখ ভরতি আধ চেবানো বেরি ফল পিটারের দিকে ছিটিয়ে দিয়ে বললে অবরুদ্ধ স্বরে—তু—তুই—

উঠে দাঁড়াল পিটার। এখন আর হাসছে ন।

বললে—হ্যাঁ, ওয়েপস। শয়তানের জল খেয়েছ এতদিন—এবার খেলে শয়তানের ফল। সবুজ বেরি। পাকা। কিন্তু লাল রং করা। আমিই করে এনে মিশিয়ে রেখেছিলাম লাল বেরির বাটিতে। মিষ্টি খেতে না?

জবাব দিতে পারল না ওয়েপস। হুমড়ি খেয়ে পড়ল টেবিলে। সেখান থেকে মেঝেতে।

জ্যাসোনা উঠে দাঁড়াল আস্তে-আস্তে। মৃত্যু স্বচক্ষে দেখেও সে প্রশান্ত। চাউনি অতলান্ত।

ধীরকণ্ঠে বললে পিটার—আজ আমাদের পাকা দেখা। এসো।

পরের দিন সকালে জো ক্যানো নিয়ে রওনা হল শহরের দিকে। গাঁয়ের লোককে বলে গেল—ডাক্তার আর ওষুধ আনতে যাচ্ছে ওয়েপসের জন্যে। বড় অসুস্থ সে। প্রাথমিক চিকিৎসার ভার রইল পাদ্রীর ওপর। জংলিরা যেন তাকে সাহায্য করে।

তীরে দাঁড়িয়ে অপলকে পিটার আর জ্যাসোনা চেয়ে রইল অপসৃয়মান ক্যানোর দিকে।

ওরা জানে—কাকে নিয়ে আসবে জো।

*'নবকল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশিত। জানুয়ারি, ১৯৮১।
অ্যাড্রিয়ান কন্যান ডয়ালের গল্প অবলম্বনে।

বনি আর ক্লাইড

দিবসরজনীর বিভীষিকা ছিল ওরা...

মরণের ডঙ্কা বাজিয়ে গেছে নগরে নগরে...

এক কিশোর আর কিশোরীর রুধির-পিপাসার রক্তাক্ত কাহিনি।

হলিউডের ফিল্ম-ক্যামেরা বিপুল গ্ল্যামার এনে দিয়েছে বনি আর ক্লাইডের শোণিতসিক্ত জীবন-উপাখ্যানে। সময় অনেক কিছুই গ্রাস করে, আবার অনেক কিছুকেই মর্যাদা দেয়। বনি আর ক্লাইড এমনই দুটি ব্যক্তি যাদের মহাকাল মুছে ফেলতে পারেনি, রুপোলি পরদার মহিমায় যারা কলঙ্কিত চরিত্র নিয়েও বীরত্বের শিরোপা পেয়েছে।

রবিনহুড চরিত্রকে কেন্দ্র করে কিংবদন্তীর অভাব নেই। বনি আর ক্লাইডও বহু আশ্চর্য কিংবদন্তীর স্রষ্টা। রবিনহুড ছিল ধনীর ত্রাস। গরিবের সহায়। বনি আর ক্লাইডও ছিল নিয়মের নিগড়-পরা সমাজে বিদ্রোহের বহ্নিশিখা। লড়ে গেছে আমৃত্যু নিজেদের দাবি আদায়ের সংগ্রামে, সারা আমেরিকা জুড়ে তখন নেমেছে নৈরাশ্যের নিকষ তমিস্রা। বনি আর ক্লাইড নগরে-নগরে উড়িয়েছে মরণের কেতন, খেলেছে রক্তের হোলিখেলা।

কিন্তু সত্যিই কি মাথায় তুলে নাচার মতো মানুষ ছিল বনি আর ক্লাইড?

না! না! একেবারেই না!

যুগল-খুনে ডাকাত ছাড়া তাদের আর কিছুই বলা যায় না। বড় মাপের খুনি নয়, ডাকাতও নয়। রবিনহুড বা বিশে ডাকাতের মতো মহান আর দরদি ছিল না তারা কস্মিনকালেও। লুঠ করেছে নিছক নিজেদের স্বার্থে—দশের কল্যাণের জন্যে নয়। নরহত্যা করেছে নির্বিচারে কেবল মাত্র ধরা পড়ার ভয়ে। পুলিশকে ঘৃণা করত তারা সমস্ত অণু-পরমাণু দিয়ে অধিকাংশ নীচুদরের অপরাধীর মতোই। নরশোণিতের তৃষ্ণা জাগ্রত হয়েছে মজ্জাগত এই ঘৃণা থেকেই। আমেরিকার পয়লা সারির খুনে গুন্ডারা বলত, জনসাধারণের এক নম্বর শত্রু হল বনি আর ক্লাইড।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল তারা এদের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে।

বনি আর ক্লাইড! দুর্বৃত্তদেরও দিবানিশির আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল অতি সাধারণ দুটি ছেলে আর মেয়ে। ছিমছাম ব্যাঙ্ক ডাকাতদেরও, মাথা হেঁট হয়ে যেত এদের এক একটা নারকীয় কীর্তির পর। খুন! খুন! খুন! খুন করাটাই ছিল তাদের একমাত্র উৎকট উল্লাস। জাহান্নমে যাওয়া এক কিশোর আর এক কিশোরীর অন্তরের অন্দরে এহেন পৈশাচিক আনন্দের চাহিদা এল কীভাবে, এবার তা দেখা যাক।

প্রচণ্ড প্রেম

ক্লাইডের পুরো নাম ক্লাইড চেস্টনাট বারো। বাবা ছিল টেক্সাসের গরিব চাষা। আট ছেলে মেয়ে। ষষ্ঠজন এই কীর্তিমান—ক্লাইড।

ক্লাইডের জন্ম ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের চব্বিশে মার্চ। ছেলেবেলা থেকেই অতিশয় বদমেজাজি। মাথায় রক্ত চড়ে যেত একটুতেই। ভয়ানক অবাধ্য আর একগুঁয়ে। আর একটা গর্হিত বাসনা সুপ্ত ছিল তার চরিত্রে তখন থেকেই—সমকামিতা!

কিন্তু তার প্রচণ্ড প্রেম ছিল মাত্র দুটি বস্তুর ওপর।

একটি ধ্বংসের দূত, আর একটি গতিবেগের।

বন্দুক আর মোটরগাড়ি ছিল তার জীবনের সব চাইতে প্রিয়...প্রাণের চাইতেও।

ক্লাইড-চরিত্রের সবচেয়ে ভয়ানক দিকটি ছিল কিন্তু তার মানসিক বিকৃতি। স্যাডিজম! অপরকে কষ্ট দিয়ে বুকভরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেত বাচ্ছাবেলা থেকেই। আর এই মানসিক বিকৃতির জন্যেই অমানুষিক নিষ্ঠুরতা প্রশ্রয় পেয়ে এসেছে তার চরিত্রে কাঁচা বয়স থেকেই।

ক্লাইডের পৈশাচিক প্রবৃত্তির কিছু-কিছু ঘটনা পাওয়া গেছে তার বাল্যবন্ধুদের কাছ থেকে। সাক্ষী আছে প্রতিবেশীরাও। মুরগি ছানার ঘাড় মুচড়ে রগড় দেখত ক্লাইড—মরো মরো না হলে ছাড়ত না। একটা জীবন্ত প্রাণীকে অকারণে তিল-তিল করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দিয়ে নারকীয় উল্লাস চোখেমুখে ফুটিয়ে তুলত, যা নাকি নজিরবিহীন। যন্ত্রণায় ছটফট করত মুরগি ছানা, পরমানন্দে তা প্রত্যক্ষ করত ক্লাইড। কখনও-সখনও পাখা ভেঙে দিত পাখির। ভাঙা ডানা নিয়ে ওড়বার বৃথা চেষ্টায় যখন ঘুরে-ঘুরে আছড়ে পড়ত হতভাগ্য বিহঙ্গ—অকপট হর্ষে অট্টহাস্য করত ক্লাইড।

বনি মেয়েটাও একসময়ে শক্ত ধাঁচের মেয়ে বলে নাম করেছে। মেয়েরা সিগারেট খায়—কিন্তু চুরুট খায় কি? বনি কিন্তু দাঁতে কামড়ে চুরুট খেত পাকা চুরুটখেকোদের মতো। যেন ইস্পাত দিয়ে গড়া বনি বালিকা বয়স থেকেই অতিরিক্ত যৌনক্ষুধায় ছটফট করেছে। রতিক্রিয়ায় ভাঁটা দেয়নি কখনও।

ক্লাইডের চেয়ে বয়েসে সে ১৮ মাসের ছোট। তবে সামাজিক প্রতিপত্তির দিক দিয়ে ক্লাইডের চেয়ে এক ধাপ উঁচুতেই ছিল বলা যায়। ক্লাইডের বাবা ছিল চাষা। আর বনির বাবা তৈরি করত ইঁট।

বনির বাবা মারা যান বনির চার বছর বয়সেই। পুরো ফ্যামিলিটা তখন চলে আসে টেক্সাসে। ডালাসের কাছে সিমেন্ট সিটিতে আস্তানা নেয়।

ক্লাইড কিন্তু তার আগে থেকেই আসর জাঁকিয়ে বসেছিল পশ্চিম ডালাসে। বাবা চাষবাস করে সংসার চালাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিল বলেই মাঠ ছেড়ে চলে আসে পেট্রল পাম্পের ব্যবসায়। গাড়ি আসছে এন্তার, খালি তেল ভরে দেওয়া। রোজগার মন্দ হচ্ছিল না।

বনি আর ক্লাইডের প্রথম দেখাশুনা কবে কীভাবে হয়েছিল—তা কিন্তু সঠিক জানা যায়নি। বেধড়ক খুন আর ডাকাতি করে যাওয়ার ব্যাপার-স্যাপারগুলো যেমন রহস্যাবৃত—খুঁটিনাটি বিবরণ জানা যায়নি কোনওদিনই—ঠিক তেমনি এই কীর্তিধন্য ব্যক্তি দুটির প্রথম মিলন কাহিনিও ধোঁয়াটে রয়ে গেছে আজও।

তবে বনির মা মিসেস পার্কারের মুখে যে ঘটনাটা শোনা গেছে, অজস্র রোমান্টিক রটনার মধ্যে সেইটাকেই খুবই সম্ভাব্য বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। ক্লাইডের বয়স যখন একুশ আর বনি সবে উনিশ বছরের জন্মদিবস পালন করেছে—সেই সময়ে দেখা হয় দুজনের দৈবাৎ। বনির এক বান্ধবী ছিল ক্লাইডেরও বান্ধবী। কমন ফ্রেন্ড। মেয়েটির হাত ভেঙে যাওয়ায় তার সেবায় উঠে পড়ে লেগেছিল ক্লাইড। বনি আর ক্লাইডের ঘটনাবহুল জীবন-সড়কের মিলন ঘটেছিল হাতভাঙা এই মেয়েটির বিছানার পাশে।

বনিকে দেখেই পটেছিল ক্লাইড। প্রথম দর্শনেই প্রেম। এমন কিছু আহামরি দেখতে ছিল না বনি। ছোটখাটো আকৃতি। পাঁচ ফুট লম্বাও নয়। চোখের রং নীল। নির্লজ্জভাবে উদ্ধত আর বেহায়া। লাল মুখ।

ক্লাইডকেও এক নিমেষ ভালোবেসে ফেলেছিল বনি, অথচ চোখ যার 'সাপের মতো', চালচলন যার মেয়েলি—তাকে মেয়েরা চট করে 'জীবনমরণের সখা' বলে বুকে জড়িয়ে ধরে না!

কিন্তু ভবিতব্য এড়ানো যায় না। অন্যদের কাছে এই দুই মূর্তি অচল হতে পারে—দুজনে দুজনের কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠল পলক দর্শনেই।

শুরু হয়ে গেল বনি আর ক্লাইডের যুগল ক্রীড়া। রক্তজমানো বুক কাঁপানো ঘটনার পর ঘটনা।

সেই রাতেই সিমেন্ট সিটির বাড়িতে বনি এল ক্লাইডকে সঙ্গে নিয়ে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কত কথাই বলে গেল দুজনে। কথা যেন আর ফুরোয় না। আশ মিটিয়ে দুজনে দুজনকে দেখছে তো দেখছেই।

রাত গভীর হল। এত রাতে দুরন্ত মেয়ের রহস্যময় বন্ধুকে তো আর বলা যায় না—বাপু হে, এবার পথ দেখো। চোখ যার সাপের মতো—তাকে অন্তত সাফ কথাটা বলতে পারেননি মিসেস পার্কার। উলটে বসবার ঘরে একটা বড় সোফায় তার শোওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

পরে বলেছিলেন—যাক বাবা, বাঁচা গেল! রয় সরে পড়ার পর থেকেই হেদিয়ে মরছিল মেয়েটা। ক্লাইডকে নিয়ে মেতেছে—ভালোই করেছে।

যে কাজ অপরাধীদের মানায়

রয়! সে কে?

পুরো নাম তার রয় থর্টন। যে বয়েসে ছেলেমেয়েরা নির্মল মেলামেশা আর খেলাধুলোয় মেতে থাকে—সেই বয়েসেই রয়ের সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম এবং 'ইত্যাদি' চালিয়ে গেছে বনি। যৌনপিপাসার নিবৃত্তি ঘটাতেই মাত্র ষোল বছর বয়েসে প্রিয়তম রয়কে বিয়েও করে ফেলেছিল বনি। যার প্রতিটি রক্তকোষ কামনার লেলিহান শিখায় সদা উদ্দীপ্ত—তার পক্ষেই মানায় এতটা বেহায়াপনা।

কিন্তু শাশুড়িঠাকরুণের দাপটে বিয়ে ভেঙে দিতে হয় বছর কয়েকের মধ্যেই। ছেলের ওপর ধকল যাচ্ছে দেখে ছেলের মা স্থির থাকতে পারেনি। দূর দূর করে খেদিয়ে দিয়েছে খুদে বউকে—যার লাসলা আর কামনা, দেহের আর মনের খিদে মিটোনোর ক্ষমতা ছিল শুধু একজনেরই—ক্লাইডের!

বিতাড়িত হয়ে মায়ের কাছে ঠাঁই পেয়েছে বনি। আবার এই মা-ই ক্লাইডকে ঠাঁই দিয়েছে বাড়িতে প্রথম দর্শনের দিনেই। বনির জীবনে তাই একটা বিরাট ভূমিকা নিয়েছে এই মা। ক্লাইডের কাছেও মা ছিল শ্রদ্ধা আর সম্মান, ভালোবাসা আর পরম আশ্রয়ের স্থল। আতঙ্কের পর আতঙ্ক সৃষ্টি করে দুজনে যখন বেশ কয়েকটা স্টেটের পুলিশ বাহিনীকে সন্ত্রস্ত আর সজাগ করে তুলেছে তখনও পুলিশের চোখে বেমালুম ধুলো দিয়ে বনি আর ক্লাইড হাসতে-হাসতে দেখা করে গেছে যে-যার মায়ের সঙ্গে। প্রতিটি অভিযান রোমাঞ্চকর এবং রক্তঝরানো—তবুও পুলিশ তাদের টিকি ধরতে পারেনি।

বিশ্ব ইতিহাসে এমন কুলিশকঠোর করাল নির্মম চরিত্র আর আছে কিনা সন্দেহ।

বনি আর ক্লাইডের মিলন ঘটে যাওয়ার দিন থেকেই বলা যায় শুরু হয়ে গেল ওদের যৌথ অ্যাডভেঞ্চার। মিসেস পার্কারের দৌলতে বড় সোফায় শুয়ে নিরুদ্বেগে নাক ডাকাচ্ছে ক্লাইড—রাতভোর হয়েছে, ভোরের পাখি ডাকছে...এমন সময় পুলিশ হানা দিল সেই ঘরেই!

ক্লাইডকেই চাই তাদের। কেন? কারণটা শুনে মিসেস পার্কার তো থ! চোখ দেখেই নাকি মানুষ চেনা যায়—ক্লাইডের সাপের মতো চোখ দেখে তাহলে তিনি অকারণে শঙ্কিত হননি।

ছোটখাটো মেয়েলি চেহারার ছোকরার গুণের তো ঘাট নেই! এই বয়সেই গাড়ি চুরি করেছে বেধড়ক, ডাকাতি করেছে হাসতে-হাসতে। এক-আধটা নয়—সাত-সাতটা চার্জ ঝুলছে তার বিরুদ্ধে। সপ্ত অপরাধে অপরাধী ফিচেল ছোকরা এর পরেও ভিজে বেড়ালের মতো নিরীহ নিপাট ভদ্রলোক সেজে প্রেম করতে পারে তার মেয়ের সঙ্গে এবং যেন ভাজামাছটি উলটে খেতে জানে না—এমনি শান্তশিষ্ট সুবোধ বালকের মতো অমন বিচ্ছিরিভাবে নাসিকা গর্জন করে ঘুমোতে পারে প্রণয়িনীর বসবার ঘরে?

বেচারি মিসেস পার্কার! ভেবেছিলেন, প্রথম জামাই সরে পড়ার পর দ্বিতীয় জামাইকে নিয়ে দিনগুলো শান্তিতে কাটাবেন। কিন্তু এ কী আপদকে সোফায় ঘুমোতে দিয়েছেন? এ যে খাল কেটে কুমির ডেকে আনা!

বনি কিন্তু চেঁচিয়ে-মেচিয়ে একসা করেছিল। তার চোখের সামনেই পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে ক্লাইডকে? এত বড় স্পর্ধা? হিস্টিরিয়া রোগে পেয়েছিল তাকে সেই মুহূর্তে! তারপর কিন্তু চোখের পাতা আর কাঁপেনি।

একেবারেই না। নরহত্যা, চুরি, ডাকাতি আর গুলিবৃষ্টির ঝড় বইয়ে দিয়েছে দুজনে মিলে কিছুদিন পর থেকেই। দাঁতে চুরুট কামড়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছেড়েছে মুখে—আগ্নেয়াস্ত্রের ঘোড়া টিপে ধূম্রজাল রচনা করেছে

নগরে-নগরে। চিত্ত চঞ্চল হয়নি এতটুকুও। মনের মানুষকে পেয়ে বনি দেখিয়ে দিয়েছে নারী নারকীয় হতে পারে কতখানি।

জেলখানায় থাকতেই হত ক্লাইডের টানা চোদ্দো বছর। কিন্তু ভিজে বেড়ালের গাঁটে-গাঁটে কুচুটে বুদ্ধির তো অন্ত নেই। তাই ভেবেচিন্তে সাতটা অপরাধের মধ্যে তিনটে অপরাধের আদ্যোপান্ত স্বমুখে নিবেদন করল আদালতে। অপরাধী নিজেই যখন অপরাধ স্বীকার করে, কবুল জবাব দেয়—তখন ধর্মাবতারের কঠিন প্রাণ গলে যায়, শাস্তির বহর কিঞ্চিৎ কমিয়ে দেন।

ধুরন্ধর ক্লাইড এমন অভিনয় করে গেল যেন নিদারুণ আত্মগ্লানি আর অনুশোচনা তাকে কুরেকুরে খাচ্ছে ভেতর থেকে। বোকা বনে গেল প্রত্যেকেই। চোদ্দ বছরের জায়গায় মাত্র দু-বছরের শ্রীঘর বাসের সাজা মাথা পেতে নিয়ে মুখ টিপে হেসে জেলখানার চেহারাটা দেখতে গেল ক্লাইড।

কৌতূহলী পাঠিক পাঠিকা নিশ্চয় জানতে ইচ্ছুক, কড়া ধাতের মেয়ে বনি সাধারণ মেয়ের মতো অত চেঁচামেচি করেছিল কেন ক্লাইডকে ধরে নিয়ে যাওয়ার সময়ে?

খুবই সমীচীন কৌতূহল!

বনির মা মিসেস পার্কার সর্পচক্ষু ভাবী জামাইয়ের অতীত কাহিনি কিছুই জানতেন না। তাই তিনি ভেবেছিলেন—এবং পরে সবাইকে বলেও দিলেন—আহা রে! সদ্য ভালোলাগা মানুষটা এত কুকাণ্ড করে বসে আছে, জানতে পেরে মেয়ে আমার বড্ড শক পেয়েছিল!

ভুল! ভুল! মা হয়েও মেয়েকে তিনি চিনতে পারেননি।

বনি সব জানত। পরিচয়ের প্রথম পর্বেই নরপিশাচ ক্লাইড তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে বুঝে ফেলেছিল—এই সেই বিরল কন্যা যার কাছে তার যাবতীয় দুষ্কৃতির কেচ্ছা অকপটে বিবৃত করা যায়। তাই কিছুই গোপন করেনি ক্লাইড। সাত-সাতটা অপরাধের ইতিবৃত্ত সগৌরবে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিল নিবিষ্টচিত্ত শ্রোতা বনির কর্ণরন্ধ্রে।

পুলকিত হয়েছিল বনি। খুবই! এই বয়েসেই এত কুকীর্তি। অহো! অহো! মনুষ্যদের মধ্যে এমন প্রাণী যে অতিশয় দুষ্প্রাপ্য!

এহেন মনের মানুষকেই কিনা রাত ভোর হতেই চোখের সামনে দিয়ে ধরে নিয়ে গেল বেআক্কেলে পুলিশ!

প্রচণ্ড ক্রোধে তাই ফেটে পড়েছিল বনি। বিপুল নৈরাশ্যে আচ্ছন্ন হয়েছিল তার চিত্তাকাশ! হায়! হায়! হায়! কত স্বপ্ন সে দেখেছিল এই একটা রাতেই। অজস্র রোমাঞ্চ কল্পনায় বিভোর ছিল সুখনিদ্রায়! কত স্বপ্নই দেখেছিল একটি মাত্র বিভাবরীতে—সব ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে গেল হতচ্ছাড়া পাজি বদমাশ পুলিশবাহিনী!

রাগ হবে না? হওয়াই উচিত! অন্তত বনির মতো ডাকসাইটে মেয়ের। নতুন মানুষটাকে বুকের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল যে আরক্ষাবাহিনী, তাদের সে ক্ষমা করতে পারেনি আমৃত্যু—শুধু এই কারণেই।

কিন্তু মনের মধ্যে রাগ পুষে রেখে প্রিয়তমের ছবি বুকে নিয়ে দু-দুটো বছর প্যান প্যান করে কেঁদে কাটিয়ে দেওয়ার মানুষ নয় বনি—সে যে কী ধাতু দিয়ে তৈরি তা তার গর্ভধারিণী জননীও অতিবড় দু:স্বপ্নেও কল্পনা করে উঠতে পারেননি। তা না হলে তিনি বলেন—'ক্লাইড ছোঁড়াটাই যত নষ্টের গোড়া। ওই হাবাতেটার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে আমার মেয়ে অপরাধ কী জিনিস জানত না—অপরাধীদের ছায়া পর্যন্ত মাড়াত না!'

মায়েরা অন্ধ হন চিরকালই। মিসেস পার্কারের তাই দোষ নেই।

বলা যাক বনির কথা। ক্লাইড তো গেল হরিণবাড়ি, মানে, জেলে। বণি কিন্তু পণ করল, এইরকম একটা ক্ষণজন্মা পুরুষকে দু-দুটো বছর জেলখানার পাঁচিল দিয়ে ঘিরে রাখলে দেশের বিরাট ক্ষতি অনিবার্য! সুতরাং অবিলম্বে তার মুক্তির ব্যবস্থা করা যাক।

বলা বাহুল্য, ব্যবস্থাটা আইনের পথে নিশ্চয় নয়। বিলক্ষণ প্রশান্তচিত্তে একদা এক শুভলগ্নে একটা রিভলভার নিয়ে জেলে ঢুকল বনি—পাচার করে দিলে ক্লাইডের হাতে।

রক্ত নেচে উঠল ক্লাইডের ধমনীতে। মারণাস্ত্রকে কোমরে লুকিয়ে রেখে রইল সুযোগের প্রতীক্ষায়। এবং সুযোগ যখন এল, তখন উপর্যুপরি রিভলভার নির্ঘোষে সচকিত হল জেলখানা। উধাও হয়ে গেল শ্রীমান ক্লাইড।

একা নয়—সঙ্গে আরও দুজন জেলখাটা আসামিকে নিয়ে।

কিন্তু জেলখানার জাল পা থেকে ছাড়াতে পারল না অত চটপট। আবার শ্রীঘরে ফিরে আসতে হল অল্পদিনের মধ্যেই—

না, না, জেল থেকে পালানোর নিছক অপরাধে নয়—আরও একটা আনকোরা অপরাধ করে ফেলায়।

হাত নিশপিশ করছিল ক্লাইডের। বনের পাখিকে খাঁচায় পুরে রাখলে তার মনে ময়লা লাগবেই। এই ময়লা সাফ করার জন্যেই যেন পাগল হয়ে গেছিল ক্লাইড। তাই আর তর সইল না।

ওহিও-র মিডলটন শহরের রেলওয়ে অফিসে হানা দিল ক্লাইড। দুর্বার বেগে তছনছ করে দিয়ে গেল গোটা অফিস। লুটপাট, ডাকাতি। একাই একশো।

মন তাতে একটু শান্ত হল বটে, কিন্তু অশান্ত হল পুলিশবাহিনী। বড় চতুর, বড় দক্ষ সে দেশের নগর রক্ষীরা, তাই ঝটপট জালে ফেলে তুলে নিল শ্রীমান ক্লাইডকে! চালান করল আদালতে। আদালত থেকে শ্রীঘরে। এবার দয়াদাক্ষিণ্য, কৃপা, অনুকম্পা নয়—পুরো চোদ্দ বছর বনবাস, থুড়ি, শ্রীঘরবাস করতে হবে ক্লাইড মহাপ্রভুকে।

এবং এই শ্রীঘরবাসের ফলেই বেশ খানিকটা পালটে গেল ক্লাইড। ছেলেবেলা থেকেই যে ছিল বুনো, দামাল, দুর্বার কিন্তু স্নেহকোমল—জেলখানায় থেকে সে হল কুলিশকঠোর এবং তিক্ত। সুকুমার মনে অপরকে ভালোবাসার যেটুকু প্রবৃত্তি প্রচ্ছন্ন ছিল—হরিণবাড়ির রূঢ় বাস্তবতায় তা উবে গেল একেবারেই। জেলখানায় থেকে ক্লাইড হয়ে গেল পুরোপুরি নিষ্করুণ, নির্দয়, নির্মম!

টেক্সাসের জেলখানা তো আর প্রমোদকেন্দ্র নয়—পিকনিক করার জায়গায়ও নয়। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে যেতে হত আসামিদের রৌদ্রতপ্ত তুলোর খেতে। কাজে ঢিলেমি দিলে অথবা 'এত খাটতে পারছি না' বলে গাঁইগুঁই করলেই রাম ধোলাইয়ের ব্যবস্থাও আছে। মারের চোটে চোখে সর্ষেফুল দেখিয়ে ছাড়ে—পিতৃপুরুষের নামও বিস্মৃত হতে হয়। মার খেয়ে এবং ক্লান্ত গতরে কাহিল হয়ে গেলেও রাত নামলেই ছুটে-ছুটে সমস্ত রাস্তা পেরিয়ে ফিরে আসতে হয় জেলখানায় খাঁচাবন্দি হতে। ঘোড়ায় চড়ে ওয়ার্ডাররা তাড়িয়ে নিয়ে যায় চাবুকের সুমধুর সঙ্গীত শোনাতে-শোনাতে এবং কশাঘাতের তীব্র জ্বলুনি সওয়াতে-সওয়াতে। পিছিয়ে পড়লেই চাবুক আর চাবুক! পালানোর প্রশ্নই ওঠে না।

প্রথম নরহত্যা

সুতরাং কাজ না করার একটা উপায় বের করতে হয়েছিল কয়েদিদের। বড় অভিনব উপায়। শুনলেও গা শিরশির করে।

গোড়ালির কণ্ডরা অর্থাৎ টেন্ডন কেটে দিত নিজেরাই। অমানুষিক পরিশ্রম থেকে পলায়নের অমানুষিক প্রক্রিয়া।

সোনার চাঁদ ক্লাইড এগিয়েছিল আরও একধাপ বেশি। জনাকয়েক কয়েদিকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নৃশংসতম একটা কাজে তাকে সাহায্য করতে রাজি করিয়েছিল। বাঁ পাখানা তাদের সামনে এগিয়ে ধরে দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিল বন্ধু কয়েদিদের—'হাঁ করে দেখছ কী? চালাও?'

ক্লাইডের কাণ্ড দেখে হতবাক হলেও তার অনুরোধ রেখেছিল কয়েদি-বন্ধুরা। মাথার ওপর তুলে ধরেছিল ধারালো কুঠার। এক কোপে বাঁ পায়ের পাতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল দু-দুখানা আঙুল।

এরই নাম ক্লাইড! কশাই ক্লাইড! অভীষ্ট সিদ্ধির জন্যে কোনও কাজই পরাঙমুখ নয়।

হাড়ভাঙা খাটুনি বন্ধ হল আঙুলহারা ক্লাইডের। হাঁটাচলা করার জন্যে জেলখানা থেকেই তাকে দেওয়া হল একজোড়া ক্রাচ। এই ক্রাচেই ভর দিয়ে ঘুরে-ঘুরে সময় কাটাত নিষ্কর্মার ধাড়ি। এমন সময়ে ভগবান—ক্লাইডের ভগবান—মুখ তুলে চাইলেন।

১৯৩২ এর ফেব্রুয়ারি মাসে জেল থেকে অকস্মাৎ খালাস পেল ক্লাইড। টেক্সাসের নতুন গভর্নর হয়ে এসেছিলেন একজন দয়াময়ী। সবাই তাঁকে মা বলে ডাকত। নামটাই হয়ে গেছিল 'মা' ফার্গুসন। ইনি গভর্নর হয়েই সমস্ত কয়েদিদের মুক্তি দিলেন। ভালোভাবে থাকো, সৎপথে থাকো—এই ছিল তাঁর বিদায়বাণী।

একই সদুপদেশ দিয়েছিলেন বনির গর্ভধারিণী মিসেস পার্কার। বলেছিলেন—'এবার আক্কেল হয়েছে তো? শুধু নিজের জন্য নয়—অন্তত বনি মেয়েটার মুখ চেয়ে বাকি জীবনটা সরল পথে কাটিয়ে দাও।'

জেল থেকে ফিরে বাড়ি ঢুকতেই হাসতে-হাসতে কাঁদতে-কাঁদতে এই কথাই মিসেস পার্কার বলেছিল গুণধর ভাবী জামাইকে।

বচনে তুখোড় ক্লাইড তৎক্ষণাৎ আশ্বস্ত করেছিল শাশুড়িঠাকরুণকে এই ভাষায়—'চেষ্টা আমি করে যাব। তবে কি জানেন, সরলপথে বেঁচে থাকাটা আর তত সহজ হবে না। কে কাজ দেবে আমাকে? তাছাড়া যখনি যেখানে ডাকাতি হবে—গোয়েন্দারা ডাকাতদের টিকি ধরতে না পারলেই আমাকে নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করবেই। চাকরি যদিও বা পাই, সে চাকরি থাকবে না।'

চাকরির চেষ্টা করেছিল বইকি ক্লাইড। খুবই সাধারণ দাসত্ব মাথা পেতে নেওয়ার প্রথম প্রয়াসে ছিল বিলক্ষণ আন্তরিকতা। ওর এক বোনের বান্ধবীর স্বামী কাজ করত ম্যাসাচুসেটস এর একটা ঘরবাড়ি তৈরির কোম্পানিতে। ক্লাইডকে সে কথা দিয়েছিল—চাকরি জুটিয়ে দেবেই একই কোম্পানিতে।

কিন্তু ম্যাসাচুসেটস তো দশ-পা দূরের জায়গা নয়—দেশের একেবারে অন্যপ্রান্তে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে অনেক দূরের জায়গায় ক্লাইড গেছে বহুবার—কিন্তু এতদূরে তো কখনও যায়নি।

গৃহছাড়া ক্লাইডকে এতদূরের জায়গায় বড্ড 'একা-একা' থাকতে হয়েছিল পুরো আধমাস! তারপর বাড়ির জন্যে এমনই মন কেঁদে উঠল যে আর তাকে সেখানে ধরে রাখা গেল না।

পুলিশের ভয়ে জুজু হয়ে থাকতেও ভালো লাগছিল না 'ভালোমানুষ' ক্লাইডের। তাই একদিন ফিরে এল পশ্চিম ডালাসে। ফিরে আসার কারণটা ধানাইপানাই করে বুঝিয়ে দিলে এইভাবে—'সারাটা জীবন যদি পুলিশের চোখ এড়িয়েই আমাকে থাকতে হয়, তাহলে এমন জায়গায় থাকতে চাই যেখান থেকে ঘাপটি মারা যাবে যখন তখন—দোস্তদের সঙ্গে দহরম-মহরম করে আসা যাবে।'

এর ঠিক তিনদিন পর...মানে, ম্যাসাচুসেটস থেকে সৎকর্মের সুযোগ ছেড়ে ক্লাইডের ফিরে আসার ঠিক তিনদিন পর...গৃহত্যাগ করল বনি।

মা'কে বলে গেল—'হিউসটনে একটা কাজ পেয়েছি। দোকানে বসে কসমেটিকস বিক্রির কাজ।'

কথাটা ডাহা মিথ্যে। দু-বছরব্যাপী রক্তঝরানো অভিযানে ক্লাইডকে সঙ্গ দিতে ঘর থেকে পথে নেমেছিল বনি। ডাকাতি আর নরহত্যার অভিযানে। পরে এই খুনে ডাকাতদের দলটারই নাম হয়েছিল 'বারো গ্যাং'। জনগণের পয়লা নম্বর শত্রু। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে বিভীষিকা সৃষ্টি করে বেরিয়েছিল একটানা দু-বছর!

তখন মার্চ মাস, ১৯৩২ সাল। বারো গ্যাং-এর প্রথম নরহত্যা অনুষ্ঠিত হল সতেরোই এপ্রিল। টেক্সাসের হিলসবরো শহরে জন ডব্লিউ বুচার নামে এক মণিকারকে গুলিতে-গুলিতে ঝাঁঝরা করে ছাড়ল শোণিতপিপাসুরা। লুঠ করল কত? মাত্র চল্লিশ ডলার!

মাত্র চল্লিশ ডলারের জন্যে খুনটা তাহলে করল কোন নরাধম? ক্লাইডের সাফাই যদি মেনে নিতে হয়, তাহলে অন্তত এই ঘটনায় সে নিষ্পাপ। ক্লাইড গাড়ি চালাচ্ছিল—দলবলকে গাড়িতে তুলে চম্পট দিয়েছিল।

গুলি চালিয়েছিল দলের দুই স্যাঙাত!

বনি তখন কোথায়?

ঠিক এই ঘটনার সময়ে সে তখন জেলখানায়। গাড়ি চুরির অপরাধে ধরা পড়েছিল পুলিশের হাতে। ছাড়া পেয়েছিল তিনমাস পরে—কিন্তু নিষ্কৃতি পেয়েছিল গাড়ি চুরির অপবাদ থেকে।

আর ঠিক এই সময়েই হত্যা-পাগল ক্লাইড নতুন স্যাঙাত নের হ্যামিলটন এবং আরও দুই দোস্তকে নিয়ে যমালয়ে পাঠিয়েছে ওকলাহোমার ওটোকা শহরের ডেপুটি শেরিফ মুরকে।

আচমকা গুলি বর্ষণটা ঘটেছিল একটা নাচঘরের বাইরে। আকণ্ঠ মদ্যপান করছিল ক্লাইড আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা। একজন স্যাঙাত আস্ত একটা হুইস্কির বোতল টেনে নিয়ে গলায় উপুড় করে দিতেই ডেপুটির সহকারী ম্যাক্সওয়েল বলে উঠেছিল—'ঢের হয়েছে! এবার থামাও! এসব লোচ্চামো এখানে চলে না।'

কথাটার মধ্যে অন্যায় ছিল না এতটুকুও। কেননা, শহরে তখন মদ্যপান নিষিদ্ধ। কিন্তু রক্তপাগলদের রক্ত গরম হয়েছিল হুকুম শুনেই। গর্জে উঠেছিল রিভলভার। ডবল বুলেট বেরিয়ে গেছিল মুর-এর মাথা আর বুক ফুঁড়ে—পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়েছিল নিমেষ মধ্যে। মারাত্মকভাবে জখম হয়ে মুখ থুবড়ে ফুটপাতে আছড়ে পড়েছিল ম্যাক্সওয়েল।

বনি জেল থেকে বেরিয়েই নাচতে-নাচতে ভিড়ে গেল ক্লাইড আর হ্যামিলটনের দলে। বেশ কিছু স্যাঙাত জুটিয়ে নিয়ে বাজপাখির মতো ছোঁ মারল টেক্সাসের গ্র্যান্ড প্রেরির একটা পেট্রল পাম্পে। সাড়ে তিন হাজার ডলার লুঠ করে উধাও হয়ে গেল ঝড়ের বেগে।

সেইদিন পর্যন্ত 'বারো গ্যাং' এত টাকা একবারে কখনও রোজগার করেনি। গুলিবর্ষণও করতে হয়নি। করার দরকারও হয়নি। 'বারো গ্যাং' যে গুলি করে মানুষ খুন করতে বড্ড মজা পায়—এ খবরটা ছড়িয়ে পড়েছিল আগুনের মতো। তাই রুদ্রমূর্তিদের দেখে কেউ আর হঠকারিতা দেখায়নি—বাধা দেয়নি। ফলে, রক্তারক্তিও হয়নি।

একগাদা ডলার নিয়ে খুনে ডাকাতদের দল উৎসব করতে গেল মিচিগানে হ্যামিলটনের বাবার বাড়িতে। হ্যামিলটনের শেষদিন ঘনিয়ে এল সেখানেই।

অত্যধিক মদ্যপান করেছিল হ্যামিলটন। বড্ড বেশি কথাও বলে ফেলেছিল। ফলে ধরা পড়ল পুলিশের হাতে। চালান করা হল টেক্সাসে। উপর্যুপরি ডাকাতি আর হিলসবরো মার্ডারের অভিযোগে তাকে ২৬৩ বছরের জন্যে পাঠিয়ে দেওয়া হল জেলখানায়।

বেচারা! হিলসবরো মার্ডারের মধ্যে হ্যামিলটন কিন্তু জড়িত ছিল না কোনওমতেই।

কিন্তু ধর্মের কল নড়ে যে এইভাবেই!

অতৃপ্ত কামনা

যে হ্যামিলটন পচুক জেলে—বনি আর ক্লাইডের বয়ে গেছে তাতে! দুজনেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে প্রমোদভ্রমণে। পকেটে প্রচুর টাকা, হাতে অঢেল সময় আর মনে অপার ফুর্তি। মিচিগান থেকে ক্যানসাস, ক্যানসাস থেকে মিসৌরী—পুরো সেপ্টেম্বর আর অক্টোবর মাস গেল পকেট ফতুর করতে। সবসেরা হোটেল, খানদানী রেস্তোরাঁ আর চড়া দামের জামাকাপড়—বিলাসিতার অন্ত নেই দুজনেরই। ছেলেবেলায় দুজনেই বিবিধ অনটনে কাটিয়েছে—তারই প্রতিক্রিয়া প্রকটভাবে প্রকাশ পেল জামাকাপড়ের খুঁতখুঁতুনির মধ্যে। ফিটফাট সাজগোজ না হলে মনের ময়লা যেন কাটতে চায় না কিছুতেই। চুল আর মুখের সৌন্দর্য বাড়াতে বনি নিয়মিত যেত হেয়ারড্রেসার আর বিউটি পারলারে। ফলে, দুমাসেই উড়ে গেল লুঠের টাকা—পকেটে রইল মাত্র দুটো ডলার! অতএব পুনরায় ডাকাতি না করলেই নয়! গা ঝাড়া দিল দুই নরাধম। টেক্সাসের শেরমান শহরের হাওয়ার্ড হল নামে এক ৬৭ বছরের বৃদ্ধ কসাইকে পেটে গুলি করল পর-পর তিনবার একটি মেয়ে। চুল তার 'সোনালি'। লুটে নিয়ে গেল বুড়োর সমস্ত টাকা।

কিন্তু সোনালি চুল কার?

কার আবার, বনির! হেয়ারড্রেসারের কাছে গিয়ে রূপবতী হওয়ার সাধনায় মেতেছিল যে গত দুমাস!

লুঠতরাজ আর নরহত্যার ঝড় বয়ে গেল মিসৌরীর নানা জায়গায়। কার্থেজে একটা ব্যাঙ্ক লুঠও করল দুজনে। সবই ঝোঁকের মাথায়—আচমকা। কোনওরকম প্ল্যান প্রোগ্রাম না করেই।

ব্যাঙ্ক লুঠ করে কিন্তু লাভ হয়নি তেমন। পাওয়া গেছিল মাত্র আশি ডলার!

নৈরাশ্য-নিপীড়িত বনি আর ক্লাইড নবীন উদ্যমে তাই লুঠ করতে গেছিল আর একটা ব্যাঙ্ক। প্ল্যান না করেই গেছিল। তাই গিয়েই দেখেছিল...

চারদিন আগে উঠে গেছে বিশেষ সেই ব্যাঙ্ক!

এর পরের খুনটাও করেছে দুজনে একই রকম হঠাৎ খেয়ালের বশবর্তী হয়ে। বাঁধাধরা কাজ নেই, কাজের ছকও নেই—ইচ্ছে হল—খুন করা যাক একটা। ব্যাপারটা ঠিক তাই।

এই সময় উইলিয়াম ড্যালিয়েল জোন্স নামে একটি ষোল বছর বয়সের কিশোরকে দলে টেনে নেয় ক্লাইড। নিছক দল ভারী করার উদ্দেশ্যে নয়। মূল কারণটা ছিল অতিশয় কদর্য।

বনির যৌন-কামনা মিটিয়ে উঠতে পারছিল না একা ক্লাইড। তাই নাকি উইলিয়ামকে দরকার হয়ে পড়েছিল!

উইলিয়াম ছেলেও তেমনি। যেন একই ছাঁচে তৈরি। ক্লাইডের ছেলেবেলা যেমন কেটেছে পশ্চিম ডালাসের আধাবস্তি অঞ্চলে—উইলিয়ামের আশৈশব ইতিহাস ছিল তাই। নষ্ট-চরিত্র অকালপক্ক বদ কিশোর। ক্লাইডকে পুজো করত সাক্ষাৎ অবতারজ্ঞানে।

ক্লাইডও চাইছিল এই রকম একটি ডেঁপো এঁচোড়েপাকা ছোকরাকে। হ্যামিলটন গেছে জেলে। বনির যৌনখিদের কিছুটা সে মিটিয়ে এসেছিল এতদিন। উইলিয়ামকে পেয়ে তাই বাঁচল ক্লাইড।

তিনজনে মিলে টেক্সাসের টেম্পল শহরে একটা গাড়ি চুরি করতে গিয়ে প্রাণপ্রদীপ নিভিয়ে দিল গাড়ির মালিকের ছেলে ডয়াল জনসনের। বনি বলেছিল পরে—'বাধা দিতে গেছিল কেন ছোঁড়া? এত বড় স্পর্ধা কবজি চেপে ধরে জোন্সের? গুলি করতে তাই বাধ্য হয়েছিল জোন্স। ক্লাইড কিন্তু ভীষণ রেগে গেছিল জোন্সের ওপর—খামোকা রক্তগঙ্গা বওয়ানোর জন্যে!'

সেদিনের তারিখটা ছিল পাঁচই ডিসেম্বর, ১৯৩২। পুলিশ কিন্তু বিশ্বাস করেনি বনির ভাঁওতাবাজি। গুলি চালিয়েছিল আসলে ক্লাইড। পরের মার্ডারটাও করেছিল নিজের হাতে। নতুন বছরের সূচনাতেই জানুয়ারি মাসের ছ'তারিখে ঠান্ডা মাথায় বুলেটে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল ডেপুটি শেরিফ ম্যালকম ডেভিসের নশ্বর দেহ।

অথচ ক্লাইডের মুখোমুখি হওয়ার আদৌ কোনও ইচ্ছেই ছিল না ডেপুটি শেরিফের। ফাঁদ পাতা হয়েছিল ওডেল চ্যান্ডলেস নামে আর একজন ব্যাঙ্ক ডাকাতকে পাকড়াও করার জন্যে।

বেপরোয়া ক্লাইড না জেনে পা দেয় ফাঁদে এবং অম্লান বদনে খুন করে ম্যালকমকে।

১৯৩৩-এর জানুয়ারি থেকে ১৯৩৪-এর মে মাস পর্যন্ত কত ডাকাতি আর কত খুন যে করেছে বনি আর ক্লাইড—তার ফর্দ করা সম্ভব হয়নি পুলিশের পক্ষে। খুন আর ডাকাতির পরিসমাপ্তি ঘটেছিল কিন্তু ওই মে মাসেই—পুলিশের হাতেই গুলিবিদ্ধ হয়ে মর্ত্যধাম ত্যাগ করতে বাধ্য হয় বিকারগ্রস্ত বনি আর ক্লাইড। যে গাড়িতে বসে তারা লড়াই চালিয়েছিল পুলিশের সঙ্গে—সেটিও গুলিতে গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায়। মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত রোজগার করে গেছে দুজনে বিরামবিহীন লুঠতরাজের মাধ্যমে—এ ছাড়া পেট আর মন ভরাবার আর কোনও পন্থা তাদের পছন্দ হয়নি। খুন করেছে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতো—ধরা পড়ার সম্ভবনা এলেই মুখর করেছে আগ্নেয়াস্ত্রকে—পরিণাম চিন্তা করেনি কখনওই।

তাড়া খাওয়া জন্তু

পুলিশের অকর্মণ্যতার জন্যেই এতদিন ধরে এত কুকর্ম করে যেতে পেরেছে দুজনে। আরও একটা কারণ আছে। সারা আমেরিকা জুড়ে নেমেছে সেই সময়ে নৈরাশ্যের নিষ্ক্রিয়তা। সেই সঙ্গে বেড়েছে অপরাধ করার হিড়িক। একই পুলিশকে সামলাতে হয়েছে সবদিক।

তবে হ্যাঁ, বহুবার ধরা পড়তে-পড়তে বেঁচে গেছে বনি আর ক্লাইড। ১৯৩৩ এর মার্চে মিসৌরির জোপলিনে একটা ভাড়া করা অ্যাপার্টমেন্টে আত্মগোপন করেছিল বনি, ক্লাইড আর জোন্স। সঙ্গে জুটেছিল ক্লাইডের ভাই বাক আর ভ্রাতৃবধূ ব্ল্যাঞ্চি। পাড়াপড়শিদের কিন্তু সন্দেহ হয়েছিল। প্রত্যেকেই অভিজাত শ্রেণির মানুষ। প্রকৃতই খানদানী। নতুন ভাড়াটেদের হাবভাব দেখে তাই ঘাবড়ে যায় একজন প্রতিবেশী। পুলিশকে সে-ই খবর দিয়েছিল। বলেছিল—'এ আবার কীরকম ভাড়াটে? তাড়া খাওয়া জন্তুর মতো ভয়ে-ভয়ে অ্যাপার্টমেন্টে ঢোকে আর বেরোয়?'

টনক নড়েছিল পুলিশের। দু-গাড়ি বোঝাই সশস্ত্র আদমি এসেছিল তদন্ত করতে। গুলির ঝড় বয়ে গেছিল পরমুহূর্তেই। তারই মধ্যে উধাও হয়ে গেছিল পুরো দলটা বুলেটের চোট অবশ্য এড়োতে পারেনি ক্লাইড আর জোন্স। সামান্য জখম হয়েছিল দুজনেই। কিন্তু জানে খতম হয়ে গেছিল দুজন পুলিশ—আর একজন আহত হয়েছিল মারাত্মকভাবে।

পরের মাসেই পলাতকদের খবর পাওয়া গেল লুই সিয়ানা, ওকলাহোমা, মিনেসোটা আর আয়োয়া-র গোটা কয়েক অঞ্চল থেকে। ডাকাতি হয়ে গেছে প্রতিটি অঞ্চলেই। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে গোটা দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে। ফলে গা-ঝাড়া দিয়েছে পুলিশ। হন্যে হয়ে খুঁজছে খুনে ডাকাতদের।

টুরিস্ট ক্যাম্পে থাকা যে আর নিরাপদ নয়—বুঝল বনি আর ক্লাইড। অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করে থাকা আরও বিপজ্জনক। তাই নিশাযাপন করত চুরি করা গাড়ির মধ্যে। এক গাড়ি ফেলে চুরি করত আর একটা গাড়ি! রাতের পর রাত এইভাবে কাটিয়েছে চোরাই গাড়ির মধ্যে।

ঘুমোনোর কষ্ট গায়ে মাখেনি দুজনের কেউই। যত চিন্তা পোশাক নিয়ে। নোংরা পোশাক পরে থাকা তো সম্ভব নয়! গায়ে কাদা ময়লা থাকলেও চলবে না। ফিটফাট থাকতে গেলে যেটুকু ঝুঁকি নিতে হয়—তা নিতে হয়েছে বইকি। জামাকাপড় কাচতে দিয়ে গেছে ছোট শহরের কোনও ধোপার কাছে। নিয়ে গেছে দিন কয়েক পরে। জোন্স আর ক্লাইড চুলকাটা আর দাড়ি কামানোর জন্যে নাপিতের কাছে গেছে ঠিক এইভাবে। একজন গুলিভরা রিভলভার নিয়ে পাহারা দিয়েছে গাড়িতে বসে—আর একজন তখন গাল আর মাথা পেতে দিয়েছে নাপিতের ক্ষুর আর কাঁচির কাছে।

বেশ কিছুদিন এইভাবেই স্রেফ কপাল জোরে মরতে-মরতে বেঁচে গেছে পুরো দলটা। বনি কিন্তু বুঝেছিল, চিরকাল ভাগ্য সহায় হবে না। একদিন বলেও ফেলেছিল,—'মরবার আগে মাকে আর একবার দেখতে চাই।' কিন্তু সে সুযোগ এসেছিল প্রায় এক বছর পরে। রক্তাক্ত শেষ বিদায় নিয়ে এসেছিল বনি আর ক্লাইড মায়েদের কাছ থেকে।

ইতিমধ্যে একটা দুর্ঘটনা বাঁধিয়ে বসেছিল ক্লাইড। গাড়ি চালাচ্ছিল ঘণ্টায় সত্তর মাইল গতিবেগে। টেস্কাসের ওয়েলিংটনে খাদের ওপর ব্রিজটা যে ধসে পড়েছে, তা নজরে আনেনি। শূন্যে দুবার ঘুরপাক খেয়ে গাড়ি গেঁথে গেল খাদের তলদেশে—আগুন লেগে গেল তৎক্ষণাৎ। শূন্যপথেই ক্লাইড ছিটকে বেরিয়ে গেছিল অবশ্য তার আগেই। বনি চাপা পড়েছিল জ্বলন্ত গাড়ির তলায়।

মৃত্যুর সামনে

অলৌকিকভাবে প্রাণে বেঁচে গিয়ে ক্লাইড দৌড়ে এসেছিল প্রাণপ্রিয়দের প্রাণে বাঁচাতে। জোন্সকে টেনে বের করেছিল ভেতর থেকে—সেই সঙ্গে উদ্ধার করেছিল অতীব মূল্যবান অস্ত্রাগার—বেশ কিছু মেশিনগান আর

রিভলভার। এদিকে তারস্বরে চেঁচিয়ে গেছে বনি—'ক্লাইড, প্লীজ! টেনে বার করতে না পারলে গুলি করো আমাকে!'

একা ক্লাইড কোনওদিনই উদ্ধার করতে পারত না বনিকে যদি না সাহায্য করত একজন চাষা আর খেত মজুর। দুর্ঘটনার আগাগোড়া তারা দেখেছে—ছুটেও এসেছিল। হাতাহাতি করে আধপোড়া বনিকে এরাই টেনে বের করেছিল অনল-পরিবৃত যন্ত্রযানের তলা থেকে। ঠাঁই দিয়েছিল খামার বাড়িতে। কিন্তু তারপরেই সন্দেহ করে বসে অতিথিদের। গোপনে খবর পাঠায় পুলিশকে। কিন্তু চুলের ডগাও ছুঁতে পারল না তিন মূর্তির। বন্দুকবাজি করে হাওয়া হয়ে গেল বনি, ক্লাইড আর জোন্স।

ভাই আর ভ্রাতৃবধূ, বাক আর ব্ল্যাঞ্চির সঙ্গে যোগাযোগ করে আরকানসাসের ফোর্ট স্মিথের কাছে ট্যুরিস্ট ক্যাম্পের একটা ডবল কেবিন ভাড়া নিল ক্লাইড। বনি তখন প্রলাপ বকছে—মৃত্যুর বুঝি আর দেরি নেই। মুখে-মুখে রাশিরাশি মিথ্যে বলে গেল ক্লাইড। স্টোভ ফেটে যাওয়ায় নাকি পুড়ে গেছে বনি। চিকিৎসার জন্যে ডাক্তার জোগাড়ও করেছে। যদিও পুরো তল্লাট জুড়ে তখন পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজছে 'ভয়াল ভয়ঙ্কর ত্রয়ী'কে—ক্লাইড নিরুদ্বেগে ট্যুরিস্টদের বোকা বানিয়েছে, ডাক্তারকে ধোঁকা দিয়েছে—তাঁর উপদেশমতো বনিকে হাসপাতালে পাঠানো সম্ভব নয় বলে তাঁকে দিয়েই ট্যুরিস্ট কেবিনে চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে নার্স মোতায়েন করেছে।

খুবই কড়া স্নায়ু থাকলে এত কাণ্ড করা সম্ভব হয়। কিন্তু শুধু নার্ভের জোর থাকলেই তো চলবে না—টাকার জোরও যে দরকার। কাজেই নিতান্তই নিরুপায় হয়ে হাতের কাছের একটা ব্যাঙ্ক আর দুটো মণিহারি দোকানও লুঠ করেছে। এই কর্ম করতে গিয়ে গণ্যমান্য এক ব্যক্তিকে গুলি করে পরলোকে পাঠিয়েছে এবং তাঁরই গাড়ি হাঁকিয়ে অকুস্থল থেকে চম্পট দিয়েছে। পরিশেষে ট্যুরিস্ট ক্যাম্প থেকেও।

জুলাই মাসে গাড়ি হাঁকিয়ে গেছে আয়োয়া-র মধ্যে দিয়ে এবং খুন জখম লুঠপাট করে গেছে টাকার ঘাটতি দেখা দিলেই। শেষে ঠাঁই নিয়েছে মিসৌরির একটা ট্যুরিস্ট ক্যাম্পে।

কিন্তু জিরেন পায়নি। কেবিন থেকে চুপিসাড়ে বেরোনো আর ঢোকা, জানলা দরজায় অষ্টপ্রহর পরদা টেনে রাখা—এইসব দেখেই সন্দেহ ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশে। ডবল কেবিনকে ঘিরে ফেলে পুলিশ। গুলি ছুড়তে-ছুড়তে পুলিশের বেড়াজাল ভেদ করে বেরিয়ে আসে পুরো দলটা। 'ভয়াল ভয়ঙ্কর ত্রয়ী'র গায়ে আঁচড় না লাগলেও মাথায় তিন-তিনটে বুলিটের ক্ষত বহন করতে হয়েছে বাক-কে। আর ব্ল্যাঞ্চি সাময়িকভাবে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছিল জানলার ভাঙা কাচের টুকরো চোখে-মুখে আছড়ে পড়ায়।

চিকেন খানা

দলের প্রত্যেকেই তখন মরিয়া। খিদে আর তেষ্টায় কাহিল তো বটেই; বাক মরতে বসেছে; বনি আর ব্ল্যাঞ্চি দুজনেই যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। খাদ্য, পানীয়, ডাক্তার, ওষুধ দরকার এখুনি। তাই একজন গেল সরাইখানা থেকে পাঁচটা চিকেন রোস্ট কিনতে—বাকি সবাই লুকিয়ে রইল আয়োয়ার ডেক্সটারে—একটা নদীর ধারে জঙ্গলের মধ্যে।

গ্রামে-গঞ্জে তখন সাড়া ফেলেছে 'বারো গ্যাং'। কাজেই পাঁচটা 'চিকেন খানা' একসঙ্গে বিক্রি হতেই খবর চলে গেল পুলিশের কাছে। দুশো পুলিশ এসে ঘিরে ফেলল পাঁচজনকে।

আবার গুলিবিদ্ধ হল বাক-এবার ঊরুতে, কাঁধে আর পিঠে। ব্ল্যাঞ্চি মুমূর্ষু স্বামীর বুকের ওপর আছড়ে কেঁদে উঠল উন্মাদিনীর মতো—'মারা যেও না...মারা যেও না...দোহাই তোমার...মারা যেও না!' কিন্তু নেহাতই কপাল খারাপ বাক আর ব্ল্যাঞ্চির।

ছ'দিন পর প্রলাপ বকতে-বকতে হাসপাতালে শেষ ঘুম ঘুমোল বাক। ব্ল্যাঞ্চি তখন পাশে নেই। রয়েছে জেলখানায়। সেখান থেকে আদালতে। দশ বছর জেলখাটার শাস্তি মাথা পেতে নিতে হয়েছিল সদ্য বিধবা

হয়েও।

অব্যাহত ছিল কিন্তু বনি আর ক্লাইডের প্রলয়-অভিযান। বাক আর ব্ল্যাঞ্চিকে পুলিশ যখন পাকড়াও করছে, জোন্স, ক্লাইড আর বনি তখন গুলি বর্ষণের প্রলয় সৃষ্টি করছে। হেঁটে নদী পেরিয়েছে। ওপারে পৌঁছে আবার একটা গাড়ি চুরি করেছে। অজানার অভিযানে গা ভাসিয়েছে। লক্ষ্মীছাড়ার মতোই দুরন্ত গতিবেগে ধেয়ে চলেছে—কোথায়? তিনজনের কেউই তা জানে না।

দুশো পুলিশের ব্যূহ ভেদ করে আসা কম হিম্মতের কথা নয়। একেবারে অক্ষত অবস্থায় বেরোনো যায় না। জোন্সের মাথাতেও চোট লেগেছিল সামান্য—ক্লাইডের একটা বাহুতেই বুলেট বিঁধেছিল চারবার। মাথার ক্ষত সেরে যেতেই ভেগে পড়েছিল জোন্স। বনি আর ক্লাইড ফিরে গেছিল ডালাসে। অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর আর জানুয়ারি—এই চার মাস ডালাসেই কাটিয়েছে। ঘুমিয়েছে গাড়ির মধ্যে। আত্মীয়দের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেছে লুকিয়ে-চুরিয়ে নিরালা জায়গায়। বিরামবিহীনভাবে চুরি করেছে গাড়ি, লুঠ করেছে দোকানপাট আর পেট্রলপাম্প।

দুই স্বর্ণকেশী

এবারও ধরা পড়তে-পড়তে দুজনে বেঁচে গেছে স্রেফ বনির বুদ্ধির জোরে। সোনালি রঙের একটা পরচুলা জোগাড় করে ক্লাইডকে পরিয়ে দিয়েছিল বনি। সাজিয়ে দিয়েছিল মেয়েদের সাজে। বলেছিল—'বোকা পুলিশগুলো খুঁজছে এমন দুজনকে যাদের একজন পুরুষ আর একজন স্বর্ণকেশী। দুজন স্বর্ণকেশীকে তো খুঁজছে না।' ধোঁকাবাজিতে কাজ হয়েছিল। বোকা পুলিশদের নাকের ডগা দিয়ে প্রতিবার পগারপার হয়েছে ধুরন্ধর বেপরোয়া দুই খুনে ডাকাত যাদের নীতিজ্ঞানের বালাই নেই একেবারেই!

১৯৩৪-এর ১৬ই জানুয়ারি কাজের ছক পালটে নিল বনি আর ক্লাইড—রে হ্যামিলটনের ২৬৩ বছরের বন্দিদশা ঘুচিয়ে দিয়ে। দু:সাহসের নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত রেখে গেল হান্টসভিল কারাগারে। গাড়ি হাঁকাল বনি, কয়েদিদের কাজের জায়গায় ঝোপের মধ্যে অটোমেটিক আগ্নেয়াস্ত্র লুকিয়ে রাখল ক্লাইড, নিজেও মেসিনগান চালিয়ে সাহায্য করল রে হ্যামিলটনকে পালিয়ে যেতে। গুলি খেয়ে প্রাণপাখি উড়ে গেল একজন ওয়ার্ডারের। রে হ্যামিলটনের সঙ্গে চম্পট দিল আরও চারজন কয়েদি।

অতি দ্রুত কাজে নেমে পড়ল হ্যামিলটন। হানা দিয়ে গেল একটার পর একটা ব্যাঙ্কে। অবশ্যই ক্লাইড নিয়েছিল বড় রকমের ভূমিকা—হ্যামিলটন যদিও তা স্বীকার করেনি পুলিশের কাছে। দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে যে কটা অপরাধ সংঘটিত হয়েছে—প্রত্যেকটির পেছনে ছিল বনি আর ক্লাইড—এ বিশ্বাস পুলিশের মাথায় এনে দিয়েছে অনেক প্রমাণ অনেক সাক্ষী।

পয়লা এপ্রিল রোববার ডালাসের কাছে গ্রেপভাইনে দুজন হাইওয়ে পুলিশের সঙ্গে টক্কর লাগল বনি, ক্লাইড আর হ্যামিলটনের সঙ্গে পালিয়ে আসা একজন কয়েদির। নিমেষমধ্যে মেশিনগান চালিয়ে দুই অফিসারকেই খতম করে দিল তিন নরঘাতক। পাঁচ দিন পর ওকলাহোমা-র মিয়ামির কাছে একজন পুলিশকে সটান গুলি করে যমের দক্ষিণ দুয়ার দেখিয়ে দিল বনি। সে বেচারা গোপন খবর পেয়েই ছুটে এসেছিল 'এক স্বর্ণকেশীর সঙ্গে দুই পুরুষকে' চোরাই ফোর্ড গাড়ির মধ্যে দেখতে!

'বারো গ্যাং'কে পরলোকের পথ দেখিয়ে দেওয়ার জন্যে তখন কিন্তু উঠে পড়ে লেগেছে ওকলাহোমা, লুইসিয়ানা আরকানসাস আর ক্যানসাসের সমস্ত পুলিশ। অনেকেই বলে নাকি পুলিশকে খবর দিয়েছিল মেথভিনের বাবা। মেথভিন সেই কয়েদির নাম যাকে হ্যামিলটনের সঙ্গে জেলের মাঠ থেকে উদ্ধার করেছিল বনি আর ক্লাইড। পুলিশে খবর দিয়ে মেথভিনকে বাঁচাতে চেয়েছিল পিতৃদেব! পুলিশের সঙ্গে এই চুক্তি না হলে নাকি সেবারেও নাজেহাল হতে হত আরক্ষাবাহিনীকে—তাণ্ডব কাণ্ড ঘটিয়ে ফের উধাও হয়ে যেত দুই রুদ্রমূর্তি।

ভক্তদের প্রশস্তি

১৯৩৪-এর ২৩শে মে। লুইসানার গিবসল্যান্ড থেকে আট মাইল দূরে রাস্তার ধারে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে দুজন পুলিশ অফিসার।

ঘড়িতে তখন নটা বাজে। দূরে দেখা গেল ফোর্ড ফাইভ এইট সিডান গাড়িটা।

দেখা গেল বনি আর ক্লাইডকেও।

গর্জে উঠল পুলিশের আগ্নেয়াস্ত্র। মোট ১৬৭টা গুলি বর্ষণ করা হয়েছিল। বনি আর ক্লাইড ভাগাভাগি করে নেয় পঞ্চাশটা। মারা যায় তৎক্ষণাৎ।

রক্তে ভেজা ন্যাকড়ার মতোই নাকি দেখতে হয়েছিল দুজনকে—গুলির নরক বানানোর পর বলেছিল একজন অফিসার।

কবর দেওয়ার জন্যে যুগল দেহকে নিয়ে যাওয়া হল ডালাসের বাড়িতে। অনেক কিংবদন্তীর সৃষ্টি হয়ে গেছিল এতদিনে। খবর ছড়িয়ে গেল আগুনের মতো। ভক্তরা ছুটে এসেছিল ফুলের তোড়া নিয়ে। গল্পে উপকথায় নাকি এমন নায়ক এমন নায়িকার কথা শোনা যায়। কফিন থেকে ফুলের পাপড়ি আর কফিনের অলঙ্করণ পর্যন্ত ছিনিয়ে নিয়ে গেছে অশ্রুসজল অনুরাগীরা। গোটা কবরখানায় এত লোক ভেঙে পড়েছিল যে ক্লাইডের সহোদরা কবরের চল্লিশ ফুটের মধ্যেও আসতে পারেনি।

ক্লাইডের বয়স তখন ২৫, বনির ২৩। দুজনার রোমাঞ্চকর কাহিনির ভাবাকুল পরিসমাপ্তির ভবিষ্যৎবাণী করে গেছিল, বনি নিজেই স্বরচিত একটি কবিতায়। কবিতাটির নাম 'দ্য স্টোরি অব বনি অ্যান্ড ক্লাইড। সুধী পাঠক-পাঠিকার কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যে মূল কবিতাটির প্রতিটি শব্দ মুদ্রিত হল নিচে :

Some day they'll go down together,
They'll bury them side by side,
To a few it'll be grief–to the law a relief–
But it's death to Bonnie and Clyde.

** 'দক্ষিণী বার্তা' পত্রিকায় প্রকাশিত। শারদীয় সংখ্যা।*

স্পোর্টস পৃষ্ঠার রহস্য

মাসে একবার ধাঁধা ক্লাবের মিটিং বসে। ক্লাবের নামটি কিন্তু বিদঘুটে। 'ব্ল্যাক উইডোয়ার্স ক্লাব'—অর্থাৎ কালো বিপত্নীকদের আড্ডাখানা!

মিটিং মানে খানাপিনা। তারিয়ে-তারিয়ে ভালো-ভালো খাবার গেলা হয়, চুক চুক করে দামি-দামি পানীয়তে চুমুক মারা হয়—এবং একজন অতিথিকে আপ্যায়ন করা হয়। মাননীয় এই অতিথি মহাশয় কিন্তু খানাপিনার মধ্যেই একটা জবর রহস্য হাজির করেন—প্রতি মাসেই একটি করে ধাঁধার জট খুলতে হয় আড্ডাধারীদের।

যত জটিল প্রহেলিকাই হোক না কেন—সমাধান ঘটে আশ্চর্যভাবে—স্রেফ বুদ্ধির খেলায়। প্রতিবারই সাহায্য করে যায় যে মানুষটি—সে কিন্তু ক্লাবের একজন ওয়েটার—নাম, হেনরী। ধাপে ধাপে জট খুলে চমক সৃষ্টি করতে তার জুড়ি নেই।

আড্ডাখানায় গোয়েন্দাগিরির অভিনব এই পরিকল্পনার স্রষ্টা প্রখ্যাত কল্পবিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান লেখক আইজাক আসিমভ। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে এলারী 'কুঈনস মিস্ট্রি ম্যাগাজিনে' পেটুক কালো বিপত্নীকদের একটা গোয়েন্দা গল্প লিখেছিলেন। তার পরেও লিখতে হয়েছে তিন ডজন গল্প। কোনও গল্পেই মারপিট নেই, সেক্স নেই, ক্রাইমও খুব একটা নেই—আছে শুধু আলসেমি আর যুক্তিতর্কের প্যাঁচ। বড়লোকি খেয়াল বললেও চলে।

আসিমভ সাহেব নিজেই বলেছেন—এসব গল্পে সব কিছুই পাঠকের সামনে মেলে ধরি—তারপরেও পাঠককে ধরাশায়ী হতে হয় হেনরীর যুক্তির মুষ্ট্যাঘাতে। কথাবার্তায় বুদ্ধির ধার রাখি—কারণ, আমার নিজেরই তা ভালো লাগে। খানাপিনার কথাও বেশ থাকে—পাঠকদের খুশি করার জন্যে।

তিন ডজন ধাঁধা থেকে একটি ধাঁধা হাজির করা হল এই সংখ্যায়। ওয়েটার হেনরী সমস্যার সমাধান করে ফেলার আগেই পাঠক যদি তা করতে পারেন—তাহলে কিন্তু তিনি নিজেকে অনায়াসেই ক্ষুরধার ডিটেকটিভ হিসেবে জাহির করতে পারেন...

এই পেশায় নেমেও পড়তে পারেন।

মাসিক ভোজসভায় বসেছেন কালো বিপত্নীকরা।

ম্যারিও গোনজালো জিগ্যেস করলেন—Blain কি একটা ইংরেজি শব্দ?

Blain? খড়াং করে চেয়ারটাকে টেবিলের সামনে টেনে বললেন জেমস ড্রেক। উনি এখন তাকিয়ে আছেন রকমারি রুটি আর রোলের দিকে। ভাবছেন কোনটার দিকে হাত বাড়াবেন।

Blain, তীক্ষ্ণ জবাব দিলেন গোনজালো।

বানানটা কী? দু-পিস রাইসর্ষের রুটি তুলে নিয়ে মাখন মাখাতে-মাখাতে শুধোলেন রোজার হ্যালস্টেড।

বিরক্ত হলেন গোনজালো, বানানে কী এসে যায়। বলে খুব যত্নের সঙ্গে ন্যাপকিনটা রাখলেন নিজের ডোরাকাটা গোলাপি ট্রাউজার্সের ওপর।—যেভাবে খুশি বানান করতে পারেন। শব্দটা ইংরেজি কিনা তাই বলুন।

টমাস ট্রামবুল আজকের ভোজসভার স্বাগতিক অর্থাৎ হোস্ট। সবাইকে তিনিই নেমন্তন্ন করে এনেছেন। ভদ্রলোকের কপালখানা দেখলে মনে হয় যেন খাঁটি ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি। কপাল কুঁচকোলেই মনে হয় চাষের মাঠে লাঙল পড়েছে—লম্বা-লম্বা খাঁজ জেগে ওঠে। এই মুহূর্তে সেইরকম খানকয়েক খাঁজ সৃষ্টি করেছেন

ব্রোঞ্জ ললাটে। বলছেন—ড্যাম ইট, ম্যারিও। বেশ তো সময়টা কাটছিল। হঠাৎ এই Blain নিয়ে উৎপাত শুরু করলেন কেন?

প্রশ্ন করেছি—তার বেশি তো নয়। জবাবটা দিচ্ছেন না কেন?

অল রাইট। Blain ইংরেজি শব্দ নয়।

টেবিলে যাঁরা বসেছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকের মুখের দিকে চাইলেন গোনজালো—সবাই তাহলে মেনে নিচ্ছেন, Blain ইংরেজি শব্দ নয়।

কিঞ্চিৎ দ্বিধার সঙ্গে হলেও একে-একে সবাই সায় দিলেন। সবশেষে বিড়বিড় করে ইমানুয়েল রুবিন বললেন—কক্ষনো না। ভদ্রলোকের চশমার লেন্স এত মোটা যে কাচের মধ্যে দিয়ে অস্বাভাবিক বৃহৎ দেখাচ্ছে চক্ষু যুগলকে। দাড়ির দৈর্ঘ্যও কম নয়—তবে আজকে তা সামান্য খাটো—যেন অন্যমনস্কভাবে কেটে ছোট করে ফেলেছেন।

লরেন্স পেনটিলি এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিলেন। আজকের ভোজসভায় তিনিই প্রধান অতিথি। প্রৌঢ়। পাতলা সাদা চুল। জুলপি দুটো মাটনচপ আকারে লম্বা হয়ে নেমে এসেছে নিচের দিকে এবং যেন আরও নামবার ফিকিরে আছে। সবার বক্তব্য শেষ হয়ে গেলে ইনি মৃদু হাসলেন এবং বললেন—জীবনে শুনিনি এই শব্দ।

একদম কথা বললেন না একজনই। জিওফ্রে অ্যাভালোন। শিরদাঁড়া সিধে করে বসে থাকা এঁর একটা বাতিক। এখনও বসে রইলনে সেইভাবে। ভুরু দুটো শুধু একটু কুঁচকে রইল। মাঝের আঙুল দিয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে নাড়তে লাগলেন সিরাজির বরফ। এই তাঁর দ্বিতীয় গেলাস।

অলরাইট, অলরাইট, বললেন গোনজালো—শব্দটা যে ইংরেজি শব্দ নয়—তা মেনে নিতে কারও দ্বিধা নেই। চক্ষের নিমেষেই তা দেখা যায়। কিন্তু দেখা যায় কী করে, প্রশ্নটা সেইখানেই। ইংরেজি শব্দ যতগুলো জানা আছে—তার ফিরিস্তিতে কি চোখ বুলোতে হচ্ছে? চোখ বুলোনোর পরই কী বলছেন—না, Blain শব্দটা ইংরেজিতে নেই? নাকি, শব্দটার আওয়াজটা চেনাচেনা লাগছে না বলেই আন্দাজে ঢিল ছুড়ছেন? আপনারা যদি মনে—

নরম গলায় বাধা দিলেন হ্যালস্টেড।

বললেন—মানুষের স্মৃতি কাজ করে কীভাবে, কেউ যখন তা জানে না—তখন প্রশ্নটা তুলছেন কেন। স্মৃতির কলকবজা চালু রয়েছে কীভাবে, এ সম্পর্কে যাঁরা তত্ত্বের পর তত্ত্ব আউড়ে যান—তাঁরাও জানেন না কীভাবে তথ্যকে বের করে আনতে হয় মাথার মধ্যে একবার তা ঢুকিয়ে দেওয়ার পর। এই যে এতগুলো শব্দ বলে গেলাম—এদেরকে টেনে আনতে হচ্ছে আমারই শব্দের ভান্ডার থেকে—যখন যেটাকে দরকার, ঠিক তখনি পেয়ে যাচ্ছি সেই শব্দটাকেই। এ রহস্যের কিনারা কি আজও হয়েছে?

ট্রামবুল বললেন—ভায়া, এমন অনেক সময় আসে যখন মাথার চুল ছিঁড়ে ফেললেও যে-শব্দটি যখন দরকার, তখন তাকে পাওয়া যায় না।

ঠিক এই সময়ে ক্লাবের অতুলনীয় ওয়েটার হেনরী এক বাটি কাছিমের সুরুয়া এনে রাখল হ্যালস্টেডের সামনে। দেখেই চিত্ত তৃপ্ত হয়েছে হ্যালস্টেড সাহেবের। লোভনীয় আহার্যর দিকে মন ধাবিত হয়েছে তুরঙ্গ বেগে। এহেন পরিবেশে কথার কচকচি মানেই মনের ওপর চাপ সৃষ্টি করা। হ্যালস্টেড সাহেব আবার মানসিক চাপ একদম সইতে পারেন না। তোতলাতে থাকেন।

এ ক্ষেত্রেও তো-তো করে তিনি বললেন—বিলকুল ঠিক। ঠিক এই সময়ে ঠিক শব্দ মনে করতে না পারলেই মেজাজ আপনার খিঁচড়ে যায়। শুধু আপনার নয়,—বেশির ভাগ লোকেরই তাই হয়। ভাবে বুঝি সাংঘাতিক একটা কিছু গোলমাল ঘটে গেছে—সহজভাবে নিতে পারে না কিছুতেই। যেমন আমি। মনের মতো শব্দ মনে করতে না পারলেই তোতলাতে থাকি।

অ্যাভালোন-এর ভারী পুরুষালি কণ্ঠস্বর গমগমিয়ে উঠল এই সময়ে। টেবিল মাত করে দিলেন একাই।

সবুর! সবুর! Blain বলে একটা শব্দ আছে বইকি। সেকেলে হলেও ইংরেজি শব্দ। মানে, ফোড়া।

রাইট, হৃষ্ট কণ্ঠে বললেন গোনজালো—বাইবেলের শব্দ। বুক অফ এক্সোডাস-এ আছে। মিশরে প্লেগ মহামারীর কথা লেখার সময়ে ব্যবহার করা হয়েছে। জানতাম, কেউ না কেউ ঠিকই ধরতে পারবেন। আমি তো ভেবেছিলাম ম্যানি-র মাথায় এসে যাবে।

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, রুবিন—আমি কিন্তু ভেবেছিলাম, একেলে ইংরেজির কথা হচ্ছে।

আমি কিন্তু তা বলিনি, বললেন গোনজালো—তাছাড়া, Blain শব্দটা Chilblain শব্দেরই অংশ এবং Chilblain একটি আধুনিক ইংরেজি শব্দ। মানেটা কারও অজানা নয়—ঠান্ডায় হাতে পায়ে ফোড়া হলে বলা হয় Chilblain।

কে বলেছে Chilblain একেলে ইংরেজি শব্দ? গরম হয়ে গেলেন রুবিন—তাছাড়া...

উচ্চকণ্ঠে ধমক দিলেন ট্রামবুল—ম্যানি, আত্মরক্ষার চেষ্টা করবেন না। ম্যারিও এসব কথা জানলেন কী করে, সেটা জানা আগে দরকার। ভালো কথা। আমারই বিশেষ অনুরোধে আজ সামুদ্রিক কড মাছ 'ফিন্যান হ্যাডি' রান্না করা হয়েছে। যদি কারও খেতে রুচি না হয়—হেনরীকে বলে দিন অন্য পদ দিতে।—ম্যারিও, বলুন কোত্থেকে জানলেন এত ব্যাপার?

সাইকোলজির বই পড়তে গিয়ে জেনে ফেলেছি, বললেন ম্যারিও গোনজালো—সবকিছু জেনেই জন্মেছি—এমন ধারণা আমার মাথায় নেই, আছে ম্যানি-র মাথায়। চোখ আর কান খোলা রেখে শিখে যাই এবং সেই জ্ঞানকে দরকার মতো কাজে লাগাই। যেমন লাগালাম এক্ষুনি। মনে রাখাটাও তো বিপজ্জনক ব্যাপার।

সে বিপদের মধ্যে আপনি অন্তত কখনও পড়বেন না, স্বগতোক্তি করলেন রুবিন।

পড়লেও বয়ে গেছে। মনে রাখার ঝকমারি তো দেখতেই পেলাম। জিগ্যেস করলাম, Blain শব্দটা ইংরেজিতে আছে কিনা—জিওফ ছাড়া ঝটপট জবাব দিয়ে গেলেন প্রত্যেকেই। জিওফ দ্বিধায় পড়লেন, কেন? কেন না, উনি বেশি মনে রাখেন। বাইবেলে এই শব্দের ব্যবহার তাঁর মনে আছে। সেই সঙ্গে মনে আছে আরও অনেক কিছু। এত মনে রাখার ফলেই সিদ্ধান্ত নিতে তাঁর দ্বিধা জেগেছে।

হক কথা, বললেন ড্রেক। এই মুহূর্তে তিনি কাঁটা চামচের ওপর একটু 'ফিন্যান হ্যাডি' নিয়ে জিভে রেখেছেন। চোখ মুখ চিন্তায় আবিল হয়ে উঠেছে। পরমুহূর্তেই খুশির রোশনাই ছড়িয়ে গেল সারামুখে।

গোনজালো বললেন—এই দ্বিধাটাই খুব খারাপ। ঝটপট সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং কাজে নেমে পড়া—এই হল গিয়ে সফলতার চাবিকাঠি। দ্বিধায় পড়ার চাইতে ঝটপট বাজে সিদ্ধান্ত নেওয়াও অনেক ভালো। অনেক ক্ষেত্রে ভালো। মানুষকে এই কারণেই ক্ষীণ স্মৃতি দেওয়া হয়েছে—টিকে থাকার জন্যে।

হেসে সায় দিলেন অ্যাভালোন—খুব একটা মন্দ অভিমত নয়, ম্যারিও। কণ্ঠস্বরে প্রকাশ পেল অর্বাচীনকে প্রশ্রয় দেওয়ার সুর—তর্কবিতর্কের মধ্যেও ক্রমবিবর্তনের সুফল সম্পর্কে আমার একটা থিওরি আছে। বলেছি কী? শিকারি সমাজে...

দু-হাত ওপরে তুললেন গোলজালো—এখনও শেষ করিনি, জিওফ। ঠিক এই কারণেই হেনরী বহুবার বহু জটিল সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে চোখের পলক ফেলবার আগেই। আমরা যখন তলিয়ে ভাবি—

আমরা মানে আমাদের সব্বাই নয়। বাধা দিলেন রুবিন—আপনি সেই দলে থাকতে পারেন।

হেনরি তখন তা করে না—রুবিনের মন্তব্য যেন শুনতেই পেলেন না গোনজালো—অপ্রাসঙ্গিক তথ্য দিয়ে মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত করে না হেনরী। তাই দেখতে পায় পরিষ্কার।

খানকয়েক বাড়তি ডিস ধুতে-ধুতে হেনরী বললে মৃদু স্বরে—কথার মাঝে কথা বলার জন্যে ক্ষমা করবেন, মি: গোনজালো। যাই করি না কেন, তা কখনওই করতে পারতাম না যদি না আপনারাই বাড়তি ব্যাপারগুলোকে বাদসাদ দিয়ে না দিতেন। আমার মাথা গুলিয়ে যায় না আপনাদের বুদ্ধিপূর্ণ আলোচনার দৌলতেই।

বিনয় বচন শেষ করে ডিস নামিয়ে রাখল হেনরী। গেলাসে গেলাসে ঢেলে গেল আর এক দফা শ্বেত মদিরা। অবিচল দক্ষতা ফুটে উঠেছে তার যাট বছরের বলিরেখা আঁকা মুখের পরতে-পরতে।

ট্রামবুল বললেন—ম্যারিও, তোমার বস্তাপচা সস্তা থিওরি নেহাতই অচল। আর হেনরী, অত বৈষ্ণব বিনয় ভালো নয়। তোমার ব্রেন আমাদের ব্রেনের চাইতে যে অনেক ধারালো—তাতে নেই কোনও সন্দেহ। তুমি নিজেও তা জানো।

না স্যার, মোটেই না, হেনরীর কণ্ঠে সেই বিনয়—সবার প্রতি সশ্রদ্ধ সম্মান জানিয়ে শুধু এইটুকুই বলতে চাই—অবিসম্বাদিতকে দেখবার ক্ষমতা আমার আছে। তার কারণ একটাই—বললেন গোনজালো—আমাদের অনেকেই যা করেন—তুমি তা করো না। ঘোলানির মধ্যে দিয়েও অবিসম্বাদিতকে দেখবার সময়ে নিজের বিচার বুদ্ধিকে ঘোলাটে করে তোলো না।

বাতাসে মাথা ঠুকে নীরব সম্মতি জানিয়ে চুপ মেরে গেল হেনরী এবং অনেকটা স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠল ক্ষুব্ধ রুবিন অন্য প্রসঙ্গে চলে যেতেই। লেখকের বিবিধ জ্ঞান অনেক সুফল ফলায়; সেই জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করলে কত আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে যায়; সাধারণ বুদ্ধিমত্তা মানে তো তাই—মনের খাতায় তথ্যকে জমিয়ে রাখা, দরকার মতো সেই তথ্যকে কাজের মধ্যে টেনে আনা, তাকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করা এবং প্রয়োজন হলে রকমারি স্মৃতির সংশ্লেষণ ঘটিয়ে চমকপ্রদ বিস্ময়কে সৃষ্টি করা, ইত্যাদি...

সুদীর্ঘ এবং জ্ঞানগর্ভ এই আলোচনায় কিন্তু তিলমাত্র আগ্রহ দেখালেন না প্রধান অতিথি পেনটিলি। চিন্তাঘন নিমেষহীন দৃষ্টি ফিরতে লাগল হেনরীর পেছন-পেছন...

প্রধান ভোজপর্ব শেষ হল। ফল মিষ্টি আহার সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরে গেলেন ট্রামবুল। কয়েক কাপ কফিও নেমে গেল বেশ কয়েকটা উদরে। কফির কাপ যখন ফের ভরতি করা হচ্চে, তখন মুখ খুললেন ট্রামবুল। চামচে দিয়ে টং-টং করে কাঁচের গেলাস বাজিয়ে ঘোষণা করলেন, এবার শুরু হোক সমস্যা সমাধান ওরফে ঝাঁঝরিতে ঝলসানোর পালা।

বললেন গুরু গুরু গলায়—যেহেতু আমি হোস্ট, সুতরাং সমস্যা সমাধানের কষ্ট দিতে চাই না মাননীয় প্রধান অতিথিকে। ম্যারিও, সুরুয়ার শুরু থেকে যন্ত্রণা দিতে শুরু করেছেন আপনি। প্রধান অতিথিকে কষ্ট দেওয়ার ভারটাও আপনি নিন।

সানন্দে নিলাম, সশব্দে কেশে গলা সাফ করলেন ম্যারিও—মি: পেনটিলি, আপনি যে এখনও টিকে আছেন—এটাই একটা রহস্য। কিন্তু টিকে থাকাটা ন্যায়সঙ্গত হয়েছে কিনা—তা বলুন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে।

কান এঁটো করা হাসি হাসলেন পেনটিলি। এমনই হাসি যে দুই গালের দুই উঁচু হনুর ওপর নৃত্য করে উঠল দু-দলা মাংসপিণ্ড। তখন তাঁকে মনে হল বড়দিনের বুড়ো সান্তাক্লজের মতো—যে সান্তাক্লজের গালে নেই সাদা দাড়ির স্রোত—কিন্তু পরনে আছে আধুনিক ধড়াচূড়া।

বললেন—থ্যাঙ্ক হেভেন। আর কি তার দরকার আছে? রিটায়ার করেছি এবং তোফা আছি। যতদিন কাজে ছিলাম—টিকে থাকার চেষ্টা চালিয়ে গেছি—হয়তো ব্যর্থও হয়েছি।

কীভাবে সেই চেষ্টা চালিয়েছেন?

নিশ্বেস নিয়ে। টিকে থাকা যায় একমাত্র সেইভাবেই। কিন্তু আপনার প্রশ্ন তা নয়। আপনি জানতে চাইছেন, রুটি রোজগার করতাম কীভাবে—তাই তো?দেখুন মশায়, টম যেভাবে আঙ্কল স্যাম-এর সেবা করেছেন, আমিও প্রায় সেইভাবে পেটের ভাত জুটিয়েছি।

গুপ্ত সঙ্কেত-এর বিশেষজ্ঞ ছিলেন?

না না। তবে গুপ্ত সংস্থায় থাকতে হয়েছে।

টিকে থাকার পক্ষে সেটা কি ন্যায়সঙ্গত পন্থা? বলে উঠলেন রুবিন।

সবিনয় জবাবটা দিলেন পেনটিলি—তাই নিয়ে বিতর্কে প্রবেশ করতে চান?

একদম না, ঝটিতি বললেন ট্রামবুল—কোন জীবিকা ন্যায়সঙ্গত আর কোনটা নয়—এ বিষয়ে বার পঞ্চাশেক বিতর্ক হয়ে গেছে। ম্যারিও, চালিয়ে যান।

ঝুঁকে বসলেন ম্যারিও—গত ভোজসভায় প্রধান অতিথি একটা প্রহেলিকা পেশ করেছিলেন। আপনার কোনও প্রহেলিকা আছে?

এই মুহূর্তে নেই। তাই আমি মোটামুটি সুখী। টম এবং আরও অনেকে সমাধান করে দেন আমার জীবনের সমস্ত সমস্যা। আমি শুধু দেখে যাই—পর্যবেক্ষণ করা ছাড়া আর কোনও বাতিক আমার এখন নেই। তবে একটা প্রশ্ন কুরে-কুরে খাচ্ছে আমার এই মনকে। যদি অনুমতি করেন—পেশ করতে পারি উপযুক্ত জবাবের প্রত্যাশায়।

বলুন।

হেনরী আমাদের ওয়েটার?

এই ক্লাবের সবচেয়ে দামি সদস্য এবং সব সেরা সদস্য, বললেন ট্রামবুল।

বেশ। শুনে মনে হল, হেনরী হেঁয়ালির জট খুলতে পোক্ত। কী ধরনের হেঁয়ালি?

অস্বস্তির ছায়া ভেসে গেল হেনরীর মুখাবয়বের ওপর দিয়ে ক্ষণেকের জন্যে। বললে—খেতে বসে মাঝেমধ্যেই নানারকম সমস্যা এসে যায় কথাবার্তার মধ্যে। মাননীয় সদস্যরাই সে সবের সুরাহা করে দেন।

সুরাহা তুমিই করো। প্রবল উৎসাহে বললেন ম্যারিও গোনজালো।

হাত তুললেন অ্যাভালন—প্রতিবাদ জানাচ্ছি। বিষয়টাকে আলোচনার মধ্যে আনা সঙ্গত হচ্ছে না। এখানে যা কিছু ঘটে তার সবই গোপনীয়। আগের আলোচনা সভার একটা বর্ণও এই আলোচনা সভায় উপস্থিত করা হবে না।

নিশ্চয় না, নিশ্চয় না, সবেগে মস্তক আন্দোলন করতে করতে বললেন পেনটিলি—গোপন কথাবার্তার তিলমাত্র জানবার আগ্রহ আমার নেই। প্রশ্নটার জবাব যাচ্ঞা করা সমীচীন হবে কিনা—এইটাই শুধু জানতে চেয়েছি। যদি হয়, তাহলে হেনরীকে বলব জবাব জুগিয়ে দিতে।

গোনজালো বললেন—আপনি কিন্তু একটু আগেই বলেছেন রিটায়ার করে তোফা আছেন। প্রশ্নের বিড়ম্বনা মাথার মধ্যে নিয়ে কেউ তোফা থাকতে পারে না।

প্রশ্নটা আজকের নয়—অনেক বছর আগেকার, দুই চোখে কৌতুক নাচিয়ে বললেন পেনটিলি—প্রশ্নের সমাধান তখন মোটেই সন্তোষজনক মনে হয়নি—অন্তত আমার কাছে। আজ আর তার গুরুত্ব নেই। তবে কৌতূহলকে বড় খুঁচিয়ে যায় আজও।

আচমকা আগ্রহ দেখালেন ট্রামবুল—ব্যাপারটা কী, ল্যারি?

টম, ডিপার্টমেন্টে সদ্য ঢুকেছিলাম সেই সময়ে। আপনারা কেউই জড়িত ছিলেন না সে ব্যাপারে—শুধু আমি ছাড়া।

শুনতে পারি ব্যাপারটা? গোনজালোর প্রশ্ন।

আগেই বলেছি, এ ব্যাপারের এখন আর কোনও গুরুত্ব নেই। এ নিয়ে কথাবার্তারও কোনও মানে হয় না। কিন্তু যেহেতু হেনরীকে পাচ্ছি হাতের কাছে—

মৃদুস্বরে বললে হেনরী—স্যার, মি: গোনজালো সহৃদয় বলেই আমাকে হেঁয়ালির সমাধানকারী মনে করেন। আসলে সে যোগ্যতা আমার নেই। তবে মাঝে-মাঝে আমার কথা কাজে লেগে গেছে—সেটাও সম্ভব হয়েছে মাননীয় সদস্যরা বুদ্ধি দিয়ে জট ছাড়িয়ে এনেছিলেন বলেই—অপ্রাসঙ্গিক এবং অদরকারী তথ্যগুলোকে নিজেরাই বাদ দিয়ে দিয়েছিলেন বলে। তখন যে খেই-টা পড়ে থাকে—আমার কাজ শুধু তাকে তুলে নেওয়া। এর বেশি ক্ষমতা আমার নেই।

রক্তিম হয়ে ওঠে পেনটিলির মুখ—বেশ, বেশ, সেক্ষেত্রে প্রশ্নটা হাজির করা যাক সমাগত সুধী সদস্যদের কাছে।

কানখাড়া করলাম, বললেন অ্যাভালন।

ব্র্যান্ডির গেলাস এক চুমুকে শেষ করে দিলেন পেনটিলি। হেনরী এগিয়ে এসেছিল বোতল হাতে গেলাসে ফের ঢালবার জন্যে—নিতে রাজি হলেন না পেনটিলি।

বললেন—জেন্টলমেন, ১৯৬১-র দিনগুলোয় মনকে নিয়ে যান। জন এফ কেনেডির শোচনীয়ভাবে সংক্ষিপ্ত শাসনকালের প্রথম ক'মাসে কিউবা আক্রমণের প্ল্যান আঁটছে কিউবা থেকে নির্বাসিতরা। কেনেডির মাথাতেও ঢুকছে না এই প্ল্যান। হানাদারদের আমেরিকান বিমানবাহিনী মদত জোগানোর পর যে প্রতিক্রিয়া ঘটবে—তার সুযোগও নিলেন না। গুপ্তসংস্থা তাঁকে আশ্বস্ত করেছিল বিশেষ একটা গোপন খবর দিয়ে। হানাদাররা যখন চড়াও হবে—তখন তাদের সমর্থন জোগাবে কিউবার জনগণই—এক কথায় অভ্যুত্থানটা ঘটবে ভেতর থেকে। ঝটপট স্বাধীন কিউবান সরকার গঠিত হবে এবং তাদের অনুরোধ পেলেই যুক্তরাষ্ট্র অগ্রসর হবে।

সৈন্যসামন্ত আর দেশের ওপর ক্যাস্ট্রোর প্রচণ্ড প্রভাবের কোনও খবরই আমরা রাখিনি। অথচ আশার কুয়াশার মধ্যে দিয়ে দেখেছি—জয় আমাদের হবেই। কী হয়েছিল আপনারা সব্বাই জানেন। শূকর উপসাগরে হানাদাররা নামতে-না-নামতেই ক্যাস্ট্রোর সুসংগঠিত লোকজন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বেচারাদের ওপর। কিউবার লোকজনের মধ্যে বিন্দুমাত্র অভ্যুত্থান ঘটেনি। বিমানবাহিনীর সাহায্য না পেয়ে হানাদাররা দলে-দলে ধরা পড়েছে, কাতারে-কাতারে খতম হয়েছে। প্রচণ্ড বিড়ম্বনায় পড়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। প্রেসিডেন্ট হিসেবে সমস্ত দায়িত্ব মাথা পেতে নিয়েছিলেন কেনেডি। বলেছিলেন, জেতার আনন্দ হাজার জনে নেয়, পরাজয়ের নিরানন্দ নিতে হয় একজনকেই।

কফির কাপের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকতে -থাকতে আচমকা বলে উঠলেন রুবিন—উদ্ধৃতি-পুস্তকে আছে কেনেডির এই বাক্য।

কেশে গলা সাফ করে বললেন অ্যাভালোন—হারলেও দমেননি কেনেডি। পরের বছরেই কিউবান ক্ষেপণাস্ত্রর ব্যাপারে সোভিয়েতদের মুখ চুন করে দিয়েছিলেন—ঠান্ডা লড়াইয়ে বিশাল বিজয়ের অধিকারী করেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রকে।

সবেগে বললেন রুবিন—বিজয় কক্ষনো নি:সঙ্গ থাকে না। পূর্বসূরীর কীর্তির সঙ্গে টেক্কা মেরেছিলেন প্রেসিডেন্ট জনসন। একটু-একটু করে গড়ে তুলেছিলেন ভিয়েতনামের কর্দম পঙ্ক—শেষকালে—

হে মূর্খগণ, সজোরে বললেন ট্রামবুল—এটা ইতিহাসের ক্লাস নয়। ল্যারি পেনটিলিকে কথা বলতে দিন।

সঙ্গে-সঙ্গে নেমে এল সূচিভেদ্য স্তব্ধতা। পেনটিলির সারা মুখে এখন বিষাদের ছায়া। বললেন—শূকর উপসাগরের বিপর্যয়ের মুলে পয়লা নম্বর শয়তানটা আসলে গুপ্তচর সংস্থা—তারাই ভুল খবর দিয়ে আমাদের মুখে চুনকালি দিয়েছে। কিউবার সত্যিকারের পরিস্থিতি যদি জানা থাকত, কেনেডি হানাদারদের এগিয়ে যাওয়া রুখে দিতেন—অথবা বিমানবাহিনীকে পাঠিয়ে আকাশ থেকে তাদের সাহায্য করতেন। তাহলেই ফ্লোরিডা থেকে নব্বই মাইল তফাতে মিজাইল ঘাঁটি বসিয়ে বহাল তবিয়তে কেটে পড়ার ভুল ধারণাটা সরে যেত ক্যাস্ট্রো অথবা [illegible] মাথা থেকে আর রুবিনের সাইকোহিসটোরিক্যাল ব্যাখ্যা মেনে যদি নিই—তাহলে ভিয়েতনাম সমস্যাও আর তৈরি হত না।

আমি বলব একটাই কথা—খবরটাও ভুল হওয়ার দরকার ছিল না। কিউবাতে আমাদের একজন গুপ্তচর ছিলেন। শূকর উপসাগরে হামলা শুরু হওয়ার ছ'মাস আগে তিনি চলে আসেন ওয়াশিংটনে। রেডিওতে যে-খবর পাঠাতে পারেননি—সঙ্গে এনেছিলেন সেই গোপন সংবাদ...

কেন পাঠাতে পারেননি? ঝটিতি শুধোন গোনজালো।

অত্যন্ত কঠিন একটা ভূমিকায় অবতীর্ণ ছিলেন বলে—বেশি ঝুঁকি নিতে সাহস হয়নি। ভদ্রলোক ছিলেন সোভিয়েত স্পাই। সোভিয়েতরাই তাঁকে গোটা যুক্তরাষ্ট্র চষে বেড়াতে দিয়েছে নিজেদের স্বার্থে—উনিও পরমানন্দে সোভিয়েতের সমস্ত খবর পৌঁছে দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র।

এক মুখ সিগারেট-ধোঁয়া ছেড়ে বললেন ড্রেক—ডবল এজেন্টের কোন মুখে সত্যি কথা বেরোয়—তা বলা কিন্তু মুশকিল।

দু-মুখেই বেরোতে পারে, হ্যালস্টেডের মন্তব্য।

তা হতে পারে, সায় দিলেন পেনটিলি—আমরা যে খবর পাচার করাতে চেয়েছি সোভিয়েত দেশে—শুধু সেই খবরটা তিনি জানিয়েছিলেন স্বদেশে। কিন্তু সোভিয়েত সম্পর্কে আমরা জেনেছি ভুরি-ভুরি সংবাদ ভদ্রলোকের মারফত—এমনই খবর যা কোনওদিনই সোভিয়েতরা আমাদের জানতে দিতে চায়নি।

বিদ্রূপতরল কণ্ঠে বললেন রুবিন—ঠিক এই কথাটা হয়তো সোভিয়েতরাও ভেবেছিল এবং একইভাবে তাঁকে দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের গোপনতম সংবাদ সংগ্রহ করে গেছে।

তাই যদি হত, তাহলে শেষকালে সোভিয়েতরাই বিশেষ এই গুপ্তচরকে যমালয়ে পাঠিয়ে দিত না, বললেন পেনটিলি—ভদ্রলোককে আমরা কিন্তু খতম করিনি—মূল প্রশ্নটা আসছে এই রহস্য থেকেই। কীভাবে যে ভদ্রলোকের ডবল গুপ্তচরগিরি ফাঁস হয়ে গেছিল সোভিয়েতদের কাছে—তা জানতে পারিনি কোনওদিনই।

মূলত তিনি যে সোভিয়েতের স্পাই নন—আমাদের স্পাই—এটা তারা জানবার পরেই খাঁড়া নামিয়ে আনে ভদ্রলোকের ওপর। বিশ্বাসঘাতকের সাজা এইভাবেই হয়। আমাদের বিশ্বাসঘাতকদেরও আমলারা কোতল করি ঠিক এইভাবে।

অ্যাভালোন বললেন—দেখুন মশায়, বিশ্বাসঘাতককে বিশ্বাস করাটাই তো বোকামি, যে লোক একবার বিশ্বাসঘাতকতা করেছে—সে যে আবার তা করবে না, তার কি কোনও গ্যারান্টি আছে?

তা ঠিক, তা ঠিক, সায় দিয়ে গেলেন পেনটিলি—সেই জন্যেই তো ভদ্রলোককে ঠিক সেইটুকুই জানতে দেওয়া হয়েছে যে-টুকু জানলে আমরা থাকব নিরাপদে—নিরাপদে থাকবেন তিনি নিজেও। আমি কিন্তু বিশ্বাস করতাম ভদ্রলোককে, কারণও ছিল। আমেরিকান আদর্শে বিশ্বাসী বলেই ভদ্রলোক কাজ করে গেছেন আমাদের হয়ে—এই ধারণা নিয়েই বিশ্বাস করতাম ভদ্রলোককে—তিন বছর কাজ করে গেছেন আমাদের হয়ে—একবারও দুশ্চিন্তার কারণ সৃষ্টি করেননি।

ভদ্রলোকের নাম স্টিপান। কাজ করতেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে—হাসি ঠাট্টা জিনিসটা একেবারেই ছিল না ভেতরে। এক কথায় বলা যায়—গুপ্তচরগিরি অন্যের কাছে পাপ কাজ হতে পারে—তাঁর কাছে পুণ্যের কাজ—তাই নিজেকে ঢেলে দিয়েছিলেন এই কাজে। ইংরেজি ভাষার বৈশিষ্ট্য যে-সব ইডিয়ম-এর মধ্যে, অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সে সব শিখতেন এবং মোটামুটি আমেরিকান উচ্চারণে কথা বলে যেতেন। রেডিওর খবর শুনতেন খবর জানবার জন্যে নয়—খাঁটি আমেরিকান উচ্চারণ শেখবার জন্যে। শব্দসম্ভার বৃদ্ধির জন্যে শব্দ ছক নিয়ে মেতে থাকতেন। আর একটা খেলা খেলতেন নিজের মনে। নাম তার স্ক্র্যাবল। সেটাও শব্দের খেলা।

অ্যাভালন বললেন—স্ক্র্যাবল? ছোট-ছোট কাঠের টালিতে অক্ষর লেখা থাকে? বোর্ডে সেই টালি বসিয়ে শব্দ তৈরি করতে হয়?

অত সোজা খেলা নয়, বললেন রুবিন—মাথা খারাপ করে দেয়—

পেনটিলি পাত্তা দিলেন না রুবিনকে—ঠিকই ধরেছেন মি: অ্যাভালন। আজকের এই প্রহেলিকায় এই খেলার একটা ভূমিকা আছে। যত চেষ্টাই করুন না কেন স্টিপান, ইংরেজিটাকে মুঠোয় আনতে পারেননি কোনওদিনই—শব্দসম্ভার বাড়ানোর চেষ্টাতেও ত্রুটি রাখেননি। সোভিয়েতরা ওঁর এই খেলাখেলির ব্যাপারটায় বিলক্ষণ মদত দিয়েছে শুধু একটাই কারণে—ভবিষ্যতে যেন আরও দক্ষ গুপ্তচর হতে পারেন স্টিপান।

ঠিকই করেছিল, শুষ্ক কণ্ঠে বললেন রুবিন।

কিন্তু শেষকালে ওঁকে খুনও করেছিল এই সোভিয়েতরা। ১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বরে কিউবা থেকে এসে পৌঁছন স্টিপান। কিউবাতে থাকার সময়ে সরাসরি ওঁর গতিবিধির বিশেষ খবর না রাখলেও আমরা অন্যপথে জেনেছিলাম মোক্ষম খবর জোগাড় করেছেন স্টিপান। গুরুত্বপূর্ণ সেই খবর পাচার করতে না পেরে নিজেই ওয়াশিংটনে চলে এসেছেন। ওকে ফাঁসিয়ে না দিয়ে গোপনে খবরটা জানবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলাম তখন থেকেই।

ঘুরিয়ে নাক দেখানোর মতোই আমরা ঠিক করলাম স্টিপানের সঙ্গে দেখা করব একটা হোটেলের ঘরে। সোভিয়েতরা যে ওঁর দু-মুখো চরিত্র জেনে ফেলেছে—আমরা তা কল্পনা করতে পারিনি—স্টিপান নিজেও তা জানতেন না। আমাদের লোক হোটেলের ঘরে পৌঁছনোর আগেই সোভিয়েত জল্লাদ হাজির হয়েছিল সেখানে। ছুরি মেরে উড়িয়ে দিয়ে গেছিল গুপ্তচরের প্রাণপাখি। যা বলতে এসেছিলেন—তা বলবার সুযোগও পেলেন না।

অ্যাভালনের কফির কাপ শূন্য হয়ে গেছিল অনেক আগেই। খালি পেয়ালার কিনারায় আঙুল বুলোতে-বুলোতে বললেন চিন্তাঘন ললাটে—সোভিয়েতরাই যে খুন করেছিল স্টিপানকে—তার কী প্রমাণ পেয়েছেন? মারদাঙ্গা এই সমাজে রোজই মানুষ খুন হয়ে চলেছে নানা কারণে।

লম্বা নিশ্বেস ফেলে বললেন পেনটিলি—খবরটা পাচার করার ঠিক আগেই স্টিপান খুন হয়েছিলেন—সুতরাং অন্য ঘাতককে এক্ষেত্রে ধর্তব্যের মধ্যে আনা যায় না।

ওয়াশিংটনের পুলিশও এ খুনকে মামুলি খুনের পর্যায়ে ফেলতে চেয়েছে—আমরাও তাতে মদত দিয়েছি—কারণ নিহত ব্যক্তি সোভিয়েত দেশের নাগরিক। স্টিপানের প্রাইভেট লাইফ হাতড়েও উল্লেখযোগ্য কিছু জানা যায়নি। সাধারণ অপরাধী খুন-টুন করে কিছু না কিছু সূত্র ফেলে যায়—এক্ষেত্রে কোনও সূত্রই পাওয়া যায়নি।

দ্বিতীয়ত স্টিপানের মৃত্যুতে লাভ হয়েছে সোভিয়েতের—খবর বেরিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আর থাকেনি। তৃতীয়ত, স্টিপান জীবিত থাকলে আমাদের যে সুবিধেগুলো ছিল—তা তিরোহিত হয়েছিল ওঁর মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে। মি: অ্যাভালন, এতগুলো যুক্তি শোনবার পর নিশ্চয় বলবেন না, অন্যের হাতে খুন হয়েছিলেন স্টিপান। না, না, না। গুপ্তচর যেভাবে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়—স্টিপানকেও পরলোকে যেতে হয়েছে ঠিক সেইভাবে।

আচমকা হুঁশ হল গোনজালোর, একগাদা খাবারের গুঁড়ো লেগে রয়েছে কোটের হাতায়। ঝেড়ে সাফ করতে-করতে বললেন—এতদিন পরে স্টিপানের খুন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন কেন বুঝলাম না। হেঁয়ালিটাই তো শোনা হল না এখনও। খুনি কে, এইটাই কি আপনার প্রহেলিকা?

না। খুন হলেন কেন স্টিপান—প্রহেলিকা সেইটাই।

অর্থাৎ—

মি: গোনজালো, স্টিপান একটা জবর খবর দেওয়ার জন্যেই ছুটে এসেছিলেন কিউবা থেকে। কিন্তু দিতে পারেননি। যদি জানতে পারতাম সেই খবর—এই দেশের ক্ষয়ক্ষতি অনেক কম হত। স্টিপানের খুনের পরেও খবরটার ধরন জানা উচিত ছিল আমাদের। এই নিয়েই ভেবেছি রিটায়ার করার আগে—ভাবি এখনও।

মি: পেনটিলি, বললেন হ্যালস্টেড—স্টিপানের খুনের পর কি আপনাকে জোর করে রিটায়ার করানো হয়েছে? কিছু মনে করবেন না আপনাকে বিড়ম্বনায় ফেলছি বলে।

না। খুনের সঙ্গে আমার অবসর নেওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই। কোনও দুর্নাম কুড়োতে হয়নি। রিটায়ার করেছি এই তো বছর কয়েক আগে—সসম্মানে—পুরস্কার নিয়েছি প্রেসিডেন্ট নিক্সনের হাত থেকে। খুনের পর একা আমিই ওপরতলাকে পই-পই করে বলেছিলাম—কিছু একটা জানাতে চেয়েছিলেন স্টিপান প্রাণ-প্রদীপ নিভে যাওয়ার ঠিক আগে—কানে তুলো এঁটেছিল ওপরতলা—পাত্তাই দেয়নি আমার মতামতে। বিপদটা ঘটেছিল তখনি। মুখে চাবি দিয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছিলাম বটে—কিন্তু মন থেকে তাড়াতে পারিনি। রিটায়ার করার পর সেই রহস্যই বড্ড বেশি পীড়া দিয়ে চলেছে আমাকে।

জবর খবরটা কীভাবে দিতে চেয়েছিল স্টিপান? গোনজালোর প্রশ্ন।

ওঁর কাছে লিখিত কিছু ছিল না—সে ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হয়েছিলাম মৃতদেহ দেখবার সঙ্গে-সঙ্গে। অত কাঁচা কাজ করতেন না স্টিপান। লেখালেখির মধ্যে যেতেন না। হোটেল রুমে টুরিস্টের কাছে যা থাকে—তার বেশি কিছু রাখেননি সঙ্গে, একটামাত্র সুটকেশ, তার মধ্যে জামাকাপড়, মাজন, বুরুশ, চিরুনি ইত্যাদি। খুব পাকা হাতে নাড়াচাড়া হয়েছে সবকিছুই— কিন্তু খুনি কিছু নিয়ে গেছে—তা মনে হয়নি।

খটকা লেগেছিল শুধু দুটো জিনিস দেখে। একটা হল শব্দছকের হেঁয়ালি পুস্তক—অর্ধেক হেঁয়ালি নিজের হাতে লিখে সমাধান করেছেন অথবা করবার চেষ্টা করেছেন স্টিপান—আর একটা স্ক্র্যাবল সেট—যা উনি হরবখৎ রাখতেন সঙ্গে...

বাধা দিলেন রুবিন—যাতে কেউ দেখা করতে এলেই তার সঙ্গে এক হাত খেলতে পারে?

আজ্ঞে না। একা থাকলেই চার হাতের খেলা নিজে নিজে খেলতেন স্টিপান—পকেট ডিক্সনারির সাহায্য নিয়ে খেলে যেতেন নিজের মনে। শব্দসম্ভার বাড়ানোর জন্যে ওঁর প্রচেষ্টায় ফাঁকি ছিল না তিল মাত্র—আগেই বলেছি সেকথা। ডিক্সনারিটাও পেয়েছি ওঁর কোটের পকেটে—আলমারিতে ঝোলানো ছিল কোট।

ও, বলে চুপ করে গেলেন রুবিন।

দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থাতেই ছুরি খেয়েছিলেন বলেই সঙ্গে-সঙ্গে মারা যাননি স্টিপান —নিখুঁত এই অপরাধে এইটাই একমাত্র খুঁত বলতে পারেন। খুন করার পর খুনি অথবা একাধিক খুনি তড়িঘড়ি চম্পট দিয়েছিল বলেই তারপরেও ধড়ে প্রাণ নিয়ে বেঁচেছিলেন স্টিপান। টেবিলের পাশেই আছড়ে পড়েছিলেন—ঘর ফাঁকা হয়ে যেতেই উঠে দাঁড়িয়েছিলেন টেবিল ধরে। টেবিলে তখন ছিল একটা খবরের কাগজ—ওয়াশিংটন পোস্ট—আর স্ক্র্যাবল সেট।

টেনে খুলেছিলেন টেবিলের সব চাইতে ওপরের ড্রয়ার—কলম বের করে লিখতে গিয়ে দেখেছিলেন কালি নেই। হোটেলের কলমের দশা এই রকমই হয়। কলম ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন মেঝেতে। নিজের পেন ছিল কোটের পকেটে—ঘরের আর একদিকে। অতদূর যেতে পারবেন না বুঝেছিলেন বলেই সে চেষ্টা করেননি—আয়ু ছিল মোটে মিনিট ছয়েকের মতো। তাই কাজে লাগাতে হয়েছে নাগালের মধ্যেকার জিনিসকে।

ছুরি খাওয়ার সময়ে কাগজটা ছিল ভাঁজ করা অবস্থায়—ঘণ্টাখানেক আগে সেই অবস্থাতেই কাগজ এনে রেখেছিলেন টেবিলে—

এত ব্যাপার জানলেন কী করে? হ্যালস্টেডের প্রশ্ন।

পারিপার্শ্বিকের বিবেচনায়। এ ব্যাপারে অন্তত দক্ষতা আমাদের তুলনাবিহীন বলতে পারেন। টেবিলের ড্রয়ার টেনে খোলা, খটখটে শুকনো কলম গড়াগড়ি যাচ্ছে মেঝেতে। সবচেয়ে বড় কথা, ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছিল স্টিপানের শরীর থেকে—বিশেষ করে ডান হাত থেকে—ছুরির মার আটকাতে গেছিলেন ডান হাত দিয়েই। রক্তাক্ত হাত আর শরীর যেখানে যেখানে ঠেকেছে—রক্তের চিহ্ন লেগেছে সেই-সেই জায়গায়।

যা বলছিলাম, স্পোর্টস পৃষ্ঠায় কাগজটা খুলেছিলেন স্টিপান। তারপর হাতে নিয়েছিলেন ক্র্যাবল খেলার বাক্স, টেনে সরিয়েছিলেন কাঠের ঢাকনি, টেনে বের করেছিলেন পাঁচটি হরফ, পর-পর সাজিয়েছিলেন হোল্ডারে। মারা গেছিলেন ঠিক তখুনি। হরফগুলো এই : e, p, o, c আর k।

সাজিয়েছিল কি এইভাবেই? শুধোন ড্রেক।

হ্যাঁ। বাঁ-দিক থেকে ডানদিকে।

ইতিহাসের কোনও এক সময়কে বলা হয় epock—বললেন গোনজালো।

মুখিয়ে উঠলেন রুবিন—সেটা হল epock—শেষে k নেই। তার মানে, ইতিহাসের বিশেষ একটা সময় যখন উল্লেখযোগ্য কোনও ঘটনা ঘটেছে। রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

মৃত্যুকালীন ভ্রান্তি ধর্তব্যের মধ্যে নয়, সবেগে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলেন গোনজালো—মরবার সময়ে দৃষ্টি নিশ্চয় ঝাপসা হয়ে গেছিল—তাই দেখতে পায়নি সঠিক বানানের হরফ সাজানো হচ্ছে কিনা। k-কে মনে হয়েছে h। সবচাইতে বড় কথা স্টিপান জাতে রাশিয়ান—ইংরেজি ভাষাজ্ঞান আপনার মতো হবে—আশা করা যায় না।

অধীর কণ্ঠে বলে উঠলেন পেনটিলি—মোদ্দা ব্যাপার কিন্তু তা নয়। k অথবা h—কী এসে যায় তাতে?

ঠিক বলেছেন, বললেন অ্যাভালোন—এই তো একজন সাংকেতিক শব্দ-বিশেষজ্ঞ রয়েছেন আমাদের মধ্যে। টম—

দুকাঁধ ঝাঁকিয়ে ট্রামবুল বললেন—যাচ্চলে! নিজের মাথাটা খাটালেই তো হয়! আমি যখন বুঝব—কথা বলব।

অ্যাভালন বললেন—মি: পেনটিলি, সাংকেতিক শব্দের কোনও বই কি তখন ছিল আপনাদের কাছে? এমন একখানা বই যার মধ্যে—epock আছে, যার মানে বিশেষ একটা শব্দমালা অথবা কথা? সরকারি সাংকেতিক শব্দ কী?

না, না, না। epock অথবা epock—কোনওটারই সাংকেতিক মানে অন্তত স্টিপানের জানা ছিল না। হেঁয়ালির জবাব খোঁজা উচিত ছিল স্পোর্টসের পৃষ্ঠায়।

কেন বলছেন? হ্যালস্টেডের প্রশ্ন।

হেনরী, একটু ব্র্যান্ডি দেবে? শুনছ তো সব? বললেন পেনটিলি।

ইয়েস স্যার, হেনরীর জবাব।

গুড! এমার্জেন্সির মুহূর্তে স্টিপানের উচিত এমন একটা সংখ্যা পাচার করে দেওয়া যার মধ্যে গোপন বার্তা-টা থাকবে ঘনীভূত অবস্থায়। মানে, রীতিমতো নিরেট অবস্থায় থাকবে খবরটা—নড়ানো চড়ানো যাবে না শব্দমালার শব্দগুলোকে। মৃত্যু যার দোরগোড়ায়, এ ছাড়া আর কোনও পথ তার কাছে থাকে না। স্টিপানের ক্ষেত্রে সেই অবস্থা এসে গেছিল। তাই খুলেছিলেন স্পোর্টস পৃষ্ঠা—যে পৃষ্ঠায় সংখ্যার ছড়াছড়ি এবং যে সংখ্যাদের একটা সংখ্যা রীতিমতো প্রনিধানযোগ্য।

লেখবার জন্যে হয়তো কাগজের দরকার ছিল—তার বেশি নয়, বললেন হ্যালস্টেড।

যা দিয়ে লেখা যায়—সে রকম তো কিছু ছিল না হাতে।

রক্ত ছিল—নিজের রক্ত।

হয়তো তাই, মুখ বেঁকিয়ে বললেন পেনটিলি—কিন্তু তা নয়। কেন না, শুধু লেখবার জন্যে কাগজ যে তুলবে, সে কাগজের পাতা খুলতে যাবে কেন? ওপরের পৃষ্ঠাতেই লেখবার চেষ্টা করলেই পারত। তা ছাড়া—আর একবার মুখ মচকালেন পেনটিলি—যার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে, সে তখন খেয়াল করে কি গা থেকে রক্ত বেরোচ্ছে কিনা?

জেদি গলায় বলে গেলেন হ্যালস্টেড—ঝটকান দিয়ে খুলেছিল কাগজ—স্পোর্টস পৃষ্ঠাই যে খুলতে গেছিল, একথা ভাবছেন কেন? টান মেরে খুলতে গিয়ে স্পোর্টস পৃষ্ঠা খুলে গেছে। মৃত্যুর সময় অমন খিঁচুনি অসম্ভব কি?

মি হ্যালস্টেড, চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন পেনটিলি—স্টিপানের মতো পাকা গুপ্তচরের কাছে ব্যাপারটা খুবই অসম্ভব। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষে তাঁকে বেঁচে থাকতে হয়েছে দিনের পর দিন—প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাওয়ার ঠিক আগে গুরুত্বপূর্ণ খবরটা পাচার করবার শেষ চেষ্টাই তিনি করেছেন—কারণ, তিনি প্রফেশন্যাল স্পাই, অ্যামেচার নন।

ধমকে উঠলেন ট্রামবুল—রোজার, তুচ্ছ বিষয় নিয়ে খামোকা জেদ কেন?

টম, বললেন পেনটিলি—ঠিক এইরকম ধারণা ছিল কিন্তু দপ্তরেও। যা-যা বলে গেলাম, তার মধ্যে নাকি হেঁয়ালি নেই একটুও, মরবার সময়ে কোনও গোপন খবর দিয়ে যাওয়ার চেষ্টাই করেননি স্টিপান, অথবা যা করাতে গেছিলেন—শেষপর্যন্ত তা আর করতে পারেননি। একা আমি, শুধু আমিই, স্টিপানের শেষ চেষ্টার অর্থ খুঁজে বের করবার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেছি—কিন্তু গোপন খবরের ধারেকাছেও পৌঁছতে পারিনি।

মুশকিলটা হয়েছিল ওর স্পোর্টস পৃষ্ঠা খোলা নিয়েই। টাকাকড়ি আর ব্যবসা বাণিজ্যের খবর যে পৃষ্ঠায় ছাপা হয়, সে পৃষ্ঠায় যেমন সংখ্যার ছড়াছড়ি থাকে—ঠিক সেই রকমই থাকে স্পোর্টস পৃষ্ঠায়। বলুন দিকি,

এত সংখ্যার মধ্যে থেকে কী করে বেছে নেওয়া যায়, ঠিক সেই সংখ্যাটিকে যা তিনি জানাতে চেয়েছেন, আয়ুর শেষ মুহূর্তে পাঁচটি মাত্র হরফ সাজিয়ে?

তাই যদি হয়, বললেন অ্যাভালোন—তাৎপর্যপূর্ণ একটি সংখ্যাকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর জন্যেই যদি স্পোর্টস পৃষ্ঠা মেলে ধরে থাকে স্টিপান—তাহলে তো বলতে হয় এত সংখ্যার মধ্যে থেকেও সে সংখ্যা খুবই চোখে পড়ার মতো সংখ্যা! যেমন, স্পোর্টস পৃষ্ঠার সংখ্যা।

প্রথম সমাধান প্রচেষ্টার জন্যে সাধুবাদ জানাই। স্পোর্টস পৃষ্ঠার সংখ্যা ছিল ৩২। সাংকেতিক শব্দের বই অনুসারে ৩২ মানে, আগের খবর বাতিল করুন। আগে কোনও খবরই পাঠাননি স্টিপান।

স্পোর্টস পৃষ্ঠায় কী ছিল বলতে পারেন? শুধোলেন অ্যাভালন।

এত বছর পরে তা মনে করা সম্ভব নয়। জেরক্স কপিও করে রাখিনি যে আপনাদের দেখাব। তবে প্রায় পুরো পৃষ্ঠা জুড়েই ছিল বেসবলের খবর। আগের কয়েক হপ্তায় গেছিল বেসবলের মরশুম। বিশেষ বিশেষ খেলার স্কোর-গুলো ছিল বক্সের মধ্যে—ছিল এন্তার স্ট্যাটিসটিক্স।

বেসবলের খবরাখবর রাখত স্টিপান?

একটু-একটু। পেশাগতভাবে আমেরিকার ওপর আগ্রহ ছিল বইকি। গোগ্রাসে গিলতেন আমেরিকান ইতিহাস। আমেরিকার জাতীয় খেলাতেও আগ্রহ ছিল সেই কারণে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান স্পাইয়ের বোকামির ঘটনা নিশ্চয় মনে আছে। গত বছরের ওয়ার্ল্ড সিরিজ কী ছিল—তা জানত না। সেই ফাঁদে পা দিতে চাননি স্টিপান। তবে হ্যাঁ, তুখোড় বিশেষজ্ঞ ছিলেন বেসবলের ব্যাপারে—তাও বলা যায় না।

নীরস গলায় বললেন অ্যাভালন—বেসবলে আগ্রহ না থাকাটা যদি স্পাইয়ের পক্ষে মৃত্যুর সামিল হয়—তাহলে আমারও মরণ আসন্ন। কারণ বেসবল আমার দু-চক্ষের বিষ।

আবারও প্রবলবেগে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন ড্রেক।

আরে, গেল যা। তেড়ে উঠলেন গোনজালো—কাগজ পড়লে, টি-ভি দেখলে, পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা করলে বেসবল সম্বন্ধে কিছু না কিছু খবর রাখতেই হয়। আপনারা যে পয়লা নম্বরের নাক উঁচু—সেটা অত জোর গলায় জাহির না করলেও চলবে। আসল সমস্যায় আসুন না কেন! সংখ্যাটা কী হওয়া উচিত ছিল—সেটা কেন মাথায় আসছে না? মি: পেনটিলি, কত বড় সংখ্যা বলে মনে হয়?

দুই অথবা তিন-এর অঙ্ক—তার বেশি নয়।

বেশ, বেশ। বেসবল এক্সপার্ট যদি নাও হয় স্টিপান—ক্রিকেটের খবর-টবর নিশ্চয় রাখত। গড় রান সংখ্যা সাধারণত তিন অঙ্কেই হয়। হেডলাইনে এই রকম খবর বেরিয়েছিল কি?

মাথা নেড়ে বললেন পেনটিলি—হেডলাইনে কোনও অঙ্কই ছিল না। চোখে পড়ার মতো কোনও সংখ্যা বা অঙ্ক ছিল না পৃষ্ঠার কোথাও—অথচ আমার দৃঢ় বিশ্বাস, স্পোর্টস পৃষ্ঠা খুলে ধরেই ইঙ্গিতটাকে চোখের সামনে এনে দিয়ে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন গ্রেগরি স্টিপান।

স্ক্র্যাবল হরফগুলোর কথাই কি বলছেন? Epock? বললেন রুবিন।

হ্যাঁ, তাই বলছি।

এর মধ্যে আদৌ কোনও ইঙ্গিত আছে বলে তো মনে হয় না।

হয়তো শুরু করেছিল, শেষ করতে পারেনি, বললেন গোনজালো—যেমন ধরুন। বলতে চেয়েছিল হয়তো ১২২ তাহলে দরকার হত পাঁচটারও বেশি হরফ—কিন্তু পাঁচটার বেশি তোলবার আর সময় পাননি।

Epock দিয়ে কোনও সংখ্যা শুরু হয় বলে আমার জানা নেই, রুবিনের কাট-কাট জবাব।

স্ক্র্যাবল খেলায় হরফদের উলটেপালটে করে সাজানো যায়। তবেই খেলা জমে ওঠে। স্টিপান তুলেছিল পাঁচটা হরফ—ঠিকমতো সাজিয়ে সংখ্যাটা প্রকাশ করার আগেই—

মারা গেছে এই তো? বললেন হ্যালস্টেড—সরি, ম্যারিও, তা সম্ভব নয় কোনওমতেই। সংখ্যাদের যখন হরফ দিয়ে লেখা হয়—তখন একটা বাঁধাধরা গৎ থাকে তাদের মধ্যে। আপনি কি জানেন জিরো থেকে

নাইন হাড্রেড নাইনটি নাইন পর্যন্ত লেখা যায় a-কে এক্কেবারে বাদ দিয়ে!

তাতে কি প্রমাণিত হল? বললেন গোনজালো—epock এর মধ্যে a নেই।

নেই। কিন্তু একটা p, আর একটা c আছে। চব্বিশ অঙ্কের সংখ্যা সমেত এক হেপটিলিয়ন পর্যন্ত পর-পর লিখে গেলেও p-এর ব্যবহার পাবেন না—পাবেন তারপরে। সাতাশ অঙ্কের সংখ্যা সমেত এক অকটিলিয়ান পর্যন্ত c-এর প্রয়োজন হবে না। এটা গেল আমেরিকান মতে সংখ্যালিখন—ব্রিটিশ মতে অবশ্য...

ব্যস, ব্যস, বুঝে গেছি, যেন গুমড়ে উঠলেন ট্রামবুল।

সঙ্গে-সঙ্গে বললেন রুবিন—আমার কিন্তু মনে হয় না হাতের কাজ শেষ করতে পেরেছিল স্টিপান। স্পোর্টস পৃষ্ঠা থেকে খবর খুঁজে নেওয়ার মতলবকে হয় তো তাড়িয়েছিল মন থেকে। ইচ্ছে ছিল আর একটা মাত্র হরফ তুলে নেওয়ার—। তাহলেই তাদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সাজালে শব্দটা দাঁড়াত pocket; পকেট খুঁজে বের করে নিতে বলত গুপ্ত সংবাদটা...

কিছুই ছিল না পকেটে, জবাব তো নয় যেন গিলোটিনের কোপ মারলেন পেনটিলি।

ছিল নিশ্চয়—ছুরি মেরেই বের করে নিয়েছিল খুনি—প্রাণটা তখন বেরিয়ে যাচ্ছে বলেই টের পায়নি স্টিপান।

অনুমানটা দ্বিতীয় শ্রেণীর হয়ে যাচ্ছে না? ধরে নিলেন একটা বাড়তি t, শুধু তাকে খাপ খাওয়ানোর জন্যে টেনে আনলেন পিকপকেটিং এর অনুমিতি। অসম্ভব।

পকেট তো একটা সাংকেতিক শব্দও হতে পারে, ছাড়বার পাত্র নন রুবিন।

না, না, না! এইবার কিন্তু অসহিষ্ণুতায় ফেটে পড়লেন পেনটিলি—জেন্টেলমেন, মজার মজার অনেক তত্বই আউরে যাচ্ছেন—এবং সব কটাই ভুল দিকে আপনাদের নিয়ে যাচ্ছে। ভুলে যাচ্ছেন কেন, মানুষের স্বভাব ম'লেও যায় না—মরবার সময়ে তো যায়ই না। স্টিপান ছিলেন বড় পরিপাটি মানুষ। মরতে যখন চলেছেন, গুছোনি স্বভাব তখনও যায়নি। হাতটা ছিল বাক্সের ঢাকনির ওপর—টেনে বন্ধ করেছিলেন ঢাকনি। সুতরাং যে কটা হরফ তাঁর দরকার হয়েছিল বের করার—তা বের করা হয়ছিল বলেই বাক্স বন্ধ করে দিচ্ছিলেন। পাঁচটাই হরফ, খেয়াল রাখবেন।

হ্যালস্টেড বললেন—পাঁচটা হরফকেই প্ল্যান মতো সাজানোর সময় নিশ্চয় পায়নি।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন পেনটিলি—পাঁচটা আলাদা হরফকে ১২০ রকমভাবে সাজানো যায়। কোনওটাই ইংরেজি শব্দ নয়—একটা শব্দ হল kopec—কিন্তু রাশিয়ান মুদ্রা kopek এর বানান আলাদা। না, মশাই না—সংখ্যার উল্লেখই করতে চেয়েছিল স্টিপান।

আচমকা বলে ওঠেন অ্যাভালোন—স্পোর্টস পৃষ্ঠায় স্পোর্টসের খবর ছাড়া আর কিছু ছিল কি? যেমন, বিজ্ঞাপন?

এমনভাবে শূন্যে তাকিয়ে রইলেন পেনটিলি যেন একটা অদৃশ্য কাগজ পড়ছেন চোখমুখ কুঁচকে। বললেন—না, ব্রিজ খেলার এক কলম খবর অবশ্য ছিল বটে।

পেয়েছি। মি: পেনটিলি, ব্রিজ খেলায় দিগগজ আমি—তা বলতে চাই না। তবে কি জানেন, মাঝেসাঝে খেলাটা খেলি—ব্রিজ কলমও পড়ি। North, South, East আর West—এই চারটে হেডিং-এর নীচে একটা করে হাত আঁকা থাকবেই সব কলমে। প্রত্যেক হাতে উপযুক্ত তাসের লিস্টও থাকবে। স্পেডস, হার্টস, ডায়মন্ডস, ক্লাবস। তার নীচে প্রতিটি তাস পরপর সাজানো থাকবে মান অথবা দাম অনুসারে।

চোয়াল শক্ত হয়ে গেল পেনটিলির—বেশ?

এবার আসা যাক epock শব্দে। e থেকে পেতে পারি east, c থেকে clubs; East-এর হাতে পাঁচটা Clubs থাকতে পারে; ধরুন সেগুলো J, 8, 4, 3, 2; J আর 3 কে বাদ দেওয়া গেল, কেন না তাদের জায়গায় e আর c-কে আমরা আগেই কাজে লাগিয়েছি। পড়ে রইল তাহলে 842; মি: পেনটিলি এই হল গিয়ে আপনার সাংকেতিক অঙ্ক।

সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন পেনটিলি।

বললেন—মশায়, স্বীকার করছি, এভাবে ভাবিনি কখনও। ডেরায় ফিরেই ব্রিজ নিয়ে বসতে হবে দেখছি। আশ্চর্য! এক্কেবারে নতুন ধরনের একটা সম্ভাবনা।

ঈষৎ রক্তিম মুখে বললেন অ্যাভালন—স্বল্পবুদ্ধিতে যেটুকু কুলিয়েছে, তা-ই বললাম।

তবে কি জানেন, বললেন পেনটিলি—আপনার এই ধারণা খুব যে একটা কাজে লাগবে, তা মনে হয় না। স্টিপান ব্রিজভক্ত ছিলেন না বলেই জানি। তাছাড়া মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একমাত্র বাতুল ছাড়া কেউ ব্রিজের সাহায্য নিয়ে গুপ্ত সংবাদ কৌশলে পাচার করানোর চেষ্টা করবে বলেও মনে হয় না। কৌশল যাই হোক না কেন—তাকে হতে হবে অতিশয় সহজ, সরল। পৃষ্ঠা সঙ্কেত দিলেই ল্যাটা চুকে যেত—কিন্তু তিনি মেলে ধরেছেন স্পোর্টস পৃষ্ঠার পুরো পাতাটাই। তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে স্ক্র্যাবল সেট থেকে বের করেছেন বড়-বড় হরফ। এর চাইতে সহজ আর কী হতে পারে।

হেনরীর মাথায় সমাধান এসেছে নাকি? বললেন গোনজালো।

যেন লাফিয়ে উঠলেন পেনটিলি—ঘুরেফিরে শেষকালে হেনরীর কাছেই যেতে হল! কী গো হেনরি, হেঁয়ালির মারপ্যাঁচে মাথা ঠান্ডা আছে তো?

কথার ঝড়ে ঘরের মধ্যে যখন তুলকালাম কাণ্ড চলছে, হেনরী তখন ঠায় দাঁড়িয়েছিল সাইডবোর্ডের পাশে শিষ্ট বালকের মতো। এবার বললে—এইটুকু মাথায় কিছু ঢুকলে তো! ২০ সংখ্যাটির কোনও তাৎপর্য আছে কিনা—

কথা আর শেষ করতে পারেনি হেনরী। আচমকা দুই ভুরু পাকিয়ে কটমট করে তার দিকে চেয়েছেন পেনটিলি।

বলছেন—কুড়ি! আন্দাজে ঢিল ছুঁড়লে নাকি?

মোটেই না, স্যার। তাৎপর্যটা তাহলে আছে?

তাৎপর্য! মুখ কালো করে বছরের পর বছর শুধু ভেবেই গেছি—নিশ্চয় কুড়ি সংখ্যাটা জানাতে চেয়েছিল স্টিপান। সাংকেতিক শব্দের বই অনুসারে, কুড়ি মানে—'সরকারের কড়া নিয়ন্ত্রণে সব কিছুই'। এতক্ষণ তো অনেক বকলাম—20 সংখ্যাটা নিশ্চয় ভুলেও বলিনি?

সমস্বরে সবাই জানালেন—না, পেনটিলির মুখ দিয়ে এ সংখ্যার আভাসটুকুও বেরোয়নি। পেনটিলি বললেন—যদি প্রমাণ করতে পারতাম, 20 সংখ্যা দিয়ে স্টিপান আমাদের হুঁশিয়ার করতে চেয়েছেন—তাহলে অন্তত: শূকর উপসাগরের বিপর্যয় রোধ করতেও পারতাম। চেষ্টাটা অন্তত করতাম। কিন্তু...কিন্তু...হেনরী কী করে চট করে এসে গেল 20-তে?

আমার অজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে, সবিনয়ে জানাল হেনরী—আপনি তো বললেন, বেসবলের মোটামুটি খবর রাখত স্টিপান—আমিও রাখি মোটামুটি খবর। সেই জন্যেই দেখি বক্সের মধ্যে স্কোরগুলো। খেলার ফল কী হল—তাই জানলেই চলে যায় আমার মতো উজবুক লোকের—স্কোর মানেই তো কুড়ি।

হারতে রাজি নন অ্যাভালন—তা কী করে হয়, হেনরী। স্কোর তো সেকেলে শব্দ। স্টিপান সেকেলে ইংরেজিতে মা-গঙ্গা ছিল বললেই চলে।

মি: পেনটিলি কিন্তু বলেছেন, আমেরিকান ইতিহাস গোগ্রাসে গিলত স্টিপান। ইতিহাসের একটা কথা তো প্রবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে, ফোর স্কোর অ্যান্ড সেভেন ইয়ার্স এগো...

ঈষৎ মুষড়ে পড়ে পেনটিলি বললেন—তবুও বলব খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য হচ্ছে না—

বিশ্বাসযোগ্য হতেই হবে মি: পেনটিলি। স্ক্র্যাবল হরফগুলোর মানেও তো কুড়ি।

কীভাবে?

মি: গোনজালো যখন Blain শব্দটা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, পরিষ্কার জিগ্যেস করেছিলেন, শব্দটা ইংরেজি কিনা। Epock শব্দটাকেও যে ইংরেজি হতেই হবে—এমন কথাও কি কেউ বলেছিলেন?—বলেননি।

সহর্ষে বললেন গোনজালো—Epock কি তাহলে রাশিয়ান শব্দ? যার মানে কুড়ি?

জবাবটা দিলেন পেনটিলি—না। Kopec/Kopek সম্ভাবনার কথা আগেই বলেছি—কিন্তু তার সঙ্গে কুড়ি-র কোনও সম্পর্ক নেই।

রাশিয়ান শব্দের কথা আমি ভাবিনি, বললে হেনরী—আপনিই তো বললেন, মরবার সময়েও মানুষ তার অভ্যেস ছাড়তে পারে না। মি: স্টিপানও অভ্যেসের বশে নিশ্চয় রাশিয়ান হরফ তুলে নিয়েছিল।

Cyrillic অ্যালফাবেট, বললেন রুবিন।

ইয়েস স্যার। USSR-কে রাশিয়ান হরফে দেখেছি এইভাবে—CCCP; আঁচ করেছিলাম রাশিয়ান C আমাদের S-এর সমান, আর রাশিয়ান P আমাদের R-এর সমান।

হতভম্ব মুখে বললেন পেনটিলি—ঠিক! ঠিক! ঠিক! ঠিক!

রাশিয়ান k যদি আমাদের c-এর সমান হয়, তাহলে epock শব্দটা হয়ে যাচ্ছে erosc; ঘুরিয়েফিরিয়ে সাজালেই পাচ্ছি Score।

আবার ভয়ানক মুষড়ে পড়েন পেনটিলি—হেনরী! হেনরী! একথা তুমি ১৯৬০ সালে কেন বললে না আমাকে?

জানলে তো বলব, হেনরীর মুচকি জবাব।

(আইজাক আসিমভের 'স্পোর্টস পেজ' অনুসরণে)

**'ফ্যানট্যাসটিক' পত্রিকায় প্রকাশিত। শারদীয় সংখ্যা।*

লাল চুনি পেকে হলুদ

লেডি ফেবার বললেন, সোজা ব্যাপারটা শুনুন। চোরদের আপ্যায়ন চলছে এখানে। খানাপিনা করাচ্ছি তস্করদের। ছি:-ছি:-ছি:! ভাবতও গা-শিরশির করছে আমার। তাকাতে পারছি না অতিথিদের মুখের দিকে। কী লজ্জা! খাতির করে যাদের ডেকে এনেছি, চোর রয়েছে কি না তাদের মধ্যে!

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছে ভদ্রমহিলার পোর্টম্যান স্কোয়ারের বাড়িতে—গাছপালা রাখবার ঘরে। ঝকমকে নাচঘরটা দেখা যাচ্ছে সামনেই। কত রঙের বাহার সেখানে। ঝলমল করছে অসংখ্য জহরতের জৌলুসে। একপাশে আমাকে নিয়ে গিয়ে লেডি ফেবার আমাকে দেখাচ্ছেন বিখ্যাত চুনির মালা। মালা থেকে উধাও হয়েছে একটা পেনড্যান্ট। খুবই সূক্ষ্ম কারুকাজ করা পেনড্যান্ট। উধাও হওয়া মানে কোথাও খসে পড়েনি —চুরি হয়েছে। দুর্ঘটনা নয়—লোপাট হওয়া।

বেশ কিছুদিন ধরেই এমনি বিস্ময়কর জহরত চুরি চলছে লন্ডনে। লন্ডন শহর হতভম্ব হয়ে যাচ্ছে এক-একটা ঘটনার পর। ১৮৯৩ সালের মরশুমে যেন মণিমাণিক্য চুরির হিড়িক পড়ে গেছে শহর জুড়ে।

লেডি ফেবারের বাড়িতে এসেছি মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে। এর মধ্যেই বেশ কয়েকজনের ঘ্যানঘ্যানানি শুনতে হল। জহরত চুরি গেলে এত নাকি কান্নাও কাঁদতে পারে মেয়েগুলো! হ্যা: হ্যা:!

ডানহোমের কাউন্টেসের একটা হিরের ব্রোচ চুরি গেছে। পোশাক আটকে রাখার দামি পিন। দেখতে আধখানা চাঁদের মতো।

মিসেস কেনিংহাম-হার্ডি হারিয়েছেন মুক্তো আর নীলকান্ত মণির কণ্ঠহার।

পান্নার লকেট খুইয়েছেন লেডি হ্যালিংহাম। নেকলেস থেকে লকেটটা হয়তো চাকরানিও সরিয়ে থাকতে পারে, এমন একটা বাঁকা সন্দেহও প্রকাশ করতে ছাড়েননি ভদ্রমহিলা।

তারপরেই শুনলাম লেডি ফেবারের পেনড্যান্ট চুরির কাহিনি। বেশ বুঝলাম, আজকের এই নাচের আসর জমবে ভালোই—নাচের জন্যে নয়—জহরত হাওয়া হয়ে যাওয়ার বহু ঘটনার জন্যে।

সাত পাঁচ ভাবছি আর লেডি ফেবারের পেনড্যান্টহীন রত্নমালা উলটেপালটে দেখছি। জিনিসটা নিসন্দেহে মূল্যবান। পেনড্যান্টটা মুচড়ে বার করে নেওয়া হয়েছে অপূর্ব এই রত্নমালা থেকে। যেই নিক, তার যে সৌন্দর্যপিপাসা আছে বিলক্ষণ, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ভালো জিনিসই নিয়েছে। তবে লেডি ফেবার এমন কটমট করে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন যে মুখ ফুটে চোরের রুচির প্রশংসা করতে পারছি না।

তাই চোখে-চোখে না তাকিয়ে রত্নহারের দিকে চোখ রেখে বললাম, কাটা জায়গাটা দেখেছেন? কাঁচি দিয়ে সোনার চেন কাটা হয়েছে। তারপর ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে। যিনি নিয়েছেন, তাঁর নাম যখন জানা নেই, তখন তাঁকে পকেটমার বলতে দ্বিধা নেই। কেননা, কাটার জায়গা দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছে, কাঁচিটা পকেটমারদের কাঁচি।

মুখ-টুখ লাল হয়ে গেল লেডি ফেবারের, বলেন কী! তাহলে একজন পকেটমারকেও খাতির করে খানাপিনা করাচ্ছি!

পকেটমার না হলেও পকেটে হয়তো পকেটমারদের কাঁচি রেখে দিয়েছেন—ভয়ে ভয়ে বললাম আমি।

কী ভীষণ! কী ভীষণ! আর্ত চিৎকার করে উঠলেন লেডি ফেবার। আমার যা গেল তা তো গেলই। কিন্তু অভ্যাগতদের অবস্থাটা এখন কী হবে বলুন তো। কে যে কখন কপাল চাপড়াবে... জানেন তো এ হপ্তায় এই নিয়ে তিন-তিনটে নাচের আসরে জহরত চুরি হয়ে গেল। এর শেষ কোথায়?

পুলিশ ডাকুন, শেষ দেখতে পাবেন। দ্বিধা ঝেড়ে ফেলুন। অভ্যাগতদের সার্চ করতে দেবেন না, তাঁদের অপমান করবেন না—এই মনোভাব নিয়ে থাকলে তস্কর মহাশয় মনের সুখে চুরি চালিয়ে যাবেন। বুঝতেই তো পারছেন পাইকারি হারে চুরি চলছে—ডাকাতিও বলতে পারেন—সমাজে মিশে গিয়ে সামাজিকতা রক্ষে করার ফাঁকে-ফাঁকে চুরিতে হাত পাকিয়ে চলেছেন একজন। ধরতে তাকে হবেই। ডাকুন পুলিশ।

জুল-জুল করে তাকালেন লেডি ফেবার, খুব হালকাভাবে কথাটা বললেন বটে, কিন্তু...পেনড্যান্টের প্রত্যেকটা চুনির দাম কত জানেন? আমার স্বামীর হিসেবে আটশ পাউন্ড—প্রত্যেকটার।

তা তো হবেই। দেখতেও অপূর্ব। অবিকল বর্ণনা শোনাতে পারবেন? প্রত্যেকটা চুনিকে দেখতে কীরকম?

শুনে কী করবেন? খুঁজে পেতে কি সুবিধে হবে?

এমনও তো হতে পারে, চোরাই চুনি বিক্রির জন্যে আমার কাছেই এল? তখন যদি বর্ণনা মতো মিলিয়ে নিতে পারি, আপনার হারানিধি আপনাকেই ফিরিয়ে দিয়ে যাব। লেডি ফেবার, এ সংসারে অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে।

ঝঙ্কার দিলেন লেডি ফেবার, আমি চাই চোরকে আপনি ধরুন।

আমিও তাই চাই। কেন না, এইভাবে যদি চুরি চলতে থাকে, লন্ডনের কোনও ভদ্রমহিলা আর আসল রত্ন গায়ে চাপাবেন না। ফলে, লোকসান তো আমারই।

দেখুন মশাই, আমার অতিথি অভ্যাগতদের চুলটি ছুঁতে দেব না আপনাকে। যা করবেন, বাইরে করুন। নাচঘরে বা বাড়ির মধ্যে ঝামেলা করতে যাবেন না।

ঠিক, ঠিক। মাথা ঠান্ডা করেই কাজ করা উচিত এখন। কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একজন নয়, একটা গোটা দল রয়েছে এই চুরির পেছনে। কাজেই আপনার বাড়ির মধ্যে কোনও হামলাই আমি করব না। থাক সেকথা। এখন বলুন, আপনার হারানো চুনিদের দেখতে কীরকম।

গোটা পেনড্যান্টটাই গোলাপ ফুলের মতো দেখতে। কণ্ঠমালাটা লর্ড ফেবার এনেছিলেন বর্মা থেকে। আংটির আকারে সাজানো সারি-সারি লাল চুনি ছাড়াও পেনড্যান্টের মধ্যে আছে চারটে হলদে চুনি, লোকে বলে, লাল চুনি নাকি পেকে হলুদ হয়ে আসছিল। কুসংস্কার ছাড়া অবিশ্যি কিছুই নয়। তবে কি জানেন, হলদে চুনিগুলোকে দেখলে মনে হয় যেন আগুনে ঠাসা, হিরের মতো ঝলমলে। চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়।

মণিরত্ন আমিও চিনি, লেডি ফেবার। বার্মিজরা নানা রঙের চুনি বেচে, সে খবরও রাখি। তবে কি জানেন, নীল চুনি বলে যেটাকে চালায়, সেটা আসলে নীলকান্তমণি। যাক সে কথা, কতক্ষণ আগে হারিয়েছেন আপনার পেনড্যান্ট?

দশ মিনিট আগে।

তাহলে এইমাত্র যার সঙ্গে নেচে এলেন, চোর হয়তো সে-ই!

অ্যাঁ!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। নাচের আসর আজকাল বড়লোক হওয়ার সবচেয়ে সোজা পথ।

দেখুন মশায়, তেড়ে উঠলেন লেডি ফেবার। এইমাত্র যাঁর সঙ্গে নেচে এলাম, তিনি আমার স্বামী। দয়া করে এসব কথা তাঁকে বলতে যাবেন না। চুনি হারানোর শোকে পাগল তো হবেনই, আমাকেও আর দু-চক্ষে দেখতে পারবেন না।

বলেই সাঁই সাঁই করে চলে গেলেন লেডি ফেবার। কী আর করি, গুটি-গুটি গিয়ে দাঁড়ালাম সিঁড়ির গোড়ায়। আমি তো এখানে এসেছি সাম্প্রতিক জহরত চুরি সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে—কানাঘুসোয় যদি কিছু শুনতে পাওয়া যায়—এই আশায়। চুরিগুলো মামুলি চুরি নয়—রীতিমতো বিস্ময় জাগানো। সুতরাং টনক নড়েছে আমার।

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম নাচঘরের দৃশ্য। লন্ডন শহরে এরকম নাচঘর আরও অনেক আছে। চেহারায় আর চরিত্রে প্রায় একইরকম—একটু যা উনিশ বিশ। ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ি নেচেকুঁদে বেড়াচ্ছে

বিভিন্ন ঢঙে। সবাই চায় শরীরের তৎপরতা দেখাতে। রহস্যময় এই কক্ষে কোনও ব্যক্তি হাতসাফাইয়ের ফন্দি এঁটে চলেছেন, তা বোঝা মুশকিল। অথচ এ চুরি থামানো দরকার। নইলে লন্ডনের জহরত বিক্রির ব্যাবসা দারুণ চোট খাবে। আমার কারবারেও মন্দা দেখা দেবে।

জীবনে অনেক চাঞ্চল্যকর অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। খাতায় সব লেখা আছে। তা থেকে দু-একটা ইন্টারেস্টিং কেস পাঠকপাঠিকাদের সামনে হাজির করেছি। যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন, নিজেকে কোনওদিন ডিটেকটিভ বলে জাহির করতে যাইনি। ডিটেকটিভদের যে যোগ্যতা আছে, আমার তার কিছুই নেই। তাঁদের সবচেয়ে বড় ক্ষমতা হল দূরদৃষ্টি, আমার তা মোটেই নেই। অনেক কেসে নাক গলিয়েছি ঠিকই, মাথাও ঘামিয়েছি—কিন্তু তা গোয়েন্দাগিরি করার জন্যে নয়—কারুর না কারুর উপকার করার জন্যে —যাতে তার উপকার আমি পরে পেতে পারি। আর অস্ত্রশস্ত্রের কথা যদি বলেন তো ও সবের ধারকাছ দিয়েও আমি যাইনি কোনওদিন। হাতিয়ার আমার একটাই—কমনসেন্স। কোনও-কোনও ক্ষেত্রে দৈব আমার সহায় হয়েছে; দৈবাৎ মোক্ষম সূত্র হাতে এসে গেছে। স্রেফ কপাল জোরে সোজা পথের সন্ধান পেয়েছি—রহস্যের গোলকধাঁধায় ঘুরে মরতে হয়নি।

এইরকম একটা আশা নিয়েই এসেছিলাম লেডি ফেবারের প্রাসাদে। অচেনা কোনও মুখের দর্শন পেলেও পেতে পারি, মুখ ফসকে কেউ কোনও কথা বলে ফেলতে পারে, অথবা নিছক ঝোঁকের মাথায় এমন পথে পা দিতে পারি যা গত কয়েক হপ্তাব্যাপী অন্ধকারময় প্রহেলিকার মধ্যে আলোর সন্ধান দিতে পারে।

তা সত্ত্বেও নাচঘরে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকাই সার হল। সমস্ত প্রচেষ্টাটাই মনে হল বৃথা গেল। আশেপাশে সন্দেহভাজন কোনও মুখ দেখলাম না, সন্দেহজনক কোনও কথা কানে ভেসে এল না। মেজাজ গেল খিঁচড়ে। নাচঘর ছেড়ে এসে দাঁড়ালাম গাছপালা রাখার ঘরে। সবুজ পাতাগুলোর দুলুনি দেখে অনেক শান্ত হল মনটা।

এ ঘরে এখন লোকজন বেশি নেই। টেবিল ভরতি খাবার নিয়ে গব-গব করে গিলে চলেছেন জেনারেল শারার্ড। এই এক লোক! খেতেই আসেন এবং খেয়ে যান। যতক্ষণ না ডিনার টেবিলে খাবার সাজানো হচ্ছে, ততক্ষণ রিফ্রেশমেন্ট টেবিলে বসেই খেয়ে যাবেন। সব ভোজসভায় তাঁকে দেখি ঠিক এইভাবেই খেয়ে যেতে। সেন্ট পিটার্স গির্জের সহকারী যাজক রেভারেন্ড আর্থার মেলব্যাঙ্ককে দেখলাম চুকচুক করে চায়ে চুমুক দিতে। রোগা প্যাকাটি এক তরুণ স্কুলের বাচ্চাছেলের মতো সুগন্ধী বরফ খাচ্ছে তো খাচ্ছেই। আর দেখলাম সিবাইল ক্যাভানাগ নামের সেই মহিলাকে, যাকে দেখা যায় লন্ডনের সব নাচের আসরে। ভদ্রমহিলা খুব মিশুকে—আসর জমাতে পারেন। সমাজের মাথাদের সঙ্গে যোগাযোগও নিশ্চয় আছে, নইলে সবক'টা নাচের আসরে এসে জোটেন কী করে। দেখতে শুনতেও মন্দ নয়। আমি কিন্তু ভদ্রমহিলার বকবকানি সইতে পারি না বলে দেখা হলেই এড়িয়ে চলি।

সেদিন কিন্তু এড়াতে পারলাম না। হঠাৎ মুখোমুখি হতেই সোল্লাসে এমন চিৎকার করে উঠলেন যে পালাবার পথ খুঁজে পেলাম না।

চা আনান, চা আনান, এক কাপ চা আনান আমার জন্যে। কর্নেল হার্নারকে চেনেন তো? তেষ্টার দেশ থেকে এসে দশ মিনিট কথা বলে গেলেন আমার সঙ্গে—সেই থেকে তেষ্টায় মরে যাচ্ছি।

মরে যাইরে। কী আহ্লাদ! ওঁর চা-তেষ্টা পাবে বকর-বকর করে, আর আমাকে চা বয়ে এনে দিতে হবে তাঁর জন্যে!

কী আর করা যায়! ভদ্রতার খাতিরে এনে দিলাম এক কাপ চা। সেইসঙ্গে অমায়িক হেসে একটু জ্ঞানদান করতেও ছাড়লাম না—নার্ভের বারোটা বাজিয়ে বসবেন দেখছি। শেষকালে খানাপিনাই না বাদ যায়।

নার্ভ কি আর আছে আমার—চায়ের স্বাদ নিতে-নিতে বললেন সিবাইল ক্যাভানাগ—দুধে দাঁত যেদিন বিসর্জন দিয়েছিলাম, আমার তো মনে হয় সেইদিন থেকেই নার্ভ জিনিসটাও ছেড়ে গেছে আমাকে। যাক সে কথা—খবর শুনেছেন তো? ভয়ানক ব্যাপার, তাই না?

চোখমুখ ভয়ানক করুণ করে কথাগুলো বললেন সিবাইল ক্যাভানাগ। প্রথমটা বুঝতে পারিনি কী বলতে চাইছেন, তারপরেই খেয়াল হল, নিশ্চয় লেডি ফেবারের চুনি খোয়ানোর ব্যাপারটা শুনে ফেলেছেন।

তালে তাল ঠুকে তাই বলতেই হল, তা যা বলেছেন। ভয়ানক রহস্যই বটে।

রহস্যের জট ছাড়াতে পেরেছেন কি? সন্দেহ হয় কাউকে? আহা, সময় কাটানোর জন্যে না হয় একজনকে সন্দেহই করা গেল!

কথার ধরন দেখে গা-পিত্তি জ্বলে গেল। তা সত্বেও মুখে হাসি টেনে এনে বললাম, আপনার কাউকে সন্দেহ হচ্ছে নাকি? বলেই ফেলুন না—কিছুটা সময় তো কাটবে।

ফিক ফিক করে হেসে বললেন, সিবাইল ক্যাভানাগ—সেরকম কাউকে তো দেখছি না এঘরে। যাজক মশায়ের পকেট সার্চ করা কি ঠিক হবে? পাবেন তো ধর্মোপদেশ—চুনির বদলে!

আজকের কেসটাকেও 'ধর্মোপদেশ' বলতে পারেন। দামি পাথরের ধর্মোপদেশ। আচ্ছা, আপনি আস্তিনের মধ্যে চুনিগুলো লুকিয়ে রাখেননি তো?

কী যে বলেন! আস্তিনের মধ্যে লুকোতে যাব কেন?

সবার চোখে ধুলো দিয়ে পালাবেন বলে।

আচ্ছা মানুষ তো আপনি! ঘর ছেড়ে নড়লামই না—পালালাম কোথায়? তাছাড়া আপনি জানেন না, এই সেদিন হেইস-এর নাচের আসরে দামি পাথরের একটা ব্রোচ হারিয়েছি। হারিয়েছি মানে চুরি গেছে। কিন্তু আমার স্বামী তা বিশ্বাস করে না। রোজই গজগজ করে চলেছেন—ভিড়ের মধ্যে কোথায় ফেলে দিয়েছি—দোষ চাপাচ্ছি চোরের ঘাড়ে।

আপনার নিজের কী মনে হয়?

চুরি, চুরি, নির্ঘাত চুরি। অত কাঁচা কাজ আমি করি না। ব্রোচ পাছে খুলে পড়ে যায় তাই কষে পিন দিয়ে এঁটে রাখি। কিন্তু যে লোকটি নিয়েছে, তার হাতের জাদুর তারিফ করতে হয়। ঠিক যেভাবে লেডি ফেবারের পেনড্যান্ট খুলে নিয়েছে সোনার চেন থেকে চক্ষের নিমেষে, অবিকল সেইভাবে আমার ব্রোচও খুলে নিয়েছে পিন আলগা করে দিয়ে। ভাবতেও গা শিরশির করছে। একটা চোরকে নিয়ে প্রত্যেক পার্টিতে ঘোরাফেরা করা...ছি: ছি: ছি:!

শুরু হয়ে গেল বকবকানি। গয়না চুরি গেলে মেয়েরা এত বকতেও পারে! বাধা দিয়ে কোনও লাভ হবে না জেনে হাসি-হাসি মুখে শুনে গেলাম ভদ্রমহিলার বাক্যস্রোত।

হাই হাউ করে বেশ কিছুক্ষণ আলতু ফালতু বকবার পর আচমকা ভদ্রমহিলা বললেন, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কাউকে সন্দেহ করিনি আমরা—করাটা কিন্তু খুবই দরকার। তাই নয় কি? যাজকমশায়কে যদি ধর্তব্যের মধ্যে না আনা যায়, তাহলে ওই হ্যাংলাপানা ছোকরাটাকে সন্দেহ করলে ক্ষতি কী বলুন?

মুখটা দেখেছেন? খাই-খাই ভাব রয়েছে না?

এন্তার খেয়ে যাচ্ছে বলেই ছোকরাকে ক্রিমিন্যাল শ্রেণির মধ্যে ফেলা যায় না। দেখতেই তো পাচ্ছেন, খাবারের লোভই ওর বেশি—অন্য কোনও লোভ আছে বলে মনে হয় না। তাছাড়া, হিরে-মণি-মুক্তোর দিকে যার নজর থাকবে, সে এখানে দাঁড়িয়ে সুগন্ধী বরফ গিলবে কেন? নাচঘরে ঘুরঘুর করলেই পারত? মণিমুক্তো যেখানে রয়েছে?

তা যা বলেছেন। নাচঘরের সবাইকে অবশ্য এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে। ওই যে দেখছেন তালঢ্যাঙা লোকটা মাঝে-মাঝে সারস পাখির মতো ঘাড় লম্বা করে এদিক-ওদিক তাকিয়েই বুটের দিকে তাকাচ্ছে...বুট দেখছে, না, অন্য কিছু দেখছে?

হয়তো অন্য কিছুই দেখছে। তবে মানুষের মাথা দেখে তো আর সিদ্ধান্ত খাড়া করা যায় না।

হেসেই গড়িয়ে পড়লেন সিবাইল ক্যাভানাগ—সত্যি! কত কম জানেন আপনি! আরে মশাই, মাথাই তো মানুষের চরিত্র! ধরুন একজন বুড়ো লোকের ব্রহ্মতালু। খুঁটিয়ে যদি দেখেন তো এত খবর পাবেন তাজ্জব

হয়ে যাবেন। বেশ তো ওই যে চকচকে ছাদের মতো টেকোমাথা লোকটাকে দেখছেন—টাক দেখেই কি বুঝছেন না টাকার কুমির হলেও অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি? আমি অবশ্য আমার শত্রুর মাথাতেও অমন টাক পছন্দ করব না।

বলতে-বলতে আবার খিলখিল করে হাসতে-হাসতে কিলবিল করে কেঁপে উঠলেন ভদ্রমহিলা। মেজাজটাকে কোনওমতে সামলে রেখে শুধোলাম,—আপনারও শত্রু আছে নাকি?

আছে কি নেই সবাইকে জিগ্যেস করেই দেখুন না।

চলুন—মুখ দিয়ে কথাটা বার করতে-না-করতেই নাচঘর থেকে একটা বিরাট দল হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল এই ঘরে। সিবাইল ক্যাভানাগ আর আমি দুজনেই কোণঠাসা হয়ে গেলাম সিঁড়ির রেলিংয়ের পাশে। কিছুক্ষণ পরেই হই-হই করতে করতে দলটা বেরিয়ে যেতেই সিঁড়ির দিক থেকে সরে আসতে গেলেন সিবাইল ক্যাভানাগ। গাউনের তলার দিকটা যে রেলিংয়ের লোহার পেরেকে আটকে গেছে, খেয়াল করেননি। টানের চোটে ছিঁড়ে গেল ভেতরকার সিল্কের পটি। পটির তলা বরাবর ফাঁকা জায়গাটায় দেখলাম সেলাই করা রয়েছে একটা অতীব সুন্দর হিরের ব্রোচ—দেখতে আধখানা চাঁদের মতো।

ভদ্রমহিলার তখনও খেয়াল নেই যে গাউন ছিঁড়েছে। আরও একটু টান দিতেই বেশ খানিকটা সিল্ক-পটি ছিঁড়ে নিয়ে ঝুলতেই ঠেকল পায়ে। চকিতে নিচের দিকে তাকিয়ে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রবেগে গাউন সামলে নিলেন সিবাইল ক্যাভানাগ—লুকিয়ে ফেললেন ছেঁড়া অংশসমেত হিরের ব্রোচ।

রক্তিম মুখে আড়চোখে তাকালেন আমার দিকে—ভাবখানা, আমি কি দেখে ফেলেছি লুকোনো ঐশ্বর্য?

আমি কিন্তু সেরকম কোনও ভাবই চোখেমুখে প্রকাশ করলাম না। ডিটেকটিভ হই আর না হই, একটু-আধটু অ্যাকটিং করতে হয় আমাদের সবাইকেই।

ভীষণ আক্ষেপের সুরে তখন বললেন ভদ্রমহিলা, কী কাণ্ড বলুন তো! ছিঁড়ে ফেললাম গাউনটা!

তাই নাকি? গাউন ছিঁড়েছে? সামনে, না পেছনে?

কী কষ্টে যে কণ্ঠস্বর সংযত রেখে কথা ক'টা বলেছিলাম, তা শুধু আমিই জানি। বিস্ময়ের বন্যায় তখন আমার বুক ধড়াশ-ধড়াশ করছে; বিরাট এই আবিষ্কারের ফলে যে এ বছরের সেরা গল্প হাতের মুঠোয় এসে গেল, তা সমস্ত সত্তা দিয়ে উপলব্ধি করছি; তা সত্ত্বেও চোখমুখ নির্বিকার রেখে ছেঁড়া গাউন দেখার অভিনয় চালিয়ে যেতে হল। একটু ভুল হলেই গল্প মাঠে মারা যাবে জেনে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হল।

তারপর হেসে-হেসে বলতে হল, ছেঁড়া গাউন কাউকে না দেখিয়ে বরং ওপরে চলে যান। কেউ না কেউ আছে, ছেঁড়া জায়গা সেলাই করে দেবে। তারপর নীচে নামবেন।

আকাশের চাঁদ যেন হাতে পেলেন ভদ্রমহিলা। তড়বড় করে উঠে গেলেন সিঁড়ি বেয়ে দোতলায়—অদৃশ্য হয়ে গেলেন একটা শোওয়ার ঘরে।

চোখের আড়াল হতেই ফিরে এলাম গাছপালার ঘরে। তারিয়ে-তারিয়ে এককাপ কড়া চা খেলাম। চিন্তাশক্তি উদ্দীপ্ত করতে চায়ের জুড়ি হয় না—এ অভিজ্ঞতা আমার অনেক দিনের। তারপর ঝাড়া দশ মিনিট ধরে পুরো ব্যাপারটাকে মনের মধ্যে তোলাপাড়া করলাম। কে এই মিসেস সিবাইল ক্যাভানাগ? গাউনের ভেতরকার প্যানেলে হিরের ব্রোচ সেলাই করে রেখে দিয়েছেন কেন? এমনভাবে লুকিয়ে রেখেছেন যেন টেমস নদীর জলে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে—হাজার চেষ্টা করলেও আশপাশের কারুর চোখে পড়বে না।

প্রশ্নগুলোর উত্তর যে-কোনও শিশুই দিতে পারে ঠিকই, কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই শিশুর চোখ এড়িয়ে যেতে পারে—এতবড় একটা সিদ্ধান্তের মূলে পৌঁছতে হলে প্রত্যেকটা ঘটনার অবদান নেহাত কম নয়।

যেমন ধরা যাক, এইমাত্র যে অপরূপ ব্রোচটা দেখে নয়ন সার্থক করলাম, লেডি ডানহোমের চুরি যাওয়া ব্রোচের সঙ্গে তা দিব্বি মিলে যায়। অথচ ঠিক এই ধরনের ব্রোচ শ'খানেক মহিলা গয়না হিসেবে ব্যবহার করেন।

কিন্তু আমি যদি এখন লেডি ফেবারের কাছে দৌড়ে গিয়ে বলি—শুনুন, শুনুন, চোরকে পাওয়া গেছে—নাম তাঁর মিসেস সিবাইল ক্যাভানাগ,—তাহলেই মারাত্মক ভুল করে বসব কেলেঙ্কারিই সার হবে।

অথচ আমি জানি, একশ পাউন্ড পকেট থেকে বার করে দিয়ে যদি ভদ্রমহিলার গাউনের প্যানেল তল্লাশি করার অনুমতিলাভ করি, তাহলে চুনির পেনড্যান্ট ওই প্যানেলের মধ্যেই পাব, পুরস্কার হিসেবে তখুনি ফিরে পাব একশ পাউন্ড, সেইসঙ্গে বাড়তি কিছু।

পেনড্যান্ট পাওয়া নিছক একটা সূত্র। ওই ক্লু ধরে এগোলেই পরের পর জহরত চুরি রহস্যের সমাধান ঘটবেই, বছরের সবচেয়ে জটিল প্রহেলিকার অবসান ঘটবে।

কিন্তু ভদ্রমহিলা এখন ওপরতলায়। সেখানে লুকিয়ে রাখার জায়গার অভাব নেই। যা লুকোতে চান, এতক্ষণে তা লুকনোও হয়ে গেছে। কাজেই আচমকা গাউনের পটি তল্লাশি করা আহাম্মকি হবে—চোরকে বামাল ধরা যাবে না।

আর এক কাপ চা পান করতেই মাথাটা আরও একটু পরিষ্কার হয়ে গেল। স্পষ্ট বুঝলাম, ভদ্রমহিলা আদৌ চোর নন, কিন্তু চুরির মাল কাছে রাখেন। লেডি ফেবারের রত্নমালার কাঁচি চালিয়ে পেনড্যান্ট সরানো হয়েছে; সিবাইল ক্যাভানাগের পক্ষে ওভাবে কাঁচি চালানো সম্ভব নয়। দক্ষ কোনও পুরুষ এই কর্মটি করেছে। কিন্তু কে সেই ব্যক্তি? একজন, না বহুজন? কপাল জোরে একটা জুটির আভাস পাচ্ছি; এমনও তো হতে পারে, আরও অনেকের হাত রয়েছে রত্নচুরির পেছনে? তাদের খোঁজখবর নেওয়াটা আগে দরকার। তা না করে যদি ওই ভদ্রমহিলাকে শাস্তি দেওয়া যায়, ব্যাপকভাবে যে ষড়যন্ত্র চলছে, তা বন্ধ হবে না। ভদ্রমহিলার গাউনের পটি থেকে হিরের ব্রোচ পাওয়া গেলেও বিরাট কিছু একটা প্রমাণ করতে পারব না। কেন না, প্রায় ওই ধরনের হিরের ব্রোচ কেনশিংটন থেকে টেম্পল বার পর্যন্ত সমস্ত জড়োয়া গয়নার দোকানেই পাওয়া যায়। সুতরাং ভদ্রমহিলাকে ফট করে চোর বলে বসলে লোকে আমাকেই পাগল ঠাওরাবে।

আর একটা কাজ করতে পারি। ছ্যাকড়াগাড়ি ডেকে এখুনি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে চলে যেতে পারি। এইমাত্র যা দেখলাম, তা বলতে পারিও। অদ্ভুত এই কেসের কাহিনি যদি লিখতেই হয়, তা আমিই লিখব এবং আর একটুও সময় নষ্ট করা উচিত নয়।

পুরো ব্যাপারটাকে মাথার মধ্যে সাজিয়ে নেওয়ার ফলে অনেকটা ধাতস্থ হয়েই ফের ঢুকলাম নাচঘরে। একটু পরে দেখলাম মিসেস সিবাইল ক্যাভানাগও এসে গেছেন। চোখমুখ নির্বিকার। আগের মতোই হাসছেন খিলখিলিয়ে। আমাকে দেখেও হাসির ফোয়ারা ছোটালেন। বেশ বুঝলাম, ওঁর বিশ্বাস, গাউনের পটিতে লুকনো হিরের ব্রোচ আমি দেখতে পাইনি।

কিছুক্ষণ পরেই অভ্যাগতরা ঢুকলেন ডাইনিং রুমে। আমি দেখে নিলাম মিসেস সিবাইল ক্যাভানাগ কী-কী গয়না পরে আছেন।

তারপর সবার অলক্ষিতে বেরিয়ে এলাম সামনের দরজা দিয়ে বাড়ির বাইরে। ডাকলাম একটা ঘোড়ার গাড়ি। সোজা চলে এলাম বন্ড স্ট্রিটে আমার আস্তানায়।

ঘণ্টা বাজাতে দরজা খুলে দিল দ্বাররক্ষক। চেয়ে রইল অবাক চোখে। সোজা গেলাম আমার জুয়েল কেসগুলোর সামনে। বিশেষ একটা কেসে থাকে যত রাজ্যের সস্তা জড়োয়া গয়না। তুলে নিলাম একটা হিরের ব্রোচ। গেঁথে রাখলাম আমার কোটের ভেতর দিকে। তারপর দ্বাররক্ষককে ওপরে পাঠিয়ে ঘুম ভাঙালাম চাকর অ্যাবেল-এর। পাঁচ মিনিটেই পাশে এসে দাঁড়াল অ্যাবেল—পরনে শুধু ট্রাউজার্স আর শার্ট।

বললাম—সুসংবাদ, অ্যাবেল। যে দলটার খোঁজ করছিলাম, তাদের সন্ধান পেয়েছি।

সোল্লাসে বললে অ্যাবেল, গুড গুড স্যার!

লেডি ফেবারের নাচের আসরে আজ রাতে সিবাইল ক্যাভানাগ নামে এক ভদ্রমহিলা হাজির আছেন। লেডি ফেবারের পেনড্যান্ট তাঁর কাছে আছে, আছে আর একটা হিরের ব্রোচ। ব্রোচটা আমি দেখেছি।

পেনড্যান্টটাও যদি ভদ্রমহিলার কাছে পাওয়া যায়, তাহলে কেস কমপ্লিট হয়ে গেল।

উল্লাসে বিকট মুখভঙ্গি করে অ্যাবেল বললে, হুই! জানতাম মেয়েরা আছে এর মধ্যে। পাকা চোর এই সিবাইল ক্যাভানাগ, তাই না?

পাকা কি কাঁচা, কদ্দিন ধরে এ লাইনে নেমেছেন, সব জানতে পারব শিগগিরই। এখুনি আবার যাচ্ছি পোর্টম্যান স্কোয়ারে। ছ্যাকড়াগাড়ি নিয়ে এসো পেছন-পেছন। বাড়ির সামনে গিয়ে বসে থাকবে আমার ব্রুহাম গাড়ির মধ্যে। আমি না আসা পর্যন্ত নড়বে না। তার আগে একটাকাজ সেরে নেবে। মার্লবরো স্ট্রিট পুলিশ স্টেশনে যাবে। জিগ্যেস করবে, কালকে এই সময় থেকে ভোর ছ'টার মধ্যে জনা দশ-বারো লোককে দিতে পারবে কিনা বেজওয়াটারে একটা বাড়িতে হানা দেওয়ার জন্যে।

ভদ্রমহিলার পেছন নিয়ে বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করবেন নাকি?

ঠিক তাই করব। লেডি ফেবারের বাড়ি থেকে ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলে ওঁর বাড়িতেই আমি অতিথি হব মিনিট দশেকের জন্যে। মার্লবরো স্ট্রিট অথবা হ্যারো রোড পুলিশ স্টেশন থেকে লোক তুমি পাবেই। ওরাও তো অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে গয়না চুরির নালিশ শুনতে-শুনতে। মাথা হেঁট হয়েছে পাবলিকের কাছে।

খাঁটি কথাই বলেছেন। কালকেই কিং বলছিল, ঝটপট এ ঝামেলার সুরাহা না হলে আত্মহত্যা করবে। পুরো ঠিকানাটা কিন্তু দেননি, স্যার।

পাইনি বলে দিইনি। শুধু জানি ভদ্রমহিলা থাকেন সেন্ট স্টিফেন গির্জের কাছাকাছি কোথাও—কোনও এক যাজকের ওপরতলায় বা নীচের তলায়। ওঁর কোচোয়ানের পেট থেকে ঠিকানা যদি বার করতে পারো, খুব ভালো। কিন্তু আর দেরি নয়। জামাকাপড় পরে পোর্টম্যান স্কোয়ারে হাজির হও যত তাড়াতাড়ি পারো।

রাত তখন প্রায় একটা। অর্চার্ড স্ট্রিটের গির্জের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে ঢং করে ঘণ্টা বাজল গির্জের ঘড়িতে। স্কোয়ারে পৌঁছে দেখি আমার কোচোয়ান দাঁড়িয়ে আছে ব্রুহাম গাড়ি নিয়ে বেকার স্ট্রিটের মোড়ে। বাড়িতে ঢোকবার আগে বলে গেলাম অ্যাবেলের জন্যে অপেক্ষা করতে। ভুল করেও যেন লেডি ফেবারের বাড়ির সামনে গাড়ি নিয়ে না যায়।

গুটি-গুটি এগোলাম নাচঘরের দিকে। দেখতে পেলাম মিসেস ক্যাভানাগকে। বর্শা ছোঁড়ার খেলায় মেতে রয়েছেন। বেশ বুঝলাম, আসরে যতক্ষণ একটি লোকও থাকবে, উনিও থাকবেন।

ঢুকলাম খাওয়ার ঘরে। বসলাম দরজার কাছে, যাতে পাশ দিয়ে যে-ই যাক না কেন, তার বদনখানা দেখতে পাই।

যৎসামান্য আহার করছি পেটের আগুন নেভানোর জন্যে—দশ মিনিটও হয়নি—আচম্বিতে আমাকে অবাক করে দিয়ে হলঘরে এসে ঢুকলেন মিসেস ক্যাভানাগ। একা। শাল জড়ানো সারাগায়ে। হনহন করে বেরিয়ে গেলেন আমার ঠিক পাশ দিয়ে—অথচ খেয়াল করলেন না আমি বসে আছি খাবার নিয়ে।

বসেই রইলাম চুপচাপ। হলঘরের দরজা বন্ধ হল, নিমেষে উঠে দাঁড়ালাম।

বেশিরভাগ অভ্যাগতই ততক্ষণে বিদায় নিয়েছেন। খানকয়েক বাড়ির গাড়ি আর ছ্যাকড়া গাড়ি দাঁড়িয়ে পার্কের পাশে। লেডি ফেবারের মাইনে করা একজন লোক একে-ওকে গাড়ি এনে দিচ্ছে।

দ্রুত ভাবলাম, ভদ্রমহিলার ঠিকানা অ্যাবেল জোগাড় করতে পেরেছে কিনা জানি না। এই লোকটাকে ঠিকানা জিগ্যেস করা যাক।

এই যে ভদ্রমহিলা এখুনি চলে গেলেন, উনি কি বাড়ির গাড়িতে গেলেন, না, ভাড়াটে গাড়িতে?

মিসেস...মিসেস কেভেনারের কথা বলছেন?

কেভেনার? হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই হবে, সঠিক নামটা বলার সময় তখন নেই।

উনি ভাড়াটে গাড়ি নিলেন। ১৯২ নম্বর ওয়েস্টবোর্ন পার্কে যাবেন।

থ্যাংকিউ। ভদ্রমহিলার বাড়ি যেতে হবে এখুনি। একটা জড়োয়া গয়না ফেলে গেছেন হলঘরে। যাই, নিজে গিয়ে ফিরিয়ে দিই।

লোকটা হাঁ হয়ে গেল। জন্মে এমন কথা শোনেনি। লন্ডন শহরে নাচের আসরে জড়োয়া গয়না ফেলে গেলে বাড়ি ধাওয়া করে ফিরিয়ে দিয়ে আসার ঘটনা এই প্রথম বইকি।

দৌড়ে গিয়ে উঠলাম আমার গাড়িতে। সামনের সিটের নীচে গুঁড়ি মেরে বসেছিল অ্যাবেল। করুণ কণ্ঠে জানাল, ভদ্রমহিলার কোচোয়ানকে পায়নি, ঠিকানাও জোগাড় করতে পারেনি।

গাড়ি ততক্ষণে ছুটতে শুরু করে দিয়েছে। বললাম, অত মুষড়ে পড়তে হবে না। পুলিশ স্টেশনে কী শুনে এলে বলো।

ওরা তো থানার লোক ঝেঁটিয়ে এনে বাড়ির সব্বাইকে অ্যারেস্ট করার জন্যে তড়পনি শুরু করে দিয়েছিল। অতি কষ্টে আটকেছি। ঠিক হয়েছে, হ্যারো রোড পুলিশ স্টেশনে এক ডজন লোক মোতায়েন থাকবে আপনার হুকুমের অপেক্ষায় সকাল পর্যন্ত। স্যার, আপনার ওপর ওদের অগাধ আস্থা।

আস্থাটা নিজেদের ওপর রাখলে আরও ভালো হত। যাক গে, অ্যাবেল, কপাল ভালোই আমাদের। ভদ্রমহিলার ঠিকানা, ১৯২ নম্বর ওয়েস্টবোর্ন পার্ক। জায়গাটা চৌকোনা বলেই তো মনে পড়ছে।

চৌকোনা ঠিকই, কিন্তু অনেকটা ডিমের মতো। ডারহ্যামের দিকে পড়বে একশো বিরানব্বই নম্বর বাড়িটা। গাছপালার আড়াল থেকে অনায়াসেই নজর রাখা যাবে।

দশ মিনিট পরেই পৌঁছে গেলাম ওয়েস্টবোর্ন পার্কে। অ্যাবেল ঠিকই বলেছে। নামেই 'স্কোয়ার', আসলে তেকোনা পার্ক। একশো বিরানব্বই নম্বর বাড়িটা বেশ বড়। বাইরের রং জ্বলে গেছে। দোতলা আর তিনতলার ঘরে আলো জ্বলছে। কিন্তু খড়খড়ি নামানো থাকার ফলে দেখতে পাচ্ছি না বসবার ঘরে ঘোরাঘুরি করছে কারা।

দুটো গাছ যেখানে জটলা পাকিয়েছে, অ্যাবেলকে নিয়ে ঘাঁটি গাড়লাম সেখানে। বীটের কনস্টেবল আমাকে চেনে। তাই অবাক হল ওই অবস্থায় বসে থাকতে দেখে।

খুশিও হল বিলক্ষণ। খুশি-খুশি মুখেই বললে—আগেই আঁচ করেছিলাম। সুবিধের নয় বাড়ির হালচাল। সারারাত ধরে ছোকরাদের আনাগোনা। ওই তো...ওই দেখুন...একজন এসে গেছে।

গাছের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। এ যে সেই ছোকরা, নাচের আসরে না গিয়ে গাছপালার ঘরে দাঁড়িয়ে যে সুগন্ধী বরফ গিলছিল—মিসেস ক্যাভানাগ রঙ্গচ্ছলে যাকে চোর ঠাউরেছিলেন। এমন ভান করেছিলেন, কস্মিনকালে দেখেননি ছোকরাকে।

বুঝলাম, সময় হয়েছে নিকট।

বললাম—অ্যাবেল, এবার যাও। থানার লোকদের বলবে সঙ্গে করে একটা ছোট মই যেন নিয়ে আসে। আমার সঙ্কেত না পাওয়া পর্যন্ত বাড়ির ধারেকাছেও যাবে না—তারপর মই লাগিয়ে উঠতে হবে বারান্দায়। টেবিলের ওপর কাচের ল্যাম্পটা দেখতে পাচ্ছ? ওই ল্যাম্প গুঁড়িয়ে গেলেই জানবে সঙ্কেত দিলাম। পিস্তল এনেছ?

ও ভুল কখনও আমার হয় না, স্যার। দুটো পিস্তলই এনেছি—দুটোই দরকার হতে পারে। অবস্থা দেখছেন তো!

হলেও হতে পারে—তবে সেটা নির্ভর করছে তোমার ওপর। যাও, এখুনি যাও। লোকজন নিয়ে এস। সঙ্কেত না পেলে টুঁ শব্দ করবে না। ক্লু কমপ্লিট না হওয়া পর্যন্ত সঙ্কেত দেব না—খেয়াল থাকে যেন।

নি:শব্দে উধাও হয়ে গেল অ্যাবেল গাড়ির দিকে। আমি কিন্তু সোজা গেলাম বাড়ির দিকে। জোরে কড়া নাড়লাম সদর দরজায়। সঙ্গে-সঙ্গে খুলে গেল পাল্লা। এত চট করে খুলবে, ভাবতে পারিনি। উর্দিপরা গাঁট্টাগোট্টা একটা লোক দাঁড়িয়ে সামনে। মোটেই অবাক হয়নি আমাকে দেখে। বরঞ্চ বললে অমায়িক স্বরে, ওপরে সবাই—আপনিও যান।

তা তো যাবই। পথ দেখাও।

দ্বিধায় পড়ল লোকটা।

বলল, ভুল করেছি মনে হচ্ছে। একটু দাঁড়ান, মিসেস ক্যাভানাগকে জিগ্যেস করে আসি।

আমার জবাবের জন্যে না দাঁড়িয়েই লোকটা তিনতলা উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে; আমিও আঠার মতো লেগে রইলাম পেছনে। চাতালে উঠেই দেখতে পেলাম সামনের বসবার ঘরের ভেতর পর্যন্ত। মিসেস ক্যাভানাগ তো রয়েছেনই, রয়েছে একজন খর্বকায় বুড়োটে লোক—গালে লম্বা কালো জুলপি। সুগন্ধী বরফ প্রিয় সেই ছোকরাকেও দেখলাম। বসবার ঘরের লাগোয়া ঘরটায়, কিন্তু আলো জ্বলছে না—এ ঘরের আলোয় ফোল্ডিং দরজার ওপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে সে ঘর ফাঁকা।

এত কিছু দেখলাম চকিতের মধ্যে। গাঁটাগোট্টা লোকটা মিসেস ক্যাভানাগের কানে-কানে ফিসফিস করতেই ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মতো ছিটকে সোজা হয়ে গেলেন ভদ্রমহিলা, ছোকরাটাকে ঠেলে বার করে দিলেন বারান্দায়, ঝড়ের বেগে চলে এলেন চাতালে—দাঁড়ালেন আমার মুখোমুখি।

তার আগে অবশ্য বসবার ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিতে ভুললেন না।

আরে! মিস্টার সাটন যে! কী সৌভাগ্য! কিন্তু আমি যে এখুনি শুতে যাচ্ছি।—কী নিপুণ অভিনয়ই জানে এই মেয়েরা। চোখেমুখে আনন্দ যেন উপচে পড়ল। সুপার ফাইন আকটিং!

যতদূর সম্ভব মোলায়েম হাসলাম। হেসে-হেসে বললাম, আমি তো ভেবেছিলাম, এতক্ষণে ঘুমিয়ে কাদা হয়ে গেছেন। কিন্তু না এসে যে পারলাম না। লেডি ফেবারের নাচঘরে একটা হিরের ব্রোচ কুড়িয়ে পেয়েছি। আপনি চলে আসার পরেই। দারোয়ানও বললে, নিশ্চয় আপনারই হবে। তাই ছুটতে-ছুটতে চলে এলাম—কাল সকালেই আবার বাইরে যেতে হচ্ছে তো।

কথা বলতে-বলতে হিরের ব্রোচ বার করে দিলাম ভদ্রমহিলার হাতে। এই সেই অলঙ্কার যা আমি একটু আগেই নিয়ে এসেছি বন্ড স্ট্রিটের আমার রত্ন বাক্স থেকে। ব্রোচটা হাতে নিয়েই চকিতের জন্যে আমার পানে ঝকমকে চাহনি নিক্ষেপ করলেন মিসেস ক্যাভানাগ। ঈষৎ কঠিন হল দুটো ঠোঁট। পরমুহূর্তেই হেসে ফেলে ব্রোচ ফিরিয়ে দিলেন আমার হাতে।

কষ্ট করে এসেছেন—কৃতজ্ঞ রইলাম। কিন্তু এ জিনিস আমার নয়। আমার ব্রোচ এইমাত্র খুলে রাখলাম জড়োয়া বাক্সে।

হতাশ হওয়ার ভঙ্গিমায় বললাম, আপনার নয়? শুধু-শুধু কষ্ট দিলাম এত রাতে।

কষ্ট তো আমিই দিলাম আপনাকে। আসুন না, এককাপ কফি খেয়ে যান।

না, থাক। আর ঝামেলা বাড়াতে চাই না। গুডনাইট।

করমর্দন করে যেন নিশ্চিন্ত হলেন মিসেস ক্যাভানাগ। সিঁড়ির ধাপে পা দিলাম আমি, উনিও ঘুরে গিয়ে ঢুকলেন বসবার ঘরে—নিশ্চয় বারান্দায় লুকিয়ে থাকা ছোকরাকে ডাকতে।

গাঁট্টাগোট্টা লোকটা হলঘরে দাঁড়িয়েছিল দরজা খুলে আমাকে বিদেয় করার জন্যে। আমি কিন্তু নিচে নামছিলাম শামুকের মতো আস্তে-আস্তে। বেজায় দমে গিয়েই। পা যেন আর চলছে না। পুরো প্ল্যানটাই ভণ্ডুল হয়ে গেল। সেই মুহূর্তে নতুন কোনও মতলব মাথায় আসছে না।

এ বাড়িতে এসেছিলাম আচমকা ভদ্রমহিলার সামনে গিয়ে তাঁকে চমকে দেব বলে, দলবলের হদিশ জেনে নেব, সুযোগ পেলে গ্রেপ্তারও করব। কিন্তু মূল যোগসূত্রটাই এখনও আঁধারে বিলীন—অচিরে সন্ধান পাব বলেও মনে হয় না।

চিন্তা করতে হল তাই দশ সেকেন্ডের মধ্যে—এখুনি, না কালকে?

এক হয়, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাই চুপচাপ। নিশ্চিন্ত মনে এরা আবার হানা দিক আর এক নাচের আসরে। তখন দলশুদ্ধ পাকড়াও করা যাবে'খন।

নাকি, এখুনি যা করবার শেষ করে যাব?

শেষের পন্থাটা মনে ধরল আমার।

কেন না, কালকে এরা কে কোথায় থাকবে, তার কি ঠিক আছে? কেউ হয়তো সটকান দেবে প্যারিসে, কেউ বেলজিয়ামে। চুনি-পেনড্যান্টের মতো এরকম মোক্ষম সূত্র হাতে আর নাও আসতে পারে। যে দলটাকে দীর্ঘদিন গরু খোঁজার মতো খুঁজছি, তাদের জনা তিন-চারকে একই বাড়িতে একসঙ্গে পাওয়ার সুযোগ আর নাও পেতে পারি। শেষের এই কথাটা ভাবতেই গোটা প্ল্যানটা নিমেষমধ্যে ঝলসে উঠল মাথার মধ্যে। নি:শব্দে, ঝড়ের বেগে, কাজ করে গেলাম প্ল্যানমাফিক। আজও অবাক হই, সেই মুহূর্তে চিন্তায় ভাবনায় কাজেকর্মে অত বিদ্যুৎগতি ক্ষিপ্রতা পেয়েছিলাম কীভাবে?

গাঁট্টাগোট্টা লোকটা তখন হলঘরের দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে—আমিও পৌঁছেছি চৌকাঠের সামনে। লোকটার পানে এক ঝলক সন্ধানী চাহনি বুলিয়ে নিয়েই বুঝলাম, প্ল্যান সফল হবেই একে দিয়ে কাজ শুরু করলে। লোকটা গায়ে গতরে ভারী হলেও বিনীত—সততাও আছে বলে মনে হল। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আচমকা হাত থেকে দরজার হাতল ছিনিয়ে নিয়ে দড়াম করে বন্ধ করে দিলাম কপাট—দুজনেই রইলাম কিন্তু হলঘরের মধ্যেই।

পরক্ষণেই পিস্তল ঠেকালাম হোঁৎকার মাথায় (জানি না এই অপকর্মটির জন্যে জজসাহেব আমাকে মাসখানেক শ্রীঘর দর্শন করিয়ে ছাড়বেন কিনা), কানে-কানে বললাম ফিস-ফিস করে,—পুলিশ ঘিরে ফেলেছে বাড়ি। একদম চুপ। দোতলার ভদ্রমহিলা গ্রেপ্তার হবেন এখুনি। যা বলব, তা না করলে তোমাকে ওঁর সাগরেদ বলে চালান দেব জেলে। আমি বেরিয়ে গেছি কিনা জানতে চাইলে চেঁচিয়ে বলে দেবে, হ্যাঁ। ওপরে ডাকলে ওপরেই যাবে। ঠিক যা বললাম, তাই বলবে। তারপর ফিরে আসবে আমার কাছে। নইলে জেলখানা আছে কপালে।

শুনেই কাগজের মতো সাদা হয়ে গেল বেচারা। কাঁপতে লাগল ঠকঠক করে।

বললে অবরুদ্ধ স্বরে—যা বললেন, তাই হবে হুজুর। এই নাক কান মলছি, আর এদের গোলামি করব না।

ঠিক আছে। ওদিকের ঘরটা বেশ অন্ধকার—ওখানেই লুকোচ্ছি। তুমি বরং ওপরেই যাও—গিয়ে বলে এসো, আমি বিদেয় হয়েছি।

পাশের ঘরটা সকালে প্রাতরাশ খাওয়ার ঘর। ডাইনিং টেবিলের তলায় ঢুকে পড়ে দেখলাম, সিঁড়ির গোড়া পর্যন্ত দিব্বি দেখা যায়। হোঁৎকা লোকটা যেই প্রথম ধাপে পা দিয়েছে ওপরে যাবে বলে, মিসেস ক্যাভানাগ নিজেই নেমে এলেন—বিদেয় হয়েছেন ভদ্রলোক?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আর আমাকে না জিগ্যেস করে কক্ষনো আর অচেনা কাউকে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দেবে না। কাজ শেষ হলে সটান শুয়ে পড়। মাথায় ঢুকেছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

গজগজ করতে-করতে ওপরে চলে গেলেন মিসেস ক্যাভানাগ। হোঁৎকা লোকটা অমনি ছুটে এল আমার কাছে।

স্যার, বলুন এখন কী করব। আপনি যা বলবেন, তাই হবে। বিশ বছরের ক্যারেকটার সার্টিফিকেট দিয়েছেন লর্ড ওয়ালি। আপনি স্যার একটু বলে দেবেন। আগে জানলে কে আসে এখানে—

ঠিক আছে, ঠিক আছে, যা বলবার আমি বলে দেব। আর কেউ আসবে?

সেই ক্যাপ্টেন আর একজন পুরুতমশায়। দুজনেই নিশ্চয় একই কারবার করে, তাই না, স্যার?

তোমাকে তা ভাবতে হবে না। এলেই ঢুকিয়ে নাও। তারপর ওপরে গিয়ে আলোটা নিভিয়ে দেবে এমন ভাবে যেন হাত লেগে হঠাৎ নিভে গেল। তারপর যাবে শোওয়ার ঘরে।

পুলিশগুলো কোথায়, হুজুর?

সব জায়গায়। ছাদে, রাস্তায়, বারান্দায়। বাধা পেলেই তছনছ করে ছাড়বে গোটা বাড়ি।

ঠিক এই সময়ে কড়া নড়ে উঠল দরজায়। পরপর দুজন লোক ঢুকল ভেতরে। একজনের পরনে যাজকের পোশাক। আর একজনের গায়ে নিউমার্কেট কোট—ভীষণ শক্তিশালী বপু।

দ্রুত চরণে দুজনেই উঠে গেল ওপরে—পেছন-পেছন হোঁৎকা বাটলার। সেকেন্ড কয়েক পরেই নিভে গেল সিঁড়ির গ্যাসবাতি। বসবার ঘরে কথাবার্তার ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি ছাড়া বাড়ি নিস্তব্ধ।

রাতের খেল দেখানোর সময় এবার হয়েছে। বুটজোড়া খুলে ফেললাম পা থেকে। পিস্তলের ঘোড়া অর্ধেক তুলে রাখলাম। বেড়ালের মতো পা-টিপে-টিপে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গিয়ে বসবার ঘরের পেছন দিকের ঘরে ঢুকলাম।

এ ঘরের ফোল্ডিং দরজার একটা পাল্লা খোলা। একটু জোরে পা ফেললে বা হোঁচট খেলেই খাঁচাছাড়া হবে প্রাণটা। পুলিশ কোথায় এখন কে জানে। রাস্তায় আছে কি থানায় বসে আছে, তা তো জানি না।

তবে আমার কপাল ভালো। ঘরের লোক ক'জন বেশ জোর গলায় কথা বলে চলেছে। মনে হল যেন ঝগড়া লেগেছে।

খোলা পাল্লার ফাঁক দিয়ে প্রথমেই দেখে নিলাম, মিসেস ক্যাভানাগ ঘরে নেই। চার সাগরেদ রয়েছে ঘরের মধ্যে। ল্যাম্পের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে তিনজন। কালো জুলপিওলা বেঁটে বুড়ো লোকটা বসে রয়েছে হাতলওলা চেয়ারে।

সবচেয়ে খুশি হলাম টেবিলের ওপর একটা বস্তু দেখে।

বনাত পাতা রয়েছে টেবিলে। ব্রোচ, লকেট, হিরের হার ছড়ানো রয়েছে বনাতে। আলোয় ঝলমল করছে রত্নরাশি।

সবচাইতে ঝলমল করছে লেডি ফেবারের চুনির পেনড্যান্ট!

যাক, সূত্র তাহলে পাওয়া গেল, কিন্তু কাজে লাগাই কী করে মোক্ষম এই ক্লু-কে?

চারজনের কেউই নিশ্চয় নিরস্ত্র নয়। ঘরে ঢুকলেই গুলি চালাবে। পুলিশ এসে পড়ার আগেই আমি তো অক্কা পাবই—এরাও সটকান দেবে।

মিনিট পাঁচ দশ দাঁড়িয়ে যাব? উঁকি মেরে রাস্তায় দেখব, অ্যাবেল পুলিশ নিয়ে এল কিনা?

আচমকা আলো দেখলাম সিঁড়ির ডগায়। পরমুহূর্তেই দরজায় হাজির হলেন মিসেস ক্যাভানাগ স্বয়ং। সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন আমার দিকে সেকেন্ড কয়েক।

তারপরেই গলার শির তুলে সে কী চিৎকার! আমিও তাই চাইছিলাম। প্রভঞ্জনের বেগে পিস্তল উঁচিয়ে ঢুকে গেলাম বসবার ঘরে এবং চক্ষের নিমেষে এক গুলিতে উড়িয়ে দিলাম কাঁচের ল্যাম্প।

লক্ষ্যভেদী পিস্তলবাজ হিসেবে আমার সুনাম আছে বিলক্ষণ। চরম মুহূর্তে সে সুনাম রাখতে পেরেছিলাম বলেই কাচের ফানুস খানখান হয়ে ছিটকে গেল ঘরময়। চিলের মতো চেঁচাতে চেঁচাতে ওপর তলায় শোওয়ার ঘরের দিকে দৌড়োলেন মিসেস ক্যাভানাগ। লোক চারটে কিন্তু বিকট গর্জন ছেড়ে বাঘের মতো লাফ দিয়ে তেড়ে এল আমাকে যেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল—ঠিক সেই দিকে।

চার মূর্তিমানকে ওইভাবে শার্দুলবিক্রমে ধেয়ে আসতে দেখেই মনে পড়ল অ্যাবেলের কথা। আহারে! ঠিক এই সময়ে হতভাগাকে যদি পেতাম পাশে...

আচম্বিতে ঝনঝন করে বারান্দার দিকের জানলার কাচ ভেঙে ঠিকরে বেরিয়ে এল ভেতর দিকে। নিমেষ মধ্যে পুলিশ গিজগিজ করতে লাগল ঘরময়। অ্যাবেল চলে এল আমার পাশে সবার আগে।

আদালত থেকে কী শাস্তি দেওয়া হয়েছিল বিরাট এই দলটাকে, আজ আর তা হুবহু মনে নেই। পুলিশের ইতিহাসে কুখ্যাত এই তস্কর বাহিনীর যে নাম লেখা আছে, সেটা অবশ্য মনে আছে—ওয়েস্টবোর্ন পার্ক গ্যাং।

জড়োয়া চুরিতে সিদ্ধহস্ত দলের প্রত্যেকেই। পালের গোদা ছিল মিসেস ক্যাভানাগের স্বামী—সেই বেঁটে বুড়ো কালো জুলপিওলা লোকটা। হুইটি তার নাম। জেমস থর্নডাইক কোম্পানির ম্যানেজার ছিল এককালে। টটেনহ্যাম কোর্টে এদের অফিস। দুনিয়ায় যা কিছু বস্তু সরবরাহ করা ছিল বিশেষ এই কোম্পানির কাজ। মাল সাপ্লাই করতে গিয়ে হুইটি দেখলে কারবারটা তো মন্দ নয়; লন্ডনের নাচের আসরগুলোয় নিমন্ত্রিতদের ছদ্মবেশে চোর সাপ্লাই করলে কেমন হয়?

চাকরি ছেড়ে দিয়ে লোভনীয় এই ব্যবসা ফেঁদে বসল হুইটি। তেইশজন পুরুষ আর আটজন মহিলাকে দিয়ে নানারকম চোরাই মাল এনে ফেলতে লাগল নিজের ডেরায়। সবই জড়োয়া গয়না। দাম যা হত তার এক তৃতীয়াংশ পেত চোর বা চোরনী। সিংহ বখরা ঝেড়ে দিত নিজে।

হুইটি এখন পোর্টল্যান্ড জেলের হাওয়া খাচ্ছে বলেই শুনেছি। তরুণ-তরুণী সাগরেদগুলো পাথর ভেঙে মরছে। বউটা শুনেছি আমার নাম শুনলেই দাঁত কিড়মিড় করে।

(ম্যাক্স পেমবারটন-এর গল্প অবলম্বনে)

'কিশোর মন' পত্রিকায় প্রকাশিত। ১৬.৪.৮৬ তারিখের সংখ্যা।

এডগার ওয়ালেস-এর গল্প নিয়ে গোয়েন্দা ধাঁধা

পুলিশের ঘাড়ে কবিতা ভূত

ব্যাঙ্কটা লুঠ হওয়ার মতো নয়, তবুও লুঠ হয়ে গেল।

ছোট শাখা হলেও ব্যাঙ্কের লেনদেন বড় কম নয়। তিন-তিনটে পেল্লায় কোম্পানির টাকা-পয়সা থাকে সেখানে। মাইনে দেওয়ার আগের দিন যথারীতি একলক্ষ পাউন্ড এনে রাখা হয়েছিল স্ট্রং রুমে। রাত ফরসা হওয়ার আগেই টাকার কাঁড়িও ফরসা হয়ে গেল সুরক্ষিত পাতালকুঠরী থেকে।

আশ্চর্য! সত্যিই আশ্চর্য! স্ট্রং রুমটা ইস্পাত আর কংক্রিট দিয়ে তৈরি। কুঠরীর ছাদে ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের প্রাইভেট অফিস। সে-ঘরে ঢুকতে হলে বাইরের অফিস দিয়ে আসতে হয়। দরজা একটাই। ইস্পাতের দরজা। এই দরজা পেরোলে তবে ম্যানেজারের অফিস।

সুতরাং দরজাটা দারুণ গুরুত্বপূর্ণ। তাই দরজার মাথায় সারারাত জ্বলে একটা বিদ্যুৎ বাতি। সেই আলোয় রাস্তা থেকেই দেখা যায় দরজাটা বন্ধ রয়েছে। একজন পুলিশ কনস্টেবল ঠিক চল্লিশ মিনিট অন্তর সামনের রাস্তা দিয়ে যায়।

শুধু পুলিশ আর ইস্পাতের দরজাতেও নিশ্চিন্ত হয়নি ব্যাঙ্কের মালিক। তাই একজন রাতের পাহারাদার মোতায়েন করা হয়েছে প্রাইভেট রুমে। জানলা দিয়ে সে মুখ বাড়িয়ে বলে দেয় রাতের পুলিশকে—সব ঠিক হ্যায়!

সে রাতেও যথারীতি চল্লিশ মিনিট অন্তর ঘুরপাক দিচ্ছে পুলিশ কনস্টেবল বার্নেট। হঠাৎ দেখলে আলোটা নেভানো। পিলে চমকে উঠল বার্নেটের। রাতের পাহারাদারের জন্যে দাঁড়িয়ে না থেকে দৌড়ে এল দরজার সামনে। বুক ধড়াশ করে উঠল পাল্লা দু-হাট দেখে। জড়ের মতো ভেতরে ঢুকলে দেখলে একটা অদ্ভুত দৃশ্য।

রাতের পাহারাদার শুয়ে আছে মেঝেতে। হাতে আর পায়ে হাতকড়া। নাকের ওপর তুলোর প্যাড। ইঞ্চি কয়েক ওপরে ঝুলছে একটা ফুটো টিন। টপটপ করে ক্লোরোফর্ম ঝরছে তুলোর প্যাডে। মিষ্টি গন্ধে ঘর ভরপুর।

রাতের পাহারাদারের নাম আর্থার মলিং।

তৎক্ষণাৎ ফোন করা হল পুলিশ ফাঁড়িতে। ওই রাস্তাতেই থাকতেন মিস্টার গ্রীন—ব্যাঙ্ক ম্যানেজার। পুলিশ আগে দৌড়ল তাঁর কাছে। গিয়ে কী দেখল?

বাক্স-বিছানা বেঁধে চম্পট দেওয়ার আয়োজন করছেন মিস্টার গ্রীন। ভীষণ উত্তেজিত। এত রাত্রে যাওয়া হচ্ছে কোথায়, এই প্রশ্নের উত্তরে বললে আমতা আমতা করে, কাজ আছে। মালিককে একটা চিঠি লিখে যাচ্ছেন অবশ্য। চিঠি আর চাবি অফিসঘরের ড্রয়ারে রেখে এসেছেন।

কিন্তু ড্রয়ারে চাবি বা চিঠি কোনওটাই পাওয়া গেল না। স্ট্রং রুমেও পাওয়া গেল না এক লক্ষ পাউন্ড।

সোজা কেস! দিনের আলোর মতো স্পষ্ট! খাঁচায় পোরা হল মিস্টার গ্রীনকে। টাকা? ধোলাই দিলেই বেরিয়ে পড়বে'খন।

পুলিশ কতকগুলো আঁচড়ের রহস্য কিন্তু ধরতে পারল না। আর্থার মলিংয়ের হাতের তেলোয় পাওয়া গিয়েছিল রক্ত রেখাগুলো।

ব্যাঙ্ক লুঠের দিনই সক্কালবেলা চার্জ বুঝে নিতে এলেন মিস্টার রীডার। ইন্সপেক্টর হলফর্ড কাগজপত্র বুঝিয়ে দিয়ে বললে—ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ডের সেই ভীষণ চুরি আপনিই ধরে দিয়েছিলেন। কিন্তু দোহাই আপনার,

আজকের চুরি নিয়ে খামোকা মাথা ঘামাতে যাবেন না। মিস্টার গ্রীন জেলখাটা আসামি। ব্যাঙ্কেরই কেস। নাম ভাঁড়িয়ে ম্যানেজারি করেছে অ্যাদ্দিন।

জানি, বিষণ্ণ চোখে বললেন মিস্টার রীডার, আমিই ধরে দিয়েছিলাম গ্রীনকে। টাকা ধার দিয়ে ফেঁসে গিয়েছিল। স্বীকার করলেই ল্যাটা চুকে যেত বেচারা।

ভুরু কুঁচকে বললেন ইন্সপেক্টর হলফর্ড—গ্রীনের সঙ্গে মোলাকাত করার ইচ্ছে আছে নাকি?

আছে।

ফলে, হাজতে হাজির হলেন মিস্টার রীডার। দেখেই চিনতে পারলেন মিস্টার গ্রীন। হাউ হাউ করে বললেন অনেক কথা। একটা উড়ো চিঠি পেয়েই দেশ থেকে পালাচ্ছিলেন তিনি। চিঠিতে লেখা ছিল, গ্রীন যে জেলখাটা আসামি, পত্রলেখক তা জানে। পাছে মুখে চুনকালি পড়ে তাই নতুন জায়গায় গিয়ে নতুনভাবে জীবন শুরু করবেন ভেবেছিলেন গ্রীন। এই বয়েসে বিয়ের ইচ্ছেও হয়েছিল। মেয়েটার বয়স যদিও তাঁর চাইতে তিরিশ বছর কম কিন্তু পোড় খাওয়া মেয়ে তো, এক বদমাসকে বিয়ে করে অনেক জ্বলেছে। সে বিয়ে ভেঙে গেছে। নাম তার মিস ম্যাগডা গ্রেন। থাকে এই পাড়াতেই। পাড়ার কিছু ছেলেছোকরা এর মধ্যেই ঘুরঘুর করতে শুরু করেছে বাড়ির আশেপাশে। উদ্দেশ্য, প্রেম করা। এদের মধ্যে পুলিশ কনস্টেবল বার্নেটও আছে। সে আবার কবিতা লিখে-লিখে ছুড়ে দেয় তার ভাবী বউকে। যাক, এখন আর সে ভাবী নয়। এ মুখও তিনি দেখাতে চান না ম্যাগডাকে।

মাথার মধ্যে চিন্তার বোঝা নিয়ে বাড়ি ফিরলেন মিস্টার রীডার। সারারাত ঘুমোতে পারলেন না। হাজতে যাওয়ার আগেই কনস্টেবল বার্নেটের রিপোর্টটা তিনি পড়েছিলেন। তাতে লেখা আছে, ব্যাঙ্কের কাছাকাছি আসতেই একটা লোককে মোড় ঘুরতে দেখেছিল সে। ভালো করে দেখবার আগেই হোঁচট খেল একটা লোহার নালে। নীচু হয়ে নালটা দেখে ফের সিঁধে হয়ে লোকটাকে সে আর দেখতে পায়নি।

সকাল আটটা নাগাদ—পাড়া ঘুরতে বেরোলেন মিস্টার রীডার। দেখলেন ম্যাগডার বাড়ির সামনে একটা ছোট্টা বাগান। বাগানের কাছে একটা গোলাপগাছ। ধুঁকছে বললেই চলে। বাদামি হয়ে গেছে পাতা।

শহরের মস্ত বাগানের ধারে গিয়ে ফুলগাছগুলোর দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন মিস্টার রীডার। ফিরে এলেন ম্যাগডার বাড়িতে। ম্যাগডার সঙ্গে কথা বলতে-বলতে দেখলেন একটা ফুলদানিতে একগুচ্ছ গোলাপ। বাজে অছিলায় পাশের ঘরে পাঠালেন ম্যাগডাকে। গোলাপগুচ্ছ টেনে নিয়ে দেখলেন। বোঁটাগুলো কাঁচি দিয়ে কাটা নয়—টেনে ছেঁড়া। নোট বইয়ের একটা পাতা দিয়ে আগে মোড়া হয়েছে বোঁটাগুলো—তার ওপর জড়ানো সুতো। ভিজে পাতার ওদিকে লাল কালি দিয়ে কী যেন লেখা।

নেমে এলেন মিস্টার রীডার। বাগানে পেলেন একটা লোহার নাল। জানলা থেকে ম্যাগডা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল বাগানে।

গেলেন কনস্টেবল বার্নেলের কাছে। কথায় কথায় জানলেন, লোহার নালে হোঁচট খাওয়ার পরেই রাত দুপুরে কবিতা লেখার ইচ্ছে হয়েছিল বার্নেটের। শহরের বাগানে গিয়ে অনেকগুলো গোলাপ ছিঁড়ে ছিল। নোটবইয়ের পাতায় কবিতা লিখেছিল। সেই কবিতা দিয়েই গোলাপগুলো মুড়ে লোহার নাল দিয়ে ভারী করে ছুড়ে দিয়েছিল ম্যাগডার জানলা দিয়ে।

সেইদিনই বিকেলবেলা জানলা থেকে ম্যাগডা দেখলে বিষণ্ণ মুখ সেই লোকটা ফের আসছে। পেছনে একজন পুলিশ ডিটেকটিভ।

নিমেষ মধ্যে বিছানার গদি তুলে ফেলল ম্যাগডা। প্যাডের মতো সাজানো ব্যাঙ্ক নোটের বাণ্ডিলগুলো তুলে নিয়ে ঠাসল একটা ব্যাগে। পেছনের জানলা খুলে রান্নাঘরের ছাদে ব্যাগটা ফেলে দিয়ে নিজেও লাফ দিয়ে নামল ছাদে। সেখান থেকে বাগানে। বাগান থেকে রাস্তায়। চলন্ত ট্যাক্সি থামিয়ে উঠে বসল টাকার থলি সমেত। মিশে গেল জনারণ্যে।

ঠকে গেলেন। মেয়েটা মোটেই চুরনী নয়, হত্যাকারীও নয়।

চোর রাতের পাহারাদার নিজেই। হত্যাকারীও সে নিজে! মানে, নিজেই খুন করে ফেলেছে টাকার আণ্ডিল চুরি করার পরেই! কিন্তু খুন সে হত না। যদি রাতের পুলিশের ঘাড়ে কবিতার ভূত না চাপত।

প্ল্যানটা অনেক দিনের। আর্থার মলিং নিজেও দাগী আসামি। ম্যাগডা তারই মেয়ে।

ষড়যন্ত্র মতো ম্যাগডা তালাক-দেওয়া ম্যাগডা গ্রেন সেজে বাড়ি নিয়েছিল ব্যাঙ্ক পাড়ায়। তারপর ছেনালি করে পটিয়ে ফেলেছিল গ্রীনকে। মেয়ের মুখেই স্ট্রংরুমের খবরাখবর সংগ্রহ করত আর্থার মলিং।

তারপরেই মনিকাঞ্চন যোগ ঘটল। উড়ো চিঠি এল গ্রীনের নামে। চম্পট দেওয়ার আয়োজন করলেন গ্রীন। সেইদিনই এক লাখ পাউন্ড এসেছে স্ট্রং রুমে।

আর্থার মলিংয়ের কাছে নকল চাবিও ছিল। কিন্তু ড্রয়ারের চাবি দিয়েই স্ট্রং রুম খুলল। টাকার আণ্ডিল এনে পুঁতে রাখল গোলাপ গাছের তলায়। ফিরে এল অফিসে। যেই দেখলে বার্নেট আসছে, ঝাঁ করে গিয়ে হাত-পায়ে হাতকড়া লাগিয়ে শুয়ে পড়ল ফুটো টিনভরতি ক্লোরোফর্মের তলায়।

জ্ঞান হারাল সঙ্গে-সঙ্গে। হিসেব মতো তখনি বার্নেটের এসে পড়ার কথা। প্রাণটা তাহলে বেঁচে যেত। কিন্তু তার মাথায় তখন কবিতা ভূত চেপেছে। ফুল ছিঁড়ে, কবিতা পাঠিয়ে ফিরে এল দশ মিনিট পরে। ততক্ষণে যা হওয়ার তা হয়ে গেছে।

কিন্তু ষড়যন্ত্রটা মিস্টার রীডার আঁচ করলেন কী করে?

ম্যাগডার বাড়ির বাগানে নেতিয়ে পড়া গোলাপ গাছ দেখে। নিজের মনটাও ক্রিমিন্যালের মন তো। তাই তক্ষুনি মনে হয়েছে, মাঝরাতে এক কাঁড়ি টাকা গোলাপগাছের তলায় তাড়াতাড়ি পুঁততে গেলে হাতে কাঁটার আঁচড় তো লাগবেই।

পুলিশ যে রহস্যের সমাধান করতে না পেরে ধামাচাপা দিয়ে রেখেছিল, সে রহস্যের সমাধানও হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ!

মৃত আর্থার মলিংয়ের হাতের তেলোর রক্তরেখাগুলো আর কিছুই নয়—গোলাপ কাঁটার রক্ত-সূত্র!

** সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত।*

আগাথা ক্রিস্টি-র গল্প নিয়ে গোয়েন্দা ধাঁধা

গ্র্যান্ড মেট্রোপলিটনের মোতির মালা। হারকুল পয়রট

হেস্টিংস বললে, 'পয়রট, চলো ব্রাইটনে গিয়ে মাথা ঠান্ডা করে আসি।'

সঙ্গে-সঙ্গে রাজি হল হারকুল পয়রট। এলাম ব্রাইটন। কিন্তু মস্তিষ্কের ব্যায়াম থেকে রেহাই পেলাম না। ঘটনাটা ঘটল সেই রাতেই।

পয়রট তো বলেই ফেলল, 'হেস্টিংস, ইচ্ছে যাচ্ছে কিছু হিরে-জহরত ছিনতাই করে নিই এই তালে। থামের পাশে ওই মোটা মেয়েটাকে দেখেছ? গয়নার সচল দোকান তাই না?'

'ওঁর নাম মিসেস ওপালসেন,' বলল হেস্টিংস।

'চেনো?'

'সামান্য। স্বামী শেয়ার মার্কেটের দালাল। তেলের হিড়িকে আঙুল ফুলে কলাগাছ।'

খাওয়াদাওয়ার পর লাউঞ্জে দেখা হয়ে গেল ওপালসেন দম্পতির সঙ্গে। একগাল হেসে মিসেস তাঁর বক্ষশোভা দেখালেন পয়রটকে। মানে, মূল্যবান কণ্ঠহারটি। তাতেও আশ মিটল না। হারকুল পয়রটকে তাঁর মোতির মালা না দেখালেই নয়। ছুটলেন শোওয়ার ঘরে মহামূল্যবান নেই নেকলেস আনতে।

স্বামীদেবতা গম্ভীর চালে বললেন, 'মালার মতো মালা মশাই। দেখে চোখ ঠিকরে যাবে। দামটা অবশ্য চড়া—'

কথা আটকে গেল এক ছোকরা খানসামার আবির্ভাবে। মেমসাহেব তলব করেছেন কর্তাকে।

দৌড়লেন ধনকুবের ওপালসেন। দশ মিনিট আর পাত্তা নেই।

ভুরু কুঁচকে বলল হেস্টিংস, 'আরে গেল যা! এঁরা কি আর আসবেন না?'

পয়রট বললেন—'না। একটা গোলমাল হয়েছে।'

'তুমি জানলে কী করে?'

'এইমাত্র হন্তদন্ত হয়ে অফিসঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন হোটেল ম্যানেজার। লিফটম্যান গুজগুজ করছে ওয়েটারদের সঙ্গে—তিনবার ঘণ্টা বাজল লিফটের—কিন্তু খেয়াল নেই লিফটম্যানের। ওয়েটারদেরও মন নেই খদ্দেরদের দিকে। ওয়েটাররা যখন খদ্দেরদের কথাও ভুলে যায়, তখন জানবে—দেখো, পুলিশ এসে গেল।' সত্যি সত্যিই দুজন পুলিশ ঢুকল হোটেলে। তারপরেই দৌড়ে এল একজন হোটেল কর্মচারী।

'স্যার, আপনারা দয়া করে মিস্টার ওপালসেনের ঘরে পায়ের ধুলো দেবেন?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়।' পয়রট যেন এক পায়ে খাড়া ছিল এতক্ষণ।

মিসেস ওপালসেনের ঘরে ঢুকে দেখলাম দেখবার মতো এক দৃশ্য। গয়নামোড়া গৃহিণী ইজিচেয়ারে চিৎপটাং হয়ে শুয়ে কাঁদছেন হাপুসনয়নে। জলের ধারায় ধুয়ে যাচ্ছে মুখের পাউডার। পেছনে হাত দিয়ে রাঙামুখে পায়চারি করছেন কর্তা। পুলিশ-অফিসার নোটবই খুলে জেরা করছেন আর লিখছেন। একজন পরিচারিকা বলির পাঁঠার মতো কাঁপছে সামনে। আর একজন রাগে ফুলছে পাশে দাঁড়িয়ে।

ব্যাপার অতি গুরুতর। মহামূল্যবান মোতির মালা চুরি হয়ে গেছে। খেতে যাওয়ার আগেও গিন্নি দেখেছিলেন মালাটা। গয়নার বাক্সে চাবি দিয়ে রেখে গেছিলেন টেবিলের ড্রয়ারে। গয়নার বাক্সের চাবিটা অবশ্য মামুলি। যে কেউ খুলতে পারে। ড্রয়ারেও চাবি থাকে না। কেননা, বলির পাঁঠার মত কাঁপছে, ওই যে

মেয়েটা, ও সবসময় থাকে ঘরে। ওর নাম সিলেসটিন। ফরাসি মেয়ে। গিন্নির সেবাদাসী। কর্তার হুকুমমতো সে ঘর থেকে বেরোয় না। এমনকি হোটেলের ঝি (রাগে ফুলছে যে মেয়েটা) যখন ঘরে ঢোকে, তখনও সিলেসটিন থাকে ঘরে। তা সত্বেও এইটুকু সময়ের মধ্যে কে যে নিল মোতির মালা বোঝা যাচ্ছে না।

সিলেসটিন দৌড়ে এল পয়রটের সামনে। সে কী কান্না। পয়রট জাতে ফরাসি (পয়রট বলে, মোটেই না আমি বেলজিয়ান), সুতরাং সিলেসটিনকে বাঁচাতেই হবে। গোলমুখো ওই ঝি মাগিই হাতসাফাই করেছে মালাটা।

হোটেলের ঝি তেড়ে উঠল। সার্চ করা হোক এখুনি। কিন্তু সার্চ করেও মোতির মালা পাওয়া গেল না কারও কাছে।

সিলেসটিন বললে, 'দু-বার আমি পাশের ঘরে গেছিলাম। ওইটাই আমার ঘর। একবার তুলো আনতে। আর কেবার কাঁচি আনতে।'

পয়রট ঘড়ি বের করে বললে, 'যাও তো একবার। দেখি কতক্ষণ লাগে।'

দু-বার গেল সিলেসটিন। প্রথমবার লাগল বারো সেকেন্ড। দ্বিতীয়বার পনেরো সেকেন্ড।

পয়রট নিজে এবার ঘড়ি ধরে ড্রয়ার খুলল, গয়নার বাক্স বার করল। চাবি খুলল ডালা খুলে ফের বন্ধ করল, চাবি বন্ধ করল, ড্রয়ার খুলে রেখে দিল। সবশুদ্ধ লাগল ছেচল্লিশ সেকেন্ড। তার মানে, হোটেলের ঝি মোতির মালা নেয়নি। সিলেসটিনই চুরনী। সত্যি সত্যিই সিলেসটিনের বিছানার তলা থেকে পাওয়া গেল মালাটা।

পুলিশ ধরে নিয়ে গেল তাকে।

পয়রট দেখল, টেবিলের পাশে একটা খিল আঁটা দরজা। ওদিক থেকেও আঁটা খিল। গেল সেই ঘরে। ফাঁকা ঘর। দরজার পাশেই একটা ধূলিধূসরিত টেবিল। ধুলোর ওপর একটা চৌকো ছাপ।

বেরিয়ে এল পয়রট। হোটেলের ঝিকে নিয়ে গেল মিস্টার ওপালসেনের ঘরে। গিন্নির ঘরের উলটোদিকে তার ঘর। পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে বলল, 'এরকম একটা কার্ড দেখেছ কোথাও?'

'না তো।' কার্ডটা উলটেপালটে দেখে বলল হোটেল-ঝি।

'খানসামাকে ডাক।' খানসামা আসতেই কার্ডটা বাড়িয়ে ধরল পয়রট। উলটেপালটে দেখে কার্ড ফিরিয়ে দিয়ে ঘাড় নাড়ল খানসামা—না, এ কার্ড সে আগে দেখেনি।

বেরিয়ে এল পয়রট। দুই চোখ বেশ উজ্জ্বল। বলল হেস্টিংসকে, 'আমি লন্ডন যাচ্ছি। হারকুল পয়রটকে এত সহজে ধোঁকা দেওয়া যায় না। মালা-চোর এবার ধরা পড়বে।'

'মালা তো পাওয়া গেছে,' বলল হেস্টিংস।

'দূর। ওটা নকল মালা।' বলে গায়ের কোটটা হেস্টিংসের হাতে ধরিয়ে দিল পয়রট। বলল, 'কোটের হাতায় সাদা গুঁড়োটা বুরুশ দিয়ে ঝেড়ে রেখো তো।'

'কীসের গুঁড়ো?'

'ফ্রেঞ্চ চক। ড্রয়ারে ছিল—কোটে লেগে গেছে।'

পরের দিন সন্ধেবেলা ফিরে এল হারকুল পয়রট।

সত্যিই ফিরে এসেছে আসল মুক্তোর মালা। খাঁচায় ঢুকেছে হোটেল-ঝি আর খানসামা।

কিন্তু কীভাবে?

গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান

খানসামা বন্ধ ঘরের দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিল নকল চাবি হাতে। খিল খুলে রেখেছিল। সিলেসটিন প্রথমবার তুলো আনতে গেল নিজের ঘরে। ড্রয়ার টেনে গয়নার বাক্স বের করল হোটেল-ঝি। খিল খুলে

চালান করল পাশের ঘরে। ফিরে এল সিলেসটিন। আবার গেল কাঁচি আনতে। আবার দরজা খুলল হোটেল-ঝি। খানসামা ততক্ষণে বাক্স খুলে মালা নিয়ে নিয়েছে। খালি বাক্সটা নিয়ে ড্রয়ারে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল হোটেল-ঝি।

নকল মুক্তোর মালাটা সকালবেলা বিছানা ঝাড়বার সময়ে সিলেসটিনের গদির তলায় লুকিয়ে রেখেছিল হোটেল-ঝি।

পয়রট দেখল খালি ঘরে ধুলো জমা টেবিলে একটা চৌকো ছাপ। গয়নার বাক্সটাও চৌকো এবং একই মাপের। বুঝে ফেলল হোটেল-ঝির সঙ্গে এ ঘরের খানসামা হাত মিলিয়েছে। তাই আগে থেকেই ফ্রেঞ্চ চক মাখিয়ে রাখা হয়েছিল ড্রয়ারে যাতে টানাটানিতে আওয়াজ না হয়।

সাদা কার্ডটা বিশেষ মশলা মাখানো আঙুলের ছাপ নেওয়ার কার্ড। ঝি আর খানসামার আঙুলের ছাপ কার্ডের ওপর ধরে নিয়ে পয়রট গেল লন্ডনে। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড পুরোনো ফাইল দেখে বললে—হ্যাঁ, এরা দুজনেই দাগি হিরে চোর। এখন ফেরারি।

গ্রেপ্তার হল দেবা আর দেবী। খানসামার পকেটে পাওয়া গেল আসল মুক্তোর মালা।

ফ্রেঞ্চ চক আর ধুলোর ছাপ হেস্টিংসও দেখেছিল—কিন্তু বুদ্ধির খেলায় হেরে গেল পয়রটের কাছে।

** সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত।*

আগাথা ক্রিস্টির গল্প নিয়ে গোয়েন্দা ধাঁধা

ভাঙা দেউলের খুনি প্রতিমা। মিস মার্পল

ক্লাবের নাম টুইসডে নাইট ক্লাব। উদ্দেশ্য—রহস্য গল্প বলা এবং তার সমাধান করা। সেদিন গল্প বলছেন পাদ্রী পেনডার।

ডার্টমুর জায়গাটা রহস্যময়, ভয়ঙ্কর অথচ সত্যিই দর্শনীয়। ডার্টমুরের প্রান্তে বেশ খানিকটা জায়গা জমি কিনলেন স্যার রিচার্ড হেডন। প্রাসাদের পাশেই প্রস্তরযুগের সারি-সারি গুহা, দিগন্তবিস্তৃত জলাভূমি এবং জঙ্গলাকীর্ণ পর্বতশ্রেণি।

এই বাড়িতেই একদিন একটা পার্টি দিলেন স্যার রিচার্ড। অনেকেই এলেন সেখানে—অভ্যাগতদের মধ্যে রইল মিস ডায়না—ডাকসাইটে সুন্দরী।

সবাইকে নিয়ে স্যার রিচার্ড গেলেন প্রস্তরযুগের গুহা অঞ্চলে। নিওলিথিক কুঁড়ে দেখিয়ে বললেন—এ জায়গার নাম সাইলেন্ট গ্রোভ।

সাইলেন্টই বটে। থমথম করছে চারিদিক। নির্জন, নিস্তব্ধ। এবড়োখেবড়ো পাহাড় ন্যাড়া ন্যাংটা। আর কিছু নেই।

অদূরে অনেকগুলো গাছ মাথা ঠোকাঠুকি করে দাঁড়িয়ে আছে। অনেকদিনের মরা গাছ—নতুন করে পুঁতে রাখা হয়েছে শুধু মাঝের দেউলটাকে ঘিরে রাখার জন্যে।

ভাঙা দেউল। ফোনিসিয়ানদের ডাকিনী মন্দির। মন্দিরে পাথরের প্রতিমা। মনে হয় যেন জীবন্ত। মাথায় জোড়া শিং।

গা শিরশির করে উঠল অভ্যাগতদের। মেয়েরা ভয় পেল। পুরুষরাও স্বীকার করলে—জায়গাটা অভিশপ্ত। যেন একটা অশুভ শক্তি প্রচ্ছন্ন রয়েছে এখানকার বাতাসে। পরিবেশ মোটেই সুবিধের নয়।

মিস ডায়না কিন্তু লাফিয়ে উঠে বললে—তাই কি হয়? আসুন আজ চাঁদনী রাতে সবাই মিলে নাচগান করি—দেবীপ্রতিমার সামনে।

রোমাঞ্চিত হল সবাই। রাজিও হল।

প্রাসাদের হলঘরে খাওয়ার টেবিলে সব শেষে হাজির হল মিস ডায়না। এসে দেখলে তার মন জোগাতে প্রত্যেকেই অদ্ভুত সাজে সেজে এসেছে। স্যার রিচার্ড প্রস্তরযুগের গুহাবাসী সেজেছেন—তাঁর খুড়তুতো ভাই জংলি সর্দারের ছদ্মবেশ নিয়েছেন। লেডি ম্যানারিং সেজেছেন হাসপাতালের নার্স—তাঁর মেয়ে হয়েছেন হারেমের বাঁদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

ফুর্তিতে নেচে উঠে মিস ডায়না বললে—চলুন বেড়িয়ে আসা যাক।

বাইরে চাঁদের আলো। মায়াময় পরিবেশ। অভ্যাগতরা সকলেই ফুর্তি উচ্ছল। হঠাৎ দেখা গেল মিস ডায়না নেই।

শুতে গেল নাকি? বললেন স্যার রিচার্ড।

না-না। মন্দিরের দিকে যেতে দেখেছি, বললেন ভায়োলট ম্যানারিং।

এত রাতে মন্দিরের দিকে? ভুরু কুঁচকোলেন স্যার রিচার্ড। মতলবটা বোঝা যাচ্ছে না তো। ডাইনি সাজবে নাকি?

মন্দিরের দিকে রওনা হলেন সবাই। দূর থেকেই দেখা গেল ভয়াবহ সেই দৃশ্য।

মন্দিরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে অপার্থিব একটি মূর্তি। সারা দেহ চকচকে বস্তুতে আচ্ছাদিত। মাথায় একজোড়া সিং।

প্রতিমা কি জাগ্রত হয়েছে?

ডায়না! ডায়না! তীক্ষ্নস্বরে বললেন ভায়োলেট।

মেয়েদের চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। ভায়োলেট ঠিকই চিনেছেন। ডায়নাই বটে।

ভীষণা দেবীর মতোই চন্দ্রকিরণে দাঁড়িয়ে অকম্পিত দেহে—

ডায়না! চমকে উঠলেন স্যার রিচার্ড! অন্যরকম মনে হচ্ছে না?

দাওয়ায় দাঁড়িয়ে এক হাত শূন্যে তুলল ভয়ংকরী!

বলল—আমি এ মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কাছে এসো না। আমার হাতে মৃত্যু।

সর্বনাশ! হেসে উঠে বললেন স্যার রিচার্ড। কী ছেলেখেলা জুড়েছ, ডায়না। বলেই পা বাড়ালেন সামনে।

এগিয়ো না, এগোলেই মরবে।

হা:-হা:-হা:। খুব ভয় দেখাচ্ছ দেখছি।

বারণ করছি আর এগিয়ো না। আমার হাতে মৃত্যু।

ছুটে গেলেন স্যার রিচার্ড।

সহসা শূন্যে উত্থিত হাতটা নামিয়ে আনল মিস ডায়না—সঙ্গে-সঙ্গে হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন স্যার রিচার্ড। আর নড়লেন না।

দৌড়ে গেল তাঁর খুড়তুতো ভাই ইলিয়ট হডন। হাঁটু গেড়ে বসে চিৎ করে শোয়াল দাদাকে।

পরক্ষণেই দাঁড়িয়ে উঠে বললে—ডাক্তার ডাকুন। দাদা মারা গেছেন।

স্যার রিচার্ডের বুকে ছুরি মারার চিহ্ন।...রক্ত...কিন্তু ছুরি নেই কোথাও।

পুলিশ এল। মাথা নেড়ে বললে অসম্ভব! অশুভ প্রেতাত্মা এসে ছুরি মেরে গেল।

তাই কি হয়?

সমস্ত রাত কারও ঘুম হয় না। স্যার রিচার্ডকে সত্যি সত্যিই মরতে দেখে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল ডায়না। ডাক্তার তাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে—পুলিশ তাকে জেরা না করা পর্যন্ত কোনও কথা বলতে রাজি নয়।

সবচেয়ে আশ্চর্য! ছুরিটা কোথায়? অভ্যাগতদের মধ্যে কেউ বললে, ডায়নার হাতে সত্যিই যেন কী চকচক করে উঠেছিল। কেউ বললে, চোখের ভুল। সত্যিই ডায়নার হাতে কিছু দেখা যায়নি—ক্ষতস্থানেও নয়।

ছুরিটা খুঁজে বের করার জন্যেই ইলিয়ট হেডন ফের গিয়েছিল মন্দিরচত্বরে। ভোররাতেও তাকে ফিরতে না দেখে টনক নড়ল প্রত্যেকের। পাদ্রী সাহেবের ওপর ভার পড়ল তাকে খুঁজে আনার।

একজন সঙ্গী নিয়ে পাদ্রী গেলেন অকুস্থলে। স্যার রিচার্ডের লাশ আগেই সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ঠিক সেই জায়গায় মুখ থুবড়ে পড়ে আরও একটা দেহ।

ইলিয়ট হেডন। তখনও নিশ্বেস পড়ছে। কাঁধে বিঁধে আছে একটা ছুরি।

জ্ঞান ফেরার পর ইলিয়ট যা বলল তা সত্যিই রোমাঞ্চকর। মন্দিরের সামনে পৌঁছনোর পর থেকেই কেন জানি তার মনে হচ্ছিল কে যেন তাকে প্যাট-প্যাট করে দেখছে গাছের আড়াল থেকে।

আচমকা কীসের আঘাত লাগল রগের ওপর। মাথা টলে পড়ে যাওয়ার সময়ে একটা ছুরি উড়ে এসে গেঁথে গেল কাঁধে। তারপর আর কিছু মনে নেই।

গল্প শেষ হল। ক্লাবের কেউ বললে ডায়নাই খুনি। অপরজন বললে—দূর! ডায়না স্যার রিচার্ডের কাছেই আসেনি। দূর থেকে ছুড়ে মেরেছে? বেশ বেশ ছুরিটা কি হাওয়ায় গলে মিলিয়ে গেল? অন্য এক সদস্য

বললে—গাছের আড়ালেই কেউ লুকিয়ে ছিল। ইলিয়ট নিজেও তা টের পেয়েছে। বুকে ছুরি নিয়ে পড়ে যাওয়ার সময়ে হাতের টানে ছুরি টেনে নিয়ে নিশ্চয় দূরে ফেলে দিয়েছিলেন স্যার রিচার্ড। সেই ছুরি দিয়েই হত্যাকারী খতম করতে চেয়েছে তাঁর খুড়তুতো ভাইকে।

মিস মার্পল বললেন—তোমাদের মাথা আর মুণ্ডু।

আর কী বললেন বলুন তো?

গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান

মিস মার্পল বললেন—তোমাদের মাথা আর মুণ্ডু। মেয়েছেলে দেখলেই সব ব্যাটাছেলেই কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে ছোটে। স্যার রিচার্ডও রূপে পাগল হয়ে ছুটে গিয়েছিলেন সামনে—নিশ্চয় হোঁচট খেয়েছিলেন গাছের শেকড়ে। মাথা ঠুঁকে বেহুঁশ হয়ে যেতেই সবার আগে একজনই গিয়েছিল তাঁর কাছে—খুড়তুতো ভাই ইলিয়ট। তার পরনে জংলি সর্দারের পোশাক। তার মানে কোমরে গোটা চার পাঁচ ছুরি থাকা আশ্চর্য নয়। ঝোঁকের মাথায় চট করে খুন করে ফেলে দাদাকে—সম্পত্তির লোভে, উপাধির লোভে, ডায়নার লোভে। বুকে ছুরি বিঁধিয়েই লুকিয়ে ফেলে বেল্টের মধ্যে। পরে নিজের কাঁধেই ছুরি মেরে সাধু সাজতে চেয়েছিল। প্রেমের আগুনে পুরুষ-পোকারা পুড়ে মরে এইভাবেই।

** 'সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত। ১৪ চৈত্র, ১৩৮১।*

মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের গল্প নিয়ে গোয়েন্দা ধাঁধা

কুরুক্ষেত্র। প্রতুল লাহিড়ী

স্থান—নির্জন কক্ষ কাল—রাত্রি

(বিছানার ওপর তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম; মুখখানা চিন্তাচ্ছন্ন।
কৃষ্ণ বসে অদূরে একখানা চেয়ারে। সেক্রেটারিয়েট টেবিলে ছড়ানো কাগজপত্র।)

কৃষ্ণ : বেশ, তাহলে ধ্বংসই চলুক।

ভীষ্ম : পাঁচখানা তরবারির বিরুদ্ধে একশোটা তরবারি ঝলসে উঠবে...

কৃষ্ণ : এটা তরবারির যুদ্ধ হবে না, ঠাকুরদা।

ভীষ্ম : তবে কীসের যুদ্ধ হবে?

কৃষ্ণ : এটা বিজ্ঞানের যুগ...

ভীষ্ম : (অসহ্য বিস্ময়ে) বিজ্ঞানের যুগ আবার কী হে? চার যুগের নামই তো জানি, সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি, এটা আবার কীসের ফ্যাকড়া?

কৃষ্ণ : (হাসলেন) বিজ্ঞানের যুগের সঙ্গে কারুর চালাকি খাটবে না। খাপের তরবারি খাপেই থাকবে, হাতের লাঠি থাকবে হাতে, তির-ধনুক পিঠেই ঝুলবে, মাঝ থেকে যোদ্ধার অকস্মাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটবে, অর্থাৎ হাত দুটো উড়ে যাবে দক্ষিণে, পা দুটো উড়ে যাবে উত্তরে, ধড়টার কোনও অস্তিত্বই থাকবে না।

ভীষ্ম : কিন্তু তা কী করে সম্ভব?

কৃষ্ণ : (দৃঢ়কণ্ঠে) বুদ্ধি, ঠাকুরদা, বুদ্ধি, স্রেফ কৃষ্ণের ক্ষুরধার বুদ্ধি...

ভীষ্ম : বুদ্ধিটা কি তোমার বৈজ্ঞানিক যুগেরই স্বধর্ম?

কৃষ্ণ : আমার বুদ্ধি আমারই স্বধর্ম, বৈজ্ঞানিক যুগের নয়। যুদ্ধের নামে লোকধ্বংসের জন্য বৈজ্ঞানিকরা সৃষ্টি করবে এরোপ্লেন, মাস্টার্ড গ্যাস, বিমান-বিধ্বংসী কামান, হাউইজার, শ্র্যাপনেল, ইউবোট আর আমি...

নাটকটা অজয়ের লেখা।

ধনঞ্জয় মিত্রের প্রথম পক্ষের ছেলে অজয়। বৈজ্ঞানিক এক্সপেরিমেন্টের বাতিক আছে। এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে প্রাণীহত্যা করে জেল পর্যন্ত খেটেছে। দীর্ঘদিন স্বদেশ ছাড়া। বোম্বাইবাসী। রহস্যময় চরিত্র।

বৃদ্ধ ধনঞ্জয় মিত্র প্রথমে তাঁর দেড় কোটি টাকার সম্পত্তি এই অজয়ের নামেই উইল করেছিলেন। তারপর অজয়ের কীর্তিকাহিনি যৎকিঞ্চিৎ শুনেই উইল পালটানোর মনস্থ করলেন। অমনি তাঁর এটর্নি মাধবচরণ মারা গেলেন বিষপ্রয়োগে। কিন্তু কেউ ধরতে পারল না, বিষটা কী ধরনের, শরীরেই বা ঢুকল কী করে। অজয় তখন বোম্বাইতে।

মুলতুবি রইল উইল পালটানো। দিন কয়েক পরে এটর্নি সারদাচরণকে ডেকে পাঠালেন বৃদ্ধ ধনঞ্জয় মিত্র। সারদাচরণ মাধবচরণের ছেলে। বাপ-বেটা দুজনেই এটর্নি।

দ্বিতীয় পক্ষের দুই ছেলে বিজয় আর সুজয়কেও ডাকলেন ধনঞ্জয় মিত্র।

বিজয়কে ধমক দিয়ে বললেন ধনঞ্জয় মিত্র, 'তুমি যদি সেই অভিনেত্রীটিকে বিয়ে করার সঙ্কল্প ত্যাগ করো, তবেই সম্পত্তি পাবে। নইলে—'

'আপনার সম্পত্তি চাই না।' বিজয় বললে সোজা গলায়।

ঠিক এমনি সময়ে একটা চিঠি এল ভৃত্যের হাতে। খাম ছিঁড়ে পড়লেন ধনঞ্জয় মিত্র। জবাব লিখে তক্ষুনি দিলেন ভৃত্যকে—ডাকবাক্সে ফেলে দেওয়ার জন্যে।

বিজয়কে বললেন, 'গলাটা শুকিয়ে গেছে। সোডা আর গ্লাস দাও।'

গেলাসে সোজা ঢেলে দিল বিজয়। তার কয়েক মিনিট পরেই অপমৃত্যু ঘটল ধনঞ্জয় মিত্রের। শরীরে দেখা দিল বিষক্রিয়া।

গ্রেপ্তার হল বিজয়।

কিছুদিন পরেই বোম্বাই থেকে ফিরে এল অজয়।

কোর্টে দাঁড়িয়ে সে বললে, 'বিজয় খুনি নয়। ওঁকে ছেড়ে দিন।'

ছাড়া পেল বিজয়। কিন্তু অজয় সুনজরে দেখল না তাকে। বরং চেষ্টা করল তার প্রেয়সী অরূপা দেবীকে ফুসলে আনার। এই সেই অভিনেত্রী যার জন্যে সম্পত্তিও ত্যাগ করতে চেয়েছিল বিজয়।

টাকার লোভে মেয়েরা সব পারে। অরূপা দেবীকেও একদিন দেখা গেল অজয়ের বাড়িতে। অজয়ের নিমন্ত্রণ সে রেখেছে। অজয় নাটক লেখে। সেই নাটকের গান্ধারী রোলটা তাকেই করতে হবে। বাড়ির মধ্যেই একখানা ঘরে বসবাস শুরু করে দিল অরূপা দেবী। মনোমালিন্য হয়ে গেল বিজয়ের সঙ্গে।

অজয় কিন্তু কল্পনাও করতে পারল না, নেপথ্যে থেকে কলকাঠি নাড়ছে প্রতুল লাহিড়ী। সে-ই পাঠিয়েছে অরূপা দেবীকে, সরিয়েছে বিজয়কে মনে আঘাত দিয়ে।

এমন সময়ে একখানা চিঠি এল অজয়ের নামে। প্রতুল লাহিড়ী হস্তগত করল চিঠিখানা। লিখেছেন সারদাচরণ। শুধু দুটি শব্দ—'পঞ্চাশ হাজারেও নয়।'

পরদিন সকালে দেশসুদ্ধ লোক জেনে গেল আর একটা অপমৃত্যুর চাঞ্চল্যকর সংবাদ। সারদাচরণও মারা গেছেন রহস্যজনকভাবে বিষপ্রয়োগে।

পুলিশ দপ্তরে খবর এল। অজয় টেলিফোন করে জানিয়েছে—সারদাচরণের মৃত্যুর আগে নাকি বিজয়কে সেখানেও দেখা গিয়েছে।

পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজতে লাগল বিজয়কে।

প্রতুল লাহিড়ী অরূপা দেবীকে পরামর্শ দিলে বিজয়কে নিয়ে গা-ঢাকা দিতে। কেঁদুটির এক কুঁড়ে ঘরে পালিয়ে গেল দুজনে। অজয়ের নাটকটা পড়বার জন্যে সঙ্গে করে নিয়ে গেল অরূপা দেবী।

নাট্যকার হওয়ার শখ তখন মাথায় উঠেছে অজয়ের। জেল পালানো একটি মেয়ে এসে উঠেছে তার বাড়িতে। নাম তার উজালী। বোম্বাইতে বিয়ে করেছিল। মারাত্মক একটা বিষের সন্ধান এই উজালীর কাছেই সে জেনেছিল। বিষটা আসে একটা ফুল থেকে। ফুলটার নাম টামুই...

অরূপা দেবীকে অজয় বিয়ে করতে চায় জানতে পেরে বাঘিনী মূর্তি ধারণ করল উজালী। অজয়ের কুকীর্তি সে ফাঁস করে দেবেই। মাধবচরণ, ধনঞ্জয় মিত্র এবং সারদাচরণকে দূর থেকেও খুন করার গুপ্ত রহস্য আর কেউ না জানলেও সে জানে...

কেঁদুটি থেকে ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে এল অরূপা দেবী। হাতে নাটকের পাণ্ডুলিপি। চোখ বড়-বড়।

'প্রতুলবাবু, প্রতুলবাবু, খুনগুলো হচ্ছে কী করে ধরে ফেলেছিল। বিষ...বিষ...ফুলের বিষ।'

'জানি।' বলল প্রতুল। 'টামুই ফুলের বিষ।' কিন্তু প্রয়োগ হচ্ছে কী করে? চিঠির মধ্যে দিয়ে বললে বিশু। অজয়ের বাড়িতে ছদ্মবেশে হেঁসেল সামলেছে অ্যাদ্দিন। আড়ি পেতে সাংঘাতিক চক্রান্তটা শুনেছে সে। এক্ষুনি কেঁদুটিতে লোক পাঠাতে হবে। বিজয়কে চিঠি লিখেছে অজয়। সে চিঠির জবাব দিলেই মারা পড়বে বিজয়।

কিন্তু কীভাবে?

উজালীকে বলল অজয়, 'চল আমরা পালাই বোম্বাইতে। খতম করে যাই বিজয়কে। পুলিশ তাকে খুঁজেছে খুনের অপরাধে। হঠাৎ মারা গেলে বুঝবে আত্মহত্যা করে জ্বালা জুড়িয়েছে।'

বলে, মারাত্মক চিঠিখানা লিখে ফেলে দিয়ে এল ডাক বাক্সে।

ফিরে এসে গুলি করল উজালীকে।

পুলিশ এসে দেখল বিষ খেয়েছে অজয়। টামুই ফুলের বিষ। মারা গেল বিশ মিনিট পরে।

অরূপা দেবীর হাত থেকে নাটকের পাণ্ডুলিপিটা টেনে নিয়ে পড়ল প্রতুল লাহিড়ী।

কৃষ্ণ। আর আমি—আর আমি ধ্বংস করব বিপুল কৌরব কুল—সামান্য একখানা চিঠির সাহায্যে।

ভীষ্ম—চিঠির সাহায্যে!

কৃষ্ণ। হ্যাঁ। আমি লিখব যাকে সে জবাব দেবে—ব্যস। আয়োজনের কোনও ঘটা নেই আধ ঘণ্টার ভেতর মৃত্যু এসে ধীরে ধীরে গ্রাস করবে। কেউ জানবে না কেউ বুঝবে না ডাক্তারের বিশ্লেষণ শক্তি হবে পরাহত। বৈজ্ঞানিকের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি পরাজয়ের কালিমায় কালো হয়ে উঠবে।

ভীষ্ম। ব্যাপারটা বুঝিয়ে না বললে তোমার কথার একটা বর্ণও যে আমার মাথায় ঢুকছে না, কৃষ্ণ!

কৃষ্ণ! মাথায় ঢুকবে না, ঠাকুরদা। ফুলে কীট আছে শুনেছেন তো? এ সেই ফুল আর এ-সেই কীট...

লাফিয়ে উঠে বললেন ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর আনন্দমোহন, 'ব্যস ব্যস আর পড়তে হবে না, বুঝেছি।'

খাতা বন্ধ করে বলল প্রতুল লাহিড়ী, 'হ্যাঁ, শুধু একখানা ডাক টিকিট!'

কী বুঝলেন?

গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান

চিঠি লিখে খামে মুড়ে ডাক টিকিট লাগানোর সময়ে শতকরা নিরানব্বই জন মানুষ জিভের ডগায় ডাকটিকিট বুলিয়ে নেন—হাতের কাছে জল বা জলশোষক স্পঞ্জ থাকে না বলে।

অজয় ডাকটিকিটের পেছনে টামুই ফুলের বিষ মাখিয়ে রাখত। যাকে খুন করতে হবে তাকে চিঠি লিখে জবাব চাইত এবং ঝটিতি জবাব পাওয়ার আশায় নিজের ঠিকানা লেখা আর একটা খাম আর বিষ মাখানো ডাকটিকিট সঙ্গে দিত।

ধনঞ্জয় মিত্র উইল পালটাবেন শুনেই মাধবচরণকে সরিয়ে দিয়েছিল এইভাবেই—হাতে খানিকটা সময় নেওয়ার মতলবে। তারপরে একই কায়দায় চিঠি লিখল ধনঞ্জয় মিত্রকে। উইল পালটাবার জন্যে তিনি সবাইকে ডাকলেন এবং সবার সামনেই সেই চিঠির জবাব দিয়ে বিদায় নিলেন ধরাধাম থেকে।

মারা গেলেন সারদাচরণ একই পন্থায়। তিনি বোধহয় কিছুটা আঁচ করেছিলেন। অজয় তাঁকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে মুখ বন্ধ করতে চেয়েছিল। ওটা অছিলা। উদ্দেশ্য জবাব নেওয়া। 'পঞ্চাশ হাজারেও নয়'—লিখে মৃত্যুমুখে ঢলে পড়লেন ভদ্রলোক।

এই হল কৃষ্ণের বৈজ্ঞানিক কুরুক্ষেত্র।

* *'সাপ্তাহিক অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত। ২৯শে ফাল্গুন, ১৩৮১।*

মার্গারি অ্যালিঙহ্যাম-এর গল্প নিয়ে গোয়েন্দা ধাঁধা

ফাঁকে পড়ল ফাঁকিবাজ। অ্যালবার্ট ক্যামপিয়ন

কে বলেছে চেয়ারে বসে গোয়েন্দাগিরি হয় না? ঘরে বসে স্রেফ নকসা দেখেও খুনি ধরা যায়। অ্যালবার্ট ক্যামপিয়ন সব পারেন।

ভদ্রলোক চশমাধারী। লিকপিকে ঠ্যাং। ঘরকুনো। কিন্তু মাথাটি সাফ। আপদে-বিপদে তাই ইন্সপেক্টর ওটস আসেন শলাপরামর্শ করতে।

সেদিন এলেন একটা ভারী সোজা কিন্তু ভারী কঠিন খুনের হেঁয়ালি নিয়ে। খবরের কাগজেও বেরিয়েছে খবরটা।

আগের রাতে খাস লন্ডন শহরেও গরম পড়েছিল। গুমোট গরম। জলের মাছ ডাঙায় উঠলে যেমন খাবি খায়, ঠান্ডার দেশের মানুষরা গরম পড়লে তেমনি হাঁসফাঁস করে। সাহেব মেমরা মাথা ঘুরে পড়েও যায়। তাই রাত একটার সময়ে লোকটাকে টলে পড়ে যেতে দেখে অবাক হল না বীটের কনস্টেবল। হেলতেদুলতে কাছে এসে আঁতকে উঠল কাঁধের ফুটো দেখে। পাকা হাত বটে। নীল ফুটোর মধ্যে দিয়ে ঢুকেছে বুলেট, ফুসফুস ফুটো করেছে, হার্ট ফুটো করেছে তারপর আটকে গেছে বুকের খাঁচায়।

গুলির আওয়াজ শোনা যায়নি।

তাই মনে হয় সাইলেন্সার ছিল বন্দুকে, না হয় খুব দূর থেকে গুলি করা হয়েছে।

কিন্তু কতদূর থেকে? কোনখান থেকে? ধাঁধা তো সেখানেই। গজগজ করতে লাগলেন ইন্সপেক্টর ওটস। একটা নকশাও এঁকে ফেললেন। নকশাটা এই :

বললেন, 'খুন হয়েছে জনি গিলকিক। জোসেফাইন বলে একটা ছুঁড়িকে নিয়ে অনেকদিন থেকেই তার মনকষাকষি ছিল ডোনোভানয়ের সঙ্গে। ডোনোভান দারুণ বন্দুকবাজ। টিপ কখনও ফসকায় না। পঁয়ত্রিশ বছর বয়স। তার মধ্যে দশ বছর জেলে ছিল। লোকটা গভীর জলের মাছ। খুনি জালিয়াত নিয়ে কারবার করে।'

তন্ময় হয়ে শুনতে লাগলেন ক্যামপিয়ন সাহেব।

ওটস বললে, 'ওর চোরাই মালের কারবারের গোপন ঘাঁটি হল কোল কোর্টয়ের এই কাফে। যদিও কফি পানের জায়গা ভালো আড্ডাখানাও বটে। চোর বাটপার খুনে গুন্ডারাও থাকে সে আড্ডায়।

'দাঙ্গাবাজ ডোনোভান ওদের মাথা বললেও চলে। জোসেফাইন মেয়েটাকে অষ্ট-প্রহর বসিয়ে রাখে কাউন্টারে—রাস্তার খদ্দেরকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ভেতরে টেনে আনার জন্যে। এহেন জোসেফাইনের সঙ্গে সত্যি-সত্যিই পটে গেল গিলকিক। রেগে টং হল ডোনোভান। শাসিয়ে দিল সবার সামনেই, ফের যদি জোসেফাইনের ধারেকাছে দেখা যায় তো টুঁটি ছিঁড়ে ফেলবে।

'তা সত্বেও কাল রাতে বিরহী গিলকিক এসেছিল প্রেয়সীর কাছে। মরণকালেই লোকের বুদ্ধিনাশ ঘটে। জোসেফাইন ভয়েময়ে হাঁকিয়ে দিয়েছিল গিলকিক-কে। কিন্তু ডোনোভানের গুলি কখনও ফসকায় না।

'অথচ জোসেফাইন নিজে থেকেই দৌড়তে-দৌড়তে থানায় এসে বলে গেল, ডোনোভান নাকি কাফে থেকে একদম বেরোয়নি। ওর গায়ে পড়ে সাফাই গাওয়া মোটেই ভালো চোখে দেখিনি আমি। কিন্তু আরও প্রমাণ পেলাম দুজন সাংবাদিকের কথা শুনে। জানেন তো ও অঞ্চলে দুটো খবরের কাগজের অফিস আছে।

সারারাত কফি সাপ্লাই যায় সেখানে। রিপোর্টাররাও আড্ডা মারে ফাঁক পেলেই। ডোনোভান যে কাফের বাইরে পা দেয়নি—তারাই হলফ করে বললে।

'খুনটা তাহলে হল কী করে? কোলকোর্ট একটা গলির মধ্যে। দুপাশে দুটো গুদোমের কংক্রিট দেওয়াল—একটা ফুটোও নেই।

'নকশা দেখুন। গিলকিক-য়ের লাশ পাওয়া গেছে বালির গাদার সামনে চৌকো চিহ্ন দেওয়া জায়গায়।

'ডেকেসন স্ট্রিটের রাস্তার দুপাশে দুজন কনস্টেবল মোতায়েন ছিল। কোলকোর্টয়ের ডানদিকের গ্যাসপোস্ট পর্যন্ত দুজনের এখতিয়ার।

'দুজনের কেউই গুলির আওয়াজ শোনেনি—বন্দুকবাজকেও দেখেনি। কনস্টেবল ক স্বচক্ষে দেখেছে গিলকিক গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ছে। কনস্টেবল খ সেই সময়ে গুদোম টহল দিতে ভেতরে ঢুকেছিল।

'কনস্টেবল ক তাকে ডেকে আনে। অ্যামবুলেন্স ডাকে।

'ডাক্তার বলছেন, যে-ভাবে গুলি লেগেছে তাতে সঙ্গে-সঙ্গে মারা গেছে গিলকিক। ওই গুলি খেয়ে তিন পায়ের বেশি হাঁটা সম্ভব নয়। অর্থাৎ ডোনোভান রাস্তায় বেরিয়ে এসে গুলি করে ফের ঢুকে গেছিল গলিতে এবং কাফের ভেতরে।

'অথচ কেউ তাকে বেরোতে দেখেনি।

'মিস্টার ক্যামপিয়ন, বলুন দিকি একি রহস্য? ডোনোভান ছাড়া আর কেউ খুন করেনি—কিন্তু করল কেমন করে?'

অ্যালবার্ট ক্যামপিয়ন, এতক্ষণে নড়ে উঠলেন চেয়ারে। বললেন, 'গিলকিক গুলি খেয়েছে চার দেওয়ালের মধ্যে। তার মধ্যে দুটো দেওয়াল হচ্ছে নিরেট কংক্রিটের—বাকি দুটো দেওয়াল হচ্ছে রক্তমাংসের—কনস্টেবল ক আর খ।

'ওটস, রক্তমাংসের দেওয়াল কি নির্ভরযোগ্য?'

বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলেন ওটস।

বিড়বিড় করে শুধু বললেন, 'ও মাই গড!' পরক্ষণেই বাঁই-বাঁই করে ছুটলেন থানায়।

খবর এল যথাসময়ে। কনস্টেবল ক ছুটিতে গেছে আজ সকালেই। লাশটা পাচার করেছিল সে-ই—পাছে ছুটি নষ্ট হয়, এই ভয়ে।

কিছু বুঝলেন? লাশটা কোথায় পাচার হয়েছিল?

গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান

বালির গাদার সামনে থেকে ডানদিকের গ্যাসপোস্ট পর্যন্ত—যেখান থেকে শুরু হয়েছে কনস্টেবল খ-য়ের এখতিয়ার।

কাফে-র দোতলা থেকে ডোনোভান গুলি করেছিল গিলকিক-কে। গুলি খেয়ে গিলকিক টলতে-টলতে মুখ থুবড়ে পড়ল বালির গাদার সামনে। কনস্টেবল খ এসে দেখল, মহা মুশকিল! নিজের এলাকায় খুন হওয়া মানেই তদন্তে জড়িয়ে পড়া। ছুটি বাতিল হবেই।

কনস্টেবল খ সেই মুহূর্তে টহল দিতে ঢুকেছে ভেতরে। ফাঁকিবাজ ক লাশটাকে তুলে এনে শুইয়ে দিল খ-য়ের এলাকায়। তারপর ছাড়ল পুলিশী হাঁক।

ক্লিয়ার?

** সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত। ৮ই ফাল্গুন, ১৩৮১।*

স্যার আর্থার কোনান ডয়ালের গল্প নিয়ে গোয়েন্দা ধাঁধা

ইঞ্জিনিয়ারের বুড়ো আঙুল। শার্লক হোমস

গোয়াটসনের তখন মরবার সময় নেই। ঘর সংসার নিয়ে ব্যস্ত। সদ্য বিয়ে হয়েছে। একদিকে বউ, আরেক দিকে রুগি। দু-দিক সামলাতে গিয়ে ব্যাচেলর বন্ধু শার্লক হোমসকে পর্যন্ত ভুলতে বসেছে।

ঠিক এই সময়ে একদিন ভোরবেলা ঘুম চোখে নীচে নেমে আসতে হল ওয়াটসনকে। অদ্ভুত একটা রুগি এসে বসে আছে বসবার ঘরে। লোকটা পেশায় হাইড্রলিক ইঞ্জিনিয়ার। বুড়ো আঙুলটা সদ্য কাটা গেছে। রক্তে জবজবে রুমাল জড়ানো।

ব্যান্ডেজ করার পর ইঞ্জিনিয়ার বললে, 'আমাকে এখুনি পুলিশের কাছে যেতে হবে। কেসটা সিরিয়াস।'

ওয়াটসন এই সুযোগে শার্লক হোমসের ওকালতি করে বসল। শুনে লাফিয়ে উঠল আঙুলকাটা ইঞ্জিনিয়ার। পুলিশের চাইতে হোমসের ওপর তার আস্থা বেশি।

সুতরাং সেই সকালেই সটান বেকার স্ট্রিটে এসে পৌঁছল ওয়াটসন। হোমস যথারীতি বসে আছে আরাম কেদারায়। মুখে-পাইপ, ঘরে তামাকের ধোঁয়া। পেট খালি। হাতে খবরের কাগজ।

ইঞ্জিনিয়ারের অবস্থা তখন শোচনীয়। বিপুল রক্তপাত আর ক্লান্তিতে কথা বলার শক্তিও নেই। হোমস ব্র্যান্ডি খাইয়ে দিতে একটু চাঙ্গা হল ভদ্রলোক। ইজিচেয়ারে আরাম করে শুয়ে শুরু করল অতি ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার অত্যাশ্চর্য কাহিনি।

নাম তার ভিক্টর হেথার্লি। হাইড্রলিক ইঞ্জিনিয়ার। আপিস সাজিয়ে বসেও সুবিধে করে উঠতে পারছিল না। এমন সময়ে গতকাল একটা অদ্ভুত লোক এসে দেখা করল তার সঙ্গে।

লোকটার নাম কর্নেল স্টার্ক। ভীষণ ঢ্যাঙা আর পাকানো চেহারা। গালের চামড়া যেন হাড়ের ওপর সেলাই করা। নাকটা খাঁড়ার মতো। চোখ ঝকঝকে, চলন-বলন চটপটে। কথার মধ্যে জার্মান টান।

শকুনের মতো তীক্ষ্ণ চোখে হেথার্লিকে বিঁধে ফেলল কর্নেল। ঝট করে লাফিয়ে গিয়ে দেখে এল দরজায় কেউ আড়ি পাতছে কিনা। তারপর শপথ করিয়ে নিল হেথার্লিকে দিয়ে—কোনও কথা যেন কেউ জানতে না পারে। যেহেতু হেথার্লি অনাথ আর আইবুড়ো—তাই তার কাছেই এসেছে কর্নেল। কেন না অনাথ আর আইবুড়ো লোকেরা পেটে কথা রাখতে জানে। কাজটা অবশ্য সামান্য—ঘণ্টা কয়েকের মতো। দক্ষিণাটা অসামান্য। পঞ্চাশ গিনি নগদ।

শুনেই হেথার্লির টনক নড়ল। পঞ্চাশ গিনি চাট্টিখানি কথা নয়। কিন্তু কাজটা কী?

কর্নেল তখন ফিসফাস করে বলল, তার একটা হাইড্রলিক মেশিন আছে। মেশিনটার কোথায় যেন একটি গলদ হয়েছে। হেথার্লিকে গিয়ে তা বার করে দিতে হবে।

কিন্তু এ-কাজ এত চুপিসাড়ে করার দরকারটা কী? কর্নেল দেঁতো হাসি হেসে বুঝিয়ে দিল কারণটা। রিডিং-য়ের কাছে খানিকটা জমি কিনেছিল সে। তারপর একদিন দেখল, জমির তলায় সাজিমাটির স্তর হয়েছে—যা কিনা সোনার চেয়েও দামি। তার চাইতেও বড় কথা—স্তরটা বেশি করে ছড়িয়ে পড়েছে পাশের দুই ভদ্রলোকের জমিতে। তারাও জানে না তাদের জমিতে সোনার চেয়েও দামি জিনিস পড়ে আছে। জানলে চড়চড় করে দাম উঠে যাবে জমিগুলোর। কিন্তু জলের দরে ও জমি কিনতে চায় কর্নেল। তাই আগে নিজের জমি থেকে সাজিমাটি তুলে দু-পয়সা জমিয়ে নিয়ে সেই টাকা দিয়ে কিনবে পাশের জমিগুলো। এত গোপনতা

সেই কারণেই। নিজের জমিতে মেশিন চলছে—এ খবর একবার প্রকাশ পেলে পাশের জমিওলা আর তো জমি বেচতে চাইবে না। সুতরাং হেথার্লি যেন সন্ধের দিকে রিডিং স্টেশনে চুপিসাড়ে হাজির থাকে। কর্নেল এসে তাকে নিয়ে যাবে তার খামারবাড়িতে।

সব শুনে শুধু, একটা প্রশ্নই করেছিল হেথর্লি, 'সাজিমাটি তো মাটি খুঁড়ে বার করতে হয়—কিন্তু হাইড্রলিক মেশিনের দরকার তো চাপাচাপির জন্যে।'

'ও সব আপনি বুঝবেন না। আমাদেরও চাপ দেওয়া দরকার আছে' বলে হেথার্লিকে যেন তোপের মুখে উড়িয়ে দিল কর্নেল।

অত কৌতূহলে দরকারটা কী? পঞ্চাশ গিনি পেলেই হল। সুতরাং যথাসময়ে রিডিং স্টেশনে হাজির হল হেথার্লি। স্টেশনের বাইরে কর্নেল দাঁড়িয়েছিল একটা এক-ঘোড়া গাড়ি নিয়ে। ঘোড়াটা বেশ তেজালো বাদামি রঙের, গায়ে ধূলোবালি, ঘামের চিহ্নমাত্র নেই।

গাড়ির মধ্যে হেথার্লিকে উঠিয়ে নিয়ে কোচোয়ানকে চলতে হুকুম দিল কর্নেল। দরজা-জানলা বন্ধ থাকায় হেথার্লি দেখতে পেল না কোন পথে চলেছে গাড়ি। তবে ওইরকম বেগে ঘণ্টাখানেক একনাগাড়ে ছুটে চলা মানে মাইল বারো পথ যেতে হয়েছিল নিশ্চয়। পাহাড়ি পথ হলে টের পাওয়া যেত। রাস্তাটা এবড়োখেবড়ো—কিন্তু চড়াই উৎরাই পেরোতে হয়নি।

একঘণ্টা পরে একটা বাগানের মধ্যে গাড়ি ঢুকল। হেথার্লিকে নামিয়ে বেরিয়ে গেল গাড়িটা। একজন জার্মান মহিলা আলো হাতে সভয়ে দরজা খুলে কী যেন বলল কর্নেলকে। তারপর বেরিয়ে এল একজন মোটা ইংরেজ। কর্নেলের ম্যানেজার। মেয়েটাকে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে কর্নেল আর ম্যানেজার হেথার্লিকে নিয়ে এল হাইড্রলিক মেশিনের ঠিক তলায়—একটা ছোট্ট খুপরি ঘরে।

ঘরটার তলায় লোহার প্লেট—ওপরে লোহার প্লেট। চারদিকে কাঠের দেওয়াল। মেশিন চললেই ওপরের লোহা নেমে এসে মিশে যায় নীচের লোহার সঙ্গে।

হেথার্লি সামান্য একটু ঘটাং-ঘটাং করেই বুঝে ফেলল রবারের ঢাকনি দিয়ে প্রেসার বেরিয়ে যাচ্ছে। তাই সেরকম চাপ উঠছে না অত বড় মেশিনেও।

তারপরেই তেলের বাতি হাতে একা ফিরে এল খুপরি ঘরে। মনটা খুঁতখুঁত করছিল মেশিনের সাইজ দেখে। এত বড় মেশিন দিয়ে সাজিমাটি চাপ দেওয়ার কথাটা যে মিথ্যে, তা ধরে ফেলল লোহার পাত দুটোয় হাত বুলোতেই। অদ্ভুত কতকগুলো ধাতুর গুঁড়ো লেগে সেখানে।

ঠিক এই সময়ে পেছনে পায়ের শব্দ শোনা গেল। কর্নেল জ্বলন্ত চোখে দেখছে হেথার্লিকে। তারপরেই আর সময় পাওয়া গেল না। চক্ষের নিমেষে বেরিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল কর্নেল।

মেশিনের চাপ-ঘরে বন্দি হল হেথার্লি। পরক্ষণেই কানে ভেসে এল সোঁ-সোঁ শব্দ। মেশিন চালিয়ে দিয়েছে কর্নেল। ওপরের লোহার প্লেট নীচে নেমে আসছে হেথার্লিকে চিঁড়েচ্যাপটা করতে। আচম্বিতে পাশের কাঠের দেওয়ালে খুলে গেল আর একটা দরজা। সেই জার্মান মহিলাটা ওকে টেনে নিয়ে এল বাইরে। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে তেলের বাতি গুঁড়ো হওয়ার এবং ধাতুতে-ধাতুতে ঠোকাঠুকির আওয়াজ শোনা গেল মেশিন ঘরের ভেতর থেকে।

মেয়েটা হেথার্লিকে বললে তিনতলার জানলা থেকে লাফ দিয়ে পড়তে। কিন্তু কর্নেল ততক্ষণে ছুটে এসেছে কৃপাণ হাতে। দরজা আটকে দাঁড়াল মেয়েটা। ঠেলে ফেলে দিয়ে ছুটে এল কর্নেল। হেথার্লি তখন চৌকাঠ ধরে বাইরে ঝুলছে। কৃপাণের কোপে বুড়ো আঙুলটা রয়ে গেল ঘরের মধ্যে।

তারপর আর কিছু মনে নেই হেথার্লির। জ্ঞান হলে দেখল কোথায় সেই বাগানবাড়ি? ও শুয়ে আছে স্টেশনের ধারে একটা ঝোপের মধ্যে। রক্তপাতে প্রাণটা গলায় এসে ঠেকেছে।

শার্লক হোমস তক্ষুনি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড থেকে লোকজন নিয়ে রওনা হল রিডিং স্টেশনে। সঙ্গে হেথার্লি আর ওয়াটসন। আর একটা ম্যাপ। রিডিং স্টেশনকে ঘিরে দশ মাইল মত জায়গা নিয়ে একটা বৃত্ত টানা হয়েছে

ম্যাপের ওপর। বাগানবাড়িটা এই বৃত্তের মধ্যেই নিশ্চয় পড়বে। কিন্তু কোথায়? ট্রেনে বসেই আরম্ভ হল জল্পনাকল্পনা।

ওয়াটসন, ইন্সপেক্টর সার্জেন্ট আর ইঞ্জিনিয়ার—এই চারজনে দেখিয়ে দিলে স্টেশনের উত্তর, দক্ষিণ, পুব, পশ্চিম দিক। কিন্তু সবাইকে বোকা বানিয়ে শার্লক হোমস আঙুল টিপে ধরল বৃত্তের ঠিক মাঝখানে—রিডিং স্টেশনের ওপর।

আশ্চর্য! ট্রেন রিডিং স্টেশনে পৌঁছতে-না-পৌঁছতেই দেখা গেল ছাতার মতো ধোঁয়ার কুণ্ডলী। স্টেশনের পাশেই একটা গাছপালা ঘেরা বাগানবাড়িতে আগুন জ্বলছে। হেথার্লির বুড়ো আঙুল সেই বাড়িতেই পাওয়া গেল। একজোড়া ছোট পায়ের ছাপ, আরেক জোড়া ভারী পায়ের ছাপ। অচেতন হেথার্লিকে এই দুজন বয়ে নিয়ে ফেলে গেছে স্টেশনের ধারে। তারপর পালিয়েছে বাড়ি ছেড়ে। মেশিন ঘরে কেবল পাওয়া গেল টিন আর নিকেলের গুঁড়ো।

এবার আসুন রহস্য সমাধানে।

এক নম্বর রহস্য—শার্লক হোমস জানল কী করে রিডিং স্টেশনের ধারেই ওদের বাড়ি?

দু'নম্বর রহস্য—কে আগুন লাগাল বাড়িতে?

তিন নম্বর রহস্য—হাইড্রলিক মেশিন কী কাজে লাগান হত?

চার নম্বর রহস্য—অচেতন হেথার্লিকে কারা বয়ে নিয়ে এসেছিল স্টেশনের ধারে?

গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান

এক নম্বর সমাধান—হেথার্লিকে নিয়ে ঘোড়ার গাড়িটা ছ'মাইল গিয়ে আবার ফিরে এসেছিল। বারো মাইল দূর থেকে যদি আসতে হত, তাহলে ঘোড়াটার গায়ে ধুলোবালি ঘাম থাকত। কিন্তু হেথার্লি দেখেছিল ঘোড়াটা একেবারে ঝকঝকে তাজা।

দু-নম্বর সমাধান—হেথার্লি নিজেই। তেলের বাতিটা ফেলে এসেছিল মেশিন ঘরে। সে ঘরে দেওয়ালগুলো কাঠের। বাতি ভেঙে যেতেই কাঠে আগুন লেগে গেছিল।

তিন নম্বর সমাধান—টিন আর নিকেলের গুঁড়ো দেখেই হেথার্লি টের পেয়েছিল মেকি টাকার কারখানা খুলে বসেছে কর্নেল।

চার নম্বর সমাধান—ছোট পা একজন মহিলার, ভারী পা ভারী লোকের। অর্থাৎ জার্মান মেয়েটা মোটা ইংরেজকে নিয়ে হেথার্লিকে পাঁজাকোলা করে তুলে এনেছিল নিরাপদ জায়গায়। বাড়িতে আগুন লাগার পর পালানো ছাড়া আর পথ ছিল না। ইংরেজের প্রাণটা একটু নরম ছিল বলেই হেথার্লিকে আর প্রাণে মারেনি।

** সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত। ১৩৮১।*

স্যার আর্থার কোনান ডয়ালের গল্প নিয়ে গোয়েন্দা ধাঁধা

বউ উধাও। শার্লক হোমস

গোয়েন্দা হওয়ার ঝকমারি অনেক। বিশেষ করে আইবুড়ো গোয়েন্দার। বউ হারালেও বউকে খুঁজে আনতে হয়—বউয়ের মর্যাদা না বুঝেও।

বেচারা শার্লক হোমস-কেও এই জোয়াল কাঁধে বইতে হয়েছে বেশ কয়েকবার। স্ক্যান্ডিনেভিয়ার কেলেঙ্কারির কথা কে না জানে। আরেকবার প্রায় একই ঘটনা ঘটল লর্ড সাইমনের বিয়ের পর।

কী বিশ্রী ব্যাপার! ঢি-ঢি পড়ে গেল সারা লন্ডন শহরে। তারপরেই অবশ্য দরদে বুক উথলে উঠল যখন লেডি সাইমনের জামাকাপড় পাওয়া গেল একটা লেকে। আহারে! বিয়ের পরেই বিপত্নীক।

ঘটনাটা গোড়া থেকে না বললে জমবে না। লর্ড সাইমন ইংল্যান্ডের সেইসব জমিদার-তনয় যাদের বংশের নামের ডাকেই গগন ফাটে, কিন্তু তালপুকুরে ঘটি ডোবে না। মাঝখানে খুব হিড়িক উঠেছিল আমেরিকার টাকাওলা মেয়েদের পটিয়ে বিয়ে করে ফেলা এবং মোটা বরপণ নিয়ে নতুন করে কাপ্তেনি করা।

লর্ড সাইমন তার ব্যতিক্রম নন। লন্ডনের কাগজে-কাগজে এই নিয়ে ঝালমশলা মুড়ির মত জিভে জল ঝরানো খবর ছাপা হল অনেকবার। কনের বাবার নাকি টাকা গুণে শেষ করা যায় না—খনির মালিক তো। মেয়েটারও কেবল ডানা দুটো নেই—বাদবাকি অবিকল পরির মতোই। কিন্তু এইসব দেখে কোনওক্রমে ভোলো উচিত হয়নি লর্ড সাইমনের ইত্যাদি ইত্যাদি।

ফালতু কথায় কান না দিয়ে ঝটপট বিয়েটা সেরে ফেললেন লর্ড মহাশয়। বয়স তাঁর কম। হুকুম করার জন্যেই জন্মেছেন—হুকুমমাফিক কাজ করিয়ে নিতেও জানেন। বিয়েটাও একটা হুকুম। সুতরাং বউ বেচারিকেও আশা করেছিলেন সেবাদাসীর মতো খাটাবেন—দরকার মতো মোচড় মেরে টাকাও বার করে নেবেন।

কিন্তু কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! বিয়ে সেরে বাড়ি পৌঁছতে না পৌঁছতেই বাতাসে মিলিয়ে গেল বউ! লর্ড সাইমন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। ঘরভরতি লোক তখন একপেট খিদে নিয়ে বসে আছে খাওয়ার টেবিলে—কনেবউ এসে বসলেই মুরগির ঠ্যাং চিবোবে—এমন সময়ে খবর এল কনে উধাও।

সঙ্গে-সঙ্গে পুলিশ এসে গেল। পুলিশ মানে ইন্সপেক্টর লেসট্রেড। যার চেহারা খর্বকায় নেউলের মতো। বেজায় চটপটে। বেজায় ধুরন্ধর। বেজায় প্র্যাকটিক্যাল। অনুমান—ফনুমানের ধার ধারে না। সে এসে দেখলে ফ্লোরা মিলার বলে একটা নাচুনে মেয়ে এসে বাড়িতে হামলা জুড়েছিল। লর্ড সাইমনকে নাকি এত সহজে সে হাতছাড়া করতে রাজি নয়। ফুর্তি করার সময়ে মনে ছিল না? ফ্লোরাকে নাকি ঘাড় ধরে বার করে দেওয়া হয় বাড়ি থেকে। তারপর সেই ফ্লোরার সঙ্গেই নাকি লেডি সাইমনকে বাগানে পাশাপাশি হাঁটতে দেখা গেছে। সুতরাং কেসটা জলবৎ তরলম। অর্থাৎ ফ্লোরাই গায়েব করেছে লেডি সাইমনকে। মেয়েরা ভারী হিংসুটে হয়। হবুবর পালালে বাঘিনী হতেও আপত্তি নেই। সুতরাং পাকড়াও ফ্লোরা মিলারকে।

প্রমাণ? লেসট্রেড অত কাঁচা ছেলে নয়। তাও জুটিয়ে ফেলল সার্পেন্টাইন লেকের জল থেকে। লেডি সাইমনের পরিত্যক্ত জামাকাপড় পাওয়া গেলেও অবশ্য লাশটা পাওয়া গেল না। তাই বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দেওয়ার জন্যে প্রতিবারের মতো এবারও শখের গোয়েন্দার পায়ে তেল দেওয়ার জন্যে বেকার স্ট্রিটের আইবুড়ো মন্দিরে হাজির হল সরকারি গোয়েন্দা।

শার্লক হোমস তখন সবে বিদেয় করেছে লর্ড সাইমনকে। কেসটা গোড়া থেকে শেষপর্যন্ত শুনে নিয়ে মনে-মনে সাজিয়েও ফেলেছে। সামান্য দু-চারটে প্রশ্ন অবশ্য করেছিল। লর্ড সাইমন তার জবাবে বলেছেন, ক্লারা, মানে তাঁর সদ্য উধাও বউয়ের মাথাটা বিয়ের আগে থেকেই একটু বেসামাল ছিল বলে মনে হয়। নইলে ফ্লোরার ভয়ে এ-ভাবে কেউ পালায়? ফ্লোরার সঙ্গে লটঘট ছিল কিনা? তা হ্যাঁ, একটু-আধটু ছিল বইকি। বিয়ের আগে কার না থাকে? তাই বলে বাড়ি বয়ে বিয়ে ভণ্ডুল করতে আসবে? এত বড় স্পর্ধা? ক্লারাকেও বলিহারি যাই। বিয়ে করতে গেল হাসতে-হাসতে। বরকে নিয়ে ফিরে এল মুখখানা তোলা হাঁড়ির মতো করে। গির্জের মধ্যে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যাওয়ার সময়ে হাতের ফুলের তোড়াটা পড়ে গেল মেঝেতে। একজন গেঁইয়া টাইপের লোক তুলে দিল হাতে। তারপরেই বাড়ি ফিরে এসে ওর বাপের বাড়ির ঝি-কে ডেকে কী যে বলল ভগবান জানেন। একটা কথা শুধু কানে এসেছিল। কথাটা আমেরিকার চাষাড়ে লোকদের মধ্যেই চালু। কথাটার সাদা মানে হল, আগের জিনিসের ওপর দাবি নিয়ে তা দখল করা।

ঝি-য়ের সঙ্গে গজর-গজর করার পরেই হাওয়া হয়ে গেল ক্লারা। ব্যাপারটা সিরিয়াস। লর্ড সাইমনের ইজ্জৎ বলে একটা কথা আছে।

সব শুনে নিয়ে লর্ডকে বাড়ি ফেরত পাঠাল হোমস। তারপরেই ধূর্ত হাসি হেসে ঘরে ঢুকল লেসট্রেড।

সোল্লাসে বলল হোমস, 'আসা হোক! আসা হোক! কিন্তু কোটের হাতা ভিজে কেন বৎস?'

'সার্পেন্টইনে জাল ফেলেছিলাম যে।'

'জাল! সার্পেন্টাইনে। কেন?' চোখ কপালে উঠে গেল হোমসের।

'লেডী সাইমনের লাশ তোলার জন্যে।' হোমসের অজ্ঞতা দেখে অনুকম্পার সঙ্গেই বলল লেসট্রেড। সেইসঙ্গে বললে লেডির জামাকাপড় পাওয়ার বৃত্তান্ত। এমনকী ফ্লোরা মিলার যে এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত তার প্রমাণ পর্যন্ত নাকি পাওয়া গেছে লেডির পোশাকের পকেটে।

অতি তুচ্ছ প্রমাণ। একটুকরো ছেঁড়া কাগজ। তার ওপর পেনসিল দিয়ে লেখা :

'একটু সামলে নিয়ে দেখা করো আমার সঙ্গে।

—এফ, এইচ এম।

মোক্ষম প্রমাণ। ফ্লোরা মিলারকে ঘানি ঘুরিয়ে ছাড়বে লেসট্রেড এই একটা প্রমাণের জোরে।

ভীষণ উৎসুক হয়ে কাগজটা হাত পেতে নিল হোমস। দেখতে-দেখতে চোখেমুখে ফুটে উঠল প্রচণ্ড কৌতুক। অট্টহাসি হেসে বললে, 'সাবাস!'

'কিন্তু একী! আপনি উলটোদিকে দেখছেন কেন?' আঁতকে উঠল লেসট্রেড।

'উলটো কোথায়? ওইটাই তো সোজা দিক হে! হোটেলের বিলের ছেঁড়া টুকরো তো! পেছনের হিসেবটাই আসল।'

'ও হিসেব আমিও দেখেছি। চৌঠা আগস্টের তারিখ আর ঘরভাড়ার জন্যে ৮ সিলিং দেওয়া হয়েছে জেনে আমার লাভ? রেটটা যদিও চড়া—'

আরেক দফা অট্টহাসি হেসে হোমস বললে, 'বৎস লেসট্রেড, শুধু একটা কথাই শুনে যাও। লেডি সাইমন বলে কেউ নেই, কোনওকালেই ছিল না!'

বিমূঢ় লেসট্রেড বিদেয় হতেই সুট করে বেরিয়ে পড়ল শার্লক হোমস। ওয়াটসন বেচারি বসে রইল একা-একা। কিছুক্ষণ পরেই হোটেল থেকে লোকজন এসে পাঁচজনের খাবার সাজিয়ে দিয়ে গেল টেবিলে। ওয়াটসন বুঝল না কেন এই রাজসিক আয়োজন। তারও অনেকক্ষণ পরে হোমস ফিরে এসে বললে, 'যাক, খাবার এসে গেছে। তাঁরাও এলেন বলে।'

'কারা?'

'লর্ড সাইমন এবং আরও দুজন।'

বলতে না বলতেই ঘরে ঢুকলেন সাইমন। চোখমুখ লাল। ভীষণ উত্তেজিত, বিচলিত এবং হতচকিত।

'কী বলছেন মশায়?' টেবিল চাপড়াতে-চাপড়াতে বললেন লর্ড। 'আপনি ঠিক জেনে বলছেন তো?'

'ঠিকই বলছি।'

'কিন্তু এ যে সাংঘাতিক অপমান,' ঠকাঠক-ঠকাঠক শব্দে টেবিলে আঙুল বাজাতে লাগলেন লর্ড। পরক্ষণেই তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে কটমট করে চেয়ে রইলেন দরজার দিকে।

দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন একজন ডানাকাটা পরি। পাশে একজন ছোটখাটো চেহারার চটপটে লোক।

পরিচয় করিয়ে দিল শার্লক হোমস, 'মিস্টার অ্যান্ড মিসেস ফ্রান্সিস হে মুলটন!'

'ক্লারা!' বজ্রকণ্ঠে হুঙ্কার ছাড়লেন লর্ড।

ডানাকাটা পরিটি এগিয়ে এসে মিষ্টি হেসে বললে, 'রবার্ট, খামোকা রাগ করো না। ফ্রান্সিসের সঙ্গে অনেক আগেই গোপনে বিয়ে হয়ে গেছিল আমার। বাবা জানতেন না। ফ্রান্সিস গরিব ছিল বলে জানাইনি। কিন্তু ও পণ করেছিল আরও বড় খনির মালিক হয়ে এসে তবে আমাকে ঘরে নিয়ে যাবে। কিন্তু বছর খানেক পরেই খবরের কাগজে ওর নাম দেখলাম—খনি দুর্ঘটনায় মারা গেছে। তারপরেও অনেকদিন বসে থাকার পরেও যখন ও এল না, বাবার জেদে আমার দেহটা তোমাকে দেব ঠিক করলাম—মনটা নয়। তুমি বলো, আমি ঠিক করেছি না বেঠিক করেছি?'

'আমি চললাম' কাঠের পুতুলের মতো পা বাড়ালেন লর্ড।

'কোথায় যাবেন? খেয়েদেয়ে তারপর যাবেন।' বলল হোমস।

'এরপরেও খাওয়া নামবে গলা দিয়ে?' বলে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে উধাও হলেন লর্ড সাইমন।

বেচারা! নাকের ডগা দিয়ে ফস্কে গেল রাজকন্যা এবং আধখানা রাজত্ব। কিন্তু রহস্য সমাধানের সূত্রগুলো এখনও আপনার সামনে থেকে পালাতে পারেনি। সামনেই আছে। বলুন দিকি কী?

গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান

হাসতে-হাসতে বিয়ে করতে গেল ক্লারা, ফিরে এল মুখখানা বাংলা পাঁচ করে। কী ঘটেছিল মাঝখানে? না, হাত থেকে ফুলের তোড়া পড়ে গিয়েছিল গির্জের সিঁড়িতে—তুলে দিয়েছিল একজন গেঁইয়া চেহারার লোক। তারপরেই গেঁইয়া ভাষায় ঝি-কে বললে ক্লারা—আগের জিনিসের দাবি নিয়ে তা দখল করতে হবে। কী সেই জিনিস? না একটা চিরকুট পাওয়া গেল ক্লারার পরিত্যক্ত পকেটে—তাতে অমুক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে বলা হয়েছে ক্লারাকে। চিরকুটটা ক্লারার পকেটে এল কখন? গির্জের মধ্যে ফুলের তোড়া হাতে তুলে দেওয়ার সময়ে নয় তো? গেঁইয়া চেহারার সেই লোকটার নামের আদ্যক্ষর এফ এইচ এম? সে চৌঠা আগস্ট লন্ডনের একটা দামি হোটেলে উঠেছিল। সেখানকার ঘরভাড়া দৈনিক ৮ সিলিং। পুরো ব্যাপারটাতেই পূর্ব-প্রণয়ীর গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না?

খোঁজ...খোঁজ...খোঁজ। লন্ডনে এমন খানদানি হোটেল বলতে তো মাত্র আটটা। তার একটিতে এক ভদ্রলোক উঠেছিলেন চৌঠা আগস্ট—নামের আদ্যক্ষর এফ এইচ এম—অর্থাৎ ফ্রান্সিস হে মুলটন!

পরিষ্কার হয়ে গেল হেঁয়ালি। ক্লারা-র ঝি ক্লারার বিয়ের জামাকাপড় পুঁটলি পাকিয়ে ফেলে দিয়ে এসেছিল সার্পেন্টাইনে—পুলিশকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যে—ক্লারাকে অন্য পোশাকে পাচার করে দিয়েছিল বাড়ির বাইরে।

** সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত। ১৩৮১।*

স্যার আর্থার কোনান ডয়ালের গল্প নিয়ে গোয়েন্দা ধাঁধা

বুদ্ধিমান ঘোড়া আর বোকা চোর। শার্লক হোমস

চলন্ত ট্রেনে বসে ঘটনাটার আদ্যোপান্ত ওয়াটসনকে বলল হোমস। ভারী রহস্যজনক ব্যাপার। ডার্টমুর জায়গাটা যেমন ফাঁকা তেমনি নিরিবিলি। দু-চারটে স্বাস্থ্যনিবাস আছে স্বাস্থ্যকামীদের জন্যে। সিম্পসন বলে একটা লোক প্রায় আসত সেখানে। খুনের দিন এসেছিল সিলভার বেজ যে আস্তাবলে আছে, সেইখানে। তখন সন্ধে হতে চলেছে। মাংসের বাটি হাতে ঝি আসছে ট্রেনারের বাড়ি থেকে হান্টার ছোকরার জন্যে। রাত্রে আস্তাবল পাহারা দেবে হান্টার—খাবেও ওইখানে। এমন সময়ে সিম্পসন পাকড়াও করল ছুঁড়িকে। হাতে মাথামোটা ভারী লাঠি। মিঠে-মিঠে বুলি ছেড়ে হাতে একটা দশ পাউন্ডের নোটও গুঁজে দিতে গেল। ভড়কে গিয়ে ঝি গিয়ে বলে দিল হান্টারকে। সিম্পসন ততক্ষণে কাছে এসে গেছে। হান্টারকেও ঘুস দিয়ে জানতে চাইল সিলভার বেজ সম্বন্ধে খবরাখবর।

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল হান্টার। রেসের আগে এরকম ঘটনা আকছার ঘটে। তাই 'তবে রে' বলেই দৌড়ল কুকুর লেলিয়ে দেওয়ার জন্যে। ঝি মেয়েটিও ভোঁ দৌড় দিল বাড়ির দিকে। যেতে-যেতে দেখল জানলা দিয়ে ভেতরে মুণ্ড বাড়িয়ে রয়েছে সিম্পসন। হান্টার অবশ্য কুকুর নিয়ে বেরিয়ে এসে দেখল লোকটা ভেগে পড়েছে।

ট্রেনারের নাম স্ট্রেকার। খুব নাম আছে। ঝিয়ের মুখে সব শুনে অস্থির হলেন ভদ্রলোক। রাত একটায় বর্ষাতি কাঁধে বেরিয়ে পড়লেন আস্তাবলের দিকে। বউকে বলে গেলেন মন চঞ্চল হয়ে আছে ঘোড়াদের জন্যে। একটু দেখে আসা যাক।

সেই হল তাঁর কালযাত্রা। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেও মিসেস স্ট্রেকার বোঝেননি তিনি বিধবা হয়ে গেছেন। আস্তাবলে গেলেন স্বামীর খোঁজে। গিয়ে দেখেন তাজ্জব কাণ্ড। হান্টার ছোঁড়া বেহুঁশ। মাচায় শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে আরও দুটো ছোঁড়া। আস্তাবলের দরজা খোলা। সিলভার বেজ উধাও।

বেশ খানিকটা দূরে পাওয়া গেল গাছে ঝুলন্ত বর্ষাতি। একটু তফাতে মুখ গুঁজড়ে পড়ে স্ট্রেকার। খুলি চূর্ণ কঠিন আঘাতে। হাতে একটা রক্তমাখা তীক্ষ্ণ ছুরি। বেশ খানিকটা কাটা দাগ। পাশে পড়ে সিম্পসনের পরিত্যক্ত গলাবন্ধ—তাতেও রক্ত লেগে।

ঘটনাস্থলে গিয়ে আরও কয়েকটা অদ্ভুত প্রশ্ন করল হোমস। স্ট্রেকারের হাতের ছুরিটাকে ডাক্তারি ভাষায় ছানিকাটা ছুরি বলে। খুব দামি আর খুব সূক্ষ্ম ধারালো ফলা। কিন্তু ফলা মোড়া যায় না। পকেটে নিয়ে যাওয়া যায় না। তা সত্বেও স্ট্রেকার ছুরি নিয়ে দৌড়েছিলেন। তাড়াতাড়িতে নাকি টেবিল থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন—বললেন তাঁর বিধবা বউ।

স্ট্রেকারের পকেটে পাওয়া গিয়েছিল মোমবাতি, দেশলাই আর কুড়ি গিনি দামের একটা মেয়েদের জামার ক্যাশমেমো। কুড়ি গিনি দামের জামা কি সাধারণ বউ-ঝি পরে? মিসেস স্ট্রেকারকে আচমকা শুধোল হোমস, 'অমুক পার্টিতে একটা ঝলমলে দামি পোশাক পরে আপনি গিয়েছিলেন না?'

'আজ্ঞে না,' সাফ জবাব দিলেন স্ট্রেকার গৃহিণী। 'আপনি আর কাউকে দেখেছেন!' কর্নেল রস হতাশ হলেন হোমসের পাগলাটে কথাবার্তা আর কাদার মধ্যে মুখ ঘষটানো দেখে। হোমস কিন্তু গ্রাহ্য করল না। বলল, 'আমি একটু বেড়িয়ে আসি। নমস্কার।'

বলে ওয়াটসনকে নিয়ে পা বাড়াল জলার ভেতর দিকে। যেতে যেতে বললে, 'বেদেরা ঘোড়া লুকোয়নি। ওরা পুলিশকেও এড়িয়ে চলে। ফাঁকা জায়গাতেও ঘোড়া ঘুরছে না। ঘোড়ারা দল বেঁধে থাকে। কাজেই হয় যাবে কিংস পাইল্যান্ডে নয় কেপলটনে। কিংস পাইল্যান্ডে ঘোড়া যখন ফেরেনি—তখন কেপলটনেই আছে। —ওই দেখো ঘোড়ার পায়ের ছাপ।'

আসবার সময়ে সিলভার ব্লেজ-য়ের পায়ের নাল সঙ্গে এনেছিল হোমস। পায়ের ছাপের সঙ্গে তা মিলে গেল। পাশেই দেখা গেল থ্যাবড়ামুখো একসারি জুতোর ছাপ। ঘোড়া আর মানুষে কিংস পাইল্যান্ডের দিকে কিছুটা এসে ফের ফিরেছে কেপলটনের দিকে।

চিহ্ন অনুসরণ করে একটা আস্তাবলের সামনে পৌঁছল দুজনে। পাহারাদার ছোকরা তেড়ে এল ওদের দেখে। তারপরেই বেরিয়ে এল আস্তাবলের মালিক। সে আরও রুক্ষ। এই মারে কি সেই মারে।

কিন্তু শার্লক হোমস কি মন্ত্র জানে? চোয়াড়ে লোকটার কানে-কানে কী মন্ত্র বলতেই সাপের ফণা নেমে এল যেন। কুকুরের মতো কেঁউ-কেঁউ করে ঘুরতে লাগল হোমসের পেছন- পেছন। উলটে ধমক দিয়ে হোমস-ই বলে গেল রেসের দিন ঘোড়া যেন হাজির থাকে।

ফেরার পথে হোমস বললে, 'ওয়াটসন, লোকটার পায়ে থ্যাবড়া জুতো লক্ষ করেছ?' কর্নেল রসের কাছে গিয়ে বললে, 'আমরা চললাম। আপনার ঘোড়া রেসে দৌড়োবে।'

কর্নেল তাচ্ছিল্যের সঙ্গে চেয়ে রইলেন। বেরোনোর পথে ভেড়ার পাল দেখে থামল হোমস। ছোকরাটাকে ডেকে জিগ্যেস করলে, 'দিন কয়েকের মধ্যে তোমার ভেড়াদের অসুখ-বিসুখ করেনি? অবাক হয়ে ছোকরা বললে, 'করেছে বইকি। তিনটে ভেড়া খুঁড়িয়ে চলছে।' শুনে ভীষণ খুশি হল হোমস। গ্রেগরিকে ডেকে বললে, 'বৎস, ভেড়াদের অদ্ভুত অসুখটা নিয়ে তলিয়ে ভেবো।'

'আর কিছু উপদেশ দেবেন?' গ্রেগরি বুঝল হোমস রহস্যের কিনারা করে ফেলেছে।

হোমস বললে, 'কুকুরটার অদ্ভুত আচরণ নিয়েও ভেবে দেখো।'

'কুকুর! সে তো রাতে চেঁচায়নি।'

'সেইটাই তো অদ্ভুত ব্যাপার!'

নির্দিষ্ট দিনে একটা অন্য ঘোড়া সিলভার ব্লেজ-য়ের জায়গায় দৌড়ে বাজি জিতল। অন্য ঘোড়া মনে হল এই কারণে যে সিলভার ব্লেজ-য়ের যেখানে-যেখানে সাদা দাগ থাকা উচিত সেখানে তা নেই।

হোমস কিন্তু বললে কর্নেল রসকে, 'মদ দিয়ে ধুয়ে দিন ওই জায়গাগুলো। সাদা দাগ বেরিয়ে পড়বে। ঘোড়া যে লুকিয়ে রেখেছিল। সে পাকা জোচ্চোর। ঘোড়া ফিরিয়ে দিতে এসেও লুকিয়ে রেখেছিল ভোল পালটে মাঠে নামাবে বলে। ওই জন্যে সব আস্তাবল সার্চ করেও সিলভার ব্লেজ-কে দেখতে পায়নি গ্রেগরি।'

'কিন্তু স্ট্রেকারকে খুন করল কে?' শুধোলেন কর্নেল রস।

'সে তো আমাদের সঙ্গেই রয়েছে।'

খেপে গেলেন কর্নেল। হোমস তখন সিলভার ব্লেজয়ের পিঠ চাপড়ে বললেন, 'ভারী বুদ্ধিমান ঘোড়া। স্ট্রেকার মেয়েমানুষের খপ্পরে পড়েছিল। তাই বিশ গিনির পোশাক কিনে দিতে হত। দেনায় ডুবে টাকার লোভে ঠিক করেছিল সিলভার ব্লেজয়ের পেছনের 'টেন্ডন' একটু চিড়ে দেবে গভীর রাতে। শুধু চোখে ধরা যাবে না। কিন্তু খোঁড়া হয়ে যাবে বিখ্যাত ঘোড়া। ওই জন্যেই ছানিকাটা ছুরি আর মোমবাতি রেখেছিল সঙ্গে। তাড়া খেয়ে ফেলে যাওয়া সিম্পসনের গলাবন্ধ তুলে নিয়েছিল ঘোড়ার পা বাঁধবে বলে। কিন্তু ঘোড়াদের অদ্ভুত অনুভূতি ওদের অনেক বিপদ থেকে বাঁচায়। মাঠের মধ্যে ঘোড়া নিয়ে গেল স্ট্রেকার—দাপাদাপিতে ছোকরাদের ঘুম ভেঙে যেতে পারে—এই ভয়ে। কিন্তু দুরভিসন্ধি আঁচ করে সিলভার ব্লেজ চাট মেরে খুলি গুঁড়িয়ে দিল ট্রেনারের—পড়বার সময়ে হাতের ছুরি আপনা থেকেই চিরে দিয়ে গেল দাবনা।'

হে পাঠক হে পাঠিকা! আপনিও কম বুদ্ধিমান নন। বলুন দিকি হোমস কী করে বুঝল কুকর্মের হোতা স্ট্রেকার স্বয়ং?

গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান

এক—কুকুরটা রাতে চেঁচায়নি কেন? চেনা মানুষ দেখেছিল বলে।

দুই—ভেড়া তিনটের খুঁড়িয়ে চলা রোগ হল কেন...ওদের 'টেন্ডন' চিরে দিয়ে স্ট্রেকার হাত পাকিয়েছিল বলে।

** সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত। ২ বৈশাখ, ১৩৮২।*

স্যার আর্থার কোনান ডয়ালের গল্প নিয়ে গোয়েন্দা ধাঁধা

পাঁকে পড়েছে পটের বিবি। শার্লক হোমস

মেয়েটার নাম ভায়োলেট হান্টার।

ভায়োলেট হান্টার বাড়ি গিয়ে ছেলেপুলে মানুষ করার চাকরি করত। কিন্তু কিছুদিন হাতে কাজ নেই।

এমন সময়ে একটা অদ্ভুত চাকরি এল হাতে। মাইনে তিনগুণ। কিন্তু কাজটা যেন কেমন-কেমন। বাচ্ছা মানুষ করতে হবে ঠিকই। দু-বছরের বাঁদুরে বাচ্চা। চটি দিয়ে চটাস-চটাস করে আরশুলা মারতে ওস্তাদ। কিন্তু মাস্টারনিকে মাথার চুল কাটতে হবে কেন? কেন মনিবের মেয়ের জামা পরে এখানে-সেখানে বসে থাকতে হবে?

ঝাড়ু মারি অমন চাকরিতে—বলে পালিয়ে এল ভায়োলেট। চাকরি আগে না চুল আগে? কিন্তু বাড়ি এসে ভাঁড়ার খালি দেখে মন বলল চাকরি আগে। এল শার্লক হোমসের কাছে। চাকরি নেওয়াটা কি ঠিক হবে?

আইবুড়ো হোমস বললে—মোটেই না।

আমতা আমতা করে ভায়োলেট বললে—কিন্তু আমার যে অভাবের সংসার। বরং বেগতিক দেখলে ডেকে পাঠাব। আসবেন তো?

রাজি হল হোমস।

পনেরো দিন পরে ডাক এল। অমুকদিন এগারোটায় ব্ল্যাক সোয়ান সরাইখানায় আসা চাই।

যথাসময়ে দুই বন্ধু এসে পৌঁছল সরাইখানায়। ভায়োলেট সত্যি-সত্যিই মাথার চুল কেটে ফেলেছে। দিন দুয়েক ভালোই কেটেছিল। মনিব ভদ্রলোক চোয়াড়ে হলেও খারাপ ব্যবহার করেননি। মনিবানি তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের তরুণী ভার্যা। প্রথম পক্ষের মেয়ে আমেরিকা চলে গিয়েছে নতুন মায়ের সঙ্গে বনিবনা হয়নি বলে। বিরাট বাড়ি। নাম কপারবিচেস। একটা রাক্ষুসে ডালকুত্তা বাড়ি পাহারা দেয় সারারাত। কুকুর দেখবার ভার যার ওপর নাম তার টলার। ভীষণ মদ খায়।

মনিবের নাম রুক্যালস। মিসেস কিন্তু অষ্টপ্রহর বিষাদ সিন্ধুতে ডুবে রয়েছেন। মাঝে-মাঝে চোখের জলও ফেলেন।

দিন দুই পরে মিসেস মিস্টারের কানে-কানে কী যেন বললেন। অমনি রুক্যালস বললেন—নাও উঠে পড়ো। নীল পোশাকটা পরে এসো। দেখি কেমন মানায়।

হুকুম তামিল করল ভায়োলেট। নিশ্চয় রুক্যালসের প্রথম পক্ষের মেয়ের পোশাক। এসে বসল জানলার দিকে পিঠ করে একটা চেয়ারে। সামনে দাঁড়িয়ে অনেক মজার-মজার কথা বলে ভায়োলেটের পেটের খিল খুলে ছেড়ে দিলেন রুক্যালস।

তারপরের দিনও একই কাণ্ড ঘটল। নীল পোশাক পরে জানলার দিকে পিঠ করে বসে রইল ভায়োলেট। মনিবের হুকুমে এবার বই থেকে কিছু-কিছু পড়ে শোনাতে হল। কিন্তু বেশ মনে হল পেছনে কিছু একটা ঘটছে—যা শুধু মনিব আর মনিবানিই দেখতে পাচ্ছেন।

কুচুটে বুদ্ধিতে ভায়োলেটও কম যায় না। তৃতীয় দিন একটা ভাঙা আয়না রুমালের মধ্যে নিয়ে বসে রইল চেয়ারে। হাসির ফাঁকে রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে গিয়ে আয়নার মধ্যে দিয়ে দেখে নিল পেছনের রাস্তায় ছাই রঙের পোশাক পরা একটা ছোট্ট মানুষ একদৃষ্টে তাকে দেখছে।

মিসেস রুক্যালস তার চালাকি ধরে ফেলেছিলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন কর্তাকে—দেখে তো কে রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্যাট-প্যাট করে দেখছে মিস হান্টারকে।

তাই নাকি? ভায়োলেট ওকে হাত নেড়ে বলো চলে যেতে।

হাত নাড়ল ভায়োলেট। মিসেস সঙ্গে-সঙ্গে পরদা টেনে দিলে জানালায়।

রহস্য আরও জট পাকিয়ে উঠল এরপর। বাড়ির একটা অংশে সবসময়ে তালাচাবি লাগানো থাকত। সেই অংশেরই পেছন দিকের জানলাগুলোর একটা জানলার খড়খড়ি তোলা দেখে খটকা লাগল ভায়োলেটের মনে। বাইরে তালা ঝুলছে কেন? তারপরেই একদিন দেখা গেল নিষিদ্ধ অংশে চুপিসারে ঢুকলেন রুক্যালস—বেরিয়ে এলেন পা টিপে টিপে কিছুক্ষণ পরেই।

অতশত না ভেবে মনিবকে জিগ্যেস করেছিল ভায়োলট—জানলার খড়খড়ি কে তুলে রেখেছে? শুনেই চমকে উঠলেন চোয়াড়ে মনিব। ভুরু কুঁচকে ব্যঙ্গের স্বরে বললেন—তাই নাকি? সবদিকেই নজর আছে দেখছি। ওটা আমার ডার্করুম। বুঝেছ।

রুক্যালসের মেয়ে আগে যে ঘরে থাকত সেই ঘরেই থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল ভায়োলেটের। দৈবাৎ একটা দেরাজ খুলে ফেলেছিল নিজের চাবির গোছা দিয়ে। ভেতর থেকে বেরোল একগোছা ভারী সুন্দর মাথার চুল। তারই মাথার চুল।

নিজের মাথার চুল কেটে ফেলেও দ্বন্দ্ব মিটোনোর জন্যে তোরঙ্গ খুলে দেখল। তোরঙ্গে চুল তুলে রেখেছিল ভায়োলেট। যেখানকার চুল সেখানেই আছে। দেরাজের মধ্যে অবিকল একরকম চুলের গোছাটা তাহলে কার?

এ তো ভারী সমস্যার ব্যাপার। ভায়োলেটের বুকের মধ্যে গুড়গুড়ানি আরম্ভ হল সেই থেকে। এমন সময়ে একদিন দেখা গেল নিষিদ্ধ অংশের দরজায় চাবি ঝুলছে। ভুল করে ঝুলিয়ে গেছেন রুক্যালস। বাচ্চাটাও রয়েছে স্বামী-স্ত্রীর কাছে।

এই তো সুযোগ। টুক করে ভেতরে ঢুকল ভায়োলেট। লম্বা গলি শেষ হয়েছে একটা বন্ধ দরজার সামনে। পাল্লা দুটো বাইরে থেকে হুড়কো দিয়ে পাকাপোক্তভাবে বন্ধ করা। অথচ ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে অন্ধকারের মধ্যে একটা ছায়ামূর্তির নড়াচড়া।

দেখেই ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল ভায়োলেটের। দুপদাপ করে বেরিয়ে এসে পড়বি তো পড় রুক্যালসের দু-বাহুর মধ্যেই। ভদ্রলোক দাঁত কিড়মিড় করে শুধু একটা কথাই বললেন—ফের যদি চৌকাঠ মাড়াতে দেখি তো ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াব বুঝেছ?

খুব বুঝেছিল ভায়োলেট। এ বাড়িতে পা দেওয়ার পরেই রুক্যালস খুব মিষ্টি করে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন বাছুরের মতো প্রকাণ্ড ডালকুত্তাটা দেখিয়ে। রাত্রে বেরোলে আর নিস্তার নেই।

তাই আজ দিনের বেলায় হোমসকে ডেকে এনেছে ভায়োলেট। কর্তাকে মিথ্যে বলে এসেছে। ফিরতে হবে তিনটের মধ্যে। সন্ধ্যায় কর্তা-গিন্নি অবিশ্যি বাড়ি থাকবেন না। টলার মদ খেয়ে বেহুঁশ। কুকুরটা ঘরে বন্ধ।

লাফিয়ে উঠল হোমস—তাই তো চাই। আপনি বাড়ি গিয়ে টলারের বউকে ঘরে পুরে শেকল তুলে দেবেন। সাতটার সময়ে আমরা আসছি।

ঠিক সাতটায় এল দুই বন্ধু। রহস্যে ঘেরা অন্ধকার পুরিতে প্রবেশ করে গায়ের জোরে সেই বিশেষ দরজাটা ভেঙে কী দেখল?

পাখি উড়েছে। স্কাইলাইট খোলা—একটা মই নেমে গেছে বাইরে।

আচমকা বজ্রনাদ করে আবির্ভূত হলেন রুক্যালস। বাইরের লোকজন আর ভাঙা দরজা দেখেই দৌড়ে গিয়ে খুলে দিলে ডালকুত্তাকে।

ফলটা হল সাংঘাতিক। দু-দিনের উপোসী ডালকুত্তা খ্যাঁক করে কামড়ে ধরল মনিবের টুটি। ওয়াটসন গুলি করে মারল ডালকুত্তাকে। মিসেস রুক্যালস ছুটলেন ডাক্তার ডাকতে।

শেকল খুলতেই বেরিয়ে এল টলারের তালগাছ বউ। বিরক্ত হয়ে বললে—এত কাণ্ডর দরকার ছিল না। আমাকে বললেই তো হত।

জানি, বললে হোমস। আপনিই আজকের নাটকের জোগাড়যন্ত্রর করেছেন। স্বামীকে মদ খাইয়ে বেহুঁশ রেখেছেন। স্কাইলাইটের সামনে মই রেখে ওদের পালাতে সুযোগ দিয়েছেন।

কাদের?

গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান

রুক্যালসের প্রথম পক্ষের মেয়ে আর তার হবু বরকে।—বিয়ে করলে মেয়ের ভাগের সম্পত্তি পাছে হাতছাড়া হয়ে যায়, তাই একটা দলিল সই করিয়ে নিতে চেয়েছিল রুক্যালস। চূড়ান্ত অত্যাচার করেছে—মেয়ে রাজি হয়নি। এদিকে তার হবু বরকেও ঠান্ডা রাখা দরকার। তাই ভায়োলেটকে দিয়ে মেয়ের পার্ট করিয়েছে ছোকরাকে ভুলিয়ে রাখবার জন্যে। কিন্তু টলারের বউ যে তলায়-তলায় হবু বরের টাকা খেয়ে কাজ এগিয়ে রেখেছে তা কে জানত?

সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত। ১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮২।

অদ্রীশ বর্ধনের গল্প নিয়ে গোয়েন্দা ধাঁধা

ঘেঁটু পুজোতে ঢোল সানাই। ইন্দ্রনাথ রুদ্র

সাংবাদিক তদন্তকে নিয়ে ইন্দ্রনাথ গিয়েছিল কলকাতার একটা বিখ্যাত প্রমোদ মহলে। সুরা এবং সাকীর জন্যে বিলক্ষণ সুনাম আছে প্রতিষ্ঠানটির। অবসর মুহূর্তকে রঙিন করে তোলার প্রয়াসে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে এখানে।

সাংবাদিক তদন্ত অথবা ইন্দ্রনাথের সোমরস সম্বন্ধে ছুঁচিবাই না থাকলেও পরি সম্বন্ধে অ্যালার্জি আছে। তা সত্বেও এসেছে ক্যাবারে নাচে ছন্দিত, উদ্দাম জাজসঙ্গীতে মুখরিত হলঘরটির মধ্যে। দাঁড়িয়ে আছে ঘরের এককোণে—যেখান থেকে সবাইকে শ্যেনচোখে দেখা যায়—কিন্তু ওদের দেখা যায় না।

হঠাৎ কাঁধে হাত রাখল ইন্দ্রনাথ। চোখ ফেরাল তদন্ত। ইন্দ্রনাথ গল গল করে ধোঁয়া ছাড়ছে নাকমুখ দিয়ে—চোখ দুটো কিন্তু ধোঁয়ার পরদা ভেদ করে তাকিয়ে আছে দরজার দিকে।

উর্দিপরা দ্বাররক্ষক দরজা খুলে ধরেছে সসম্মানে। খোলা দরজার মধ্যে দিয়ে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে ডানহাতে একটা ছড়ি নিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী পরেশনাথ পুরকায়স্থ।...

পরেশনাথ পুরকায়স্থ।...

তিনদিন আগে একটি অঘটন ঘটেছিল তাঁর বাড়িতে।

ভদ্রলোক গবেষণা করছিলেন অন্য বিষয় নিয়ে কিন্তু কোত্থেকে কী যে হয়ে গেল—আবিষ্কার করে ফেললেন আর একটা জিনিস। জন্মনিয়ন্ত্রণ বটিকা—তাও এই বাংলারই ফেলে দেওয়া গাছগাছড়ার রস থেকে।

বুঝুন ঠ্যালা। একেই বলে পুরুষস্য ভাগ্যম...। অজ পাড়াগাঁয়ে টোঁ-টোঁ করে খাল বিল ডোবার ধার থেকে আজেবাজে আগাছা জোগাড় করে নিংড়ে রস বার করেছিলেন পরেশনাথ। সেই রস স্তন্যপায়ী জীবদের রক্তে ঢুকিয়ে দিয়ে দেখছিলেন গ্ল্যান্ডের ওপর কী রিঅ্যাকসন হয়। একদিন দু-দিন নয়—ঝাড়া দুটি বছর খালি রস নিংড়েছেন, সলিউসন বানিয়েছেন, ছুঁচ, ফুটিয়েছেন।

বছর দুই পরে ডাইরির পাতায় নতুন করে চোখ বুলোতে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল পরেশনাথ পুরকায়স্থর। ডাইরি তিনি দেখেন রোজই। রোজকার গবেষণা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে লিখে রাখেন। যাদের গায়ে ওষুধ ফুঁড়ে এক্সপেরিমেন্ট করছেন, তাদের খবরাখবর মোটামুটি লিখে রাখেন। খুঁটিয়ে লিখতেন কেবল যা তাঁর লক্ষ, সেই সম্পর্কিত তথ্যাবলী।

তাই একদম খেয়াল ছিল না আরেক দিকে—যা নিয়ে গবেষণা করার কথা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। বুঝতে পারছেন? জন্মনিয়ন্ত্রণ! এক...দুই...তিন...ব্যস—আর না।

দুটি বছর এক নাগাড়ে এক্সপেরিমেন্ট চালিয়ে হিমসিম খেয়ে যাওয়ার পর আনমনে ডাইরির পুরোনো পাতা উলটোতে গিয়ে পুরকায়স্থ দেখলেন—কেয়া বাত। যাদের নিয়ে গবেষণা—সেই মহিলারা তো প্রত্যেকেই মাথায় সিঁদুর হাতে লোহা-শাঁখা পরে বসে আছে। নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েছেলে—বছর বছর বাচ্ছা বিয়োনোর কথা। অথচ মা ষষ্ঠীর দুয়োর মাড়ায়নি কেউ।

কিমাশ্চর্যম। ভীষণ সন্দেহ হল পুরকায়স্থর। স্বামীগুলোকে ধরে দারুণ তদন্ত করে জানলেন, সত্যি সত্যিই কেউ পরমহংস হয়নি। অথচ...

খবরটা যেদিন কাগজে বেরোল, সেইদিনই সন্ধ্যায় কতকগুলো বদমাস লোক হামলা করে গেল তাঁর ল্যাবরেটরিতে। লণ্ডভণ্ড হল কাগজপত্র চুরমার হয়ে গেল গবেষণার যন্ত্রপাতি—কিন্তু কিছুতেই বার করা গেল না কোন আগাছাটির দৌলতে এত বড় আবিষ্কার করে ফেলেছেন পুরকায়স্থ।

বৈজ্ঞানিক হলেই যে কাঁচাখোলা হতে হবে, এমন কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নেই। পরেশনাথ পুরকায়স্থও ভারী গুছোনো মানুষ। আটঘাট না বেঁধে কাজে হাত দেন না। খবরের কাগজে খবর ছাপিয়ে বাহাদুরি নেওয়ার আগেই নিজের ঘর সামলেছিলেন। আগাছাটির নামধাম নিদর্শন—সব সরিয়ে ফেলেছিলেন।

বদমাস লোকগুলো তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল সেয়ানা পাগলের হুঁশিয়ারিতে। বলল—ঠিক হ্যায়। গুলি মারো ফরমুলাকে। চলো হামারা সাথ! আঙুলের ডগা থেকে সাঁড়াশি দিয়ে নখ উপড়ে আনলেই সড়াৎ করে ফরমুলা হড়কে আসবে গলা দিয়ে।

নির্ঘাত কিডন্যাপড হয়ে যেতেন পুরকায়স্থ। কিন্তু ফটোইলেকট্রিক সেল চালিত অদৃশ্য চোখ স্পর্শ করেছিল একজন দুশমন। দুমদাম বোমা ফাটার আওয়াজ হতে লাগল বাড়িময়—ঢং-ঢং ঘণ্টা বাজতে লাগল পাগলা ঘন্টির মতো—সবই কিন্তু টেপরেকর্ডের খেলা—অদৃশ্য চোখ সংযুক্ত ম্যাগনেটিক টেপ-য়ের কারসাজি।

কিন্তু ভড়কে গেল দুশমনরা। ফস করে রিভলভার বার করে দড়াম করে গুলি চালাল বৈজ্ঞানিকের বাঁ-পায়ে এবং গাড়ি চেপে ভোঁ করে মিলিয়ে গেল লোকজন ছুটে আসার আগেই।

চোট খেয়েও নিপাত্তা হয়ে গেলেন পুরকায়স্থ। পরের দিন থেকে সাংবাদিকরা শকুনির পালের মতো ছিঁড়ে খেতে এল তাঁকে। এসে দেখল ভোঁ ভাঁ। বৈজ্ঞানিক হাওয়া।

মুখ চুন হয়ে গেল খবরের কাগজওয়ালাদের। এমনিতেই খবরের বাজার বড্ড মন্দা যাচ্ছে। মিথ্যে খবর সত্যির মতো করে ছেপেও চনমন করানো যাচ্ছে না পাঠকদের মস্তিষ্ক। আর এই তরতাজা খবরের পাঁপড় ভাজা উৎসটি কিনা ফুস করে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল বিনা নোটিশে।

কথায় বলে, একশোটা শকুন মরে একজন সাংবাদিক হয়। এত সহজে ছাড়বার পাত্র নয় তারা। খবরটা যে আগে জানতে পারবে—তার বরাতে লক্ষ্মী নাচবে আপনা থেকেই। কাজেই তদন্ত এসে ধরল ইন্দ্রনাথকে। বড়ি খেয়ে ব্যর্থ কন্ট্রোল করতে গিয়ে অনেকরকম বিভ্রাট খাস মার্কিন মুলুকেও দেখা যাচ্ছে। কিন্তু পচা বাংলার আদাড়ে-পাঁদাড়ে এমন খাসা গাছড়া আছে কে জানত। প্রায় নিখরচায় স্বদেশি ভেষজে জন্মনিয়ন্ত্রণ—কুফল নেই মোটেই।

এ হেন পরেশনাথ পুরকায়স্থকে চোখের সামনে দেখে তাই উত্তেজনায় দম আটকে এল তদন্তের। ইন্দ্রনাথ কিন্তু চোখ কুঁচকে দেখছিল পুরকায়স্থ মশায়ের বাঁ-পা টেনে-টেনে চলার ধরন...একটু পরেই দেখা গেল সে ফিকফিক করে হাসছে।

তদন্ত করল তদন্ত—হাসি কেন?

অভিনয় দেখে।

কার অভিনয়?

প্রাণকুমারের অভিনয়।

বলে হন-হন করে এগিয়ে গিয়ে পরেশনাথ পুরকায়স্থর কাঁধে হাত রাখল ইন্দ্রনাথ—অভিনন্দন নিন।

বোঁ করে ঘুরে গিয়ে শুঁয়োপোকা ভুরুর তাণ্ডব নাচ দেখিয়ে ভস্মলোচন দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন পুরকায়স্থ।

কিন্তু ভারী অমায়িক হেসে ইন্দ্রনাথ বললে—নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছি না—এত সুন্দর অভিনয়...এত নিখুঁত ছদ্মবেশ—সাবাস প্রাণকুমার।

প্রাণকুমার। শুঁয়োপোকা ভুরুজোড়া মাথা ঠোকাঠুকি করে স্ট্রেটলাইন হয়ে গেল চক্ষের নিমেষে—আমার নাম পরেশনাথ...

নো ম্যান, নো—নেভার। ওটা আপনার বাইরের খোলস। রিপোর্টার এড়ানোর চমৎকার ফন্দি বানিয়েছেন ভদ্রলোক। পরেশনাথ পুরকায়স্থ আছেন ল্যাবরেটরিতেই। কিন্তু ঘেঁটু পুজোতে ঢোল সানাইয়ের দরকার কী?

বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না? তবে হ্যাঁ তদন্তকে বেশ ভড়কে দিয়েছেন। আমাকেও দিতেন—যদি না—।

যদি না...কি? পারলেন না তো?

গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান

পরেশনাথ পুরকায়স্থর বাঁ পায়ে গুলি লেগেছিল। সুতরাং বাঁ-দিকের দেহের ভর রাখার জন্যে ছড়িটা তাঁর বাঁ হাতে থাকা উচিত। কিন্তু তিনি প্রমোদ মহলে ঢুকলেন ডানহাতে ছড়ি নিয়ে। সন্দেহ হল সন্দেহবাজ ইন্দ্রনাথের। তারপর পুরস্কার পাওয়া শ্রেষ্ঠ অভিনেতাকে চেনা কি খুব কঠিন?

** সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত। ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮২।*

স্যার আর্থার কোনান ডয়ালের গল্প নিয়ে গোয়েন্দা ধাঁধা

ফিরোজা নিয়ে ফেরেববাজি। শার্লক হোমস

আগের রাতে খুব বরফ পড়েছিল লন্ডনে। বরফ জমা রাস্তার ওপর দিয়ে তুর্কি নাচ নাচতে-নাচতে এক ভদ্রলোক এলেন শার্লক হোমসের আস্তানায়।

কাল রাতে তাঁর সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে।

'কী সর্বনাশ?' শুধোল হোমস।

'বেরিল-মুকুটের নাম শুনেছেন তো? জাতীয় সম্পত্তি বললেই চলে। উনচল্লিশটা অমূল্য বেরিল রত্ন আছে তাতে। একটা রত্ন হারালেও জোড়া খুঁজে পাওয়া যাবে না। কাল রাতে মুকুট থেকে খোয়া গেছে তিন-তিনটে রত্ন।'

'কী করে?'

'আমি ব্যাঙ্কার। আমার নাম আলেকজান্ডার হোল্ডার। গতকাল মুকুটটা বন্ধক রেখে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড নিয়ে গেলেন মুকুটের মালিক—কথা রইল চারদিন পর ছাড়িয়ে নিয়ে যাবেন। ব্যাঙ্ক লুঠ আকছার হচ্ছে বলে মুকুটটা আমি বাড়ি নিয়ে এলাম। দেরাজে রাখলাম। রাত্রে খেতে বসে আমার অপোগণ্ড ছেলে আর্থার আর মা লক্ষ্মী ভাই-ঝি মেরীকে বললাম মুকুটের কথা। সুন্দরী ঝি লুসী হয়তো বাইরে থেকে সে কথা শুনেছিল। হাসতে-হাসতে আর্থার অবিশ্যি বলেছিল গুদোমের তাকে রাখা চাবি দিয়ে দেরাজ নাকি খোলা যায়। ও নিজে খুলেছে ছেলেবেলায়।

আর্থার মা-মরা ছেলে। আর বিয়ে করিনি। আদর দিয়ে নিজেই তার মাথা খেয়েছি। এখন ক্লাবে গিয়ে অনেক কাপ্তেন বন্ধু পাকড়েছে। যখন-তখন টাকা চায়। জুয়ো খেলতেও শিখেছে। স্যার জর্জ বার্নওয়েল ওর বড় দোস্ত। অতি পাজি নচ্ছার লোক। প্রায় বাড়ি আসে। আর্থার ওর খপ্পর থেকে বেরোতে পারছে না। সে ছাড়া বাড়িতে অন্য কেউ আসে না।

মেরীর বাপ-মা নেই। আমার কাছেই মানুষ। বড় ভালো মেয়ে। দু-দুবার আর্থার ওকে বিয়ের প্রস্তাব জানিয়েছে। রাজি হয়নি মেরী। হলে এই সর্বনাশ হত না। আর্থারকে ভালো করতে পারে কেবল সে-ই।

ঝিয়েরা সব পুরোনো লোক। আলাদা থাকে। লুসীই নতুন। কাজের মেয়ে। কিন্তু রূপসি বলে অনেক ভোমরাকে আশেপাশে ঘুরঘুর করতে দেখা যায়।

কাল রাতে খাওয়াদাওয়ার পর আর্থার এসে ফের দুশো পাউন্ড চাইল। হাঁকিয়ে দিলাম। মুখ কালো করে চলে গেল বটে কিন্তু পথে বসিয়ে গেল আমাকে।

শুতে যাওয়ার আগে আমি নিজে সারা বাড়ির দরজা-জানলা বন্ধ আছে কিনা দেখে নিচে নেমে দেখলাম জানলা খুলে দাঁড়িয়ে আছে মেরী। আমাকে দেখেই পাল্লা বন্ধ করে দিয়ে বললে, লুসী ফের রাস্তায় বেরিয়েছিল। ওকে একটু বকা দরকার।

মাঝরাতে দড়াম করে দরজা বন্ধ করার আওয়াজ শুনে ঘুম ভেঙে গেল আমার। পাশের ঘরে খসখস আওয়াজ শুনে এসে দেখি আর্থার মুকুট ভাঙবার চেষ্টা করছে দেরাজের সামনে দাঁড়িয়ে। খালি পা। পরনে নাইট ড্রেস। চোর-চোর করে চেঁচিয়ে উঠলাম। আমার চিৎকারে আর্থার ভীষণ রেগে উঠল। মুকুট কেড়ে নিয়ে

দেখলাম, কোণটা ভাঙা। তিনটে বেরিল রত্ন উধাও। চিৎকার শুনে মেরি ছুটে এসেই অজ্ঞান হয়ে গেল কোণ ভাঙা রত্নমুকুট দেখে।

পুলিশ ডেকে আর্থারকে ধরিয়ে দিলাম। আর্থার কিন্তু রেগেমেগে যেন আমাকেই মারতে এল। রত্ন তিনটে কোথায় কিছুতেই বলল না। পুলিশও বলছে, রত্ন উদ্ধার তাদের ক্ষমতায় কুলোবে না। মিস্টার হোমস, আমাকে বাঁচান।'

শার্লক হোমস সব শুনে অদ্ভুত কথা বলে বসল, 'আর্থার বেঁকা মুকুটকে সোজা করবার চেষ্টা করেনি তো?'

শুনে তো ব্যাঙ্কারমশায় রেগে কাঁই, 'কী! আপনি আমার বকাটে ছেলের পক্ষ নিয়ে কথা বলছেন?'

'আচ্ছা আর বলব না। চলুন আপনার বাড়ি যাওয়া যাক।'

যাওয়ার পথে গুম হয়ে বসে রইল হোমস। ব্যাঙ্কারের বাড়ি পৌঁছে পকেট থেকে বার করল মস্ত একটা আতস কাঁচ। যে জানলার সামনে মেরীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন ব্যাঙ্কার তার গোবরাট আর ফ্রেম দেখল খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে। তারপর নেমে গেল বাড়ির পাশে আস্তাবলের সামনেকার সরু গলিটায়। পুলিশ নাকি সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে দেখেছে—বাইরে উঁকিও মারেনি।

ওয়াটসন রইল বাড়ির মধ্যে। কিছুক্ষণ পরেই ঘরে ঢুকল মেরী। মুখ অতি বিষণ্ণ। ব্যাঙ্কারকে বললে মিনতি করে, 'আর্থার নির্দোষ। ওকে ছাড়িয়ে আনুন।' কিন্তু ব্যাঙ্কার কোনও কথাতেই কান দিলেন না। এমন সময়ে বুট থেকে বরফ ঝাড়তে-ঝাড়তে ফিরে এল শার্লক হোমস। মেরীকে দেখে জিগ্যেস করল, 'লুসী রান্নাঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে যার সঙ্গে কথা বলছিল তার একটা পা কাঠের তৈরি, তাই না?' শুনে হেসে ফেলল মেরী—'হ্যাঁ। তরকারিওলার একটা পা কাঠেরই বটে' হোমস কিন্তু হাসল না।

গেল ওপরে। গুদোম ঘরের তাকে রাখা চাবি দিয়ে দেরাজ খুলে রত্নমুকুট হাতে নিয়ে বললে ব্যাঙ্কারকে, 'মশায় আপনি এর আরেকটা কোণ ভাঙতে পারবেন?' আঁতকে উঠলেন ব্যাঙ্কার। হোমস ততক্ষণে গায়ের জোর দিয়ে কোণ ভাঙতে আরম্ভ করে দিয়েছে। কিন্তু না পেরে বললে, 'দেখলেন তো? যদিও বা কেউ ভাঙতে পারে এমন জোর আওয়াজ হবে যে পাশের ঘর থেকে ঠিকই শুনতে পাবেন।'

'তাহলে?' ঢোঁক গিলে বললেন ব্যাঙ্কার।

'আপনার ছেলে আর যাই হোক চোর নয়।' বলে ভদ্রলোককে ফের রাগিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল হোমস। যাওয়ার আগে বলে গেল, 'কাল সকাল নটায় আসবেন বাসায়।'

বেকার স্ট্রিটে ফিরেই হোমস ছদ্মবেশ ধরল। লোফারের ছদ্মবেশ। বেরিয়ে গেল শিস দিতে-দিতে। অনেকক্ষণ পরে ফিরে এসে একজোড়া বুট ওয়াটসনের সামনে ছুড়ে দিয়ে আবার নামল রাস্তায়। সারারাত বাইরে থেকে ফিরল পরের দিন ভোরে।

নটার সময়ে ব্যাঙ্কার ভদ্রলোক আসতেই হোমস বললে, 'এক-একটা বেরিল রত্নের জন্যে হাজার পাউন্ড দিতে রাজি?'

'দশ হাজার দেব।'

'অত চাই না। এই নিন কলম। চেক বার করুন। লিখুন চার হাজার পাউন্ড—আমার পারিশ্রমিক সমেত। বা:,' উঠে গিয়ে দেরাজ খুলে রত্নমুকুটের ভাঙা কোণটা এনে ব্যাঙ্কারের সামনে ছুড়ে দিয়ে বললে, 'খুশি?'

আলেকজান্ডার হোল্ডারের তখন হয়ে এসেছে। দু-চোখ প্রায় ঠেলে বেরিয়ে আসে আর কি! হোমস কি তুকতাক জানে?

গম্ভীর কণ্ঠে বললে হোমস, 'আর একটা ঋণশোধ বাকি রইল আপনার।'

খপ করে চেক-বই তুলে নিয়ে বললেন ব্যাঙ্কার, 'বলুন কত পাউন্ড?'

'পাউন্ড নয়—ক্ষমা চাইতে হবে। আপনার ছেলের কাছে। আর্থার ছিল বলেই রত্নমুকুট ফিরে পেয়েছেন। নইলে পুরোটাই যেত। দুশো পাউন্ড না চেয়ে পায়নি বেচারি। ঘুম আসছিল না রাত্রে। এমন সময়ে শুনল বাড়ি থেকে জানলা-পথে পাচার হয়ে গেল রত্নমুকুট। দেখে আর চুপ করে থাকতে পারেনি। জানলা দিয়ে

লাফিয়ে পড়ে বেদম ঠেঙিয়ে চোরের হাত থেকে ছিনিয়ে আনে রত্নমুকুট। চোরের মাথা ফেটে যায় ওর মারে —হাতের মধ্যে থাকে শুধু মুকুটের ভাঙা কোণ। জানলা দিয়ে বাড়ি ঢুকে দড়াম করে পাল্লা বন্ধ করে দোতলায় উঠে ভাঙা মুকুটের কোণ সিধে করার চেষ্টা করছিল আর্থার—আপনি তাকে চোর বলায় আর মুখ খোলেনি।'

'কিন্তু আপনি জানলেন কী করে?'

'দেখলাম গলির বরফে জুতো পরে কে যেন পায়চারি করেছে—আর একজন খালি পায়ে সেই দাগ মাড়িয়ে গিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। দেখলাম জুতো পায়ে লোকটা দৌড়ে পালিয়েছে—রক্তের ফোঁটা পড়তে পড়তে গেছে। গোবরাট পরীক্ষা করে দেখলাম আর্থার জানলা দিয়েই লাফিয়ে নেমেছিল। তাই ছদ্মবেশে চোরের বাড়ি গিয়ে চাকরের সঙ্গে ভাব জমিয়ে মনিবের একজোড়া বুট জোগাড় করলাম। আপনার গলিতে এসে পায়ের ছাপের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলাম। ফিরে গিয়ে চ্যালেঞ্জ করলাম চোরকে। এমনিতেই তার মাথা ফেটেছিল। তারপর আমার রিভলভার দেখে উগড়ে দিল রত্নের হদিশ। বিক্রি করেছিল ছ'শ পাউন্ডে—আমি কিনে নিলাম হাজার পাউন্ডে।'

কিন্তু চোর কে? কে রত্নমুকুট পাচার করেছিল তার হাতে? রাগে ফেটে পড়লেন ব্যাঙ্কার।

আপনি কিন্তু ধরে ফেলেছেন—তাই না?

গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান

রাত্রে দরজা বন্ধ করতে এসে কাকে জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন আলেকজান্ডার হোল্ডার?—মেরীকে। ভাঙা মুকুট দেখেই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল কে?—মেরী।

বাড়িতে কেউ আসে না একজন ছাড়া। কী তার নাম?—স্যার জর্জ বার্নওয়েল। পাজি নচ্ছার বদমাস।

সরলা মেরী পটে গিয়েছিল এই বদমাসের মিষ্টি বচনে। শুতে যাওয়ার আগে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে প্রাণের মানুষকে জানিয়েছিল রত্নমুকুটের বৃত্তান্ত। শুনেই প্রেয়সীর কাছে মুকুট ভিক্ষা করেছিল স্যার জর্জ।

মেয়েরা সব পারে—প্রেমে পড়লে। সুতরাং কাকামণিকে পথে বসাতে দ্বিধা করল না মেরী। গভীর রাতে মুকুট এনে তুলে দিল পরমপ্রিয়কে। ওপর থেকে আর্থার দেখল, স্তম্ভিত হল, কিন্তু উপস্থিত বুদ্ধি হারাল না। খামোকা চোর বদনাম শুনেও ফাঁসিয়ে দিল না মেরীকে।

কিন্তু মেরী কোথায়? কর্মফল ভোগ করতে পালিয়েছে স্যার জর্জের সঙ্গে।

** সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত। ১৩৮২।*

সত্যজিৎ রায়ের গল্প নিয়ে গোয়েন্দা ধাঁধা

রয়াল বেঙ্গল রহস্য। ফেলুদা

সক্কালবেলা লালমোহন গাঙ্গুলি ওরফে জটায়ু এসে হাজির। ভদ্রলোকের হাইট মোটে পাঁচফুট পাঁচ ইঞ্চি, অনর্গল ভুল ইংরেজি বলেন, ভুল তত্ব দিয়ে রগরগে রোমাঞ্চ গল্প লেখেন। বাজারে দারুণ কাটতি তাঁর বইয়ের। এক-একখানা বইয়ের চার-পাঁচটা এডিশন হয়ে গেছে এবং তিনি আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছেন।

এহেন লালমোহনবাবু এসে বললেন, 'জঙ্গলে যাবেন?'

ফেলুদা তক্তাপোশের ওপরে উঠে বসে বললেন, 'আপনার জঙ্গলের ডেফিনিশন?'

'সেন্ট পারসেন্ট জঙ্গল। যাকে বলে ফরেস্ট।'

'কোথায়?'

'ডুয়ার্সে। মহীতোষ সিংহরায়ের নাম শুনেছেন তো? জবর শিকারি। অনেক বই লিখেছেন। এই দেখুন চিঠি লিখে ইনভাইট করেছেন আপনাকেও।'

ফেলুদা কিছুক্ষণ চিঠিটার দিকে চেয়ে থেকে বললে, 'ভদ্রলোক কি বৃদ্ধ?'

'নো স্যার।'

'সইটা দেখে বুড়ো বলে মনে হয়েছিল। চিঠিটা অন্যের লেখা।'

নিউজলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে ফেলুদা, তোপসে আর লালমোহনবাবুকে নিতে এলেন যে ভদ্রলোক নাম তাঁর তড়িৎ সেনগুপ্ত। বয়স তিরিশ। সাহিত্যের ডিগ্রি আছে। মহীতোষবাবুর সেক্রেটারি। শিকারের বইগুলো উনিই শুনে-শুনে লিখে যান—মহীতোষবাবুর হাতের লেখা ভালো নয় বলে।

সিংহরায় প্যালেসে গাড়ি পৌঁছতেই মহীতোষবাবু নিজে ওদের খাতির করে নিয়ে গেলেন বৈঠকখানায়। ভদ্রলোক দারুণ ফরসা, চুল পাকা, চওড়া চোয়াল, চওড়া কাঁধ, চাড়া দেওয়া গোঁফ। গলার ডাক বাঘের ডাকের মতো। রীতিমতো ঢ্যাঙা।

মহীতোষবাবুরা তিনপুরুষের শিকারি। ঠাকুরদা আদিত্যনারায়ণ বাঘের হাতে মারা গেছেন, বাবাও তাই। মহীতোষবাবু তাই নিজের দেশের জঙ্গলে শিকার করেন না—আসাম আর উড়িষ্যার জঙ্গলে গিয়ে বাঘ মারেন। বাঘ মেরেছেন একাত্তরটা, লেপার্ড পঞ্চাশের ওপর। শিকারের কাহিনি লিখতে আরম্ভ করেন পঞ্চাশ বছর বয়েসে। এর মধ্যেই এত নাম।

বৈঠকখানায় আলাপ হল শশাঙ্ক সান্যালের সঙ্গে। মহীতোষবাবুর বাল্যবন্ধু। ওঁর কাঠের কারবার দেখাশুনা করেন। চেহারায় আর হাবভাবে আশ্চর্য বেমিল। মাথায় তেমন ঢ্যাঙা নন, কথা বলেন নীচু গলায়, চুপচাপ শান্ত স্বভাবের মানুষ।

প্রাথমিক গল্পগুজবের পর বিশ্রাম নিতে দোতলায় উঠল ফেলুদা, তোপসে, লালমোহনবাবু। সেই সময়ে দেখা গেল বেগুনি ড্রেসিং গাউন পরা আর একজন তালঢ্যাঙা পুরুষকে। মাথার চুল বেবাক সাদা।

মহীতোষবাবুর দাদা। দেবতোষবাবু। বদ্ধ উন্মাদ।

বিকেলের দিকে জিপে করে জঙ্গলে বেড়িয়ে এল সবাই। কাকর হরিণের ডাক শোনা গেল বটে, বাঘ দেখা গেল না। ম্যানঈটার আসছে শুনেই অবশ্য গা ঠান্ডা হল লালমোহনবাবুর।

বাড়ি ফেরার পর মহীতোষবাবু ওদের নিয়ে গেলেন ঠাকুরদার ঘরে। শেষ বয়েসে তিনি পাগল হয়ে গিয়ে একটা তলোয়ার দিয়ে বাঘ মারতে ছুটেছিলেন। তলোয়ারটা আলমারিতেই রয়েছে অন্যান্য ছুরি ছোরার সঙ্গে।

হাতির দাঁতের একটা বাক্স বার করলেন মহীতোষবাবু। ভেতরে ভাঁজ করা কাগজ। কাগজে লেখা একটা উদ্ভট ছড়া :

মুড়ো হয় বুড়ো গাছ
হাত গোণ ভাত পাঁচ
দিক পাও ঠিক ঠিক জবাবে।
ফাল্গুন তাল জোড়
দুই মাঝে ভুঁই ফোঁড়
সন্ধানে ধন্দায় নবাবে।

মহীতোষবাবু বললেন, 'ডিটেকটিভদের অনেক ক্ষমতা থাকে। হেঁয়ালির সমাধান করতে পারেন, মিস্টার মিত্তির?'

ফেলুদার ভালো নাম প্রদোষ মিত্র। বলল, 'গুপ্তধনের ইঙ্গিত রয়েছে শেষের লাইনে। এ সঙ্কেতের কথা আর কে জানে?'

'আমি, শশাঙ্ক আর তড়িৎ।'

তড়িৎ সেনগুপ্ত মারা গেল সেই রাতেই। ঘটনাটা ঘটল এইভাবে।

শুতে উঠে দেবতোষবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ফেলুদার। ভদ্রলোক কাছে এসে আবোল তাবোল কথা বলতে-বলতে অদ্ভুত একটা কথা বললেন, 'যুধিষ্ঠিরের রথের চাকা মাটি ছুঁত না। তাও শেষটায় ছুঁল।' তার আগে বললেন, 'হাতিয়ার কি আর সবাইয়ের হাতে বাগ মানে? সবাই কি আর আদিত্যনারায়ণ হয়?'

ফেলুদা লক্ষ করল, ভদ্রলোকের খড়মের তলায় রবারের সাইলেন্সার লাগানো।

রাত এগারোটায় শোনা গেল মহীতোষবাবুর চাপা ধমকানি।

'আমি শেষবারের মতো বলছি—এর ফল ভালো হবে না।' কিন্তু কাকে ধমকাচ্ছেন তা বোঝা গেল না।

গভীর রাতে দেখা গেল কালবুনির জঙ্গলে একটা টর্চের আলো ঘোরাফেরা করছে। বিদ্যুতের আলো জ্বলছে আকাশে। বৃষ্টি আসছে।

'হাইলি সাসপিশাস,' চাপা গলায় বললেন লালমোহনবাবু।

টর্চ নিভে গেল। শোনা গেল কানফাটা বাজের আওয়াজ।

খবর এল সকালবেলায়। তড়িৎবাবুকে বাঘে খেয়েছে। ম্যানঈটার।

তক্ষুনি জিপে করে সবাই গেলেন জঙ্গলে। তড়িৎবাবুর আধখাওয়া দেহ যেখানে পড়ে, তার ধারেকাছে বাঘের দাগ অবিশ্যি পাওয়া গেল না। বৃষ্টির জলে ধুয়ে গেছে।

কিন্তু একটা আশ্চর্য আবিষ্কার করল ফেলুদা। তড়িৎবাবুর বুকে বাঘের আঁচড়ের দিকে তাকিয়ে বললে, 'বাঘ কি কেবলমাত্র একটা নখের সাহায্যে একটা গভীর আঁচড় দিতে পারে?'

দেখা গেল, আঁচড়টা সার্ট ভেদ করে বুকে ঢুকে গেছে।

ধারালো ফলা দিয়ে খুন করা হয়েছে তড়িৎবাবুকে! বাঘে খেয়েছে পরে!

সেইরাতেই উদ্ভট হেঁয়ালির সমাধান করে ফেলল ফেলুদা। হেঁয়ালি উদ্ধারে তার জুড়ি নেই। ইংরেজি কেতাব ছাড়াও 'বিদগ্ধমুখমণ্ডলম' বলে একটা সংস্কৃত হেঁয়ালির বইও আছে তার কাছে। আটকাল শুধু একটা

শব্দ নিয়ে—'বুড়ো গাছ'।

এমন সময়ে আবির্ভূত হলেন দেবতোষবাবু। ফেলুদা তাকেই জিগ্যেস করে বসল, 'এখানে বুড়ো গাছ মানে প্রাচীন গাছ কিছু আছে কি?'

'প্রাচীন আর বুড়ো কি এক হল?' ঘোলাটে চোখে বললেন উন্মাদ দেবতোষবাবু। 'কাটা ঠাকুরানির মন্দির দেখেছ? মন্দিরের পশ্চিমে একটা অশ্বত্থ গাছ আছে। গায়ে একটা ফোকর। ঠিক যেন ফোকলা দাঁত বুড়ো। সেই গাছেই একদিন মহী—'

'দাদা, চলে এসো!'

বাজখাঁই গলায় হাঁক দিয়ে ঘরে ঢুকলেন মহীতোষবাবু। —একরকম জোর করেই ঘাড় ধরে ঘর থেকে বার করে নিয়ে গেলেন দাদাকে। ঘরে ঢুকিয়ে তালা দিয়ে দিলেন বাইরে।

পরদিন শিকারি মাধবলালকে নিয়ে ফেলুদা সদলবলে গেল কাটা ঠাকুরানির মন্দিরের পাশে। বাঁশের গায়ে গুলির দাগ আবিষ্কার করল ফেলুদা—পাওয়া গেল খানিকটা বাঘের লোম। গুলি খেয়ে পালিয়েছে বাঘ—তার চিহ্ন।

আর পাওয়া গেল সেই তলোয়ারটা। ঝোপের মধ্যে পড়েছিল।

আদিত্যনারায়ণের তরবারি। ডগায় খয়েরি রঙের রক্তের দাগ।

গুপ্তধন কিন্তু উধাও! মাটিতে গর্ত! কলসি নেই!

কাটা ঠাকুরানির মন্দিরে গেল ফেলুদা। মাটিতে নাক ঠেকিয়ে কী যেন দেখল। অদৃশ্য হল মন্দিরের অন্ধকারে। ফিরে এল কিছু পরেই।

বলল, 'অন্ধকারের মাঝে আলোর আভাস পাচ্ছি। তোপসে, বাড়ি চ।'

বাড়ি ফিরে ট্রোফিরুমে ঢুকে একে-একে সবক'টা বন্দুক নামিয়ে পরীক্ষা করল ফেলুদা। উলটেপালটে দেখল বন্দুকের বাঁট, ট্রিগার, নল, সেফটিক্যাচ।

তারপর বলল মহীতোষবাবুকে, 'গুপ্তধন উধাও হয়েছে। গর্ত খুঁড়ে কেউ সরিয়েছে।'

'সেকী!'

'চলুন, সবাই গিয়ে দেখে আসা যাক।'

কিন্তু বিকেলে তুমুল বৃষ্টি নামায় জঙ্গলে যাওয়া আর হল না। তবে জানলায় দাঁড়িয়ে ফেলুদা দেখল, দুটি মূর্তি টর্চের আলো জ্বালিয়ে শলাপরামর্শ করছে দারোয়ানের ঘরের কাছে দাঁড়িয়ে।

এই দারোয়ানই খবর দিয়েছিল ফেলুদাকে—পরশু রাতে তড়িৎবাবু জঙ্গলে ঢুকলে পেছন পেছন আরও একজন গিয়েছিল টর্চ নিয়ে। অন্ধকারে তার মুখ দেখা যায়নি।

পরদিন সকালে সবাই মিলে গেলেন কাটা ঠাকুরানির মন্দিরে। ফেলুদা রিভলভার হাতে মন্দিরে ঢুকল। পাঁচ সেকেন্ডের উপর্যুপরি দু-বার গুলিবর্ষণ করে একটা কেউটে বধ করে উদ্ধার করে নিয়ে এল নারায়ণী মুদ্রা বোঝাই একটা পেতলের ঘড়া।

তড়িতের কাণ্ড। গুপ্তধন চুরি করে সরিয়ে রেখেছিল মন্দিরের অন্ধকারে।

ঠিক এই সময়ে ডেকে উঠল কাকর হরিণ। বাঘ আসছে।

দাঁতে দাঁত চিপে মহীতোষবাবু বললেন, 'মিস্টার মিত্তির, যদি প্রাণের মায়া থাকে তো চলে যান।'

'কোথায়?'

দুজনের হাতেই বন্দুক। মহীতোষবাবুর বন্দুক উঠেছে ফেলুদার দিকে।

'বলছি যান—জিপে। আমার হুকুম।'

আচমকা বাঘের গর্জনে সমস্ত বনটা কেঁপে উঠল। মন্দিরের পেছনে অর্জুন গাছের সাদা ডালের ফাঁক দিয়ে দেখা গেল একটা গনগনে আগুনের মতো চলন্ত রং। সেটা লম্বা ঘাসের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে একটা প্রকাণ্ড ডোরাকাটা বাঘের চেহারা নিল।

মহীতোষবাবুর হাত থরথর করে কাঁপছে।

বাঘ নীচু হয়েছে—এবার লাফ দেবে।

আচমকা গর্জে উঠল দুটো বন্দুক। বাঘ খতম। কিন্তু কি আশ্চর্য! মহীতোষবাবুর হাতের বন্দুক চলে গিয়েছে শশাঙ্কবাবুর হাতে। গুলি চালিয়েছেন তিনি এবং ফেলুদা। দুটো গুলিই ঢুকেছে বাঘের মাথায়।

মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলেন মহীতোষবাবু।

ফেলুদা বলল, 'অযথা দুশ্চিন্তায় ভুগছেন মহীতোষবাবু। আপনার শিকারের অক্ষমতা কারুকে বলব না। আপনি যে মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছেন, আপনার দাদা তা জেনে খুব কষ্ট পেয়েছেন। দুবার তা নিয়ে আক্ষেপ করেছেন আমার কাছে। মনে হয়েছে অসংলগ্ন কথা। তাছাড়া চিঠিতে আপনার সই দেখেই বুঝেছিলাম, আপনার হাত কাঁপে। বন্দুক ধরবেন কী করে?'

চেঁচিয়ে উঠলেন মহীতোষবাবু, 'এককালে ধরতাম। এয়ারগান দিয়ে শালিক মেরেছিলাম। চড়ুইভাতি করতে এসে অশ্বত্থের ওই ডালে উঠেছিলাম। দাদা বলল বাঘ আসছে। আমি বাঘ দেখব বলে লাফ মেরে—'

'হাত ভাঙলেন?'

'কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচার। হাড় আর জোড়া লাগেনি ভালো করে।'

'তবুও শিকারি হওয়ার সখ হল —বংশের মর্যাদা রাখবার জন্যে। তাই নিজের দেশের জঙ্গলে যেতেন না ধরা পড়ে যাবেন বলে। আসাম উড়িষ্যার জঙ্গলে যেতেন—বাঘ শিকার করতেন শশাঙ্কবাবু—নাম হত আপনার। কাহিনি লিখতেন তড়িৎবাবু। নাম হত আপনার। একদিন দুজনেই তা সইতে পারলেন না। এই নিয়ে পরশু রাতে আপনি শাসালেন শশাঙ্কবাবুকে। সেই রাতেই তড়িৎবাবু গুপ্তধন তুলে নিয়ে পালাবেন ঠিক করলেন। একা জঙ্গলে ঢুকলেন আদিত্যনারায়ণের তলোয়ার নিয়ে। সেদিন বাজ, বিদ্যুৎ আর বৃষ্টির মাতামাতি চলছে আকাশে। শশাঙ্কবাবু এলেন পেছন পেছন—বন্দুকের বাঁটে সে চিহ্ন পেয়েছি গতকাল।'

'এসেছিলাম তড়িৎকে বাঁচাতে,' বললেন শশাঙ্কবাবু। 'কিন্তু দেখলাম বাঘ ওকে খাচ্ছে। গুলি চালালাম, ওকে মুখে নিয়ে বাঘ পালাল।'

'গতকাল দারোয়ানের ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে মাধবলালকে কী বলছিলেন, শশাঙ্কবাবু? মন্দিরের পেছনে টোপ ফেলতে?

'মোষের বাচ্চা।' চাপা গলায় বললেন শশাঙ্কবাবু।

'যাতে বাঘ আসে এবং আমার সামনেই মহীতোষবাবুর কেরদানি ফাঁস হয়ে যায়, তাই না?'

মহীতোষবাবু এগিয়ে এসে বললেন, 'মিস্টার মিত্তির, গুপ্তধনের খানিকটা ভাগ আপনি নিন।'

'রৌপ্যমুদ্রা নয়, মিস্টার সিংহরায়। আমি চাই আদিত্যনারায়ণের এই তলোয়ারটা।'

'ইস্পাতের তলোয়ার—রূপো ফেলে?'

'কারণ এই তলোয়ারই তড়িৎকে মেরেছে।'

'খুন?'

'না।'

'আত্মহত্যা?'

'তাও না।' বলে তলোয়ারটা শশাঙ্কবাবুর বন্দুকের দিকে নিয়ে গেল ফেলুদা। কাছে আসতেই খটাং শব্দ করে জোড়া লেগে গেল ইস্পাতে-ইস্পাতে।

'একী, এ যে চুম্বক !'বলে উঠলেন শশাঙ্কবাবু।

'হ্যাঁ, চুম্বক। তলোয়ারটা—বন্দুক নয়। আগে ছিল না—তাই অন্যান্য ছুরি ছোরার পাশেই শোয়ানো থাকত আলমারিতে, গায়ে গায়ে লাগত না—হয়েছে পরশু রাতে।'

'কী করে?' জিগ্যেস করলেন মহীতোষবাবু। রুদ্ধশ্বাস বাকি সকলে।

ফেলুদা বলল...।'

কী বলল বলুন তো?

গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান

ফেলুদা বলল, 'কোনও মানুষের হাতে লোহা বা ইস্পাতের কোনও জিনিস থাকা অবস্থায় যদি তার ওপর বাজ পড়ে, তাহলে সে অবস্থায় সে জিনিস চুম্বকে পরিণত হয়। শুধু তাই নয়, সে জিনিস অনেক সময়ে বিদ্যুৎকে আকর্ষণ করে। তড়িৎবাবুর মৃত্যু হয়েছিল বজ্রাঘাতে, এবং হয়তো এই তলোয়ারই তাঁর মৃত্যুর জন্যে দায়ী। মাটি খুঁড়ে কলসি বার করার পর বৃষ্টি নামে, তার সঙ্গে বাজ ও বিদ্যুৎ। তড়িৎবাবু অশ্বত্থগাছের নীচে আশ্রয়ের জন্যে ছুটে আসেন। বাজ পড়ে তড়িৎবাবু ছিটকে পড়ার সময়ে তাঁর হাতের তলোয়ার বুকে বিঁধে যায়। সম্ভবত মৃত্যুর পর মুহূর্তেই তলোয়ার তাঁর দেহে প্রবেশ করে।

বলে উঠলেন লালমোহনবাবু, 'তড়িৎবাবু শেষটায় তড়িৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেলেন?'

** প্রকাশিত*

নীহাররঞ্জন গুপ্ত-র গল্প নিয়ে গোয়েন্দা ধাঁধা

রহস্যভেদী। কিরীটি রায়

কিরীটি তখন পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণির ছাত্র। ফলিত পদার্থ বিজ্ঞানে এম. এস. সি হতে চলেছে। থাকে শিয়ালদার কাছে অখ্যাতনামা 'বাণীভবন' মেসের তিনতলায়। অন্ধকার খুপরি। মাসিক সাত টাকায় খাওয়া-পরা-থাকা।

শীতকাল। রবিবার। সন্ধ্যা।

কলেজ-বন্ধু সলিল সরকার এসে বলল, 'কিরীটি, আজ আমার মনটা ভালো নেই। একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে বাড়িতে। বাবার ঘরের সিন্দুকে একটা দলিল ছিল। কয়েকদিন ধরে হাইকোর্টে একটা মামলা চলছে, দলিলটা সেই মামলা সংক্রান্ত। গতকালও বাবা সকালের দিকে দলিলটা সিন্দুকেই দেখেছেন। আজ সকালবেলা সিন্দুক খুলে উকিলকে দলিল দিতে গিয়ে দেখলেন দলিল নেই। সিন্দুকের টাকাকড়ি, অন্যান্য জিনিসপত্র সবই ঠিক আছে, কেবল দলিলটাই নেই সিন্দুকে।'

'সিন্দুকের চাবি কার কাছে থাকে?'

'বাবার কোমরে।'

'মামলাটা কার সঙ্গে হচ্ছে?'

'মামলাটার একটু ইতিহাস আছে। ২৪-২৫ বছর আগে সোনারপুরে একটা প্রকাণ্ড বাগানবাড়ি দেনার দায়ে বিক্রি হয়ে যায়। বাগানবাড়িটা ছিল রাজা ত্রিদিবেশ্বর রায়ের। ওঁর পিতামহ যজ্ঞেশ্বর রায় ব্যবসা করে জমিদারি গড়ে তোলেন আর গভর্নমেন্টের কাছে রাজা খেতাব পেয়েছিলেন। রাজা ত্রিদিবেশ্বর কিন্তু ব্যবসা করতে গিয়েই পথে বসলেন। দেনার দায়ে শেষ বসতবাটি সোনারপুরের বাগানবাড়িটাও বিক্রি করতে হল। বাবা সাতহাজার টাকায় কিনে নিলেন বাগানবাড়ি। খানিকটা ঝোঁকের মাথায় কিনেছিলেন বলেই কোনও সংস্কার করেননি। বছরখানেক আগে অনিল চৌধুরী নামে এক ভদ্রলোক এসে কিনতে চাইলেন ভাঙা বাগানবাড়িটা—উদ্দেশ্য, স্কুল স্থাপন করা। লেখাপড়া হবে, সব ঠিকঠাক, এমন সময়ে বাবা একটা বেনামি চিঠি পেলেন। চিঠিতে লেখা ছিল :

প্রিয় মধুসূদনবাবু,

লোক পরম্পরায় শুনলাম, রাজা ত্রিদিবেশ্বরের বাড়িটা নাকি আপনি বিক্রি করছেন। আমি জানি, ওই বাড়ির কোনও এক স্থানে ত্রিদিবেশ্বরের পিতামহ যজ্ঞেশ্বর রায়ের গোটা দশ-বারো দামি হিরে পোঁতা আছে। সে হিরের দাম সাত আট লক্ষ টাকা তো হবেই, আরও বেশি হতে পারে। যার কাছে আপনি বাড়িটা বিক্রি করছেন, সে সেকথা কোনও সূত্রে জানতে পেরেছে তাই কেনবার জন্যে এত ব্যস্ত হয়েছে; তা না হলে এতদিনকার ভাঙা বাড়ি, তাও কলকাতার বাইরে, কেউ কিনতে চায়? রাজা ত্রিদিবেশ্বর বা তাঁর পিতা রাজেশ্বরও সেকথা জানতেন না। হিরের কথা একমাত্র রাজা যজ্ঞেশ্বর ও তাঁর নায়েব কৈলাস চৌধুরীই জানতেন। কিন্তু হিরেগুলো যে সঠিক কোথায় পোঁতা আছে, সে কথা একমাত্র যজ্ঞেশ্বর ভিন্ন দ্বিতীয় প্রাণী কেউ জানত না। রাজা যজ্ঞেশ্বর হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে মারা যান। কাজেই মৃত্যুর সময়ে তাঁর লুকানো হিরেগুলোর কথা কাউকেই বলে যেতে পারেননি।

ইতি–

আপনার জনৈক 'শুভাকাঙ্ক্ষী'।

চিঠিখানা পড়ে বাবার মত বদলে গেল। অনিল চৌধুরীকে স্পষ্ট বলে দিলেন, বাড়ি বিক্রি করবেন না। অনিলবাবু বিশহাজার টাকা পর্যন্ত দিতে চাইলেন। তাতে বাবার সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হল। বাধ্য হয়ে অনিলবাবু ফিরে গেলেন।

মাসখানেক পরে বাবার কাছে এক উকিলের চিঠি এল। সোনারপুরের বাগানবাড়ি দেনার দায়ে ভুবন চৌধুরীর কাছে বন্ধক রেখেছিলেন রাজা ত্রিদিবেশ্বর। বন্ধকী জিনিস আইনত বিক্রি করা যায় না। তাছাড়া বাবাকে দলিল-দস্তাবেজ দিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে, বাড়িটা সত্যিই তিনি রাজা ত্রিদিবেশ্বরের কাছ থেকে কিনেছিলেন।

উকিলের চিঠি পেয়ে বাবা হাসলেন। কোনও জবাবই দিলেন না। কেননা, বাবার সিন্দুকে যে দলিল আছে, সেটাই তার প্রমাণ। অবশেষে কোর্টে মামলা উঠল। গতকাল কোর্টে দলিল পেশ করার দিন। এমন সময়ে অকস্মাৎ চুরি গেল দলিলটা।

কিরীটি বললে, 'এ যেন একটা রহস্য উপন্যাস। চেষ্টা করলে অবশ্য সুরাহা করা যেতে পারে।'

'পারবি তুই দলিলটা খুঁজে বের করে দিতে?'

কিরীটি কোনও জবাব দিল না। শুধু হাসল।

এ কাহিনি যখনকার, তখন ঢাকুরিয়া অঞ্চলে আধুনিকতার হাওয়া লাগেনি। লেক তো দূরের কথা, সেখানে তখন ঘন বন-জঙ্গল আর ধানখেত। রেললাইনের ধার দিয়ে দু'একটা পাকা বাড়ি দেখা যেত মাত্র।

ঢাকুরিয়া স্টেশনের কাছেই মধুসূদন সরকারের প্রকাণ্ড চারমহলা বাড়ি। সোমবার ভোরবেলা সলিলের সঙ্গে কিরীটি ঢুকল বাগানে। মধুসূদনবাবু তখন গায়ে শাল জড়িয়ে বেড়াচ্ছেন।

কিরীটি বললে, 'কাকাবাবু, সলিল কাল রাতে আমার কাছে ছিল। আপনার শরীর ভালো তো?'

'হ্যাঁ, বাবা। বুড়ো হাড়ে কোনওরকমে জোড়াতালি দিয়ে চলছে।'

সলিল বলে উঠল, 'বাবা, কিরীটি বলছিল তোমার হারানো দলিল ও খুঁজে বের করে দেবে।'

মধুসূদন পুত্রের কথায় চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কিরীটির দিকে তাকালেন।

কিরীটি ধীরভাবে বললে, 'চেষ্টা করব। কিন্তু আপনার সাহায্য সবার আগে দরকার, কাকাবাবু।'

গুম হয়ে রইলেন মধুসূদনবাবু। তারপর মৃদুস্বরে বললেন, 'সাহায্য! কীভাবে করতে পারি বল?'

'আমি যে দলিলটা খোঁজার ভার নিয়েছি, সে কথা এক আপনি আর সলিল ছাড়া ঘুণাক্ষরেও কেউ জানতে পারবে না।'

'বেশ, তাই হবে।'

বাড়িটা চারমহলা। দোতলা। প্রথম মহলে ব্যবসার আপিস, দ্বিতীয় মহলে গুদোম, তৃতীয় মহলে দাসদাসীর আস্তানা, চতুর্থ মহলই প্রকৃতপক্ষে অন্দরমহল।

অন্দরমহলে ওপরের দক্ষিণের দুটো ঘরে মধুসূদনবাবু থাকেন—একটা তাঁর বসবার ঘর, অন্যটা শয়নকক্ষ। অন্য দুটির একটিতে থাকে সলিল, আর একটি পূজার ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

নীচের একটি ঘরে খাওয়াদাওয়া হয়, একটিতে পিসিমা সলিলের তিনটি বোনকে নিয়ে থাকেন, একটিতে সলিলের কাকা বিপিনবাবু, অন্যটিতে অতিথি অভ্যাগত এলে থাকে।

যে ঘরে সিন্দুক আছে, সেটি বেশ বড় আকারের ঘর। মধুসূদনবাবুর শোওয়ার ঘর। দক্ষিণ পুবে খোলা। ব্যালকনির ঠিক পাশ দিয়ে একটা নারকেল গাছ উঠে গেছে। ব্যালকনি থেকে হাত বাড়িয়ে ধরা যায়। ঘরটা বারান্দার একেবারে শেষপ্রান্তে। ওই ঘর দিয়েই ছাদে যাওয়ার দরজা।

খাটের পাশে আলমারি। আলমারির পাশে মানুষ প্রমাণ উঁচু মজবুত লোহার সিন্দুক। সিন্দুকের গায়ে বেশ বড় আকারের একটা জার্মান তালা ঝুলছে।

ঘরের দেওয়ালে টাঙানো মুখোমুখি পুব-পশ্চিমে দুখানি বড় অয়েল পেন্টিং—মধুসূদনের মা ও বাবার। বাবার ফটোটি ঠিক সিন্দুকের ওপরেই টাঙানো।

ছোটবেলায় কিরীটির ছবি আঁকার দিকে খুব ঝোঁক ছিল। সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ছবি দুটিকে খুঁটিয়ে শিল্পীর মন নিয়ে দেখতে লাগল। বেশ কিছুদিন ঝাড়াপোঁছা হয়নি ছবি দুটি।

সলিল প্রশ্ন করে, 'অমন করে কী দেখছিস, কিরীটি?'

'বিলিতি ফ্রেম বলেই মনে হয়। তোর ঠাকুরদার ফটোটা ঠিক দেওয়ালের সঙ্গে সেট করা হয়নি।—একটু যেন বাঁয়ে হেলে আছে।'

এমন সময়ে মধুসূদনবাবু ঘরে প্রবেশ করলেন।

'কী দেখছ?'

'আপনার বাবার অয়েল পেন্টিং।...বেশ সুন্দর। শিল্পীর হাত চমৎকার। তুলির প্রতিটি টানে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়।'

'হ্যাঁ, একজন ইটালিয়ান শিল্পীর আঁকা। চল, চা খেতে-খেতে কথা বলা যাবে।'

বসবার ঘরে চায়ের টেবিলে বসে মধুসূদনবাবু বললেন, 'বাড়িতে লোকজনের মধ্যে আমি, বিপিন, দিদি, সলিলের মা আর সলিলের তিন বোন। প্রতিদিন আমি বিকেল পাঁচটার মধ্যেই দোকান থেকে ফিরি। কিন্তু পরশু ফিরতে রাত প্রায় নটা হয়ে যায়। সকালবেলা সিন্দুক খুলে দেখেছিলাম দলিলটা রয়েছে।

'রাত্রে একটা খসখস শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। শব্দটা যেন পাশের ঘর থেকেই আসছে মনে হল। হঠাৎ একটা ক্যাঁচ করে শব্দও হল। উঠে পড়লাম। ঘরের বাতি নিভোনো। ডায়নামো রাত এগারোটার পর বন্ধ হয়ে যায়। মোমবাতি জ্বেলে পাশের ঘরে গেলাম। কিন্তু ঘর খালি! বারান্দার দিকের দরজাটা হা-হা খোলা! অথচ শোওয়ার সময়ে নিজের হাতে দরজা বন্ধ করে শুয়েছিলাম। বারান্দায় এলাম। চাঁদের আলোয় দেখলাম কে যেন তরতর করে নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে। নীচে গিয়ে দেখলাম বাইরে যাওয়ার দরজা বন্ধ—তালা দেওয়া—রোজ তোমার কাকিমা নিজের হাতে তালা দিয়ে শুতে যায়—ভোরে উঠে তালা খোলে। নীচের তিনটে ঘরও বন্ধ—ঠেলে দেখলাম। সকাল নটায় দেখলাম, সিন্দুকে দলিল নেই।

'কাল রাতে সাড়ে বারোটা নাগাদ শোওয়ার ঘরের ব্যালকনিতে অন্ধকারে বসে আছি চেয়ারে, হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ শিসের শব্দ শুনলাম ব্যালকনির নীচ থেকে! ঝুঁকে তাকালাম—কাউকে দেখতে পেলাম না। হাঁক দিয়ে দারোয়ানকে ডাকতেই কে যেন তীর বেগে পালিয়ে গেল—পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম। দারোয়ান এল। টর্চের আলোয় দেখল, ব্যালকনির নীচে নতুন ফুলের চারার পাশে নরম মাটিতে জুতোর ছাপ। সত্যিই কেউ দাঁড়িয়েছিল।'

গভীর মনোযোগে সব কথা শুনে কিরীটি বললে, 'দলিল বোধহয় পাওয়া যাবে। আপনি দিনরাত বাড়ির আশেপাশে পাহারার ব্যবস্থা করুন।'

রাত দেড়টা।

চিলেকোঠার ঘরে ঘাপটি মেরে বসে কিরীটি রায়। হঠাৎ ছাদের ওপর শোনা গেল পায়ের শব্দ।

মাথায় ঘোমটা দিয়ে কে যেন ঢুকল ঘরে। দেশলাই জ্বেলে জ্বালাল মোমবাতি। জ্বলন্ত মোমবাতি রাখল বাগানের দিকের জানলায়।

আধঘণ্টা পরে হঠাৎ ঘরের ধুলোয় আছড়ে পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠল আগন্তুক।

কিরীটি কাছে গিয়ে ধীরে ধীরে ডাকল, 'পিসিমা।'

কিরীটির দুহাত চেপে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন পিসিমা। লোকে জানে তাঁর ছেলে শম্ভু মারা গেছে। কিন্তু সে মরেনি—গোল্লায় গেছে। রোগজীর্ণ কঙ্কালসার দেহ নিয়ে কিছুদিন আগে এসেছিল। দেনায় ডুবে আছে। এক হাজার টাকা এখুনি একজন দেবে সিন্দুক থেকে একটা দলিল চুরি করে আনলে। নইলে জেলে

যেতে হবে। পিসিমা বিবেকের সঙ্গে যুদ্ধ করে হেরে গেছেন। ছেলের জন্য কীভাবে চাবি চুরি করে সিন্দুক খুলে দলিল সরিয়েছেন, তা বলতে পারলেন না লজ্জায়।

কথা ছিল ব্যালকনি থেকে নীচে ফেলে দেবেন দলিলটা—লুফে নেবে শম্ভু। কিন্তু পরপর দু-রাত ব্যর্থ হয়েছেন পিসিমা। আজ—

পিসিমাকে নীচে পাঠিয়ে সলিলকে ডাকল কিরীটি। ওর সামনেই হাত বাড়িয়ে মধুসূদনের বাবার ফটোর পেছন থেকে বার করে নিল খামসমেত দলিলটা।

পিসিমা কিন্তু বলেননি, দলিল কোথায় আছে। তবুও কিরীটি জানত। কী করে বলতে পারেন?

গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান

ছবিটা অনেকদিন ঝাড়পোঁছ হয়নি—অথচ বেঁকে ঝুলছিল। মধুসূদন উঠে পড়ায় পিসিমা দলিলটা ছবির আড়ালে রেখে তরতরিয়ে পালিয়েছিলাম নীচে।

সুন্দরী তুমি শুকতারা

গৌরচন্দ্রিকা

ফুটন্ত লোহা গর্জায়, কিন্তু বানিয়ে দেয় ইস্পাত। ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডির লেলিহান অগ্নিশিখায় মানুষও কখনও কখনও পালটে যায়—অসহ্য কষ্ট তাকে প্রায় অমানুষ করে দেয়। বিদ্রোহী বর্মন-এর ক্ষেত্রে হয়েছিল ঠিক তাই। সুন্দরী স্ত্রীকে হারানোর পর সে হয়ে গেল নিছক একটা মেশিন, প্রতিহিংসা নেওয়ার মেশিন।

আমরা জানি সে এখন কী হয়েছে : বরফ আর ইস্পাতে গড়া মূর্তি, এই দুইয়ের চাইতেও বেশি নিষ্করুণ; অতি ভয়ানক প্রায় নৈর্ব্যক্তিক এক শক্তি, যার মড়ার মতন সাদা মুখ মুখোশের মতন ঢেকে রেখে দেয় হিমশীতল প্রায় অলৌকিক নির্মম প্রতিভাকে—সমাজশত্রু হননের পূর্বমুহূর্তেই কেবল নারকীয় আগুন দেখা যায় কালো চোখের মণিকায়—

এ কাহিনি সেই বিদ্রোহী বর্মনের—

সঙ্গে আছে গোয়েন্দা ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

অর্ধাঙ্গিনীর অন্তর্ধান

ফাগুনের আগুন লেগেছে বনে-বনে।

দমদম এয়ারপোর্টের দূরে-দূরে দেখা যাচ্ছে এহেন আগুনের সমারোহ।

এয়ারপোর্ট কিন্তু নিস্তরঙ্গ পুষ্করিণীর মতনই স্থির। পুকুরের শোভা যেমন পদ্ম ফুল, এয়ারপোর্টেও তেমনি ঝকঝক করছে খানকয়েক এরোপ্লেন।

শান্ত এয়ারপোর্টে ঝিকমিকিয়ে চলেছে ফাগুনের আনন্দময় রোদ। এই দৃশ্যই নয়নভরে দেখছে বিদ্রোহী বর্মন। তখন কি কল্পনাও করতে পেরেছিল যে এমন সুন্দর জায়গাটাই তার জীবন সাহারার সূচনাকেন্দ্র হয়ে দাঁড়াবে? ভাবতেও কি পেরেছিল অপরিসীম আতঙ্কঘন ফ্যানট্যাসটিক ঘটনার পর ঘটনা তার গোটা জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেবে?

না, পারেনি।

আতঙ্কের জীবাণু প্রশান্ত পরিবেশে লীলা দেখাতে পারে না—এ হেন জায়গায় তার সৃষ্টির সম্ভাবনাও থাকে না।

অথচ রৌদ্রবিধৌত অপরূপ এই দমদম বিমান বন্দরেই আতঙ্ক হল অঙ্কুরিত। বিদ্রোহী বর্মন সর্বজনের কাছে পরিচিত ছিল হাসিখুশির অফুরন্ত আধার হিসাবে—কৌতুকবোধ অপসৃত হল তার চরিত্র থেকে।

ট্র্যাজেডির বীজ বপন হয়ে গেল শান্তিময় এই ক্ষেত্রেই—পালটে গেল বিদ্রোহী বর্মনের জীবনের ছন্দ।

ডগলাস বিমানে দশজন প্যাসেঞ্জার বসতে পারে। প্রাইভেট এয়ারলাইন্স-এর বিমান। দুটো আছে। এখুনি একটা আকাশে উড়বে। তাই যেন দম নিচ্ছে। রানওয়ের ওপর খাড়া। শেষ লাগেজটা এইমাত্র প্রবেশ করেছে তার উদরে। জানলায় বসে সেই দৃশ্য দেখল বিদ্রোহী।

বলল এজেন্টকে, 'আমাকে যে যেতেই হবে পোর্টব্লেয়ার—এখুনি।'

সসম্ভ্রমে বিদ্রোহীর দিকে চেয়ে রইল এজেন্ট। সম্ভ্রম সে ছিনিয়ে নেয় সবার কাছ থেকেই। তার ব্যক্তিত্ব দিয়ে। তার চাবুক চেহারা দিয়ে। কণ্ঠস্বরের মাদল বাজনা দিয়ে। তার কুচকুচে চুলের ঝিকিমিকি, তার কৃষ্ণতর চোখের কালো দীপ্তি পুরুষ অথবা নারী—সবাইকেই মন্ত্রমুগ্ধ করতে পারে প্রথম দর্শনেই।

এত সমীহবোধ সত্বেও ঘাড় নাড়ল এজেন্ট। নিতান্তই নারাজ।

বললে মৃদু স্বরে, 'কলকাতায় হেড অফিসে খোঁজ নিয়ে আসেননি? একদম জায়গা নেই। সব সিট ফুল।'

বিদ্রোহীর কালো মণিকা দুটোয় শুধু কালো স্ফুলিঙ্গ দেখা দিল—ক্ষণেকের জন্য। পিয়ানোর ইস্পাত তারে টঙ্কার দিলে যেরকম শিরশির আওয়াজ বেরয়, সেই আওয়াজ ধ্বনিত হল তার কণ্ঠস্বরে—খুব নীচু খাদে।

বললে, 'আমাকে যে যেতেই হবে। আমি আর আমার স্ত্রী। স্ত্রীর আত্মীয়া খুবই অসুস্থ। মুমূর্ষু।'

হাত রাখল শুকতারার হাতে। বিদ্রোহীর হাতের পাঞ্জা দেখলে বোঝা কঠিন প্রতিটি আঙুল যেন হাড় আর ইস্পাত দিয়ে গড়া—চামড়া দিয়ে ঢাকা; সে তুলনায় শুকতারার বাহু পেলব কোমল, মসৃণ চামড়া মখমল কোমল, উজ্জ্বল গৌরবর্ণের সঙ্গে দুধ আর আলতার সংমিশ্রমের আভাস আছে। শুকতারা তাই শুধু সুন্দরী নয়—অপরূপ রূপসি। তার নাক মুখ চিবুক ইউরোপীয় মর্মর মূর্তিকে স্মরণ করিয়ে দেয়, তার দীঘল আঁখি আর মখমল পেলবতা পলিমাটির স্নিগ্ধতা মনে এনে দেয়। তার দুই চোখের তারার সমাহিত চাহনি মন-সমুদ্রের অতলতাকে বাঙময় করে তোলে। পরনে তার ফিকে গোলাপি রঙের অর্গ্যান্ডি শাড়ি ফরসা রঙকে আগুনের মতোই প্রোজ্জ্বল করে তুলেছে। বিদ্রোহীর করস্পর্শে সাদা দাঁতের সারির আভাস, সে সামান্য হাসল। বরকে যেন সংযত হতে বলছে।

এজেন্ট কিন্তু নিরুপায়। ডাইনে বাঁয়ে মাথা নেড়েই চলেছে। সমবেদনা জানাচ্ছে, একই সঙ্গে অক্ষমতাও প্রকাশ করে চলেছে।

'কিছুই করা যাবে না। মাঝরাতে একটা প্লেন ছাড়বে—'

'অতক্ষণ ওয়েট করা যাবে না,' ঝটিতি বললে বিদ্রোহী। ওর মুখের পরতে-পরতে সঙ্কল্প প্রস্তরকঠিন রূপ নিয়েছে। অতীতেও এরকম মুখাবয়ব দেখা দিয়েছে বিশেষ ক্ষেত্রে—যখনি সাধারণ মানুষ সমস্যা সমাধানে অপারগ হয়েছে—বিদ্রোহী বর্মনের অ্যাডভেঞ্চারাস সত্তা সেই সমস্যা লুফে নিয়েছে। সমাধান হাতে তুলে দিয়েছে।

বললে, 'চার্টার প্লেন নেব। যত বড়ই হোক না কেন—'

'চার্টার করার মতন প্লেন এখন ফিল্ডে নেই। সরি, কান্ট হেল্প।'

ঠিক এই সময়ে এয়ারপোর্ট অফিসের জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল বিদ্রোহী বর্মন। দেখেছিল চাকা গড়গড়িয়ে রানওয়ের দিকে চলেছে ডগলাস।

এজেন্টের সঙ্গে আর কথা বলেনি বিদ্রোহী। দ্রুতপদে ধাবিত হয়েছিল দরজার দিকে। পেছনে এসেছে সুন্দরী শুকতারা।

শুধিয়েছিল, 'কী করতে চাও?'

সুন্দরী শুকতারার কণ্ঠস্বরে বীণার ঝঙ্কার—স্বামীর সঙ্গে কথা বলার সময় মূর্ত হয়ে ওঠে গভীর আস্থা—সে জানে, ধূসর অগ্নিশিখা সম স্বামী প্রবরের ডিক্সনারিতে অসম্ভব শব্দটা ঠাঁই পায় না।

বিদ্রোহী বললে, 'পোর্টব্লেয়ারে যাব—এখুনি।'

ধেয়ে চলেছে সে এয়ারলাইনারের দিকে।

বিদ্রোহী যখন নিশ্চল, তখন সে সম্ভ্রম ছিনিয়ে নেয়। যখন সে চলমান, তখন তাকে স্বচ্ছন্দ গতিতে শিকারি চিতার মতন ধাবমান বলেই মনে হয়। বহু যুগে এমন শরীরী বিদ্যুৎ দেখবার সৌভাগ্য হয় মানুষের। প্রাণশক্তির তীব্রতা স্ফুরিত হয় হাতে-পায়ে সর্ব অঙ্গে। অথচ সে আয়তনে বিপুলকায় নয়। হাইটে মাত্র পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি। ওজন মোট একশ ষাট পাউন্ড।

স্বামী স্ত্রী একই গতিবেগে চলে এসেছে প্লেনের কাছে। ডবল মেট্যাল ডোর এখনও খোলা রয়েছে। ধাতুর সোপান এখনও যথাস্থানে রয়েছে। প্লেন ঘুরে একজন অ্যাটেনড্যান্ট এসে দাঁড়াল বিদ্রোহীর সামনে।

বললে, 'এ প্লেনের দুটো খালি সিট কি আপনাদের জন্যে?'

লোকটা বেজায় লম্বা। হাড়সর্বস্ব। আঙুলের গাঁট বেশ মোটা। চামড়া লালচে আর কর্কশ। বিদ্রোহীর কালো চোখের ওপর কালো ভুরু জোড়া নারকেল দড়ির মতন শক্ত হয়ে ওঠে লোকটার দিকে তাকিয়েই।

দুই চোখে জয়োল্লাস ভাসল তৎক্ষণাৎ।

'সিট তাহলে আছে। অথচ বলল নেই। ঘোর চক্রান্ত।'

'আপনাদের টিকিট যদি না থাকে—'

'পোর্টব্লেয়ারে নেমে মিটিয়ে দেব। ফরম্যালিটি যদি কিছু থাকে সেরে নিন—এসো সুন্দরী।'

শুকতারাকে শুধু সুন্দরী বলেই ডাকে বিদ্রোহী। চিরকাল। বিয়ের আগে থেকে। শুনে যারা চোখ কাঁপায়, তাদের দিকে কালো চোখের হিরে জ্বালিয়ে রাখে—থেমে যায় চোখের কাঁপন।

টুকটুক করে সিঁড়ি বেয়ে প্লেনের ভেতরে গিয়ে ঢোকে দুই মূর্তি। একজন পুরোদস্তুর হি-ম্যান, আর একজন অণু পরমাণুতেও শী-ম্যান। প্রপেলারের গর্জন চলছে, ধাম করে বন্ধ হচ্ছে মেট্যাল ডোর, লক করেও দেওয়া হল সে দরজা। চলতে শুরু করেছে প্লেন। চারপাশে চোখ ঘুরিয়ে নেয় বিদ্রোহী। ঠিক জায়গাতেই এসে পড়েছে। কিন্তু অন্যান্য আরোহীদের চিনতে পারছে না।

ওরা স্বামী-স্ত্রী ছাড়াও আটজন প্যাসেঞ্জার রয়েছে প্লেনে। সাতজন পুরুষ। একজন নারী। মহিলাটির শ্রী অঙ্গে আকর্ষণ আছে বিলক্ষণ। কিন্তু মুখ শক্ত, চোয়াল শক্ত, নাক শক্ত। এগুলি না থাকলে তাকে পারফেক্ট বিউটি বলা যেত। ছয় পুরুষের একজন বিশালকায় এবং স্থূলকায়—বাড়তি চর্বি জমেছে শরীরের সব জায়গায়। দ্বিতীয়জনও বিশাল, তবে চর্বির পাহাড় নয়—এর হাতে রয়েছে গুচ্ছ গুচ্ছ কালো চুল। তৃতীয়জন খর্বকায়, সলিড বপু—দাঁতের ফাঁকে মোটা চুরুট। বাকি চারজন ভিড়ে হারিয়ে যাওয়ার মতন মামুলি চেহারার অধিকারী। পর্যবেক্ষণ সমাপ্ত করে সুন্দরীর পানে তাকায় বিদ্রোহী—'খুশি তো?'

নিজের সিটে বসে ঈষৎ ঝুঁকেও পড়ে। ইস্পাত-পাঞ্জা রাখে সুন্দরীর কাঁধে। যেন হরগৌরী। নিবিড় সম্পর্কটা বিজ্ঞাপিত ওই একটি আচরণেই।

'ফাইন।' মিষ্টি হেসে বললে সুন্দরী।

রিল্যাক্সড হয়ে যায় বিদ্রোহী। প্লেনের মৃদু আন্দোলনে আন্দোলিত হয় পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি বডি। সূর্য ডুবছে দিগন্তে—গোধূলি অবগুণ্ঠন মেলে ধরছে ধীরে ধীরে।

সুন্দরীর মা মৃত্যুশয্যায়। যদি কিছু হয়ে যায়, বিশাল সম্পত্তির ওয়ারিশ হতে চলেছে সুন্দরী। নির্বিকার থাকার চেষ্টা করে বিদ্রোহী।

প্লেনের গর্জন এখন কানে সয়ে গেছে। কালো ইস্পাতের পাতের মতন বঙ্গোপসাগর পড়ে রয়েছে নীচে। আকাশে তারা দেখা যাচ্ছে না—সাগরের জলও তাই কালো। বেঁটে সলিড লোকটা জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরে—তার দৃষ্টি নেই আর কোনও দিকে।

বছর বিশেক বয়সের স্টুয়ার্ডেস এগিয়ে এল সুন্দরী শুকতারার দিকে। সুন্দরীরা সুন্দরীদের দিকে বেশি তাকায়—পুরুষদের দিকে ততটা তাকায় না। শুকতারা দেখে নিল স্টুয়ার্ডেসকে। স্লিম অ্যান্ড অ্যাট্রাকটিভ।

হাসল স্টুয়ার্ডেস। কিছু প্রয়োজন কি শুকতারার?

না, শুকতারা ভালোই আছে। তবে উঠে দাঁড়াল বিদ্রোহী। হাত দুটো তার চটচট করছে। ধোয়া দরকার। এগোল ল্যাভেটরির দিকে।

চলন ভঙ্গিমায় আবার ঠিকরে গেল সেই মসৃণ পিচ্ছিলতা—শক্তি ঠাসা পেশিপুঞ্জ থেকে যার আবির্ভাব ঘটে। প্রতিটি পদক্ষেপে চিতাবাঘের রাজকীয়তা—অঙ্গ ঘিরে বিদ্যুৎ-বহ্নির অদৃশ্য বিচ্ছুরণ। শুধু চলন ভঙ্গিমাই নয়। মাঝারি মাপের ফ্রেমে বিরল শক্তির কাহিনি যেন কথা কয়ে উঠবে ওর শরীরটার দিকে তাকালে। দক্ষ লড়াকুর পূর্ণ বয়েসের সমস্ত অভিজ্ঞতাই সঞ্চিত হয়েছে বিদ্রোহীর শক্তিঠাসা শরীরটার সব জায়গায়। একই সঙ্গে যৌবনের আগুন আর সহনশীলতাও বিধৃত রয়েছে প্রতিটি অণুপরমাণুতে। বিদ্রোহী এই দুইয়ের সমন্বয় ঘটিয়ে এমনই তড়িৎ, শক্তি অর্জন করেছে যা চোখে পড়ে কদাচিৎ।

শুকতারা এহেন বিরল পুরুষের দিকে তাকিয়ে হাসল ছোট্ট আর মিষ্টি হাসি। হাসি ফিরিয়ে দিল বিদ্রোহী কালো চোখের তারা নাচিয়ে। তারপর দরজা খুলে ঢুকল টয়লেট রুমে।

হাতে ময়লা না থাকলেও হাত ধোওয়ার বাতিক আছে বিদ্রোহীর। জঙ্গলে অথবা মেরু প্রান্তরে, শহরে অথবা পর্বতে—লক্ষ কোটি টাকার অ্যাডভেঞ্চারে গেছে বিদ্রোহী হাত ধোওয়ার বাতিক ছাড়েনি। এক বিন্দু জলের দাম যেখানে সোনা দিয়ে ধার্য করা যায়—সেই মরু অঞ্চলেও দু-হাতের কল্পিত ক্লেদ সাফ করতে জল অপচয় করেছে নির্বিকার ভাবে।

ধীরে সুস্থে নিতান্তই অলস ভঙ্গিমায় দুহাত পরিষ্কার করে নিল বিদ্রোহী—ফিরে এল প্লেনের মধ্যে।

দেখল, ওর পাশের সিট শূন্য।

যেখানে বসেছিল সুন্দরী শুকতারা একটু আগেই।

নির্নিমেষে শূন্য সিটটার দিকে চেয়ে রইল বিদ্রোহী। শিরশির করে উঠল ব্রহ্মতালুর চামড়া।

কিন্তু শিউরে ওঠবার মতন কিছুই তো ঘটেনি। লেডিজ ল্যাভেটরি পেছনে—শুকতারা গেছে সেখানে।

বেঁটে সলিড লোকটা এখনও চুরুট কামড়ে চলেছে—অগ্নিসংযোগ এখনও ঘটেনি। বিদ্রোহীর দিকে পূর্ণ চোখে ক্ষণেক তাকিয়ে চাহনি ফিরিয়ে নিল জানলার দিকে। বাকি ছয় পুরুষ আর এক নারী দৃকপাতই করল না ওর দিকে। পেছন থেকে এগিয়ে এল বিমানসুন্দরী। হাতছানি দিয়ে তাকে কাছে ডাকল বিদ্রোহী।

'আমার স্ত্রীর শরীর সুস্থ তো? ল্যাভেটরিতে গেল নাকি?'

'আপনার স্ত্রী?' ললাটে ঈষৎ কুঞ্চন জাগিয়ে বললে বিমান-অপ্সরা।

'হ্যাঁ। সিক হয়ে গেল নাকি প্লেন মোশান-এর জন্য?'

'বুঝলাম না।' রূপসীর চোখে এখন জাগ্রত হচ্ছে অদ্ভুত চাহনি।

নিমেষে প্রদীপ্ত হল বিদ্রোহীর কয়লা কালো চোখ, কালো স্ফুলিঙ্গ যেন বিমান রূপসীর সুন্দর তনুর মর্মস্থল ভেদ করে গেল চকিতে। একই সঙ্গে শিরশির করে উঠল শিরদাঁড়ার শীর্ষদেশ।

বললে স্পষ্টতর উচ্চারণে, 'আমি বলছি আমার স্ত্রীর কথা। একটু আগেই বসেছিল আমার পাশে—ওই সিটে।'

'ও সিট তো খালিই ছিল।'

চকচক করে ওঠে বিদ্রোহীর কপাল। আবির্ভাব ঘটেছে স্বেদবিন্দুর। ইস্পাতের দীপ্তি দেখা যায় কালো চোখে।

বিমান তিলোত্তমার কথা কিন্তু থামেনি, 'কী বলেছেন বুঝতে পারছি না। প্লেনে উঠেছেন একা—কেউ তো সঙ্গে ছিল না।'

'মনে হচ্ছে আপনার মাথা খারাপ হয়েছে', ডম্বরু-কণ্ঠে শব্দগুলো নিক্ষেপ করেই ঘুরে গেল বিদ্রোহী। চর্বির পাহাড় বসে আছে ওর সব চাইতে কাছে। বললে তাকেই, 'আপনি তো দেখেছেন আমার স্ত্রীকে। বলে দিন এই স্টুপিড স্টুয়ার্ডেসকে।'

খুব আস্তে মাথা নাড়ে চর্বির পাহাড়।

'ঠিকই বলেছেন স্টুয়ার্ডেস। দমদম এয়ারপোর্টে আপনি একাই উঠেছেন প্লেনে—কেউ ছিল না সঙ্গে।'

জীবনমৃত্যুর লড়াইয়ে বহুবার নিজের শ্রবণেন্দ্রিয়র ওপর নির্ভর করতে হয়েছে বিদ্রোহীকে। কখনই দুর্বলতা দেখায়নি শ্রবণশক্তি। সুতরাং এখনও ভুল শুনছে কানে—তা ভাবতে পারল না। ঘুরে দাঁড়াল অন্যান্যদের দিকে।

'আপনারা তো দেখেছেন আমার স্ত্রীকে?'

পর্যায়ক্রমে প্রত্যেকের মুখ নিরীক্ষণ করে যায় বিদ্রোহী। সব মুখেই ভাসছে অবাক চাহনি। বিমূর্ত বিস্ময়—যেন একযোগে সবাই প্রত্যক্ষ করছে এক বদ্ধ উন্মাদকে। ভয়ের ভাবও মিশে রয়েছে চাহনিগুলোর মধ্যে।

প্রায় লাফিয়ে প্লেনের পেছনে চলে যায় বিদ্রোহী। দড়াম করে খোলে লেডিজ ল্যাভেটরির দরজা। কেউ নেই ছোট্ট খুপরিতে। দৃষ্টি নিক্ষেপ করে টেল কম্পার্টমেন্টে। শুধু লাগেজই রয়েছে সেখানে—আর মেল ব্যাগ। দৌড়ে চলে আসে প্লেনের সামনের দিকে—ঝটকান দিয়ে খোলে পাইলটের কম্পার্টমেন্টের দরজা। ক্রুnদ্ধ চোখে ওর দিকে তাকায় পাইলট আর কোপাইলট। তারপরেই ঘাবড়ে যায় বিদ্রোহীর চোখে ঘনায়মান ক্ষিপ্ততা দেখে।

ওর মাথায় তখন চর্কিপাক দিচ্ছে একটাই অসম্ভব সত্য।

সুন্দরী শুকতারা নেই এই প্লেনে।

কঠিন ধাতুর রড বুঝি মট করে ভেঙে গেল বিদ্রোহীর কণ্ঠস্বরে, 'ড্যাম ইউ অল। হোয়াট হ্যাভ ইউ ডান? হোয়্যার ইজ মাই ওয়াইফ?' ছিটকে যায় দরজার সামনে। লক করা রয়েছে। এ দরজা এখন খোলা প্রায় অসম্ভব—উড়ন্ত প্লেনে বাইরের এয়ার প্রেসার ঠেলে দরজা খোলা এত সহজ নয়। লাট্টুর মতন অবয়বটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে তাকায় আরোহীদের দিকে।

চর্বির পাহাড় আর বেঁটে সলিড লোকটা পায়ে-পায়ে এগিয়ে আসছে ওর দিকে।

অস্ফুট স্বরে বলে ওঠে বিমান-রূপসী, 'মাথা বিগড়েছে। ধরুন।'

'তাহলেই মরবেন।' বিদ্রোহীর কণ্ঠস্বর বিদ্রোহীই এখন চিনতে পারছে না।

আগুয়ান দুজনেই পিছিয়ে যায় এক পা। উঠে দাঁড়িয়েছে অন্য পাঁচ পুরুষ। এখন ওরা সাতজন।

বিদ্রোহীর হাত চলে যায় হিপ পকেটে। খুদে রিভলভার ওর নিত্য সঙ্গী।

কণ্ঠে মিনতি জাগায় বিমান-সুন্দরী—'প্লিজ। কেন বুঝছেন না? আপনি তো একাই উঠেছেন। একাই বসেছিলেন। কেউ তো আপনার সঙ্গে ছিল না। ইউ আর হ্যাভিং ডিলিউশনস।

যেন অবোধ বালকের মতিভ্রম ঘোচাতে চাইছে স্টুয়ার্ডেস।

'স্ত্রী আমার সঙ্গেই ছিল না—এটাই তো বলতে চান?' বলতে বলতে শূন্য সিটটার দিকে এগিয়ে যায় বিদ্রোহী—'কুশন এখনও গরম বডির গরমে। দেখুন—'

কুশন কিন্তু ঠান্ডা। কেউ সেখানে বসেছে বলে তো মনে হচ্ছে না। আস্তে আস্তে হাত তুলে নেয় বিদ্রোহী।

স্ত্রী নেই প্লেনে। একসময় যে ছিল, তারও কোনও প্রমাণ নেই। প্যাসেঞ্জার আর কর্মীরাও বলছে, শুকতারা ওঠেনি প্লেনে। প্লেন থেকে তাকে বাইরে নিয়ে যাওয়ারও কোনও পথ নেই।

পেছন দিকে পাইলটের দরজা ফাঁক হচ্ছে একটু-একটু করে। তন্ময় হয়ে থাকায় ওদিকে খেয়াল ছিল না বিদ্রোহীর। নি:শব্দে বেরিয়ে এল কোপাইলট। দু-হাতে উঁচু করে ধরল আগুন নেভানোর সিলিন্ডার। সবেগে নিক্ষিপ্ত হল মানুষটার মাথার ওপর। যে মানুষটার দিকে সভয়ে তাকিয়ে রয়েছে সকলেই।

লুটিয়ে পড়ে বিদ্রোহী।

ট্র্যাজেডির পরের ঘটনা

পোর্ট ব্লেয়ার এয়ারপোর্ট।

চারজন পুলিশ আর তিনজন ফিল্ড অ্যাটেনড্যান্ট—প্রত্যেকেই লোহায় পেটা ভীম বললেই চলে—দাঁড়িয়ে রয়েছে বিদ্রোহী বর্মনের গা-ঘেঁষে। এত কাছে থাকার কারণ, দু-দুবার বিদ্রোহীর কালো চোখে উন্মাদ অগ্নির নৃত্য দেখা গেছে।—মাসল গুটিয়ে ইস্পাতের বল হয়ে গেছে—প্রতিবারেই তাকে চেপে ধরেছে সাতজন একসঙ্গে। বিদ্রোহীর মুখাবয়ব খড়ির মতন সাদা।

সে বলছে, 'ফোন করুন দমদমে। কতবার বলব?'

'করা হয়েছে', নরম গলায় জবাব দিল এয়ারপোর্ট ম্যানেজার। 'আপনার প্যাসেজের কোনও রেকর্ড সেখানে নেই।'

'বললাম তো, লাস্ট মিনিটে জোর করে উঠেছিলাম প্লেনে—আমি আর আমার স্ত্রী। রেকর্ড থাকবে কী করে? কিন্তু ফিল্ডের লোকজন—'

'তারাও বলছে একই কথা। প্লেনে উঠেছেন একা। সঙ্গে স্ত্রী ছিল না।'

দৃষ্টি বিনিময় ঘটে চার পুলিশের চোখে—তাৎপর্যপূর্ণ চাহনি।

'তবে গেল কোথায় আমার ওয়াইফ? কাউকেই বিশ্বাস করাতে পারছি না কেন?'

সাতজোড়া অবিশ্বাসভরা চোখ চেয়ে রইল বিদ্রোহীর দিকে। সাতজোড়া হাতও এগিয়ে এল বেগতিক দেখলেই আঁকড়ে ধরার জন্য। বিদ্রোহীর চোখে জ্বলছে মশাল। মনের ভেতর প্রোজ্জ্বল হয়ে রয়েছে শুকতারার দুটি চোখ। টলটলে একজোড়া দীঘি—নিস্তরঙ্গ শান্ত চাহনি—নিমেষহীন নয়নে শুধু দেখছে বিদ্রোহীকে—যেভাবে জ্যোৎস্না রাতে অরণ্য অঞ্চলে চাঁদের দিকে তাকিয়ে থেকেছে—ঠিক সেইভাবে—বিদ্রোহী বলেছিল—'কী মুশকিল। পূর্ণিমার রাতে এত কষ্ট করে জঙ্গলে নিয়ে এলাম —আর তুমি দেখছ চাঁদ? আমি কি জিরো হয়ে গেলাম?' নরম চাহনি বিদ্রোহীর পানে ফিরিয়ে শুভ্র দাঁতে চাঁদের আলোর ঝিলিক তুলে শুকতারা বলেছিল, 'হে আর্যপুত্র, তুমিই যে আমার চাঁদ। অবাক হয়ে তখন ভাবছিলাম, আমার চাঁদ আকাশে গেল কী করে?'

বুকের ভেতর কনকন করে ওঠে বিদ্রোহীর। ও যেন শুনতে পায় মনের আয়নায় শুকতারার চোখ বলছে, 'আমার চাঁদ আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছে না কেন?'

ইচ্ছে হয়েছিল সেই মুহূর্তে চিৎকার করে বলে, 'শুকতারা তুমি কোথায়? বন্দিনী কার কাছে? কীভাবে?'

নিশ্চয় দুই চক্ষু তখন অগ্নিময় হয়ে উঠেছিল, স্ফুলিঙ্গ বর্ষণও করেছিল। আর সেই উন্মাদ চাহনি দেখেই সাত জোয়ান সাতরকম ভাবে ওকে চেপে ধরেছিল—নড়বার উপায় ছিল না বিদ্রোহীর।

আর ঠিক তখনি যেন ঝঙ করে একটা আওয়াজ হল ব্রেনের মধ্যে। যেন পিয়ানোর তার ছিঁড়ে গেল।

এল অ্যাম্বুলেন্স। নিয়ে গেল মামুলি হাসপাতালে নয়—স্যানিটারিয়ামে।

'নার্স—'

ভাঙা কর্কশ কণ্ঠস্বর। কাহিল। নিজের কণ্ঠস্বর? চিনতে অসুবিধে হয় বিদ্রোহীর। সাদা জানলার সামনে দাঁড়িয়েছিল শুভ্রবেশ পরা একটি মেয়ে। এ ঘরের দেওয়ালও সাদা। কিন্তু জানলায় লোহার মোটা গরাদ। এত মজবুত গরাদ তো গেরস্থ বাড়িতে থাকে না। পায়ের কাছে দরজাটাও স্টিলের পাত দিয়ে তৈরি। এখন রয়েছে বন্ধ।

সাদা পোশাক পরা মেয়েটি এল বিদ্রোহীর শয্যার পাশে—'কী বলছেন?'

'কটা বাজে এখন?'

'বিকেল সাড়ে চারটে।' নার্সের চোখে পেশাদারি হাসি—সেই হাসি ভেদ করে বিদ্রোহী দেখল—মনে মনে মেয়েটা কিন্তু হাসছে না—যেন সুদূরের পানে চেয়ে আছে।

বিদ্রোহীর সুদূর অতীতের দিকে কি?

'সাড়ে চারটে? তার মানে অজ্ঞান ছিলাম আঠারো থেকে কুড়ি ঘণ্টা।'

'অজ্ঞান ছিলেন তিন সপ্তাহ। ব্রেন ফিভার হয়েছিল আপনার।'

'তিন সপ্তাহ!'

ঝটিতে খাটে উঠে বসে বিদ্রোহী, 'আর দেরি নয়। যেতে হবে এখুনি।'

আস্তে ঠেলে বিদ্রোহীকে শুইয়ে দেয় নার্স। বাধা দেওয়ার শক্তি নেই বিদ্রোহীর। বড় দুর্বল। শুয়ে পড়ে অসহায়ভাবে। মুখে কথা নেই। নীরবে চেয়ে আছে নার্সের দিকে।

বলে অবশেষে, 'ওভাবে চেয়ে আছেন কেন? কী দেখছেন? মাথার ভেতরটা অসাড় হয়ে থাকায় এর বেশি কথা বলতেও পারে না। এই অসাড়তার মধ্যে রয়েছে নিবিড় শান্তি—অস্থির উদ্দামতার লেশমাত্র নেই।

এখানে আসবার আগে কী ঘটেছিল, তা মনে পড়ছে না। বাতাসে মিলিয়ে গেল নাকি শুকতারা? প্লেনের দরজা কি খুলেছিল?

নার্স বললে নরম গলায়, 'কেন তাকাচ্ছি? আপনি যে অনেক পালটে গেছেন, এখানে আসবার পর।'

বলে, একটা আয়না ধরল বিদ্রোহীর মুখের সামনে।

ও দেখল নিজেকে। নিজের মুখকে। কিন্তু এ মুখ তো তার মুখ নয়।

তার চুল ছিল কয়লা কুচকুচে। আয়নার যার মুখ দেখা যাচ্ছে তার চুল যে ধবধবে সাদা—তুষার শুভ্র। এ মুখের চামড়া সাদা কাপড়ের মতন—অথচ ওর ফরসা মুখ ছিল রোদ ঝলসানো। প্রাণশক্তিতে রাঙানো। এ মুখে কোনও ভাব-বিকাশ নেই—যেন একটা মোমের মুখোশ।

আর এই ভাবহীনতার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রয়েছে ভয়ানক কিছু। যাকে স্বাভাবিক বলা যায় না। মড়ার মুখ—জীবিত মানুষের মুখ এমন হয় না। এক্কেবারে অনড় মুখাবয়ব। দেখলে ভয় হয়। স্বাভাবিক মোটেই নয়। প্রাণময় প্রাণীর মুখ কি এমন হয়? না। স্পন্দনহীন সেই মুখ দেখলেই হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসে।

দম আটকে আসে বিদ্রোহীর। দলা পাকিয়ে ওঠে গলার কাছে। হাসবার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না।

ঠোঁট, ভুরু, মুখের সমস্ত মাংস একেবারে স্থির।

চেষ্টা করে কপাল কুঁচকানোর—ব্যর্থ হয়। পারে না ভেংচি কাটতেও।

কোমল কণ্ঠে বললে নার্স, 'মুখের পেশি প্যারালাইজড হয়ে গেছে। না, না, পারমানেন্ট প্যারালিসিস নাও হতে পারে।' কণ্ঠস্বরেই প্রকাশ পায় সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা—'চিরকাল এমন থাকবে না।'

'হল কী করে?' বিদ্রোহীর কণ্ঠস্বর বিলক্ষণ আড়ষ্ট।

'সঠিক বলা যাচ্ছে না। দুটো কারণ অনুমান করা হয়েছে।'

'কী কী?'

'প্লেনে আপনার মাথায় মেরেছিল কোপাইলট। ব্রেনে চোট লাগার দরুন হতে পারে।'

'আর?'

'নার্ভ শক—ডিলিউশনের জন্যে।'

'ডিলিউশন? আমার?'

'হ্যাঁ।'

নিজের অনড় মুখের দিকে চেয়ে থাকে বিদ্রোহী। সাদা কাপড়ের মতন মুখ। কয়লা কালো চোখ দুটো শুধু ধক-ধক করছে তার মাঝে।

জানলার দিকে এগিয়ে যায় নার্স। বন্ধ করে পাল্লা।

আঙুল দিয়ে মুখে চাপ দেয় বিদ্রোহী। আঙুল ঠেকেছে গালে, অথচ তা টের পায় না। চামড়ায় নেই অনুভূতিবোধ।

ঘুরে দাঁড়িয়েছে নার্স। আর্ত চিৎকার করে ওঠে পরক্ষণেই।

চোখ তুলেছিল বিদ্রোহী। নার্সের আতঙ্ক আঁকা মুখচ্ছবি দেখেই ফের চোখ নামিয়েছিল দর্পণের ওপর।

শিউরে উঠেছিল নিজেই।

আঙুলের ডগা দিয়ে মুখের চামড়ায় চাপ দিয়েছিল বিদ্রোহী। যেখানে চাপ দিয়েছে, সেখানকার মাংস ঠেলে উঠে গেছে হনুর ওপর।

তরঙ্গায়িত মাংস বিকটাকার করে তুলেছে মুখগুলকে। অবর্ণনীয় সেই আকৃতি কাপড়ের মতন ফ্যাকাশে চামড়ার সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় প্রকৃতই লোমহর্ষক।

আঙুল দিয়ে টিপে-টিপে মাংসর দলা নীচে নামিয়ে আনে বিদ্রোহী। তারপর হাতের চেটো দিয়ে তোলে আর নামায় দুই হনুর ওপরকার মাংস। তারপর আঙুল দিয়ে।

কাজ হচ্ছে আঙুলেই। চেটোর দরকার হচ্ছে না। যখন খুশি মুখের মাংস নড়িয়ে সরিয়ে দিয়ে মুখের চেহারা পালটে দিতে পারে বিদ্রোহী। মাংস যেখানে ঠেলে দিচ্ছে থেকে যাচ্ছে সেখানেই। ফিরে আসছে না আগের জায়গায়।

ঠিক এই সময়ে ঘরে ঢুকলেন স্টাফ ডক্টর।

'বা:। জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন? কী রকম লাগছে?'

বিদ্রোহীর মন এখন ওর শরীরের মতনই ছুটছে তুরঙ্গ গতিতে। মাত্র মিনিট কয়েক আগে জ্ঞান ফিরে পেয়েই জেনেছে ব্রেনের চোট কী কাণ্ড ঘটিয়ে বসেছে মুখের ওপর।

একই সঙ্গে বুঝে নিয়েছে দুটো সার সত্য।

শক্তি সঞ্চয় করতে হবে খুব দ্রুত—এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে।

বেরনোর পথ প্রশস্ত করার জন্যে প্রকাশ করা চলবে না শুকতারা বিহনের অন্তর যন্ত্রণা—ভান করে যেতে হবে যেন শুকতারা নেই—কোনওকালেই ছিল না তার অস্তিত্ব।

বললে সুস্পষ্ট গলায়, 'খুব ভালো লাগছে।'

'ফাইন। এবার বলুন আপনার স্ত্রীর কথা।'

'স্ত্রী? আমার? আমি তো ব্যাচেলর।'

উজ্জ্বল হয় ডাক্তারের মুখ, 'ভেরি ফাইন। জানতাম আপনার বিভ্রম একদিন কাটবেই। এবার আপনাকে ডিসচার্জ করা যায়।'

'থ্যাংকিউ, ডক্টর।' চোখে চোখ রেখে বলে গেল বিদ্রোহী—চোখের মধ্যে দিয়ে মনের কথাও পড়ে নিল। ডাক্তারের অভিপ্রায় ছিল মতিভ্রমের ভিত্তিতে মারদাঙ্গা রোগীদের ওয়ার্ডে তাকে চালান করা, যেখানে আছে, দেওয়ালে প্যাড লাগানো খুপরি ঘর—ঘরে ঘরে উন্মত্ত নৃত্য আর গজরানি।

অল্পের জন্য ভয়ানক এই পরিণতি এড়িয়ে গেল বিদ্রোহী।

শক্তি সঞ্চয় করে গেল পরের কয়েকটা দিন। ব্যায়াম, পুষ্টিকর খাদ্য আর বিশ্রাম। দিনে-দিনে বৃদ্ধি পেল শক্তির ভাণ্ডার। অবসর সময়ে শুধু ভাবল একজনের কথা। শুকতারার কথা।

গেল কোথায় মেয়েটা? প্লেন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথ তো ছিল না। তা সত্বেও অন্তর্ধান ঘটিয়েছে কতিপয় দুর্বৃত্ত।

কেন?

বারংবার এই একটি প্রশ্নের জবাব খুঁজেছে মনের মধ্যে। মাঝে-মাঝে ভয় হয়েছে, ভাবতে ভাবতেই না পাগল হয়ে যায়।

কীভাবে?

অজান্তে এ কোন চক্রান্তজালে জড়িয়ে পড়ল বিদ্রোহী তার সুন্দরী শুকতারাকে নিয়ে? নারকীয় কর্মকাণ্ডের মূলে নিশ্চয় আছে অতীব নিষ্ঠুর আর অতিশয় শক্তিশালী একটা গোষ্ঠী। বিদ্রোহী একাই নয়—হয়তো আরও অনেকে শিকার হয়েছে হৃদয়হীন এই দলটির।

স্যানিটারিয়াম থেকে ডিসচার্জ সার্টিফিকেট পেয়ে গেল বিদ্রোহী। ঢুকেছিল একটা মানুষ—বেরিয়ে গেল একটা মেশিন।

বরফ আর ধীরগতি আগুন দিয়ে গড়া একটা মেশিন।

এ মেশিনের পাওয়ারফুল ইঞ্জিন শুধু একটা গিয়ারেই বেঁধে রেখেছে নিজেকে...

যে গিয়ারের লক্ষ শুধু দুটি কাজ—

স্ত্রী উদ্ধার। এবং...

যে ফোর্স এইরকম ফ্যানট্যাসটিক পন্থায় তার জীবনে বিপর্যয় আবাহন করতে পারে সেই ফোর্সকে সমূলে ধ্বংস করা।

বিদ্রোহীকে দেখলেও এখন আর মানুষ বলে মনে হবে না। যেন স্টিল দিয়ে গড়া।

চুল তার তুষার শুভ্র, ক্রোমিয়ামের মতন। ভাবলেশহীন অতীব ভয়ঙ্কর মুখ ইস্পাতের মতন সাদা। এই মুখে গাঁথা কালো চোখ দুটো এমনই নিতল যে ক্ষণেক দৃষ্টিপাতেই মনে হবে যেন কুয়াশা আর বরফ দিয়ে ঠাসা এক তুহিনশীতল জগতের দিকে চোখ চলে যাচ্ছে। এমনকী পরনের স্যুটটাও বহন করছে এই অভিব্যক্তি—এ স্যুটের রং ইস্পাত-ধূসর।

পোর্টব্লেয়ার এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে বুকটা ধক করে উঠেছিল রানওয়ের ওপর অলস ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে থাকা একটা মস্ত প্লেন দেখে। একই সঙ্গে সাদা মুখের পটভূমিকায় চোখের মশাল জ্বলে ওঠে ধিকিধিকি। বিদ্রোহী জানে, এ প্লেনের দিকে ফিরে তাকানো মানেই বুকের খাঁচায় মহা ভয়ঙ্কর সেই আঘাতটাকে ফিরিয়ে আনা। এটাও জানে, প্রতিহিংসার অনলে বৈরী শক্তিপুঞ্জকে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে গেলে এই দুটোই তার দরকার।

ধকধকে চোখ দেখেই কিন্তু এক পা পেছিয়ে গেছে এজেন্ট। বলে আমতা-আমতা করে, 'ইয়েস স্যার, দমদমের প্লেনে খালি রয়েছে একটা সিট।'

'থ্যাংকিউ,' ঠোঁট নড়ে না বিদ্রোহীর—শব্দটা বেরিয়ে এল অতল কূপ থেকে—যেখানে অনির্বাণ রয়েছে প্রতিহিংসার আগুন।

প্লেনে উঠে বসে বিদ্রোহী। তাকিয়ে থাকে অ্যাটেনড্যান্টরা। সেদিকে চোখ নেই ওর। ও এখন একা, একেবারে একা।

প্লেন ছুটে যায় রানওয়ের ওপর দিয়ে।

প্রথম সূত্র

জীবনে অনেক পেয়েছে বিদ্রোহী বর্মন। সব পাওয়াকে ছাড়িয়ে গেছে একা শুকতারা।

শেষ অভিযান চলেছিল অস্ট্রেলিয়ায়। তিরিশ লাখ উপার্জনের পর বউকে নিয়ে ঘুরেছিল অর্ধেক পৃথিবী। বার্মুডা, হাওয়াই, ক্যালিফোর্নিয়া, ফ্লোরিডা, আলাস্কা—এখানকার অনেক মানুষ আজও মনে রেখেছে এই দুজনকে। বিদ্রোহীর মতন শুকতারাও ছিল ভাইটাল এনার্জির সজীব বোমা। যেখানে গেছে, সেখানেই প্রাণশক্তির বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। শুকতারার সরু কোমর আর বড় চোখ, পাতলা ঠোঁট আর ঠেলে বেরিয়ে আসা চিবুক নারী পুরুষ সবার মনেই দাগ কেটে গেছে। ওর উছল হাসির মধ্যে ঝরনার সঙ্গীত কেউ ভুলবে না। যেন একটা চৌম্বক শক্তি দিয়ে আকর্ষণ করত সবাইকে এবং জয় করত মনের শক্তি দিয়ে।

মন। শুকতারার এই আশ্চর্য মনের ক্ষমতার হদিশ পায়নি বিদ্রোহী নিজেও। চোখে চোখ রেখে যেমন বিদ্রোহীর মনের কথা হুবহু বলে দিয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে চোখে চোখ রেখে শুকতারার মনের কথার প্রতিধ্বনিও বিদ্রোহীর মাথার মধ্যে জাগ্রত হয়েছে। কীভাবে এটা হয়, তা বুঝতে পারেনি বিদ্রোহী। শুকতারাও বোঝাতে পারেনি। জিগ্যেস করলে শুধু হেসেছে। খুব চেপে ধরলে বলেছে, 'জানি না কেন এমন হয়। মাঝে-মাঝে মনে হয়, আমার ব্রেনের রেডিও তোমার ব্রেনের রেডিওর সঙ্গে এক টিউনিং-এ বাঁধা।'

'রেডিও?' অবাক হয়েছে বিদ্রোহী।

'তাছাড়া আর কী বলব বলো? তুমি আর আমি একই বৃন্তে দুটি ফুল। একই যন্ত্র—দুটো খাঁচায় ঠাসা। আমি শুকতারা—তুমি বিদ্রোহী;'

'শুনেছি মাথায় চোট পেলে অদ্ভুত ক্ষমতা অনেকের মধ্যে এসে যায়। পিটার হারকোস ছিলেন রঙের মিস্ত্রি। দোতলার ভাড়া থেকে পড়ে যান। মাথায় চোট লাগার পর অর্জন করেছিলেন ই এস পি।'

'সেটা কী?'

'এক্সট্রা সেনসরি পারসেপশন। অতীন্দ্রিয় অতি-অনুভূতি বোধ। শুকতারা, তোমার মাথায় কি কখনও চোট লেগেছিল?'

'সে তো তুমি দিয়েছিলে।'

'আমি!'

'সেই যে গো, কোলে তুলে নিয়ে শূন্যে ছুড়ে দিয়ে আবার লুফে নিচ্ছিলে—খটাং করে মাথা লাগল সিলিং-এ।'

'ধ্যেৎ। তার আগে থেকেই তোমার মনের এই শক্তি দেখে আসছি। বিশেষ করে চাঁদনি রাতে তোমার এই ক্ষমতা যেন বেড়ে যায়। পূর্ণিমার চাঁদ যখন গোল রূপোর থালার মতন—'

'পূর্ণিমা সবাইকেই অল্পবিস্তর পাগল করে দেয়। আমি তো হবই।'

'না, শুকতারা, না—পূর্ণিমায় তুমি ভয়ানক পাওয়ারফুল।'

হোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে-দেখতে এইসব কথাই ভাবছিল বিদ্রোহী।

একা। আশপাশের ঝুলবারান্দায় জনপ্রাণী নেই। আর ঠিক এই সময়ে...

শুকতারা কথা কয়ে উঠল ওর মাথার মধ্যে।

'শুনছ? বলি ও আর্যপুত্র, শুকতারা সুন্দরীর কথা কি শুনতে পাচ্ছ?'

থ হয়ে যায় বিদ্রোহী।

পাগল হয়ে গেল নাকি?

পরক্ষণেই চোখ ঘুরে যায় চাঁদের দিকে।

আজ পূর্ণিমা।

আজই তো মনের শক্তির তুঙ্গে যেত তার চাঁদবদনি ধনি—সুন্দরী শুকতারা।

শুকতারা কি তবে বেঁচে আছে?

শুকতারা কি তার মনের কথা ধরতে পারছে?

আকুলভাবে মনের সব শক্তি জড়ো করে মনে-মনে আউড়ে যায় বিদ্রোহী, 'শুকতারা। শুকতারা। তুমি কোথায়?'

জবাব তো এল না। একই কথা আবার ধ্বনিত হয়ে চলেছে মাথার মধ্যে, 'বলি ও আর্যপুত্র, তোমার শুকতারা যে বড় একা, বড় একা, কথা শুনতে পাচ্ছ?'

দুহাতে মাথা চেপে বারান্দাতেই বসে পড়ে বিদ্রোহী। রগের শিরা ফুলে উঠেছে দড়ির মতন। পুঞ্জীভূত শক্তি দিয়ে বৃথাই মনে মনে বলে যাচ্ছে, 'শুকতারা। শুকতারা। কোথায় তুমি? তুমি কি জীবিত না মৃত? তুমি ইহলোকে না পরলোকে? এ কার কথা শুনছি? প্রেতিনী শুকতারার না দেহিনী শুকতারার?'

জবাব নেই। একই কথা ঘুরে-ঘুরে আছড়ে পড়ছে বিদ্রোহীর মাথার কন্দরে, 'শুনছ? শুনতে পাচ্ছ? কথা বলছ না কেন?'

ফ্ল্যাস খেলে যায় বিদ্রোহীর মগজে।

মাথায় চোট। কোপাইলট তার মাথায় মারার পর মুখের পেশির ওপর কন্ট্রোল হারিয়েছে বিদ্রোহী।

অঘটন ঘটেছে আর এক ক্ষেত্রেও।

শুকতারার কথাই যদি ঠিক হয় তাহলে বিদ্রোহীর ব্রেনের রেডিওটা বিকল হয়ে গেছে—অথবা, টিউনিং নষ্ট হয়ে গেছে।

নয়তো...

যা একেবারেই অবিশ্বাস্য তাই ঘটছে।

শুকতারা এখন বিদেহিনী।

না। আর সময় নষ্ট করা সমীচীন নয়।

এই মুহূর্তে পুলিশের কাছে যাওয়াও অসমীচীন। পুলিশ তার কথার একটা অক্ষরও বিশ্বাস করবে না।

এমন একজনের কাছে যেতে হবে যাকে পুলিশ মানে, জানে, চেনে।

কিন্তু সেরকম মানুষকে তো চেনে না বিদ্রোহী। ভবঘুরে জীবন যাপন করেছে বউকে নিয়ে মাসের পর মাস। বড়লোক ভ্যাগাবন্ড ছাড়া সে কিছুই নয় এই শহরের কলকাতায়। উঠেছে দামি হোটেলে শুধু পয়সার জোরে। তখন শুকতারা ছিল সঙ্গে।

এখনও উঠেছে সেই হোটেলে—এখন শুকতারা নেই সঙ্গে।

ম্যানেজারকে জিগ্যেস করবে?

ভুল হবে। ভয়ানক ভুল। যে শক্তিচক্রের সঙ্গে মোকাবিলা করতে নেমেছে তার চরচক্র কি হোটেলেও নেই? শুকতারাকে নিয়ে সে তো এই হোটেল থেকেই রওনা হয়েছিল দমদম এয়ারপোর্ট অভিমুখে। এই ম্যানেজারই ট্যাক্সি বুথ থেকে ডাকিয়ে এনেছিল ট্যাক্সি।

তাহলে উপায়?

বুদ্ধিটা মাথায় এসে যায় হঠাৎ।

ইয়োলো পেজ। সব বড় শহরেই চালু হয়ে গেছে এই সিসটেম। বিজনেস ডাইরেক্টরি। অনেক শহরে থাকে টেলিফোন গাইডের সঙ্গে।

ঘরে ফিরে আসে বিদ্রোহী। টেলিফোনের পাশেই রয়েছে পুরোনো টেলিফোন গাইড। তুলে নিয়ে পাতা ওলটাতেই চোখে পড়ে ইয়োলো পেজ সেকশান।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ হেডিং-এর নীচে চোখ বুলিয়ে যায়। মড়ার মুখে এখন জ্বলছে কালো অঙ্গার। চোখ আটকে যায় সবচেয়ে বড় নামটায় যার শাখা অফিস ছড়িয়ে আছে পৃথিবীর প্রায় সব বড় শহরে।

প্রেমচাঁদ প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি। নামটা আগেও শুনেছে বিদ্রোহী। ক্যালিফোর্নিয়ায় থাকার সময়ে।

অলস নয়নে মুখর টেলিফোনটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল ইন্দ্রনাথ। তারপর তুলে নিল রিসিভার, 'ইন্দ্রনাথ রুদ্র বলছি।'

'আমি বিদ্রোহী বর্মন বলছি।'

'চিনতে পারলাম না।'

'স্বাভাবিক, আমি এই শহরের লোক নই। তবে প্রেমচাঁদ মালহোত্র আমাকে চেনে।'

'প্রেমচাঁদ প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি? বারণ করেছিলাম আমার ফোন নাম্বার যেন...'

'কাউকে না দেয়। আমাকে তা বলেওছেন মি: মালহোত্র। তবে সিডনিতে আমি ওর একটা উপকার করেছিলাম। খুব ছোট্ট উপকার। ওঁর প্রাণটাকে একটিমাত্র বুলেটের খপ্পর থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলাম। তারই প্রতিদানে—'

'মনে হচ্ছে আপনি অত্যন্ত ডেয়ারডেভিল?'

'এবং রাগলে চণ্ডাল।'

'এই মুহূর্তে রেগেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কার ওপর?'

'যারা আমার বউকে ফ্লাইং প্লেন থেকে হাওয়া করে দিয়েছে।'

'কৌতূহল জাগিয়েছেন কিন্তু।'

'নিরসন করা টেলিফোনে সম্ভব নয়। আমার পক্ষেও আপনার কাছে যাওয়া সঙ্গত নয়।'

'অতএব আমিও আসছি। প্রেমচাঁদ কখনও ছ্যাঁচড়া কেস আমাকে দেয় না।

'আসুন। কিন্তু হোটেলে কেউ যেন জানতে না পারে আপনি এসেছেন আমার কাছে।'

'আই সি। আর ইউ আন্ডার অবজারভেশন?'

'আই থিঙ্ক সো।'

'ডোন্ট ওরি। আই নো মেনি টেকনিকস।'

দুজনে এখন মুখোমুখি বসে। ইন্দ্রনাথ রুদ্র আর বিদ্রোহী বর্মন।

ইন্দ্রনাথ বললে, 'আপনার প্রাণ যে-কোনও মুহূর্তে যেতে পারে, সেইসঙ্গে আমার।'

বিদ্রোহী—'ভয় দেখিয়েছে মনে হচ্ছে?'

ইন্দ্রনাথ—'আপনার টেলিফোন রাখবার সঙ্গে-সঙ্গে। ছোট্ট উপদেশ—আমি যেন নাকে তেল দিয়ে ঘুমোই। নইলে খতম কহানি শুরু হয়ে যাবে।'

বিদ্রোহীর মড়ার মতন মুখে কোনও ভাববিকৃতি দেখা গেল না—শুধু প্রদীপ্ত হল চোখের অঙ্গার। বলে গেল ইন্দ্রনাথ, 'ঘরে আলো জ্বলছে, স্টার টিভি চলছে, চলবে। আমারও সিক্রেট প্যাসেজ আছে, আপনাকে বলা যাবে না।'

'গুড, এখানে ঢুকলেন কীভাবে?'

'খোলাখুলি।'

'মানে?'

'সবার নাকের ডগা দিয়ে,' বলে আর কথা না বলে এক টুকরো কাগজ বিদ্রোহীর চোখের সামনে মেলে ধরল। তাতে লেখা আছে :

এদেরকে ধরতে হলে অথবা এই রহস্যের মীমাংসা সূত্র বের করতে হলে সম্মুখ-যুদ্ধ অনিবার্য। কোনও কথা না। এ ঘরে লুকোনো মাইক্রোফোন আর চোরা টিভি ক্যামেরা থাকতে পারে। এখুনি উঠুন। আমার সঙ্গে বেরোন। ট্যাক্সি ধরব। তারপর দেখি কী হয়।

পড়া সাঙ্গ করে ইন্দ্রনাথের মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে নিল বিদ্রোহী। অপূর্ব সুন্দর মানুষ। যেন টুসকি দিলে রক্ত ফেটে পড়বে গালে। মর্মর মূর্তি সহসা সজীব হয়ে গেলে বুঝি চোখমুখ চিবুকের গড়ন এমন নিখুঁত হয়। সবচেয়ে সুন্দর দুটি চোখ। ভাবালু। স্বপ্নিল। কবি অথবা দার্শনিক বলা সঙ্গত। মানুষটার পরনেও মুগার পাঞ্জাবি আর চুনোট করা ধুতি। গা ঘিরে ভুর-ভুর করছে দক্ষিণ ফ্রান্সের ল্যাভেন্ডারের খোশবাই।

এমন মানুষটা মানুষ-খুনেদের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে চায়? দ্বিধা জাগে বিদ্রোহী বর্মনের চোখেমুখে।

নীচে নেমে আসে দুই মূর্তি। সটান ঢুকে পড়ে ম্যানেজারের চেম্বারে। সে ভদ্রলোক আকার-আয়তনে ক্ষুদ্র জলহস্তী বিশেষ। পরনে ব্লু সাফারি স্যুট। কেশবিরল মাথাটা প্রকাণ্ড। মুণ্ডটাও বিরাট। নিষ্প্রভ চক্ষুযুগল জানিয়ে দিচ্ছে, বিপুল কলেবরের এই জীবনটির যকৃৎ সুস্থ নয়। অতিরিক্ত মদিরা সেবন নিশ্চয় হেতু, তাই দু-চোখের নীচে দুটো থলি ঝুলছে। চিবুকের নীচেও তিনথাক মাংস গরুর গলকম্বলের মতন ঝুলছে। দুই চিবুকের দুই কোণে যেন দুটি গলগণ্ড ফুলে রয়েছে। মিশকালো মানুষটা পান খাওয়া দাঁত দেখিয়ে কাষ্ঠ হেসে বললে, 'বলুন স্যার?'

বিদ্রোহী বললে, 'আমার স্ত্রী কোথায়?'

মড়া গাছের মতন চোখ বড় করে ম্যানেজার বললে, 'আপনি তো একা এলেন স্যার।'

'গতবার আমার সঙ্গে ছিল। মনে পড়ছে?'

'অফকোর্স...রিয়াল বিউটি।'

'তিনি কোথায়?'

'আপনি তো সঙ্গে নিয়ে দমদম এয়ারপোর্টে চলে গেলেন।'

'তারপর?'

'চলে গেলেন পোর্টব্লেয়ার—না, না, উনি যাননি।'

'আমার স্ত্রী যায়নি?' মুখোশ মুখে অঙ্গার চক্ষু জ্বালিয়ে বললে বিদ্রোহী।

'চিঠি পড়ে তাই তো জেনেছি।'

'চিঠি। কার চিঠি?'

বেল টিপল ক্ষুদ্র জলহস্তী। ক্লার্ক ঢুকল ঘরে, 'এঁকে চেনো? মিস্টার বর্মন। গতবার এখান থেকে এয়ারপোর্ট গেছিলেন উইথ ওয়াইফ। তারপর একটা চিঠি আসে—মিসেস বর্মনের। মনে আছে? কী লেখা ছিল চিঠিতে? উনি পোর্টব্লেয়ার যাচ্ছেন না। দিল্লির এডিকং হোটেলে যাচ্ছেন, এখানে চিঠিপত্র এলে যেন রিডাইরেক্ট করে দেওয়া হয়। ঠিক বলেছি? যাও।'

বিদ্রোহীর দিকে তাকিয়ে শেষ করল ম্যানেজার, 'গেস্টদের খবরাখবর রাখতে হয় স্যার।'

'আই সি।' চিবিয়ে-চিবিয়ে বলে ইন্দ্রনাথের দিকে তাকায় বিদ্রোহী। ভেতরে পাওয়ারফুল ইঞ্জিনটা চালু হয়ে গেছে। ক্ষুদ্র জলহস্তীর মুণ্ডুটা মুচড়ে ছিঁড়ে আনতে ইচ্ছে করছে।

স্মিত মুখে বললে ইন্দ্রনাথ, 'ট্যাক্সি বুথ থেকে ট্যাক্সি ডাকিয়ে এনেছিলেন আপনি?'

খুবই সংযত স্বর ইন্দ্রনাথের। অথচ যেন পেতলের ঘণ্টা বাজছে প্রতিটি শব্দ উচ্চারণে। হুঁশিয়ার হয়ে যায় জলহস্তী। ম্যানেজার—'ও ইয়েস।'

'কত নম্বর ট্যাক্সি, সে রেকর্ডও নিশ্চয় আছে। ভি আই পি গেস্টদের সিকিউরিটির ভার তো আপনার হাতে। ট্যাক্সি ড্রাইভারকে ডাকান।'

'তোমার ট্যাক্সিতেই ইনি গেছিলেন এয়ারপোর্ট? সঙ্গে ছিলেন ম্যাডাম?'

'আগে গেছিলেন এয়ারলাইন্সের সিটি অফিসে।' নিরক্ত মুখে বলে গেল শুঁটকে ট্যাক্সি ড্রাইভার। বিদ্রোহীর মুখ আর চোখ দেখে তার হৃৎপিণ্ড চঞ্চল হয়েছে। তাই জোর করে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ইন্দ্রনাথের দিকে।

ইন্দ্রনাথের চোখে জ্বলছে নরম আলো—বিখ্যাত সেই প্রদীপ শিখা—যা শ্রোতার মনের কন্দরে আস্থা জাগিয়ে তোলে—মনকে নির্ভয় করে তোলে।

বললে, 'সিটি অফিস থেকে?'

'দমদম এয়ারপোর্ট।'

'দুজনে?'

'আজ্ঞে না।'

'তা হলে?'

'উনি তো একা গেলেন।' বিদ্রোহীকে তর্জনী সঙ্কেতে দেখায় ট্যাক্সি ড্রইভার 'ম্যাডাম যাননি।'

বিদ্রোহীর সাঁড়াশি আঙুল নিশপিশিয়ে উঠেছে লক্ষ করেই তার কাঁধে হাত রেখে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে মন্ত্রমন্থর কণ্ঠে বললে ইন্দ্রনাথ, 'ঠিক আছে। আসতে পারো।'

'লোকটাকে ছেড়ে দিলেন আপনি—আমি কিন্তু মার্ক করে রাখলাম।' ইস্পাত গলায় বললে বিদ্রোহী বর্মন ছুটন্ত ট্যাক্সির মধ্যে।

ট্যাক্সি উড়ে যাচ্ছে দমদম এয়ারপোর্টের দিকে।

ইন্দ্রনাথ নীরব। স্বপ্নিল চাহনিতে সুদূরের প্ল্যান।

অ্যাকশন শুরু হতে আর বেশি দেরি নেই।

দু-জনের কেউই খেয়াল করেনি সবুজ ফিয়াটটাকে। আসছে ট্যাক্সির পেছন পেছন—অনেক দূরে থেকে ফলো করে চলেছে। ফিয়াটের মধ্যে তিন জোড়া চোখ নিবদ্ধ সামনের ধাবমান ট্যাক্সির দিকে।

দমদম এয়ারপোর্ট।

অভিজাত আকৃতির ধুতি পাঞ্জাবি পরা অতীব সুদর্শন বাঙালিবাবুকে এগিয়ে আসতে দেখে টলেনি এজেন্ট। কিন্তু মুখের পেশি কেঁপে উঠল নাতিদীর্ঘ মানুষটাকে ঠিক পাশেই যন্ত্রদানবের মতন হেঁটে আসতে দেখে। ধাতু দিয়ে গড়া নাকি? মুখভাব অতীব ভয়াল। গনগনে চোখে চেয়ে আছে এজেন্টের দিকে।

জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে শুনে গেল বাঙালিবাবুর প্রথম প্রশ্ন, চেয়ে রইল কিন্তু জাগুয়ার আকৃতির মানুষটার দিকে। দুলছে ডাইনে-বাঁয়ে। লাফিয়ে পড়ার আগের মুভমেন্ট।

বিদ্রোহীকে দেখিয়েই প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়েছিল ইন্দ্রনাথ, 'এঁকে চিনতে পারছেন?'

ঢোঁক গিলে বললে এজেন্ট, 'ইয়েস স্যার।'

'একমাস আগে এসেছিলেন এখানে। সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী। যাচ্ছিলেন পোর্টব্লেয়ার। প্লেনে সিট চেয়েছিলেন দুটো।'

ম্যালেরিয়া রুগির জ্বর প্রকম্প শুরু হয়ে গেছে এজেন্টের সারা শরীরে। অতি কষ্টে অকম্পিত রাখল কণ্ঠস্বর, 'উনি তো একা এসেছিলেন।'

স্ত্রী ছিলেন না সঙ্গে?'

'না। পোর্টব্লেয়ার থেকে ওয়ারলেসে জানতে চেয়েছিলেন একই কথা, 'যা তখন বলেছি, এখনও তাই বলছি।'

'একাই এসেছিলেন?'

সাদা হয়ে গেল এজেন্টের মুখ। গলার স্বর এবার কাঁপছে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

পলকহীন চোখে শুধু চেয়ে রইল বিদ্রোহী। ভয়ানক একটা চক্রান্তের গন্ধ আর চেপে রাখা যাচ্ছে না। এজেন্টের চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। শুধু বিদ্রোহী নয়, শুকতারাকেও সে দেখেছে। অথচ ভীষণ ভয়ে তা স্বীকার করতে সাহস পাচ্ছে না। এই ভয় গ্রাস করেছিল ট্যাক্সি ড্রাইভারকেও। সত্যি স্বীকার করতে পারেনি।

এরা দুজনেই জানে খলনায়কদের।

কিন্তু ইন্দ্রনাথ কথা বলতে দিচ্ছে না বিদ্রোহীকে। হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল এয়ারফিল্ডে। নিরক্ত মুখে ওদের দিকে চেয়ে রইল এজেন্ট।

সবুজ ফিয়াট থেকে তিন ষণ্ডামার্কা ওদের পেছন নিয়ে ঢুকেছিল ভেতরে। ওরা এগিয়ে যেতেই এজেন্টের খুপরিতে গিয়ে ঢুকল তিনজনে।

শোচনীয় হয়ে ওঠে এজেন্টের মুখচ্ছবি।

তিন মূর্তির একজন বললে, 'মুখ খুললে কী ঘটবে মনে আছে?'

গলা ভেঙে গেল এজেন্টের—'আ-আমি তো মুখ খুলিনি। সাফ বলে দিয়েছি একা এসেছিলেন, কেউ ছিল না সঙ্গে।'

দ্বিতীয় ব্যক্তির রিভলভারের চোঙাটা চেপে বসে এজেন্টের তলপেটে, 'কাকে ভয় বেশি? একে না ওই দু-জনকে?'

শিউরে উঠে বললে এজেন্ট, 'ধুতি পাঞ্জাবিকে তো ভয় পাইনি, পাশের লোকটার মুখটা ওরকম কেন? রাইফেলের চাইতেও ভয়ঙ্কর।'

সবচেয়ে কাছের হ্যাঙারে পৌঁছে গেছে ইন্দ্রনাথ আর বিদ্রোহী। ওদের এগিয়ে আসতে দেখেছে একদল পুরুষ। কৌতূহলী চোখে চেয়ে আছে বিদ্রোহীর মরা মুখের পানে—অস্বস্তি বোধ করছে মশাল চক্ষু দেখে।

প্রশ্নবাণ নিক্ষিপ্ত হল, বিদ্রোহীর অনড় অধরোষ্ঠের ফাঁক দিয়ে। অধর নড়ছে না, ওষ্ঠ নড়ছে না—শব্দগুলো শুধু বেরিয়ে আসছে মুখবিবর থেকে।

ভয়াবহ সেই মুখচ্ছবি দেখে কম্পিত কলেবর প্রত্যেকেই।

শুধোয় বিদ্রোহী, 'ঠিক একমাস আগের ঘটনা। প্লেনে উঠেছিলাম পোর্টব্লেয়ার যাব বলে। সঙ্গে ছিল আমার স্ত্রী। কেউ কি মনে করতে পারছেন?'

ধীরে-ধীরে মাথা নাড়ে প্রত্যেকেই। মনে করতে অক্ষম প্রত্যেকেই।

যেন কুয়াশার সঙ্গে লড়ছে বিদ্রোহী। আঘাতে-আঘাতে পর্যুদস্ত করেও টলানো যাচ্ছে না কাউকে। এক্ষেত্রে এরা অবশ্য অসত্য বলছে বলে মনে হচ্ছে না। অশুভ সেইদিনে এদের কাউকে দেখেনি বিদ্রোহী।

হ্যাঙার ছেড়ে সরে আসে ইন্দ্রনাথ। টেনে নিয়ে আসে পরাজিত বিদ্রোহীকে। লম্বকর্ণ এক পুরুষকে দেখেই ইন্দ্রনাথ কৌতূহলী হয়েছে। লোকটা দূরে দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ। অন্যদিকে পাশ ফিরে থাকলেও তার নজর যে ওদের দু'জনের দিকেই, তা চোখের কোণ দিয়ে বুঝেছে ইন্দ্রনাথ।

লোকটার কান দুটো অদ্ভুত লম্বা। নৌকোর পালের মতন যেন পত-পত করে উড়ছে দুপাশে। বেজায় পুরু গর্দান। ষাঁড়ের গর্দানের সঙ্গে তুলনীয়। ইন্দ্রনাথ যে চোখের কোণ দিয়ে তাকে লক্ষ করছে, সে নিজেও যেন তা বুঝেছে। হঠাৎ তাই পায়ে-পায়ে সরে গেল তফাতে।

ইঙ্গিতটা সুস্পষ্ট। যেন পেছন ধরতে বলছে।

বিদ্রোহী এতক্ষণে তাকে নজরে এনেছে। স্মৃতির বিদ্যুৎ ঝলসে দিয়ে গেল মনের গগনকে। লোকটাকে চেনে সে। দেখেছে এই এয়ারফিল্ডেই।

লম্বকর্ণ হাঁটছিল ধীরপদে। ওরা দু'জন হনহনিয়ে নাগাল ধরে ফেলতেই ঘাড় না ফিরিয়ে, সামনে চোখ রেখে, সে বললে, 'পেছনে আসছেন কেন জানি। কিন্তু এখানে কোনও প্রশ্ন নয়। হ্যাঙার থেকে দূরে সরে যাচ্ছি এই কারণেই। এখানে ধুলোরও কান আছে। কোন হোটেলে উঠেছেন?'

ঠোঁটের কোণ দিয়ে কথাগুলো বলে গেল লম্বকর্ণ—পা না থামিয়ে।

দূরত্ব বজায় রেখে রুদ্ধশ্বাসে বললে বিদ্রোহী, 'তোমাকে...'

'পেটে অনেক কথা জমা আছে। বলতে চাই। এখান থেকে বেরোলেই।'

'হোটেল রেডরোজ। ডাইনিং রুম।' চাপা গলায় বলে গেল বিদ্রোহী। যে হোটেলে উঠেছে এটা সে হোটেল নয়। ইন্দ্রনাথ ওকে হাত ধরে টানছে বাইরের দিকে। উত্তেজনায় দুজনের কেউই লক্ষ করল না তিন মূর্তিকে।

অনুসরণ করছে বেশ তফাতে থেকে। তিনজনের একজন বগলের নীচে ঝোলানো রিভলভারে হাত দিয়েছিল। অপর দুজন অলস নয়নে বিমান ক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে ঘাড় নাড়ল নীরবে। গুলি বর্ষণের জায়গা এটা নয়।

ট্যাক্সি ছুটছে হোটেলের দিকে। জানলা দিয়ে উদাস চোখে বাইরে তাকিয়ে ইন্দ্রনাথ। বিদ্রোহীর ধমনীতে উত্তাল হয়েছে রুধির। এই বোধহয় শেষ সুযোগ। লম্বকর্ণের আচরণে প্রতিভাত হয়েছে সততা। শুকতারার সন্ধান সে জানে।

ট্যাক্সির ডানপাশ দিয়ে বেগে বেরিয়ে গেল একটা সবুজ ফিয়াট। ব্রেক টিপে ধরেছে ট্যাক্সি ড্রাইভার। ঘূর্ণ্যমান চাকার আচমকা গতিরোধের আর্তনাদ সচকিত করেছে ইন্দ্রনাথকে।

দেখল, ট্যাক্সি এসে পড়েছে জনবিরল রাস্তায়। দুপাশে ঝোপ আর জঙ্গল। দূরে-দূরে ফ্যাক্টরির শেড।

গ্রীন ফিয়াট ড্যাশ করেছে সামনে দিয়ে—ট্যাক্সিকে এনে ফেলেছে রাস্তার পাশে। রিফ্লেক্স অ্যাকশন চনমনে করে তুলেছে বিদ্রোহীকে। হাত চলে গেছে লুকোনো রিভলভারের সন্ধানে।

কিন্তু রিভলভার নেই সেখানে। পোর্টব্লেয়ার স্যানিটারিয়ামে বের করে নেওয়া হয়েছে। ইন্দ্রনাথ নিজেও নিরস্ত্র।

তাই শুধু বললে চাপা গর্জনে, 'মারো ধাক্কা।'

আসন্ন সংঘাত বিমূঢ় করে তুলেছিল ট্যাক্সি ড্রাইভারকে। তাই বোধহয় শুনতে পায়নি ইন্দ্রনাথের আদেশ। আরও মন্থরগতি হয় ট্যাক্সি।

পাঞ্জাবি পরা নবনীত কোমল মানুষটার ডান হাত ধেয়ে যায়, ইস্পাত কঠিন আঙুল দিয়ে খামচে ধরে ড্রাইভারের কণ্ঠদেশ। ঝটকান দিয়ে মুণ্ডু সুদ্ধ ঘাড় বেঁকিয়ে আনে পেছন দিকে।

ব্রেক থেকে পা পিছলে যায় ড্রাইভারের। লাফিয়ে উঠে ট্যাক্সি ধেয়ে যায় সামনে।

গ্রিন ফিয়াটের তিন আরোহীর হাতে উঠে এসেছে রিভলভার। দুই গাড়ির মধ্যে ব্যবধান দ্রুত কমছে দেখেই ট্যাক্সি ড্রাইভার স্টিয়ারিং কাটিয়েছে—ডাইনে সংঘাত এড়ানোর শেষ চেষ্টা। রুখে দেওয়ার চেষ্টায় ঘুরেছে গ্রিন ফিয়াটও। ঝাঁকুনিতে লক্ষ ঠিক রাখতে পারল না দুই বন্দুকবাজ। শূন্যে ঠিকরে গেল দুটো বুলেট।

সবুজ ফিয়াটের ওপর আছড়ে পড়ল ট্যাক্সি।

কলিশনের শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই ট্যাক্সির দুদিকের দরজা খুলে ছিটকে গেছিল ইন্দ্রনাথ আর বিদ্রোহী। লাফিয়ে এগিয়ে গেছিল সবুজ ফিয়াটের দিকে। প্রথমজনের চোখ এখন হীরক-উজ্জ্বল। দ্বিতীয় জনের চোখ তুহিন শীতল—প্রতিহিংসা স্পৃহায় নির্মম। শুকতারা অন্তর্ধানের সূত্র এখন প্রায় হাতের মুঠোর মধ্যে। ঠোঁটের কোণে ভাসছে বরফকঠিন হাসি।

ধাক্কা খেয়ে ট্যাক্সি থেকে দূরে ছিটকে গিয়ে সবুজ ফিয়াট ডানদিকের দুই চাকার ওপর প্রায় উলটে যাচ্ছিল। মুহূর্তের মধ্যে সিধে হয়ে গেল চার চাকার ওপর। ভেতরের প্রাণী তিনজন ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার আগেই গাড়ির দুপাশে আবির্ভূত হল ইন্দ্রনাথ আর বিদ্রোহী।

প্রথমজন যেন ননী দিয়ে গড়া—দ্বিতীয় জনের উচ্চতা মোটে পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি। কিন্তু নিরীহদর্শন এই দুটি কলেবরের মধ্যে যে এত শক্তি লুকিয়ে আছে, তা কি জানত ফিয়াটের আরোহী তিনজন?

জানত কি পরিমাণে স্বল্প হলেও কিছু কিছু পেশিতে সঞ্চিত থাকে রুদ্রশক্তি? বিজ্ঞান তার ব্যাখ্যা জোগাতে অক্ষম। পেশির এই প্রচ্ছন্ন ভয়াল শক্তি অবিশ্বাস্য প্রলয় ঘটিয়ে দিতে পারে সময় এলেই।

এখনও তাই ঘটল। মাত্র দশ সেকেন্ডের মধ্যে।

বাঁ-হাতে সবুজ ফিয়াটের দরজা খুলে ধরে রেখে ডানহাতটাকে বিদ্যুৎ গতিতে এগিয়ে দিল বিদ্রোহী। মাত্র দশ ইঞ্চি দূরে ছিল একজনের চোয়াল। বর্শার ডগায় লাগানো যেন লোহার বল আছড়ে পড়ল সেখানে। গুলিবিদ্ধ মানুষের মতনই লোকটা ঠিকরে গেল পাশের সঙ্গীর ওপর।

ড্রাইভার ততক্ষণে রিভলভার তাগ করেছে বিদ্রোহীর দিকে। কিন্তু খেয়াল করেনি খুলে গেছে পাশের দরজা। কবজি খামচে ধরেছে ইন্দ্রনাথ। শুধু খামচে ধরেছে। আর একটু মোচড় মেরেছে। কাতরে উঠেও ট্রিগার টিপেছিল ড্রাইভার। কিন্তু গুলি বেরিয়ে গেল ফিয়াটের ছাদ ফুটো করে। একহাতেই আরও মোচড় দিচ্ছে ইন্দ্রনাথ। বিকট চেঁচিয়ে উঠে সিটে লুটিয়ে পড়েছে ড্রাইভার।

পেছনের সিটে সঙ্গীর দেহভার কাটিয়ে সবে ধাতস্থ হয়েছে তৃতীয় মূর্তি। গুলিবর্ষণ অসম্ভব বুঝেই কাত হয়ে থেকেও লাথি ছুড়েছিল বিদ্রোহীর দিকে।

ভুল করেছিল সেইখানেই।

খপ করে ডান হাতে তার পায়ের ডিম চেপে ধরল বিদ্রোহী। তারপর মোচড় আর মোচড়। আতীব্র যন্ত্রণা উঠে গেল স্নায়ুকেন্দ্রে। রক্ত জল করা চিৎকার শুনেও মোচড়ানি অব্যাহত রাখল বিদ্রোহী, যতক্ষণ না জ্ঞান লোপ পায়।

দশ সেকেন্ডের মধ্যে সব স্তব্ধ। পাংশুমুখে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ট্যাক্সি ড্রাইভার। ভয়ার্ত চোখে তাকাচ্ছে ইন্দ্রনাথ আর বিদ্রোহীর দিকে। দুজনেরই শ্বাসপ্রশ্বাসে ছন্দপতন ঘটেনি।

স্বাভাবিক গলায় বললে প্রথম জন, 'চলো থানায়।'

লকআপে তিনজনকে ঢুকিয়ে দিয়ে 'রেডরোজ' হোটেলের ডাইনিং রুমে এল ইন্দ্রনাথ, বিদ্রোহীকে নিয়ে। টেলিফোন এল প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে।

তিন আততায়ীকেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে থানা থেকে, খুবই উঁচু মহলের নির্দেশে—সে মহলের নাম বলা যাবে না।

এই তিনজনকেও যে আর সশরীরে দেখা যাবে না তাও নিমেষে বুঝল ইন্দ্রনাথ।

লম্বকর্ণ উৎকর্ণ হয়ে বসেছিল কোণের টেবিলে।

নয়া স্যাঙাৎ

নাম তার চম্পক সাহা। ছ'ফুট ঢ্যাঙা। মাথায় চাপ-চাপ চুল। নিগ্রোদের চুলের মতন ঘন আর কোঁচকানো। চোখ দুটো ঈষৎ খয়েরি। দু-হাতের মুঠো মুগুরের সঙ্গে তুলনীয়। পায়ের পাতা বিরাট, চার্লি চ্যাপলিন বেঁচে থাকলে অবাক হতেন। এমনকী তার হাঁটার ঢঙও চার্লির মতন। এটা অবশ্য বিমানক্ষেত্রেই লক্ষ করেছিল ইন্দ্রনাথ আর বিদ্রোহী।

টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে সে। বিদ্রোহীর মুখ শিহরণ জাগায় সব মানুষেরই চোখে। গত ক'দিন ধরে তা লক্ষ করে আসছে বিদ্রোহী। কিন্তু এই লোকটা শিহরতি হয়নি। বিলক্ষণ নির্বিকার, ভয় বস্তুটা যেন তার ধাতে নেই। ব্রণ কলঙ্কিত মুখ আর রেখাজটিল ললাট অবিকৃত, খয়েরি চোখ পাথরের চোখ বলে মনে হচ্ছে। দুর্জয়, মানুষ, নি:সন্দেহে।

শুষ্ক কণ্ঠে বললে বিদ্রোহী, 'স্ত্রীকে নিয়ে প্লেনে উঠতে আমাকে দেখেছিলে?'

'দেখেছিলাম।'

ইন্দ্রনাথ চেয়েছিল চম্পক সাহার ডানহাতের আঙুলের গাঁটের দিকে। চামড়া উঠে গেছে সেখান থেকে। কপালেও কালসিটের দাগ।

'সদ্য মারপিটের চিহ্ন মনে হচ্ছে?' প্রশ্নটা ইন্দ্রনাথের।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। এয়ারপোর্টে আপনাদের সঙ্গে যখন কথা বলছিলাম তখন তা লক্ষ করা হয়েছিল। বেরোতেই দুজন ঝাঁপিয়ে পড়ে। দুজনকেই ফেলে এসেছি রাস্তায়।'

ধক করে ওঠে বিদ্রোহীর চোখ। কিন্তু মজা নাচছে ইন্দ্রনাথের চোখে। বললে, 'টাকার হরির লুঠ চলছে দেখছি। টাকা দিয়ে বলানো হচ্ছে, প্লেনে ওঠেনি বিদ্রোহীর স্ত্রী।'

'ঠিক,' কঠোর কণ্ঠে বললে চম্পক।

'রাস্তায় শুইয়ে না দিয়ে দুজনকে পুলিশের হাতে দিলে না কেন?'

'পুলিশের সঙ্গে খেলা শেষ করে এসেছি বলে।'

'জেল খেটেছিলে?'

'না। কিন্তু পুলিশের চরিত্র জেনে গেছি।'

'কীভাবে?'

'এয়ারপোর্টে আমি লেবারার, তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু এক সময় চাঁদনিচকে ছিল আমার ওষুধের দোকান। ঘরে ছিল বউ আর দুই ছেলে। ভালোই ছিলাম। একদিন ওরা এল। মাসে চারশো টাকা চাইল। ওদের দলের মেম্বারশিপ ফী। নইলে বোমা মেরে দোকান উড়িয়ে দেবে। আমি তাদের মেরে তাড়ালাম।'

চোখ জ্বলছে চম্পকের। খয়েরি মশাল। কথা আটকে গেছে।

নরম গলায় ইন্দ্রনাথ বললে, 'তারপর?'

'দোকানের পিছনেই থাকতাম বউ বেটা নিয়ে। ভোর ছ'টায় বোমা ফাটল। দোকান উড়ে গেল। বউ আর বেটা দুটো কড়িকাঠ চাপা পড়ল। সেই থেকে আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি। খেটে খাই। মস্তান দেখলেই ঠ্যাঙাই। পুলিশের হাতে দিয়ে কী করব?'

বিদ্রোহী নির্বাক। এতদিনে পেয়েছে মনের মতন দোসর। পুলিশের কাছে যেতে চায় না চম্পক, চায় না বিদ্রোহী।

অনড় রইল অধর আর ওষ্ঠ, কথাগুলো বেরিয়ে এল দাঁতের ফাঁক দিয়ে, 'মনে হয় আমরা তোমার কাজে লাগব। তুমিও আমাদের কাজে লাগবে। রাজি?'

'হ্যাঁ।'

ইন্দ্রনাথ বললে, 'তাহলে বলো, ম্যাডাম উধাও হল কেন? কার পাকা ধানে মই দিয়েছিল আমার এই বন্ধুটি? কী সেই চক্রান্ত? জোর করে প্লেনে উঠেছিল স্বামী-স্ত্রী। স্ত্রীকে লোপাট করা হল কেন? এত লোককে

টাকা খাইয়ে মিথ্যে বলাচ্ছে কারা? এয়ারপোর্টে কাদের লোক অ্যাটাক করেছিল তোমাকে? এখানে আসবার সময় তিনজন অ্যাটাক করেছিল আমাদেরও। এরাই বা কাদের লোক?'

নিগ্রো চুলে আঙুল চালনা করে চম্পক বললে, 'জানলে বলতাম।'

'কিছুই জানো না?'

'অন্য ব্যাপার জানি। গত তিনটে সপ্তাহে একটাই দল বিশেষ ওই প্লেনটায় চেপে পোর্টব্লেয়ার গেছে। প্রতিবার প্লেনের সব সিট বুক করেছে, কিন্তু দুটো-তিনটে সিট খালি রেখেছে। ট্রাঙ্ক নিয়ে সচরাচর কেউ প্লেনে ওঠে না, কিন্তু এই দলটার কাছে থাকে একটা ট্রাঙ্ক।'

এতক্ষণ কথা হচ্ছিল বসে। চম্পকের কথা শেষ হতেই শুধু উঠে দাঁড়াল বিদ্রোহী। পেশি ফুলে উঠেছে বাঘের পেশির মতন। হাত নাড়াতেই কিলবিল করে উঠল কাঁধের দলা পাকানো মাসল। সাদা মড়ার মুখে দুটো গর্তে জ্বলছে কালো আগুন।

'ট্রাঙ্ক। টেল কম্পার্টমেন্টে আমিও দেখেছি। শুকতারাকে সেই ট্রাঙ্কে ঢুকিয়ে পোর্টব্লেয়ার নিয়ে যায়নি তো?'

বলেই বসে পড়ল আস্তে-আস্তে। ডালা খুলে উলটানো ছিল—সুতরাং বউকে তার মধ্যে পুরে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা টিকছে না।

আদৌ বেঁচে আছে কি শুকতারা?

গলার স্বর বুঁজে আসে কথা বলতে গিয়ে, 'হয়তো মেরেই ফেলেছে। তাই যদি হয় এদের কারও রক্ষে নেই।'

'তিনজনের পক্ষে তা কি সম্ভব?' খয়েরি চোখ শক্ত করে বলে গেল চম্পক, 'ওদের দল ভারী, অনেক টাকা, অনেক উঁচু মহল হাতের মুঠোয়।'

'দেখা যাক।'

লড়বেন কীসের জোরে?'

'টাকার জোরে। অভাব নেই আমার। সঙ্গে আছেন ইনি—' ইন্দ্রনাথকে দেখিয়ে বলে, 'আর তুমি। পারব না?'

'আরও জোর দরকার।'

'চম্পক,' মড়ার মুখোশের মতন অচঞ্চল মুখে প্রত্যেকটা শব্দের মধ্যে বুঝি বোমা ফাটিয়ে গেল বিদ্রোহী, 'আমি টাকা রোজগার করেছি ইন্ডিয়ার বাইরে। এমন সব জায়গা যেখানে সভ্যদেশের কানুন খাটে না। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষেছি দিনেরাতে সমানে। যাদের সঙ্গে টক্কর দিয়েছি তাদের কাছে বড় বড় শহরের বড়-বড় মস্তানরা নিতান্তই শিশু। বরফের দেশ মেরু অঞ্চলে খনি আবিষ্কার করেছি, ব্রেজিল থেকে পান্না নিয়ে এসেছি, মালয়ের জঙ্গল থেকে জাহাজ ভরতি জানোয়ার এনে চড়া দামে ক্লিভল্যান্ড চিড়িয়াখানায় বেচেছি, তেইশ দিন ধরে প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর নৌ-বিদ্রোহ ঠেকিয়েছি। বেশি কথার মানুষ আমি নই। কাজে দেখাই আমি কী করতে পারি। এই এঁর মতন।' ইন্দ্রনাথকে দেখিয়ে—একে দেখে যেমন বোঝা যায় না দরকার হলে উনি চিতাবাঘ হতে পারেন, আমার পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি হাইট দেখেও তোমার ছ'ফুট বডি ধারণাও করতে পারবে না কী রয়েছে আমার মধ্যে।'

নীরব হল বিদ্রোহী। সামান্য হাঁফাচ্ছে। উত্তেজনায়।

শান্ত স্বরে ইন্দ্রনাথ বললে, 'কাজের কথা হোক।'

বাধা দিয়ে বললে বিদ্রোহী, 'আরও একটা মোক্ষম অস্ত্র হাতে এসেছে আমার। ব্রেনে চোট মেরেছিল এরা। মুখের মাসল কন্ট্রোলের নার্ভ আর কাজ করছে না। দেখুন।'

বলতে-বলতে টেবিলের ওপর থেকে তুললে ছোট্ট আয়না। স্ট্যান্ডের ওপর রেখে ঘুরিয়ে দিল নিজের দিকে। আঙুল দিয়ে টিপে ঠোঁটের দুপাশ ঝুলিয়ে দিল নীচের দিকে। চোখের তলদেশ তুলে দিল ওপর দিকে। নরুনচেরা চোখে সে এখন চাইনিজ ম্যান।

থ হয়ে চেয়ে রইল চম্পক।

'তোফা।' বললে ইন্দ্রনাথ, 'এমনটা কখনও দেখিনি।'

আঙুল চালিয়ে মুখের আগের অবস্থা ফিরিয়ে আনল বিদ্রোহী। বললে ইন্দ্রনাথকে, 'এবার শুরু করতে পারেন কাজের কথা।'

ইন্দ্রনাথ বললে, 'চম্পক, এই যে প্লেনটা থেকে বিদ্রোহীর বউ উবে গেল, এই প্লেন সম্বন্ধে বিশেষ কোনও খবর তোমার জানা আছে? ফ্লাইংপ্লেনে কোথাও কোনও চোরা দরজা আছে কি? যে দরজা খুলে মিসেস বর্মনকে ঠেলে ফেলে দেওয়া যায় বাইরে?'

সশব্দে নিশ্বাস নিয়ে চুপ করে রইল বিদ্রোহী। সম্ভাবনাটা তার মাথায় আসেনি। ভাবতেও কষ্ট হচ্ছে। যদি চোরা দরজা থাকে, শুকতারা তাহলে বেঁচে নেই।

সোজা সামনের দিকে সেকেন্ড কয়েক চেয়ে থেকে যেন দম নিল চম্পক সাহা। বলে গেল থেমে থেমে, 'এই প্লেনের মালিক হচ্ছে 'বে অফ বেঙ্গল এয়ারলাইন্স'। এদের সব প্লেনই সেকেন্ড হ্যান্ড। এই প্লেনটাকে কিনেছিল ইউনাইটেড স্টেটস কোস্ট সারভিস থেকে। ম্যাপ তৈরির কাজে লাগত প্লেনটা। 'বে অফ বেঙ্গল এয়ারলাইন্স' এই প্লেনেই গত বছর ফুড ড্রপ করেছিল বন্যার সময়। গভর্নমেন্ট ভাড়া নিয়েছিল।'

সিধে হয়ে বসল ইন্দ্রনাথ। 'ম্যাপ আঁকার প্লেন—ফুড ড্রপ করা হয়েছে। তাহলে তো মেঝেতে চোরা দরজা আছে।'

'সূত্র নম্বর ওয়ান,' বিড়বিড় করে বলে গেল বিদ্রোহী, 'তদন্ত হল শুরু। তার আগে আমার দুটো জিনিস দরকার। ওয়াইল্ড কান্ট্রিতে কাজে লেগেছিল, কুবের হওয়ার পর আর অ্যাডভেঞ্চারের দরকার হবে না বলে রাখিনি। ইন্দ্রনাথ রুদ্র, জোগাড় করে দেবেন জিনিস দুটো?'

'কী জিনিস?' বললে ইন্দ্রনাথ।

নাম বলে গেল বিদ্রোহী।

ট্যাপডোর প্লেন

চম্পক ভার নিল চোরা দরজা দেখে আসার। এয়ারফিল্ডে তার যাতায়াত কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না।

কিন্তু কর্মস্থলে পা দিয়েই শুনল, তার চাকরি নেই।

কথা বাড়াল না চম্পক। যাদের ঠেঙিয়েছে, তাদের লোক তাকেও এয়ারফিল্ডে ঢুকতে দিতে চায় না। সেটা যখন বোঝাই গেল, তখন এবার ঘুরপথে কাজ শুরু করা যাক।

চম্পক সাহা জানে, কীভাবে চেহারা পালটাতে হয়।

দমদম এয়ারপোর্টের এজেন্ট দুই চোখে বিপুল কৌতূহল জাগিয়ে চেয়ে রইল আগন্তুকের দিকে, লোকটাকে কোথায় যেন দেখেছে, এমনি একটা আবছা ধারণা মনের মধ্যে জাগছে বটে, কিন্তু বুঝে উঠতে পারছে না। সে কে হতে পারে।

আগন্তুক কমসেকম ছ'ফুট লম্বা। কাঁধ দুটো ভয়ানক চওড়া। কলেবরও বিপুল। পরনে স্যুট, মাথায় চওড়া কিনারা টুপি, চোখে হালকা নীল কাচের চশমা। দেখে তো মনে হচ্ছে ফরেন ট্যুরিস্ট, হিপিটিপিও হতে পারে।

লম্বা-লম্বা পা ফেলে লোকটা যখন সামনে দিয়ে হেঁটে গেল তখনই চক্ষু বিস্ফারিত হয়েছে এজেন্টের।

এতবড় পায়ের পাতা আছে শুধু একজনের—হাঁটার ধরনও সিনেমার চার্লি চ্যাপলিনের মতন।

আস্তে-আস্তে খুপরি ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছে, এমন সময় মুগার পাঞ্জাবি আর চুনোট করা ধুতি পরা সেই ফুলবাবুটি এসে দাঁড়াল সামনে। মুখে ভাসছে দ্যাখন হাসি। বললে মধুক্ষরা গলায়, 'আরে বসুন, বসুন। আপনার সঙ্গে কথা আছে।'

'কী কথা? তাড়াতাড়ি বলুন।'

'বলছি, বলছি।' একটা একশো টাকার নোট এগিয়ে দেয় ফুলবাবুটি, 'যেখানকার যা দস্তুর... বুঝলেন কিনা...পান খাওয়ার জন্য রাখুন...পোর্টব্লেয়ার যেতে চাই...গোটা একটা প্লেন নিয়ে...কীরকম প্লেন জানেন?...যার মেঝেতে ট্র্যাপডোর আছে।'

'ট্র্যাপডোর?'

'আরে ওই হল গিয়ে...চোরা দরজা...চোরা দরজা...বুঝলেন কিনা? আন্দামানে একটা দ্বীপে আগ্নেয়গিরি আছে না? ওখানকার ছবি তুলব আকাশ থেকে...আজ্ঞে...আমি প্রোডিউসারও বটে, ডিরেক্টরও বটে...ডকুমেন্টারি তুলছি...ইন্ডিয়ার ওই তো সবেধন নীলমণি একটাই আগ্নেয়গিরি...খাসা হবে ডকুমেন্টারিটা।'

'এরকম প্লেন, এরকম প্লেন,' দ্বিধায় পড়ে এজেন্ট, 'আছে বলে তো আমার জানা নেই।'

'নেই? তাহলে আর জ্বালাব না...না-না, ও নোটটা আপনার...আমার তো নয়...আচ্ছা আসি।'

তালঢ্যাঙা বৃষস্কন্ধ লোকটা চার্লি চ্যাপলিনের মতন হেঁটে বেরিয়ে গেল সামনে দিয়ে। ফুলবাবু মিটিমিটি হেসে গেল পেছন পেছন।

দেখেশুনে একটু ভাবল এজেন্ট। চাইল হাতের নোটখানার দিকে। বসে পড়ল আস্তে-আস্তে। ক্ষেত্র বিশেষে মুখে চাবি দিয়ে থাকাই সঙ্গত।

বাইরে দাঁড়ানো ট্যাক্সিতে একদিক দিয়ে উঠল বৃষস্কন্ধ, আর একদিক দিয়ে ফুলবাবু। প্রথম জন মাথার হ্যাট খুলতেই বেরিয়ে পড়ল বিটকেল দুটো কান আর চাপ-চাপ নিগ্রো চুল। কাঁধের স্প্রিং-এ চাপ দিতেই সোঁ-সোঁ করে হাওয়া বেরিয়ে গেল যেন বেলুন থেকে। চুপসে ছোট্ট হয়ে গেল কাঁধ। মেকি কাঁধ। হাওয়া দিয়ে ফোলানো থাকে। চশমা খুলতেই বেরিয়ে এল খয়েরি চোখ।

শক্ত মুখে বললে ফুলবাবুকে, 'ভাগ্যিস এজেন্টকে আটকে রেখেছিলেন, নইলে হ্যাঙারেই ঢুকতে পারতাম না।'

ফুলবাবু, মানে ইন্দ্রনাথ রুদ্র বললে, 'ঢুকেছিলে? ট্র্যাপডোর দেখে এলে?'

'আছে। কার্পেট ঢাকা। এককোণ ধরে টানলেই উঠে আসে। তবে ওরা প্লেনের নাম্বার পালটেছে। ছিল S-402 এখন হয়েছে S-404।'

ট্যাক্সি ড্রাইভার এতক্ষণ ছিল বাইরে, এগিয়ে আসছে ট্যাক্সির দিকে। তাড়াতাড়ি বললে ইন্দ্রনাথ, 'তোমাকে ঢুকতে দেখেছে হ্যাঙারে?'

'দুজন আটকাতে এসেছিল—শুইয়ে এসেছি।'

কেষ্টপুরের প্রায় গ্রাম্য অঞ্চলের একটা একতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল ট্যাক্সি। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকে সোজা ছাদে উঠে গেল দুজনে। সেখানে ডেক চেয়ারে বসে বিদ্রোহী বর্মন চেয়ে আছে চাঁদের দিকে। আবিষ্ট চাহনি।

ইন্দ্রনাথ বললে, 'মেসেজ আসছে শুকতারার কাছ থেকে?'

আস্তে বললে বিদ্রোহী, 'মাঝে-মাঝে—তেমন জোরাল নয়...ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক...শুধু জিগ্যেস করে যাচ্ছে...আমার জবাব শুনতে পাচ্ছে না...বেঁচে আছে...নিশ্চয় বেঁচে আছে...'

'বিদ্রোহী,' নরম কিন্তু দৃঢ় স্বরে বললে ইন্দ্রনাথ, 'এবার কাজের কথা হোক।'

চোখ নামিয়ে বিদ্রোহী বললে, 'হোক।'

'প্লেনে ট্র্যাপডোর আছে।'

'গুড।'

'আমরা যখন নতুন তৈরি এই বাড়িতে পালিয়ে লুকিয়ে আছি, আমাদের খোঁজ ওরা পাবে না। কিন্তু ওদের খোঁজ আমি নেবই, কাল সকালে।'

'নিন। কিন্তু শুকতারাকে ওরা ট্র্যাপডোর দিয়ে ফেলে দিল কেন?'

'শুকতারা কিছু দেখে ফেলেছিল বলে।'

'কী দেখেছিল?'

'অনুমান করে বলতে পারি।'

'বলুন।'

'অতবড় ট্রাঙ্কে মানুষের বডি পুরে নিয়ে যাওয়া যায়। সেই রকমই কারও বডি নিয়ে গিয়ে যখন ফেলা হচ্ছে, শুকতারা তা দেখে ফেলেছিল, ট্র্যাপডোর ছিল ওর পেছনে, কিন্তু ঘাড় ঘুরিয়েছিল নিশ্চয়।'

'বটে।'

'শুকতারাকেও তখন ট্র্যাপডোর দিয়ে বেরিয়ে যেতে হয়, নিশ্চয় প্যারাসুট দিয়েছিল, নইলে বেঁচে থাকবে কেন, নিশ্চয় নীচে বঙ্গোপসাগরের জল থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়েছিল, কিন্তু কেন? সুন্দরী বলে?'

কয়লাচক্ষু জ্বলে উঠল বিদ্রোহীর। পরক্ষণেই দু-রগ টিপে মাথা ঝোঁকাল সামনে। এখন সে নিঝুম।

ইন্দ্রনাথ আর চম্পক দাঁড়িয়ে দুপাশে। শুধু চেয়ে আছে।

আস্তে আস্তে রগ থেকে হাত নামাল বিদ্রোহী। বললে, 'মেসেজ আসছে। একতরফা, কিন্তু আপনার প্রশ্নের জবাব এর মধ্যে রয়েছে।'

নির্নিমেষে চেয়ে রইল ইন্দ্রনাথ।

বলে গেল বিদ্রোহী, 'মুক্তিপণ চাইছে...শুকতারা বলেছিল, আমি সুন্দরী। কিন্তু আমার ধর্ম নষ্ট করো না...করলে তোমরা কেউ পার পাবে না...বরং মুক্তিপণ চাও...আমার স্বামীর অনেক টাকা... একথা হয়েছিল প্লেনে...তাই আমাকে জলে ফেলে দেয়নি...নানাভাবে কবজায় আনবার চেষ্টা করছে।'

'শুকতারা কোথায় আছে, তা কি বলছে?'

'না, শুধু কাঁদছে। বলছে, যেখানেই থাকো, ওদের টাকা দাও, ছাড়িয়ে নিয়ে যাও দ্বীপ থেকে।'

'দ্বীপ?'

'আন্দামান নিকোবরের অসংখ্য দ্বীপেই ওদের ঘাঁটি। সে হদিশ আমি বের করে নেব। তার আগে জানতে চাই, ট্রাঙ্কে করে পাচার করছে কাদের?'

'কালকেই জানবেন।'

'হ্যাঁ। এ শহর থেকে গত তিন সপ্তাহে অন্তত তিনজন নামী-দামি লোক নিরুদ্দেশ হয়েছে, তাদের নামধাম জানা কি খুব কঠিন?'

'ডাঙাতেই অনেক জায়গা আছে, পাঁকের তলায় বডি পুঁতে দিলেই তো হত। এত খরচ করে, প্লেন ভাড়া করে সমুদ্রে ফেলছে কেন?'

'জ্যান্ত কয়েদ করে রাখবে বলে।'

'প্যারাসুট দিয়ে নামিয়ে দিচ্ছে? যেমন দিয়েছে শুকতারাকে?'

'নিশ্চয়।'

'জল থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে মোটরবোট?'

'আমারও তাই বিশ্বাস।'

'পোর্টব্লেয়ারে নেমে ট্রাঙ্ক পাচার করছে না কেন?'

'ছোট জায়গা। অনেকেরই চোখে পড়তে পারে। তার চেয়ে বড় কারণ যেখানে সমুদ্রে ফেলছে, সেখান থেকে দ্বীপের ঘাঁটি নিশ্চয় খুব কাছে। পোর্টব্লেয়ার থেকে দূরে। অসংখ্য দ্বীপ ও অঞ্চলে। সব দ্বীপে সভ্য মানুষ আজও নামতে চায় না।—কে আসছে?'

চাঁদনি রাতে দূরের গাছপালার ঝাপসা অন্ধকার থেকে ভটভট করে বেরিয়ে এল একটা থ্রি পয়েন্ট ফাইভ বুলেট মোটর সাইকেল। সরু মেঠোপথটা সাদা ফিতের মতন ঝকমক করছে। লাল মোটর বাইকের নিকেল

করা বনেটও ঝকঝক করছে। চালকের মাথার রূপোলি স্পেস হেলমেটও ঝকঝক করছে।

'প্রেমচাঁদ মালহোত্র আসছে।' ইন্দ্রনাথের হিরে চোখ ঝকমকিয়ে উঠল চাঁদের আলোয়।

ঠিক এই সময় শুকতারা গুনগুন করে উঠল বিদ্রোহীর ব্রেনের মধ্যে—'আন্দামান...আন্দামান...শুধু এইটুকু শুনলাম...দ্বীপের নামটা বলতে চাইছে না। ওরা তোমাকে জ্যান্ত ধরতে চায়...গুলি করে মেরে ফেলার নাটক করে গেছে...সত্যিই তোমাকে গুলি করতে চায় না...কিন্তু তুমি কথা বলছ না কেন? বিদ্রোহী...ও বিদ্রোহী...আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছ না?...বৃথাই কি বকে যাচ্ছি আমি?'

ইনসুলিন রহস্য

পাঞ্জাব-তনয় প্রেমচাঁদের পেল্লায় সিলভার হেলমেট এখন ছাদের ওপর পাতা সতরঞ্চিতে ঝকমক করছে। চারজনে বসে মুখোমুখি। প্রেমচাঁদের মাথা উঠে রয়েছে সবার ওপরে। কতখানি ঢ্যাঙা, তা বোঝা যাচ্ছে।

বিরাগ মুখে ইন্দ্রনাথ বললে, 'প্রেম, তোর এখানে আসা উচিত হয়নি।'

'ইন্দ্র,' বললে প্রেমচাঁদ, 'খবর আছে। টেলিফোন নেই বলে চলে এলাম।'

'কী খবর?'

'শেয়ার মার্কেট নিয়ে কি কাণ্ড চলছে গোটা ইন্ডিয়ায়, তা তুই জানিস?'

'জানবার চেষ্টা করি না। তবুও চোখে পড়ে, কাগজে।'

'গত তিন সপ্তাহে তিনজন শেয়ার জায়ান্ট নিখোঁজ হয়েছে।'

'মাই গড!' সোজা হয়ে গেল ইন্দ্রনাথের মেরুদণ্ড, 'এইরকমই একটা খবর বের করার জন্য কাল সকালেই যাচ্ছিলাম তোর কাছে।'

'তাহলেই দ্যাখ, প্রাইভেট ডিটেকটিভদের চেয়ে প্রফেশন্যাল ডিটেকটিভরা কত ফাস্ট ইন অ্যাকশন।'

'সেটা জানা আছে বলেই তোকে এ লাইনে এনেছি। লেগওয়ার্ক করা প্রাইভেট ব্রেনে সম্ভব নয়, তারা করবে ব্রেনওয়ার্ক।'

বিদ্রোহী নীরস গলায় বললে, 'ঝগড়া পরে হবে। মি: মালহোত্র, খবরটা পেলেন কী করে?'

'বলবার আগে আপনার জিনিস দুটো নিন, ইন্দ্রনাথ অর্ডার দিয়েছিল আপনার ফরমাস মাফিক। ঠিক আছে?'

সতরঞ্চির ওপর দুটো চামড়ার খাপ রাখল প্রেমচাঁদ। লম্বাটে খাপ। কুচকুচে কালো চামড়া দিয়ে তৈরি।

দুটো খাপেরই একদিকে সূচ্যগ্র, আর একদিক খোলা। খোলা দিকে বেরিয়ে রয়েছে একটা করে আংটা।

প্রেমচাঁদের চোখে চোখ রেখে বিদ্রোহী বললে, 'জোগাড় করলেন কোত্থেকে?'

মুচকি হেসে প্রেমচাঁদ বললে, 'ওটা আমার ট্রেড সিক্রেট। তবে আপনাকে বলতে বাধা নেই। তার আগে একটা প্রশ্ন, এ দুটোর ব্যবহার শিখেছিলেন কোথায়?'

'টোকিওতে। আমার গুরুর নাম মিৎসুবিসি।'

'আমিও তাই আঁচ করেছিলাম। এই শহরেই আছেন জাপানিজ সিক্রেট এজেন্ট। দুটো জিনিসই পেয়েছি তাঁর কাছ থেকে।'

'দাম?'

'নেয়নি। তিনিও যে মিৎসুবিসির শিষ্য। তাই একটা অনুরোধ করেছেন। এ জিনিস যেন যত্রতত্র ব্যবহার করা না হয়। আর যদি নিতান্তই প্রয়োজন হয় তাঁকে তলব করলে তিনি আপনার পাশে এসে দাঁড়াবেন।'

'নাম কী তাঁর?'

'প্রেমচাঁদ তক্ষুনি কোনও জবাব দিল না। দূরে চাঁদের আলোয় ধোওয়া গাছপালার দিকে তাকিয়ে রইল। অর্থব্যঞ্জক চাহনি।

চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বললে, 'তাঁকে দেখতে চান?'

মুখে দু-আঙুল পুরে শিস দিয়েছিল প্রেমচাঁদ। কোকিলের কুহু-কুহু রব ভেসে গেছিল গাছপালার ওপর দিয়ে নাচতে-নাচতে দূরে বহুদূরে। সেই আওয়াজ মিলোতে-না-মিলোতেই কুহু-কুহু রব জেগেছিল জঙ্গলের মধ্যে। তারপরেই দেখা গেল তাঁকে।

খর্বকায় শ্বেতবসন এক মূর্তি এগিয়ে আসছে সরু ফিতের মতন পথের ওপর দিয়ে।

নাম তাঁর কাকোই। বয়স চল্লিশ। কিন্তু তিরিশের বেশি মনে হয় না। কদমছাঁট চুল নিতান্তই শ্রীহীন। হলদে পার্চমেন্টের মতন মুখের চামড়া। ছোট-ছোট দু-চোখ, কিন্তু কৌতুকময়। হাসিতেও কৌতুক। এ জগৎটা যেন বড়ই রঙ্গময় তাঁর কাছে।

তিনি ছাদে উঠে এসে সতরঞ্চির ওপর পাতলেন একটা কাঠের পাটাতন। যা দিয়ে বাড়ি তৈরি চলছে। আর একটা পাটাতন খাড়া করে রাখলেন চিলেকোঠার গায়ে। খাপ থেকে আংটায় টান দিয়ে বের করলেন দুটি জিনিস, দুটোতেই চাঁদের আলো লেগে ঠিকরে গেল।

প্রথমটি একটি ছোরা। দ্বিতীয়টি একটি রিভলভার।

দুটোই অতিশয় অদ্ভুত ধরনের।

এ ছোরার বাঁট নেই। পুরোটাই ফলা। মাঝে মোটা, দু প্রান্তে সরু। দুদিকেই ধার। একপ্রান্তে ছোট্ট একটা আংটা এক বর্গ ইঞ্চি ধাতুর ফলকে আটকানো। হাতল বলা চলে এই ফলকটাকেই। খুব জোর দু-আঙুলে ধরা যায়।

বিদ্রোহী তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে চেপে ধরল ছোরার ছুঁচোলো দিকটা। ঝোলাল শূন্য সতরঞ্চিতে পাতা কাঠের তক্তার তিনফুট উঁচুতে। আংটা লাগানো ধাতুর ফলকটা রইল নীচের দিকে। বললে, 'এখন ছোরা ছেড়ে দিলে কী হওয়া উচিত। আংটার দিকটা একটু ভারী বলে ওই দিকটাই তক্তায় পড়বে তাই তো? দেখুন কী হয়।'

তর্জনী আর বুড়ো আঙুল শিথিল করতেই খসে পড়ল আজব ছোরা। কিন্তু ওই তিন ফুটের মধ্যেই পরিষ্কার একটা ডিগবাজি খেয়ে ছুঁচোলো দিকটা নামিয়ে আনল নিচে, ঘ্যাঁত করে গেঁথে গেল কাঠের তক্তায়।

শুকনো গলায় বিদ্রোহী বললে, 'আবিষ্কারটা গুরু মিৎসুবিসির। ছোরার সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি এমন জায়গায় রাখা হয়েছে যে ছুঁচোলো দিকটা শূন্যে ঘুরে গিয়ে সবসময় থাকবে সামনের দিকে। দেখুন।'

ফলকের দিকটা দু-আঙুলে ধরে কাঠ থেকে টেনে তুলে নিয়েই দূরের চিলেকোঠায় খাড়া করা কাঠের তক্তার দিকে ঘুরিয়ে ছুড়ে দিল বিদ্রোহী। চাঁদের আলোয় ঝিলিক তুলে ছোরা ধেয়ে গেল সামনে, ছুঁচোলো দিকটা গেঁথে গেল তক্তায়। যদিও মরা আলোয় তক্তা দেখা যাচ্ছিল না ভালোভাবে।

নীরবে দ্বিতীয় বস্তুটা তুলে নিল বিদ্রোহী। লম্বাটে চোঙা বললেই চলে। মাঝখানটা স্ফীত। এইখানে আঙুল রেখে বিদ্রোহী বললে, 'চারটে বুলেট আছে এখানে। সামনে রয়েছে সাইলেন্সার। হাতল বেঁকিয়ে রাখার দরকার হয় না। কারণ, এটা বাঁধা থাকে এখানে।' বলে ডান পায়ের প্যান্টের তলা গুটিয়ে নিয়ে পায়ের ডিমের ঠিক তলার খাঁজে চামড়ার খাপটা সেঁটে দিল স্ট্র্যাপ টেনে। চোঙা রিভলভার গুঁজে রাখল তার মধ্যে। বললে, 'হাতলের পেছনের এই বোতামে বাঁ-পায়ের চাপ দিলে গুলি ছুটে যাবে নি:শব্দে। দুহাত ব্যবহারের দরকার হবে না।' বলতে-বলতে উঠে গিয়ে তক্তা থেকে ছোরা টেনে নিয়ে ফিরে এর সতরঞ্চির ওপর। খাপে ঢুকিয়ে বেঁধে নিল বাঁ-পায়ের ডিমের খাঁজে। বললে অবিচলিত কণ্ঠে, 'মি: মালহোত্র, গত তিন সপ্তাহে তিনজন শেয়ার জায়ান্ট নিখোঁজ হয়েছে বলছিলেন। খবরটা পেলেন কী করে, সে প্রশ্নের উত্তরটা এখনও দেননি। এখন দেবেন?'

প্রেমচাঁদ তাকাল কাকোই-এর দিকে। কাকোই বলে গেল পরিষ্কার কথ্য বাংলায়।

ইন্ডো-নিপ্পন কোম্পানির শেয়ার চড়া দামেই বিকিকিনি হচ্ছিল খোলা বাজারে। তা সত্ত্বেও খবর এল আমার কাছে, খুব গোপনে শেয়ার কেনা হচ্ছে কোম্পানি অফিসেই।

এ কোম্পানির তিন ডিরেক্টরের মধ্যে একজন জাপানের এক শিল্পপতি—হিতোহিশো। বাকি দুজনের একজন সুজন দেশাই। তৃতীয় জন রাম ঘোষ।

হিতোহিশোর ইন্টারেস্ট দেখার জন্য আমাকে অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছে জাপান থেকে। কারণ, এ কোম্পানির ক্যাশ রিজার্ভে আছে এক হাজার কোটি টাকা।

অবাক হচ্ছেন? হবেন না, জাপান যখন কোনও দেশে টাকা লগ্নী করতে চায়, সেই দেশে বাণিজ্যের ফসল ফলাতে চায়, তখন টাকা ঢালে আর জমায় এইভাবে।

ক্যাশ রিজার্ভের কথা অ্যানুয়াল রিপোর্টে খুব কায়দা করে সংক্ষেপে লেখা আছে। এমনিতেই এ কোম্পানির সুনাম যথেষ্ট। বাজারে শেয়ার পড়তে পায় না। অথচ গোপনে কোম্পানির অফিসেই শেয়ার কিনে নেওয়া হচ্ছে শুনে আমার টনক নড়েছিল।

আমি লোক পাঠিয়েছিলাম। অফিস ক্লার্ক জানিয়েছিল, কোম্পানি উঠে যাওয়ার আপাতত কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে অঘটন ঘটে যেতে পারে, এরকম একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে। তাই কোম্পানি গুটিয়ে নিচ্ছে কাকপক্ষীকে না জানিয়ে, যেন পাবলিকের ক্ষতি না হয়।

ঠিক এর পরেই পরপর তিনজন ডিরেক্টরই নিরুদ্দেশ হয়েছেন। প্রথম জন রাম ঘোষ। পরের সপ্তাহে সুজন দেশাই টেলিফোন করেন হিতোহিশোকে। বাড়িতে আসতে বলেন। খুব জরুরি কথা আছে। আর ফিরে আসেননি। মিসেস হিতোহিশো আমাকে খবর দেন। আমি যাই সুজন দেশাইয়ের জোকার ভিলায়। গিয়ে দেখি বাড়ি খাঁ-খাঁ করছে। জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড। উনি একা থাকতেন ভিলায়। ফ্যামিলি থাকে বম্বেতে। এ বাড়ির সব দেখাশুনা করে যে লোকটা, তাকে অর্ধমৃত অবস্থায় দেখতে পাই গ্যারেজে। গাড়ির মধ্যে হাত-পা বাঁধা অবস্থায়।

তার কাছেই শুনলাম, হিতোহিশো যাননি ও বাড়িতে। চারজন ষণ্ডা প্রকৃতি লোক সুজন দেশাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে আসে তার আগের দিন। চৌকাঠ পেরিয়েই প্রথমেই গৃহরক্ষীকে নাকে ক্লোরোফর্ম ভিজানো রুমাল চেপে ধরে অজ্ঞান করতে যায়। বাগে আনতে না পেরে চলে মারপিট। তারপর আর কিছু মনে নেই তার।

সুজন দেশাই বাড়িতে নেই শুনে হতভম্ব হয়ে যায় সে।

বুঝলাম, কিডন্যাপ করা হয়েছে তাঁকে।

চলে আসার আগে গোটা বাড়ি সার্চ করেছিলাম। বাইরের ঘরে একটা কাগজ পেলাম। এই ঘরেই তুমুল হাতাহাতি হয়েছিল চার গুন্ডার সঙ্গে ভিলা রক্ষকের।

কাগজে লেখা ছিল শুধু দুটি শব্দ—SEND INSULIN।

বন্দির জন্য দরদ?

চাঁদের দিকে তাকিয়ে কাকোই-এর কথা শুনছিল বিদ্রোহী। শেষ শব্দ দুটো শোনবার সঙ্গে-সঙ্গে দুহাতে রগ টিপে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল চাঁদের দিকেই। ওর ওই কালো শক্ত চোখে এরকম বিমূঢ় চাহনি এর আগে দেখেনি ইন্দ্রনাথ। ইশারায় চম্পক, কাকোই আর প্রেমচাঁদকে মুখ বন্ধ রাখতে বলে চেয়ে রইল বিদ্রোহীর চোখের দিকে।

যেন দম আটকে বসে রইল বিদ্রোহী। মিনিট কয়েক, তারপর পাঁজর খালি করা নিশ্বাস ফেলে চাইল ইন্দ্রনাথের দিকে। ফিরে আসছে চোখের স্বাভাবিক চাহনি।

মৃদুকণ্ঠে বললে ইন্দ্রনাথ, 'শুকতারার মেসেজ?'

'হ্যাঁ।' ততোধিক মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল বিদ্রোহী।

'কী বলছে?'

'কথা কও, কথা কও। হে বিদ্রোহী, কথা নেই কেন তোমার কণ্ঠে? তুমি কি বোবা? তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না? তোমার কাছে মুক্তিপণের দাবি নিয়ে কেউ কি যায়নি? বিশ লক্ষ টাকা দিতে তুমি পেছপা নও আমি জানি। কিন্তু সাড়া দিচ্ছ না কেন? নাকি বীরত্ব ফলাতে যাচ্ছ? বউ আগে না বীরত্ব আগে? ওরা এখনও আমার সতীত্ব বজায় রেখেছে। তবে ওদের একজনের চোখে আমি লোভের আগুন দেখেছি। হাজার হোক, তোমার শুকতারা তো সুন্দরী? বিশ্বসুন্দরী না হলেও সুন্দরী। সুন্দরীদের জীবন সুন্দর হয় না। যদি না স্বামী পাশে থাকে। আমার জীবনও বোধহয় অসুন্দর হতে চলেছে। লাবণ্যবৃদ্ধির কসমেটিক্স তো অনেক কিনে দিয়েছিলে, কাল হয়েছিল সেইটাই। লোকটা এখুনি এসেছিল, দরজা খোলার আগে কাকে যেন বলল—ফোনে বলে দাও, ইনসুলিন পাঠাক নেক্সট প্লেনে। তারপরেই ঘরে ঢুকে শুধু বলে গেল বেশি সময় আর দেওয়া যাবে না। বিদ্রোহী, ইনসুলিন কি জিনিস? ড্রাগ? আমার আত্মরক্ষার শক্তি কেড়ে নেওয়ার ওষুধ? বিদ্রোহী...বিদ্রোহী...আমার ভয় করছে...বড় ভয় করছে...'

ছাদের কেউ আর এখন কথা বলছে না। গোটা পৃথিবীটা যেন মরে গেছে। জীবন্ত শুধু বুঝি ওই চাঁদ। যার অতিপ্রাকৃত প্রভাবে সাগরপার থেকে ভেসে আসছে শুকতারার হাহাকার।

থমথমে নৈ:শব্দ্য ভঙ্গ করল প্রেমচাঁদ।

বললে নিবিড় ভরাট গলায়, 'আরও একটা খবর এনেছি।'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকায় সবাই।

'কাল আবার প্লেনটা যাচ্ছে পোর্টব্লেয়ার।'

যেন একটা হ্যাঁচকা টান লাগল বিদ্রোহীর শিরদাঁড়ায়। চাঁদের কিরণ দ্বিগুণ তেজে প্রতিফলিত হল চোখের কালো অঙ্গার থেকে।

বলে গেল প্রেমচাঁদ, 'যথারীতি আটজন প্যাসেঞ্জার যাচ্ছে।'

'সাতজন পুরুষ, একজন মহিলা?' মেশিনের মতো বলে গেল বিদ্রোহী।

'হ্যাঁ। দুটো সিট খালি আছে।'

'একটায় যাব আমি,' খুব আস্তে বললে ইন্দ্রনাথ। 'চম্পক, ডগলাস প্লেনের আন্ডারক্যারেজের স্কেচ এঁকে দেখাতে পারবে?'

চাঁদের আলোয় ম্যাপ দেখা সম্ভব হল না। নেমে আসতে হল একতলার ঘরে। ম্যাপ বিছিয়ে বসল প্রেমচাঁদ। আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অগুন্তি দ্বীপগুলোর কোনটি আকাশ পথে দমদম এয়ারপোর্ট থেকে সবচেয়ে কাছে, জলপথে পোর্টব্লেয়ার থেকেও কাছে এমন একটি দ্বীপ আগে থেকেই চিহ্নিত করে রেখেছিল প্রেম। এখন সেখানে আঙুল রেখে বলল, 'এই সেই দ্বীপ, যার কাছাকাছি আকাশ থেকে প্যারাসুটে করে কাউকে ফেলে দিলে, পোর্টব্লেয়ার থেকে স্পিড বোট নিয়ে তাকে উদ্ধার করে এই দ্বীপে তোলা যায়।'

'চম্পক বলল, 'আকাশ থেকে ড্রপ করে ঝক্কি বাড়ানোর দরকারটা কি? পোর্টব্লেয়ারে নেমে মোটর বোটে করে পাঠিয়ে দিলেই তো ল্যাটা চুকে যায়। অনেক সহজও হয়।'

হয় না।' বললে প্রেমচাঁদ, 'পোর্টব্লেয়ার ছোট জায়গা। প্রতি সপ্তাহে সেখানে একটা ট্রাঙ্ক প্লেন থেকে নেমে যদি মোটর বোটে উঠে বিশেষ একটা দ্বীপের দিকে যায়, কাস্টমস-এর চোখে পড়বেই। তার চেয়ে অনেক নিরাপদ আকাশ থেকে ট্রাঙ্কের লোকটাকে ফেলে দেওয়া, জল থেকে তুলে নিয়ে তাকে দ্বীপে পৌঁছে দেওয়া। পোর্টব্লেয়ারে মোটরবোট যখন ফিরে যাবে, দেখা যাবে, বেরুনোর সময়ও ট্রাঙ্ক ছিল না ফিরে আসার পরেও নেই।'

'তাহলে বিশেষ একটা মোটরবোট পোর্টব্লেয়ার থেকে রাতে বেরিয়ে আবার রাতেই ফিরে আসছে,' বললে ইন্দ্রনাথ।

'হ্যাঁ।' সায় দিল প্রেমচাঁদ।

'অতএব আরও একটু লেগ ওয়ার্ক করো বন্ধু।'

'বান্দা তৈরি। দোস্ত, তুমি যা বলতে চাও তা বোঝা হয়ে গেছে। ওয়্যারলেসে খবর পাঠাচ্ছি পোর্টব্লেয়ার অফিসে। ওখানকার অজস্র মোটরবোটের কোন মোটরবোটটি গত তিন সপ্তাহের বিশেষ এক রাত্রে বিশেষ একটা সময়ে বেরিয়েছে এবং ফিরে এসেছে—এই তো?'

'কাল সকালেই খবর চাই—বেরুনোর আগে।'

'কোথায় বেরুবি? এই যে বললি, আট দুশমনের সঙ্গে একই প্লেনে ট্র্যাভেল করবি?'

'সে তো আমি করব। বিদ্রোহী, চম্পক আর কাকোই যাবে আমার আগেই। চার্টার প্লেনে। তিনজনের কাজ হবে তিন রকম। বলছি, কান পেতে শোন।'

ভোরের দিকে ধাতুর পাখিটা উড়ে গেল পোর্টব্লেয়ারের দিকে। যথাসময়ে নেমেও পড়ল সেখানে। তালঢ্যাঙা লম্বকর্ণ এক ব্যক্তি তুম্বোমুখে নেমে এসে চার্লি চ্যাপলিন কায়দায় হেঁটে গিয়ে উঠে পড়ল ট্যাক্সিতে। তার একটু পরে নামল জীবন্ত যন্ত্রের মতন এক পুরুষ। হাইট মোটে পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি। মুখখানা অবিকল চিনে ম্যানের মতন। চামড়া তো নয় যেন সাদা পার্চমেন্ট কাগজ। চোখ দুটোতেই কেবল প্রাণ আছে বলে মনে হয়। বুঝি নরকাগ্নি জ্বলছে সে চোখে। সভয়ে এ হেন পুরুষের দিকে চেয়ে রইল বিমানক্ষেত্রের কর্মীরা। ধীর চরণে গিয়ে সে উঠল অন্য একটা ট্যাক্সিতে। মিনিট খানেক পরেই হন্তদন্ত হয়ে প্লেন থেকে নেমে এল খর্বকায় এক জাপানি। ভাবখানা যেন, ট্রেন ফেল হয়ে যেতে পারে আর একটু আস্তে পা চালালেই। চোখে আর ঠোঁটে কৌতুকের ঝরনাধারা ছুটিয়ে দিয়ে, হাত নেড়ে বিমানক্ষেত্রের কর্মীদের অভিবাদন জানিয়ে, সে একরকম ছুটেই বেরিয়ে গিয়ে উঠে পড়ল তৃতীয় একটা ট্যাক্সিতে। আগের দুটো ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ। এবার তিনটে ট্যাক্সিই যাত্রা শুরু করল একযোগে। ঘুরেফিরে গিয়ে দাঁড়াল একটাই হোটেলের সামনে।

তিনমূর্তি তিনটে ট্যাক্সি থেকে নেমে এসে ঢুকল হোটেলে। উঠল একটাই কামরায়। সেখানে ইজিচেয়ারে জানলার ধারে বসে পাইপ টানছিলেন পক্ককেশ এক বৃদ্ধ। তাঁর নাক চোখা, চিবুক ঠেলে বের করা, সাদা চুল টেনে আঁচড়ানো। পরনের সাদা স্যুটে লাল নেকটাই মানিয়েছে ভালো।

তিনমূর্তি কুচকাওয়াজ করে ঘরে ঢুকতেই মুখের পাইপ নামিয়ে বাঁধানো সাদা দাঁত বের করে প্রায় দাঁত খিঁচিয়েই হাসলেন বৃদ্ধ। বললেন, 'ক্যাপ্টেন ডিক্সিট স্পিকিং। আপনাদের জন্য একটা মোটরবোট রেডি অ্যাট জেটি। গায়ে লেখা আছে দেখবেন 'মোহান্ত'। এতে কে যাবেন?'

বিদ্রোহীর বীভৎস মুখাবয়বের দিকে তাকিয়েই প্রশ্নটা করেছিলেন তিনি। তার মানে, তিনি জানতেন প্রায় অমানুষ আকৃতি এই মানুষটাই যাবে এহেন অসম্ভব অভিযানে।

বিদ্রোহী দাঁড়িয়ে থেকেই বলল, 'আমি যাব।'

'তাহলে চলে যান। মোহান্তর পাইলটের নাম আসগর। তাকে আমার এই ভিজিটিং কার্ড দেবেন। সে আপনার জন্য জান দেবে। ও কে।'

বিদ্রোহী আর বসলই না। বেরিয়ে গেল।

কৌতুক নাচানো চোখে বিদ্রোহীর অপসৃয়মান মেশিন বডির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল কাকোই। বসল খাটের ওপর। টেনে বসাল চম্পককে।

বললে ক্যাপ্টেন ডিক্সিটকে, 'আমাদের হিল্লে কী করলেন?'

'বেশ বাংলা বলেন তো আপনি?' পাইপে ফের কামড় দিয়ে বললেন ক্যাপ্টেন ডিক্সিট, 'আমি অবশ্য ছটা ল্যাংগুয়েজে চোস্ত। বেঙ্গলি ইজ সুইটেস্ট অফ অল। শুনুন মশাইরা, 'ডলফিন' নামে একটা মোটর বোটের গতিবিধি আমার চোখে ভালো ঠেকেনি। গত তিন সপ্তাহে রোজই গভীর জলে পাড়ি দিয়েছে মাছ ধরার জন্য। ভোররাতে বেরোয়, মাঝদুপুরে ফেরে। তখন থাকে মাঝিমাল্লা। কিন্তু প্রতি সপ্তাহে একটি দিন বোটের মালিক ছুটি নেয়। সেদিন আর ভোররাতে বেরোয় না। গভীর রাতে যায় গভীর জলে। যায় দুজনে, ফিরেও আসে দুজনে। অতএব মাই ডিয়ার জেন্টেলমেন, আপনারা দুজনেই ডলফিনে উঠে লুকিয়ে থাকুন মাছ

রাখবার পেটিতে। জেটিতে ভাসছে, মালিকের নাম হাফিজজি। মাথার চুল সব সাদা। কিন্তু গা-গতরে বেশ জোয়ান। সামলেসুমলে চলবেন। এগোন। বেগতিক দেখলে ফিরে আসবেন। এই ঘরটাই আমাদের ঘাঁটি। আপনারা ফিরে না আসা পর্যন্ত। আর ওই যে অদ্ভুত লোকটা, কী যেন ওর নাম? বিদ্রোহী বর্মন। মনে হয় না উনি দ্বীপে ঢুকে একলা ফিরতে পারবেন, যদি ফেরেন, নিয়ে আসবেন এখানে। আর কিছু জানার আছে? নেই? তাহলে নমস্কার।'

আসগর লোকটাকে রামগড়ুরের ছানা বললেই চলে। রোদেজলে ঝামা চেহারা। শুকনো প্যাঁকটি। তবে হাত-পা-কাঁধের দড়ি দড়ি মাসল দেখলে সম্ভ্রম হয়। এ লোক প্রয়োজনে হাতি টেনে রাখতে পারে। বয়স তিরিশ-পঁয়ত্রিশ হবে। গোড়ালি থেকে জিনস-এর প্যান্ট গুটিয়ে খালি গায়ে দাঁড়িয়েছিল মোহান্তর সামনে। বিদ্রোহী এগিয়ে আসতেই তার সঙ্গে কথা না বলে তক্তা বেয়ে উঠে গেল ডেকে। পেছন-পেছন উঠে গেল বিদ্রোহী। দুজনেই ঢুকল কেবিন রুমে। সেখানে একটা চার্ট পাতা ছিল। একটা দ্বীপের ওপর আঙুল রেখে বললে আসগর, 'এই একটা দ্বীপের একটা দিক জল থেকে সোজা ওপরে উঠে গেছে। পাথরের দেওয়াল, খাঁজ কাটা। কাছে যাইনি, দূর থেকে দেখেছি। এদিক দিয়ে দ্বীপে ওঠা যাবে না। আমাদের যেতে হবে অনেক ঘুরে। এখন বেরোনো দরকার।'

বিদ্রোহী ঠোঁট আর অধর না কাঁপিয়ে বললে, 'তাই চলো।'

চিনেম্যান মেকআপ এখনও পালটায়নি বিদ্রোহী। চিনেম্যানের মুখে এত পরিষ্কার বাংলা আশা করেনি আসগর। তাই চেয়ে রইল সাদা চুল, সাদা মুখ আর কালো চোখের দিকে।

দুই চোখের অমানবিক শীতলতা শিহরিত করল আসগরের মতন আসুরিক শক্তির মানুষকেও।

'মোহান্ত' বেরিয়ে গেল বঙ্গোপসাগরের বুকে।

'ইনসুলিন,' বললে ইন্দ্রনাথ কলকাতায় প্রেমচাঁদের অফিসে বসে, 'দরকার হয় হাই ডাইবিটিজ পেসেন্টের জন্য। 'সেন্ড ইনসুলিন' লেখা কাগজটা পাওয়া গিয়েছিল সুজন দেশাইয়ের বাড়িতে। কেমন?'

'প্রেমচাঁদ বললে, 'শুনছি।'

'নিশ্চয় ধস্তাধস্তির সময় চার গুন্ডার পকেট থেকে পড়ে গেছিল? সুজন দেশাইয়ের গৃহরক্ষী কিন্তু ইনসুলিন কি জিনিস, তা জানে না। তার বস সুজন দেশাইয়েরও ডায়াবিটিজ নেই। হাউস ফিজিসিয়ানের কাছে খবর নিয়েছি।'

'বলে যা।'

'শুকতারা টেলিপ্যাথিক মেসেজ পাঠায় বিদ্রোহীকে। ব্যাপারটা বিজ্ঞানসম্মত নয়, কিন্তু ঘটছে। বিজ্ঞান যার ব্যাখ্যা করতে পারে না, এমন অনেক জ্ঞানই আমাদের গিলতে হচ্ছে। স্রেফ ঘটে যাচ্ছে বলে। শুকতারার অসাধারণ ক্ষমতাকেও তাই মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছি।'

'বেশ।'

'শেষ বার্তায় শুকতারা জানিয়েছিল, ফোনে হুকুম দেওয়া হবে—নেক্সট প্লেনে ইনসুলিন পাঠানোর জন্য। নেক্সট প্লেন যাচ্ছে আজকে। যার মধ্যে যাচ্ছি আমি, স্রেফ গায়ের জোরে।'

'জানি।'

'ইনসুলিনও যাচ্ছে এই প্লেনে। কার জন্য?'

'যার ডায়াবিটিজ আছে তার জন্য?'

'মাই ডিয়ার প্রেমচাঁদ, এই হেঁয়ালিটার সমাধান করেছি স্রেফ ব্রেন ওয়ার্ক করে। তুই কি কিঞ্চিৎ লেগ ওয়ার্ক করে আমার সিদ্ধান্তটার সমর্থন এনে দিবি?'

'সিওর,' উজ্জ্বল চোখে বললে প্রেমচাঁদ, 'যাদের কিডন্যাপ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তাদের কি কারুর জন্যে দরদ উথলে উঠল কিডন্যাপারদের—এইটাই তো জানতে চাস?'

'রাইট ইউ আর, মাইডিয়ার মাথামোটা প্রেমচাঁদ।'

কুঁজোর হঠকারিতা

ট্রান্সপোর্ট প্লেনে রাতের জার্নি খুব সুখকর হয় না। বিমান ভ্রমণের উত্তেজনা এতে নেই। গতিবেগ হয় মন্থর, জানলা দিয়ে বাইরে কিছু দেখাও যায় না। মোটরের চাপা একঘেয়ে গজরানিতে ঘুম এসে যায়। প্যাসেঞ্জাররা ঢুলতে পারলে বেঁচে যায়।

অথচ রাতের মালবাহী বিমানেই উঠেছে এতগুলি মানুষ।

প্রথমে এসেছিল চারজন। ট্যাক্সিতে। চার পুরুষ। একজন বিশালকায় এবং স্থূলকায়। বাড়তি চর্বি জমেছে শরীরের সব জায়গায়। দ্বিতীয় জন বিশাল, তবে চর্বির পাহাড় নয়, এর হাতে রয়েছে গুচ্ছ-গুচ্ছ কালো চুল। তৃতীয় জন খর্বকায়, সলিড বপু, দাঁতের ফাঁকে-ফাঁকে মোটা চুরুট। চতুর্থ জন ভিড়ে হারিয়ে যাওয়ার মতন মামুলি চেহারার অধিকারী।

এরা চারজনেই ছিল সেই রাতে—যে রাতে শুকতারা নিখোঁজ হয়েছিল উড়ন্ত প্লেন থেকে।

ট্যাক্সি থেকে নামবার আগে চুরুট প্রিয় খর্বকায় ব্যক্তি যেন বলেছিল নিজের মনেই, 'ট্রাঙ্কটা কার কাছে?'

'রিনির কাছে।' জবাব দিল চর্বির পাহাড়।

ট্যাক্সি থেকে নেমে চার মূর্তিমান স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিমায় ঢুকে গেল ভেতরে। চারজনেরই হাতে ছোট ব্রিফকেস—যেমন থাকে প্যাসেঞ্জারদের হাতে। বিবিধ বিধি নিষেধের গণ্ডি টপকিয়ে চারজনেই এগিয়ে গেল ডগলাস বিমানের দিকে। কিন্তু তাড়াহুড়ো নেই।

ঝড়ের বেগে আর একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল গাড়ির লাইনে। গাড়ি থেকে নামল চারজন। তিনজন মামুলি চেহারার পুরুষ, চতুর্থজন এক মহিলা। আকর্ষণীয়া। কিন্তু চোখ শক্ত, নাক শক্ত। চোয়াল শক্ত। এগুলির জন্যই তাকে পুরোপুরি বিউটি কুইন বলা যাচ্ছে না।

তিন পুরুষ আরোহীর একজন বললে দ্রুত কণ্ঠে—রিনি ট্রাঙ্কটা। বাগড়া পড়বে না তো ভেতরে ঢোকাতে?'

কঠোর হেসে রিনি বললে, 'এই বডি দেখিয়ে সব পথই চিচিং ফাঁক করে রেখেছি। এর আগের দুবার কী অসুবিধে হয়েছে?'

'টিকটিকি লেগেছে যে পেছনে।'

'টাকাও ছড়াচ্ছি আমি, প্লাস মাই বডি। ডোন্ট ওরি। গো অ্যাহেড।' ট্রাঙ্ক নিয়ে তিনজনে পেছনে। বিধি নিষেধের গণ্ডিগুলো ভোজবাজির মতন মিলিয়ে যাচ্ছে রিনির খটখটাখট জুতোর হিলের আওয়াজ শোনার সঙ্গে-সঙ্গে। খোদ প্রাইম মিনিস্টার গেলেও এভাবে শশব্যস্তে কেউ পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ায় না।

ধীরপদে হাঁটছিল যে চারজন, ট্রাঙ্কবাহী দলটা তাদের নাগাল ধরে ফেলতেই ট্রাঙ্কের ওজন নিয়ে আর কারও মাথাব্যথা থাকার কথা নয়। আট যাত্রী, এক ট্রাঙ্ক। অসুবিধাটা কোথায়?

আগে ট্রাঙ্ক উঠে গেল বিমানে, যাত্রীরা উঠল তার পরে। এবার রওনা হওয়ার পালা।

উল্কাবেগে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল বাইরে। ছিটকে বেরিয়ে এল বিদঘুটে এক মূর্তি। লম্বা সে বিলক্ষণ সন্দেহ নেই, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না কুঁজো হয়ে থাকায়। উটের কুঁজের মতনই বিশাল বক্রপিঠ বেচারিকে ঝুঁকিয়ে রেখেছে সামনে। কিন্তু সে হাঁটছে অবিশ্বাস্য গতিবেগে। দৌড়চ্ছে বললেই চলে। তার কাঁধ খুব চওড়া, পায়ে চর্কি লাগায় এই কাঁধ দুলছে সমান তালে। মুখ তার থসথসে চর্বির্তে ঠাসা। পুরু নাক, লোমশ ভুরু। ঠোঁটের দু-কষ বেয়ে পানের রস গড়াচ্ছে। পরনের ঢোল প্যান্ট আর ঢোলা বুশ শার্ট বালিশের খোলের সঙ্গে তুলনীয়।

কী আশ্চর্য! এমন একটা কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি কিন্তু ছুটতে ছুটতেই পেরিয়ে গেল গেটের পর গেট, কেউ ফিরেও তাকাল না।

টাকার কার্পেট পেতে রেখেছে নাকি লোকটা? নাকি ওপর মহলের নির্দেশ?

ডগলাস বিমান তখন ওড়বার জন্য তৈরি হচ্ছে, লোকটাও ভাঙা গলায় চেঁচাচ্ছে, 'আটকাও, আটকাও। প্লেনটাকে ধরো। পোর্টব্লেয়ার যেতে হবে আমাকে, এখুনি।'

বিমানের ভেতরে চুরুটধারী পুরুষ সবেগে ছিটকে গেল পাইলটের কম্পার্টমেন্টে, 'চালাও। আবার এসেছে একটা গাধা।'

চিৎকার করে ওঠে পাইলট, 'চালাব কী করে? চাকার তলা থেকে কাঠ না সরালে চাকা ঘুরবে কী করে?' বলতে বলতে উদ্দামভাবে হাতের ইশারা করতে থাকে নীচের লোকজনদের, কাঠের ব্লক সরিয়ে নেওয়ার জন্য।

প্লেনের দরজা পর্যন্ত লাগানো সিঁড়ি তখনও সরানো হয়নি। কুঁজো এসে দাঁড়িয়েছে সিঁড়ির গোড়ায়। হাত-পা ছুঁড়ে তর্ক জুড়েছে ফিল্ড অ্যাটেনড্যান্টের সঙ্গে।

'প্লেন হাউসফুল তো আমার কি? যেতে আমাকে হবেই। প্লেনের ল্যাজে বসে থাকব। এতবড় একটা প্লেন বাড়তি একজনকে নিয়ে যেতে পারবে না বললেই হল? আরও হাফটন ওজন নিয়ে শূন্যে উড়ে যেতে পারে এ প্লেন। কী ভেবেছ আমাকে? গাড়ল?'

তা সত্বেও পথ রুখে দাঁড়িয়েছিল অ্যাটেনডেন্ট। ঠিক এই সময় একটা লাল জিপ এসে দাঁড়াল পাশে। ভেতরে থেকে শোনা গেল কড়া গলা, 'ঝামেলা কীসের? যেতে চাচ্ছে যাক।'

জোঁকের মুখ নুন পড়ল যেন। সরে গেল অ্যাটেনড্যান্ট। সিঁড়ি বেয়ে তরতরিয়ে ওপরে উঠতে-উঠতে বিড়বিড় করে বললে কুঁজো, 'সাবাস প্রেমচাঁদ। তোর হাত এত লম্বা?'

গলাটা ইন্দ্রনাথ রুদ্রর।

প্লেনের দরজা তখন বন্ধ হচ্ছে। ভেতর থেকে তিনজন বন্ধ করতে চাইছে। বাইরে থেকে কুঁজো একাই দরজা খুলে রাখছে। ঢুকেও গেল ঝটকানি মেরে। তিনজনকে এক হাতে রুখে দেওয়া তার কাছে নেহাতই ছেলেখেলা।

ঢুকেই অবশ্য পানরঞ্জিত বিচ্ছিরি দাঁত বের করে বলে উঠল, 'সরি ফর ডিসটার্বান্স, বাট আই হ্যাভ টু গো।'

চুরুটধারী তখনও রয়েছে পাইলটের কম্পার্টমেন্টে। পাইলট শুনেছে কুঁজো ঢুকে পড়েছে ভেতরে।

বললে খাটো গলায়, 'একটু দাঁড়িয়ে যাব? ঠেলে ফেলে দেবেন?'

'না। জিপের অফিসার আমাদের ঘুষের লিস্টে নেই। কুঁজোর ব্যবস্থা করছি—ওঠাও প্লেন।'

দমাস করে বন্ধ হল দরজা। রানওয়ের ওপর দিয়ে দৌড়ে গিয়ে রাজকীয় ভঙ্গিমায় গগনবিহারী হল ডগলাস প্লেন।

শূন্য একটা সিটে ততক্ষণে পরম আরামে বসে পড়েছে কুঁজো।

আমোদ ঝলমল করছে গোটা বদন জুড়ে। যেন ভীষণ একটা মজা হয়ে গেল, এমনিভাবে তাকাচ্ছে আট আরোহীর দিকে।

চুরুটধারীকে শুধু একটাই প্রশ্ন করল, 'পাইলট কোথায়?'

'প্রথমটাকে ফেলবার ঠিক আগে—দূরে আলোর সিগন্যাল পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। আগের মেয়েটাকে প্যারাসুট দিয়েছিলাম। এটাকে তাও দেব না। তার হাজব্যান্ডকে পোর্টব্লেয়ার পৌঁছে দিয়েছিলাম, এটাকে জলে ফেলে দেব। টাকার মালিক বলে তো মনে হয় না—জঘন্য।'

দাঁত বের করে আমুদে হাসি হাসতে-হাসতে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল জঘন্য কুঁজো।

আর, সাধারণ প্যাসেঞ্জারদের মতনই ঝিমোতে শুরু করে দিল প্লেনের আটজন আরোহী। নিদারুণ একঘেয়েমির ভাব মুখচ্ছবিতেই সুস্পষ্ট। লোমশহস্ত বিশালবপু লোকটা মাঝেমধ্যে সামনে ঝুঁকছে, কী যেন বলছে সামনে সলিডবপু খর্বকায় চুরুটধারীকে। দ্বিতীয় ব্যক্তি ঠোঁট বেঁকিয়ে মৃদু মৃদু হেসেই চলেছে, হাসিহীন

কিন্তু মুখাবয়বের বাদবাকি অংশ। এই হাসিটুকুই একমাত্র প্রাণস্পন্দন হয়ে রয়েছে আট আরোহীর মধ্যে। বাকি সবাই যেন নিষ্প্রাণ।

ভয়ানক উত্তেজনার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে কেবল বৃষস্কন্ধ কুব্জ ব্যক্তিটির সর্বাঙ্গে। এমনভাবে ইতিউতি তাকাচ্ছে যেন জীবনে এই প্রথম বিমানে চেপেছে। জানলার ওপর দিয়ে তাকাচ্ছে, নীচ দিয়ে তাকাচ্ছে, অন্ধকারে কত কিছু দেখবার চেষ্টা করছে দু-চোখ কুঁচকে। তারপরেই বত্রিশপাটি দাঁত বের করে তাকাচ্ছে সহযাত্রীদের দিকে। যেন একটা বৃহদাকার বালক। নিরবচ্ছিন্ন শব্দহীন হাসিতে ঠাসা লোকটা কিন্তু এই ভড়কিতে ভোলেনি।

চর্বির পাহাড় বসেছিল ঠিক তার সামনেই। ঈষৎ ঝুঁকে বললে নিম্নকণ্ঠে, 'এবার চিনেছি বাছাধনকে। সেই টিকটিকিটা—ইন্দ্রনাথ রুদ্র। ওই চোখ কি ভোলো যায়?'

সত্যি, তাড়াহুড়োয় ওই একটা ভুল করেছিল ইন্দ্রনাথ। কনট্যাক্ট লেন্স ছদ্মবেশ বাক্সে তো ছিলই।

তবে মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়।

নি:শব্দে শিস দিয়ে ওঠে চর্বির পাহাড়, 'আশ্চর্য। কুঁজ দেখে ভুলেছি সবাই।'

'বিদ্রোহীর লোক। টাকার লোভে রাস্কেলটাকে ছেড়ে দেওয়াটা ভুল হয়েছে। কী করা যায়?'

'বাড়াবাড়ি করলে ট্র্যাপডোর তো রয়েছেই।'

'ভয়ানক জোর গায়ে—দরজাটা একহাতে খুলল কী করে দেখলেন তো?'

'টিট করার পথ আমি জানি। সুটকেশে আছে তো জিনিসটা?'

'নিশ্চয়।'

'তাহলে ওঠা যাক।'

দ্যাখন হাসি, লোকটা দাঁড়িয়ে উঠে গেল প্লেনের পেছন দিকে। ফুরফুরে চেহারার বিমান সেবিকা এগিয়ে এল একইরকম দেঁতো হাসি হেসে—পোর্টব্লেয়ারের এই সফরে প্রতিবারেই এই ললনাকেই দেখা যায় এই প্লেনে। এগিয়ে দিল দ্যাখন হাসির ব্রিফকেস। নিরীহ দর্শন একটা রুমাল বের করে সশব্দে তাতে নাক ঝেড়ে নিল দ্যাখন হাসি। কিন্তু ব্রিফকেস বন্ধ করার সময় যখন রুমাল গুঁজল পকেটে, তখনই বর্ণহীন তরল পদার্থ ভরতি ছোট্ট একটা শিশি চালান হয়ে গেল রুমালের ফাঁকে।

স্বস্থানে ফিরে এসে পাশের জানলা দিয়ে কিছুক্ষণ বাইরে তাকিয়ে রইল দ্যাখন হাসি। তারপর উঠে এসে বসল কুঁজোর পাশের খালি সিটে। জানলা দিয়ে চেয়ে রইল বাইরে। যেন অদৃশ্য কোনও বস্তু নিরীক্ষণের আপ্রাণ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

কুঁজে ঠেস দিয়ে আরও আরামে বসল ইন্দ্রনাথ এবং রইল প্রতীক্ষায়।

ক্রিমিনালদের হেডকোয়ার্টার আবিষ্কারের বিপদসঙ্কুল এই পরিকল্পনাটা তার নিজস্ব। বলেছিল প্রেমচাঁদকে, 'যাব একই প্লেনে, একই জায়গায়। দেখি তোর মুরোদ, পারবি না পথ পরিষ্কার করে দিতে?'

প্রেমচাঁদ তার খেল দেখিয়েছে।

এবার এসেছে ইন্দ্রনাথের খেলা দেখানোর সময়।

বসেছে বিদ্রোহী যেখানে বসেছিল একমাস আগে, ঠিক সেই জায়গায়। বুদ্ধির ভেলকিতে যদি হারাতে পারে প্রতিপক্ষকে, প্রাণে বাঁচবে, নইলে...

দু:সাহসের প্রথম পর্বটা সহজেই পেরিয়ে আসা গেছে। এবার বাকি দ্বিতীয় পর্ব, সবচেয়ে কঠিন পর্ব। আন্দামান বেশি দূর নেই।

লক্ষ করে যাচ্ছে আট আরোহীর প্রত্যেকের প্রতিটি মুভমেন্ট।

বেশি নজর কিন্তু পাশে বসা লোকটার দিকে। বিপদের সম্ভাবনা এই তরফেই। একটু আগেই প্লেনের পেছনে গিয়ে রুমাল বের করেছে ব্রিফকেস থেকে।

পাশের দিকে বড় বেশি নজর দিয়েছিল বলেই একটু শৈথিল্য দিয়েছিল পেছনের দিকে। কানজোড়াকে ততটা সজাগ রাখেনি। তাই বুঝতেও পারল না, একদম পেছনের সিট থেকে অতিশয় মামুলি চেহারার একটা লোক সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। বেড়ালের মতন নি:শব্দে এসে গেছে পেছনে, বগল থেকে একটা রিভলভার বের করে আচমকা ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে।

খরনজরে পাশের লোককে দেখতে-দেখতে হঠাৎই টের পেল ইন্দ্রনাথ, হিমশীতল একটা বস্তু ঠেকেছে কানের পেছনে। এখন একটু নড়লেই উড়ে যাবে মগজ। সুতরাং সে একদম অনড় হয়ে রইল।

নড়ল না কেউই। কথাও বলল না। ডিটেকটিভ ধরা পড়েছে। আর কি?

খুব আস্তে, নিরন্তর নি:শব্দ হাসি-আঁটা মুখটা ঘুরে গেল ইন্দ্রর দিকে। হাসতে হাসতেই সে রুমাল বের করেছে পকেট থেকে। শক্ত চোয়াল, শক্ত নাক, শক্ত চোখওয়ালা মেয়েটা বিষম ভয়ের ভান করছে। আর সবাই দাঁত খিঁচিয়ে হাসছে।

হাসি মুখ লোকটা একহাতের শিশি উপুড় করে ধরেছে আর এক হাতের রুমালের ওপর। ক্লোরোফর্মের উৎকট গন্ধে ভরে গেল কেবিন।

'পাইলট।' বিকট গলায় হেঁকে উঠল ইন্দ্রনাথ। এর বেশি কিছু করা সম্ভব নয়। নলচে ঠেকে রয়েছে কানের পেছনে।

ক্লোরোফর্ম ভিজোনো রুমাল চেপে বসল তার নাকে আর মুখে। ধস্তাধস্তি করেছিল ইন্দ্রনাথ। প্রথমে জোরে, তারপর ক্ষীণভাবে। শেষে নিস্তেজ হয়ে গেল সর্বাঙ্গ। রুমাল আরও চেপে বসল নাকে-মুখে।

সিটে এলিয়ে পড়ল কুঁজো।

দুজন গিয়ে ট্র্যাপডোর খুলছে। ঠান্ডা বাতাস ঢুকছে ভেতরে। আয়তাকার গর্তের দিকে শিথিল দেহটাকে ঠেলে এগিয়ে দেয় বেশ কয়েকজন।

দু-হাজার ফুট নীচে বঙ্গোপসাগরের আবলুষ কালো জল ফুটপাথের মতনই কঠিন, এত উঁচু থেকে যে আছড়ে পড়বে, সে পড়বে যেন গ্র্যানাইটের ওপর।

ঢালু পথে গড়িয়ে দেওয়া হল ইন্দ্রনাথকে। ঢাল নেমে গেছে প্লেনের পেছন দিকে। আর তাকে দেখা গেল না। গর্জন অব্যাহত রেখে এগিয়ে গেল বায়ুযান।

ইন্দ্রনাথ কোথায়?

বিমানের মধ্যে তখন চলছে বিপুল তৎপরতা। চলছে দু-হাজার ফুট নীচের জলেও। অনেক দূরে পিনের ডগার মতন একটা আলোক বিন্দু দেখা গেছে জলের ওপর। দেখেছে নিরবচ্ছিন্ন হাস্যমুখর চুরুটধারী।

কুচক্রীদের গোপন বিবরের নিশানা এই আলোর কণা।

প্লেনের পেছন থেকে হিড়হিড় করে টেনে আনা হল কালো ট্রাঙ্ক। ডালা খুলে ধরাধরি করে বের করা হল একটা মনুষ্যদেহ। বৃদ্ধ অথচ তার হাত মুখ পা কষে বাঁধা। জ্ঞানহীন এই বৃদ্ধ সুজন দেশাই।

কর্কলাইট বেল্ট এঁটে দেওয়া হল বৃদ্ধের কাঁধে।

সামনের কম্পার্টমেন্টের দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে পাইলট। হাঁক দিচ্ছে সেখান থেকেই, 'তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি।'

দ্রুত হাত চালিয়ে একটা প্যারাসুট বেঁধে দেওয়া হল সুজন দেশাইয়ের শরীরে। বয়ে নিয়ে যাওয়া হল খোলা ট্র্যাপডোরের পাশে।

আলোকবিন্দু এখন প্লেনের ঠিক নীচে। হেঁকে ওঠে পাইলট, 'ফেলুন।'

ঢালু দরজার ঢালে পিছলে নামিয়ে দেওয়া হল দেহটাকে।

'প্যারাসুটটা খুললে হয়।' অস্বস্তির সুরে বললে একজন।

'এর আগেও যখন খুলেছে, এবারও খুলবে,' জবাব দিল আর একজন।

বলতে-বলতেই দেখা গেল প্যারাসুট খুলে গেছে। বঙ্গোপসাগরের জলের দিকে হেলেদুলে নেমে যাচ্ছে সুজন দেশাইয়ের অচেতন দেহ।

সাদা ব্যাঙের ছাতার মতন এই প্যারাসুটের অদূরে খুলে গেল আর একটা ব্যাঙের ছাতা, এটা কুচকুচে কালো রঙের।

প্লেন থেকে পতনের ঝুঁকিটা অকারণে নেয়নি ইন্দ্রনাথ। মাথা খাটিয়েছে আগেই।

ডগলাস প্লেনের আন্ডারক্যারেজের নকশা আঁকিয়ে নিয়েছিল চম্পককে দিয়ে।

এ প্লেন ল্যান্ডিং করে ট্রাইসাইকেল কায়দায়। পেছনের চাকাজোড়াকে জুড়ে রেখেছে যে ডান্ডাটা সেটা থাকে ট্র্যাপডোরের পেছন প্রান্তে। হাত বাড়ালে নাগাল পেলেও পাওয়া যেতে পারে।

নাকেমুখে ক্লোরোফর্ম দেওয়ার সময় দমবন্ধ রেখেছিল ইন্দ্রনাথ। তা সত্বেও শেষের দিকে যৎকিঞ্চিৎ নাকে ঢুকেছিল, তাতেই কুয়াশা জমেছিল ব্রেনে। লোপ পেয়েছিল জ্ঞান।

ট্র্যাপডোরের মারাত্মক ঢালু পথে পিছলে নামবার সময় ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটায় পরিষ্কার হয়ে গেছিল মগজ। পা নীচের দিকে করে পাশ ফিরে হড়কে নেমে যাচ্ছে, বুঝতে পেরেছিল। দরজার ঢাল থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে-সঙ্গে মোচড় দিল শরীরে।

সেকেন্ডে দুশো ফুট গতিবেগে এরোপ্লেনটা মাথার ওপর থেকে সরে যেতেই বাতাসের ধাক্কায় একটু কমেছিল ওর পতনের বেগ। ওইটুকু সময়ের মধ্যেই হাত বাড়িয়ে আঙুলের ডগা দিয়ে ধরে নিয়েছিল পেছনের চাকা জোড়ার মাঝের ডান্ডা। বাতাসের ধাক্কায় সঙ্গে-সঙ্গে উড়ন্ত প্লেনের সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে গেল শরীর, আঙুলের আঁকশি কিন্তু শিথিল হয়নি। বরং আরও জবর মুঠোয় চেপে ধরেছে ডান্ডা।

এইভাবেই তেড়চা হয়ে কিছুক্ষণ ঝুলে রইল ইন্দ্রনাথ। টনটনিয়ে উঠল মাসল। কিন্তু কেটে গেল গা-পাক দেওয়া ভাবটা। ঘরে বসে প্ল্যান করা এক জিনিস, আর তার রূপায়ণ আর এক জিনিস। দুটোতেই দরকার ঠান্ডা মাথার। ইন্দ্রনাথের তা আছে।

এবার একহাতে শরীর ঝুলিয়ে রেখে আর এক হাতে খুলে ফেলল গায়ের কোট, টেনে ছিঁড়ে আনল পিঠের প্যাড। হাত বদল করে শরীর ঝুলিয়ে রেখে অপর হাত দিয়ে কোট গলিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল নীচে।

এখন তার পিঠে দেখা যাচ্ছে একটা কমপ্যাক্ট প্যারাসুট। প্যাড সেঁটে এই জিনিসটাকেই কুঁজের আকার দেওয়া হয়েচিল। কুঁজ ছিল তার ছদ্মবেশ।

ট্র্যাপডোর ফের খোলা হচ্ছে দেখেই প্লেনের তলপেটে নিজেকে সাঁটিয়ে নিয়েছিল ইন্দ্রনাথ। ওই পজিশনে থাকলে প্লেনের ভেতর থেকে তাকে দেখা যাবে না। ও কিন্তু দেখতে পাবে আবার কি গড়িয়ে নামছে প্লেন থেকে।

অচিরেই দেখা গেল তাকে।

হাত-পা বাঁধা একটা নরদেহ।

নীচে ঠিকরে গেল দেহটা। সাদা মেঘের মতন খুলে গেল প্যারাসুট, হ্রাস পেল পতনবেগ। নিমেষে শূন্যে ঝাঁপ দিল ইন্দ্রনাথ—সাদা মেঘের পেছনে।

বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমে উঠেছিল কপালে। মৃত্যু সামনে—কিছু করার নেই।

খুলে গেছে প্যারাসুট। কালো রঙের। দুলছে ইন্দ্রনাথ। কালো রং মিশে গেছে আকাশের কালো রঙের সঙ্গে। ভাগ্যিস এখনও চাঁদ ওঠেনি। আকাশে মেঘ থাকায় তারা দেখাও যাচ্ছে না। দেখা দিলে বিপদ বাড়ত। নীচের লোক দেখত বেশ কিছু তারা ঢাকা পড়ে গেছে একটা ধ্যাবড়া কালো জিনিসে।

প্যারাসুট বাতাসে ভেসে নামে বটে, কিন্তু নামে খুব জোরেই। একটু পরেই সাদা প্যারাসুট আছড়ে পড়ল জলে। কাঁধের কর্ক লাইফ বেল্ট ভাসিয়ে রাখল বৃদ্ধকে।

পা নীচের দিকে নামিয়ে সেকেন্ড কয়েক পরেই জলে আছড়ে পড়ল ইন্দ্রনাথ। শরীরটাকে দুমড়ে মুচড়ে বের করে আনল প্যারাসুটের দড়িদড়ার জঙ্গল থেকে।

শোনা যাচ্ছে মোটরবোটের ভটভট আওয়াজ। দ্রুত এগিয়ে আসছে এই দিকেই।

'ওই তো প্যারাসুট, সাদা জায়গাটা'—বোট থেকে ধ্বনিত হল, পুরুষ কণ্ঠস্বর, 'ঝটপট...জ্যান্ত তুলতে হবে জল থেকে।'

আবলুষ-কালো জলে নি:শব্দে সাঁতরে গেল ইন্দ্রনাথ। বোটের ইঞ্জিনের আওয়াজ লক্ষ করে। ওর ঠিক সামনেই ভাসছে অচেতন বৃদ্ধ। এক লাইনেই উলটো দিক থেকে এগিয়ে আসছে মোটরবোট। আলো নেই বোটে। কালো আকাশ আর কালো জলের পটভূমিকায় দেখা যাচ্ছে শুধু কালো জমাট আঁধার। বোটের বিশাল খোল। রিভার্স গিয়ারে ঘড়ঘড় আওয়াজ হল, স্পিড কমছে বোটের, স্থির হয়ে গেল ভাসমান শরীরটার পাশে এসে।

'তোলো।'

বোটের উঁচু দিক থেকে নেমে এল একটা বোটহুক। লাইফবেল্টের স্ট্র্যাপে গেঁথে গেল হুক। টেনে তোলা হল শরীরটাকে।

'ঠান্ডা মেরে গেছে, তবে বেঁচে আছে,' বোটের ডেকে ধ্বনিত হল পুরুষ কণ্ঠস্বর।

আলো না জ্বালিয়েই আন্দামান-নিকোবর দ্বীপের গোলক ধাঁধার দিকে ভটভটিয়ে এগিয়ে গেল মোটরবোট। ততক্ষণে বোটে উঠে পড়েছে আরও এক আরোহী—বোটের মালিক তাকে চেনে না।

বোট যখন দাঁড়িয়ে ছিল, ঠিক তখন দুটো হাত উঠে এসেছিল কালো জল ছেড়ে। নোঙর আঁকড়ে অক্লেশে টেনে তুলেছিল নিজের ব্যায়ামপুষ্ট বডিটাকে। বোট যখন ছুটেছে ঘণ্টায় তিরিশ মাইল গতিবেগে, সে তখন গলুইয়ের তমিস্রায় নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছে।

মাকড়সা ওৎ পেতে বসে থাকে জটিল জালের ঠিক সেন্টারে। ইন্দ্রনাথ রুদ্র চলেছে রহস্যময় সেই কেন্দ্র অভিমুখে।

আদর করে দ্বীপটার ডাকনাম হয়েছিল 'রাজার দ্বীপ'। শুনলে মনে হতে পারে রাজা-বাদশাদের আনাগোনা ছিল অতীতকালে। অথবা বাদশাহী কাণ্ডকারখানা চলছে সেখানে এখনও।

কিন্তু এ দ্বীপে রাজকীয় কাজকারবার নেই একেবারেই।

ছোট্ট দ্বীপ। খান কয়েক কাঠের গুঁড়ির কেবিন। দ্বীপে দিন গুজরানের অভিলাষ যাদের, তাদের জন্য একটা মুদির দোকান।

'মোহান্ত'র ডেকে দাঁড়িয়ে নিমেষহীন চোখে এই দ্বীপটার দিকেই তাকিয়েছিল বিদ্রোহী।

পাশে দাঁড়িয়ে আসগর বললে, 'আপনার প্ল্যানটা কী?'

'দ্বীপে হানা দেওয়া।'

'পণ্ডশ্রম হবে। প্রাণটাও যেতে পারে। এখানকার খুদে-খুদে দ্বীপে অনেক ব্যাপার চলে, পুলিশ আসতেও সাহস পায় না। দ্বীপে নামতেই পারবেন না। বুলেট ছুটে আসবে।'

'ভয় পেয়েছ?'

'আপনার হঠকারিতা বন্ধ করার চেষ্টা করছি। আপনার স্ত্রী ছাড়াও আরও অনেককে যারা ওখানে আটকে রেখেছে, তারা নিশ্চয় বাইরের লোককে দ্বীপের ধারেকাছে আসতে দেবে না। নামবার জায়গা খোঁজার জন্য আমাকে টহল দিতেই হবে। খবর চলে যাবে।'

'যাক।'

'আপনি যা করতে চাইছেন, সেটা তো হবে না।'

'তোমার প্ল্যান কী?'

'রাজার দ্বীপে নেমে পড়ুন। মুদির দোকানে খোঁজ নিন। আশপাশের ছোটখাটো দ্বীপের মানুষ কেনাকাটার জন্য পোর্টব্লেয়ার যায় না। খোঁজ পেয়ে যাবেন।'

আসগরের বুদ্ধির তারিফ করতেই হল বিদ্রোহীকে। একটু চুপ করে থেকে বললে, 'তার চাইতে ভালো হয়, যদি তুমি নামো।'

'নেমে?'

'আমার মুখ দেখলে সবাই ভয় পায়। তোমাকে দেখলে ঠিক তার বিপরীত হবে। প্রাণ খুলে কথা বলবে।'

'ঠিক আছে।'

বাঁশের তৈরি জেটিতে 'মোহান্ত'কে বেঁধে রেখে আসগর নেমে গেল। ফিরে এল ঘণ্টাখানেক পরে।

ছোট্ট কেবিনে নিশ্চুপ দেহে বসেছিল বিদ্রোহী। যেন পাথরের চিনেম্যান। আসগর বললে, 'আপনাকে আঘাটায় নামিয়ে দিচ্ছি।'

'তারপর?'

'খাবার এনেছি দোকান থেকে, চিঁড়ে গুড়। খেয়ে নিন। এই নিন জলের বোতল। জঙ্গলে রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। সন্ধের পর 'ডলফিন' আসবে এখানে।'

'ডলফিন?'

'একটা মোটরবোট। গত তিন সপ্তাহে তিনবার গভীর রাতে গভীর জলে গেছে।'

'গত তিন সপ্তাহে তিনবার—গভীর রাতে?'

'মাছ ধরতে নয়, তাহলে মাঝিমাল্লা থাকত। ডেকে থাকে শুধু দুজন। মালিক আর একজন। যাওয়ার আগে এখান থেকে মদের মোতল নিয়ে যায়, দামে সস্তা বলে। কোথায় যায় অত রাতে তা কখনও বলেনি হাফিজজি।'

'হাফিজজি কে?'

'বোটের মালিক। লোকটার কথাবার্তা আর চোখ দেখে খটকা লেগেছিল মুদির দোকানির, কিন্তু বেশি জানতে চায়নি। প্রাণের ভয় তো আছে। করেকম্মে খাচ্ছে খাক। আমার মনে হয়, হাফিজজির বোট ওইখানেই যায়, যে দ্বীপে আপনি যেতে চাইছেন।'

'আন্দাজি কথা।'

'আমি যে দ্বীপটাতে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছিলাম, গভীর রাতে ওই দ্বীপের দিক থেকেই হাফিজজির মোটর বোটকে ফিরতে দেখা গেছে। দূর দিয়েই পোর্টব্লেয়ার চলে গেছে। তবে আওয়াজ শুনে মুদির দোকানি ঠিক চিনতে পেরেছে। এখান থেকে যাওয়ার সময় গভীর সমুদ্রের দিকে যায়, ফেরে ওই দ্বীপ হয়ে। কেন, সেটা একটা রহস্য।'

'তোমার প্ল্যানটা কী?'

'জঙ্গলে লুকিয়ে থাকুন। 'ডলফিন' যখন আসবে, সাঁতরে পেছন দিয়ে উঠে পড়বেন। মাছ রাখার অনেক খালি পেটি থাকে। একটায় লুকিয়ে থাকবেন। যেখানে যেতে চান, পৌঁছে যাবেন। তারপর যদি আয়ু থাকে, ওই বোটেই ফিরে যাবেন পোর্টব্লেয়ার।'

'আমার আয়ু?' হাসল বিদ্রোহী। অধর আর ওষ্ঠ নড়ল না।

ভেতর পর্যন্ত কেঁপে উঠল আসগরের। এ যে জীবন্ত বিভীষিকা।

বিদ্রোহীর রণমূর্তি

গুটিসুটি মেরে খুবই অল্প জায়গায় নিজেকে লুকিয়ে ফেলেছিল ইন্দ্রনাথ। কালো আকাশ, কালো জল, ডেকের অন্ধকার, পরনের শার্ট প্যান্টও ডিপ ব্লু। সুতরাং আঁধার তাকে গ্রাস করেছে।

বোটটা লম্বায় তিরিশ ফুট। সামনের উঁচু ডেক জুড়ে রয়েছে আট ফুট। সরু কেবিনটা নিয়েছে পনেরো ফুট জায়গা। তারপরেই পেছন দিক, খোলা ককপিট।

কেবিনের দু-ফুট নীচে রয়েছে সামনের ডেক। কেবিনের জানলা রয়েছে এইদিকেই। ককপিটে দাঁড়িয়ে যে দুজন মোটরবোট চালাচ্ছে, তাদের দেখতে হচ্ছে কেবিনের কাচের জানলা দিয়ে। যেখানে ঘাপটি মেরে রয়েছে ইন্দ্রনাথ সেখান থেকে জায়গাটা খুব কাছে। ককপিটের কেউ যদি বিড়ি ধরায় আলোর আভায় দেখা যাবে ইন্দ্রনাথকে। তবে বিড়ি ধরানোর চেষ্টা কেউ করছে না। মুখে চাবি দিয়ে বোটটাকে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ঘণ্টায় তিরিশ মাইল বেগে। গন্তব্যস্থান বেশি দূর আর নেই।

রেলিং এর ধারে বসে ইন্দ্রনাথ দেখল, অন্ধকার ডাঙা দেখা যাচ্ছে সামনে। রহস্যাবৃত সেই দ্বীপ এসে গেছে। প্লেন থেকে যেখানে প্যারাসুট নামানো হয়েছে, সেখান থেকে বেশি দূরে নয়, আধ মাইলের মধ্যেই। সময়জ্ঞান খুব প্রখর বটে প্লেন চালকের।

মোটর-গর্জন কমে গেছে। গতি মন্থর হচ্ছে। সামনে খাড়াই পাথর ছাড়া কিছু দেখা যাচ্ছে না। দ্বীপের এদিকটা যেন ছুরি দিয়ে কেক কাটার মতন কাটা হয়েছে।

বোট আস্তে-আস্তে যাচ্ছে খাড়াই দেওয়ালের পাশ দিয়ে। ফাঁক ফোকর তো কোথাও নেই। তবুও যাচ্ছে। গোপন গহ্বরের সন্ধানে নাকি?

আচমকা চোখ ধাঁধানো আলো জ্বলে উঠল খাড়াই পাথরের শীর্ষদেশে। সার্চলাইট। সোজা এসে পড়েছে মোটরবোটের ডেকে।

সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কার ভেসে আসে ওপর থেকে, 'ডেকে ও কে?'

চকিতে ডিগবাজি খেয়ে রেলিং টপকে টুপ করে জলে পড়েই তলিয়ে গেল ইন্দ্রনাথ। কিন্তু পার পেল না।

ককপিট থেকে দু-জনেই লাফ দিয়ে নেমে এসেছিল ওপর থেকে হুঙ্কারের সঙ্গে-সঙ্গে। দু-জনেই তুলে নিয়েছিল দুটো বোটহুক। লম্বা লগার মাথায় লাগানো। ইন্দ্রনাথ জলে পড়তেই একটা বোটহুক ওর পেছন-পেছন এসে গেছিল জলের মধ্যে।

জল এখানে মাত্র ফুট পাঁচেক গভীর। ঘোলাটে। ডুব সাঁতার কাটা সম্ভব নয়। সে সময়ও পায়নি ইন্দ্রনাথ।

একটা বোটহুক আঁকড়ে ধরল কোমরের বেল্ট। টেনে তুলল জল থেকে বাইরে। আর একটা বোটহুক পাশ থেকে ঘা মারল মাথায়।

মাথা ঘুরে গেল ইন্দ্রনাথের। কিন্তু পুরো সম্বিৎ হারাল না। অবশ হয়ে রইল গোটা দেহ। ওই অবস্থাতেই শুনল ওপরের আর নীচের কথোপকথন।

'বোটে উঠল কী করে?'

'তাই তো ভাবছি।'

'প্যারাসুট পড়বার সময় আশেপাশে মোটরবোট ছিল?'

'একেবারেই না।'

'তবে কি আকাশ থেকে খসে পড়ল?'

'কী করে জানব?'

'চোপরাও। বস যখন শুনবে, কাউকে আস্ত রাখবে না। ঠিক এই সময় জল ফুঁড়ে উঠে বসল তোমার বোটে?'

'চোখ রাঙাবেন না। প্যারাসুটের লোকটাকে নামিয়ে নিন, আমার কাজ শেষ।'

'খুব যে গরম দেখছি। একাই উঠেছে না আরও কেউ?'

'খুঁজে দেখতে হবে।'

'ইনসুলিন এনেছ?'

'সেটা কী?'

'যে বডিটা জল থেকে তুলেছ, তার গায়ে একটা প্যাকেট বাঁধা আছে?'

'পেটের কাছে প্লাস্টিক মোড়া একটা প্যাকেট আছে।'

'ওইটাই ইনসুলিন। বডি আমরা নামাচ্ছি। তোমরা বোট খুঁজে দেখো, আর কেউ আছে কিনা।'

ওপরের আর নীচের কথোপকথনের শুরুতেই মোটর বোটের পেছনের ডেকে রাখা দুটো পিপের ওপর থেকে সরতে শুরু করেছিল আলগা কাঠের ঢাকনা দুটো। ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরেছিল একজোড়া করে চোখ। সার্চলাইটের আলো আর মোটরবোটের ওপর পড়ছে না দেখে আস্তে-আস্তে আরও ওপরে উঠল ঢাকনা দুটো। মার্জার লম্ভনে বেরিয়ে এল দুটি ছায়ামূর্তি। সাপের মতন বুকে হেঁটে গেল ডেকের ওপর দিয়ে। রেলিং টপকে পা ঝুলিয়ে নেমে গেল জলে।

একইসঙ্গে নড়ে উঠল একটা প্যাকিং কেস। বিরাট সাইজ। পাঁচ ফুট বাই তিনফুট। ডেকের পাটাতন ছেড়ে উঠল সামান্য। বাক্সের অন্ধকারে যেন দু-টুকরো আগুন জ্বলছে। আশেপাশে কেউ নেই দেখে মাথার ওপর তুলে ফেলল গোটা প্যাকিং কেসটা। রাখল পাশের আরও প্যাকিং কেসের গাদায়।

ঠিক এই সময় পায়ের শব্দ শোনা গেল। কেবিনের দুপাশ দিয়ে দুজন এগিয়ে আসছে পেছনের ডেকে।

জ্বলন্ত-চক্ষু মানুষটা নিমেষমধ্যে হিসেব করে নিল, যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে রেলিং কতদূর।

রেলিং পর্যন্ত দৌড়ে গিয়ে জলে ঠিকরে যাওয়ার আগেই পদশব্দের অধিকারী দুজন বেরিয়ে আসবে কেবিনের দু-পাশ থেকে। অতএব...

চোখের পলক ফেলবার আগেই ডেকের ওপর বসে পড়ে, দু-পা সামনে ছড়িয়ে দিয়ে, দুই পায়ের প্যান্টের পা টেনে তুলে, দুটো খাপ থেকে বের করল দুটি মারণাস্ত্র।

হাতলবিহীন ছোরা আর সাইলেন্সার লাগানো রিভলভার। বাঁ-হাতের রিভলভার সমেত হাতটা সটান বাড়িয়ে ধরল সামনে। ডান হাতটা কনুইয়ের কাছে বেঁকিয়ে ছোরাটাকে রাখল কানের কাছে। কেবিনের দুপাশ থেকে বেরিয়ে এসেছে পদশব্দের দুই মালিক। এদের একজন কুখ্যাত হাফিজজি, অপরজন তার স্যাঙাৎ। ধরাধামে তাদের আয়ু ছিল ওই পর্যন্তই।

বাঁ-হাতের রিভলভারে আওয়াজ হল খট, ডান হাতের কনুই হয়ে গেল সোজা—ছোরা আর নেই দু-আঙুলের ফাঁকে।

বিঁধেছে হাফিজজির বুকে।

বুলেট উড়িয়ে দিয়েছে তার স্যাঙাতের খুলি।

নি:শব্দে দুটি মূর্তি আস্তে-আস্তে লুটিয়ে পড়ল ডেকের ওপর।

উঠে গেল বিদ্রোহী বর্মন। ছোরাটা বুক থেকে টেনে নিয়ে গুঁজল চামড়ার খাপে। রিভলভার গেল যথাস্থানে। এখনও তিনটে বুলেট রয়েছে সেখানে। কাজ এখনও বাকি।

যেন পিছলে গেল ডেকের ওপর দিয়ে। রেলিং টপকে জলে পড়তেই দু-পাশ থেকে দুটো হাত পড়ল তার কাঁধে।

ছুঁচ

'জল এখানে মোটে পাঁচফুট গভীর। আপনার হাইট পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি। অতএব দাঁড়িয়ে থাকুন।'

কথাগুলো বলা হল কানের কাছে। বক্তার গলা চেনা। চম্পক সাহা।

'দাঁড়িয়েই আছি।' জবাব দিল বিদ্রোহী, 'এ পাশে নিশ্চয় কাকোই?'

'হ্যাঁ' জবাবটা কাকোই-এর, 'আমার হাইট মোটে পাঁচ ফুট। আঙুলের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। আকাশের দিকে মুখ করে আছি। কষ্ট হচ্ছে। ইন্দ্রনাথ রুদ্র ধরা পড়ল মনে হচ্ছে?'

'উনি ছাড়া গভীর জলে বোটে উঠবে কে? আকাশ থেকে উনিই তো ঝাঁপ দিয়েছিলেন। বাহাদুর বটে। আন্ডারক্যারেজের নকশা আঁকিয়েছিলেন আমাকে দিয়ে। কেন জানি না।' গলাটা চম্পক সাহার।

'আস্তে। সামনে তাকান।' বিদ্রোহীর গলায় চাপা রণদামামা।

বোটের পাশ দিয়ে দেখা যাচ্ছিল অন্ধকারে ঢাকা পাথুরে দেওয়াল। আচমকা সেখানে একটা বাতি দেখা গেল। পাথরের গায়ে একটা ফোকর আবির্ভূত হয়েছে। কপাট সাইজের খানিকটা পাথর সরে গেছে। সেখান দিয়ে আলো পড়েছে জলে।

একটা লম্বা তক্তা বেরিয়ে এল ফোকর দিয়ে। পড়ল বোটের ডেকে। একটা শিথিল দেহ মানুষকে ধরাধরি করে নামিয়ে নেওয়া হল তক্তার ওপর দিয়ে। ফিরে এল একজন। মোটর বোটের ডেকে উঠে এল পাটাতন বেয়ে। হেঁকে বলল, 'হাফিজজি।'

আবার ক্ষিপ্রগতির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে দিল বিদ্রোহী বর্মন। বিদ্যুৎ গতিতে দু-পাশের দু-জনের কাঁধে ভর দিয়ে গোটা শরীরটাকে তুলে নিল জল থেকে। দাঁড়িয়ে পড়ল দু-জনের কাঁধে পা রেখে। নোঙর ঝুলছিল মাথার ওপর। দু-হাতে সেটা খামচে ধরে শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে রেলিং টপকে গিয়ে পড়ল ডেকের ওপর।

হেঁট হয়েই পায়ের চামড়ার খাপ থেকে টেনে নিল মারাত্মক হাতিয়ার—দু-দিক ধারাল হাতলবিহীন ছুরিকা।

হাফিজজি সাড়া না দেওয়ায় পদশব্দ যখন এগিয়ে আসছে কেবিনের দিকে, চিতাবাঘের মতন পা টিপে-টিপে তখন পদশব্দ লক্ষ করেই এগিয়ে যাচ্ছে মানুষ-বাঘ বিদ্রোহী বর্মন। অপরিসীম নিষ্ঠুরতায় তুহিন-কঠিন হয়ে উঠেছে দুই চক্ষু। শীতল বরফের মধ্যে ধকধকে আগুন যদি কেউ কল্পনাও না করতে পারে, তাহলে সে এখন দেখে নিতে পারে সেই দৃশ্য—বিদ্রোহীর দুই চোখ।

কেবিনের পাশ দিয়ে পায়ের আওয়াজ এগিয়ে এসেই থমকে গেল, পায়ের কাছে লুণ্ঠিত মৃতদেহ নিশ্চয় দেখেছে।

দেখেছে বিদ্রোহীকেও। মুখোমুখি। কিন্তু আর সময় পেল না বাকযন্ত্রকে চালু করার।

তার আগেই হাতটা সটান বাড়িয়ে দিয়ে তার টুঁটি কেটে দু-টুকরো করে দিল বিদ্রোহী।

আর ঠিক এই মুহূর্তে আকাশের চাঁদের জন্যও আর অপেক্ষা করল না শুকতারার কণ্ঠস্বর। ধ্বনিত হল বিদ্রোহীর ব্রেনের মধ্যে, 'বিদ্রোহী...বিদ্রোহী...তুমি কোথায়?'

নিমেষে স্থাণু হয়ে গেল শ্রোতা।

সামনের ডেকে নড়ে উঠল লুণ্ঠিত মানুষটা। ইন্দ্রনাথ রুদ্র। আচমকা আঘাতে আচ্ছন্ন ব্রেন এতক্ষণে ক্লিয়ার হয়ে এসেছে। হাফিজজিকে ডাকা সে শুনেছে, পায়ের আওয়াজকে এগিয়ে যেতেও শুনেছে, ধপ করে কিছু একটা পড়ে যাওয়ার আওয়াজও শুনেছে।

তারপর থমথমে নৈ:শব্দ্য।

অতএব সঞ্চরমান হল তার দেহ—সর্পিল ভঙ্গিমায়। কেবিনের পাশে গিয়ে দেখল পরপর দুটো মৃতদেহ। ওপাশে আকাশের দিকে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে একটা ছায়া মূর্তি। অন্ধকারে আদল দেখেও বোঝা যাচ্ছে সে কে।

নরম গলায় বললে ইন্দ্রনাথ, 'বিদ্রোহী, কী বলছে শুকতারা?'

পাথুরে দেওয়ালের খুপরিতে ফিরে আসছে পায়ের আওয়াজ। এবার অনেকে। নিমেষে বিদ্রোহীকে ঝাঁকুনি দিয়ে ঘোর কাটিয়ে দিল ইন্দ্রনাথ। পলক ফেলবার আগেই বিদ্রোহীর দু-হাতে উঠে এল দুই মারণাস্ত্র। ইন্দ্রনাথের হাতে তার প্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র।

'আর মার্ডার নয়,' কড়া গলায় ফিসফিসিয়ে গেল ইন্দ্রনাথ, 'চম্পক আর কাকোই কোথায়?'

'এসে গেছি।' পেছনে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় বললে কাকোই, 'নাউ অ্যাকশন, টুগেদার।'

কেরামতি দেখিয়েছে বটে চম্পক সাহা। খর্বকায় কাকোই-এর কষ্ট দেখে তাকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল নিজের তালঢ্যাঙা শরীরের মাথার ওপর। নোঙর আঁকড়ে কাকোই যখন ঝুলছে, তখন তার পা

ধরে উঠে এসে নোঙর ধরেছে চম্পকও।

পায়ের মালিকেরা এখন অনেকে। মোট পাঁচজন।

তক্তা বেয়ে উঠতে-উঠতে একজন বললে, 'বুড়োর জ্ঞান ফিরেছে। এবার টিকটিকিটাকে চাবকাব। এল কী করে এখানে?'

দ্বিতীয় জন তক্তায় পা দিয়ে বললে, 'কিন্তু বোটের লোকেরা গেল কোথায়?'

তৃতীয় জন বলে উঠল, 'জনসাহেব কিন্তু একটু আগেই এসেছেন। কোথায় উনি?'

চতুর্থ জন বললে, 'দাঁড়াও?'

আর দাঁড়াও। পাঁচজনকে পাঁচ রকমভাবে টার্গেটের মধ্যে পেয়ে আর কি রোখা যায় কাকোই-কে?

ইন্দ্রনাথের অগোচরে অদ্ভুত একটা যন্ত্র এনে ফেলেছিল হাতের মুঠোয়। স্প্রিং পিস্তল।

পরপর পাঁচজনকে তাগ করে চাপ দিয়ে গেল স্প্রিং-এ। নি:শব্দে ধেয়ে গেল পাঁচটা ছুঁচ। তিনজন রইল পাথুরে দেওয়ালের সামনে, পাথুরে আলসেতে।

শক্ত গলায় বললে ইন্দ্রনাথ, 'ফের খুন?'

'নইলে এরা আমাদেরই খুন করত।' নিরুত্তাপ গলায় জবাব দিল কাকোই।

'জিনিসটা কী?' এই প্রথম অবাক হতে দেখা গেল বিদ্রোহীকে।

'সারিন,' বললে কাকোই, 'পটাসিয়াম সায়ানাইডের চাইতে বিশগুণ পাওয়ারফুল। জাপানে নিরীহ লোক মারা হয়েছে এই দিয়ে। আমি ট্রায়াল নিলাম কুলোকের ওপর। সাকসেসফুল।'

সারিন বিষে ডোবানো ছুঁচের এত শক্তি? ইন্দ্রনাথ যখন ওর বিস্ময় নিয়ে ব্যস্ত, বিদ্রোহী তখন ছিটকে গেছে তক্তার দিকে।

মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত

আলোকিত আলসেতে দাঁড়াতেই দেখা গেছিল পাথরের সিঁড়িটা। পাহাড়ের গায়ে গুহার পাথর কেটে তৈরি সিঁড়ি। একটু উঠেই একটা চাতাল। এখান থেকে দুদিকে উঠেছে সিঁড়ি।

কোনদিকে যাওয়া যায়?

দুভাগ হয়ে গেল চারজনের দল। ইন্দ্রনাথ আর চম্পক একদিকে। কাকোই আর বিদ্রোহী আর একদিকে।

প্রথম দল পনেরো ধাপ ভেঙেই পেল আর একটা চাতাল। চাতালের একদিকে তালা দেওয়া লোহার ফটক। তার ওপাশে কয়েদ ঘরে আলো জ্বলছে। অনেক উঁচুতে গরাদ দেওয়া একটাই জানলা। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে মেঝেতে বসে রয়েছে বিধ্বস্ত চেহারার তিন পুরুষ। একজন বৃদ্ধ। তার পোশাক জলে ভিজে গায়ে লেপটে রয়েছে। দ্বিতীয়জন প্রৌঢ়। মুখ মঙ্গোলীয় ধাঁচের। তৃতীয় বয়স্ক ব্যক্তি নি:সন্দেহে বাঙালি—পরনে ধুতি আর পাঞ্জাবি।

তৃতীয় ব্যক্তির দিকে চেয়ে লোহার ফটকের এদিক থেকে বললে ইন্দ্রনাথ, 'আপনি রাম ঘোষ। আপনার পাশে নিশ্চয় হিতোহিশো। ভিজে পোশাকে এখুনি অসুস্থ হবেন সুজন দেশাই। ইনসুলিন এসে গেছে—দরকার কার?'

সটান হয়ে বসেছিলেন তিনজনই। মঙ্গোলীয় মুখের অধিকারী হিতোহিশো বললেন, 'আমার ব্লাডসুগার নরম্যাল। ইনসুলিন নিয়ে কী করব? 'জড়িত গলায় ভিজে পোশাকে সুজন দেশাই বললেন, 'এটা কি রসিকতার সময়।' রাম ঘোষ কিছু বললেন না।

ইন্দ্রনাথ তাঁর দিকে চেয়ে শুধু হাসল। পাশ ফিরে বললে চম্পককে, 'হাঁ করে দেখছ কী? সিঁড়ি তো উঠে গেছে আরও ওপরে, যাও ওঠ।'

'গিয়ে?' কাঠকাঠ গলায় বললে চম্পক।

'তালা ঝুলছে, চাবি আনতে হবে না? খবরদার খুন-টুন আর নয়।'

'খুন।' কয়েদ ঘরের ভেতর থেকে বলে উঠলেন রাম ঘোষ ভরাট গম্ভীর গলায়, 'কে খুন হল?'

'আপনি চেনেন নাকি সবাইকে?' ইন্দ্রনাথের প্রশ্ন।

'আমি জানতে চাইছি কে খুন হল?'

'বলুন ক'জন খুন হল।'

'হোয়াট?'

'মোট আটজন। তার মধ্যে দুজন মোটরবোট চালিয়ে এনেছিল।'

'বাকি ছ'জন তো এখানকার লোক।'

'ছজনের গ্যাং?'

'ও ইয়েস।'

'যাচ্ছলে। চাবি কোথায় আছে কে বলবে? আপনাদের বের করব কী করে?'

'চাবি থাকে জনসাহেবের কাছে। কোমরের বেল্টে।'

'মুশকিলে ফেললেন। দুজন তো পড়েছে জলে, এদের মধ্যে জনসাহেব যদি থাকে...'

'নেই,' সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসতে-আসতে বললে বিদ্রোহী। তার পার্চমেন্ট মুখ দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু কালো চোখে ভাসছে হাসি।

সেই চোখে চোখ রেখে বললে ইন্দ্রনাথ, 'আসা হচ্ছে কোথা থেকে?'

'শুকতারার ঘর থেকে।'

'হয়েছে প্রেমালাপ?'

'মাঝে গরাদ থাকলে ওটা কি হয়?'

'বটে, বটে। কিন্তু চাবি তো জনসাহেবের কাছে। সে ভদ্রলোক তো পরলোকে। বডিটা কোথায়?'

'জনসাহেব? বোটে উঠেছিল প্রথমে? তা হলে বোটেই আছে।'

চম্পকের দিকে মুখ ফেরাতেই সে হনহন করে নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে।

চাবি নিয়ে একসঙ্গে তিনটে ধাপ টপকে ফিরে এল একটু পরেই। বললে, 'আগে খুলব কোন দরজা?'

জবাব দিল বিদ্রোহী, 'আগে এই দরজা?'

'সেকি। আগে তো বউ,' মিটিমিটি হেসে বললে ইন্দ্রনাথ।

'আগে রহস্যের সমাধান।'

'সেটা কি এই ঘরের মধ্যে।'

'আমার তাই মনে হয়।'

'আপনি কি অন্তর্যামী?'

'আমি নয়-শুকতারা।'

'তিনি জানেন, রহস্যের সমাধান রয়েছে এই ঘরে?'

'হ্যাঁ।'

'কী করে জানলেন?'

'আপনার মন পড়ে।'

'আ-আমার মন পড়ে?' জীবনে বুঝি এই প্রথম তোতলা হয়ে যায় ইন্দ্রনাথ।

'আপনার চিন্তার তীব্রতা যে বড় বেশি, ইন্দ্রনাথবাবু। রয়েছেনও শুকতারার খুব কাছে। তাই আমাকে বললে, তুমি যাঁদের সঙ্গে এসেছ, তাঁদের একজন খালি একটা নাম মনে-মনে জপে যাচ্ছেন। তিনি নাকি পালের গোদার সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন।'

'পালের গোদাই বটে। ইন্ডো-নিপ্পন কোম্পানির শেয়ার যাঁদের কাছে সবচেয়ে বেশি, তাঁদের সবার কাছ থেকেই কোম্পানি শেয়ার কিনে নিচ্ছে। কিন্তু এই তিন ডিরেক্টরের শেয়ার সংখ্যা জুড়লে সবচেয়ে বেশি হয়। তাই এই তিন ডিরেক্টরকে আনা হয়েছে এখানে—জোর করে সই করিয়ে নেওয়ার জন্য। ঠিক কিনা?'

শেষ দুটো শব্দের প্রশ্ন নিক্ষিপ্ত হল গরাদের ওদিকে—ঘরের ভেতর। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন হিতোহিশো, 'নেভার। আই উইল নট সাইন।'

সুজন দেশাই অদ্ভুত চোখে শুধু তাকিয়ে রইলেন। তাঁর গলা দিয়ে এখন ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরচ্ছে, ঠান্ডায় জমে যাবেন মনে হচ্ছে।

'কসাই,' দাঁতে দাঁত পিষে বললে ইন্দ্রনাথ, 'কে বলুন তো?' এবারের প্রশ্ন রাম ঘোষের দিকে। তিনি কোনও জবাব দিলেন না।

বিদ্রোহী বললে, 'এঁর নাম কী?'

'যে নামটা আপনার সুন্দরী বউয়ের মুখে শুনে এসেছেন।' ইন্দ্রনাথের জবাব।

এবার আর কথা বলল না বিদ্রোহী। শুধু বেরিয়ে পড়ল দাঁতের সারি। নড়ল না ঠোঁট অধর। পার্চমেন্ট মুখের একটা পেশিও কাঁপল না। দুই অঙ্গার চক্ষুতে শুধু জাগ্রত হল পাশবিক চাহনি।

মধুক্ষরা হাসি হেসে ইন্দ্রনাথ বললে, 'নো, বিদ্রোহী নো, নো মোর মার্ডার। রাম ঘোষকে জ্যান্ত দরকার ইন্ডিয়ার সেকেন্ড গ্রেটেস্ট শেয়ার কেলেঙ্কারি ফাঁস করার জন্য। প্রথমটার নাম আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা জানে। সেই ঘটনাই প্রেরণা জুগিয়েছে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাম ঘোষকে। চমৎকার পরিকল্পনা। একটাই ভুল করে ফেলেছিল ওঁর সাগরেদরা। টাকার লোভে শুকতারাকে এখানে এনে, আর তার স্বামীকে পোর্টব্লেয়ারে জ্যান্ত পৌঁছে দিয়ে। এটা ঘটেছে ওঁর পারমিশান না নিয়ে, নইলে ফুলপ্রুফ ছিল ওঁর প্ল্যান। নিজের শেয়ার বিক্রি করতেন না। সব শেয়ার নিজেই কিনে নিতেন, এক হাজার কোটি টাকার ক্যাশ রিজার্ভ এসে যেত নিজের কন্ট্রোলে। দুই ডিরেক্টরের যাতে সন্দেহ না হয়, তাই আগেই কিডন্যাপড হয়েছিলেন নিজে। সাজানো কিডন্যাপিং। তারপরেই সত্যিকারের কিডন্যাপিং হল পরপর দুবার।' বলে একটু থামল ইন্দ্রনাথ। বললে স্বগতোক্তির সুরে, 'পরপর দুবার।' পরক্ষণেই রাম ঘোষকে উদ্দেশ করে, 'সেগুলো তো ঘটেছে পরপর দুটো সপ্তাহে। কিন্তু তার আগের সপ্তাহে 'ডগলাস' প্লেন একই প্যাসেঞ্জার নিয়ে কেন রওনা হয়েছিল পোর্টব্লেয়ারের দিকে? ও হো-হো, উকিলকে সামনে না রেখে আপনি কথাই বলবেন না ঠিক করেছেন। তাহলে আমি বলে দিচ্ছি —ট্রায়াল দিচ্ছিলেন। ব্যস, আর কথা নয়। চম্পক, কাকোই, চাবি খোলা হোক এই দরজার। কিন্তু শ্রীল শ্রীযুক্ত পরম পূজনীয় রাম ঘোষ নজর ছাড়া না হন। চলুন মশায় বিদ্রোহী বর্মন। আপনার সুন্দরী শুকতারাকে আশীর্বাদ করে আসি। আশীর্বাদই তো করব? আপনি তো আমার হাঁটুর বয়সি। সেইসঙ্গে দেখব, তার মনের কথা আমি পড়তে পারি কিনা।'

মোল্লার দৌড় যেমন মসজিদ পর্যন্ত, ইন্দ্রনাথের দৌড়ও যে তার বেশি নয়, তা সেই রাত্রেই প্রমাণিত হয়ে গেছিল। অবলা মেয়েদের মনের কথা জানতে পারা কি চাট্টিখানি কথা?

** 'স্বস্তিকা' পত্রিকায় প্রকাশিত। পূজাসংখ্যা, ১৪০২।*

পাগল খুনি

কাগজটার চারদিক দিয়ে চার হাত-পা বেরিয়েছিল। চুরি পরা হাত, শাড়ি ঢাকা পা। যেন কাগজটারই হাত-পা বেরিয়েছে।

একটু পরে কাগজই যেন কথা বলে উঠল নারীকণ্ঠে, 'পড়েছ?'

আমি বললাম, 'পড়ব কখন?'

কাগজ বলল, 'কাগজ নিয়ে তোমার মাথাব্যথা নেই বলেই আমাকে পড়তে হয়।'

'জোর খবর আছে মনে হচ্ছে?'

'লোম খাড়া করা খবর।'

'যথা?'

'খুন।'

'রোজই হচ্ছে।'

'এ-খুন সে-খুন নয়।'

'তবে?'

'রহস্যজনক খুন।'

'কাগুজে ভাষা। জোলো হয়ে গেছে।'

'খুনি হয় বর্বর, নয় উন্মাদ।'

'খুন হয়েছে কে?'

'একটা মেয়ে।'

'সেক্স ম্যানিয়াক মনে হচ্ছে?'

'ও ইয়েস, মাই বর্বর স্বামী। তুমি কি শুনবে?'

'তোমার কৌতূহল যখন জাগ্রত হয়েছে—'

'এবং গা শিরশির করছে—'

'তখন শুনব বইকি। হতভাগিনীর বডি নিয়ে নিশ্চয় ছিনিমিনি খেলেছে সেক্স ম্যানিয়াক?'

কাগজ নামিয়ে বড়-বড় চোখে তাকাল কবিতা। লাল হয়ে উঠেছে ফরসা মুখ—চোখে গা-রিরি করার আভাস। বললে সামান্য ভাঙা গলায়, 'কুৎসিতভাবে। বলতেও কষ্ট হচ্ছে। তুমি পড়ে নাও।'

অবাক হলাম। ক্রাইমের গল্প আর খবর কবিতাকে চুম্বকের মতো টানে চিরকাল। বীভৎস খুন দেখেওছে। কিন্তু ঠিক এভাবে কখনও শিউরে উঠতে দেখিনি।

হাত বাড়িয়ে বললাম, 'দাও।'

কাগজ বাড়িয়ে দিয়ে কবিতা বলে, 'শুধু মেরে ফেললেই পারত। ওইভাবে—'

'কীভাবে?'

'বলতে পারব না। পড়ো।'

সত্যিই তা বলা যায় না। কাগজ পড়বার পর বুঝলাম। বর্বর খুনি মেয়েটার...

অসম্ভব! লিখতে পারছি না। সাংবাদিক যা পারে, সাহিত্যিক তা পারে না। তাই সংবাদটা হুবহু তুলে দিচ্ছি।

বীভৎস হত্যা—কামিনী নিয়ে ছিনিমিনি

রঙ্গিলানগর। দুপুরের খাওয়ার সময় পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। অথচ সাড়া নেই 'নীল কপোত' হোটেলের চার নম্বর ঘরে। প্রাণের স্পন্দন যেন মুছে গেছে ঘরের ভেতরে—ঠিক এই রকমেরই মনে হয়েছিল ষোড়শী পরিচারিকা কাত্যায়নীর—ঘর পরিষ্কার করা যার রোজকার কাজ। মেজাজ খিঁচড়ে গেছিল প্রথমে—দুপুর গড়িয়ে গেলে রাগ হওয়া স্বাভাবিক। সব ঘরেই ঝাঁটপাট চুকে গেছে—বাকি শুধু এই চার নম্বর। মরে গেল নাকি ঘরের মানুষ দুটো? কড়া নেড়ে আর ধাক্কা মেরেও যখন কেউ সাড়া দেয়নি—তখন চাবির ফুটো দিয়ে উঁকি মেরেছিল যুগলবন্দি দৃশ্য দেখবার মতলবে। সারারাত দাপাদাপি করেছে নিশ্চয়—এখন ঘুমিয়ে মড়া হয়ে গেছে। ষোড়শী কাত্যায়নীর ঔৎসুক্য কিন্তু মেটেনি। বাদ সেধেছিল চার নম্বর ঘরের নিকষ অন্ধকার। দিনের বেলাতেও ঘরের মধ্যে এককণা আলো নেই। দিনকে রাত বানিয়ে রেখেছে মানুষ দুটো। বলিহারি যাই আদিম রিপুর তাড়নাকে।

ফের দুমদাম ঘুসি মেরেছিল কাত্যায়নী দরজার কপাটে। নিথর কক্ষে জাগ্রত হয়নি এতটুকু শব্দতরঙ্গ। নিস্তব্ধ ঘরে শুধু প্রতিধ্বনিত হয়েছে কপাট কাঁপার আওয়াজ—তার বেশি কিছু না।

কুম্ভকর্ণের ঘুমও যে হার মেনে যায়!

কাত্যায়নী তখন খবর দিয়েছে বৌদিমণিকে। উনিশখানা ঘরওলা 'নীল কপোত' হোটেলের দেখাশুনো করতে হয় এই মহিলাকেই। নাম তাঁর শ্রীমতী চারুবালা মৈত্র। সংক্ষেপে ম্যাডাম। ঝি-চাকরদের কাছে বউদিমণি। কারণ, হোটেলের মালিক গগনচাঁদ মৈত্রর তিনি পুত্রবধূ।

কাত্যায়নীর ব্যাজার মুখ দেখেই দেওয়ালের কোয়ার্জ ঘড়ির দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করেছিলেন ম্যাডাম। দেখেছিলেন, কাঁটায়-কাঁটায় দুটো। কাত্যায়নীর রাগ কি অকারণে হয়েছে?

তবে ভুরু কুঁচকে গেছিল ম্যাডামের। বঙ্কিম হয়েছিল ললাটরেখা। উনিশখানা ঘরে উনিশটা উপন্যাস রচিত হয়েছে প্রতিরাতে। অবশ্যই মিলনান্তক। বিয়োগান্তক কিছু ঘটে গেল নাকি?

তদন্ত প্রয়োজন—অবিলম্বে।

পাশ-কী বের করেছিলেন ম্যাডাম। হোটেলে নিশা সমাপনের অভিলাষে যাঁরা কক্ষ দখল করেন, তাঁদের হাতে একখানা চাবি গছিয়ে দিয়ে বলে দেওয়া হয়—একটাই চাবি এই ঘরের, হারিয়ে ফেলবেন না যেন।

কিন্তু তা নয়। ডুপ্লিকেট চাবি থাকে হোটেল মালিকের কাছে। পাশ-কী যার নাম। সঙ্কট মুহূর্ত ছাড়া যে চাবি অদৃশ্যই থাকে।

এখন দৃশ্যমান হল সেই চাবি। প্রবিষ্ট হল চাবির গর্তে। উন্মুক্ত হল কপাট।

কিন্তু ঘর যে কবরখানার মতোই নিস্তব্ধ। শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজও যে নেই!

চৌকাঠে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন ম্যাডাম। উৎকর্ণ হয়েও যখন সক্রিয় ফুসফুসের ক্রিয়াকলাপের কীর্তি কানে ধরা পড়েনি—নয়ন-শক্তি তীক্ষ্ণতর করেও যখন নিশ্ছিদ্র তমিস্রায় কিছুই অবলোকন করতে পারেননি তখন তিনি পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেছিলেন জানলার দিকে। টেনে সরিয়ে দিয়েছিলেন পরদা। ছিটকিনি খুলে দু-হাট করে দিয়েছিলেন বাতায়নের পাল্লা।

আলোয় ভেসে গেছিল ঘর। সেই আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছিল লোমহর্ষক এক দৃশ্য।

দু-শয্যার এই ঘরে পাশাপাশি লাগানো রয়েছে দুটো সিঙ্গল বেড। একটা খাটে শয়ান এক কৃষ্ণকেশী কৃষ্ণা। বিছানার চাদর আর কম্বল দিয়ে মোড়া তার গলা থেকে পা পর্যন্ত। বস্ত্রাবরণ না সরিয়েই বলা যায় শূন্য হয়েছে তার প্রাণপিঞ্জর। পাশের সিঙ্গল খাটের চাদরে অজস্র রক্তচিহ্ন বহন করছে সেই কাহিনি।

শিহরিত ম্যাডাম তৎক্ষণাৎ সচকিত করেছিলেন আরক্ষা বাহিনীকে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাঁদের আবির্ভাব ঘটেছিল রুধিরলাঞ্ছিত চার নম্বর ঘরে। চাদর আর কম্বল তাঁরাই অপসারণ করেছিলেন বিগতপ্রাণার

হিমশীতল নশ্বর দেহ থেকে। দেখেছিলেন নিষ্করুণ এক দৃশ্য।

পৈশাচিকভাবে বিকৃত করা হয়েছে শরীরটাকে।

সে দৃশ্য বাস্তবিকই অবর্ণনীয়। সুস্থ চিন্তার অধিকারী কোনও পুরুষের পক্ষে কি কোনও নারীর অঙ্গহানি করা সম্ভব এইভাবে?

লেখনী মন্থর হলেও পাঠকদের জ্ঞাতার্থে লিখতেই হবে। জনগণ জানুক, আজ এই মুহূর্তে এক নররূপী পশু বিচরণ করছে এই শহরে...স্টোনম্যান-এর চাইতেও যে বিকট এবং বিকৃত যৌনানন্দের অভিলাষী...

কৃষ্ণা সুন্দরীর বক্ষদেশের পদ্মকোরক দুটি কামড়ে প্রায় কেটে ফেলা হয়েছে—ঝুলছে চিবোনো চামড়ার ওপর।

বিবমিষা জাগ্রত হলেও এই সংবাদ যাঁরা পাঠ করছেন, তাঁদের কাছে একান্ত অনুরোধ—আরও একটু ধৈর্য ধরুন। কসাই-খুনির কদাকার অন্তর-প্রকৃতি এখনও যে উদঘাটিত হয়নি।

নির্মমভাবে পেটানো হয়েছিল মেয়েটাকে। ভয়াল কামনা যখন প্রকৃতই নারকীয় হয়ে ওঠে তখনই বুঝি এইভাবে কোমলাঙ্গী নারীদেহকে চাবুক মেরে ক্ষতবিক্ষত করা যায়। মোট সতেরোটা রক্তজমা গভীর ক্ষতচিহ্নময়, লম্বা দাগ ভয়াবহরূপে মুখব্যাদান করে রয়েছে হতভাগিনীর মুখে, বুকে, পেটে ও পিঠে।

মোট সতেরোবার তাকে কষাঘাত করা হয়েছে। কখনও চিৎ করে, কখনও উপুড় করে।

সাধারণ চাবুক নয়, অসাধারণ চাবুকের প্রহারে শক্তিমান উচ্চৈ:শ্রবাও উন্মাদ হয়ে গিয়ে নিশ্চয় মৃত্যুবরণ করত। নরম মেয়েটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে গুনে-গুনে সতেরোবার সেই চাবুক হাঁকড়েছে বর্বর খুনি চোখের পাতা না কাঁপিয়ে এবং চাপা অট্টহাসিতে ঘর মুখর করে।

নরদানব অবশ্যই।

চাবুকটা? ছ-ইঞ্চি অন্তর লোহার কাঁটা বল লাগানো। মোট ছ'টা কণ্টকময় লৌহগোলক। বাদশাহী আমলেও এরকম নির্যাতন বোধহয় কল্পনাতেও আনতে পারেনি কেউ। এক-একবারের কষাঘাতে ছ'টা কাঁটাবল একই সাথে, ছ'টি করে কূপ রচনা করে গেছে মাংস ভেদ করে, অস্থি-পিঞ্জর চূর্ণ করে দিয়ে। ললাট ভেঙে ভেতরে ঢুকে গেছে। নাক ভেঙে হেলে পড়েছে, মেরুদণ্ডের কশেরুকা আস্ত থাকেনি।

পাশের খাটে রক্ত থইথই করেছিল কেন? এখন তা জমে শুকিয়ে শক্ত হয়ে গেছে বটে—কিন্তু অত রক্ত অবশ্যই অভাগিনীর শরীর থেকে অবিরল ধারায় ঝরানো হয়েছিল ওই খাটে—কণ্টকাকীর্ণ লৌহবর্তুলের মুহুর্মুহু: প্রহারে—তারপর দেহটাকে টেনে এনে ফেলা হয়েছে এই খাটে—চাদর আর কম্বল দিয়ে সযত্নে মুড়ে রেখেছে বিকট চাবুকের মালিক।

বালিশের ওপর তখন রাখা হয়েছিল চাবুকটা। রক্তমাখা চাবুকের দাগ জেগে রয়েছে শুভ্র ওয়াড়ে।

কদর্যতম বিকৃতির কাহিনি লিখতে কলম সরতে চাইছে না, কিন্তু তা লিখতেই হবে। নইলে যে জনসাধারণ জানতেই পারবেন না, কতবড় নরাধম বিচরণ করছে এই মুহূর্তে আমাদের আশেপাশে —পরবর্তী নারীশিকারের প্রতীক্ষায়।...কদর্যতম বিকৃতিটা এই : ঘরের খিল উপড়ে এনে ঘাতক তা দিয়ে তলপেটে আঘাত করেছে। তখন সে দুই গোড়ালি বেঁধে রেখেছিল বড় রুমাল দিয়ে।

কিন্তু হতভাগিনীকে কি জ্যান্তই পিটিয়ে গেছিল নরদানবটা তার যন্ত্রণা তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করার জন্যে? ভয়াল চাবুকের এক ঘা-ই যথেষ্ট প্রাণপাখিটাকে উড়িয়ে দেবার পক্ষে—বাকি ষোলটা কশাঘাত কি টের পেয়েছিল কালো সুন্দরী?

এ প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারেননি মর্গের পোস্টমর্টেম করার প্যাথলজিস্ট। তিনি শুধু বলেছিলেন, মেয়েটা মারা গেছে দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার দরুন। হয়তো মুখের মধ্যে ন্যাকড়া ঠুসে দিয়ে ফুসফুসে বাতাস যাতায়াতের পথ রোধ করে দেওয়া হয়েছিল—অথবা, বালিশ চেপে ধরা হয়েছিল মুখে।

প্রহারের আগে, না পরে? মুখে কাপড় ঢুকিয়ে মরণ চিৎকারের পথ বন্ধ করেই নিশ্চয় চাবুক লকলকিয়ে উঠেছিল তার নিরাবরণা শরীরের প্রতিটি বর্গ ইঞ্চির ওপর। খিল উপড়ে আনা হয়েছিল তার আগে না পরে?

বীভৎস! অতিবড় দু:স্বপ্নেও যে এহেন নারী নিধনের পরিকল্পনা মাথায় আনা যায় না। হত্যাকারী কি তবে উন্মাদ? যৌন বিকৃতিতে আচ্ছন্ন এক শরীরী আতঙ্ক?

পুলিশ তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। মেয়েটির হাড়গোড় ভাঙা ছিন্নভিন্ন দেহটা পাওয়া গেছিল শুক্রবার, ২৪ জুন, ১৯৯৪। তার আগের রবিবারে চার নম্বর ঘর ভাড়া দেওয়া হয়েছিল যে পুরুষ অতিথিকে, তার সঙ্গে ছিল এক মহিলা—যে-মহিলা খুন হয়েছে, সে নয়। হোটেল রেজিস্টারে সই করেছিল পুরুষটি মিস্টার অ্যান্ড মিসেস এন. জি. সহায় নাম দিয়ে—ঠিকানা লিখেছিল মহম্মদবাজারের এক বাড়ির।

পুলিশ সুপার ইকবাল হোসেন নিজেই এই নিষ্ঠুর হত্যার তদন্ত শুরু করেছেন। পাঠক সাধারণের স্মরণ থাকতে পারে, গতবছর ইনি পুলিশ মেডেল পেয়েছিলেন দিল্লি থেকে—ভারতের এক নম্বর মানুষ স্বর্ণপদক তুলে দিয়েছিলেন ভারতের এক নম্বর পুলিশ অফিসারের হাতে। কৃতী পুরুষ ইকবাল হোসেন তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব আর বিদ্যুৎগতি তদন্তের অন্যতম নিদর্শন হাজির করেছেন কৃষ্ণাকামিনীর নিঠুর ঘাতকের সন্ধানে।

কয়েক ঘণ্টাও অতিক্রান্ত হয়নি—ঘাতকের হদিশ তিনি বের করে ফেলেছেন। নাম তার নটগোপাল সহায়। সুদর্শন। বয়স ২৯। একদা ছিল আর্মি অফিসার। বিলক্ষণ লম্বা—পাক্কা ছ'ফুট। ক্রিমিন্যাল রেকর্ডের অধিকারী। সেসব ক্রাইমের মধ্যে অবশ্য ভায়োলেন্স নেই। খুন জখম মারপিটের দাগ নেই তার অতীত ইতিহাসে—তবে ধোয়া তুলসিপাতা নয়।

শনাক্ত করা গেছে হতভাগিনী মেয়েটিকেও। বয়স তার ৩২। নাম, মিসেস বিদ্রোহিনী বরাট। মাঝে-মাঝে ফিল্মে এক্সট্রা হয়েছে। স্বামী পরিত্যক্তা। হল্লামুখর বোহেমিয়ান জীবনযাপনে অভ্যস্ত। নিত্যনতুন আদমের সঙ্গে নিশাযাপন তার চরিত্রের মস্ত দিক।

খুনের আগের রাতে সে আকণ্ঠ সুরা পান করেছিল। শুধু বিকিনি এবং অতি ক্ষীণ বক্ষবাস পরে উল্লোল নৃত্য নেচেছিল নটগোপাল সহায়ের সঙ্গে—স্থানীয় পানামা ক্লাবে। মধ্যযামিনী নাগাদ ক্লাব ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল দুজনে কোমর ধরাধরি করে। দাঁড় করিয়েছিল চলমান এক ট্যাক্সিকে। সোজা গেছিল 'নীল কপোত' হোটেলে। ট্যাক্সিচালক উমেশ খান্না প্রখর স্মৃতিশক্তির নিদর্শন রেখেছে পুলিশ সুপারের রিপোর্টে। বলেছে, ওরা তো ট্যাক্সির মধ্যেই গুজুর-গুজুর করছিল, চাপা হাসি হাসছিল, এলোমেলো চুম্বনও চলছিল। মদের গন্ধে ভুরভুর করছিল ট্যাক্সি। এসব লোকদের আমি হাড়ে-হাড়ে চিনি। বেশি বেলেল্লাপনা করলে নিশ্চয় গলা তুলতাম। কিন্তু তার দরকার হয়নি। 'নীল কপোত' হোটেল যখন প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে, ট্যাক্সি থামিয়ে নেমে পড়েছিল দুজনে, ঢ্যাঙা লোকটা জিগ্যেস করেছিল—ভাড়া কত হয়েছে? উমেশ বলেছিল—বাইশ টাকা। দশটাকার তিনখানা নোট উমেশের হাতে গুঁজে দিয়ে মেয়েটার কোমড় জড়িয়ে ধরে সোজা হোটেলের দিকে টলতে-টলতে এগিয়ে গেছিল দুজনে—ঢুকে গেছিল লোহার গেট পেরিয়ে ভেতরে।

তদন্ত ধারা নিশ্চয় আরও এগিয়েছে। কিন্তু বিচক্ষণ ইকবাল হোসেন এর বেশি খবর দিতে চাননি আমাদের প্রতিবেদকের কাছে। তবে পুলিশের সাহায্য ছাড়াই আমরা এই নরপিশাচের সন্ধান নেওয়া শুরু করেছি। আমরা নিছক সংবাদদাতা নই, সমাজসেবকও বটে। আমাদের সাংবাদিক শুধু সংবাদ সংগ্রহই করেন না—সমাজশত্রুর অন্বেষণও করেন। অচিরেই আমরা এই দুষ্ট ব্রণর নাগাল ধরে ফেলতে পারব—এই আশা রাখছি।

কাগজ নামিয়ে রেখে তাকালাম কবিতার দিকে। গালে হাত দিয়ে প্রোজ্জ্বল চোখে সে তখনও তাকিয়ে আমার পানে।

আমি বললাম, 'দৈনিক ক্রাইম ইন্ডিয়াকে একমাত্র ক্রাইম ডেলি বলেই জানতাম—কিন্তু ডিটেকটিভগিরি শুরু করেছে, এটা জানা ছিল না।'

জবাবটা ভেসে এল চৌকাঠ থেকে, 'এবং আমিই সেই ডিটেকটিভ।'

সচমকে তাকিয়েছিলাম কণ্ঠস্বরের অধিকারীর দিকে। মিটিমিটি হাসছে দরজার দুই পাল্লায় হাত রেখে। খাসা মানিয়েছে পাটভাঙা গরদের পাঞ্জাবি। চুনোট করা কোঁচার অগ্রভাগ লুটিয়ে রয়েছে দুই পায়ের ফাঁকে মেঝের ওপর।

চোখের তারা নাচিয়ে সে বললে, 'হ্যাঁ, আমিই সেই গোয়েন্দা—শ্রীহীন ইন্দ্রনাথ রুদ্র।'

গাল থেকে হাত নামিয়ে গলা শক্ত করে বললে কবিতা, 'ঠাকুরপো, স্বামী-স্ত্রীর কথার মধ্যে আড়ি পাতা অত্যন্ত কু-অভ্যেস।'

'আড়ি তো পাতিনি। পুনর্বার চক্ষুনৃত্য দেখিয়ে এবং কণ্ঠস্বরের অর্গান বাজিয়ে বললে শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ রুদ্র, 'সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি তীর্থের কাকের মতোন—সুবচনী বউদির হাতে এক কাপ চা খাব বলে—কিন্তু বউদির নয়নজ্যোতি যে মৃগাঙ্কর অঙ্কেই নিবদ্ধ।'

গাল লাল হল কবিতার। মুখে আঁচল চাপা দিয়েই সরিয়ে নিয়ে বললে, 'ভেতরে আসা হোক। অভিনয় যথেষ্ট হয়েছে। আইবুড়ো হলেই কি এমনি হয়?'

'কেমনি?' ভেতরে এসে ধপ করে কবিতার পাশে দেহভার ন্যস্ত করে বললে ইন্দ্রনাথ, 'একাধারে স্ত্রীত্ব, মাতৃত্ব, বন্ধুত্ব তোমার মাঝে দেখবার জন্যে ছুটে আসি যেমনিভাবে—তেমনি?'

'তোমার সঙ্গে কথায় আজকে অন্তত পারব না।'

'কেন? কেন? কেন? আজ তোমার জিহ্বাসরস্বতী কি নিদ্রিতা?'

'মূর্চ্ছিতা।'

'কেন? কেন? কেন?'

'দৈনিক ক্রাইমে রিপোর্টেড ওই পাষণ্ডটার কাণ্ড পড়বার পর।'

'পাষণ্ড করেছে পাষণ্ডর কাজ—তাতে তোমার মস্তিষ্ক লণ্ডভণ্ড কেন?'

'তার আগে বলো, দৈনিক ক্রাইম তোমাকে অ্যাপয়েন্ট করেছে?'

'হ্যাঁ।'

'নটগোপাল সহায়কে ধরবার জন্যে?'

'হ্যাঁ।'

'সন্ধান পেয়েছ?'

'না।'

'ইকবাল হোসেন ত্বরিৎ গতিতে এগিয়ে গেলেন, খুনির নাম বের করে ফেললেন, আর তুমি তার—'

'টিকি ধরতে পারছি না, এই তো? হে বউদি, ইকবাল যা কিছু খবর পেয়েছেন সবই তো ওই নাইট ক্লাব থেকে। সেখানে রেগুলার যারা আসে, তাদের নামধাম রেজিস্টারে লেখা থাকে। তারপর?

'তারপর কী?'

'সব ফলস। ইকবাল হোসেন তাই এখন ল্যাজেগোবরে।'

'বিশদ করো ঠাকুরপো।'

'ইকবাল খোঁজ নিয়েছিলেন নটগোপালের রেসিডেন্সে—সেখানে ওই নামে কেউ থাকে না।'

'নটগোপাল তাহলে আর্মিতেও ছিল না?'

'মনে তো হয়।'

'তার ক্রিমিন্যাল কীর্তিকলাপ ইকবাল হোসেন জানলেন কী করে?'

'ক্লাবেই বড়াই করত নটরাজ—'

'নটগোপাল।'

'ওই হল গিয়ে। মদের ঝোঁকে এন্তার কথা বলেছে সমাজশ্রেণির মানুষদের কাছে। নাইট ক্লাবে কখনও যাওনি—গেলে বুঝতে সেখানে কী শ্রেণির লোক আসে।'

'তুমি যাও বুঝি?'

পা নাচিয়ে গুনগুন করে গান গাইতে লাগল ইন্দ্রনাথ। তারপর পকেট থেকে বের করল পাইপ আর টোব্যাকো।

কবিতা বললে, 'তবুও ভালো। নস্যিটা ছেড়েছ।'

'কিছুই ছাড়িনি। সবই আছে। দরকার মতো ইউজ করি। যেমন করেছি ধনগোপালকে কব্জা করার জন্যে।'

'ধনগোপাল আবার কে?'

'বিদ্রোহিনীর হাজব্যান্ড।'

ঝট করে শিরদাঁড়া সিধে করে ফেলল কবিতা, 'বিদ্রোহিনী! সেই কুলটা মেয়েটা?'

'মেয়েরাই মেয়েদের বড় শত্রু। কুকর্মের এহেন সাজাপ্রাপ্তির পরেও তাকে কুলটা বলাটা অন্যায়।'

'কে এই ধনগোপাল?'

'লাটনগরের নাম শুনেছ? শোনোনি। শিগগিরই দৈনিক ক্রাইমে বেরোবে দ্বিতীয় কিস্তি—তখন জানতে পারবে।'

'তার আগে তোমার মুখে শুনব।'

'শোনো।'

সমুদ্রের ধার বরাবর পান্থনিবাস গড়বার একটা হিড়িক খুব লক্ষ করা যাচ্ছে। ইদানীং দেশ বেড়ানোর বাতিক যাদের, তারা এইসব জায়গায় কিস্তিতে টাকা নিয়ে ফ্ল্যাট কিনেও রাখছে।

লাটনগরও সমুদ্রের ধারে—গভীর ঝাউবনের মধ্যে। কিন্তু এ যুগের প্রোমোটারদের জন্ম হওয়ার আগে পরিকল্পিত। সিপাই বিদ্রোহের ঠিক পরে লাটনগরের পত্তন ঘটে সুন্দরবনের গভীর গহন অঞ্চলে। সেখানে গেলে ইতিহাস যেন গাছের পাতায়-পাতায় কথা কয়। আমি সেই কথা শুনে এসেছি।

সিপাই বিদ্রোহ যখন শুরু হয়নি, মঙ্গল পাণ্ডে যখন ব্যারাকপুরে রুখে দাঁড়ায়নি, তখন এক কর্মঠ ব্রাহ্মণ যজমানি ত্যাগ করে সেই অঞ্চলে চলে যান শান্তিতে থাকবেন বলে। মানুষের সঙ্গ তাঁর ভালো লাগেনি—বিশেষ একটা কারণে। নাম তাঁর মাধবেন্দ্র আচার্য বারেন্দ্র। ঘণ্টা বাজানো তিনি ঘৃণা করতেন, কিন্তু কুড়ুল চালাতে পারতেন ভালো। বন্দুক আর তলোয়ার ছিল তাঁর নিত্য সঙ্গী। তাঁর ভেতরে ছিল বজ্র—আগুন ছিল চোখে। এই পৃথিবীর একটা মানুষ জাতকে তিনি অন্তরের দাবানল দিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিলে স্বস্তি পেতেন।

সে জাতটা ইংরেজ জাত।

কারণ, তাঁর সুন্দরী যুবতী বধূকে উপভোগ করে গেছিল এক ইংরেজ সামরিক অফিসার। ছ'ফুট লম্বা মাধবেন্দ্র আচার্য তাকে ক্ষমা করেননি—কুড়ুলের এক কোপে খুলি দু-ফাঁক করে দিয়েছিলেন।

ধর্ষিতা স্ত্রীকে নিয়ে চলে গেছিলেন জঙ্গলে। সেইখানেই ফুটেছিল ধর্ষণের ফুল। মাধবেন্দ্র তাকে নিজের ছেলে বলেই গ্রহণ করেছিলেন। বড় করে তুলেছিলেন।

সেই যুগে জায়গাজমি নিয়ে এত লেখাজোখা হত না। জঙ্গলের জমিতে কে বাড়ি বানিয়ে জমি দখল করেছে—অত ভাববার দরকার হত না। কুড়ুল চালিয়ে গাছ সাফ করে সুন্দর একটা আস্তানা বানিয়ে তুলেছিলেন মাধবেন্দ্র। কুড়ুলের কোপে বাঘ মেরেছেন, সাপ সাফ করেছেন।

এই সময়ে সিপাই বিদ্রোহ শুরু হল এবং শেষও হয়ে গেল। আঁচ পৌঁছল না জঙ্গলের শান্তিঘেরা অঞ্চলে।

ব্রিটিশ সরকার কিন্তু বিদ্রোহের গতিপ্রকৃতি আর নেতৃত্বের পরিচয় জানবার জন্যে খোঁজ নেওয়া শুরু করেছিল। দেখা গেছিল, বিদ্রোহ ঘটেছে শুধু উত্তরভারতেই—যে জায়গাটা আর্যদের বাসভূমি বৈদিক আর্যাবর্ত। বিদ্রোহের নায়করা প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণ।

সেনাদলে নৈতিক নেতৃত্ব নিল কীভাবে ব্রাহ্মণরা? খোঁজ নিয়ে জানা গেছিল—সবই বেদের ক্ষমতা। ব্রিটিশ সরকার তখন বেদের ব্যাখ্যা করিয়েছিল ম্যাক্স মুলারকে দিয়ে। একই সঙ্গে খতম করতে চেয়েছিল ব্রাহ্মণদের

—শুরু হয়েছিল শত্রুসংহার বড় ভয়ানকভাবে। শাহী সড়ক বা গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের দু-ধারে গাছে-গাছে ফাঁসিতে লটকে দেওয়া হয়েছিল পৈতেধারী ব্রাহ্মণদের—গাঁয়ে হানা দিয়ে ব্রাহ্মণ পেলেই ধরে এনে ঝুলিয়ে দিয়েছে। ঝুলন্ত ব্রাহ্মণদের নামিয়ে এনে সৎকার করতেও দেওয়া হয়নি।

এই সময়ে বৈকুণ্ঠ বরাট নামে এক ধনকুবের সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ জায়গা ইজারা নেয় ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে—বিদ্রোহ দমনে বিস্তর সাহায্য করার পারিতোষিক হিসেবে।

মাধবেন্দ্রকে উৎখাত করার দরকার হয়েছিল তখনই। অথচ তাকে যমের মতোন ভয় পেত বৈকুণ্ঠ। প্রথমে বন্ধুত্ব দিয়ে জয় করার চেষ্টা করেছিল মাধবেন্দ্রকে। সমুদ্রের ধারে নিজের প্যালেস যখন তৈরি হচ্ছে, মাধবেন্দ্রকে ডেকে এনে খাইয়েছে, নামী আর্টিস্টকে দিয়ে তার অয়েল পেন্টিং আঁকিয়ে ঘরে ঝুলিয়েছে, টাকা পয়সাও দিতে চেয়েছে।

মাধবেন্দ্র কিন্তু টলেনি।

তাই একদিন দেখা গেল, ব্রিটিশ সৈন্য অতর্কিতে হানা দিয়ে মাধবেন্দ্রকে ঝুলিয়ে দিয়েছে ফাঁসির দড়িতে—তাঁরই প্রিয় বটগাছের ডালে। অপরাধ—সিপাই বিদ্রোহে মদত দেওয়া।

পালিয়ে বাঁচল মাধবেন্দ্রর কিশোর পুত্র—যার ধমনীতে রয়েছে ইংরেজ রক্ত—স্ত্রী-র মৃত্যু আগেই ঘটেছিল।

যে ক'জন জানল ব্যাপারটা, তারা মুখে চাবি দিয়ে রইল বৈকুণ্ঠর ভয়ে।

প্যালেস ঘিরে গড়ে উঠল বসতি। বরাট এর 'ব' বাদ দিয়ে নাম দেওয়া হয়েছিল রাটনগর। কালক্রমে তা দাঁড়িয়েছে লাটনগর।

এই লাটনগরের বর্তমান মালিক ধনগোপাল বরাট দিন কয়েক আগে এসেছিলেন আমার কাছে। বিদ্রোহিনীর মার্ডারারকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্যে।

'দৈনিক ক্রাইমে খবরটা পড়ে?'

'হ্যাঁ। প্রথমে গেছিলেন পত্রিকা অফিসে। আত্মপরিচয় দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, বিদ্রোহিনীকে তিনি ত্যাগ করেননি—বিদ্রোহিনীই তাঁকে ত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হয়েছিল। কারণ, তিনি তাঁর বিধবা পুত্রবধূর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে চলেছেন।'

চোখের তারা স্থির হয়ে গেল কবিতার। মুখে কথা নেই।

জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলে গেল ইন্দ্রনাথ।

ভদ্রলোকের মুখাবয়ব শেয়ালের মতোন ছুঁচোল। চোখ কোটরে ঢোকানো। কান খাড়া—খরগোশের কানের মতোন। ভয়ানক ফরসা—রং যেন ফেটে পড়ছে। নিখুঁতভাবে কামানো গাল আর চিবুক—ঠোঁটের নীচের গোঁফজোড়া কিন্তু বাইসনের বাঁকানো শিং-এর অনুকরণে মোম দিয়ে সযত্নে পাকানো। গায়ে গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবি। চাহনি চঞ্চল এবং ধূর্ততায় পিচ্ছিল। প্রথম দর্শনেই তাঁর চরিত্রের সততা সম্বন্ধে সন্দেহ জেগেছিল দৈনিক ক্রাইম পত্রিকার নিউজ এডিটরের মনে।

জিগ্যেস করেছিলেন, 'আপনার স্ত্রী? ত্যাগ করেছিলেন কেন?'

'আমি করিনি।' অম্লানবদনে বলেছিলেন ধনগোপাল, 'পালিয়ে গেছিল।'

'কেন?'

'আর বলেন কেন। বউ মরে গেল—ছেলেটার বিয়ে দিলাম—একই ছেলে। সে ব্যাটাও অক্কা পেল। কী করি বলুন? ঘরের বউকে তো পরকে দেওয়া যায় না। তাই একটু ইয়েটিয়ে করতাম।'

'শাট আপ। আপনি আসতে পারেন।'

'আসব মানে? লাটনগর থেকে এতটা পথ ঠেঙিয়ে এলাম কি আপনার বদনচন্দ্র দেখে বিদায় নেব বলে? মেয়েটাকে কে মারল, তা জানব না!'

'আপনি যান।'

'না, যাব না। দ্বিতীয় পক্ষের বউ হয়ে এসেছিস, সেইভাবে থাকলেই পারতিস। খাওয়া-পরার অভাব তো ছিল না—তা না, আমি আমার ছেলের বউয়ের সঙ্গে কী করছি তাই নিয়ে মাথা গরম।'

'গেট আউট।

'বুঝেছি। আপনার কম্ম নয়। ইন্দ্রনাথ রুদ্র নামে কে একটা ডিটেকটিভ যেন আছে? সত্যি, না সেটাও বোলচাল কাগজ কাটানোর গল্প? আছে? দিন, দিন, ঠিকানা দিন—দেখি তার মুরোদ।'

'আপনিই ইন্দ্রনাথ রুদ্র? চেহারাটা বাগিয়েছেন খাসা—লায়ক-লায়ক।'

'লায়ক নয়—নায়ক।'

'নস্যি-নস্যি...নাক বুজে গেছে মশায়—আপনিও নেন? দিন।'

'আপনার কুকীর্তি এখুনি শুনলাম—টেলিফোনে।'

'ভ্যানতারা নিউজ এডিটরটা ফোন করেছিল? বোগাস লোক মশায়—আমি চাই বিদ্রোহিনীর মার্ডারারকে। কেন? দূর মশায়, গলা কাটতে যাব কেন? গালে চুমু খাব। মাগিকে টাইট দিয়েছে ভালোই।

'আপনি খুশি?'

'বিলক্ষণ। পেটের ভাত জোগাতে বেশ্যাগিরি করছে, সে খবর পেয়েছিলাম। ঘরে ফিরিয়ে আনতেও চেয়েছিলাম।'

'আপনার মতোন লম্পটের ঘরে?'

'সে নিজেই বা কম যাচ্ছিল কীসে! এইসব মেয়েদের পিটোতে আমার ভারি—'

'তাই ফিরিয়ে আনতেন?'

'হা-হা! ঠিক ধরেছেন। কাঁটাওলা চাবুক তো ঘরেই আছে।'

'আপনার ঘরে?'

'মাইরি মশায়, কী ভাবেন আমাকে? বাপ চোদ্দো পুরুষের চাবুক যত্ন করে রাখব না? ছেলের বউ তো চাবুকের ভয়েই—'

'আমাকে দেখাবেন?'

'নজর দেবেন? যা ফিগার আপনার—'

'চাবুকটা দেখতে চাই।'

'তাই বলুন! চলুন না—গাড়ি রেডি।'

ঝাউবন দিয়ে ঘেরা সারি-সারি কটেজ। একপ্রান্তে একটা দোতলা বাড়ি। ব্রিটিশ স্থাপত্য বনেদ থেকে ছাদ পর্যন্ত। বড়-বড় থাম—কলকাতার সেনেট হাউসের অনুকরণে।

এই বাড়িটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা—বাগান সমেত। পাঁচিলের বাইরে ঝাউবনের মাঝে-মাঝে কটেজ—ভাড়া দেওয়া হয়। তিন দিকে। আর একদিকে সমুদ্র।

দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ধনগোপাল বললেন, 'অনেকটা পথ এসেছেন। রাতও হয়েছে। একটু মাল চেখে নেবেন?'

'চাবুকটা দেখান।'

'অ্যাবাউট টার্ন করুন। ওই যে হলঘর—এ বাড়ির নাচঘর। দেওয়ালে-দেওয়ালে ওই যে অয়েল পেন্টিংগুলো দেখছেন—আমার পূর্বপুরুষদের—শুরু সেই বৈকুণ্ঠ বরাট থেকে। এই যে এই ছবিটা—পাশেরটা কার বলুন তো? হা-হা—সেই গবেটটার—যাকে ফাঁসিতে লটকে ছিল বৈকুণ্ঠ বরাট কায়দা করে—'

'মাধবেন্দ্র আচার্য।'

'নামটা মনে রেখেছেন তাহলে! গাড়ির ঝাঁকুনিতে অনেক কথাই পেট থেকে বেরিয়েছে দেখছি। —কে?'

হলঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে একটা লম্বা ছায়ামূর্তি, 'আমি।'

'বিলকুল?'

'আজ্ঞে।'

'মশায় ডিটেকটিভ, এই আমার ম্যানেজার—এর মুখেই খবর পেয়েছিলাম, কেলে বউটা কেলোর কীর্তি করে বেড়াচ্ছে—জানতেও পাঠিয়েছিলাম—তার আগেই গেল ফরসা হয়ে। বিলকুল, ওই ঝাড়বাতিটা জ্বালো।'

জ্বলে উঠল ইলেকট্রিক ঝাড়বাতি—লাটনগরের পাওয়ার হাউস চলে হাওয়া-কলের দৌলতে—সমুদ্রের হাওয়ায়। ধনগোপালের ব্রেন।

ম্যানেজার বিলকুল ঘুরে দাঁড়াল দেওয়ালের সুইচ বোর্ডের সামনে। লোকটা যেমন দীর্ঘকায়, তেমনি অস্থিময়। রোগা হাড় নয়—মোটা হাড়। চোয়াল বুলডগের চোয়ালের মতোন চৌকো। চোখ দুটো ধীর স্থির শান্ত।

ধনগোপাল বললেন, 'বিলকুলের ডানদিকের দেওয়ালে আলমারিতে রয়েছে কাঁটা চাবুক। দেখুন আপনি—আমি একটু মাল খেয়ে আসি।'

বিদায় হলেন ধনগোপাল—কোঁচা লুটিয়ে। বিলকুল আর ইন্দ্রনাথ তাঁর গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইল সেকেন্ড কয়েক।

তারপর বললে ইন্দ্রনাথ, 'আপনার নামটা অদ্ভুত।'

'অবাঙালি বলে মনে হয়?' হাড় খটখটে চেহারা হলেও বিলকুলের গলা মার্জিত—মিষ্টতা আছে।

'তা বটে। পদবী কী আপনার?'

'আচারিয়া। ইন ফ্যাক্ট, আমরা ইউ-পি'র মানুষ। বাঙালি বনে গেছি।'

'বিদ্রোহিনী বরাটের খবর আপনি পেলেন কী করে?'

'এস্টেট ম্যানেজ করতে গেলে শহরে যেতেই হয়—সর্বত্র গতিবিধি রাখতে হয়। এসব কটেজ যারা ভাড়া নেয়—তারা কেউ নিখাদ সোনা নয়। এ-ওর বউকে ভাগিয়ে নিয়ে রাত কাটিয়ে যায়, কখনও অফিসের মেয়ে, কখনও পাড়ার দিদি-বোন-বউদি, কখনও স্রেফ কলগার্ল।'

'বুঝেছি। লাটনগর তাহলে আসল পাপনগর?'

গম্ভীর মুখে কিন্তু শান্ত চোখে সংক্ষেপে জবাব দিল বিলকুল, 'ব্যাবসা।'

'কালো ব্যাবসা। পাপ তো এই প্রাসাদেও, তাই না?'

চুপ করে রইল বিলকুল। কিন্তু জবাবটা ভেসে এল দূর থেকে একটা নারী কণ্ঠের আর্ত চিৎকারের মধ্যে দিয়ে। সমুদ্রের গর্জন ছাপিয়ে, ঝাউ গাছগুলোর মর্মরধ্বনি ডুবিয়ে—ক্ষণস্থায়ী কিন্তু আকুল সেই চিৎকার রণরণিয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে গেল প্রাসাদের অলিন্দে-অলিন্দে বেশ কয়েক সেকেন্ডে। তারপর সব চুপ।

দেওয়ালে প্রলম্বিত অয়েল পেন্টিং-এর দিকে চোখ তুলে নিশ্চুপ দেহে দাঁড়িয়ে বিলকুল। নির্বিকার।

'কার কণ্ঠ?' প্রশ্ন ইন্দ্রনাথের।

'মৌমিতার।'

'ধনগোপাল বরাটের পুত্রবধূ?'

'হ্যাঁ।'

'চেঁচাল কেন?'

অয়েল পেন্টিং থেকে চোখ নামিয়ে ঠান্ডা গলায় বললে বিলকুল, 'আপনি তা জানেন।'

'এত নিশ্চিতভাবে বলছেন কেন?'

'কারণ, বস সবার কাছে বড়াই করেন।'

এই প্রথম বিলকুলের কণ্ঠস্বরে ঈষৎ উত্তাপের আভাস লক্ষ করল ইন্দ্রনাথ। বললে, 'যে অয়েল পেন্টিংটা এতক্ষণ চোখের পাতা না কাঁপিয়ে দেখছিলেন—সেটা কার, তাও বলেছেন।'

অয়েল পেন্টিংয়ের দিকে ফের চোখ ঘুরে গেল বিলকুলের, 'বেচারা। কিন্তু শেষ অভিশাপ ঘুরছে এই প্রাসাদের বাতাসে।'

'কেন?'

'কয়েকটা রাত থাকলেই বুঝবেন।'

'প্রেতাত্মার কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ। শুনেছি, ফাঁসিতে ঝোলাবার আগে বৈকুণ্ঠ বরাটের দিকে তাকিয়ে তিনি দাঁতে দাঁত পিষে বলেছিলেন—আমার জারজ সন্তান এর শোধ নেবে বৈকুণ্ঠ।'

'আপনি জানলেন কী করে?'

'আপনিও জানতে পারবেন। ক'দিন থাকুন। এই ঝাউবনের বাইরে যারা থাকে, তারা জানে। দেখছেন না, এ বাড়ির কেউ স্বাভাবিক নয়। বিধবা পুত্রবধূর মৃত্যুও বুঝি এর চাইতে ভালো ছিল। বিদ্রোহিনী পালিয়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছিল—কিন্তু কী হল!'

'মাধবেন্দ্রর ছেলে তো এখন বেঁচে নেই—থাকলে বলতাম খুনটা করেছে সেই।'

'থাক সে কথা।'

'আমার তো মনে হয় এ ভিটেতে ঘুঘু চড়িয়ে ছাড়বে মাধবেন্দ্রর প্রেতাত্মা।'

পূর্ণ চোখে ইন্দ্রনাথের পানে তাকাল বিলকুল—'আশ্চর্য নয়।'

'কাঁটা চাবুকটা দেখান।'

'আসুন। এই দেখুন। লাল ভেলভেটের ওপর কত যত্নে সাজিয়ে রাখা—যেন অমূল্য ধন।' শেষের দিকের শ্লেষ আর প্রচ্ছন্ন রইল না বিলকুলের কণ্ঠে।

'আলমারিটা খুলুন—'

'হাতে নিয়ে দেখবেন? দেখুন।'

'কী লাগানো রয়েছে বলুন তো? ভেসলিন নয়—কালচে...এ যে রক্ত...শুকনো রক্ত!'

পাথরের মতোন শক্ত হয়ে গেল বিলকুলের দুই চক্ষু—দুই মণিকা এখন গ্র্যানাইট-কঠিন—'রক্ত!'

'হ্যাঁ।—পুত্রবধূকে পেটান হয়েছিল নাকি?'

'হলে জানতে পারতাম।'

'আপনাকে মৌমিতা সব কথা বলে মনে হচ্ছে?'

'ঠিক ধরেছেন। আমার কিছু করার নেই। গৃহভৃত্য ছাড়া আমি কিছুই নই।'

'চাবুকের রক্ত খুব পুরোনো নয়।'

'তাই তো দেখছি।'

'কার রক্ত বলে মনে হয়?'

চোখ নামিয়ে নিয়ে বললে বিলকুল, 'সেটা আপনি বলবেন। আমি যাই, আপনার আহারাদির ব্যবস্থা করি।'

ঘর যখন ফাঁকা হয়ে গেল, তখনও ইন্দ্রনাথ ঠায় দাঁড়িয়ে রইল অয়েল পেন্টিংয়ের সামনে। কাঁটা চাবুক তার দু-হাতে।

চমক ভাঙল মরণাত্মক আর্তনাদে।

নারীকণ্ঠের আর্তনাদ। একবার...দুবার...তারপর নৈ:শব্দ্য।

ধাবমান পায়ের আওয়াজ শোনা গেল চওড়া বারান্দায়—যেদিকে রয়েছে সমুদ্র।

ঘরে ঢুকল বিলকুল। চক্ষু বিস্ফারিত। হাঁপাচ্ছে, 'শুনলেন?'

'কার কণ্ঠ?' একইরকম নিরুত্তাপ স্বরে বললে ইন্দ্রনাথ।

'মৌমিতার।'

'সে এখন কোথায়?'

'আসুন।'

বারান্দার শেষের দিকে যাওয়ার পথে পাশের একটা ঘর থেকে হাঁক শোনা গেল ধনগোপালের, 'কে যায়?'

'আমি।' বললে বিলকুল।

'কে চেঁচাল অমন করে?'

'আপনার পুত্রবধূ?' এবারের জবাবটা ইন্দ্রনাথের। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে। সাদাকালো মার্বেল বাঁধানো মেঝের ওপর কার্পেট পাতা। মখমলের তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে ধনগোপাল। সামনে হুইস্কির বোতল আর গেলাস। বললে [illegible] স্বরে, 'মাগির বড় বাড় বেড়েছে। যাচ্ছি।'

বিলকুল ঢুকল ঘরে। কার্পেট থেকে ধনগোপালকে টেনে তুলল দুই বগলের নীচে হাত গলিয়ে, 'চলুন।'

ফের বারান্দা। দু-খানা ঘর পরেই ডানদিকের দরজা খোলা। আলো জ্বলছে।

চৌকাঠে থমকে দাঁড়াতে হল তিনজনকেই।

মাতালের গলা দিয়ে বেরিয়ে এল শুধু একটা শব্দ, 'যাচ্চলে।'

বিশাল পালঙ্কে এলিয়ে রয়েছে অর্ধনগ্না গৌরবর্ণা এক নারীদেহ। রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত।

গোটা শরীর ফালাফালা হয়ে গেছে ধারাল নখের খাবলানিতে। লম্বালম্বি টান। বুকের ফুল টুকরো-টুকরো। ঠোঁট আধখানা নেই। সবচেয়ে বেশি আঁচড়ানি দুই জঙ্ঘার মাঝে—পৈশাচিক আক্রোশ যেন সেইখানেই।

চেঁচিয়েছিল তখনই—যন্ত্রণায় আকুল হয়ে—চেঁচানি স্তব্ধ হয়েছে শাণিত নখ যখন একটানে দু-টুকরো করেছে কণ্ঠনালি।

বারান্দার নীচে বাগানে এখন জঙ্গল—বাগানের নামগন্ধ নেই। এই জঙ্গল শেষ হয়েছে সমুদ্রের ধারে বালির সৈকতে।

গভীর রাতে একটা টর্চ বারকয়েক জ্বলে উঠে নিভে গেল এই জঙ্গলের অন্ধকারে।

যেন হারানো নিধি খুঁজছে অন্ধকারের প্রেত।

ডেডবডি তখনও চাদর দিয়ে চাপা। পুলিশের গাড়ি এসে দাঁড়াল প্রাসাদের গাড়ি-বারান্দায়। গাড়ি থেকে নামলেন সুদেহী এক অফিসার। কোমরে রিভলভার।

অভ্যর্থনা জানাল শুধু ইন্দ্রনাথ।

অফিসার বললেন, 'ফোর্স আনতে বারণ করলেন কেন?'

'দরকার কী? আপনার আর আমার রিভলভারই যথেষ্ট।'

'যদি গুলি ফসকায়...না, না, আপনার নয়...আমার।'

'ইকবাল হোসেনের গুলি আকাশের উড়ন্ত পাখিকেও মাটিতে নামিয়ে আনে।'

'প্রেতের গায়ে কি গুলি লাগবে?'

'লাটনগরের প্রেত? ওই সেই বটগাছ—ওই সেই ডাল—যেখানে ঝুলছিল তাঁর নশ্বর দেহ। ইকবাল হোসেন, হয়তো তিনি এখনও আছেন।'

'বাঘের আঁচড় মশায়—বারান্দা টপকে ঢুকেছিল—বারান্দা টপকে পালিয়েছে।'

'শিকারকে মুখে না নিয়ে?'

'যা চেঁচিয়েছিল মেয়েটা—'

'বাঘ কখনও মেয়েদের গোপন জায়গায় আক্রোশ দেখায়?'

'সেক্স ম্যানিয়াক বাঘ নাকি?'

'তার চাইতেও জঘন্য—মানুষ।'

'সে কে?'

'স্বচক্ষে দেখে যান।'

নাচঘরে এখন সাদা পাথরের গোল টেবিলে মুখোমুখি বসে বিলকুল আর ধনগোপাল, ইকবাল আর ইন্দ্রনাথ।

শেষের দুই ব্যক্তির সামনে দুটি রিভলভার, বিলকুলের সামনে নামী ব্র্যান্ডের সেলোটেপ আঁটা এক প্যাকেট সিগারেট, ধনগোপালের সামনে রুপোর নস্যির ডিবে।

ইন্দ্রনাথ বললে, 'গল্পটা ছোট করে আনছি। এ বাড়িতে অভিশাপ লেগেছে। বৈকুণ্ঠ বরাটের শেষ বংশধর ধনগোপাল বরাট মরলেই বংশ ধ্বংস হবে। ওঁর স্ত্রী মারা গেছেন সেক্স ম্যানিয়াকের হাতে। ওঁর পুত্রবধূ মারা গেলেন—'

'বাঘের নখে,' বললেন ধনগোপাল।

'না।' মসৃণ গলায় বলে গেল ইন্দ্রনাথ, 'একই সেক্স ম্যানিয়াকের হাতে।'

'পাগলের হাতেও অমন নখ থাকে না।'

'বানিয়ে নেওয়া যায়।'

'ম্যাজিকের মন্ত্র পড়ে?'

'এইভাবে,' পকেট থেকে রুমালের পুঁটলি বের করে টেবিলে বিছিয়ে দিল ইন্দ্রনাথ। পাঁচটা ইঞ্চি দেড়েক লম্বা নরুণ। গায়ে সেলোটেপ জড়ানো।

ইন্দ্র বললে, 'পাঁচ আঙুলে সেলোটেপ দিয়ে বাঁধা হয়েছিল পাঁচটা খুদে নরুণ। শিবাজির বাঘনখ থেকে আইডিয়াটা ধার করেছিল হত্যাকারী—মেয়েদের নরম শরীর ফালাফালা করে উৎকট আনন্দ পাওয়ার জন্যে।'

'বুঝলাম,' শেয়াল-চোখে ধূর্ততার ঝিলিক ঝলসিয়ে বললেন ধনগোপাল, 'মালগুলো পেলেন কোথায়?'

'আপনার পুত্রবধূ যে ঘরে খুন হয়েছে, সেই ঘরের সামনের বারান্দার নীচের জঙ্গলে। খুন করেই সে একটানে নরুণ পাঁচটা খুলে নিয়ে জঙ্গলে ফেলে দিয়েছিল—যেখানে কেউ খুঁজতে যাবে না—জানা না থাকলে চোখে পড়লেও মাথা ঘামাবে না। কিন্তু আমি জানতাম—তাই খুঁজছিলাম।'

'নরুণ বাহিনী।' মৃদু স্বরে বললেন ইকবাল হোসেন।

'হ্যাঁ,' বললে ইন্দ্রনাথ, 'আপনার মুখেই শুনেছি। পার্টির ছেলেরা নরুণ বাহিনী গড়েছে পুলিশি অ্যারেস্ট রোখবার জন্যে।—যাক সে কথা। এ নরুণ যে চালিয়েছে, সে চাবুকও হাঁকড়েছে বিদ্রোহিনীর বডিতে।'

'চাবুকটা পেয়েছেন?'

'ওই তো রয়েছে আলমারির মধ্যে...রক্ত লেগে রয়েছে...ফোরেনসিক সায়েন্স বলে দেবে, এ রক্ত বিদ্রোহিনীর।'

'কিন্তু সে রক্ত ঝরাল কে?' ইকবালের প্রশ্ন।

'সেক্স ম্যানিয়াক,' নরম গলায় বললে বিলকুল। বলে তাকাল ধনগোপালের দিকে।

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন ধনগোপাল—'শুয়ার কা...। গেট আউট। নেমকহারাম!'

'ধীরে-ধীরে, ধনগোপালবাবু,' ভেলভেট কোমল গলায় বলে গেল ইন্দ্রনাথ, 'আপনি সেক্স ম্যানিয়াক নি:সন্দেহে—চাবুকের ভয় দেখিয়ে বিধবা পুত্রবধূকে উপভোগ করেছেন—নিশ্চয় এই চাবুকের ভয়েই আপনার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী পালিয়েছিলেন—এবং হয়তো তাঁকে চাবুক মারবেন বলেই বিলকুল আচারিয়াকে পাঠিয়েছিলেন তাঁকে পাকড়াও করে আনার জন্যে—কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে গেল চোরে-চোরে মাসতুতো ভাইয়ের ব্যাপার—বিলকুল আচারিয়া—টেবিল থেকে হাত সরান—'

কিন্তু অনেক বেশি ক্ষিপ্র বিলকুল। মুখচোখের ভাব পালটাচ্ছিল একটু-একটু করে—ইন্দ্রনাথের শেষ কথাগুলো শেষ হওয়ার আগেই চোখের তারায় অমানবিক নৃশংসতা বিচ্ছুরিত হয়েছিল—এখন বুঝি বিদ্যুতের চাইতেও বেশি গতিবেগে দু-মুঠোয় তুলে নিল সিগারেটের প্যাকেট আর নস্যির ডিবে—চেয়ার

উলটে ফেলে দিয়ে পেছনে ছিটকে গিয়েই সিগারেট প্যাকেট ছুঁড়ে দিল ইন্দ্রনাথের দিকে—একই সঙ্গে নস্যির ডিবে নিক্ষিপ্ত হল ধনগোপালের দিকে।

হতচকিত ধনগোপাল চেয়ার ছেড়ে ওঠবার সময় পাননি—তাই নস্যির ডিবে ফাটল তাঁর মুখের ওপর—ভয়ানক বিস্ফোরণ—মুণ্ড উড়ে গেল ধড় থেকে।

সিগারেট প্যাকেটও ফাটল ইন্দ্রনাথের সামনে টেবিলের পাথরে। বিস্ফোরণের পর দেখা গেল, সাদা মর্মর প্রায় সাদা পাউডার হয়ে ঘরময় উড়ছে।

বিলকুল তখন বাইরে। ছুটছে। বারান্দা দিয়ে। দশহাত পেছনে ইন্দ্রনাথ আর ইকবাল। দুজনের হাতেই রিভলভার। গজরাল আগ্নেয়াস্ত্র—একইসঙ্গে—ছিটকে পড়ে মসৃণ পাথরের মেঝে দিয়ে পিছলে গেল বিলকুল। তার দুটো মালাইচাকি গুঁড়িয়ে গেছে।

কবিতা বললে, 'বিলকুলকে কেন সন্দেহ করলে?'

'ওর পদবী শুনে আর অয়েল পেন্টিং দেখে।'

'পদবী তো আচারিয়া।'

'ওরফে আচার্য। মাধবেন্দ্র আচার্যর শেষ বংশধর।'

'ও মা!...আর অয়েল পেন্টিং?'

'জীনতত্ব যেন তার প্রমাণ রেখে গেছে চোয়াল, চোখ, নাকে। একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যায়—বংশের ছাপ রয়েছে।'

'কিন্তু মাধবেন্দ্রর ছেলে ছিল তো জারজ—ধমনীতে ছিল ইংরেজের রক্ত—তাঁর বংশধরের চোয়াল, চোখ, নাক মাধবেন্দ্রর মতন হবে কেন?'

'প্লাস্টিক সার্জারির দৌলতে। প্রতিহিংসাপাগল বিলকুলের মাথা থেকেই বেরিয়েছিল আইডিয়া। প্রথমে এসেছিল কটেজের গেস্ট হয়ে—মাধবেন্দ্রর ফটো নেয় অয়েল পেন্টিং থেকে। যায় প্লাস্টিক সার্জনের কাছে—'ফাঁসিতে লটকানো পূর্বপুরুষের আদল অর্জনের পরেই মাথাটা বিগড়োয় একেবারে। চাকরি নেয় ধনগোপালের কাছে—তাকে নির্বংশ করবে বলে। করেওছে। সেইসঙ্গে মিটিয়ে নিয়েছে যৌনক্ষুধা। মৌমিতাকেও বাদ দেয়নি।'

'কিন্তু ইকবাল হোসেনকে ডেকে আনলে কেন?'

'কী মুশকিল! বড্ড লেটে বোঝ বউদি। 'নীল কপোত' হোটেলে স্টাফ তো দেখেছিল নটগোপাল সহায়-কে। তাদের বর্ণনা থেকে স্কেচ আঁকিয়ে খুনির মুখের চেহারা দাঁড় করিয়েছিলেন দক্ষ অফিসার ইকবাল হোসেন। কিন্তু সে ছবি কাগজে ছাড়েননি খুনি হুঁশিয়ার হয়ে যাবে বলে। তবে থানায়-থানায় ফটো চলে গেছিল। আমি হাতিয়েছিলাম কৌতূহলকে বাগে রাখতে। নিয়ে গেছিলাম লাটনগরে। বিলকুলকে প্রথম দেখেই চিনেছিলাম—তারও হাইট ছ'ফুট।'

'সিগারেট প্যাকেট আর নস্যির ডিবে অমনভাবে ফাটল কেন?'

'খুব সম্ভব আর ডি এক্স ছিল ভেতরে। এখনকার ছেলেরা যে বোমা ছোঁড়ে—তা পাট দিয়ে বাঁধা নয়—অবিকল সিগারেট প্যাকেট—আনকোরা নতুন, নয়তো ম্যাচবক্স। নস্যির কৌটোয় বোমা বানিয়ে এনেছিল বিলকুল, অতীতের খুনের দৃশ্যটাকে আরও নারকীয়ভাবে দেখানোর জন্যে। ফাঁসির দড়িতে ঘাড় ভেঙেছিল মাধবেন্দ্র আচার্যর—বিলকুল আচার্যর বোমাবাজিতে উড়ে যেত বৈকুণ্ঠ বরাটের শেষ বংশধরের গোটা মুণ্ডটাই।—হলও তাই।'

'বিলকুল বলেছে বুঝি?'

'স-ব। আরও বলেছে, এখন ওর মাথা ঠিক হয়ে গেছে—ছেড়ে দিলে আর মেয়ে খুন করবে না।'

'পাগল' শিউরে উঠে বললে কবিতা।

** 'সানন্দা' পত্রিকায় প্রকাশিত। (ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৫)।*

সোনার খড়ম

'কে, মৃগাঙ্ক রায়?'

'মিহির কাঞ্জিলালের কণ্ঠস্বর মনে হচ্ছে।'

'অধমের নাম তাই বটে। রায়মশায়ের হাত কি খালি?'

'নতুন লেখার জন্যে? হবে না—হাতে ব্যথা।'

'যাচ্চলে। কথাটা শুনবেন তো।'

'শুনছি। শুনছি। শুনছি।'

'খেপে আছেন কেন?' না, না, গল্প-টল্প চাই না। তবে গল্পের মশলা জুটিয়ে দিতে পারি।'

এবার কিঞ্চিৎ আগ্রহ প্রকাশ করতে হল। গোয়েন্দা গল্প লেখা ইদানীং কষ্টকর হয়ে পড়েছে ভালো উপাদানের অভাবে। এখানকার খুনেরা পুলিশদের চেয়ে বেশি ধুরন্ধর তো বটেই, অস্ত্র সম্ভারেও পুলিশদের টেক্কা মেরেছে। এখন তাদেরই হাতিয়ারের প্রদর্শনী দেখতে এবং তা থেকে জ্ঞান অর্জন করতে দৌড়চ্ছে পুলিশের লোক।

সুতরাং পুলিশ মহল থেকে উত্তম মালমশলা পাওয়া দুষ্কর। বন্ধুবর ইন্দ্রনাথ রুদ্রও চ্যালেঞ্জিং কেস ছাড়া মাথা ঘামাতে চাইছে না। ও বলে, অবলা অবোধ নারীই এখন বধ্যভূমিতে অবতীর্ণ হয়ে মানুষ বধ করে চলেছে অবলীলাক্রমে, অতএব আমি আর নেই।

আরে, নেই বললে আমার কি আর চলে। দুটো পাতা লিখলে তবে দুটো পয়সা পাওয়া যায়। পয়সার অবশ্য আমার তেমন দরকার নেই—কিন্তু কাজের দরকার তো আছে। কাঁহাতক বসে-বসে আর গিন্নির সঙ্গে কোঁদল করে দিন কাটানো যায়। বিশেষ করে যে গিন্নি গোয়েন্দা গল্পের নম্বর ওয়ান পোকা এবং আমার কলম দিয়ে আর গোয়েন্দা গল্প বেরুচ্ছে না বলে উদয়াস্ত টিটকিরি দিয়ে চলেছে।

মিহির কাঞ্জিলালের সুমিষ্ট বচন শুনে তাই অন্তরে পুলক অনুভব করলাম।

মিহির আমাদের পুরোনো দোস্ত। একটু-আধটু পলিটিক্স করে বটে, তবে লোক ভালো। সব পলিটিসিয়ান তো হৃদয়হীন নয়। নীতিবোধ, মূল্যবোধ আছে অনেকেরই। এই রকমই এক ব্যক্তির সান্নিধ্যে থেকে এবং ইন্ডিয়া জোড়া এহেন কু-রাজনীতির তুফানের মধ্যে থেকেও গা-বাঁচিয়ে চলছে মিহির; সেইসঙ্গে চুটিয়ে সম্পাদনা চালিয়ে যাচ্ছে একটা কাগজের। সাহিত্যও ভালোবাসে। তাই আমরাও ওকে ভালোবাসি এবং সুযোগ পেলেই মুখ নাড়া দিই।

সেই কাঞ্জিলাল ফোন করেছে গল্পের মশলা দেবে বলে।

অতএব নড়ে বসতে হল।

বললাম, 'বৎস কাঞ্জিলাল—'

'বৎস! বয়সে তো মোটে তিন বছরের ছোট—'

'এই ক্ষেত্রে আপনাকে গো—বৎস বলতে চাইছি। অর্থাৎ বাছুর। ঢুঁ মারা হয়েছে কোথায়?'

'টেলিফোনের আওয়াজ শুনে ধরতে পারছেন না?'

'টেলিফোনের আওয়াজে কি টেলিফোন-ভুসির ঠিকানা থাকে?'

'খুব স্পষ্ট শুনছেন বলে মনে হচ্ছে?'

'স্পষ্টই তো।'

'ফোন করছি কিন্তু অনেক দূর থেকে।'

'কতদূর থেকে?'

'ব্যাঙ্গালোর থেকে।'

থমকে গেলাম। তারপর, 'কী হয়েছে সেখানে?'

'খুন।'

'পুলিশ নেই ব্যাঙ্গালোরে?'

'আছে। কিন্তু গোয়েন্দা নেই।'

'আমি গোয়েন্দা নই।'

'আপনার বন্ধু তো বটে।'

'ইন্দ্রনাথ? ছ্যাঁচড়ামি ও ছেড়ে দিয়েছে।'

'বাট দিস ইজ নট ছ্যাঁচড়ামি। একটা মানুষ খুন হয়েছে—নিরপরাধ আর একটা মানুষকে নিয়ে পুলিশ টানাহ্যাঁচড়া করছে—'

'মাইশোরের পুলিশ ওইরকমই করে। চন্দন কাঠ ডাকাতদের নিয়ে কী কাণ্ডটা চলছে দেখছেন তো—'

'ব্যাপারটা চন্দনকাঠ ঘটিতও হতে পারে। মৃগাঙ্কবাবু, কেস ইজ ইন্টারেস্টিং। এর মধ্যে রয়েছে একটি মেয়ে। বেজায় ধনবতী। পৃথিবীর একশো জন বড়লোকের মধ্যে না হলেও দুশো জনের মধ্যে পড়ে। ইন্দ্রনাথ রুদ্রর সাহায্য চাইছে সে।'

'ইন্দ্রনাথকে চেনে মাইশোরের মেয়ে?'

'বাঙালি যে। আপনার গল্পের ফ্যান। খুনি সাব্যস্ত করা হয়েছে তার ভাবী বরকে।'

'মাই গড! তাহলে তো ইন্দ্রনাথকে খোশামোদ করতেই হয়।'

'করুন। কখন ফোন করব?'

'আধ ঘণ্টা পরে।'

পরের দিন সকাল ছ'টা কুড়ির ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স-এর বিমানে চেপে ব্যাঙ্গালোরের মাটি ছুঁলাম কাঁটায়-কাঁটায় আটটা পঁয়তাল্লিশে।

ভীষণ উদ্বিগ্ন মুখে অভ্যর্থনা জানাল মিহির কাঞ্জিলাল। যেহেতু ব্যাঙ্গালোর জায়গাটা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে আড়াই হাজার ফুট উঁচুতে এবং ধারে কাছে কোথাও সমুদ্র নেই—তাই বেশ নাতিশীতোষ্ণ আর ঘাম-টাম হয় না বললেই চলে। মওকা বুঝে সুট পরার রেওয়াজ ওখানে বেশি। দিশি সাহেব প্রায় প্রত্যেকেই।

মিহির কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে চিরকালের খদ্দরের খয়েরি পাঞ্জাবি আর ধুতি পরে। চুল যেমন থাকে বরাবর—অর্থাৎ উস্কখুস্ক। বয়সের অনুপাতে পেকেছে বেশি। দাড়ি-গোঁফও কামায়নি—বুঝলাম, ঘুম ভেঙেছে এখুনি।

সদা উদ্বিগ্ন থাকা ওর একটা স্বভাব। দুনিয়ার টেনশন যেন মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কবিতাকে দেখেই কিন্তু এহেন টেনশনও মিলিয়ে গেল মুহূর্তে।

বললে সোল্লাসে এবং সহাস্যে, 'আরে পুঁটলি বউদিও যে।'

আমার গিন্নি কবিতা যদিও পুঁটলির ধারকাছ দিয়েও যায় না। বম্বের মেয়ে হয়েও খাঁটি বাঙালি—কিন্তু পুঁটলি নয়।

চোখ পাকিয়ে সে বললে, 'ফের!'

আধ হাত জিভখানা সড়াৎ করে বেরিয়ে এল মিহিরের মুখবিবর থেকে, 'সরি বৌদি! কিন্তু দাদার কোঁচা ধরে সব সময়ে ঘোরেন তো—'

'উলটো। আপনার দাদাই আমার আঁচল ধরে ঘোরে।'

পেছন থেকে গম্ভীর গলায় ইন্দ্রনাথ বললে, 'রহস্যালাপ পরে হবে। আগে যাওয়া যাক পারমিতার কাছে।'

আমরা এখন বসে রয়েছি পারমিতা হাজরার বৈঠকখানায়। ঘরের বর্ণনা আর দেব না—তবে বাড়িটার বর্ণনা এক ঝলকে জানিয়ে দিই। বাকিংহাম প্যালেসে নাকি ৬৬২টা ঘর আছে। ব্যাঙ্গালোরের বাইরের দিকে—ম্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে—জঙ্গল ঘেঁষা এই প্রকাণ্ড প্রাসাদেও মনে হল ঘরের সংখ্যা ওইরকমই হবে। কত পয়সা থাকলে এই আক্রাগণ্ডার যুগে এতবড় বাড়ি একটা মানুষ বানাতে পারে—তা ভাবতে গিয়ে মাথা ঘুরে গেছিল। এই মুহূর্তে এই পৃথিবীর সবচেয়ে ধনীব্যক্তি এখন ব্রুনেই-য়ের সুলতান। ৩,৭০০ কোটি মার্কিন ডলারের মালিক। পারমিতা হাজরার বাবা কত টাকার মালিক, তা এই দেশের ইনকাম ট্যাক্স অফিসাররাও আঁচ করতে পারে না—ঘাঁটাতে যায় না। যার টাকা আছে, তার ক্ষমতাও আছে—তাকে দূর থেকে পেন্নাম ঠোকাই ভালো। তবে স্ক্যাম-এর চার-পাঁচ হাজার কোটি টাকা উনি নাকি ইচ্ছে করলেই মিটিয়ে দিতে পারেন—এমন একটা আভাসও দিয়েছিলেন বন্ধু মহলে।

এমন ব্যক্তির একমাত্র মেয়ে এই পারমিতা। অপ্সরা তো কোনওদিন দেখিনি, পারমিতাকে দেখে আশ মিটিয়ে নিচ্ছিলাম। এত টাকার মালিক বলে মনেই হয় না। কবিতার সঙ্গে জমে গেল চক্ষের নিমেষে।

ইন্দ্রনাথ এখন নস্যি আর পাইপ দুটোই চালাচ্ছে। এই মুহূর্তে ও পাইপ টানছে আর পারমিতার কথা শুনছে। ওর বাবা বিশ্ববন্ধু এখন ইন্ডিয়ায় নেই।

ভদ্রলোকের চন্দন কাঠ আর হাজারো ব্যাবসা নিয়ে মাথা ব্যথা ছিল না পারমিতার। শিক্ষা-দীক্ষা সবই তো আমেরিকায়। হার্ভার্ড-এর পড়াশুনা শেষ করে ঢোকে মাইক্রোসফট কর্পোরেশনে, যেখানে কাজ করতে-করতে কম্পিউটরের এমন একটা প্রোগ্রামিং আবিষ্কার করে, যা কম্পিউটরের যে কোনও ভাইরাসের যম। ফলে, পৃথিবীর কোটি-কোটি পারসোনাল কমপিউটার-ওয়ালারা ওর এই প্রোগ্রাম কিনছে। বেলজিয়ামের নতুন-নতুন তুখোড় ভাইরাসও কাছে ঘেঁষতে পারছে না।

ব্যাঙ্গালোরেই কিন্তু হেডকোয়ার্টার বানিয়েছে পারমিতা। ইন্ডিয়ার ইলেকট্রনিক সিটি তো এখন ব্যাঙ্গালোর। আগে যার নাম ছিল 'গার্ডেন সিটি অফ ইন্ডিয়া'। পৃথিবীজোড়া কোম্পানির কয়েকশ ব্রাঞ্চে পাঠিয়ে দিচ্ছে নতুন প্রোগ্রামিং—সফটওয়্যার রপ্তানি করে দেদার টাকা এনে দিচ্ছে ভারত সরকারকেও।

কাজেই ওর সময় অঢেল। বাপের আর নিজের টাকা আগামী পঞ্চাশ জন্মেও উড়িয়ে পুড়িয়ে শেষ করতে পারবে না বলে ফাঁক পেলেই বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আড্ডায় জমে যায়।

ওর প্রিয়তম আড্ডা হল বনে-বাদাড়ে। শিকার করা মোটামুটি নিষেধ। কিন্তু জঙ্গলে জন্তু থাকলেই বন্দুকধারীদের হাত নিশপিশ করবেই। কখনও হাঁস, কখনও হায়না—এইসব নিয়েই মেতে থাকে। ম্যাঙ্গালোরের দিকে যেতে মার্কারা-র গভীর জঙ্গলে একটা ক্লাব-হাউসও বানিয়ে রেখেছে। জায়গাটা জেনারেল কারিয়াপ্পার বাড়ির কাছেই। সব সময়েই সেখানে মেঘ আর কুয়াশা পাহাড় ঘিরে থাকে। এখানকারই একটা পাহাড়ে বসে ইন্ডিয়ার সেরা সূর্যাস্ত দেখা যায়। বিধান রায়ও দেখে গেছিলেন। সেরা সূর্যোদয় দেখার জায়গাটা টাইগার হিলে সবাই তা জানেন।

এই ক্লাব-হাউসে তিন দিন আগে চার বন্ধুকে নিয়ে সময় কাটাতে গেছিল পারমিতা। ব্যাঙ্গালোরের মালেশ্বরমে বাঙালিদের মস্ত ঘাঁটি আছে। চার বন্ধুই থাকে সেখানে। চারজনেই বাঙালি। চার জনেই জোয়ান পুরুষ।

হ্যাঁ, পুরুষ। নারী বন্ধু একদম পছন্দ করে না পারমিতা।

এই চারজনের একজনের নাম ওথেলো। ওথেলো বোনার্জি। বিলেতে থাকবার সময়ে ব্যানার্জিকে বোনার্জি বানিয়েছে।

ওথেলোকেই বিয়ে করবে পারমিতা এইটাই ঠিক হয়ে রয়েছে, মানে কানাঘুষো সেই রকমই যখন চলছে ঠিক সেই সময়ে ওথেলোকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল রামকুমারকে গুলি করে খুন করার অভিযোগে।

রামকুমার সান্যালও পারমিতার প্রণয় প্রার্থী। যে চারজনকে নিয়ে জঙ্গলের হাওয়া খেতে গেছিল পারমিতা সেই চারজনই ওকে ভালোবাসে। কিন্তু চারজনেই জানে পারমিতা মালা দেবে কার গলায় আর কে হবে

পৃথিবীর অন্যতম ঈর্ষণীয় বড়লোক।

এহেন পরিস্থিতিতে জঙ্গলের মধ্যেই গুলিবিদ্ধ হল রামকুমার। ওথেলো ছিল চন্দন লেক-এর উত্তর-পুব কোণে। বিশ গজ ডাইনে রামকুমার। রামকুমারের বিশ গজ ডাইনের জায়গাটা খালি ছিল পারমিতার জন্যে। কিন্তু পারমিতা যায়নি—শরীরটা হঠাৎ খারাপ হয়ে পড়ায়—বলেছিল, একটু দেরি করে যাবে। এই ফাঁকা জায়গাটার আরও বিশ গজ ডাইনে ছিল তপনমোহন শিকদার, তারও বিশ গজ ডাইনে চন্দন লেকের একদম দক্ষিণ-পুব কোণে—বীরেশ্বর ভৌমিক।

অর্থাৎ চন্দন লেকের গোটা পুব পাড়ে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছিল চারজনে।

এই পাড়ের ঘাসবন প্রায় বারো ফুট উঁচু। কেউ কাউকে দেখতে পায় না। ছোট-খাট জন্তুরা ঘাসে গা লুকিয়ে আসে জল খেতে। তার মধ্যে বড় জন্তু থাকলেও রক্ষে নেই। কারও কিছু বলবার নেই। কেননা, এ তল্লাটের বনজঙ্গল পাহাড় সবই তো পারমিতার বাবার। প্রাইভেট এরিয়া।

সন্ধে সাতটার মধ্যেও পারমিতা যেতে পারেনি শরীরটা বড় ম্যাজম্যাজ করছিল বলে। কিন্তু ফায়ারিং আওয়াজ শুনেছে ক্লাবহাউসে বসেই। সাতটার মধ্যেই সবার ফেরার কথা। সাড়ে সাতটা নাগাদ ফিরে এল তপন, বীরেশ্বর, ওথেলো।

ফিরল না শুধু রামকুমার।

মেয়েদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় একটু বেশি মাত্রায় সজাগ থাকে। তাই খচ করে উঠেছিল পারমিতার বুক।

তপন, বীরেশ্বর, ওথেলো—এই তিনজনেও অবাক হয়েছিল রামকুমারের না ফেরায়। ওরা ভেবেছিল, আগেভাগে পারমিতার কাছে রামকুমার ফিরে এসেছে—নিরিবিলিতে পারমিতাকে কাছে পাওয়ার জন্যে।

ছ'টা পর্যন্ত রামকুমারের বন্দুকের আওয়াজ শুনেছে ওথেলো। ও ছিল বাঁ-দিকে। বিশ গজ দূর থেকেই দেখেছে বারো ফুট লম্বা ঘাসের মাথায় ধপাধপ পড়ছে মরা হাঁস—প্রায় তিরিশ চল্লিশ ফুট ওপরকার উড়ন্ত হাঁস যে ওর গুলি এড়িয়ে যেতে পারছে না—তা তো দেখা যাচ্ছিল।

ছ'টার পর থেকেই হাঁসেরা উড়ে গেছে রামকুমারের মাথার ওপর দিয়ে। বন্দুকের আওয়াজও তাই শোনা যায়নি। তাই সাতটা বাজতেই চন্দন লেকের উত্তর পাড় ধরে ক্লাবহাউসে ফিরে এসেছে ওথেলো।

দক্ষিণ পাড় বেয়ে ফিরেছে তপন আর বীরেশ্বর।

এসে দেখল ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে আছে পারমিতা। কাছে দাঁড়িয়ে সত্যনারায়ণ। আগে ছিল আর্মিতে। এখন এই ক্লাবহাউসের কেয়ারটেকার।

রামকুমারের খোঁজে বেরিয়ে গেছিল এই সত্যনারায়ণ।

ডেডবডি সে-ই দেখেছে। বারোফুট উঁচু ঘাসের মধ্যে একটুখানি ফাঁকা জায়গা। রামকুমার মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে সেখানে। গুলি তার পিঠে ঢুকে বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে।

বডি ঘাড়ে করে ফিরে এসেছে সত্যনারায়ণ। পুলিশ এসেছে। তারা পিঠ-বুকের ফুটোর মাপ নিয়েছে। যে মাপের গুলি পিঠ দিয়ে ঢুকে বুক দিয়ে বেরিয়ে গেছে, সেই মাপের গুলিই ওথেলো ছুঁড়েছে মাত্র বিশ গজ দূরে।

ও-মাপের গুলি আর বন্দুক নেই অন্য দুজনের কাছে।

ওথেলোই যে খুনি—তার পয়লা নম্বর প্রমাণ এটা।

নম্বর দুই প্রমাণ : পায়ের ছাপ।

চার বন্ধুই বন্দুক ঘাড়ে করে চন্দন লেকের দক্ষিণ পাড়ে গেছে যে-যার জায়গায়। জায়গা আগে থেকেই ঠিক করে রেখে দিয়েছিল সত্যনারায়ণ। কাদার ওপর রয়েছে চারজনের পায়ের ছাপ—ফিরেছে দুজন—সেই ছাপ। ওথেলোর পায়ের ছাপ লেকের পুব পাড় বেয়ে সটান চলে গেছে উত্তর-পুব কোণ পর্যন্ত নিজের জায়গায়। সেইখান থেকেই একসারি পায়ের ছাপ ফিরে এসেছে উত্তর পাড় বেয়ে—যখন ফিরেছে, তখনকার ছাপ।

এ ছাড়াও রয়েছে আরও দু-সারি পায়ের ছাপ—মানে, জঙ্গল-বুটের ছাপ। ওথেলো নেমে এসেছে নিজের জায়গা ছেড়ে। কাদা মাড়িয়ে ফিরে গেছে রামকুমার যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল—তার পেছনে লেকের পাড়ে। আবার ফিরে এসেছে নিজের জায়গায়।

যেন, কথা-বলা পায়ের ছাপ। যা বলতে চাইছে। তাই এই : ওথেলো এখান দিয়ে গিয়ে রামকুমারকে পেছন থেকে গুলি করে মেরে ফিরে গেছে নিজের জায়গায়।

তেসরা প্রমাণ জুগিয়েছে তপন আর বীরেশ্বর।

দক্ষিণ পাড় বেয়ে শিকার-অভিযানে যাওয়ার আগে তুমুল ঝগড়া চলছিল রামকুমার আর ওথেলোর মধ্যে। ওরা দুজনে এগিয়ে গেছিল—অনেক পেছনে যাচ্ছিল তপন আর বীরেশ্বর! দু-চারটে কথা কানেও এসেছে।

ঝগড়াটা পারমিতাকে নিয়ে।

রামকুমার টিটকিরি দিচ্ছিল ওথেলো-কে। 'কীরে! শেষকালে টাকার লোভে গলায় মালা পরতে যাচ্ছিস?' রেগে আগুন হয়ে গেছিল ওথেলো।

তারপরেই রামকুমার খতম।

এবং ওথেলো গ্রেপ্তার।

পাইপ নামিয়ে বললে ইন্দ্রনাথ, 'পারমিতা, আপনার কী মনে হয়? ওথেলো খুন করেছে রামকুমারকে?'

পারমিতা ইন্দ্রনাথের চোখে-চোখে চেয়ে বললে, 'না। ওকে দেখলে বুঝবেন।—দেখবেন?'

চার চোখ এক হয়ে রইল কিছুক্ষণ।

আস্তে বললে ইন্দ্রনাথ—'তাকে এখানে আনা হয়েছে?'

'আপনি আসছেন বলে। পুলিশ আমার কথা শোনে।'

'আনান এখানে।'

'গায়ত্রী,' একটু গলা চড়িয়ে ডাকল পারমিতা।

ঘরে ঢুকল মাঝ বয়সি একটি স্ত্রীলোক। মাইশোরের মেয়ে অবশ্যই। শাড়ি পরা দেখেই মালুম হয়। খুব ফরসা। চোখমুখ একটু চোয়াড়ে। ঠোঁট ফুলে রয়েছে। একহাতে চাপা দিয়ে রয়েছে।

কানাড়া ভাষায় হুকুম দিল পারমিতা। বেরিয়ে গেল গায়ত্রী।

কবিতা বলে ওঠে, 'ওর ঠোঁটে কী হয়েছে?'

'দাঁত ভেঙেছে—মুখ থুবড়ে পড়ে গেছিল। এদিকে এই অবস্থা—ওদিকে ওর মুখ রক্তারক্তি।'

'এখানেই থাকে?'

'ক্লাবহাউসে থাকে। সত্যনারায়ণের স্ত্রী। একটাই ছেলে ছিল। বকাটে। মারা গেছে। দুজনেই সব দেখে। আজকে আনিয়েছি দুজনকেই।'

গায়ত্রীর পেছন-পেছন ঘরে ঢুকল তিনজন পুরুষ।

প্রথমজনের দাড়িওয়ালা রাগী চেহারা দেখেই মনে হল নিশ্চয় ওথেলো। লম্বায় ইন্দ্রনাথের সমান যায়, দেখতেও প্রায় সেইরকম—দাড়িটা বাড়তি। চোখের চেহারা প্রায় একইরকম। বড়-বড়। ঝকঝকে। মনের ভাষা লুকোতে পারে না। এই মুহূর্তে সেই চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরোচ্ছে।

পারমিতা বললে, 'ওথেলো, তুমি আমার পাশে বসো। তুমি যে নিরপরাধ, তা প্রমাণ করতে এসে গেছেন ইন্দ্রনাথ রুদ্র। ওঁর এপাশে মৃগাঙ্ক রায়, ওপাশে কবিতা বউদি। এঁকে তো চেনই, মিহির কাঞ্জিলাল—এবারের শিকার অভিযান নিয়ে আর্টিকেল লিখতে এসেছিলেন। —ইন্দ্রনাথবাবু, কী দেখছেন?'

ইন্দ্রনাথ চেয়েছিল ওথেলোর পেছনের দুই পুরুষমূর্তির দিকে। একজনকে তো চেনাই যাচ্ছে—পুলিশ অফিসার নি:সন্দেহে—পাহারা দিয়ে নিয়ে এসেছে ওথেলোকে। আর একজন? আবলুস কাঠের মতোন তার গায়ের রং। কালো পাথর কুঁদে তৈরি মূর্তি। চোখ দুটো শক্ত আর লালাভ।

সত্যনারায়ণ—পরিচয় করিয়ে দিল পারমিতা। এক্স আর্মি ম্যান। কথাবার্তাও সেইরকম—উগ্রক্ষত্রিয় টাইপের।

ইন্দ্রনাথ প্রথমে কথা বলল এর সঙ্গেই—অবশ্য ইংরেজিতে। তারপর কথা হল পুলিশ অফিসারের সঙ্গে। ইতিমধ্যে কফি রেখে গেল গায়ত্রী। কফি শেষ করেই ইন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'চলুন, সন্দেহজনক পায়ের ছাপের সারি দুটো আগে দেখে আসি। সত্যনারায়ণ, আপনি দেখবেন চলুন। আপনারা বসুন। মিহিরবাবু, আসবেন? আসুন। মৃগ, তুমিও এসো।'

ঘণ্টাতিনেক লাগল গাড়িতে করে যেতে। মিহির আগে থেকেই ব্যবস্থা করে রেখেছিল—যাতে বেলাবেলি অকুস্থল দেখা যায়।

চন্দন লেক বাস্তবিকই বড় মনোরম জায়গা। গাড়ি ছাড়া আসা যায় না। চারদিকে শুধু পাহাড় আর উঁচু গাছ, কুয়াশা আর মেঘ। বড় স্যাঁতসেঁতে।

এরই মাঝে চন্দন লেক যেন পটে আঁকা ছবি। ক্লাবহাউসে দাঁড়িয়ে অবশ্য লেক দেখা যায় না। চারদিকে গাছ আর গাছ। উঁচু পাঁচিল। বড় নিভৃত, নিরিবিলি জায়গা।

গাছপালার মধ্যে দিয়ে পথ বেয়ে পৌঁছলাম লেকের পাড়ে।

বিশাল লেক। ওপাড় দেখা যায় না। বহু পাখি উড়ছে। হাঁস ভাসছে জলে।

এপাড়ে ঘাটে বাঁধা একটা নৌকো। দাঁড় তোলা রয়েছে ভেতরে।

আমরা দক্ষিণ পাড় বেয়ে পায়ের ছাপ দেখতে-দেখতে গেলাম। পুব পাড়ে পৌঁছে পদচিহ্ন অনুসরণ করলাম। চারজনের থেকে হল তিনজনের—বীরেশ্বর উঠে গেল নিজের জায়গায়। তারপর হল দুজন—তপন গেল। তারপর একজনের—রামকুমার গেল ওপরে। একা ওথেলো এগিয়ে গেছে—বিশেষ বল্টু মারা জঙ্গল-বুট পরে।

শুকতলায় বড়-বড় দাগ।

সত্যনারায়ণ বললে, 'চারজনেই এখানে এসে জুতো পালটে নেন। ক্লাব হাউসেই সব থাকে। বন্দুক, টোটা—সব।'

বোবা হয়ে গেছে ইন্দ্রনাথ। মিহির মোহিত হয়েছে নিসর্গ দৃশ্য দেখে। জাপানি ক্যামেরা বের করে ক্লিক-ক্লিক করে ফটো তুলে যাচ্ছে।

হেঁট হয়ে অনেকক্ষণ ওথেলোর পায়ের ছাপের দিকে চেয়ে রইল ইন্দ্রনাথ।

সিধে হল। চোখ কুঁচকে চেয়ে রইল লেকের দিকে। কুয়াশা বুঝি এখনও সরেনি। নিস্তরঙ্গ জল। হাঁস সাঁতরাচ্ছে বলেই একটু যা ঢেউ উঠছে।

ডাকল মিহিরকে। বললে, 'ছাপগুলোর ক্লোজ আপ ফটো তুলে দেবেন?'

'নিশ্চয়,' ক্যামেরা নামাল মিহির।

ইন্দ্র বললে, 'ওথেলোর তিনসারি বুটের ছাপ একই প্রিন্টে যাতে আসে, সেইভাবে তুলবেন।'

'ও-কে, ও-কে।'

নিস্তব্ধ সরোবরের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে পাখির ঝাঁক। কোথাও কোনও আওয়াজ নেই। মাঝে-মাঝে ক্যামেরার ক্লিকিং।

ইন্দ্র বললে, 'সত্যনারায়ণ সাহেব।'

'ইয়েস স্যার।' মিলিটারি কায়দায় অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে গেল আবলুস মূর্তি। আর্মির জাতই আলাদা।

'ওথেলো গুলি ছুঁড়েছিলেন রামকুমারের পেছনে গিয়ে?'

'ইয়েস স্যার।—ওই তো ওইখান থেকে।'

প্রায় বিশগজ দূরে লেকের পাড়ে একটা জায়গার দিকে আঙুল তুলে দেখাল সত্যনারায়ণ।

ইন্দ্র বললে, 'মিহিরবাবু, আপনার এদিকের ফটো তোলা হয়ে গেলে আসবেন।'

'যাই।'

আমরা তিনজনে এগোলাম। সত্যনারায়ণ আঙুল নামিয়ে দেখাল কাদার ওপর অনেকগুলো জঙ্গল-বুটের ছাপ। এলোমেলো। সব কটাই ওথেলোর বুটের ছাপ।

লম্বা ঘাসের মধ্যে দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম তিনজনে। নরম মাটিতে একটা গোলমতো জায়গা দেবে গেছে।

সত্যনারায়ণ বললে, 'এইখানে রামকুমার সাহেব হাঁটু পেতে বসে বন্দুক ছুঁড়ছিলেন।'

সেখানে দাঁড়িয়ে ঘাসের পাঁচিল ভেদ করে লেকের জল দেখা যাচ্ছে বটে। খুব অল্প।

ভুরু কুঁচকে জলের ধারে ফিরে এল ইন্দ্রনাথ। পেছনে আমরা। মিহির এসে গেছে। মন দিয়ে ফটো তুলছে জঙ্গল-বুটের দাগগুলোর। সামনেই একটা বড় লম্বা গুঁড়ি জলে পড়ে রয়েছে। অল্প গভীর জলে কাদায় গেঁথে রয়েছে। একটা প্রান্ত ঠেকে রয়েছে পাড়ে—আর,-একটা প্রান্ত প্রায় দশ হাত দূরে জলে।

ইন্দ্রনাথ এই গুঁড়ির ওপর দিয়ে ব্যালেন্স করে এগিয়ে গেল। ওদিকে পৌঁছে ঘুরে দাঁড়াল। চেয়ে রইল মিহিরের দিকে। তারপর ঘাসবনের দিকে।

তারপরেই মুখটা একটু বিকৃত হল।

যেন একটা কষ্ট চাপবার চেষ্টা করছে। খামচে ধরল পেটটা। গুঁড়ি বেয়ে টলতে-টলতে ফিরে এল পাড়ে। বললে, 'টয়লেট যাব।'

সত্যনারায়ণ বললে, 'চলুন।'

ইন্দ্র বললে, 'আপনি মিহিরকে হেল্প করুন। লেকের উত্তর পাড় আর দক্ষিণ পাড়—যেখানে-যেখানে ওথেলোর জঙ্গল-বুটের ছাপ—ফটো চাই। টয়লেটটা ক্লাব হাউসের কোন দিকে?'

'ডান দিকে।'

কষ্ট-বিকৃত মুখে আমাকে ডেকে নিয়ে প্রায় দৌড়েই ক্লাব হাউসে ফিরে এল ইন্দ্রনাথ। গাড়িটাকে ড্রাইভার গেটের মধ্যে এনে রেখেছে। পাঁচিল ঘুরে আমরা ভেতরে ঢুকে দেখলাম, গাড়ির মধ্যেই বসে রয়েছে সে।

ইন্দ্র গলা নামিয়ে বললে, 'মৃগ, তুমি শিস দিয়ে তোফা গান গাও শুনেছি।'

অবাক হলাম, 'হঠাৎ এ কথা?'

'ড্রাইভারকে নিয়ে লেকের পাড়ে যাও—নৌকোয় চড়বার অছিলায়।'

'তারপর?'

'নৌকোয় চড়বে। পাড়ের কাছেই ঘুরবে। সত্যনারায়ণকে ফিরে আসতে দেখলেই শিস দিয়ে গান গাইবে। খুব জোরে। যাতে আমি শুনতে পাই।'

'তথাস্তু।'

উত্তেজনায় 'চাহে কোই মুঝে জংলি কহে' সুরটা শিস দিয়ে বের করে ফেলেছিলাম—মিহিরকে পেছনে ফেলে সত্যনারায়ণ তখন হনহন করে ফিরছে। আমার শিস শুনেই থমকে দাঁড়াল। তারপরেই আরও জোরে পা চালিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল ক্লাবহাউসের দিকে—গাছপালার মধ্যে।

মিনিট কয়েক পরেই শুনলাম, বন্দুকের আওয়াজ। একবারই।

মিহির আগে দৌড়েছিল। পেছনে আমি আর ড্রাইভার। গেট পেরিয়েই বাঁ-দিকে কেয়ারটেকারের কটেজ—সামনে, চত্বরের ঠিক মাঝখানে, ক্লাবহাউস।

ইন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে আছে কটেজের সামনে। ধুতি আর পাঞ্জাবির লণ্ডভণ্ড অবস্থা দেখে বুঝলাম ভয়ানক ধস্তাধস্তি হয়ে গেছে এখুনি।

পারমিতা বললে, 'সত্যনারায়ণ! খুনি?'

কথাটার জবাব না দিয়ে পুলিশ অফিসারকে বললে ইন্দ্রনাথ, 'শুধু একটা 'কলারবোন' ভেঙে দিয়েছি। আর রদ্দা মেরে অজ্ঞান করে বেঁধে ফেলেছি—নইলে গুলি খেয়ে মরতাম।'

'ভালোই করেছেন।' মুখখানা উৎকট গম্ভীর করে বললেন নাগরাজন। পুলিশ অফিসার। খুব সিরিয়াস হওয়ার চেষ্টা করছেন। কারণ, ভেতরে কৌতূহলে ফেটে পড়েছেন, 'কিন্তু আঁচ করলেন কী করে?'

'ওথেলোর পায়ের ছাপ দেখে।'

ওথেলো এখন বসে পারমিতার পাশেই। চোখে সেই স্ফুলিঙ্গ আর নেই। শান্ত সরোবর বললেও চলে।

'কী ছিল পায়ের ছাপে?' নাগরাজনের প্রশ্ন।

'সামান্য তফাত। জঙ্গল-বুট পায়ে দিয়ে ওথেলো যখন হেঁটে গেছেন—তখন তাঁর শরীরের ভার সমান ভাবেই পড়েছে সব ছাপে। যে-ছাপের সারি নিয়ে আপনার সন্দেহ—বা, যা আপনার দোসরা প্রমাণ—'

'বলুন, বলুন—'

'ওথেলো নিজের জায়গা থেকে নাকি বেরিয়ে এসে, পাড় বেয়ে রামকুমারের পেছনে গিয়ে, গুলি ছুঁড়ে আবার ফিরে গেছে নিজের জায়গায়।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই দুই সারি বুটের ছাপ তাই বলে বটে।'

'না, বলে না।'

'কেন বলে না?'

'মিহির ফটো তুলেছে,' ক্যামেরা তুলে দেখাল মিহির কাঞ্জিলাল, 'আপনি বড় প্রিন্টে তফাতটা দেখতে পাবেন।'

'কী তফাৎ?'

'বুটের ছাপ কখনও সমান গভীর নয়। কখনও কম, কখনও বেশি। ওথেলো কি কখনও হালকা, কখনও ভারী হয়ে গেছিলেন?'

ওথেলো নির্বাক।

নাগরাজনের প্রশ্ন, 'ছাপটা নকল?'

'অবশ্যই। হাতে ধরে কেউ নকল ছাঁচ কাদায় চেপে-চেপে বসিয়ে গেছে।'

'অসম্ভব। তারও পায়ের ছাপ থাকত কাদায়। নিশ্চয় শূন্যে উড়ে আসেনি।'

'না। জলে এসেছে।'

চেয়ে রইলেন নাগরাজন। পাতলা ঠোঁট শক্ত করে চেপে রয়েছেন।

ইন্দ্রনাথ বললে, 'নৌকোয় করে সে এসেছিল। নৌকো থেকে নীচু হয়ে কাদায় ছাপ আঁকতে-আঁকতে গেছে।

'গুলিও ছুঁড়েছে নৌকো থেকে? পেছন-ঝাঁকুনিতে টিপ ঠিক থাকে?'

জবাব দিল না ইন্দ্রনাথ।

বললে, 'পেটের অসুখের অছিলায় চলে গেলাম সত্যনারায়ণের কটেজে। গাড়ি থেকে নেমেই সে আগে কটেজে ঢুকেছিল—দরজা ভেজানো ছিল। ভেতরে গেলাম। একটু খুঁজতেই পেলাম চারটে জিনিস।'

'বন্দুক আর গুলি দেখেছি। একই কোম্পানির তৈরি, একই মাপের, একই গুলি। ওথেলোসাহেবের যা আছে। অনেকদিন ধরেই সত্যনারায়ণ তাহলে তৈরি হচ্ছিল—এক্স আর্মি ম্যান—ফায়ার আর্মস-এর অসুবিধে ছিল না।'

'হ্যাঁ, অনেকদিন ধরেই তৈরি হচ্ছিল, 'ইন্দ্রনাথের গলার সুর এখন অন্যরকম। হেঁয়ালি ভাসছে কথার সুরে।

আরও একটু শক্ত হল নাগরাজনের ঠোঁট, 'তৃতীয় আর চতুর্থ জিনিস কী পেলেন?

'এইটা,' বলে পাঞ্জাবি তুলে কোমরে ধুতির ফাঁক থেকে একজোড়া বস্তু বের করে টেবিলে রাখল ইন্দ্রনাথ।

ঝুঁকে পড়লাম আমরা সকলেই। ফ্ল্যাশ মেরে একখানা ফটোও তুলে নিল মিহির। ঝিলিক মেরে গেল সোনার গায়ে।

সোনার খড়ম। একজোড়া।

ইন্দ্রনাথ বললে, 'উলটে দেখুন। লেখা আছে 'রামকুমারকে দিলাম—স্বামী 'আত্মানন্দ'। বাংলায় লেখা। আপনি বুঝবেন না। কিন্তু এটা তো বুঝছেন, খড়মজোড়া রামকুমারের।'

[illegible] স্বরে নাগরাজন বললেন, 'স্বামী আত্মানন্দ? মিশনের মহারাজা?'

'আপনি চেনেন?'

'না। নাম শুনেছি।'

'মিশনে টেলিফোন নিশ্চয় আছে? ফোনে কনট্যাক্ট করে দেবেন?'

'স্বামী আত্মানন্দ?'

'বলছি। আপনি?'

'ইন্দ্রনাথ রুদ্র। প্রাইভেট ডিটেকটিভ।'

'বলুন।'

'রামকুমার সান্যালকে আপনি চেনেন?'

'চিনি।'

'তিনি খুন হয়েছেন।'

'ও। কে করেছে?'

'জানবার জন্যেই এই ফোন। আপনি এক জোড়া সোনার খড়ম তাঁকে দিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার খড়ম?'

'আমার বটে। রামকুমারেরও বটে।'

'প্রাঞ্জল করে দেবেন?'

'এই মিশনের জমি আর বাড়ি রামকুমারের দান—সেইসঙ্গে ওই সোনার খড়ম। আমি তা পায়ে দিয়ে ওরই নাম লিখে উপহার দিয়েছিলাম। কিন্তু তা তো চুরি হয়ে গেছে।'

'কে চুরি করেছে জানেন?'

'না। ডাকাত পড়েছিল রামকুমারের বাড়িতে। চন্দনকাঠের ডাকাত। লুঠপাট করাই ছিল মতলব। সোনার খড়ম নিয়ে পালায়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে গুলি চালিয়েছিল রামকুমার। জখমও করেছিল কয়েকজনকে। কিন্তু মেরে ফেলতে পারেনি। সে তো প্রায় পাঁচ বছর আগের কথা। খড়ম কোথায়?'

'আমার সামনে।'

পারমিতা বললে, 'বছর চারেক হল সত্যনারায়ণ ক্লাবহাউসের চার্জে এসেছে। এক্স আর্মি ম্যান। দাঁতে-দাঁতে পিষে, 'আগে ছিল চন্দন ডাকাত। এখন খুনি।'

'গায়ত্রীকে ডাকবেন?' ইন্দ্রনাথের স্বর আশ্চর্য শান্ত। চোখে কিন্তু হিরের ঝিলিক—সেই রোশনাই, যা বিশেষ উপলক্ষে দেখা দেয়।

সোনার খড়মজোড়া তুলে রাখল পেছনে।

গায়ত্রী সামনে দাঁড়িয়ে। ও এখনও জানে না, সত্যনারায়ণ খুনি!

ইন্দ্রনাথ আমার দিকে চাইল। বললে, 'নৌকোয় রক্ত দেখেছিলে?'

'হ্যাঁ,' বললাম আমি।

'পারমিতা,' ইন্দ্রনাথ এবার তাকিয়েছে পারমিতার দিকে, 'রামকুমারের খুনের খবর পেয়ে মরা হাঁস আর পাখিগুলোকে নৌকোয় করে আনা হয়নি? ঘাস বনেই পড়েছিল?'

'নিশ্চয়। তখন হাঁসের মাংস কে খাবে?'

'গায়ত্রী,' এবার গায়ত্রীর দিকে তাকিয়েছে ইন্দ্রনাথ, 'ইংরেজি বোঝ?'

ঘাড় নেড়ে সায় দিল গায়ত্রী। চোয়াড়ে মুখ শক্ত। যেন কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে।

ইন্দ্র বললে, 'সত্যনারায়ণ তোমাকে বন্দুক চালানো শিখিয়েছিল?'

মনে হল, যেন একটা ঝিলিক দেখলাম গায়ত্রীর খরখরে চোখে। সে জবাব দিল না।

ইন্দ্র বললে, 'তোমার দাঁত ভাঙল কী করে?'

গায়ত্রী নিশ্চুপ। শরীর তার অল্প-অল্প দুলছে।

'আমি বলছি,' বলে গেল ইন্দ্রনাথ, 'নৌকো নিয়ে দুজনে বেরিয়েছিলেন। পারমিতা তখন বিছানায়। পাড়ে জুতোর ছাপ এঁকে গেল সত্যনারায়ণ। পোড়ামাটির ছাঁচ তোমার ঘরে পেয়েছি। মি: নাগরাজন—চতুর্থ জিনিস এই নকল জুতোর ছাঁচ—গাড়ির মধ্যে রেখেছি—নিয়ে নেবেন।—গায়ত্রী, তারপর তুমি উঠে দাঁড়ালে কাঠের গুঁড়িতে। গুলি চালালে বন্দুকের বাঁট পেছনে ছিটকে এসে তোমার দাঁত ভেঙে দিল—।'

শ্বাপদ গর্জন শুনলাম গায়ত্রীর কণ্ঠে। চোখে বাঘিনীর চাহনি। বললে হিসহিসিয়ে, 'আই ডোন্ট কেয়ার।'

'কিন্তু কেন? কেন মারলে রামকুমারকে?'

'আমার ছেলেকে মেরেছিল বলে।'

'গুলি করে? বারান্দা থেকে? সোনার খড়ম নিয়ে পালানোর সময়ে? ডাকাত ছিল তোমার ছেলে?'

পেছন থেকে সোনার খড়ম জোড়া সামনে এনে বাড়িয়ে ধরল ইন্দ্রনাথ।

জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল গায়ত্রী।

*'দক্ষিণী বার্তা' পত্রিকায় প্রকাশিত। শারদীয় সংখ্যা।

স্তব্ধ অট্টহাসি

অট্টহাসি বটে একখানা। ঘর বুঝি ফেটে গেল। কড়িকাঠ কেঁপে উঠল। চারদিকের দেওয়ালে ফাট ধরল।

ভুরু কুঁচকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল ইন্দ্রনাথ। ভেবেছিল, ওই একখানা তেজালো হাসি হেসেই ক্ষ্যামা দেবে আগন্তুক।

কিন্তু তা তো হল না। অট্টহাসি যে ক্রনিক হয়ে গেল। একটা থামতে না থামতেই শুরু হয় আর-একটা। ঘর গমগম করছে। আওয়াজে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অট্টহাসি আর থামছে না। থামানো যাচ্ছে না। চেষ্টা করছে আগন্তুক। চোখে জল এসে গেছে। রুমাল বের করে চোখ মুছছে, মুখ চাপা দিচ্ছে, পেট খামচে ধরছে—কিন্তু তেড়েমেড়ে অট্টহাসি বেরিয়ে আসছে মুখগহ্বর দিয়ে।

আর, তারপরেই শুরু হল হেঁচকি। প্রবল হেঁচকি। আগন্তুকের অতবড় কলেবরটাকে ভেতর থেকে মুহুর্মুহু: ঝাঁকুনি দিয়ে যাচ্ছে পাকস্থলীর তড়কা।

এরকম কাণ্ড ইন্দ্রনাথ রুদ্রর ঘরে কখনও ঘটেনি। রহস্য আর ষড়যন্ত্রে হাবুডুবু খেয়ে যারা আসে, তারা একেবারে মিইয়ে থাকে। উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় আধমরা হয়ে থাকে।

ইন্দ্রনাথ তাদের চাঙা করে। তাদের জটিল সংকট থেকে কুটিল কাঁটা খুঁজে বের করে দেয়। তারা তখন হেসে বাড়ি ফিরে যায়।

কিন্তু এরকম অট্টহাসি তো হাসে না। বিশেষ করে কী ফ্যাসাদে ফেঁসেছে তা ব্যক্ত করার পূর্বমুহূর্তেই এবম্বিধ অট্টহাস্যের উদ্রেক ঘটে না। এভাবে হেঁচকিও তোলে না।

ইন্দ্রনাথ বুঝল, লোকটা হেঁচকিকে আর কন্ট্রোল করতে পারছে না। হেঁচকিই এখন তার প্রভু হয়ে দাঁড়িয়েছে। দম আটকে আসছে, চোখ ঠেলে-ঠেলে বেরিয়ে আসছে, গোটা অন্ননালিটা যেন পটাং করে ছিঁড়ে যেতে চাইছে।

হেঁচকির হাতে মক্কেলকে ছেড়ে দিয়ে পাশের ঘরে গেল ইন্দ্রনাথ। ফিরে এল একটা সাদা রঙের ট্যাবলেট নিয়ে। আর এক গেলাস জল।

বললে, 'খেয়ে নিন। স্প্যাজম কমবে। হেঁচকি পালাবে।' মক্কেলের তখন কথা বলার অবস্থা নেই। এক হাতে জলের গেলাস, আর এক হাতে সাদা বড়ি নিয়ে দুটোই তুলল মুখের কাছে। একটা হেঁচকি যেই উঠেছে আর সময় না দিয়ে তক্ষুনি বড়ির পেছনে খানিকটা জল দিয়ে পেটে চালান করে দিল মহাকায় মানুষটা।

এরপরেও উঠেছিল খান তিনেক হেঁচকি। তারপর চম্পট দিল একেবারেই। ঘর এখন নিস্তব্ধ। অট্টহাসিও যে স্তব্ধ।

ইন্দ্রনাথ বললে, 'যে বড়িটা আপনাকে দিলাম তা 'বারালগন'। দুটো বড়ি পকেটে সবসময়ে রাখবেন। বেমক্কা হেঁচকিকে শায়েস্তা করতে পারবেন।'

লোকটা তখন টানা লম্বা নিশ্বেস নিচ্ছে। ফুসফুসকে ঠান্ডা করে তুলছে। কথা বলতে চাইছে না। হেঁচকির ভয়ে। ফের যদি তেড়ে আসে।

ইন্দ্রনাথ তাই একাই কথা বলে গেল।

'মামুলি হেঁচকি এটা নয়। তাই 'বারালগন' দিলাম। নইলে দিতাম ঠান্ডা জল অথবা গরম কফি। নাছোড়বান্দা এ হেঁচকি ওঠে ক্রনিক নার্ভের ইরিটেশন অথবা ইনফ্লেমেশন ঘটলে। উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা,

ইমোশন্যাল শক—সেই থেকেই হেঁচকি-রূপী সাইকোসোম্যাটিক রিঅ্যাকশন। বুঝছেন?'

মক্কেল ঘাড় হেলিয়ে জানাল, সে বুঝতে পারছে।

ইন্দ্রনাথ বললে, 'আপনার তো দেখছি, মানসিক চিকিৎসার দরকার।'

মক্কেল জোরে-জোরে ঘাড় নেড়ে সায় দিল এই প্রস্তাবে।

ইন্দ্রনাথ তখন নস্যির ডিবে বের করল। মুডে থাকলে খুব কায়দা করে নস্যি নেওয়া ওর অভ্যেস। আগে টানত 'কাঁচি' সিগারেট তারপর হল চুরুট, পাইপ কামড়েও স্টাইল মেরেছে অনেক। এখন সব ছেড়ে দিয়ে চালাচ্ছে শুধু তামাকচূর্ণ—মস্তিষ্ককে ঝাঁকুনি মেরে- মেরে অ্যাকটিভ রাখার জন্যে। কিন্তু নস্যি যখন নেয়, তখন মনে হয় যেন একটা মস্ত শিল্পকর্ম করছে।

আগন্তুক খাবি খাওয়ার ভঙ্গিমায় নাকমুখ দিয়ে অক্সিজেন টানতে-টানতে দুর্লভ এই দৃশ্য অবলোকন করে গেল। ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে এল। একটু কাষ্ঠ হাসি হাসল—এবার আর অট্টহাসি নয়।

বললে, 'আপনি ঠিকই বলেছেন। আমার মানসিক চিকিৎসার দরকার। কারণ আমি পাগল।'

ইন্দ্রনাথ সিনেমা-নায়কের ঢঙে অপাঙ্গে তাকিয়ে নিয়ে নস্যির কৌটো পকেটে রাখল। দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে বললে, 'নিজেকে যে পাগল বলে, সে পাগল নয়।'

মক্কেল বললে, 'কিন্তু আমি পাগল। দাগি পাগল।'

'মানে?'

'আমি পাগলা গারদে ছিলাম।'

ঘর আবার নিস্তব্ধ হয়ে গেল। মওকা বুঝে একটা গেরস্ত টিকটিকি টিক-টিক করে উঠে বোধহয় সর্বজ্ঞ ভূশণ্ডী কাকের মতো বলে উঠল—ঠিক, ঠিক, ঠিক! মক্কেল নির্ঘাত পাগল।

ইন্দ্রনাথের চাহনি এখন সূচ্যগ্র হয়েছে। ছুঁচের ডগার মতো সরু ওই চাহনির মধ্যেই নিহিত রয়েছে ঈগল চোখের ক্ষমতা। অনেকদূর থেকে অনেক কিছু দেখলেই ঈগল ঠিক আসল জায়গাটাকে বিবর্ধিত আকারে দেখতে পায়। ঈশ্বরের কৃপায় শুধু ঈগলই এই ক্ষমতা পায়নি—পেয়েছে নিশ্চয় ইন্দ্রনাথ রুদ্রও। নইলে হাজার গোলমালের স্তূপের মধ্যে থেকে সঠিক গোলমালটা ও টক করে চিনে নেয় কী করে? তারপরেই নির্মূল করে আসল কারণটাকে—সঙ্কটের সমাধান ঘটে। মক্কেলের মুখে হাসি ফোটে। ইন্দ্রনাথের পকেটে টাকা আসে।

হ্যাঁ, এটা ওর প্রফেশন। ও বলে। অ্যামেচার ডিটেকটিভদের অস্তিত্ব শুধু গল্পের বইতেই। আসল ডিটেকটিভকে খাটতে হয়। ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে শুধু বুদ্ধির খেল দেখালেই হয় না। সেই সঙ্গে চাই দক্ষিণা, যে যা দিতে পারে।

আগন্তুকের মুখের দিকে এহেন ঈগল চাহনি নিক্ষেপ করে ইন্দ্রনাথ কী সিদ্ধান্তে এল, সেটা মুখের পরতে প্রকাশ পেল না। চোখদুটো শুধু অনুকম্পায় নরম হয়ে এল। কণ্ঠে শোনা গেল তারই অনুরণন।

বললে, 'পাগলা গারদে ছিলেন?'

মক্কেল বললে, 'হ্যাঁ।'

'আমাকে দেখে অমন হাসতে গেলেন কেন?'

'ঠিক তার মতো দেখতে আপনাকে। চমকে উঠেছিলাম, তারপরেই মনে পড়ে গেল, আমি তো পাগল। তাই—'

'হাসি পেল। হাসির রাজা অট্টহাসি, চমৎকার হাসি, এমন হাসি ক'জন হাসতে পারে বলুন। এমন হেঁচকিও কেউ তুলতে পারে না।—কোন পাগলা গারদে ছিলেন?'

'নয়নতারা মেন্টাল নার্সিংহোম।'

'সেটা কোথায়?'

'পুরুলিয়ায়।'

'রিলিজ সার্টিফিকেট কবে পেয়েছেন?'

'সে অনেক বছর আগে।'

'কত বছর আগে?'

কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলে বছরের হিসেব করতে লাগল মক্কেল। সেই অবসরে তাকে খুঁটিয়ে দেখে নিল ইন্দ্রনাথ।

হেঁচকির ঢেউ যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ মানুষটাকে মনে হয়েছিল বড্ড অসহায়। নিজের দেহমন্দিরকে যে পুরুষ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না, নিজেকে সে নিতান্ত অপদার্থও মনে করে। তাকে দেখলে তখন মায়া হয়, হাসিও পায়।

কিন্তু এখন সে ভাব তিরোহিত হয়েছে তার চোখমুখ থেকে। হাবভাবে ফুটে উঠেছে সুগভীর আত্মপ্রত্যয়।

উচ্চতায় সে নাতিদীর্ঘ। প্রস্থে কিন্তু বিপুল। তার বিশাল কাঁধ, বিরাট বুক এক লহমাতেই জানিয়ে দেয় শরীরের আসুরিক শক্তির অস্তিত্ব। মুখমণ্ডলও চৌকো। চোয়ালের হাড় বেশ চওড়া আর মোটা। কঠিন মনোবল ফুটে উঠেছে ঠেলে বেরিয়ে আসা চিবুকেও। ভুরু লোমশ। নাক পাতলা আর রীতিমতো ধারাল। সবচেয়ে আকর্ষণীয় তার চোখ। চওড়া, চ্যাপটা, স্থূলমুখে ঠিক যেন দু-টুকরো সরোবর ভেসে রয়েছে। ভাবমগ্ন, ধ্যানগম্ভীর, স্বপ্নিল সেই চাহনি যার ওপর পড়ে তাকে টলিয়ে দেয়।

আর এই চাহনি দেখে টলেছিল বলেই ইন্দ্রনাথ তার পরিচয় না নিয়েই তাকে আসন গ্রহণ করতে বলেছিল। পরক্ষণেই শুরু হয়েছিল তুমুল অট্টহাসি আর প্রবল হেঁচকি।

এখন সে তার আশ্চর্য চাহনি কড়িকাঠের দিকে মেলে রয়েছে। ভাবছে।

ভাবনা শেষ হল। চোখ নামিয়ে ধীর গম্ভীর গলায় সে বললে, 'চব্বিশ বছর আগে।'

গলার আর বলার ব্যক্তিত্ব মন ছুঁয়ে গেল ইন্দ্রনাথের। নির্নিমেষে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। ব্যক্তিত্বের এহেন চকিত পরিবর্তন মানসিক অস্বাভাবিকতার পরিচায়ক নয় কি?

স্বর মাধুর্য বজায় রাখল ইন্দ্রনাথ। বললে, 'চব্বিশ বছর আগে? তখন আপনার বয়স কত ছিল?'

'চার।'

ইন্দ্রনাথের চোখের পলক পড়ল না কয়েক সেকেন্ড।

'চার বছর বয়েসে মেন্টাল নার্সিং হোমে ছিলেন?'

সরোবর চাহনিতে এতটুকু কাঁপন না জাগিয়ে সে বললে, 'এই ধাঁধার জবাবটাই আপনার কাছে পেতে এসেছি। সত্যিই কি আমি চার বছর বয়েসে পাগল ছিলাম?'

'এখন জেনে কী লাভ?'

'এর ওপরেই নির্ভর করছে আমার বিয়ে'

ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে ইন্দ্রনাথ বললে, 'বলুন আপনার কাহিনি।'

বিচিত্র সেই কাহিনি আগন্তুকের জবানিতেই শোনা যাক।

আমার নাম সত্য বসু। আমার বাবার নাম সুপ্রিয় বসু। মায়ের নাম সাধনা বসু। 'স' দিয়েই তিনজনের নামের শুরু। তিন-এর এই অভিশাপ আমার গোটা জীবনে জড়িয়ে রয়েছে।

খুব ছোটবেলার স্মৃতি নেই বললেই চলে। যা আছে তা বড় আবছা। কুয়াশার মতো অস্পষ্ট। তা থেকে উদ্ধার করা যায় না। আমি অন্তত পারিনি।

দু-একটা পাতলা ছবি মাঝে-মাঝে মনের কোণে উঁকি দেয়। একটা ছবি ভাবতে খুব ভালো লাগে। এ ছবিতে আছে অনেক জল। আমার চারপাশে। মাথার ওপর নীল আকাশ। আকাশ আর জল এক হয়ে গেছে।

আর একটা ছবি মনে পড়লেই গা হিম হয়ে আসে। কেন, তা বলতে পারব না। একটা মুখ...যেন ধোঁয়া দিয়ে গড়া কটমট করে চেয়ে রয়েছে আমার দিকে...নৃশংস চাহনি...এর বেশি কিছু মনে নেই।

তারপর যা বেশি করে মনে পড়ে, তা নার্সিং হোমের আদুরে মা-য়ের ছবি। আমাকে খুব ভালোবাসত। আমার সঙ্গে কত খেলা করত। কত হাসত। পাহাড়ে আর বনে বেড়াতে নিয়ে যেত।

আদুরে মায়ের কাছে শুনেছিলাম...আর একটু বড় হয়ে শুনেছিলাম আমার বাবা আর মা আগে আসত আমাকে দেখতে। মাস ছয়েক পরে আর আসেনি। এলেও দূর থেকে আমাকে দেখত। কাছে আসত না। আমি না কি বাবাকে দেখলেই ডুকরে কেঁদে উঠতাম। ভয় পেতাম।

তারপরের ছবিগুলো খুব স্পষ্ট। তখন তো আমি বড় হয়ে গেছি। নার্সিং হোম থেকে ছাড়া পেয়েছি। আমার বাবা আর মা আমাকে নিতে আসেনি বলে মানুষ হচ্ছি আদুরে মায়ের কাছে। নার্সিং হোমের কাছেই থাকত আমার এই মা। নিজেদের বাড়ি। বাবা ছিলেন স্কুল মাস্টার। তিনি দেহ রাখার পর আদুরে মা একা থাকত। বিয়ে করেনি। আমিই তার সব। তার চোখের মণি।

আমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছে, বড় করেছে, এই আদুরে মা। 'আদুরে মা' বলে ডাকতে নিজেই শিখিয়েছিল। বলত, তোকে আদর দিয়ে বাঁদর করব। একটা বাঁদর পোষার শখ আমার অনেক দিনের। তুই আমার সেই বাঁদর।

রঘুনাথপুরে এখন মস্ত মানসিক চিকিৎসালয় তৈরি হচ্ছে। যখন তৈরি হয়ে যাবে, তখন পুব ভারতে এইটাই হবে সবচেয়ে বড় পাগলা গারদ। রাঁচি ম্লান হয়ে যাবে। পুরুলিয়ার গৌরব বাড়বে। এর পেছনে রয়েছে দিল্লির ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ।

কিন্তু মূল আইডিয়াটা এসেছে নয়নতারা মেন্ট্যাল নার্সিং হোম থেকে। পুরোপুরি বেসরকারি উদ্যোগ। সরকারি গ্রান্ট একটা পেত। আজও পায়। পাবেও। বিরাট সরকারি হাসপাতালের পাশেই থাকবে ছোট্ট সুন্দর, একান্ত ঘরোয়া এই বেসরকারি হাসপাতাল।

এই হাসপাতালকে আমি ভালোবাসি, এখানেই ফিরে এসেছিল আমার মানসিক ভারসাম্য। বছর দুই ছিলাম সেখানে। বছরখানেক ধরে চিকিৎসার টাকা পাঠিয়ে দিত বাবা। তারপর তাও বন্ধ হয়ে গেল। গ্রান্ট ছিল বলেই হাসপাতাল আমাকে দূর করে দেয়নি। দেবেই বা কোথায়। অনাথ আশ্রম ছাড়া আমার যাওয়ার আর জায়গা ছিল না। আদুরে মা তা হতে দেয়নি। হাসপাতাল যখন রিলিজ সার্টিফিকেট দিয়ে আমাকে ছেড়ে দিল, আদুরে মা আমাকে তুলল নিজের বাড়িতে।

যখন স্কুলে পড়ছি, তখন প্রথম জানলাম, আদুরে মা আমার সত্যিকারের মা নয়। ন্যাশনাল ট্যালেন্ট স্কলারশিপের একটা পরীক্ষা দিতে হয়েছিল আমাকে। ফর্মে বাবা আর মায়ের নামের জায়গায় ব্র্যাকেট দিয়ে আদুরে মা লিখেছিল একটাই নাম—সুলোচনা দেবী। বাবার নাম ছিল না।

সেই দিন রাতে খাটে শুয়ে আদুরে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিলাম, 'মা, আমার বাবার নাম লিখলে না কেন?'

আদুরে মা প্রথমে কিছুই বলতে চায়নি। কিন্তু আমি বড্ড জেদী ছেলেবেলা থেকেই,। অনেক রাত পর্যন্ত ঘ্যানর-ঘ্যানর করে গেছিলাম।

বলেছিলাম, 'বলতেই হবে তোমাকে। নইলে ঘুমোতে দেব না।'

আদুরে মায়ের তখন হাই উঠছিল। সারাদিন ডিউটি দিয়েছে নয়নতারা-য়। রাত্রে না ঘুমোলে পরের দিন ডিউটি দেবে কী করে। ভুলে গেছি, আদুরে মা ছিল নয়নতারা-র নার্স।

শেষকালে রেগেমেগে মা বলেছিল, 'সত্যিই বাঁদর হয়েছিস তুই। যা শুনে কোনও লাভ নেই, তা যখন শুনতেই চাস, তাহলে শোন।'

সেই রাতে সেই প্রথম জানলাম, যার ঔরসে, যার গর্ভে এই ধরায় আমি আবির্ভূত হয়েছি, তাদের নাম যথাক্রমে সুপ্রিয় আর সাধনা। দুজনের কেউই আমার আর খোঁজ খবর নেয় না। আদৌ তারা বেঁচে আছে কি না, সেটাও কারও জানা নেই।

জানলাম আরও একটা খবর। যা জানবার পর থেকেই আমার মাথায় পোকা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আমার বাবা আর মা আমার মাথা খারাপ বলেই নার্সিং হোমে রেখে গেছিল। কিন্তু মাস ছয় কাটবার পর থেকেই ডাক্তারদের মনে ধোঁকা লাগে। সেরকম অ্যাবনরম্যালিটি না কি আমার মধ্যে ছিল না। আর পাঁচটা সুস্থ খোকাখুকুর মতো আমিও সুস্থ। একথা বলবার সময় যখন এল, তখন থেকেই হাসপাতালে আসা বন্ধ করেছিল আমরা বাবা আর মা।

আদুরে মা আমার বুকেপিঠে হাত বুলিয়ে বলেছিল, 'সতু, ডাক্তারদের সঙ্গে আমিও একমত। গোড়া থেকেই আমার জিম্মায় তুই ছিলি। প্রথম-প্রথম তুই মাঝে-মাঝে সিঁটিয়ে যেতিস। কথা বলে মনের ভাব প্রকাশ করবার ক্ষমতা ওইটুকু বয়েসে থাকে না। মনের কথা যদি বুঝতেই না পারি, তাহলে আমি মা হয়েছি কেন। এটুকু বুঝেছিলাম, তোর ভেতরে কোথায় একটা আতঙ্ক রয়েছে। আস্তে-আস্তে তা মনের মধ্যেই চাপা পড়ে গেল। তখন তো আর তোকে নার্সিংহোমে রেখে দেওয়ার দরকার হল না। আমিই ডাক্তারদের বলে-কয়ে তোকে ছাড়িয়ে নিয়ে রেখে দিলাম আমার কাছে। শুধু অবাক হয়েছি তোর ওই চামার বাবা আর মায়ের কথা ভেবে। কীরকম লোক তারা? সুস্থ সন্তানকে পাগলা গারদে ফেলে রেখে চলে গেল?'

বাকি রাতটা আমি ঘুমোতে পারিনি। আমার বয়স তখন ষোল। মায়ের সঙ্গে নয়নতারায় যেতাম। একাও যেতাম। আমায় কেউ আটকাত না। বরং দুদিন না গেলেই জিগ্যেস করত শরীর খারাপ হয়েছে কি না। সব্বাই ভালোবাসত। এখনও বাসে। এই ধরনের নার্সিংহোম থেকে যারা ভালো হয়ে বেরিয়ে যায়, সমাজের স্বাভাবিক স্রোতে মিশে যায় তাদের আরও বেশি ভালোবাসে নার্সিংহোমের সবাই। আমি ছিলাম ওদের গর্ব। মাঝে-মাঝে আমি ওদের গ্রুপ স্টাডি অ্যাটেন্ড করতাম। ডাক্তারদের কাজ সহজ করে দিতাম। ভি আই পি-রা হাসপাতাল দেখতে এলে আমাকে তাদের সামনে যেতে হত। আমি ছিলাম নয়নতারা-র গর্ব। এখন আরও বেশি।

আর এই সবের ফলেই হাসপাতালের সব জায়গায় যেতে পারতাম, সবকিছু দেখতে পারতাম। বিশেষ করে আমার আদুরে মা যখন ওখানকার নামী নার্স।

দিনকয়েক নজর রাখলাম অফিস ঘরের ওপর। রোজ গিয়ে বসে থাকতাম। কোন আলমারিতে কী ফাইল আছে, সব দেখতাম। রুগিদের কেস-হিস্ট্রি থাকত আলাদা-আলাদা ফাইলে। প্রত্যেক মানসিক রুগির আলাদা ফাইল। মূল্যবান ডকুমেন্ট। অনেক সময়ে আদালত পর্যন্ত যখন কোনও ব্যাপার গড়ায়, তখন হাকিম দেখতে চান হাসপাতালের রেকর্ড। এরকম অনেকবার ঘটেছে বলে আমি সব জানতাম।

সম্পত্তি হাতানোর মতলবেই বিশেষ করে এটা ঘটে। আসল উত্তরাধিকারকে পাগল সাজিয়ে রাখা হয়। পাগলামি এমনিই একটা ব্যায়রাম যা যন্ত্রে ধরা পড়ে না। ভালোমনের ডাক্তার কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যা বলেন হাকিম তা বিশ্বাস করে।

আমি তো বাবার ওয়ারিশ। তাহলে বাবা আমাকে পাগল সাজিয়ে হাসপাতালে রেখে উধাও হয়ে গেল কেন?

তক্কে-তক্কে রইলাম। একদিন সুযোগ বুঝে ফাঁকা অফিসঘরে ঢুকে বিশেষ একটা আলমারি খুললাম। সেখানে থাকে পুরোনো রুগিদের ফাইল। আমার ফাইল বের করলাম। রিলিজ সার্টিফিকেটের কপি দেখলাম। হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার আমাকে সম্পূর্ণ সুস্থ বলে ঘোষণা করেছেন।

এর নীচে রয়েছে অনেক রিপোর্ট। কীভাবে চিকিৎসা হয়েছে। কে-কে করেছে। ইত্যাদি।

সবার নীচে রয়েছে আসল কাগজগুলো। যেগুলো আমি খুঁজছিলাম।

আমার বার্থ সার্টিফিকেট আর নয়নতারা-য় ভরতি করানোর জন্যে একজন ডাক্তারের সার্টিফিকেট।

এইটাই নিয়ম। রুগির ঠিকুজিকোষ্ঠী জানাতে হয়, যাকে ভরতি করা হচ্ছে—সে পাগল কি না, তা সার্টিফাই করে দিতে হয় একজন ডাক্তারকে।

আমাকে সার্টিফাই করেছিলেন ডা: বিষ্ণুপদ নায়েক। ঠিকানাটা টুকে নিলাম। পুরুলিয়া টাউনের জেনারেল ফিজিসিয়ান।

বার্থ সার্টিফিকেটের কপি করে নিলাম, জন্মেছিলাম দিল্লিতে। বাবার আর মায়ের ঠিকানাও রয়েছে দিল্লির।

অ্যাপ্লিকেশন ফর্মে ছবি লাগানো ছিল আমার। ছিঁড়ে নিলাম। এ ফাইল নয়নতারা আর কোনওদিন দেখবে না।

তারপর বারো বছর ধরে আমার বাবা মা আর ডা: বিষ্ণুপদ নায়েককে খুঁজছি। প্রথমে তোলপাড় করেছিলাম পুরুলিয়া টাউন। ডা: নায়েকের চেম্বারের ঠিকানায় চলে গেছিলাম। কিন্তু তাঁকে পাইনি। অনেক বছর আগে তিনি ডাক্তারি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন। যেখানে ডাক্তারখানা ছিল, সেই ঘরে এখন স্টেশনারি দোকান হয়েছে। দোকানি পুরুলিয়ার পুরোনো বাসিন্দা। ডা: নায়েককে চিনতেন। তিনিই বললেন, 'ডাক্তারবাবু তো এখানে ভাড়া থাকতেন। পুরো বাড়িটাই ভাড়া নিয়েছিলেন। তারপর একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার ঘটে গেল। উনি বউ ফেলে বিবাগী হয়ে গেলেন। আর তাঁকে দেখিনি। সে আজ চুয়ান্ন বছর আগের কথা।'

আমি জিগ্যেস করেছিলাম, 'বিচ্ছিরি ব্যাপারটা কী?'

দোকানি রেগে গিয়ে বলেছিলেন, 'সে খবরে তোমার দরকার কী? এক ফোঁটা ছেলে! ভাগো।'

বাস্তবিকই, ষোলো বছরের একটা ছেলের কাছে সেই কেলেঙ্কারি কাহিনি বলা যায় না। ঘটনাটা তখন না জানলেও পরে জেনেছিলাম। পুরো ব্যাপারটা উদ্ধার করতে সময় লেগেছিল প্রায় চারবছর। আমি সেই ষোলো বছর বয়েসেই বুঝতে পেরেছিলাম বাবা, মা আর ডাক্তারবাবুর হদিশ পেতে হলে আমাকে গোটা ভারত টহল দিতে হতে পারে। তাই ভেবেচিন্তে ট্র্যাভেলিং সেলসম্যানের চাকরি নিয়েছিলাম আঠারো বছর বয়সেই। স্কুলের গণ্ডি পেরিয়েই রোজগারের ধান্দা শুরু করে দিয়েছিলাম। আদুরে মা আমাকে আটকাতে পারেনি। আর লেখাপড়াও করাতে পারেনি। শুয়োরের গোঁ চেপেছিল মাথায়। কেন এই শাস্তি দিয়ে গেছিল আমার বাবা, মা আর ডা: বিষ্ণুপদ নায়েক—আমাকে তা জানতেই হবে।

স্বাস্থ্য মজবুত বলে চাকরিও জুটে গেল সহজে। ফেরিওলার কাজে কোয়ালিফিকেশন দরকার হয় না। শরীরটা পেটাই হলেই চলে যায়।

যে নামী কোম্পানির চাকরি জুটিয়েছিলাম, তার সেলসম্যানদের খাতির অনেক মনোহারি দোকানদারদের কাছে। পুরুলিয়া জেলায় একটা নতুন প্রোডাক্ট-এর ক্যাম্পেন করার জন্যে প্রথমেই এলাম সেই দোকানির কাছে যিনি আমাকে ষোলো বছর বয়েসে হাঁকিয়ে দিয়েছিলেন গোঁফদাড়ি ওঠেনি বলে। বিশ বছরের সত্য বসুকে প্রথমে চিনতে পারেননি। আমার চুলের ডগা থেকে বুটের ডগা পর্যন্ত তখন গ্ল্যামার ঝলমল করছে। চোখেমুখে বুকনির ফুলঝুরি ছুটছে। নামী কোম্পানির দামি স্ট্যাম্প আমার চলনে বলনে।

দু-দিনেই দোকানির মন জয় করলাম। তাঁকে কিছু বিশেষ সুবিধে পাইয়ে দিলাম। গোটা পুরুলিয়া টাউনে স্পেশ্যাল ডিসকাউন্ট শুধু তিনিই পাবেন। তাঁর দুটো শোকেস কোম্পানির তরফ থেকে হাজার টাকায় ভাড়া নিলাম—শুধু কোম্পানির জিনিস দিয়ে শোকেস দুটো সাজানোর জন্যে। ওষুধ ধরে গেল। চার বছর আগে এই ভদ্রলোকই আমার কাছে যা চেপে গেছিলেন, এখন তা রসিয়ে-রসিয়ে বলে গেলেন।

ডা: বিষ্ণুপদ নায়েক মন্দ ডাক্তার ছিলেন না। কিন্তু তাঁর দাম্পত্য জীবন খুব মধুর হয়নি। তাঁর সুন্দরী স্ত্রী-কে তিনি সুখে রাখতে পারেননি। দোষটা তাঁর নিজের। বাড়িওলার বউয়ের কেন ছেলেপুলে হচ্ছে না, তাঁর চিকিৎসা করতে গিয়ে সেই মহিলার সঙ্গে পরকীয়া প্রেম শুরু করে দেন। বউটিকে বাঁজা ভাবা হয়েছিল। আসলে বাড়িওলারই শুক্রকীটের সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা ছিল না। ডা: বিষ্ণুপদ নায়েক সেটা হাতেকলমে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন বাঁজা বউয়ের গর্ভে ছেলে এনে দিয়ে।

এসব ব্যাপার চাপা থাকে না। জানাজানি হতেই ঢি-ঢি পড়ে যায়। তাঁর স্ত্রী আক্ষরিকভাবেই ঝাঁটা মেরে ডাক্তারবাবুকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন। ডাক্তারখানা তুলে দেন। একমাত্র মেয়েকে দার্জিলিং অঞ্চলের এক কনভেন্ট স্কুলে পাঠিয়ে দেন।

ডা: বিষ্ণুপদ নায়েক আর ফিরে আসেননি। এলে দোকানদার তা জানতে পারতেন। কেন না, পাড়ার লোক তাঁকে ঠেঙাত। ঠেঙাত বাড়িওলার গুন্ডাও। ইনি বড় ভয়ানক লোক। বিষ্ণুপদ নায়েকের ছেলেকে তিনি

নিজের ছেলে বলে মেনে নিতে চাননি। বউকেও দূর করে দিয়েছিলেন বাড়ি থেকে। সে ভদ্রমহিলা এখন বলতে গেলে ঝিগিরি করে বাপের বাড়িতে দাদাদের সংসারে। আমি কিন্তু হাল ছাড়লাম না। দোতলা বাড়িটার একতলায় মনিহারি দোকান। দোতলায় দুটো ঘর। একটায় থাকেন ডা: বিষ্ণুপদ নায়েকের স্ত্রী—আর-একটা ঘর বন্ধ থাকে। ওঁর মেয়ে কনভেন্ট থেকে এলে দিন কয়েক সেখানে থেকে যায়।

আমি একদিন স্যুটেড বুটেড অবস্থায় গট গটিয়ে উঠে গেলাম দোতলায়। 'মাসিমা, মাসিমা' বলে ডাকতে ডাকতে সোজা ঢুকলাম তাঁর ঘরে। ফেরিওয়ালারা কথা দিয়ে মানুষ কেনে—জিনিস বেচে। এই বিদ্যে আমিও শিখে গেছিলাম। ডা: নায়েকের স্ত্রীকেও জয় করতে বেশি সময় লাগেনি। সরলভাবেই নিজের পরিচয় দিয়েছিলাম। আমি সেলসম্যান। কনজিউমার ডিভিশনের কিছু প্রসাধন দ্রব্য ঘরে-ঘরে ইনট্রোডিউস করতে হবে। ওঁর সাহায্য চাই।

সাহায্য পেয়েছিলাম। আলাপও জমে গেছিল। সাহস করে শুধু ডা: নায়েকের প্রসঙ্গটা তুলতে পারিনি। ঘরের দেওয়ালে ঝোলানো ফ্যামিলি ফটোগ্রাফেও ডাক্তারবাবুর কোনও ছবি দেখিনি। ওঁর মেয়ের অনেক ছবি আছে। বেশ চটপটে চৌকস এক কিশোরী।

এই কিশোরীর সঙ্গেও আলাপ হল একদিন। স্কুলের পাট চুকিয়ে তখন সে বাড়ি চলে এসেছে। কলকাতায় যাবে। হস্টেলে থেকে কী সব পড়াশুনো করবে প্ল্যান করছে। মেয়েটি মায়ের মতোই সুন্দরী। কনভেন্টের শিক্ষা আর অবাধ মেলামেশার সুযোগ পাওয়ায় বেঁকা ভোজালি বললেই চলে। দু-দিকে কাটে। বেফাঁস কথা বললেই ভোজালি চালায়।

এরপর অনেক দিন, অনেক মাস, অনেক বছর গেছে। আমি আঠার মতো লেগে আছি নায়েক পরিবারের মা আর মেয়ের পেছনে। বিষ্ণুপদর ঠিকানা আমাকে বের করতেই হবে। একমাত্র তিনিই বলতে পারেন, আমি কতখানি পাগল ছিলাম, আর আমার বাবা-মা এখন কোথায়।

সুযোগ একদিন পেলাম।

মাসছয়েক আগের কথা। খুব বৃষ্টি পড়ছিল। পুরুলিয়া ভিজিটে গিয়ে নির্দিষ্ট হোটেলে উঠেছি। সকালবেলা আদুরে মায়ের কাছে গিয়ে আদর খেয়ে এসেছি। মা এখন চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। একা বাড়িতে থাকে। হাসপাতাল থেকে পেনশন পায়, জমানো টাকার সুদ খায়, আমিও টাকা পাঠাই। আমি গেলেই ঘ্যানর-ঘ্যানর করে, 'এবারে একটা বিয়ে কর সতু।' আমি বলি, 'পাগলের কখনও বিয়ে হয়?' মা বলে, 'কে তোকে পাগল বলেছে?' আমি বলি, 'বিষ্ণুপদ নায়েক। তাকে আমি চাই।'

আদুরে মা সব জানত। মায়ের কাছে কিছুই গোপন করিনি। সেই বৃষ্টির দিনে রঘুনাথপুর থেকে ফিরে এসে ভাবলাম যাই মাসিমার সঙ্গে একটু গল্প করে আসি। কমলার খবরটাও নেওয়া যাক।

কমলা তার নাম। ডাক্তার নায়েকের মেয়ের নাম।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে থমকে দাঁড়ালাম। শুনলাম, মায়ের সঙ্গে মেয়ের কথা চলছে। দুজনেই খুব উত্তেজিত। এত জোরে কথা বলছে যে মাঝের চাতালে দাঁড়িয়ে শোনা যাচ্ছে।

মেয়ে বলছে, 'আবার এসেছিল?'

মা বলছে, 'হ্যাঁ।'

মেয়ে—'টাকা চাইতে?'

মা—'হ্যাঁ।'

মেয়ে—'দিয়েছ?'

মা—'না।'

মেয়ে—'ইস, আমার সঙ্গে যেদিন দেখা হবে—'

মা—'মুখ ঘুরিয়ে থাকবি।'

মেয়ে—'কেন?'

মা—'ওর টাকাতেই তো এতগুলো বছর বসে খাচ্ছি, বাড়িভাড়া দিচ্ছি তোর লেখাপড়া হচ্ছে—'

মেয়ে—'ভাগ্যিস জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে সব টাকা তুলে নিজের অ্যাকাউন্টে রেখেছিলে।'

মা—'ওই উড়নচণ্ডের ভয়েই করতে হয়েছিল। কিন্তু কী অবস্থাই দাঁড়িয়েছে...খেতে পাচ্ছে না...শরীর ভেঙে পড়েছে...।'

মেয়ে—'মদ তো ছাড়েনি।'

মা—'ছাড়তেও পারবে না।'

মেয়ে—'এখন কোথায়?'

মা—'সুকুজ হোটেলে।'

মেয়ে—'বোম্বাইয়ের কাজ?'

মা—'ছেড়ে দিয়েছে। কলকাতায় কী যেন করছে।'

মেয়ে—'যাচ্ছি আমি সুকুজ হোটেলে।'

মা—'কমলা!'

আমি আর দাঁড়াইনি। তরতরিয়ে নেমে এসেছিলাম নীচে। তখনও বৃষ্টি পড়ছে। রাত হয়েছে। উলটো দিকের বাড়ির বারান্দার তলায় দাঁড়িয়ে রইলাম অন্ধকারে গা ঢেকে।

মিনিট দশেক পরেই দেখলাম কমলা নেমে এল রাস্তায়। মুখ থমথম করছে। এখন ওর বয়স তেইশ কি চব্বিশ। অপরূপা। সালোয়ার কামিজের দৌলতে ভোজালি চেহারা আরও ধারাল হয়েছে। সেই সন্ধ্যায় মনে হয়েছিল, ভোজালিতে যেন নতুন শান পড়েছে।

আমি ওর পেছন-পেছন গেছিলাম। সুকুজ হোটেল পুরুলিয়ার খুব বাজে হোটেল। যত নীচুস্তরের লোকের আস্তানা। এখানে কমলার মতো মেয়ের আসা উচিত হয়নি।

আমি ভেতরে ঢুকলাম। হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। ভেবেছিলাম অনেকক্ষণ দাঁড়াতে হবে। মেয়ে-বাপে কথা ফুরোলেই আমি ঢুকব।

কিন্তু কমলা বেরিয়ে এল পাঁচ মিনিটেই। মুখে হতাশা। বুঝলাম বাপের দেখা পায়নি।

ও চলে যেতেই আমি ঢুকলাম। ম্যানেজার সামনেই বসে। আমার মতো চকচকে চেহারার লোক এ হোটেলে আসে না। তাই সে অবাক চোখে তাকাল আমার দিকে। আমি যে সেলসম্যান, সেটা আঁচ করতে পেরেছিল। হাতের ব্যাগ দেখেই বুঝে নেয়। তাই আমি মুখ খোলবার আগেই বলেছিল, 'ঘর চাই?'

'চাই। হোটেল প্যারি আমার ভালো লাগছে না।'

'ওখানেই আছেন এখন?'

'হ্যাঁ। এখানে ঘর পেলেই চলে আসব।'

'কিন্তু কাল সকালের আগে তো পাবেন না।'

'খালি হবে তখন?'

'হ্যাঁ। ন'নম্বরের লোক কলকাতার ট্রেন ধরবেন।'

বোর্ডে চোখ বুলিয়ে নিলাম। প্রত্যেক ঘরের চাবি ঝোলে সেই বোর্ডে। ঘরে লোক থাকলে, তার নাম লেখা কার্ড থাকে—তখন আর চাবি থাকে না।

ন'নম্বর ঘরের চাবি নেই। কার্ড আছে। কার্ডে লেখা রয়েছে, যাকে খুঁজতে এসেছি তার নাম। ডা: বি নায়েক।

বুক ধড়াস করে উঠেছিল নামটা দেখেই।

সহজভাবে জিগ্যেস করেছিলাম, 'ঘরটা এখন দেখে যেতে পারি?'

'কিন্তু উনি তো চাবি দিয়ে বেরিয়েছেন।'

'তাহলে একটু ঘুরে আসি।'

'আসুন। ন'টা নাগাদ আসবেন।'

ন'টার সময়ে বোর্ডাররা খেতে বসে। বিষ্ণুপদও ওই সময়ে খাবেন। তারপর ওপরে উঠবেন। আমি তাঁকে চিনি না। এই প্রথম দেখব। তাই ন'টার আগেই হাজির হলাম হোটেলে। এক কাপ চা খেলাম। আরও আধঘণ্টা বসবার পর এক ছোকরা এসে বললে, 'চলুন ন'নম্বর ঘর দেখে যাবেন।

তিনতলায় লম্বা করিডরের দু-ধারে খুপরি ঘর। ন'নম্বরের দরজা ভেজানো। ছোকরা বাইরে থেকে হেঁকে বললে, 'আসব?'

ভারি গলা ভেসে এল ভেতর থেকে, 'এসো।'

ছোকরা দরজাটা দু-হাট করে খুলে রেখে ঢুকে গেল ভেতরে। টেবিল থেকে খালি গেলাস, চায়ের কাপ নিতে-নিতে বিষ্ণুপদকে জিগ্যেস করলে, 'কিছু লাগবে?'

'না। কে রে বাইরে?'

'উনি ঘর দেখছেন। আপনি চলে গেলে কাল আসবেন।'

আমি কিন্তু ঘর দেখছিলাম না। আমার মনের ক্যামেরায় বিষ্ণুপদর ফটো তুলে নিচ্ছিলাম। রোগা লিকলিকে মাঝবয়সি লোকটাকে দেখে রাগতে পারিনি—অনুকম্পা হচ্ছিল। দু-চোখ ছলছল করছে—ঘোলাটে—মদের ক্রিয়া। পুষ্টির অভাব গোটা শরীরে। গালের হাড় উঁচু, চোয়ালের হাড় খোঁচা হয়ে বেরিয়ে—চামড়া দিয়ে মোড়া একটা কঙ্কাল। গেঞ্জি গায়ে লুঙ্গি পরে বসে খাটের ওপর, চব্বিশ বছর আগে এই লোকটাই আমাকে পাগল সাজিয়ে নয়নতারায় ঢুকিয়েছিল।

চলে এলাম। ম্যানেজারকে বলে এলাম, কাল সকালেই আসছি। ঘর পছন্দ হয়েছে।

কলকাতার ট্রেন ছাড়ে খুব ভোরে। আমি পাঁচটার আগেই আমার সামান্য জিনিসপত্র সাইকেল রিক্সায় চাপিয়ে হাজির হলাম সুকুজ হোটেলের সামনে। একটু পরেই কলকাতার যাত্রী বেরিয়ে এলেন বাইরে। বিষ্ণুপদ নায়েক।

আমি তাঁর পেছন নিয়ে এসেছিলাম কলকাতায়, দেখে গেছিলাম ১০০ নম্বর সার্পেন্টাইন লেনে তাঁর আস্তানা। এ ঠিকানায় আগে পেল্লায় বস্তি ছিল। চারদিকে উঁচু-উঁচু পাকা বাড়ি। মধ্য কলকাতায় এত বড় বস্তি কি চিরকাল বস্তি হয়ে থাকতে পারে? তাই খানিকটা অঞ্চলে বদখৎ টাইপের কয়েকটা নতুন বাড়ি উঠেছে। সরু তিনতলা বাড়িটার তিনতলায় থাকেন বিষ্ণুপদ।

এসব আমি পরের দিন জেনেছিলাম। সকালেই বাড়িওলার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তিনি থাকেন দোতলায়। জিগ্যেস করেছিলাম, ঘর খালি আছে কি না।

লোকটা লোফার টাইপের। চোয়াড়ে চেহারা, কথাবার্তায় ইতোরামি। খোঁচা দাড়ির জন্য আরও জঘন্য লাগছিল। চোখ লাল, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। বিশাল বপু। দেখলেই গুন্ডা বলে মনে হয়। এরাই এখন কলকাতার চটজলদি বাড়িওলা। ওদের সমীহ করে চলতেই হয়।

'সেলামি দিতে হবে।' কর্কশ গলাকে একটুও নরম করবার চেষ্টা করেনি ইতোর লোকটা।

'কত?'

'দশ হাজার।'

'ভাড়া?'

'দুশো। লাইট ফ্যানের চার্জ আলাদা।'

'কোন ঘর?'

'একতলায় মুখোমুখি দুটো ফ্ল্যাট আছে। ওয়ানরুম ফ্ল্যাট, অ্যাটাচড বাথ। দুটোই খালি।'

'তিনতলায় নেই?'

'না।'

আর কথা বাড়াইনি। তিনতলায় ঘর তো একখানা। চিলেকোঠার ঘর। বিষ্ণুপদ তাহলে ওইখানেই থাকেন।

সঙ্গে হাজার টাকা ছিল। অ্যাডভান্স করে দিলাম। একতলার দক্ষিণের ফ্ল্যাট নেব বলে দিলাম। হাওয়া পাওয়া যাবে। বলে গেলাম কাল-পরশুর মধ্যেই চলে আসছি।

কলকাতায় যেখানে ছিলাম, সেখানকার আস্তানায় রইল সব জিনিস। সামান্য কিছু মালপত্র নিয়ে দু-দিন পরে চলে এলাম মুচিপাড়ার বাড়িতে। সকালবেলা গেছিলাম। ন'হাজার দুশো টাকা ইতোর বাড়িওলার হাতে তুলে দিয়ে ঘরের দখল নিলাম। তারপর ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কাজকর্ম শেষ করে, ফরডাইস লেনের হোটেলে একপেট খেয়ে ঢুকলাম নতুন আস্তানায়।

দরজা খুলে ঢুকে ঘুরে দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছি, চোখ পড়ল সামনের ফ্ল্যাটের দরজায়। সে দরজায় এখন আর তালা নেই। ভেজানো রয়েছে। ভেতরে আলো জ্বলছে। তাই দেখা যাচ্ছে, দুই পাল্লার ফাঁকে কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্পষ্ট বুঝলাম, নিজেকে আড়ালে রেখে সে আমাকে দেখছে।

আমার আর দরজা বন্ধ করা হল না। সামনের ফ্ল্যাটে তাহলে নতুন ভাড়াটে এসেছে। আমাকে দেখার তার যখন এত কৌতূহল, তাকে দেখার কৌতূহল আমাকে পেয়ে বসল। তাই দুই কপাটে দু-হাত রেখে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম।

নতুন ভাড়াটে যখন দেখল আমিও তাকে দেখছি, মানে দেখবার চেষ্টা করছি, তখন তো আর দরজা বন্ধ করে খিল তুলে দেওয়া যায় না। দরজা খুলেই তাকে বেরিয়ে আসতে হল।

ভোজালি হেসে সে বললে, 'চিনতে পারছেন?'

কমলা! এখানে?

আমি থ হয়ে গেছিলাম। মুখ দিয়ে কথা বেরোয়নি।

কমলা বললে, 'ভেতরে আসতে আজ্ঞা হোক।'

যন্ত্রচালিতের মতো তার ঘরে বসলাম।

ঘরের একখানামাত্র চেয়ারে আমাকে ইঙ্গিতে বসতে বলে কমলা গিয়ে বসল নোংরা সরু খাটে।

বললে বাঁকা সুরে, 'আপনি আমার বাবার পেছনে লেগেছেন কেন?'

আরও শোচনীয় হল আমার অবস্থা।

কমলা বললে, 'নিজেকে বড় ধড়িবাজ মনে করেন আপনি। তাই না? আপনি আমার বাবার পিছু নিয়েছিলেন, আর আমি পিছু নিয়েছিলাম আপনার।'

'আ...আমার!'

'আজ্ঞে। সুকুজ হোটেল থেকে ফিরেই একটা সাবান কিনতে গেছিলাম লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে।'

আমি চেয়ে রইলাম। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার হল সেই মনিহারি দোকানটার নাম, যার দোতলায় থাকে কমলা আর তার মা। দোকানিরও নামও লক্ষ্মী।

'লক্ষ্মীদার মুখেই শুনলাম, আপনি একটু আগেই ওপরে গেছিলেন, নেমে এসে বারান্দার তলায় দাঁড়িয়েছিলেন, আমার পেছন-পেছন গেছিলেন। লক্ষ্মীদা মন্তব্য করে বলেছিল, আপনি নাকি আমার সঙ্গে ভাব করতে চাইছেন। আমি কিন্তু বুঝেছিলাম, আপনার মতলব তা নয়। কী করে বুঝলাম জানেন?'

আমি শুধু চেয়েই রইলাম।

কমলা বলে গেল, 'দেড়তলার চাতালে অনেক জল আর কাদা মাখা জুতোর ছাপ ছিল। ওখানে কেউ দাঁড়িয়েছিল। দেড়তলা থেকে দোতলায় আর ওঠেনি। ফের কাদামাখা জুতোর ছাপ এঁকে নেমে গেছে সিঁড়ি দিয়ে। কেন সে ওখানে দাঁড়িয়েছিল? কারণ, সে আড়ি পেতে শুনছিল আমার সঙ্গে মায়ের কথা। শোনবার পর সে আমার পিছু নিয়ে গেছিল সুকুজ হোটেলে। কেন গেছিল? এটা জানার জন্যে তক্ষুনি আমি ফিরে গেলাম সুকুজ হোটেলে। দেখলাম হোটেলে বসে আপনি চা খাচ্ছেন। দেখলাম, একটু পরে ওপরে উঠে গেলেন। নেমে এসে ম্যানেজারকে বললেন, কাল ন'নম্বর খালি হচ্ছে ভোরে—আমি আসছি আটটায়। ন'নম্বরে আমার বাবা উঠেছে, সে খবর আমি নিয়েই গেছিলাম। বাবা ভোরে চলে যাচ্ছে জেনে ঠিক করলাম,

বাবার পেছনই নেব আপনাকে পরে এক হাত নেব। ভোর পাঁচটায় সুকুজ হোটেলের সামনে পৌঁছে দেখলাম, আপনি ফলো করছেন বাবাকে। এলেন এখানে। এখন দেখছি আমার আগেই ঘর নিয়েও ফেলেছেন। কে আপনি? পুলিশ?'

'না।' এতক্ষণে কথা বলার মতো মনের অবস্থা ফিরে পেলাম। বললাম, 'আমি এক পাগল।'

সব কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল কমলা।

আমি বললাম, 'আপনার বাবার পেছন নিয়েছি শুধু এই কারণেই। আমি জানতে চাই, কেন উনি চার বছরের একটা সুস্থ বাচ্চাকে পাগল বলে সার্টিফাই করেছিলেন?'

'আর জানতে চান আপনার বাবা আর মায়ের ঠিকানা? জানতে চান, কেন তাঁরা আপনাকে পাগলাগারদে ফেলে রেখে উধাও হয়ে গেলেন?' কমলার চোখ আর গলা দুটোই এখন নরম হয়ে এসেছে।

'যদি তারা বেঁচে থাকে,' বললাম আমি।

কমলা কিছুক্ষণ কথা বলল না। মেঝের দিকে তাকিয়ে বসে রইল। তারপর হঠাৎ মাথা তুলে বললে, 'আমাদের দুজনকেই বোকা বানিয়ে গেল বাবা।'

'কেন?'

'কাল রাতেই তিন তলার ঘর ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে।'

'সেকী!'

'বাড়িওলাকে সেলামি আর ভাড়ার টাকা দিয়ে আলগোছে জিগ্যেস করেছিলাম—ছাদের ঘরে যিনি থাকেন, তিনি বেশ আছেন। ছাদ পাচ্ছেন, হাওয়া পাচ্ছেন। বাড়িওলা বললে—এখন আর নেই। কাল রাতেই চলে গেল। আমি চমকে উঠেও সামলে নিয়ে বললাম—তাহলে ওই ঘরটাই দিন না। বাড়িওলা বললে—না, না। ও ঘরে খুব জানাশুনা ছাড়া কাউকে থাকতে দিই না আমি।'

আমি বললাম, 'আপনার বাবাকে তাহলে বাড়িওলা ভালো করেই চেনেন?'

'তাই তো মনে হল।'

'তাহলে', বলে আমার চোখ রাখলাম কমলার চোখের ওপর। চোখে-চোখে বাকি কথা হয়ে গেল।

সেই থেকে আমরা দুজনে পালা করে বাড়িওলার পেছনে লেগে রয়েছি। লোফারটার নাম বাচ্চু সেন। ছেলেপুলে কেউ নেই। বাচ্চুবাবুর চেহারা যতখানি কর্কশ, ওর স্ত্রীর চেহারা ততখানি মোলায়েম। টিপিক্যাল বাংলার বধূর মতো যে ধরনের বধূদের কথা শৈলজানন্দ শরৎচন্দ্রের গল্প উপন্যাসে পড়েছি। ফরসা, গোলগাল মুখ, কপালে আর সিঁথিতে সিঁদুর, চওড়া লালপেড়ে শাড়ি ছাড়া বাহারি শাড়ি কোনওদিন পরতে দেখিনি। চোখে বা মুখে বা কথায় উগ্রতার লেশ মাত্র নেই। হাসিখুশিও নয়। গোটা মুখখানায় যেন বিষাদ লেগে রয়েছে। চাহনির মধ্যেও বিষাদের ছোঁয়া রয়েছে। বিষাদ রোগে ভুগছে নিশ্চয়। নয়নতারায় এরকম পেসেন্ট অনেক দেখেছি।

বাচ্চু সেন বাড়ি থেকে খুব একটা বেরোয় না। একটা ঠিকে ঝি দুবেলা এসে বাজার- হাট, রেশন ধরা, দুধ এনে দেওয়া, ঘর মোছা এইসব করে দেয়। বাচ্চুর বউকে কোনওদিন দোতলা থেকে একতলাতেও নামতে দেখিনি।

আমার আর কমলার মধ্যে চুক্তি হয়েছিল, আমি যখন সারাদিন কাজে থাকব, কমলা তখন নীচের ঘাঁটি আগলাবে। আমি ফিরে এলে ওর ছুটি। তখন করিডোরে চোখ রাখব আমি। এ কাজটা আমি করতাম কমলার ঘরে বসেই। উঠতি বয়সি ছেলেমেয়েদের আলাদা রাখা যায় না।

কিন্তু এটা সহ্য হয়নি বাচ্চু সেনের। একদিন সন্ধ্যায় দরজা খোলা রেখে আমি বসে রয়েছি কমলার ঘরে, এমন সময়ে সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ শুনলাম। ভারী আওয়াজ। নির্ঘাত বাচ্চু নামছে। সঙ্গে-সঙ্গে দুজনেই চেয়ে রইলাম দরজার দিকে। বাচ্চু বেরিয়ে গেলেই ওর পেছন নেব—এইটাই ছিল আমাদের প্ল্যান।

ও বাড়িতে ঠাঁই নেওয়ার ষষ্ঠ দিনের ঘটনা এটা।

বাচ্চু সেন দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। রক্তচক্ষু মেলে দেখল আমাকে আর কমলাকে। পায়ের আওয়াজ শুনেই আঁচ করেছিলাম। মদে চুর-চুর হয়ে আছে। এখন ঘামে ভেজা মুখ আর লাল চোখ দেখে তা পরিষ্কার হয়ে গেল। গায়ে একটা হাতকাটা গেঞ্জি। চেককাটা লুঙ্গিতে মাংসের ঝোল পড়েছিল বোধহয়—দাগ ধরেছে।

বিষাক্ত চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বাচ্চু জঘন্য গলায় বললে, 'এটা প্রেমপট্টি নয়।'

নিমেষে ঝলসে উঠল ভোজালি। কমলার স্বভাব-তীব্র চোখে যেন আগুন ঠিকরে গেল, 'কী বললেন?'

'যা বলবার তা বলে দিলাম,' বাচ্চুর গলাতে ভয়ঙ্করের সঙ্কেত, 'একলা মেয়েছেলেকে থাকতে দিয়েছি দুর্নাম কুড়োনোর জন্যে নয়। এ পাড়ার একটা সুনাম আছে।'

'নিজের চরকায় তেল দিন,' কঠিন গলায় বলে কমলা। 'পেশায় আমি সাংবাদিক, আপনাকে আগেই বলে দিয়েছি। যখন খুশি ঘরে থাকব, যখন খুশি বেরোব, যার সঙ্গে খুশি কথা বলব। আপনি বাড়িওলার মতো থাকবেন, গার্জেনগিরি করতে আসবেন না।'

কটমট করে চেয়ে রইল বাচ্চু সেন। মেয়েদের মুখে এরকম চাঁচাছোলা কথা বোধহয় কখনও শোনেনি। হিংস্রতা প্রকট হল দাঁতে দাত চেপে ধরার মধ্যে।

মাতালকে বিশ্বাস নেই। আমি উঠে দাঁড়ালাম। সহজ গলায় বললাম, 'বাচ্চুবাবু, আপনি ঘরে যান। এটা অবাধ মেলামেশার যুগ। এর মধ্যে খারাপ কিছু নেই। আপনি কিছু ভাববেন না। আমাদের নিয়ে আপনাকে আর মাথাও ঘামাতে হবে না। যান, যান।'

বাচ্চু যত বড় লোফারই হোক আমার পেটাই চেহারা দেখেই বুঝেছিল, তর্জন-গর্জন করলে ফল হবে না। তাই আর একবার কমলার দিকে রক্তচক্ষু হেনে উঠে গেল ওপরে।

আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে বললাম কমলাকে, 'এ রকম মেজাজ আর দেখাবেন না, আমাদের কৌশলে ঠান্ডা মাথায় কাজ উদ্ধার করতে হবে। হারামজাদা যখন বাড়ি থেকে বেরোয় না, তখন আমি ওর বাড়ি ঢুকব—আজ, রাতেই।'

'মানে?'

'করিডরটা গিয়ে শেষ হয়েছে সরু উঠোনে—দুপাশে আমাদের বাথরুম। তার ঠিক ওপরেই সরু বারান্দাটা বাচ্চু সেনের। পাইপ বেয়ে উঠে যাওয়াটা এমন কিছু নয়। কেউ দেখতেও পাবে না পেয়ারা গাছটার জন্যে। আজকের এই মাথা গরমের পর গিন্নির কাছে নিশ্চয় খানিকটা লম্ভজম্ভ করবে বাচ্চু রাস্কেল। কী বলে, তা শুনতে চাই।'

তখন সাতটা বাজে। বাচ্চুর শোওয়ার ঘরে সবুজ আলো জ্বলে রাত দশটা নাগাদ। হাতে তখনও তিনঘণ্টা ছিল। আমি খেয়ে এলাম ফরডাইস লেনে। তারপর গেল কমলা। বাচ্চু ওপর থেকে আর নামেনি। দশটা নাগাদ রান্নাঘর আর খাওয়ার ঘরের আলো নিভে গেল। আমি পেছনের উঠোনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। শোওয়ার ঘরে সবুজ আলো জ্বলে উঠতেই বৃষ্টির জলের মোটা পাইপ ধরে উঠে এলাম দোতলার বারান্দায়। শোওয়ার ঘরের একটা জানলা এই বারান্দার দিকে। খোলা রয়েছে। তাই পাইপ বেয়ে আর একটু উঠে তিনতলার ছাদের আলসের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম। কান রইল জানলার দিকে। শুনলাম স্বামী-স্ত্রীর কথা।

বাচ্চুর বউ বলছে, 'আজকালকার মেয়েরা মেলামেশা করে, নিজেদের বাঁচিয়েও চলে। তোমার নাক গলানো ঠিক হয়নি।'

'তুমি থামো,' গরগর করে ওঠে বাচ্চু,' এত বড় স্পর্ধা...চোখ রাঙায়...চুলের মুঠি ধরে... ছোঁড়াটাও কম নয়।'

'ওকেই আমার ভয়।'

'কীসের ভয়? বাচ্চু সেন কাউকে ভয় পায় না।'

'তুমি কিছু বোঝোনি?'

'কী...কী...বুঝবটা কী?'

'নতুন ভাড়াটে এলে কত কথাই তো জিগ্যেস করো—একে তো জিগ্যেস করলে না?'

'অ্যাশ কোম্পানির সেলসম্যান। ঠিকই বলেছে। কার্ড তো দেখিয়েছে।'

'তাতেই সব জানা হয়ে গেল?'

'আবার কী জানব?' 'ওর বাবা কে, মা কে এইসব।'

'জেনে আমার লাভ? টাকার দরকার টাকা পেয়েছি।'

'ওগো তুমি কি অন্ধ?'

'মানে?'

'ওর চাহনি দেখেছ?'

'চাউনি...চাউনি নিয়ে কি ধুয়ে খাব?'

'সেই চাউনি...ঠিক তার মতো...ও সে-ই।'

কিছুক্ষণ ঘর নিস্তব্ধ। তারপর চাপা গলায় বললে বাচ্চু, 'ঠিক বলছ?'

বাচ্চুর বউ এমনিতে খুব আস্তে কথা বলে। সব সময়ে যেন মুষড়ে আছে। এখন একটু কান্নার ছোঁয়া লাগল গলার সুরে। 'হ্যাঁ...হ্যাঁ...মায়ের মন সেই সর্বনাশের পর থেকে...'

'আবার সেই কথা! সর্বনাশ হতই।'

'তাই বলে ওইভাবে।'

'আ:!'

বাচ্চুর বউ আর একটা কথাও বলল না। ঘরের আলো নিভে গেল। একটু পরেই বাচ্চুর নাকডাকার শব্দ পেলাম।

পাইপ বেয়ে নেমে এলাম। কমলাকে বললাম যা শুনেছি।

পরের দিন সন্ধ্যায় বাচ্চু বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। আমি তখন বাড়ি ছিলাম না। কমলা ওর পিছু নিয়েছিল। কিন্তু সুরী লেনের মোড় পর্যন্ত। স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর বাড়ির সামনে কোলে-দের গ্যারেজে ঢুকেছিল বাচ্চু। 'বুলেট' মোটর সাইকেল হাঁকিয়ে বেরিয়ে এসেছিল।

কমলা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে এসেছিল ফ্ল্যাটে। আমি তখন সবে ফিরেছি। বাচ্চু ফিরে এল গভীর রাতে।

তারপরের দিন তিনতলায় এল নতুন ভাড়াটে।

রিক্সা থেকে যখন নামছে, তখন দেখেছিলাম তাকে। যথেষ্ট বয়স হয়েছে। চুলদাড়িতে সাদা চুল অনেক। দাড়িও রবিঠাকুরের দাড়ির মতো বুক পর্যন্ত ঝুলছে। চুল সাধু সন্ন্যাসির মতো। জট পাকিয়ে গেছে। লম্বা আর নোংরা। খুব রোগা। পোশাক কিম্ভূত। পুরো হাতা ফতুয়া। কালো রঙের। পাজামাও কালো রঙের। পিঠে একটা পুঁটলি। হাতে বাঁশের লাঠি। চোখে কালো চশমা।

জানলা দিয়ে দেখলাম, রিক্সাওলা তাকে হাত ধরে নামিয়ে দিল। অতি কষ্টে সে নীচে নামল। লাঠি সামনে বাড়িয়ে ঠুকে-ঠুকে দরজার দিকে এগোল—রিক্সাওলা তার হাত ধরে নিয়ে গেল করিডর দিয়ে, সিঁড়ির ওপর দিয়ে, দোতলার চাতাল পেরিয়ে, তিনতলায়। একটু পরেই শুনলাম, বাচ্চু ওঘর থেকে বেরিয়ে ভারী পায়ে উঠে গেল ওপরে।

রিক্সাওলা নেমে আসতেই করিডরে বেরিয়ে এসে জিগ্যেস করলাম, 'কে রে? অন্ধ নাকি?'

সে বললে, 'হ্যাঁ।'

পরের দিন থেকে সে রোজ নেমে আসত লাঠি ঠুকে-ঠুকে, সার্পেন্টাইন লেন আর সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের বাড়িগুলোর দেওয়াল ঘেঁষে চলে যেত শিয়ালদা স্টেশনে। ফিরত রাত্রে। পেছন-পেছন গিয়ে দেখেছি মেন স্টেশনের সামনে ইসকনের গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করছে। মুখে একটাই একঘেয়ে বুকনি : 'বুড়ো

অন্ধকে দশটা পয়সা দিয়ে যাও বাবা'। কাতারে-কাতারে লোক যে অঞ্চলে ভোর থেকে রাত পর্যন্ত যাতায়াত করছে, সেখানে অন্ধ ভিখিরি একজনই। রোজগার ভালোই চলছিল।

আমি নিজেও একদিন দশ পয়সা ফেলে দিলাম কোঁচড়ে। জিগ্যেস করলাম, 'নাম কী তোমার?'

'সাধুচরণ।'

রাত ন'টা নাগাদ ফিরত সাধুচরণ। সারাদিন থাকত শিয়ালদা স্টেশনের আশেপাশে। খেয়ে নিত কোর্টের সামনের ফুটপাতের দোকানে। ও অঞ্চলের সব্বাই ওকে চিনে গেল ছ'মাসে। ছ'মাস আমি তাকে চোখে-চোখে রেখেছি। তিনতলায় সে উঠে গেলে দেখেছি, ছাদের ঘরে পরদার ফাঁকে আলো জ্বলছে। আলো যখন নিভে যেত, আমি পাইপ বেয়ে পেয়ারা গাছের আড়াল রেখে উঠে যেতাম দোতলায়, কখনও তিনতলায়। ছাদেও উঠেছি। কিন্তু সাধুচরণের ঘর বন্ধ থাকত, জানলায় পরদা ঝুলত, ঘর অন্ধকার; কিচ্ছু দেখতে পেতাম না।

বাচ্চু আর বউয়ের কথাবার্তা শুনে খটকা লেগেছিল একদিন। যেদিন সাধুচরণ ভাড়াটে হয়ে এল সেই দিন।

রাতে উঠেছিলাম পাইপ বেয়ে। শুনেছিলাম ওর বউ বলছে, 'নতুন ভাড়াটে আনলে, দেখেশুনে এনেছ তো?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ। অন্ধ বলেই তো আনলাম। তোমার ছাদে উঠতে অসুবিধে হবে না।'

কাপড় মেলতে বাচ্চুর বউ রোজ সকালে উঠত ছাদে। বিষ্ণুপদ যখন থাকতেন, তখনও নিশ্চয় উঠত।

ছ'মাস ধরে আড়ি পেতেও কিন্তু বাচ্চু আর ওর বউয়ের মুখে আমাকে নিয়ে আর একটা কথাও শুনিনি, নির্জনে স্বামী-স্ত্রীরা প্রাণ খুলেই তো কথা বলে। বাচ্চু অতীতকে যেন কবর দিয়ে রাখতে চায়। বউ তা জানে। ভয়ে কথা বলে না।

বাচ্চু কিন্তু সেই রাতের পর থেকে আমার দিকে যখন তাকায়, তখন ওর চোখে দেখি অদ্ভুত এক চাহনি। কী যেন খুঁজছে আমার চোখ-মুখের মধ্যে। একদিন সটান জিগ্যেস করেছিল, 'আপনার পুরো নাম কী বলুন তো? কার্ডে তো লেখা আছে এস বোস।

আমি গলা ছেড়ে অট্টহাসি হেসেছিলাম। বলেছিলাম, 'সত্য বোস।'

তারপরেই উঠেছিল হেঁচকি। উপুড় হয়ে খাটে শুয়েও হেঁচকি থামাতে পারিনি। বাচ্চু কিন্তু আর আমার কাছে ঘেঁষেনি—ঝি-কে দিয়ে পাঠিয়ে দিত ভাড়ার রসিদ—ঝি-এর হাতেই দিতাম টাকা।

ছ'মাস পরে মেট্রো রেলের খাদে পাওয়া গেল সাধুচরণের মৃতদেহ।

খবরটা কাগজে বেরিয়েছিল। মেট্রো রেলের মুণ্ডপাত করেছিল সাংবাদিক। রাত নামলে যখন লোডশেডিং হয়, তখন খুঁড়ে ফেলে রাখা এই মৃত্যুকূপগুলো আরও কতজনের প্রাণ নেবে, এই নিয়ে কর্তৃপক্ষের পিণ্ডি চটকেই হাত ধুয়ে ফেলেছিল জার্নালিস্ট। সাধুচরণের নাম ঠিকানাটা অবশ্য ছাপিয়ে দিয়েছিল। ফতুয়ার পকেটে পাওয়া গেছিল ভাড়ার রসিদ। তাতেই লেখা ছিল নামধাম।

পুলিশও এসেছিল। বাচ্চুর সঙ্গে নামকাওয়াস্তে দেখা করে, তদন্ত সেরে চলে গেছিল। আমার ঘরে যখন এসেছিল, আমি শুধু বলেছিলাম, 'তিনতলায় থাকত জানি, শিয়ালদায় ভিক্ষে করত। মেট্রো রেলের ওদিকে মরতে গেছিল কেন?'

'মরতে! ভিক্ষের লোভ বড় লোভ।' বলে চলে গেছিল পুলিশ।

সাধুচরণকে পাওয়া গেছিল বৌবাজার আর চিত্তরঞ্জন এভিন্যুর চৌমাথায়—পাতালে।

সেই রাতে খাটে শুয়ে বাচ্চুর বউও জিগ্যেস করেছিল একই কথা, 'আহারে। অতদূরে গেল কেন?'

একই জবাব দিয়েছিল বাচ্চু, 'মরতে।'

তারপরের দিন সকাল বেলা সার্ট প্যান্ট পরে করিডর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল বাচ্চু। এটা ওর বাইরে বেরোনোর পোশাক। ছ'মাসে এই প্রথম বাইরে যাচ্ছে। এরকম কুয়োর ব্যাঙ জীবনে দেখিনি।

ও বেরিয়ে যেতেই কমলা এল আমার ঘরে। আমরা এখন পরস্পরকে তুমি বলে সম্বোধন করি। নাম ধরে ডাকি। মেয়েটাকে আমার ভালো লাগে। আমার জীবনে যে লোকটা সর্বনাশ ঘটিয়েছে, তার মেয়ে সে। তবুও ভালো লাগে। বাপের রক্ত ধমনীতে নিয়েও কমলা অন্য জাতের মানুষ।

যা বলছিলাম। হন্তদন্ত হয়ে আমার ঘরে ঢুকে কমলা বললে, 'যাও-যাও! নিশ্চয় মোটর সাইকেল বের করতে যাচ্ছে। সেদিনও এই ড্রেস করে বেরিয়েছিল।'

আমাকে আর কিছু বলতে হয়নি। বেরোবার জন্যে আমিও জামাকাপড় পরে নিয়েছিলাম। সেলসম্যানের ব্যাগটা হাতে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলাম রাস্তায়। দেখলাম, মোড় ঘুরে সুরী লেনে ঢুকছে বাচ্চু। ও গেল গ্যারেজে। অনেকদূর থেকে দেখলাম, 'বুলেট' আর স্টার্ট নিচ্ছে না। ছ'মাস ফেলে রেখে দিলে এত সহজে স্টার্ট নেয় না। বেশ ভোগাবে। মিস্ত্রি প্লাগ সাফ করতে বসে গেল। আমি চলে গেলাম ট্রাম রাস্তায়। হাসপাতাল থেকে ট্যাক্সি বেরোচ্ছিল। মিটার ডাউন করে ঢুকলাম সুরী লেনে। ইঞ্জিন বন্ধ করিয়ে বসে রইলাম ভেতরে।

প্রায় আধঘণ্টা পরে মাথায় হেলমেট এঁটে, শাঁখারিতলা দিয়ে বেরিয়ে গেল বাচ্চু আর বুলেট। পেছনে আমার ট্যাক্সি।

ডায়মন্ডহারবার যাওয়ার পথে আজকাল বেশ কয়েকটা হলিডে হোম হয়েছে। কলকাতার কালো টাকার বাবুরা এখানে এসে সারাদিন পরের বাড়ির মেয়ে-বউ নিয়ে ফূর্তি করে। সন্ধ্যায় কলকাতা ফেরে। কেউ-কেউ রাতেও ফুর্তি চালায়।

এরই পাশ দিয়ে একটা সরু রাস্তা চলে গেছে অনেক ভেতরে। বড় রাস্তা থেকে ভেতরের সেই অঞ্চলের সৌন্দর্য টের পাওয়া যায় না। এককালে নিশ্চয় কোনও জমিদারের বাগানবাড়ি ছিল। টলটলে জলের ঝিল আর দীঘি, ফুলে ভরা বাগান, বড়-বড় গাছ। পুরো জায়গাটা উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। সে যে কত বিঘের জমি, সে আন্দাজ করবার মতো অবস্থা আমার ছিল না। পাঁচিলের ওপর দিয়ে শুধু একটা বাড়ির ওপর দিক দেখেছিলাম। অনেকদূরে রয়েছে। রোদ্দুরে ঝকঝক করছে। আলট্রামডার্ন ডিজাইনের প্রাসাদ নয়। আগের যুগের সুন্দর স্থাপত্যের অনুপম নিদর্শন। বড়-বড় থাম। ব্রিটিশ আমলের খিলেন। যেন কোনও রাজারাজড়ার বাড়ি।

লোহার গেটের সামনে বুলেট পৌঁছতেই স্টিল প্লেটের গায়ে একটা খুপরি খুলে একজন তাকিয়েছিল। তারপরেই খুলে গেল গেট, ঢুকে গেল বাইক।

ট্যাক্সি ছাড়লাম না। পানের দোকানে বসে গল্প শুরু করলাম। এ বাড়ির মালিকের নাম দয়ালশঙ্কর শেঠ। মারোয়াড়ি নয়। বাঙালি শেঠ। বহু বছর আগে এই বাড়ি আর বাগান কিনে নিয়েছে। আগের মালিক রেস খেলেই ফতুর হয়েছিল। এখনকার মালিক বাড়ি থেকেই বেরোয় না। একটা বিরাট গাড়ি আছে। বিলিতি গাড়ি। কালেভদ্রে তাতে চেপে এদিক-ওদিক ঘুরে আসে। ছেলেপুলে নেই। বউ বড় খিটখিটে। চাকর-দারোয়ান মালি-ঝি আউটহাউসে থাকে। উলটোদিকের পাঁচিলের ধারের দোতলা বাড়িটায় থাকে লিকলিকে একটা লোক খুব বদমেজাজি। কারও সঙ্গে মেশে না। নিজের বাড়ির চারদিকে জঙ্গল বানিয়ে রেখেছে। মালিকে ঘেঁষতে দেয় না। গভীর রাতে সেখানে হাসি আর কান্নার আওয়াজ পাওয়া যায়। কখনও মেয়েছেলের কখনও ব্যাটাছেলের। লোকটার চরিত্র ভালো নয়। জ্যান্ত পিশাচ। মুখ দেখলেই বোঝা যায়।

ঠিক এই সময়ে বুলেট-এর বিকট আওয়াজ শুনলাম। হেলমেটধারী বাচ্চু বেরিয়ে এল দু-চাকায় চেপে। ট্যাক্সির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে চেয়ে দেখল সেদিকে। ভাগ্যিস আমি দূরে পানের দোকানে বসেছিলাম—আমাকে দেখবার আগেই উঠে গিয়ে দাঁড়ালাম দোকানের পেছনে। বুলেট বেরিয়ে গেল সামনে দিয়ে। ট্যাক্সি নিয়ে পেছন-পেছন আমি ফিরে এলাম মুচিপাড়ায়।

কমলা বসেছিল আমার জন্যে। সব শুনল। বললে, 'বুনো হাঁসের পেছনে আর কদ্দিন দৌড়োব, সত্য?'

আমি বললাম, 'কী করতে চাও?'

ও বললে, 'বিয়ে।'

'আমাকে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আমি সত্যিই পাগল ছিলাম কি না, সেটা না জেনে তো বিয়ে করব না।'

'সেটা জানবার ভার দাও যোগ্য লোককে। ছ'মাসেও আমরা যা পারিনি—ছ'দিনে তা জানা যেতে পারে।'

'গোয়েন্দার কথা বলছ?'

'হ্যাঁ। ইন্দ্রনাথ রুদ্র তাঁর নাম।'

ইন্দ্র বললে, 'এখান থেকে মুচিপাড়া বেশি দূরে নয়। আপনি কমলাকে নিয়ে আসুন।'

সত্য বললে, 'সে সুভাষ সরোবরে বসে আছে। আপনার বাড়ির সামনেই।'

'নিয়ে আসুন।'

মিনিট কয়েক পরেই কমলাকে নিয়ে ফিরে এল সত্য। একবিন্দুও রং চড়ায়নি সে কমলার চেহারার বর্ণনায়। সত্যিই চাবুক চেহারা। তীব্র চাহনি। সালোয়ার কামিজের আড়ালে বাঁকা ভোজালিই বটে।

হাত তুলে সে বললে ইন্দ্রকে, 'আমি আপনার গুণমুগ্ধ।'

'বেগুন মুগ্ধ,' বলে হাল্কা হেসে দুজনকে সোফায় বসাল ইন্দ্র। কোনও বাগাড়ম্বর করল না। কমলাকে বললে, 'সত্য বসুর উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট। আপনারটা নয়।'

'আমার উদ্দেশ্য?'

'হ্যাঁ।'

'খুব সোজা।'

'না। খুব বেঁকা।'

'মানে?'

'আপনি জানতে চান, আপনার বাবা অত টাকা কোত্থেকে পেয়েছিলেন?'

যেন অদৃশ্য চাবুকের আঘাতে বিবর্ণ হয়ে গেল কমলা।

ইন্দ্র বললে, 'কত টাকা ছিল জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে?'

'পাঁচ লাখ।'

'পুরুলিয়ায় একজন ছাপোষা ডাক্তার এত টাকা হঠাৎ পেল কোত্থেকে? এইটাই আপনার কৌতূহল। পাপের টাকার সুদে মা-মেয়ের এতদিন চলছে কি না—এইটাই আপনি জানতে চান।'

'হ্যাঁ।'

'পুরো ব্যাপারটায় টাকার খেলা চলছে। টাকার খুব গন্ধ পাচ্ছি। দেখা যাক কী করতে পারি।'

পরপর কয়েকটা ফোন করে গেল ইন্দ্রনাথ।

প্রথম ফোনটা ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের এক চাঁই অফিসারকে। একশ নম্বর সার্পেন্টইন লেনের বাচ্চু সেন কত বছর আগে জমি কিনেছিলেন? বাড়ি কি কনট্রাক্টর তৈরি করেছিল? কত টাকা লেগেছিল। আন্দাজি হিসেব পেলেই চলবে। অসম্ভব? অসম্ভবকে সম্ভব করাই কর্পোরেশনের কাজ। টাকায় সব হয়। খবর নিতে হবে বাচ্চু সেনকে না জানিয়ে।

দ্বিতীয় ফোনটা চব্বিশ পরগণার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে। তিনি তরুণ আই এ এস অফিসার। ইন্দ্রনাথ তাকে দাবড়ি দিয়ে বলে গেল, দয়ালশঙ্কর শেষ কত বছর আগে জায়গা জমি কিনেছিলেন? কার কাছ থেকে কত টাকায় কিনেছিলেন? আগে কোথায় থাকতেন? এ খবরও নিতে হবে দয়ালশঙ্করকে না জানিয়ে।

তৃতীয় ফোনটা দিল্লির প্রেমচাঁদ ডিটেকটিভ এজেন্সিকে। ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রেমচাঁদ মালহোত্রা ইন্দ্রনাথকে তোয়াজ করতে পারলে যেন বাঁচে। ইন্দ্রনাথ তাকে তুই তোকারি করে বলে গেল, আজ থেকে আটাশ বছর আগে একটা বার্থ সার্টিফিকেট দিল্লি থেকে ইস্যু করা হয়েছিল। সুপ্রিয় আর সাধনা বসু ছেলে সত্য বসুর নামে এই সার্টিফিকেট নিয়েছিল। বাবা আর মায়ের বর্তমান ঠিকানা বের করা যাবে?

সাত দিন পরে। সন্ধে হয়েছে। দয়ালশঙ্কর শেঠ-এর বাড়ির একতলায় বিশাল বসবার ঘরে ঢুকলেন ডি এম কালিপ্রসাদ সিংহ। সঙ্গে রয়েছে ইন্দ্রনাথ।

কাঁপতে-কাঁপতে ঘরে ঢুকলেন দয়ালশঙ্কর শেঠ, বয়স প্রায় ষাট। ধবধবে সাদা গায়ের রং। দীর্ঘ, সৌম্য আকৃতি। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। গায়ে কেমব্রিকের পাঞ্জাবি। ফরসা রং ফুটে বেরোচ্ছে কেমব্রিক ফুঁড়ে।

রাগে কাঁপছেন দয়ালশঙ্কর। বললেন, 'এ সব কী হচ্ছে এ বাড়িতে? সার্চ ওয়ারেন্ট আছে আপনার?'

'এস পি এসে সেটা দেখাবেন। উনি এখন আপনার ডান হাতকে নিয়ে ব্যস্ত আছেন।' বললেন মি: সিংহ।

'আমার ডান হাত?'

'বসুন বসুন, দাঁড়িয়ে কি কথা হয়? অনেক কথা আছে। হ্যাঁ আপনার ডান হাত—সচ্চিদানন্দ ঘোড়ুই। তার জঙ্গলঘেরা বাড়িতে এখন সার্চ চলছে। অন্ধ ভিখিরি সাধুচরণকে ট্রেস করা হচ্ছে। চিনতে পেরেছেন তাহলে? সাধুচরণ! মেট্রো রেলের পাতাল কূপে পড়ে যে মারা গেছে।'

দয়ালশঙ্করের ফরসা মুখ থেকে সমস্ত রক্ত নেমে গেছিল। আস্তে-আস্তে উনি বসে পড়লেন একটা সোফায়।

বসলেন ডি এম—তাঁর পাশে। ইন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে রইল সামনে। চোখে যেন কমল হিরে জ্বলছে।

ঠিক এই সময়ে ঘরে ঢুকল সত্য আর কমলা।

ইন্দ্র বললে, 'আপনারা দুজনেই ওপরে যান—মিসেস শেঠকে নিয়ে আসুন। যদি না আসতে চান—পরিচয় দেবেন নিজেদের—তাহলেই আসবেন।'

দয়ালশঙ্কর রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছলেন। সত্যকে টেনে নিয়ে কমলা চলে গেল ওপরে। একটু পরেই হাত ধরে নিয়ে এল এক প্রৌঢ়াকে। মুখ তাঁর এমনিতেই সাদা, বোধহয় অ্যানিমিয়ায় ভুগছেন বলে আরও সাদা মনে হচ্ছে। বিবর্ণতা বেড়ে গেছে বিষম ভয়ে। কাঁপছেন। কমলা তাঁকে ধরে বসিয়ে দিল দয়ালশঙ্করের পাশে। ইন্দ্রনাথ দাঁড়িয়েই রইল। এক দৃষ্টে চেয়ে রয়েছে দুজনের দিকে।

বাইরে পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। ভারিক্কি চেহারার এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। শ্যামবর্ণ। চোখে চশমা। রোদে পোড়া মুখ। একটু বিরক্ত।

ডি এম উঠে দাঁড়ালেন, 'আসুন স্যার।' দয়ালশঙ্করকে দেখিয়ে বললেন, 'এঁকে চিনতে পারছেন?'

দয়ালশঙ্করের সামনে এসে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন। বললেন, 'না চেনার কী আছে। অতবড় উকিল আন্দামানে আর তো কেউ ছিল না।'

ডি এম বললেন, 'আপনি বসুন। মি: শেঠ উকিলি ব্যবসা ছেড়ে দিলেন কেন?'

'সেটা নিয়ে জল্পনাকল্পনা আমরাও করেছি। ওঁর বন্ধু সাত্যকি সাহা ছিলেন মস্ত বড় টিম্বার মার্চেন্ট। কাটা গুঁড়ি চাপা পড়ে একই সময়ে মারা গেলেন স্বামী-স্ত্রী দুজনেই। একমাত্র ছেলেকে নিয়ে কোথায় যে চলে গেলেন শেঠ মশাই—'

'কার ছেলে?'

'আশ্চর্য কথা। কার আবার? সাত্যকি সাহার।'

'স্যার, রাগ করবেন না। রাজনীতি করার দৌলতে আপনি আন্দামানের অনেকের হাঁড়ির খবর রাখেন বলেই আপনাকে বিরক্ত করছি। সেই ছেলের বয়স তখন কত ছিল?'

একটু ভাবলেন ভদ্রলোক। ঘড়ি দেখলেন, 'নেক্সট ফ্লাইটেই আমাকে দিল্লি যেতে হবে। ছেলেটার বয়স...তা তিন বা চার বছর তো হবেই।'

'আপনি দেখেছিলেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

'এই ছবির মতো তাকে দেখতে ছিল কি?' বলে ডি এম যে ফটো এগিয়ে দিলেন, সেটা নয়নতারা-র ফাইল থেকে খুলে এনেছিল সত্য বসু।

একবার দেখেই ভদ্রলোক বললেন, 'মনে তো হচ্ছে তারই। অনেক বছর আগে দেখা তো। কেন বলুন তো?'

'স্যার, এই ছেলেটাকে পাগল সাজিয়ে পুরুলিয়ার নয়নতারা মেন্ট্যাল নার্সিং হোমে রাখা হয়েছিল।'

'অ্যাবসার্ড! এ ছেলে কক্ষনও পাগল ছিল না।'

'হাসপাতালও সেই রায় দিয়েছে। এই সেই ছেলে,' সত্যকে দেখিয়ে বললেন ডি এম। 'ছবির সঙ্গে মিল খুঁজে পাচ্ছেন?'

'চোখ,' সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠলেন শ্যামবর্ণ ভদ্রলোক, 'এবার মনে পড়েছে। ছেলেটার আশ্চর্য চোখ নিয়ে আমরা কত কথাই বলতাম সাত্যকি সাহাকে। এ সেই চোখ। এতবড় হয়েছে! এই ছেলেকে পাগল সাজানো হয়েছিল! কে সাজিয়ে ছিল? ইনি?' দয়ালশঙ্করকে দেখিয়ে যেন ফেটে পড়লেন রাজনীতিবিদ। 'ওঁর সঙ্গেই তো ছেলে এসেছিল আন্দামান ছেড়ে।'

'মূলে ছিলেন ইনিই। তবে নার্সিংহোমে সত্য বসুর বাবা আর মা বলে পরিচয় দিয়েছিলেন যাঁরা, 'তাঁদের এই ছবি'। দুটো পাশপোর্ট ফটো এগিয়ে দিলেন ডি এম, 'দিল্লি থেকে ইস্যু করা বার্থ সার্টিফিকেটে লাগানো ছিল ফটো দুটো।'

'কার বার্থ সার্টিফিকেট?'

'সাত্যকি সাহার এই ছেলের।'

'ওর জন্ম তো আন্দামানে। বাবা আর মা তো—

'মিস্টার অ্যান্ড মিসেস সাত্যকি সাহা। দিল্লিতে জাল বার্থ সার্টিফিকেটের ফলাও ব্যাবসার খবর আপনি তো রাখেনই—'

'জঘন্য কাণ্ড চলছে।'

'চবিশ বছর আগেও ছিল এই জালিদের কারবার। এই ছেলের বাবা আর মা বলে পরিচয় দিয়েছিল এই দুজন। ছবি দেখলেন—এবার স্বচক্ষে দেখুন।'

চোখের ইঙ্গিত করলেন ডি এম। সত্য বেরিয়ে গেল। সঙ্গে করে নিয়ে এল বাচ্চু সেন আর তার স্ত্রী-কে।

ছবির সঙ্গে মিলিয়ে নিলেন রাজনীতিবিদ, 'আশ্চর্য! ক্রিমিন্যাল আপনারা। সাত্যকি সাহার ছেলেকে নাম ভাঁড়িয়ে নিজের ছেলে বলে চালিয়েছিলেন? পাগলাগারদে রেখেছিলেন? হোয়াই? আই ওয়ান্ট টু নো, হোয়াই?'

এই প্রথম কথা বললেন দয়ালশঙ্কর। এখন তাঁর গলা শক্ত।

'ভুল করছেন সকলেই। সাত্যকির ছেলে রোগে ভুগে সরকারি হাসপাতালে মারা গেছে বাইশ বছর আগে। ডেথ সার্টিফিকেট আছে।'

থতিয়ে গেলেন রাজনীতিবিদ। চাইলেন ডি এম এর দিকে। ডি এম চাইলেন ইন্দ্রনাথের দিকে।

ইন্দ্রনাথ বললেন রুদ্রকণ্ঠে, 'মানুষ যখন ইতোর হয়, লোভী হয় তখন সে পশুরও অধম। বাচ্চু সেনের স্ত্রী আমাদের কাছে সব বলেছেন। ওঁর মুখেই শুনুন।'

স্বামীর দিকে না চেয়ে বলে গেল তার স্ত্রী কলের পুতুলের মতো, 'পাপ আর পারা কখনও চাপা থাকে না। ফুটে বেরোবেই। আমি কত বারণ করেছিলাম। হোক সে জন্ম রুগ্ন—তবুও তো আমার ছেলে। তাকে দেওয়া হল দয়ালশঙ্কর শেঠকে আর এই ছেলেটাকে' সত্যকে দেখিয়ে 'নিয়ে এসে সুপ্রিয় বসু আর সাধনা বসুর নাম দিয়ে জাল বার্থ সার্টিফিকেট বানিয়ে ছেলেটাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হল পাগলাগারদে। ভগবান আছেন।'

'কেন?' ইন্দ্রর প্রশ্ন।

'কেন আবার। আমার ছেলে ছিল জন্ম রুগ্ন—সে তো মারা যেতই। কিন্তু লোকে জানত, মারা গেল সাত্যকি সাহার ছেলে। বন্ধু দয়ালশঙ্করকে দিয়ে তিনি উইল করেছিলেন তাঁদের অবর্তমানে ছেলের আর সম্পত্তির ভার দয়ালশঙ্করের। বিরাট সম্পত্তি হাতিয়ে নিলেন আসল মালিককে পাগল সাজিয়ে।'

'কেন?' একই ভাবে ফের প্রশ্ন করে ইন্দ্রনাথ।

'টাকা...টাকার জন্যে। প্রত্যেকের পাঁচ লাখ। আমার ছেলে হাতছাড়া করার জন্যে...সেই ছেলেকে পাগল বলে সার্টিফাই করার জন্যে...'

'কে সার্টিফাই করেছিল? বিষ্ণুপদ নায়েক?'

'হ্যাঁ।'

সে এখন কোথায়?'

'কিছুদিন ছিল আমাদের বাড়িতে। মাসছয়েক আগে চলে গেল।'

ইন্দ্র বললে, 'সে চলে যায়নি। এখানে আসত। বাড়ির আউট হাউসে থাকত। মদ খেত, মেয়েছেলে নিয়ে ফুর্তি করত। এখান থেকে গেল বাচ্চু সেনের বাড়িতে ভাড়াটে সেজে টাকা দোহন করার মতলবে। ভিখিরি সেজে বেরোতো। তাকে সরিয়েছে এই দয়ালশঙ্কর শেঠ আর বাচ্চু সেন—মেট্রো রেলের গর্তে লাশ ফেলে দিয়েছে। সাত্যকি সাহা আর তার বউকেও কাটা গাছ চাপা দিয়ে মেরেছে এই দয়ালশঙ্কর শেঠ। সম্পত্তি হাতিয়েছে। আসল উত্তরাধিকারী এই সত্য বসুকে পাগলাগারদে রেখেছিল বাচ্চু সেন আর তার স্ত্রী—দিল্লিতে জাল বার্থ সার্টিফিকেট বানিয়ে। বাচ্চু সেনের স্ত্রী কিন্তু ছেলেটির চোখ মনে রেখেছিল—মেয়েদের এ ক্ষমতা থাকে। সে চোখ এই সত্য বসুর—বিয়ে করতে চায় কমলাকে—আপনাদের কারও আপত্তি আছে?'

'না।' সম্মতি শোনা গেল একাধিক গলায়।

শক্তগলায় বললেন শ্যামবর্ণ ভদ্রলোক, 'কিন্তু একটা শর্তে। হানিমুন হবে আন্দামানে।'

হেঁচকি তুলে সত্য বললে, 'আপনার খরচে!'

** 'দ্বীপবাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত (শারদীয় সংখ্যা, ১৪০০)।*

দাঁত থাকতে

শুকনো মুখে অনিতা জানলা দিয়ে চেয়ে রইল আকাশের দিকে। মুখ দেখে কে বলবে মাত্র বারো ঘণ্টা আগে ময়দানের অন্ধকারে নরপশুদের শিকার হতে হয়েছিল তাকে।

অনিতার বাবা রোটারিয়ান শশাঙ্ক সান্যাল পাকা গোঁফে তা দিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'ইন্দ্রনাথবাবু, আমি সেকেলে হলে কী হবে, মেয়ে বড় হচ্ছে পারমিসিভ সোসাইটির হাওয়ায়। ছেলেমেয়ের মধ্যে মেলামেশা আমিও দোষের মধ্যে দেখি না। কালকে ও অজিতকে নিয়ে গিয়েছিল বেড়াতে। ভিক্টোরিয়ার উলটোদিকে প্যারেড গ্রাউন্ডে সি এম ডি এ যেখানে পাতালরেলের কাজ চালাচ্ছে সেইদিকে। তারপর কী হয়েছে অনিতার মুখেই বরং শুনুন। আমি বাইরে যাচ্ছি।

জুতো মসমসিয়ে বেরিয়ে গেলেন বৃদ্ধ শশাঙ্ক সান্যাল। লম্বা, রোগা, খানদানি চেহারা। এই বয়সেও আদ্দির পাঞ্জাবি গিলে করে পরেন, ধুতি চুনোট করেন, হাতে মালাক্কা বেতের ছড়ি নিয়ে হাঁটেন। বারান্দায় দেশলাই ঘষার আওয়াজ হল। চুরুটের গন্ধ পেলাম।

অনিতা জানলা দিয়ে ঠায় তাকিয়ে ছিল বাইরে। বাবা বাইরে গেলেন। ঘরে আমরা দুজন সদ্য পরিচিত পুরুষ—অথচ একবার ফিরেও তাকাল না—কাল রাতের ভয়াবহ ওই অভিজ্ঞতায় স্নায়ু চোট খেয়েছে নিশ্চয় —বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে না।

নরম গলায় ইন্দ্র বললে, 'অনিতা।'

অনিতা ফিরে তাকাল। অষ্টাদশী সুন্দরী, লাবণ্যময়ী। ধারাল মুখ। ঠোঁঠে শুষ্ক হাসি টেনে এনে বলল, 'বলুন।'

'তুমি বলছি বলে রাগ করছ না তো?'

'না, না।'

'অজিত কে অনিতা?'

স্মার্ট মেয়ে বটে। একটু দ্বিধা না করে বললে, 'কলেজ ফ্রেন্ড—লাইফ পার্টনার করব ভাবছি। কিন্তু এই কাণ্ডটা হয়ে যাওয়ার পর—'

'কী হয়েছিল, খুলে বলবে?'

চোখ ফিরিয়ে ফের জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল অনিতা।

মাত্র আঠারো বছর বয়স, কিন্তু তিনগুণ বয়সের পুরুষকেও আকর্ষণ করার মতো উপাদান শরীরে জড়ো হয়েছে। সোনা-সোনা রঙের ঘাড়-ছাঁটা এক মাথা চুল, ঠোঁটের ভঙ্গিমায় আদুরে-আদুরে ভাব, বুটিদার হলুদ ঢিলেহাতা পাঞ্জাবি আর বেগুনি স্ল্যাকসের দৌলতে অষ্টাদশী সৌন্দর্য বেশ প্রকট।

একটু ধার-ঘষা গলায় বললে, 'নিউ এম্পায়ারে ইভিনিং শো-তে 'এক্সরসিস্ট' দেখে আমি আর অজিত গিয়েছিলাম ময়দানে—আমার স্কুটারে।'

'তুমি স্কুটার চালাও?'

'হ্যাঁ। অজিত অসভ্য রকমের লম্বা বলে ও-ই চালিয়ে নিয়ে গেল।'

'কত লম্বা?'

চোখ ফিরিয়ে তাকাল অনিতা। এই প্রথম ওর ক্লান্ত চোখে দুষ্ট ঝিলিক লক্ষ করলাম, 'বললে বিশ্বাস করবেন না। সাত ফুট দু-ইঞ্চি।'

'সাত ফুট দু-ইঞ্চি!'

'লং মেন্স ক্লাবের ও ফাউন্ডার সেক্রেটারি।'

'কী ক্লাব বললে?'

এবার হেসে বলল অনিতা।

বললে—'লং মেন্স ক্লাব—লম্বা লোকদের ক্লাব। কলকাতায় এই প্রথম। অজিত নিজে উদ্যোগী হয়ে প্রতিষ্ঠা করেছে।'

হাঁ করে শুনছিল ইন্দ্রনাথ, 'ঠিকানাটা দিও তো। দেখব আমার ঠাঁই হয় কি না।'

ওর তালঢ্যাঙা চেহারার পানে তাকিয়ে অনিতা বললে, 'তা হবে। সাত বাই তিন, কৈলাশ মুখুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা সাত।'

ঠিকানাটা লিখে নিল ইন্দ্রনাথ। আবহাওয়া বেশ লঘু হয়ে এসেছে লম্বা লোকদের ক্লাব প্রসঙ্গে আসায়। মুচকি হেসে বললে, 'তোমার লম্বা হবু লাইফ পার্টনার স্কুটার চালিয়ে গেল ময়দানে। তারপর?'

আবার চোখ ফিরিয়ে নিল অনিতা। চঞ্চল হল আঙুলগুলো।

সেকেন্ড কয়েক চুপ করে থেকে বলল, 'মাটি কেটে পাহাড়ের মতো যেখানে ঢেলে রাখা হয়েছে, তার আড়ালে বসেছিলাম ঘণ্টাদেড়েক। ওদিকে আলো নেই। কয়েকটা গাছের ঘুপসি জটলা। হঠাৎ—' কথা আটকে গেল অনিতার।

নরম গলায় ইন্দ্র বললে, 'লজ্জা করো না, বল আমার শোনা দরকার।'

'হঠাৎ অজিত ভীষণ চেঁচিয়ে উঠল, 'কে? কে?' সঙ্গে-সঙ্গে কারা যেন মাটির ঢিবি বেয়ে হুড়মুড় করে লাফিয়ে পড়ল আমাদের ওপর। দমাস করে একটা আওয়াজ শুনলাম—অজিত ককিয়ে উঠল। আমাকে কয়েকজন চক্ষের নিমেষে ধরে মুখ, চোখ, হাত, পা বেঁধে ফেলল। চেঁচাতেও পারলাম না। তারপর—' দু-চোখ বন্ধ করল অনিতা। আর কথা বলতে পারছে না। ঠোঁট দুটো কেবল থরথর করে কাঁপছে।

ইন্দ্রনাথ বললে, 'যাক আর বলতে হবে না। কাউকে দেখোনি?'

'তারার আলোয় দেখেছিলাম, কিন্তু কিছু মনে পড়ছে না। চোখ বেঁধে ফেলার আগে কিন্তু কাউকে দেখিনি।'

'তবে কখন দেখেছিলে?'

'অনেকক্ষণ পরে...গোঙাচ্ছিলাম...চোখের বাঁধন খুলে দিল...অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার আগে একজন আমাকে...কিন্তু কিছুতেই তার মুখটা মনে করতে পারছি না।'

'তুমি তাকে দেখেছিলে?' ঝুঁকে পড়ল ইন্দ্রনাথ। দুই চোখ খরখরে।

'হ্যাঁ। কিন্তু আমি তখন...আমি তখন...তারপর আর কিছু মনে নেই।'

'ঠোঁট কামড়ে মাথা নীচু করে রইল ইন্দ্রনাথ। শক্ত হয়ে উঠল চোয়ালের হাড়।

বললে, 'তারপর?'

'চলন্ত ট্যাক্সির পেছনে জ্ঞান ফিরল। অজিতের কোলে মাথা রেখে শুয়েছিলাম।'

'অজিত জখম হয়েছিল?'

'গাল কেটে রক্ত পড়ছিল। রুমাল দিয়ে চেপেছিল। একা বলে অতজনের সঙ্গে পারেনি।'

'মৃগ, শশাঙ্কবাবুকে ডাক।'

উঠে গিয়ে ডেকে নিয়ে এলাম শশাঙ্ক সান্যালকে। চুরুট কামড়ে ধরে স্বভাবতীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'স্কাউন্ড্রেলদের কি ধরা যাবে না, ইন্দ্রনাথবাবু?'

'সম্ভব নয়। অনিতা তো কাউকেই মনে করতে পারছে না। অজিত কি কাউকে দেখেছে?'

'না। ওরও চোখ, হাত, পা, মুখ বাঁধা ছিল।'

'একটা উপায় আছে—শেষ চেষ্টা করতে পারি।'

'বলুন।'

বলল ইন্দ্রনাথ। চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল শশাঙ্ক সান্যালের, 'এও কি সম্ভব?'

'খুবই সম্ভব।'

'বেশ ব্যবস্থা করুন।'

সম্মোহন চিকিৎসক হিমাংশু দলুইয়ের চেম্বারে পৌঁছলাম সন্ধেবেলা।

উনি পথ চেয়ে বসেছিলেন। অনিতাকে একটা ইজিচেয়ারে আড় করে শুইয়ে দিলেন। ঘরে নরম আলো জ্বেলে দিলেন। তারপর ময়দানের কাহিনি আর একবার শুনলেন।

চেনে ঝোলানো চকচকে একটা চাকতি বার করে বললেন, 'সম্মোহন এবার শুরু হবে। আপনারা দয়া করে—'

উঠে পড়লাম আমি, ইন্দ্রনাথ আর শশাঙ্কবাবু। বসলাম বাইরের ঘরে।

ঘণ্টাখানেক পরে ডাক পড়ল আমাদের। অনিতা আড় হয়ে শুয়ে। এইমাত্র সম্মোহিত হয়েছে বলে মনেই হয় না।

ডাক্তার বললেন, 'পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেগেছে ওকে হিপনোটাইজ করতে। এত সময় কখনও লাগে না। যে হিপনোটাইজড হবে, সে যদি সহজ হতে না পারে, দেরি হবেই।'

'অনিতার আর দোষ কী বলুন,' সহানুভূতির স্বরে বললে ইন্দ্রনাথ। 'শেষ যাকে দেখেছিল, তার চেহারা কি মনে করতে পেরেছে?'

'তা পেরেছে।'

উৎসুক হল অনিতা নিজেও। আমরা তো বটেই।

ডাক্তার একটা সাদা কাগজ টেবিল থেকে নিয়ে চার ভাঁজ করে ইন্দ্রনাথের হাতে দিলেন।

ভাঁজ খুলে পড়ল ইন্দ্রনাথ। ফের ভাঁজ করে পকেটে রেখে বলল, 'চল মৃগ, অজিতকে জিগ্যেস করে আসি তার আবার কাউকে মনে পড়ে কি না।'

লং মেন্স ক্লাবেই পাওয়া গেল অজিত সামুইকে।

আখাম্বা লম্বা বটে চেহারাখানা। গায়ে সে অনুপাতে মাংস বা চর্বি খুব কম। দড়ির মতো পাকানো হাত আর পা। চোয়ালের হাড় আর গালের হনু ঠেলে বেরিয়ে আসছে। ঘরের একটিমাত্র টেবিলে বসে ঘাড় হেঁট করে কী লিখছিল, আমি আর ইন্দ্রনাথ ঢুকতেই প্রথমে চোখ তুলল—তারপরেই সটান উঠে দাঁড়াল। লক্ষ করলাম বাঁ-গালে একটা স্টিকিং প্লাস্টার লাগানো।

'আপনারা?'

পেশায় আমি ডিটেকটিভ, নাম ইন্দ্রনাথ রুদ্র। আর ইনি হলেন আমার ডক্টর ওয়াটসন। মৃগাঙ্ক রায়,' বলে তক্তপোশে বসতে-বসতে বললে ইন্দ্র, 'আপনার কাছে কেন এসেছি বুঝতেই পারছেন। অনিতা কাউকেই মনে করতে পারছে না। আপনি কি পারবেন?'

'অসম্ভব। ওই অন্ধকারে আচমকা ঘাড়ে এসে না পড়লে বাছাধনদের টের পাইয়ে দিতাম।'

'আপনাকেও বেঁধে ফেলেছিল শুনলাম।'

'আষ্টেপৃষ্ঠে।'

'মার খাওয়ার পর?'

'মেরেছি আমিও,' গালের স্টিকিং প্লাস্টারে হাত বুলিয়ে নিল অজিত। 'প্রথম ঘুসিটা সামলাতে পারিনি।'

'গাল থেকে রক্ত ঝরছিল কেন?'

'কামড়ে দিয়েছিল যে।'

'কামড়ে দিয়েছিল! বলেন কী?'

'একজনকে জাপটে ধরেছিলাম। এমন কামড়ে ধরল যে—'

'ছেড়ে দিলেন। কে কামড়েছিল দেখেননি?'

'বললাম তো ওই অন্ধকারে—'

'এক কাজ করুন। আমার সঙ্গে স্পেশ্যালিস্টের কাছে চলুন। কামড়ের দাগ দেখে দাঁতের চেহারা তিনি বার করে ফেলবেন। কিছুটা সাহায্য তাতে হবে। দাগি ক্রিমিন্যাল হলে ধরা যাবে।'

চোখ কুঁচকে তাকাল অজিত, 'কামড়ের দাগ থেকে দাঁতের চেহারা বার করা যায়?'

'নিশ্চয় যায় অজিতবাবু। বিজ্ঞানে সব হয়। ফোরেনসিক ওডোনটোলজির নাম শোনেননি বোধ হয়?'

'না।'

'ক্যালকাটায় ওডোনটোলজিস্ট একজনই আছেন। ডাক্তার বিমল ভটচাজ। আমার বিশেষ বন্ধু। আসবেন?'

'চলুন।'

দাঁতের কামড়ের বিশেষজ্ঞ শেষ পর্যন্ত কী রিপোর্ট দিয়েছিলেন ইন্দ্রনাথকে, আমার তা দেখার সৌভাগ্য হয়নি। এ-কেসে যে শেষ পর্যন্ত বন্ধুবরকে মুখে চুনকালি মাখতে হবে, তা বুঝে আমিও আর খুঁচিয়ে কিছু জিগ্যেস করিনি। দিন কয়েক পরে সস্ত্রীক বসে কফি পান করছি, এমন সময় ঘরে ঢুকল ইন্দ্রনাথ, পেছনে শশাঙ্ক সান্যাল।

নমস্কার-টমস্কার শেষ হওয়ার পর শশাঙ্কবাবু বললেন, 'মৃগাঙ্কবাবু, মিসেস রায়, আপনারা দুজনেই এগারোই আষাঢ় আমার পর্ণ কুটিরে পায়ের ধুলো দেবেন। এই রইল পত্র।'

বলে একখানা ভারী হ্যান্ডমেড পেপারের হলুদ রঙের খাম রাখলেন টেবিলে। খামের ওপরে বাহারি ছাঁদে লেখা 'শুভবিবাহ'।

'কার বিয়ে?' নিরীহ কণ্ঠে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল কবিতা।

'আমার মেয়ের।'

'অনিতার?' আমি হতভম্ব। 'পাত্র কে?'

'অজিত।'

'অজিত!'

উঠে পড়লেন শশাঙ্কবাবু, 'বড় ভালো ছেলে। চলি আজ। আসবেন কিন্তু।'

ইন্দ্রনাথ দরজা পর্যন্ত শশাঙ্কবাবুকে এগিয়ে দিয়ে এসে বসল কবিতার পাশে। ধীরে-সুস্থে একটা কাঁচি ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে, 'কফিটা কি না চাইলে দেবে না?'

কবিতা শুনেছিল অনিতা-কাহিনি। তাই হাঁ করে চেয়েছিল ইন্দ্রনাথের পানে। এখন ঘোর সন্দেহ দেখা দিল চাহনির মধ্যে। সন্দেহ আমারও হল। ইন্দ্রনাথ জানে এই হঠাৎ বিয়ের রহস্য।

শক্ত গলায় বললে কবিতা, 'কফি পরে। আগে বল সব জেনেশুনে অনিতাকে অজিত বিয়ে করছে কেন? ভালোবেসে?'

'তা তো বটেই। ঘটকালিটা অবশ্য আমাকেই করতে হয়েছে। একটা কথা বলতেই রাজি হয়ে গেল অজিত।'

'কী কথা?'

'বললাম অজিতবাবু, আমি সব জানি। শশাঙ্কবাবু বা অনিতা কোনওদিন জানতে পারবে না। যদি আপনি অনিতাকে বিয়ে করেন সামনের লগ্নেই।'

চোখ বড়-বড় করে কবিতা বললে, 'ঠাকুরপো, তুমি কি বলতে চাও অজিত—'

'আরে হ্যাঁ। বন্ধুবান্ধব নিয়ে প্ল্যান করেছিল। বিকৃতি আর কাকে বলে?'

'কী বলছ তুমি।'

'ঠিকই বলছি বউদি। এ-কলকাতায় এরকম অসম্ভব কাণ্ড নিত্য ঘটছে, কে তার খবর রাখে। অনিতা-অজিতের প্রেমে খাদ নেই। কিন্তু অজিত অন্য রসের সন্ধানে এই প্ল্যান করেছিল। যাকগে সেসব নোংরা ব্যাপার। যখনি শুনলাম, হিপনোটাইজড হতে অনিতা পাক্কা পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় নিয়েছে, তখনি বুঝলাম

ওর অবচেতন মনে পুরুষটার চেহারা চাপা পড়ে রয়েছে এবং অবচেতন মনের কারসাজিতেই সম্মোহিত হয়ে তাকে সে ধরিয়ে দিতে চাইছে না। ভেতর থেকে ইচ্ছা না থাকলে, কখনওই সম্মোহিত হওয়া যায় না। অবচেতন মনের কারচুপির খবর সজ্ঞান মন পর্যন্ত পৌঁছয় না বলেই অনিতা সজ্ঞানে চেষ্টা করেও অজিতের চেহারা মনে করতে পারেনি।

'কিন্তু সম্মোহিত হয়ে সে বললে, ভীষণ লম্বা একটা লোক, অনেকটা অজিতের মতো চেহারা, তাকে চেপে ধরেছিল। তখন সে তার গলা কামড়ে দেয়।

'ক্লু পেয়ে গেলাম। অজিতকে নিয়ে ওডোনটোলজিস্টের কাছে গেলাম। কামড়ের ক্ষতচিহ্নে দাঁতের যে ছাপ পাওয়া গেল, তার সঙ্গে হুবহু মিলে গেল অনিতার দাঁতের ছাপ। হিপনোটাইজ করিয়ে যা আঁচ করেছিলাম ওডোনটোলজিস্ট দিয়ে তা প্রমাণ করলাম। কিন্তু কোর্টে গেলাম না।'

'কেন গেলে না? ওই রকম একটা জানোয়ারকে—' তেড়ে উঠল কবিতা।

'বউদি, বিয়ে ভাঙা সহজ, দেওয়া কঠিন। তাছাড়া আমরা চোর-ডাকাত ধরি সংসারকে সুন্দর করার জন্যে, মানুষকে সুখী করার জন্যে। তাই নয় কি? অনিতা বা শশাঙ্কবাবু কেউই কোনওদিন জানবে না অজিত প্রথমে পৈশাচ বিয়ের পর ব্রাহ্ম বিয়ে করেছে অনিতাকে।'

'পৈশাচ বিয়ে?' ভুরু তোলে কবিতা।

'তা ছাড়া আর কী? নিউ এম্পায়ার থেকে বেরোনোর আগে দুজনেই যে একটু সুরাপান করেছিল। পারমিসিভ সোসাইটি তো—অনিতা পরে স্বীকার করেছিল আমার কাছে।'

গল্পের শেষে আপনাদের একটা খবর জানিয়ে রাখি। ভারতে এই প্রথম সম্মোহন আর দাঁতের ছাপ দিয়ে অপরাধী সনাক্ত করল ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

** 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকায় প্রকাশিত (শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮৫)*

জুয়েল বক্স

জুয়েল বক্স চুরির গল্প এটা নয়। বরং ঠিক তার উলটো। অথচ তা অপরাধ।

নিভা আর নিখিল বিয়ে করেছিল ভালোবেসে। প্রথম দেখায় ভালোবাসা। লেকে বেড়াতে- বেড়াতে প্রথমে চার চোখের মিলন। তারপর আঙুলে-আঙুল ঠেকে জাপানি মন্দিরের ধ্যানী বুদ্ধের সামনে। দ্রিমি-দ্রিমি বাজনার তালে-তালে ওদেরও হৃদপিণ্ড দ্রিমি-দ্রিমি নেচেছিল সেই মুহূর্তে।

পরিণাম যা হয়, তাই হয়েছে। নিভার সীমন্তে সিঁদুর টেনে দিয়েছে নিখিল। তারপর ওই লেক রোডেই একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে সংসার পেতেছে।

এই গেল আদি পর্ব।

পরের পর্বে দেখা গেল খিটিমিটি লেগেছে দুজনের মধ্যে। নিভা রূপসি হতে পারে, নিভা চটুলাও হতে পারে, নিভা ময়ূরী হতে পারে—কিন্তু নিভার ভেতরে আছে এমন কয়েকটা বদ বাতিক, যা নিয়ে সুখী হওয়া যায় না। সেই সঙ্গে আছে প্যানপেনে কান্না। যখন তখন।

দুদিনেই অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে নিখিল। মনের রং ছুটে গেল কয়েক মাসেই। তারপর পালাই-পালাই রব উঠল মনের কোণে-কোণে।

এবার আসা যাক শেষ পর্বে।

এয়ারপোর্টে এসে পৌঁছল নিখিলের গাড়ি। ইঞ্জিন বন্ধ করতেই ফোঁস-ফোঁস করে ফের কেঁদে উঠল নিভা। নিখিলের মনে হল, প্রচণ্ড ক্রোধে বুঝি ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে যাচ্ছে। অতি কষ্টে সামলে নিল নিজেকে।

বলল, 'নিভা, মনকে ঠিক কর। মায়ের ডাকে যাচ্ছ মায়ের কাছে এক মাস জিরেন নিতে। প্রথমে লাফিয়ে উঠেছিলে যাওয়ার জন্যে—তারপর বেঁকে বসলে না যাওয়ার জন্যে। এখন আবার শুরু করলে কান্নার সেই ছেঁদো নাটক। কী চাও? যাবে, না যাবে না?'

'আ-আমি যাব...না, যাব না।'ফোঁপানির মধ্যেই নিভা যা জানাল তার কোনও মানেই হয় না।

হাল ছেড়ে দিল নিখিল। একী গেরো রে বাবা! মাথা হেলিয়ে দিয়ে কটমট করে চেয়ে রইল গাড়ির ছাদের দিকে। সেকেন্ড কয়েক পরেই ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মতো হঠাৎ সিধে করল শিরদাঁড়া—টংকার শোনা গেল কম্বু কণ্ঠে।

'নিভা তুমি যাচ্ছ। গেট রেডি।'

ঘটাং করে দরজা খুলে নেমে পড়ল নিখিল। গাড়ির পেছনে গিয়ে আরও জোরে শব্দ করে খুলল ট্রাঙ্কের ডালা। কুলি সামনেই দাঁড়িয়েছিল রামভক্ত হনুমানের মতো। হেঁকে বলল নিখিল, 'দুটো সুটকেশ। বোম্বাই ফ্লাইট। জলদি।'

'আমার জুয়েল বক্স? গাড়ির ভেতর থেকে যেন আর্তনাদ করে উঠল নিভা।

'পেছনের সিটে ব্রিফকেশের মধ্যে। মনে নেই গতবার দিল্লি থেকে জুয়েল বক্স কোলে নিয়ে ফেরবার পর কী কাণ্ড ঘটেছিল? জুয়েলভরতি বক্স সিটে রেখেই তো নেমে এসেছিলে। এবার তাই ব্রিফকেসের মধ্যে রইল তোমার সাধের রত্নবাক্স। বুঝেছ?' রেগে তিনটে হয়ে বলল নিখিল।

কুলি ইতিমধ্যে সুটকেশ দুটো বগলদাবা করে এগিয়েছে। নিখিলও গেল পেছনে। কাচের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢোকার আগে পেছন ফিরে দেখল গাড়ির মধ্যে বসে তখনও রুমাল দিয়ে চোখ মুছছে নিভাননী ওরফে নিভা।

'ডিসগাস্টিং!' বলেই সামনে ঘাড় ফেরাল নিখিল। কাচের কপাটে প্রতিফলিত আপন মুখচ্ছবি দেখে নিজেই চমকে উঠল। কাগজের মতো সাদা হয়ে গিয়েছে সে মুখ।

নিভার হাতে টিকিট গছিয়ে দিয়ে নিখিল বললে, 'তোমাকে আর একটা জিনিস দিতে বাকি রইল। তোমার রত্নবাক্সর চাবি। এই নাও।' বলে রূপোর চেনে গাঁথা সোনার চাবিটা নিভার গলায় লকেটের মতো ঝুলিয়ে দিল নিখিল। 'এতক্ষণ দিইনি হারিয়ে ফেলবে বলে। জুয়েল বক্স খুলবে বাড়ি গিয়ে—বোম্বাইতে। তার আগে নয়। কেমন?' দু-হাতের মধ্যে নিভার শ্যামল মুখশ্রী কাছে টেনে নিল নিখিল। এদিক-ওদিক দেখে টুক করে মুখ চুম্বন করে বলল, 'বিদায় ডার্লিং, বিদায়।'

আবার কেঁদে উঠল নিভা। বিদায়কালীন শেষ চুম্বনে কী জাদু ছিল কে জানে, নিভা আর নিজেকে রুখতে পারল না। লাজলজ্জা ভুলে গলা জড়িয়ে ধরল নিখিলের।

একরকম জোর করেই নিজেকে ছাড়িয়ে নিল নিখিল। ঠেলে দিল নিভাকে দণ্ডায়মান উড়োজাহাজের দিকে। কাঁদতে-কাঁদতে এগুলো নিভা। এয়ারপোর্টের জোর হাওয়ায় নিশানের মতো উড়তে লাগল ওর ব্লু জর্জেটের আঁচল।

শেষদৃশ্য—বলল নিখিলের মন।

কয়েক মিনিট পর।

গাড়িতে এসে বসল নিখিল। মনটা বলাকার মতো পাখা মেলে উড়ে যেতে চাইছে সুনীল গগনে। মুক্তি! মুক্তি! চিরমুক্তি!

ইঞ্জিন গর্জে উঠেছে। ওর এক্সপার্ট হাতের মোচড়ে প্রবল পাক খেয়ে গাড়ি ছুটেছে এয়ারপোর্টের বাইরে। ভি-আই-পি রোডে এসে সিগারেট নিতে সামনের খোপে হাত দিল নিখিল। হাতে ঠেকল একটা ভাঁজ করা কাগজ।

লাল কাগজ। চিঠি। লিখেছে নিভা।

'প্রিয়তম,

আমি জানি তুমি আর আমাকে চাও না। কিন্তু বিশ্বাস কর আর নাই কর–আমি তোমাকে ভালোবাসি। বোম্বাই থেকে ফিরে এসে তোমাকে আর দেখতে পাব কি না জানি না। কিন্তু আমার ভালোবাসার চিহ্ন স্বরূপ তোমার দেওয়া জুয়েল বক্স তোমাকেই দিয়ে গেলাম। ফের যদি বিয়ে করতে মন চায় তো আমার সতীনকে দিও।

নিভা।'

আঁতকে উঠল নিখিল। জুয়েল বক্স! গাড়ির মধ্যে!

ব্রেক কষল তৎক্ষণাৎ। কিন্তু কোথায়...কোথায় সেই জুয়েল বক্স?

সময় নেই...আর সময় নেই...নিজের হাতে জুয়েল বক্সের মধ্যে টাইম ফিউজ বোমা রেখেছে নিখিল...উড়ন্ত অবস্থাতেই যাতে প্লেন ফেটে উড়ে যায়—যাতে প্লেনের মধ্যে নিভাননীর নরম তনুটা ছিঁড়ে পুড়ে টুকরো-টুকরো হয়ে শূন্যে ছড়িয়ে যায়—তাইতো তার সাধের রত্নবাক্সের মধ্যে টাইমবোমা রেখেছিল নিখিল। তারিফ করার মতো বউ নিধনের পরিকল্পনা কি শেষে বুমেরাং হয়ে যাবে? জুয়েল বক্স ফাটবে তারই গাড়ির মধ্যে —সেই সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হবে নিখিল?...

কোথায় জুয়েল বক্স? কোথায় সেই অভিশপ্ত জুয়েল বক্স?

বিদ্যুৎ চমকের মতো এতগুলো ভাবনা ঝলসে উঠল মনের আকাশে।

বিস্ফোরণটা ঘটল সঙ্গে-সঙ্গে।

গাড়ি আর নিখিলের দেহ অনেক টুকরো হয়ে ছড়িয়ে গেল রাস্তার দুপাশে।

*অপ্রকাশিত।

হীরক বন্দরের হিরের কলম

সিনথিয়া উল্কাবেগে ঘরে ঢুকে বললে, 'আপনিই তো ইন্দ্রনাথ রুদ্র? একটু আগে আপনিই তো টেলিফোন ধরেছিলেন? হাঁ করে তাকিয়ে দেখছেন কী?

'দেখছি স্টার অ্যাকট্রেস-কে। হ্যাঁ, আমিই ফোন ধরেছিলাম। আপনার কলম চুরি গেছে—আমাকে উদ্ধার করে দিতে হবে, এই তো? আমার সময় নেই।'

ইন্দ্রনাথের গা-ঘেঁষে সোফায় বসে পড়ল বিখ্যাত চিত্রতারকা সিনথিয়া। নামটা ইংরেজি হলেও মেয়েটা খাঁটি বাঙালি। চেহারায়, পোশাকে, কথায়।

'সময় আপনাকে করতেই হবে। কলমের বাতিক আমার নেই। কিন্তু জড়োয়া কলমদের কোন মেয়ে ভালোবাসে না?'

'জড়োয়া কলম?'

'ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। রত্ন বসানো মোগল আমলের কলম, হিরে বসানো নিরেট সোনার কলম, জুয়েল সেট করা ডাইনোসর কলম—মোট তেরখানা এইরকম কলম। দাম শুনলে আপনার মাথা ঘুরে যাবে, তাই বলব না। আপনার মাথা ঘুরে গেলে আমার জুয়েল পেন আর ফিরে আসবে না। জুয়েল পেন ফিরে না এলে আমার মাথা কাটা যাবে। চন্দ্রকান্ত ভরদ্বাজ আমাকে চোর বলবে। বলবে, বউ হব বলে ভড়কি দিয়ে কলমগুলো হাতিয়ে নিয়ে আর বউ হতে চাইছি না। কুৎসা ডালপালা মেলে ছড়িয়ে পড়বে। মিস্টার ইন্দ্রনাথ রুদ্র, আমাকে বাঁচান।' বলে ইন্দ্রনাথের দুহাত জড়িয়ে ধরল সিনথিয়া।

ইন্দ্রনাথ বললে, 'দেখুন, আমি ব্যাচেলর মানুষ। মেয়েরা আমাকে ছুঁয়ে ফেললে আমার সব গোলমাল হয়ে যায়। আপনি একটু সরে বসুন।'

ঝট করে সরে বসে, তর্জনি তুলে, শাসনের চোখে সিনথিয়া বললে, 'তাহলে খুঁজে দেবেন?'

'চন্দ্রকান্ত ভরদ্বাজ লোকটা কে?'

'আপনি কোন জগতের লোক? ভরদ্বাজ স্টুডিওর নাম শোনেননি? ডায়মন্ডহারবারের ফেমাস স্টুডিও। লেটেস্ট স্টুডিও। টেলিফিল্ম তোলার এমন জায়গা গোটা কলকাতায় আর নেই। স্টিভেন স্পিলবার্গ বর্তে যেতেন এই স্টুডিওর সন্ধান পেলে। ওঁর লেটেস্ট ফিল্ম 'দ্য লস্ট ওয়ার্ল্ড' এখানেই তুলতেন।'

মিনমিন করে ইন্দ্রনাথ বললে, 'দ্য লস্ট ওয়ার্ল্ড তো টেলিফিল্ম নয়।'

'ওটা কথার কথা। মুম্বাইতে হিরের বিজনেস করে বাংলার জুয়েল চন্দ্রকান্ত ভরদ্বাজ এবার হলিউড-টলিউড-বলিউড-এর সঙ্গে পাল্লা দিতে নেমেছে। এতবড় খবরটা আপনার জানা উচিত ছিল।'

কাষ্ঠ হেসে ইন্দ্রনাথ বললে, 'এই ব্যক্তির সঙ্গে ঘর করবেন ঠিক করেছিলেন?'

'তাহলে আর বলছি কী। আমার নাম সিনথিয়া—যেখানে সেখানে নিজেকে বাঁধি না। এনগেজমেন্ট পর্যন্ত হয়ে গেছিল। সব্বাই জেনে গেছে, আমিই ভরদ্বাজের বাগদত্তা। গতকাল ভেঙে গেল এনগেজমেন্ট। ভীষণ রাফ। আমিও কম যাই না। বিয়েই করব না অমন রাফ রাস্কেলকে। তাই আজ হিরের প্রেজেন্টেশনগুলো সব নিয়ে গেছিলাম ফিরিয়ে দেব বলে। একটা শুটিং শেষ করে গ্রিনরুমে ফিরে এসে দেখি সব লোপাট। এখন তো ভরদ্বাজ আমাকে ছেড়ে দেবে না। জিনিসগুলোও স্রেফ হিরে মুক্তো চুনি পান্না সোনাদানা নয়। আমি একটু কবিতা-টবিতা লিখি বলে, রাইটার্স এগজিবিশন থেকে বেছে-বেছে শুধু জুয়েল পেন কিনে আমাকে প্রেজেন্ট করেছিল ভরদ্বাজ। মিস্টার ইন্দ্রনাথ রুদ্র, প্লিজ রিকভার দ্য লট। আই উইল পে ইউ এ লট।'

'থ্যাংক্স এ লট।' এই পর্যন্ত বলেছে ইন্দ্রনাথ। এমন সময় বাজল টেলিফোন। রিসিভার তুলল ইন্দ্রনাথ। তারের মধ্যে দিয়ে ভেসে এল কর্কশ কণ্ঠস্বর, 'মি: শার্লক নাকি?'

ইন্দ্রনাথ বললে, 'অধমের নাম ইন্দ্রনাথ রুদ্র।'

'সেটা জেনেই ফোন করা হচ্ছে।' দম্ভ ফেটে-ফেটে পড়ছে উচ্চারণ ভঙ্গিমায়। এক শ্রেণির লোক আছে, যারা মনে করে পৃথিবীটা তাদের পায়ের তলায়। তারা এইরকম গলায় কথা বলে, 'মি: শার্লক, সিনথিয়া আপনার কাছে গেছে?'

'আপনাকে বলে এসেছে নাকি?' বলে, সিনথিয়ার দিকে চাইল ইন্দ্রনাথ। কৃত্রিম ত্রাসে চক্ষু বিস্ফারিত করল সিনথিয়া।

দুম-দুম করে দম্ভের বোমা ফাটিয়ে-ফাটিয়ে বললে দাম্ভিক লোকটা, 'নিশ্চয় পিণ্ডি চটকাচ্ছে আমার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিই সেই রাফ রাস্কেল চন্দ্রকান্ত ভরদ্বাজ। সব ব্যাচেলরের ওপরেই ওর একটু দুর্বলতা আছে। আপনার ওপরও। সেটা জেনেই ফোন করা হচ্ছে। আপনি তো নামকরা টিকটিকি। ভালো পয়সা পাবেন। এখানে একটা খুন হয়েছে। খুনিকে ধরে দিন।'

ইন্দ্রনাথের গলায় আওয়াজ এবার বদলে গেল। চাইল সিনথিয়ার দিকে। বললে মাউথপিসে, 'কলম চুরির পরেই মানুষ খুন। কে খুন হয়েছে?'

'সেটা সিনথিয়াকে নিয়ে এসে দেখে যান। চেনা মাল। ও তো নিজেই গাড়ি হাঁকিয়ে গেছে। ওর গাড়িতেই চলে আসুন। ছাড়লাম।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে ইন্দ্রনাথ বললে, 'খুন যে হয়েছে, তাকে আপনি চেনেন? এই গেল এক নম্বর। নম্বর দুই প্রশ্ন, ড্রাইভার ছাড়াই এতটা পথ ড্রাইভ করে এলেন?'

'তাকে খুঁজেই পেলাম না। কিন্তু কে খুন হল?'

'গিয়ে দেখা যাক।'

গাড়ি একখানা কিনেছে বটে সিনথিয়া। ভেতরে বসে মনে হবে যেন ছোটখাটো একটা পাঁচতারা হোটেল। সিনথিয়া গাড়ি চালায়ও ভালো। বেলেঘাটার সুভাষ সরোবর থেকে ডায়মণ্ডহারবারে উড়ে গেল পক্ষিরাজের বেগে—নি:শব্দে।

যাওয়ার পথে তন্ময়চিত্ত সিনথিয়াকে খানকয়েক জুতসই প্রশ্ন করেছিল ইন্দ্রনাথ। যেমন, খুন যে হয়েছে, সে নাকি সিনথিয়ার 'চেনা মাল'। চন্দ্রকান্ত ভরদ্বাজের ভাষায়। তার মানে, মরে গিয়েও লোকটা ভরদ্বাজের দু-চোখের বিষ হয়ে আছে। এবং তাকে চেনে সিনথিয়া। সে কে হতে পারে?

জেরায় কোণঠাসা হয়ে গিয়ে সিনথিয়াকে বলতেই হল, 'একটা লোকই চন্দ্রকান্ত ভরদ্বাজের দুচোখের বিষ হয়েছিল। সিনথিয়ার ড্রাইভার।'

'কেন?' ইন্দ্রনাথের সপেটা প্রশ্ন।

'জেলাসি;' সিনথিয়া রাস্তার দিকে চেয়েই বলে গেল।

'ড্রাইভারের সঙ্গে প্রেম-ট্রেম ছিল?'

'চন্দ্রকান্তর সন্দেহ হয়েছিল। গতকাল তুলকালাম কাণ্ড হয়ে গেল তো এই নিয়েই। দুর্যোধনের স্ক্রিন টেস্টের কথা বলতেই জ্বলে উঠল চন্দ্রকান্ত। ড্রাইভার হলেও সে তো মানুষ। দেখতে শুনতেও খারাপ নয়। চান্স যদি পায়, অনেক কিছু করতে পারে। ট্যালেন্ট সার্চ করতে জানে না চন্দ্রকান্ত। স্টুপিড। ডায়মণ্ড ছাড়া কিছু চেনে না।'

'তাই ডায়মন্ডহারবারে খুলেছে স্টুডিও। হীরক বন্দর। কিন্তু এত জায়গা থাকতে হীরক বন্দরকে পছন্দ হল কেন? সল্টলেকে তো অনেক সুবিধে।'

'সেখানেও তো রয়েছে কুমতোলব।'

'যেমন?'

'যত রিসর্ট তো এই ডায়মন্ডহারবারেই। কলকাতা থেকে গিয়ে এক রাতের ফুর্তি সেরে ভালোমানুষের মতো ফিরছে কলকাতায় যে যার বাড়ি। উচ্ছন্নে গেছে দেশটা। উচ্ছন্নে পাঠাচ্ছে এই চন্দ্রকান্তর মতন স্কাউন্ড্রেলরা। স্টুডিওর একপাশে রেখেছে রিসর্ট। বার। জুয়োর আড্ডা। সবই বেআইনি। কিন্তু ম্যানেজ করে চলেছে চন্দ্রকান্ত। ওইজন্যেই তো খুনের খবর আগে পুলিশকে না দিয়ে দিল আপনাকে।'

'পুলিশকে দেয়নি জানছেন কী করে?'

'চন্দ্রকান্তকে আমি হাড়ে-হাড়ে চিনে ফেলেছি। গরিলার বাচ্চা কোথাকার! লাশ পর্যন্ত উড়িয়ে দিতে পারে।'

'এই লাশটা কি দুর্যোধনের বলে মনে হয়?'

'হলে আশ্চর্য হব না।'

'কদ্দিন গাড়ি চালাচ্ছে আপনার?'

'বছরখানেক। চন্দ্রকান্তই দিয়েছে। স্লট মেশিনে জুয়োর আড্ডায় ঢুকিয়েছিল নিজের লোক। খুব বিশ্বাস করে। আমার গাড়ির ভার ওকে দিয়েছে তো ওই মতলবেই। আমি এদিক ওদিক করলে খবর যেন পায় চন্দ্রকান্ত। জানেন তো ড্রাইভারগুলোই হয় স্পাই।'

'চন্দ্রকান্তর লোক দুর্যোধন? জুয়ো খেলার স্লট মেশিনের নাড়ি নক্ষত্র জানে?'

'হ্যাঁ।'

'পুরো নাম কি দুর্যোধন পাড়োয়াল?

এইবার চকিতে ইন্দ্রনাথের দিকে চোখ ফিরিয়েই ফের রাস্তার দিকে তাকাল সিনথিয়া, 'চেনেন মনে হচ্ছে?'

'এ নাম একবার শুনলে ভোলা যায় না। নামের জন্য অনেকে বিখ্যাত হয়ে থাকে। দুর্যোধন পাড়োয়াল বিখ্যাত আর এক কারণে। জানেন কী কারণে?'

'সত্যি জানি না।'

'বছরতিনেক আগে জলপাইগুড়ি জেলের পাঁচিল টপকে পালিয়েছিল দুর্যোধন। অদ্ভুত বুদ্ধি খাটিয়ে। জেলখানায় ইলেকট্রিক্যাল কানেকশনের জন্যে এখানে সেখানে পড়েছিল লোহার পাইপ। সেইসব পাইপ একটা-একটা করে জেলখানার ভেতরেই বাথরুমের পেছনে ফাঁকা জায়গায় জড়ো করেছিল দুর্যোধন। জেলখানার গুদোমে ছিল নুনের বস্তা। নাইনলের দড়ি খুলে নিয়েছিল সেইসব বস্তা থেকে। লোহার পাইপগুলোকে পরপর বেঁধে তৈরি করেছিল সিঁড়ি। এই সিঁড়ি বেয়ে জেলখানার চোদ্দো ফুট পাঁচিল টপকেছিল দুর্যোধন।'

'ব্রিলিয়ান্ট ব্রেন।' ফস করে বলে ফেলেই সামলে নিল সিনথিয়া, 'পুলিশ আর ওকে ধরতে পারেনি?'

'পুলিশের কত কাজ। ইন্ডিয়াটা বিরাট। যেন উবে গেছিল দুর্যোধন পাড়োয়াল। এখন তো দেখছি জহুরী চন্দ্রকান্ত ঠিক জহর চিনেছে।'

নাকের পাটা শক্ত করে সিনথিয়া বললে, 'নইলে ক্রাইমের ব্যাবসা চালাবে কী করে?'

সমুদ্র নীল পোশাক পরা অপরূপা সিনথিয়ার সামনে চন্দ্রকান্ত ভরদ্বাজকে গরিলার বাচ্চার মতনই লাগছিল। বিশেষণটা মন্দ দেয়নি সিনথিয়া।

ওরা এখন দাঁড়িয়ে আছে চন্দ্রকান্তর খাস কামরায়। দরজায় দাঁড়িয়ে রিভলভার হাতে চন্দ্রকান্তর দেহরক্ষী। তার গায়ের রং কষ্টি পাথরকে হার মানায়। বসনও কুচকুচে কালো। দেখলে ভয় হয়। এই মুহূর্তে তার মাথায় বিরাট ব্যান্ডেজ। হঠাৎ দেখলে মনে হবে শিখদের পাগড়ি।

অঘটনের পর অঘটন ঘটে চলেছে এখানে। হিরের কলম চুরি গেছে। জুয়ো খেলার ঘরের সামনে মুখোশধারী দুজন দুশমন দুর্যোধনের খুলি চুরমার করেছে, ব্ল্যাক কমান্ডোর আয়ু ছিল বলে মাথায় ডাণ্ডা খেয়েও বেঁচে আছে।

পুরো স্টুডিও আর রিসর্ট এরিয়া পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না। যেন, চায়না টাউন। জবরদস্ত সিকিউরিটি এজেন্সির হাতে পাহারাদারির ভার তুলে দিয়েছে চন্দ্রকান্ত। নিকষকালো এই ব্ল্যাক কমান্ডোই সিকিউরিটি চিফ। তার নাম অর্জুন পাণ্ডে।

এইমাত্র ঘটনা পরম্পরাগুলো তিনজনের মুখে শুনে নিয়েছে ইন্দ্রনাথ। অর্জুন কালো পাথরের থামের মতোন দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ইন্দ্রনাথ, গিলে করা অর্গ্যান্ডির পাঞ্জাবি আর চুনোট করা ধুতির বাবুয়ানি দেখে মনে হতে পারে হিরোর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেই তার আগমন ঘটেছে স্টুডিওতে। ইন্দ্রনাথের একপাশে গোল কাঁধ আরও গোল করে আর বিশাল লম্বা হাত দু-খানা প্রায় হাঁটু পর্যন্ত ঝুলিয়ে গনগনে চোখে সিনথিয়ার দিকে চেয়ে আছে চন্দ্রকান্ত ভরদ্বাজ। সিনথিয়াও তার অনিন্দ্যসুন্দর চক্ষুরত্ন দুটোকে একজোড়া মরকত গুলি বানিয়ে চেয়ে আছে চন্দ্রকান্তর দিকে। এই মুহূর্তে তার হাতে এসে গেছে আর একটা বস্তু। একটা ছোট্ট রিভলভার। ডান হাতে অস্ত্রটাকে বাগিয়ে ধরে চন্দ্রকান্তর দিকে নলচে ফিরিয়ে নাচাচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে, 'দুর্যোধনকে তুমিই খুন করেছ, ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে গিয়ে—ইউ মার্ডারার।'

ইন্দ্রনাথ খুব ঠান্ডা গলায় বললে, 'এই কোঁদলের মধ্যে আমাকে টেনে আনার দরকার ছিল না। লেডি সিনথিয়া, এই মাত্র কী শুনলেন? আপনি যখন শুটিংয়ে ক্যামেরার সামনে, তখন দুর্যোধন পা টিপে-টিপে, চোরের মতন এদিক-ওদিক দেখতে-দেখতে গ্রিনরুমে ঢুকছিল। অর্জুন পাণ্ডে, আপনি দেখেছিলেন?'

কষ্টিপাথর অর্জুন বললে পাথুরে গলায়, 'ওইভাবে ঢুকতে দেখেই তো আমার খটকা লেগেছিল। কিন্তু তা নিয়ে ভাবিনি। তারপর যখন সিনথিয়া দেবী গ্রিনরুমে ঢুকেই গলা চিরে চিৎকার করে উঠলেন, তখনই বুঝলাম, হিরের কলম চুরির মতোলবেই গ্রিনরুমে ঢুকেছিল দুর্যোধন। তখুনি দৌড়লাম তার খোঁজে। দেখলাম, ডেডবডি মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে জুয়ো ঘরের দরজার সামনে। মাথার ঘিলু বেরিয়ে এসেছে ভাঙা করোটির ফাঁক দিয়ে। পকেটে কিন্তু হিরের কলম নেই। ভাবলাম, জুয়ো ঘরের মধ্যে রেখেছে। ঢুকতে যাচ্ছি, মাথায় পড়ল ডাণ্ডা। জ্ঞান হারানোর আগে দেখেছিলাম কালো মুখোশ পরা দুটো লোককে। নেহাত নিরেট মাথা, তাই বেঁচে গেছি। স্যার, চোরের ওপর বাটপারি হয়েছে। গ্রিনরুম থেকে চুরি করেছে দুর্যোধন, দুর্যোধনকে খতম করে হিরে নিয়ে পালিয়েছে দুই দুশমন।'

ইন্দ্রনাথ জিগ্যেস করল, 'লেডি সিনথিয়া, ট্রিগার থেকে আঙুলটা সরিয়ে কথা বলুন। গাড়িতে আসবার সময় দুর্যোধনকে বলেছিলেন হিরের কলমের কথা?'

'কেন বলব না?' ফোঁস করে উঠল সিনথিয়া, 'বিয়েই যখন করব না, তখন প্রেজেন্টেশন কাছে রাখতে যাব কেন? ঢাক পিটিয়ে ফেরত দেব সবার সামনে। তাই বলেছিলাম।'

'বেশ করেছিলে।' গরগর করে উঠল চন্দ্রকান্ত, 'একটা চোরের সঙ্গে লটর-ঘটর করতে গেছিলে। ইউ ন্যাস্টি গার্ল। দাও আমার ডায়মন্ড।'

'এই নাও তোমার ডায়মন্ড।' বলেই চন্দ্রকান্তর দিকে ছোট্ট রিভলভার তুলল সিনথিয়া।

'খবরদার,' বলে হেঁকেই গুলি চালাল অর্জুন পান্ডে, অবশ্য সিলিং লক্ষ করে। কিন্তু তাইতেই ভড়কে গিয়ে সত্যি-সত্যিই ফায়ারিং করল সিনথিয়া—অর্জুনকে লক্ষ করে। আনাড়ি হাতের গুলি লাগল অর্জুনের হাতে, রিভলভার গেল ছিটকে। গুলিবিদ্ধ হাত ঝাড়তে-ঝাড়তে মেঝেতে পড়ে থাকা রিভলভারের দিকে লাফিয়ে যেতেই ধুতি পাঞ্জাবি পরা ইন্দ্রনাথ চিতাবাঘের মতোন লাফিয়ে গিয়ে মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিল রিভলভারটা। বললে, 'তিষ্ঠ, তিষ্ঠ, অর্জুন পাণ্ডে। মাথার ব্যান্ডেজটা অত আনাড়ি ভাবে বাঁধা কেন বৎস? নিজের বাঁধা, না ডাক্তারের হাতে বাঁধা?'

থতমত খেয়ে গেল কষ্টিপাথর কমান্ডো চিফ। তেড়ে আসতে গিয়েও থমকে গেল। কেননা, তার এক হাতের মধ্যে দিয়ে গুলি ঢুকে বেরিয়ে গেছে—ইন্দ্রনাথের হাতের রিভলভার কিন্তু টিপ করে রয়েছে তার দিকেই।

সুতরাং সে জবাব না দেওয়াটাই বাঞ্ছনীয় মনে করল।

চোখ তার দিকেই রেখে চন্দ্রকান্তকে বললে ইন্দ্রনাথ, 'অনুগ্রহ করে আপনার দেহরক্ষীর মাথার পাগড়িটা খুলবেন?'

নীরবে হুকুম তামিল করে গেল গরিলা-তনয়সম চন্দ্রকান্ত ভরদ্বাজ। অনেকগুলো ফেটি খুলে আনবার পর ব্যান্ডেজ দিয়ে তৈরি গোটা পাগড়িটা খসে এল হাতের মধ্যে।

দেখা গেল, অর্জুন পাণ্ডের মাথা বিলকুল অক্ষত। ডাণ্ডা-ফাণ্ডা কিছুরই চোট পড়েনি মাথায়।

মিহি গলায় বললে ইন্দ্রনাথ, 'এই সন্দেহটাই করেছিলাম আনাড়ি হাতের ব্যান্ডেজ দেখে। ঠিক যেন পাগড়ি। মিস্টার চন্দ্রকান্ত ভরদ্বাজ, চোরের ওপর বাটপারি করেছে আপনার সবচেয়ে কাছের লোক—এই দু:শাসন, ইয়ে অর্জুন পাণ্ডে। দুর্যোধনের অতীত ভালো নয়। হিরের কলমের লোভ সে সামলাতে পারেনি। লেডি সিনথিয়া কখন ক্যামেরার সামনে থাকবে সে জানত। সেই ফাঁকে হিরে হাতিয়েছে, কিন্তু নিজের কাছে রাখেনি। লুকিয়ে রেখে যখন বেরিয়ে আসছে, তখন আপনার কমান্ডো চিফ আগে তার মাথা ছাতু করেছে, তারপর পকেট সার্চ করেছে, হিরে পায়নি। জুয়োর ঘরে সার্চ করেও হিরে পায়নি।

'তখন মুখোশধারী দুই হানাদারের গল্প শুনিয়েছে, দুর্যোধনকে খতম করে হিরে হাতিয়ে নিয়ে তারাই চম্পট দিয়েছে। কিন্তু হিরের কলম আছে এই স্টুডিওর মধ্যেই। কোথায় আছে, তাও আন্দাজে বলতে পারি।'

'কোথায়?' বিচ্ছিরি কর্কশ গলায় বলল চন্দ্রকান্ত।

'আপনার প্রিয় দুর্যোধন কোন বিষয়ে এক্সপার্ট ছিল? জুয়ো খেলার স্লট মেশিনে। এই মেশিনগুলো এক একটা আয়রন সেফের মতন। কম্বিনেশন লক তো থাকেই—আরও অনেক কিছু জানতে হয়। তবেই টাকা বেরোয় মেশিনের ভেতর থেকে। ঠিক বলছি?'

'বলছেন।'

'আপনি জানেন আটটা মেশিনের কম্বিনেশন লকের সিক্রেট?'

'জানি।'

'খুলতে পারেন আয়রন সেফের প্লেট?'

'পারি।'

'চলুন তাহলে খোলা যাক। অর্জুন পাণ্ডে, দু-হাত মাথার ওপর রেখে সামনে-সামনে চল। অনেক কমান্ডো নাচিয়েছি, তোমাকে শুইয়ে দেব। খেল দেখাতে যেও না।'

জুয়োর ঘর। পাশাপাশি সাজানো আটটা স্লট মেশিন। একটার মধ্যে পাওয়া গেল তেরটা হিরের কলম।

ঠিক সেই সময় একটা অত্যন্ত অশোভন আচরণ করে বসল সিনথিয়া। হাতের রিভলভার ফেলে দিয়ে দু-হাতে জাপটে ধরল চন্দ্রকান্তকে এবং ভেঙে পড়ল অকৃত্রিম এবং অনাটকীয় কান্নায়, 'আমার ভুল হয়েছে, আমার ভুল হয়েছে।'

দু-চোখ বুঁজে সিনথিয়ার মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে চন্দ্রকান্ত বললে, 'ওরকম হয়, ওরকম হয়...যত রাগ, তত ভাব।'

** 'স্বস্তিকা' পত্রিকায় প্রকাশিত (পূজা সংখ্যা, ১৪০৪)।*

ব্রেন ডিটেকটিভ

বাইশটা টেলিভিশন আমার সামনে অর্ধচন্দ্রাকারে সাজানো রয়েছে। রাডারও বলা চলে। এদের কাজই নাকি তাই। বায়োর‍্যাডিয়েশন অর্থাৎ চিন্তাকে লুফে নিয়ে ফুটিয়ে তোলা পরদার বুকে। দেখানো রঙের খেলা। সেই সঙ্গে উত্তাল সঙ্গীত।

ঘরটা বেশ বড়ই। ডক্টর বাসু মিত্রের গবেষণা কক্ষ। ঘরভরতি মেশিনের সব মেশিন আমি নিজেও চিনি না। যদিও আমি ডাক্তার, ইলেকট্রো-এনকেফালোগ্রাফিক চার্টটা চিনতে পারছি। কিন্তু তার পাশে যেসব কিম্ভুতকিমাকার মেশিন পরিপাটিভাবে সাজানো, তাতে শ'য়ে-শ'য়ে রেডিও টিউব দেখতে পাচ্ছি। শ'য়ে-শ'য়ে প্যানেলও রয়েছে ঘরময়। দেখেশুনে হঠাৎ মনে হবে বেশ কয়েকজন সুদক্ষ অপারেটর দরকার এসব মেশিন চালানোর জন্যে।

কিন্তু মনে হওয়াটা যে মিথ্যে, তা একদিন কাজের সময়ে ঘরে ঢুকলেই বোঝা যাবে। টাকমাথা প্রৌঢ় ডক্টর বাসু মিত্র একাই অপারেট করেন যাবতীয় মেশিন। বহু মেশিন তিনি নিজে বানিয়ে নিয়েছেন। ভদ্রলোক কদাকার। ছেলেবেলায় পড়ে গিয়ে পিঠ বেঁকে গিয়েছিল—সেই থেকে কুঁজো। মুখে অজস্র আব—হঠাৎ দেখলে ভয় হয়। আব ঝুলছে হাত থেকে, ঘাড় থেকে, কপাল থেকে, চিবুক থেকে। আবের জঙ্গলের মধ্যে চোখ জোড়া কিন্তু আশ্চর্য সুন্দর। স্বপ্নময়, উদাস এবং আত্মনিমগ্ন।

বাসু মিত্র সত্যই ভোলা মহেশ্বর। মালা মিত্র তাঁর পার্বতী। উমার মতোই পরমাসুন্দরী। বয়সের তফাত বিশ বছরের। মালা শুধু রূপসি নয়—গুণবতীও। রেডিও, মিউজিক কনফারেন্স, ছায়াছবি—সব মহলে সে নাইটিঙ্গেল আখ্যা পেয়েছে তার সুরেলা কণ্ঠের জন্যে। মালা মন দিয়ে গান গাইলে শুকনো আকাশে বৃষ্টি ঝরতে পারে—মোমবাতিতে আগুন লাগতে পারে।

এ-সব অবশ্য স্তাবকদের প্রশস্তি। মালা মিত্র ভ্রূক্ষেপ করে না। বাসু মিত্র নাকি তাঁর গান শুনেই বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু এখন শোনেন না। মালার সঙ্গে সব দিন দেখাও হয় না...গবেষণা কক্ষে রাত কাটান।

আমি বিলেত ফেরত ডাক্তার। ব্রেন স্পেশালিস্ট। বিলেতে থাকতেই কয়েকটা পেপারে তাঁর প্রবন্ধ পড়েছিলাম। মানুষের মস্তিষ্ক আজও চিররহস্যে ঘেরা। তিনি সেই মস্তিষ্ক নিয়েই গবেষণা করছেন। ফিংগার প্রিন্ট আর ব্রেনপ্রিন্ট—দুটো দিয়েই নাকি ক্রিমিন্যাল ধরা যায়। ফিংগারপ্রিন্ট যেমন অপরাধীদের সনাক্ত করে—ব্রেনপ্রিন্টও তেমনি ব্রেনের গন্ডগোলের খবর দিতে পারে।

পশ্চিমের প্রেসে ডক্টর বাসু মিত্রকে নিয়ে তাই কার্টুন আর ব্যঙ্গ বেরিয়েছিল। ব্রেন ডিটেকটিভ—এই আখ্যা পেয়েছিলেন তিনি। দেশে ফেরার পর সুযোগমতো গেলাম তাঁর বাড়ি। আলাপ করলাম। এবং দুটি জিনিস ভালো লাগল।

একটি তাঁর টপোস্কোপি—অর্থাৎ বাইশটা টেলিভিশন সমন্বিত ব্রেন ডিটেকটিভ মেশিন। দ্বিতীয়টি মালা মিত্র।

বাসু মিত্রের বাড়ি যাওয়া বেড়ে গেল এরপর থেকে টপোস্কোপির জন্যে নয়—মালার জন্যে। মালার গান শুনতে, ওর সঙ্গে কথা বলতে। বাসু মিত্রের সঙ্গে অর্ধেকদিন দেখাই হত না। উনি গবেষণাকক্ষে বসে টপোস্কোপি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। ব্রেনের ইলেকট্রিক্যাল রিদমকে উনি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক মেশিনের মধ্যে দিয়ে এনে ইলেকট্রন গ্যাজেটের ভেতরে চালান করে ফ্ল্যাশ আর সাউন্ডে রূপান্তর করতে পেরেছেন। এখন চাইছেন চিন্তা অর্থাৎ বায়োর‍্যাডিয়েশনকে যন্ত্রের মধ্যে টেনে আনতে।

আমি ব্রেন স্পেশালিস্ট বলেই বুঝেছিলাম, আবিষ্কারটা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমার ব্রেন তখন অন্য বিষয়ে নিমগ্ন—মালা একটু-একটু করে যেন আমাকে সম্মোহিত করে ফেলছিল। আমি বিলেতে দশবছর ছিলাম। বহু মেয়ের সঙ্গে মিশেছি। কিন্তু মালার মতো কেউ আমাকে এভাবে আকর্ষণ করেনি। ও যখন হাসত মনে হত যেন দুচোখে দুটো জোনাকি জ্বলছে—ওর সমস্ত রূপ জড়ো হয়েছিল আশ্চর্য সুন্দর বুদ্ধি উজ্জ্বল ওই দুটি জোনাকি চোখের মধ্যে। সে চোখের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না—মনে হয় একজোড়া ফিল্ড বাইনাকুলার আমার মনের অন্তস্থল পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে।

মালাও দেখেছিল। মালা আমার মন বুঝেছিল। কিন্তু আমি বুঝিনি। আমিও মালাকে দুর্বারভাবে টেনেছি আমার দিকে। আমি লেডি কিলার নই। কিন্তু লোকে বলে আমি হ্যান্ডসাম, স্মার্ট, টল। তারপর ব্যাচেলর। সেইজন্যেই কি মালা ওর জোনাকি চক্ষু দিয়ে বশ করল আমাকে? না, কদাকার বাসু মিত্রের কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য একটা অবলম্বনই শুধু চেয়েছিল? সে প্রশ্নের জবাব আজও পাইনি।

মন জানাজানি কিন্তু একদিনে হয়নি। আমরা দুজনেই পূর্ণবয়স্ক। অথচ যে অন্ধ আবেগ, প্রচণ্ড আকর্ষণ, অপরিসীম শূন্যতা বুকের মধ্যে বহন করতাম সারাটা দিন—তা কিশোর বয়সেই মানায়। কিন্তু প্রেম বয়স মানে না, স্থান-কাল-পাত্রের তোয়াক্কা করে না। তাই প্রেম দরিয়ায় পুরোপুরি হাবুডুবু খেয়ে গেলাম বিজ্ঞান সাধক বাসু মিত্রের রূপসি যুবতী সঙ্গীত সাধিকা স্ত্রীর সঙ্গে।

যে দিনের কথা বলছি, সেদিন ডক্টর মিত্র আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। টপোস্কোপি নাকি শেষ হয়ে এল। আমি যেন একবার এসে দেখে যাই। খবরটা মুচকি হেসে দিল মালা। গাল টিপে দিয়ে বললে, 'যাও, খেলাঘরে খেলা করে এসো।'

মালা ডক্টর মিত্রের ল্যাবোরেটরিকে বলত খেলাঘর। আর, স্বামীদেবতাকে বলত বুড়ো খোকা। এ-টুকু বুঝতাম, মালা হাঁপিয়ে উঠেছে। ওর জগৎ অন্য—রুক্ষ নীরস তাপসের সঙ্গে গ্রন্থিতে আবদ্ধ থাকলে তার চলে না। তাই মুক্তি চায়। গত পূর্ণিমায় গঙ্গার পাড়ে বসে আমার কাঁধে কাঁধ রেখে বিশাল চাঁদের পানে চেয়ে বলেছিল ফিসফিস করে, 'পারবে না আমাকে নিয়ে যেতে? অনেক দূরে...যেখানে কেবল গান আর গান...বিজ্ঞান নেই, মেশিন নেই, অঙ্ক নেই?'

গাঢ় কণ্ঠে বলেছিলাম, 'পারব, মালা।'

বাইশটা টেলিভিশনের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম সেদিনের কথা। মালা নিউমার্কেটে গেছে। ডক্টর মিত্র আমাকে বসতে বলে লাইব্রেরিতে গেছেন। আমি বসে-বসে ভাবছি সেদিনের কথা। সেদিন মালা আমার অনেক কাছে এসেছিল...অনেক...অনেক কাছে।

পায়ের আওয়াজ পেলাম। ঘরে ঢুকলেন বাসু মিত্র। কুঁজো হয়ে থাকার দরুন ভদ্রলোকের চাউনির ধরনটা অদ্ভুত। তীক্ষ্ণ চোখে আমার পানে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর অদ্ভুতভাবে হেসে বললেন, 'দিবাস্বপ্ন দেখছিলেন বুঝি?'

চমকে উঠলাম। পরক্ষণেই জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে বললাম, 'না, না, আপনার মেশিনগুলোর কথা ভাবছিলাম।'

সারি-সারি প্যানেল বসানো অদ্ভুতদর্শন টপোস্কোপির পানে উদাস চোখে তাকিয়ে রইলেন বাসু মিত্র। আবার চোখের তারায় দেখলাম সুদূরের সেই স্বপ্ন।

আবার সেইরকম বিচিত্র হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, আজব মেশিন। ব্রেন ডিটেকটিভ। তাই না?'

'ফরেন কমেন্ট তাই বটে।'

'খুব মিথ্যে কমেন্ট নয় কিন্তু। ব্রেনপ্রিন্ট থেকে সার্কিট বানিয়ে নিয়ে মেমারি ব্যাঙ্কেও গোয়েন্দাগিরি করা যায়।' একটু হেসে বললেন, 'যে মেমারি আপনি ডিজক্লোজ করতে চান না তাও।'

শেষ কথাটা ডক্টর মিত্র কীরকম যেন ফিসফিস করে বললেন। ওঁর কথা বলার ধরন এমনিতে কর্কশ। গলা নামিয়ে নরম গলায় কথা বলতে জানেন না। তাই গলার স্বর হঠাৎ খাদে নেমে আসায় অস্বাভাবিক শোনাল।

উনি কুঁজো পিঠ নিয়ে শরীরটাকে দুলিয়ে-দুলিয়ে ততক্ষণে প্যানেলগুলোর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। পটাপট কয়েকটা সুইচ টিপে দিতেই ঘর অন্ধকার হয়েই মৃদু নীলাভ আলোয় আলোকিত হয়ে রইল। চারিদিকে যেন তারার আলো জ্বলতে লাগল—মাঝখানে আমি নরম কুশন মোড়া কালো চেয়ারে বসলাম।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, আমার পানে নির্নিমেষে চেয়ে রয়েছেন বাসু মিত্র। নীলাভ অন্ধকারে তাঁর মুখ দেখা যাচ্ছে না—কিন্তু মনে হচ্ছে যেন দু-টুকরো নীল আগুন জ্বলছে দুই চোখে। পরক্ষণেই বুঝলাম, চোখের ভুল। নীলাভ আলোর রিফ্লেকশনে নীল আগুনের মতো জ্বলছে চশমার কাচ।

বললাম, 'আপনার টপোস্কোপ রেডি?'

'হ্যাঁ, রেডি,' কাটা-কাটা স্বর ভেসে এল নীলাভ অন্ধকার পেরিয়ে, 'এখুনি দেখবেন ব্রেন ডিটেকটিভদের গোয়েন্দাগিরি—শুনতেও পাবেন।'

বিরক্তি লাগছিল ডক্টর মিত্রের হেঁয়ালিতে। আমি প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার। সময়ের দাম অনেক। অনেকক্ষণ ধরে বসিয়ে রাখার জন্যে বিরক্ত হইনি মালা-স্বপ্নে বিভোর ছিলাম বলে। কিন্তু এবার হলাম।

বললাম ঈষৎ উষ্ণ স্বরে, 'একটু তাড়াতাড়ি করুন। চেম্বারে যেতে হবে।'

উত্তরে হাসির শব্দ শুনলাম। কর্কশ হাসি। কিন্তু কথাগুলো ছুড়ে-ছুড়ে দিলেন যেন বিনয়ের রসে ডুবিয়ে-ডুবিয়ে।

বললেন, 'ডাক্তার, আপনি ভালোবাসার রং জানেন? ঊষার আলোর মতো—কখনও গোলাপি। রাগলে এই রঙই কালো। ঈর্ষায় ধূসর বাদামি। কামনায় ড্রাগন-লাল।'

কী বলতে চান ডক্টর? ধাঁধায় পড়লাম। কথায় বলে, কানা খোঁড়া কুঁজো—তিন চলে না উজো। এরা কখনওই সোজা পথে যায় না—কুঁজো বাসু মিত্রও কোন পথে আসছেন বুঝতে না পেরে চুপ করে থাকাই মঙ্গল মনে করলাম।

নীলাভ অন্ধকারের মধ্যে সেইরকম পাথরে পাথর ঘষার মতো কর্কশ স্বরে ডক্টর তখনও বলে চলেছেন—'ঠিক তেমনি মানুষের মাথার মধ্যে সুর আছে—গানের সুর, আনন্দের সুর, উদ্বেগের সুর, ভালোবাসার সুর—মনের ভাবতরঙ্গ যেরকম ঠিক সেইমতো ইলেকট্রিক্যাল রিদম উঠছে ব্রেনের মধ্যেও। এতদিন আপনি চার্টে আলোর নাচ দেখেছেন—এবার দেখবেন শব্দ আর রঙের মধ্যে।' একটু থেমে গলা নামিয়ে বললেন খসখসে গলায়, 'সেই সঙ্গে চেহারা—চিন্তার চেহারা!'

বলার সঙ্গে-সঙ্গে খটাং করে একটা আওয়াজ হল। আমার চোখের পরদার ওপর ফেটে পড়ল একসঙ্গে বাইশটা টেলিভিশনের রক্তলাল আলোক উচ্ছ্বাস। ক্ষণেকের জন্যে অতি উজ্জ্বল রক্তাক্ত ফ্লাশে আমি যেন অন্ধ হয়ে গেলাম। একই সঙ্গে কানের পরদার ওপরেও ফেটে পড়ল প্রমত্ত ঝড়ের অট্টনিনাদ। কানের টিমপ্যানিক মেমব্র্যান যেন ফেটে চৌচির হয়ে গেল। সারা ঘরটাকে যেন নিমেষ মধ্যে লক্ষ করতালি বাজিয়ে উড়িয়ে ফাটিয়ে শূন্যমার্গে বিলীন করে দিতে চাইল সেই শব্দ বিস্ফোরণ।

চোখ বন্ধ করে কানে হাত চাপা দিয়ে চিৎকার করে বললাম, 'একী করছেন? অ্যাডজাস্ট করুন—তাড়াতাড়ি!'

কর্ণবধিরকারী সেই প্রলয়ংকর শব্দ ছাপিয়ে বাসু মিত্রের জবাব শুনতে পেলাম না বটে, কিন্তু আস্তে-আস্তে ক্ষীণ হয়ে এল বাইশটা অ্যামপ্লিফায়ারের সম্মিলিত বজ্রনির্ঘোষ। চোখের পাতার ওপরেও আলোর ঝলক স্তিমিত হয়ে আসতে চোখ খুললাম ধীরে-ধীরে।

কী দেখলাম? দেখলাম, ড্রাগন-লাল ঘোর লোহিতবর্ণ তিরোহিত হচ্ছে বাইশটা পরদার বুক থেকে। যেন বাইশটা ঘূর্ণিপাক রক্তের সাগরে মিলিয়ে যাচ্ছে আস্তে-আস্তে।

কানের কাছে শুনলাম ফিসফিসানি, 'কামনার রং।'

চমকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, আমার ঠিক পেছনটিতে এসে দাঁড়িয়েছেন বাসু মিত্র। পিঠ বেঁকিয়ে প্রোজ্জ্বল চোখ দুটো নিবদ্ধ রেখেছেন অর্ধচন্দ্রাকারে সাজানো বাইশটা পরদার দিকে। বাইশটা রক্তলাল ঘূর্ণিপাকের

প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে চশমার কাচে।

ফিসফিস করে ফের বললেন ডক্টর, 'দেখুন, দেখুন ভালোবাসার রং।'

বজ্রগর্জন মিলিয়ে গেল। কান জুড়িয়ে গেল যেন বীণার ঝংকারে। অজানা অপার্থিব রাগরাগিনী অশ্রুতপূর্ব অর্কেস্ট্রায় বেজে চলেছে...চলেছে। পৃথিবীর কোনও ভাষা কোনও সঙ্গীতের স্বরলিপি দিয়ে অলৌকিক সেই সঙ্গীতের ব্যাখ্যা করা যায় না। পরদার বুকে সেইসঙ্গে আরম্ভ হয়েছে গোলাপি রঙের খেলা। অজস্র গোলাপ ফুল যেন নিংড়ে রং ঢেলে দিয়েছে বাইশটা পরদায়। দেখতে-দেখতে অদৃষ্টপূর্ব সেই রঙের জোয়ার বর্ণালীর ওপর দিয়ে ধেয়ে গিয়ে ভোরের রাঙা আকাশের মতো অপরূপ হয়ে উঠল। কানের ওপর সুরের খেলাও বুঝলাম মোড় নিয়েছে।

ফিসফিস করে বললেন বাসু মিত্র, 'প্রথমে যা দেখলেন—তা মালার ব্রেনপ্রিন্ট। গত পূর্ণিমায় গঙ্গার ঘাট থেকে ফিরে ও যখন ঘুমন্ত, তখন মেমারি ব্যাঙ্ক থেকে লুঠ করেছি চিন্তার রং—কামনার রং। আর এখন যা দেখলেন—তা আপনার ব্রেনপ্রিন্ট—একটু আগের ভাবনার রং। আপনি বড় রোম্যান্টিক, ডক্টর, তাই না? বড্ড বেশি রোম্যান্টিক।'

আমি মুখ খুলতে গেলাম, কিন্তু তার আগেই হাত তুলে বাইশটা পরদার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ডক্টর বললেন, 'ধূমকেতু! ধূমকেতু!'

সচমকে দেখলাম, রক্তবর্ণ অগ্নিগোলক পেছনে কালচে বেগুনি রঙের পুচ্ছ উড়িয়ে বনবন করে পাক দিচ্ছে বাইশটা পরদায়। ফুলঝুড়ির মতো অজস্র লাল কালো বাদামি বেগুনি রং ছিটকে-ছিটকে যাচ্ছে। ঘোরার পথে ঘন-ঘন প্রদীপ্ত হয়েই যেন নিস্তেজ হয়ে আসছে ধূমকেতুর মুণ্ড— পরক্ষণেই জ্বলে উঠছে দ্বিগুণ তেজে। পরদা জুড়ে অতিপ্রাকৃত অনৈসর্গিক সেই আলোর খেলা পৃথিবীর কোনও বর্ণালীতে আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি। —ডক্টরের কথাই যদি সত্য হয়—এ রং মনের রং—চোখ কখনও দেখেনি।

আলোক তরঙ্গ কিন্তু অত্যন্ত চঞ্চল, অস্থির। ঘন-ঘন নতুন-নতুন কোণ থেকে মোচড় নিয়ে আছড়ে পড়ছে। সেই সঙ্গে সম্পূর্ণ নতুন আওয়াজে মুখরিত হয়েছে—বাইশটা অ্যামপ্লিফায়ার। জল স্থল অন্তরীক্ষ যেন একসাথে প্রলয় নাচে নেচে চলেছে। অট্ট-অট্ট হাসি হেসে লক্ষ করে তালি দিয়ে যেন জল ফুঁসছে, ঢেউ আছড়াচ্ছে, শিলাময় বিস্তীর্ণ উপকূলে হু-হুঙ্কারে ভেঙে পড়ছে সাইক্লোন তাড়িত দানবিক তরঙ্গ। বাড়ছে জলোচ্ছ্বাসের শব্দ—সেই সঙ্গে ফাটছে যেন কানের পরদা। তালে তাল মিলিয়ে জল যেন ঘুরছে, শূন্যে উঠছে; আকাশ যেন নীচু হয়ে চুম্বন করতে চাইছে সাগরের জলকে—আকাশ আর সাগর যেন মুখে মুখ দিয়ে মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতে চাইছে, যেন জলস্তম্ভ রচিত হচ্ছে ঘুরন্ত জলরাশি আর ঘূর্ণিঝড়ের সম্মিলিত দাপটে।

ধ্বনিময় জলনির্ঘোষ যখন রূপময় হয়ে উঠেছে মনের পরদায়, ঠিক তখনি যেন যাদুমন্ত্রবলে ক্ষীণ ক্ষীণতর ক্ষীণতম হয়ে মিলিয়ে গেল বাইশটা পরদায় ধূমকেতুর ঘূর্ণন—অপার্থিব নাচন। মিলিয়ে গেল মহাশূন্যতায়—ধূ-ধূ শূন্যতার মধ্যে বাইশটা পরদায় যেন কুয়াশার মতো অস্বচ্ছ অস্পষ্ট কৃষ্ট্যালদানা শূন্য হতে এসে জমা হতে লাগল পরদার বুকে...যেন অগুন্তি নক্ষত্রখচিত বাইশটা ছায়াপথ লাট্টুর মতো বনবন করে ঘুরতে-ঘুরতে জমাট বাঁধতে লাগল মধ্যিখানে...জ্যোতির্ময় হাজারটা সুপার-রামধনু যেন একযোগে পাকসাট খেয়ে গেল পরদার বুকে।...তারপর অকস্মাৎ, নেহাতই আচম্বিতে, আমার মনের ঘোর সন্দেহকে প্রকট করে দিয়ে নিমেষ মধ্যে আবছা আকারে জেগে উঠল দুটি মুখ—অজস্র রঙে রঞ্জিত, আবেগে বিহ্বল, আবেশে স্নিগ্ধ শুধু দুটি মুখ—সৃষ্টির শুরুতে যেভাবে আদম আর ঈভ চেয়েছিল পরস্পরের পানে—একান্ত সন্নিকটে ঠিক তেমনিভাবে ওরা নিষ্পলকে চেয়ে আছে পরস্পরের পানে এবং সে মুখ আমার আর...

কানের ওপর সমুদ্রনির্ঘোষ নায়াগারূপ বজ্রনাদে ফেটে পড়ল। পৃথিবীর কোনও জানা রূপক দিয়ে ভাষা দিয়েও সেই গুরুগম্ভীর সঙ্গীতকে বোঝানো যায় না। দেহমন অবশ করা অবর্ণনীয় সেই নিনাদের বুক চিরে

শোনা গেল বাসু মিত্রের পাথরে পাথর ঘষা কণ্ঠে একটি মাত্র চিরন্তন শব্দ। কানের কাছে মুখ এনে নীরস উদাস বিষণ্ণ কণ্ঠে শুধু বললেন : 'চুম্বন!'

(বিদেশি ছায়ায়।)

**'দক্‌ষিণী বার্‌তা' পত্‌রিকায় প্‌রকাশিত (শারদীয় সংখ্‌যা, ১৩৮৩)।*

কদাকার কেস

সল্টলেক স্টেডিয়ামের সামনে দিয়ে যে নতুন রাস্তাটা সোজা উত্তর দিকে চলে গেছে, সেই রাস্তা বরাবর করুণাময়ী স্টেট পর্যন্ত গেলে মাঝে অনেকগুলো সারকেল পড়ে চার রাস্তার মোড়ে।

থারড সারকেলটায় রোজ বিকেলবেলা একা গিয়ে বসে ইন্দ্রনাথ। বৃদ্ধ বায়ুসেবীরা এদিকে ততটা ভিড় করেন না। চারদিকে ফাঁকা মাঠ। এখানে ওখানে দু-একটা বাড়ি তৈরি হচ্ছে। আর বছরকয়েকের মধ্যে এখানে আর এভাবে হু-হু করে বাতাস বইবে না, জায়গাটা আর এরকম নির্জন থাকবে না।

শুধু একজন এসে রোজ বসে ইন্দ্রনাথের অদূরে। চাপাগলায় প্রায় ফিসফিসানি স্বরে এক লাইনের একটা গানই গায় প্রতিদিন। উদাস চোখে নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে হঠাৎ ফিসফিস করে তান ধরে আপন মনে :

তারা আসছে...তারা আসছে...রোজ রাতে তারা আসছে...আসছে...আসছে...আসছে।

শেষের দিকের 'আসছে' শব্দ তিনটে যেন খাদের মধ্যে নামতে-নামতে হারিয়ে যায় গলার মধ্যে।

গায়কের বয়স বেশি নয়। বড় জোর পঁচিশ। চেহারা সাধারণ, পোশাকও সাধারণ। উচ্চতা মাঝারি। গায়ের রং না ময়লা, না ফরসা। চোখমুখের মধ্যে এমন কোনও বৈশিষ্ট্য নেই যে মনে দাগ কেটে যায়।

দাগ কেটে যায় শুধু তার ওই চাপাগলার গানটা। একই গান। একই সুর। কিছুক্ষণ অন্তর একইভাবে গাওয়া। সন্ধে ঘনিয়ে এলে একইভাবে আস্তে-আস্তে হাঁটতে-হাঁটতে আর গাইতে-গাইতে চলে যায় দূরের নতুন ফ্ল্যাট বাড়িগুলোর দিকে। নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় হু-হু বাতাস বয়ে আনে অদ্ভুত শব্দগুলো চাপা হাহাকারের মতো :

'তারা আসছে...তারা আসছে...রোজ রাতে তারা আসছে...আসছে...আসছে... আসছে।'

একদিন উঠে গিয়ে তার পাশে বসল ইন্দ্রনাথ। সে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালে ইন্দ্রনাথের দিকে। চোখের চাহনি সুস্থ মানুষের চাহনির মতো নয়। পাগল। সন্দেহ নেই।

নরম গলায় বললে ইন্দ্রনাথ, 'গানটার মানে কী?'

'মানে শুনতে হলে একটা কেস শুনতে হবে—খুবই কদাকার কেস,' আস্তে-আস্তে থেমে-থেমে বললে সে।

'আমি শুনব।' বললে ইন্দ্রনাথ।

তখন সে বলল কদাকার কেসের কদর্য কাহিনি। এবং তা লোমহর্ষকও বটে!

ললিতা ঘাড় বেঁকিয়ে বললে, 'রমেশ, এখন কী করবে?'

গ্র্যানাইট কঠিন চোখে রমেশ বললে, 'তুমি যা চাও, তাই হবে।'

'তুমি খ্রিস্টান, আমি হিন্দু। তোমার বাবা বড়লোক, আমার বাবা গরিব মাস্টার। তা সত্ত্বেও বিয়ে করবে?'

'এখনও সন্দেহ আছে?'

'কিন্তু আমি তো তোমাকে বলেইছি, আমার বিয়েতে শাঁখ বাজবে, উলুধ্বনি হবে, নিজের হাতে সিঁদুর টেনে দেবে সিঁথিতে। কিন্তু তোমার বাবা—'

'চায় বিয়ে হবে গির্জেতে।'

'যদি আমি তা না করি।'

'আইনের পথে যাবে বাবা। সম্পত্তিচ্যুত হব, বাড়ির দরজা চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে যাবে। কাগজে-কাগজে লিগ্যাল নোটিশ ছাপা হবে।'

'তা সত্ত্বেও চাও হিন্দুমতে হোক বিয়ে?'

'তোমার এই সেন্টিমেন্ট বাবার সম্পত্তির চেয়ে অনেক বেশি দামি আমার কাছে।'

'রমেশ, আর এক বছর কাটিয়ে দিলেই মাস্টারস ডিগ্রি পেয়ে যাব দুজনে।'

'একটা ডিগ্রির লোভে আমাদের জীবন থেকে একটা বছরকেও আমি হারাতে চাই না, ললিতা।

'বেশ, তবে তাই হোক।'

'হ্যাঁ। ঠিক তাই হবে। তোমার কোনও ইচ্ছেই অপূর্ণ রাখব না আমি।'

অদৃষ্টের অট্টহাসি শোনা গিয়েছিল তখন অন্তরালে—শুনতে পায়নি দুজনের কেউই।

'রমেশ, বিয়ে তো হল। পথের ফকির হলে। কলেজ ছাড়লাম। পকেটে মাত্র পাঁচশো টাকা। এবার?'

'শুরু হোক অদৃষ্টের সঙ্গে পাঞ্জা কষা। ব্যাচেলরস ডিগ্রিটা যখন আছে, টিচারের চাকরি একটা পাবেই।'

'রমেশ, আমার বাবা সারা জীবন মাস্টারি করেছে। সংসারের অভাব কোনওদিনই ঘোচাতে পারেনি। ও লাইনে আমি যাব না।'

'তবে কী করবে?'

'কেরানির কাজ।'

'পেয়ে গেছ মনে হচ্ছে?'

'এই তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। এবার বল, তুমি কী করবে?'

'ব্যাবসা।'

'চাকরি করবে না?'

'জীবনেও না। বাবার এত টাকা—ব্যাবসা করে। আমিও যাব সেই পথে।'

'মাত্র পাঁচশো টাকা পুঁজি নিয়ে?'

'ওর চাইতেও বড় পুঁজি যে আমার আছে, তা তো তুমি জানো ললিতা?'

'জানি, জানি, জানি। পুরুষের সব চাইতে বড় পুঁজি তার সাহস, তার উদ্যম—তা তোমার আছে। আর আছে ব্যক্তিত্ব, আছে স্মার্টনেস—তুমি পারবে, রমেশ, তুমি পারবে, কিন্তু ব্যাবসাটা কীসের?'

'পাইকারি বাজার থেকে মাল কিনে বাড়ি-বাড়ি ডেলিভারি দেব। টেন পারসেন্ট প্রফিটই যথেষ্ট। পাঁচশো টাকা পুঁজি নিয়ে—'

'এর বেশি হয় না। বেশ, আমি রইলাম চাকরি নিয়ে—তুমি ভাগ্য ফেরাও বাণিজ্য করে। দেখা যাক কী আছে অদৃষ্টে।'

আবার অট্টহেসে উঠেছিল অদৃষ্ট। এবারও তা শুনতে পায়নি দুজনের কেউই।

'রমেশ, সত্যিই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুললে। দু-বছরেই ডেলিভারি ভ্যান!'

'নিজেই চালাব। অর্ডার সাপ্লাই বিজনেসে ভ্যানটা খুবই দরকার।'

'বলেছিলাম না তোমাকে, উদ্যোগী পুরুষেরই সহায় হয় ভাগ্য।'

'অদৃষ্টকে তো তৈরি করে নেওয়া যায় পুরুষকার দিয়ে, তাই নয় কি ললিতা?'

আবার বিপুল রবে অট্টহেসে উঠেছিল অদৃষ্ট—না, শুনতে পায়নি কেউই।

'রমেশ, আজ আমাদের পঞ্চম বিবাহ বার্ষিকী।'

'আর আজকের দিনেই উদ্বোধন হবে আমার নতুন ব্যাবসার—বিলডিং আর ব্রিজ কনস্ট্রাকসন।'

'হিন্দি ফিল্মের কাহিনির মতো অলীক মনে হচ্ছে। তাই না রমেশ? মাত্র পাঁচশো টাকা পুঁজি নিয়ে পাঁচ বছরেই সল্টলেকে বাড়ি, গাড়ি—'

'এইবার তোমার শেষ সাধটা পূর্ণ করা দরকার, ললিতা। এবার আর না বলতে পারবে না।'

'আসলে সাধটা তোমার নিজেরই। বাবা হওয়ার ইচ্ছে হয়েছে বললেই হয়।'

'কার না হয়, ললিতা? যে আসবে, সে ছেলেই হোক কি মেয়েই হোক—তার চোখ যদি তোমার মতো সুন্দর না হয়—'

'আর তার হাইট যদি তোমার মতো ছ'ফুট না হয়—'

সর্বনাশ ললিতা, ছ'ফুট হাইটের মেয়ের বর জুটবে না যে।'

'রমেশ, যে পৌরুষ দিয়ে এই বিপুল সম্পত্তি অর্জন করেছ, সেই পৌরুষ দিয়েই তুমি আমাকে ছেলেই উপহার দেবে—মেয়ে নয়।'

অট্টহেসে উঠেছিল দীর্ঘদেহী, অত্যন্ত সুপুরুষ, প্রখর ব্যক্তিত্বের অধিকারী রমেশ। তাই সম্ভবত শুনতে পায়নি অদৃষ্টের অট্টহাসি!

'অত ভেঙে পড়লে কি চলে রমেশ?'

'যে পুরুষ বউকে সন্তান উপহার দিতে পারে না, তার ভেঙে পড়াই তো স্বাভাবিক, ললিতা।'

'ইউরোপ আমেরিকার ডাক্তাররা তোমার শরীরের হরমোন ঘাটতি মিটিয়ে দিতে পারবে। চল, সেখানেই যাই। আমিও যাব।'

'কিছু হবে কি?'

'চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করাই পুরুষের ধর্ম। তুমি না পুরুষ?'

'আমি?'

'রমেশ, তোমার ওই হতাশ হাসি আমার বুক ভেঙে দিচ্ছে—দেখাই যাক না অদৃষ্টে কী আছে?'

অদৃষ্ট স্বয়ং তা জানতেন বইকি। তাই এবার আর তিনি অট্টহাস্য করলেন না। কেবল মুচকি হাসলেন।

তাবড়-তাবড় ডাক্তারদের দোরে ঘুরে মুখ চুন করে ফিরে এলে স্বামী-স্ত্রী। রমেশের ঔরসে ললিতার মা হওয়ার সম্ভবনা নেই একেবারেই।

'ললিতা, একটা কথা বলব?'

'অমনভাবে বলছ কেন? না ঘুমিয়ে চোখমুখের অবস্থাটা কী করেছ আয়নায় গিয়ে দেখে এসো।'

'আগে কথাটা বলি—'

'তোমার কোনও কথা এখন শুনতে চাই না। এতবড় কারবারের দিকে একেবারেই নজর দিচ্ছ না। আকাশপাতাল চিন্তা করে সমস্যার সমাধান তো হবে না। অদৃষ্টে যা আছে, তা মেনে নেওয়াই ভালো।'

'অদৃষ্ট?...হ্যাঁ, অদৃষ্টই বটে! এই প্রথম অদৃষ্টের কাছে হার মানলাম আমি। কিন্তু সমস্যার সমাধান একটা আছে।'

'কী শুনি?'

'রাগ করবে না তো?'

'কোন কালে করেছি?'

'ললিতা...ব্যাপারটা ডেলিকেট...মানে, আমার কোনও আপত্তি নেই...তোমার সবচেয়ে বড় সাধপূরণ করার জন্যে আমি সবকিছুই মেনে নিতে পারি। আমি বলছিলাম...আমি বলছিলাম...'

'বল না? অত কিন্তু-কিন্তু করছ কেন?'

'তুমি...তুমি...'

'কী হল? ফ্যাকাশে মেরে গেলে যে?'

'তুমি...আর কাউকে দিয়ে...মানে, এরকম নজির তো সমাজে আছে...'

'ছি:! রমেশ! ছি:! এত নোংরা সমাধানটা তোমার মাথায় এল কী করে?'

'নোংরা!'

'কদর্য! অত্যন্ত কদর্য! ভবিষ্যতে আর এ নিয়ে কোনও কথা আমাকে বলবে না।'

'শোন ললিতা, এখন তোমার বয়স উনচল্লিশ—এখনও সময় আছে।'
'চল্লিশ থেকেই শুরু হোক তোমার নতুন জীবন—আমাদের দুজনের ছোট্ট সংসারে নাই বা এল তৃতীয় জন? সেই হোক আমাদের—'
'কিন্তু—'
'আর কোনও কথা নয়। কারবারের মধ্যে ডুবে যাও—'
'তোমার শেষ সাধটা—'
'শিকেয় তোলা থাক।—যাও, দয়া করে নিজে গাড়ি ড্রাইভ আর কোরো না। দু-দুটো অ্যাকসিডেন্ট থেকে বেঁচ্ছে। যার মাথার ঠিক নেই—তার হাতে স্টিয়ারিং যেন না থাকে—'
'আমার কথাটা—'
'আবার ওই কদর্য কথা?'
'মেমসাব!'
'কী হয়েছে, রামলোচন? অমন করছ কেন? সাব কোথায়?'
'হাসপাতালে?'
'আবার অ্যাকসিডেন্ট? কে ড্রাইভ করছিল?'
'সাব নিজেই। আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে—'
'চল যাই।'
'মেমসাব।'
'অমন করে চেয়ে আছ কেন? কী হয়েছে, রামলোচন? কী হয়েছে? বল কী হয়েছে?'
'সাব আর বেঁচে নেই।'
চল্লিশেই জীবন ফুরিয়ে গেল জীবনযুদ্ধে জয়ী রমেশের—নতুন করে নতুন জীবন শুরু করার আগেই।
কৌতূহলী অদৃষ্ট কি সরে গেলেন?
তাই কি হয়? ললিতার অদৃষ্ট লিখন ফলিয়ে যেতে হবে না?
'সেক্রেটারিবাবু এসেছেন মেমসাব।'
'ভেতরে নিয়ে এসো।—আসুন মি: চৌধুরী। সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই—অফিসে সেটা সম্ভব নয়। এই একবছর বিজনেস চালিয়েছি আপনার সাহায্য নিয়েই—নইলে পারতাম না।'
'এটা আপনার বিনয়, মিসেস দত্ত। মিস্টার দত্তর চাইতে আপনি কোনও অংশে কম যান না, তা হাতেনাতে দেখিয়ে দিয়েছেন।'
'কিন্তু এখন আমি ক্লান্ত। খুব একা। আপনি রমেশের বন্ধু। আমারও। তাই আপনার কাছেই মন খুলে কথা বলা যায়। আপনি জানেন নিশ্চয়, রমেশের মৃত্যুর পর আমার কাছে বিয়ের অফার পাঠিয়েছিল অনেকে?'
'জানি। আবার বিয়ের বয়স তো আপনার পেরিয়ে যায়নি। যৌবনকেও, এক্সকিউজ মি ফর মাই ফ্র্যাঙ্কনেস, আপনি টিকিয়ে রেখেছেন। নি:সঙ্গতা একটা অভিশাপ—তা সত্ত্বেও ফিরিয়ে দিয়েছেন সবাইকে।'
'কারণ, একলা থাকাটাই আমার সয়ে গেছে। রমেশের জায়গায় আর কারও আসার দরকার নেই। যাক সে কথা, আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি একটা বড় রকমের সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য।'
'বলুন।'
'আমি কারবার বেচে দেব। আপনি খদ্দের দেখুন।'
'সেকী! চালু কারবার, এত গুডউইল—'
'ভালো দর এখনই পাওয়া যাবে। অনেক ভেবে এই ডিসিশন নিয়েছি আমি। এর আর নড়চড় হবে না। আপনি ব্যবস্থা করুন।'
'বেশ তাই হোক।'

'মিসেস দত্ত, বিজনেস তো বিক্রি করে দিলেন, বাড়িটাকে দু-ভাগ করছেন কেন?'

'ভাড়াটে বসাব বলে।'

'ভাড়াটে! টাকার অভাব তো আপনার নেই।'

'মি: চৌধুরী, আপনি সেদিন বলে গেছিলেন না নি:সঙ্গতা একটা অভিশাপ? হাড়ে-হাড়ে তা ফিল করছি। আপনি বন্ধু মানুষ। সবই জানেন। কফি পার্টি, কিটি ক্লাব, মিক্সড ক্লাব, সোস্যাল সারভিস, লাইব্রেরি-বই—কোনও কিছুই আমার এই ফাঁকা জীবনটাকে ভরিয়ে তুলতে পারছে না। বিজ্ঞাপন লাইনেও কিছুদিন মন ঠেলে দিলাম—মন ভরল না। তাই—'

'ভাড়াটে বসাবেন। কিন্তু যেচে উৎপাতকে ডেকে আনা হবে না?'

'বিজ্ঞাপনের জবাব এসেছে অনেক। উৎপাতের ভয়ে কাউকে বেছে নিতে পারছি না। আপনার পরামর্শ চাই সেই কারণেই। কীরকম ভাড়াটে হলে উৎপাত থাকবে না, অথচ নি:সঙ্গতা ঘুচবে—বলতে পারেন?'

'নিতান্তই যদি ভাড়াটে বসাতে চান কথাবার্তা বলে নি:সঙ্গতা ঘুচোনোর জন্যে, তাহলে বলব রিটায়ারড ফ্যামিলি রাখুন। এমন ফ্যামিলি যাদের ছেলেপুলে নেই।'

'ঠিক বলেছেন। এরকম একটা ফ্যামিলি নিজেই এসেছিল সেদিন। মিস্টার অ্যান্ড মিসেস মালকানি। ননবেঙ্গলি কিন্তু অত্যন্ত ভদ্র। নি:সন্তান।'

'মালকানি। মিসেস কি খুব মোটা? দেখতে শুনতে মোটেই ভালো নয়।'

'আপনি চেনেন?'

'খুব ভালোভাবে চিনি। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের বড় অফিসার ছিলেন। আমাদের অনেক অর্ডার পাইয়ে দিয়েছেন। কিন্তু—'

'কীসের কিন্তু—'

'ওঁর স্ত্রী সম্বন্ধে অনেক রকম কথা শুনেছি তো!'

'কীরকম কথা বলুন তো?'

'মিসেস মালকানির ছেলেপুলে না হওয়ার কারণটা আপনাদের ক্ষেত্রে যা হয়েছে, ঠিক তার উলটো। কিছু মনে করবেন না খোলাখুলি কথা বলছি বলে।'

'না, না, বলুন আপনি। সবই জানা দরকার।'

'তাহলে আরও কিছু জানিয়ে রাখি। যেহেতু রাবেয়া মালকানির গর্ভে কোনওদিনই সন্তান আসবে না তাই...'

'বলুন?'

'তাই উনি একটু উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির। মানে...'

'থাক, কারওর চাহিদা বেশি থাকে। রাবেয়া যে পন্থায় সুখে থাকতে চায়, তাতে আমার অসুখী হওয়ার কোনও কারণ নেই। মি: মালকানি লোক কীরকম?'

'অত্যন্ত অনেস্ট। ক্লাব নিয়েই সময় কাটিয়ে দেন। নিষ্কলঙ্ক চরিত্র।'

'তাহলে এই ফ্যামিলিকেই ভাড়া দেব। আপনার হেল্প পাব তো?'

'চিরকাল পাবেন।'

কিন্তু এমন সব ঘটনা ঘটতে লাগল মালকানি দম্পতিকে বাড়ি ভাড়া দেওয়ার পর থেকে যে বিশেষ সেই ঘটনাগুলো মস্ত প্রহেলিকা হয়ে দাঁড়াল রমেশের প্রিয় বন্ধু বিপুল চৌধুরীর কাছে।

ললিতা যে বড় একা, এই কথা শোনার পর থেকেই বিপুল চৌধুরী প্রায় আসত তার কাছে। কোম্পানির মালিক এখন অন্য ব্যক্তি, কিন্তু ললিতার সঙ্গে বন্ধুত্বে ছেদ পড়েনি। সময় পেলেই সন্ধে নাগাদ এসে চা-কফি খেত আর গল্প করত।

একদিন বললে ললিতা, 'মি: চৌধুরী, আপনি ভূত মানেন?'

হেসে বললে বিপুল চৌধুরী, 'একেবারেই না।'

'কিন্তু আমি ইদানীং প্রায় রাতে ছায়ার মতো কাকে যেন ঘুরতে দেখি আমার ঘরে। আলো জ্বাললেই আর তাকে দেখতে পাই না। দরজাও দেখি বন্ধ রয়েছে ভেতর থেকে।'

'আপনার মনের ভুল। এক কাজ করতে পারেন।'

'কী?'

'আপনার মেড সারভেন্টটার কী যেন নাম?'

'মেরী। কেন বলুন তো?'

'ওকে এনে ঘরে শোয়াতে পারেন। হাসছেন কেন?'

'মেরীর চরিত্রটা আপনি জানেন না বলে। সন্ধের পর ওর ঘরে নাগর আসে—থাকে তো সারভেন্ট কোয়ার্টারে। সব্বাই জানে।'

'রাত্রে?'

'প্রায় সারা রাত চলে এই কাণ্ড। হাড় জ্বালিয়ে খেল আমার। মালকানিদের ওই যে ছোকরা চাকরটা আছে। দেখেছেন তো?'

'মাসুদ?'

'হ্যাঁ। মেরীর নাগর।'

'আপনি কিছু বলেন না?'

'বলে কোনও লাভ নেই। কারণ, রাবেয়া সম্বন্ধে আপনি যা বলেছিলেন, তা অক্ষরে-অক্ষরে সত্যি। তবে রুচিটা যে এত নীচে নামতে পারে, সেটাই ভাবা যায় না। মাসুদ শুধু মেরীর নয়...রাবেয়ারও।'

'বলছেন কি!'

'এ বাড়ির সব্বাই জানে। মি: মালকানিই বোধহয় জানেন না।'

'জানেন নিশ্চয়। কিছু করার নেই বলেই ক্লাব নিয়ে পড়ে থাকেন। আচ্ছা, একটা কথা জিগ্যেস করব?'

'আপনি যে ছায়ামূর্তিকে মাঝে-মাঝে ঘরের মধ্যে দেখেন, তাকে দেখতে কীরকম বলুন তো?'

'স্পষ্ট দেখতে পাই না। তবে খুব মোটা।'

'অনেকটা রাবেয়ার মতো দেখতে কী?'

'রাবেয়ার মতো...তা...হ্যাঁ...প্রায়ই তাই। কিন্তু রাবেয়া আসবে কী করে বন্ধ ঘরে?'

'আসে ওর সূক্ষ্ম শরীর!'

'সূক্ষ্ম শরীর! কী বলছেন বুঝছি না।'

'রাবেয়া মালকানির এই অলৌকিক ক্ষমতাটার কথা আগে আপনাকে বলিনি বিশ্বাস করবেন না বলে। কোনও ভাড়াবাড়িতেই টিকতে পারেনি এই কারণেই। সূক্ষ্ম শরীরে রাত্রে অন্যের ঘরে গিয়ে সেক্স দেখা ওর একটা অত্যন্ত কদর্য অভ্যেস।'

'অসম্ভব।'

'এ ক্ষমতা অনেকেরই আছে, মিসেস দত্ত। রাবেয়ারও আছে। কিন্তু আপনি একা থাকেন, আপনার ঘরে রাত্রে ঘুরঘুর করে কেন সূক্ষ্ম শরীরে—এটাই একটা রহস্য।'

'নিন, নিন, কফি খান—সারাদিন খেটে মাথা গরম হয়েছে আপনার।'

সেইদিন রাত্রেই খুন হয়ে গেল ললিতা।

ভোরবেলা দুধের লাইন দিয়ে বোতল নিয়ে এসে ললিতাকে ডেকে তোলা মণিরামের বিশ বছরের অভ্যেস। সেদিন হাঁকডাক দরজায় ধাক্কা মেরেও কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে ঠেলে খুলেছিল পাল্লা।

পরক্ষণেই তার বিকট চিৎকারে চমকে উঠেছিল বাড়ির সকলে। ছুটতে-ছুটতে এসে দেখেছিল, খাটে পড়ে ললিতার নগ্ন দেহ। ব্রা পড়ে আছে মেঝেতে। ব্লাউজটা ঠেসে ঢোকানো মুখে। সায়ার দড়ি দিয়ে হাত আর পা

বাঁধা।

ঘর লণ্ডভণ্ড। দেরাজ তছনছ। স্টিল আলমারি খোলা—ভেতরকার সিক্রেট চেম্বার থেকে জড়োয়া গয়নার বাক্স উধাও। এমনকী ললিতার কান থেকে হিরের দুল আর টেবিল থেকে সোনার হাতঘড়িও নিপাত্তা।

পুলিশ এল। ঘণ্টাচারেক লাগল সবাইকে জেরা করতে, হারানো জিনিসপত্রের ফর্দ বানাতে, মৃতদেহের ফটো নিতে, নানা জায়গায় পাউডার ছড়িয়ে আঙুলের ছাপ তুলতে এবং কিছু বস্তু ফোরেনসিক পরীক্ষার জন্যে বাছাই করতে। সবশেষে মৃতদেহ মুড়ে পাঠিয়ে দেওয়া হল পোস্টমর্টেম করার জন্যে।

জেরার ফলে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু জানা গেল না। মণিরাম আর মাসুদ দুজনেই একসঙ্গে রোজ ভোরবেলা দুধের লাইন দেয়। সেদিন মণিরাম একাই দুধ এনেছে। তার চিৎকার শুনে মি: মালকানি দৌড়ে এসেছেন। একটু পরে এসেছেন রাবেয়া। রাত একটায় ক্লাব থেকে ফিরেছিলেন মিস্টার মালকানি। বাড়ি ফিরেই অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঘুম ভাঙে মণিরামের চিৎকারে। রাবেয়া তখন ছিল রান্নাঘরে। মাসুদ যে সেদিন দুধ আনতে যায়নি, একথা জানা গেল মণিরামের কাছেই। তার আগে পর্যন্ত রাবেয়া মালকানি কেন বলল না মাসুদ দুধ এনে দেয়নি রোজ সকালের মতো—ভেবে পেল না অফিসার। সে যে বাড়িতেই নেই, একথাটাও প্রকাশ পেল পুলিশ অফিসার যখন তাকে ডেকে পাঠাল জেরা করার জন্যে। মেরীকে জেরা করে জানা গেল সে গেছিল নাইট শোতে সিনেমা দেখতে।

মাসুদকে আর পাওয়া যায়নি। পাওয়া যায়নি জহরতের বাক্স।

একটা রহস্যই কেবল ধাঁধা হয়ে রইল অফিসারের কাছে। জহরতের বাক্স যে গোপন চেম্বারে থাকত, সেটা খোলবার বিশেষ তালাটার সংখ্যাগুলো ললিতা ছাড়া কেউ জানত না। তা সত্বেও তালা খুলল কে?

ললিতা নিজে নয়তো? ফোরেনসিক রিপোর্টেও প্রকাশ পেল, মৃত্যুর আগে সহবাস করেছিল ললিতা। কার সঙ্গে?

তারপর তার হাত-পা সায়ার দড়ি দিয়ে বেঁধে, মুখে ব্লাউজ ঢুকিয়ে, মারা হয়েছে গলা টিপে। মাসুদের হাতে জহরতের বাক্স তুলে দেওয়ার পরই কি মৃত্যু এসেছিল এইভাবে?

বিপুল চৌধুরী সবই জানল যথাসময়ে। বুঝলও অনেক কিছু। কিন্তু মুখ খুলল না।

কাহিনি শেষ করে আবার চাপাগলায় ফিসফিস করে সেই গানটা গেয়ে উঠল পাগলটা, 'তারা আসছে...তারা আসছে...রোজ রাতে তারা আসছে...আসছে...আসছে...।' ...রাতের অন্ধকারে হুহু হাওয়ায় বুকফাটা হাহাকারের মতো শব্দগুলো ভেসে গেল বাতাসে।

ইন্দ্রনাথ বললে, 'জহরতের বাক্সর তালা খোলার সিক্রেট নাম্বার জেনেছিল রাবেয়া —সূক্ষ্ম শরীরে রোজ রাতে ঘরে আসত ওই জন্যেই।'

'ঠিক কথা।' বললে পাগলটা।

'মাসুদের কাছে রাবেয়াই জানিয়ে দিয়েছিল সিক্রেট নাম্বারটা।'

'তাও ঠিক।'

'ললিতাকে আগে খুন করেছিল মাসুদ—পরে ধর্ষণ করেছিল ব্যাপারটাকে কদর্যভাবে সাজানোর জন্যে। ফোরেনসিক রিপোর্টেও নিশ্চয় তা প্রকাশ পেয়েছে।'

'পেয়েছিল। খুনিকে ধরতে না পেরে অফিসার তা চেপে গেছিল।'

'কিন্তু মাসুদ, কারা আসছে রোজ রাতে তোমার কাছে...তা তো বললে না?'

'রাবেয়ার সূক্ষ্ম শরীর—এখনও সে চায় আমাকে। জহরতের বখরা পেয়েও খুশি নয়।'

'আর একজন?'

'ললিতার প্রেতাত্মা।'

'কেন?'

চোখে চোখ চাইল মাসুদ। অন্ধকারেও জ্বলজ্বল করছে দুই চোখ।

'কেন? কেন? কেন? আমি নিজেই জানি না কেন? কী চায় সে? জহরত ফেরত চায় না—তবে? রাবেয়া যা চায়, তাই কি? চোখেমুখে তাই কি অমন মিনতি ফুটিয়ে তোলে? কিন্তু কেন? কেন? কেন? সব তো শেষ হয়ে গেছে—আবার কেন চাই সেই কদাকার—'

উঠে দাঁড়াল মাসুদ। আস্তে-আস্তে দূর হতে দূরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল তার মূর্তি। চাপাগলায় গানটা কিন্তু লেগে রইল ইন্দ্রনাথের কানে।

'তারা আসছে...তারা আসছে...রোজ রাতে তারা আসছে...আসছে...আসছে...।'

*'পরিবর্তন' পত্রিকায় প্রকাশিত (শারদীয় সংখ্যা)।

রূপোর রেকাবি

ডাক্তার! ডাক্তার!'

চোখ রগড়াতে-রগড়াতে খাট থেকে নেমে এলেন ডক্টর ওঙ্কারনাথ নাগ। বীতনিদ্র রজনীর জ্বালা তখনও চোখের পাতায়—ঘোর কাটেনি মগজ থেকে। সাত সকালেই আবার কে ডাকে?

দরজা খুলে দেখলেন সহাস্যমুখ এক যুবাপুরুষকে। পরনে মুগার পাঞ্জাবি। চুনোট করা ধুতির কোঁচা লুটোচ্ছে জরিদার নাগরার ওপর। দুই চক্ষু ঝকঝক করছে কৌস্তুভমণির মতো।

'ইন্দ্রনাথ! এত সকালে?'

'তদন্তে বেরিয়েছি,' ঘরের মধ্যে পা দিয়ে বলল ইন্দ্রনাথ রুদ্র। 'সাহাভবনে কাল রাত্রে বিরাট চুরি হয়ে গিয়েছে। ফোন করেছিলেন সকালবেলাই!'

চোখ কপালে তুলে বললেন ডাক্তার নাগ, 'সেকী কথা! কাল রাতেই তো গিয়েছিলাম বুড়িকে দেখতে। ঘুমের ইঞ্জেকশন দিয়েছিলাম।'

সায় দিয়ে ইন্দ্রনাথ বললে, 'সেই জন্যেই তো এসেছি তোমার কাছে।'

কথার সুর কানে বাজল ওঙ্কারনাথের। অথচ কথাটা পেঁচিয়ে বলেনি ইন্দ্রনাথ। চোখ তুলে তাকালেন ডাক্তার।

বিষ্ণুমণি চক্ষু অতীব প্রশান্ত—সন্দেহের ঝিলিক তো নেই!

'আমার কাছে কেন?'

'যেতে-যেতে বলব। এখুনি বেরোবে তো?'

'হ্যাঁ। বুড়িকেও দেখতে যাওয়ার কথা আছে। তার আগে কয়েকটা ভিজিট সেরে নেব। শেষকালে যাব চেম্বারে।'

'আমি বসছি।—তৈরি হয়ে নাও।'

কিন্তু শুধু বসল না ইন্দ্রনাথ, কথা বলতে লাগল। অনর্গল কথা বলে চলল। হাজার- হাজার কথা সুতীক্ষ্ণ ভল্লের মতো সবেগে বেরিয়ে আসতে লাগল মুখ দিয়ে। রাজনীতির কথা, সমাজ পিঞ্জরের কথা, বারবণিতাদের দুরবস্থার কথা, আধুনিক সাহিত্যের কথা, চিকিৎসায় অব্যবস্থার কথা, গ্রামে দুশ্চিকিৎসার কথা, ওঙ্কারনাথের পশারের কথা, রুগিদের কথা, ভেষজশিল্পের কথা, জাল ওষুধের কথা ইত্যাদি-ইত্যাদি-ইত্যাদি।

মাথা ভোঁ-ভোঁ করতে লাগল ওঙ্কারনাথের। কাঁচা ঘুম ভাঙার পর থেকে সেই যে বাক্যস্রোত শুরু হয়েছে নায়গ্রা জলপ্রপাতের মতো বিরামহীনভাবে ঝমাঝম শব্দে আছড়ে পড়ছে কানের পরদায়। যেন অবিরাম বর্ষিত লৌহগুলিকায় বিদীর্ণ হয়ে চলেছে কর্ণপটহ। গাড়ি বের করেছেন, একটির-পর-একটি রুগির বাড়ি গেছেন, নাড়ি টিপেছেন, নিদান নির্ণয় করেছেন, ব্যবস্থাপত্র লিখেছেন—'ফাঁকে-ফাঁকে জবাব দিয়েছেন শুধু চিন্তাসূত্রকে অটুট রাখার জন্যে। গাড়ি চালাতে-চালাতেও সহস্র আয়ুধের মতন প্রশ্নের ধারাবর্ষণের জবাব দিয়ে গিয়েছেন—সেইসঙ্গে আপ্রাণ প্রয়াস পেয়েছেন শকটচালনায় নিবিষ্ট থাকতে। অর্জুনের ক্ষুর প্রবাণও বুঝি সহনীয়। নবনীতকোমল ইন্দ্রনাথের রসনা এত কঠিন, এত শাণিত? পাষাণ-প্রক্ষেপক ভূষণ্ডী অস্ত্র বললেও চলে। শব্দরূপ লৌহগুলিকার মুহূর্মুহু: আঘাতে ক্রমশ বিহ্বল বিপর্যস্ত হয়ে এসেছে ডাক্তারের রাতজাগা অবসাদক্লান্ত মগজ, বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা অনুভব করেছেন প্রতিটি স্নায়ুতন্তুতে।

অবশেষে আসল প্রশ্নে এসেছে ইন্দ্রনাথ—ছেড়েছে শক্তিশেল!
'কালরাতে কোথায় ছিলে?'
'সাহাদের বাড়ি।'
'তারপর?'
'পালেদের বাড়ি।'
'তারপর?'
'আমার বাড়ি।'
'ক'টায় বাড়ি ফিরেছিলে?'
'রাত দুটোয়।'
'পালেদের বাড়ি ক'টায় গিয়েছিলে?'
'রাত দশটায়।'
'কাকে দেখতে?'
'পালেদের ছেলেটার অ্যাপেন্ডিসাইটিস হয়েছে—এই ভয়ে ডেকেছিলেন মহীতোষ পাল।'
'গিয়ে কী দেখলে?'
'অ্যাপেন্ডিসাইটিস নয়—বদহজম।'
'তখন রাত কটা?'
'সাড়ে দশ।'
'সাড়ে দশটা থেকে দুটো পর্যন্ত কোথায় ছিলে মনে পড়ছে?'
'নিরুক্ত পাণ্ডুর মুখে বললেন ওঙ্কারনাথ, 'না।'
সাহাদের বাড়ি এসে গিয়েছে। পঞ্চু সাহা এ অঞ্চলের একদা ধনী ব্যবসায়ী। বড়বাজারে রজত-সামগ্রীর ভূরিবিক্রয়ী ছিলেন।
কথিত আছে, ত্রিপুরাসুর বধকালে মহাদেবের রোষপূর্ণ দক্ষিণ নেত্র থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হয়ে তাতে রুদ্রের উদ্ভব হয়; সেই সময়ে বাম নেত্র থেকে যে অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়ে, তা থেকে রৌপ্যের জন্ম হয়। রূপো চিরযৌবনকারক, বাত-প্রমেহাদি রোগ-নাশক। কিন্তু বিধি বাম! তাই চিরযৌবন অভিলাষী পঞ্চু সাহা রূপাজিবা পল্লীতে যুবতী সাহচর্য করতে গিয়ে প্রমেহ রোগেই আক্রান্ত হলেন এবং অশেষ কষ্ট পেয়ে অবশেষে উর্বশী-মেনকা-রম্ভার দর্শনকামনায় ইহলোক ত্যাগ করলেন।
সেটা বছর দুই আগের কথা। মিনসের [illegible] বিধবা বুড়ি বড়ই মানসিক আঘাত পেয়েছিলেন। গোটা দুনিয়াটাকে বিষনয়নে দেখতে শিখেছিলেন। অবিশ্বাসের বিষ সিঞ্চিত হয়েছিল অণুপরমাণুতে। তাই লাটে তুলে দিয়েছিলেন রজতবাণিজ্য; এমনকী ব্যাঙ্ক থেকেও বস্তাভরতি নোট তুলে এনেছিলেন পাছে ব্যাঙ্কও তাঁকে পথে বসায় এই ভয়ে। দোতলায় পালঙ্কের গদীর মধ্যে তুলো সরিয়ে নোট ঢুকিয়ে রেখেছিলেন। রূপোর বিস্তর রেকাবি রেখেছিলেন একতলায়।
কাকপক্ষীও জানত না—জানত শুধু নিশিকুটুম্বরা। অলৌকিক ক্ষমতা তাদের। গৃহস্থর গোপন কাহিনিও যেন মন্ত্রবলে জেনে ফেলে। এহেন একজন দৈবজ্ঞ নিশিকুটুম্ব কাল রাতে তাঁকে পথে বসিয়ে গিয়েছে। ঘুমের ওষুধের প্রভাবে গভীর নিদ্রিতা বৃদ্ধা কিছুই টের পাননি।
ডাক্তার ক্লান্ত চরণে উঠে গেলেন দোতলায়। বুড়ি বড় শক পেয়েছেন। ভালো করে কথাও বললেন না ডাক্তারের সঙ্গে—মুখ ফিরিয়ে রইলেন। ওষুধের ব্যবস্থা করে ডাক্তার নেমে এসে দেখলেন, দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে ইন্দ্রনাথ। বেরোতে না দেওয়ার মতলব।
কথা বলারও প্রবৃত্তি হল না ডাক্তারের। কাঁধের ধাক্কা দিয়ে ইন্দ্রকে সরিয়ে দিলেন, হাতল ঘুরিয়ে ল্যাচ খুললেন, বেরিয়ে এলেন রোয়াকে।

সেই সময়ে খেয়াল হল, হাতটা চটচট করছে। হাত শুঁকে দেখলেন দুর্গন্ধ। দরজার হাতলে নোংরা মাখিয়ে রেখেছে কে!

পেছন থেকে শোনা গেল ইন্দ্রনাথের নিরীহ কণ্ঠস্বর, 'ডাক্তার, ওটা আমিই লাগিয়েছি—তোমার অঙ্গুলাঙ্ক, মানে ফিংগারপ্রিন্ট নেব বলে।'

[illegible] চোখে ইন্দ্রনাথকে ভস্মীভূত করার চেষ্টা করলেন ডাক্তার। পরক্ষণেই বেগে ফের ভেতরে এলেন, টপাটপ ধাপ টপকে গেলেন দোতলায়, শয়নকক্ষ সংলগ্ন কলতলায় হাত ধুয়ে নেমে এলেন একতলায়।

ইন্দ্রনাথ ততক্ষণে তাঁর গাড়িতে গিয়ে বসেছে। ডাক্তার আসতেই বলল, 'চল, পালেদের বাড়ি যাই।'

'দরকার নেই।'

'হ্যাঁ, দরকার আছে। ছেলেটাকে একবার দেখে এসো।'

ঠোঁট কামড়ে ধরলেন ডাক্তার। প্রতিবাদ করলেই তো শুরু হবে জিহ্বা সঞ্চালন। অগ্নির সাতটি জিভ আছে বলে তিনি সপ্ত জিহ্ব। ইন্দ্রনাথের জিহ্বার সংখ্যা বোধকরি সাত সাততে ঊনপঞ্চাশ। তাই নীরবে এবং সভয়ে গেলেন পালেদের বাড়ি। মহীতোষ পাল এবং তাঁর গৃহিণী তো অবাক অসময়ে ডাক্তারকে দেখে। বিখ্যাত গোয়েন্দা ইন্দ্রনাথ রুদ্রের আগমনে যেন বেশি পুলকিত হলেন মহীতোষ-গৃহিণী। মহীতোষবাবু গেলেন ভেতর ঘরে। ছেলেটার উদর টিপতে লাগলেন ডাক্তার। ইন্দ্রনাথ কিন্তু সোৎসাহে বাক্যস্রোত অব্যাহত রাখল পাল-গৃহিণীর সঙ্গে। ব্যবস্থাপত্র লেখা সাঙ্গ হতেই দুজনে বেরিয়ে এসে বসল গাড়িতে। স্টার্ট দিয়ে লোহিতনয়নে শুধোলেন ডাক্তার, 'এবার?'

'ইন্দ্রনাথ বললে, 'গাড়ির বুট-য়ের মধ্যে কী রেখেছ?'

'কিছু না!'

ড্যাশবোর্ডের ছোট্ট খুপরির দিকে হাত বাড়াল ইন্দ্রনাথ। চকিতে হাত বাড়ালেন ডাক্তারও। কিন্তু তার আগেই বুট খুলে একটা প্যাকেট বার করে আনল ইন্দ্রনাথ। ধাতব ঝনৎকার শোনা গেল পুলিন্দার মধ্যে।

প্যাকেট ছিঁড়তেই ঝকঝক করে উঠল অনেকগুলো রূপোর রেকাবি। সাদা হয়ে গেল ডাক্তারের মুখ।

'সাহাবুড়ির রূপোর রেকাবি। এখানে এল কী করে?' ইন্দ্রনাথের প্রশ্ন।

জবাব দিতে পারলেন না ডাক্তার।

'আমি বলছি, কী করে এল এখানে। মহীতোষবাবু রেখে গেছেন। যখন কথা বলছিলাম, ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে, উনি পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে বুটের মধ্যে রেখে গেছেন তোমাকে চোর প্রতিপন্ন করার জন্যে—। এখন মনে পড়ছে কাল রাত সাড়ে দশটা থেকে রাত দুটোর মধ্যে কোথায় ছিলে?'

'হ্যাঁ, মনে পড়েছে,' তড়িৎ-স্পৃষ্টের মতন বললেন ডাক্তার। মহীতোষবাবুর বাড়ির সামনেই ছিলাম। চাকা থেকে হাওয়া বেরিয়ে গিয়েছিল।'

'হ্যাঁ, হাওয়া বার করে দেওয়া হয়েছিল। দিয়েছিলেন পাল-দম্পতি—যাতে তোমার অ্যালিবি, মানে অন্যত্রস্থিতি অস্পষ্ট থাকে। সেই ফাঁকে দুজনে মিলে সরিয়ে দিয়েছিলেন সাহাবুড়ির ঐশ্বর্য। কী অপূর্ব কূটযোগ স্বামী-স্ত্রী-র মধ্যে। জয় হোক পাল দম্পতির! শুধু একটা ভুল করেছিলেন বলেই তোমাকে ফাঁসানো গেল না।'

'কী?' [illegible] কণ্ঠ ডাক্তারের।

'শোওয়ার ঘরের কোথায় কী আছে, ডাক্তারের পক্ষে জানা সম্ভব—মায় গদীর ভেতর নোট পর্যন্ত। কিন্তু একতলার খবর রাখা কোনও ডাক্তারের পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই দরজার হাতলে নোংরা লাগিয়ে তোমার হাত যখন ময়লা করে দিলাম, তুমি আমার পিণ্ডি চটকাতে- চটকাতে সটান ওপরে দৌড়লে হাত ধুতে—অথচ সিঁড়ির পাশেই ছোট্ট ঘরে ছিল হাত ধোওয়ার বেসিন—পাশেই আলমারির মধ্যে থাকত রূপোর রেকাবি। সাহাবুড়িকে ঘুমের ইঞ্জেকশন দিয়ে এসেছ, এ গল্প নিশ্চয় পাল-দম্পতির কাছে করেছিলে?

তৎক্ষণাৎ প্ল্যানটা মাথায় এসেছিল পাল-দম্পতির। সাধু! সাধু! আমি চললাম পালেদের বাড়ি—টাকাগুলো উদ্ধার করতে। ডাক্তার, তুমি বাড়ি যাও—একটু ঘুমোও। মুখটা বড্ড শুকিয়ে গেছে। আমার বাচালতা মাপ কোরো—ওটা এক ধরনের প্রতি-পরীক্ষা—এক্ষেত্রে অপরিহার্য ছিল। সত্যনিষ্কর্ষণের উপায় উপকরণ বলতে পার। ভোরবেলা যখনি শুনেছি, তোমার ইঞ্জেকশনের জন্যেই সাহাবুড়ি মড়া-ঘুম ঘুমিয়েছে, নিশ্চিত হয়েছিলাম পুলিশ তোমাকে ছুঁলো বলে, তাই বন্ধুকৃত্য করে গেলাম পুলিশ আসার আগেই।—গুডবাই!'

**'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত (পুজো সংখ্যা ১৯৭৫)।*

প্রবঞ্চক সম্রাট

যে কোনও ব্যাঙ্কে চলে আমার নোট? দেখবেন হাজার টাকার নোট কীভাবে ডবল করি।

'রোমাঞ্চ'র প্রিয় সম্পাদক মহাশয়,

আমার নাম ইন্দ্রনাথ রুদ্র। প্রাইভেট ডিটেকটিভ। আমার সঙ্গে আপনার পরিচয় আমার অসাহিত্যিক বন্ধু মৃগাঙ্কর সৌজন্যে। আমার ডাইরি থেকে দু-চারটে ছেঁড়া কাহিনি মাঝে-মাঝে ও উদ্ধার করে এবং তাই নিয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে গল্প নামক যে বস্তুগুলি রচনা করে, আমার মতে তা শুধু অপাঠ্যই নয়—আগাগোড়া ভুল। আমার কানে আসে সেসব গল্পে নাকি আমাকে ও অতিমানব সাজায়। ম্যাজিশিয়ান আর ডিটেকটিভ যে একই জীব, এইটা প্রমাণ করবার চেষ্টা করে। আমার আপত্তি সেইখানেই। আমি ম্যাজিশিয়ান নই। অলৌকিক শক্তিধরও নই। আমি সাধারণ মানুষ। পরাজয়ের গ্লানি আমার ললাটেও জোটে। কিন্তু মৃগাঙ্ক কি কোনওদিন আপনাদের শুনিয়েছে আমার পরাজয়ের কাহিনি? শুনিয়েছে কি দুরন্ত এক প্রবঞ্চক-সম্রাটের কাছে কীভাবে আমি বারংবার হার স্বীকার করেছি? শুনিয়েছে কি রাজা কঙ্কর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা আর দুর্জয় সাহসের আশ্চর্য উপাখ্যান?

জানি কী বলবেন। বলবেন, শুনিয়েছে বইকী। রাজা কঙ্কর প্রতারণা কাহিনি রোমাঞ্চতেই প্রকাশ পেয়েছে এই সেদিন। আরে মশাই, সে কাহিনিতে আমার পরাজয়ের বর্ণনা কতখানি ছিল, তা কি তলিয়ে দেখেছেন? দেখেননি। এটা ঠিক, রাজা কঙ্কর টিকি একবারই আমি স্পর্শ করতে পেরেছিলাম। হিমাচল থেকে সিন্ধু অঞ্চল পর্যন্ত সুপুরুষ যে মানুষটি যাদুকরেরই মতো লোক ঠকিয়েছে মাসের পর মাস যার নাম শুনলেই এখনও শিহরিত হয় পুলিশ মহল, ধুরন্ধর শিরোমণি সেই রাজা কঙ্ককে একবারই আমি বাগে আনতে পেরেছিলাম।

রাজা কঙ্কর সঙ্গে তুলনা চলে একমাত্র পাঁকাল মাছের। একাধিকবার গো-হারান হারিয়েছে সে আমায়, বলতে গেলে কাছে এসেও গালে ঠোনা মেরে চম্পট দিয়েছে। সে শঠ, সে প্রতারক, সে কপট; কিন্তু সে মহা ওস্তাদ, মহা ধড়িবাজ, মহা শক্তিমান। রূপে সে কার্তিক, বাকতাল্লায় সেলসম্যান। তার টাঁক উঁচুমহলের রাঘববোয়ালের ট্যাঁকের দিকে; ডাগর মেয়েদের প্রয়োজন কেবল ফাঁদ পাতার খাতিরে—শিকারকে ডেড়েমুষে নেওয়ার পর ডাকসাইটে সুন্দরীকেও হেলায় পরিত্যাগ করতে দ্বিধা করে না বিন্দুমাত্র। সে যখন আসরে অবতীর্ণ হয়, তখন আসে সবার সামনে দিয়ে—পাঁদাড় দিয়ে নয়। মহা ধুমধাড়াক্কা সহকারে শুরু হয় তার দাঁও মারার কারবার। সোমত্ত মেয়েরা পাগল হয়ে যায় তার রূপে, তার চাল-চলনে। ধূর্ত ধনীরা মোহিত হয় তার বনেদিয়ানায়, রাজার মতো খানদানি পট্টি মারায়। তারপর শুরু হয় ধোঁকাবাজ-শিরোমণির শেষ খেলা। অতি বড় সেয়ানাকেও পটকে দিয়ে পিট্টান দেয় রাজা কঙ্ক। উধাও হয়ে যায় রাতারাতি।

রাজা কঙ্ক! রাজা কঙ্ক! রাজা কঙ্ক! রাজা সে কোনোকালেই ছিল না। কিন্তু তার নেকনজর রাজারাজড়ার দিকেই। ভাঁড়াভাঁড়ির মস্ত আর্টে সে কুশলী আর্টিস্ট। ভড়ং দিয়ে ভাঁওতা মারার মহাবিদ্যায় সে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। সে জানে, বারফট্টাইয়ের প্রয়োজন ঠিক কখন এবং ভেড়া বানাবার মুহূর্ত আসে কোন সময়ে। রূপচাঁদ তার একমাত্র সাধনা, লোচ্চামো নয়। নারী তার সাধনা-সহচরী—অঙ্কে শোয়ানোর জন্য নয়।

রাজা কঙ্ক তাই একটা বিস্ময়। অন্তত আমার কাছে। রাজা কঙ্কর কাহিনি অলীক নয়, রাজা কঙ্কর কাহিনি কপোলকল্পিত নয়—এ কাহিনি সূর্যের মতো সত্য, ঈশানী ঝড়ের মতো নিষ্ঠুর। কিন্তু এমন আশ্চর্য উপাখ্যানকেও হরেকরমবা কাহিনি বানিয়ে ছেড়েছে আমার বন্ধু মৃগাঙ্ক।

রাজা কঙ্ককে একবারই আমি বাগে এনেছিলাম। কিন্তু ধরে রাখতে পারিনি। উধাও হয়ে গিয়েছিল রাজা। কোনও হদিশ আর পাইনি। পেলাম যখন-তখন আর একজনের সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। গল্পটা শুনলাম, তারই মুখে।

গোয়ার সাগর সৈকত। ঝিকঝিকে সাদা বালির ওপর যেন চাঁদের হাট বসেছে। রূপ আর যৌবনের সেই মেলায় অনভ্যস্ত চক্ষু বিস্ফারিত হয় বইকী।

কিন্তু রাজা কঙ্কর দৃষ্টি নেই কোন দিকে। গোয়ার কোলভা বিচ তার কাছে নতুন কিছু নয়। সাগর, জমি আর আকাশ যেখানে একাকার হয়ে গিয়েছে, যেখানকার নিসর্গশ্রী নেহাত অকবিকেও কবি হতে বাধ্য করে, আশ্চর্য সুন্দর সেই কোলভা সৈকতে রূপ আর রুপো নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে আসে কেবল ধনীর দুলালরা। তারা আসে বোম্বাইয়ের রুপোলি পরদার জগৎ থেকে, আসে কোটিপতিদের কুবের মহল থেকে।

রাজা কঙ্ক এদের নাড়িনক্ষত্র জানে। বোম্বাইয়ে তার লীলাখেলা ঘটেছে একাধিকবার। তার মুখশ্রীর সঙ্গে পরিচয় অনেকেরই। রাজা কঙ্ক তবুও রাজা কঙ্ক। অকুতোভয়, নির্ভীক, দুর্মদ।

তাই কোলভা সৈকতে আবার দেখা গেল রাজা কঙ্ককে। রাজার মতোই তার আর্বিভাব। সাড়া পড়ে গেল প্রথম আবির্ভাবেই। প্রকাণ্ড রোলসরয়েস গাড়ি এসে দাঁড়াল সব চাইতে বিলাসবহুল হোটেলের সামনে। ঝলমলে রোলসরয়েসের সোফারটিও রীতিমতো ঝলমলে। যেমনি সাজের বাহার, তেমনি চেহারা। লোকটা জাপানি।

বাতায়নে বারান্দায় ভিড় জমে গেল আরোহীর দর্শনলাভের প্রত্যাশায়। জাঁকালো মূর্তি। চোখে মনোবল। খানদানি রূপ বটে।

কিন্তু আশ্চর্য মানুষ তো রাজা কঙ্ক! সেই যে নিজের ঘরে ঢুকল, আর দেখা নেই। ঝাড়া দুটো দিন যেন ধ্যানস্থ হয়ে রইল ভদ্রলোক নিজের স্যুটে।

বিদ্যুৎচমকের মতো একবারমাত্র দেখা দিয়েই অন্তর্ধান করাটা রাজার একটা মস্ত কায়দা। চোখ ঝলসে দিয়েই উধাও হওয়ায় কৌতূহল বৃদ্ধি পেতে থাকে উত্তরোত্তর। না জানি কত বড় যক্ষপতি! ধার ধারে না কারও!

পুরো দুটো দিন গেল এইভাবে। কৌতূহলে যেন ফেটে পড়তে লাগল আশপাশের সবাই। দুদিন পরে সৈকতে দেখা গেল রাজা কঙ্ককে। মাথার ওপর রঙিন ছাতা। হাতে খোলা বই। ভিড় যেখানে, সেখান থেকে বেশ খানিকটা তফাতে বসে মৌনি বুদ্ধের মতো ধ্যানস্থ অলীক কাহিনির পৃষ্ঠায়।

কিছুক্ষণ পরেই সৈকতের বালি মাড়িয়ে হনহন করে প্রায় দৌড়ে এল জাপানি সোফার। হাতে একটা টেলিগ্রাম।

ধ্যান ভাঙল রাজার। উদাসীন দুই চোখে ঈষৎ বিরক্তি। সেইসঙ্গে ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস, কী জ্বালা! দু-দণ্ড শান্তিও কি নেই?

টেলিগ্রামে চোখ বুলিয়েই ফিরিয়ে দিল রাজা। মাথা নেড়ে জানাল জবাব দেবার কোনও সদিচ্ছাই তার নেই।

এক ঘণ্টাও গেল না। আবার দ্রুতছন্দে আবির্ভাব ঘটল জাপানি সোফারের। হাতে আর একটা টেলিগ্রাম। না, এবারও জবাব দেবে না রাজা। কিছুক্ষণ যেতে-না-যেতেই এল আবার একটা টেলিগ্রাম। এবারও বিষম বিরক্তিতে মাথা নাড়ল রাজা। একই দৃশ্যের পুনরাভিনয় হয়ে চলল বারংবার।

সারাদিন গেল। পরের দিন গেল। তার পরের দিনও ঘটল তাই। পরপর তিন দিন একই দৃশ্য ঘটে চলল ঘণ্টায়-ঘণ্টায়। রাজা কঙ্ক উদাসীন। কিন্তু বিরাম নেই টেলিগ্রাম আসার। উদগ্র কৌতূহলে থমথম করতে লাগল সারা সমুদ্র-সৈকত।

সাহস করে কেউ যদি একখানা টেলিগ্রামেও চোখ বুলোত, থ হয়ে যেত সঙ্গে-সঙ্গে।

কেন না, প্রতিটি টেলিগ্রামই ফাঁকা—একটি শব্দও লেখা নেই তাতে।

এতবড় ধোঁকাবাজি অনুমান করার ক্ষমতাও এল না কারও মাথায়। তাই পুরো একটা সপ্তাহ গেল শুধু এই খেল দেখেই। রহস্য যখন তুঙ্গে পৌঁছল, আসর যখন গমগমে হয়ে উঠল, রাজার নামে টেলিগ্রাম আসা নিয়ে যখন সমুদ্র-সৈকতের ফিসফিসানি সমুদ্র গর্জনের সঙ্গে একাকার হয়ে গেল, তখন খানদানি খোলস খুলে ঈষৎ আত্মপ্রকাশ করল রাজা। তাও সোফারের মুখ দিয়ে।

টেলিগ্রাম কীসের? আরে ছো:! দেশ বিদেশের বহু কারবারি চাইছে তার উপদেশ, চাইছে তার সাহায্য, সহযোগিতা। বড়-বড় কারবারে রাজা কঙ্কর টাকা চাই। রাজা কঙ্ক থাকলেই চলবে সেসব কারবার, নইলে নয়। কিন্তু নাম-মাহাত্ম্যের বিড়ম্বনায় রাজা বিলক্ষণ বিড়ম্বিত। কারণ, রাজা কঙ্কর আর টাকার দরকার নেই। এত টাকা জমেছে তার ভাঁড়ারে যে নতুন অর্থের কোনও লালসাই আর নেই। তাই রাজা উদাসীন। তাই টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম আসছে, কিন্তু জবাব যাচ্ছে না কোনওটারই।

সাড়া পড়ে গেল কোলভা বিচে। সাক্ষাৎ কুবের নাকি? এত টাকাও মানুষের থাকে?

সফল হল রাজার প্রথম চাল। খানদানি মহলে কায়েমি হয়ে গেল রাজার মৌরসী পাট্টা। তবুও রাজার প্রাণে সুখ নেই। কেন না, উঁচু মহলকে নিয়ে তো তার দরকার নয়। দরকার এমন একজনকে যে উঁচু মহলের বাসিন্দা নয়, অথচ নজর সেই দিকেই। প্রাণে শখ অনেক, কিন্তু সাধ্য নেই। কারণ, তার অর্থ চাই—আরও অর্থ!

রাজা খুঁজছে এমনি এক শিকারকে। কোন হতভাগ্যের ওপর শ্যেন দৃষ্টি পড়বে রাজার, তা এখনও জানা যায়নি বটে, তবে জমি প্রস্তুত। এখন শুধু প্রতীক্ষা।

পুরো তিনটে দিনও গেল না—সার্থক হল প্রতীক্ষা। কোলভা বিচে আবির্ভাব ঘটল এক আজব জীবের। ঝলমলে ইমপালা গাড়ি থেকে নামলেও সাগর স্নান সম্বন্ধে বিলক্ষণ শঙ্কিত লোকটা। তেল-চুকচুকে মুখ। কিন্তু টাই স্যুট পরে 'কী হনু' একটা ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা সর্বক্ষণ। কয়েকবার দেখেই জীবটিকে পছন্দ হয়ে গেল রাজা কঙ্কর।

'কী হনু' প্রাণীটির নাম নাকি নির্বাণকুমার। ফিল্মস্টারদের নামের অনুকরণে নামগ্রহণের মধ্যেও উঁচু মহলে ওঠার প্রয়াস। চড়ুকে হাসি সবসময়েই অট্টহাসির সামিল। বিচে যারা কেষ্টবিষ্টু, তাদের গায়ে গা ঘষবার চেষ্টা অষ্টপ্রহর। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। দেখেশুনে পুলকিত হল রাজা কঙ্কর চিত্ত। যাক, এতদিনে পাওয়া গেছে আসল মালকে! এবার টোপ ফেলা, তারপর খেলিয়ে তোলা!

নির্বাণকুমারের চড়ুকে হাসি আর গায়ে পড়ে আলাপ করার ব্যর্থ চেষ্টায় সবারই ভুরু যখন উত্থিত, এবং কোথাও কল্কে না পেয়ে নির্বাণকুমার নিজেও যখন দমিত, ঠিক তখনি সিগার-স্ট্যান্ডে যেচে কথা বলল রাজা কঙ্ক। আকাশের চাঁদ হাতে পেল নির্বাণকুমার। গোটা বিচের কাউকে যে মানুষটা পাত্তা দেয় না, সেই রাজা কঙ্ক স্বয়ং আলাপ করতে চাইছে তার সঙ্গে? কৃতার্থ হয়ে গেল নির্বাণকুমার।

সুতরাং আলাপ জমতে দেরি হল না। দু-দিন যেতে-না-যেতেই নিবিড় সখ্যতা গড়ে উঠল দুজনের মধ্যে। কাজের কথা এল তারপরে।

নির্বাণকুমার অবাক হয়েছিল রাজার হাতে একটি বাক্স দেখে। চৌকোণা বাক্স। তাতে কয়েকটা ছিদ্র, চাকা, বোতাম ইত্যাদি। কাঠের বাক্স। কিন্তু বাক্সের উদ্দেশ্য বোঝা ভার। রাজকীয় চালচলনের মধ্যেও কেন যে বাক্সটাকে অষ্টপ্রহর সঙ্গে রাখে রাজা, সেই হেঁয়ালির রহস্য উদ্ধার করতেই কালঘাম ছুটে গেল নির্বাণকুমারের।

রাজা কিন্তু নির্বিকার। বাক্স আগলায় যকের ধনের মতো। দিন নেই, রাত নেই—সর্বক্ষণ কদাকার চেহারার বাক্স রয়েছে সঙ্গে। যেন নয়নের মণি, যেন সাত রাজার ধন, যেন সাগরসেঁচা মাণিক। ব্যাপারস্যাপার দেখে নির্বাণকুমার তো হতবাক। দু-একবার কথা পাড়তে গিয়েও বেকুব হল। রাজা কঙ্ক বাক্স প্রসঙ্গের ধার দিয়েও গেল না।

অবশেষে সময় এল। কথা হচ্ছিল ব্যালকনিতে। টাকাকড়ি নিয়ে আলোচনা। কথায়-কথায় নির্বাণকুমার ব্যক্ত করল তার মনোভাব। আহারে! কী সুখেই না রয়েছেন রাজা কঙ্ক! টাকার পাহাড়ে বসে কী নিরবচ্ছিন্ন শান্তি! ধমনীতে বইছে নীলরক্ত মানে ব্লু ব্লাড। খানদানি রক্ত। কোষাগারে কাঁড়ি-কাঁড়ি ধনরত্ন। কাজেই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টাকা রোজগারের কোনও ভাবনাই নেই রাজা কঙ্কর।

সুযোগ বুঝে রাজা কঙ্ক শুরু করল আত্মকাহিনি। বলা বাহুল্য সবটাই গাঁজার দম। বলল, দেশবিভাগের আগের ঐশ্বর্য। সবই তো পড়ে পাকিস্তানে। জমিজমা-সোনাদানা—স—ব। প্রথম-প্রথম কী কষ্টেই না দিন গেছে। বাইরে লণ্ঠন, ভেতরে ঠনঠন। ঠাট বজায় রাখতে গিয়ে হিমশিম খাওয়া!

তবে উদ্যোগী পুরুষের হাতেই দুনিয়া আসে। রাজা কঙ্কও বিস্তর মেহনত করে সংগ্রহ করেছে এমন একটা যন্ত্র, যা দিয়ে দুনিয়াটাকে কেনা যায়।

শুনে তো চক্ষু চড়কগাছ হওয়ার উপক্রম হল নির্বাণকুমারের। আশ্চর্য যন্ত্রর কাহিনি তাকে শুনতেই হবে। অনেক কাঁদুনির পর নিমরাজি হয়ে রাজা কঙ্ক নিবেদন করল অদ্ভুত যন্ত্রর বিচিত্র উপাখ্যান।

বলল, 'এ মেশিন আমার হলেও আবিষ্কারটা আমার নয়। আধুনিক বিজ্ঞান তাকে মেশিনই বলবে। কিন্তু কলকব্জার বাহাদুরি বিজ্ঞানের নয়।'

'কীসের?'

'তন্ত্রের।'

'তন্ত্রের?'

'হ্যাঁ, তন্ত্রের। এক তান্ত্রিক-সাধকের সাক্ষাত পেয়েছিলাম কনখলে। বস্তুবিজ্ঞান তন্ত্রসাধকের কাছে কতখানি অকিঞ্চিৎকর, তারই প্রমাণ দেওয়ার জন্যে তিনি যন্ত্রটা বানিয়েছিলেন আমারই সামনে। ভেতরে আছে অদ্ভুত-অদ্ভুত কতকগুলো আরক আর জড়িবুটি। আশ্চর্য এদের ক্ষমতা। যে-কোনও টাকার নোটকে ডবল করে দিতে পারে! এক টাকা থেকে শুরু করে হাজার টাকার নোট পর্যন্ত হুবহু কপি করে দেয়।'

'কী করে?' হাঁ বন্ধ করে শুধোয় নির্বাণকুমার।

'মন্ত্রের ক্ষমতায় তো বটেই। তা ছাড়া আরকের গুণও আছে। হাজার টাকার নোট এদিক দিয়ে ঢুকিয়ে দিন—ওদিক দিয়ে বেরিয়ে আসবে পরপর দুটো নোট—হুবহু একরকম।'

নির্বাণকুমার নির্বোধ নয়। তাই অবিশ্বাসের মেঘ ঘনায় কুতকুতে দুই চোখে। শুধোয় সন্দিগ্ধ কণ্ঠে, 'ঠাট্টা করছেন?'

যেন বিষম আহত হল রাজা কঙ্ক। আরক্ত মুখে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। অবশেষে বলল অতি মৃদু কণ্ঠে, 'আমি ঠাট্টা করি না। আমি মিথ্যে বলি না। ও দোষ আমার রক্তে নেই।'

কিছুক্ষণ বিরতি। তাইতেই কাজ হল। এমন সাংঘাতিক ধাক্কা খেল নির্বাণকুমার যে কথাই বলতে পারল না কিছুক্ষণ। রাজা কঙ্ক নিজেই কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বললে, 'এ মেশিন পৃথিবীতে আর দুটি নেই। সাধকের সাক্ষাত পাওয়াও এখন মুশকিল। আপনি অবিশ্বাস করতে পারেন। কিন্তু তাতে আমার কী?'

ঢোক গিলে তাড়াতাড়ি বলে নির্বাণকুমার, 'না...না...অবিশ্বাসের কথা বলিনি। বলছিলাম কি, নোটজালের কারবারে ঝুঁকি তো অনেক—

কথাটা শেষ করতে পারল না নির্বাণকুমার। বাকি শব্দগুলো স্রেফ গিলে ফেলল রাজা কঙ্কর চোখ দেখে।

সেকী চোখ! বাঘের চোখেও এত তেজ থাকে কি না সন্দেহ। সেই সঙ্গে নি:সীম অপমানের ধিক-ধিক বহ্নি।

অনেকক্ষণ পরে সামলে নিল রাজা। বলল অবরুদ্ধ কণ্ঠে, 'আমি জালিয়াত নই। নোট জাল করা আমার পেশা নয়। মন্ত্রের কৃপায়, আরক আর জড়িবুটির মাহাত্ম্যে, তান্ত্রিক সাধকের দৌলতে আমি যা বানাই, তা জালনোট নয়—আসল নোট। নকল নয়—কেননা, কোনও তফাত থাকে না আসলের সঙ্গে। তাই যে-কোনও ব্যাঙ্কে চলে আমার নোট। দেখবেন হাজার টাকার নোট কীভাবে ডবল করি?'

নির্বাণকুমার তো তাই চায়। সঙ্গে-সঙ্গে গেল রাজা কঙ্কর ঘরে। বাক্সটা কাছেই ছিল। রোজউড টেবিলের ওপর রাখা হল কদাকার বস্তুটা। দু-দিকে দুটো ফুটো। ঝকমকে তামা পিতল-ইস্পাতের নাট, বল্টু, চাকা আর টেলিফোন ডায়ালের মতো ডায়াল। দেখতে কিম্ভুতকিমাকার সন্দেহ নেই। কিন্তু কারিগরির বাহাদুরিতে, বিশেষ করে তান্ত্রিক সাধুর কপোল কাহিনি শোনার পর, কিম্ভুত বাক্সটাই অদ্ভুত শক্তিশালী মনে হল নির্বাণকুমারের চোখে।

হাজার টাকার একটা নোট বার করল রাজা কঙ্ক। পরখ করতে দিল নির্বাণকুমারকে। তারপর রোল করে পাকিয়ে ঢুকিয়ে দিল একদিকের ফুটো দিয়ে। অন্যদিকের ফুটো দিয়ে ঢোকাল আর একটা কাগজের রোল। কাগজের সাইজ হাজার টাকার নোটের মতোই। একটুও ছোট নয়, বা বড় নয়। ডায়াল ঘোরাল খুব হিসেব করে। কতকগুলো চাকা নাড়াল খুব সন্তর্পণে। টিপল বোতাম, আলগা করল নাট, খটাস করে তুলে দিল একটা সুইচ।

বলল, 'এখন আরকে ডুবে রয়েছে সাদা কাগজ আর নোট। আরক আর জড়িবুটির কাজ শুরু হয়ে গেছে। রোল করা অবস্থাতেই নোটটার হুবহু কপি উঠে যাবে রোল করা সাদা কাগজে। সময় লাগবে ছ'ঘণ্টা। ছ'ঘণ্টা পরে দেখবেন আসল নোট আসলই রয়ে গেছে—কোথাও আঁচড় পড়েনি। পাশাপাশি থাকবে আরও একটা আসল নোট।'

বাকতাল্লার তুফানে নির্বাণকুমারের মাথায় তখন চর্কিপাক লেগেছে। কাজেই ছ'টি ঘণ্টা যে কীভাবে উড়ে গেল, তা টের পেল না ভদ্রলোক। ছ'ঘণ্টা পর অসীম উৎকণ্ঠা নিয়ে দুজনে এল রাজার ঘরে। অতি সন্তর্পণে আবার ডায়াল ঘোরাল রাজা, চাকা নাড়াল হিসেব করে, বোতাম টিপল পটাপট শব্দে, সবশেষে হাতলে চাপ দিতেই ফুটো দিয়ে পরপর বেরিয়ে এল দু-দুটো নোট।

হাজার টাকার নোট!

চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসার উপক্রম হল নির্বাণকুমারের। দুটো নোটই তখনও ভিজে। টেবিলের ওপর পাশাপাশি নোট দুটো বিছিয়ে ধরল রাজা। দেখল, নির্বাণকুমারের ছানাবড়া চোখে তখনও যেন কিছুটা অবিশ্বাস। তাই বলল সহজ সুরে, 'এক কাজ করুন। দুটো আলাদা ব্যাঙ্কে গিয়ে ভাঙিয়ে আনুন নোট দুখানা। এক ব্যাঙ্কে একই নম্বরের দু-খানা নোট নিয়ে যাবেন না। কী দরকার খামোকা ওদের কৌতূহল বাড়িয়ে। মাঝখান থেকে আমার গোপন যন্ত্র আর গোপন থাকবে না।'

দুরু-দুরু বুকে নির্বাণকুমার ছুটল দু-হাতে দু-খানা নোট নিয়ে। ফিরে এল নাচতে-নাচতে। দু-হাজার টাকার ভাঙানি দু-হাতে।

রাজা কঙ্ক কিন্তু নির্বিকার। নোটের ভাঙানি তো মিলবেই। দুটো নোটই যে আসল। আগে থেকেই আর একটা হাজার টাকার নোট অদ্ভুত যন্ত্রর মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল রাজা। তবে নয়া নোটের নাম্বারে অবশ্য সামান্য কারসাজি করতে হয়েছিল আগেভাগে। বেশি কিছু নয়। ইংরেজি 3 আর 8 কে সযত্নে কলম বুলোতে হয়েছিল। ফলে হুবহু মিলে গিয়েছিল দুটো নাম্বার।

কিন্তু নির্বাণকুমারের উল্লাস দেখবার মতো। ভুঁড়ি নাচিয়ে ঘরময় সে কী রক-এন-রোল ড্যান্স! অতি কষ্টে হাসি চেপে চুরুট নিয়ে বসে রইল রাজা কঙ্ক।

কিছুক্ষণ পরে বেদম হাঁপিয়ে কাছে এল নির্বাণকুমার। বলল, 'রাজাসাহেব, দুনিয়ায় এ মেশিন একটাই আছে, তাই না?'

'হ্যাঁ।' বলে নির্বাণকুমারের মুখে ভাবের খেলা দেখল রাজা। উল্লাস তিরোহিত হচ্ছে—আসছে উদ্বেগ। দেখে মিষ্টি গলায় বলল, 'অবশ্য সাধুর ঠিকানা আমিই কেবল জানি। দুর্গম পথ। হিমালয় অঞ্চল তো।'

শুকনো ঠোঁটে জিভ বুলোয় নির্বাণকুমার। অধীর আগ্রহে শুধোয়, 'দেখা হলে আপনার কথা শুনবেন তো?'

'কী কথা?'

'মানে...ইয়ে...আর একটা যন্ত্র যদি চান?'

চুপ করে রইল রাজা কঙ্ক। সঙ্গে-সঙ্গে কোনও জবাব দিল না। মিনিট কয়েক চুরুট টানার পর সাসপেন্স যখন তুঙ্গে পৌঁছল, তখন ছোট্ট করে বলল, 'কেন?'

'আপনার এই মেশিনটা তা হলে আমি কিনে নিতাম।'

আবার সাসপেন্স। এমনভাবে চেয়ে রইল রাজা কঙ্ক, যেন সামনে একটা ডাহা উন্মাদ দাঁড়িয়ে। সে কী অভিনয়। দানীবাবুও ছার তার সেই প্রতিভার কাছে!

'কিনবেন?' অপরিসীম তাচ্ছিল্য দেখাল রাজা। 'মেশিন কিনবেন? কত টাকা আছে আপনার?'

তোতলা হয়ে গেল নির্বাণকুমার, 'সঙ্গে তো বেশি আনিনি। তিরিশ হাজার এখুনি দিচ্ছি। ওয়াইফের জড়োয়া সেট দিচ্ছি—দাম লাখতিনেক তো হবেই। তারপরও লাখ টাকা নগদ দেব বোম্বাই গিয়ে। কথা দিচ্ছি। জানি এ মেশিনের দাম টাকা দিয়ে হয় না। কিন্তু বন্ধুর একটি কথা রাখুন...' তুবড়ি ছোটাল নির্বাণকুমার। হিসেবি বুদ্ধি গোল্লায় গেল। জুয়োর নেশা চাপলে ঘাড়ে যেমন ভূত চাপে—নির্বাণকুমারেরও হল তাই। ঝাড়া আধ ঘণ্টা সে কী নাকে-কাঁদুনি মেশিনটার জন্যে। চুরুট মুখে দিয়ে বোবার মতো বসে রইল রাজা কঙ্ক। অনেকক্ষণ পরে পাঁজর গুঁড়োনো দীর্ঘশ্বাস ফেলে কেবল বলল, 'জলের দাম দিচ্ছেন আপনি।'

এরপর শুরু হল বিড়াল তপস্বীর সর্বশেষ চাল। বলল, 'বন্ধুর মান আমার কাছে সবার আগে। টাকার অভাব আমার নেই। সাধুবাবার সঙ্গে দেখা হলে আর-একটা ব্যবস্থা না হয় করা যাবে। বেশ, কী আছে আপনার এনে দিন।' হিসেব করে দেখল রাজা, নোট ডবল হতে ছ'ঘণ্টা লাগে। এর মধ্যেই পগারপার হওয়া যাবে গোয়া ছেড়ে।

সঙ্গে-সঙ্গে লাখ তিনেক টাকার জড়োয়া এল রাজার হাতে। সেই সঙ্গে তিরিশ হাজার নগদ। বিনিময়ে মেশিন সমর্পণ করল নির্বাণকুমারের হাতে। ভুঁড়ো শিয়াল আশ্চর্য বাক্স নিয়ে তৎক্ষণাৎ ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োল গৃহিণীর কাছে।

আর, ঠিক দশ মিনিটের মধ্যে রোলসরয়েস নিয়ে চম্পট দিল প্রবঞ্চক-সম্রাট।

প্রবঞ্চনা ধড়া পড়ল কিন্তু ছ'ঘণ্টারও অনেক ঘণ্টা, অনেকদিন পরে। ডবল নোটের সৃষ্টি চোখের সামনে দেখে নির্বাণকুমারের মনে বিশ্বাস বটগাছের শেকড়ের মতোই দৃঢ়মূল হয়ে গিয়েছিল। তাই, রাজা যে তাকে বোকা পাঁঠা বানিয়ে লম্বা দিয়েছে, এই সহজ সত্যটা কিছুতেই মাথায় আনতে পারছিল না বেচারি। ছ'ঘণ্টা পরেও যখন ডবল নোট বেরুল না বাক্স থেকে, তখন ভাবল নিশ্চয় যন্ত্র চালানোয় কিছু ভুল হয়েছে। তাই ফের বসল খুটখাট করতে। এইভাবে নোটের পর নোট ঢুকল ভেতরে। গেল বেশ কয়েকটা সপ্তাহ।

অবশেষে একদিন ধৈর্যচ্যুতি ঘটল খাণ্ডার বউয়ের। তিন লাখ টাকার জড়োয়া গচ্ছা দিয়ে মন করকর করছিল বেচারির! তাই নাওয়া-খাওয়া ভুলে দিনের-পর-দিন বাক্স নিয়ে কস্তাকস্তির হেস্তনেস্ত করল ভদ্রমহিলা এক মিনিটেই।

বিশেষ কিছু না। বাক্সটি নিয়ে সজোরে আছাড় মারল মেঝেতে। তারপর হাতুড়ি-পেটা করতেই ডালা উড়ে গেল। ভেতরে দেখা গেল তালগোল পাকানো কিছু আস্ত নোট—যা নির্বাণকুমার ঠেলে-ঠেলে ঢুকিয়েছে ডবল করার প্রচেষ্টায়। আর কয়েকটা রোলার আর একটা খালি টিন।

ব্যস, আশ্চর্য বাক্সর মধ্যে আর কিছুই নেই। আরক, জড়িবুটি, মন্ত্র-তন্ত্র—কিচ্ছু না।

পলকহীন চোখে চেয়েছিল নির্বাণকুমার। অনেকক্ষণ পরে শুধু বলেছিল, 'বুঝেছি, আরক শুকিয়ে গেছে। তাই বিগড়েছে মেশিন। ঠিক আছে। রাজার সঙ্গে দেখা হলেই চেয়ে নেওয়া যাবে নতুন আরক। তারপর কামানো যাবে লাখ-লাখ টাকা। গিন্নি, আমি কুবের হব।'

কিন্তু আক্কেল দাঁত যে কী জিনিস—জড়োয়া খুইয়ে গৃহিণী তখন তা হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছিল। সুতরাং নির্বাণকুমারের কুবের হওয়ার সাধ নাকি খেংরে ঝেড়ে দিয়েছিল ভদ্রমহিলা।

সম্পাদক মশায়, সংক্ষেপে এই হল রাজা কঙ্কর অসামান্য প্রতারণা কাহিনির একটি মাত্র অধ্যায়। এ-কাহিনির উপসংহার কবে টানব, তা জানি না। কারণ, রাজা এখনও রাজা। স্বাধীন। ইন্দিরা গান্ধীর সহস্র

প্রচেষ্টাও তার রাজা খেতাব মুছতে পারবে না। কারণ রাজত্ব তার কস্মিন কালেও ছিল না, থাকবে না। কিন্তু রাজা সে থাকবেই। রাজা ঐশ্বর্যের মোহ দিয়ে অন্ধ করে লুণ্ঠনও করবে হবু রাজাদের। এই তার জীবনের ব্রত।

আমি তার ঠিকানা খুঁজছি। মোলাকাতের সখ হয়েছে। রাজার নতুন কীর্তিকলাপের সন্ধান পেলে জানাবেন? আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকার অগণিত পাঠকসাধারণের একজনের ধারে-কাছে যদি রাজার মতো কেউ আসে রাজকীয় ঠাটবাট নিয়ে, তবে তিনি যেন সাবধান হন। রূপে সে সত্যিই রাজা, বাকতাল্লায় দুঁদে সেলসম্যান। রোলসরয়েস কি মনোপ্লেন দিয়ে হয়তো চোখ ধাঁধিয়ে আগমন ঘটবে তার। ঝোপ বুঝে কোপটি মেরেই উধাও হবে অশরীরীর মতো।

উধাও হওয়ার আগেই যদি খবরটা পাঠান আমায়, সমাজের একটা উপকার করতে পারতাম।

নমস্কার জানবেন। ইতি—

প্রীত্যর্থী
ইন্দ্রনাথ রুদ্র

**'রোমাঞ্চ পত্রিকায় প্রকাশিত (জানুয়ারি, ১৯৭১)।*

সোনার আতা

কে জানত সোনার আতা সত্যিই অভিশপ্ত? কে জানত স্বয়ং যক্ষ এর রক্ষক? কে জানত গোরস্থানেও গুপ্তধন থাকে?

এ-কাহিনি ইন্দ্রনাথের হেরে যাওয়ার কাহিনি—কিন্তু রোমাঞ্চকর। তাই শোনাই।

ক্যাম-মুক্স-এর আসল নাম কমলিকা মুখার্জি। বাবা বিলেত ঘুরে এসেও লুঙ্গি পরতেন। কিন্তু মা বিলেত ফেরত স্বামীর প্রেস্টিজ বজায় রাখলেন। মেয়েকে কনভেন্টে ঢোকালেন। ভাটিয়া-পাঞ্জাবি-মাদ্রাজিদের সঙ্গে এলিমেন্টারি বাংলা পড়ালেন। নামটাকে পর্যন্ত পালটে দিলেন।

কমলিকার আড্ডাখানা পার্ক স্ট্রিটে। সেখানকার নাচের আড্ডায়, মদের আড্ডায়, কালচারাল আড্ডায় সে একটি সুপরিচিত ভোমরা। তার সম্পূর্ণ নগ্ন পিঠ এবং প্রায় নগ্ন বক্ষদেশের বিজ্ঞাপনের সঙ্গে পরিচিত সকলেই। চকচকে রঙচঙে তেলতেলে মুখ, এলোমেলো আছাঁটা চুল, ইট-রঙিন রাক্ষুসি নখ এবং নিতম্ব কামড়ানো স্ল্যাকস পরা নাগর জোটানো ক্যাম মুক্সকে চেনে না এমন উজবুক ও-পাড়ায় নেই। খোকা-খোকা ক্লাউন সদৃশ নব্যযুবক থেকে আরম্ভ করে হোটেল-বারের বেয়ারা বাবুর্চি পর্যন্ত সবাইকেই সে ধন্য করেছে তার মদির কটাক্ষ আর বিলোল হাসির প্রসাদ দিয়ে। চুম্বনের স্বর্গে পর্যন্ত টেনে তুলেছে কয়েকজন ভাগ্যবানকে—আরও অধ:পতন ঘটেছে কি না জানা নেই।

এমন সময়ে কমলিকা হারাল তার বাবা এবং মাকে একই দিনে—সাংঘাতিক মোটর দুর্ঘটনায়। চোখের জল শুকিয়ে যাওয়ার পর খুলল বাবার সিন্দুক। পেল অনেক কিছু। সেই সঙ্গে একটা সোনার আতা আর একটা তাম্রপত্র।

চক্ষুস্থির হল ম্যাড়মেড়ে তাম্রফলককে চকচকে করতেই। খুদে-খুদে ইংরেজি হরফে উৎকীর্ণ একটা উদ্ভট ইতিহাস। আর একটা গুপ্তধনের নকশা। বর্তমান মুদ্রাস্ফীতির বাজারে তার পরিমাণ—প্রায় তিরিশ কোটি টাকা।

সিপাই বিদ্রোহের সময়ে সর্বনাশ করা হয়েছিল এক নেটিভ রাজার। লুণ্ঠিত হয়েছিল তাঁর কুবের সম্পদে ঠাসা কোষাগার। সোনার আতা বোঝাই একটা মস্ত সিন্দুক ছিল ধনরত্নের মধ্যে। বিদ্রোহ থেমে গেলে কলকাতায় বদলি হল ব্রিটিশ অফিসারটি। সঙ্গে এল সোনার আতা। পুঁতে রাখা হল পার্ক স্ট্রিটের পুরোনো কবরখানায় একটি কবরের তলায়।

বংশ পরম্পরায় হাত বদল হয়েছে নকশা আঁকা এই তাম্রফলক। এখন পৌঁছল কমলিকার হাতে। কমলিকার মায়ের পূর্ব-পুরুষই সেই নৃশংস ইংরেজ সেনাপতি। তৈমুর লং নাদির শাকেও সে লজ্জা দিয়েছিল সোনার আতা লুঠ করার সময়ে। শেষকালে অবশ্য ধর্মে মতি হয়েছিল এক হিন্দু বিধবাকে বিয়ে করার পর।

স্বর্ণ পিণ্ডের বিপুল স্তূপ নাকি আজও অভিশপ্ত। বাবার সিন্দুকে একটা চিঠিও পেল কমলিকা। মেয়েকে তিনি হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। জীবিতকালে সোনার আতার কথা ইচ্ছে করে বলেননি। কাঁচা বয়েসে লোভের বশে সর্বনাশ আসতে কতক্ষণ? সাবধান! সাবধান! সুদীর্ঘ দুটি শতাব্দী অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু কারা যেন এখনও আগলে রেখেছে স্বর্ণ ভাণ্ডারকে। গোরস্থান অত্যন্ত নিরাপদ বিবেচনা করেই গুপ্তধনকে গুপ্ত রাখা হয়েছিল সেখানে —বিশেষ একটি স্মৃতিসৌধের তলায়। কিন্তু কে জানত কবরখানার অতৃপ্ত আত্মারাই পুঞ্জীভূত অশুভ শক্তি নিয়ে আগলে রাখবে রাজরক্তে রঞ্জিত স্বর্ণ ভাণ্ডারকে? কে জানে নিষ্ঠুরভাবে সবংশে নিহত সেই রাজন্যবর্গই যুগ-যুগ ধরে প্রহরা দিচ্ছে কিনা তাদের লুণ্ঠিত কোষাগারকে?

সঠিক কিছুই জানা যায়নি। শুধু জানা গেছে স্বর্ণলোভে উন্মাদ হয়ে যারাই হানা দিয়েছে প্রেতমহল্লায় তারাই মায়া কাটিয়েছে ইহলোকের রাত পোহাতে-না-পোহাতে। হিমকঠিন প্রাণহীন দেহ পাওয়া গিয়েছে কবরখানার জঙ্গলে।

যে দুজন পূর্বপুরুষ এইভাবে প্রাণ হারিয়েছেন তাঁরা ভীতু ছিলেন না। তবুও বিষম ভয়ে দু-জনেরই মুখের চেহারা নাকি পালটে গিয়েছিল। সুতরাং কমলিকা যেন গোরস্থানের ত্রিসীমানাও না মাড়ায় এবং গুপ্তধনের হদিশ গল্পচ্ছলেও কারও কাছে না বলে। সম্পদ থেকেই বিপদ আসে। এবং গুপ্তধন যেন ব্যক্ত না হয়।

কন্যা-অন্ত পিতৃদেবের জ্ঞানগর্ভ পত্র পেয়ে চমৎকৃত হল কমলিকা। বিলেত ঘুরে এসেও এত কুসংস্কার? ভূতপ্রেত পিশাচ দানো তো মনের বিকার। মাইক্রোসকোপ দিয়ে যাদের দেখা যায় না, স্পেকট্রামে যাদের ঠিকানা থাকে না, ক্যামেরায় যাদের ছবি ওঠে না, তারা আবার আছে নাকি? কবরখানায় যাঁরা অক্কা পেয়েছেন তাঁরা ভয়ের চোটেই টিকিট কেটেছেন। নিশ্চয় হার্টের রোগ ছিল। আগাছায় পা বেঁধে গিয়ে অথবা শেয়ালের তাড়া খেয়ে অথবা প্যাঁচার ডানা ঝটপটানিতে অথবা বাদুরের ছায়াপাতে অথবা...ইত্যাদি ইত্যাদি।

[illegible] আগেই নিশ্চয় ঘটেছিল। এবার একটু ভালো করেই ঘটল। স্যাম্পেনের ঝোঁকে সরস আকারে কাহিনিটি পরিবেশন করা হল দুই বয়ফ্রেন্ডের কাছে। ব্যক্ত হল গুপ্তধন।

সাতদিনও গেল না।

ইন্দ্রনাথের মেসে দেখা গেল কমলিকাকে। বলল ত্রাস-বিস্ফারিত উদ্বেগ-থরথর চোখে—আমাকে বাঁচান। ওরা হয় নিজেরা মরবে নয় আমাকে মারবে।

কামপঙ্কে নিমজ্জিত কমলিকার কেচ্ছাকালো মুখের দিকেও তাকাতে পারছিল না ইন্দ্রনাথ। নখ খুঁটতে-খুঁটতে বলল, কেন?

গুপ্তধনের খবরটা যাতে আর না ছড়ায়। ভূপেশ আর মাইকেল দুজনেই পকেটে ছুরি নিয়ে ঘুরছে। দুজনেই দুজনকে মারতে চাইছে। তারপর নকশাটা ভোগা মেরে গুপ্তধনের মালিক হতে চাইছে।

নকশাটা কোথায়?

বলব কেন? এমন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছি কেউ খুঁজে পাবে না। তাছাড়া সোনার আতার জন্যে তো আসিনি আপনার কাছে।

তবে কেন এসেছেন?

বাঁচতে।

কিন্তু বাঁচানো গেল না।

সেইদিনই রাত আটটায় পার্ক সার্কাসের পুরোনো কবরখানায় খতম হয়ে গেল ক্যাম মুক্স। নিভে গেল বংশের প্রদীপ। সম্পূর্ণ হল স্বর্ণপিণ্ডের অভিশাপ। কায়াহীনের মায়াঘেরা কাঞ্চন ভাণ্ডারের রক্ষক স্বয়ং রাজযক্ষ কি না তা নিয়ে কিন্তু মোটেই মাথা ঘামাল না ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর জয়ন্ত চৌধুরী।

টেলিফোন এল রাত দশটায়।

ইন্দ্রনাথ? আমি জয়ন্ত বলছি। ক্যাম-মুক্স খুন হয়েছে গোরস্থানের মধ্যে। ওর হ্যান্ডব্যাগে তোর নাম ঠিকানা লেখা একটা কাগজ পেলাম। তুই কিছু জানিস?

জানি। বলে মুখ কালো করে সব বলল ইন্দ্রনাথ। মুখ কালো হল তীব্র গ্লানিতে। মেয়েটা বাঁচতে এসেছিল। কিন্তু...

সব শুনে জয়ন্ত বললে, রাত সাড়ে সাতটার সময়ে লালবাজারে ফোন করে ভূপেশ বলল এইমাত্র নাকি ক্যাম মুক্সকে ছুরি মেরে পালিয়েছে মাইকেল। জিপ নিয়ে ছুটলাম তক্ষুনি। গাড়ি দাঁড়াতে-না-দাঁড়াতেই পেট্রল পাম্পের দিক থেকে ছুটে এল ভূপেশ ছোকরা। বেলবটমের মতো লটপটে জিন আর গা কামড়ানো স্কিনি গেঞ্জি। লম্বা-লম্বা চুল আর চিনেম্যানের মতো ঝোলা গোঁফ। ভীষণ উত্তেজিত। সে নাকি গোরস্থানের

নিরিবিলিতে বসে গল্প করছিল ক্যাম- মুক্সকে নিয়ে। প্রোগ্রাম ছিল এখান থেকেই সটান যাবে ইন অ্যান্ড আউটয়ের সাইকেডেলিক নাচের আসরে।

এমন সময়ে ঝোপের মধ্যে থেকে বিদ্যুৎবেগে বেরিয়ে এল একটা ছায়ামূর্তি। দমাস করে ক্যাম-মুক্স-এর বুকে ঘুসি মেরেই পালিয়ে গেল এঁকেবেঁকে। তারার আলোয় মুখের আদল আর ছোটার ধরন দেখেই মাইকেলকে চিনতে পেরেছিল ভূপেশ।

ঘুসি খেয়ে ছিটকে পড়েও কেন তেড়ে উঠছে না ক্যাম-মুক্স তা দেখবার জন্যে লাইটার জ্বালিয়েছিল ভূপেশ। বুকের বাঁ-দিকে ছুরির ফুটো আর ফিনকি রক্ত দেখেই সটান ছুটেছে পেট্রল পাম্প থেকে লালবাজারে ফোন করতে।

জিগ্যেস করেছিলাম, পার্ক স্ট্রিটের পুলিশ ঘাঁটি তো পাশেই ছিল। লালবাজারে ফোন করা হল কেন? সে বললে, দু-দিন আগে ডিসি-ডিডি-র আবেদন পড়েছিল স্টেটসম্যানে—চুরি-ডাকাতি খুন-খারাপির খবরটা তাঁকে সোজা জানালে নাকি অপরাধীকে ঝটপট ধরা যায়।

মেয়েটাকে মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করলাম। ভূপেশকে আরও জেরা করার জন্যে লালবাজারে নিয়ে এলাম। ঘরে ঢুকতেই একটা ছোকরা তেড়ে এসে গলা টিপে ধরল ভূপেশের। সেপাই এসে ছাড়াল। এই ছোকরাই মাইকেল। লালবাজারে এসেছে ভূপেশের কুকীর্তি ফাঁস করতে। পকেট থেকে এক জোড়া মিনার্ভার টিকিট বের করে দেখাল নাইট শোয়ের টিকিট। কথা ছিল ক্যাম-মুক্স সঙ্গে যাবে। তার আগে কবরখানার নিরিবিলিতে বসে একটু ইয়ে করেছিল। এমন সময় ঝোপের মধ্যে থেকে বিদ্যুৎ বেগে বেরিয়ে এল একটা ছায়ামূর্তি...

বাকি কথাগুলো ভূপেশের কথার মতোই—তফাত নেই। দুজনের চেহারাও একরকম। তালঢ্যাঙা, লম্বাচুল, ঢিলে জিন টাইট স্কিনি, ঝোলা গোঁফ। মেয়ে কি মদ্দা বোঝা যায় শুধু ওই গোঁফ দেখে। দুজনেরই পকেটে সমান মাপের দুটো ছুরি। দুজনেই বলছে ছুরি রাখতে হয়েছে আত্মরক্ষার জন্যে। ভূপেশ বলছে, মাইকেল ওকে ছুরি মারবে ক্যাম-মুক্সের মুখে শুনে অবধি সে ছুরি রেখেছে পকেটে। ঠিক উলটো গীত গাইছে মাইকেল। দুজনকেই ফাটকে ঢুকিয়েছি।

কিন্তু মিথ্যে বলছে কে ধরা যাবে একটি সূত্র ধরে।

'কী সূত্র? শুধোল ইন্দ্রনাথ।'

মাইকেলের ছুরিতে রক্ত লেগেছিল—রুমাল দিয়ে মুছেছে। ওর বুড়ো আঙুলটাও বেশ কেটে গেছে। বলছে হঠাৎ কেটে গেছে। মেডিক্যাল রিপোর্টে ধরা যাবে ছুরির রক্ত আর ক্যাম-মুক্স-এর রক্ত এক গ্রুপের কি না।

ভালো সূত্র, বললে ইন্দ্রনাথ। সেইসঙ্গে আরও একটা পয়েন্ট চেক করিস কাল দিনের আলোয়।

কী?

আজকের বৃষ্টিতে গোরস্থানের ভিজে মাটিতে নিশ্চয় পায়ের ছাপ পড়েছে দুজনের। শ্রীচরণ থেকে জুতোগুলো খুলে নিয়ে গিয়ে মিলিয়ে দেখবি।

তুই বলার আগেই সে ব্যবস্থা হয়ে গেছে। দড়ি দিয়ে জায়গাটা ঘিরে সেপাই বসিয়ে এসেছি। আমি নিজে যাচ্ছি কাল সকালে।

পরের দিন দুপুরবেলা ফের ফোন এল।

ইন্দ্রনাথ? জয়ন্ত বলছি। সব গুবলেট হয়ে গেল।

কেন?

ছুরির রক্ত আর ক্যাম-মুক্স-এর রক্ত এবি গ্রুপের। কিন্তু মাইকেলের রক্তও যে এবি গ্রুপের। সুতরাং কিছুই প্রমাণ করা যাচ্ছে না।

জগাই মাধাইয়ের চরণ চিহ্ন?

সে গুড়েও বালি ব্রাদার। মাসখানেক আগে দু-জনেই একই দিনে একই মাপের বাটার রবারসোল স্পোর্টস শু কিনেছিল। দু-জোড়া জুতোই সমানভাবে ক্ষয়েছে। কবরখানায় প্রিয়ামিলনে গিয়েছিল দু-জনেই ওই জুতো পরে। দু-জনের জুতোতেই কাদা মাখামাখি। একী ঘ্যাঁচাকল রে বাবা। কী করি বলত?

একটুও না ভেবে ইন্দ্রনাথ বলল—ভূপেশকে গ্রেপ্তার করবি। রবারসোলের জুতো পরে কেউ ইন অ্যান্ড আউটের সাইকেডেলিক নাচের আসরে যায়? গুল মারবার আর জায়গা পায়নি?

**'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত (শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮১)।*

ফকিরচাঁদের ফৌতি ব্যবসা

চোখের সামনে থেকে খবরের কাগজটা নামিয়ে গুলি-গুলি চোখে আমাকে নিরীক্ষণ করলেন পুলিশ কাকা।

তারপর চেরা-চেরা গলায় শুধোলেন—হঠাৎ কী মনে করে?

কাষ্ঠ হেসে বললাম, 'পুলিশের গোয়েন্দাগিরি...'

এমন সময়ে হাঁচি এল কাকার। এই এক ব্যায়রাম তাঁর সাইনাসাইটিস। দক্ষ পুলিশ কর্মচারী ছিলেন ব্রিটিশ আমলে। সাব ইন্সপেক্টরের পদ থেকে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি কমিশনার হয়েছিলেন। বড়লাটের হাত থেকে সোনার মেডেল নিয়েছেন। দোষ একদম ছিল না। পান-তামাক-বিড়ি-সিগারেট-চা-কফি-নস্যি কোনও নেশা নেই।

দোষের মধ্যে ওই হাঁচি আর নাক ঝাড়া।

হ্যাঁচ্চো করে হাঁচতেই আমি থেমে গেলাম। তারপর বললাম, 'নিয়ে কিছু...'

'হ্যাঁচ্চো!'

গল্প লেখবার...'

'হ্যাঁচ্চো!'

'ফরমাশ এসেছে।'

'ফোঁৎ-ফোঁৎ! এবার শুরু হল নাকঝাড়া।'

আমি আবার গোড়া থেকে আগমনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছি, উনি হাত তুলে নিরস্ত করলেন। রুমালের পাট খুলে নাক ঝাড়লেন, এবং পাট মুড়ে রেখে আমার দিকে ফের গুলি-গুলি চোখে তাকালেন।

বক্রসুরে বললেন, 'শুনেছি। পুলিশ আবার গোয়েন্দাগিরি করে নাকি?'

নার্ভাস হয়ে গেলাম। চিরকাল হয়েছি। পুলিশ কাকার স্বভাব রুক্ষ, চেহারা রুক্ষ, কথাবার্তাও রুক্ষ। চুল ছাঁটেন মল্লবীরের মতো। সামনের দিকে তিন বর্গইঞ্চি পরিমিতো স্থানে ইঞ্চিখানেক লম্বা কয়েকগাছা পাকা চুল—বাকি মাথা ক্লিপ দিয়ে মুড়িয়ে ছাঁটা। গড়ুর পাখির ঠোঁটের মতন বেঁকানো নাক, পুরু ওষ্ঠ এবং দৃঢ় চিবুকের মধ্যে কঠোর মনোবল, ধীশক্তি এবং একগুঁয়েমির লক্ষণ। সন্দেহ-কুটিল চাহনি—সারা জীবন ক্রিমিন্যাল ঘেঁটে কাউকেই যেন আর বিশ্বাস করেন না।

জোর করে হেসে বললাম, 'আগে ইন্ডিয়ান পুলিশ জার্নাল বেরোত—আপনারা রিটায়ার করলেন—সে সবও বন্ধ হয়ে গেল। তাই...'

ওষুধ ধরল। সাদা চুলভরতি বুকে হাত বুলোতে-বুলোতে কাকা বললেন, 'কে আর বলবে? ক্যালকাটা পুলিশ জার্নালও যদি একটা থাকত—'

কথাটা অসমাপ্ত রাখলেন কাকা। নত-চক্ষে কি যেন ভাবলেন। তারপর ভ্রূকুটি-ঘন চোখ তুলে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করলেন আমাকে—যেন মনে-মনে তৌল করলেন আমার অন্তরের অভিপ্রায়। অবশেষে বললেন স্বভাবকর্কশ গলায়, 'আমাদের কালে ফোরেনসিক সায়েন্সের এত রমরমা ছিল না। সায়েন্টিফিক ডিটেকশন যখন শুরু হয়নি, যখন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের ওপর আমরা বেশি গুরুত্ব দিতাম—তখনকার একটা কেস মনে আছে।'

আমি নড়েচড়ে বসলাম।

'কেসটা স্রেফ সারকমসট্যানসিয়াল এভিডেন্সের ওপর খাড়া করেছিলাম। কিঙস এভিডেন্স পাইনি—প্রত্যক্ষদর্শী ছিল না।'

প্রমাণ?

তাও ছিল না। ছিল শুধু একটা সূত্র। খুব সামান্য। বাকিটা ব্যাক ক্যালকুলেশান করে মনে-মনে কল্পনা করেছিলাম।

পুলিশ কাকা অঙ্কে সোনার মেডেল পেয়েছিলেন এম. এস. সি. পরীক্ষায়—ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। পিছুহাঁটা অঙ্কতে রপ্ত থাকবেন বইকী। কিন্তু—

জিগ্যেস করলাম, 'কোর্টে কেস টিকেছিল?'

বলেই বুঝলাম ভুল করেছি। নির্দয় চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন পুলিশ কাকা। তারপর প্রচণ্ড শব্দে নাক ঝাড়লেন গুনে-গুনে তিনবার। রুমালটা পাট করে রেখে কর্কশকণ্ঠে বললেন, 'ফাঁসি হয়ে গিয়েছিল ফকিরচাঁদ, ফকিরলাল আর শ্রীশচন্দ্রের—লাটে উঠেছিল ফৌতি ব্যবসা।'

আমি কিছুক্ষণ কাঠ হয়ে বসে রইলাম। তারপর শুধোলাম ভীরুকণ্ঠে, 'ফৌতি ব্যবসা কী?'

মার্বেল-চোখে এক পশলা তাচ্ছিল্য বর্ষণ করলেন কাকা। একটা উদগত হাঁচিকে সংবরণ করে নিয়ে বললেন ঠোঁট বেঁকিয়ে, 'মড়া...ডেড বডি নিয়ে কারবার।'

তখন 'বডি স্ন্যাচার'দের স্বর্ণযুগ।

সোনা-দানা-মণিমুক্তো নয়—স্রেফ লাশ লুঠ করেও দু-পয়সা পিটছে একদল লোক।

কলেজ হাসপাতালের শব ব্যবচ্ছেদ কক্ষে দারুণ চাহিদা রয়েছে মরা মানুষের। মড়াপিছু দেড়শো থেকে দুশো টাকা। মড়া কেটে জ্ঞানার্জন করতে চায় ছাত্ররা। অত মড়া হাসপাতাল থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। চালান আসত বাইরে থেকে।

ক্রমে ক্রমে মড়া চালান একটা ব্যবসায়ে দাঁড়িয়ে গেল। জোগান দিতে লাগল কলকারখানার কুলিমজুর এবং অন্যান্য গরিবরা—আত্মীয়স্বজন মরলে চিতায় তোলবার বা গোর দেওয়ার খরচও যাদের নেই। মড়ার দালালদের হাতে মড়া চালান দিয়ে সে খরচ তো বাঁচছেই উপরন্তু দু-পয়সা আসছে।

আরও একটা পথে ডেড বডি জোগাড় করত দালালরা—কবর খুঁড়ে!

অর্থাৎ মড়া চুরি। রাত বিরেতে এরা কবরখানায় দিত হানা। কেউ জানতেও পারত না—মাটির তলা থেকে সদ্য মরা মানুষটা চালান আসত কলেজ হাসপাতালের শব ব্যবচ্ছেদ কক্ষে।

ডেড বডি বিক্রি আইনের চোখে দোষনীয় নয়। কিন্তু গোরস্থানের লাশ লুঠ বেআইনি।

যে ব্যবসায়ে লাভ বেশি, বদলোক সেখানে জুটবেই—লাভের অংশ আরও বাড়ানোর ফিকিরে দু-ভাবে তা সম্ভব।

ডেড বডি সংগ্রহের খরচ আরও কমিয়ে দিয়ে।

অথবা, একেবারে না খরচ করে!

কি দরকার খামোকা দালালদের পেছনে টাকা খরচ করার? ডেড বডি যে কিনতেই হবে, এমন দিব্যি কেউ দেয়নি। গোরস্থান থেকে লুঠ করারই বা দরকার কী? তাতেও অনেক খরচ, অনেক হাঙ্গামা।

সব খরচের সাশ্রয় সম্ভব একটিমাত্র পন্থায়।

মড়া বানিয়ে নেওয়া!

ডেড বডি জোগাড় করার ঝক্কি অনেক—কিন্তু মড়া তৈরি করার কোনও ঝক্কি নেই। বাউন্ডুলে, ভবঘুরে, ভিখিরে অনেকেই আছে। এদের ঠিকানা নেই। নিখোঁজ হলে কারও মাথাব্যথাও নেই। মরলেও কিছু এসে যায় না। বডি পিছু গড়ে দেড়শো টাকা নীট লাভ করো।

অতীব লাভজনক ব্যবসা। কিন্তু হুঁশিয়ারি প্রয়োজন। বডি দেখে যেন সন্দেহ না হয় যে আনন্যাচারাল ডেথ।

ফৌতি ব্যবসার বিপদ এইখানেই।

শব ব্যবচ্ছেদ কক্ষ।

গিরধরলাল টুলে বসে পা দোলাচ্ছে। দেবী চামুণ্ডার পদতলে নিক্ষিপ্ত অসুরের মতন মাংসপুষ্ট বপু। মিশমিশে কালো। চোখ দুটি ঘোর রক্তবর্ণ। নগ্ন গা। ক'টি দেশে ক্ষীণ বস্ত্রাবরণ।

গিরধর পূর্বজন্মে শুম্ভ অথবা নিশুম্ভ ছিল বোধ হয়। ইহজন্মে সে একাধারে ডোম ও মুদ্দোফরাশ। জাতিতে চণ্ডাল।

গিরধর বিপত্নীক। অতিকোপনা বউয়ের সঙ্গে বছর দুই ঘর করেই নিষ্কৃতি পেয়েছে—ও পথ আর মাড়ায়নি। কিন্তু দেবী ধান্যেশ্বরীর সেবা চলে নিয়মিত। আর তার সঙ্গে দেবী 'সূর্যমুখী'র প্রসাদে সে তুরীয় আনন্দে আছে।

টুলে বসে বিড়ি টানতে-টানতে সেই কথাই ভাবছিল গিরধর।

কালরাতের মৌজ এখনও কাটেনি। উপরি পয়সা হাতে এলে এট্টু ফুর্তি না করে পারে না সে।

হাসপাতালের স্টুডেনবাবুরা দিলদরাজ। শুধু মুখে খোশামুদ নয়, হাতে সিকি-আধুলি গুঁজে দিয়ে যায় বায়নাস্বরূপ। বডির বায়না।

ডেড বডি জোগাড় কি চাট্টিখানি কথা? তাকে অবশ্য কিছুই করতে হয় না। দালালরাই বডি পৌঁছে দিয়ে যায় ঘরে। কম দামে কিনে চড়া দামে বেচে দেয় গিরধর। তাকেই সব করতে হয়। মড়া নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলেও কেনাবেচার সময়ে কোনও ডাক্তারবাবুই থাকেন না।

খোলা দরজায় উঁকি মারল দুটি মুণ্ড। একজনের মুখ তরতরে, চোখেমুখে কথা কয়। অপরজনের চোখ প্যাঁচার চোখের মতন বক্র-কুটিল, টেপা-ঠোঁট, শুকনো মুখ।

বিড়িটা দাঁতে কামড়ে বললে গিরধর, 'ফিকির-ফকির যে! এত সকালে?

চৌকাঠ পেরিয়ে এল তারা। তরতরে মুখ যার, সে বেশ ঢ্যাঙা, ডিগডিগে। পেচক-চক্ষু গাঁট্টাগোঁট্টা। প্রথম জন ফকিরচাঁদ, দ্বিতীয় জন ফিকিরলাল। দুজনেই লাশ চালানি। গিরধরলালের সঙ্গে দীর্ঘদিনের পরিচয়।

ফকিরচাঁদ হেসে বললে, 'মাল আছে।'

হাত নেড়ে গিরধরলাল বললে, 'দরকার নেই। কাল একটা পেয়েছি।'

একটু দমে গেল ফকির। কিন্তু ফিকিরের মুখে কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না।

ফকিরচাঁদ বললে, 'সস্তায় দিব। লিয়ে লাও।'

অর্থাৎ সস্তায় কিনে কাঠের বাক্সের মধ্যে বরফচাপা দিয়ে রাখলেই হবে। স্টুডেনবাবুরা কালকেই বডি চাইবে।

বিড়ি কামড়েই বলল গিরধর, 'কত?'

'সোয়া-শ।'

'যা, ভাগ।'

'কত দিবি বলবি তো?'

'সত্তর।'

শেষ পর্যন্ত রফা হল নব্বই টাকায়। বডি আনতে চলে গেল ফিকির আর ফকির। মনে-মনে হিসেব করে দেখল গিরধর। একদিনেই ষাট টাকা লাভ। সূর্যমুখীর নাকছাবির খরচটা তো উঠে গেল।

ঘণ্টা তিনেক পরে ফিরে এল ফিকির আর ফকির। সঙ্গে আরও দুই ব্যক্তি। মাথায় করে এনেছে একটা ঝাঁকা। চারজনে ধরাধরি করে মেঝেতে নামাল ঝাঁকাটা।

ঝাঁকার মধ্যে একটা মুখবাঁধা বস্তা। মুখের দড়ি খুলে দিল ফিকির আর ফকির। বস্তার পেছনের কোণ দুটো ধরল শক্ত মুঠোয়। তারপর হ্যাঁচকা টানে বস্তা উপুড় করে দিল মেঝের ওপর।

ধপ করে বস্তার মধ্যে থেকে ছিটকে এল একটা কিশোর বালকের প্রাণহীন দেহ।

চোখ কুঁচকে বস্তা উপুড় করার ধরনটা দেখছিল গিরধরলাল। মানুষে মরে গেলেও এইভাবে কেউ তাকে ছুঁড়ে ফেলে না। ডেড বডি নিয়ে এত হেলাফেলা বড় বেশি দৃষ্টিকটু।

এবার চোখ ফিরল বডির দিকে।

এবং ফেরাতে পারল না বেশ কিছুক্ষণ।

ছেলেটি সুদর্শন। বছর চোদ্দো-পনেরো বয়স। গায়ের রং তামাটে। কিন্তু নাকমুখ বেশ ধারালো। মৃত্যু এখনও তার সতেজ লাবণ্য কেড়ে নিতে পারেনি। বাঁ-রগটা সামান্য কেটে গেছে এবং রক্ত ক্ষরণের দাগ রয়েছে।

অনিমেষে চেয়ে রইল গিরধর। বিড়িটা ধরা রইল দাঁতের ফাঁকে। ভুলে গেল টানতে। কোথায় যেন একটা খুঁত রয়েছে—ধরতে পারছে না সে।

স্বাভাবিক মৃত্যু বলেই তো মনে হচ্ছে। বল প্রয়োগের এতটুকু চিহ্ন নেই...অথচ কোথায় যেন একটা গলদ রয়েছে...

...না! ঝুঁকি নেওয়াটা ঠিক হবে না। মনে খটকা যখন লেগেছে...

বিড়িটা নামিয়ে গিরধর বললে, 'তা হলে নব্বইতে রাজি তো?'

'আরে হ্যাঁ হ্যাঁ,' চোখেমুখে কথা কয়ে উঠল ফিকির।

'দাঁড়া, টাকা নিয়ে আসি ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে।'

'তোর কাছে নেই?'

'না।' দাঁত বার করে হাসল গিরধর। 'কাল রাত্তিরে উড়িয়ে দিয়েছি। দাঁড়া, আসছি।'

অ্যানাটমির ডিমন্সট্রেটর ডক্টর রক্ষিতকে এক নিশ্বাসে আপন সন্দেহের কথা বিবৃত করল গিরধর। ডক্টর রক্ষিত প্রবীণ, বিচক্ষণ এবং বহুদর্শী। ভ্রূকুঞ্চিত ললাটে শুনলেন গিরধরের সন্দেহের কাহিনি। টাটকা বডি, চোট লাগেনি কোথাও—অথচ খটকা লেগেছে শুনে এলেন ওর সঙ্গে।

মেঝের ওপর ঝাঁকা, ঝাঁকার পাশে শূন্য বস্তা এবং গতায়ু বালকের দেহসুষমার পানে ক্ষণেক চাইলেন ডাক্তার। চোখের কোণ দিয়ে দেখলেন ফিকির আর ফকিরের নির্ভীক মুখচ্ছবি। হেঁট হয়ে ডেড বডির হাত-পা তুলে নেড়ে আড়ষ্টতা পরখ করলেন, চোখের পাতা টেনে অক্ষি-তারকা লক্ষ করলেন।

লাশের ওপর চোখ রেখে সহজ গলায় জিগ্যেস করলেন, 'কত দিতে হবে?'

'নব্বই,' জবাব দিল ফকিরচাঁদ।

'দাঁড়াও—আনছি টাকা', বলে বেরিয়ে এলেন ডাক্তার। পেছনের দরজা দিয়ে মর্গের বাইরে গিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে সোজা হাজির হলেন থানায়।

থানার ছোট দারোগা একনাথ রায় নিবিষ্ট চিত্তে শুনলেন ডক্টর রক্ষিতের সন্দেহ কাহিনি। সামনের দিকের খানকয়েক চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে-চালাতে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে শুধু একটা প্রশ্নই করলেন, 'গিরধরলালের কথা বাদ দিন। আপনার সন্দেহ হল কেন?'

'পাঁচটি কারণে। মুখটা ফোলাফোলা, চোখ দুটোয় রক্তজমা, দেহটা টাটকা আর হাত-পা আড়ষ্ট।'

সূচীতীক্ষ্ণ চেয়ে রইলেন পুলিশকাকা একনাথ রায়। ঈষৎ ঝুঁকে কর্কশ কণ্ঠে বললেন, 'পঞ্চম কারণটা বললেন না তো?'

'সেটা আপনি নিজে দেখবেন। দেখলেই বুঝবেন।'

চোখে বিদ্যুৎ ঝিলিক দিল একনাথ রায়ের। ঘণ্টা বাজিয়ে সেপাইকে ডাকলেন। ডাক্তারকে বললেন, 'আপনি গিয়ে ওদেরকে আটকে রাখুন। আমি আসছি।'

থানা থেকে বেরিয়ে হাসপাতালে এসে পেছনের দরজা দিয়ে সটান ডিসেক্টিং রুমে ঢুকলেন ডক্টর রক্ষিত। ঢুকেই লক্ষ করলেন, ঘরের আবহাওয়া পালটে গিয়েছে।

চঞ্চল হয়েছে ফকির আর ঘনঘন আঙুল মটকাচ্ছে ফিকির। অন্য দুই ব্যক্তি ঝাঁকা নিয়ে উশখুশ করছে যাওয়ার জন্যে।

এক লহমার মধ্যেই ডক্টর রক্ষিত উপলব্ধি করলেন, তাঁর অবর্তমানে বেফাঁস কিছু বলেছে গিরধরলাল।

কিন্তু নিরতিশয় চতুর তিনি। তাই কিছুই যেন লক্ষ করেননি, এমনিভাবে বললেন ফকিরচাঁদকে, 'বড় মুশকিলে পড়লাম।'

চকিত চাহনি নিক্ষেপ করল ফকিরচাঁদ।

কিন্তু উত্থান পতন নেই ডাক্তারের কণ্ঠে। বললেন, 'একশো টাকার নোট ছাড়া কিছুই নেই। ভাঙাতে পাঠিয়েছি রামলক্ষ্মণকে।'

ফিকির ঠোঁটটা কামড়ে ধরেই ছেড়ে দিল—বলল শুষ্ককণ্ঠে, 'দশটা টাকা আমার কাছেই ছিল।'

—'তাই নাকি? দেখো দিকি, খামোকা দাঁড় করিয়ে রাখলাম। থাগ্গে, রামলক্ষ্মণ এসে পড়বে এখুনি।'

গিরধর জানল না—ডাক্তারবাবু এই অল্প সময়ের মধ্যে পুলিশ ফাঁড়ি ঘুরে এসেছেন। মুখগোঁজ করে দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ। ফাঁক পেয়ে বলে উঠল, 'ডাগদর সাব, ফকির বলছে ছালা থেকে ফেলতে গিয়ে রগ কেটে গেছে লাশের—'

'ঠিকই বলছি,' তেড়ে উঠল ফরিকচাঁদ।

'আহা, তাতে হয়েছে কী?' ডাক্তার যেন বড় বিড়ম্বিত বোধ করলেন ফকির-গিরধরের ঝগড়ায়। বললেন, 'রগটা সামান্য কেটেছে বই তো নয়।'

'কিন্তু—' গিরধর নাছোড়বান্দা।

'তুই থাম,' ধমকে উঠলেন ডক্টর রক্ষিত।

থতমত খেল গিরধর। ডক্টর রক্ষিতের মহৎ গুণ—তিনি রাগতে জানেন না—মোটেই গলা চড়ান না। মাটির মানুষ। অথচ এমন তেড়ে উঠলেন—বিশেষ করে বাইরের লোকের সামনে...

মনে বড় লাগল গিরধরের। কিন্তু মুখে কিছু বলল না।

ফিকির আর ফকির গিরধরলালের তাড়না দেখেও হৃষ্ট হয়নি। চকিত দৃষ্টি বিনিময় ঘটল দু'জনের মধ্যে। ফিকির গলা-ঝাড়া দিয়ে বললে, 'বড্ড তাড়া ছিল।—আজ আসি, ডাক্তারবাবু—'

ডক্টর রক্ষিত তো অবাক, 'সে কি রে! টাকা না নিয়ে যাবি কোথায়?...রামলক্ষ্মণকে বলিহারি যাই। নোট ভাঙাতে ট্যাঁকশালে গেল নাকি? ও বাবা গিরধর দেখ না গিয়ে গেল কোথায়?'

গিরধরলাল অগ্রসর হওয়ার আগেই ফিকির-ফকির দরজার দিকে এগোল। যেতে-যেতে বললে ফিকির, 'আজ বড্ড তাড়া আছে স্যার।—কাল আসব'খন।'

উঠে দাঁড়িয়েছিলেন ডক্টর রক্ষিত। কিন্তু পরক্ষণেই বসে পড়লেন।

একনাথ রায় কখন জানি আবির্ভূত হয়েছেন নি:শব্দে—আখাম্বা চেহারার পাহারালাকে নিয়ে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছেন।

মুহূর্তের জন্য হকচকিয়ে গিয়েছিল ফিকির-ফকির এবং ঝাঁকামুটে দুজন। সবার আগে সংযত হল ফিকির। পেচকচক্ষু সঙ্কুচিত করে হিসহিসিয়ে উঠল, 'এ কী! পুলিশ কেন!'

একনাথ রায় জবাব দিলেন না। ধীরেসুস্থে এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন ডেড বডির পাশে। ক্ষণকাল স্থির নেত্রে কি দেখলেন।

তারপরই ঘুরে দাঁড়িয়ে হুকুম দিলেন কাঠ-চেরা গলায়, 'লাগাও হাতকড়া।—মার্ডার!'

এই পর্যন্ত বলে পুলিশ কাকা বাড়ি কাঁপিয়ে খানিকক্ষণ হাঁচলেন। আমি তড়বড় করে জিগ্যেস করলাম, 'কি দেখে বুঝলেন মার্ডার?'

একনাথ বললেন নীরসকণ্ঠে, 'এই সহজ জিনিসটাও মাথায় এল না? গিরধর পর্যন্ত ধরে ফেলেছিল!'

ময়নাতদন্ত রিপোর্টটা আসতেই বারবার অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পড়লেন একনাথ রায়। তারপর উঠে দাঁড়ালেন সশব্দে। ঘরময় পায়চারী করলেন কিছুক্ষণ। অনেক ভাবলেন। কূল কিনারা পেলেন না।

নিরেট রহস্য! ছিদ্র কোথাও নেই। বড় আশা ছিল, পোস্ট মর্টেম হলেই মৃত্যুর কারণ ধরা পড়বে। সেই রিপোর্টের বশে চারটেকে চালান দেবেন।

কিন্তু ময়নাতদন্তে কিসসু ধরা পড়েনি। ছেলেটা নাকি মরবার সময়ে বেশ সুস্থ ছিল এবং কোনও অসুখবিসুখে ভোগেনি। মৃত্যুর কোনও কারণ আবিষ্কার করতে পারেননি ডাক্তাররা। পারেননি বলেই অনুমান করছেন মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়। হ্যাঁ, রগটা খানিকটা কেটে গেছে ঠিকই। কিন্তু তার জন্যে মৃত্যু হতে পারে না। অথচ আর কোথাও চোট লাগার চিহ্ন নেই।

কিন্তু হাল ছাড়বার পাত্র নন একনাথ। যে চারজনকে ঢুকিয়েছেন, তাদের মধ্যে দুজন মার্কামারা বডি-স্ন্যাচার। বডি-স্ন্যাচারদের আসল কারবার কি, দেশশুদ্ধ লোক জানে। সুতরাং খুনি তারাই।

কিন্তু জুরী তো তা শুনবে না। অমুক লোক অবশ্যই হত্যাকারী বললে ধোপে টিকবে না—প্রমাণ চাই।

অথচ এক কণা প্রমাণও হাতে নেই।

অনেক চিন্তার পর অবশেষে একটা সিদ্ধান্তে এলেন একনাথ রায়। প্রমাণ ব্যাতিরেকে খুনের চার্জ আনা আদৌ উচিত হবে কিনা, সে পরামর্শ দিতে পারবেন একজনই—থানাদার উমানাথ ভদ্র।

উমানাথ কুশাগ্রবুদ্ধি পুলিশ অফিসার। সঙ্কট মুহূর্তে সুসম পরামর্শদাতা হিসাবে সুনাম আছে। বয়েসে প্রৌঢ় —কিন্তু এখনও খাটতে পারেন প্রচণ্ড—খাটাতেও পারেন তেমনি। কৌতুকপ্রিয়। কিন্তু কাজের সময়ে তিনি অন্য মানুষ। তখন অটল গাম্ভীর্য এবং প্রখর ব্যক্তিত্বে সমাচ্ছন্ন। দেখে মনেই হয় না অবসর সময়ে সহকর্মীদের সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি করতে তিনি অদ্বিতীয়।

একনাথ ঘরে ঢুকতে ফাইল থেকে চোখ তুললেন উমানাথ ভদ্র। বললেন, 'কী সংবাদ বৎস?'

'কেস আছে।'

'কী কেস?'

সংক্ষেপে রহস্যের জটাজাল বিবৃত করলেন একনাথ রায়।

শিবনেত্র হয়ে সব শুনলেন উমানাথ। শুনতে-শুনতে অন্য মানুষ হয়ে গেলেন।

নিমীলিত নয়নে কিছুক্ষণ একনাথ রায়ের পানে চেয়ে আস্তে-আস্তে বললেন, 'না, প্রমাণ ছাড়া খুনের চার্জ আনা যাবে না। আসামিদের ছেড়ে দিতে হবে।'

চোখে-চোখে চেয়ে আছেন একনাথ রায়। উমানাথও চোখ ফেরালেন না। একরোখা একনাথের অভিপ্রায় তিনি উপলব্ধি করেছেন।

বললেন ধীরকণ্ঠে, 'কিন্তু তুমি কি নিশ্চিত যে প্রমাণ নেই? প্রমাণ খোঁজবার কী-কী চেষ্টা করেছ বলো তো?'

হঠাৎ একনাথের মনে পড়ল ময়নাতদন্তের রিপোর্টের একটি লাইন। ডাক্তাররা লিখেছেন, মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই নাকি বত্রিশপাটি দাঁত উৎপাটন করে নেওয়া হয়েছে ছেলেটির।

ছোট্ট সূত্র। কিন্তু আঁধারে আলো। তদন্ত শুরু করা যেতে পারে।

দিন কয়েক উদয়াস্ত খাটলেন একনাথ রায় এই সূত্র ধরে। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল, যেদিন লাশ বিক্রি করতে হাসপাতালে আসে ফিকির আর ফকির, তার আগের দিন বেলেঘাটার একটা তাড়িখানায় তাড়ি খাচ্ছিল ওরা তিনজন—ফিকির, ফকির আর সেই মুটে দুজনের একজন। নাম তার শ্রীশচন্দ্র। রুমালমোড়া একরাশ দাঁত টেবিলে রেখেছিল ফকির। সাফ করছিল মদ খেতে-খেতে।

পরবর্তী খবর পাওয়া গেল বৌবাজারের একটা হাতুড়ে চিনা ডেনটিস্টের কাছে। সেইদিনই রাতে অনেকগুলো দাঁত ফকির সেখানে বিক্রি করেছে।

কিন্তু তারপর? ছেলেটাকে যে মার্ডার করা হয়েছে, তার প্রমাণ কই?

লৌহ মনোবলেও চিড় ধরল এবার। নিরাশ হয়ে বসে রইলেন একনাথ অফিস টেবিলে। প্রমাণ নেই! ফিকির-ফকিরের অপরাধ সপ্রমাণ করার কোনও উপাদান তাঁর হাতে নেই। সেকালে মরা মানুষের দাঁত বিক্রি কোনও অপরাধ নয়।

হেনকালে পাহারালা রামশঙ্কর সবুট স্যালুট করল ঘরে ঢুকে।

সপ্রশ্ন চোখে তাকালেন একনাথ রায়।

রামশঙ্কর এই কদিন বিস্তর মেহনত করেছে এই কেসে।

রামশঙ্কর নিবেদন করল যে তাড়িখানায় বসে ফিকির এবং ফকির তাড়ি খেয়েছিল, ফকিরচাঁদের বাসা নাকি তার অনতিদূরে। বেলেঘাটার খালপাড়ে।

—'তাতে কী হল?' শুষ্ক কণ্ঠে শুধোলেন একনাথ রায়।

—'উহ মোকান সার্চ করনে সে কুছ তো মিলেগা।'

কথাটা আগে মাথায় আসেনি একনাথ রায়ের। বিস্মিত হলেন সেজন্যে। তারপর ভেবে দেখলেন, লাভ কী? নিধন-চিহ্ন নিহত ব্যক্তির দেহতেই থাকে। সে দেহ কাটাছেঁড়া করে দেখা হয়েছে। বাড়ি দেখে কী হবে?

যাই হোক, পাহারালা রামশঙ্করের কাঁধে অর্পণ করলেন সেই দায়িত্ব—গুরুত্বহীন বলেই।

রামশঙ্কর ফিরে এসে তাঁর মনোমত রিপোর্টই দিল। লাশ-লুঠেরাদের ঘরে কোদাল-গাঁইতি-শাবল উল্লেখযোগ্য কিছু পাওয়া যায়নি। মার্ডার কেসে অকাট্য প্রমাণ হওয়ার মতো কিসসু চোখে পড়েনি।

কিন্তু ছেলেটি কে?

বসে-বসে সেই কথাই ভাবছিলেন একনাথ। তার গায়ের রং তামাটে, মুখ চোখ সুদর্শন। ফিকির এবং ফকিরের খপ্পরে সে পড়ল কীভাবে? নিবাস কোথায় তার?

এবার একনাথ রায় মনস্থ করলেন—তিনি নিজেই বেরোবেন।

কোয়ার্টারে গেলেন আধ ঘণ্টার জন্যে। কাবার্ড খুলে বার করলেন ছদ্মবেশ ধারণের সরঞ্জাম। দশ-বারো জোড়া বিভিন্ন আকৃতির পাদুকা থেকে বেছে নিলেন মোটর-টায়ার থেকে তৈরি ছেঁড়া চটিজুতো। মলিন ধুতি আর রং-সিমেন্ট মাখা সার্ট নির্বাচন করলেন হ্যাঙারে ঝোলানো ছেঁড়াখোঁড়া বেশভূষার মধ্যে থেকে। একনাথ রাস্তায় নেমে এলেন দিন মজুরের ছদ্মবেশে। ফটকে দণ্ডায়মান কনস্টেবল মুচকি হাসল এবং সবুট স্যালুট ঠুকল মজুরবেশী পুলিশ কাকাকে।

বেলেঘাটা খালের ঠিক ধারে ছোট্ট ভাটিখানাটি সন্ধের পর থেকেই জমজমাট হয়ে ওঠে দিনমজুর আর কারখানা শ্রমিকদের পৃষ্ঠপোষকতায়।

একনাথ ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে এসে বসলেন ভাটিখানায়। তিনি নেশা করেন না। অথচ নেশার ভান করলেন এক ভাঁড় তাড়ি সামনে রেখে। ঝিমোতে লাগলেন কৃত্রিম নেশার ঝোঁকে—কান আর চোখ রইল সজাগ।

গতকাল পুলিশ হানা দিয়েছিল তাড়িখানায়। সঙ্গে রামশঙ্করও ছিল। ফকিরচাঁদ এবং ফিকিরলাল নাকি পুলিপোলাও খাচ্ছে থানা হাজতে খুনের চার্জে। তাড়িখানা সরগরম সেই প্রসঙ্গ নিয়ে।

'লাও বাবা,' হেঁচকি তুলতে-তুলতে বলছিল একজন ধুনুরি।

'কেন খুন হল, তা তো বলবি।'

'কে আবার, সেই ছোঁড়াটা,' চানা চিবুতে-চিবুতে বলল কয়লাওলা মিশির।

'কৌন ছোকরা?'

উৎকীর্ণ হলেন একনাথ। সংগৃহীত টুকরোটাকরা তথ্যগুলি থেকে ধীরে-ধীরে নিহত বালকের বৃত্তান্ত পূর্ণ রূপ নিল।

ছেলেটার নাম আবদুল। থাকতো রাজাবাজারের বস্তিতে। অনাথ। সাদা ইঁদুরের খেলা দেখাত পথেঘাটে। ফিকিরচাঁদের বাড়িতে এই সেদিন তাকে ঢুকতে দেখা গেছে। তখন তার মাথায় লাল রঙের ফেজ টুপি ছিল। কবে?—যেদিন লাশ নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিল ফকিরচাঁদ, তার আগের দিন—

আরও কিছুক্ষণ বসে রইলেন একনাথ রায়। তারপর তাড়ির ভাঁড় হাতে নিয়ে টলতে টলতে বেরিয়ে এলেন খাল পাড়ে। ভাঁড়টা খালের জলে ছুঁড়ে দিয়ে অন্ধকারে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন অনেকক্ষণ।

নিশ্ছিদ্র ষড়যন্ত্র। আবদুলকে ফকিরচাঁদই ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছে বাড়ির মধ্যে—খুনও করেছে। কিন্তু কীভাবে? ডাক্তাররাও তা বলতে পারেনি।

পরের দিন সকালবেলা উমানাথ ভদ্র তলব করলেন একনাথ রায়কে।

একনাথ স্যালুট করে বসলেন সামনের চেয়ারে।

উমানাথ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাঁকে দেখলেন।

পেনসিল দিয়ে টেবিলের ওপর টকটক শব্দ করে শুধোলেন অবশেষে, 'ফকিরচাঁদ আর ফিকিরলালের কেস কবে?'

'আগামী পরশু।'

'খুনের চার্জ আনবার প্রমাণ পেয়েছ?'

'না।'

'রিপোর্ট দাও—মুখে।'

একনাথ রায় অল্প কথায় বললেন কীভাবে পদে-পদে ব্যর্থ হচ্ছেন তিনি। বললেন, ডেনটিস্টের কথা, রামশঙ্করকে দিয়ে ফকির-ফিকিরের বাড়ি তল্লাশির কথা এবং সবশেষে ভাটিখানায় অভিযানের কথা।

তিনবার তিন পথে তদন্ত পরিচালনা করেছেন—তিনবারই অন্তে শূন্য লাভ করেছেন।

শুনতে-শুনতে উমানাথ থমথমে মুখে শুধু বললেন, 'ছি: একনাথ! তুমি জমাদারকে দিয়ে খানাতল্লাশি করেছ?'

'কিন্তু স্যার, সে কিছুই পায়নি।'

'তর্ক করো না।—তুমি কি চাও রামশঙ্কর কাল থেকে তোমার চেয়ারে বসুক?—যাও।'

আরক্তমুখে বেরিয়ে এলেন একনাথ রায়। ঘরে বসে টেবিলে মাথা গুঁজে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। ধীরে-ধীরে আত্মস্থ হলেন। উমানাথ ভদ্র তাঁর উপকারই করেছেন। পুরস্কারের সঙ্গে তিরস্কারেরও প্রয়োজন।

আধঘণ্টার মধ্যে লোকজন নিয়ে বেলেঘাটায় হাজির হলেন একনাথ রায়।

খালের পশ্চিম পাড়ে ভাটিখানা। তার একশো গজ দূরে ফকিরচাঁদের বাড়ি। পেছন দিকে খানিকটা বাগান। তারপর মস্ত পুকুর। রেললাইন চোখে পড়ে বাগানে দাঁড়ালে।

বাড়িটার সামনের দিকের দেওয়াল ইটের—তিন দিকের দেওয়াল দরমা আর মাটির। কুলুঙ্গীর আকারে অতি ছোট জানলা। ছাদ লাল টালির। হেঁট হয়ে না ঢুকলে দরজায় মাথা ঠুকে যায়।

বাড়ির সদর দরজা থেকে প্রতি ইঞ্চি জায়গা দেখতে-দেখতে ভেতরে প্রবেশ করলেন একনাথ রায়। দেওয়ালে চোরা কুলুঙ্গী আছে কিনা পরখ করলেন, মেঝের নিচে পাতালকুঠরি আছে কিনা যাচাই করলেন, রান্নাঘরের উনুনের ছাই ঘাঁটলেন, মাচার জিনিসপত্র সব নামিয়ে আনলেন। খাটিয়া ঠুকে দেখলেন। একটিমাত্র টিনের তোরঙ্গ খুলে জিনিসপত্র লাটঘাট করে ফেললেন।

রামশঙ্করকে হুকুম দিলেন—যা কিছু পাওয়া গেল তার ফর্দ বানাতে।

নিজে টহল দিয়ে এলেন বাগানে। উঁকি মারলেন কোণের কুয়োর ভেতরে। গাছপালাগুলো অযত্নবর্ধিত। সামান্য একফালি জমিতে আবর্জনার ডাঁই। ভাঙা ক্যানেস্তারা আর হাবিজাবি জিনিস ছড়ানো। কুয়োর পর কাঁটাগাছের বেড়া। তারপর পুকুর।

এসে দাঁড়ালেন বাড়ির মধ্যে। একখানাই ঘর। পাশে রান্নাঘর। কলতলা খোলা উঠোনে।

কোথাও আবদুল হত্যার কোনও সূত্র নেই।

অন্যমনস্কভাবে চেয়ে রইলেন মাচা থেকে নামানো পাঁচমিশেলী জিনিসের দিকে। কোদাল, খোন্তা, শাবল, ছেঁড়া ন্যাকড়া, অনেকগুলো খালি বোতল, একটা টুপি...

চোখ সরাতে পারলেন না একনাথ রায়।

ফেজ টুপি! লাল রঙের! এইরকম টুপি মাথায় আবদুলকে দেখা গিয়েছিল ফকিরচাঁদের বাড়ি ঢুকতে!...

ভেতরে-ভেতরে নতুন উৎসাহ, নতুন উত্তেজনা অনুভব করলেন একনাথ। পাওয়া গেছে...একটা প্রমাণ অন্তত পাওয়া গেছে...আবদুল যে ফকিরচাঁদের বাড়িতে প্রবেশ করেছিল —সে প্রমাণ পাওয়া গেছে!

তারপর? খুন হল কীভাবে? পরে ভাবা যাবে'খন। দেখা যাক, মাচার জঞ্জালের মধ্যে আর কি আছে।

নতজানু হয়ে নিজেই আবর্জনা হাঁটকাতে শুরু করলেন একনাথ রায়।

এবার পেলেন একটা হাফপ্যান্ট।

ছোট ছেলের নীল হাফপ্যান্ট। রক্তাক্ত। প্যান্টে কালচে রক্ত চামাটি ধরে রয়েছে।

নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন একনাথ রায়। রক্তমাখা প্যান্ট। আবদুলেরও হতে পারে। কিন্তু আবদুলের গা থেকে এত রক্তপাত ঘটল কোন ক্ষত মুখে? রগ সামান্য কেটে গিয়েছিল—এত রক্ত রগ থেকে বেরোয়নি। তবে?

একটা ঘোর সন্দেহ দেখা দিল মনে।

আবদুল ছাড়াও এ বাড়িতে খুন হয়েছে আরও একটি ছেলে—এ প্যান্ট তার!

পুলিশ ফাঁড়ি।

একনাথ রায়ের ঘর। টেবিলে সাজানো লাল ফেজ টুপি, আর রক্তমাখা নীল প্যান্ট।

রাইটার জমাদার খাতা-পেনসিল নিয়ে তৈরি। চেয়ারে এক পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন একনাথ।

ঘরে ঢুকল ফকিরচাঁদ। থানাহাজতের জামাই আদরে এই ক'দিনেই মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। কিন্তু তরতরে চনমনে ভাবটা যায়নি। চোখের মধ্যে ভয়ডরের লেশমাত্র নেই।

ঘরে পা দিয়েই টেবিলের দিকে তাকাল ফকিরচাঁদ। চোখের তারা ঈষৎ বিস্ফারিত হয়েই স্বাভাবিক হয়ে গেল। জিনিস দুটি এ-স্থানে সে আশা করেনি।

কর্কশকণ্ঠে শুধোলেন একনাথ রায়, 'চিনতে পারছ?'

'আজ্ঞে?' ফকিরচাঁদ যেন শুনতেই পায়নি।

'টুপি আর প্যান্ট কার?'

'কী করে বলব বলুন।'

'তোমার ঘরের মাচায় ছিল, আর তুমিই জানো না?'

'মাচায় অনেক জিনিসই আছে—ভাড়া নেওয়ার সময়ে মাচায় উঠে দেখিনি।'

সজোরে অধর দংশন করলেন একনাথ রায়। জেরা করলেন আরও কিছুক্ষণ—কিন্তু বৃথাই।

গেল ফকিরচাঁদ—এল ফিকিরলাল। তার মুখভাব আরও ভাবলেশহীন। চোখের তারকা অতিশয় স্থির। বিস্ফারিত হতেই জানে না।

তারপর এল শ্রীশচন্দ্র—জিজ্ঞাসাবাদ করে শুধু একটা খবরই পাওয়া গেল তার কাছে। শ্রীশচন্দ্র থাকে ফকিরচাঁদের লাগোয়া বাসায়। ফকিরচাঁদের মতো টালির বাড়ি। পেছনে বাগান।

চতুর্থজনের নাম পচা। পেশায় ঝাঁকামুটে।

রাইটার জমাদারকে বিদায় দিয়ে সাদা দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে রইলেন একনাথ রায়। মানসচক্ষে দেখতে পেলেন পাশাপাশি দুটি বাড়ি—ফকিরচাঁদের আর শ্রীশচন্দ্রের। একটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখা হয়েছে—আর একটি...

কিন্তু বৃথা হল খানতল্লাশি। শ্রীশচন্দ্রের বাড়ির মধ্যে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া গেল না।

যথা সময়ে আসামিদের নিয়ে আদালতে হাজির হলেন একনাথ রায়। আরও তদন্ত সাপেক্ষে সময় প্রার্থনা করলেন। হাকিম তা মঞ্জুর করলেন—কিন্তু বেকসুর খালাস করে দিলেন পচাকে। কারণ সে পেশায় ঝাঁকামুটে। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল, শেয়ালদা স্টেশন থেকে ফকিরচাঁদ তাকে নিয়ে এসেছিল বস্তা বইবার জন্যে।

ফিকির, ফকির আর শ্রীশচন্দ্রকে নিয়ে থানায় ফিরলেন একনাথ রায়।

উমানাথ ভদ্র আর তাঁকে তলব করেননি। উনিও দেখা করেননি। দেখা করার মতো মুখ নেই।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল একনাথ রায়ের। বিদ্যুৎ ঝলকের মতো একটা কথা উদ্ভাসিত হল মনে।

সটান উঠে বসলেন একনাথ। তখনও তিনি অবিবাহিত।

মানসচক্ষে দেখলেন পাশাপাশি দুটি বাড়ি—পেছনে বাগান। বাড়ি দুটি খুঁটিয়ে দেখেছেন—দেখেননি কেবল বাগানের মাটি।

বাকি রাত না ঘুমিয়ে কাটালেন তিনি। ভোররাতেই থানায় গিয়ে লোকজন জড়ো করে হানা দিলেন বেলেঘাটায়। কয়েক ফুট মাটি কুপিয়ে ফেললেন দুটি বাগানেই।

শ্রীশচন্দ্রের বাগানের জঞ্জালের গাদার নিচে আলগা মাটির তলায় পাওয়া গেল একটা সাদা শাড়ি আর সায়া। সায়ার মাঝখান থেকে টেনে ছেঁড়া—যেন গিঁট খুলতে তর সয়নি ছিঁড়ে খোলা হয়েছে—আর ফকিরচাঁদের বাগানে বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া গেল একটা খয়েরি হাফ প্যান্ট, একটা কালো ইজের এবং একটা ধুতি আর ফতুয়া।

বেলা আড়াইটেয় শেষ হল খোঁড়াখুঁড়ি পর্ব। চড়া রোদে দাঁড়িয়ে একনাথ রায় উপলব্ধি করলেন সেই নির্মম সত্য।

মোট ছ'টি খুন হয়েছে এই দুটি বাড়িতে। লাল ফেজ টুপি, নীল প্যান্ট, কালো ইজের, খয়েরি প্যান্ট, সায়া-শাড়ি এবং ধুতি-ফতুয়া সেই হতভাগ্যদেরই পরিধেয়!

আচ্ছন্নচিত্তে রোদে দাঁড়িয়ে রইলেন একনাথ রায়। মর্মস্পর্শী সত্যটা উদঘাটিত হওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হল। আবদুল হত্যার রহস্য এখনও অমীমাংসিত—লাশ পাওয়া গেছে, ডাক্তাররা ব্যবচ্ছেদ করেছেন—কিন্তু হত্যার উপকরণ এবং পদ্ধতি এখনও অজ্ঞাত।

এমতাবস্থায় আরও পাঁচটি নিখোঁজ লাশ এবং সেই সম্পর্কিত তদন্তভার কাঁধে এসে চাপল।

হুঁশ ফিরল রামশঙ্করের ডাকে, 'হুজুর!'

চোখ তুললেন একনাথ রায়। চোখ জ্বালা করছে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'চল।'

বুকের ওপর চিবুক গুঁজে থানায় ফিরলেন। সমস্ত রাস্তায় মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল এক চিন্তা। ফকিরচাঁদ নিশ্চয় মন্ত্রপ্রয়োগে ছ'টি মানুষকে বধ করেনি। পাঁচটি লাশ বিনা বাধায় বিক্রি করেছে—ডাক্তারদের চোখে ধুলো দিয়ে। ষষ্ঠ লাশটিও অনুরূপভাবে খণ্ড-খণ্ড হত। রগটা সামান্য কেটে গিয়েছিল বলে হল না।

কিন্তু তার মন্ত্রগুপ্তি কী?

থানার সিঁড়ি দিয়ে নতমস্তকে উঠতে গিয়ে নজরে পড়ল এক জোড়া জুতো। ওপরধাপে দাঁড়িয়ে আছেন উমানাথ ভদ্র।

চোখ তুললেন একনাথ রায়। উমানাথ গম্ভীর চোখে চেয়ে আছেন তাঁর পানে—মুখ গম্ভীর।

তিরস্কৃত হওয়ার পর থেকে আর থানাদারের চৌকাঠ মাড়াননি একনাথ রায়। পণ করেছিলেন রহস্যের মীমাংসাসূত্র আবিষ্কার না করা পর্যন্ত ঘরে ঢুকবেন না।

উমানাথ তা উপলব্ধি করেই যেন পথরোধ করে দাঁড়িয়েছেন।

বললেন ভরাট গলায়, 'ঘরে এসো।'

রাতে ঘুম নেই, সকাল থেকে চড়া রোদে মাথা মুখ ঝলসে গিয়েছে, মনে চরম নৈরাশ্য; এই মুহূর্তে ঊর্ধ্বতন অফিসার স্নেহক্ষরিত কণ্ঠে আমন্ত্রণ জানালে মানুষের মনে আবেগের আলোড়ন উপস্থিত হবেই। একনাথ রায় বাহ্যত রুক্ষ—কিন্তু ভাবালুতার অতীত তিনি নন। তাই একটা পুঁটলি ঠেলে উঠল গলার কাছে। মাথা হেঁট করে বস-এর পেছন পেছন গেলেন তাঁর কক্ষে—ঢুকলেন।

হাতের ইঙ্গিতে একনাথকে চেয়ারে বসালেন উমানাথ। টেবিল ঘুরে গিয়ে বসলেন নিজের চেয়ারে। পেছনে হেলান দিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে নিরীক্ষণ করলেন একনাথ রায়ের নিদ্রাহীন উৎকণ্ঠাক্লিষ্ট মুখ।

মন্থর কণ্ঠে বললেন, 'একনাথ, আমার সেদিনকার রূঢ়তা মনে রেখো না। আজ কী পেলে?'

একনাথ সংক্ষেপে গুটি কয়েক কথায় প্রতিবেদন পেশ করলেন।

গালে হাত দিয়ে শুনলেন উমানাথ। বুদ্ধিদীপ্ত চক্ষু সঙ্কুচিত হয়ে এল শেষের দিকে—নাসিকারন্ধ্র ঈষৎ স্ফীত হল হাফপ্যান্ট ইত্যাদি উদ্ধারের কাহিনি এবং মর্মস্পর্শী অবশ্যম্ভাবী সিদ্ধান্তটা শুনে।

চোখ ফিরিয়ে চেয়ে রইলেন জানলা দিয়ে। একটা সিগারেট ধরালেন। মৃদু টান দিতে লাগলেন। মনে-মনে পর্যালোচনা করলেন সহকর্মীর অভিযান কাহিনি।

অবশেষে সিগারেটের দগ্ধাংশ ছাইদানীতে গুঁজে দিয়ে ফের তাকালেন ঘাড় বেঁকিয়ে।

বললেন, 'কুয়োটা দেখেছ?'

একনাথ রায় আশা করেছিলেন নতুন পদনির্দেশ। কুয়ো দেখার কথা তিনি বলতে ভুল করেননি। তবু কেন সেই প্রশ্ন?

বললেন গাঢ় কণ্ঠে, 'দেখেছি।'

'কীভাবে দেখেছ?'

'ওপর থেকে ঝুঁকে। জল ছাড়া কিছু নেই।'

'আ:!' বলতে-বলতে রক্ত জমে উঠল উমানাথের ফরসা মুখে, 'জলের তলায় কী আছে দেখোনি কেন?'

বিদ্রোহীকণ্ঠে একনাথ রায় বললেন, 'তা হলে তো পাশের পুকুরটার তলাতেও দেখতে হয়।'

শক্তচোখে চাইলেন উমানাথ, 'একনাথ, বেলেঘাটার পুকুরের জলে জেলে জাল ফ্যালে, লুকোনোর পক্ষে তাই বাড়ির পাশের পুকুর নিরাপদ নয়। কিন্তু জেলে কি কুয়োতে জাল ফেলে?'

আস্তে-আস্তে খাড়া হয়ে বসলেন একনাথ রায়। অনিবার্য সিদ্ধান্তটা নিমেষমধ্যে ডালপালা মেলে ছড়িয়ে পড়ল মাথার মধ্যে।

'আমাকে মাপ করবেন স্যার। এখুনি যাচ্ছি।'

ফিরলেন বিকেল গড়িয়ে যাওয়ার পর।

লোকজন ডেকে জল ছেঁচেছেন কুয়োর। স্নান হয়নি, আহারও হয়নি। নিজে দাঁড়িয়ে তদারক করেছেন।

কাজ হয়েছে উমানাথের তাড়নায়। তিরস্কারের পুরস্কার পেয়েছেন হাতে-হাতে। রোদ ঝলসানো উপবাসক্লিষ্ট কালো মুখেও তাই হাসির ঝলক ফুটেছে। বেশ কয়েকদিন পরে মনটা হালকা হয়েছে। দু-হাত পেছনে রেখে দাঁড়ালেন বস-এর সামনে।

স্নেহাস্পদর সহাস্য মুখ দেখে কৌতুক কটাক্ষ হানলেন উমানাথ।

'কি হে, রাজ্য আর রাজকন্যে দুটোই জয় করে এলে নাকি?'

'আজ্ঞে না, সে রকম কিছু পাইনি।'

'তবে কি পেলে?' আর একটা লাশ?'

'আজ্ঞে, তাও না।'

'তা হলে? মণিমাণিক্য সোনাদানা?'

'প্রায় সেইরকমই।—দামের দিক দিয়ে।'

'বলো কী! দেখাও তোমার সাগরছেঁচা মাণিক।'

পেছন থেকে হাতজোড়া সামনে নিয়ে এলেন। একনাথ রায়। বললেন, 'এইটা।'

জিনিসটা একটা লেডিজ শাল। কালো রঙের।

কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে রইলেন উমানাথ। তারপর বললেন সবিস্ময়ে, 'মেয়েদের শাল। কিন্তু এর দাম হিরে জহরতের সমান হল কী করে?'

'আমার কাছে তাই।'

চোখ চকচকর করল উমানাথের, 'মার্ডারের মেথড পেয়েছ?'

'আজ্ঞে।'

'এই শালটাই সেই মেথড?'

'বলতে পারেন।'

'হেঁয়ালি রাখো, একনাথ,' ঈষৎ গলা চড়িয়ে বললেন উমানাথ। 'কি জেনেছ বলো।'

'আজ্ঞে, যা জেনেছি, তা আপনার সামনেই রয়েছে।—শাল-টাই শেষ পর্যন্ত শাল দিল ফকিরচাঁদকে।'

'একনাথ!'

'আপনি ভাবুন। আমি যা বলবার আদালতে বলব।' বলে, সবিনয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন একনাথ।

উমানাথ ভদ্র উপলব্ধি করলেন শুধু চ্যালেঞ্জ নয়—এই কদিনের রুক্ষ আচরণের পালটা জবাব দিয়ে গেলেন তাঁর সুযোগ্য শিষ্য।

পরের দিন উমানাথ নিজেই উপস্থিত হলেন একনাথের অফিসকক্ষে। শিষ্যটি তখন ঘাড় হেঁট করে নোট লিখছেন খাতায়। পদশব্দে মুখ তুললেন এবং গাত্রোত্থান করলেন।

'কতদূর এগোলে?' জিজ্ঞাসা করলেন উমানাথ।

'আজ্ঞে, আপনাকে একটা টিপস দিতে পারি।'

'কি রকম?' তরল কণ্ঠ উমানাথের।

'শাল-টা যার, সায়া-শাড়িও তার। একই স্ত্রীলোকের। নাম তার মহাকালী। পেশায় পতিতা। মাস দেড়েক সে ঘরে ফেরেনি। কিন্তু শালটা দেখেই ভাটিখানার মালিক চিনতে পেরেছিল। মার্কামারা শাল।'

'আর কিছু?' নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন উমানাথ।

ঠোঁট টিপে বললেন একনাথ, 'আজ্ঞে না।'

বড় কঠিন ঠাঁই, মনে-মনে বললেন উমানাথ।

একনাথ বস-এর মুখ দেখে মনের ভাব অনুধাবন করলেন। সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'হুকুম করলে কিন্তু আমি বলতে বাধ্য।'

আত্মসম্মানে লাগল উমানাথের। বললেন, 'না থাক। দেখি আমি ভেবে।'

কিন্তু অনেক ভেবেও কালো শাল থেকে হত্যার মেথড বার করতে পারলেন না।

আদালত প্রাঙ্গণ। সেদিন লোক হয়েছে খুব।

ফকির-ফিকিরের ফৌতি ব্যবসার কাহিনি পল্লবিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সারা শহরে—সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নবীন পুলিশ অফিসার একনাথ রায়ের নাম।

আদালতে তাই আজ এত ভিড়। কেউ বলছে ফকির জন্মান্তরিত ঠগী সর্দার আমীর আলি। মা ভবানীর প্রসাদ নিয়ে পথিকদের গলায় ফাঁস লাগিয়ে পথে পুঁতে রাখত। এ জন্মে সে মায়ের প্রসাদে স্রেফ মন্ত্রের জোরে নরহত্যা করছে—বাঘা পুলিশ আর দুঁদে ডাক্তাররাও অপারগ হয়েছে হত্যার পদ্ধতি নির্ণয় করতে। কেউ বলছে তার চাইতেও লোমহর্ষক কাহিনি। ফকির-ফিকির যুগ্মভাবে নাকি হাজারখানেক হত্যা করেছে—কলির ভীষ্ম একনাথ রায় আসরে অবতীর্ণ না হলে ছেলেপুলেরা কেউ নিরাপদ না। ইত্যাদি, ইত্যাদি...

সংক্ষেপে, সারা শহরে ঢি-ঢি পড়ে গিয়েছে ফৌতি ব্যবসা নিয়ে।

উৎকণ্ঠা চরমে উঠল একনাথ রায় প্রবেশ করতেই। হাতে একটা কাঠের বাক্স। ক্যাশবাক্স বলেই মনে হল। ডালার আংটা ধরে ঝুলিয়ে আনলেন এবং আসন গ্রহণ করলেন কাঠগড়ার সামনে।

জোড়া-জোড়া চোখ ছানাবড়ার আকারে স্থির হয়ে রইল বাক্সটার ওপর। কী আছে ভেতরে? ফকির ফিকিরের অজ্ঞাত রহস্য নিশ্চয়—মনুষ্যবধের অভিনব উপকরণ!

বিচারপতি প্রবেশ করলেন মঞ্চে। জুরীরা বসলেন যে যাঁর আসনে। শুরু হল সওয়াল জবাব। যথা সময়ে ডাক পড়ল একনাথ রায়ের।

বাক্সটা হাতে নিয়ে কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়ালেন একনাথ রায়। কাঠগড়ার সামনেই পেশকার পান্নাবাবুর টেবিল। বাক্সটা সেই টেবিলে রাখলেন।

পান্নাবাবুকে বললেন, 'একটা কাগজ দেবেন?'

কাগজ এগিয়ে দিলেন পান্নাবাবু। ঝর্ণা কলম বার করে কাগজে কি লিখলেন একনাথ রায়। পেশকারের হাতে দিয়ে বললেন, 'ধর্মাবতারের টেবিলে রাখুন।'

নীরবে হুকুম তামিল করলেন পান্নাবাবু। ধর্মাবতার কাগজ খণ্ডতে চোখ বুলোলেন। নিবিড় বিস্ময় ঘনীভূত হল চোখে। হুকুম দিলেন, 'ফকিরচাঁদ, ফিকিরলাল আর শ্রীশচন্দ্রকে বিপরীত দিকের কাঠগড়ায় হাজির রাখা হোক।'

একনাথ রায় বাগাড়ম্বর করলেন না। মামলার সংক্ষিপ্তসার গুছিয়ে বললেন। সবশেষে বললেন, 'এই নরমেধ যজ্ঞের হোতা তিনজন—ফরিকচাঁদ, ফিকিরলাল এবং শ্রীশচন্দ্র। কিন্তু প্রমাণ নেই। আমি একটি খুনের দৃশ্য আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করব। দেখে বিচার করুন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই বলে এই কশাইদের লোকালয়ে ছেড়ে দিয়ে এতগুলি নিরীহ মানুষের জীবন বিপন্ন করা উচিত হবে কিনা।'

সামনের আসনে বসে ঘাড় বেঁকিয়ে তদগতচিত্তে সহকর্মীর ভাষণ শুনছিলেন উমানাথ। এখন আড়চোখে তাকালেন বিপরীত কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান তিন আসামির দিকে।

এতক্ষণ নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়েছিল তিনজনে। একনাথের শেষ কথায় ঈষৎ উদ্বেগ উপস্থিত হল তিনজোড়া চোখে।

একনাথ কাঠের বাক্সের ডালা খুললেন। একটা কাঁচের গেলাস রাখলেন কাঠগড়ায় চওড়া রেলিংয়ের ওপর। একটা বেতের রিঙ আটকে দিলেন গেলাসের মাথায়। রিঙ থেকে উঠেছে দুটো খাড়াই কাঠি—দুটো কাঠির মধ্যে আড়াআড়িভাবে আর একটা কাঠি দিয়ে জোড়া। শেষোক্ত কাঠির মাঝখান থেকে একটা টোয়াইন সুতো ঝুলছে গেলাসের তলদেশ পর্যন্ত।

এক বোতল জল বার করলেন বাক্স থেকে। জল ঢাললেন গেলাসে—বেশি না—দেড়ইঞ্চি পরিমাণ।

এবার বেরোল একটা দু-ইঞ্চি লম্বা কাচের পুতুল। দু-হাত বুকে জড়ো করে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে।

সবশেষে বার করলেন একফালি কালো কাপড়—প্রস্থে দু-আঙুল, দৈর্ঘ্যে এক আঙুল।

সবকটি বস্তু কাঠের রেলিংয়ে সাজিয়ে রেখে আদালত কক্ষের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন একনাথ রায়। ঘর ভরতি লোক রুদ্ধশ্বাসে চেয়ে আছে তাঁর পানে।

দম নিয়ে শুরু করলেন একনাথ, 'ধর্মাবতার, আমি শুধু একজনের খুনের দৃশ্য এখানে দেখাবো। নাম তার মহাকালী। বৃত্তিতে পতিতা। গায়ে কালো শাল দিয়ে খদ্দের খুঁজতে বেরোত রাস্তাঘাটে—কল-কারখানার আশে-পাশে। বয়স তিরিশ।

'ধরুন, এই পুতুলটা সেই মহাকালী। আর এই কালো কাপড়টা তার কালো শাল। শালটা পুতুলের কাঁধে জড়িয়ে দিলাম আপনাদের সামনে।'

'দেড়মাস আগে খদ্দের ধরতে বেরিয়েছিল মহাকালী। ফকির-ফিকির-শ্রীশ তাকে নিয়ে গেল বাড়ির মধ্যে। কিছু খাইয়ে বেহুঁশ করে ফেলল। তারপর পায়ে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিল কুয়োর মধ্যে এইভাবে...' বলতে-বলতে টোয়াইন সুতোর প্রান্ত কাচের পুতুলের পায়ে বেঁধে গেলাসের মধ্যে নামিয়ে দিলেন একনাথ রায়

পুতুলটাকে উলটো করে। মাথা রইল নিচের দিকে। কাঁধ পর্যন্ত ডুবে রইল জলের মধ্যে। কালো কাপড়টা তলিয়ে গেল গ্লাসের তলদেশে।

সুতো ছেড়ে দিয়ে সটান ফিকির-ফকির-শ্রীশচন্দ্রের পানে চাইলেন একনাথ রায়। ধর্মাবতার তার আগেই ভ্রূকুটি করে চেয়েছিলেন সেইদিকে।

আদালতশুদ্ধ লোক দেখল—ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে তিন আসামির একদা বেপরোয়া মুখ। এমনকী ফিকিরলালের পেচক-চক্ষুর তারকাতেও ভয়ের কাঁপন অতিশয় প্রকট।

জুরীরাও দেখলেন সেই দৃশ্য। দৃষ্টি বিনিময় করলেন পরস্পরের সঙ্গে।

এতক্ষণে বোঝা গেল, নাটকের প্রারম্ভে একনাথ এই কথাই লিখে জানিয়েছিলেন বিচারপতিকে, 'চোখ রাখুন তিন আসামির ওপর। মনের পাপ মুখের অগোচর থাকবে না!'

এবং এই প্রতিক্রিয়া যাতে প্রমারস্বরূপ গ্রাহ্য হয়, তাই এত গোপনীয়তা অবলম্বন করেছেন এই ক'দিন।

এখন, নাটকীয় প্রস্তাবনা দিয়ে প্রমাণ করে দিলেন, অনুমান তাঁর অভ্রান্ত। উপসংহার টানলেন আরও কম কথায়।

বললেন আসামিদের ওপর চোখ রেখে, 'বেশ কিছুক্ষণ জলে চুবিয়ে রেখে মেরে ফেলা হল মহাকালীকে। বেহুঁশ করার জন্যে যা কিছু খাওয়ানো হয়েছিল—বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে। শরীরের বাইরে কোথাও আঁচড়ের দাগ রইল না—ভেতরেও জল ঢুকল না—বেহুঁশ ছিল বলে মহাকালী ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে পারেনি।—কিন্তু মি লর্ড, আবদুল তা করেছিল। তাই কুয়োর গায়ে লেগে রগটা সামান্য কেটে গিয়েছিল। মানুষ বেঁচে থাকলেই হার্ট রক্ত পাম্প করে—মরে গেলে করে না। রগের কাটা দিয়ে তাই রক্ত বেরিয়েছিল আবদুলের মৃত্যুর আগে—রক্তক্ষরণের চিহ্ন দেখেই বুঝেছিলাম, আবদুল লড়ে মরেছে।'

একটু থেমে দম নিলেন একনাথ রায়। গেলাসটা মাথার ওপর তুলে বললেন, 'আপনারা দেখুন, কালো কাপড়টা জলের তলায় পড়ে। পুতুলটাকে মাথা নিচের দিকে করে না ডোবালে কিন্তু কাপড়টা খসে পড়ত না। কুয়োর তলায় কালো শাল দেখে তাই আমি ব্যাক ক্যালকুলেশান করে বাকিটা অনুমান করেছিলাম। বাগানে পাওয়া গেল শাড়ি আর শায়া—শালটা কুয়োর তলায় কেন? —স্ত্রীলোকটিকে মাথা নিচু করে চুবিয়ে মারা হয়েছিল বলে।'

থামলেন একনাথ রায়।

এক ঘর লোকের সামনে কুকীর্তির পুনরাভিনয় দেখে মনের আগল ভেঙে পড়েছিল তিন আসামির।

জেরার মুখে স্বীকার করল ফকিরচাঁদ, হ্যাঁ, একনাথ রায়ের কথা বর্ণে-বর্ণে সত্যি। মহাকালী বারবনিতা। মদ খেত। তাড়ির সঙ্গে আফিং খাওয়াতেই দশ মিনিটেই নেতিয়ে পড়েছিল। পায়ে দড়ি বেঁধে মুখ নিচের দিকে করে কুয়োয় ঝুলিয়ে দিতে পাকস্থলীর আফিং বেরিয়ে গিয়েছিল মুখ দিয়ে—জলের ওপর দেখা গিয়েছিল শুধু কয়েকটা বুদবুদ। আধঘণ্টা রাখতে হয়েছিল এইভাবে। আরও খুন হয়েছে একই পন্থায়।

ছটফট করেছিল আবদুল। তাই কুয়োর গায়ে লেগে কেটে গিয়েছিল রগটা। কিন্তু মৃত্যুর পর যে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায়, তা জানা ছিল না বলেই মিথ্যে বলতে গিয়ে ধরা পড়ে গিয়েছিল গিরধরলালের কাছে।

কাহিনি শেষ করে ফোঁৎ-ফোঁৎ নাকঝাড়া শব্দের ফাঁকে-ফাঁকে পুলিশকাকা বললেন, 'এই ছোট্ট ব্যাপারটা...তোর ঘিলুতেও...ধরা পড়েনি...অথচ তুই লিখিস...গোয়েন্দা গল্প।'

নীরস ব্যঙ্গ নীরবে হজম করে বাড়ি এসেই লিখে ফেললাম গল্পটা।

** 'বেতার-জগৎ' পত্রিকায় প্রকাশিত (৪৬ বর্ষ, ১৯ সংখ্যা)।*